পরশুরাম গল্পসমগ্র



রাজশেখর বসু

'ব্যাস ঋষির সিংহনাদ'

নামে খ্যাত জগৎবিখ্যাত কথাগ্রন্থ

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত

মহাভারত

এমন বিচিত্র চরিত্র সমাবেশ কোনও

উপন্যাসে নেই লোকোত্তর চরিত

মহারথ ভীষ্ম....

অস্থিরমতি হতভাগ্য ধৃতরাষ্ট্র....

বিভ্রান্ত ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির....

চিরন্তন দুরাত্মা দুর্যোধন....

নির্মম প্রতিহন্তা ভীম....

অদ্বিতীয়া নায়িকা পঞ্চপ্রিয়া

পাঞ্চালী....

শাশ্বত ধর্মসোপ্তা কৃষ্ণ....

প্রিয়াগতপ্রাণ ঋষিপুত্র রুরু....

সতী শিরোমণি সাবিত্রী দময়ন্তী....

সেকালের একালিনী দেবযানী....

গণিকা কবলিত কিশোর ঋষ্যশৃঙ্গ....

এই রকম অসংখ্য চরিত্র।

অতি প্রাচীন চিরনূতন মহাগ্রন্থ।

ISBN : 81-7157-044-5

পরশুরাম গল্পসমগ্র

রাজশেখর বসু

যতীন্দ্রকুমার সেন বিচিত্রিত

সম্পাদনা ঃ দীপংকর বসু

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক ঃ শমিত সরকার
এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ঃ অমিতাভ খান

প্রথম সংস্করণ (তিন খণ্ডে) আশ্বিন ১৩৭৬ (১৯৬৯)
প্রথম অখণ্ড সংস্করণ
কার্তিক ১৩৯৯ নভেম্বর ১৯৯২
মূল্য ঃ ২০০ টাকা
এককালীন গ্রাহক মূল্য ঃ ১২৫ টাকা● দু' কিস্তিতে গ্রাহক মূল্য ঃ ১৫০ টাকা
বিমান ডাক খরচ সহ বিদেশের মূল্য
$ 16·00 £ 8·00

ISBN : 81-7157-044-5

মুদ্রাকর
প্রিন্ট-ও গ্রাফ
৯-সি ভবানী দত্ত লেন
কলকাতা-৭০০০৭৩

সূচীপত্র

আনন্দীবাঈ ইত্যাদি গল্প ৫৯৩—৬৮০

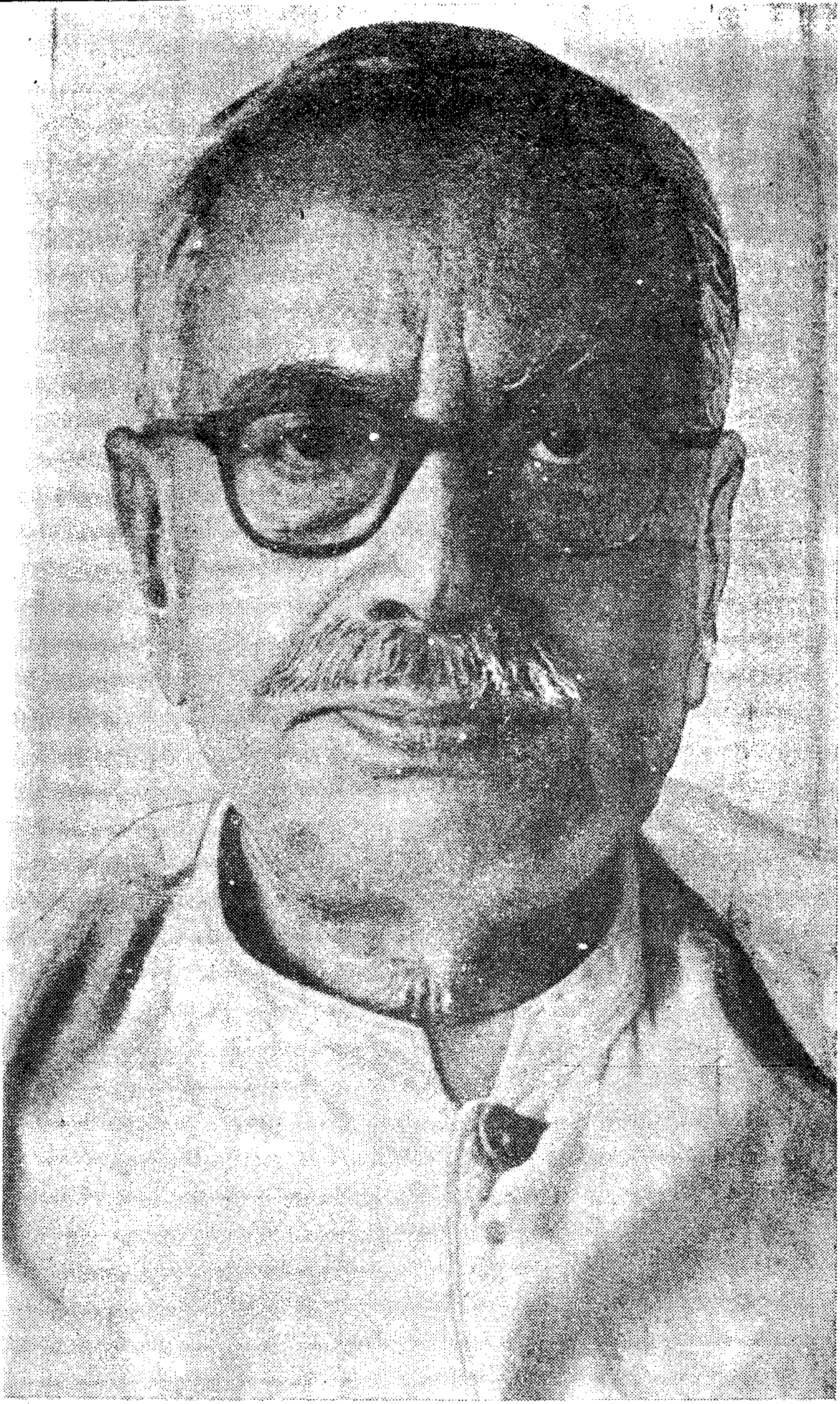
চমৎকুমারী ইত্যাদি গল্প ৬৮১—৭৬২

কবিতা ৭৬৫-৮৩২

চিত্রসূচী



পরশুরাম-অঙ্কিত (পেনসিলে)
(কার 'মুখ'-জানা নেই)



জন্ম : ১৬ মার্চ ১৮৮০ মৃত্যু : ২৭ এপ্রিল ১৯৬০

ভূমিকা

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

পুরাকালে পরশুরাম এসেছিলেন মানুষ মারতে, আমাদের কালে পরশুরামের সে রকম কোন মারাত্মক উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি মানুষকে হাসিয়ে গিয়েছেন। এই হাসির প্রকৃতি কি তা না-হয় পরে বিচার করা যাবে, তবে আপাততঃ নির্বিচারে বলা যায় যে পরশুরাম হাসির গল্প লিখে গিয়েছেন,—সে সব গল্পে অন্য উপাদান থাকলেও, হাসিটাই মূল উপাদান। হাসির গল্পলেখক মাত্রেই হাসিখুশি থাকবে, আমুদে হবে এরকম ধারণা অনেকের আছে, কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে হাসির রচনা যাঁরা লিখে গিয়েছেন তাঁরা সকলেই গম্ভীর প্রকৃতির লোক। ত্রৈলোক্যনাথ, প্রভাতকুমার, পরশুরাম সকলেরই প্রকৃতি গম্ভীর। প্রাচীনদের মধ্যে মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন বলেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়, কারণ তাঁদের দু'জনেরই দুঃখের জীবন। এত দুঃখের মধ্যে এত হাসিকে কেমন করে তাঁরা রক্ষা করেছেন সে এক বিস্ময়। শমীবৃক্ষ আপন অভ্যন্তরে অগ্নিকে কিভাবে রক্ষা করে? ব্যতিক্রম বোধ করি দীনবন্ধু। দীনবন্ধু আমোদপ্রিয় মজলিসী ব্যক্তি ছিলেন। আবার তিনিও ব্যতিক্রম কিনা সন্দেহ করবার কারণ আছে, যেহেতু খুব সম্ভব একই সংগে দুটি বিপরীত ব্যক্তিত্বকে অন্তরে তিনি পোষণ করতেন। একজন সামাজিক ব্যক্তি, অপরজন সাহিত্যিক। তবু না হয় স্বীকার করা গেল তিনি ব্যতিক্রম।

প্রকৃত হাস্যরসের মধ্যে একটা গাম্ভীর্য আছে, প্রকৃত হাস্যরস আর যাই হোক তরল নয়। কালিদাস যে কৈলাস পর্বতকে ত্র্যম্বকের অট্টহাসির সংগে তুলনা করেছেন সে এই জন্যে। প্রকৃত হাস্যরস করুণার রূপান্তর বলেই তা গহন গম্ভীর। এ কথাই সবাই বোঝে না বোলেই হাসির গল্পের লেখককে দেখতে গিয়ে আমুদে লোককে প্রত্যাশা করে। পরশুরামকে দেখতে গিয়ে অনেকেরই সন্দেহ হয়েছে এ কেমন ধারা হলো, ইনি যে গম্ভীর রাশভারী লোক।

অনুরূপা দেবীর এইরকম আশাভঙ্গ হয়েছিল। * "আমার বিশ্বাস ছিল 'পরশুরাম', আমার পরম স্নেহাস্পদ 'বিশু'র স্বামী, তাঁর লেখার মতই খুব হাসিখুশিতে ভরা অত্যন্ত সামাজিক, চালাক, চটপটে একটি আমুদে লোক হবেন। কিন্তু ওঁকে দেখে মনে মনে ভাবলাম —ইনি কি করে ওই সব অপূর্ব হাস্যরসের আধার হলেন? এ যেন 'সরষার মধ্যে ত্যাল'। মজঃফরপুরে থাকতে আমার একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু, আমার স্বামীর সহপাঠী সাবজজ ব্রজেন ঘোষের স্ত্রী পংকজিনী ঘোষের মারফত তাঁর ছোট বোন (কনিষ্ঠা নয়) বিশুর সংগে পরিচয় ঘটেছিল তার পরে। তার স্বামীর কথা, তাঁর আঁকা বিশুরই চিত্র (অসুখের পূর্বে, তৎপরে ইত্যাদি) ও নানা সরস মন্তব্য দেখেশুনে ঐ রকম ধারণাটাই বোধহয় পাকা হয়ে গেছলো। যাহোক, পরে সে বিষয়ে সামঞ্জস্য করবার সুযোগও যথেষ্ট রূপেই আমি পেয়েছিলাম। তাঁর বেংগল কেমিকেলের গৃহে, পরে বহু-বহুবার তাঁর নিজগৃহেও যাতায়াত করে তাঁর লেখার মতই তাঁর গভীর সৌজন্যপূর্ণ গাম্ভীর্যময় সুমিষ্ট ব্যবহারে তাঁর অন্তরের কোন্ গভীরে যে তাঁর অন্তঃসলিল সহজাত হাস্যরস প্রবাহিত ছিল তার সম্যক সন্ধান লাভ করেছি। আর দেখেছি তাঁর ধ্যানমগ্ন শোকগম্ভীর সে রূপটুকু। বাস্তবিক একাধারে এমন শান্তসমাহিত

---

* কথা সাহিত্য : রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা : শ্রাবণ ১৩৬০

এবং স্নিগ্ধসরস চরিত্র সংসারে বড় কম দেখা যায়।" (কথাসাহিত্য : রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা : শ্রাবণ, ১৩৬০)।

কবিশেখর কালিদাস রায় মহাশয়ও আমাদের মন্তব্যের সমর্থক।* "রাজশেখরবাবু রাশি-রাশি পুস্তক রচনা করেন নাই, মাসিক পত্রিকায় কচিৎ কখনও তাঁর লেখা দেখা যায়। জীবিকার জন্য তিনি লেখেন নাই, বাণীকে বানরী করিয়া সভায় সভায় তিনি নাচান নাই, সাহিত্যকে পণ্য করিয়া তিনি গ্রন্থবণিক সাজেন নাই, দেশের সভা-সমিতি, সমাজের নানা অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ-সভা, সাহিত্যিক বৈঠক, গোষ্ঠী, মজলিস কোথাও তাঁহাকে দেখা যায় নাই। এই ভাবে তিনি সাহিত্যিক আভিজাত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিয়াছেন।

তাঁহাকে 'রাজশেখর দাদা' বলিয়া কেহ আহবান করিতে সাহসী হন নাই। প্রগল্ভতা, চাপল্য বা ধৃষ্টতা দূর হইতে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া চলিয়া যায়। তিনি কাহারও স্তব প্রশস্তি গান করেন নাই, ভূমিকা, পরিচায়িকা, প্রশংসাপত্র ইত্যাদির পুটে প্রসাদ বিতরণ করেন নাই, অযোগ্যকে মিথ্যা স্তোকবাক্যে আশ্বস্ত করেন নাই, আচার্য সাজিয়া সহস্রের প্রথাগত প্রণিপাত ও মুদ্রিত অর্ঘ্য গ্রহণ করেন নাই।

তাঁহার জীবনে যেমন একটা বিবিক্ততা ও বিচ্ছিত্তি দেখা যায়—রচনাতেও তেমনি আত্ম-নিগূহন ও প্রথম শ্রেণীর আর্টিস্টের পক্ষে যে detachment ও impersonality স্বাভাবিক তাহাই লক্ষিত হয়। রাজশেখরবাবু নিজে না হাসিয়া হাসান, নিজে না কাঁদিয়া কাঁদান, নিজে অন্তরালে থাকিয়া ঐন্দ্রজালিক মায়া বিস্তার করেন—এ বিষয়ে তিনি বিধাতারই মন্ত্রশিষ্য।"

এই মন্তব্যের আর একজন সাক্ষী বর্তমান লেখক। সে ১৯৩৪ সালের কথা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিভাষা কমিটি গঠন করেছে, অবৈতনিক সম্পাদক অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, বেতনভুক্ সহকারী সম্পাদক বর্তমান লেখক, সভাপতি রাজশেখর বসু। প্রথম দিনের অধিবেশনে আগ্রহভরে সভাপতির অপেক্ষায় আছি, আগে কখনও তাঁকে দেখিনি। নির্দিষ্ট সময়ে সৌম্যমূর্তি প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন, গায়ে সাদা খদ্দরের গলাবন্ধ কোট, পরনে খদ্দরের ধুতি (এ পোশাক ছাড়া অন্য পোশাকে তাঁকে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না) হাতে কাগজের ফাইল, গম্ভীর প্রসন্ন মুখ। সে প্রসন্নতা কতকটা স্বভাবের, কতকটা প্রতিভার। ঐ প্রসন্নতাটুকু না থাকলে তাঁকে যে-কোন বড় একটা অফিসের অভিজ্ঞ বড়বাবু বলে মনে হওয়া অসম্ভব নয়। ক্রমে টেবিলের চারধারের চেয়ারগুলি পূর্ণ হয়ে উঠল, সকলেই গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তি, অধিকাংশই নামজাদা অধ্যাপক। বিজ্ঞানের নানা শাখার পরিভাষা সংকলিত হচ্ছে, নানা শাখায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আছেন, সভাপতির সব শাখাতেই সমান অধিকার। বাঙালীর সভার কাজ চালানো সহজ নহে, কাজের কথাকে ছাপিয়ে ওঠে অকাজের কথা। অকাজের কথায় সভাপতি যোগ দেন না, চুপ করে শোনেন, কিছুক্ষণ পরে কথার মোড় ঘুরিয়ে কাজের কথায় নিয়ে এসে ফেলেন। কোন একটা বিষয়ে কতজনে কতরকম মন্তব্য করছেন সভাপতি নীরব শ্রোতা সকলের সব মন্তব্য শেষ হলে দুটি একটি ক্ষুদ্র কথায়—শিখা জেলে দিলেন তিনি। সমস্ত পরিষ্কার হয়ে গেল। এই সভা দীর্ঘকাল চলেছিল। দীর্ঘকাল তাঁকে টেবিলের অন্য প্রান্ত থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছি। কখনও কখনও সভার অধিবেশন বসেছে তাঁর সুকিয়া স্ট্রীটের ভাড়া বাড়িতে। বস্তুতঃ সভা চালাতে এমন যোগ্য সভাপতি আমার চোখে পড়েনি। সভাপতির মধ্যে কোনদিন 'গড্ডলিকা'র লেখককে দেখতে পাইনি, বড় জোর দেখতে পেয়েছি বেঙ্গল কেমিকেলের অভিজ্ঞ ম্যানেজারকে। ব্যক্তিত্বের শক্তিতে তিনি রাজশেখর বসু। পরশুরামকে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য কোঠায় রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছেন। এই স্বাতন্ত্র্যের ভাব অপর একজন ব্যক্তিও লক্ষ্য করেছেন। * "যখন তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়

* কথা সাহিত্য : রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা : শ্রাবণ ১৩৬০

হয়েছে সেই সময় একদিন আমায় Bengal Chemical-এর আপিসে—যে আপিসের তিনি সে সময়ে Manager ছিলেন—কার্যবশতঃ দেখা করতে যেতে হয়েছিল। কাজের কথা হয়ে যাবার পর আমি—যেমন আমাদের বেশীর ভাগ লোকেরই অভ্যাস—তাঁকে দু-একটা বাড়ির খবরের কথা জিজ্ঞেস করেছিলুম। কিছুমাত্র দ্বিধা না করে তিনি তখনই বলে দিলেন—ও সব কথা ত আপিসের নয়—আপিসের সময় নষ্ট না করে বাড়িতে জিজ্ঞেস করবেন—এই বলে তিনি নিজের কাজে মন দিলেন। তখন আমার বয়স অনেক কম ছিল, তাঁর কাছে থেকে এই শিক্ষা তখন পেয়েছিলুম যে. আপিস আপিসই, বাড়ি নয়—কর্তব্যের সময় কর্তব্য করে যাওয়াই সংগত: অন্য কাজে বা কথায় সময় নষ্ট না করাই উচিত।" মেজদা—শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র। (কথাসাহিত্য ঃ রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা ঃ শ্রাবণ, ১৩৬০)।

কয়েক বৎসর পরে কাজ শেষ হয়ে গেলে পরিভাষা কমিটি উঠে গেল, পরিভাষা কমিটির সিদ্ধান্তগুলি এখন 'চলন্তিকা' অভিধানের পরিশিষ্টে স্থান পেয়েছে। তখন তিনি বকুল-বাগান রোডে বাড়ি তৈরী করে উঠে গিয়েছেন। সে বাড়িতে অনেকবার গিয়েছি. কখনও দরকারে, অধিকাংশ সময়েই অদরকারে। যেতেই প্রথম প্রশ্ন করেছেন, চা-না কফি? তাঁর সমাদরের মধ্যে আড়ম্বর ছিল না, তবে সহৃদয়তার কখনও অভাব দেখিনি। সেখানেও দেখেছি দুটি একটি কথায় আলোচনার জট ছাড়াতে তার স্বাভাবিক নিপুণতা। আমরা হয়তো অনেক কথা বললাম, মুহূর্তে তার মধ্যে থেকে আলগোছে আসল কথাটি তুলে নিলেন। এও তাঁর শিক্ষা ও স্বভাবের ফল। তাঁর বাড়িটিও তাঁর গায়ের খদ্দরের কোটের মত অনাড়ম্বর প্রশস্ত, বিলাসিতা নেই অথচ সম্পূর্ণ বাসোপযোগী। আর একটা লক্ষ্য করবার জিনিস তাঁর গায়ের কোটটি. যেটা প্রথমেই চোখে পড়েছিল পরিভাষা কমিটির অধিবেশনে। নিপুণ জাদুকর যেমন পোশাকের নানা অন্ধিসন্ধি থেকে বিচিত্র বস্তু টেনে বের করেন, তেমনি বের করতেন তিনি কোটের পকেট থেকে। অনেকগুলি পকেট. কোনোটা চশমার খাপ রাখবার, কোনোটা ফাউণ্টেন পেন রাখবার, কোনোটা থেকে বা বের হতো পেন্সিল কাটা ছুরি ও রবার, প্রায় তাঁর 'অটমেটিক শ্রীদুর্গাগ্রাফ' আর কি! মোটের উপরে রাজশেখর বসু সজ্জন, অমায়িক, গম্ভীর প্রকৃতির ব্যক্তি, প্রকৃত হাস্যরসিকের যেমন হওয়া উচিত তার চেয়ে কম বা বেশী নন। এ পর্যন্ত যা জানা গেল. তাতে আর দশজন হাস্যরসিক সাহিত্যিকের সংগে তাঁর মিল আছে। এবারে অমিলটা কোথায় দেখা যাক। মিলে-অমিলে মিলিয়ে চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে আশা করা যায়।

॥ ২ ॥

কোনো লেখকই আকাশের শূন্যতায় জন্মগ্রহণ করে না. তারা ছোট বড় মাঝারি যে দরেরই লেখক হোক না কেন। লেখকের সামাজিক পরিবেশ, দেশ ও কালের প্রভাব. পারিবারিক প্রবণতা প্রভৃতি লেখককে অজ্ঞাতে নিয়ন্ত্রিত করে. এখানে লেখক মানে তার শক্তির বিশেষ রূপটি। এখন কোন লেখককে সম্যকভাবে বুঝতে হলে এই সমস্তর সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে কিংবা এই সমস্তর মানচিত্রের উপরে যথাস্থানে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে বুঝতে হবে। 'কবিকে পাবে না কবির জীবনচরিতে'. একথা সর্বাংশে গ্রাহ্য নহে: জীবনচরিত যদি যথার্থ হয় তবে অবশ্যই কবিকে তাতে পাওয়া যাবে। আরও একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে বলতে হবে যে লেখকের শৈশব বা বড়জোর বাল্যকালের কয়েক বছর তাকে গঠন করে তোলে। 'Child is father of the man' এ আদৌ কবির অত্যুক্তি নয়। আরব্য-উপন্যাসে দেখা গিয়েছে যে, সিন্ধবাদ এক বৃদ্ধকে কাঁধে নিয়ে চলতে বাধ্য হয়েছে, মানুষের বেলায় ঠিক তার উল্টো।

প্রত্যেক মানুষ তার শৈশবকে কাঁধে নিয়ে আমৃত্যু চলছে। লেখকের পক্ষে একথা আরও সত্য, কেননা লেখক যে জীবনরহস্যের সন্ধানী তার চাবিকাঠি ঐ শিশুটার হাতে।

রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামের গণ্ডি', তেতালায় বসে দুপুরের আকাশে চিলের ডাক শ্রবণ, পেনেটির বাগানে প্রথম গঙ্গাদর্শন প্রভৃতি আদৌ অকিঞ্চিৎকর ঘটনা নয়। পারিবারিক বিগ্রহের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্তি, কিংবা সাগরদাঁড়ি গ্রামে নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী মধুসূদনের মনে যে সূক্ষ্ম প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার ক্রিয়া শেষ পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। মানুষ দশ-বারো বছর বয়স পর্যন্ত যা গ্রহণ করে তাই তার যথার্থ পুঁজি, তারপরে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে নূতন সঞ্চয় যতই হোক, পুঁজিতে যতই মুনাফা দেখানো যাক না কেন, মূলধনের পরিমাণ বাড়ে না। এ সত্য রাজশেখর বসু সম্বন্ধে ষোলআনা প্রযোজ্য। কবিকে জানতে হলে তার জীবনের ভিতর দিয়ে জানতে হবে, কাজেই রাজশেখর বসুর সাহিত্য-বিচারের আগে তার জীবন-বিচার আবশ্যক।

রাজশেখরবাবু নিজে খ্যাতি সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন, স্মৃতিকথা, জীবনচরিত বা কোন-রকম খসড়া লিখবার কথা ভাবেন নি। অধিকাংশ লেখক খ্যাতির প্রদীপের শিখাটিকে নিজেই উস্কে দেয়, কেউ বা প্রত্যক্ষে কেউ বা গোপনে, রাজশেখরবাবু কিছুই করেন নি। তবে সৌভাগ্যবশতঃ তাঁর স্বজন ও অনুরাগীগণ কিছু করেছেন বটে। এখানে আমরা সেই সব রচনার সুযোগ গ্রহণ করলাম। উদ্ধৃতিগুলি কিছু দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও ভীত হইনি, কারণ গ্রন্থাবলীর সঙ্গে জীবনের বিস্তৃত পরিচয় সংযুক্ত থাকা নিতান্ত স্বাভাবিক।

প্রথম উদ্ধৃতিতে রাজশেখর বসুর বাল্যকালের কিছু বিবরণ পাওয়া যাবে।

* "দ্বারভাঙ্গা ঘুরে এসে একবার চন্দ্রশেখর (পিতা) বললেন, 'ফটিকের নাম ঠিক হয়ে গেছে।' মহারাজ (লক্ষ্মীশ্বর সিং, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ) জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার দ্বিতীয় ছেলের নামও একটা শেখর হবে নাকি? কি শেখর হবে?' আমি বল্লাম, ইওর হাইনেস, যখন তাকে আশীর্বাদ করেছেন, তখন আপনিই তার শিরোমাল্য,—আমি আপনার সামনে তার নামকরণ করলাম রাজশেখর। দারভাঙ্গার রাজা যার শিরে আছেন,—রাজা মহেন্দ্রপালের সভাকবি থেকে এ নাম নেওয়া হয়নি।

মা যখন তার হাতে খেলনা দিতেন, টিনের এঞ্জিন, রবারের বাঁশি, স্প্রিং-এর লাট্টু, এক ঘণ্টার মধ্যেই রাজশেখর লোহা, পাথর ও হাতুড়ি দিয়ে ভেঙ্গে দেখতো ভেতরে কি আছে,—কেন বাজে?—কেন ঘোরে?

আবার যখন কলকাতা থেকে স্প্রিং-এর নূতন এঞ্জিন আসতো, মা রাজশেখরের হাতে দেবার সময় বলতেন, দেখিস্ যেন ভাঙিস না। অমনি চার বছরের ছেলের মুখ অভিমানে গম্ভীর হয়ে গেল,—খেলনা নেবে না! তারপর মা বললেন, 'এই নে যা খুশি কর!' তখন নিয়ে খানিকক্ষণ চালিয়ে রাজশেখর এঞ্জিনটার মুণ্ডপাত করতো।

রাজশেখর আরো বড় হলে কলকাতা থেকে একটা আড়াই টাকা দিয়ে এঞ্জিন কিনে এনেছে। তাতে ইসপিরিট দিয়ে চালাবার জন্য আমাদিগকে সব ডাকলো। সোঁ সোঁ হিস হিস করচে স্টিম, কিন্তু এঞ্জিন চলচে না। সায়েনটিফিক মেকানিকাল ব্রেন বিপদ ঘটবে বুঝে নিলে—চিৎকার করে বললে, 'দাদা পালাও। পালাও!' সকলে পালিয়ে অন্য ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। দড়াম করে বিকট আওয়াজে আড়াই টাকার বয়লার ফাটলো। সকলেই চিন্তিত, —কর্ড মেলের বয়লার ফাটে যদি?

রাজশেখরের বয়স যখন চার তখন সে ফুলস্টপ দিতে শিখলো। দুজন লোক একটা বড় কাগজ ধরে দাঁড়িয়ে থাকতো আর পায়জামা চায়না কোট পরা রাজশেখর একটি পেনসিল

---

* রাজশেখরের ছেলেবেলা : শশিশেখর বসু : শারদীয়া যুগান্তর

নিয়ে ছুটে এসে কাগজটা ফুটো করে পেনসিল ভেঙে দিতো। এই তার হাতেখড়ি। পকেটে অটোমেটিক পেনসিল, হাতে লোহার স্ট্র্যাপ, কখনও বা কাঠের 'সোটা'।

যখন দারভাঙ্গায় এলাম তার বয়স তখন সাত আন্দাজ। আমি লুকিয়ে বাবার বাক্স থেকে 'বেগম' সিগারেট চুরি করে খাই। রাজশেখর যখন আর একটু বড় হলো বল্লাম, 'ওরে ফটিক, একটা সিগারেট টান দিকি, এতে ভারি মজা!' রাজশেখর একটু টেনে ফেলে দিলে।

বুড়ো বয়সে যখন দিল্লীতে অপারেশন হল বেচারী যন্ত্রণায় ছটফট করচে। ডাক্তার সন্তোষকুমার সেন পেশেণ্টকে অন্যমনস্ক করবার জন্যে বল্লেন, 'সিগারেট খান একটা।' পেশেণ্ট বল্লে, 'খাই না।' 'কখনও খাননি?' রাজশেখর উত্তর দিল, 'আমার দাদা একবার লুকিয়ে খাইয়েছিল ছেলেবেলায়।' ডাঃ সেন বল্লেন, 'You ought to have continued it!' এবং পেশেণ্ট ও ডাক্তার হেসে উঠলেন। যাঁরা বলেন, রাজশেখর হাসে না, তাঁরা দেখবেন রোগযন্ত্রণাতেও কি রকম মজা করবার ঝোঁক। আট বছর বয়সে মাছ মাংস ঘৃণায় ত্যাগ করলো। লোকে বলল, "রাজশেখর বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হবে। ইঁদুর কলে পড়লে ছেড়ে দিত, মারত না।" (রাজশেখরের ছেলেবেলা ঃ শশিশেখর বসু ঃ শারদীয়া যুগান্তর)।

দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে বাল্যকালের বিবরণ কিছু থাকলেও বেশি করে আছে কলকাতার তাঁর কলেজ জীবনের কথা এবং চাকুরি জীবনের প্রারম্ভের বিবরণ।

* "১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ মঙ্গলবার বর্ধমান জেলার শক্তিগড়ের সন্নিকটস্থ বামুনপাড়া গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। বামুনপাড়া হচ্ছে রাজশেখরের মামার বাড়ি। আর পৈতৃক নিবাস নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী উলা বীরনগর।

চন্দ্রশেখর বসুর চার পুত্র ঃ শশিশেখর, রাজশেখর, কৃষ্ণশেখর, গিরীন্দ্রশেখর। চন্দ্রশেখরের জন্ম হয় ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। ইহারা মাহিনগর সমাজভুক্ত বড়ানিবাসী কনিষ্ঠ ধবু বসুর সন্তান। চন্দ্রশেখরের বৃদ্ধপ্রপিতামহ রামসন্তোষ বসু পলাশী যুদ্ধের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্বে উলার মুস্তৌফী বাটীতে বিবাহ করেন।

রাজশেখরের পিতা চন্দ্রশেখর সামান্য অবস্থায় জীবনসংগ্রাম শুরু করেন। তবে তাঁর যোগ্যতার গুণে দ্রুত উন্নতির মধ্য দিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। তিনি যখন যশোহর জেলায় সামান্য একজন ডাক বিভাগের কর্মচারী, সেই সময়ে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার সম্পর্কে অনুসন্ধান করে কলকাতায় যে রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন, তারই উপর ভিত্তি করে কলকাতায় ইণ্ডিগো কমিশনের তদন্ত কাজ চলে।

চন্দ্রশেখর সাহিত্য এবং দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ বজায় রাখতেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেনও। তার রচিত বেদান্তপ্রবেশ, বেদান্তদর্শন, সৃষ্টি, অধিকারতত্ত্ব, প্রলয়-তত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থ সেকালে খ্যাতিলাভ করেছিল।

পরবর্তীকালে চন্দ্রশেখর দ্বারভাঙ্গার মহারাজার ম্যানেজার পদে বহাল হয়ে দীর্ঘকাল বাংলার বাইরে অতিবাহিত করেন। রাজশেখরের বাল্যকাল পিতার সঙ্গে বাংলার বাইরেই কেটেছে। প্রথম সাত বৎসর তিনি মুঙ্গের জেলার খড়্গপুরে কাটান। তারপর ১৮৮৮ থেকে ১৮৯৫ পর্যন্ত দ্বারভাঙ্গার রাজ স্কুলে পড়ে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দ্বারভাঙ্গার স্কুলে রাজশেখরই তখন একমাত্র বাঙালী ছাত্র ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তাঁর পিতার নিয়ম-নিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্‌গুণের দ্বারা রাজশেখর এবং তাঁর ভ্রাতৃবর্গ প্রভাবান্বিত হন। চন্দ্রশেখর নিজে ছেলেদের হস্তলিপি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর রাখতেন। পরে বড় হয়েও তাঁরা বাল্যকালের ভিত্তিপত্তনকে অগ্রাহ্য করেন নি। ব্যক্তিজীবনের ক্ষেত্রেও তাঁরা সেই ধারা বহন করে চলেছেন। বাংলাদেশের বেমক্কা চরিত্রের সঙ্গে এদিক দিয়ে তাঁর আশ্চর্য ব্যতিক্রম।

---

* গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। কথা সাহিত্য ঃ রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা ঃ শ্রাবণ ১৩৬০

১৮৯৫-৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজশেখর পাটনা কলেজে ফার্স্ট আর্টস পড়েন। এই সময়ে রাজেন্দ্রপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর সহপাঠী ছিলেন। পাটনা কলেজে তাঁর সঙ্গে আরও জন-দশেক বাঙালী ছাত্র পড়তেন। সে মহলে সাহিত্য-আলোচনা হত, তবে তা তেমন দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। বাঙালী মন তখনও হেম-মধু-বঙ্কিমের প্রভাব-প্রতিপত্তির আওতায় চলেছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতি হয়েছে, তবে সেরকম প্রকট হয়নি।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজশেখর পাটনার পর্ব চুকিয়ে কলকাতায় বি. এ. পড়বার জন্য এলেন, প্রেসিডেন্সী কলেজের বিজ্ঞান শাখায় তিনি ভর্তি হলেন। এই বছরই তাঁর বিবাহ। তাঁর পত্নী মৃণালিনী ছিলেন শ্যামাচরণ দে'র পৌত্রী। রাজশেখর ও মৃণালিনীর সন্তান বলতে একমাত্র কন্যা প্রতিমা।

প্রেসিডেন্সী কলেজে রাজশেখর যখন পড়েন সে সময়ে শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষও পড়তেন, তবে হেমেন্দ্রবাবু আর্টসের ছাত্র ছিলেন। রাজশেখরের সতীর্থদের মধ্যে শরৎচন্দ্র দত্ত পরবর্তী-কালে জার্মেনী থেকে বিশেষ শিক্ষা লাভ করে দেশে ফিরে এ্যাডেয়ার ডাট্ নামে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এ ছাড়া আর্ট প্রেসের নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং নরেন্দ্রনাথ শেঠও তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর কাছে রাজশেখর সামান্য কিছুদিন বি. এ.-তে পড়েছেন। অনেকের ধারণা আছে যে, তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ছাত্র, এ ধারণা ভুল। অবশ্য পরবর্তী জীবনে প্রফুল্লচন্দ্রের সাহচর্যে রাজশেখর উপকৃত হয়েছিলেন, তবে সেটা কর্মজীবনে, ছাত্রজীবনে নয়।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কেমিস্ট্রি এবং ফিজিক্সে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স নিয়ে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এর একবছর পরে অর্থাৎ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে রসায়নশাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করে রাজশেখর এম. এ. পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হলেন।

পাটনা এবং কলকাতায় থাকবার সময়েও দ্বারভাঙ্গার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অব্যাহত ছিল।

এম. এ. পাশ করার দু-বছর পরে তিনি আইন অধ্যয়ন সমাপ্ত করে বি. এল. পরীক্ষাটিও পাশ করে ফেললেন। এরপর স্বভাবতই হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ের উদ্যোগ করবার কথা। কিন্তু মাত্র তিনদিনেই আদালতে পসার জমাবার উদ্যমে জলাঞ্জলি দিয়ে বসলেন। আইন ব্যবসায়ীর খোলস চাপকানগুলি বিলিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হয়ে তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

রাজশেখর প্রকৃতিগত ভাবেই সৎ এবং ভদ্র। শুধু একথা বললেও সম্পূর্ণ বলা হয় না। তিনি সংযত শান্ত এবং অন্তর্মুখী মানুষ। তাঁকে দিয়ে গবেষণাদির চিন্তাপ্রধান কাজই ভাল হতে পারে, এ কথা তিনি নিজেও বেশ বুঝেছিলেন।

"১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল এবং রাজশেখর বেঙ্গল কেমিকেল ওয়ার্কস-এ রাসায়নিকের পদে বহাল হলেন। তখন সারকুলার রোডে বেঙ্গল কেমিকেলের কার্যালয় ছিল। সারকুলার রোড থেকে কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়ে নয় বৎসর এ্যালব্যার্ট বিল্ডিংস-এ ছিল। বর্তমান বেঙ্গল কেমিকেলের আপিস চিত্তরঞ্জন এভেন্যুতে অবস্থিত। প্রথমে রাজশেখর কিছুকাল থাকেন বেচু চাটুজ্যে স্ট্রীটের ভাড়া-বাড়িতে, তার-পর পার্শীবাগানের পৈতৃক গৃহে অবস্থান করেন। কাজে বহাল হওয়ার এক বছরের মধ্যেই তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজার হলেন। এবং ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বেঙ্গল কেমিকেলের সর্বময় কর্তৃত্বের ভার গ্রহণ করলেন। সেই থেকে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই স্বদেশী প্রতি-ষ্ঠানটির প্রভূত উন্নতিসাধন করে অবসর গ্রহণ করেন। অবশ্য এখনও পরোক্ষভাবে বেঙ্গল

কৌমিকেল তাঁর কাছে উপদেশ পরামর্শ গ্রহণ করে থাকেন।" (গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। কথা-সাহিত্য : রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা : শ্রাবণ, ১৩৬০)

এই দুটি অংশ পড়লে শৈশব, বাল্য ও প্রথম যৌবনের একটা খসড়া পাওয়া যাবে। আপাততঃ এতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে, কারণ এর বেশী তথ্য পাইনি, আর আমার বিচারে তার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কারণ এই বয়সের মধ্যেই তাঁর ভাবী রচনার গাঁথুনি পাকা হয়ে গিয়েছে। তবে আর একটা পরিচয় এখানে উদ্ধার করে দিচ্ছি। চোদ্দ নম্বর পার্শীবাগান বসু ভ্রাতৃগণের পৈতৃক বাসভবন। এই বাড়িটি ও এখানে যে নিয়মিত আড্ডা বসতো নামান্তরে পরশুরামের রচনায় তা অমরত্ব লাভ করেছে।

"১৪ নম্বর পার্শীবাগানে একটি বিরাট আড্ডা বসিত। পরশুরামের গল্পে ইহা ১৮ নম্বর হাবসীবাগান বলিয়া পরিচিত। ১৪ নম্বর ছিল বসু ভাতৃগণের পৈতৃক বাসভবন। চারি ভ্রাতার মধ্যে রাজশেখর বসু মধ্যম, আমরা মেজদা বলিতাম; ডক্টর গিরীন্দ্রশেখর বসু কনিষ্ঠ। সে আজ ত্রিশ বৎসরের কথা তাঁহাদের সহিত প্রথম আলাপ। প্রতিদিনই মজলিস বসিত, জমজমাট হইত রবিবার, বৈঠকখানা গমগম করিত, সেদিন সকলের ছুটি। সেই বৈঠকে কত ডাক্তার, কত অধ্যাপক, কত বৈজ্ঞানিক, কত সাহিত্যিক, কত শিল্পী, কত ঐতিহাসিক উপস্থিত থাকিতেন তার ইয়ত্তা নাই। তার নামকরণ করা হইয়াছিল 'উৎকেন্দ্র সমিতি'। প্রথমে একটা ইংরেজী নামই ছিল, বাংলা নামটি দেন রাজশেখরবাবু। সেই মজলিসে চা, দাবা ও তাসের সঙ্গে চলিত মনস্তত্ত্ব, বিজ্ঞান, শিল্প, কাব্য, পুরাণ, ইতিহাস এবং সাহিত্যের আলোচনা। প্রতি রবিবার বন্ধুবর ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমি একসঙ্গে দুপুরবেলা সেই মজলিসে উপস্থিত হইতাম। আড্ডাধারী ছিলেন প্রসিদ্ধ চিত্র-শিল্পী চিরকুমার যতীন্দ্রকুমার সেন। তিনি প্রতিদিন দুপুরে উপস্থিত হইয়া সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরিতেন। তাঁহার হাতে তৈয়ারী চা আড্ডার একান্ত উপভোগ্য বস্তু ছিল। এ ভার আর্টিস্ট স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং এ দায়িত্ব কাহারও উপর ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার তৃপ্তি ছিল না।

এই বৈঠকে জলধরদা নিত্য আসিতেন। শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার সত্য রায়, অধ্যাপক মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু, ডক্টর সুহৃৎচন্দ্র মিত্র, অধ্যাপক হরিপদ মাইতি, ডক্টর দ্বিজেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি নিয়মিতভাবে উপস্থিত থাকিতেন। আচার্য যদু-নাথ সরকার, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর বিরজাশঙ্কর গুহ, শিল্পী পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, শিল্পী পুলিন-চন্দ্র কুণ্ডু কখনও কখনও আসিতেন। পাটনার অধ্যাপক রঙীন হালদার ছুটি পাইলেই পার্শীবাগানে সমুপস্থিত হইতেন। ক্যাপ্টেন সত্য রায়ের পিতা আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় কলিকাতায় আসিলেই এখানে আসিতেন। আরও অনেকে থাকিতেন যাঁহাদের সহিত সাহিত্য বা অধ্যাপনার কোন সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু তাঁহারা গল্প এবং কথাবার্তায় আসর সরগরম করিয়া রাখিতেন। জলধরদা অধিকাংশ সময় নীরব থাকিতেন, তিনি কানে কম শুনিতেন। শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির কানে না যায় এমন সব কথার আলাপ যখনই জমিয়া উঠিত তখনই দাদা বলিয়া উঠিতেন, 'অ্যাঁ, কি বলছ ভাই?' মজাদার কথা কদাচিৎ তাঁহার কান এড়াইয়া যাইত।

একদল তাস লইয়া বসিত। ক্যাপ্টেন সত্য রায় ও আমি মাঝে মাঝে দাবা লইয়া বসিতাম। গিরীন্দ্রবাবু কখনও কখনও তাহাতে যোগ দিতেন। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ কখনও খেলার আমল দিতেন না। এই দাবা খেলার মধ্যে দিয়াই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম ঘনিষ্ঠতা জন্মে, কিন্তু সে এখানে নয়, রবিবাসরের এক বার্ষিক উদ্যান সম্মেলনে, 'তুলসীমঞ্চে'।

---

* উৎকেন্দ্র সমিতি—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা। কথা সাহিত্য : রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা : শ্রাবণ ১৩৬০

বড়-দা শ্রীশশিশেখর বসু বড় মজার গল্প করিতে পারিতেন। তিনি ইংরেজী লিখিয়ে, ইংরেজী কাগজে তাঁহার রসরচনা বাহির হইত। এই বৃদ্ধ বয়সে তিনি বাংলা লিখিতে শুরু করিয়াছেন। রবিবাসরীয় 'যুগান্তরে' এখন প্রায়ই তাঁহার সাক্ষাৎ মেলে। সেজা-দা শ্রীকৃষ্ণশেখর বসু উলা বীরনগরের উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। পল্লী-উন্নয়নের কথা হইলে তিনি মশগুল হইয়া পড়িতেন। শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় চমৎকার মজলিসী গল্প করিতে পারিতেন।' (উৎকেন্দ্র সমিতি—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা। কথাসাহিত্য ঃ রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা ঃ শ্রাবণ, ১৩৬০)।

আর একটি ছোট উদ্ধৃতি দিয়ে এই প্রসংগটা শেষ করবো ইচ্ছে আছে। যতদূর জানি রাজশেখরবাবু খুব পত্রালাপী লোক ছিলেন না। তাঁর যে সব পত্র পাওয়া যায় সেগুলি সংক্ষিপ্ত অথচ তাঁকে বোঝবার পক্ষে অত্যাবশ্যক। এই রকম একখানি পত্র উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

*"হাস্যরসিক শ্রীরাজশেখর বসুকে দেখিয়াছি, আবার শোকপ্রাপ্ত শ্রীরাজশেখর বসুকেও দেখিয়াছি।

পত্নীবিয়োগ সমবেদনা জানাইয়া শ্রীনিকেতন হইতে তাঁহাকে যে পত্র লিখি তদুত্তরে এই পত্রখানি পাই।

৭২, বকুলবাগান রোড, কলিকাতা
২।১২।৪২

সুহৃদ্‌বরেষু,

চারুবাবু, আপনার প্রেরিত লেখা ভাল লাগল। মন বলছে, নিদারুণ দুঃখ, চারিদিকে অসংখ্য চিহ্ন ছড়ানো, তার মধ্যে বাস করে স্থির থাকা যায় না। বুদ্ধি বলছে, শুধু কয়েক বছর আগে পিছে। যদি এর উলটোটা ঘটত তবে তাঁর মানসিক শারীরিক সাংসারিক সামাজিক দুঃখ ঢের বেশী হত। পুরুষের বাহ্য পরিবর্তন হয় না, খাওয়া পরা পূর্ববৎ চলে, কিন্তু মেয়েদের বেলায় মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা পড়ে।

নিরন্তর শোকাতুর আর একজনকে দেখলে নিজের শোক দ্বিগুণ হয়। গতবারে আমার সেই অবস্থা হয়েছিল। এবারে শোক উস্‌কে দেবার লোক নেই, আমার স্বভাবও কতকটা অসাড়, সেজন্য মনে হয় এই অন্তিম বয়সেও সামলাতে পারব।

আশা করি আপনার সংগে আবার শীঘ্র দেখা হবে এবং তার আগে খবর পাব।

ভবদীয়
রাজশেখর বসু

তিনি লিখিতেছেন,—আমার স্বভাবও কতকটা অসাড়। কিন্তু তা ঠিক নয়।
গীতায় আছে,—

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥

যাঁহার চিত্ত দুঃখপ্রাপ্ত হইয়াও উদ্বিগ্ন হয় না ও বিষয়সুখে নিস্পৃহ এবং যাঁহার রাগ ভয় ও ক্রোধ নিবৃত্ত হইয়াছে, সেই মননশীল পুরুষ স্থিতপ্রজ্ঞ।

---

* স্থিতপ্রজ্ঞ—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। কথা সাহিত্য ঃ রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যাঃ শ্রাবণ ১৩৬০

অনেক দিন অনেকবার অতি নিকট হইতে তাঁহাকে দেখিয়াছি। তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ। স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষ রাজশেখরকে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করি।"

পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়লে রাজশেখর বসু সম্বন্ধে কয়েকটি মূল তথ্য জানতে পাওয়া যাবে, যেগুলির পদে পদে প্রয়োজন হবে তাঁর সাহিত্য ও চরিত্র বিচারের সময়ে। (১) তাঁর বৈজ্ঞানিক কৌতূহল ও বিজ্ঞান শিক্ষা, এই বিজ্ঞান শিক্ষার মধ্যে আইন পাশ করাকেও ধরতে হবে, (২) বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে কৃতী প্রধান ব্যক্তি রূপে দীর্ঘকাল অবস্থিতি, (৩) সংসার সম্বন্ধে আগ্রহশীল হওয়া সত্ত্বেও নির্লিপ্ত উদাসীন ভাব। পার্শীবাগানে আড্ডায় কখনও যোগ দেওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি, তদ্‌সত্ত্বেও অনায়াসে অনুমান করতে পারি যে, তিনি সেই আড্ডার মধ্যমণি হওয়া সত্ত্বেও সবচেয়ে বাগ্‌যত ছিলেন, মাঝে মাঝে একটি দুটি হাসির বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আবার নিস্তব্ধ হয়ে যেতেন। তিনি হাসাতেন, তবে হাসতেন কদাচিৎ। 'অন্যে কথা কবে তুমি রবে নিরুত্তর'। (৪) চারুবাবুকে লিখিত পত্রখণ্ডে যে স্থিতপ্রজ্ঞ প্রশান্ত ভাব প্রকাশিত, তাতে মিলিত একাধারে গীতার ও বিজ্ঞানের শিক্ষা। গীতোক্ত আদর্শ পুরুষ বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিক। তিনি দুই-ই ছিলেন। এখন এই বিশ্লেষণ-লব্ধ সিদ্ধান্তগুলি সম্বল করে তাঁর সাহিত্য বিচারে অগ্রসর হবো আর আশা করি দেখতে পাবো যে, বিচারের মূল উপাদান আয়ত্তের মধ্যে এসে পড়েছে।

॥ ৩ ॥

রাজশেখর বসুর গ্রন্থাবলী তাঁর দুটি নামে পরিচিত, রাজশেখর বসু ও পরশুরাম। এই দুই নামের স্বাতন্ত্র্য তিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বজায় রেখেছেন. এমন আর কোন লেখক রাখতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। দুটি এমন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। একই ব্যক্তির দুটি ভিন্ন ব্যক্তিত্ব আলাদা কোঠায় রাখা যে খুব কঠিন এ কথা সহজেই বুঝতে পারা যাবে। তাঁর পক্ষে এ কাজ কিভাবে সম্ভব হয়েছিল * *

রাজশেখর বসু নামে পরিচিত গ্রন্থাবলীতে মনীষার পরিচয়, অবশ্য শিল্পীর পরিকল্পনা গৌণভাবে আছে। আর পরশুরামের ছদ্মনামে পরিচিত জনবল্লভ গল্পের বইগুলির শিল্পীর রচনা, যদিচ গৌণভাবে মনীষার দেখা পাওয়া যাবে।

আমরা প্রথমে পরশুরাম রচিত গ্রন্থাবলীর বিশদ আলোচনা করবো, পরে রাজশেখর বসু রচিত গ্রন্থাবলীর আলোচনা সারলেই হবে।

রাজশেখরবাবু জনসমাজে হাসির গল্পের লেখক বলে পরিচিত, আরো স্বরূপে বলতে

* মেজদা—শ্রীসুরেশচন্দ্র মিত্র। কথা সাহিত্য : রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা : শ্রাবণ ১৩৬০

* এখানে কিঞ্চিৎ তথ্য-ভ্রান্তি ঘটেছে। 'মধ্যমণি' দূরে থাক এই আড্ডায় রাজশেখর বসতেনই কদাচিৎ। তবে আড্ডা চালানোর খরচে ঘাটতি পড়লেই একমাত্র গতি তিনি। এ জন্যেই এই আড্ডায় তাঁর নামই প্রচলিত হয়ে গেছল—গৌরী সেন!

গেলে ব্যঙ্গরসিক বলা যেতে পারে। মোটের উপরে একথা স্বীকার্য যে, তাঁর গল্পের প্রধান উপাদান হাসি। কাজেই হাসির প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা করে নেওয়া আবশ্যক।

সূর্যালোককে বিশ্লিষ্ট করে ফেললে সাতটি রং পাওয়া যায়, যার এক প্রান্তে লাল, অন্য প্রান্তে বেগনী, মাঝখানে অন্য রং। শুভ্র হাসিকেও যদি বিশ্লেষণ করা যায় অনেক জাতের হাসি পাওয়া যাবে, যার এক প্রান্তে প্রচ্ছন্ন তিরস্কার, অন্য প্রান্তে প্রচ্ছন্ন অশ্রু; ওরই মধ্যে এক জায়গায় নিছক কৌতুকহাস্যও আছে। আমরা যখন কোন লেখককে হাসির গল্পের লেখক বলি, তখন বিচার করা আবশ্যক এই হাসির বর্ণালীর মধ্যেই কোনটি তাঁর রচনার প্রধান উপাদান। এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে একাধিক উপাদানই তাঁর রচনায় থাকতে পারে। বিশুদ্ধভাবে একটি মাত্র উপাদানকে অবলম্বন করে রচিত এমন গল্প খুব বিরল। বিশেষতঃ আধুনিক মন মিশ্ররীতির পক্ষপাতী, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় একাধিক উপাদান মিলিত হয়ে যায় তাঁর রচনায়। শেক্সপীয়ারের 'ফলস্টাফ' এই রকম একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তার গঠনে কৌতুকহাসি থেকে আরম্ভ করে প্রায় সবগুলির উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত ফলস্টাফের বিদায়ে (Rejection of Falstaff) প্রচ্ছন্ন অশ্রু প্রায় অপ্রচ্ছন্নভাবে ধরা দিয়েছে। বাংলা সাহিত্যেও এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। দীনবন্ধুর নিমে দত্তর চরিত্রে শেষে দিকে গিয়ে প্রচ্ছন্ন অশ্রু উদ্গত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের বৈকুণ্ঠ চরিত্রেও হাসির অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন অশ্রুর রেশ আছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত চরিত্র এ বিষয়ে বোধ করি প্রকৃষ্টতম উদাহরণ। হাসির স্ফটিকশিলায় কমলাকান্ত চরিত্র গঠিত, তা থেকে শতমুখে হাসি বিচ্ছুরিত হতে থাকে, কিন্তু যেমনি একটু ব্যথার তাপ লাগে, অমনি স্ফটিক অশ্রুতে বিগলিত হয়ে পড়ে। পূর্বোক্ত লেখকগণের কেউ অমিশ্র হাসির কারবার করেন নি। বাংলা সাহিত্যে অমিশ্র হাসির একমাত্র কারবারী বোধ করি অমৃতলাল বসু। তাঁর হাসি প্রায় সময়েই প্রচ্ছন্ন তিরস্কার। এখন বিচার্য পরশুরামের স্থান হাসির বর্ণালীর মধ্যে কোন দিকে, প্রচ্ছন্ন তিরস্কারের দিকে না প্রচ্ছন্ন অশ্রুর দিকে। এই কথাটি বোঝাবার উদ্দেশ্যে আর একজন প্রধান হাসির গল্পের লেখকের নাম করা দরকার, তিনি ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। দুজনেই হাসির গল্পের লেখক বলে পরিচিত, কিন্তু হাসির বর্ণালীর মধ্যে তাঁদের স্থান একত্র নয়। ত্রৈলোক্যনাথ আছেন প্রচ্ছন্ন অশ্রুর দিক ঘেঁষে আর পরশুরাম আছেন প্রচ্ছন্ন তিরস্কারের দিকে ঘেঁষে। ত্রৈলোক্যনাথের হাসি প্রধানতঃ প্রচ্ছন্ন অশ্রু ঘেঁষা হলেও তাতে অন্য উপাদান আছে, পরশুরামে মিশ্রণ নেই এমন বলি না, তবে অপেক্ষাকৃত কম। মোটের উপর দাঁড়ালো এই যে, এঁদের একজন আছেন বর্ণালীর লালের দিকে, আর একজন বেগনীর দিকে। একজনের আবেদন পাঠকের হৃদয়ে, আর একজনের আবেদন পাঠকের বুদ্ধিতে।

ম্যাথু আর্নল্ড-এর একটি সুভাষিত আছে "Literature is Criticism of life"— এই উক্তিটি নিয়ে গত একশ বছর তর্ক-বিতর্কের আর অন্ত নাই। কাজেই সে তর্কের মধ্যে প্রবেশ করা বাহুল্য। নিছক কৌতুকহাস্য বাদ দিলে দেখা যাবে যে, হাসি যে জাতেরই হোক না কেন তা Social Criticism ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে এই Criticism বা সমালোচনার প্রকার ভেদ আছে। কোন লেখক সমালোচক হিসাবে তিরস্কার করেন কেউ অশ্রুপাত করেন, দুজনের পন্থা ভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য এক।

সমাজ সংস্কার হাসির (নিছক কৌতুকহাস্য ছাড়াও) উদ্দেশ্য বলেই হাস্যরসিককে একটা মাপকাঠি ব্যবহার করতে হয়। সে মাপকাঠি Ethical হতে পারে, Intellectual হতে পারে, Social হতে পারে বা অন্য কোন রকমের হতে পারে। একটি Norm বা আদর্শ লেখকের মনের মধ্যে থাকে, সমাজের যেখানে সেই আদর্শের চ্যুতি ঘটছে সেখানে তিনি মাপকাঠিখানি বের করে এগিয়ে আসেন। এখানে বিশুদ্ধ কমেডির সঙ্গে Satire বা ব্যঙ্গের তফাৎ।

বিশুদ্ধ আনন্দ দান ছাড়া কমেডির আর কোন উদ্দেশ্য নেই, অন্য সর্বপ্রকার হাসি উদ্দেশ্য-মূলক। কমেডি লেখক আনন্দ দান করেন, ব্যঙ্গরসিক বিচার করেন; কমেডি লেখক উৎসব-রাজ, ব্যঙ্গরসিক বিচারক। বিচারে ভুলভ্রান্তি হতে পারে, এক আদালতের রায় অন্য আদালতে উল্টে যেতে পারে, এক যুগের নজির অন্য যুগ না মানতে পারে এমন উদাহরণ সাহিত্যের ইতিহাসে প্রচুর। বিশুদ্ধ আনন্দের মার নেই, বিশুদ্ধ বিচার বলে কিছু আছে কিনা সন্দেহ, একথা স্বীকার না করে পারা যায় না যে ব্যঙ্গলেখকের স্থান অত্যুচ্চ সাহিত্যে সর্বোচ্চশ্রেণীতে কখনো নির্দিষ্ট হয় না। সকলেই তার গুরুত্ব স্বীকার করে, তবু বিশুদ্ধ আনন্দদাতার সঙ্গে সমান আসন দিতে রাজী হয় না। বিচারকের স্থান আদালতে, আনন্দ-দাতার স্থান অন্তঃপুরে।

নাটকে এই সমালোচনার কাজটি বিদূষক করে থাকে, নীচু আসনে বসেও রাজার দোষ দেখাতে সে কুণ্ঠিত হয় না, কিন্তু নাটকের চূড়ান্ত পর্বে বিদূষককে কদাচিত দেখতে পাওয়া যায় তার কারণ আর কিছুই নয়, বিদূষণার সীমা অন্তঃপুরে ও অন্ত্যঅঙ্কের বাইরে। এই সীমা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যঙ্গরসিক স্বকর্তব্য সাধনে যে নিরস্ত হয় না, তার কারণ বিশেষ আদর্শের প্রেরণা তাকে চালিত করে। মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। যে প্রলাপ-বাদিনী কবিতা তার কানে কানে আনন্দ মন্ত্র উচ্চারণ করে, যে আনন্দ মন্ত্রে বৈষয়িক সার্থকতা কিছুমাত্র কম নেই, সেই কবিতাকে মানুষ সর্বোচ্চ আসন দিয়ে নীচে বসিয়ে রাখে ব্যঙ্গ-রসিককে, সার দৃষ্টি সদাজাগ্রত না থাকলে সমাজস্থিতি অসম্ভব হয়ে পড়ে। ওরই মধ্যে যে ব্যঙ্গরসিক প্রচ্ছন্ন অশ্রুকে উপাদান রূপে গ্রহণ করে তার প্রতি মানুষের মন কিছু সদয় বটে, কিন্তু প্রচ্ছন্ন তিরস্কারককে সে মনে ভয় করলেও হৃদয়ের মধ্যে স্থান দেয় না। পরশুরাম ও ত্রৈলোক্যনাথ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা প্রসঙ্গ ব্যাপারটি আরেকবার বোঝাতে চেষ্টা করবো। এখন এইটুকুই যথেষ্ট যে পরশুরামের হাসি প্রধানতঃ তিরস্কার ঘেঁষা, যার আবেদন মানুষের বুদ্ধিতে। কিন্তু তিনি শুধুই হাসির গল্প লিখেছেন এ কথা সত্য নয়। তাঁর রচনার মধ্যে এমন অনেক গল্প আছে যা ঠিক হাসির গল্প নয়। অন্য নামের অভাবে তাদের সামাজিক গল্প বলতে হয়। যথা—কৃষ্ণকলি, চিঠিবাজি, দীনেশের ভাগ্য, যশোমতি, ভূষণ পাল, ভবতোষ ঠাকুর ইত্যাদি।

এ সব গল্পে হাসি যে নেই তা নয়, তবে হাসিটা তার প্রধান উপাদান নয়। একবার হাস্যরসিক বলে নাম রটে গেলে তার নিতান্ত সাধারণ কথাতেও হেসে ওঠা পাঠক কর্তব্য মনে করে। শুনেছি প্রসিদ্ধ কমিক অভিনেতা চিত্তরঞ্জন গোস্বামী একটি সভায় ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে উঠে প্রথম বাক্যটাও শেষ করতে পারেন নি, ঘনঘন হাসি ও করতালিতে শ্রোতারা নিজেদের রসবোধের পরিচয় দিয়েছিল।

পরশুরামের এমন কতকগুলি গল্প আছে যা গভীর মনীষা-প্রসূত। মনুষ্য জাতির ভবিষ্যৎ, সমাজের অবস্থা, মৃত্যুর রহস্য, পৃথিবীব্যাপী লোভ-অশান্তির পরিণাম প্রভৃতি সম্বন্ধে দুঃসাহসিক চিন্তার পরিচয় বহন করে এই সব গল্প। পরোক্ষভাবেও হাসির সঙ্গে সংস্রব নাই। কিন্তু যেহেতু পরশুরামের রচনা-কাজেই পাঠকের পক্ষে হাসা একপ্রকার জাতীয় কর্তব্য। যথা—গামানুষ জাতির কথা, অটলবাবুর অন্তিম চিন্তা, ভীম গীতা, মাঙ্গলিক, কাশীনাথের জন্মান্তর, সত্যসন্ধ বিনায়ক, নির্মোক নৃত্য, কর্দম মেখলা প্রভৃতি।

এই সব গল্পগুলির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের কারণ আর কিছুই নয়, পরশুরাম প্রধানতঃ ব্যঙ্গ গল্পের লেখক হলেও কেবলই ব্যঙ্গ গল্প তিনি লেখেন নি, এমন অনেক গল্প লিখেছেন যা মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। তিনি যদি অন্য ব্যঙ্গরচনা নাও লিখতেন তবে হয়তো এত জনপ্রিয় হতেন না সত্য,

কিন্তু একথাও তেমনি সত্য যে এই গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের আসরে তাঁকে স্থায়ী আসন দান করতো। ব্যঙ্গরচনার দ্বারা পাঠকের মনে নিজের যে Image তিনি তৈরী করে তুলেছেন সেই Image-এর আড়ালেই তাঁর অনেক কীর্তি ঢাকা পড়ে গিয়েছে।

॥ ৪ ॥

শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড গল্পটি প্রকাশিত হওয়া মাত্র (১৯২২) বাঙালী পাঠকের কান ও চোখ সজাগ হয়ে উঠল, এ আবার কে এলো? Curtain Raiser হিসাবে গল্পটি অতুলনীয়। এক গল্পেই আসর মাত। তারপরে পাঠকের ঔৎসুক্য আর ঘুমিয়ে পড়বার অবকাশ পায়নি। চিকিৎসা-সংকট, মহাবিদ্যা, লম্বকর্ণ ও ভুশণ্ডীর মাঠে একত্র গ্রন্থাকারে গড্ডলিকা। পরে প্রকাশিত হ'ল কজ্জলী গ্রন্থ, অর্থাৎ বিরিঞ্চিবাবা, জাবালি, দক্ষিণরায় স্বয়ম্বরা, কচি-সংসদ ও উলট-পুরাণের সমষ্টি। বাংলা সাহিত্যের আকাশে প্রথম যা একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্ররূপে দেখা দিয়েছিল, কালক্রমে তা উজ্জ্বল বৃহৎ নির্নিমেষ গ্রহের রূপ ধারণ ক'রে সৌর পরিবারের পরিধি বাড়িয়ে দিল। পরে আরও সাতখানি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তবে একথা বললে বোধ করি অন্যায় হবে না যে অদ্যাবধি প্রথম বই দু-খানাই সবচেয়ে জনপ্রিয়! এই জনপ্রিয়তার কারণ কি?

বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে সাহিত্যিকরূপে রাজশেখর বসুর আত্মপ্রকাশ, যে বয়সে নাকি অধিকাংশ লেখকের আদিপর্ব শেষ হ'য়ে গিয়ে মধ্যপর্বে প্রবেশ ঘটে। বিয়াল্লিশের আগে পর্যন্ত তাঁর কোন সাহিত্যিক পরিচয় পাঠকের সম্মুখে ছিল না, হঠাৎ তিনি পাকা লেখা নিয়ে আবির্ভূত হলেন। পাঠক একেবারে চমকে গেল, কিন্তু সে চমক পীড়াদায়ক নয়, সুখদায়ক। তিনি ধীরে-সুস্থে পাঠককে তৈরী করে নিয়ে পরিণত রচনায় উপনীত হননি, পাঠককে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করিয়ে রাখেন নি। পাঠকের সেই কৃতজ্ঞতা তাঁর জনপ্রিয়তাকে বর্ধিত করেছে।

কোন কোন লেখক, তার মধ্যে অতিশয় শক্তিমান লেখক আছেন, ধীরে ধীরে পাঠকের সম্মুখে আবির্ভূত হতে থাকেন। এই ধীরতায় পাঠকের চক্ষু অভ্যস্ত হয়ে আসে। রবীন্দ্রনাথ অতি অপরিণত রচনা নিয়ে প্রথম দেখা দিয়েছিলেন, তার পরে শতাব্দীর না হোক দশকের প্রহরে প্রহরে পরিণতির মধ্য গগনে উত্তীর্ণ হন। অপরপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী দিয়ে এবং মধুসূদন মেঘনাদ বধ কাব্য দিয়ে পাঠক সমাজকে চমকে দিয়েছিলেন। এই তিন মহারথীর সঙ্গে তুলনা না করেও বলা যায় যে, রাজশেখর বসু অতর্কিতে চমকে দিয়ে পাঠকের মনকে অধিকার করে নিলেন। মনে রাখতে হবে যে শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড প্রকাশের সময়ে তাঁর বয়স দুর্গেশনন্দিনী ও মেঘনাদ বধ কাব্য প্রকাশকালে লেখকদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল।

এখন চমক যতই বিস্ময়কর হোক ক্রমে তার দ্যুতি ম্লান হ'য়ে আসে। পরশুরামের ক্ষেত্রে তা হয়নি, তার কারণ পাঠকের চমককে নিত্য নূতন উদাহরণ যোগাতে সক্ষম হয়েছিলেন, গড্ডলিকা ও কজ্জলীর এগারটি গল্পে। অবশ্য একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, পরবর্তী সাতখানি গ্রন্থে চমকের দ্যুতি অনেকটা ম্লান হয়ে এসেছে। একটি কারণ, পাঠকের চোখ অভ্যস্ত হয়ে এসেছে। অন্য কারণ আছে তার আলোচনা যথাস্থানে। এবার পূর্বসূত্র টেনে জনপ্রিয়তার দ্বিতীয় কারণ আলোচনা করা যেতে পারে।

অনেকের ধারণা যে গল্পে বর্ণিত নরনারীর নূতনত্বে পাঠক বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। প্রকৃত ব্যাপার ঠিক উল্টে। এসব নরনারী অত্যন্ত পুরাতন বলেই তারা আকর্ষণ করেছে

কিন্তু একথাও তেমনি সত্য যে এই গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের আসরে তাঁকে স্থায়ী আসন দান করতো। ব্যঙ্গরচনার দ্বারা পাঠকের মনে নিজের যে Image তিনি তৈরী করে তুলেছেন সেই Image-এর আড়ালেই তাঁর অনেক কীর্তি ঢাকা পড়ে গিয়েছে।

॥ ৪ ॥

শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড গল্পটি প্রকাশিত হওয়া মাত্র (১৯২২) বাঙালী পাঠকের কান ও চোখ সজাগ হয়ে উঠল, এ আবার কে এলো? Curtain Raiser হিসাবে গল্পটি অতুলনীয়। এক গল্পেই আসর মাত। তারপরে পাঠকের ঔৎসুক্য আর ঘুমিয়ে পড়বার অবকাশ পায়নি। চিকিৎসা-সংকট, মহাবিদ্যা, লম্বকর্ণ ও ভুশণ্ডীর মাঠে একত্র গ্রন্থাকারে গড্ডলিকা। পরে প্রকাশিত হ'ল কজ্জলী গ্রন্থ, অর্থাৎ বিরিঞ্চিবাবা, জাবালি, দক্ষিণরায় স্বয়ম্বরা, কচি-সংসদ ও উলট-পুরাণের সমষ্টি। বাংলা সাহিত্যের আকাশে প্রথম যা একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্ররূপে দেখা দিয়েছিল, কালক্রমে তা উজ্জ্বল বৃহৎ নির্নিমেষ গ্রহের রূপ ধারণ ক'রে সৌর পরিবারের পরিধি বাড়িয়ে দিল। পরে আরও সাতখানি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তবে একথা বললে বোধ করি অন্যায় হবে না যে অদ্যাবধি প্রথম বই দু-খানাই সবচেয়ে জনপ্রিয়! এই জনপ্রিয়তার কারণ কি?

বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে সাহিত্যিকরূপে রাজশেখর বসুর আত্মপ্রকাশ, যে বয়সে নাকি অধিকাংশ লেখকের আদিপর্ব শেষ হ'য়ে গিয়ে মধ্যপর্বে প্রবেশ ঘটে। বিয়াল্লিশের আগে পর্যন্ত তাঁর কোন সাহিত্যিক পরিচয় পাঠকের সম্মুখে ছিল না, হঠাৎ তিনি পাকা লেখা নিয়ে আবির্ভূত হলেন। পাঠক একেবারে চমকে গেল, কিন্তু সে চমক পীড়াদায়ক নয়, সুখদায়ক। তিনি ধীরে-সুস্থে পাঠককে তৈরী করে নিয়ে পরিণত রচনায় উপনীত হননি, পাঠককে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করিয়ে রাখেন নি। পাঠকের সেই কৃতজ্ঞতা তাঁর জনপ্রিয়তাকে বর্ধিত করেছে।

কোন কোন লেখক, তার মধ্যে অতিশয় শক্তিমান লেখক আছেন, ধীরে ধীরে পাঠকের সম্মুখে আবির্ভূত হতে থাকেন। এই ধীরতায় পাঠকের চক্ষু অভ্যস্ত হয়ে আসে। রবীন্দ্রনাথ অতি অপরিণত রচনা নিয়ে প্রথম দেখা দিয়েছিলেন, তার পরে শতাব্দীর না হোক দশকের প্রহরে প্রহরে পরিণতির মধ্য গগনে উত্তীর্ণ হন। অপরপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী দিয়ে এবং মধুসূদন মেঘনাদ বধ কাব্য দিয়ে পাঠক সমাজকে চমকে দিয়েছিলেন। এই তিন মহারথীর সংগে তুলনা না করেও বলা যায় যে, রাজশেখর বসু অতর্কিতে চমকে দিয়ে পাঠকের মনকে অধিকার করে নিলেন। মনে রাখতে হবে যে শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড প্রকাশের সময়ে তাঁর বয়স দুর্গেশনন্দিনী ও মেঘনাদ বধ কাব্য প্রকাশকালে লেখকদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল।

এখন চমক যতই বিস্ময়কর হোক ক্রমে তার দ্যুতি ম্লান হ'য়ে আসে। পরশুরামের ক্ষেত্রে তা হয়নি, তার কারণ পাঠকের চমককে নিত্য নূতন উদাহরণ যোগাতে সক্ষম হয়েছিলেন, গড্ডলিকা ও কজ্জলীর এগারটি গল্পে। অবশ্য একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, পরবর্তী সাতখানি গ্রন্থে চমকের দ্যুতি অনেকটা ম্লান হয়ে এসেছে। একটি কারণ, পাঠকের চোখ অভ্যস্ত হয়ে এসেছে। অন্য কারণ আছে তার আলোচনা যথাস্থানে। এবার পূর্বসূত্র টেনে জনপ্রিয়তার দ্বিতীয় কারণ আলোচনা করা যেতে পারে।

অনেকের ধারণা যে গল্পে বর্ণিত নরনারীর নূতনত্বে পাঠক বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। প্রকৃত ব্যাপার ঠিক উল্টে। এসব নরনারী অত্যন্ত পুরাতন বলেই তারা আকর্ষণ করেছে

পাঠকের চিত্ত। পুরাতন তবে অতিপরিচয়ের ধুলো জমে জমে সে-সব আচ্ছন্ন হয়ে নাস্তিবৎ বিরাজ করছিল। পরশুরামের হাসির দমকা হাওয়ায় সে ধুলো সরে যেতেই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল। বিস্মিত পাঠক বলে উঠল বাঃ বাঃ, এসব তো সামনেই ছিল অথচ দেখতে পাইনি! ভোরবেলা দরজা খুলতেই বৃহৎ একটা গাছ দেখতে পেলে পাঠক অবশ্যই চমকিত হয়, কিন্তু পরমুহূর্তেই বিস্ময়কে চাপা দেয় বিরক্তি, তখন সে কুড়ুলের সন্ধান করে। না, পরশুরামের প্রথম রচনা দরজার সমুখের বনস্পতি নয়, দিগন্তের গিরিমালা। শীতের কুয়াশায়, গ্রীষ্মের ধুলোয় আর বর্ষার মেঘে আচ্ছন্ন ছিল, আজ হঠাৎ শরৎকালের বৃষ্টি-ধৌত নির্মল আকাশে তার উজ্জ্বল প্রকাশ দেখে মনটি প্রসন্ন হয়ে উঠল, বাঃ ঠিক জায়গায় ঠিক জিনিসটি আছে দেখছি। পূর্বসংস্কারহীন নূতন প্রথমটা চমকে দিলেও তার পরিণাম বিরক্তিতে, আর যে নূতন পূর্বসংস্কারের সূত্র ধরে অতি পরিচয়ের পর্দা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে প্রকাশ পায়, সে কখনো পুরাতন হয় না; কারণ পুরাতনত্বেই তার যথার্থ পরিচয়। সূর্যোদয়ে প্রত্যাশিত বিস্ময়, জাদুকরের আমগাছে অপ্রত্যাশিত বিস্ময় প্রথম বারের পরে দ্বিতীয় বারে বিরক্তিকর।

এরা যে সবাই পুরাতন, অত্যন্ত পরিচিত, অত্যন্ত প্রত্যাশিত। শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়া, নন্দবাবু, তারিণী কবিরাজ, কেদার চাটুজ্যে, লাটুবাবু, নাদু মল্লিক —এরা কি আজকের! এদের কেউ কেউ মুরারি শীলের সংগে ভাগে ব্যবসা করেছে, তাঁড়ুদত্তর সংগে বাজারে তোলা আদায় নিয়ে ভাগাভাগি করেছে, আবার ঠক চাচার সংগে গলা মিলিয়ে বলেছে, দুনিয়া বুরা মুই সাচা হয়ে কি করবো? ডমরুধারা আসরে কেদার চাটুজ্যে গল্পের শিকল বোনেনি এবং শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী যে নদেরচাঁদের ব্যবসার পার্টনার ছিল না এমন কথা কে হলপ করে বলবে। এরা সবাই অতিপরিচয়ের আড়ালে প্রচ্ছন্ন ছিল বলেই ঠাহর করতে পারা যায়নি!

॥ ৫ ॥

আমেরিকার ভূভাগ গোড়া থেকেই ছিল, কলম্বাস তাকে আবিষ্কার করলো। পূর্বোক্ত মহাপুরুষগণ গোড়া থেকেই ছিল, পরশুরাম সন্ধানীরূপে তাদের আবিষ্কর্তা। প্রতিভা দুই ভাবে কাজ করে, আবিষ্কার ও সৃষ্টি, নূতন জগতের উদ্ঘাটন ও নূতন জগতের নির্মাণ, কলম্বাস ও বিশ্বামিত্র। এ দুই গুণের কোন একটাকে একচেটিয়া মনে করলে ভুল হবে। অল্পবিস্তর সব প্রতিভাবান্ লেখকেই পাওয়া যাবে। আয়েষা সৃষ্টি, বিদ্যাদিগ্গজ আবিষ্কার; গোরা সৃষ্টি, পানুবাবু আবিষ্কার। তবে এ পর্যন্ত বলতে পারা যায় যে স্যাটায়রিস্টে, ব্যঙ্গ প্রতিভার সৃষ্টির তুলনায় আবিষ্কারের ভাগ বেশি। সুইফটের লিলিপুটকে যতই অভিনব মনে হোক, আসলে সে মানুষকে উল্টো দূরবীনের দৃষ্টিতে আবিষ্কার। পরশুরামের আবিষ্কারের ভাগটাই সুপ্রচুর, তবে সৃষ্টিকার্যও আছে। জাবালি চরিত্র মহৎ সৃষ্টি, কৃষ্ণকলি (কালিন্দী) ও চিরঞ্জীবও সৃষ্টিকার্য। তাহলে দাঁড়ালো এই যে, পাঠকের বিস্ময়ের দ্বিতীয় কারণ হিসাবে সে মোটেই বিস্মিত হয়নি, অন্ততঃ নূতন দেখে বিস্মিত হয়নি। প্রত্যাশিত পুরাতনকে স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়ে আনন্দিত হয়েছিল। তৃতীয় কারণ পরশুরামের ভাষা।

এমন পরিচ্ছন্ন, বাহুল্য বর্জিত, সুপ্রযুক্ত ভাষা বড় দেখা যায় না। পাঠক-সমাজ যখন সবুজপত্রী ভাষাকে প্রগতির চরম লক্ষণ বলে ধরে নিয়েছিল, ভেবেছিল সাধু ভাষার আয়ু শেষ হয়ে গিয়েছে, নূতন কোন সম্ভাবনা আর তার মধ্যে নেই, তখন গড্ডলিকা কজ্জলীর ভাষা দেখে সকলে চমকে গেল। রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর ভাষারীতিকে এড়িয়ে সাধুভাষার

এই পদক্ষেপ সত্যই বিস্ময়জনক। বস্তুতঃ পড়বার সময়ে খেয়াল থাকে না এ ভাষা সাধু কি কথ্য, পরে হিসাবে দেখা যায় সাধু ভাষা।

প্রমথ চৌধুরীর ভাষা পাঠককে প্রতি নিঃশ্বাসে তার ধর্ম স্মরণ করিয়ে দেয়, নিজের কৌশলকে লুকোবার কৌশলটা তার অনায়ত্ত। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের ভাষাতেও এই ত্রুটি। গড্ডলিকা ও কজ্জলীর ভাষারীতি সাধু, তবে জটাজুটধারী ভেকধারী সাধু নয়, এমন সাধু যে সাধুত্ব গোপন রাখতে সমর্থ। সবশুদ্ধ মিলে ভাষাটি ভারী তৃপ্তিদায়ক, ভাবের স্বাভাবিক বাহন।

এখানে একটি বিষয় স্মরণ করিয়ে দেওয়া আবশ্যক। হাস্যরস রচনার ভাষা সাধু হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাতে ভাষার গাম্ভীর্যে আর ভাবের লঘুতায় যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, তা হাসির পরিবেশ রচনায় সাহায্য করে। কথ্য ভাষার চটুলতা আর হাসির চটুলতায় মিলে যায়, মুহুর্মুহু পাঠকের মনকে দ্বন্দ্বের চকমকি স্ফুরণে আলোকিত ও চকিত করতে পারে না। বিষয়টির বিস্তার অনাবশ্যক, কতকগুলি উদাহরণ দিলেই চলবে। বঙ্কিমচন্দ্রের লোকরহস্য ও কমলাকান্ত, রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ-কৌতুক, ত্রৈলোক্যনাথ, ইন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার প্রভৃতির উল্লেখ যথেষ্ট। অনেকে আক্ষেপ করেন বাংলা সাহিত্যে আজকাল যথেষ্ট হাস্যরসের রচনা লিখিত হচ্ছে না। তার অনেক কারণের মধ্যে একটি প্রধান, হাসির রচনা আজ ভ্রষ্টবাহন। সিদ্ধিদাতা গণেশ চটুল মূষিক বাহনে চলাফেরা করতে পারেন, তবে তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করবে এমন কার সাধ্য। যে-শুঁড়ের বহর! গভীর গম্ভীর ভাব কথ্যভাষায় আত্মপ্রকাশ করতে সমর্থ হলেও, কথ্যভাষায় হাস্যরস! নৈব নৈব চ। এই একটি কারণ যেজন্য পরশুরামের শেষ ছয়খানি গল্পগ্রন্থ কিছু পরিমাণে ম্লান। সেগুলির বাহন কথ্যভাষা। সাধুভাষা ও পয়ার ছন্দের আয়ু বঙ্গভারতীর আয়ুর সঙ্গে মিলিয়ে গণনীয়। নূতন নূতন গুণীর হাতে অভাবিত রূপে যুগে যুগে তারা দেখা দেবে।

॥ ৬ ॥

হাসির গল্প লিখবার বিপদ এই যে, পাঠকে হেসেই সব কর্তব্য শোধ করে দেয়, আদৌ তলিয়ে দেখতে চায় না। হাসির গল্পে আর এমন কি থাকবে, ভাবটা এইরকম। কেমন করে জানবে যে হাসির গল্পে না থাকতে পারে এমন বস্তু নাই। ভাষার জাদুর কথাই ধরা যাক। হাস্যরস একান্ত ভাবে সামাজিক ব্যাপার। হাসিতে সামাজিক মনের প্রকাশ, অশ্রুতে প্রকাশ ব্যক্তিমনের। স্বভাবতই হাস্যাত্মক রচনায় নিসর্গ বর্ণনার স্থান সংকীর্ণ। যখন তা অপরিহার্য হয়ে ওঠে, নূতন খাত খনন করে নিতে হয়। গঙ্গা প্রবাহিত স্বাভাবিক খাতে, গঙ্গার খাল কৃত্রিম খাতে যা নাকি সামাজিক চেষ্টার ও সামাজিক প্রয়োজনের ফল।

লম্বকর্ণ গল্পে কালবৈশাখীর এবং ভূশণ্ডীর মাঠে অপরাহ্নের বর্ণনা দুটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কালবৈশাখীর ও অপরাহ্নের স্বভাব বর্ণনার সঙ্গে সুনিপুণ ভাবে মিশে গিয়েছে ব্যঙ্গরসিকের স্বভাব। আবার কচি-সংসদ গল্পে দুটি বর্ণনা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। একটি শরৎ আবির্ভাবের, আর একটি রেলগাড়িতে যাত্রার সুখের।

শরতের প্রথম পদক্ষেপের নিখুঁৎ স্বাভাবিক বর্ণনা, তারপরেই সামাজিক মন সক্রিয় হয়ে উঠেছে। "টাকায় এক গণ্ডা রোগারোগা ফুলকপির বাচ্চা বিকাইতেছে। পটোল চড়িতেছে, আলু নামিতেছে।" আবার রেলগাড়িতে যাত্রার বর্ণনার মধ্যেও কেমন অনায়াসে নিসর্গের স্বভাব ও সামাজিক স্বভাব গঙ্গাযমুনায় মিশে গিয়েছে। "কয়লার ধোঁয়ার গন্ধ, চুরুটের গন্ধ, হঠাৎ জানলা দিয়ে এক ঝলক উগ্রমধুর ছাতিম ফুলের গন্ধ। তারপর সন্ধ্যা—পশ্চিম আকাশে ওই বড় তারাটা গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিয়াছে। ওদিকের বেঞ্চে স্থূলোদর লালাজী এর মধ্যেই নাক ডাকাইতেছেন। মাথার উপরে ফিরিঙ্গীটা বোতল হইতে কি খাইতেছে।

ত্রাদিকের বেঞ্চে দুই কম্বল পাতা, তার উপর আরও দুই কম্বল, তার মধ্যে আমি, আমার মধ্যে ভর-পেট ভাল-ভাল খাদ্যসামগ্রী, তাছাড়া বেতের বাক্সে আরও অনেক আছে। গাড়ির অঙ্গে অঙ্গে লোহালক্কড়ে চাকার ঠোক্করে জিঞ্জির ডাণ্ডার ঝঞ্জনায় মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজিতেছে—আমি চিৎপাৎ হইয়া তাণ্ডব নাচিতেছি। হমীন্ অস্ত্, ওআ হমীন অস্ত্!" শেষোক্ত বাক্যে দ্রুত ধাবমান গাড়ির চলার ছন্দ কেমন সুকৌশলে অথচ কেমন অনায়াসে ধরা হয়েছে। উড়ন্ত পাখীকে ফাঁদ পেতে ধরবার চেয়েও এ যে কঠিন। সাহিত্যে সবচেয়ে দুঃসাধ্য ব্যঙ্গের সঙ্গে প্রকৃতিকে মেলানো, আর ব্যঙ্গের সঙ্গে প্রেমকে মেশানো। উপরে উদ্ধৃত সবগুলি বর্ণনায় প্রথম দুঃসাধ্যকে সম্ভব করে তোলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় দুঃসাধ্য সুসাধ্য হয়ে ওঠবার উদাহরণ পরে দেওয়া যাবে। মোট কথা এই যে এহেন নিসর্গ বর্ণনা বঙ্গ-সাহিত্যে আর কোথাও পাওয়া যাবে না, না গল্পগুচ্ছে না কপালকুণ্ডলায়। এ পরশুরামের নিজস্ব। আর ভাষার এই ছন্দ, গতি ও ভঙ্গীও অন্যত্র বিরল, পরশুরামের শেষের বইগুলোতেও নেই। সে-গুলির আপেক্ষিক অপ্রিয়তার এ যে একটা কারণ তা আগেই বলেছি। এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও বাধা নেই যে, রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদে সাধুভাষা ব্যবহার করলে তাদের মর্যাদা রক্ষিত হতো।

॥ ৭ ॥

গড্ডলিকা ও কজ্জলীর আর একটি ঐশ্বর্য ছবিগুলি। কথার সঙ্গে ছবিগুলি গানের সঙ্গে সঙ্গত নয়। সঙ্গত বন্ধ হলেও গানের মাধুর্য কমে না। ছবিগুলিকে বলা চলে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের নিমিত্ত নীচে লালকালি দিয়ে দাগ টেনে দেওয়া, কিংবা সঙ্গীর উত্তরীয় প্রান্ত টেনে দৃশ্য বিশেষের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ। ওগুলো আছে বলে পাঠক একটু অতিরিক্ত সচেতন হয়ে ওঠে, ওগুলো না থাকলে অনবহিত পাঠক সেগুলো হয়তো অতিক্রম করে যেতো। শেষের ছয়খানি গ্রন্থের আপেক্ষিক ম্লানতার কারণ নীচে দাগটানার কিংবা উত্তরীয় প্রান্তে টান দেওয়ার অভাব। তৃতীয় গ্রন্থ হনুমানের স্বপ্নের কোন কোন গল্পে যথা হনুমানের স্বপ্ন ও প্রেমচক্রে ছবির গুণে অপকর্ষ লক্ষ্য করবার মতো। খুব সম্ভব চিত্রকর নিজের ক্ষমতার ক্ষীণতা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন বলেই শেষের বইগুলি অলংকৃত করতে ক্ষান্ত হয়েছেন। তার ফলে গল্পগুলির আবেদন মন্দ হয়ে এসেছে। তবে প্রথম বই দু'খানিতে লেখায় রেখায় এমন মিলে গিয়েছে যে, এক এক সময়ে সন্দেহ হয়, গল্প অনুসারে ছবি আঁকা, না ছবি অনুসারে গল্প লেখা।

পরশুরামের গল্পের আর একটি বিশেষ লক্ষণ পড়বার সময়ে পাঠক ভারী একটি আরাম ও স্বস্তি বোধ করে। বর্তমান জীবনের তাড়াহুড়া, ব্যস্ততা, গেল গেল ভাব এদের মধ্যে নাই। বর্তমান ব্যস্তসমস্ত জীবনে নিত্য বিড়ম্বিত পাঠক এখানে পদার্পণ করে ভারী আরাম বোধ করে। উদাহরণ-স্বরূপ কেদার চাটুজ্যে গল্পমালার উল্লেখ করা যেতে পারে। বংশ-লোচনবাবু গৃহকর্তা হলেও গল্পকর্তা কেদার চাটুজ্যে। বংশলোচনবাবুর বাড়ির আড্ডাটি ১৪ নম্বর পার্শীবাগান লেনের আড্ডার প্রতিচ্ছবি বলে মনে হয়।

"চাটুজ্যে মশায় পাঁজি দেখিয়া বলিলেন, রাত্রি ন'টা সাতাম মিনিট গতে অম্বুবাচী নিবৃত্তি। তার আগে এই বৃষ্টি থামবে না। এখন তো সবে সন্ধ্যা। বিনোদ উকীল বলিলেন—তাই তো বাসায় ফেরা যায় কি করে? গৃহস্বামী বংশলোচনবাবু বলিলেন, বৃষ্টি থামলে সে চিন্তা ক'রো। আপাততঃ এখানেই খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা হোক। উদো, বলে আয় তো বাড়ির ভেতর। চাটুজ্যে বলিলেন, মসুর ডালের খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা।"

এই চিত্র যুদ্ধপূর্ব সত্যযুগের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে পাঠকের চিত্তে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস প্রশ্বাসিত করে তোলে। রেশন কার্ড নাই, কন্‌ট্রোল নাই, ইলিশ মাছ চালান বন্ধ

হওয়ার আশংকা নাই; যত রাতেই বাড়িতে ফেরো না কেন, ট্রাম বাস পাওয়া যাবে, নাই ধর্মঘট, নাই ছিনতাইয়ের আশংকা। কয় বছর আগেকারই বা কথা। কিন্তু সত্যযুগ তো লৌকিক বছর গণনার হিসাবের উপরে নির্ভর করে না। প্রত্যেক যুগ বিগত যুগের মধ্যে অচরিতার্থ আশার মরীচিকা দেখে—সেই তো সত্যযুগ। জাবালি পত্নী "হিন্দ্রলিনী তাঁর বাবার কাছে শুনিয়াছিলেন, সত্যযুগে এক কপর্দকে সাত কলস খাঁটি হৈয়ংগবীন মিলিত, কিন্তু এই দগ্ধ ত্রেতাযুগে তিন কলস মাত্র পাওয়া যায়, তাও ভয়সা।" আজকের সকলের মধ্যেই একজন হিন্দ্রলিনীর বাস। আবার আগামী যুগ বর্তমান কালের দিকে তাকিয়ে, ধর্মঘট, ঘেরাও, কন্‌ট্রোল, রেশন, ছিনতাই-শংকিত যুগকে সত্য বলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলবে। পাঠকে কেদার চাটুজ্যে গল্পমালা পড়বার সময়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাসের চিরন্তন বাসা সত্যযুগে প্রবেশ করবার সুযোগ পায়। এই গল্পগুলির রসের নিত্যতার কারণ বংশলোচনবাবুর বাড়ির আড্ডা ও আড্ডাধারীগণ নিত্যকালের অধিবাসী, যে নিত্যকাল লৌকিক হিসাবের ঊর্ধ্বে। সতত বিক্ষুব্ধ সংসার-সমুদ্রের মাঝখানে এই শান্তিময় দ্বীপটিতে পদার্পণ করবামাত্র এখানকার নাগরিক অধিকার লাভ করা যায়। কিছু মাত্র দায়িত্ব নাই, বসে বসে কেদার চাটুজ্যের গল্প শোনো, (বাধা দিলে ব্রাহ্মণ চটে যায় এমন কাজটি করো না) নগেন ও উদয়ের পরস্পরকে আক্রমণ কৌশল লক্ষ্য করো, পারো তো বিনোদ উকীলের কোল থেকে তাকিয়াটা টেনে নাও, আর সম্ভব হলে বংশলোচনবাবুর অনবধানতার সুযোগে পাশে থেকে Happy though Married বইখানা আলগোছে টেনে নিয়ে ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টা করো। রাত যতই হোক মসুর ডালের খিচুড়ি ও ইলিশ মাছ ভাজার আসরে যথাসময়ে ডাক পড়বে। স্বচ্ছল গৃহস্থ বংশলোচনবাবুর বাড়িতে সর্বদা দু'চারজন অতিরিক্তের জন্য চাল নেওয়া হয়ে থাকে। বিশেষ প্রয়োজনও আছে, কেননা, ১৪ নম্বর পার্শীবাগান লেনের আড্ডাধারীরা ক্রমে ক্রমে ওখানে গিয়ে সমবেত হচ্ছেন, এতদিনে বোধহয় সকলেই খণ্ডকালের সীমা পেরিয়ে নিত্যকালের আসরে গিয়ে জুটেছেন।

॥ ৮ ॥

পরশুরামের জনপ্রিয়তার শ্রেষ্ঠ কারণ তার গল্পগুলির বাহনের বিশেষ প্রকৃতি। এই বিশেষ প্রকৃতিকে সাধারণভাবে হাস্যরস বলা বলে, কিন্তু আগে মনে করিয়ে দিয়েছি যে হাস্যরসের বর্ণালী বা বর্ণচ্ছটায় নানা রঙ, এক প্রান্তে অনতিপ্রচ্ছন্ন অশ্রু, আর এক প্রান্তে অনতিপ্রচ্ছন্ন তিরস্কার, মাঝখানে আছে বিশুদ্ধ কৌতুকহাস্য ও অন্যজাতের হাসি। আরও বলেছি যে, পরশুরামের হাসি অনতিপ্রচ্ছন্ন তিরস্কার-ঘেঁষা। সেই সংগেই বলেছি যে, আধুনিক মন রসের জাত বাঁচিয়ে চলতে অভ্যস্ত নয়, বিভিন্ন রস, এক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতের হাসি মিশে গিয়ে মিশ্ররসের এবং মিশ্র জাতের হাসি সৃষ্টি করে। পরশুরামে বিশুদ্ধ কৌতুক হাস্য আছে, যেমন গুপী সাহেব ও উপেক্ষিতা, জটাধর বকশী পর্যায়কেও এই শ্রেণীতে ধরা উচিত। অনতিপ্রচ্ছন্ন তিরস্কারের হাসিই অধিকাংশ গল্পে। অনতিপ্রচ্ছন্ন অশ্রু বড় চোখে পড়ে না। হাসতে হাসতে কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ করে তোলে কমলাকান্তের দপ্তরে ও বৈকুণ্ঠের খাতায়। সে হাসির বোধ করি একেবারেই অভাব পরশুরামে। বের্গস' যাকে ইনটেলেকচুয়াল লাফটার বলেছেন, পরশুরামের হাসি তা-ই। তবে তাঁর হাসির একটা প্রধান লক্ষণ এই যে, ব্যক্তি বিশেষের বা গোষ্ঠী বিশেষের গায়ে এসে লাগে না। এ হাসি ভূতের ঢিলের মতো সম্মুখে এসে প'ড়ে সচকিত ও সতর্ক করে দেয়, গায়ে লেগে ব্যথা দেয় না। অর্থাৎ হাসির উদ্দেশ্য সাধিত হয় অথচ উদ্দিষ্ট ব্যক্তি পীড়িত হয় না। সেই জন্যে সকলেরই কাছে এর নিত্য সমাদর। অপরপক্ষে অমৃতলাল ও ইন্দ্রনাথের হাসি ব্যক্তিবিশেষ ও গোষ্ঠী বিশেষের পক্ষে পীড়াদায়ক। স্ত্রীশিক্ষা,

ইংরেজীশিক্ষা, রাজনৈতিক আন্দোলন, ব্রাহ্মসমাজ এবং অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষ এই হাসির লক্ষ্য। পরশুরামের হাসির লক্ষ্য Idea, Ideology, কোন কোন বৃত্তি, ব্যবসায়, সাহিত্য ও ধর্মের ব্যভিচার ইত্যাদি। এ হাসির একটা মস্ত সুবিধা এই যে, প্রত্যেকেই মনে করে সে ছাড়া আর সকলে তার লক্ষ্য, কাজেই অসঙ্কোচে হাসতে তার বাধে না। গণ্ডেরিরাম বাটপারিয়া পেন্সনপ্রাপ্ত রায় সাহেব তিনকড়িবাবু, শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, বিরিঞ্চিবাবা, বকুবাবু, শিহরন সেন অ্যান্ড কোং সকলেই প্রাণ ভরে হাসে, হাঃ হাঃ হাঃ—অমুক লোকটাকে খুব ঠুকেছে দেখছি, বেড়ে হয়েছে। শেক্সপীয়র নাটককে প্রকৃতির দর্পণ বলেছেন। পরশুরামের দর্পণখানা কিছু বাঁকা, দর্শক নিজের বিকৃত ছায়া দেখে বুঝতে না পেরে ভাবে অপরের ছায়া, পেট ভরে হেসে নেয়। সামান্য অতিরঞ্জনের আমদানি করে পরশুরাম এই কাজটি সুসিদ্ধ করেছেন।

হাস্যরস সৃষ্টির একটি চিরাচরিত পন্থা অপ্রত্যাশিতের অতর্কিত সমাবেশ। সকলকেই অল্পবিস্তর এ পন্থা অনুসরণ করতে হয়েছে। এ গুণটিতে পরশুরাম প্রতিদ্বন্দ্বী-রহিত।

সত্যব্রতর উক্তি, "সাণ্ডেল মশায় বলছেন ধর্মজীবনের মধুরতা, আর আমি ভাবছি আর সোলা।"

শূর্পণখা বিরহ দুঃখ বর্ণনা করছে এমন সময়ে ভাইঝি পুষ্কলা জিজ্ঞাসা করে বসে: "পিসি, তুমি ঋষি খেয়েছে?"

"নিরুপমা বলিল—শাক নয়, ঘাস সেদ্ধ হচ্ছে। ওঁর কত রকম খেয়াল হয় জানেন তো।"

"নিবারণ। সেদ্ধ হচ্ছে? কেন ননীর বুঝি কাঁচা ঘাস আর হজম হয় না।"

"দি অটোম্যাটিক শ্রীদুর্গাগ্রাফ", "ঠোঁটের সিঁদুর অক্ষয় হোক', "শিবুর তিন জন্মের তিন স্ত্রী এবং নৃত্যকালীর তিন জন্মের তিন স্বামী", "তাঁহারা (নাস্তিকরা) মরিলে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসে পরিণত হন", "লালিমা পাল (পুং)", "তবে এইটুকু আশার কথা, এখানে (দার্জিলিঙ পাহাড়ে) মাঝে মাঝে ধস নামে।" "সার আশুতোষ এক ভলুম এন্‌সাইক্লোপিডিয়া লইয়া তাড়া করিলেন", প্রভৃতি। এমন উদাহরণ শত শত উদ্ধার করা যেতে পারে। এই ধরনের অপ্রত্যাশিতের অতর্কিত সমাবেশকে এক ধরনের এপিগ্রাম বলা যেতে পারে, প্রভেদের মধ্যে এই যে সাধারণ এপিগ্রাম ভাবময়, এগুলি চিত্রময়। এইসব এপিগ্রামের স্ফুলিঙ্গ-বর্ষণ যেমন মনোহর, তেমনি অত্যাবশ্যক। এরাই পাঠকের মনকে সর্বদা সজাগ করে রেখে দেয়, তার চোখের সম্মুখে পথ দৃশ্যমান ও সুসম হয়ে ওঠে।

॥ ৯ ॥

পরশুরামের রচনাগুলির প্রকৃতি সম্বন্ধে সাধারণভাবে বক্তব্য শেষ করে এবারে গ্রন্থ হিসাবে তাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যেতে পারে। কিন্তু তার আগে বইগুলোর আপেক্ষিক গুরুত্বের কারণ সম্বন্ধে আরও কিছু বলা আবশ্যক।

গড্ডলিকা ও কজ্জলী অধিকাংশ পাঠকের বিবেচনায় পরশুরামের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। একথা সম্পূর্ণ সত্য হোক বা না হোক এই বিবেচনার কিছু হেতু আছে। প্রথম দু'খানির সঙ্গে শেষের সাতখানির একটি প্রধান পার্থক্য, (অন্য পার্থক্য আগেই দেখানো হয়েছে) প্রথম দু'খানিতে দেখানো হয়েছে জীবনচিত্র, শেষের কয়খানিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে জীবনতত্ত্ব। প্রথম দু'খানি ছবি, শেষের গুলি ভাষ্য। তবে ছবি ও ভাষ্য, আগে যাকে বলেছি চিত্র ও তত্ত্ব সম্পূর্ণ অন্য নিরপেক্ষ নয়। অনেক সময়ে একটার মধ্যে আর একটা এসে পড়েছে। তবে ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে বিচার করলে পার্থক্য মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড ও বিরিঞ্চিবাবা আর তৃতীয়দ্যূতসভা, রামরাজ্য বা গামানুষ জাতির কথা, একজাতের গল্প নয়। প্রথম দুটোতে লেখক ছবি এঁকেই সন্তুষ্ট, শেষেরগুলোতে ছবির সঙ্গে মন্তব্য জুড়ে

দিয়েছেন কিংবা বলা উচিত মন্তব্যের সঙ্গে কখনো কখনো জুড়ে দিয়েছেন ছবি। ফানুস ও ঘুড়িতে এই রকম প্রভেদ। ফানুষ হাত থেকে ছেড়ে দিয়ে বাজিকর সম্পূর্ণ দায়মুক্ত, তারপরে ঐ বস্তুটা বাতাসের বেগ ও নিজের ভার অনুসারে চলতে থাকে। ঘুড়ি উড়নদার নিরপেক্ষ নয়, বাতাসের বেগ ও নিজের ভার যাই বলুক, যতই উঁচুতে সে উঠুক, ওর হাতের চরম টানটা পড়ছে উড়নদারের হাত থেকে। লোকটি ভাষ্যকার, ঘুড়ির গতিবিধি তার ভাষ্য। অন্যপক্ষে ফানুষ অনন্যনির্ভর স্বয়ংসম্পূর্ণ। পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত গল্পগুলি জীবনতত্ত্বের বা জীবনভাষ্যের শ্রেষ্ঠ আধার।

এখন পাঠক-সাধারণের কাছে তত্ত্বের চেয়ে চিত্রের আদর বেশি; তাকালেই চিত্র দেখতে পাওয়া যায়, তত্ত্ব বুঝতে হলে বুদ্ধির আবশ্যক, সকলে সব সময়ে বুদ্ধি খাটাতে চায় না, বিশেষ গল্প উপন্যাসে, সে গল্প উপন্যাস আবার যদি হাস্যরসাত্মক হয়। কিন্তু বুঝমান পাঠকের কাছে শেষের বইগুলোর আদর কম হওয়ার কথা নয়; লেখকের প্রতিভার সঙ্গে মনীষাকে লাভ করাকে তারা উপরি পাওনা বলে গণ্য করে। শেষের বইগুলির গল্পে সমাজ, সাহিত্য, ধর্ম, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, যুদ্ধ, শান্তি, প্রেম, নরনারীর সম্বন্ধ প্রভৃতি গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন আর সেই মন্তব্যের সমর্থনে কখনো বিচিত্র নরনারী ও ঘটনাকে উপস্থিত করেছেন।

তবে উভয় পর্যায়েই ব্যতিক্রম আছে বলে আগে উল্লেখ করা হয়েছে। শেষের বইগুলির মধ্যে জটাধর বক্শী সিরিজ, দুই সিংহ, আনন্দীবাঈ, আতার পায়েস, পরশ পাথর, সরলাক্ষ হোম, জয়হরির জেব্রা, লক্ষ্মীর বাহন, রাতারাতি, গুরুবিদায় প্রভৃতি জীবনচিত্র-প্রধান গল্প। আবার দুয়ের মিশ্রণে অত্যুৎকৃষ্ট সৃষ্টি গগন চটি। এটি পরশুরামের অতি শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র সরস কাহিনীর ফ্রেমের মধ্যে বর্তমান পৃথিবীর ধাপ্পা ও ভণ্ডামিকে সশ্রদ্ধ করে দাঁড় করানো মুনশীয়ানার চরম, গল্পের কলমের পিছনে মনীষার প্রেরণা না থাকলে এমন সম্ভব হতো না।

প্রথম দু'খানির এগারটি গল্পের মধ্যে জাবালি নিঃসন্দেহে জীবতত্ত্ব-প্রধান। শুধু তাই নয় পরবর্তীকালে পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে যে-সব গল্প লিখেছেন জাবালি তাদের প্রথম। খুব সম্ভব রামায়ণ ও মহাভারত সম্বন্ধে আগ্রহ থেকেই তিনি পেয়েছেন পৌরাণিক কাহিনী পুরুষোচিত ছাঁচে ঢালাই করবার প্রেরণা। সে যাই হোক এই জাবালিতে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন আছে, পরে সবিস্তারে বলবো। আপাততঃ অন্য গল্পগুলি সম্বন্ধে বিচার সেরে নেওয়া যেতে পারে।

এগারটি গল্পের জাবালি বাদ পড়লে থাকে দশটি। মহাবিদ্যা ও উলটা-পুরাণ দুটির অভিনবত্বে নরনারীর বৈচিত্র্যে এবং wit-এর খদ্যোতবর্ষণে চিত্তাকর্ষক হলেও, শক্ত গল্পের ফ্রেমের অভাবে অন্যগুলোর সমকক্ষ হতে পারেনি। ওর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি মনোহর, কিন্তু সমগ্র রূপটি নয়। লেখক যেন দেহের outline-টা আঁকতে ভুলে গিয়েছেন। অন্য আটটি গল্প বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ আটটি গল্প।

॥ ১০ ॥

গোড়াতে উল্লেখ করেছি যে রাজশেখর বসুর বিজ্ঞান শিক্ষা (আইনও তার মধ্যে পড়ে) এবং বৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব গল্পগুলির উপাদান সংগ্রহে তাঁকে সাহায্য করেছে। সকল লেখককেই করে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের হাকিমী অভিজ্ঞতার পরিচয় তাঁর অনেক উপন্যাসে আছে। কৃষ্ণকান্তের উইল ও রজনী প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সংগীতবিদ্যার সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ ভাবের পরিচয় পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনায়। তাঁর অনেক Image অনেক অলঙ্কার সংগীত-বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। রাজশেখর বসুও কাজে লাগিয়েছেন

তাঁর অর্জিত জ্ঞানকে। শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড গল্পের কোম্পানীর আইনের রন্ধ্র সন্ধানে যাঁর জ্ঞান পাকা। আবার বিজ্ঞানবিদ্যাও তাঁর কাজে লেগেছে। কুমড়োর চামড়া কস্টিক পটাশ দিয়ে বয়েল করলে ভেজিটেবিল শু হলেও হতে পারে এ ধারণা সকলের মাথায় আসবার কথা নয়। আবার বিরিঞ্চিবাবাতে প্রোফেসার ননীর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার আইডিয়া কেবল তারই মাথায় আসা সম্ভব, বিজ্ঞানের বিশেষ রসায়নের সাধারণ সূত্রগুলি যিনি অবহিত। প্রাণিতত্ত্ব, অভিব্যক্তিবাদ প্রভৃতির মূল সূত্রগুলিকে তিনি কাজে প্রয়োগ করেছেন পরবর্তী অনেক গল্পে।

তারপর ১৪ নম্বর পার্শীবাগান লেনের আড্ডাটিকে এবং আড্ডাধারীদের অনেককে তিনি নামান্তরে ও রূপান্তরে ব্যবহার করেছেন কেদার চাটুজ্যে গল্পমালায়।

রাজশেখরবাবু স্বীকার করেছেন যে তিনি বেশী লোকের সঙ্গে মেশেন নি, দেশভ্রমণ বেশি করেন নি। প্রতিভাবান লোকের পক্ষে এ প্রয়োজন সব সময়ে হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র খুব মিশুক লোক ছিলেন না, দেশভ্রমণও বেশি করেন নি। তবে তাঁর উপন্যাসে এত বিচিত্র নর-নারী এলো কোথা থেকে? তাদের অধিকাংশ স্বেচ্ছায় দিয়েছে দেখা আদালতে এসে। রাজশেখরবাবুর বেলায় বেঙ্গল কেমিক্যালের আপিসে। বাকিটুকু প্রতিভার রসায়ন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাঙালীর রসায়ন বিদ্যার সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন "মোদের নব্য রসায়ন শুধু গরমিলে মিলাইয়া।" গরমিলে মেলানোই যে হাস্যরস সৃষ্টির প্রধান উপায়। হাস্যরস ফকিরের আলখাল্লা, নানা রঙের কাপড়ের টুকরোয় তৈরী। বেঙ্গল স্কুল অব কেমিস্ট্রির নব্য-রাসায়নিক পরশুরাম সেই নীতিতেই তাঁর হাসির গল্পগুলি সৃষ্টি করেছেন।

এবারে জাবালি। জাবালি চরিত্রটি খুব জনপ্রিয় না হলেও (সেযুগেও জনপ্রিয় ছিলেন না) জাবালি গল্পটি, অতি উৎকৃষ্ট। আর শুধু তাই নয় পরবর্তী অনেক উৎকৃষ্ট পৌরাণিক গল্পের অগ্রজ।

ব্রহ্মা জাবালিকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "হে স্বাবলম্বী মুক্তমতি যশোবিমুখ তপস্বী, তুমি আর দুর্গম অরণ্যে আত্মগোপন করিও না, লোকসামাজে তোমার মন্ত্র প্রচার কর। তোমার যে ভ্রান্তি আছে তাহা অপনীত হউক, অপরের ভ্রান্তিও তুমি অপনয়ন করো। তোমাকে কেহ বিনষ্ট করিবে না, অপরেও যেন তোমার দ্বারা বিনষ্ট না হয়। হে মহাত্মন্, তুমি অমরত্ব লাভ করিয়া যুগে যুগে লোকে লোকে মানবমনকে সংস্কারের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিতে থাকো।"

স্বাবলম্বী মুক্তমতি যশোবিমুখ সংস্কারের ছিন্নবন্ধন জাবালি মানব সমাজের বিরুদ্ধে একটা মূর্তিমান প্রচ্ছন্ন তিরস্কার। এর আগে অনেকবার বলেছি পরশুরামের হাস্যরসের বিশেষ প্রকৃতি প্রচ্ছন্ন তিরস্কার। পরশুরামের চোখে আদর্শপুরুষ জাবালি। অমরনাথে ও কমলাকান্তে মিলিয়ে নিলে, হয়তো বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্বকে খানিকটা পাওয়া যায়। তেমনি খুব সম্ভব পরশুরামের ব্যক্তিত্বের খানিকটা পাওয়া যায় জাবালি চরিত্রে। পরশুরামের Symbolic Hero জাবালি। ত্রৈলোক্যনাথের সঙ্গে বারে বারে পরশুরামের তুলনা করেছি, আবার করা যেতে পারে।

ত্রৈলোক্যনাথের চোখে আদর্শপুরুষ মুক্তামালা গল্প পর্যায়ের সুবলচন্দ্র গড়গড়ি। গড়গড়ি সরল ভাবে স্বীকার করেছে, (যেন অপরাধ স্বীকার) "ভালরূপ লেখাপড়া জানি না, শাস্ত্র জানি না, জানি কেবল এই যে সত্য ও পরোপকার, ইহাই ধর্ম।" ত্রৈলোক্যনাথের জীবনেও এই ছিল নীতি ও প্রকৃতি। তার হাস্যরসের প্রচ্ছন্ন অশ্রুর জগতের Symbolic Hero সুবলচন্দ্র গড়গড়ি। একজনে ঘনীভূত অশ্রু, অপরজনে ঘনীভূত তিরস্কার। এইভাবে দুইজনে হাসির বর্ণালীর দুই বিপরীত প্রান্ত।

১১

এবারে আর গ্রন্থ হিসবে নয় বিভিন্ন পর্যায় হিসাবে গল্পগুলির আলোচনা করবো। অনেকগুলি পর্যায়ক্রম পরশুরামে আছে, তার মধ্যে পৌরাণিক, কেদার চাটুজ্যে, জটাধর পর্যায়গুলি প্রধান। অন্য গল্পগুলি উল্লেখযোগ্য হলেও পর্যায়রূপে তাদের তেমন গুরুত্ব নাই, অর্থাৎ এই সব গল্পে পর্যায়ের বিস্তার সংকীর্ণ।

চিত্তাকর্ষকগুণ কেদার চাটুজ্যে ও জটাধার পর্যায়ে অধিক হলেও চিন্তাকর্ষকগুণ পৌরাণিক পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি। সমাজ রাজনীতি ও ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে পরশুরামের চিন্তায় এগুলি বাহন। কত বিষয়ে যে তাঁর কল্পনা প্রসারিত হয়েছে, কত সমস্যা যে তাঁর চিন্তার পরিধির মধ্যে এসে পড়েছে গল্পগুলি সেই পরিচয় বহন করছে।

অনেকের মুখে এমন কথা শোনা যায় যে, পরশুরামের হাতে পড়ে পৌরাণিক নরনারীর বা কাহিনীর অপকর্ষ সাধিত হয়েছে। একথা সত্য নয়, তবে পুরাণের সঙ্গে গল্পগুলির যে ভেদ ঘটে গিয়েছে তা অবশ্যই সত্য। এ ভেদ কালের ও লেখকের দৃষ্টির ভেদ। পুরাণ-গুলিতে সমস্ত কাহিনী একরূপ নয়, বিভিন্ন পুরাণে একই কাহিনীর রূপান্তর দেখতে পাওয়া যায়। সেও একই কারণে, কালের ও লেখকের দৃষ্টির ভেদ। কালের ও লেখকের দাবী অনুসারে পরশুরামের হাতে পুরাণের জন্মান্তর ঘটেছে বললে অন্যায় হয় না।

রামরাজ্য ও চিরঞ্জীবে পুরাণের সঙ্গে আধুনিক কালের মিশ্রণ। রামরাজ্য গল্পের মিডিয়াম-রূপে ভূতগ্রস্ত ভূতনাথ যে গভীর সামাজিক তত্ত্ব প্রকাশ করেছে তা কখনোই আধা-মূর্খ ভূতনাথের দ্বারা সম্ভব নয়। শেষপর্যন্ত পাঠকের মনে এই সন্দেহটুকু লেখক জাগিয়ে রেখেছেন, পাঠক ভাবতে থাকে তবে কি সত্যই সে ভূতাবিষ্ট হয়েছিল? ভূতনাথ কথিত তত্ত্বগুলিকে সে গ্রহণ করলেও ভূতনাথের নিজস্ব বলে গ্রহণ করতে তার বাধে। এই বাধাটুকু সৃষ্টি খুব মুনশীয়ানার কাজ।

চিরঞ্জীবেও তা-ই। চিরঞ্জীব কে? বিভিষণ ছাড়া আর কে হবে? অথচ স্পষ্ট করে বলা হয়নি।

গুলবদ্দলিস্তান আরব্য-উপন্যাসের উপসংহার, ভারতীয় পুরাণের রূপান্তর নয়, অন্য নামের অভাবে তাকে পৌরাণিক বলেই ধরা উচিত।

দশকরণের বানপ্রস্থে সুখের স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাজা দশকরণ নানা অবস্থার মধ্যে সুখের সন্ধান করেছেন, শেষ পর্যন্ত তিনি আবিষ্কার করলেন যে, পরের ঘর ছেয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছুতেই সুখ নাই, পরোপকারই যথার্থ সুখ। ব্যঙ্গরসিক কমলাকান্তেরও এই সিদ্ধান্ত। অপর দুইজন অতিশ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গরসিক বার্নার্ড শ ও ভলটেয়ার শেষ পর্যন্ত এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। Candide এবং Blackgirl's Search for God এই দুই অমর গ্রন্থে এই একই সিদ্ধান্ত। দশকরণ ঘরামী বৃত্তি ছেড়ে সিংহাসনে ফিরে যেতে অস্বীকৃত হয়েছেন।

তৃতীয়দ্যূতসভায় দেখানো হয়েছে, অধর্মের বিরুদ্ধে অধর্মাচরণ রাজনীতির চিরস্বীকৃত নীতি। এই নীতির প্রেরণাতেই শকুনির ভ্রাতা মৎকুনি যুধিষ্ঠিরকে কপট দ্যূতের সাহায্য লইতে পরামর্শ দিয়েছেন।

ভীম গীতা গল্পে ভীম কৃষ্ণকে বলেছেন কাপুরুষতা ও ধর্মভীরুতা কোনটাই তার চরিত্রের লক্ষণ নয়; সে মধ্যপন্থী। কাজেই কৃষ্ণ তাঁর উচ্চ আদর্শ নিয়ে থাকুন, ভীম ক্ষত্রিয় বীরের কর্তব্য করবে। এই গল্পে চোক্কমল্ল আর তক্কমল্ল নামে কৃষ্ণের দুইজন সেবকের উল্লেখ আছে, তারা নিতান্ত সাধারণ ও দুর্বল ব্যক্তি। তাদের সিদ্ধান্ত এই যে; 'দুর্বলের একমাত্র উপায় জোটবাঁধা। বোলতার ঝাঁক বাঘ-সিংহীকেও জব্দ করতে পারে।' বর্তমান যুগ এই নীতি অবলম্বন করে চলেছে।

ভূমিকা

ভরতের ঝুমঝুমি ভারত বিভাগ সম্বন্ধে ব্যঙ্গ মন্তব্য।

অগস্ত্যদ্বার রাজাদের জিগীষার মূঢ়তা সম্বন্ধে ব্যঙ্গ মন্তব্যে পরিপূর্ণ।

বালখিল্যগণের উৎপত্তি চিন্তাশীল মাত্রেরই প্রণিধানযোগ্য। লেখকের অভিমত এই যে বালখিল্যগণের লীলা পৌরাণিক কালেই সীমাবদ্ধ নহে, যুগে যুগে সে লীলা পুনঃঅভিনয় হয়ে থাকে, বর্তমান যুগ সেই লীলার প্রশস্ত আসর।

তিন বিধাতা গল্পে পাপের উৎপত্তি ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক বিবৃতি আছে। লেখকের বক্তব্য এই যে, বিধাতা পাপপুণ্যের অতীত, তাঁর চোখে সবই সমান, মানুষ ক্ষুদ্র বুদ্ধি বলেই পাপপুণ্যের ভেদ করে আর উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। অসীমকালের অধীশ্বর বিধাতা নিরুদ্বিগ্ন। পাপ ও পুণ্য দুই-ই জীবনের অপরিহার্য লক্ষণ। কোন একটিকে বাদ দিয়ে জীবনকে কল্পনা করা চলে না।

গন্ধমাদন-বৈঠকে দেখানো হয়েছে যে, ধর্মযুদ্ধ বলে কিছু সম্ভব নহে। যুদ্ধের আগে ধর্মের প্রেরণায় যেমনই নিয়ম বেঁধে দেওয়া হোক না কেন, যুদ্ধকালে তার ব্যভিচার ঘটবেই। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত সমস্তই এই ব্যভিচারের দৃষ্টান্তে পূর্ণ। হয় যুদ্ধ একেবারে বন্ধ করতে হবে, নয় যুদ্ধে অধর্মকে স্বীকার করে নিতে হবে।

নির্মোক নৃত্যে জীবনে একটি গভীর জিজ্ঞাসাকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা হয়েছে। প্রকৃত সৌন্দর্য রূপশ্রী নয়, তার স্থান আরও গভীরে। উর্বশীর পরাজয়ে এই সত্যটি দেখানো হয়েছে।

যযাতির জরা গল্পে দেখানো হয়েছে যে, তথাকথিত সন্ন্যাস বাসনার মূলচ্ছেদ করতে অক্ষম। বাসনা যখন রূপসী নারীরূপে উপস্থিত হয়, তখন সন্ন্যাসের সযত্নরচিত তাসের ঘর মুহূর্তে ভেঙে পড়ে।

উম্বরু পণ্ডিত একজন মূর্খ আদর্শবাদী. তাই কোথাও প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারেনি আদর্শবাদের সংগে সাংসারিক কাণ্ডজ্ঞানের বিরোধ নেই এই কথাই বোধ করি লেখক বলতে চান।

এ ছাড়া আরও কতকগুলি গল্প এই পর্যায়ে পড়ে, বাহুল্যবোধে সেগুলির বিস্তারিত আলোচনা করা গেল না। আগেই বলেছি আবার বলতে ক্ষতি নেই, ওই পর্যায়ের আদি ও শ্রেষ্ঠ গল্প জাবালি। শুধু তাই নয় মূর্তিমতি সংস্কারমুক্ত জাবালি পরশুরামের Symbolic Hero.

আর একটি পর্যায় আছে যার প্রধান ব্যক্তি কেদার চাটুজ্যে। সে বক্তা ও প্রবক্তা দুই-ই। এই পর্যায়ে লম্বকর্ণ, গুরুবিদায়, রাতারাতি, স্বয়ংবরা, দক্ষিণ রায় ও মহেশের মহাযাত্রা গল্পগুলির মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ নিশ্চয় করে বলা কঠিন। শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট অভিযোগে আমরা কোনটিকেই ছাড়তে রাজী নই। ব্যঙ্গ-সমাজচিত্র হিসাবে এই পর্যায়টিকে পরশুরামের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বললে অন্যায় হয় না। প্রত্যেকটি চরিত্র নিখুঁতভাবে, নখদর্পণে বিম্বিত। ঘটনাগুলি চিত্তাকর্ষক এবং সর্বোপরি কেদার চাটুজ্যের গল্প-ব্যাখ্যান কি তার তুলনা দেব জানি না। এই বললেই বোধ করি যথেষ্ট হবে যে, একমাত্র কেদার চাটুজ্যেতেই তা সম্ভব। এই গল্পের একটি প্রধান পাত্র লম্বকর্ণকে ভুলি নাই, বংশলোচনবাবুর অনেক অন্ন সে ধ্বংস করেছে এবং গুরুবিদায় গল্পে নিজের কীর্তি দ্বারা সমস্ত অন্নঋণ শোধ করে দিয়েছে।

জটাধর বক্‌শী সিরিজের তিনটি গল্প। জটাধর বক্‌শী ভণ্ড ও জোচ্চোর। কিন্তু হলে কি হয়, তার নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি ও সপ্রতিভ ভাব তার উপরে কাউকেই রাগ করতে দেয় না। চাণ্ডায়নি সুধা সমূল্যে বিতরণ করে যখন সে সকার্য সিদ্ধি করছে, তখনও তার

উপরে রাগ করা অসম্ভব। যখন স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে সে পকেট মারছে, তখনও মনে হয় যা করছে করুক কেবল আর কিছুক্ষণ কথা বলুক, তার কথাবার্তাতেই চাণ্গায়নি সুধার উন্মাদক শক্তি বিদ্যমান। ডিকেন্স যে সব প্রতিভাবান জোচ্চোর সৃষ্টি করেছেন, তাদের সঙ্গে বেশ মিলত জটাধর বক্শীর।

মাঙ্গলিক ও গামানুষ জাতির কথা গল্প দুটিতে চরিত্রগুলি ঠিক মানুষ নয়। মঙ্গলগ্রহ থেকে আগত ব্যক্তি মাঙ্গলিক, তার চোখে পৃথিবীর সমস্তই অদ্ভুত, অসংলগ্ন ও অযৌক্তিক। গামানুষ জাতির কথার পাত্রগুলি মানুষ নয়, মানুষ বহুকাল আগে পৃথিবী থেকে লোপ পেয়েছে, এরা গোড়ায় ছিল ইঁদুর এখন আণবিক রশ্মির প্রভাবে একপ্রকার, অন্য শব্দের অভাবে মনুষ্যত্ব ছাড়া আর কি বলব, মনুষ্যত্ব লাভ করেছে। এদেরই বিচিত্র ইতিহাস এই গল্পে।

বিশুদ্ধ আদর্শবাদের প্রতি, যে আদর্শবাদ শতকরা একশো ভাগ খাঁটি, পরশুরামের অনুকম্পা মিশ্রিত হাস্যের ভাব আছে। সত্যসন্ধ বিনায়ক, ভবতোষ ঠাকুর, নিধিরামের নির্বন্ধ, অক্রূর সংবাদ, অটলবাবুর অন্তিমচিন্তা ও সিদ্ধিনাথের প্রলাপ প্রভৃতি এই পর্যায়ে পড়ে। সত্যসন্ধ বিনায়ক, ভবতোষ ঠাকুর ও নিধিরাম অবিমিশ্র সৎ প্রকৃতির লোক, খাঁটি আদর্শবাদী। কাজেই তাদের পরিণাম দুঃখের। আদর্শবাদ ও পাগলামি যে কোন কোন সময়ে অভিন্ন বলে প্রতীয়মান হয়, অক্রূর সংবাদ তার একটি উদাহরণ। আবার অনেক সময়ে আদর্শবাদ মানুষকে যে নৈরাজ্যের মধ্যে নিয়ে যায়, অটলবাবুর অন্তিমচিন্তা তার একটি উদাহরণ। মোটকথা এই যে, আদর্শবাদকে পরশুরাম অশ্রদ্ধা করেন না কিন্তু সেই আদর্শবাদ যখন একান্ত হয়ে উঠে কাণ্ডজ্ঞানকে বর্জন করে, তখন তাকে ব্যঙ্গের উপকরণরূপে গ্রহণ করতেও তিনি কুণ্ঠিত হন না। আদর্শবাদের সঙ্গে কাণ্ডজ্ঞান মিশ্রিত হলে তবেই তা কার্যক্ষম হয়ে ওঠে। বোধ করি এই তাঁর সুচিন্তিত অভিমত।

॥ ১২ ॥

ব্যঙ্গ-লেখকের কলমের সঙ্গে প্রেমের বড় আড়াআড়ি, দুয়ে মেলে না, কিংবা মিলতে গেলেও তীক্ষ্ণ কলমের ঠোকরে প্রেমে বিকৃতি ঘটে যায়। সুইফট্, বার্নার্ড শ ও ভলটেয়ার মহা প্রতিভাবান ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও মধুর রসের কাহিনী লিখতে পারেন নি। এমন কেন হয় সহজেই অনুমেয়। ব্যঙ্গের চোখ স্বভাবতই জীবনের অপূর্ণতার দিকে নিবন্ধ আর প্রেমে যেমন জীবনের পূর্ণতার পরিচয় এমন আর কিসে? ও দুয়ে ধর্মের মূলগত প্রভেদ। অন্য-পক্ষে লিরিক কবি, প্রেম যাদের প্রধান উপজীব্য তাদের হাতের ব্যঙ্গের কলমের গতি বড় সুষ্ঠু নয়। শেলী, ওয়ার্ডস্বার্থ, রবীন্দ্রনাথ উদাহরণ। ব্যতিক্রম বায়রণ ও হায়নে। কীটস সম্বন্ধে নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না, কাব্যের কোন ক্ষেত্রে তার যে প্রবেশ অনধিকার ছিল এমন মনে হয় না।

পরশুরামের ব্যঙ্গদৃষ্টি ব্যঙ্গের স্বাভাবিক উপাদানের দিকে নিবন্ধ হলেও সৌভাগ্যবশতঃ কখনো কখনো প্রেমের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। তার রচিত প্রেমের গল্প সংখ্যায় সামান্য কয়টি, তার উপরে আবার তাতে প্রেমের উন্মাদনা নেই, এমন কি প্রথম নজরে অনেক সময়ে সেগুলি যে প্রেমের গল্প তা খেয়াল হয় না। তবু সেগুলি প্রেমের গল্প ছাড়া আর কিছু নয়, আর এই স্বল্প-সংখ্যকের কয়েকটি পরশুরামের শ্রেষ্ঠ কীর্তির অন্তর্গত। আনন্দীবাঈ, যশোমতী, রটন্তীকুমার, চিঠিবাজি, জয়হরির জেব্রা, নীলতারা প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। গল্প-গুলিতে প্রেমের প্রকৃতি আবার এক রকম নয়।

আনন্দীবাঈ গল্পে প্রেম দাম্পত্য সম্বন্ধের সার্থকতা লাভ করেছে।

যশোমতীতে কিশোর-কিশোরীর প্রণয় দীর্ঘ কাল-সমুদ্র ডুব সাঁতারে পার হয়ে যখন আবার মুখোমুখী হল তখন পাত্র বৃদ্ধ, পাত্রী বৃদ্ধা ও পিতামহী। তারা একদিন প্রেমকে দেখেছিল পূর্বাচলের তীর থেকে আজ দেখলো অস্তাচলের তীরে এসে, মাঝখানে দীর্ঘকালের বিচ্ছেদ। তাদের চোখে অস্তাচলের দৃশ্যও কম মনোরম নয় কেননা তা পলে পলে পুরাতন হয়ে যাওয়ার দুর্ভাগ্য এড়াতে সমর্থ হয়েছে। প্রেমের উত্তাল সমুদ্র এখন তুষারে শুভ্র ও শান্ত, তাই বলে তার সৌন্দর্য অল্প নয়।

রটন্তীকুমারে ধনী পাত্রের সঙ্গে দরিদ্র পাত্রীর কোর্টশিপ বড় নিপুণভাবে, বড় সুকুমার ভাবে, বড় আত্মসম্মান রক্ষা করে অঙ্কিত হয়েছে।

চিঠিবাজিতে পাত্রপাত্রী পরস্পরকে পরীক্ষা করে নিয়েছে। এ প্রেম একটু Intellectual, তাই বলে Emotion-এ কমতি পড়েনি। দুজনের বাসরের সংলাপটুকু পড়লেই আর সন্দেহ থাকে না।

নীলতারাতে পথভ্রান্ত প্রেম শেষ পর্যন্ত স্বস্থানে এসে মিলিত হয়েছে।

জয়হরির জেব্রা প্রায় Taming of the Shrew। অদৃষ্টের আঘাতে বেতসী খঞ্জিনী হয়েছে। ঐটুকুর প্রয়োজন ছিল খঞ্জ জয়হরির অর্ধাঙ্গিনী হওয়ার জন্যে।

গল্পগুলি প্রেমের নিঃসন্দেহ, তবে সে-সব গল্পে যে মামুলী উপাদান ও মনস্তত্ত্বের প্যাঁচ থাকে তা একেবারেই নেই, কিন্তু মানব স্বভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ সংগতি আছে। এগুলি পরশুরামের দক্ষিণ হস্তের রচনা, তবে মননের রেখা গভীর নয়, রঙটাও হাল্কা।

॥ ১৩ ॥

আর কয়েকটি গল্প আছে যাদের কোন বিশেষ পর্যায়ে ফেলা যায় না, তবু তাদের মধ্যে যেন মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ভূষণ পাল ও দাঁড়কাগ গল্প দুটিতে প্রচ্ছন্ন অশ্রুর আভাস বিদ্যমান। পরশুরামে প্রচ্ছন্ন অশ্রু বিরল বলেই গল্প দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্যামা নামান্তরে তমিস্রা নামান্তরে দাঁড়কাগ বা কোয়া দিদি নিজের রূপহীনতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। এ বিষয়ে কোন মেয়ে সচেতন অর্থাৎ নিঃসন্দেহ হলে তার মন বিশ্বসংসারের বিরুদ্ধে বিদ্বিষ্ট হতে বাধ্য, চরাচরের ষড়যন্ত্রেই এমনটি হয়েছে বলে তার নিশ্চিন্ত বিশ্বাস। কোয়াদিদি কিন্তু ঐ বিশ্বাসের ফাঁদে পা দেয়নি, বিদ্বেষকে নিজের বিরুদ্ধে আরোপ করে নিজেকে নিয়ে সে ঠাট্টা করতে পারে। এ কাজ যে পারে তাকে আঘাত করা কঠিন। কোয়াদিদি অশ্রুকে জমিয়ে আইসক্রীমে পরিণত করেছে, তার উপরে হাসির সূর্যকিরণ পড়ে বড় মনোহর দেখাচ্ছে।

ভূষণ পাল এমনি আর একটি প্রচ্ছন্ন অশ্রু (অনতিপ্রচ্ছন্ন) কাহিনী। খুনী, আসামী ফাঁসির বলি। এমন লোকের মধ্যেও যে মহত্ত্ব থাকতে পারে এখানে সেটাই অত্যন্ত সহজে দেখানো হয়েছে। অপটু লেখকের হাতে পড়লে চোখের জলের ঢেউ বয়ে যেতো, এখানে গোটা-দুই চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস মাত্র শ্রুত হয়েছে।

কৃষ্ণকলি গল্পে প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য কোন প্রকার অশ্রু থাকবার কথা নয়, তবু প্রচ্ছন্ন অশ্রুর তালিকায় গল্পটির নাম লিখতে ইচ্ছে করে। গল্পটি শিউলি ফুলের মতো সুকুমার ও স্পর্শ-কাতর, এর মধ্যে কোথায় যে গল্প বুঝি বুঝতে অক্ষম। শিউলি ফুলে যদি শিশিরের আভাস থাকে, তবে এ গল্পটিতেও অশ্রুর আভাস আছে।

॥ ১৪ ॥

সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্বন্ধে অনেক গূঢ়ার্থ ব্যঙ্গ মন্তব্য পরশুরামের বিভিন্ন গল্পে ছড়ানো আছে সত্য, কিন্তু সরাসরি বিষয়টি নিয়ে লিখিত গল্পের সংখ্যা বেশি নয়। দুই

সিংহ, রামধনের বৈরাগ্য, বটেশ্বরের অবদান ও দ্বান্দ্বিক কবিতা গল্প কয়টিকে সাহিত্য ও সাহিত্যিক বিষয় বলা যেতে পারে।

দুই সিংহ সাহিত্যিকের আত্মম্ভরিতায় হাস্যকর। রামধনের বৈরাগ্য এক শ্রেণীর সাহিত্যিকের মনোভাব সম্বন্ধে এবং বটেশ্বরের অবদান এক শ্রেণীর পাঠকের উপরে সাহিত্যের প্রভাব সম্বন্ধে ব্যঙ্গচিত্র। দ্বান্দ্বিক কবিতা এক শ্রেণীর সাহিত্যিকের পরিণাম সম্বন্ধীয় সরস বিবরণ।

১৯২২-এ প্রথম গল্প প্রকাশের পর থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত পরশুরামের যে গল্পধারা প্রকাশিত হয়েছে, তাদের মধ্যে বাঙালীর সামাজিক পরিবর্তন সুষ্ঠুভাবে প্রতিফলিত। গড্ডলিকা ও কজ্জলীর গল্পগুলিতে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেকার সামাজিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চিত্র। তারপরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সামাজিক অশান্তি, দুর্ভিক্ষ, দেশবিভাগ, স্বাধীনতালাভ ও তৎপরবর্তী অশান্ত অবস্থা রামরাজ্য, শোনা কথা, বালখিল্যগণের উৎপত্তি, গগন চটি, মাৎস্য ন্যায়, ভীম গীতা প্রভৃতি গল্পে চিত্রিত। কালান্তরে অবস্থান্তর ব্যঙ্গ-রসিকের দৃষ্টি এড়ায় নি।

পর্যায়ক্রমে আলোচিত গল্পগুলির বাইরে এমন অনেকগুলি গল্প আছে যা পরশুরামের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মধ্যে। লক্ষ্মীর বাহন, পরশ পাথর, বরনারীবরণ, বদন চৌধুরীর শোকসভা, চিকিৎসা-সংকট, ভুশণ্ডীর মাঠে, কচি-সংসদ, বিরিঞ্চিবাবা, কাশীনাথের জন্মান্তর প্রভৃতি ব্যঙ্গরসের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

॥ ১৫ ॥

এবারে উপসংহার। আমাদের যা বক্তব্য প্রবন্ধ মধ্যে নানা প্রসঙ্গে তা কথিত হয়েছে। উপসংহারে সেই সব পুরানো কথা দু-একটা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। প্রধান কথাটা এই যে, ব্যঙ্গরচনার ক্ষেত্রে পরশুরামের একমাত্র দোসর ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। রচনার পরিমাণ, শ্রেণীভেদ ও বৈচিত্র্যে ত্রৈলোক্যনাথ বোধ করি পরশুরামের উপর। আবার রচনার সুক্ষ্মতায়, ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতায়, বুদ্ধির অনুশীলনে পরশুরামের শ্রেষ্ঠতা। কঙ্কাবতীর মত উপন্যাস পরশুরাম লেখেন নি। কঙ্কাবতী উপন্যাসখানিকে অবলম্বন করলে ত্রৈলোক্যনাথের মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়। পরশুরামের ক্ষেত্রে সেরকম কোন অবলম্বন নেই, অন্ততঃ কুড়ি-পঁচিশটি গল্পকে গ্রহণ না করলে তাঁর মোটামুটি পরিচয় লাভ সম্ভব নহে। গল্প-লেখকের পক্ষে এ এক মস্ত অসুবিধে। দুজনেই উচ্চ-পাটীয়ান্ স্রষ্টা, তবে দুয়ে প্রভেদ আছে। ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন অশ্রু ঘেঁষা, পরশুরামের প্রচ্ছন্ন তিরস্কার ঘেঁষা, ব্যতিক্রম দুই ক্ষেত্রেই আছে। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পগুলির উদ্ভব ও পরিবেশ গ্রামাঞ্চল, পরশুরামের কলকাতা শহর। এ ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম আছে। উদ্ভব ও পরিবেশের ভেদে দুজনের গল্পের বিষয়, মনোভাব ও টেকনিকে ভেদ ঘটেছে। পরশুরামের অসুবিধে এই যে বাংলা দেশের গ্রামাঞ্চলকে তিনি জানেন না বললেই হয়। না জানুন তাতে ক্ষতি নেই, কলকাতা শহরের অনেক পথঘাট ও বিভিন্ন অঞ্চলকে সাহিত্যে তিনি স্থায়ীভাবে চিত্রিত করে গিয়েছেন, সেই সব চিত্রে পাঠক বাস্তবের অতিরিক্ত কিছু পায়, ফলে কলকাতা শহর ব্যঙ্গের তির্যকছটায় কিছু পরিমাণে সত্যতর হয়ে ওঠে। আজ একশো বছরের উপরে বাঙালী সাহিত্যিকগণ কলকাতা শহরকে সাহিত্যের মানচিত্রে স্থায়িত্ব দেবার চেষ্টা করেছেন, দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রধান সাহিত্যিকত্রয় মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে তেমন কোন মন দেননি। তাঁদের রচনায় বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চল সত্যতর হয়ে উঠেছে। ডিকেন্স লণ্ডন শহরের জন্য যা করেছেন, কলকাতা শহরের জন্যে এখনও কেউ তা করেন নি। কলকাতা শহরের ডিকেন্স এখনও ভবিতব্যের গর্ভে। পরশুরামের রচনায় কিঞ্চিৎ পরিমাণে এ চেষ্টা

৩

আছে। তিনি প্রতিভায়, পরিচয়ে ও স্বভাবে Urban বা নাগরিক। সেই জন্য তাঁর রচনা ত্রৈলোক্যনাথের চেয়ে অনেক বেশী মার্জিত, অনুশীলিত ও ভব্যতাযুক্ত। অন্যপক্ষে সৃষ্টির প্রাণশক্তির প্রাচুর্য ত্রৈলোকনাথে বেশী। তবে দুজনকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে না করে পরিপূরক মনে করাই অধিকতর সংগত। তাঁদের রচনাকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করলে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল ও নগরপ্রধান কলকাতা শহরকে যেন একত্রে পাওয়া যায়। এ একটা মস্ত সৌভাগ্য। সুবল গড়গড়ি ও জাবালি যতই ভিন্নস্তরের ব্যক্তি হোক এক জায়গায় দুজনের মিল আছে। একজন হৃদয় দিয়ে, অপরজন বুদ্ধি দিয়ে সংসারকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন, কেউই স্থিতাবস্থাকে স্বীকার করে নেন নি। এদের দুজনকে ব্যঙ্গ-রসিকদ্বয় । Symbolic Hero বলেছে, ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশুরামের প্রতিনিধি হিসাবে তাদের পাঠকের সম্মুখে এনে দিয়ে আমাদের বক্তব্য সমাপ্ত করলাম।

॥ ১৬ ॥

রাজশেখর বসু স্বনামে অনেকগুলি বই লিখেছেন। তার মধ্যে প্রধান চলন্তিকা অভিধান এবং রামায়ণ ও মহাভারতের সংক্ষিপ্ত সারানুবাদ।

সুখের বিষয় বাংলা ভাষায় অতিকায় অভিধানের অভাব নেই, তৎসত্ত্বেও চলন্তিকা অপরিহার্য। প্রথম কারণ, এর আয়তন বিভীষিকা ব্যঞ্জক নহে, যে সব শব্দ সাহিত্য ও সংলাপে নিত্য চলে চলন্তিকা তারই সংযোগ। দ্বিতীয় কারণ, বাংলাভাষা, বানান ও বানান-চিহ্নে অরাজকতার মধ্যে একটি নিয়ম প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা আছে। তৃতীয় কারণ, পরিশিষ্ট প্রদত্ত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে পরিভাষা সংকলন। প্রধানতঃ এই তিনটি কারণে সাহিত্য-ব্যবসায়ীদের পক্ষে অর্থাৎ সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষক, অধ্যাপক, ছাত্র এবং প্রুফ-রিডারদের পক্ষে চলন্তিকা অপরিহার্য সঙ্গী। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, সুবলচন্দ্র মিত্র, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অভিধানের স্থান আলমারিতে, চলন্তিকার স্থান লেখার টেবিলের উপরে। অভিধানের পক্ষে এর চেয়ে প্রশংসার কথা আর কি হতে পারে জানি না। শুধু এই বইখানা লিখলেই রাজশেখর বসু বাংলা ভাষায় স্মরণীয় হয়ে থাকতেন।

কোন বৃহৎগ্রন্থের সংক্ষেপণ একপ্রকার নিষ্ঠুর কার্য। সে গ্রন্থ আবার যদি মহৎ হয়, তবে এই নিষ্ঠুরতা প্রত্যবায়ের পর্যায়ে পৌঁছতে পারে, কিন্তু রাজশেখর বসু প্রত্যবায়গ্রস্ত হননি তার কারণ রামায়ণ মহাভারত তথা প্রাচীন শাস্ত্রের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধার প্রেরণাতেই তিনি রামায়ণ মহাভারতকে নবকলেবর দান করেছেন। মহাভারতের তুলনায় রামায়ণ ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থ, কাজেই এখানে কার্যটি দুষ্কর হয়নি। মূল কাহিনীকে সহজ বাহ্য আকারে তিনি লিপিবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছেন। মহাভারতের ক্ষেত্রে তাঁর চেষ্টা তর্কাতীত নয়।

কাহিনী, উপকাহিনী, উপদেশ ও অনুশাসনে গঠিত মূল মহাভারতে লক্ষাধিক শ্লোক। এ হেন তিমিঙ্গিল মহাগ্রন্থকে আট শ পৃষ্ঠার মধ্যে আনয়ন অসম্ভব বলেই মনে করতাম, যদি না রাজশেখর বসু হাতেকলমে তা সম্পন্ন করতেন। তাঁর এ কাজ তর্কাতীত না হতে পারে তবে আদৌ যে সম্ভব হয়েছে তাই বিস্ময়কর। যাই হোক এই দুই অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থকে সহজায়ত্ত করে দিয়ে তিনি বাঙালীর মহৎ উপকার সাধন করেছেন। রামায়ণ, মহাভারত ও ইলিয়ডের মত ক্লাসিক গ্রন্থকে মূলভাষায় পাঠ করার প্রয়োজন সব সময়ে হয় না, সকলের পক্ষে তো কখনই হয় না, এদের মহত্ত্ব এমন আন্তরিক যে ভাষান্তরে পাঠ করলেও তার স্বাদ লাভ করতে পারে পাঠকে। এই ভাবেই এই সব কাব্য চিরকাল পরিজ্ঞাত হয়ে আসছে। রাজশেখর বসু প্রদত্ত নবকলেবর সেই পরিজ্ঞাপ্তির বিস্তারসাধন করে বাঙালী পাঠকের সম্মুখে আর একটা নূতন পথ খুলে দিয়েছে।

বক্তব্য

গল্প-সমগ্র বা সংগ্রহ, যে লেখকেরই হোক, হাতে পেলে প্রায় কোনো পাঠকই তার 'ভূমিকা' পড়ায় আগ্রহী হন না, অনর্থক 'বিদ্যে-জাহির' মনে করেন। এটাই স্বাভাবিক। আর 'পরশুরাম'-এর গল্প—বারবার পড়েও ত তা প্রায় অনাদি অনন্ত। 'ভূমিকা' কি হবে।

তবু বারবার পড়ার ফাঁকে শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর অপূর্ব ভূমিকাটি পড়লে এই অনাদি অনন্তের একটি চমৎকার দিশা পাওয়া যাবে।

কিন্তু অনন্ত সম্বন্ধে তারপরও অনন্ত কথা বাকী থাকে। আমি তার যৎকিঞ্চিৎ বলেছি এই গ্রন্থের শেষে, 'উপসংহার'-এ।

আপাততঃ আমি কেবল পরশুরাম/রাজশেখর বসুর সমগ্র রচনা ও তার প্রকাশ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিখছি।

রাজশেখর বসুর জীবৎকালে তাঁর স্বনামে প্রকাশিত হয়েছিল দশটি গ্রন্থ—চলন্তিকা (অভিধান), রামায়ণ, মহাভারত (সারানুবাদ), কুটিরশিল্প, ভারতের খনিজ, কালিদাসের মেঘদূত, হিতোপদেশের গল্প (ছোটদের) ও তিনটি প্রবন্ধ-সংকলন-লঘুগুরু, বিচিন্তা, চলচ্চিন্তা।

পরশুরাম নামে প্রকাশিত হয় মোট সাতানব্বইটি গল্প নিয়ে নখানি গ্রন্থ।

কয়েকটি কবিতা নিয়ে 'পরশুরামের কবিতা' ও 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' মরনোত্তর প্রকাশন।

আরও পরে (১৯৬৯) এই নখানি গল্পগ্রন্থ, তিনটি প্রবন্ধ সংকলন ও একটি কবিতার বই নিয়ে তিন খণ্ডে পরশুরাম গ্রন্থাবলীর প্রকাশ, যাতে সংযোজিত হয়েছিল তাঁর লেখা শেষ গল্প 'জামাইষষ্ঠী' (১৫. ৬. ১৯৫৯-এ লেখা আরম্ভ কিন্তু অসমাপ্ত) ও তাঁর জীবনের সর্বশেষ রচনা 'রবীন্দ্রকাব্যবিচার'। এর কথা পরে বলছি।

এরও পরে খুঁজে পাওয়া গেল আর দুটি গল্প 'আমের পরিণাম' ও 'আনন্দ মিস্ত্রী'। প্রথমটি তাঁর নিজস্ব ভাষা-শৈলীতে কথিত হলেও ও 'সচিত্র ভারত' পত্রিকায় একবার প্রকাশ করলেও সম্ভবত একটি প্রচলিত উপকথা হওয়ার জন্যই তাঁর কোনো গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেন নি। দ্বিতীয়টি ১৩৬১'র (১৯৫৪) শারদ গল্প-ভারতীতে প্রকাশিত কিন্তু কোনো গ্রন্থে প্রকাশ না করার কারণ অজ্ঞাত। রাজশেখর একবার বলেছিলেন, "আমি সাধারণ লোকসমাজে বেশী মিশিনি, তার চেয়ে ঢের মিশেছি মিস্ত্রীদের সঙ্গে, কারখানায় কাজের সময়। 'ভূষণ পাল' গল্পের সূত্র অনেকটা সত্যি, সেখান থেকেই পাওয়া। আরও একটা গল্প এবিষয়ে লিখেছি, কিন্তু ছাপিনি ; কারণ তাদের সংসার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।"

আনন্দ-মিস্ত্রী এই 'মিস্ত্রীদের সংসার' নিয়েই গল্প। এটাই কি তাঁর সেই 'না-ছাপা' রহস্যময় গল্প? হয়তো উপেন গাঙ্গুলিমশায়ের নির্বন্ধাতিসয় একবার গল্প-ভারতীতে দিয়েছিলেন। জানি না।

এখন রাজশেখর বসুর মৃত্যুর বত্রিশ বছর পরে পূর্বোক্ত নখানি গল্প-গ্রন্থের সাতানব্বইটি গল্প ও শেষ অসমাপ্ত গল্পসহ আরও তিনটি—এই একশটি গল্পের অখণ্ড ও সম্পূর্ণ পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হল।

অবশ্য 'গল্প-সমগ্র' নাম সত্ত্বেও এতে তাঁর প্রায় সমগ্র কবিতাও অন্তর্ভুক্ত হল। এতে নামের 'ব্যাকরণ-ভুল' হলেও কারণ প্রাঞ্জল। শুধু 'পরশুরাম-সমগ্র' নাম হলে

অসংখ্যজন কৈফিয়ৎ চাইতেন, 'এতে রামায়ণ-মহাভারত নেই কেন?' (কেউ কেউ আরও জানতে চাইতেন 'আচ্ছা এতে চলন্তিকাটাও থাকছে ত?')

এর উত্তর—রাজশেখর বসুর স্বনামে রচিত সব গ্রন্থ বাদ দিয়ে শুধু 'পরশুরাম' নামে লেখা যাবতীয় রচনা নিয়েই—যা শুধুই গল্প—এই 'সমগ্র'। (আমার শৈশবে অনেকবার বলতে শুনেছি—'আমি যখন ঠাট্টা করে কিছু লিখি তখন 'পরশুরাম' বলে লিখি; আর যখন 'গম্ভীর' হয়ে লিখি তখন নিজের নামে লিখি।')

কিন্তু তাহলে 'কবিতা' কোথায় যাবে? সেতো সবই স্বনামে লেখা। তবে 'প্রবন্ধ-সংগ্রহ' বা রামায়ণ-মহাভারত, এমনকি 'চলন্তিকা'-র সঙ্গেও কবিতা দেওয়া যায় না। বরং কবিতা গল্পেরই সমগোত্রীয়। তাই গল্প-সমগ্রেই স্থান পেল কবিতা।

গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম একমাত্র 'রবীন্দ্রকাব্যবিচার' প্রবন্ধ। রবীন্দ্রজীবনের শেষ সতের বছর (১৯২৪-৪১) তাঁর একান্ত স্নেহধন্য রাজশেখরের জীবনের এটি সর্বশেষ রচনা। এ এক অদ্ভুত সমাপতন। রবীন্দ্র-শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে এই প্রবন্ধ লেখার আরম্ভ ১৭-৪-৬০। অসুস্থ রাজশেখর এটি শেষ করেন ২৬-৪-৬০এ। পরদিন বুধবার, ২৭-৪ সকালে একটি অসমাপ্ত 'ফেআর কপি'ও করে রাখেন। তার কয়েক-ঘণ্টা পরেই নিঃশব্দ মৃত্যু। মৃত্যুর কিছু আগে এই শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলির সংযোজন—গুরুত্ব প্রশ্নাতীত। রাজশেখর বসুর প্রবাদ হয়ে যাওয়া হস্তাক্ষর, জীবনের শেষ দিনে—যতই খারাপ হয়ে যাক।

* * *

শেষে সম্পাদকের 'কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন' দস্তুর। কিন্তু আমি নিরুপায়, আমি কারুর কাছে কোনো সাহায্য পাইনি, বাধাও পাইনি—তাই কৃতজ্ঞতা বা হিংসা প্রকাশের কোনো অবকাশ নেই; স্তুতি বা নিন্দা দুটোতেই আমার সমান অধিকার। ব্যতিক্রম অবশ্য একমাত্র শ্রীসুপ্রিয় সরকার। তাঁর নিরন্তর তাগিদের ফলেই এই বিশাল কাজ সম্ভব হল।

এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের কথা এই সূত্রে বারবার মনে পড়ছে। সৈয়দ মুজতবা আলী। যিনি পরশুরামকে বলেছিলেন 'আপনার সমস্ত পাণ্ডুলিপি যদি হারিয়ে যায় আমাকে বলবেন, আমি স্মৃতি থেকে সমস্ত লিখে দোব।' পরশুরামের মৃত্যুর পরই আমাকে লিখেছিলেন—'হঠাৎ যেন চোখের সামনে একটা বিরাট সমুদ্র শুকিয়ে গেল।' এই দিয়ে আরম্ভ চিঠিটির শেষ—'আমি পৃথিবীর কোনো সাহিত্য আমার পড়া থেকে বড় একটা বাদ দিইনি। রাজশেখরবাবু যে কোনো সাহিত্যে পদার্পণ করলে সে সাহিত্য ধন্য হত। একথা বলার অধিকার আমার আছে।"

এবং আরও পরে মুজতবা আলী বলেছিলেন, 'রাজশেখর বাবুর গ্রন্থাবলী প্রকাশ হলে যেন আমি ছাড়া আর কেউ তা সম্পাদনা না করে।'

হয়ত তা দুই জ্যোতিষ্কের মহাকাশ সম্মিলন হত। আজ তাঁরা কতদূরে। সত্যি সত্যিই 'উজ্জ্বল মহাকাশের বিপুল পরিসীমায়' নক্ষত্রে নক্ষত্রে মহাসম্মিলনে ব্যস্ত।

তাঁদের সকলের ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

দীপংকর বসু

গড্ডলিকা

বইখানির নাম "গড্ডলিকা প্রবাহ।" ভয় ছিল পাছে নামের সঙ্গে বইয়ের আত্মপরিচয়ের মিল থাকে, কেননা সাহিত্যে গড্ডলিকা প্রবাহের অন্ত নাই। কিন্তু সহসা ইহার অসামান্যতা দেখিয়া চমক লাগিল। চমক লাগিবার হেতু এই যে, এমন একখানি বই হাতে আসিলে মনে হয় লেখকের সঙ্গে দীর্ঘকালের পরিচয় থাকা উচিত ছিল। সকালে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া যদি দ্বারের কাছে দেখি একটা ইঁদুরের ঢিবি আশ্চর্য ঠেকে না, কিন্তু যদি দেখি মস্ত একটা বট গাছ তবে সেটাকে কি সহসাই ভাবিয়া উঠা যায় না। লেখক পরশুরাম ছদ্মনামের পিছনে গা ঢাকা দিয়াছেন। ভাবিয়া দেখিলাম, চেনা লোক বলিয়া মনে হইল না, কেননা লেখাটার উপর কোনো চেনা হাতের ছাপ পড়ে নাই। নূতন মানুষ বটে সন্দেহ নাই কিন্তু পাকা হাত।

পিতৃদত্ত নামের উপর তর্ক চলে না কিন্তু স্বকৃত নামের যোগ্যতা বিচার করিবার অধিকার সমালোচকের আছে। পরশু অস্ত্রটা রূপধ্বংসকারীর, তাহা রূপসৃষ্টিকারীর নহে। পরশুরাম নামটা শুনিয়া পাঠকের সন্দেহ হইতে পারে যে লেখক বুঝি কোমর বাঁধিয়া ধ্বংস করিবার কাজে প্রবৃত্ত। কথাটা একেবারেই সত্য নহে। বইখানি চরিত্র চিত্রশালা। মূর্তিকারের ঘরে ঢুকিলে পাথর ভাঙার আওয়াজ শুনিয়া যদি মনে করি ভাঙাটাই তার কাজ তবে [illegible] সে ভুলটা ছেলেমানুষের মত হয়, — ঠিকভাবে দেখিলে বুঝা যায়, গড়িয়া তোলাই তাহার ব্যবসা। মানুষের অবুদ্ধি বা দুর্বুদ্ধিকে লেখক তাঁহার রচনায় আঘাত করিয়াছেন কিনা সেটা তো তেমন করিয়া আমার নজরে পড়ে নাই। আমি দেখিলাম তিনি মূর্তির পর মূর্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন। এমন করিয়া গড়িয়াছেন যে, মনে হইল ইহাদিগকে চিরকাল জানি। এমন কি, তাঁর ভূশণ্ডীর মাঠের ভূতপ্রেতগুলোর ঠিকানা যেন আমার [illegible] জানা; [illegible] এমন কি, যে ষাঁড়টা কাবুলিওয়ালার ডোরা চাদর ও তাহার

দশটাকার নোটগুলো চিবাইয়া খাইয়াছে সেটাকে আমারই গাধাদের স্বভাবই গোলাপ সমেত কাঁটাসুদ্ধ খাইতে দেখিয়াছি বলিয়া স্পষ্ট মনে পড়িতেছে। লেখক বোধ করি আধুনিক [redacted] ক্ষুদ্র [redacted] দিকে নিজেকে বীরপুরুষের দলে চালাইয়া দিবার লোভ সামলাইতে পারেন নাই কিন্তু আমরা তাঁহাকে রসস্রষ্টার দলেই দাবী করি। ইহাতে বর্তমানে যদি তাঁহার কিছু লোকসান হয় সুদীর্ঘ ভাবী কালে তাহা পূর্ণ হইয়াও উদ্বৃত্ত থাকিবে।

লেখার দিক হইতে বইখানি আমার কাছে বিস্ময়কর, ইহাতে আরো বিস্ময়ের বিষয় আছে সে যতীন্দ্রকুমার সেনের চিত্র। লেখনীর সঙ্গে তুলিকার কী চমৎকার জোড় মিলিয়াছে, লেখার ধারা রেখার ধারা সমান তালে চলে, কেহ কাহারো চেয়ে খাটো নহে। চরিত্রগুলো ডাইনে বাঁয়ে এমন করিয়া ধরা পড়িয়াছে যে, তাহাদের আর পালাইবার ফাঁক নাই।

গ্রন্থ সমালোচনার দাবী আমার কাছে প্রায় আসে। রক্ষা করিতে পারি না। লেখা আমার পছন্দ হয় না বলিয়া নয়, কর্মবিভ্রাটের পাকে পাছে জড়িয়া যায় এইভয়ে। [redacted] আজ ঝোঁকের মাথায় নিয়ম ভঙ্গ করিয়া ভীত হইলাম। ভূতগ্রস্তীর মতো এবার আমার যখন গতি হইবে তখন [redacted] সঙ্গে আমার কী ভাবের বোঝাপড়া ঘটিবে [redacted] পরশুরামের উপর তাহার রিপোর্টের ভার রহিল কিন্তু [redacted] যতীন্দ্রকুমারের [redacted] দরবার [redacted] এইযে আমার প্রেতশরীরের [redacted] প্রতিকৃতির প্রতি মনিবের সম্বন্ধে কঠিন ব্যবহার করিবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড



মাঘ মাস ১৩২৬ সাল। এই মাত্র আরমানী গির্জার ঘড়িতে বেলা এগারটা বাজিয়াছে। শ্যামবাবু চামড়ার ব্যাগ হাতে ঝুলাইয়া জুডাস লেনের একটি তেতলা বাড়িতে প্রবেশ করিলেন। বাড়িটি বহু পুরাতন, ক্রমাগত চুন ও রঙের প্রলেপে লোলচর্ম কলিপত-কেশ বৃদ্ধের দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। নীচের তলায় অন্ধকারময় মালের গুদাম। উপরতলার সম্মুখভাগে অনেকগুলি ব্যবসায়ীর আপিস, পশ্চাতে বিভিন্ন জাতীয় কয়েকটি পরিবার পৃথক পৃথক অংশে বাস করেন। প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখেই তেতলা পর্যন্ত বিস্তৃত কাঠের সিঁড়ি। সিঁড়ির পাশের দেওয়াল আগাগোড়া তাম্বুলরাগচর্চিত—যদিও নিষেধের নোটিশ লম্বিত আছে। কতিপয় নেংটে ইঁদুর ও আরসোলা পরস্পর অহিংসভাবে স্বচ্ছন্দে ইতস্তত বিচরণ করিতেছে। ইহারা আশ্রমমৃগের ন্যায় নিঃশঙ্ক, সিঁড়ির যাত্রিগণকে গ্রাহ্য করে না। অন্তরালবর্তী সিন্ধী-পরিবারের রান্নাঘর হইতে নির্গত হিঙের তীব্র গন্ধের সহিত নরদমার গন্ধ মিলিত হইয়া সমস্ত স্থান আমোদিত করিয়াছে। আপিস-সমূহের মালিকগণ তুচ্ছ বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকিয়া কেনা-বেচা তেজি-মন্দি আদায়-উসুল ইত্যাদি মহৎ ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া দিন যাপন করিতেছেন।

শ্যামবাবু তেতলায় উঠিয়া একটি ঘরের তালা খুলিলেন। ঘরের দরজার পাশে কাষ্ঠফলকে লেখা আছে—ব্রহ্মচারী অ্যান্ড ব্রাদার-ইন-ল, জেনার্যাল মার্চেণ্টস। এই কারবারের স্বত্বাধিকারী স্বয়ং শ্যামবাবু (শ্যামলাল গাংগুলী) এবং তাঁহার শ্যালক বিপিন চৌধুরী, বি. এস-সি। ঘরে কয়েকটি পুরাতন টেবিল, চেয়ার, আলমারি, প্রভৃতি আপিস-সরঞ্জাম। টেবিলের উপর নানাপ্রকার খাতা, বিতরণের জন্য ছাপানো বিজ্ঞাপনের স্তূপ, একটি পুরাতন থ্যাকার্স ডিরেক্টরি, একখণ্ড ইণ্ডিয়ান কম্পানিজ অ্যাক্ট, কয়েকটি বিভিন্ন কম্পানির নিয়মাবলী বা articles, এবং অন্যবিধ কাগজপত্র। দেওয়ালে সংলগ্ন তাকের উপর কতকগুলি ধূলিধূসর কাগজমোড়া শিশি এবং শূন্যগর্ভ মাদুলি। এককালে শ্যামবাবু পেটেণ্ট ও স্বপ্নাদ্য ঔষধের কারবার করিতেন, এগুলি তাহারই নিদর্শন।

শ্যামবাবুর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, গাঢ় শ্যামবর্ণ, কাঁচা-পাকা দাড়ি, আকণ্ঠলম্বিত কেশ, স্থূল লোমশ বপু। অল্পবয়স হইতেই তাঁহার স্বাধীন ব্যবসায়ে ঝোঁক, কিন্তু এ পর্যন্ত নানাপ্রকার কারবার করিয়াও বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। ই. বি. রেলওয়ে অডিট আপিসের চাকরিই তাঁহার জীবিকা-নির্বাহের প্রধান উপায়। দেশে কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি এবং একটি জীর্ণ কালীমন্দির আছে, কিন্তু তাহার আয় সামান্য। চাকরির অবকাশে ব্যবসায়ের চেষ্টা করেন—এ বিষয়ে শ্যালক বিপিনই তাঁহার প্রধান সহায়। সন্তানাদি নাই, কলিকাতার বাসায় পত্নী এবং শ্যালক সহ বাস করেন। ব্যবসায়ের কিছু উন্নতি হইলেই চাকরি ছাড়িয়া দিবেন, এইরূপ সংকল্প আছে। সম্প্রতি ছয় মাসের ছুটি লইয়া নূতন উদ্যমে ব্রহ্মচারী অ্যান্ড ব্রাদার-ইন-ল নামে আপিস প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

শ্যামবাবু ধর্মভীরু লোক, পঞ্জিকা দেখিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন এবং অবসর-মত তান্ত্রিক সাধনা করিয়া থাকেন। বৃথা—অর্থাৎ ক্ষুধা না থাকিলে—মাংসভোজন, এবং অকারণে কারণ পান করেন না। কোন্ সন্ন্যাসী সোনা করিতে পারে, কাহার নিকট দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ বা একমুখী রুদ্রাক্ষ আছে, কে পারদ ভস্ম করিতে জানে, এই সকল সন্ধান প্রায়ই লইয়া থাকেন। কয়েক মাস হইতে বাটীতে গৈরিক বাস পরিধান করিতেছেন এবং কতকগুলি অনুরক্ত শিষ্যও সংগ্রহ করিয়াছেন। শ্যামবাবু আজকাল মধ্যে মধ্যে নিজেকে 'শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী' আখ্যা দিয়া থাকেন, এবং অচিরে এই নামে সর্বত্র পরিচিত হইবেন এরূপ আশা করেন।

শ্যামবাবু তাঁহার আপিস-ঘরে প্রবেশ করিয়া একটি সার্ধ-ত্রিপাদ ইজিচেয়ারে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ডাকিলেন—'বাঞ্ছা, ওরে বাঞ্ছা।' বাঞ্ছা শ্যামবাবুর আপিসের বেয়ারা—এতক্ষণ পাশের গলিতে টুলে বসিয়া ঢুলিতেছিল—প্রভুর ডাকে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিল। শ্যামবাবু বলিলেন—'গঙ্গাজলের বোতলটা আন, আর খাতাপত্রগুলো একটু ঝেড়ে-মুছে রাখ, বা ধুলো হয়েছে।' বাঞ্ছা একটা তামার কুপি আনিয়া দিল। শ্যামবাবু তাহা হইতে কিঞ্চিৎ গঙ্গোদক লইয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক গৃহমধ্যে ছিটাইয়া দিলেন। তার পর টেবিলের দেরাজ হইতে একটি সিন্দুর-চর্চিত রবার স্ট্যাম্পের সাহায্যে ১০৮ বার দুর্গানাম লিখিলেন। স্ট্যাম্পে ১২ লাইন 'শ্রীশ্রীদুর্গা' খোদিত আছে, সুতরাং ৯ বার ছাপিলেই কার্যোদ্ধার হয়। এই শ্রমহারক যন্ত্রটির আবিষ্কর্তা শ্রীমান বিপিন। তিনি ইহার নাম দিয়াছেন—'দি অটোম্যাটিক শ্রীদুর্গাগ্রাফ' এবং পেটেণ্ট লইবার চেষ্টায় আছেন।

উক্তপ্রকার নিত্যক্রিয়া সমাধা করিয়া শ্যামবাবু প্রসন্নচিত্তে ব্যাগ হইতে ছাপাখানার একটি ভিজা প্রুফ বাহির করিয়া লইয়া সংশোধন করিত লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে জুতার মশমশ শব্দ করিতে করিতে অটলবাবু ঘরে আসিয়া বলিলেন—'এই যে শ্যাম-দা, অনেকক্ষণ এসেছেন

ব্ঝি? বড় দেরি হয়ে গেল, কিছ্ মনে করবেন না—হাইকোর্টে একটা মোশন ছিল। ব্রাদার-ইন-ল কোথায়?'

শ্যামবাব্। বিপিন গেছে বাগবাজারে তিনকড়ি বাঁড়ুজ্যের কাছে। আজ পাকা কথা নিয়ে আসবে। এই এল ব'লে।

অটলবাব্ চাপকান-চোগা-ধারী সদ্যোজাত অ্যার্টর্নি, পিতার আপিসে সম্প্রতি জ্নিয়ার পার্টনার-র্পে যোগ দিয়াছেন। গৌরবর্ণ, স্প্র্ষ, বিপিনের বাল্যবন্ধ্। বয়সে নবীন হইলেও চাতুর্যে পরিপক্ক। জিজ্ঞাসা করিলেন—'ব্ড়ো রাজী হ'ল? আচ্ছা, ওকে ধরলেন কি ক'রে?'

শ্যাম। আরে তিনকড়িবাব্ হলেন গে শরতের খ্ড়শ্বশ্র। বিপিনের মাস্তুতো ভাই শরৎ। ঐ শরতের সঙ্গে গিয়ে তিনকড়িবাব্কে ধরি। সহজে কী রাজী হয়? ব্ড়ো যেমন কঞ্জ্স তেমনি সন্দিগ্ধ। বলে—আমি হল্ম রায়সাহেব, রিটায়ার্ড ডেপ্টি, গভরমেণ্টর কাছে কত মান। কোম্পানির ডিরেক্টর হয়ে কি শেষে পেনশন খোয়াব? তখন নজির দিয়ে বোঝাল্ম—কত রিটায়ার্ড বড় বড় অফিসার তো ডিরেক্টরি করছেন, আপনার কিসের ভয়? শেষে যখন শ্নলে যে, প্রতি মিটিংএ ৩২ টাকা ফী পাবে, তখন একট্ ভিজল।

অটল। কত টাকার শেয়ার নেবে।

শ্যাম। তাতে বড় হ্শিয়ার। বলে—তোমার ব্রহ্মচারী কোম্পানি যে ল্ট করবে না, তার জামিন কে? তোমরা শালা-ভগ্নীপতি মিলে ম্যানেজিং এজেণ্ট হয়ে কোম্পানিকে ফেল করলে আমার টাকা কোথায় থাকবে? বলল্ম—মশায় আপনার মত বিচক্ষণ সাবধানী ডিরেক্টর থাকতে কার সাধ্য ল্ঠ করে। খরচপত্র তো আপনার চোখের সামনেই হবে। ফেল হ'তে দেবেন কেন? মন্দটা যেমন ভাবছেন, ভালর দিকটাও দেখ্ন। কি রকম লাভের ব্যবসা! খ্ব কম করেও যদি ৫০ পারসেণ্ট ডিভিডেণ্ড পান তবে দ্-বছরের মধ্যেই তো আপনার ঘরের টাকা ঘরে ফিরে এল। শেষে অনেক তর্কাতর্কির পর বললে—আচ্ছা, আমি শেয়ার নেব, কিন্তু বেশী নয়, ডিরেক্টর হ'তে হ'লে যে টাকা দেওয়া দরকার তার বেশী নেব না। আজ মত স্থির ক'রে জানাবেন, তাই বিপিনকে পাঠিয়েছি।

অটল। অমন খ্তখ্তে লোক নিয়ে ভাল করলেন না শ্যাম-দা। আচ্ছা মহারাজাকে ধরলেন না কেন?

শ্যাম। মহারাজাকে ধরতে বড়-শিকারী চাই, তোমার আমার কর্ম নয়। তা ছাড়া পাঁচ ভ্তে তাঁকে শ্ষে নিয়েছে, কিছ্ আর পদার্থ রাখে নি।

অটল। খোট্টাটি ঠিক আছে তো? আসবে কখন?

শ্যাম। সে ঠিক আছে, এই রকম দাঁও মারতেই তো সে চায়। এতক্ষণ তার আসা উচিত ছিল। প্রসপেক্টসটা তোমাদের শ্নিয়ে আজই ছাপাতে দিতে চাই। তিনকড়িবাব্কে আসতে বলেছিল্ম, বাতে ভ্গছেন, আসতে পারবেন না জানিয়েছেন।

'রাম রাম বাব্সাহেব'

আগন্তুক মধ্যবয়স্ক, শ্যামবর্ণ, পরিধানে সাদা ধ্তি, লম্বা কাল বনাতের কোট, পায়ে বার্নিশ-করা জ্তা, মাথায় হলদে রঙের ভাঁজ-করা মলমলের পাগড়ি, হাতে অনেকগ্লি আংটি, কানে পান্নার মাকড়ি, কপালে ফোঁটা।

শ্যামবাব্ বলিলেন—'আস্ন, আস্ন—ওরে বাঞ্ছা, আর একটা চেয়ার দে। এই ইনি

হচ্ছেন অটলবাবু, আমাদের সলিসিটর দত্ত কোম্পানির পার্টনার। আর ইনি হলেন আমার বিশেষ বন্ধু—বাবু গণ্ডেরিরাম বাটপারিয়া।'

গণ্ডেরি। নোমোস্কার, আপনের নাম শুনা আছে, জান-পহচান হয়ে বড় খুশ হ'ল।

অটল। নমস্কার, এই আপনার জন্যই আমরা ব'সে আছি। আপনার মত লোক যখন আমাদের সহায়, তখন কোম্পানির আর ভাবনা কি?

গণ্ডেরি। হেঁ হেঁ, সোকোলি ভগবানের ইিস্থা। হামি একেলা কি করতে পারি? কুছু না।



রাম রাম বাবুসাহেব

শ্যাম। ঠিক, ঠিক। যা করেন মা তারা দীনতারিণী। দেখ অটল, গণ্ডেরিবাবু যে কেবল পাকা ব্যবসাদার তা মনে ক'রো না। ইংরেজী ভাল না জানলেও ইনি বেশ শিক্ষিত লোক, আর শাস্ত্রেও বেশ দখল আছে।

অটল। বাঃ, আপনার মত লোকের সঙ্গে আলাপ হওয়ায় বড় সুখী হলুম। আচ্ছা মশায়, আপনি এমন সুন্দর বাংলা বলতে শিখলেন কি ক'রে?

গণ্ডেরি। বহুত বাঙ্গালীর সঙে হামি মিলা মিশা করি। বাংলা কিতাব ভি অনেহেক পড়েছি। বঙ্কিমচন্দ্, রবীন্দরনাথ, আউর ভি সব।

এমন সময় বিপিনবাবু আসিয়া পৌঁছিলেন। ইনি একটু সাহেবী মেজাজের লোক, এককালে বিলাত যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরিধানে সাদা প্যাণ্ট, কাল কোট, লাল নেকটাই, হাতে সবুজ ফেল্ট হ্যাট। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, ক্ষীণকায়, গোঁফের দুই প্রান্ত কামানো। শ্যামবাবু উদ্‌গ্রীব হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি হ'ল?'

বিপিন। ডিরেক্টর হবেন বলেছেন, কিন্তু মাত্র দু-হাজার টাকার শেয়ার নেবেন। তোমাকে অটলকে আমাকে পরশু সকালে ভাত খাবার নিমন্ত্রণ করেছেন। এই নাও চিঠি।

অটল। তিনকড়িবাবু হঠাৎ এত সদয় যে?

শ্যাম। বুঝলুম না। বোধ হয় ফেলো ডিরেক্টরদের একবার বাজিয়ে যাচাই ক'রে নিতে চান।

অটল। যাক, এবার কাজ আরম্ভ করুন। আমি মেমোরাণ্ডম আর আর্টিকল্‌সের মুসাবিদা এনেছি। শ্যাম-দা, প্রসপেক্টসটা কি রকম লিখলেন পড়ুন।

শ্যাম। হাঁ, সকলে মন দিয়ে শোন। কিছু বদলাতে হয় তো এই বেলা। দুর্গা--দুর্গা—

জয় সিদ্ধিদাতা গণেশ

১৯১৩ সালের ৭ আইন অনুসারে রেজিস্ট্রিত

শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড

মূলধন—দশ লক্ষ টাকা, ১০৲ হিসাবে ১০০,০০০ অংশে বিভক্ত। আবেদনের সঙ্গে অংশ-পিছু ২৲ প্রদেয়। বাকী টাকা চার কিস্তিতে তিন মাসের নোটিসে প্রয়োজন-মত দিতে হইবে।

অনুষ্ঠানপত্র

ধর্মই হিন্দুগণের প্রাণস্বরূপ। ধর্মকে বাদ দিয়া এ জাতির কোনও কর্ম সম্পন্ন হয় না। অনেকে বলেন—ধর্মের ফল পরলোকে লভ্য। ইহা আংশিক সত্য মাত্র। বস্তুত ধর্মবৃত্তির উপযুক্ত প্রয়োগে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয়বিধ উপকার হইতে পারে। এতদর্থে সদ্য সদ্য চতুর্বর্গ লাভের উপায়স্বরূপ এই বিরাট ব্যাপারে দেশবাসীকে আহ্বান করা হইতেছে।

ভারতবর্ষের বিখ্যাত দেবমন্দিরগুলির কিরূপ বিপুল আয় তাহা সাধারণে জ্ঞাত নহেন। রিপোর্ট হইতে জানা গিয়াছে যে বঙ্গদেশের একটি দেবমন্দিরের দৈনিক যাত্রিসংখ্যা গড়ে ১৫ হাজার। যদি লোক-পিছু চার আনা মাত্র আয় ধরা যায়, তাহা হইলে বাৎসরিক আয় প্রায় সাড়ে তের লক্ষ টাকা দাঁড়ায়। খরচ যতই হউক যথেষ্ট টাকা উদ্‌বৃত্ত থাকে। কিন্তু সাধারণে এই লাভের অংশ হইতে বঞ্চিত।

দেশের এই বৃহৎ অভাব দূরীকরণার্থে 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' নামে একটি জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানি স্থাপিত হইতেছে। ধর্মপ্রাণ শেয়ারহোল্ডারগণের অর্থে একটি মহান্‌ তীর্থ-ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হইবে, জাগ্রত দেবী সমন্বিত সুবৃহৎ মন্দির নির্মিত হইবে। উপযুক্ত ম্যানেজিং এজেণ্টের হস্তে কার্য-নির্বাহের ভার ন্যস্ত হইয়াছে। কোনও প্রকার অপব্যয়ের সম্ভাবনা নাই। শেয়ারহোল্ডারগণ আশাতীত দক্ষিণা বা ডিভিডেণ্ড পাইবেন এবং একাধারে ধর্ম অর্থ মোক্ষ লাভ করিয়া ধন্য হইবেন।

ডিরেক্টরগণ।—(১) অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ বিচক্ষণ ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট রায়সায়েব শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। (২) বিখ্যাত ব্যবসাদার ও ক্রোরপতি শ্রীযুক্ত গণ্ডেরিরাম বাটপারিয়া। (৩) সলিসিটর্স দত্ত অ্যান্ড কোম্পানির অংশীদার শ্রীযুক্ত অটলবিহারী দত্ত, M. A., B. L. (৪) বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মিস্টার বি. সি. চৌধুরী, B. Sc., A. S. S (U.S.A.) (৫) কালীপদাশ্রিত সাধক ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ শ্যামানন্দ (ex-officio)।

অটলবাবু বাধা দিয়া বলিলেন—'বিপিন আবার নতুন টাইটেল পেল কবে?'

শ্যাম। আর বল কেন। পঞ্চাশ টাকা খরচ ক'রে আমেরিকা না কামস্কাটকা কোথা থেকে তিনটে হরফ আনিয়েছে।

বিপিন। বা, আমার কোয়ালিফিকেশন না জেনেই বুঝি তারা শুধু শুধু একটা ডিগ্রী দিলে? ডিরেক্টর হ'তে গেলে একটা পদবী থাকা ভাল নয়?

গণ্ডেরি। ঠিক বাত। ভেক বিনা ভিখ মিলে না। শ্যামবাবু, আপনিও এখন্‌সে ধোতি-উতি ছোড়ে লঙোটি পিনহুন।

শ্যাম। আমি তো আর নাগা সন্ন্যাসী নই। আমি হলুম শক্তিমন্ত্রের সাধক, পরিধেয় হ'ল রক্তাম্বর। বাড়িতে তো গৈরিকই ধারণ করি। তবে আপিসে প'রে আসি না, কারণ, ব্যাটারা সব হাঁ করে চেয়ে থাকে। আর একটু লোকের চোখ-সহা হয়ে গেলে সর্বদাই গৈরিক পরব। যাক, পড়ি শোন—

মেসার্স ব্রহ্মচারী অ্যান্ড ব্রাদার-ইন-ল এই কোম্পানির ম্যানেজিং এজেন্সি লইতে স্বীকৃত হইয়াছেন—ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। তাঁহারা লাভের উপর শতকরা দুই টাকা মাত্র কমিশন লইবেন, এবং যতদিন না—

অটলবাবু বলিলেন—'কমিশনের রেট অত কম ধরলেন কেন? দশ পার্সেণ্ট অনায়াসে ফেলতে পারেন।'

গণ্ডেরি। কুছ দরকার নেই! শ্যামবাবুর পরবস্তি অপ্‌নেসে হোয়ে যাবে। কমিশনের ইরাদা থোড়াই করেন।

এবং যতদিন না কমিশনে মাসিক ১০০০, টাকা পোষায়, ততদিন শেষোক্ত টাকা অ্যালাওয়েন্স রূপে পাইবেন।

গণ্ডেরি। শুনেন অটলবাবু, শুনেন। আপনি শ্যামবাবুকে কী শিখলাবেন?

হুগলী জেলার অন্তঃপাতী গোবিন্দপুর গ্রামে ৺সিদ্ধেশ্বরী দেবী বহু শতাব্দী যাবৎ প্রতিষ্ঠিত আছেন। দেবীমন্দির ও তৎসংলগ্ন দেবত্র সম্পত্তির স্বত্বাধিকারিণী শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী সম্প্রতি স্বপ্নাদেশ পাইয়াছেন যে উক্ত গোবিন্দপুর গ্রামে অধুনা সর্ব-পীঠের সমন্বয় হইয়াছে এবং মাতা তাঁহার মাহাত্ম্যের উপযোগী সুবৃহৎ মন্দিরে বাস করিতে ইচ্ছা করেন। শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী অবলা বিধায় এবং উক্ত দৈবাদেশ স্বয়ং পালন করিতে অপারগ বিধায়, উক্ত দেবত্র সম্পত্তি মায় মন্দির বিগ্রহ জমি আওলাত আদি এই লিমিটেড কোম্পানিকে সমর্পণ করিতেছেন।

অটল। নিস্তারিণী দেবী আবার কোথা থেকে এলেন? সম্পত্তি তো আপনার ব'লেই জানতুম।

শ্যাম। উনি আমার স্ত্রী। সেদিন তাঁর নামেই সব লেখাপড়া ক'রে দিয়েছি। আমি এসব বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত থাকতে চাই না।

গণ্ডেরি। ভালা বন্দোবস্ত্ কিয়েছেন। আপনেকো কোই দুস্বে না। নিস্তাণী দেবীকো কোন্ পহ্চানে। দাম কেতো লিচ্ছেন?

অতঃপর তীর্থপ্রতিষ্ঠা, মন্দিরনির্মাণ, দেবসেবাদি কোম্পানি কর্তৃক সম্পন্ন হইবে এবং এতদর্থে কোম্পানি মাত্র ১৫,০০০৲ টাকা পণে সমস্ত সম্পত্তি খরিদার্থে বায়না করিয়াছেন।

গণ্ডেরি। হম্দ্ কিয়া শ্যামবাবু! জঙ্গল কি ভিতর পুরানা মন্দিল, উস্মে দো-চার শও ছুছুন্দর, ছটাক ভর জমীন, উস্পর দো-চার বাঁশ ঝাড়—বস্, ইসিকা দাম পন্দ্র হজার!

শ্যাম। কেন, অন্যায়টা কি হ'ল? স্বপ্নাদেশ, একান্ন পীঠ এক ঠাঁই; জাগ্রত দেবী—এসব বুঝি কিছু নয়? গুড-উইল হিসেবে পনের হাজার টাকা খুবই কম।

গণ্ডেরি। আচ্ছা। যদি কোই শেয়ারহোল্ডার হাইকোর্ট মে দরখাস্ত পেশ করে—স্বপন-উপন সব ঝুট, ছক্লায়কে রুপেয়া লিয়া—তব্?

অটল। সে একটা কথা বটে, কিন্তু এই সব আধিদৈবিক ব্যাপার বোধ হয় অরিজিনাল সাইডের জুরিসডিক্শনে পড়ে না। আইন বলে—caveat emptor, অর্থাৎ ক্রেতা সাবধান! সম্পত্তি কেনবার সময় যাচাই কর নি কেন? যা হোক, একবার expert opinion নেব।

শীঘ্রই নূতন দেবালয় আরম্ভ হইবে। তৎসংলগ্ন প্রশস্ত নাটমন্দির, নহবতখানা, ভোগশালা, ভাণ্ডার প্রভৃতি আনুষঙ্গিক গৃহাদিও থাকিবে। আপাততঃ দশ হাজার যাত্রীর উপযুক্ত অতিথিশালা নির্মিত হইবে। শেয়ারহোল্ডারগণ বিনা খরচায় সেখানে সপরিবারে বাস করিতে পারিবেন। হাট বাজার যাত্রা থিয়েটার বায়োস্কোপ ও অন্যান্য আমোদ-প্রমোদের আয়োজন যথেষ্ট থাকিবে। যাঁহারা দৈবাদেশ বা ঔষধ-প্রাপ্তির জন্য হত্যা দিবেন তাঁহাদের জন্য বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা থাকিবে। মোট কথা, তীর্থযাত্রী আকর্ষণ করিবার সর্বপ্রকার উপায়ই অবলম্বিত হইবে। স্বয়ং শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী সেবার ভার লইবেন।

যাত্রিগণের নিকট হইতে যে দর্শনী ও প্রণামী আদায় হইবে, তাহা ভিন্ন আরও নানা উপায়ে অর্থাগম হইবে। দোকান হাট বাজার অতিথিশালা মহাপ্রসাদ বিক্রয় প্রভৃতি হইতে প্রচুর আয় হইবে। এতদ্ভিন্ন by-product recoveryর ব্যবস্থা থাকিবে। সেবার ফুল হইতে সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত হইবে এবং প্রসাদী বিল্বপত্র মাদুলীতে ভরিয়া বিক্রীত হইবে। চরণামৃতও বোতলে প্যাক করা হইবে। বলির জন্য নিহত ছাগলসমূহের চর্ম ট্যান করিয়া উৎকৃষ্ট কিড-স্কিন প্রস্তুত হইবে এবং বহুমূল্যে বিলাতে চালান যাইবে। হাড় হইতে বোতাম হইবে। কিছুই ফেলা যাইবে না।

গণ্ডেরি। বকাড় মারবেন? হামি ইস্মে নেহি, রামজী কিরিয়া। হামার নাম কাটিয়ে দিন।

শ্যাম। আপনি তো আর নিজে বলি দিচ্ছেন না। আচ্ছা, না হয় কুমড়ো-বলির ব্যবস্থা করা যাবে।



ঐসী গতি সন্‌সারমে

অটল। কুমড়োর চামড়া তো ট্যান হবে না। আয় ক'মে যাবে। কিহে বৈজ্ঞানিক, কুমড়োর খোসার একটা গতি করতে পার?

বিপিন। কস্টিক পটাশ দিয়ে বয়েল করলে বোধ হয় ভেজিটেব্‌ল শু হ'তে পারে। এক্সপেরিমেন্ট ক'রে দেখব।

গণ্ডেরি। জো খুশি করো। হমার কি আছে। হামি থোড়া রোজ বাদ আপ্‌না শেয়ার বিলকুল বেচে দিব।

হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে যে কোম্পানির বাৎসরিক লাভ অন্ততঃ ১২ লক্ষ টাকা হইবে এবং অনায়াসে ১০০ পারসেণ্ট ডিভিডেণ্ট দেওয়া যাইবে। ৩০ হাজার শেয়ারের আবেদন পাইলে অ্যালটমেণ্ট হইবে। সত্বর শেয়ারের জন্য আবেদন করুন। বিলম্বে এই সুবর্ণসুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবেন।

গণ্ডেরি। লিখে লিন—ঢাই লাখ টাকার শেয়ার বিক্রি হয়ে গেছে। হামি এক লাখ লিব, বাকী দেড় লাখ শ্যামবাবু বিপিনবাবু অটলবাবু সমান হিস্‌সা লিবেন।

শ্যাম। পাগল আর কি! আমি আর বিপিন কোথা থেকে পঞ্চাশ-পঞ্চাশ হাজার বার করব? আপনারা না হয় বড়লোক আছেন।

গণ্ডেরি। হামি-শালা রুপয়া ডালবো আর তুমি লোগ মৌজ করবে? সো হোবে না। সব্‌কা ঝোঁখি লেনা পড়েগা। শ্যামবাবু মতলব সমঝ্‌লেন না? টাকা কোই দিব না। সব হাওলাতী থাকবে। মেনেজিং এজিণ্ট মহাজন হোবে।

অটল। বুঝলেন শ্যাম-দা? আমরা সকলে যেন ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌দের কাছ থেকে কর্জ ক'রে নিজের নিজের শেয়ারের টাকা কোম্পানিকে দিচ্ছি; আবার কোম্পানি ঐ টাকা ম্যানেজিং

এজেন্টস্‌দের কাছে গচ্ছিত রাখছে। গাঁট থেকে এক পয়সাও কেউ দিচ্ছেন না, টাকাটা কেবল খাতাপত্রে জমা থাকবে।

শ্যাম। তার পর তাল সামলাবে কে? কোম্পানি ফেল হলে আমি মারা যাই আর কি! বাকী কলের টাকা দেব কোথা থেকে?

গণ্ডেরি। ডরেন কেনো? শেয়ার পিছ তো অভি দো টাকা দিতে হোবে। ঢাই লাখ টাকার শেয়ারে সির্ফ পচাস হজার দেনা হোয়। প্রিমিয়ম মে সব বেচে দিব—সুবিস্তা হোয় তো আউর ভি শেয়ার ধ'রে রাখবো। বহুত মুনাফা মিলবে। চিম্‌ড়িমল ব্রোকারসে হামি বন্দোবস্ত কিয়েছি। দো চার দফে হম লোগ আপ্‌না আপ্‌নি শেয়ার লেকে খেলবো, হাঁথ বদলাবো, দাম চঢ়বে, বাজার গরম হোবে। তখন সব কোই শেয়ার মাংবে, দাম কা বিচার করবে না। কবীরজী কি বচন শুনিয়ে—

ঐসী গতি সন্‌সারমে যো গাড়র কি ঠাট
এক পড়া যব গাঢ়মে সবৈ যাত তেঁহি বাট॥

মানি হচ্ছে—সন্‌সারের লোক সব যেন ভেড়ার পাল। এক ভেড়া যদি খান্দেমে গির পড়ে তো সব কোই উঁসিমে ঘুসে।

শ্যামবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—'তারা ব্রহ্মময়ী, তুমিই জান। আমি তো নিমিত্ত মাত্র। তোমার কাজ তুমিই উদ্ধার ক'রে দাও মা—অধম সন্তানকে যেন মেরো না।'

গণ্ডেরি। শ্যামবাবু, মন্দিল-উন্দিলকা কোম্পানি যো কর্‌না হ্যায় কিজিয়ে। উস্‌কি সাথ ঘই-এর কারবার ভি লাগায় দিন। টাকায় টাকা লাভ।

অটল। ঘই কি চিজ?

গণ্ডেরি। ঘই জানেন না? ঘিউ হচ্ছে আস্‌লি চিজ—যো গায় ভঁইস বকড়িকা দুধসে বনে। আউর নক্‌লি যো হ্যায় সো ঘই কহ্‌লাতা। চর্বি, চীনা-বাদাম তল ওগায়রহ্‌ মিলা কর্‌ বনায়া যাতা। পর্‌ সাল হামি ঘই-এর কামে পাঁচশ হজার লাগাই, সাঢ়ে চৌবিশ হজার মুনাফা মিলে।

অটল। উঃ বিস্তর সাপ মেরেছিলেন বলুন!

গণ্ডেরি। আরে সাঁপ কাঁহাসে মিল্‌বে? উ সব ঝুট বাত।

অটল। আচ্ছা গণ্ডারজী—

গণ্ডেরি। গণ্ডার নেহি, গণ্ডেরি।

অটল। হাঁ, হাঁ, গণ্ডেরিজী। বেগ ইওর পার্ডন। আচ্ছা, আপনি তো নিরামিষ খান, ফোঁটা কাটেন, ভজন-পুজনও করেন।

গণ্ডেরি। কেনো করবো না? হামি হর্‌ রোজ গীতা আউর রামচরিতমানস পঢ়ি, রামভজন ভি করি।

অটল। তবে অমন পাপের ব্যবসাটা করলেন কি ব'লে?

গণ্ডেরি। পাঁপ? হামার কেনো পাঁপ হোবে? বেবসা তো করে কাসেম আলি। হামি রহি কলকাত্তা, ঘই বনে হাথরস্‌মে। হামি ন আঁখসে দেখি, ন নাকসে শুংখি—চলমানরী কিরিয়া। হামি তো সির্ফ মহাজন আছি—রুপয়া দে কর্‌ খালাস। সুদ লি, মনাফার আধা হিস্‌সা ভি লি। যদি হামি টাকা না দি, কাসেম আলি দুসরা ধনীসে লিবে। পাঁপ হোবে তো শালা কাসেম আলিকা হোবে। হমার কি? যদি ফিন কুছ দোষ লাগে—জানে

রন্‌ছোড়জী—হ্‌মার পুন্‌ভি থোড়া-বহুত জমা আছে। একাদ্‌সী, শিউরাত, রামনওমীমে উপবাস, দান-খয়রাত ভি কুছু করি। আট আটঠো ধরমশালা বানোআয়া—লিলুয়ামে, বালিমে, শেওড়াফুলিমে—

অটল। লিলুয়ার ধর্মশালা তো আশরফিলাল ঠনঠনওয়ালা করেছে।

গণ্ডেরি। কিয়েছে তো কি হইয়েছে? সভি তো ওহি কিয়েছে। লেকিন বানিয়ে দিয়েছে কোন্‌? তদারক কোন্‌ কিয়েছে? ঠিকাদার কোন্‌ লাগিয়েছে? সব হামি। আশরফি হমার চাচেরা ভাই লাগে। হামি সলাহ্‌ দিয়েছি তব্‌ না রুপেয়া খরচ কিয়েছে!

অটল। মন্দ নয়, টাকা ঢাললে আশরফি, পুণ্য হ'ল গণ্ডেরির।

গণ্ডেরি। কেনো হোবে না? দো দো লাখ রুপেয়া হর্‌ জগেমে খরচ্‌ দিয়া। জোড়িয়ে তো কেতনা হোয়। উস পর কম্‌সে কম স'য়কড়া পাঁচ রুপেয়া দস্তুরি তো হিসাব কিজিয়ে। হাম তো বিলকুল ছোড় দিয়া। আশরফিলালকা পুন্‌ যদি সোলহ্‌ লাখকা হোয়, মেরা ভি অস্‌সি হজার মোতাবেক হোনা চাহ্‌তা!

অটল। চমৎকার ব্যবস্থা! পুণ্যেরও দেখছি দালালি পাওয়া যায়। আমাদের শ্যাম-দা গণ্ডেরি-দা যেন মানিকজোড়।

গণ্ডেরি। অটলবাবু, আপনি দো চার অংরেজী কিতাব পাঢ়িয়ে হামাকে ধরম কি শিখ্‌লাবেন? বঙ্গালী ধরম জানে না। তিস রুপেয়ার নোকরি করবে, পাঁচ পইসার হরিলুঠ দিবে। হামার জাত রুপেয়া ভি কামায় হিসাবসে, পুন্‌ ভি করে হিসাবসে। আপ্‌নেদের রবীন্দরনাথ কি লিখছেন—

বৈরাগ সাধন মুক্তি সো হমার নাহি।

হামি এখ্‌ন চলছি, রেস খেলনে। কোশিশ্‌ গেরিল ঘোড়ে পর্‌ আজ দো-চারশও লাগিয়ে দিব।

অটল। আমিও উঠি শ্যাম-দা। আর্টিকেলের মুসাবিদা রেখে যাচ্ছি, দেখে রাখবেন। প্রস্‌পেক্টস তো দিব্যি হয়েছে। একটু-আধটু বদ্‌লে দেব এখন। পরশু আবার দেখা হবে। নমস্কার।

বাগবাজারে গলির ভিতর রায়সাহেব তিনকড়িবাবুর বাড়ি। নীচের তলায় রাস্তার সম্মুখে নাতিবৃহৎ বৈঠকখানা-ঘরে গৃহকর্তা এবং নিমন্ত্রিতগণ গল্পে নিরত, অন্দর হইতে কখন ভোজনের ডাক আসিবে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছেন। আজ রবিবার, তাড়া নাই, বেলা অনেক হইয়াছে।

তিনকড়িবাবুর বয়স ষাট বৎসর, ক্ষীণ দেহ, দাড়ি কামানো। শীর্ণ গোঁফে তামাকের ধোঁয়ায় পাকা খেজুরের রং ধরিয়াছে—কথা কহিবার সময় আরসোলার দাড়ার মত নড়ে। তিনি দৈব ব্যাপারে বড় একটা বিশ্বাস করেন না। প্রথম পরিচয়ে শ্যামবাবুকে বুজরুক সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, কেবল লাভের আশায় কম্পানিতে যোগ দিয়াছেন। কিন্তু আজ কালীঘাট হইতে প্রত্যাগত সদ্যঃস্নাত শ্যামবাবুর অভিনব মূর্তি দেখিয়া কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হইয়াছেন। শ্যামবাবুর পরিধানে লাল চেলী, গেরুয়া রঙের আলোয়ান, পায়ে বাঘের চামড়ার শিং-তোলা জুতা। দাড়ি এবং চুল সাজিমাটি দ্বারা যথাসম্ভব ফাঁপানো, এবং কপালে মস্ত একটি সিন্দুরের ফোঁটা।

তিনকড়িবাবু তামাক-টানার অন্তরালে বলিতেছিলেন—'দেখুন স্বামীজী, হিসেবই হ'ল ব্যবসার সব। ডেবিট ক্রেডিট যদি ঠিক থাকে, আর ব্যালান্স যদি মেলে, তবে সে বিজনেসের কোনও ভয় নেই।'

শ্যামবাবু। আজ্ঞে, বড় যথার্থ কথা বলেছেন। সেইজন্যেই তো আমরা আপনাকে চাই। আপনাকে আমরা মধ্যে মধ্যে এসে বিরক্ত করব, হিসেব সম্বন্ধে পরামর্শ নেব—

তিনকড়ি। বিলক্ষণ, বিরক্ত হব কেন। আমি সমস্ত হিসেব ঠিক ক'রে দেব। মিটিংগুলো একটু ঘন ঘন করবেন। না হয় ডিরেক্টর্স্ ফী বাবদ কিছু বেশী খরচ হবে। দেখুন, অডিটার-ফডিটার আমি বুঝি না। আরে বাপু, নিজের জমাখরচ যদি নিজে না বুঝলি তবে বাইরের একটা অর্বাচীন ছোকরা এসে তার কি বুঝবে? ভারী আজকাল সব বুক-কীপিং শিখেছেন! সে কি জানেন—একটা গোলকধাঁধা, কেউ যাতে না বোঝে তারই চেষ্টা। আমি বুঝি—রোজ কত টাকা এল, কত খরচ হ'ল, আর আমার মজুদ রইল কত। আমি যখন আমড়াগাছি সবডিভিজনের ট্রেজারির চার্জে, তখন এক নতুন কলেজ-পাস গোঁফকামানো ডেপুটি এলেন আমার কাছে কাজ শিখতে। সে ছোকরা কিছুই বোঝে না, অথচ অহংকারে ভরা। আমার কাজে গলদ ধরবার আস্পর্ধা। শেষে লিখলুম কোল্ডহাম সাহেবকে, যে হুজুর, তোমরা রাজার জাত, দু-ঘা দাও তাও সহ্য হয়, কিন্তু দেশী ব্যাঙাচির লাথি বরদাস্ত করব না। তখন সাহেব নিজে এসে সমস্ত বুঝে নিয়ে আড়ালে ছোকরাকে ধমকালেন। আমাকে পিঠ চাপড়ে হেসে বললেন—ওয়েল তিনকড়িবাবু, তুমি হ'লে কতকালের সিনিয়র অফিসর, একজন ইয়ং চ্যাপ তোমার কদর কি বুঝবে? তার পর দিলেন আমাকে নওগাঁয়ে গাঁজা-গোলার চার্জে বদলি ক'রে। যাক সে কথা। দেখুন, আমি বড় কড়া লোক। জবরদস্ত হাকিম ব'লে আমার নাম ছিল। মন্দির টন্দির আমি বুঝি না, কিন্তু একটি আধলাও কেউ আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না। রক্ত জল করা টাকা আপনার জিম্মায় দিচ্ছি, দেখবেন যেন—

শ্যাম। সে কি কথা! আপনার টাকা আপনারই থাকবে আর শতগুণ বাড়বে। এই দেখুন না—আমি আমার যথাসর্বস্ব পৈতৃক পঞ্চাশ হাজার টাকা এতে ফেলেছি। আমি না হয় সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, অর্থে প্রয়োজন নেই, লাভ যা হবে মায়ের সেবাতেই ব্যয় করব। বিপিন আর এই অটল ভায়াও প্রত্যেকে পঞ্চাশ হাজার ফেলেছেন। গণ্ডেরি এক লাখ টাকার শেয়ার নিয়েছে। সে মহা হিসেবী লোক—লাভ নিশ্চিত না জানলে কি নিত?

তিনকড়ি। বটে, বটে? শুনে আশ্বাস হচ্ছে। আচ্ছা, একবার কোল্ডহাম সাহেবকে কনসল্ট করলে হয় না? অমন সাহেব আর হয় না।

'ঠাঁই হয়েছে'—চাকর আসিয়া খবর দিল।

'উঠতে আজ্ঞা হ'ক ব্রহ্মচারী মশায়, আসুন অটলবাবু, চল হে বিপিন।' তিনকড়িবাবু সকলকে অন্দরের বারান্দায় আনিলেন।

শ্যামবাবু বলিলেন—'করেছেন কি রায়সাহেব, এ যে রাজসূয় যজ্ঞ। কই আপনি বসলেন না!'

তিনকড়ি। বাতে ভুগছি, ভাত খাইনে দু-খানা সুজির রুটি বরাদ্দ।

শ্যাম। আমি একটি ফেৎকারিণী-তন্ত্রোক্ত কবচ পাঠিয়ে দেব, ধারণ ক'রে দেখবেন। শাক-ভাজা, কড়াইয়ের ডাল—এটা কি দিয়েছ ঠাকুর, এঁচোড়ের ঘণ্ট? বেশ, বেশ? শোধন করে নিতে হবে। সুপক্ক কদলী আর গব্যঘৃত বাড়িতে হবে কি? আয়ুর্বেদে আছে—পনসে কদলং কদলে ঘৃতম্। কদলীভক্ষণে পনসের দোষ নষ্ট হয়, আবার ঘৃতের দ্বারা কদলীর শৈত্যগুণ দূর হয়। পুঁটিমাছ ভাজা—বাঃ। রোহিতাদপি রোচকাঃ পুণ্টিকাঃ সদ্যভর্জিতাঃ। ওটা কিসের অম্বল বললে—কামরাঙা? সর্বনাশ, তুলে নিয়ে যাও। গত বৎসর শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে ঐ ফলটি

জগন্নাথ প্রভুকে দান করেছি। অম্বল জিনিসটা আমার সয়ও না—শ্লেষ্মার ধাত কি না। উস্‌প্‌, উস্‌প্‌, উস্‌প্‌। প্রাণায় আপনায় সোপানায় স্বাহা। শয়নে পদ্মনাভঞ্চ ভোজনে তু জনার্দনম্‌। আরম্ভ কর হে অটল।

অটল। (জনান্তিকে) আরম্ভের ব্যবস্থা যা দেখছি তাতে বাড়ি গিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হবে।

তিনকড়ি। আচ্ছা ঠাকুরমশায়, আপনাদের তন্ত্রশাস্ত্রে এমন কোন প্রক্রিয়া নেই যার দ্বারা লোকের—ইয়ে—মানমর্যাদা বৃদ্ধি পেতে পারে?

শ্যাম। অবশ্য আছে। যথা কুলার্ণবে—অমানিনা মানদেন। অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা হ'লে অমানী ব্যক্তিকেও মান দেন। কেন বলুন তো?

তিনকড়ি। হাঃ হাঃ, সে একটা তুচ্ছ কথা। কি জানেন, কোল্ডহাম সাহেব বলেছিলেন, সুবিধা পেলেই লাট সাহেবকে ধ'রে আমায় বড় খেতাব দেওয়াবেন। বার বার তো রিমাইণ্ড করা ভাল দেখায় না তাই ভাবছিলুম যদি তন্ত্রে-মন্ত্রে কিছু হয়। মানিনে যদিও, তবুও—

শ্যাম। মানতেই হবে। শাস্ত্র মিথ্যা হতে পারে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এ বিষয়ে আমার সমস্ত সাধনা নিয়োজিত ক'রব। তবে সদ্‌গুরু প্রয়োজন, দীক্ষা ভিন্ন এসব কাজ হয় না। গুরুও আবার যে সে হ'লে চলবে না। খরচ—তা আমি যথা সম্ভব অল্পেই নির্বাহ করতে পারব।

তিনকড়ি। হুঁ। দেখা যাবে এখন। আচ্ছা, আপনাদের আপিসে তো বিস্তর লোকজন দরকার হবে, তা—আমার একটি শালীপো আছে, তার একটা হিল্লে লাগিয়ে দিতে পারেন না? বেকার ব'সে ব'সে আমার অন্ন ধ্বংস করছে, লেখাপড়া শিখলে না, কুসঙ্গে মিশে বিগড়ে গেছে। একটা চাকরি জুটলে বড় ভাল হয়। ছোকরা বেশ চটপটে আর স্বভাব-চরিত্রও বড় ভাল।

শ্যাম। আপনার শালীপো? কিছু বলতে হবে না। আমি তাকে মন্দিরের হেড-পাণ্ডা ক'রে দেব। এখনি গোটা-পনর দরখাস্ত এসেছে—তার মধ্যে পাঁচজন গ্রাজুয়েট। তা আপনার আত্মীয়ের ক্লেম সবার ওপর।

তিনকড়ি। আর একটি অনুরোধ। আমার বাড়িতে একটি পুরনো কাঁসর আছে—একটু ফেটে গেছে, কিন্তু আদত খাঁটী কাঁসা। এ জিনিসটা মন্দিরের কাজে লাগানো যায় না? সস্তায় দেব।

শ্যাম। নিশ্চয়ই নেব। ওসব সেকেলে জিনিস কি এখন সহজে মেলে?

... ...

গণ্ডেরির ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হইয়াছে। বিজ্ঞাপনের জোরে এবং প্রতিষ্ঠাতৃগণের চেষ্টায় সমস্ত শেয়ারই বিক্রি হইয়া গিয়াছে। লোকে শেয়ার লইবার জন্য অস্থির, বাজারে চড়া দামে বেচা-কেনা হইতেছে।

অটলবাবু বলিলেন—'আর কেন শ্যাম-দা, এইবার নিজের শেয়ার সব ঝেড়ে দেওয়া যাক। গণ্ডেরি তো খুব একচোট মারলে। আজকে ডবল দর। দু-দিন পরে কেউ ছোঁবেও না।'

শ্যাম। বেচতে হয় বেচ, মোদ্দা কিছু তো হাতে রাখতেই হবে, নইলে ডিরেক্টর হবে কি ক'রে?

অটল। ডিরেক্টরি আপনি করুন গে। আমি আর হাঙ্গামায় থাকতে চাইনে। সিদ্ধেশ্বরীর কৃপায় আপনার তো কার্যসিদ্ধি হয়েছে।

শ্যাম। এই তো সবে আরম্ভ। মন্দির, ঘরদোর, হাট-বাজার সবই তো বাকি। তোমাকে কি এখন ছাড়া যায়?

অটল। থেকে আমার লাভ? পেটে খেলে পিঠে সয়। এখন তো ব্রাদার-ইন্-ল কোম্পানির মরসুম চলল। আমাদের এইখানে শেষ।

শ্যাম। আরে ব্যস্ত হও কেন, এক যাত্রায় কি পৃথক ফল হয়? সন্ধ্যেবেলা যাব এখন তোমাদের বাড়িতে,—গণ্ডেরিকেও নিয়ে যাব।

... ...

দেড় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মচারী অ্যান্ড ব্রাদার-ইন-ল কোম্পানীর আপিসে ডিরেক্টরগণের সভা বসিয়াছে। সভাপতি তিনকড়িবাবু টেবিলে ঘুষি মারিয়া বলিতেছিলেন —'আ—আ—আমি জানতে চাই, টাকা সব গেল কোথা। আমার তো বাড়িতেই টেকা ভার—সবাই এসে তাড়া দিচ্ছে। কয়লাওয়ালা বলে তার পঁচিশ হাজার টাকা পাওনা, ইটখোলার ঠিকাদার বলে বারো হাজার, তার পর ছাপাখানাওলা, শার্পার কোম্পানী, কুণ্ডু মুখুজ্যে, আরও কত কে আছে। বলে আদালতে যাব। মন্দিরের কোথা কি তার ঠিক নেই—এর মধ্যে



আ—আ—আমি জানতে চাই

দু-লাখ টাকা ফুঁকে গেল? সে ভণ্ড জোচ্চোরটা গেল কোথা? শুনতে পাই ডুব মেরে আছে, আপিসে বড় একটা আসে না।'

অটল। ব্রহ্মচারী বলেন, মা তাঁকে অন্য কাজে ডাকছেন—এদিকে আর তেমন মন নেই। আজ তো মিটিংএ আসবেন বলেছেন।

বিপিন বলিলেন—'ব্যস্ত হচ্ছেন কেন সার, এই তো ফর্দ রয়েছে, দেখুন না — জমি-কেনা, শেয়ারের দালালি, preliminary expense, ইট-তৈরী, establishment, বিজ্ঞাপন, আপিস-খরচ—'

তিনকড়ি। চোপ রও ছোকরা। চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা।

এমন সময় শ্যামবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন—'ব্যাপার কি?'

তিনকড়ি। ব্যাপার আমার মাথা। আমি হিসেব চাই।

শ্যাম। বেশ তো, দেখুন না হিসেব। বরঞ্চ একদিন গোবিন্দপুরে নিজে গিয়ে কাজকর্ম তদারক ক'রে আসুন।

তিনকড়ি। হ্যাঁ, আমি এই বাতের শরীর নিয়ে তোমার ধ্যাধ্যেড়ে গোবিন্দপুরে গিয়ে মরি আর কি। সে হবে না—আমার টাকা ফেরত দাও। কোম্পানি তো যেতে বসেছে। শেয়ার-হোল্ডাররা মার-মার কাট-কাট করছে।

শ্যামবাবু কপালে যুক্তকর ঠেকাইয়া বলিলেন—'সকলই জগন্মাতার ইচ্ছা। মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। এতদিন তো মন্দির শেষ হওয়ারই কথা। কতকগুলো অজ্ঞাতপূর্ব কারণে খরচ বেশী হয়ে গিয়ে টাকার অনটন হয়ে পড়ল, তাতে আমাদের আর অপরাধ কি? কিন্তু চিন্তার কোনও কারণ নেই, ক্রমশ সব ঠিক হয়ে যাবে। আর একটা call-এর টাকা তুললেই সমস্ত দেনা শোধ হয়ে যাবে, কাজও এগোবে।'

গণ্ডেরি বলিলেন—'আউর টাকা কোই দিবে না, আপকো থোড়াই বিশোআস করবে।'

শ্যাম। বিশ্বাস না করে, নাচার। আমি দায়মুক্ত, মা যেমন ক'রে পারেন নিজের কাজ চালিয়ে নিন। আমাকে বাবা বিশ্বনাথ কাশীতে টানছেন, সেখানেই আশ্রয় নেব।

তিনকড়ি। তবে বলতে চাও, কোম্পানি ডুবল?

গণ্ডেরি। বিশ হাঁথ পানি।

শ্যাম। আচ্ছা তিনকড়িবাবু, আমাদের ওপর যখন লোকের এতই অবিশ্বাস, বেশ তো, আমরা না হয় ম্যানেজিং এজেন্সি ছেড়ে দিচ্ছি। আপনার নাম আছে, সম্ভ্রম আছে, লোকেও শ্রদ্ধা করে, আপনিই ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে কোম্পানি চালান না?

অটল। এইবার পাকা কথা বলেছেন।

তিনকড়ি। হ্যাঃ, আমি বদনামের বোঝা ঘাড়ে নিই, আর ঘরের খেয়ে বুনো মোষ তাড়াই।

শ্যাম। বেগার খাটবেন কেন? আমিই এই মিটিংএ প্রস্তাব করছি যে রায়সাহেব শ্রীযুক্ত তিনকড়ি ব্যানার্জি মহাশয়কে মাসিক ১০০০ টাকা পারিশ্রমিক দিয়ে কোম্পানি চালাবার ভার অর্পণ করা হোক। এমন উপযুক্ত কর্মদক্ষ লোক আর কোথা? আর, আমরা যদি ভুল-চুক করেই থাকি, তার দায়ী তো আর আপনি হবেন না।

তিনকড়ি। তা—তা—আমি চট্ ক'রে কথা দিতে পারিনে। ভেবে-চিন্তে দেব।

অটল। আর দ্বিধা করবেন না রায়সাহেব। আপনিই এখন ভরসা।

শ্যাম। যদি অভয় দেন তো আর একটি নিবেদন করি। আমি বেশ বুঝেছি, অর্থ হচ্ছে সাধনের অন্তরায়। আমার সমস্ত সম্পত্তিই বিলিয়ে দিয়েছি, কেবল এই কোম্পানির ষোল শ খানেক শেয়ার আমার হাতে আছে। তাও সৎপাত্রে অর্পণ করতে চাই। আপনিই সেটা নিয়ে নিন। প্রিমিয়ম চাই না—আপনি কেনা-দাম ৩২০০৲ টাকা মাত্র দিন।

তিনকড়ি। হ্যাঃ, ভাল ক'রে আমার ঘাড় ভাঙবার মতলব।

শ্যাম। ছি ছি। আপনার ভালই হবে। না হয় কিছু কম দিন,—চব্বিশ শ—দু-হাজার—হাজার—

তিনকড়ি। এক কড়াও নয়।

শ্যাম। দেখুন, ব্রাহ্মণ হ'তে ব্রাহ্মণের দান-প্রতিগ্রহ নিষেধ, নইলে আপনার মত লোককে আমার অমনিই দেবার কথা। আপনি যৎকিঞ্চিৎ মূল্য ধ'রে দিন! ধরুন—পাঁচ শ টাকা। ট্রান্সফার ফর্ম আমার প্রস্তুতই আছে—নিয়ে এস তো বিপিন।

তিনকড়ি। আমি এ—এ—আশি টাকা দিতে পারি।

শ্যাম। তথাস্তু। বড়ই লোকসান হ'ল, কিন্তু সকলই মায়ের ইচ্ছা।

গণ্ডেরি। বাহবা তিনকৌড়িবাবু, বহুত কিফায়ত হুয়া!



কুছ্‌ভি নহি

তিনকড়িবাবু পকেট হইতে মনিব্যাগ বাহির করিয়া সদ্যঃপ্রাপ্ত পেনশনের টাকা হইতে আটখানা আনকোরা দশ টাকার নোট সন্তর্পণে গনিয়া দিলেন। শ্যামবাবু পকেটস্থ করিয়া বলিলেন—'তবে এখন আমি আসি। বাড়িতে সত্যনারায়ণের পুজো আছে। আপনিই কোম্পানির ভার নিলেন এই কথা স্থির। শুভমস্তু—মা-দশভুজা আপনার মঙ্গল করুন।'

শ্যামবাবু প্রস্থান করিলে তিনকড়িবাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—'লোকটা দোষে গুণে মানুষ। এদিকে যদিও হাম্‌বগ, কিন্তু মেজাজটা দিলদরিয়া। কোম্পানির ঝক্কিটা তো এখন আমার ঘাড়ে পড়ল। ক-মাস বাতে পঙ্গু হয়ে পড়েছিলুম, কিছুই দেখতে পারি নি, নইলে কি কোম্পানির অবস্থা এমন হয়? যা হোক উঠে-প'ড়ে লাগতে হ'ল—আমি লেফাফা-দুরুস্ত কাজ চাই, আমার কাছে কারও চালাকি চলবে না।'

গণ্ডেরি। অপ্‌নের কুছু তকলিফ করতে হোবে না। কোম্পানি তো ডুব গিয়া। অপ্‌কোভি ছুট্টি।

তিনকড়ি। তা হ'লে কি বলতে চাও আমার মাসহারাটা—

গণ্ডেরি। হাঃ, হাঃ, তুম্‌ভি রুপেয়া লেওগে? কাঁহাসে মিলবে বাতলাও। তিনকৌড়ি-বাবু, শ্যামবাবুকা কারবারই নহি সমঝা? নব্বে হজার রুপেয়া কম্প্‌নিকা দেনা। দো রোজ্ বাদ লিকুইডেশন। লিকুইডেটর সিকিণ্ড কল আদায় করবে, তব্ দেনা শুধবে।

তিনকড়ি। অ্যাঁ, বল কি? আমি আর এক পয়সাও দিচ্ছি না।

গণ্ডেরি। আলবত দিবেন। গবরমিণ্ট কান পকড়্‌কে আদায় করবে। আইন এইসি হ্যায়।

তিনকড়ি। আরও টাকা যাবে। সে কত?

অটল। আপনার একলার নয়। প্রত্যেক অংশীদারকেই শেয়ার পিছু ফের দু-টাকা দিতে হবে। আপনার পূর্বের ২০০ শেয়ার ছিল, আর শ্যামদার ১৬০০ আজ নিয়েছেন। এই ১৮০০ শেয়ারের ওপর আপনাকে ছত্রিশ শ টাকা দিতে হবে। দেনা শোধ, লিকুইডেশনের খরচা—সমস্ত চুকে গেলে শেষে সামান্য কিছু ফেরত পেতে পারেন।

তিনকড়ি। তোমাদের কত গেল?

গণ্ডেরি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সঞ্চালন করিয়া বলিলেন—'কুছ্‌ভি নাহি, কুছ্‌ভি নাহি। আরে হামাদের ঝড়তি-পড়তি শেয়ার তো সব শ্যামবাবু লিয়েছিল—আজ আপ্‌নেকে বিক্‌কিরি কিয়েছে।'

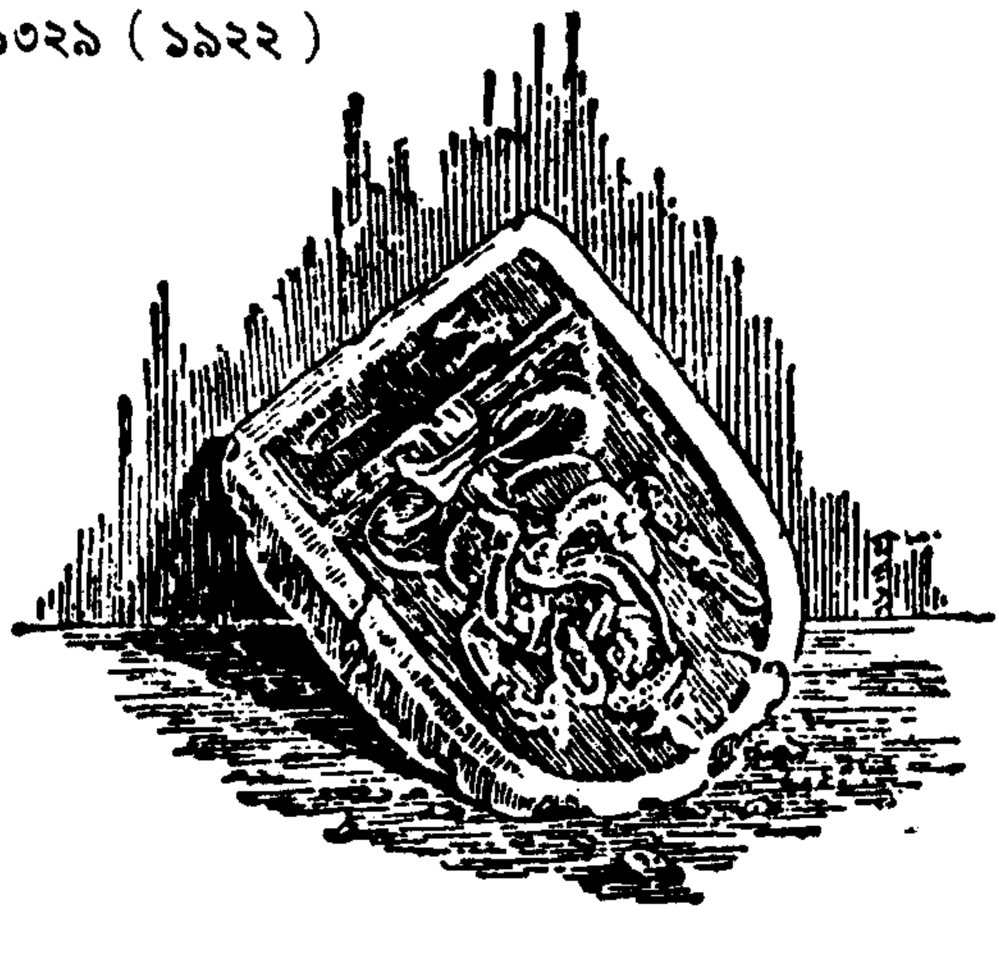
তিনকড়ি। চোর—চোর—চোর! আমি এখনি বিলেতে কোল্ডহাম সাহেবকে চিঠি লিখছি—

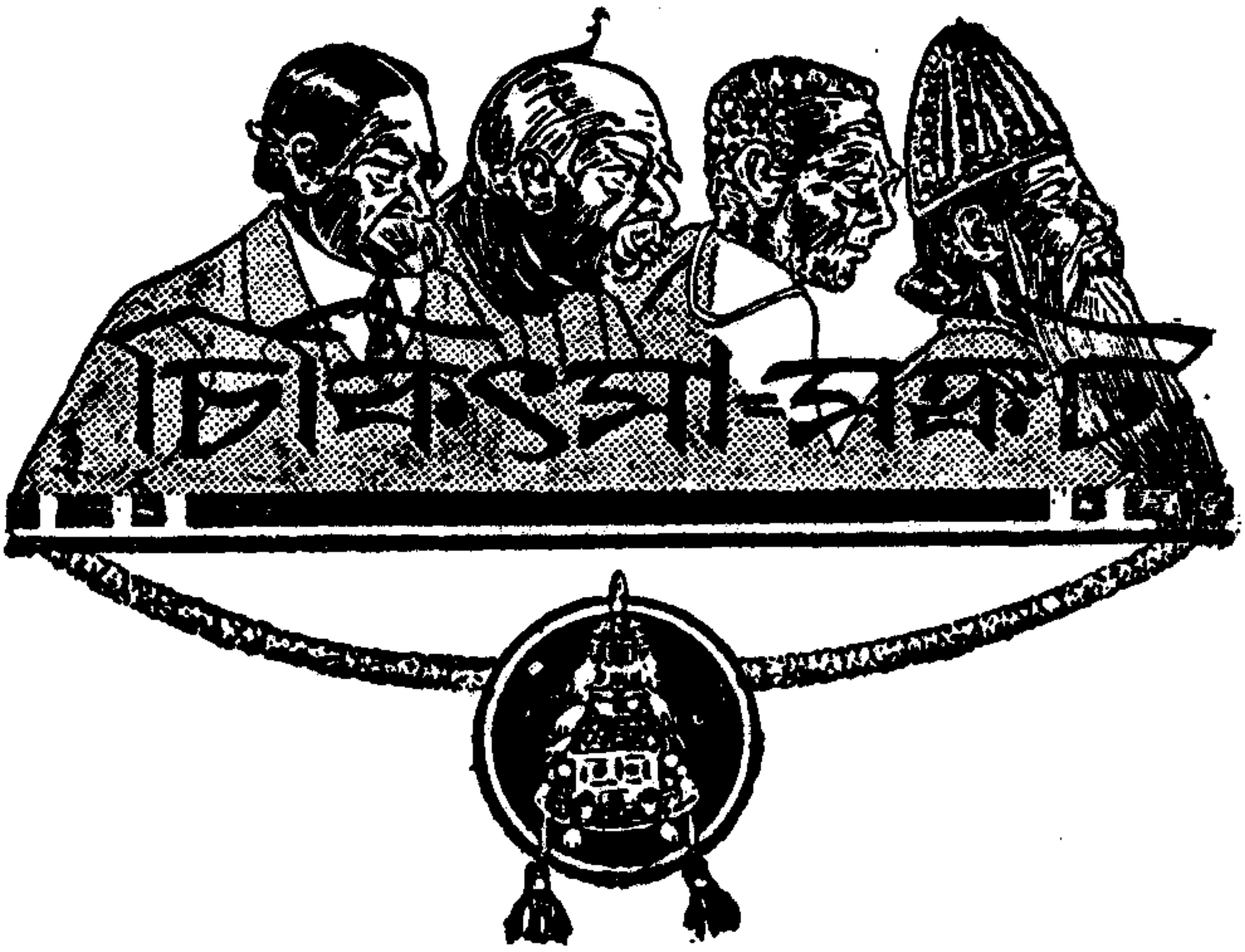
অটল। তবে আমরা এখন উঠি। আমাদের তো আর শেয়ার নেই, কাজেই আমরা এখন ডিরেক্টর নই। আপনি কাজ করুন। চল গণ্ডেরি।

তিনকড়ি। অ্যাঁ—

গণ্ডেরি। রাম রাম!

ভারতবর্ষ, মাঘ ১৩২৯ (১৯২২)





সন্ধ্যা হব হব। নন্দবাবু হগ সাহেবের বাজার হইতে ট্রামে বাড়ি ফিরিতেছেন। বীডন স্ট্রীট পার হইয়া গাড়ি আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল। সম্মুখে গরুর গাড়ি। আর একটু গেলেই নন্দবাবুর বাড়ির মোড়। এমন সময় দেখিলেন পাশের একটি গলি হইতে তাঁর বন্ধু বঙ্কু বাহির হইতেছেন। নন্দবাবু উৎফুল্ল হইয়া ডাকিলেন—'দাঁড়াও হে বঙ্কু, আমি নাবছি।' নন্দর দু-বগলে দুই বাণ্ডিল, ব্যস্ত হইয়া চলন্ত গাড়ি হইতে যেমন নামিবেন অমনি কোঁচায় পা বাধিয়া নীচে পড়িয়া গেলেন।

গাড়িতে একটা শোরগোল উঠিল এবং ঘ্যাচাং করিয়া গাড়ি থামিল। জনকতক যাত্রী নামিয়া নন্দকে ধরিয়া তুলিলেন। যাঁরা গাড়ির মধ্যে ছিলেন তাঁরা গলা বাড়াইয়া নানাপ্রকারের সমবেদনা জানাইতে লাগিলেন। '—আহা হা বড্ড লেগেছে—থোড়া গরম দুধ পিলা দোও—দুটো পা-ই কি কাটা গেছে?' একজন সিদ্ধান্ত করিল মৃগি। আর একজন বলিল ভির্মি। কেউ বলিল মাতাল, কেউ বলিল বাঙাল, কেউ বলিল পাড়াগেঁয়ে ভূত।

বাস্তবিক নন্দবাবুর মোটেই আঘাত লাগে নাই। কিন্তু কে তা শোনে। 'লাগে নি কি মশায়, খুব লেগেছে—দু-মাসের ধাক্কা—বাড়ি গিয়ে টের পাবেন।' নন্দ বার বার করজোড়ে নিবেদন করিলেন যে প্রকৃতই কিছুমাত্র চোট লাগে নাই। একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলিলেন—'আরে মোলো, ভাল করলে মন্দ হয়। পষ্ট দেখলুম লেগেছে তবু বলে লাগে নি।'

এমন সময় বঙ্কুবাবু আসিয়া পড়ায় নন্দবাবু পরিত্রাণ পাইলেন, মনঃক্ষুণ্ণ যাত্রিগণসহ ট্রাম গাড়িও ছাড়িয়া গেল।

বঙ্কু বলিলেন—মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গিয়েছিল আর কি। যা হোক, বাড়ির পথটুকু আর হেঁটে গিয়ে কাজ নেই। এই রিক্‌শ—'

রিক্‌শ নন্দবাবুকে আস্তে আস্তে লইয়া গেল, বঙ্কু পিছনে হাঁটিয়া চলিলেন।

নন্দবাবুর বয়স চল্লিশ, শ্যামবর্ণ, বেঁটে গোলগাল চেহারা। তাঁহার পিতা পশ্চিমে কমিসারিয়টে চাকরি করিয়া বিস্তর টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুকালে একমাত্র সন্তান নন্দর জন্য কলিকাতায় একটি বড় বাড়ি, বিস্তর আসবাব এবং মস্ত একগোছা কোম্পানীর কাগজ রাখিয়া যান। নন্দর বিবাহ অল্পবয়সেই হইয়াছিল, কিন্তু এক বৎসর পরেই তিনি বিপত্নীক হন এবং তারপর আর বিবাহ করেন নাই। মাতা বহুদিন মৃতা, বাড়িতে একমাত্র স্ত্রীলোক এক বৃদ্ধা পিসী। তিনি ঠাকুরসেবা লইয়া বিব্রত, সংসারের কাজ ঝি চাকররাই দেখে। নন্দবাবুর দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে আপত্তি নাই, কিন্তু এ পর্যন্ত তাহা হইয়া উঠে নাই। প্রধান কারণ—আলস্য। থিয়েটার, সিনেমা, ফুটবল ম্যাচ, রেস এবং বন্ধুবর্গের সংসর্গ—ইহাতে নির্বিবাদে দিন কাটিয়া যায়, বিবাহের ফুরসত কোথা? তার পর ক্রমেই বয়স বাড়িয়া যাইতেছে, আর এখন না করাই ভাল। মোটেই উপর নন্দ নিরীহ গোবেচারা অল্পভাষী উদ্যমহীন আরামপ্রিয় লোক।

নন্দবাবুর বাড়ির নীচে সুবৃহৎ ঘরে সান্ধ্য আড্ডা বসিয়াছে। নন্দ আজ কিছু ক্লান্ত বোধ করিতেছেন, সেজন্য বালাপোশ গায়ে দিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া আছেন। বন্ধুগণের চা ও পাঁপরভাজা শেষ হইয়াছে, এখন পান সিগারেট ও গল্প চলিতেছে।

গুপীবাবু বলিতেছিলেন—'উঁহু। শরীরের ওপর এত অযত্ন ক'রো না নন্দ। এই শীত-কালে মাথা ঘুরে প'ড়ে যাওয়া ভাল লক্ষণ নয়।'

নন্দ। মাথা ঠিক ঘোরে নি, কেবল কোঁচায় কাপড় বেধে—

গুপী। আরে, না না। ঘুরেছিল বই কি। শরীরটা কাহিল হয়েছে। এই তো কাছাকাছি ডাক্তার তফাদার রয়েছেন। অত বড় ফিজিশিয়ান আর শহরে পাবে কোথা? যাও না কাল সকালে একবার তাঁর কাছে।

বঙ্কু বলিলেন—'আমার মতে একবার নেপালবাবুকে দেখালেই ভাল হয়। অমন বিচক্ষণ হোমিওপ্যাথ আর দুটি নেই। মেজাজটা একটু তিরিক্ষি বটে কিন্তু বুড়োর বিদ্যে অসাধারণ।'

ষষ্ঠীবাবু মুড়িশুড়ি দিয়া এক কোণে বসিয়াছিলেন। তাঁর মাথায় বালাক্লাভা টুপি, গলায় দাড়ি এবং তার উপর কম্ফর্টার। বলিলেন—'বাপ, এত শীতে অবেলায় কখনও ট্রামে চড়ে? শরীর অসাড় হ'লে আছাড় খেতেই হবে। নন্দর শরীর একটু গরম রাখা দরকার।'

নিধু বলিল—'নন্-দা, মোটা চাল ছাড়। সেই এক বিরিঞ্চির আমলের ফরাস তাকিয়া, লক্কড় পালকি গাড়ি আর পক্ষিরাজ ঘোড়া, এতে গায়ে গত্তি লাগবে কিসে? তোমার পয়হার অভাব কি বাওআ? একটু ফুর্তি করতে শেখ।'

সাব্যস্ত হইল কাল সকালে নন্দবাবু ডাক্তার তফাদারের বাড়ি যাইবেন।

ডাক্তার তফাদার M.D M.R.A.S. গ্রে স্ট্রীটে থাকেন। প্রকাণ্ড বাড়ি, দু-খানা মোটর, একটা ল্যাণ্ড। খুব পসার, রোগীরা ডাকিয়া সহজে পায় না। দেড় ঘণ্টা পাশের কামরায় অপেক্ষা করার পর নন্দবাবুর ডাক পড়িল। ডাক্তারসাহেবের ঘরে গিয়া দেখিলেন এখনও একটি রোগীর পরীক্ষা চলিতেছে। একজন স্থূলকায় মারোয়াড়ী নগ্নগাত্রে দাঁড়াইয়া আছে। ডাক্তার ফিতা দিয়া তাহার ভুঁড়ির পরিধি মাপিয়া বলিলেন—'বস্, সওয়া ইঞ্চি বঢ় গিয়া।' রোগী খুশী হইয়া বলিল—'নবজ্ তো দেখিয়ে।' ডাক্তার রোগীর মণিবন্ধে নাড়ীর উপর একটি মোটর-কারের স্পার্কিং প্লাগ ঠেকাইয়া বলিলেন—'বহুত মজেসে চল্ রহা।' রোগী বলিল—'জবান তো দেখিয়ে।' রোগী হাঁ করিল, ডাক্তার ঘরের অপর দিকে দাঁড়াইয়া অপেরা গ্লাস দ্বারা তাহার জিব দেখিয়া বলিলেন,—'থোড়েসি কসর্ হ্যায়। কল্ ফিন আনা।'

রোগী চলিয়া গেলে তফাদার নন্দর দিকে চাহিয়া বলিলেন—'ওয়েল?'

নন্দ বলিলেন—'আজ্ঞে বড় বিপদে প'ড়ে আপনার কাছে এসেছি। কাল হঠাৎ ট্রাম থেকে—

তফাদার। কম্পাউন্ড ফ্রাক্‌চার? হাড় ভেঙেগেছে?

নন্দবাবু আনুপূর্বিক তাঁর অবস্থার বর্ণনা করিলেন। বেদনা নাই, জ্বর হয় না, পেটের অসুখ, সর্দি, হাঁপানি নাই। ক্ষুধা কাল হইতে একটু কমিয়াছে। রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছেন। মনে বড় আতঙ্ক।

ডাক্তার তাঁহার বুক পেট মাথা হাত পা নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—'জিব দেখি।' নন্দবাবু জিভ বাহির করিলেন।

ডাক্তার ক্ষণকাল মুখ বাঁকাইয়া কলম ধরিলেন। প্রেসক্রিপশন লেখা শেষ হইলে নন্দর দিকে চাহিয়া বলিলেন—'আপনি এখন জিব টেনে নিতে পারেন। এই ওষুধ রোজ তিনবার খাবেন।'



এখন জিব টেনে নিতে পারেন

নন্দ। কি রকম বুঝলেন?

তফাদার। ভেরি ব্যাড।

নন্দ সভয়ে বলিলেন—'কি হয়েছে?'

তফাদার। আরও দিন কতক ওয়াচ না করলে ঠিক বলা যায় না। তবে সন্দেহ করছি cerebral tumour with strangulated ganglia। ট্রিফাইন ক'রে মাথার খুলি ফুটো ক'রে অস্ত্র করতে হবে, আর ঘাড় চিরে নার্ভের জট ছাড়াতে হবে। শর্ট-সার্কিট হয়ে গেছে।

নন্দ। বাঁচব তো?

তফাদার। দ'মে যাবেন না, তা হ'লে সারাতে পারব না। সাত দিন পরে ফের আসবেন। মাই ফ্রেণ্ড মেজর গোঁসাইএর সংগে একটা কন্সলটেশনের ব্যবস্থা করা যাবে। ভাত-ডাল বড় একটা খাবেন না। এগ-ফ্লিপ, বোনম্যারো সুপ, চিকেন-স্টু, এইসব। বিকেলে একটু ঘার্গাণ্ডি খেতে পারেন। বরফ-জল খুব খাবেন। হ্যাঁ, বত্রিশ টাকা। থ্যাঙ্ক ইউ।

নন্দবাবু কম্পিত পদে প্রস্থান করিলেন।

সন্ধ্যাবেলা বঙ্কুবাবু বলিলেন—'আরে তখনি আমি বারণ করেছিলুম ওর কাছে যেয়ো না। ব্যাটা মেড়োর পেটে হাত বুলিয়ে খায়। এঃ, খুলির ওপর তুরপুন চালাবেন!'

ষষ্ঠীবাবু। আমাদের পাড়ার তারিণী কবিরাজকে দেখালে হয় না?

গুপীবাবু। না না, যদি বাস্তবিক নন্দর মাথার ভেতর ওলট-পালট হয়ে গিয়ে থাকে তবে হাতুড়ে বদ্দির কম্ম নয়। হোমিওপ্যাথিই ভাল।

নিধু। আমার কথা তো শুনবে না বাওআ। ডাক্তারি তোমার ধাতে না সয় তো একটু কোবরেজি করতে শেখ। দরওয়ানজী দিব্বি একলোটা বানিয়েছে। বল তো একটু চেয়ে আনি।

হোমিওপ্যাথিই স্থির হইল।

পরদিন খুব ভোরে নন্দবাবু নেপাল ডাক্তারের বাড়ি আসিলেন। রোগীর ভিড় এখনও আরম্ভ হয় নাই, অল্পক্ষণ পরেই তাঁর ডাক পড়িল। একটি প্রকাণ্ড ঘরের মেঝেতে ফরাশ পাতা। চারিদিকে স্তূপাকারে বহি সাজানো। বহির দেওয়ালের মধ্যে গল্পবর্ণিত শেয়ালের মত বৃদ্ধ নেপালবাবু বসিয়া আছেন। মুখে গড়গড়ার নল, ঘরটি ধোঁয়ায় ঝাপসা হইয়া গিয়াছে।

নন্দবাবু নমস্কার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। নেপাল ডাক্তার কটমট দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—'বসবার জায়গা আছে।' নন্দ বসিলেন।

নেপাল। শ্বাস উঠেছে?

নন্দ। আজ্ঞে?

নেপাল। রুগীর শেষ অবস্থা না হ'লে তো আমার ডাকা হয় না, তাই জিজ্ঞেস করছি

নন্দ সবিনয়ে জানাইলেন তিনিই রোগী।

নেপাল। অ্যালোপ্যাথ ডাকাত ব্যাটারা ছেড়ে দিলে যে বড়? তোমার হয়েছে কি?

নন্দবাবু তাঁহার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিলেন।

নেপাল। তফাদার কি বলেছে?

নন্দ। বললেন আমার মাথার টিউমার আছে।

নেপাল। তফাদারের মাথায় কি আছে জান? গোবর। আর টুপির ভেতর শিং, জুতোর ভেতর খুর, পাতলুনের ভেতর ল্যাজ। খিদে হয়?

নন্দ। দু-দিন থেকে একেবারে হয় না।

নেপাল। ঘুম হয়?

নন্দ। না।

নেপাল। মাথা ধরে?

নন্দ। কাল সন্ধ্যেবেলা ধরেছিল।

নেপাল। বাঁ দিক?

নন্দ। আজ্ঞে হাঁ।

নেপাল। না ডান দিক?

নন্দ। আজ্ঞে হাঁ।
নেপাল ধমক দিয়া বলিলেন—'ঠিক ক'রে বল।'
নন্দ। আজ্ঞে ঠিক মধ্যিখানে।
নেপাল। পেট কামড়ায়?
নন্দ। সেদিন কামড়েছিল। নিধে কাবলী মটরভাজা এনেছিল তাই খেয়ে—
নেপাল। পেট কামড়ায় না মোচড় দেয় তাই বল।
নন্দ বিব্রত হইয়া বলিলেন—'হাঁচোড়-পাঁচোড় করে।'



হাঁচোড়-পাঁচোড় করে

ডাক্তার কয়েকটি মোটা-মোটা বহি দেখিলেন, তার পর অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—'হুঁ। একটা ওষুধ দিচ্ছি নিয়ে যাও। আগে শরীর থেকে অ্যালোপ্যাথিক বিষ তাড়াতে হবে। পাঁচ বছর বয়সে আমায় খুনে ব্যাটারা দু-গ্রেন কুইনীন দিয়েছিল, এখনও বিকেলে মাথা টিপ টিপ করে। সাতদিন পরে ফের এসো। তখন আসল চিকিৎসা শুরু হবে।'

নন্দ। ব্যারামটা কি আন্দাজ করছেন?

ডাক্তার ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন—'তা জেনে তোমার চারটে হাত বেরবে নাকি? যদি

বলি তোমার পেটে ডিফারেনশ্যাল ক্যাল্‌কুলস হয়েছে, কিছু বুঝবে? ভাত খাবে না, দু-বেলা রুটি, মাছ-মাংস বারণ, শুধু মুগের ডালের যূষ, স্নান বন্ধ, গরম জল একটু খেতে পার, তামাক খাবে না, ধোঁয়া লাগলে ওষুধের গুণ নষ্ট হবে। ভাবছো আমার আলমারির ওষুধ নষ্ট হয়ে গেছে? সে ভয় নেই, আমার তামাকে সালফার-থার্টি মেশানো থাকে। ফী কত তাও ব'লে দিতে হবে নাকি? দেখছো না দেওয়ালে নোটিস লটকানো রয়েছে বত্রিশ টাকা? আর ওষুধের দাম চার টাকা।'

নন্দবাবু টাকা দিয়া বিদায় লইলেন।

নিধু বলিল—'কেন বাওআ কাঁচা পয়হা নষ্ট করছ? থাকলে পাঁচ রাত বক্সে ব'সে ঠিয়াটার দেখা চলত। ও নেপাল-বুড়ো মস্ত ঘুঘু, নন্‌-দাকে ভালমানুষ পেয়ে জেরা ক'রে থ ক'রে দিয়েছে। পড়ত আমার পাল্লায় বাছাধন, কত বড় হোমিওফাঁক দেকে নিতুম। এক চুমুকে তার আলমারি-সুদ্ধ ওষুধ সাবড়ে না দিতে পারি তো আমার নাক কেটে দিও।'

গুপী। আজ আপিসে শুনছিলুম কে একজন বড় হাকিম ফরক্কাবাদ থেকে এখানে এসেছে। খুব নামডাক, রাজা-মহারাজারা সব চিকিৎসা করাচ্ছে। একবার দেখালে হয় না?

ষষ্ঠী। এই শীতে হাকিমী ওষুধ? বাপ, শরবত খাইয়েই মারবে। তার চেয়ে তারিণী কোবরেজ ভাল।

অতঃপর কবিরাজী চিকিৎসাই সাব্যস্ত হইল।

পরদিন সকালে নন্দবাবু তারিণী কবিরাজের বাড়ি উপস্থিত হইলেন। কবিরাজ মহাশয়ের বয়স ষাট, ক্ষীণ শরীর, দাড়ি-গোঁফ কামানো। তেল মাখিয়া আটহাতী ধুতি পরিয়া একটি চেয়ারের উপর উবু হইয়া বসিয়া তামাক খাইতেছেন। এই অবস্থাতেই ইনি প্রত্যহ রোগী দেখেন। ঘরে একটি তক্তাপোশ, তাহার উপর তেলচিটে পাটি এবং কয়েকটি মলিন তাকিয়া। দেওয়ালের কোলে দুটি ঔষধের আলমারি।

নন্দবাবু নমস্কার করিয়া তক্তাপোশে বসিলে কবিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—'বাবুর কন্থে আসা হচ্চে?' নন্দবাবু নিজের নাম ও ঠিকানা বলিলেন।

তারিণী। রুগীর ব্যামোডা কি?

নন্দবাবু জানাইলেন তিনিই রোগী এবং সমস্ত ইতিহাস বিবৃত করিলেন।

তারিণী। মাথার খুলি ছেঁদা করে দিয়েছে নাকি?

নন্দ। আজ্ঞে না, নেপালবাবু বললেন পাথুরি, তাই আর মাথায় অস্তর করাই নি।

তারিণী। নেপাল! সে আবার কেডা?

নন্দ। জানেন না? চোরবাগানের নেপালচন্দ্র রায় M.B.F.T.S—মস্ত হোমিওপ্যাথ।

তারিণী। অঃ, ন্যাপলা, তাই কও। সেডা আবার ডাগদর হ'ল কবে? বলি, পাড়ায় এমন বিচক্ষণ কোবরেজ থাকতি ছেলেছোকরার কাছে যাও কেন?

নন্দ। আজ্ঞে, বন্ধু-বান্ধবরা বললে ডাক্তারের মতটা আগে নেওয়া দরকার, যদিই অস্ত্র-চিকিৎসা করতে হয়।

তারিণী। যন্তিবাবু-রি চেন? খুলনের উঁকিল যন্তিবাবু?

নন্দ ঘাড় নাড়িলেন।

তারিণী। তাঁর মামার হয় উরুস্তম্ভ। সিভিল সার্জন পা কাটলে। তিন দিন অচৈতন্য। জ্ঞান হলি ক্ষীণস্বর কইলেন, আমার ঠ্যাং কই? ডাক তারিণী স্যানরে। দেলাম ঠুকে এক দলা চ্যবনপ্রাশ। তারপর কি হ'ল কও দিকি?

নন্দ   আবার পা গজিয়েছে বুঝি?

'ওরে অ ক্যাব্‌লা, দেখ্‌ দেখ্‌ বিড়েলে সব্‌ডা ছাগলাদ্য ঘেৃত খেয়ে গেল'—বলিতে বলিতে কবিরাজ মহাশয় পাশের ঘরে ছুটিলেন। একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া যথাস্থানে বসিয়া বলিলেন—'দ্যাও নাড়ীডা একবার দেখি। হঃ, যা ভাবছিলাম তাই। ভারী ব্যামো হয়েছিল কখনও?'

নন্দ। অনেক দিন আগে টাইফয়েড হয়েছিল।

তারিণী। ঠিক ঠাউরেছি। পাচ বছর আগে?

নন্দ। প্রায় সাড়ে সাত বছর হ'ল।

তারিণী। একই কথা, পাচ দেরা সারে সাত। প্রাতিক্কালে বোমি হয়?

নন্দ। আজ্ঞে না।



হয়, টানাতি পার না

তারিণী। হয়, টানাতি পার না। নিদ্রা হয়?

নন্দ। ভাল হয় না।

তারিণী। হবেই না তো। উর্ধ্ব হয়েছে কি না। দাত কনকন করে?

নন্দ। আজ্ঞে না।

তারিণী। করে, টানাতি পার না। যা হোক, তুমি চিন্তা কোরো না বাবা। আরাম হয়ে যাবানে। আমি ওষুধ দিচ্চি।

কবিরাজ মহাশয় আলমারি হইতে একটি শিশি বাহির করিলেন, এবং তাহার মধ্যস্থিত

বড়ির উদ্দেশ্যে বলিলেন—'লাফাস নে, থাম্ থাম্। আমার সব জীয়ন্ত ওষুধ, ডাকলি ডাক শোনে। এই বড়ি সকাল-সন্ধ্যা একটা করি খাবা। আবার তিনদিন পরে আস্‌বা। বুজেচ?'

নন্দ। আজ্ঞে হাঁ।

তারিণী। ছাই বুজেচ। অনুপান দিতি হবে না? ট্যাবা লেবুর রস আর মধুর সাথি মাড়ি খাবা। ভাত খাবা না। ওলসিদ্ধ, কচুসিদ্ধ এইসব খাবা। নুন ছোবা না। মাগুর মাছের ঝোল একটু চ্যানি দিয়া রাঁধি খাতি পার। গরম জল ঠান্ডা করি খাবা।

নন্দ। ব্যারামটা কি?

তারিণী। যারে কয় উদুরি। উর্ধ্বশ্লেষ্মাও কইতি পার।

নন্দবাবু কবিরাজের দর্শনী ও ঔষধের মূল্য দিয়া বিমর্ষচিত্তে বিদায় লইলেন।

নিধু বলিল—'কি দাদা, রোকরেজির সাধ মিট্‌ল?

গুপী। নাঃ এ-সব বাজে চিকিৎসার কাজ নয়। কোথাও চেঞ্জে চল।

বংকু। আমি বলি কি, নন্দ বে-থা করে ঘরে পরিবার আনুক। এ-রকম দামড়া হয়ে থাকা কিছু নয়।

নন্দ চিঁ চিঁ স্বরে বলিলেন—'আর পরিবার। কোন্ দিন আছি, কোন্ দিন নেই। এই বয়সে একটা কাঁচ বউ এনে মিথ্যে জঞ্জাল জোটানো।'

নিধু বলিল—'নন্-দা, একটা মোটর কেন মাইরি। দু-দিন হাওয়া খেলেই চাঙ্গা হয়ে উঠবে। সেভেন সিটার হড্‌সন; ষেটের কোলে আমরা তো পাঁচজন আছি।'

ষষ্ঠী। তা যদি বললে, তবে আমার মতে মোটর-কারও যা, পরিবারও তা। ঘরে আনা সোজা; কিন্তু মেরামতী খরচ যোগাতে প্রাণান্ত। আজ টায়ার ফাট্‌ল কাল গিন্নীর অম্বল-শূল, পরশু ব্যাটারি খারাপ, তরশু ছেলেটার ঠান্ডা লেগে জ্বর। অমন কাজ ক'রো না নন্দ! জেরবার হবে। এই শীতকালে কোথা দু-দণ্ড লেপের মধ্যে ঘুমুব মশায়, তা নয়, সারারাত প্যান প্যান ট্যাঁ ট্যাঁ।

নিধু। ষষ্ঠী খুড়ো যে রকম হিসেবী লোক, একটি মোটা-সোটা রোঁ-ওলা ভাল্লুকের মেয়ে বে করলে ভাল করতেন। লেপ-কম্বলের খরচা বাঁচত!

গুপী। যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন। কাল সকালে নন্দ একবার হাকিম সাহেবের কাছে যাও। তার পর যা হয় করা যাবে।

নন্দবাবু অগত্যা রাজী হইলেন।

হাজিক-উল-মুল্‌ক্ বিন লোকমান নারুল্লা গজন ফরুল্লা অল হকিম য়ুনানী লোয়ার চিৎপুর রোডে বাসা লইয়াছেন। নন্দবাবু তেতলায় উঠিলে একজন লুঙ্গিপরা ফেজ-ধারী লোক তাঁহাকে বলিল—'আসেন বাবুমশায়। হামি হাকিম সাহেবের মীরমুন্সী। কি বেমারি বোলেন, হামি লিখে হুজুরকে ইত্তালা ভেজিয়ে দিব।'

নন্দ। বেমারি কি সেটা জানতেই তো আসা বাপু।

মুন্সী। তবু ভি কুছু তো বোলেন। না-তাক্‌তি, বুখার, পিল্লি, চেচক, ঘেঘ, বাওআসির, রাত-অন্ধি—

নন্দ। ও-সব কিছু বুঝলুম না বাপু। আমার প্রাণটা ধড়ফড় করছে।

মুন্সী। সো হি বোলেন। দিল তড়প্‌না। মোহর এনেছেন?

নন্দ। মোহর?

মুন্সী। হাকিম সাহেব চাঁদি ছোন না। নজরানা দো মোহর। না থাকে আমি দিচ্ছি।

পয়তালিশ টাকা, আর বাট্টা দো টাকা, আর রেশমী রুমাল দো টাকা। দরবারে যেয়ে আগে হুজুরকে বন্দাগি জনাব বোলবেন, তার পর রুমালের ওপর মোহর রেখে সামনে ধরবেন।

মুন্সী নন্দবাবুকে তালিম দিয়া দরবারে লইয়া গেল। একটি বৃহৎ ঘরে গালিচা পাতা, একপার্শ্বে মসনদের উপর তাকিয়া হেলান দিয়া হাকিম সাহেব ফর্সিতে ধূমপান করিতেছেন। বয়স পঞ্চান্ন, বাবরী চুল, গোঁফ খুব ছোট করিয়া ছাঁটা। আবক্ষলম্বিত দাড়ির গোড়ার দিক সাদা, মধ্যে লাল, ডগায় নীল। পরিধান সাটিনের চুড়িদার ইজার, কিংখাপের জোব্বা, জরির তাজ। সম্মুখে ধূপদানে মুসব্বর এবং রুমী মস্তগি জ্বলিতেছে, পাশে পিকদান, পানদান, আতরদান ইত্যাদি। চার-পাঁচজন পারিষদ হাঁটু মুড়িয়া বসিয়া আছে এবং হাকিমের প্রতি কথায় 'কেরামত' বলিতেছে। ঘরের কোণে একজন ঝাঁকড়া-চুলো চাপ-দেড়ে লোক সেতার লইয়া পিড়িং পিড়িং এবং বিকট অঙ্গভঙ্গী করিতেছে।



হড্ডি পিল্‌পিলায় গয়া

নন্দবাবু অভিবাদন করিয়া মোহর নজর দিলেন। হাকিম ঈষৎ হাসিয়া আতরদান হইতে কিঞ্চিৎ তুলা লইয়া নন্দর কানে গুঁজিয়া দিলেন। মুন্সী বলিল—'আপনি বাংলায় বাৎচিত বোলেন। হামি হুজুরকে সমঝিয়ে দিব।'

নন্দবাবুর ইতিবৃত্ত শেষ হইলে হাকিম ঋষভকণ্ঠে বলিলেন—'সর্ লাও!'

নন্দ শিহরিয়া উঠিলেন। মুন্সী আশ্বাস দিয়া বলিল—'ডরবেন না মশয়। জনাবকে আপনার শির দেখ্‌লান!

নন্দর মাথা টিপিয়া হাকিম বলিলেন—'হাড্ডি পিল্‌পিলায় গয়া।'

মুন্সী। শুনেছেন? মাথার হাড় বিলকুল লরম হয়ে গেছে।

হাকিম তিনরঙা দাড়িতে আঙুল চালাইয়া বলিলেন—'সুর্মা সুর্খ্‌'।

একজন একটা লাল গুঁড়া নন্দর চোখের পল্লবে লাগাইয়া দিল। মুন্সী বুঝাইল—'আঁখ ঠান্ডা থাকবে, নিদ হোবে।' হাকিম আবার বলিলেন—'রোগন বব্বর।' মুন্সী হাঁকিল—'এ জী বাল্‌বর, অস্তুরা লাও।'

নন্দবাবু—'হাঁ-হাঁ আরে তুম করো কি'—বলিতে বলিতে নাপিত চট্‌ করিয়া তাঁহার ব্রহ্মতালুর উপর দু-ইঞ্চি সমচতুষ্কোণ কামাইয়া দিল, আর একজন তাহার উপর একটা দুর্গন্ধ প্রলেপ লাগাইল। মুন্সী বলিল—'ঘবড়ান কেন মশয়, এ হচ্চে বব্বরী সিংগির মাথার ঘি। বহুত কিম্মত। মাথার হাড্ডি সকত হোবে।'

নন্দবাবু কিয়ৎক্ষণ হতভম্ব অবস্থায় রহিলেন। তার পর প্রকৃতিস্থ হইয়া বেগে ঘর হইতে পলায়ন করিলেন। মুন্সী পিছনে ছুটিতে ছুটিতে বলিল—'হামার দস্তুরি? নন্দ একটা টাকা ফেলিয়া দিয়া তিন লাফে নীচে নামিয়া গাড়িতে উঠিয়া কোচমানকে বলিলেন—'হাঁকাও!'

সন্ধ্যাকালে বন্ধুগণ আসিয়া দেখিলেন বৈঠকখানার দরজা বন্ধ। চাকর বলিল, বাবুর বড় অসুখ, দেখা হইবে না। সকলে বিষন্নচিত্তে ফিরিয়া গেলেন।

সমস্ত রাত বিছানায় ছটফট করিয়া ভোর চারটার সময় নন্দবাবু ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আর বন্ধুগণের পরামর্শ শুনিবেন না, নিজের ব্যবস্থা নিজেই করিবেন।

বেলা আটটার সময় নন্দ বাড়ি হইতে বাহির হইলেন এবং বড় রাস্তায় ট্যাক্সি ধরিয়া বলিলেন—'সিধা চলো।' সংকল্প করিয়াছেন, মিটারে এক টাকা উঠিলেই ট্যাক্সি হইতে নামিয়া পড়িবেন, এবং কাছাকাছি যে চিকিৎসক পান তাহারই মতে চলিবেন—তা সে অ্যালোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ, কবিরাজ, হাতুড়ে, অবধূত, মাদ্রাজী বা চাঁদসীর ডাক্তার যেই হউক।

বউবাজারে নামিয়া একটি গলিতে ঢুকিতেই সাইনবোর্ড নজরে পড়িল—'ডাক্তার মিস বি, মল্লিক।' নন্দবাবু 'মিস' শব্দটি লক্ষ্য করেন নাই, নতুবা হয়তো ইতস্ততঃ করিতেন। একেবারে সোজা পরদা ঠেলিয়া একটি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

মিস বিপুলা মল্লিক তখন বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া কাঁধের উপর সেফটি-পিন আঁটিতেছিলেন। নন্দকে দেখিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন—'কি চাই আপনার?'

নন্দবাবু প্রথমটা অপ্রস্তুত হইলেন, তার পর মরিয়া হইয়া ভাবিলেন—দূর হ'ক, না-হয় লেডি ডাক্তারের পরামর্শই নেব। বলিলেন—'বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি।'

মিস মল্লিক। পেন আরম্ভ হয়েছে?

নন্দ। পেন তো কিছু টের পাচ্ছি না।

মিস। ফার্স্ট কনফাইনমেণ্ট?

নন্দ। আজ্ঞে?

মিস। প্রথম পোয়াতী?

নন্দ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—'আমি নিজের চিকিৎসার জন্যই এসেছি।

মিস মল্লিক আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—'নিজের জন্যে? ব্যাপার কি?'

সমগ্র ইতিহাস বর্ণনা শেষ হইলে মিস মল্লিক নন্দবাবুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দু-চারটি প্রশ্ন করিয়া কহিলেন—'আপনার নামটি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

নন্দ। শ্রীনন্দদুলাল মিত্র।

মিস। বাড়িতে কে আছেন?

নন্দ জানাইলেন তিনি বহুদিন বিপত্নীক, বাড়িতে এক বৃদ্ধা পিসী ছাড়া কেউ নাই।

মিস। কাজকর্ম কি করা হয়?

নন্দ। তা কিছু করি না। পৈতৃক সম্পত্তি আছে।

মিস। মোটর-কার আছে?

নন্দ। নেই তবে কেনবার ইচ্ছে আছে।

মিস মল্লিক আরও নানা প্রকার প্রশ্ন করিয়া কিছুক্ষণ ঠোঁটে হাত দিয়া চিন্তা করিলেন, তার পর ধীরে ধীরে বামে দক্ষিণে ঘাড় নাড়িলেন।

নন্দ ব্যাকুল হইয়া বলিলেন—'দোহাই আপনার, সত্যি ক'রে বলুন আমার কি হয়েছে। টিউমার, না পাথুরি, না উদরী, না কালাজ্বর, না হাইড্রোফোবিয়া?'



দি আইডিয়া!

মিস মল্লিক হাসিয়া বলিলেন—'কেন আপনি ভাবছেন? ও-সব কিছুই হয় নি। আপনার শুধু একজন অভিভাবক দরকার।'

নন্দ অধিকতর কাতরকণ্ঠে বলিলেন—'তবে কি আমি পাগল হয়েছি?'

মিস মল্লিক মুখে রুমাল দিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিলেন—'ও ডিয়ার ডিয়ার

নো। পাগল হবেন কেন? আমি বলছিলুম, আপনার যত্ন নেবার জন্যে বাড়িতে উপযুক্ত লোক থাকা দরকার।

নন্দ। কেন পিসীমা তো আছেন।

মিস মল্লিক পুনরায় হাসিয়া বলিলেন—'দি আইডিয়া! মাসীপিসীর কাজ নয়। যাক, আপাতত একটা ওষুধ দিচ্ছি, খেয়ে দেখবেন। বেশ মিষ্টি, এলাচের গন্ধ। এক হপ্তা পরে আবার আসবেন।

... ...

নন্দবাবু সাত দিন পরে পুনরায় মিস বিপুলা মল্লিকের কাছে গেলেন। তার পর দু-দিন পরে আবার গেলেন। তার পর প্রত্যহ।



বিপুলানন্দ

তার পর একদিন নন্দবাবু পিসীমাতাকে কাশীধামে রওনা করাইয়া দিয়া মস্ত বাজার করিলেন। এক ঝুড়ি গল্দা চিংড়ি, এক ঝুড়ি মটন, তদনুযায়ী ঘি, ময়দা, দই, সন্দেশ ইত্যাদি। বন্ধুবর্গ খুব খাইলেন। নন্দবাবু জরিপাড় সূক্ষ্ম ধুতির উপর সিল্কের পাঞ্জাবি পরিয়া সলজ্জ সস্মিতমুখে সকলকে আপ্যায়িত করিলেন।

মিসেস বিপুলা মিত্র এখন আর স্বামী ভিন্ন অপর রোগীর চিকিৎসা করেন না। তবে নন্দবাবু ভালই আছেন। মোটর-কার কেনা হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, সান্ধ্য আড্ডাটি ভাঙিয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষ, কার্তিক ১৩৩০ (১৯২৩)



বক্তৃতা-গৃহ। উচ্চ বেদীর উপর আচার্যের আসন। বেদীর নীচে ছাত্রদের জন্য শ্রেণীবন্ধ চেয়ার ও বেঞ্চ।

প্রথম শ্রেণীতে আছেন—

হোমরাও সিং	মহারাজা
চোমরাও আলি	নবাব
খুদীন্দ্রনারায়ণ	জমিদার
মিস্টার গ্র্যাব	বণিক
মিস্টার হাউলার	সম্পাদক
ইত্যাদি	

দ্বিতীয় শ্রেণীতে—

মিস্টার গুহা	রাজনীতিজ্ঞ
নিতাইবাবু	সম্পাদক
প্রফেসার গুই	অধ্যাপক
রূপচাঁদ	বণিক
লুটবেহারী	ইনসলভেন্ট

গাঁট্টালাল	গোঁড়াতলার সর্দার
তেওয়ারী	জমাদার
ইত্যাদি	

তৃতীয় শ্রেণীতে—

মিস্টার গুপ্টা	বিশেষজ্ঞ
সরেশচন্দ্র	নূতন গ্রাজুয়েট
নিরেশচন্দ্র	ঐ
দীনেশচন্দ্র	কেরানী
ইত্যাদি	

চতুর্থ শ্রেণীতে—

পাঁচুমিয়া	মজুর
গবেশ্বর	মাস্টার
কাঙালীচরণ	নিষ্কর্মা

আরও অনেক লোক

প্রথম শ্রেণীর কথা

মিস্টার গ্র্যাব। হ্যাল্লো মহারাজা, আপনিও দেখছি ক্লাসে জয়েন করেছেন।

হোমরাও সিং। হাঁ, ব্যাপারটা জানবার জন্য বড়ই কৌতূহল হয়েছে। আচ্ছা, এই জগদ্‌গুরু লোকটি কে?

গ্র্যাব। কিছুই জানি না। কেউ বলে, এঁর নাম ভ্যান্ডারলুট, আমেরিকা থেকে এসেছেন; আবার কেউ বলে, ইনিই প্রফেসার ফ্রাঙ্কেনস্টাইন। ফাদার ওব্রায়েন সেদিন বলছিলেন, লোকটি devil himself—শয়তান স্বয়ং। অথচ রেভারেন্ড ফিগ্‌স বলেন, ইনি পৃথিবীর বিজ্ঞতম ব্যক্তি, একজন সুপারম্যান। একটা কমপ্লিমেন্টারি টিকিট পেয়েছি, তাই মজা দেখতে এলুম।

মিস্টার হাউলার। আমিও একখানা পেয়েছি।

হোমরাও। বটে? আমরা তো টাকা দিয়ে কিনেছি, তাও অতি কষ্টে। হয়তো জগদ্‌গুরু জানেন যে আপনাদের শেখবার কিছু নেই, তাই কমপ্লিমেন্টারি টিকিট দিয়েছেন।

খুদীন্দ্রনারায়ণ। শুনেছি লোকটি নাকি বাঙালী, বিলাত থেকে ভোল ফিরিয়ে এসেছে। আচ্ছা, বলশেভিক নয় তো?

চোমরাও আলি। না না, তা হ'লে গভর্নমেণ্ট এ লেক্‌চার বন্ধ ক'রে দিতেন। আমার মনে হয়, জগদ্‌গুরু তুর্ক থেকে এসেছেন।

হাউলার। দেখাই যাবে লোকটি কে!

দ্বিতীয় শ্রেণীর কথা

নিতাইবাবু। জগদ্‌গুরু কোথায় উঠেছেন জানেন কি? একবার ইন্টারভিউ করতে যাব।

মিস্টার গুহা। শুনেছি, বেঙ্গল ক্লাবে আছেন।

রূপচাঁদ। না—না, আমি জানি, পগেয়াপটিতে বাসা নিয়েছেন।

লুটবেহারী। আচ্ছা উনি যে মহাবিদ্যার ক্লাস খুলেছেন, সেটা কি? ছেলেবেলায় তো পড়েছিলুম—কালী, তারা, মহাবিদ্যা—

প্রফেসার গুই। আরে, সে বিদ্যা নয়। মহাবিদ্যা—কিনা সকল বিদ্যার সেরা বিদ্যা, যা আয়ত্ত হ'লে মানুষের অসীম ক্ষমতা হয়, সকলের উপর প্রভুত্ব লাভ হয়।

রূপচাঁদ। এখানে তো দেখছি হাজারো লোক লেকচার শুনতে এসেছে। সকলেরই যদি প্রভুত্ব লাভ হয় তবে ফরমাশ খাটবে কে?

গাট্টালাল। এইজন্যে ভাবছেন? আপনি হুকুম দিন, আমি আর তেওয়ারী দুই দোস্ত্ মিলে সবাইকে হাঁকিয়ে দিচ্ছি। কিছু পান খেতে দেবেন—

তেওয়ারী। না—না, এখন গণ্ডগোল বাধিও না,—সাহেবরা রয়েছেন।

তৃতীয় শ্রেণীর কথা

সুরেশ। আপনিও বুঝি এই বৎসর পাস করেছেন? কোন্ লাইনে যাবেন, ঠিক করলেন?

নিরেশ। তা কিছুই ঠিক করিনি। সেইজন্যই তো মহাবিদ্যার ক্লাসে ভর্তি হয়েছি,—যদি একটা রাস্তা পাওয়া যায়। আচ্ছা এই কোর্স অভ লেকচার্স আয়োজন করলে কে?

সুরেশ। কি জানি মশায়। কেউ বলে, বিলাতের কোনও দয়ালু ক্রোরপতি জগদ্‌গুরুকে পাঠিয়েছেন। আবার শুনতে পাই, ইউনিভার্সিটিই নাকি লুকিয়ে এই লেকচারের খরচ যোগাচ্ছে।

মিস্টার গুপ্টা। ইউনিভার্সিটির টাকা কোথা? যেই টাকা দিক, মিথ্যে অপব্যয় হচ্ছে। এ রকম লেকচারে দেশের উন্নতি হবে না। ক্যাপিট্যাল চাই, ব্যবসা চাই।

দীনেশ। তবে আপনি এখানে এলেন কেন? এইসব রাজা-মহারাজাই বা কি জন্য ক্লাস অ্যাটেন্ড করছেন? নিশ্চয়ই একটা লাভের প্রত্যাশা আছে। এই দেখুন না, আমি সামান্য মাইনে পাই, তবু ধার করে লেকচারের ফী জমা দিয়েছি—যদি কিছু অবস্থার উন্নতি করতে পারি।

সুরেশ। জগদ্‌গুরু আসবেন কখন? ঘণ্টা যে কাবার হয়ে এল।

চতুর্থ শ্রেণীর কথা

গবেশ্বর। কিহে পাঁচুমিয়া, এখানে কি মনে করে?

পাঁচুমিয়া। বাবুজী, এক টাকা রোজে আর দিন চলে না। তাই থারিয়া-লোটা বেচে একটা টিকিট কিনেছি, যদি কিছু হদিস পাই। তা আপনারা এত পিছে বসেছেন কেন হুজুর? সামনে গিয়ে বাবুদের সাথ বসুন না!

কাঙালীচরণ। ভয় করে।

গবেশ্বর। আমরা বেশ নিরিবিলিতে আছি। দেখ পাঁচু, তুমি যদি বক্তৃতার কোনো জায়গা বুঝতে না পার তো আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রো।

ঘণ্টাধ্বনি। জগদ্‌গুরুর প্রবেশ। মাথায় সোনার মুকুট, মুখে মুখোশ, গায়ে গেরুয়া আলখাল্লা। তিনি আসিয়া বহির্বাস খুলিয়া ফেলিলেন। মাথা কামানো, গায়ে তেল, পরনে লেংটি, ডান-হাতে বরাভয়, বাঁ-হাতে সিঁধকাটি। পট্ পট্ হাততালি।

হোমরাও। লোকটির চেহারা কি বীভৎস! চেনেন নাকি মিস্টার গ্র্যাব?

গ্র্যাব। চেনা চেনা বোধ হচ্ছে।

জগদ্‌গুরু। হে ছাত্রগণ, তোমাদের আশীর্বাদ করছি জগজ্জয়ী হও। আমি যে-বিদ্যা শেখাতে এসেছি তার জন্য অনেক সাধনা দরকার—তোমরা একদিনে বুঝতে পারবে না। আজ আমি কেবল ভূমিকামাত্র বলব। হে বালকগণ, তোমরা মন দিয়ে শোন—যেখানে খটকা ঠেকবে, আমাকে নির্ভয়ে জিজ্ঞাসা করবে।

প্রফেসার গুই। আমি স্ট্রংলি আপত্তি করছি—জগদ্‌গুরু কেন আমাদের 'বালকগণ—তোমরা' বলবেন? আমরা কি স্কুলের ছোকরা? এটা একটা রেস্পেক্‌টেবল গ্যাদারিং। এই মহারাজা হোমরাও সিং, নবাব চোমরাও আলি রয়েছেন। পদমর্যাদা যদি না ধরেন, বয়সের একটা সম্মান তো আছে। আমাদের মধ্যে অনেকের বয়স ষাট পেরিয়েছে।

হাউলার। আপনাদের বাংলা ভাষার দোষ। জগদ্‌গুরু বিদেশী লোক, 'আপনি' 'তুমি' গুলিয়ে ফেলেছেন। আর 'বালক' কথাটা কিছু নয়, ইংরেজীর ওল্ড বয়।

খুদীন্দ্র। বাংলা ভাল না জানেন তো ইংরেজীতে বলুন না।

গুই। যাই হ'ক আমি আপত্তি করছি।

মিস্টার গুহা। আমি আপত্তির সমর্থন করছি।

জগদ্‌গুরু (সহাস্যে)। বৎস, উতলা হয়ো না। আমি বাংলা ভালই জানি। বাংলা, ইংরেজী, ফরাসী, জাপানী, সবই আমার মাতৃভাষা। আমি প্রবীণ লোক, দশ-বিশ হাজার বৎসর ধ'রে এই মহাবিদ্যা শেখাচ্ছি। তোমরা আমার স্নেহের পাত্র, 'তুমি' বলবার অধিকার আমার আছে।

লুটবেহারী। নিশ্চয় আছে। আপনি আমাদের 'তুমি, তুই'—যা খুশি বলুন। আমি ও-সব গ্রাহ্য করি না। মোদ্দা, শেষকালে ফাঁকি দেবেন না।

জগদ্‌গুরু। বাপু, আমি কোনও জিনিস দিই না, শুধু শেখাই মাত্র। যা হ'ক, তোমাদের দেখে আমি বড়ই প্রীত হয়েছি। এমন-সব সোনার চাঁদ ছেলে—কেবল শিক্ষার অভাবে উন্নতি করতে পারছ না!

মিস্টার গুপ্টা। ভণিতা ছেড়ে কাজের কথা বলুন।

জগদ্‌গুরু। হে ছাত্রগণ, মহাবিদ্যা না জানলে মানুষ সুসভ্য ধনী মানী হ'তে পারে না, তাকে চিরকাল কাঠ কাটতে আর জল তুলতে হয়। কিন্তু এটা মনে রেখো যে, সাধারণ বিদ্যা আর মহাবিদ্যা এক জিনিস নয়। তোমরা পদ্যপাঠে পড়েছ—

এই ধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে,
যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।

এই কথা সাধারণ বিদ্যা সম্বন্ধে খাটে, কিন্তু মহাবিদ্যার বেলায় নয়। মহাবিদ্যা কেবল নিতান্ত অন্তরঙ্গ জনকে অতি সন্তর্পণে শেখাতে হয়। বেশী প্রচার হ'লে সমূহ ক্ষতি। বিদ্বানে বিদ্বানে সংঘর্ষ হ'লে একটু বাক্যব্যয় হয় মাত্র, কিন্তু মহাবিদ্বান্‌দের ভিতর ঠোকাঠুকি বাধলে সব চুরমার। তার সাক্ষী এই ইওরোপের যুদ্ধ। অতএব মহাবিদ্বান্‌দের একজোট হয়েই কাজ করতে হবে।

হাউলার। আমি এই লেকচারে আপত্তি করছি। এদেশের লোকে এখনও মহাবিদ্যালাভের উপযুক্ত হয় নি। আর আমাদের মহাবিদ্বানেরা দেশী মহাবিদ্বানদের সংগে বনিয়ে চলতে পারবে না। মিথ্যা একটা অশান্তির সৃষ্টি হবে।

গ্র্যাব। চুপ কর হাউলার। মহাবিদ্যা শেখা কি এ দেশের লোকের কর্ম? লেকচার শুনে হুজুরকে প'ড়ে যদি মহাবিদ্যা নিয়ে লোকে একটু ছেলেখেলা আরম্ভ করে, মন্দ কি? একটু অন্যদিকে ডিস্‌ট্র্যাক্‌শন হওয়া দেশের পক্ষে এখন দরকার হয়েছে।

হাউলার। সাধারণ বিদ্যা যখন এদেশে প্রথম চালানো হয় তখনও আমরা ব্যাপারটাকে ছেলেখেলা মনে করেছিলুম। এখন দেখছ তো ঠেলা? জোর করে টেক্স্‌ট বুক থেকে এটা-সেটা বাদ দিয়ে কি আর সামলানো যাচ্ছে?

খুদীন্দ্র। মিস্টার হাউলার ঠিক বলেছেন। আমারও ভাল ঠেকছে না।

চোমরাও আলি। ভাল-মন্দ গভর্নমেণ্ট বিচার করবেন। তবে মহাবিদ্যা যদি শেখাতেই হয়, মুসলমানদের জন্য একটা আলাদা ব্যবস্থা করা দরকার।

হোমরাও। অর্ডার, অর্ডার।

জগদ্‌গুরু। সাধারণ বিদ্যা মোটামুটি জানা না থাকলে মহাবিদ্যার ভাল রকম ব্যুৎপত্তি লাভ হয় না। পাশ্চাত্ত্য দেশে দুই বিদ্যার মণিকাঞ্চন যোগ হয়েছে। এ-দেশেও যে মহাবিদ্বান্ নেই, তা নয়—

গাঁট্টালাল। হুঁ হুঁ গুরুজী আমাকে মালুম করছেন।

রূপচাঁদ। দূর, তোকে কে চেনে? আমার দিকে চাইছেন।

জগদ্‌গুরু। তবে মূর্খ লোকে মহাবিদ্যার প্রয়োগটা আত্মসম্ভ্রম বাঁচিয়ে করতে পারে না। পাশ্চাত্ত্য দেশ এ বিষয়ে অত্যন্ত উন্নত। জরির খাপের ভিতর যেমন তলোয়ার ঢাকা থাকে, মহাবিদ্যাকেও তেমনি সাধারণ বিদ্যা দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। মহাবিদ্যার মূলসূত্রই হচ্ছে—যদি না পড়ে ধরা।

প্রফেসার গুঁই। আপনি কী সব খারাপ কথা বলছেন!

অনেকে। শেম, শেম।

জগদ্‌গুরু। বৎস, লজ্জিত হয়ো না। তোমাদেরই এক পণ্ডিত বলেন—একাং লজ্জাং পরিত্যজ্য ত্রিভুবনবিজয়ী ভব। যদি মহাবিদ্যা শিখতে চাও তবে সত্যের উলংগ মূর্তি দেখে ডরালে চলবে না। যা বলছিলুম শোন।—এই মহাবিদ্যা যখন মানুষ প্রথমে শেখে তখন সে আনাড়ী শিকারীর মত বিদ্যার অপপ্রয়োগ করে। যেখানে ফাঁদ পেতে কার্যসিদ্ধি হ'তে পারে সেখানে সে কুস্তি ল'ড়ে বাঘ মারতে যায়। দু-চারটে বাঘ হয়তো মরে; কিন্তু শিকারীও শেষে ঘায়েল হয়। বিদ্যাগুপ্তির অভাবেই এই বিপদ হয়। মানুষ যখন আর একটু চালাক হয়, তখন সে ফাঁদ পাততে আরম্ভ করে, নিজে লুকিয়ে থাকে। কিন্তু গোটাকতক বাঘ ফাঁদে পড়লেই আর সব বাঘ ফাঁদ চিনে ফেলে, আর সেদিকে আসে না, আড়াল থেকে টিটকারি দেয়, শিকারীরও ব্যবসা বন্ধ হয়। ফাঁদটা এমন হওয়া চাই যেন কেউ ধ'রে না ফেলে। মহাবিদ্যাও সেই রকম গোপন রাখা দরকার। তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো নিজের অজ্ঞাতসারে কেবল সংস্কারবশে মহাবিদ্যার প্রয়োগ কর। এতে কখনও উন্নতি হবে না। পরের কাছে প্রকাশ করা নিষেধ; কিন্তু নিজের কাছে লুকোলে মহাবিদ্যায় মরচে পড়বে। সজ্ঞানে ফলাফল বুঝে মহাবিদ্যা চালাতে হয়।

গুঁই। বড়ই গোলমেলে কথা।

লুটবেহারী। কিছু না, কিছু না। জগদ্‌গুরু নূতন কথা আর কি বলছেন। প্র্যাক্‌টিস আমার সবই জানা আছে, তবে থিওরিটা শেখবার তেমন সময় পাইনি।

গুহা। এতদিন ছিলে কোথা হে?

লুটবেহারী। শ্বশুরবাড়ি। সেদিন খালাস পেয়েছি।

গুহা। নাঃ, তোমার দ্বারা কিছু হবে না। এই তো ধরা দিয়ে ফেললে।

লুটবেহারী। আপনাকে বলতে আর দোষ কি! দু-জনেই মহাবিদ্বান্, মাসতুতো ভাই।

হোমরাও। অর্ডার, অর্ডার।

গুহা। আচ্ছা গুরুদেব, মহাবিদ্যা শিখলে কি আমাদের দেশের সকলেরই উন্নতি হবে?

জগদ্গুরু। দেখ বাপু, পৃথিবীর ধনসম্পদ্ যা দেখছ, তার একটা সীমা আছে, বেশী বাড়ানো যায় না। সকলেই যদি সমান ভাগে পায়, তবে কারও পেট ভরে না। যে জিনিস সকলেই অবাধে ভোগ করতে পারে, সেটা আর সম্পত্তি ব'লে গণ্য হয় না। কাজেই জগতের ব্যবস্থা এই হয়েছে যে জনকতক ভোগদখল করবে, বাকি সবাই যুগিয়ে দেবে। চাই গুটিকতক মহাবিদ্বান্ আর একগাদা মহামূর্খ।

খুদীন্দ্র। শুনছেন মহারাজা? এই কথাই তো আমরা বরাবর ব'লে আসছি। আরিস্টোক্রাসি না হ'লে সমাজ টিকবে কিসে? লোকে আবার আমাদের বলে মূর্খ—অযোগ্য। হুঁঃ!

জগদ্গুরু। ভুল বুঝলে বৎস। তোমার পূর্বপুরুষরাই মহাবিদ্বান্ ছিলেন, তুমি নও। তুমি কেবল অতীতে অর্জিত বিদ্যার রোমন্থন করছ। তোমার আশে-পাশে মহাবিদ্বান্‌রা ওত পেতে বসে আছেন। যদি তাঁদের সংগে পাল্লা দিতে না শেখ তবে শীঘ্রই গাদায় গিয়ে পড়বে।

প্রফেসর গুই। পরিষ্কার করেই বলুন না মহাবিদ্যাটা কি।

তৃতীয় শ্রেণী হতে। ব'লে ফেলুন সার, ব'লে ফেলুন। ঘণ্টা বাজতে বেশী দেরি নেই।

জগদ্গুরু। তবে বলছি শোন। মহাবিদ্যায় মানুষের জন্মগত অধিকার; কিন্তু একে ঘ'ষে মেজে পালিশ ক'রে সভ্যসমাজের উপযুক্ত ক'রে নিতে হয়। ক্রমোন্নতির নিয়মে মহাবিদ্যা এক স্তর হ'তে উচ্চতর স্তরে পেণছেছে। জানিয়ে শুনিয়ে সোজাসুজি কেড়ে নেওয়ার নাম ডাকাতি—

ছাত্রগণ। সেটা মহাপাপ—চাই না, চাই না।

জগদ্গুরু। দেশের জন্য যে ডাকাতি, তার নাম বীরত্ব—

ছাত্রগণ। তা আমাদের দিয়ে হবে না, হবে না!

হাউলার। Bally rot।

জগদ্গুরু। নিজে লুকিয়ে থেকে কেড়ে নেওয়ার নাম চুরি—

ছাত্রগণ। ছ্যা—ছ্যা, আমরা তাতে নেই, তাতে নেই।

লুটবেহারী। কিহে গাট্টালাল, চুপ ক'রে কেন? সায় দাও না।

জগদ্গুরু। ভালমানুষ সেজে কেড়ে নিয়ে শেষে ধরা পড়ার নাম জুয়াচুরি—

ছাত্রগণ। রাম কহ, তোবা, থুঃ।

গুহা। কি লুটবেহারী, চোখ বুজে কেন?

জগদ্গুরু। আর যাতে ঢাক পিটিয়ে কেড়ে নেওয়া যায়, অথচ শেষ পর্যন্ত নিজের মানসম্ভ্রম বজায় থাকে লোকে জয়-জয়কার করে—সেটা মহাবিদ্যা।

ছাত্রগণ। জগদ্গুরু কি জয়! আমরা তাই চাই, তাই চাই।

গুই। কিন্তু ঐ কেড়ে নেওয়া কথাটা একটু আপত্তিজনক।

লুটবেহারী। আপনার মনে পাপ আছে, তাই খটকা বাধছে। কেড়ে নেওয়া পছন্দ না হয়, বলুন ভোগা দেওয়া।

গুই। কে হে বেহায়া তুমি? তোমার কনশেন্স নেই?

জগদ্‌গুরু। বৎস, কেড়ে নেওয়াটা রূপক মাত্র। সাদা কথায় এর মানে হচ্ছে—সংসারের মঙ্গলের জন্য লোককে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কিছু আদায় করা।

লুটবেহারী। আমার তো সবে একটি সংসার। কিছু আদায় করতে পারলেই ছছল-বছল। নবাবসাহেবের বরঞ্চ—

হোমরাও। অর্ডার, অর্ডার।

গুঁই। দেখুন জগদ্‌গুরু, আমার দ্বারা বিবেক-বিরুদ্ধ কাজ হবে না। কিন্তু ঐ যে আপনি বললেন—সংসারের মঙ্গলের জন্যে, সেটা খুব মনে লেগেছে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—

লুটবেহারী। মশায়, ভগবান বেচারাকে নিয়ে যখন-তখন টানাটানি করবেন না, চটে উঠবেন!

নিতাই। আচ্ছা, সকলেই যদি মহাবিদ্যা শিখে ফেলে তা হলে কি হবে?

জগদ্‌গুরু। সে ভয় নেই। তোমরা প্রত্যেকে যদি প্রাণপণে চেষ্টা কর, তা হলেও কেবল দু-চারজন ওতরাতে পার।

সুরেশ। সার, একবার টেস্ট ক'রে নিন না।

জগদ্‌গুরু। এখন পরীক্ষা করলে বিশেষ ভাল ফল পাওয়া যাবে না। অনেক সাধনা দরকার।

নিরেশ। কিছু-মার্কও কি পাব না?

জগদ্‌গুরু। কিছু-কিছু পাবে বই কি। কিন্তু তাতে এখন ক'রে-খেতে পারবে না।

নিরেশ। তবে না হয় আমাদের কিছু হোম-একসারসাইজ দিন।

জগদ্‌গুরু। বাড়িতে তো সুবিধা হবে না বাছা। এখন তোমরা নিতান্ত অপোগণ্ড। দিনকতক দল বেঁধে মহাবিদ্যার চর্চা কর।

খুদীন্দ্র। ঠিক বলেছেন। আসুন মহারাজ, আপনি আমি আর নবাবসাহেব মিলে একটা অ্যাসোসিয়েশন করা যাক।

প্রফেসর গুঁই। আমাকেও নেবেন, আমি স্পীচ লিখে দেব।

মিস্টার গুহ। নিতাইবাবু, আমি ভাই তোমার সঙ্গে আছি।

লুটবেহারী। আমি একাই এক শ। তবে রূপচাঁদবাবু যদি দয়া ক'রে সঙ্গে নেন।

রূপচাঁদ। খবরদার, তুমি তফাত থাক।

লুটবেহারী। বটে? তোমার মত ঢের-ঢের বড়লোক দেখেছি।

গাঁড়ালাল। আমরা কারও তোয়াক্কা রাখি না—কি বল তেওয়ারীজী?

মিস্টার গুপ্টা। ভাবনা কি সুরেশবাবু, নিরেশবাবু। আমি টেকনিক্যাল ক্লাস খুলছি, ভর্তি হ'ন। তরল আলতা, গোলাবী বিড়ি, ঘড়ি-মেরামত, ঘুড়ি-মেরামত, দাঁত-বাঁধানো, ধামা-বাঁধানো সব শিখিয়ে দেব।

দীনেশ। গুরুদেব, চুপি-চুপি একটা নিবেদন করতে পারি কি?

জগদ্‌গুরু। বল বৎস।

দীনেশ। দেখুন, আমি নিতান্তই মুরুব্বীহীন। মহাবিদ্যার একটা সোজা তুকতাক—বেশী নয়, যাতে লাখ-খানেক টাকা আসে—যদি দয়া ক'রে গরিবকে শিখিয়ে দেন।

জগদ্‌গুরু। বাপু, তোমার গতিক ভাল বোধ হচ্ছে না। মহাবিদ্বান্ অপরকেই তুকতাক শেখায়—নিজে ও সবে বিশ্বাস করে না।

দীনেশ। টিকিটের টাকাটাই নষ্ট। তার চেয়ে ডার্বির টিকিট কিনলে বরং কিছুদিন আশায় আশায় কাটাতে পারতুম।

গবেশ্বর। আমার কি হবে প্রভু? কেউ যে দলে নিচ্ছে না।

জগদ্‌গুরু। তুমি ছেলে তৈরি কর। তাদের শেখাও—মহাবিদ্যা শেখে যে, গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে।

পাঁচুমিয়া। আমার কি করলেন ধর্মাবতার?

জগদ্‌গুরু। তুমি এখানে এসে ভাল করনি বাপু। তোমার গুরু রুশিয়া থেকে আসবেন, এখন ধৈর্য ধ'রে থাক।

গুহা। দশহাজার টাকা চাঁদা তুলতে পারিস? ইউনিয়ন খুলে এমন হুড়ো লাগাব যে এখনি তোদের মজুরি পাঁচগুণ হয়ে যাবে।

মিস্টার গ্র্যাব। সাবধান, আমার চটকলের ত্রিসীমানার মধ্যে যেন এস না।

গুহা। (চুপি চুপি) তবে আপনার বাড়ি গিয়ে দেখা করব কি?

কাঙালীচরণ। দেবতা আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি?

জগদ্‌গুরু। তোমার আবার কি চাই? ব'লে ফেল।

কাঙালী। যদি কখনও মহাবিদ্যা ধরা প'ড়ে যায়, তখন অবস্থাটা কি রকম হবে?

জগদ্‌গুরু। (ঈষৎ হাসিয়া বেদী হইতে নামিয়া পড়িলেন)।

ঘণ্টা ও কোলাহল

ভারতবর্ষ, ফাল্গুন ১৩২৯ (১৯২২)





রায় বংশলোচন ব্যানার্জি বাহাদুর জমিদার অ্যান্ড অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট বেলেঘাটা-বেণ্ড প্রত্যহ বৈকালে খালের ধারে হাওয়া খাইতে যান। চল্লিশ পার হইয়া ইনি একটু মোটা হইয়া পড়িয়াছেন; সেজন্য ডাক্তারের উপদেশে হাঁটিয়া এক্সারসাইজ করেন এবং ভাত ও লুচি বর্জন করিয়া দু-বেলা কচুরি খাইয়া থাকেন।

কিছুক্ষণ পায়চারি করিয়া বংশলোচনবাবু ক্লান্ত হইয়া খালের ধারে একটা ঢিপির উপর রুমাল বিছাইয়া বসিয়া পড়িলেন। ঘড়ি দেখিলেন—সাড়ে-ছটা বাজিয়া গিয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ। সিলোনে মনসুন পৌঁছিয়াছে। এখানেও যে-কোনও দিন হঠাৎ ঝড়-জল হওয়া বিচিত্র নয়। বংশলোচন উঠিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া হাতের বর্মাচুরুটে একবার জোরে টান দিলেন। এমন সময় বোধ হইল, কে যেন পিছু হইতে তাঁর জামার প্রান্ত ধরিয়া টানিতেছে এবং মিহি সুরে বলিতেছে—হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ!' ফিরিয়া দেখিলেন—একটি ছাগল।

বেশ হৃষ্টপুষ্ট ছাগল। কুচকুচে কালো নধর দেহ, বড় বড় লটপটে কানের উপর কচি পটলের মত দুটি শিং বাহির হইয়াছে। বয়স বেশী নয়, এখনও অজাতশ্মশ্রু। বংশলোচন বলিলেন—'আরে এটা কোথা থেকে এল? কার পাঁঠা? কাকেও তো দেখছি না।'

ছাগল উত্তর দিল না। কাছে ঘেঁষিয়া লোলুপনেত্রে তাঁহাকে পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। বংশলোচন তাহার মাথায় ঠেলা দিয়া বলিলেন—'যাঃ পালা, ভাগো হিঁয়াসে।' ছাগল পিছনের

দুপায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, এবং সামনের দু-পা মুড়িয়া ঘাড় বাঁকাইয়া রায়বাহাদুরকে ঢুঁ মারিল।

রায়বাহাদুর কৌতুক বোধ করিলেন। ফের ঠেলা দিলেন। ছাগল আবার খাড়া হইল এবং খপ করিয়া তাঁহার হাত হইতে চুরুটটি কাড়িয়া লইল। আহারান্তে বলিল—'অর্-র্-র্' অর্থাৎ আর আছে?

বংশলোচনের সিগার-কেসে আর একটিমাত্র চুরুট ছিল। তিনি সেটি বাহির করিয়া দিলেন। ছাগলের মাথা-ঘোরা, গা-বমি বা অপর কোনও ভাব-বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পাইল না। দ্বিতীয় চুরুট নিঃশেষ করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—'অর-র্-র্?' বংশলোচন বলিলেন —'আর নেই! তুই এইবার যা। আমিও উঠি।'

ছাগল বিশ্বাস করিল না, পকেট তল্লাশ করিতে লাগিল। বংশলোচন নিরুপায় হইয়া চামড়ার সিগার-কেসটি খুলিয়া ছাগলের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন—'না বিশ্বাস হয়, এই দেখ্ বাপু।' ছাগল এক লম্ফে সিগার-কেস কাড়িয়া লইয়া চর্বণ আরম্ভ করিল। রায়বাহাদুর রাগিবেন কি হাসিবেন স্থির করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন—'শ্-শালা।'

অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। আর দেরি করা উচিত নয়। বংশলোচন গৃহাভিমুখে চলিলেন। ছাগল কিন্তু তাঁহার সঙ্গ ছাড়িল না। বংশলোচন বিব্রত হইলেন। কার ছাগল কি বৃত্তান্ত তিনি কিছুই জানেন না, নিকটে কোনও লোক নাই যে জিজ্ঞাসা করেন। ছাগলটাও নাছোড়বান্দা, তাড়াইলে যায় না। অগত্যা বাড়ি লইয়া যাওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। পথে যদি মালিকের সন্ধান পান ভালই, নতুবা কাল সকালে যা হ'ক একটা ব্যবস্থা করিবেন।

বাড়ি ফিরিবার পথে বংশলোচন অনেক খোঁজ লইলেন; কিন্তু কেহই ছাগলের ইতিবৃত্ত বলিতে পারিল না। অবশেষে তিনি হতাশ হইয়া স্থির করিলেন যে আপাতত নিজেই উহাকে প্রতিপালন করিবেন।

হঠাৎ বংশলোচনের মনে একটা কাঁটা খচ করিয়া উঠিল। তাঁহার যে এখন পত্নীর সঙ্গে কলহ চলিতেছে। আজ পাঁচ দিন হইল কথা বন্ধ। ইঁহাদের দাম্পত্য কলহ বিনা আড়ম্বরে নিষ্পন্ন হয়। সামান্য একটা উপলক্ষ্য, দু-চারটি নাতিতীক্ষ্ন বাক্যবাণ, তার পর দিন কতক অহিংস অসহযোগ, বাক্যালাপ বন্ধ, পরিশেষে হঠাৎ একদিন সন্ধি-স্থাপন ও পুনর্মিলন। এরকম প্রায়ই হয়, বিশেষ উদ্বেগের কারণ নাই। কিন্তু আপাতত অবস্থাটি সুবিধাজনক নয়। গৃহিণী জন্তু-জানোয়ার মোটেই পছন্দ করেন না। বংশলোচনের একবার কুকুর পোষার শখ হইয়াছিল, কিন্তু গৃহিণীর প্রবল আপত্তিতে তাহা সফল হয় নাই। আজ একে কলহ চলিতেছে তার উপর ছাগল লইয়া গেলে আর রক্ষা থাকিবে না। একে মনসা, তায় ধুনার গন্ধ।

চলিতে চলিতে রায়বাহাদুর পত্নীর সহিত কাল্পনিক বাগ্‌যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। একটা পাঁঠা পুষিবেন তাতে কার কি বলিবার আছে? তাঁর কি স্বাধীনভাবে একটা শখ মিটাইবার ক্ষমতা নাই? তিনি একজন মান্যগণ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, বেলেঘাটা রোডে তাঁহার প্রকাণ্ড অট্টালিকা, বিস্তর ভূসম্পত্তি। তিনি একজন খেতাবধারী অনারারি হাকিম,—পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা, এক মাস পর্যন্ত জেল দিতে পারেন। তাঁহার কিসের দুঃখ, কিসের নার-ভস্‌নেস? বংশলোচন বার বার মনকে প্রবোধ দিলেন—তিনি কাহারও তোয়াক্কা রাখেন না।

বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানায় যে সান্ধ্য আড্ডা বসে তাহাতে নিত্য বহুসংখ্যক রাজা-উজির বধ হইয়া থাকে। লাটসাহেব, সুরেন বাঁড়ুজ্যে, মোহনবাগান, পরমার্থতত্ত্ব, প্রতিবেশী অধর-বুড়োর শ্রাদ্ধ, আলিপুরের নূতন কুমির—কোন প্রসঙ্গই বাদ যায় না। সম্প্রতি সাত

দিন ধরিয়া বাঘের বিষয় আলোচিত হইতেছিল। এই সূত্রে গতকল্য বংশলোচনের শ্যালক নগেন এবং দূরসম্পর্কের ভাগিনেয় উদয়ের মধ্যে হাতাহাতির উপক্রম হয়। অন্যান্য সভ্য অনেক কষ্টে তাহাদিগকে নিরস্ত করেন।

বংশলোচনের বৈঠকখানা ঘরটি বেশ বড় ও সুসজ্জিত, অর্থাৎ অনেকগুলি ছবি, আয়না, আলমারি, চেয়ার ইত্যাদি জিনিসপত্রে ভরতি। প্রথমেই নজরে পড়ে একটি কার্পেটে বোনা ছবি, কাল জমির উপর আসমানী রঙের বিড়াল। যুদ্ধের সময় বাজারে সাদা পশম ছিল না, সুতরাং বিড়ালটির এই দশা হইয়াছে। ছবির নীচে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বড় বড় ইংরেজী অক্ষরে লেখা—CAT। তার নীচে রচয়িত্রীর নাম—মানিনী দেবী। ইনিই গৃহকর্ত্রী। ঘরের অপর দিকের দেওয়ালে একটি রাধাকৃষ্ণের তৈলচিত্র। কৃষ্ণ রাধাকে লইয়া কদমতলায় দাঁড়াইয়া আছেন, একটি প্রকাণ্ড সাপ তাহাদিগকে পাক দিয়া পিষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু রাধাকৃষ্ণের ভ্রূক্ষেপ নাই; কারণ সাপটি বাস্তবিক সাপ নয়, ওঁ-কার মাত্র। তা-ছাড়া কতকগুলি মেমের ছবি আছে, তাদের অঙ্গে সিল্কের ব্রাহ্মশাড়ি এবং মাথায় কাল সুতার আলুলায়িত পরচুলা ময়দার কাই দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও তাহাদের মুখের দুরন্ত মেম-মেম-ভাব ঢাকা পড়ে নাই, সেজন্য জোর করিয়া নাক বিঁধাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ঘরে দুটি দেওয়াল-আলমারিতে চীনেমাটির পুতুল এবং কাচের খেলনা ঠাসা। উপরের শুইবার ঘরের চারিটি আলমারি বোঝাই হইয়া যাহা বাড়তি হইয়াছে তাহাই নীচে স্থান পাইয়াছে। ইহা ভিন্ন আরও নানাপ্রকার আসবাব, যথা—রাজা-রানীর ছবি, রায়-বাহাদুরের পরিচিত ও অপরিচিত ছোট-বড় সাহেবের ফোটোগ্রাফ, গিলটির ফ্রেমে বাঁধানো আয়না, অ্যালম্যানাক, ঘড়ি, রায়বাহাদুরের সনদ, কয়েকটি অভিনন্দনপত্র ইত্যাদি আছে।

আজ যথাসময়ে আড্ডা বসিয়াছে। বংশলোচন এখনও বেড়াইয়া ফেরেন নাই। তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু বিনোদ উকিল ফরাশের উপর তাকিয়া ঠেস দিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছেন। বৃদ্ধ কেদার চাটুজ্যে মহাশয় হুঁকা হাতে ঝিমাইতেছেন। নগেন ও উদয় অতি কষ্টে ক্রোধ রুদ্ধ করিয়া ওত পাতিয়া বসিয়া আছে, একটা ছুতা পাইলেই পরস্পরকে আক্রমণ করিবে।

আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া উদয় বলিল—'যাই বল, বাঘের মাপ কখনই ল্যাজ-সুদ্ধ হ'তে পারে না। তা হ'লে মেয়েছেলেদের মাপও চুল-সুদ্ধ হবে না কেন? আমার বউ-এর বিনুনিটাই তো তিনফুট হবে। তবে কি বলতে চাও, বউ আট ফুট লম্বা?'

নগেন বলিল—'দেখ্ উদো, তোর বউ-এর বর্ণনা আমরা মোটেই শুনতে চাই না। বাঘের কথা বলতে হয় বল্।'

চাটুজ্যে মহাশয়ের তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। বলিলেন—'আঃ হা, তোমাদের এখানে কি বাঘ ছাড়া অন্য জানোয়ার নেই?'

এমন সময় বংশলোচন ছাগল লইয়া ফিরিলেন। বিনোদবাবু বলিলেন—'বাহবা, বেশ পাঁঠাটি তো। কত দিয়ে কিনলে হে?'

বংশলোচন সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। বিনোদ বলিলেন—'বেওয়ারিস মাল, বেশী দিন ঘরে না রাখাই ভাল। সাবাড় ক'রে ফেল—কাল রবিবার আছে, লাগিয়ে দাও।'

চাটুজ্যে মশায় ছাগলের পেট টিপিয়া বলিলেন—'দিব্বি পুরুষ্টু পাঁঠা। খাসা কালিয়া হবে।'

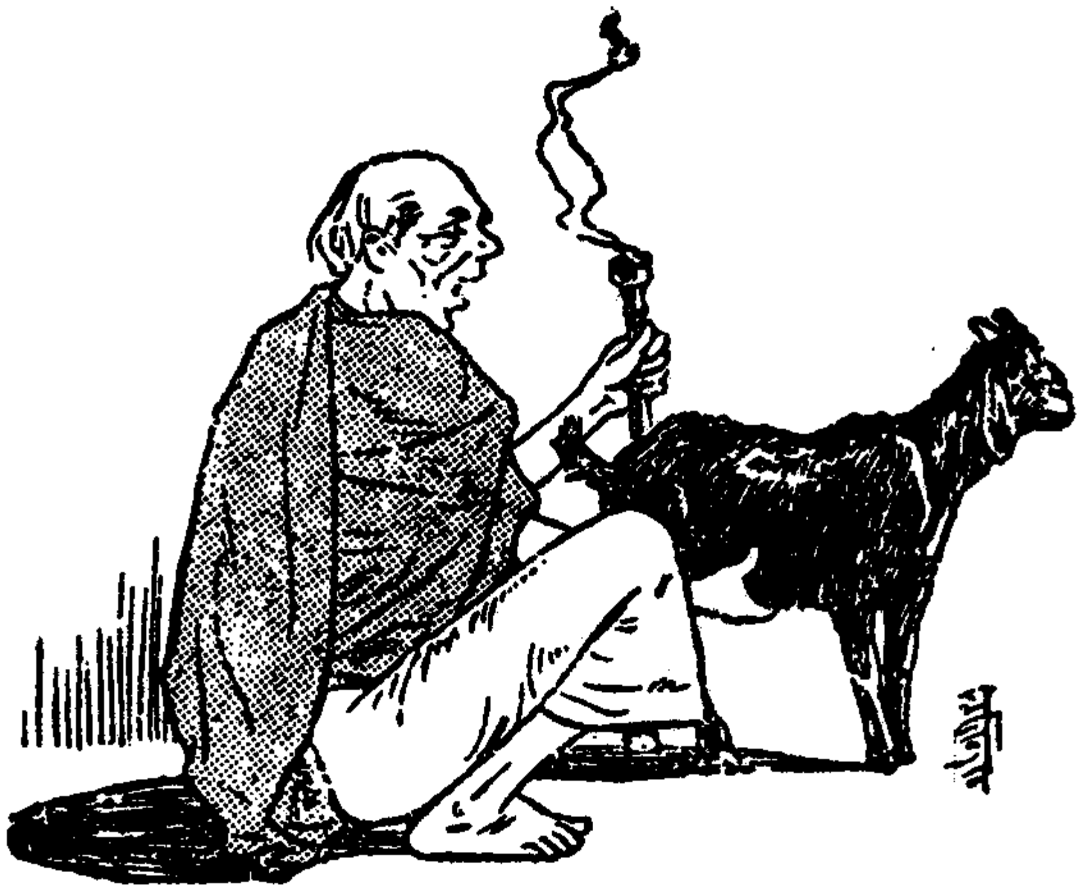
নগেন ছাগলের ঊরু টিপিয়া বলিল—'উহুঁ হাঁড়িকাবাব। একটু বেশী করে আদা-বাটা আর প্যাঁজ।

উদয় বলিল—'ওঃ, আমার বউ অ্যায়সা গুলিকাবাব করতে জানে!

নগেন ভ্রূকুটি করিয়া বলিল—'উদো, আবার?'

বংশলোচন বিরক্ত হইয়া বলিলেন—'তোমাদের কি জন্তু দেখলেই খেতে ইচ্ছে করে? একটা নিরীহ অনাথ প্রাণী আশ্রয় নিয়েছে, তা কেবল কালিয়া আর কাবাব!'

ছাগলের সংবাদ শুনিয়া বংশলোচনের সপ্তমবর্ষীয়া কন্যা টেঁপী এবং সর্বকনিষ্ঠ পুত্র ঘেণ্টু ছুটিয়া আসিল। ঘেণ্টু বলিল—'ও বাবা, আমি পাঁঠা খাব। পাঁঠার ম-ম-ম—'



'দিব্ব পুরুষ্টু পাঁঠা'

বংশলোচন বলিলেন—'যা যাঃ, শুনে শুনে কেবল খাই খাই শিখছেন।'

ঘেণ্টু হাত-পা ছুঁড়িয়া বলিল—'হ্যাঁ আমি ম-ম-ম-মেটুলি খাব।'

টেঁপী বলিল—'বাবা, আমি পাঁঠাকে পুষবো, একটু লাল ফিতে দাও না।'

বংশলোচন। বেশ তো একটু খাওয়া-দাওয়া করুক. তার পর নিয়ে খেলা করিস এখন।

টেঁপী। পাঁঠার নাম কি বল না?

বিনোদ বলিলেন—'নামের ভাবনা কি। ভাস্বুরক. দধিমুখ, মসীপুচ্ছ, লম্বকর্ণ—'

চাটুজ্যে বলিলেন—'লম্বকর্ণই ভাল।'

বংশলোচন কন্যাকে একটু অন্তরালে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'টেঁপু, তোর মা এখন কি করছে রে?'

টেঁপী। এক্ষুনি তো কল-ঘরে গেছে।

বংশলোচন। ঠিক জানিস? তা হ'লে এখন এক ঘণ্টা নিশ্চিন্দি। দেখ্. ঝিকে বল, চট্ করে ঘোড়ার ভেজানো-ছোলা চাট্টি এনে এই বাইরের বারান্দায় যেন ছাগলটাকে খেতে দেয়। আর দেখ্, বাড়ির ভেতরে নিয়ে যাস নি যেন।

উৎসাহের আতিশয্যে টেঁপী পিতার আদেশ ভুলিয়া গেল। ছাগলের গলায় লাল ফিতা বাঁধিয়া টানিতে টানিতে অন্দরমহলে লইয়া গিয়া বলিল—'ও মা, শীগ্গির এস, লম্বকর্ণ দেখবে এস।'

মানিনী মুখ মুছিতে মুছিতে স্নানের ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন—'আ মর. ওটাকে কে আনলে? দূর দূর—ও ঝি, ও বাতাসী, শীগ্গির ছাগলটাকে বার করে দে, ঝাঁটা মার।'

টে‘পী বলিল—‘বা রে, ওকে তো বাবা এনেছে, আমি পুষব।’

ঘেণ্টু বলিল—‘ঘোড়া-ঘোড়া খেলব।’

মানিনী বলিলেন—‘খেলা বার ক’রে দিচ্ছি। ভদ্দর লোকে আবার ছাগল পোষে! বেরো বেরো—ও দরওয়ান, ও চুকন্দর সিং—’

‘হুজোর’ বলিয়া হাঁক দিয়া চুকন্দর সিং হাজির হইল! শীর্ণ খর্বাকৃতি বৃদ্ধ, গালপাট্টা দাড়ি, পাকানো গোঁফ, জাঁকালো গলা এবং ততোধিক জাঁকালো নাম—ইহারই জোরে সে চোট্টা এবং ডাকুর আক্রমণ হইতে দেউড়ি রক্ষা করে।



‘হুজোর

অন্দরের মধ্যে হট্টগোল শুনিয়া রায়বাহাদুর বুঝিলেন যুদ্ধ অনিবার্য। মনে মনে তাল ঠুকিয়া বাড়ির ভিতরে আসিলেন। গৃহিণী তাঁহার প্রতি দৃকপাত না করিয়া দরোয়ানকে বলিলেন—‘ছাগলটাকে আভি নিকাল দেও, একদম ফটকের বাইরে। নেই তো এক্ষুনি ছিষ্টি নোংরা করেগা।’

চুকন্দর বলিল—‘বহুত আচ্ছা।’

বংশলোচন পাল্টা হুকুম দিলেন—‘দেখো চুকন্দর সিং, এই বকরি গেটের বাইরে যাগা তো তোমরা নোকরি ভি যাগা।’

চুকন্দর বলিল—'বহুত আচ্ছা।'

মানিনী স্বামীর প্রতি একটি অগ্নিময় নয়নবান হানিয়া বলিলেন—'হ্যাঁলা টেঁপী হতচ্ছাড়ী, রাত্তির হয়ে গেল—গিলতে হবে না? থাকিস তুই ছাগল নিয়ে, কাল যাচ্ছি আমি হাটখোলায়।' হাটখোলায় গৃহিণীর পিত্রালয়।

বংশলোচন বলিলেন—'টেঁপু, ঝিকে ব'লে দে, বৈঠকখানা-ঘরে আমার শোবার বিছানা ক'রে দেবে। আমি সিঁড়ি ভাঙতে পারি না। আর দেখ্ ঠাকুরকে বল আমি মাংস খাব না। শুধু খানকতক কচুরি, একটু ডাল আর পটলভাজা।'

পুরাকালে বড়লোকদের বাড়িতে একটি করিয়া গোসাঘর থাকিত। ক্রুদ্ধা আর্যনারীগণ সেখানে আশ্রয় লইতেন। কিন্তু আর্যপুত্রদের জন্য সে-রকম কোনও পাকা বন্দোবস্ত ছিল না অগত্যা তাঁহারা এক পত্নীর সহিত মতান্তর হইলে অপর এক পত্নীর দ্বারস্থ হইতেন। আজকাল খরচপত্র বাড়িয়া যাওয়ায় এই সকল সুন্দর প্রাচীন প্রথা লোপ পাইয়াছে। এখন মেয়েদের ব্যবস্থা শুইবার ঘরের মেঝের উপর মাদুর অথবা তেমন তেমন হইলে বাপের বাড়ি। আর ভদ্রলোকদের একমাত্র আশ্রয় বৈঠকখানা।

আহারান্তে বংশলোচন বৈঠকখানা-ঘরে একাকী শয়ন করিলেন। অন্ধকারে তাঁর ঘুম হয় না, এজন্য ঘরের এক কোণে পিলসুজের উপর একটা রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলিতেছে। কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করিয়া বংশলোচন উঠিয়া ইলেক্‌ট্রিক লাইট জ্বালিলেন এবং এক-খানি গীতা লইয়া পড়িতে বসিলেন। এই গীতাটি তাঁর দুঃসময়ের সম্বল, পত্নীর সহিত অসহযোগ হইলে তিনি এটি লইয়া নাড়াচাড়া করেন এবং সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন। কর্মযোগ পড়িতে পড়িতে বংশলোচন ভাবিতে লাগিলেন—তিনি কী এমন অন্যায় কাজ করিয়াছেন যার জন্য মানিনী এরূপ ব্যবহার করেন? বাপের বাড়ি যাবেন —ইস, ভারী তেজ! তিনি ফিরাইয়া আনিবার নামটি করিবেন না, যখন গরজ হইবে আপনিই ফিরিবে। গৃহিণী শখ করিয়া যে-সব জঞ্জাল ঘরে পোরেন তা তো বংশলোচন নীরবে বরদাস্ত করেন। এই তো সেদিন পনরটা জলচৌকি তেইশটা বঁটি এবং আড়াই শ টাকার খাগড়াই বাসনা কেনা হইয়াছে, আর দোষ হইল কেবল ছাগলের বেলা? হুঃ, যতো সব—। বংশলোচন গীতাখানি সরাইয়া রাখিয়া আলোর সুইচ বন্ধ করিলেন এবং ক্ষণকাল পরে নাসিকাধ্বনি করিতে লাগিলেন।

লম্বকর্ণ বারান্দায় শুইয়া রোমন্থন করিতেছিল। দুইটা বর্মা চুরুট খাইয়া তাহার ঘুম চটিয়া গিয়াছে। রাত্রি একটা আন্দাজ জোরে হাওয়া উঠিল। ঠাণ্ডা লাগায় সে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল। বৈঠকখানা-ঘর হইতে মিটমিটে আলো দেখা যাইতেছে। লম্বকর্ণ তাহার বন্ধনরজ্জু চিবাইয়া কাটিয়া ফেলিল এবং দরজা খোলা পাইয়া নিঃশব্দে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল।

আবার তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে। ঘরের চারিদিকে ঘুরিয়া একবার তদারক করিয়া লইল। ফরাশের এক কোণে একগোছা খবরের কাগজ রহিয়াছে। চিবাইয়া দেখিল, অত্যন্ত নীরস। অগত্যা সে গীতার তিন অধ্যায় উদরস্থ করিল। গীতা খাইয়া গলা শুখাইয়া গেল। একটা উঁচু তেপায়ার উপর এক কুঁজা জল আছে, কিন্তু তাহা নাগাল পাওয়া যায় না। লম্বকর্ণ তখন প্রদীপের কাছে গিয়া রেড়ির তেল চাখিয়া দেখিল, বেশ সুস্বাদু। চকচক করিয়া সবটা খাইল। প্রদীপ নিবিল।

বংশলোচন স্বপ্ন দেখিতেছেন—সন্ধিস্থাপন হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ পাশ ফিরিতে তাঁহার একটা নরম গরম স্পন্দনশীল স্পর্শ অনুভব হইল। নিদ্রাবিজড়িত স্বরে বলিলেন—'কখন এলে?' উত্তর পাইলেন—'হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ।'

হুলস্থূল কান্ড। চোর—চোর—বাঘ হ্যায়—এই চুকন্দর সিং—জল্‌দি আও—নগেন—উদো-শাগ্‌গির আয়—মেরে ফেললে—

চুকন্দর তার মুঙ্গেরী বন্দুকে বারুদ ভরিতে লাগিল। নগেন ও উদয় লাঠি ছাতা টেনিস ব্যাট যা পাইল তাই লইয়া ছুটিল। মানিনী ব্যাকুল হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে নামিয়া আসিলেন। বংশলোচন ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইলেন। লম্বকর্ণ দু-এক ঘা মার খাইয়া ব্যা ব্যা করিতে লাগিল। বংশলোচন ভাবিলেন বাঘ বরঞ্চ ছিল ভাল। মানিনী ভাবিলেন, ঠিক হয়েছে।

ভোরবেলা বংশলোচন চুকন্দরকে পাড়ায় খোঁজ লইতে বলিলেন—কোনও ভালা আদমী ছাগল পুষিতে রাজী আছে কি না। যে-সে লোককে তিনি ছাগল দিবেন না। এমন লোক চাই যে যত্ন করিয়া প্রতিপালন করিবে, টাকার লোভে বেচিবে না, মাংসের লোভে মারিবে না।

আটটা বাজিয়াছে। বংশলোচন বহির্বাটীর বারান্দায় চেয়ারে বসিয়া আছেন, নাপিত কামাইয়া দিতেছে। বিনোদবাবু ও নগেন অমৃতবাজারে ড্যালহাউসি ভার্সস মোহনবাগান পড়িতেছেন। উদয় ল্যাংড়া আমের দর করিতেছে। এমন সময় চুকন্দর আসিয়া সেলাম করিয়া বলিল—'লাটুবাবু আয়ে হেঁ।'

তিনজন সহচরের সহিত লাটুবাবু বারান্দায় আসিয়া নমস্কার করিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের বেশভূষা প্রায় একই প্রকার—ঘাড়ের চুল আমূল ছাঁটা, মাথার উপর পর্বতাকার তেড়ি, রগের কাছে দু-গোছা চুল ফণা ধরিয়া আছে। হাতে রিস্ট-ওয়াচ, গায়ে আগুল্‌ফ-লম্বিত পাতলা পঞ্জাবি, তার ভিতর দিয়া গোলাপী গেঞ্জির আভা দেখা যাইতেছে। পায়ে পাম্পেটা, কানে অর্ধদগ্ধ সিগারেট।

বংশলোচন বলিলেন—'আপনাদের কোত্থেকে আসা হচ্ছে?'

লাটুবাবু বলিলেন—'আমরা বেলেঘাটা কেরাসিন ব্যান্ড। ব্যান্ড-মাস্টার লটবর লন্দী—প্রধান। লোকে লাটুবাবু ব'লে ডাকে। শুনলুম আপনি একটি পাঁঠা বিলিয়ে দেবেন, তাই সঠিক খবর লিতে এসেছি।'

বিনোদ বলিলেন—'আপনারা বুঝি কানেস্তারা বাজান?'

লাটু। কানেস্তারা কি মশায়? দস্তুরমত কলসার্ট। এই ইনি লবীন লিয়োগী ক্ল্যারিয়নেট এই লরহরি লাগ ফুলোট—এই লবকুমার লন্দন ব্যায়লা। তা ছাড়া কর্লেট, পিকলু, হারমোনিয়া, ঢোল, কত্তাল সব নিয়ে উলিশজন আছি। বর্মা অয়েল কোম্পানির ডিপোয় আমরা কাজ করি। ছোট-সাহেবের সেদিন বে হ'ল, ফিণ্টি দিলে, আমরা বাজালুম, সাহেব খুশী হয়ে টাইটিল দিলে—কেরাসিন ব্যান্ড।

বংশলোচন। দেখুন আমার একটি ছাগল আছে, সেটি আপনাকে দিতে পারি, কিন্তু—

লাটু। আমরা হলুম উলিশটি প্রাণী, একটা পাঁঠায় কি হবে মশায়? কি বল হে লরহরি?

নরহরি। লস্যি, লস্যি।

বংশলোচন। আমি এই শর্তে দিতে পারি যে ছাগলটিকে আপনি যত্ন ক'রে মানুষ করবেন, বেচতে পারবেন না, মারতে পারবেন না।

লাটু। এ যে আপনি লতুন কথা বলছেন মশায়। ভদ্দর লোকে কখনও ছাগল পোষে?

নরহরি। পাঁঠী লয় যে দুধ দেবে।

নবীন। পাখি লয় যে পড়বে।

নবকুমার। ভেড়া লয় যে কম্বল হবে।

বংশলোচন। সে যাই হোক। বাজে কথা বলবার আমার সময় নেই। নেবেন কি না বলুন।

লাটুবাবু ঘাড় চুলকাইতে লাগিলেন। নরহরি বললেন—'লিয়ে লাও হে লাটুবাবু লিয়ে লাও। ভদ্দর নোক বলছেন অত ক'রে।'

বংশলোচন। কিন্তু মনে থাকে যেন, বেচতে পারবে না, কাটতে পারবে না।

লাটু। সে আপনি ভাববেন না। লাটু লন্দীর কথার লড়চড় লেই।

লম্বকর্ণকে লইয়া বেলেঘাটা কেরাসিন ব্যান্ড চলিয়া গেল। বংশলোচন বিমর্ষচিত্তে বলিলেন—'ব্যাটাদের দিয়ে ভরসা হচ্ছে না!' বিনোদ আশ্বাস দিয়া বলিলেন—'ভেবো না হে. তোমার পাঁঠা গন্ধর্বলোকে বাস করবে। ফাঁকে পড়লুম আমরা।'

সন্ধ্যার আড্ডা বসিয়াছে। আজও বাঘের গল্প চলিতেছে। চাটুজ্যে মহাশয় বলিতেছেন—'সেটা তোমাদের ভুল ধারণা। বাঘ ব'লে একটা ভিন্ন জানোয়ার নেই। ও একটা অবস্থার ফের, আরসোলা হ'তে যেমন কাঁচপোকা। আজই তোমরা ডারউইন শিখেছ—আমাদের ওসব ছেলেবেলা থেকেই জানা আছে। আমাদের রায়বাহাদুর ছাগলটা বিদেয় ক'রে খুব ভাল কাজ করেছেন। কেটে খেয়ে ফেলতেন তো কথাই ছিল না, কিন্তু বাড়িতে রেখে বাড়তে দেওয়া—উঁহু।'

বংশলোচন একখানি নূতন গীতা লইয়া নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিতেছেন—নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ, অর্থাৎ কিনা, আত্মা একবার হইয়া আর যে হইবে না তা নয়। অজো নিত্যঃ—অজো কিনা ছাগলং। ছাগলটা যখন বিদায় হইয়াছে, তখন আজ সন্ধিস্থাপনা হইলেও হইতে পারে।

বিনোদ বংশলোচনকে বলিলেন—'হে কৌন্তেয়, তুমি শ্রীভগবানকে একটু থামিয়ে রেখে একবার চাটুজ্যে মশায়ের কথাটা শোন। মনে বল পাবে।

উদয় বলিল—'আমি সেবার যখন সিমলেয় যাই—'

নগেন। মিছে কথা বলিস নি উদো। তোর দৌড় আমার জানা আছে, লিলুয়া অবধি।

উদয়। বাঃ আমার দাদাশ্বশুর যে সিমলেয় থাকতেন। বউ তো সেইখানেই বড় হয়। তাইতো রং অত—

নগেন। খবরদার উদো।

চাটুজ্যে। যা বলছিলুম শোন। আমাদের মজিলপুরের চরণ ঘোষের এক ছাগল ছিল, তার নাম ভুটে। ব্যাটা খেয়ে খেয়ে হ'ল ইয়া লাশ, ইয়া সিং, ইয়া দাড়ি। একদিন চরণের বাড়িতে ভোজ—লুচি, পাঁঠার কালিয়া, এইসব। আঁচাবার সময় দেখি, ভুটে পাঁঠার মাংস খাচ্ছে। বললুম—দেখছ কি চরণ, এখুনি ছাগলটাকে বিদেয় কর—কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ঘর কর, প্রাণে ভয় নেই? চরণ শুনলে না। গরিবের কথা বাসী হ'লে ফলে। তার পরদিন থেকে ভুটে নিরুদ্দেশ। খোঁজ-খোঁজ কোথা গেল। এক বচ্ছর পরে মশায় সেই ছাগল সোঁদরবনে পাওয়া গেল। শিং নেই বললেই হয়, দাড়ি প্রায় খসে গেছে, মুখ একেবারে হাঁড়ি; বর্ণ হয়েছে যেন কাঁচা হলুদ, আর তার ওপর দেখা দিয়েছে মশায়—আঁজি-আঁজি ডোরা-ডোরা। ডাকা হ'ল—ভুটে, ভুটে! ভুটে বললে—হালুম। লোকজন দূর থেকে নমস্কার ক'রে ফিরে এল।

'লাটুবাবু আয়ে হেঁ'।'

সপারিষদ লাটুবাবু প্রবেশ করিলেন। লম্বকর্ণও সঙ্গে আছে। বিনোদ বলিলেন—'কি ব্যাণ্ড মাস্টার, আবার কি মনে করে?'

লাটুবাবুর আর সে লাবণ্য নাই। চুল উশ্কো খুশ্কো, চোখ বসিয়া গিয়াছে, জামা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। সজলনয়নে হাঁউমাউ করিয়া বলিলেন—'সর্বনাশ হয়েছে মশায়, ধনে-প্রাণে মেরেছে। ও হোঃ হোঃ হোঃ।'

নরহরি বলিলেন—আঃ কি কর লাটুবাবু একটু থির হও। হুজুর যখন রয়েছেন তখন একটা বিহিত করবেনই।'

বংশলোচন ভীত হইয়া বলিলেন—'কি হয়েছে—ব্যাপার কি?'

লাটু। মশাই, ওই পাঁঠাটা—

চাটুজ্যে বলিলেন—'হুঁ, বলেছিলুম কি না?'

লাটু। ঢোলের চামড়া কেটেছে, ব্যায়লার তাঁত খেয়েছে, হারমোনিয়ার চাবি সমস্ত চিবিয়েছে। আর—আর—আমার পাঞ্জাবির পকেট কেটে লব্বই টাকার লোট—ও হো হো!



'ভুটে বললে—হালুম'

নরহরি। গিলে ফেলেছে। পাঁঠা নয় হুজুর, সাক্ষাৎ শয়তান। সর্বস্ব গেছে, লাটুর প্রাণটি কেবল আপনার ভরসায় এখনও ধুক-পুক করছে।

বংশলোচন। ফ্যাসাদে ফেললে দেখছি।

নরহরি। দোহাই হুজুর, লাটুর দশাটা একবার দেখুন, একটা ব্যবস্থা ক'রে দিন—বেচারা মারা যায়।

বংশলোচন ভাবিয়া বলিলেন—'একটা জোলাপ দিলে হয় না?'

লাটুবাবু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন—'মশায়, এই কি আপনার বিবেচনা হ'ল? মরছি টাকার শোকে, আর আপনি বলছেন জোলাপ খেতে?'

বংশলোচন। আরে তুমি খাবে কেন, ছাগলটাকে দিতে বলছি।

নরহরি। হায় হায়, হুজুর এখনও ছাগল চিনলেন না! কোন্ কালে হজম ক'রে ফেলেছে। লোট তো লোট—ব্যায়লার তাঁত, ঢোলের চামড়া, হারমোনিয়ার চাবি, মায় ইস্টিলের কঙ্কাল।

বিনোদ। লাটুবাবুর মাথাটি কেবল আস্ত রেখেছে।

বংশলোচন বলিলেন—'যা হবার তা তো হয়েছে। এখন বিনোদ, তুমি একটা খেসারত ঠিক করে দাও। বেচারার লোকসান যাতে না হয়, আমার ওপর বেশী জুলুমও না হয়। ছাগলটা বাড়িতেই থাকুক, কাল যা হয় করা যাবে।'



মরছি টাকার শোকে, আর আপনি বলছেন জোলাপ খেতে?'

অনেক দরদস্তুরের পর একশ টাকায় রফা হইল। বংশলোচন বেশী কষাকষি করিতে দিলেন না। লাটুবাবুর দল টাকা লইয়া চলিয়া গেল।

লম্বকর্ণ ফিরিয়াছে শুনিয়া টেঁপী ছুটিয়া আসিল। বিনোদ বলিলেন,—'ও টেঁপুরানী শীগগির গিয়ে তোমার মাকে বলো কাল আমরা এখানে খাব—লুচি, পোলাও, মাংস—'

টেঁপী। বাবা আর মাংস খায় না।

বিনোদ। বল কি! হ্যাঁ হে বংশু, প্রেমটা এক পাঁঠা থেকে বিশ্ব পাঁঠায় পোঁছেছে না কি? আচ্ছা তুমি না খাও আমরা আছি। যাও তো টেঁপু, মাকে বল সব যোগাড় করতে।

টে'পী। সে এখন হচ্ছে না। মা-বাবার ঝগড়া চলছে, কথাটি নেই।

বংশলোচন ধমক দিয়া বলিলেন— 'হ্যাঁ হ্যাঁ—কথাটি নেই—তুই সব জানিস। যা যাঃ, ভারি জ্যাঠা হয়েছিস।'

টে'পী। বা-রে, আমি বুঝি টের পাই না? তবে কেন মা খালি-খালি আমাকে বলে—টে'পী, পাখাটা মেরামত করতে হবে—টে'পী, এ-মাসে আরও দু-শ টাকা চাই। তোমাকে বলে না কেন?

বংশলোচন। থাম্ থাম্ বকিস নি।

বিনোদ। হে রায়বাহাদুর, কন্যাকে বেশী ঘাঁটিও না অনেক কথা ফাঁস করে দেবে। অবস্থাটা সঙ্গিন হয়েছে বল?

বংশলোচন। আরে এতদিন তো সব মিটে যেত, ওই ছাগলটাই মুশকিল বাধালে।

বিনোদ। ব্যাটা ঘরভেদী বিভীষণ। তোমারই বা অত মায়া কেন? খেতে না পার বিদেয় করে দাও। জলে বাস কর, কুমিরের সঙ্গে বিবাদ ক'রো না।

বংশলোচন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—'দেখি কাল যা হয় করা যাবে।'

এ রাত্রিও বংশলোচন বৈঠকখানায় বিরহশয়নে যাপন করিলেন। ছাগলটা আস্তাবলে বাঁধা ছিল, উপদ্রব করিবার সুবিধা পায় নাই।

পরদিন বৈকাল সাড়ে পাঁচটার সময় বংশলোচন বেড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিলেন, কেহ তাঁকে লক্ষ্য করিতেছে কি না। গৃহিণী ও ছেলেমেয়েরা উপরে আছে। ঝি-চাকর অন্দরে কাজকর্মে ব্যস্ত। চুকন্দর সিং তার ঘরে বসিয়া আটা সানিতেছে। লম্বকর্ণ আস্তাবলের কাছে বাঁধা আছে এবং দড়ির সীমার মধ্যে যথাসম্ভব লম্ফ-ঝম্ফ করিতেছে। বংশলোচন দড়ি হাতে করিয়া ছাগল-লইয়া আস্তে আস্তে বাহির হইলেন।

পাছে পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয় সেজন্য বংশলোচন সোজা রাস্তায় না গিয়া গলি-ঘুঁজির ভিতর দিয়া চলিলেন। পথে এক ঠোঙা জিলিপি কিনিয়া পকেটে রাখিলেন। ক্রমে লোকালয় হইতে দূরে আসিয়া জনশূন্য খাল-ধারে পৌঁছিলেন।

আজ তিনি স্বহস্তে লম্বকর্ণকে বিসর্জন দিবেন, যেখানে পাইয়াছিলেন আবার সেইখানেই ছাড়িয়া দিবেন—যা থাকে তার কপালে। যথাস্থানে আসিয়া বংশলোচন জিলিপির ঠোঙাটি ছাগলকে খাইতে দিলেন। পকেট হইতে এক টুকরা কাগজ বাহির করিয়া তাহাতে লিখিলেন—

এই ছাগল বেলেঘাটা খালের ধারে কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম। প্রতিপালন করিতে না পারায় আবার সেইখানেই ছাড়িয়া দিলাম। আল্লা কালী যিশুর দিব্য ইহাকে কেহ মারিবেন না।

লেখার পর কাগজ ভাঁজ করিয়া ছোট টিনের কৌটায় ভরিয়া লম্বকর্ণের গলায় ভাল করিয়া বাঁধিয়া দিলেন। তার পর বংশলোচন শেষবার ছাগলের গায়ে হাত বুলাইয়া আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িলেন। লম্বকর্ণ তখন আহারে ব্যস্ত।

দূরে আসিয়াও বংশলোচন বার বার পিছু ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন। লম্বকর্ণ আহার শেষ করিয়া এদিক-ওদিক চাহিতেছে। যদি তাঁহাকে দেখিয়া ফেলে এখনি পশ্চাদ্ধাবন করিবে। এদিকে আকাশের অবস্থাও ভাল নয়। বংশলোচন জোরে জোরে চলিতে লাগিলেন।

আর পারা যায় না, হাঁফ ধরিতেছে। পথের ধারে একটা তেঁতুলগাছের তলায় বংশলোচন বসিয়া পড়িলেন। লম্বকর্ণকে আর দেখা যায় না। এইবার তাহার মুক্তি—আর কিছুদিন দেরি করিলে জড়ভরতের অবস্থা হইত। এই হতভাগা কৃষ্ণের জীবকে আশ্রয় দিতে গিয়া তিনি নাকাল হইয়াছেন। গৃহিণী তাহার উপর মর্মান্তিক রুষ্ট, আত্মীয়স্বজন তাহাকে খাইবার জন্য হাঁ করিয়া আছে—তিনি একা কাঁহাতক সামলাইবেন? হায় রে সত্যযুগ, যখন শিবি

রাজা শরণাগত কপোতের জন্য প্রাণ দিতে গিয়াছিলেন—মহিষীর ক্রোধ, সভাসদ্‌বর্গের বেয়াদবি, কিছুই তাঁহাকে ভোগ করিতে হয় নাই।

দ্রুম্‌ দুদ্দুড় দুড়ু দড়ড়ড় ড়! আকাশে কে ঢেঁটরা পিটিতেছে? বংশলোচন চমকিত হইয়া উপরে চাহিয়া দেখিলেন, অন্তরীক্ষের গম্বুজে এক পোঁচ সীসা-রঙের অস্তর মাখাইয়া দিয়াছে। দূরে এক ঝাঁক সাদা বক জোরে পাখা চালাইয়া পলাইতেছে। সমস্ত চুপ—গাছের পাতাটি নড়িতেছে না। আসন্ন দুর্যোগের ভয়ে স্থাবর জঙ্গম হতভম্ভ হইয়া গিয়াছে। বংশলোচন উঠিলেন, কিন্তু আবার বসিয়া পড়িলেন। জোরে হাঁটার ফলে তাঁর বুক ধড়ফড় করিতেছিল।

সহসা আকাশ চিড় খাইয়া ফাটিয়া গেল। এক ঝলক বিদ্যুৎ—কড় কড় কড়াৎ—ফাটা আকাশ আবার বেমালুম জুড়িয়া গেল। ঈশানকোন হইতে একটা ঝাপসা পর্দা তাড়া করিয়া আসিতেছে। তাহার পিছনে যা-কিছু সমস্ত মুছিয়া গিয়াছে, সামনেও আর দেরি নাই। ওই এল, ওই এল! গাছপালা শিহরিয়া উঠিল, লম্বা-লম্বা তালগাছগুলো প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া আপত্তি জানাইল। কাকের দল আর্তনাদ করিয়া উড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ঝাপটা খাইয়া



'লুচি ক-খানি খেতেই হবে'

আবার গাছের ডাল আঁকড়াইয়া ধরিল। প্রচণ্ড ঝড়, প্রচণ্ডতর বৃষ্টি। যেন এই নগণ্য উইঢিবি - এই ক্ষুদ্র কলিকাতা শহরকে ডুবাইবার জন্য স্বর্গের তেত্রিশ কোটি দেবতা সার বাঁধিয়া বড় বড় ভৃঙ্গার হইতে তোড়ে জল ঢালিতেছেন। মোটা নিরেট জলধারা, তাহার ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট ফোঁটা। সমস্ত শূন্য ভরাট হইয়া গিয়াছে।

মান-ইজ্জত কাপড়-চোপড় সবই গিয়াছে, এখন প্রাণটা রক্ষা পাইলে হয়। হা রে হতভাগা ছাগল, কি কুক্ষণে—

বংশলোচনের চোখের সামনে একটা উগ্র বেগনী আলো খেলিয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে আকাশের সঞ্চিত বিশ কোটি ভোল্ট ইলেকট্রিসিটি অদূরবর্তী একটা নারিকেল গাছের ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া বিকট নাদে ভূগর্ভে প্রবেশ করিল।

রাশি রাশি সরিষার ফুল। জগৎ লুপ্ত, তুমি নাই, আমি নাই। বংশলোচন সংজ্ঞা হারাইয়াছেন।

বৃষ্টি থামিয়াছে কিন্তু এখনো সোঁ সোঁ করিয়া হাওয়া চলিতেছে। ছেঁড়া মেঘের পর্দা ঠেলিয়া দেবতারা দু-চারটা মিটমিটে তারার লণ্ঠন লইয়া নীচের অবস্থা তদারক করিতেছেন।

বংশলোচন কর্দম-শয্যায় শুইয়া ধীরে ধীরে সংজ্ঞা লাভ করিলেন। তিনি কে? রায়-বাহাদুর। কোথায়? খালের নিকট। ও কিসের শব্দ? সোনা-ব্যাং। তাঁর নষ্ট স্মৃতি ফিরিয়া আসিয়াছে। ছাগলটা?

মানুষের স্বর কানে আসিতেছে। কে তাঁকে ডাকিতেছে? 'মামা—জামাইবাবু—বংশু আছ?—হুজৌর—'

অদূরে একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। জনকতক লোক লণ্ঠন লইয়া ইতস্তত ঘুরিতেছে এবং তাঁহাকে ডাকিতেছে। একটি পরিচিত নারীকণ্ঠে ক্রন্দনধ্বনি উঠিল।

রায়বাহাদুর চাঙ্গা হইয়া বলিলেন—'এই যে আমি এখানে আছি—ভয় নেই—'

মানিনী বলিলেন—'আজ আর দোতলায় উঠে কাজ নেই। ও ঝি, এই বৈঠকখানা ঘরেই খড় ক'রে বিছানা ক'রে দে তো। আর দেখ্, আমার বালিশটাও দিয়ে যা। আঃ, চাটুজ্যে মিনসে নড়ে না, ও কি—সে হবে না—এই গরম লুচি ক-খানি খেতেই হবে, মাথা খাও। তোমার সেই বোতলটায় কি আছে—তাই একটু চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে দেব নাকি?'

'হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ—'

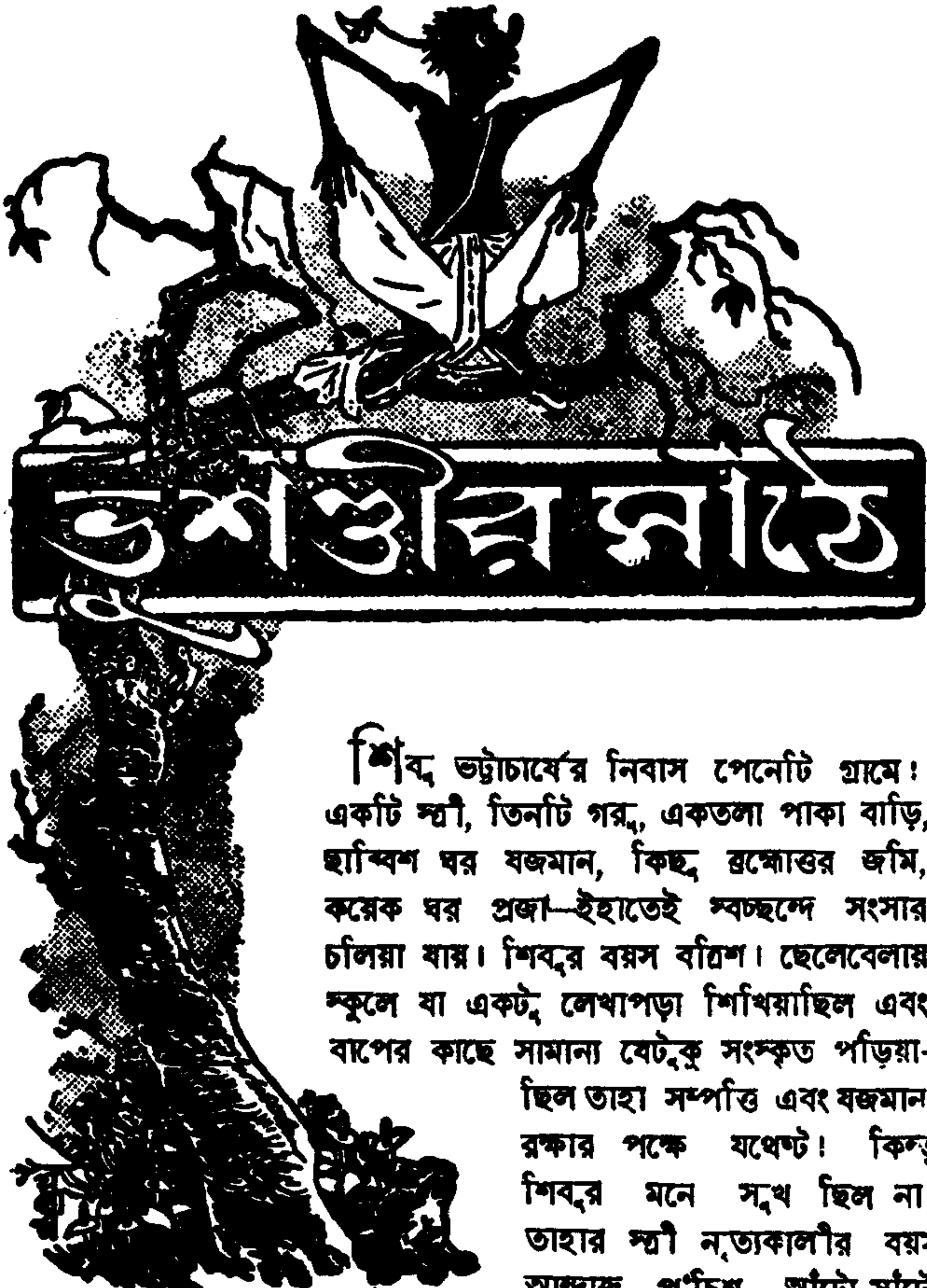
বংশলোচন লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—'অ্যাঁ, ওটা আবার এসেছে? নিয়ে আয় তো লাঠিটা—'

মানিনী বলিলেন,—'আহা কর কি, মেরো না। ও বেচারা বৃষ্টি থামতেই ফিরে এসে তোমার খবর দিয়েছে। তাইতেই তোমায় ফিরে পেলুম। ওঃ, হরি মধুসূদন!'

লম্বকর্ণ বাড়িতেই রহিয়া গেল, এবং দিন দিন শশিকলার ন্যায় বাড়িতে লাগিল। ক্রমে তাহার আধ হাত দাড়ি গজাইল। রায়বাহাদুর আর বড়-একটা খোঁজ খবর করেন না, তিনি এখন ইলেকশন লইয়া ব্যস্ত। মানিনী লম্বকর্ণের শিং কেমিক্যাল সোনা দিয়া বাঁধাইয়া দিয়াছেন। তাহার জন্য সাবান ও ফিনাইল ব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু বিশেষ ফল হয় নাই। লোকে দূর হইতে তাহাকে বিদ্রূপ করে। লম্বকর্ণ গম্ভীরভাবে সমস্ত শুনিয়া যায়, নিতান্ত বাড়াবাড়ি করিলে বলে—ব-ব-ব—অর্থাৎ যত ইচ্ছা হয় বকিয়া যাও, আমি ও-সব গ্রাহ্য করি না।

ভারতবর্ষ', কার্ত্তিক ১৩৩১
(১৯২৪)





শিবু ভট্টাচার্যের নিবাস পেনেটি গ্রামে। একটি স্ত্রী, তিনটি গরু, একতলা পাকা বাড়ি, ছাব্বিশ ঘর যজমান, কিছু ব্রহ্মোত্তর জমি, কয়েক ঘর প্রজা—ইহাতেই স্বচ্ছন্দে সংসার চলিয়া যায়। শিবুর বয়স বত্রিশ। ছেলেবেলায় স্কুলে যা একটু লেখাপড়া শিখিয়াছিল এবং বাপের কাছে সামান্য যেটুকু সংস্কৃত পড়িয়াছিল তাহা সম্পত্তি এবং যজমান-রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু শিবুর মনে সুখ ছিল না। তাহার স্ত্রী নৃত্যকালীর বয়স আন্দাজ পঁচিশ, আঁটো-সাঁটো মজবুত গড়ন, দুর্দান্ত স্বভাব। স্বামীর প্রতি তাহার যত্নের ত্রুটি ছিল না, কিন্তু শিবু সে যত্নের মধ্যে রস খুঁজিয়া পাইত না। সামান্য খুঁটিনাটি লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে তুমুল ঝগড়া বাধিত। পাঁচমিনিট বকাবকির পরেই শিবুর দম ফুরাইয়া যাইত, কিন্তু নৃত্যকালীর রসনা একবার ছুটিতে আরম্ভ করিলে সহজে নিরস্ত হইত না। প্রতিবারে শিবুরই পরাজয় ঘটিত। স্ত্রীকে বশে রাখিতে না পারায় পাড়ার লোকে শিবুকে কাপুরুষ, ভেড়ো, মেনী-মুখো প্রভৃতি আখ্যা দিয়াছিল। ঘরে বাহিরে এইরূপে লাঞ্ছিত হওয়ায় শিবুর অশান্তির সীমা ছিল না।

একদিন নৃত্যকালী গুজব শুনিল তাহার স্বামীর চরিত্রদোষ ঘটিয়াছে। সেদিনকার

বচসা চরমে পৌঁছিল—নৃত্যকালীর ঝাঁটা শিবুর পৃষ্ঠ স্পর্শ করিল। শিবু বেচারা ক্রোধে ক্ষোভে কষ্টে চোখের জল রোধ করিয়া কোনও গতিকে রাত কাটাইয়া পরদিন ভোর ছ-টার ট্রেনে কলিকাতা যাত্রা করিল।

শেয়ালদহ হইতে সোজা কালীঘাটে গিয়া শিবু নানা উপাচারে পাঁচ টাকার পূজা দিয়া মানত করিল—'হে মা কালী, মাগীকে ওলাউঠোয় টেনে নাও মা। আমি জোড়া পাঁঠার নৈবিদ্যি দেব। আর যে বরদাস্ত হয় না। একটা সুরাহা ক'রে দাও মা, যাতে আবার নতুন ক'রে সংসার পাততে পারি। মাগীর ছেলেপুলে হ'ল না, সেটাও তো দেখতে হবে। দোহাই মা!'

মন্দির হইতে ফিরিয়া শিবু বড় এক ঠোঙা তেলেভাজা খাবার, আধ সের দই এবং আধ সের অমৃতি খাইল। তার পর সমস্ত দিন জন্তুর বাগান, জাদুঘর, হগ সাহেবের বাজার, হাইকোর্ট ইত্যাদি দেখিয়া সন্ধ্যাবেলা বীডন স্ট্রীটের হোটেল-ডি-অর্থোডক্সে এক প্লেট কারি, দু প্লেট রোস্ট ফাউল এবং আটখানা ডেভিল জলযোগ করিল। তার পর সমস্ত রাত থিয়েটার দেখিয়া ভোরে পেনেটি ফিরিয়া গেল।

মা-কালী কিন্তু উলটা বুঝিয়াছিলেন। বাড়ি আসিয়াই শিবুর ভেদবমি আরম্ভ হইল। ডাক্তার আসিল, কবিরাজ আসিল, ফলে কিছুই হইল না। আট ঘণ্টা রোগে ভুগিয়া স্ত্রীকে পায়ে ধরাইয়া কাঁদাইয়া শিবু ইহলোক পরিত্যাগ করিল।

গ্রামে আর মন টিকিল না। শিবু সেই রাত্রেই গঙ্গা পার হইল। পেনেটির আড়পাড় কোন্নগর। সেখান হইতে উত্তরমুখ হইয়া ক্রমে রিশড়া, শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটীর হাট, চাঁপদানির চটকল ছাড়াইয়া আরও দু-তিন ক্রোশ দূরে ভুশণ্ডীর মাঠে পৌঁছিল। মাঠটি বহুদূর বিস্তৃত, জনমানবশূন্য। এককালে এখানে ইটখোলা ছিল সেজন্য সমতল নয়, কোথাও গর্ত, কোথাও মাটির ঢিপি। মাঝে মাঝে আসশ্যাওড়া, ঘেঁটু, বুনো ওল, বাবলা প্রভৃতির ঝোপ। শিবুর বড়ই পছন্দ হইল। একটা বহুকালের পরিত্যক্ত ইটের পাঁজার এক পাশে একটা লম্বা তালগাছ সোজা হইয়া উঠিয়াছে, আর একদিকে একটা নেড়া বেলগাছ ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। শিবু সেই বেলগাছে ব্রহ্মদৈত্য হইয়া বাস করিতে লাগিল।

যাঁহারা স্পিরিচুয়ালিজ্‌ম বা প্রেততত্ত্বের খবর রাখেন না তাঁহাদিগকে ব্যাপারটা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিতেছি। মানুষ মরিলে ভূত হয় ইহা সকলেই শুনিয়াছেন। কিন্তু এই থিওরির সঙ্গে স্বর্গ, নরক, পুনর্জন্ম খাপ খায় কিরূপে? প্রকৃত তথ্য এই।—নাস্তিকদের আত্মা নাই। তাঁহারা মরিলে অক্সিজেন হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসে পরিণত হন। সাহেবদের মধ্যে যাঁহারা আস্তিক, তাঁহাদের আত্মা আছে বটে, কিন্তু পুনর্জন্ম নাই। তাঁহারা মৃত্যুর পর ভূত হইয়া প্রথমত একটি বড় ওয়েটিংরুমে জমায়েত হন। তথায় কল্পবাসের পর তাঁহাদের শেষ বিচার হয়। রায় বাহির হইলে কতগুলি ভূত অনন্ত স্বর্গে এবং অবশিষ্ট সকলে অনন্ত নরকে আশ্রয়লাভ করেন। সাহেবরা জীবদ্দশায় যে স্বাধীনতা ভোগ করেন, ভূতাবস্থায় তাহা অনেকটা কমিয়া যায়। বিলাতী প্রেতাত্মা বিনা পাসে ওয়েটিংরুম ছাড়িতে পারে না। যাঁহারা seance দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন বিলাতী ভূত নামানো কি-রকম কঠিন কাজ। হিন্দুর জন্য অন্যরূপ বন্দোবস্ত, কারণ আমরা পুনর্জন্ম, স্বর্গ, নরক, কর্মফল, হৃয়া হৃষীকেশ, নির্বাণ, মুক্তি সবই মানি। হিন্দু মরিলে প্রথমে ভূত হয় এবং যত্র-তত্র স্বাধীনভাবে বাস করিতে পারে—আবশ্যক-মত ইহলোকের সঙ্গে কারবারও করিতে পারে। এটা একটা মস্ত সুবিধা। কিন্তু এই অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী নয়। কেহ কেহ দু-চার দিন পরেই পুনর্জন্ম লাভ করে, কেহ-বা দশ-বিশ বৎসর পরে, কেহ-বা দু-তিন শতাব্দী পরে।

ভূতদের মাঝে-মাঝে চেঞ্জের জন্য স্বর্গে ও নরকে পাঠানো হয়। এটা তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল, কারণ স্বর্গে খুব ফুর্তিতে থাকা যায় এবং নরকে গেলে পাপ ক্ষয় হইয়া সূক্ষ্মশরীর বেশ হালকা ঝরঝরে হয়, তা ছাড়া সেখানে অনেক ভাল ভাল লোকের সঙ্গে দেখা হইবার সুবিধা আছে। কিন্তু যাঁহাদের ভাগ্যক্রমে 'কাশীলাভ হয়, অথবা নেপালে পশুপতিনাথ বা রথের উপর বামনদর্শন ঘটে, কিংবা যাঁহারা স্বকৃত পাপের বোঝা হৃষীকেশের উপর চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন, তাঁহাদের পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে—একেবারেই মুক্তি।

দু-তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে। শিবু সেই বেলগাছেই থাকে। প্রথম প্রথম দিনকতক নূতন স্থানে নূতন অবস্থায় বেশ আনন্দে কাটিয়াছিল, এখন শিবুর বড়ই ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকে। মেজাজটা যতই বদ হউক, নৃত্যর একটা আন্তরিক টান ছিল, শিবু এখন তাহা হাড়ে-হাড়ে অনুভব করিতেছে। একবার ভাবিল—দূর হ'ক, না-হয় পেনেটিতেই আড্ডা গাড়ি। তার পর মনে হইল—লোকে বলিবে বেটা ভূত হইয়াও স্ত্রীর আঁচল ছাড়িতে পারে নাই। নাঃ, এইখানেই একটা পছন্দমত উপদেবীর যোগাড় দেখিতে হইল।

ফাল্গুন মাসের শেষবেলা। গঙ্গার বাঁকের উপর দিয়া দক্ষিণা হাওয়া ঝির-ঝির করিয়া বহিতেছে। সূর্যদেব জলে হাবুডুবু খাইয়া এইমাত্র তলাইয়া গিয়াছেন। ঘেঁটুফুলের গন্ধে ভুশণ্ডীর মাঠ ভরিয়া গিয়াছে। শিবুর বেলগাছে নূতন পাতা গজাইয়াছে। দূরে আকন্দ



লক্ষ্য়ে জিব কাটিয়াছিল

ঝোপে গোটাকতক পাকা ফল ফট্ করিয়া ফাটিয়া গেল, একরাশ তুলোর আঁশ হাওয়ায় উড়িয়া মাকড়শার কঙ্কালের মত ঝিকমিক করিয়া শিবুর গায়ে পড়িতে লাগিল। একটা হলদে রঙের প্রজাপতি শিবুর সূক্ষ্মশরীর ভেদ করিয়া উড়িয়া গেল। একটা কাল গুবরে পোকা ভর্ র্ করিয়া শিবুকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। অদূরে বাবলা গাছে একজোড়া দাঁড়কাক বসিয়া আছে। কাক গলায় সুড়সুড়ি দিতেছে, কাকিনী চোখ মুদিয়া গদ্‌গদ স্বরে মাঝে-মাঝে ক-অ-অ করিতেছে। একটা কট্‌কটে ব্যাং সদ্য ঘুম হইতে উঠিয়া গুটিগুটি পা ফেলিয়া বেলগাছের কোটর হইতে বাহিরে আসিল, এবং শিবুর দিকে ড্যাবডেবে চোখ মেলিয়া টিটকারি দিয়া উঠিল। একদল ঝিঁঝিপোকা সন্ধ্যার আসরের জন্য যন্ত্রে সুর বাঁধিতেছিল, এতক্ষণে সংগত ঠিক হওয়ায় সমস্বরে রিরিরিরি করিয়া উঠিল।

শিবুর যদিও রক্তমাংসের শরীর নাই, কিন্তু মরিলেও স্বভাব যাইবে কোথা। শিবুর মনটা খাঁখাঁ করিতে লাগিল। যেখানে হৃৎপিণ্ড ছিল সেখানটা ভরাট হইয়া ধড়াক ধড়াক



গোবর-গোলা জল ছড়াইয়া যায়

করিতে লাগিল। মনে পড়িল—ভুশণ্ডীর মাঠের প্রান্তস্থিত পিটুলি-বিলের ধারে শ্যাওড়া-গাছে একটি পেত্নী বাস করে। শিবু তাহাকে অনেকবার সন্ধ্যাবেলা পলো হাতে মাছ ধরিতে দেখিয়াছে। তার আপাদমস্তক ঘেরাটোপ দিয়া ঢাকা, একবার সে ঢাকা খুলিয়া শিবুর দিকে চাহিয়া লজ্জায় জিব কাটিয়াছিল। পেত্নীর বয়স হইয়াছে, কারণ তাহার গাল একটু তোবড়াইয়াছে এবং সামনের দুটো দাঁত নাই। তাহার সঙ্গে ঠাট্টা চলিতে পারে, কিন্তু প্রেম হওয়া অসম্ভব।

একটি শাকচুন্নী কয়েকবার শিবুর নজরে পড়িয়াছিল। সে একটা গামছা পরিয়া আর

একটা গামছা মাথায় দিয়া এলোচুলে বকের মত লম্বা পা ফেলিয়া হাতের হাঁড়ি হইতে গোবর-গোলা জল ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়া যায়। তাহার বয়স তেমন বেশী বোধ হয় না। শিবু একবার রসিকতার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু শাঁকচুন্নী ক্রুদ্ধ বিড়ালের মত ফ্যাঁচ করিয়া ওঠে, অগত্যা শিবুকে ভয়ে চম্পট দিতে হয়।

শিবুর মন সবচেয়ে হরণ করিয়াছে এক ডাকিনী। ভুশণ্ডীর মাঠের পূর্বদিকে গঙ্গার ধারে ক্ষীরী-বামনীর পরিত্যক্ত ভিটায় যে জীর্ণ ঘরখানি আছে তাহাতেই সে অল্পদিন হইল আশ্রয় লইয়াছে। শিবু তাহাকে শুধু একবার দেখিয়াছে এবং দেখিয়াই মজিয়াছে। ডাকিনী তখন একটা খেজুরের ডাল দিয়া রোয়াক ঝাঁট দিতেছিল। পরনে সাদা থান। শিবুকে দেখিয়া নিমেষের তরে ঘোমটা সরাইয়া ফিক করিয়া হাসিয়াই সে হাওয়ার সঙ্গে মিলাইয়া যায়। কি দাঁত! কি মুখ! কি রং! নৃত্যকালীর রং ছিল পানতুয়ার মত। কিন্তু ডাকিনীর রং যেন পানতুয়ার শাঁস।



খেজুরের ডাল দিয়া রোয়াক ঝাঁট দিতেছিল

শিবু একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া গান ধরিল—

আহা, শ্রীরাধিকে চন্দ্রাবলী
কারে রেখে কারে ফেলি।

সহসা প্রান্তর প্রকম্পিত করিয়া নিকটবর্তী তালগাছের মাথা হইতে তীব্রকণ্ঠে শব্দ উঠিল—

চা রা রা রা রা রা
আরে ভজুয়াকে বহিনিয়া ভগ্লুকে বিটিয়া
কেক্‌রাসে সাদিয়া হো কেক্‌রাসে হো-ও-ও-ও—

শিবু চমকাইয়া উঠিয়া ডাকিল—'তালগাছে কে রে?'



সড়াক্ করিয়া নামিয়া আসিল

উত্তর আসিল—'কারিয়া পিরেত বা।'
শিবু। কেলে ভূত? নেমে এস বাবা।
মাথায় পাগড়ি, কাল লিকলিকে চেহারা, কাঁকলাসের মত একটি জীবাত্মা সড়াক করিয়া

তালগাছের মাথা হইতে নামিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—'গোড় লাগি বরমদেওজী।'

শিবু। জিতা রহো বেটা। একটু তামাক খাওয়াতে পারিস?

কারিয়া পিরেত। ছিলম বা?

শিবু। তামাকই নেই তা ছিলিম। যোগাড় কর্ না।

প্রেত ঊর্ধ্বে উঠিল এবং অল্পক্ষণমধ্যে বৈদ্যবাটির বাজার হইতে তামাক টিকা কলিকা আনিয়া আগ শুলগাইয়া শিবুর হাতে দিল। শিবু একটা কচুর ডাঁটার উপর কলিকা বসাইয়া টান দিতে দিতে বলিল—'তার পর, এলি কবে? তোর হাল চাল সব বল্।'

কারিয়া পিরেত যে ইতিহাস বলিল তার সারমর্ম এই।—

তাহার বাড়ি ছাপরা জিলা। দেশে এককালে তাহার জরু গরু জমি জেরাত সবই ছিল। তাহার স্ত্রী মুংরী অত্যন্ত মুখরা ও বদমেজাজী, বনিবনাও কখনও হইত না। একদিন প্রতিবেশী ভজুয়ার ভগ্নীকে উপলক্ষ্য করিয়া স্বামী-স্ত্রীতে বিষম ঝগড়া হয়, এবং স্ত্রীর পিঠে এক ঘা লাঠি কশাইয়া স্বামী দেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া আসে। সে আজ ত্রিশ বৎসরের কথা। কিছুদিন পরে সংবাদ আসে যে মুংরী বসন্ত রোগে মরিয়াছে। স্বামী আর দেশে ফিরিল না, বিবাহও করিল না। নানা স্থানে চাকরি করিয়া অবশেষে চাঁপদানির মিলে কুলীর কাজে ভর্তি হয় এবং কয়েক বৎসর মধ্যে সর্দারের পদ পায়। কিছুদিন পূর্বে একটি লোহার কড়ি হাফিজ অর্থাৎ কপিকলে উত্তোলন করিবার সময় তার মাথায় চোট লাগে। তার পর একমাস হাসপাতালে শয্যাশায়ী হইয়া থাকে। সম্প্রতি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া প্রেতরূপে এই তালগাছে বিরাজ করিতেছে।

শিবু একটা লম্বা টান মারিয়া কলিকাটি কারিয়া পিরেতকে দিবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় মাটির ভিতর হইতে ভাঙা কাঁসরের মত আওয়াজ আসিল—'ভায়া, কলকেটায় কিছু আছে না কি?'

বেলগাছের কাছে যে ইটের পাঁজা ছিল তাহা হইতে খানকতক ইট খসিয়া গেল এবং ফাঁকের ভিতর হইতে হামাগুড়ি দিয়া একটি মূর্তি বাহির হইল। স্থূল খর্ব দেহ, থেলো হুঁকার খোলের উপর একজোড়া পাকা গোঁফ গজাইলে যে-রকম হয় সেই প্রকার মুখ, মাথায় টাক, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, গায়ে ঘুণ্টি-দেওয়া মেরজাই, পরনে ধুতি, পায়ে তালতলার চটি। আগন্তুক শিবুর হাত হইতে কলিকাটি লইয়া বলিলেন—'ব্রাহ্মণ? দণ্ডবৎ হই। কিছু সম্পত্তি ছিল, এইখানে পোঁতা আছে। তাই যক্ষি হয়ে আগলাচ্ছি। বেশী কিছু নয়—দু-পাঁচশো। সব বন্ধকী তমসুক দাদা—ইস্টাম্বর কাগজে লেখা—নগদ সিক্কা একটিও পাবে না। খবরদার, ওদিকে নজর দিও না—হাতে হাতকড়ি পড়বে, থুঃ থুঃ!

শিবুর মেঘদূত একটু আধটু জানা ছিল। সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল—'যক্ষ মহাশয়, আপনিই কি কালিদাসের—'

যক্ষ। ভায়রাভাই। কালিদাস আমার মাসতুতো শালীকে বে করে। ছোকরা হিজলিতে নিমকির গোমস্তা ছিল, অনেক দিন মারা গেছে। তুমি তার নাম জানলে কিসে হ্যা?

শিবু। আপনার এখানে কতদিন আগমন হয়েছে?

যক্ষ। আমার আগমন? হ্যা, হ্যা! আমি বলে গিয়ে সাড়ে তিন কুড়ি বচ্ছর এখানে আছি। কত এল দেখলুম, কত গেল তাও দেখলুম। আরে তুমি তো সেদিন এলে, কার্টাপ'পড়ে তাড়িয়ে তিনবার হোঁচট খেয়ে গাছে উঠলে। সব দেখেছি আমি। তোমার গানের শখ আছে



সব বন্ধকী তমসুক দাদা

দেখেছি—বেশ বেশ। কালোয়াতি শিখতে যদি চাও তো আমার শাগরেদ হও দাদা। এখন আওয়াজটা যদিচ একটু খোনা হয়ে গেছে, তবু মরা হাতি লাখ টাকা।

শিবু। মশায়ের ভূতপূর্ব পরিচয়টা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

যক্ষ। বিলক্ষণ। আমার নাম ৺নদেরচাঁদ মল্লিক, পদবী বসু, জাতি কায়স্থ, নিবাস রিশড়ে, হাল সাকিন এই পাঁজার মধ্যে। সাবেক পেশা দারোগাগিরি, ইলাকা রিশড়ে ইস্তক ভদ্রেশ্বর। জর্জটি সাহেবের নাম শুনেছ? হুগলির কালেক্টর—ভারি ভালবাসত আমাকে। মুলুকের শাসনটা তামাম আমার হাতেই ছেড়ে দিয়েছিল। নাদু মল্লিকের দাপটে লোকে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ত।

শিবু। মশায়ের পরিবারাদি কি?

যক্ষ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—'সব সুখ কি কপালে হয় রে দাদা! ঘরসংসার সবই তো ছিল, কিন্তু গিন্নীটি ছিলেন খাণ্ডার। বলব কি মশায়, আমি হলুম গিয়ে নাদু মল্লিক—কোম্পানির ফৌজদারী নিজামত আদালত যার মুঠোর মধ্যে—আমারই পিঠে দিলে দিল। এক ঘা চেলা-কাঠ কশিয়ে! তার পরেই পালাল বাপের বাড়ি। তিন-শ চব্বিশ ধারায় ফেলতুম, কিন্তু কেলেঙ্কারির ভয়ে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আর ছাড়লুম না। কিন্তু যাবে কোথা? গুরু আছেন, ধর্ম আছেন। সাতচল্লিশ সনের মড়কে মাগী ফৌত হ'ল। সংসারধর্মে আর মন বসল না। জর্জটি সাহেব বিলেত গেলে আমিও পেনশন নিয়ে এক শখের যাত্রা খুললুম। তার পর পরমাই ফুরুলে এই হেথা আড্ডা গেড়েছি। ছেলেপুলে হয় নি তাতে দুঃখু নেই দাদা। আমি করব রোজগার, আর কোন্ আবাগের-বেটা-ভূত মানুষ হয়ে আমার

ঘরে জন্ম নিয়ে সম্পত্তির ওয়ারিস হবে—সেটা আমার সইত না। এখন তোফা আছি, নিজের বিষয় নিজে আগলাই, গঙ্গার হাওয়া খাই আর বব-বম্ করি। থাক, আমার কথা তো সব শুনলে, এখন তোমার কেচ্ছা বল।'

শিবু নিজের ইতিহাস সমস্ত বিবৃত করিল, করিয়া পিরেতের পরিচয়ও দিল। যক্ষ বলিলেন—'সব স্যাঙাতের একই হাল দেখছি। পুরনো কথা ভেবে মন খারাপ ক'রে ফল নেই, এখন একটু গাওনা-বাজনা করি এস। পাখোয়াজ নেই—তেমন জুত হবে না। আচ্ছা, পেট চাপড়েই ঠেকা দিই। উহু—ঢনঢন করছে। বাবা ছাতুখোর, একটু এ'টেল-মাটি চটকে এই মধ্যিখানে থাবড়ে দে তো। ঠিক হয়েছে। চৌতাল বোঝ? ছ মাত্রা, চার তাল, দুই ফাঁক। বোল শোন—

ধা ধা ধিন্ তা কৎ তা গে, গিন্নী ঘা দেন কর্তা কে।
ধরে তাড়া ক'রে খিটখিটে কথা কয়
ধূর্তা গিন্নী কর্তা গাধারে।
ঘাড়ে ধ'রে ঘন ঘন ঘা কত ধুম্ ধুম্ দিতে থাকে।
টুটি টিপে ঝুটি ধরে উলটে পালটে ফ্যালে
গিন্নী ঘুঘুটির ক্ষমতা কম নয়;
ধাক্কা ধুক্কি দিতে ত্রুটি ধনী করে না
নগণ্য নির্ধন কর্তা গাধা—
'ধা'-এর উপর সম। ধিন্ তা তেরে কেটে গদি ঘেনে ধা।

এই 'ধা' ফসকালেই সব মাটি। গলাটা ধরে আসছে। খোট্টাভূত, আর এক ছিলিম সাজ বেটা।'

উদ্‌যোগী পুরুষের লক্ষ্মীলাভ অনিবার্য। অনেক কাকুতি-মিনতির পরে ডাকিনী শিবুর ঘর করিতে রাজী হইয়াছে। কিন্তু সে এখনও কথা বলে নাই, ঘোমটাও খোলে নাই, তবে ইশারায় সম্মতি জানাইয়াছে। আজ ভৌতিক পদ্ধতিতে শিবুর বিবাহ। সূর্যাস্ত হইবামাত্র শিবু সর্বাঙ্গে গঙ্গামৃত্তিকা মাখিয়া স্নান করিল, গাবের আটা দিয়া পইতা মাজিল, ফণি-মনসার বুরুশ দিয়া চুল আঁচড়াইল, টিকিতে একটি পাকা তেলাকুচা বাঁধিল। ঝোপে ঝোপে বনজঙ্গলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া একরাশ ঘেঁটুফুল, বঁইচি, কয়েকটি পাকা নোনা ও বেল সংগ্রহ করিল। তারপর সন্ধ্যায় শেয়ালের ঐকতান আরম্ভ হইতেই সে ক্ষীরী বামনীর ভিটায় যাত্রা করিল।

সেদিন শুক্লপক্ষের চতুর্দশী। ঘরের দাওয়ায় কচুপাতার আসনে ডাকিনীর সম্মুখে বসিয়া শিবু মন্ত্রপাঠের উদ্‌যোগ করিয়া উৎসুক চিত্তে বলিল—'এইবার ঘোমটাটা খুলতে হচ্ছে।'

ডাকিনী ঘোমটাটা সরাইল। শিবু চমকিত হইয়া সভয়ে বলিল—'অ্যাঁ! তুমি নেত্য'

নৃত্যকালী বলিল—'হ্যাঁরে মিন্‌সে। মনে করেছিলে ম'রে আমার কবল থেকে বাঁচবে! পেত্নী শাকচুন্নীর পিছু পিছু ঘুরতে বড় মজা, না?'

শিবু। এলে কি ক'রে? ওলাউঠোয় নাকি?

নৃত্যকালী। ওলাউঠো শত্তুরের হ'ক। কেন, ঘরে কি কেরোসিন ছিল না?

শিবু। তাই চেহারাটা ফরসাপানা দেখাচ্ছে। পোড় খেলে সোনার জলুস বাড়ে। ধাতটাও একটু নরম হয়েছে নাকি?

শুভকর্মে বাধা পড়িল। বাহিরে ও কিসের গোলযোগ? যেন একপাল শকুনি-গৃধিনী

ঝটোপটি কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছিঁড়ি করিতেছে। সহসা উল্‌কার মত ছুটিয়া আসিয়া পেত্নী ও শাকচুন্নী উঠানের বেড়ার আগড় ঠেলিয়া ভীষণ চেঁচামেচি আরম্ভ করিল (ছাপাখানার দেবতাগণের সুবিধার জন্য চন্দ্রবিন্দু বাদ দিলাম, পাঠকগণ ইচ্ছামত বসাইয়া লইবেন)।

পেত্নী। আমার সোয়ামী তোকে কেন দেব লা?

শাকচুন্নী। আ মর বুড়ী, ও যে তোর নাতির বয়সী।

পেত্নী। আহা, কি আমার কনে বউ গা!

শাকচুন্নী। দূর মেছোপেত্নী, আমি যে ওর দু-জন্ম আগেকার বউ।

পেত্নী। দূর গোবরচুন্নী, আমি যে ওর তিন জন্ম আগেকার বউ।

শাকচুন্নী। মর চেঁচিয়ে, ওদিকে ডাইনি মাগী মিন্‌সেকে নিয়ে উধাও হ'ক।

তখন পেত্নী বিড়বিড় করিয়া মন্ত্র পড়িয়া আগড় বন্ধ করিয়া বলিল—'আগে তোর খাড় মটকাব তার পর ডাইনি বেটীকে খাব।'

কামড়াকামড়ি চুলোচুলি আরম্ভ হইল। একা নৃত্যকালীতেই রক্ষা নাই তাহার উপর পূর্বতন দুই জন্মের আরও দুই পত্নী হাজির। শিবু হাতে পইতা জড়াইয়া ইষ্টমন্ত্র জপিতে লাগিল। নৃত্যকালী রাগে ফুলিতে লাগিল।

এমন সময় নেপথ্যে যক্ষের গলা শোনা গেল—

> ধনী, শুনছ কিবা আনমনে,
> ভাবছ বুঝি শ্যামের বাঁশি ডাকছে তোমায় বাঁশবনে।
> ওটা যে খ্যাঁকশেয়ালী, দিও না কুলে কালী।
> রাত-বিরেতে শ্যালকুকুরের ছুঁচোপ্যাঁচার ডাক শুনে।

যক্ষ বেড়ার কাছে আসিয়া বলিলেন—'ভায়া, এখানে হচ্ছে কি? এত গোল কিসের?'

কারিয়া পিরেত হাঁকিল—'এ বরম পিচাস, আরে দরবাজা তো খোল।'

শিবুর সাড়া নাই।

প্রচণ্ড ধাক্কা পড়িল, কিন্তু মন্ত্রবন্ধ আগড় খুলিল না, বেড়াও ভাঙিল না। তখন কারিয়া পিরেত তারস্বরে উৎপাটনমন্ত্র পড়িল—

> মারে জ্‌ জুয়ান—হেঁইয়া
> আউর ভি থোড়া—হেঁইয়া
> পর্বত তোড়ি—হেঁইয়া
> চলে ইঞ্জন—হেঁইয়া
> ফটে বয়লট—হেঁইয়া
> খবরদার—হা-ফিজ।

মড় মড় করিয়া ঘরের চাল, দেওয়াল, বেড়া, আগড় সমস্ত আকাশে উঠিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইল।

ডাকিনী, অর্থাৎ নৃত্যকালীকে দেখিয়া যক্ষ বলিলেন—'একি, গিন্নী! এখানে? বেহ্মদত্যিটার সঙ্গে! ছি ছি—লজ্জার মাথা খেয়েছ?' ডাকিনী ঘোমটা টানিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।

কারিয়া পিরেত বলিল—'আরে মুরুখী, তোহর শরম নহি বা?'

* * *

তার পর যে ব্যাপার আরম্ভ হইল তাহা মনে করিলেও কলমের কালি শুখাইয়া যায়। শিবুর তিন জন্মের তিন স্ত্রী এবং নৃত্যকালীর তিন জন্মের তিন স্বামী—এই ডবল গ্রাহস্পর্শযোগে ভুশণ্ডীর মাঠে যুগপৎ জলস্তম্ভ, দাবানল ও ভূমিকম্প শুরু হইল। ভূত, প্রেত, দৈত্য, পিশাচ, তাল, বেতাল প্রভৃতি দেশী উপদেবতা যে যেখানে ছিল, তামাশা দেখিতে আসিল। স্পূক, পিক্সি, নোম, গবলিন প্রভৃতি গোঁফ-কামানো বিলাতি ভূত বাঁশি বাজাইয়া নাচিতে লাগিল। জিন, জান, আফ্রিদ, মারীদ প্রভৃতি লম্বা-দাড়িওয়ালা কাবুলী ভূত দাপাদাপি আরম্ভ করিল। চিং চ্যাং, ফ্যাচাং ইত্যাদি মাকুন্দে চীনে-ভূত ডিগবাজি খাইতে লাগিল।

রাম রাম রাম। জয় হাড়িঝি চণ্ডী আজ্ঞা কর মা! কে এই উৎকট দাম্পত্যসমস্যার সমাধান করিবে? আমার কম্ম নয়। ভূতজাতি অতি নাছোড়বান্দা, ন্যায্যগণ্ডা ছাড়িবে না। পুরুষের পুরুষত্ব, নারীর নারীত্ব ভূতের ভূতত্ব, পেত্নীর পেত্নীত্ব—এসব তাহারা বিলক্ষণ বোঝে। অতএব সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি—শ্রীযুক্ত শরৎ চাটুজ্যে, চারু বাঁড়ুজ্যে, নরেশ সেন এবং যতীন সিংহ মহাশয়গণ যুক্তি করিয়া একটা বিলি-ব্যবস্থা করিয়া দিন—যাহাতে এই ভূতের সংসারটি ছারেখারে না যায় এবং কোনও রকম নীতি-বিগর্হিত বিদকুটে ব্যাপার না ঘটে। নিতান্ত যদি না পারেন, তবে চাঁদা তুলিয়া গয়ায় পিণ্ড দিবার চেষ্টা দেখুন, যাহাতে বেচারারা অতঃপর শান্তিতে থাকিতে পারে।



ভারতবর্ষ, ফাল্গুন ১৩৩০ (১৯২৩)

কজ্জলী

বিরিঞ্চি বাবা



চৌদ্দ নম্বর হাবশীবাগান লেনের মেসটি ছোট কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কারণ ম্যানেজার নিবারণ মাস্টার খুব আমুদে লোক হইলেও সব দিকে তার কড়া নজর আছে। মেসের অধিবাসী পাঁচ-ছয়জন মাত্র এবং সকলেরই অবস্থা ভাল। বসিবার জন্য একটি আলাদা ঘর, তাতে ঢালা ফরাশ এবং অনেক রকম বাদ্যযন্ত্র, দাবা, তাস, পাশা ও অন্যান্য খেলার সরঞ্জাম, কতকগুলি মাসিক পত্রিকা প্রভৃতি চিত্তবিনোদনের উপকরণ সজ্জিত আছে। কাল হইতে পূজার বন্ধ, সেজন্য মেসের অনেকে দেশে চলিয়া গিয়াছে। বাকী আছে কেবল নিবারণ ও পরমার্থ। ইহারা কোথাও যাইবে না, কারণ দুজনেরই শ্বশুরবাড়ির সকলে কলিকাতায় আসিতেছেন।

নিবারণ কলেজে পড়ায়। পরমার্থ ইনশিওরান্সের দালালি, হঠযোগ এবং থিওসফির চর্চা করে। আজ সন্ধ্যায় মেসের বৈঠকখানায় ইহারা দুইজন এবং পাশের বাড়ির নিতাইবাবু আড্ডা দিতেছেন। নিতাইবাবু নিত্যই এখানে আসেন। তাঁর একটু বয়স হইয়াছে, সেজন্য মেসের ছোকরার দল তাঁকে একটু সমীহ করে, অর্থাৎ পিছন ফিরিয়া সিগারেট খায়।

নিতাইবাবু বলিতেছিলেন—'চিত্তে সুখ নেই দাদা। ঝি-বেটী পালিয়েছে, খুকী-টার জ্বর, গিন্নী খিটখিট করছেন, আপিসে গিয়েও যে দু-দণ্ড ঘুমুব তার জো নেই, নতুন ছোট-সায়েব ব্যাটা যেন চরকি ঘুরছে।'

পরমার্থ বলিল—'কেন আপনাদের আপিসে তো বেশ ভাল ব্যবস্থা আছে।'

নিতাই। সেদিন আর নেই রে ভাই। ছিল বটে মেকেঞ্জি সায়েবের আমলে। বরদা-খুড়োকে জান তো? শ্যামনগরের বরদা মুখুজ্যে। খুড়ো দুটোর সময় আফিম খেতেন, আড়াইটা থেকে সাড়ে চারটে পর্যন্ত ঘুমুতেন। আমরা সবাই পালা ক'রে টিফিনঘরে গড়িয়ে নিতুম, কিন্তু খুড়ো চেয়ার ছাড়তেন না। একদিন হয়েছে কি—লেজার ঠিক দিতে দিতে যেমনি পাতার নীচে পেঁাছেছেন অমনি ঘুম এল। নড়ন-চড়ন নেই, নাক-ডাকা নেই, ঘাড় একটু ঝুঁকল না, লেজার টোটালের জায়গায় হাতের কলমটি ঠিক ধরা আছে। অসাধারণ ক্ষমতা—দূর থেকে দেখলে কে বলবে খুড়ো

ঘুমুচ্ছে। এমন সময় মেকেঞ্জি সায়েব ঘরে এল, সকলে শশব্যস্ত। সায়েব খুড়োর কাছে গিয়ে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ ক'রে খুড়োর কাঁধে একটি চিমটি কাটলে। খুড়ো একটু মিটমিটিয়ে চেয়েই বিড়বিড় ক'রে আরম্ভ করলে—সাঁইত্রিশের সাত নাবে তিনে-



তিনে-কত্তি তিন

কত্তি তিন। সায়েব হেসে বললে—হ্যাভ এ কপ অভ টী বাবু। এখন সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। সংসারে ঘেন্না ধ'রে গেছে। একটি ভাল সাধু-সন্ন্যাসী পাই তো সব ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

পরমার্থ। জগন্নাথ-ঘাটে আজ একটি সাধুকে দেখে এলুম—আশ্চর্য ব্যাপার। লোকে তাঁকে বলে মিরচাইবাবা। তিনি কেবল লঙ্কা খেয়ে থাকেন,—ভাত নয়, রুটি নয়, ছাতু নয়—শুধু লঙ্কা। লক্ষ লক্ষ লোক ওষুধ নিতে আসছে, একটি ক'রে লঙ্কা মন্ত্রপূত ক'রে দিচ্ছেন, তাই খেয়ে সব ভাল হয়ে যাচ্ছে। শুনেছি তাঁর আবার যিনি গুরু আছেন তাঁর সাধনা আরও উঁচু দরের। তিনি খান স্রেফ করাতের গুঁড়ো।

নিতাই। ওহে মাস্টার, তুমি তো ফিলজফিতে এম. এ. পাশ করেছ—লঙ্কা, করাতের গুঁড়ো, এ সবের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য কি বল তো? তোমার পাখোয়াজ বন্ধ কর বাপু, কান ঝালাপালা হ'ল।

নিবারণ প্রথমে একটা মাসিক পত্রিকা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল। তাতে যে পাঁচটি গল্প আছে তার প্রত্যেকের নায়িকা এক-একটি সতী-সাধ্বী বারাঙ্গনা। অবশেষে নিবারণ পত্রিকাটি ফেলিয়া দিয়া একটা পাখোয়াজ কোলে লইয়া মাঝে মাঝে বেতালা

চাঁটি মারিতেছিল। নিতাইবাবুর কথায় বাজনা থামাইয়া বলিল—'ও সব হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন সাধনার মার্গ। যেমন জ্ঞানমার্গ, কর্মমার্গ, ভক্তিমার্গ,—তেমনি মিরচাইমার্গ, করাতমার্গ, লবণমার্গ, একাদশীমার্গ, গোবরমার্গ, টিকিমার্গ, দাড়িমার্গ, স্ফটিকমার্গ, কাগমার্গ—'

নিতাই। কাগমার্গ কি রকম?

নিবারণ। জানেন না? গেল বছর হরিহর ছত্রের মেলায় গিয়েছিলুম। এক জায়গায় দেখি একটা প্রকাণ্ড বাঁশের খাঁচায় শ-দুই কাগ ঝামেলা করছে। পাশে একটা লোক হাঁকছে—দো-দো আনে কৌয়ে, দো-দো আনে। ভাবলুম বুঝি পেশোয়ারী কি মুলতানী কাগ হবে, নিশ্চয় পড়তে জানে। একটা ধাড়িগোছ কাগের কাছে গিয়ে শিস দিয়ে বললুম—পড়ো ময়না, চিত্রকোট কি ঘাট পর—সীতারাম—রাধাকিষন বোলো —চুচ্চুঃ। ব্যাটা ঠোকরাতে এল। কাগ-ওলা বললে—বাবু কৌয়া নহি পড়তা। তবে কি করে বাপু? কাগের মাংস তো শুনতে পাই তেতো, লোকে বুঝি সুক্ত বানাবার জন্যে কেনে? বললে—তাও নয়। এই কাগ খাঁচায় কয়েদ রয়েছে, দু-দু আনা খরচ ক'রে যতগুলি ইচ্ছে কিনে নিয়ে জীবকে বন্ধনদশা হ'তে মুক্তি দাও, তোমারও মুক্তি হবে। ভাবলুম মোক্ষের মার্গ কি বিচিত্র! অন্য লোকে মুক্তি পাবে তাই এই গরিব কাগ-ওলা বেচারা নিজের পরকাল নষ্ট করছে। একেই বলে conservation of virtue. একজন পাপ না করলে আর একজনের পুণ্য হবার জো নাই।

এই সময় একটি হ্যাটকোটধারী বাইশ-তেইশ বছরের ছেলে ঘরে আসিয়া পাখার রেগুলেটার শেষ পর্যন্ত ঠেলিয়া দিয়া হ্যাটটি আছড়াইয়া ফেলিয়া ফরাশের উপর থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। এর নাম সত্যব্রত, সম্প্রতি লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়া কাজকর্মের চেষ্টা দেখিতেছে। সত্যব্রত হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল—'ওঃ, কি মুশকিলেই পড়া গেছে!'

সত্য প্রায়ই মুশকিলে পড়িয়া থাকে, সেজন্য তার কথায় কেহ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিল না। অগত্যা সে আপন মনে বলিতে লাগিল—'সমস্ত দিন আপিসের হাড়ভাঙা খাটুনি, বিকেলে যে একটু ফুর্তি করব তারও জো নেই। ভাবলুম আজ ম্যাটিনিতে সীতা দেখে আসি। অমনি পিসীমা ব'লে বসলেন—সতে, তুই ব'কে যাচ্ছিস, আমার সঙ্গে চল্, সাণ্ডেলমশায়ের বক্তৃতা শুনবি। কি করি, যেতে হ'ল। কিন্তু সব মিথ্যে। সাণ্ডেলমশায় বলচেন ধর্মজীবনে মধুরতা, আর আমি ভাবছি আরসোলা।'

নিতাই। আরসোলা?

সত্য। তিন টন আরসোলা। ফরওয়ার্ড কনট্রাক্ট আছে, নভেম্বর-ডিসেম্বর শিপমেণ্ট, চল্লিশ পাউণ্ড পনর শিলিং টন, সি-আই-এফ হংকং। চায়নায় লড়াই বাধবে কিনা, তাই আগে থাকতে রসদ সংগ্রহ কচ্ছে। বড়সাহেবের হুকুম—এক মাসের মধ্যে সমস্ত মাল পিপে-বন্দী হওয়া চাই। কোত্থেকে পাই বলুন তো? ওঃ, কি বিপদ!

নিতাই। হ্যাঁরে সতে, তুই না বেহ্মজ্ঞানী, তোদের না মিথ্যে কথা বলতে নেই?

সত্য। কেন বলতে নেই। পিসীমার কাছে না বললেই হ'ল।

নিবারণ। সতে, তোর সন্ধানে ভাল বাবাজী কি স্বামিজী আছে?

সত্য। ক-টা চাই?

নিতাই। যা যাঃ, ইয়ারকি করিস নি। তোরা মন্ত্রতন্ত্রই মানিস না তা আবার বাবাজী।

সত্য। কেন মানব না। পিসীমার দাঁত কনকন করছিল, খেতে পারেন না, ঘুমুতে পারেন না, কথা কইতে পারেন না, কেবল পিসেমশায়কে ধমক দেন। বাড়িসুদ্ধ লোক ভয়ে অস্থির। পিপারমিন্ট, আস্পিরিন, মাদুলি, জলপড়া, দাঁতের পোকা বার কো-ও-রি, কিছুতে কিছু হয় না। তখন পিসেমশায় এসা জোর প্রার্থনা আরম্ভ করলেন যে তিন দিনের দিন দাঁত পড়ে গেল।

পরমার্থ চটিয়া উঠিয়া বলিল—'দেখ সত্য, তুমি যা বোঝ না তা নিয়ে ফাজলামি ক'রো না। প্রার্থনাও যা মন্ত্রসাধনাও তা। মন্ত্রসাধনায় প্রচণ্ড এনার্জি উৎপন্ন হয় তা মান?'

সত্য। আলবৎ মানি। তার সাক্ষী রাজশাহির তড়িতানন্দ ঠাকুর, কলেজের ছেলেরা যাঁকে বলে রেডিও বাবা। বাবার দুই টিকি, একটি পজিটিভ, একটি নেগেটিভ। আকাশ থেকে ইলেকট্রিসিটি শুষে নেন। স্পার্ক ঝাড়েন এক-একটি আঠারো ইঞ্চি লম্বা। কাছে এগোয় কার সাধ্য,—সিল্কের চাদর মুড়ি দিয়ে দেখা করতে হয়।

নিবারণ। নাঃ, মিরচাই বেদান্ত ইলেকট্রিসিটি এর একটাও নিতাইদার ধাতে সইবে না। যদি কোনও নিরীহ বাবাজী সন্ধানে থাকে তো বল। কিন্তু কেরামতি চাই, শুধু ভক্তিতত্ত্বে চলবে না। কি বলেন নিতাইদা?

পরমার্থ। তবে দমদমায় গুরুপদবাবুর বাগানে চলুন, বিরিঞ্চিবাবার কাছে।

নিবারণ। আলিপুরের উকিল গুরুপদবাবু? আমাদের প্রফেসর ননির শ্বশুর? তিনি আবার বাবাজী জোটালেন কোথা থেকে? সত্য, তুই জানিস কিছু?

সত্য। ননিদার কাছে শুনেছিলুম বটে গুরুপদবাবু সম্প্রতি একটি গুরুর পাল্লায় পড়েছেন। স্ত্রী মারা গিয়ে অবধি ভদ্রলোক একেবারে বদলে গেছেন। আগে তো কিছুই মানতেন না।

নিবারণ। গুরুপদবাবুর আর একটি আইবড় মেয়ে আছে না?

সত্য। বুঁচকী, ননিদার শালী।

নিবারণ। তার পর পরমার্থ, বাবাজীটি কেমন?

পরমার্থ। আশ্চর্য! কেউ বলে তাঁর বয়স পাঁচ-শ বৎসর, কেউ বলে পাঁচ হাজার, অথচ দেখতে এই নিতাইদার বয়সী বোধ হয়। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে একটু হেসে বলেন—বয়স ব'লে কোনও বস্তুই নেই। সমস্ত কাল—একই কাল; সমস্ত স্থান—একই স্থান। যিনি সিদ্ধ তিনি ত্রিকাল ত্রিলোক একসঙ্গেই ভোগ করেন। এই ধর—এখন সেপ্টেম্বর ১৯২৫, তুমি হাবশীবাগানে আছ। বিরিঞ্চিবাবা ইচ্ছে করলে এখনই তোমাকে আকবরের টাইমে আগ্রাতে অথবা ফোর্থ সেঞ্চুরি বি. সি.তে পাটলিপুত্র নগরে এনে ফেলতে পারেন। সমস্তই আপেক্ষিক কি না।

নিবারণ। আইনস্টাইনের পসার একেবারে মাটি?

পরমার্থ। আরে আইনস্টাইন শিখলে কোত্থেকে? শুনেছি বিরিঞ্চিবাবা যখন চেকোস্লোভাকিয়ায় তপস্যা করতেন তখন আইনস্টাইন তাঁর কাছে গতায়াত করত। তবে তার বিদ্যে রিলেটিভিটির বেশী এগোয় নি।

নিতাইবাবু উদ্‌গ্রীব হইয়া সমস্ত শুনিতেছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—'আচ্ছা, আইনস্টাইনের থিওরিটা কি বল তো?'

পরমার্থ। কি জানেন, স্থান কাল আর পাত্র এরা পরস্পরের ওপর নির্ভর করে। যদি স্থান কিংবা কাল বদলায়, তবে পাত্রও বদলাবে।

সত্য। ও হ'ল না, আমি সহজ ক'রে বলছি শুনুন। ধরুন আপনি একজন ভারিক্কে লোক, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে গেছেন, তখন আপনার ওজন ২ মণ ৩০ সের। সেখান থেকে গেলেন গে'ড়াতলা কংগ্রেস কমিটিতে—সেখানে ওজন হ'ল মাত্র ৫ ছটাক, ফুঁয়ে উড়ে গেলেন।

নিবারণ। ঠিক। জনার্দন ঠাকুর পটলডাঙ্গায় কেনে আড়াই সের আলু, আর মেসে এলেই হয়ে যায় ন-পো।

নিতাই। আচ্ছা পরমার্থ, বিরিঞ্চিবাবা নিজে তো ত্রিকালসিদ্ধ পুরুষ। ভক্তদের কোনও সুবিধে করে দেন কি?

পরমার্থ। তেমন তেমন ভক্ত হ'লে করেন বই কি। এই সেদিন মেকিরাম আগরওয়ালার বরাত ফিরিয়ে দিলেন। তিন দিনের জন্যে তাকে নাইণ্টিন ফোর্টিনে নিয়ে গেলেন, ঠিক লড়ায়ের আগে। মেকিরাম পাঁচ হাজার টন লোহার কড়ি কিনে ফেললে-ছ টাকা হন্দর। তার পরেই তাকে এক মাস নাইণ্টিন নাইণ্টিনে রাখলেন। মেকিরাম বেচে দিলে একুশ টাকা দরে। তখন আবার তাকে হাল আমলে ফিরিয়ে আনলেন। মেকিরাম এখন পনর লাখ টাকার মালিক। না বিশ্বাস হয়, অঙ্ক ক'ষে দেখ।

নিতাইবাবু পরমার্থের দুই হাত ধরিয়া গদ্‌গদস্বরে বলিলেন—'পরমার্থ ভাই রে, আমায় এক্ষুনি নিয়ে চল্‌ বিরিঞ্চিবাবার কাছে। বাবার পায়ে ধ'রে হত্যা দেব। খরচ যা লাগে সব দেব, ঘটি-বাটি বিক্রি ক'রব, গিন্নীর হাতে পায়ে ধ'রে সেই দশ ভরির গোট-ছড়াটা বন্ধক দেব। বাবার দয়ায় যদি হপ্তাখানেক নাইণ্টিন ফোর্টিনে ঘুরে আসতে পারি, তবে তোমায় ভুলব না পরমার্থ। টেন পারসেণ্ট—বুঝলে? হা ভগবান, হায় রে লোহা!'

নিবারণ। গুরুপদবাবু কিছু গুছিয়ে নিতে পারলেন?

পরমার্থ। তাঁর ইহকালের কোনও চিন্তাই নেই। শুনেছি বিষয়-সম্পত্তি সমস্তই গুরুকে দেবেন।

নিবারণ। এতদূর গড়িয়েছে? হ্যাঁরে সত্য, তোর ননিদা, তোর বউদি, এ'রা কিছু বলছেন না?

সত্য। ননিদাকে তো জানই, ন্যালা-খ্যাপা লোক, নিজের এক্সপেরিমেণ্ট নিয়েই আছেন। আর বউদি নিতান্ত ভালমানুষ। ওঁদের দ্বারা কিছু হ'বে না। কিছু করতে হয় তো তুমি আর আমি। কিন্তু দেরি নয়।

নিবারণ। তবে এক্ষুনি ননির কাছে চল্‌। ব্যাপারটা ভাল ক'রে জেনে নিয়ে তার পর দমদমায় যাওয়া যাবে।

নিতাইবাবু কাগজ পেনসিল লইয়া লোহার হিসাব কষিতেছিলেন। দমদমা যাওয়ার কথা শুনিয়া বলিলেন—'তোমরাও বাবার কাছে যাবে নাকি? সেটা কি ভাল হবে? এত লোক গিয়ে আবদার করলে বাবা ভড়কে যেতে পারেন। সত্যটা একে বেম্ম তায় বিশ্ববকাট, ওর গিয়ে লাভ নেই। কেন বাপু, তোদের অমন খাসা ব্রাহ্মসমাজ রয়েছে, সেখানে গিয়ে হত্যে দে না, আমাদের ঠাকুর-দেবতার ওপর নজর দিস কেন? আমি বলি কি, আগে আমি আর পরমার্থ যাই। তার পর আর একদিন না হয় নিবারণ যেয়ো।'

নিবারণ। না না, আপনার কোনও ভয় নেই, আমরা মোটেই আবদার করব না শুধু একটু শাস্ত্রালাপ করব। সুবিধে হয় তো কাল বিকেলেই সব একসঙ্গে যাওয়া যাবে।

প্রফেসার ননি কোনও কালে প্রফেসারি করে নাই, কিন্তু অনেকগুলি পাস করিয়াছে। সে বাড়িতে নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়া থাকে, সেজন্য বন্ধুবর্গ তাকে প্রফেসার আখ্যা দিয়াছে। রোজগারের চিন্তা নাই, কারণ পৈতৃক সম্পত্তি কিছু আছে। ননি গুরুপদ বাবুর জামাতা, সত্যব্রতের দূরসম্পর্কীয় ভ্রাতা এবং নিবারণের ক্লাসফ্রেন্ড।

নিবারণ ও সত্যব্রত যখন ননির বাড়িতে পেঁছিল তখন রাত্রি আটটা। বাহিরের ঘরে কেহ নাই, চাকর বলিল বাবু এবং বহুমা ভিতরের উঠানে আছেন। নিবারণ



কাঠি দিয়া ঘাঁটিতেছে

ও সত্য অন্দরে গিয়া দেখিল উঠানের এক পাশে একটি উনানের উপর প্রকাণ্ড ডেকচিতে সবুজ রঙের কোনও পদার্থ সিদ্ধ হইতেছে, ননির স্ত্রী নিরুপমা তাহা কাঠি দিয়া ঘাঁটিতেছে। পাশের বারান্দায় একটা হারমোনিয়ম আছে, তাহা হইতে একটা রবারের নল আসিয়া ডেকচির ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। প্রফেসার ননি মালকোঁচা মারিয়া কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

নিবারণ বলিল—'একি বউদি, এত শাগের ঘণ্ট কার জন্যে রাঁধছেন?'

নিরুপমা বলিল—'শাগ নয়, ঘাস সেদ্ধ হচ্ছে। ওঁর কত রকম খেয়াল হয় জানেন তো।'

নিবারণ। সেদ্ধ হচ্ছে? কেন, ননির বুঝি কাঁচা ঘাস আর হজম হয় না?

ননি বলিল—'নিবারণ, ইয়ারকি নয়। পৃথিবীতে আর অন্নাভাব থাকবে না।'

নিবারণ। সকলেই তো প্রফেসার ননি বা রোমন্থক জীব নয় যে ঘাস খেয়ে বাঁচবে।

ননি। আরে ও কি আর ঘাস থাকবে? প্রোটিন সিন্থেসিস হচ্ছে ঘাস হাইড্রোলাইজ হয়ে কার্বোহাইড্রেট হবে। তাতে দুটো অ্যামিনো-গ্রুপ জুড়ে দিলেই বস্। হেক্সা-হাইড্রক্সি-ডাই-অ্যামিনো—

নিবারণ। থাক, থাক। হারমোনিয়মটা কি জন্যে?

ননি। বুঝলে না? অক্সিডাইজ করবার জন্যে। নিরু, হারমোনিয়মটা বাজাও তো।

নিরুপমা হারমোনিয়মের পেডাল চালাইল। সুর বাহির হইল না, রবারের নল দিয়া হাওয়া আসিয়া ডেকচির ভিতর বগবগ করিতে লাগিল।

নিবারণ। শুধুই ভুড়ভুড়ি! আমি ভাবলুম বুঝি সংগীতরস রবারের নল ব'য়ে ঘাসের সঙ্গে মিশে সবুজ-অমৃতের চ্যাংড় সৃষ্টি করবে। যাক—বউদি বাবার খবর কি বলুন তো।

নিরুপমা ম্লানমুখে বলিল—'শোনেন নি কিছু? মা যাওয়ার পর থেকেই কেমন এক রকম হয়ে গেছেন। গণেশমামা কোথা থেকে এক গুরু জুটিয়ে দিলেন, তাঁকে নিয়েই একেবারে তন্ময়। বাহ্যজ্ঞান নেই বললেই হয়, কেবল গুরু গুরু গুরু। অনেক কান্নাকাটি করেছি কোনও ফল হয়নি। শুনছি টাকাকড়ি সবই গুরুকে দেবেন। বুচকীটার জন্যেই ভাবনা। তার কাছেই গিয়ে থাকতুম, কিন্তু শাশুড়ীর অসুখ, এ বাড়ি ছেড়ে যেতে পারছি না।'

সত্য বলিল—'আচ্ছা ননিদা, তুমি তো বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলতে পার?'

ননি। তা কখনও পারি? শ্বশুরমশায় ভাববেন ব্যাটা সম্পত্তির লোভে আমার ধর্মকর্মের ব্যাঘাত করতে এসেছে।

সত্য। তবে হুকুম দাও, প্রহারেণ ধনঞ্জয় ক'রে দিই।

নিরুপমা। না না জুলুম যদি কর তবে সেটা বাবার ওপরেই পড়বে। বাবাকে কষ্ট না দিয়ে যদি কিছু করতে পার তো দেখ।

সত্য। বড় শক্ত কথা। আচ্ছা বউদি, বিরিঞ্চিবাবার ব্যাপার কি রকম বলুন তো।

নিরুপমা। ব্যাপার প্রায় মাসখানেক থেকে চলছে। দমদমার বাগানে আছেন, সঙ্গে আছে তাঁর চেলা ছোট-মহারাজ কেবলানন্দ। গণেশমামা খিদমত করছেন। বাবা দিনরাত সেখানেই পড়ে আছেন। রোজ দু-তিনশ ভক্ত গিয়ে ধর্ণা দিচ্ছে, বিরিঞ্চিবাবার

অদ্ভুত কথাবার্তা শোনবার জন্যে হাঁ করে আছে। প্রতি রবিবার রাত্রে হোম হচ্ছে, তা থেকে এক-এক দিন এক-একটি দেবতার আবির্ভাব হচ্ছে। কোনও দিন রামচন্দ্র, কোনও দিন ব্রহ্মা, কোনও দিন যিশু, কোনও দিন শ্রীচৈতন্য। যাকে-তাকে হোমঘরে ঢুকতে দেওয়া হয় না, যারা খুব বেশী ভক্ত তারাই যেতে পারে। ব্রহ্মা বেরনোর দিন আমি ছিলুম।

সত্য। কি রকম দেখলেন?

নিরুপমা। আমি কি ছাই ভাল ক'রে দেখেছি? অন্ধকার ঘরে হোমকুণ্ডুর পিছনে আবছায়ার মত প্রকাণ্ড মূর্তি, চারটে মুণ্ডু, লম্বা লম্বা দাড়ি। আমার তো দেখেই দাঁতে দাঁত লেগে ফিট হ'ল। গণেশমামা ঘর থেকে টেনে বার ক'রে দিলেন। বুঁচকীর বরং সাহস আছে, প্রায়ই দেখছে কিনা। কাল নাকি মহাদেব বার হবেন।

নিবারণ। কাল একবার আমরা বিরিঞ্চিবাবার চরণ দর্শন ক'রে আসি, যদি তাঁর দয়া হয় তবে কপালে হয়তো মহাদেব দর্শনও হবে।

নিরুপমা। গণেশমামাকে বশ করুন, তিনি হুকুম না দিলে হোমঘরে ঢুকতে পাবেন না।

নিবারণ। সে আমি ক'রে নেব। কিন্তু সতে, তোকে নিয়ে যেতে সাহস হয় না, তোর মুখ বড় আলগা, তুই হেসে ফেলবি।

সত্য তার সমস্ত দেহ নাড়িয়া বলিল—'কখ্‌খনো নয়, তুমি দেখে নিও, হাসে কোন্ শা—ইল!'

নিবারণ। ও কি, জিব বার করলি যে?

সত্য। বেগ ইওর পার্ডন বউদি, খুব সামলে নিয়েছি। পিসীমার কাছে ব'লে ফেললে রক্ষে থাকত না।

নিবারণ। তবে আজ আমরা চলি। হ্যাঁ, ভাল কথা। ননি, এমন কিছু বলতে পার যাতে খুব ধোঁয়া হয়?

ননি। কি রকম ধোঁয়া? যদি লাল ধোঁয়া চাও তবে নাইট্রিক অ্যাসিড অ্যাণ্ড তামা, যদি বেগনী চাও তবে আয়োডিন ভেপার, যদি সবুজ চাও—

নিবারণ। আরে না না। প্লেন ধোঁয়া চাই।

ননি। তা হ'লে ট্রাই-নাইট্রো-ডাই-মিথাইল—

নিবারণ কান চাপিয়া বলিল—'আবার আরম্ভ করলে রে! বউদি, এটাকে নিয়ে আপনার চলে কি ক'রে?'

নিরুপমা হাসিয়া বলিল—'মামার বাড়িতে দেখেছি গোয়ালঘরে ভিজে খড় জ্বালে, খুব ধোঁয়া হয়।'

নিবারণ। ইউরেকা! বউদি, আপনিই নোবেল প্রাইজ পাবেন, ননেটার কিছু হবে না।

নিরুপমা। ধোঁয়া দিয়ে করবেন কি?

নিবারণ। ছুঁচোর উপদ্রব হয়েছে, দেখি তাড়াতে পারি কি না।

গুরুপদবাবুর দমদমার বাগানবাড়ি পূর্বে বেশ সুসজ্জিত ছিল, কিন্তু তাঁর পত্নী গত হওয়া অবধি হতশ্রী হইয়াছে। সম্প্রতি বিরিঞ্চিবাবার অধিষ্ঠানহেতু বাড়িটি মেরামত করানো হইয়াছে এবং জঙ্গলও কিছু কিছু সাফ হইয়াছে, কিন্তু পূর্বের গৌরব ফিরিয়া আসে নাই। গুরুপদবাবু সংসারের কোনও খবর রাখেন না, তাঁর শ্যালক গণেশই এখন সপরিবারে আধিপত্য করিতেছেন।

বৈকালে পাঁচটার সময় নিবারণ, সত্যব্রত, পরমার্থ এবং নিতাইবাবু আসিয়া পৌঁছিলেন। বাড়ির নীচে একটি বড় ঘরে শতরঞ্জ বিছাইয়া ভক্তবৃন্দের বসিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তার একপাশে একটি তক্তাপোশে গদি এবং বাঘের ছাপ-মারা র‍্যাগের উপর বিরিঞ্চিবাবার আসন। পাশের ঘরে ভক্ত মহিলাগণের স্থান। বাবাজী এখনও তাঁর সাধনকক্ষ হইতে নামেন নাই। ভক্তের দল উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া আছে এবং মৃদুস্বরে বাবার মহিমা গুঞ্জন করিতেছে। একটি সাহেবী পোশাক পরা প্রৌঢ় ব্যক্তি অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া পা মুড়িয়া বসিয়া আছেন এবং অধীর হইয়া মাঝে মাঝে তাঁর কামানো গোঁফে পাক দিতেছেন। ইনি মিস্টার ও. কে. সেন, বার অ্যাট-ল। সম্প্রতি কয়লার খনিতে অনেক টাকা লোকসান দিয়া ধর্মকর্মে মন দিয়াছেন।

পরমার্থ ও নিতাইবাবুকে ঘরে বসাইয়া নিবারণ ও সত্যব্রত বাহিরে আসিল এবং বাগানের চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়া ফটকের কাছে উপস্থিত হইল। ফটকের পাশেই এক সারি টালি-ছাওয়া ঘর, তাতে আস্তাবল এবং কোচমান, দরোয়ান, মালী ইত্যাদির থাকিবার স্থান।

আস্তাবলের সম্মুখে মৌলবী বছিরুদ্দি একটি ভাঙা বেঞ্চে বসিয়া কোচম্যান ঝোঁটি মিয়া এবং দরোয়ান ফেকু পাঁড়ের সঙ্গে গল্প করিতেছেন। মৌলবী সাহেবের নিবাস ফরিদপুর, ইনি গুরুপদবাবুর অন্যতম মুহুরী। গুরুপদবাবু ওকালতি ত্যাগ করায় বছিরুদ্দির উপার্জন কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও তিনি নিয়মিত মাসহারা পাইয়া থাকেন. সেজন্য মনিবকে সেলাম করিতে আসেন।

মৌলবী সাহেব ফরিদপুরী উর্দুতে দুনিয়ার বর্তমান দুরবস্থা বিবৃত করিতেছিলেন. কোচমান ও দরোয়ান মাথা নাড়িয়া সায় দিতেছিল। অদূরে সহিস ঘোড়ার অঙ্গ ডলিতেছে এবং মাঝে মাঝে চঞ্চল ঘোড়ার পেটে সশব্দে থাবড়া মারিয়া বলিতেছে —'আরে ঠহর যা উল্লু।' সামনের মাঠে একটি স্থূলকায় বিড়াল মুখভঙ্গী করিয়া ঘাস খাইতেছে—প্রত্যহ বিরিঞ্চিবাবার ভুক্তাবশিষ্ট মাছের মুড়া খাইয়া তার গুরুহজম হইয়াছে।

সত্যব্রত বলিল—'আদাব মৌলবী সাহেব। মেজাজ তো দিব্য শরিফ? পরুনাম পাঁড়েজী। কোচমানজী আচ্ছা হ্যায় তো? এঁকে চেন না বুঝি? ইনি নিবারণবাবু, জামাইবাবুর দোস্ত। পুজোর জন্যে কিছু ভেট এনেছেন—কিছু মনে করবেন না মৌলবী সাহেব—আপনার দশ টাকা, পাঁড়েজী আর কোচমানজীর পাঁচ-পাঁচ, সহিস মালী এদের আরও পাঁচ।

সৌজন্যে অভিভূত হইয়া বছিরুদ্দি. ফেকু এবং ঝোঁটি দন্তবিকাশ করিয়া বার বার সেলাম করিল এবং খোদা ও কালীমায়ীর নিকট বাবুজীদের তরক্কি প্রার্থনা করিল।

মৌলবী বলিলেন—'আর বাবুমশায়, সে সব দিন থ্যান কম্‌নে চ'লে গেছে। মা-ঠাকরোন বেহস্ত্‌ পাওয়া ইস্তক মোদের বাবুসায়েবের জান্‌ডা কলেজায় নেই। অত

ক'রে বললাম, হুজুর, অমন পসারডা নষ্ট করবেন না। তা কে শোনে?—খোদার মর্জি।'

নিবারণ বলিল—'ও বাবাজীটাই যত নষ্টের গোড়া।'

ফেকু পাঁড়ে ভরসা পাইয়া মত প্রকাশ করিল—বিরিঞ্চিবাবা বাবাজী থোড়াই আছেন। তাঁর জনৌ ভি নাই, জটা ভি নাই। তিনি মছরি ভি খান, বকাড়ির গোস্ত ভি খান। সোনো সাঁঝ চা-বিস্কুট না হইলে তাঁর চলে না। এ সব বংগালী বাবাজী বিলকুল জুয়াচোর। আর ছোট-মহারাজ যিনি আছেন তিনি তো একটি বিচ্ছু, ফেকু পাঁড়েকে পর্যন্ত দংশন করিতে তাঁহার সাহস হয়। তিনি জানেন না যে উক্ত ফেকু পাঁড়ে মিউটিনিমে তলোয়ার খেলায়া থা (যদিও ফেকু তখনও জন্মেন নাই)। একবার যদি মনিব হুকুম দেন, তবে লাঠির চোটে বাবাজীদের হড্ডি চুর করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

মৌলবী জানাইলেন যে তাঁকেও কম অপমান সহ্য করিতে হয় নাই। মামাবাবু (গণেশ) যে তাঁর উপর লম্বাই চওড়াই করিবে তা তিনি বরদাস্ত করিবেন না। তিনি খানদানী মনিষ্যি, তাঁর ধমনীতে মোগলাই রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। যদিও লোকে তাঁকে বছিরুদ্দি বলে, কিন্তু তাঁর আদত নাম ম্রেদম খাঁ, তাঁর পিতার নাম জাঁহাবাজ খাঁ, পিতামহের নাম আবদুল জব্বর, তাঁদের আদি নিবাস ফরিদপুর নয়—আরব দেশে, যাকে বলে তুর্খ। সেখানে সকলেই লুঙ্গি পরে এবং উর্দু বলে. কেবল পেটের দায়ে তাঁকে বাংলা শিখিতে হইয়াছে। সেই আরব দেশের মধ্যিখেনে ইস্তাম্বুল, তার বাঁয়ে শহর বোগদাদ। এই কলকাতা শহরডা তার কাছে একেবারেই তুশ্চু। বোগদাদের দখিন-বাগে মক্কা-শরিফ, সেখানকার পবিত্র কুয়ার জল আব-এ-জমজম তাঁর কাছে এক শিশি আছে। মনিব যদি হুকুম দেন তবে সেই জল ছিটাইয়া হালাম্ন-পো-হালা ইবলিসের বাচ্চা দুই বাবাজী মায় মামাবাবুকে তিনি হা—ই সাত দরিয়ার পারে জাহান্নমের চৌমাথায় পেঁছাইয়া দিতে পারেন।

নিবারণ বলিল—'দেখুন মৌলবী সাহেব, আমরা বাবাজী দুটোকে তাড়াবই তাড়াব। যদি সুবিধে হয় তো আজই। কিন্তু একলা পেরে উঠব না। আপনি আর দরোয়ানজী সঙ্গে থাকা চাই।'

ফেকু। মার-পিট হোবে?

নিবারণ। আরে না না। তোমাদের কোনও ভয় নেই। কেবল একটু চিল্লাচিল্লি করতে হবে। পারবে তো?

জরুর। আলবৎ। জান কবুল। কিন্তু মনিব যদি গোসা হন?

নিবারণ বুঝাইল, মনিবের চটিবার কোনও কারণ থাকিবে না। একটু পরে সে আসিয়া যথাকর্তব্য বাতলাইয়া দিবে।

নিবারণ ও সত্যব্রত বিরিঞ্চিবাবার দরবার অভিমুখে চলিল। পথে গণেশমামার সঙ্গে দেখা, তিনি ব্যস্ত হইয়া হোমের আয়োজন করিতে যাইতেছেন। নিবারণ ও সত্যব্রতকে দেখিয়া বলিলেন—'এই যে তোমরাও এসেছ দেখছি, বেশ বেশ। হেঁ-হেঁ, তার পর—বাড়ির সব হেঁ-হেঁ? নিবারণ, তোমার বাবা বেশ হেঁ-হেঁ? তোমার মা এখন একটু হেঁ-হেঁ? তোমার ছোট বোনটি হেঁ-হেঁ? সত্য, তোমার পিসেমশায় পিসীমা সক্কলে—'

নিবারণের স্বজনবর্গ সকলেই হেঁ-হেঁ। সত্যব্রতেরও তদ্রূপ। সমস্তই গণেশ-

মামার আশীর্বাদের ফল। মামাবাবুর ভাবনায় ঘুম হইতেছিল না, এখন কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইলেন।

সত্য বলিল—'মামা, আপনার ছোট জামাইটির চাকরি হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে তবে ছুটির পরেই আমাদের আপিসে একবার পাঠাবেন, একটা ভেকান্সি আছে।'

গণেশ। বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক। তোমরা হলে আপনার লোক, তোমরা চেষ্টা না করলে কি কিছু হয়? আপিস খুললেই সে তোমার সঙ্গে দেখা করবে।

নিবারণ। মামাবাবু, একটি নিবেদন আছে। দেবদর্শন করিয়ে দিতে হবে।

গণেশ। তা যাও না বাবার কাছে। সকলেই তো গেছে।

নিবারণ। ও দেবতা তো দেখবই। আসল দেবতা দেখতে চাই,—হোমঘরে।

গণেশমামা সভয়ে জিব কাটিয়া বলিলেন—'বাপ রে, সে কি হয়! কত সাধ্য-সাধনা ক'রে তবে অধিকার জন্মায়। আর আমাদের সত্য তো—এই—এই—যাকে বলে—'

নিবারণ। বেম্মজ্ঞানী। কিন্তু ওর ব্রহ্মজ্ঞান এখনও হয় নি। সত্য হচ্ছে দৈত্য কুলে প্রহ্লাদ, হিঁদুয়ানিটা ঠিক বজায় রেখেছে। ও গীতা আওড়ায়, থিয়েটার দেখে সত্যনারায়ণের শিন্নি, মদনমোহনের খিচুড়ি-ভোগ, কালীঘাটের কালিয়া সমস্ত খায়। আর বলতে নেই, আপনি হলেন নেহাত গুরুজন, নইলে ওর দু-চারটে বোলচাল শুনলে বুঝতেন যে ও বড় বড় হিঁদুর কান কাটতে পারে।

গণেশ। যাই করুক, জাত গেলে আর ফিরে আসে না। তুমিও তো শুনতে পাই অখাদ্য খাও।

নিবারণ। সে তো সব্বাই খায়। গুরুপদবাবুও ঢের খেয়েছেন। তা হ'লে দেবদর্শন হবে না? নিতান্তই নিরাশ করবেন? আচ্ছা, তবে চললুম।

সত্য। প্রণাম মামাবাবু। হ্যাঁ, একটা কথা—আমি বলি কি, আপনার জামাইটি এখন মাস চার-পাঁচ টাইপরাইটিং শিখুক। একবারে আনাড়ী, তাকে ঢুকিয়ে দিয়ে আমিই সায়েবের কাছে অপদস্থ হব। নেক্সট ভেকান্সিতে বরং চেষ্টা করা যাবে।

গণেশ। আরে না না না। চাকরি একবার ফসকে গেলে কি আর সহজে মেলে? না সত্য, লক্ষ্মী বাবা আমার, চাকরিটি ক'রে দিতেই হবে।—হ্যাঁ—কি বলছিলে? তুমি এখন গীতা-টিতা প'ড়ে থাক? খুব ভাল। তা—হোমঘরে গেলে তেমন দোষ হবে না। একটু গঙ্গাজল মাথায় দিয়ে যেয়ো—দুজনেই। আচ্ছা—তা হ'লে জামাইটির কথা ভুলো না।

গণেশ-মামা তফাতে গেলে নিবারণ বলিল—'এখন পর্যন্ত তো বেশ আশাজনক বোধ হচ্ছে, শেষ রক্ষা হলেই হয়। অমূল্য, হাবলা এরা সব এসেছে?'

সত্য। হ্যাঁ, তারা দরবারে রয়েছে। ঠিক সময় হাজির হবে। আচ্ছা নিবারণদা, মামাবাবুর কিছু বখরা আছে নাকি?

নিবারণ। ভগবান জানেন। গুরুপদবাবু যত দিন সংসারে নির্লিপ্ত থাকেন, মামাবাবুর তত দিনই সুবিধে।

বিরিঞ্চিবাবা সভা অলংকৃত করিয়া বসিয়াছেন। তাঁর চেহারাটি বেশ লম্বা-চওড়া, গৌরবর্ণ, মুণ্ডিত মুখ। সুপুষ্ট গালের আড়াল হইতে দুইটি উজ্জ্বল চোখ উঁকি মারিতেছে। দু-পয়সা দামের শিঙাড়ার মত সুবৃহৎ নাক, মৃদু হাস্যমণ্ডিত প্রশস্ত ঠোঁট, তার নীচে খাঁজে খাঁজে চিবুকের স্তর নামিয়াছে। স্বামীগিরির উপযুক্ত মূর্তি। অঙ্গে গৈরিকরঞ্জিত আলখাল্লা, মস্তকে ঐরূপ কানঢাকা টুপি। বয়স ঠিক পাঁচ হাজার বলিয়া বোধ হয় না, যেন পঞ্চাশ কি পঞ্চান্ন। বাবার বেদীর নীচে ডান-দিকে ছোট-মহারাজ কেবলানন্দ বিরাজ করিতেছেন। ইঁহার বয়স কয় শতাব্দী তাহা ভক্তগণ এখনও নির্ণয় করেন নাই, তবে দেখিতে বেশ জোয়ান বলিয়াই মনে হয়। ইনিও গুরুর অনুরূপ বেশধারী, তবে কাপড়টা সস্তাদরের। বেদীর নীচে বাঁ-দিকে শীর্ণকায় গুরুপদবাবু বেদীতে মাথা ঠেকাইয়া অর্ধশয়িত অবস্থায় আছেন, জাগ্রত কি নিদ্রিত বুঝিতে পারা যায় না। পাশের ঘরে মহিলাগণের প্রথম শ্রেণীতে একটি সতর-আঠার বছরের মেয়ে লাল শাড়ির উপর এলোচুল মেলিয়া বসিয়া আছে এবং মাঝে মাঝে গুরুপদবাবুর দিকে করুণ নয়নে চাহিতেছে। সে বুঁচকী, গুরুপদবাবুর কনিষ্ঠা কন্যা। ভক্তবৃন্দের অনেকে সটান লম্বা অবস্থায় উপুড় হইয়া যুক্তকর সম্মুখে প্রসারিত করিয়া পড়িয়া আছেন। অবশিষ্ট সকলে হাতজোড় করিয়া পা ঢাকিয়া বাবার বচনামৃত পানের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া আছেন।

সত্য ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া ভক্তমণ্ডলীর ভিতরে বসিয়া পড়িল। নিবারণ ছোট-মহারাজের বাধা অগ্রাহ্য করিয়া একেবারে বিরিঞ্চিবাবার পা জড়াইয়া ধরিল। বাবা প্রসন্ন হাস্যে বলিলেন—'চেনা চেনা বোধ হচ্ছে!'

নিবারণ। অধমের নাম নিবারণচন্দ্র।

বিরিঞ্চি। নিবারণ? ও, এখন বুঝি তোমার ওই নাম? কোথা যেন দেখেছি তোমায়,—নেপালে? উঁহু, মুরশিদাবাদে। তোমার মনে থাকবার কথা নয়। জগৎ-শেঠের কুঠিতে, তার মায়ের শ্রাদ্ধের দিন। অনেক লোক ছিল—রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রায়-রায়ান জানকীপ্রসাদ, নবাবের সিপাহ্‌-সলার খান-খানান মহব্বৎ জং, সুতোনুটির আমিরচন্দ—হিস্ট্রিতে যাকে বলে উমিচাঁদ। তুমি শেঠজীর খাজাঞ্চী ছিলে, তোমার নাম ছিল—রোস—মোতিরাম। উঃ, শেঠজী খুব খাইয়েছিল, কেবল সুতোনুটির বাবুদের পাতে মণ্ডা কম পড়ে, তারা গালাগাল দিয়ে চলে যায়।—তা মোতিরাম, উঁহু, —নিবারণচন্দ্র, তুমি ধূর্জটি মন্ত্র জপ করতে শেখ, তাতে তোমার সুবিধে হবে। রোজ ভোরে উঠেই একশ-আটবার বলবে—ধূর্জটি—ধূর্জটি—ধূর্জটি, খুব তাড়াতাড়ি। আচ্ছা, এখন ব'স গিয়ে।

নিবারণ পুনরায় পায়ের ধুলা লইল এবং তাহা চাটিবার ভান করিয়া ভক্তদের মধ্যে গিয়া বসিল।

নিতাইবাবু চুপি চুপি পরমার্থকে বলিলেন—'ব্যাপার দেখলে? নিবারণটা আসবামাত্র বাবার নজরে প'ড়ে গেল, আর আমি-ব্যাটা দেড় ঘণ্টা হাঁ ক'রে ব'সে আছি। একেই বলে বরাত। এইবার একবার উঠে গিয়ে পা জড়িয়ে ধরব, যা থাকে কপালে।'

যাঁরা ভূমিসাৎ হইয়া পড়িয়া ছিলেন তাঁদের মধ্যে একটি স্থূলকায় বৃদ্ধ ছিলেন। তাঁর পরিধানে মিহি জরিপাড় ধুতি, গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি, তার ভিতর দিয়া

সরু সোনার হার দেখা যাইতেছে। ইনি বিখ্যাত মুৎসুদ্দী গোবর্ধন মল্লিক, সম্প্রতি তৃতীয়পক্ষ ঘরে আনিয়াছেন। গোবর্ধনবাবু আস্তে আস্তে উঠিয়া করজোড়ে নিবেদন করিলেন—'বাবা, প্রবৃত্তিমার্গ' আর নিবৃত্তিমার্গ' এর কোন্‌টা ভাল?'

বাবা ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিলেন—"ঠিক ঐ কথা তুলসীদাস আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমরা আহার গ্রহণ করি। কেন করি? ক্ষুধা পায় ব'লে। কি আহার, করি? অন্নব্যঞ্জন ফলমূল মৎস্য মাংসাদি। আহার করলে কি হয়? ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়। ক্ষুধা একটা প্রবৃত্তি, আহারে তার নিবৃত্তি। অতএব ভোগের মূল হচ্ছে প্রবৃত্তি, ভোগের ফল হচ্ছে নিবৃত্তি। তুলসী ছিল সন্ন্যাসী। আমি বললুম—বাপু, ভোগ না হ'লে তোমার নিবৃত্তি হবে না। তার রামায়ণ লেখা শেষ হ'লে তাকে রাজা মানসিংহ ক'রে দিলুম। অনেক বিষয়-সম্পত্তি করেছিল, কিন্তু কিছুই রইল না। তার ব্যাটা জগৎসিংহ বাঙালীর মেয়ে বে ক'রে সমস্ত উড়িয়ে দিলে। বঙ্কিম তার বইএ সে-কথা আর লেখে নি।'

ব্যারিস্টার ও. কে. সেন বলিলেন—'ওআণ্ডারফুল!'

নিতাইবাবু আর থাকিতে পারিলেন না। ছুটিয়া গিয়া বাবার সম্মুখে গলবস্ত্র হইয়া বলিলেন,—'দয়া কর প্রভু!'

বাবা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—'কি চাই তোমার?'

নিতাইবাবু থতমত খাইয়া বলিলেন—'নাইণ্টিন ফোর্টিন।'

সত্যব্রতের একটা মহৎ রোগ—সে হাসি সামলাইতে পারে না। সে নিজে বেশ গম্ভীর হইয়া পরিহাস করিতে পারে, কিন্তু অপরের মুখে অদ্ভুত কথা শুনিলে গাম্ভীর্যরক্ষা কঠিন হয়। হাস্য দমনের জন্য সত্য একটি মুষ্টিযোগ ব্যবহার করিয়া থাকে। গুরুজনদের সমক্ষে হাসির কারণ উপস্থিত হইলে সে কোনও ভয়াবহ অবস্থার কল্পনা করে। তবে সব সময় তাতে উপকার হয় না।

বিরিঞ্চিবাবা বলিলেন—'নাইণ্টিন ফোর্টিন? সে কি?'

নিবারণ চুপি চুপি বলিল—'ওআন-নাইন-ওআন-ফোর, ক্যালকাটা। নো রিংলাই? ট্রাই এগেন মিস।'

সত্যব্রত ধ্যান করিতে লাগিল—ছুতার মিস্ত্রী তার পিঠের উপর রাঁদা চালাইতেছে। চোকলা চোকলা চামড়া উঠিয়া যাইতেছে। ওঃ সে কি অসহ্য যন্ত্রণা!

নিতাইবাবু বলিলেন—'সাতটি দিনের জন্যে আমায় লড়ায়ের আগে নিয়ে যান বাবা, সস্তায় লোহা কিনব—দোহাই বাবা!'

বিরিঞ্চি। তোমার কি করা হয়?

নিতাই। আজ্ঞে ভলচার ব্রাদার্সের আপিসে লেজার-কিপার, কুল্লে দেড়-শ টাকা মাইনে, সংসার চলে না।

বিরিঞ্চি। ষড়ৈশ্বর্য সস্তায় হয় না বাপু, কঠোর সাধনা চাই। মূলাধারচক্রে ঠেলা দিয়ে কুলকুণ্ডলিনীকে আজ্ঞাচক্রে আনতে হবে, তার পর তাকে সহস্রার পদ্মে তুলতে হবে। সহস্রারই হচ্ছেন সূর্য। এই সূর্যকে পিছু হটাতে হবে। সূর্যবিজ্ঞান আয়ত্ত না হ'লে কালস্তম্ভ করা যায় না। তাতে বিস্তর খরচ—তোমার কম্ম নয়। তুমি আপাতত কিছুদিন মার্তণ্ডমন্ত্র জপ কর। ঠিক দুপ্‌পুর বেলা সূর্যের দিকে চেয়ে একশ-আটবার বলবে—মার্তণ্ড-মার্তণ্ড-মার্তণ্ড,—খুব তাড়াতাড়ি। কিন্তু খবরদার, চোখের পাতা না পড়ে, জিব জড়িয়ে না যায়,—তা হ'লেই মরবে।

নিতাইবাবু বিরস বদনে ফিরিয়া আসিলেন।

বিরিঞ্চিবাবা বলিলেন—'ধন-দৌলত সকলেই চায়, কিন্তু উপযুক্ত পাত্রে পড়া চাই। এই নিয়েই তো যিশুর সঙ্গে আমার ঝগড়া। যিশু বলত, ধনীর কখনও স্বর্গরাজ্য লাভ হবে না। আমি বলতুম—তা কেন? অর্থের সদ্‌ব্যবহার করলেই হবে। আহা বেচারা বেঘোরে প্রাণটা খোয়ালে।'

মিস্টার সেন সবিস্ময়ে বলিলেন—'এক্স্‌কিউজ মি প্রভু, আপনি কি জিসস ক্রাইস্টকে জানতেন?'

বিরিঞ্চি। হাঃ হাঃ যিশু তো সেদিনকার ছেলে।

মিস্টার সেন। মাই ঘড!



'মাই ঘড!'

সত্যের কানের ভিতর গঙ্গাফড়িং, নাকের ভিতরে গুবরে পোকা কুরিয়া কুরিয়া খাইতেছে।

মিস্টার সেন নিবারণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ইনি তা হ'লে গৌটামা বুড্ঢাকেও জানতেন?'

নিবারণ। নিশ্চয়। গৌতম বুদ্ধ কোন্ ছার, প্রভু মনু-পরাশরের সঙ্গে এক ছিলিমে গাঁজা খেতেন। সব্বার সঙ্গে ওঁর আলাপ ছিল। ভগীরথ, টুটেন খামেন, নেবু-চাড-নাজার, হাম্মুরাব্বি, নিওলিথিক ম্যান, পিথেকান্‌থ্রোপস ইরেক্টস, মায় মিসিং লিংক।

মিস্টার সেন চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন—'মাঃই!'

সাতটা বাঘ সত্যর পিছনে তাড়া করিয়াছে। সামনে তিনটা ভালুক থাবা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বিরিঞ্চিবাবা কহিলেন—'একবার মহাপ্রলয়ের পর বৈবস্বত আমায় বললে—নীললোহিত কল্প কি? না, শ্বেতবরাহ কল্প তখন সবে শুরু হয়েছে। বৈবস্বত বললে—মানুষ তো সৃষ্টি করলুম, কিন্তু ব্যাটারা দাঁড়াবে কোথা, খাবে কি?—চারিদিকে জল থই থই করছে। আমি বললুম—ভয় কি বিবু, আমি আছি, সূর্যবিজ্ঞান

আমার মুঠোর মধ্যে। সূর্যের তেজ বাড়িয়ে দিলুম, চোঁ ক'রে জল শুকিয়ে গেল, বসুন্ধরা ধনধান্যে ভরে উঠল। চন্দ্র-সূর্য চালাবার ভার আমারই ওপর কিনা।'

মিস্টার সেন কেবল মুখব্যাদান করিলেন।

সত্য মরিয়া গিয়াছে। পঞ্জাব মেলের সঙ্গে দার্জিলিং মেলের কলিশন—রক্তারক্তি —পিসীমা—

কিছুতেই কিছু হইল না। পুঞ্জীভূত হাসি সত্যব্রতের চোখ নাক মুখ ফাটিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল। সে তখন নিরুপায় হইয়া বিপুল চেষ্টায় হাসিকে কান্নায় পরিবর্তিত করিল এবং দু-হাতে মুখ ঢাকিয়া ভেউ ভেউ করিয়া উঠিল।

বিরিঞ্চিবাবা বলিলেন—'কি হয়েছে, কি হয়েছে—আহা, ওকে আসতে দাও আমার কাছে।'

সত্য নিকটে গিয়া বলিল—'উদ্ধার কর বাবা, মানবজন্মে ঘেন্না ধ'রে গেছে। আমায় হরিণ ক'রে সেই ত্রেতা যুগে কণ্ব মুনির আশ্রমে ছেড়ে দাও বাবা! অর্থ চাই না, মান চাই না, স্বর্গও চাই না। শুধু চাট্টি কচি ঘাস, শকুন্তলার নিজের হাতে ছেঁড়া। আর এক জোড়া শিং দিও প্রভু, দুষ্মন্তটাকে যাতে গুঁতিয়ে দিতে পারি।'

নিবারণ বেগতিক দেখিয়া বলিল—'ছেলেটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে বাবা। বিস্তর শোক পেয়েছে কিনা।'

ঘড়িতে সাতটা বাজিল। দৈনিক পদ্ধতি অনুসারে এই সময় বিরিঞ্চিবাবা হঠাৎ তুরীয় অবস্থাপ্রাপ্ত হইলেন। তিনি চক্ষু বুজিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া রহিলেন, কেবল তাঁর ঠোঁট দুটি ঈষৎ নড়িতে লাগিল। মামাবাবু, চেলামহারাজ এবং দুইজন ভক্ত বাবার শ্রীবপু চ্যাংদোলা করিয়া সাধনকক্ষে লইয়া গেলেন। সভা আজকের মত ভঙ্গ হইল। ভক্তগণ ক্রমশ বিদায় হইতে লাগিলেন।

নিতাইবাবু বলিলেন—'বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই কুলোপানা চক্কর! এ রকম বাবাজী আমার পোষাবে না। ক্ষ্যামতা যদি থাকে তবে দু-চারটে নমুনা দেখা না বাপু। তা নয়, সত্যযুগে কি করেছিলেন তারই ব্যাখ্যান। চল পরমার্থ, সাতটা কুড়ির ট্রেন এখনও পাওয়া যাবে। নিবারণ আর সতেটার খোঁজে দরকার নেই। তারা নিজের নিজের পথ দেখবে। দেখ পরমার্থ, কাল না হয় মিরচাই-বাবার কাছেই নিয়ে চল।'

সত্যব্রত বুঁচকীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া বলিল—'দেখুন, একটু চা খাওয়াতে পারেন? নিবারণ-দাও আসবে এখনই। ওঃ, গলাটা বড্ড চিরে গেছে।'

বুঁচকী বলিল—'চিরবে না?—যা চেঁচাচ্ছিলেন! জল চড়িয়ে দিচ্ছি, বসুন একটু। আচ্ছা, আমার বাবার সামনে কি কাণ্ডটা করলেন বলুন তো? কি ভাববেন তিনি?'

সত্য মনে মনে বলিল, তোমার বাবা তো বেহুঁশ ছিলেন। প্রকাশ্যে বলিল—'একটু বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলেছি নয়? ভারি অন্যায় হয়ে গেছে, আর কখ্খনো অমন হবে না। আপনার বাবার কাছে মাপ চেয়ে তাঁকে খুশি ক'রে তবে বাড়ি ফিরব।'

বুঁচকী। বাবার আবার খুশি-অখুশি। বেঁচে আছেন এই পর্যন্ত, কে কি করছে বলছে তা জানতেও পারছেন না।

সত্য। থাকবে না, এমন দিন থাকবে না। আপনি দেখে নেবেন।—ওই যে, নিবারণ-দা আসছেন।

রাত ন-টা। হোম আরম্ভ হইয়াছে। ভক্তের দল পূর্বেই বিদায় হইয়াছে। হোমঘরে আছেন কেবল বিরিঞ্চিবাবা, গুরুপদবাবু, বুঁচকী, মামাবাবু, নিবারণ, সত্যব্রত এবং গোবর্ধনবাবু। ইনি একজন বিশিষ্ট ভক্ত, বাবার জন্য তেতলা আশ্রম নির্মাণ করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। হোমঘরটি ছোট, দরজা-জানালা প্রায় সমস্তই বন্ধ, প্রবেশের পথ মামাবাবু আগলাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ছোট-মহারাজ অর্থাৎ কেবলানন্দ, বাবার নৈশ আহার চরু প্রস্তুত করিবার জন্য অন্যত্র ব্যস্ত আছেন। ঘরে একটি মাত্র ঘৃতপ্রদীপ মিটমিট করিতেছে। বিরিঞ্চিবাবা যোগাসনে ধ্যানমগ্ন, সম্মুখে হোমকুণ্ড। পিছনে গুরুপদবাবু ও তাঁর কন্যা উপবিষ্ট। তাঁহাদের এক-পাশে নিবারণ ও সত্যব্রত, অপর পাশে গোবর্ধনবাবু বসিয়া আছেন।

অনেকক্ষণ ধ্যানস্থ থাকিয়া বিরিঞ্চিবাবা কোষা হইতে জল লইয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিলেন। ঘৃতপ্রদীপ নিবিয়া গেল। হোমাগ্নির শিখা নাই, কেবল কয়েক খণ্ড অঙ্গার আরক্ত হইয়া আছে। বিরিঞ্চিবাবা তখন মুখের উপর হাত কাঁপাইয়া ভীষণ গালবাদ্য আরম্ভ করিলেন। সেই গম্ভীর বু-বু-বু-বু নিনাদে ক্ষুদ্র গৃহ কম্পিত হইতে লাগিল।

সত্যব্রত বুঁচকীর কানে কানে বলিল—'বুঁচু, ভয় করছে।' বুঁচকী বলিল—'না।'

সহসা হোমকুণ্ড হইতে নীলাভ অগ্নিশিখা নির্গত হইল। সেই ক্ষীণ অস্পষ্ট আলোকে সকলে দেখিলেন—মহাদেবই তো বটে!—হোমকুণ্ডের পশ্চাতে ব্যাঘ্রচর্মধারী হাড়মালাবিভূষিত পিনাকডমরুপাণি ধবলকান্তি দস্তুরমত মহাদেব।

গুরুপদবাবু নির্বাক নিশ্চল। গোবর্ধন মল্লিক তাঁর কারবার এবং তৃতীয়পক্ষ সংক্রান্ত অভাব-অভিযোগ করুণ স্বরে দেবাদিদেবকে নিবেদন করিতে লাগিলেন। গণেশ-মামা শিবস্তোত্র আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—যেটি তাঁর ছোট মেয়ে মহাকালী-পাঠশালায় শিখিয়াছে।

নিবারণ সত্যব্রতকে চুপিচুপি বলিল—'এইবার।' সত্যব্রত উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল—'বম্‌ বাবা মহাদেব!'

একটু পরে হঠাৎ বাহিরে একটা কলরব উঠিল। তারপর চিৎকার করিয়া কে বলিল—'আগ লাগা হ্যায়।'

বিরিঞ্চিবাবার গালবাদ্য থামিল। তিনি চঞ্চল হইয়া ইতস্তত চাহিতে লাগিলেন। মামাবাবু ব্যস্ত হইয়া বাহিরে গেলেন।

'আগুন—আগুন—বেরিয়ে আসুন শিগ্‌গির।' ঘন ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘরে ঢুকিতে লাগিল। বিরিঞ্চিবাবা এক লাফে গৃহত্যাগ করিলেন। গোবর্ধনবাবু চিৎকার করিতে করিতে বাবার পদানুসরণ করিলেন, বুঁচকী পিতার হাত ধরিয়া বলিল—'বাবা বাবা, ওঠ!' নিবারণ কহিল—'এখন যাবেন না, একটু বসুন, কোনও ভয় নেই।'

মহাদেবের টনক নড়িল। তিনি উসখুস করিতে লাগিলেন। নিবারণ একটা বাতি জ্বালিল। মহাদেব পিছনের দরজা দিয়া পলায়নের উপক্রম করিলেন—অমনি সত্যব্রত জাপটাইয়া ধরিল।

মহাদেব বলিলেন—'আঃ—ছাড়—ছাড়—লাগে, মাইরি এখন ইয়ার্কি ভাল লাগে না—চাদ্দিকে আগুন—ছেড়ে দাও বলছি।'

সত্যব্রত বলিল —'আরে অত ব্যস্ত কেন। একটু আলাপ পরিচয় হ'ক। তারপর ক্যাবলরাম, কদ্দিন থেকে দেবতাগিরি করা হচ্ছে?'

বাহির হইতে দু-চারজন লোক হোমঘরে প্রবেশ করিল। ফেকু পাঁড়ের জিম্মায় কেবলানন্দকে দিয়া নিবারণ ও সত্যব্রত বিস্ময়-বিমূঢ় গুরুপদবাবু ও তাঁর কন্যাকে বাহিরে আনিল।



'আঃ—ছাড়—ছাড়—লাগে'

বাড়িতে আগুন লাগে নাই। পাশের ঘরে খানিকটা ভিজা খড় কে জ্বালাইয়া দিয়াছিল। দরোয়ান, মৌলবী সাহেব, কোচমান এবং অমূল্য হাবলা প্রভৃতি সত্যব্রতের অনুচরবৃন্দ মিথ্যা হল্লা করিয়াছে।

বিরিঞ্চিবাবা ভাঙেন কিন্তু মচকান না। বলিলেন—'কেমন গুরুপদ, এখন আশা মিটল তো? যে নাস্তিক, তার দিব্য দৃষ্টি হবে কেন? তাই তোমার কপালে দেবতা দেখা দিয়েও দিলেন না। শেষটায় মানুষের মূর্তি ধ'রে বিদ্রূপ করলেন।'

সত্যব্রত বলিল—'বিদ্রূপ ব'লে বিদ্রূপ! মহাদেব প'চে গিয়ে বেরুল ক্যাবলা। বিরিঞ্চিবাবা হয়ে গেলেন জোচ্চোর।'

গোবর্ধনবাবু বলিলেন—'ব্যাটা আমাদের সঙ্গে চালাকি? গোবর্ধন মল্লিক পাঁচটা হৌসের মুচ্ছুদ্দী, বড় বড় ইংরেজ চরিয়ে খায়,—তাকে তুমি ঠকাবে? মারো শালেকো দুই থাবড়া।'

গুরুপদবাবু এতক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। বলিলেন—'না না, যেতে দাও, যেতে দাও। সত্য, গাড়িটা জুতিয়ে এঁদের স্টেশনে পাঠাবার ব্যবস্থা কর। কেউ যেন কিছু না বলে।'

তল্পিতল্পা গুছানো হইলে সত্য সশিষ্য বিরিঞ্চিবাবাকে গাড়িতে তুলিয়া দিল। বিদায়কালে বলিল—'প্রভু, তা হ'লে নিতান্তই চললেন? চন্দ্র-সূর্য আপনার জিম্মায় রইল, দেখবেন যেন ঠিক চলে। দম দিতে ভুলবেন না, আর মধ্যে মধ্যে অয়েল করবেন।'

ভিড় কমিলে গুরুপদবাবু বলিলেন—'বাবা নিবারণ, বাবা সত্য, তোমরা আমায় রক্ষা করেছ, এ উপকার আমি ভুলব না। আজ তোমরা এখানেই খাওয়া-দাওয়া ক'রে থাক, অনেক রাত হয়েছে। একি সত্য, তোমার হাতে রক্ত কেন?'

সত্য। ও কিছু নয়, ধস্তাধস্তির সময় মহাদেব একটু কামড়ে দিয়েছিলেন। আপনি ব্যস্ত হবেন না, বিশ্রাম করুন গিয়ে।

গুরুপদ। তবে তুমি আমার সঙ্গে এস, বুঁচকী টিংচার আয়োডিন দিয়ে বেঁধে দেবে এখন।

*　　　*　　　*

আহারান্তে সত্য বলিল—'ওঃ, কি মুশকিলেই পড়া গেছে।'

নিবারণ বলিল—'আবার কি হ'ল রে?'

সত্য। নিবারণ-দা।

নিবারণ। বল্ না কি।

সত্য। নিবারণ-দা!

নিবারণ। ব'লেই ফ্যাল না কি।

সত্য। আমি বুঁচকীকে বে করব।

নিবারণ। তা তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু তোর সঙ্গে বিয়ে যদি না দেয়?

সত্য। আলবৎ দেবে, বুঁচকীর বাপ দেবে।

নিবারণ। বাপ না হয় রাজী হ'ল, কিন্তু মেয়ে কি বলে?



'যাঃ'

সত্য। বড় গোলমেলে জবাব দিচ্ছে।

নিবারণ। কি বলে বুঁচকী?

সত্য। বললে—যাঃ।

নিবারণ। দূর গাধা, যাঃ মানেই হ্যাঁ।



জাবালি

ভরতের সঙ্গে বশিষ্ঠাদি যে সকল ঋষিগণ মহিষীগণ ও কুলপতিগণ চিত্রকূট পর্বতে গিয়াছিলেন তাঁহারা সকলে রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় প্রত্যানয়নের জন্য নানা-প্রকার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সত্যসন্ধ রাম অটল রহিলেন। অবশেষে মহর্ষি জাবালি বলিলেন—

*'রাম, তুমি অতি সুবোধ, সামান্য লোকের ন্যায় তোমার বুদ্ধি যেন অনর্থদর্শিনী না হয়। জীব একাকী জন্মগ্রহণ করে এবং একাকীই বিনষ্ট হয়, অতএব মাতাপিতা বলিয়া যাহার স্নেহাসক্তি হইয়া থাকে সে উন্মত্ত।...পিতার অনুরোধে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দুর্গম সংকটপূর্ণ অরণ্য আশ্রয় করা তোমার কর্তব্য হইতেছে না। এক্ষণে তুমি সেই সুসমৃদ্ধ অযোধ্যায় প্রতিগমন কর। সেই এক-বেণীধরা নগরী তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তুমি তথায় রাজভোগে কালক্ষেপ করিয়া দেবলোকে ইন্দ্রের ন্যায় পরম সুখে বিহার করিবে। দশরথ তোমার কেহ নহেন; তিনি অন্য, তুমিও অন্য।...বৎস, তুমি স্ববুদ্ধিদোষে বৃথা নষ্ট হইতেছ। যাহারা প্রত্যক্ষসিদ্ধ পুরুষার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল ধর্ম লইয়া থাকে, আমি তাহাদিগের নিমিত্ত ব্যাকুল হইতেছি, তাহারা ইহলোকে বিবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অন্তে মহাবিনাশ প্রাপ্ত হয়। লোকে পিতৃদেবতার উদ্দেশে অষ্টকা শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। দেখ, ইহাতে অন্ন অনর্থক নষ্ট করা হয়, কারণ, কে কোথায় শুনিয়াছে যে মৃতব্যক্তি আহার করিতে পারে?...যে সমস্ত শাস্ত্রে দেবপূজা যজ্ঞ তপস্যা দান প্রভৃতি কার্যের বিধান আছে, ধীমান্ মনুষ্যেরা কেবল লোকদিগকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত সেইসকল শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছে। অতএব রাম, পরলোকসাধন ধর্ম নামে কোন পদার্থই নাই, তোমার এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হউক। তুমি প্রত্যেক্ষের অনুষ্ঠান এবং পরোক্ষের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও। ভরত তোমাকে অনুরোধ করিতেছেন, তুমি সর্বসম্মত বুদ্ধির অনুসরণপূর্বক রাজ্যভার গ্রহণ কর।'

জাবালির কথা শুনিয়া রামচন্দ্র ধর্মবুদ্ধি অবলম্বনপূর্বক কহিলেন—'তপোধন, আপনি আমার হিতকামনায় যাহা কহিলেন তাহা বস্তুতঃ অকার্য, কিন্তু কর্তব্যবৎ

* বাল্মিকী রামায়ণ। অযোধ্যাকান্ড। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য-কৃত অনুবাদ।

প্রতীয়মান হইতেছে। আপনার বুদ্ধি বেদ-বিরোধনী, আপনি ধর্মভ্রষ্ট নাস্তিক। আমার পিতা যে আপনাকে যাজকত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন আমি তাঁহার এই কার্যকে যথোচিত নিন্দা করি। বৌদ্ধ যেমন তস্করের ন্যায় দণ্ডার্হ, নাস্তিককেও তদ্রূপ দণ্ড করিতে হইবে। অতএব যাহাকে বেদ-বহিষ্কৃত বলিয়া পরিহার করা কর্তব্য, বিচক্ষণ ব্যক্তি সেই নাস্তিকের সঙ্গে সম্ভাষণও করিবেন না।...'

জাবালি তখন বিনয় বচনে কহিলেন—'রাম, আমি নাস্তিক নহি, নাস্তিকের কথাও কহিতেছি না। আর পরলোক প্রভৃতি যে কিছুই নাই তাহাও নহে। আমি সময় বুঝিয়া নাস্তিক হই, আবার অবসরক্রমে আস্তিক হইয়া থাকি। যে কালে নাস্তিক হওয়া আবশ্যক, সেই কাল উপস্থিত। এক্ষণে তোমাকে বন হইতে প্রতিনয়ন করিবার নিমিত্ত এইরূপ কহিলাম, এবং তোমাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্তই আবার তাহা প্রত্যাহার করিতেছি।'

জাবালির কথা রামায়ণে এই পর্যন্ত আছে। যাহা নাই তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

মহর্ষি জাবালি ক্লান্তদেহে বিষণ্নচিত্তে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। সমস্ত পথ তাঁহাকে নীরবে অতিক্রম করিতে হইয়াছে, কারণ অন্যান্য ঋষিগণ তাঁহার সংস্রব প্রায় বর্জন করিয়াই চলিয়াছিলেন। খর্বট খল্লাট খালিট প্রভৃতি কয়েকজন ঋষি তাঁহাকে দূর হইতে নির্দেশ করিয়া বিদ্রূপ করিতেও ত্রুটী করেন নাই।

অযোধ্যার বিপ্রগণ কেহই জাবালিকে শ্রদ্ধা করিতেন না। স্বয়ং রাজা দশরথ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন বলিয়া এ পর্যন্ত তাঁহাকে কোন লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় নাই। কিন্তু এখন রামচন্দ্র কর্তৃক জাবালির প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইয়াছে। সহযাত্রী বিপ্রগণের ব্যবহার দেখিয়া জাবালি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে তপ্ত তৈলমধ্যে মৎস্যের ন্যায় তাঁহার অযোধ্যায় বাস করা অসম্ভব হইবে।

রামচন্দ্রের উপর জাবালির কিছুমাত্র ক্রোধ নাই, পরন্তু তিনি রামের ভবিষ্যতের জন্য কিঞ্চিৎ চিন্তান্বিত হইয়াছেন। ছোকরার বয়স মাত্র সাতাশ বৎসর, সাংসারিক অভিজ্ঞতা এখনও কিছুমাত্র জন্মে নাই। শাস্ত্রজীবী সভাপণ্ডিতগণ এবং মুনিপুংগব বিশ্বামিত্র—যিনি এককালে অনেক কীর্তি করিয়াছেন—ইঁহারা যেরূপ ধর্মশিক্ষা দিয়াছেন, সরলস্বভাব রামচন্দ্র তাহাই চরম পুরুষার্থ বোধে গ্রহণ করিয়াছেন। বেচারাকে এর পর কষ্ট পাইতে হইবে। এইরূপ বিবিধ চিন্তা করিতে করিতে জাবালি অযোধ্যায় নিজ আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

নগরের উপকণ্ঠে সরযূতীরে জাবালির পর্ণকুটীর। বেলা অবসান হইয়াছে। গোময়লিপ্ত পরিচ্ছন্ন অঙ্গনের এক পার্শ্বে পনসবৃক্ষতলে জাবালিপত্নী হিন্দ্রলিনী রাত্রের জন্য ভোজ্য প্রস্তুত করিতেছেন। নদীর পরপারবাসী নিষাদগণ যে মৃগমাংস পাঠাইয়াছিল তাহা শূলপক্ক হইয়াছে, এখন খানকয়েক মোটা মোটা পুরোডাশ সেঁকিলেই রন্ধন শেষ হয়। হিন্দ্রলিনী যবপিণ্ড থাসিতে থাসিতে নানাপ্রকার সাংসারিক ভাবনা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁর এতখানি বয়স হইল, কিন্তু এ পর্যন্ত পুত্র-মুখ দেখিলেন না। স্বামীর পুন্নাম নরকের ভয় নাই, পরলোকে পিণ্ডেরও ভাবনা নাই—ইহলোকে দু-বেলা নিয়মিত পিণ্ড পাইলেই তিনি সন্তুষ্ট। পোষ্য-

পুত্রের কথা তুলিলে বলেন—পুত্রের অভাব কি, যখন যাকে ইচ্ছা পুত্র মনে করিলেই হয়। কিবা কথার শ্রী! স্বামী যদি মানুষের মতন মানুষ হইতেন তাহা হইলে হিন্দ্রালিনীর অত খেদ থাকিত না। কিন্তু তিনি একটি সৃষ্টিবহির্ভূত লোক, কাহারও সহিত বনাইয়া চলিতে পারিলেন না। সাধে কি লোকে তাঁকে আড়ালে পাষণ্ড বলে! ত্রিসন্ধ্যা নাই, জপতপ নাই, অগ্নিহোত্র নাই, কেবল তর্ক করিয়া লোক চটাইতে পারেন। অমন যে রামচন্দ্র, ব্রাহ্মণ তাঁকেও চটাইয়াছেন। যতদিন দশরথ ছিলেন, অন্নবস্ত্রের অভাব হয় নাই। বৃদ্ধ রাজা স্ত্রৈণ ছিলেন বটে, কিন্তু নজরটা তাঁর উচ্চ ছিল। এখন কি হইবে ভবিতব্যতাই জানেন। ভরত তো নন্দিগ্রামে পাদুকাপূজা লইয়া বিব্রত। সচিব সুমন্ত্র এখন রাজকার্য দেখিতেছে ; কিন্তু সে অত্যন্ত কৃপণ, ঘোড়ার বল্‌গা টানিয়া তার সকল বিষয়েই টানাটানি করা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। রাজবাটী হইতে যে সামান্য বৃত্তি পাওয়া যায় তাতে এই দুর্মূল্যের দিনে সংসার চলে না। হিন্দ্রালিনী তাঁর বাবার কাছে শুনিয়াছিলেন, সত্যযুগে এক কপর্দকে সাত কলস খাঁটী হৈয়ঙ্গবীন মিলিত, কিন্তু এই দগ্ধ ত্রেতাযুগে মাত্র তিন কলস পাওয়া যায়, তাও ভয়সা। ঘৃতের জন্য জাবালির কিছু ঋণ হইয়াছে, কিন্তু শোধ করার ক্ষমতা নাই। নীবার ধান্য যা সঞ্চিত ছিল ফুরাইয়া আসিয়াছে, পরিধেয় জীর্ণ হইয়াছে, গৃহে অর্থাগম নাই এদিকে জাবালি শত্রুসংখ্যা বাড়াইতেছেন। স্বামীর সংসর্গদোষে হিন্দ্রালিনীও অনাচারে অভ্যস্ত হইয়াছেন। অযোধ্যার নিষ্ঠাবতীগণ তাঁহাকে দেখিলে শূকরীর ন্যায় ওষ্ঠ কুঞ্চিত করে। হিন্দ্রালিনী আর সহ্য করিতে পারেন না, আজ তিনি আহারান্তে স্বামীকে কিছু কটুবাক্য শুনাইবেন।

অঙ্গনের বাহিরে হুংকার করিয়া কে বলিল—'হংহো জাবালে, হংহো!' হিন্দ্রালিনী ত্রস্ত হইয়া দেখিলেন দশ-বার জন ক্ষুদ্রকায় ঋষি কুটীরদ্বারে দণ্ডায়মান। তাঁহাদের খর্ব বপু বিরল শ্মশ্রু ও স্ফীত উদর দেখিয়া হিন্দ্রালিনী বুঝিলেন তাঁহারা বালখিল্য মুনি।

হিন্দ্রালিনী কহিলেন—'হে মহাতপা মুনিগণ, আমার স্বামী সরযূতটে ধ্যানস্থ আছেন। তিনি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন, আপনারা ততক্ষণ ঐ কুটির-অলিন্দে আসন গ্রহণ করিয়া বিশ্রাম করুন।'

বালখিল্যগণের অগ্রণী মহামুনি খর্বট কহিলেন—'ভদ্রে, তোমার ঐ অলিন্দ ভূমি হইতে বিতস্তিত্রয় উচ্চ, আমরা নাগাল পাইব না। অতএব এই প্রাঙ্গণেই আসন পরিগ্রহ করিলাম, তুমি ব্যস্ত হইও না।'

জাবালি তখন সরযূতীরে জম্বুবৃক্ষতলে আসীন হইয়া চিন্তা করিতেছিলেন—এই অন্নজলাবলম্বী মানবশরীরে পঞ্চভূতের কিংবিধ সংস্থান হইলে সুবুদ্ধির উৎপত্তি হয় এবং কিরূপেই বা মূর্খতা জন্মে। অপরন্তু, লাঠ্যৌষধি দ্বারা দেহস্থ পঞ্চভূত প্রকম্পিত করিলে মূর্খতা অপগত হইয়া যে সুবুদ্ধির উদয় হয়, তাহা স্থায়ী কিনা। এই জটিল তত্ত্বের মীমাংসা কিছুতেই করিতে না পারিয়া অবশেষে জাবালি উঠিয়া পড়িলেন এবং আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

জাবালি বালখিল্যগণকে কহিলেন—'অহো, আজ আমার কি সৌভাগ্য যে খর্বট খালিত প্রভৃতি মহামুনিগণ আমার এই আশ্রমে সমাগত! হে মুনিবৃন্দ, তোমাদের তো সর্বাঙ্গীণ কুশল? যাগযজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতেছে তো? ঋষিভুক্‌ রাক্ষসগণ তোমাদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করে না তো? তোমাদের সেই কপিলা গাভীটির বাচ্চা হইয়াছে? রাজগুরু বশিষ্ঠ তোমাদের জন্য যথেষ্ট গব্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন তো?'

মহামুনি খর্বট দর্দুরধ্বনিবৎ গম্ভীরনাদে কহিলেন—'জাবালে, ক্ষান্ত হও। আপ্যায়নের জন্য আমরা আসি নাই। তুমি পাপপঙ্কে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া আছ, আমরা তোমাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছি। প্রায়োপবেশন চান্দ্রায়ণাদি দ্বারা তোমার কিছু হইবে না। আমরা অথর্বোক্ত পদ্ধতিতে তোমাকে অগ্নিশুদ্ধ করিব, তাহাতে তুমি অন্তে পরমা গতি প্রাপ্ত হইবে। তুষানল প্রস্তুত, তুমি আমাদের অনুগমন কর।'

জাবালি বলিলেন—'হে খর্বট, তোমাদিগকে কে পাঠাইয়াছেন? রাজপ্রাতিভূ ভরত, না রাজগুরু বশিষ্ঠ? আমার উদ্ধারসাধনের জন্য তোমরাই বা অত ব্যগ্র কেন? আমি অতি নিরীহ বানপ্রস্থাবলম্বী প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ, কখনও কাহারও অনিষ্ট করি নাই, তোমাদের প্রাপ্য দক্ষিণারও অংশভাক্ হই নাই। তোমরা আমার পরকালের জন্য ব্যস্ত না হইয়া নিজ নিজ ইহকালের জন্য যত্নবান হও।'

তখন অতিকোপনস্বভাব খল্লাট ঋষি অশ্বধ্বনিবৎ কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন—'রে তপোধন, তুমি অতি দুরাচার ধর্মভ্রষ্ট নাস্তিক। তোমার বাসহেতু এই অযোধ্যাপুরী অশুচি হইয়াছে, ধর্মাত্মা বিপ্রগণ অতিষ্ঠ হইয়াছেন। আমরা ভরত বা বশিষ্ঠ কাহারও আজ্ঞাবাহী নহি। ব্রাহ্মণ্যের রক্ষাহেতু আমরা প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছি। তুমি আর বাক্যব্যয় করিও না, প্রস্তুত হও।'

জাবালি বলিলেন—'হে বালখিল্যগণ, আমি স্বেচ্ছায় যাইব না। তোমরা আমাকে ব্রহ্মতেজোবলে উত্তোলন কর।'

জাবালির শালপ্রাংশু বিরাট বপু দেখিয়া বালখিল্যগণ কিয়ৎক্ষণ নিম্নকণ্ঠে জল্পনা করিলেন। অবশেষে গলিতদন্ত খালিত মুনি স্খলিত স্বরে কহিলেন—'হে জাবালে, যদি তুমি অগ্নিপ্রবেশ করিতে নিতান্তই ভীত হইয়া থাক তবে প্রায়শ্চিত্তের নিষ্ক্রয়স্বরূপ তিন শূর্প তিল ও শত নিষ্ক কাঞ্চন প্রদান কর। আমরা যথাবিহিত যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা তোমাকে পাপমুক্ত করিব।'

জাবালি কহিলেন—'আমার এক কপর্দকও নাই. থাকিলেও দিতাম না।'

তখন খর্বট খল্লাট খালিতাদি মুনিগণ সমস্বরে কহিলেন—'রে নরাধম, তবে আমরা অভিসম্পাত করিতেছি শ্রবণ কর। সাক্ষী চন্দ্র সূর্য তারা, সাক্ষী দেবগণ পিতৃগণ দিক্পালগণ বষট্কারগণ—'

জাবালি বলিলেন—'শৌণ্ডিকের সাক্ষী মদ্যপ, তস্করের সাক্ষী গ্রন্থিচ্ছেদক। হে বালখিল্যগণ, বৃথা দেবতাগণকে আহ্বান করিতেছ, তাঁহারা আসিবেন না। বরং তোমরা শৃগালগণ ও কর্ণকর্তকগণকে স্মরণ কর।'

হিন্দুলিনী বলিলেন—'হে আর্যপুত্র, তুমি কেন এই অল্পায়ু অপোগণ্ড অকালপক্ক কুষ্মাণ্ডগণের সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডা করিতেছ, উহাদিগকে খেদাইয়া দাও।'

বালখিল্যগণ কহিলেন—'রে রে রে রে—'

জাবালি তখন তাঁহার বিশাল ভুজদ্বয়ে বালখিল্যগণকে একে একে তুলিয়া ধরিয়া প্রাঙ্গণবেষ্টনীর পরপারে ঝুপ ঝুপ করিয়া নিক্ষেপ করিলেন।

বালখিল্যগণ প্রস্থান করিলে জাবালি বলিলেন—'প্রিয়ে, আমাদের আর অযোধ্যায় বাস করা চলিবে না, কখন কোন্ দিক হইতে উৎপাত আসিবে তাহার স্থিরতা নাই।

অতএব কল্য প্রত্যুষেই আমরা এই আশ্রম ত্যাগ করিয়া দূরে কোনও নিরুপদ্রব স্থানে যাত্রা করিব।'

পরদিন ঊষাকালে সস্ত্রীক জাবালি অযোধ্যা ত্যাগ করিলেন। কয়েকজন অনুগত নিষাদ তাঁহাদের সামান্য গৃহোপকরণ বহন করিয়া অগ্রে অগ্রে পথপ্রদর্শনপূর্বক চলিল। মাসাধিক কাল তাঁহারা নানা জনপদ গিরি নদী বনভূমি অতিক্রম করিয়া অবশেষে হিমালয়ের সানুদেশে শতদ্রুতীরে এক রমণীয় উপত্যকায় উপস্থিত হইলেন।

জাবালি তথায় পর্ণকুটীর রচনা করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন। পর্বতবাসী কিরাতগণ তাঁহার বিশাল দেহ, নিবিড় শ্মশ্রু ও মধুর সদয় ব্যবহার দেখিয়া মুগ্ধ হইল এবং নানাপ্রকার উপঢৌকন দ্বারা সংবর্ধনা করিল। জাবালি তথায় বিবিধ দুরূহ তত্ত্বসমূহের অনুসন্ধানে নিবিষ্ট রহিলেন এবং অবসরকালে শতদ্রু নদীতে মৎস্য ধরিয়া চিত্তবিনোদন করিতে লাগিলেন।



'রে রে রে রে—'

দেবতাগণের খ্যাতি আছে—তাঁহারা অন্তর্যামী। কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহাদিগকেও সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় গুজবের উপর নির্ভর করিয়া কাজ করিতে হয় এবং তাহার ফলে জগতে অনেক অবিচার ঘটিয়া থাকে। অচিরে দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট সমাচার আসিল যে মহাতেজা জাবালি মুনি শতদ্রুতীরে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন আছেন,—তাঁহার অভিসন্ধি কি তাহা এখনও সম্যক্ অবধারিত হয় নাই, তবে সম্ভবতঃ তিনি ইন্দ্রত্ব বিষ্ণুত্ব কিংবা ঐরূপ কোনও একটা পরমপদ আয়ত্ত না করিয়া ছাড়িবেন না। দেবরাজ চিন্তিত হইয়া আজ্ঞা দিলেন—'উর্বশীকে ডাক।'

মাতলি আসিয়া করজোড়ে নিবেদন করিলেন—'হে দেবেন্দ্র, উর্বশী আর মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইতে চাহে না—'

ইন্দ্র কহিলেন—'হুং, তার ভারি তেজ হইয়াছে।'

দেবর্ষি নারদ কহিলেন—'মর্ত্যের কবিগণই স্তুতি করিয়া তাহার মস্তকটি ভক্ষণ করিয়াছেন। এখন কিছুকাল তাহাকে বিরাম দাও, দিনকতক অমরাবতীতে আবদ্ধ

থাকিলে আপনিই সে মর্ত্যলোকে যাইবার জন্য আবদার ধরিবে। জাবালির জন্য অন্য কোনও অপ্সরা পাঠাও।'



মাতলি বলিলেন—'মেনকা তার কন্যাকে দেখিতে গিয়াছে। তিলোত্তমাকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় এখনও তিন মাস বাহির হইতে দিবেন না। অলম্বুষার পা মচকাইয়াছে, নাচিতে পারিবে না। অষ্টাবক্র মুনি দেবগণের উপর বিমুখ হইয়া বাঁকিয়া বসিয়াছেন, রম্ভা তাঁহাকে সিধা করিতে গিয়াছে। নাগদত্তা হেমা সোমা প্রভৃতি তিন শত অপ্সরাকে লঙ্কেশ্বর রাবণ অপহরণ করিয়াছেন। বাকী আছে কেবল মিশ্রকেশী ও ঘৃতাচী।'

ইন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিলেন—'আমাকে না জানাইয়া কেন অপ্সরাদের যত্রতত্র পাঠানো হয়? মিশ্রকেশী ঘৃতাচীর বয়স হইয়াছে, তাহাদের দ্বারা কিছু হইবে না।'

নারদ বলিলেন—'হে ইন্দ্র, সেজন্য চিন্তা করিও না। জাবালিও যুবা নহেন। একটু গৃহিণী-বাহিনী-জাতীয়া অপ্সরাই তাঁহাকে ভালরকম বশ করিতে পারিবে।'

ইন্দ্র বলিলেন—'মিশ্রকেশীর চুল পাকিয়াছে, সে থাক। ঘৃতাচীকে পাঠাইবার ব্যবস্থা কর। তাহাকে একপ্রস্থ সূক্ষ্ম চীনাংশুক ও যথোপযুক্ত অলংকারাদি দাও।

বায়ু, তুমি মৃদুমন্দ বহিবে। শশধর, তুমি মন্দাকিনীতে স্নান করিয়া উজ্জ্বল হইয়া লও। কন্দর্প, তুমি সেই অভ্রের পোশাকটা পরিয়া যাইবে, আবার যাতে ভস্ম না হও। বসন্ত, তুমি সঙ্গে এক শত কোকিল লইবে।'

নারদ বলিলেন—'আর এক শত বন্যকুক্কুট। ঋষি বড়ই মাংসাশী।'

ইন্দ্র বলিলেন—'আচ্ছা, তাহাও লইবে। আর দশ কুম্ভ ঘৃত, দশ স্থালী দধি, দশ দ্রোণী গুড় এবং অন্যান্য ভোজ্যসম্ভার। যেমন করিয়া হউক জাবালির ধ্যান ভঙ্গ করা চাই।'

সমস্ত আয়োজন শেষ হইলে ঘৃতাচী জাবালিবিজয়ে যাত্রা করিলেন।

জাবালির তপোবনে তখন ঘোর বর্ষা। মেঘে পর্বতে একাকার হইয়া দিগন্তে নিবিড় প্রাচীর রচনা করিয়াছে। শতদ্রুর গৈরিকবর্ণ জলে পালে পালে মৎস্য বিচরণ করিতেছে। বনে ভেকবংশের চতুর্প্রহরব্যাপী মহোৎসব চলিতেছে।



আবার নৃত্য শুরু করিলেন

সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঘৃতাচী অনুচরবর্গসহ জাবালির আশ্রমে পৌঁছিলেন আক্রমণের উদ্‌যোগ করিতে তাঁহাদের কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না, কারণ বহুবার এইরূপ অভিযান করিয়া তাঁহারা পরিপক্ক হইয়াছেন। নিমেষের মধ্যে মেঘ দূরীভূত হইল, মলয়ানিল বহিতে লাগিল, শতদ্রুর স্রোত মন্দীভূত হইল, নির্মল আকাশে পূর্ণচন্দ্র উঠিল, পাদপসকল পুষ্পস্তবকে ভূষিত হইল, অলিকুল গুঞ্জরিতে লাগিল, ভেকগণ নীরব হইয়া পল্বলে লুকাইল।

জাবালি শতদ্রুতীরে ছিপহস্তে নিবিষ্টমনে মাছ ধরিতেছিলেন। আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তিনি বিচলিত হইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। সহসা ঋতুরাজ বসন্তের খোঁচা খাইয়া নিদ্রাতুর কোকিলকুল আকুল চিৎকার করিয়া উঠিল। জাবালি চমকিত হইয়া পিছন ফিরিয়া দেখিলেন, এক অপূর্ব রূপলাবণ্যবতী দিব্যাঙ্গনা কটিতটে বামকর, চিবুকে দক্ষিণকর নিবন্ধ করিয়া নৃত্য করিতেছে।

ধীমান্ জাবালি সমস্ত ব্যাপারটি চট করিয়া হৃদয়ংগম করিলেন। ঈষৎ হাস্যে বলিলেন—'অয়ি বরাঙ্গনে, তুমি কে, কি নিমিত্তই বা এই দুর্গম জনশূন্য উপত্যকায় আসিয়াছ? তুমি নৃত্য সংবরণ কর। এই সৈকতভূমি অতিশয় পিচ্ছিল ও উপলবিষম। যদি আছাড় খাও তবে তোমার ঐ কোমল অস্থি আস্ত থাকিবে না।'



অপাঙ্গে বিলোল কটাক্ষ স্ফুরিত করিয়া ঘৃতাচী কহিলেন—'হে ঋষিশ্রেষ্ঠ, আমি ঘৃতাচী স্বর্গাঙ্গনা। তোমাকে দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছি, তুমি প্রসন্ন হও। এই সমস্ত দ্রব্যসম্ভার তোমারই। এই ঘৃতকুম্ভ দধিস্থালী গুড়দ্রোণী—সকলই তোমার। আমিও তোমার। আমার যা কিছু আছে—নাঃ থাক।'—এই পর্যন্ত বলিয়া লজ্জাবতী ঘৃতাচী ঘাড় নীচু করিলেন।

জাবালি বলিলেন—'অয়ি কল্যাণি, আমি দীনহীন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। গৃহিণীও বর্তমানা। তোমার তুষ্টি বিধান করা আমার সাধ্যের অতীত। অতএব তুমি ইন্দ্রালয়ে ফিরিয়া যাও। অথবা যদি তোমার নিতান্তই মুনিঋষির প্রতি ঝোঁক হইয়া থাকে তবে অযোধ্যায় গমন কর। তথায় খর্বট খল্লাট খালিতাদি মুনিগণ আছেন, তাঁদের মধ্যে যাঁকে ইচ্ছা এবং যতগুলিকে ইচ্ছা তুমি হেলায় তর্জনীহেলনে নাচাইতে পারিবে। আর যদি তোমার অধিকতর উচ্চাভিলাষ থাকে তবে ভার্গব দুর্বাসা কৌশিক প্রভৃতি অনলসংকাশ উগ্রতেজা মহর্ষিগণকে জব্দ করিয়া যশস্বিনী হও। আমাকে ক্ষমা দাও।'

ঘৃতাচী কহিলেন—'হে জাবালে, তুমি নিতান্তই নীরস। তোমার ঐ বিপুল দেহ কি বিধাতা শুষ্ক কাষ্ঠে নির্মাণ করিয়াছেন? তুমি দীনহীন তাতে ক্ষতি কি, আমি তোমাকে কুবেরের ঐশ্বর্য আনিয়া দিব। তোমার ব্রাহ্মণীকে বারাণসী প্রেরণ কর। তিনি নিশ্চয়ই লোলাঙ্গী বিগতযৌবনা। আর আমার দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর, —চিরযৌবনা, নিটোলা নিখুঁতা। উর্বশী মেনকা পর্যন্ত আমাকে দেখিয়া ঈর্ষায় ছটফট করে।'

জাবালি সহাস্যে কহিলেন—'হে সুন্দরি, কিছু মনে করিও না। তুমিও নিতান্ত খুকীটি নহ। তোমার মুখের লোধ্ররেণু ভেদ করিয়া কিসের রেখা দেখা যাইতেছে? তোমার চোখের কোলে ও কিসের অন্ধকার? তোমার দন্তপঙ্‌ক্তিতে ও কিসের ফাঁক?'

ঘৃতাচী সরোষে কহিলেন—হে মূর্খ, তুমি নিশ্চয়ই রাত্র্যন্ধ, তাই অমন কথা বলিতেছ। পথশ্রমের ক্লান্তিহেতু আমার লাবণ্য এখন সম্যক্ স্ফূর্তি পাইতেছে না। আগে সকাল হোক, আমি দুধের সর মাখিয়া চান করি, তখন দেখিও, মুণ্ড ঘুরিয়া যাইবে'—এই বলিয়া ঘৃতাচী আবার নৃত্য শুরু করিলেন।

অদূরবর্তী দেবদারুবৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া জাবালিপত্নী সমস্ত দেখিতেছিলেন। ঘৃতাচীর দ্বিতীয়বার নৃত্যারম্ভে তিনি আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না, সম্মার্জনীহস্তে ছুটিয়া আসিয়া ঘৃতাচীর পৃষ্ঠে ঘা-কতক বসাইয়া দিলেন।

তখন কন্দর্প বসন্ত শশধর মলয়ানিল সকলেই মহাভয়ে ব্যাকুল হইয়া বেগে পলায়ন করিলেন। আকাশ আবার জলদজালে আচ্ছন্ন হইল, দিঙ্‌মণ্ডল তিমিরাবৃত হইল, কোকিলকুল ঢুলিতে লাগিল, মধুকরনিকর উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পরস্পরকে দংশন করিতে লাগিল, শতদ্রু স্ফীত হইল, ভেককুল মহা উল্লাসে বিকট কোলাহল করিয়া উঠিল।

জাবালি পত্নীকে কহিলেন—'প্রিয়ে, স্থিরা ভব। ইনি স্বর্গাঙ্গনা ঘৃতাচী, ইন্দ্রের আদেশে এখানে আসিয়াছেন—ইঁহার অপরাধ নাই।'

হিন্দুলিনী কহিলেন—'হলা দগ্ধাননে নির্লজ্জে ঘেঁচী, তোর আস্পর্ধা কম নয় যে আমার স্বামীকে বোকা পাইয়া ভুলাইতে আসিয়াছিস! আর, ভো অজ্জউত্ত, তোমারই বা কি প্রকার আক্কেল যে এই উৎকপালী বিড়ালাক্ষী মায়াবিনীর সহিত বিজনে বিশ্রম্ভালাপ করিতেছিলে!'

জাবালি তখন সমস্ত ব্যাপার বিবৃত করিয়া অতি কষ্টে পত্নীকে প্রসন্না করিলেন এবং রোরুদ্যমানা ঘৃতাচীকে বলিলেন—'বৎসে, তুমি শান্ত হও। হিন্দুলিনী তোমার

পৃষ্ঠে কিঞ্চিৎ ইঙ্গুদীতৈল মর্দন করিয়া দিলেই ব্যথার উপশম হইবে। তুমি আজ রাত্রে আমার কুটীরেই বিশ্রাম কর। কল্য অমরাবতীতে ফিরিয়া গিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে আমার প্রীতিসম্ভাষণ এবং ঘৃত-দধি-গুড়াদির জন্য বহু ধন্যবাদ জানাইও।'

ঘৃতাচী কহিলেন—'তিনি আমার মুখদর্শন করিবেন না। হা, এমন দুর্দশা আমার কখনও হয় নাই।'

জাবালি বলিলেন—'তোমার কোনও ভয় নাই। তুমি দেবেন্দ্রকে জানাইও যে ইন্দ্রত্বের উপর আমার কিছুমাত্র লোভ নাই, তিনি স্বচ্ছন্দে স্বর্গরাজ্য ভোগ করিতে থাকুন।'

ঘৃতাচীর পরাভব শুনিয়া দেবরাজ ইন্দ্র নারদকে কহিলেন—'হে দেবর্ষে, এখন কি করা যায়? জাবালি ইন্দ্রত্ব চাহেন না জানিয়াও আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। জনরব শুনিতেছি যে ঐ দুর্দান্ত ঋষি সমস্ত দেবতাকেই উড়াইয়া দিতে চায়।'

নারদ কহিলেন—'পুরন্দর, তুমি চিন্তিত হইও না। আমি যথোচিত ব্যবস্থা করিতেছি।'

নৈমিষারণ্যে সনকাদি ঋষিগণের সকাশে দেবর্ষি নারদ আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন—'হে মুনিগণ, শাস্ত্রে উক্ত আছে, সত্যযুগে পুণ্য চতুষ্পাদ, পাপ নাস্তি। কিন্তু এই ত্রেতা-যুগে পুণ্য ত্রিপাদ মাত্র এবং একপাদ পাপও দেখা গিয়াছে। ইহার হেতু কি তোমরা তাহা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ কি?'

মুনিগণ বলিলেন—'আশ্চর্য, ইহা আমরা কেহই ভাবিয়া দেখি নাই।'

নারদ বলিলেন—'তবে তোমাদের যাগযজ্ঞ জপতপ সমস্তই বৃথা।' ইহা কহিয়া তিনি তাঁহার কাষ্ঠবাহনে আরোহণপূর্বক ব্রহ্মার নিকট অপর এক ষড়যন্ত্র করিতে প্রস্থান করিলেন।

মুনিগণ নারদীয় প্রশ্নের মীমাংসা করিতে না পারিয়া এক মহতী সভা আহ্বান করিলেন। জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী প্রভৃতি সপ্তদ্বীপ হইতে বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞ বিপ্রগণ নৈমিষারণ্যে সমবেত হইলেন। মহর্ষি জাবালি আমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন।

অনন্তর সকলে আসন গ্রহণ করিলে সভাপতি দক্ষ প্রজাপতি কহিলেন—'ভো পণ্ডিতবর্গ, সত্যযুগে পুণ্য চতুষ্পাদ ছিল, এখন তাহা ত্রিপাদ হইয়াছে। কেন এমন হইল এবং ইহার প্রতিকার কি, যদি তোমরা কেহ অবগত থাক তবে প্রকাশ করিয়া বল।'

তখন জ্বলন্ত পাবকতুল্য তেজস্বী জামদগ্ন্য মুনি কহিলেন—'হে প্রজাপতে, এই পাপাত্মা জাবালিই সমস্ত অনিষ্টের মূল! উহার সংস্পর্শে বসুন্ধরা ভারগ্রস্তা হইয়াছেন।'

সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী বলিলেন—'ঠিক, ঠিক, আমরা তাহা অনেকদিন হইতেই জানি।'

জামদগ্ন্য কহিলেন—'এই জাবালি ভ্রষ্টাচার উন্মার্গগামী নাস্তিক। ইহার শাস্ত্র নাই, মার্গ নাই। রামচন্দ্রকে এই পাষণ্ডই সত্যধর্মচ্যুত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। বালখিল্যগণকে এই দুরাত্মাই নির্যাতিত করিয়াছে। দেবরাজ পুরন্দরকেও এই পাপিষ্ঠ

হাস্যাস্পদ করিয়াছে। ইহাকে বধ না করিলে পুণ্যের নষ্টপাদ উদ্ধার হইবে না।'

পণ্ডিতগণ কহিলেন—'আমরাও ঠিক তাহাই ভাবিতেছিলাম।'

দক্ষ প্রজাপতি কহিলেন—'হে জাবালে, সত্য করিয়া কহ তুমি নাস্তিক কিনা। তোমার মার্গ কি, শাস্ত্রই বা কি।'

জাবালি বলিলেন—'হে সুধীবৃন্দ, আমি নাস্তিক কি আস্তিক তাহা আমি নিজেই জানি না। দেবতাগণকে আমি নিষ্কৃতি দিয়াছি, আমার তুচ্ছ অভাব-অভিযোগ জানাইয়া তাঁহাদিগকে বিব্রত করি না। বিধাতা যে সামান্য বুদ্ধি দিয়াছেন তাহারই বলে কোনও প্রকারে কাজ চালাইয়া লই। আমার মার্গ যত্র তত্র, আমার শাস্ত্র অনিত্য, পৌরুষেয়, পরিবর্তনসহ।'

দক্ষ কহিলেন—'তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝিলাম না।'

জাবালি বলিলেন—'হে ছাগমুণ্ড দক্ষ, তুমি বুঝিবার বৃথা চেষ্টা করিও না। আমি এখন চলিলাম। বিপ্রগণ, তোমাদের জয় হউক।'

তখন সভায় ভীষণ কোলাহল উত্থিত হইল এবং ধর্মপ্রাণ বিপ্রগণ ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। কয়েকজন জাবালিকে ধরিয়া ফেলিলেন। জামদগ্ন্য তাঁহার তীক্ষ্ণ কুঠার উদ্যত করিয়া কহিলেন—'আমি এক-বিংশতিবার ক্ষত্রিয়কুল নিঃশেষ করিয়াছি, এইবার এই নাস্তিককে সাবাড় করিব।'

স্থিরপ্রজ্ঞ দক্ষ প্রজাপতি কহিলেন—'হাঁ হাঁ কর কি, ব্রাহ্মণের দেহে অস্ত্রাঘাত! ছি ছি, মনু কি মনে করিবেন! বরং উহাকে হলাহল প্রয়োগে বধ কর।'

দেবর্ষি নারদ এতক্ষণ অলক্ষ্যে বসিয়াছিলেন। এখন আত্মপ্রকাশ করিয়া কহিলেন —'আমার কাছে বিশুদ্ধ চৈনিক হলাহল আছে। তাহা সর্ষপপ্রমাণ সেবনে দিব্যজ্ঞান লাভ হয়, দুই সর্ষপে বুদ্ধিভ্রংশ, চতুর্মাত্রায় নরকভোগ, এবং অষ্টমাত্রায় মোক্ষলাভ হয়। জাবালিকে চতুর্মাত্রা সেবন করাও; সাবধান, যেন অধিক না হয়।'

মহাচীন হইতে আনীত কৃষ্ণবর্ণ হলাহল জলে গুলিয়া জাবালিকে জোর করিয়া খাওয়ানো হইল। তাহার পর তাঁহাকে গভীর অরণ্যে নিক্ষেপ করিয়া ত্রিলোকদর্শী পণ্ডিতগণ কহিলেন—'পাষণ্ড এতক্ষণে কুম্ভীপাককে পৌঁছিয়াছে।'

চৈনিক হলাহল জাবালির মস্তিষ্কে ক্রমশঃ প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল।

জাবালি যজ্ঞের নিমন্ত্রণে বহুবার সোমরস পান করিয়াছেন; প্রথম যৌবনে বয়স্য ক্ষত্রিয়কুমারগণের পাল্লায় পড়িয়া গৌড়ী মাধ্বী পৈষ্টী প্রভৃতি আসবও চাখিয়া দেখিয়াছেন; ছেলেবেলায় মামার বাড়িতে একবার ভৃগুমামার সঙ্গে চুরি করিয়া ফেনিল তালরসও খাইয়াছিলেন,—কিন্তু এমন প্রচণ্ড নেশা পূর্বে তাঁহার কখনও হয় নাই। জাবালির সকল অঙ্গ নিশ্চল হইয়া আসিল, তালু শুষ্ক হইল, চক্ষু ঊর্ধ্বে উঠিল, বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইল।

সহসা জাবালি অনুভব করিলেন—তিনি রক্তচন্দনে চর্চিত হইয়া রক্তমাল্যধারণপূর্বক গর্দভযোজিত রথে দক্ষিণাভিমুখে দ্রুতবেগে নীয়মান হইতেছেন। রক্তবসনা পিঙ্গলবর্ণা কামিনী তাঁহাকে দেখিয়া হাসিতেছে এবং বিকৃতবদনা রাক্ষসী তাঁহার রথ আকর্ষণ করিতেছে। ক্রমে বৈতরিণী পার হইয়া তিনি যমপুরীর দ্বারে উপনীত হইলেন। তথায় যমকিংকরগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া ধর্মরাজের সকাশে লইয়া গেল।

যম কহিলেন—'জাবালে, স্বাগতোসি, আমি বহুদিন যাবৎ তোমার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। তোমার পারলৌকিক ব্যবস্থা আমি যথোচিত করিয়া রাখিয়াছি, এখন আমার অনুগমন কর। দূরে ঐ যে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ গবাক্ষহীন অগ্ন্যুদ্‌গারী সৌধমালা দেখিতেছ, উহাই রৌরব ; ইতরপ্রকৃতি পাপিগণ তথায় বাস করে। আর সম্মুখে এই যে গগনচুম্বী তাম্রচূড় রক্তবর্ণ অলিন্দপরিবেষ্টিত আয়তন, ইহাই কুম্ভীপাক ; সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ এখানে অবস্থান করেন। তোমার স্থান এখানেই নির্দিষ্ট হইয়াছে, ভিতরে চল।'

অনন্তর ধর্মরাজ যম জাবালিকে কুম্ভীপাকের গর্ভমণ্ডপে লইয়া গেলেন। এই মণ্ডপ বহুযোজনবিস্তৃত, উচ্চচ্ছাদ, বাষ্পসমাকুল, গম্ভীর আরাবে বিধ্বনিত। উভয় পার্শ্বে জ্বলন্ত চুল্লীর উপর শ্রেণীবদ্ধ অতিকায় কুম্ভসকল সজ্জিত আছে, তাহা হইতে নিরন্তর শ্বেতবর্ণ বাষ্প ও আর্তনাদ উত্থিত হইতেছে। নীলবর্ণ যমকিংকরগণ ইন্ধন-নিক্ষেপের জন্য মধ্যে মধ্যে চুল্লীদ্বার খুলিতেছে, জ্বলন্ত অনলচ্ছটায় তাহাদের মুখ উল্কাপিণ্ডের ন্যায় উদ্ভাসিত হইতেছে।

কৃতান্ত কহিলেন—'হে মহর্ষে, এই যে রজতনির্মিত কিংকিণীজালমণ্ডিত সুবৃহৎ কুম্ভ দেখিতেছ, ইহাতে নহুষ যযাতি দুষ্মন্ত প্রভৃতি মহাযশা মহীপালগণ পরিপক্ক হইতেছে। ইঁহারা প্রায় সকলেই সংশোধিত হইয়া গিয়াছেন, কেবল যযাতির কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। আর এক প্রহরের মধ্যে সকলেই বিগতপাপ হইয়া অমরাবতীতে গমন করিবেন। ঐ যে বৈদূর্যখচিত হিরণ্ময় কুম্ভ দেখিতেছ, উহার তপ্ত তৈলে ইন্দ্রাদি দেবগণ মধ্যে মধ্যে অবগাহন করিয়া থাকেন। গৌতমের অভিশাপের পরে সহস্রাক্ষ পুরন্দরকে বহুকাল এই কুম্ভমধ্যে বাস করিতে হইয়াছিল। নিরবচ্ছিন্ন অগ্নিপ্রয়োগে ইহার তলদেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। এই যে রুদ্রাক্ষমালাবেষ্টিত গৈরিকবর্ণ প্রকাণ্ড কুম্ভ দেখিতেছ, ইহার অভ্যন্তরে ভার্গব দুর্বাসা কৌশিক প্রভৃতি উগ্রতপা মহর্ষিগণ সিদ্ধ হইতেছেন।'

জাবালি কৌতূহলপরবশ হইয়া বলিলেন—'হে ধর্মরাজ, কুম্ভের ভিতরে কি হইতেছে দয়া করিয়া আমাকে দেখাও।'

ধর্মরাজের আজ্ঞা পাইয়া জনৈক যমকিংকর কুম্ভের আবরণী উন্মুক্ত করিল। যম তাহার মধ্যে একটি বৃহৎ দারুময় দর্বী নিমজ্জিত করিয়া সন্তর্পণে উত্তোলিত করিলেন। সিক্তজটাজুট ধূমায়িতকলেবর কয়েকজন ঋষি দর্বীতে সংলগ্ন হইয়া উঠিলেন এবং যজ্ঞোপবীত ছিঁড়িয়া অভিসম্পাত আরম্ভ করিলেন—'রে নারকী যমরাজ, যদি আমাদের কিঞ্চিদপি তপঃপ্রভাব থাকে—'

দর্বী উল্টাইয়া কুম্ভের ঢাকনি ঝটিতি বন্ধ করিয়া যম কহিলেন—'হে জাবালে, এই কোপনস্বভাব ঋষিগণের কাঠিন্য দূর হইতে এখনও বহু বিলম্ব আছে। ইঁহারা আরও অষ্টাহকাল পরিসিদ্ধ হইতে থাকুন।'

এমন সময় কয়েকজন যমদূতের সহিত খর্বট খল্লাট খালিত বিষণ্ণবদনে কুম্ভীপাকের গর্ভগৃহে প্রবেশ করিলেন।

জাবালি কহিলেন—'হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা এখানে কেন, ব্রহ্মলোকে কি স্থানাভাব ঘটিয়াছে?'

খর্বট উত্তর দিলেন—'জাবালে, তুমি বিরক্ত করিও না, আমরা এখানে তদারক করিতে আসিয়াছি।'

যমরাজের ইঙ্গিতে কিংকরগণ বালখিল্যত্রয়কে একত্র বাঁধিয়া উত্তপ্ত পঞ্চগব্যপূর্ণ এক ক্ষুদ্রাকার কুম্ভে নিক্ষেপ করিল। কুম্ভ হইতে তীব্র চিৎকার উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃতান্তের বাপান্তকর বাক্যসমূহ নির্গত হইতে লাগিল। ধর্মরাজ কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া সরিয়া আসিয়া বলিলেন—'হে মহর্ষে, এই নরকের অনুষ্ঠানসকল অতিশয় অপ্রীতিকর, কেবল বিপন্না ধরিত্রীর রক্ষাহেতুই আমাকে তাহা সম্পন্ন করিতে হয়। যাহা হউক, আমি আর তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট করিব না, এখন তোমার প্রতি আমার যাহা কর্তব্য তাহাই পালন করিব। দেখ, যে পাপ মনের গোচর তাহা আমি



'রে নারকী যমরাজ'

সহজেই দূর করিতে পারি। কিন্তু যাহা মনের অগোচর তাহা জন্মজন্মান্তরেও সংক্রমিত হয়, এবং তাহা শোধন করিতে হইলে কুম্ভীপাকে বার বার নিষ্কাশন আবশ্যক। তোমার যাহা কিছু দুষ্কৃত আছে তাহা তুমি জানিয়া শুনিয়াই দৌর্বল্যবশাৎ করিয়া ফেলিয়াছ, কদাপি আত্মপ্রবঞ্চনা কর নাই। সুতরাং আমি তোমাকে সহজেই পাপমুক্ত করিতে পারিব, অধিক যন্ত্রণা দিব না।'

এই বলিয়া কৃতান্ত জাবালিকে সুবৃহৎ লৌহসংদংশে বেষ্টিত করিয়া একটি তপ্ত ঘৃতপূর্ণ কুম্ভে নিক্ষেপ করিলেন। ছ্যাঁক করিয়া শব্দ হইল।

সহস্র বিহগকাকলিতে বনভূমি সহসা ঝংকৃত হইয়া উঠিল। প্রাচীদিক্ নবারুণ-কিরণে আরক্ত হইয়াছে। জাবালি চৈতন্য লাভ করিয়া সাধ্বী হিন্দ্রলিনীর অঙ্ক হইতে ধীরে ধীরে মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখিলেন—সম্মুখে লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রসন্নবদনে মৃদুমধুর হাস্য করিতেছেন।

ব্রহ্মা বলিলেন—'বৎস, আমি প্রীত হইয়াছি। তুমি ইচ্ছানুযায়ী বর প্রার্থনা কর।'



'বৎস, আমি প্রীত হইয়াছি।'

জাবালি বলিলেন—'হে চতুরানন, ঢের হইয়াছে। আর বরে কাজ নাই। আপনি সরিয়া পড়ুন, আর ভেংচাইবেন না।'

ব্রহ্মা তাহার ভুর্জপত্ররচিত ছদ্মমুখ মোচন করিয়া কহিলেন—'জাবালে, অভিমান সংবরণ কর। তুমি বর না চাহিলেও আমি ছাড়িব কেন? আমিও প্রার্থী। হে স্বাবলম্বী মুক্তমতি যশোবিমুখ তপস্বী, তুমি আর দুর্গম অরণ্যে আত্মগোপন করিও না, লোকসমাজে তোমার মন্ত্র প্রচার কর। তোমার যে ভ্রান্তি আছে তাহা অপনীত হউক, অপরের ভ্রান্তিও তুমি অপনয়ন কর। তোমাকে কেহ বিনষ্ট করিবে না, অপরেও যেন তোমার দ্বারা বিনষ্ট না হয়। হে মহাত্মন্, তুমি অমরত্ব লাভ করিয়া যুগে যুগে লোকে লোকে মানবমনকে সংসারের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিতে থাক।'

জাবালি বলিলেন—'তথাস্তু।'



দক্ষিণরায়

চাটুজ্যেমশায় বলিলেন—'বাঘের কথা যদি বল, তো রুদ্রপ্রয়াগের বাঘ। ইয়া কে'দো কে'দো। সোঁদরবন থেকে সেখানে গ্রীষ্মকালে হাওয়া বদলাতে যায়। কিন্তু এমনি স্থানমাহাত্ম্য যে কাউকে কিছু বলে না, সব তীর্থযাত্রী কিনা। কেবল সায়েব ধ'রে ধ'রে খায়।'

বিনোদ উকিল বলিলেন—'খাসা বাঘ তো। এখানে গোটাকতক আনা যায় না? চটপট স্বরাজ হয়ে যেত,—স্বদেশী, বোমা, চরকা, কাউন্সিল-ভাঙা, কিছুই দরকার হ'ত না।'

সন্ধ্যাবেলা বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানায় গল্প চলিতেছিল। তিনি নিবিষ্ট হইয়া একটি ইংরেজি বই পড়িতেছেন—How to be happy though married। তাঁর শালা নগেন এবং ভাগনে উদয়, এরাও আছে।

চাটুজ্যে হু'কায় একমিনিটব্যাপী একটি টান মারিয়া বলিলেন—'তুমি কি মনে কর সে চেষ্টা হয় নি?'

—'হয়েছিল নাকি? কই, রাউলাট-রিপোর্টে তো সে কথা কিছু লেখেনি।'

—'ভারী এক রিপোর্ট পড়েছ। আরে গবরমেণ্ট কি সবজান্তা? There are more things...কি বলে গিয়ে।'

—'ব্যাপারটা কি হয়েছিল খুলেই বলুন না।'

চাটুজ্যে ক্ষণকাল গম্ভীর থাকিয়া বলিলেন—'হু'।'

নগেন বলিল—'বলুন না চাটুজ্যেমশায়।'

চাটুজ্যে উঠিয়া দরজা ও জানালায় উ'কি মারিয়া দেখিলেন। তারপর যথাস্থানে আসিয়া পুনরায় বলিলেন—'হু'।'

বিনোদ। দেখছিলেন কি?

চাটুজ্যে। দেখছিলুম হরেন ঘোষালটা আবার হঠাৎ এসে না পড়ে। পুলিশের গোয়েন্দা, আগে থেকে সাবধান হওয়া ভাল।

বংশলোচন বই রাখিয়া কহিলেন—'ওসব ব্যাপার নাই বা আলোচনা করলেন। হাকিমের বাড়ি ওরকম গল্প না হওয়াই ভাল।'

চাটুজ্যে বলিলেন—'ঠিক কথা। আর, ব্যাপারটাও বড় অলৌকিক, শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়। নাঃ, যাক ও কথা। তারপর, উদো, তোর বউ বাপের বাড়ি থেকে ফিরছে কবে?'

বিনোদ উদয়কে বাধা দিয়া বলিলেন—'ব্যাপারটা শুনতেই বা দোষ কি। চলুন আমার বাসায়, সেখানে হাকিম নেই।'

বংশলোচন বলিলেন—'আরে না না। এখানেই হ'ক। তবে চাটুজ্যেমশায়, বেশী সিডিশস কথাগুলো বাদ দিয়ে বলবেন।'

চাটুজ্যেমশায় বলিলেন—'মা ভৈঃ। আমি খুব বাদসাদ দিয়েই বলছি—বেশী-দিনের কথা নয়, বকু দত্তর নাম শুনেছ বোধ হয়, আমাদের মজিলপুরের চরণ ঘোষের মেসো—'

বিনোদ। বকুলাল দত্ত? কপালীটোলায় যার মস্ত বাড়ি ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ভাঙছে? তিনি তো মারা গেছেন, শুনেছি কাউনসিলে ঢুকতে পারেন নি ব'লে মনের দুঃখে।

চাটুজ্যে। ছাই শুনেছ। বকুবাবু আছেন, তবে এখন চেনা দুষ্কর। এক আনা খরচ করলেই দেখে আসতে পার, কেবল রবিবার বিকেলে এক টাকা।

বিনোদ। কি রকম?

চাটুজ্যে। বুদ্ধির দোষে বেচারা সব নষ্ট করলে—অমন মান, অমন ঐশ্বর্য। বাবার কৃপা হয়েছিল, কিন্তু শেষটায় বকুর মতিচ্ছন্ন হ'ল।

বিনোদ। কোন্ বাবা?

চাটুজ্যে। বাবা দক্ষিণরায়।

উদয় বলিল—'আমার এক পিসশ্বশুরের নাম দক্ষিণামোহন রায়।'

চাটুজ্যে। উদো, তুই হাসালি, হাসালি। পিসশ্বশুর নয় রে উদো,—দেবতা, কাঁচা-খেকো দেবতা, বাঘের দেবতা।

চাটুজ্যে হাতজোড় করিয়া তিনবার কপালে ঠেকাইলেন। তারপর সুর করিয়া কহিতে লাগিলেন—

'নমামি দক্ষিণরায় সোঁদরবনে বাস,
হোগলা উলুর ঝোপে থাকেন বারোমাস।
দক্ষিণেতে কাকদ্বীপ শাহাবাজপুর,
উত্তরেতে ভাগীরথী বহে যত দূর,
পশ্চিমে ঘাটাল পূবে বাকলা পরগণা—
এই সীমানার মাঝে প্রভু দেন হানা।
গোবাঘা শার্দুল চিতে লক্কড় হুড়ার
গেছো-বাঘ কেলে-বাঘ বেলে-বাঘ আর
ডোরা-কাটা ফোঁটা-কাটা বাঘ নানা জাতি—
তিন শ তেষট্টি ঘর প্রভুর যে জ্ঞাতি।
প্রতি অমাবস্যা হয় প্রভুর পুণ্যাহ,
যত প্রজা ভেট দেয় মহিষ বরাহ।

ধুমধাম নৃত্য গীত হয় সারানিশি,
গাঁক গাঁক হাঁক ডাকে কাঁপে দশদিশি
কলাবৎ ছয় বাঘ ছত্রিশ বাঘিনী
ভাঁজেন তেঅটতালে হালুম্ব রাগিণী।
ডেলা ডেলা পেলা দেন শ্রীদক্ষিণ রায়,
হরষিত হঞা সবে কামড়িয়া খায়।
প্রভুর সেবায় হয় জীবহিংসা নিত্য,
পহরে পহরে তাঁর জ্ব'লে উঠে পিত্ত।
বড় বড় জন্তু প্রভু খান অতি জল্‌দি,
হিংসার কারণে তাঁর বর্ণ হৈল হল্‌দি।
ছাগল শুয়ার গরু হিন্দু মুছলমান,
প্রভুর উদরে যাঞা সকলে সমান।
পরম পণ্ডিত তেঁহ ভেদজ্ঞান নাঞি,
সকল জীবের প্রতি প্রভুর যে খাঁঞি।
দোহাই দক্ষিণরায় এই কর বাপা—
অন্তিমে না পাঞি যেন চরণের থাপা।'

বিনোদ বলিলেন—'ও পাঁচালি কোত্থেকে পেলেন?'

চাটুজ্যে। রায়মঙ্গল। আমার একটা পুঁথি আছে, তিন শ বছরের পুরনো। সেটা নেবার জন্যে চিমেশ মিত্তির ঝুলোঝুলি। ছোকরা তার ওপর প্রবন্ধ লিখে ইউনিভার্সিটি থেকে ডাক্তার উপাধি পেতে চায়। দেড় শ অবধি দিতে চেয়েছিল, আমি রাজী হইনি। প্রবন্ধ লিখতে হয় আমিই লিখব। নাড়ীজ্ঞান আছে, ডাক্তার হতে পারলে বুড়ো বয়সের একটা সম্বল হবে।

বিনোদ। যাক, তার পর?

চাটুজ্যে। বকুলালবাবুর কথা বলছিলুম। পনর বৎসর পূর্বে তাঁর অবস্থা ভাল ছিল না। পরিবার দেশে থাকত, তিনি কলকাতায় একটা মেসে থেকে রামজাদু অ্যাটর্নির আপিসে আশি টাকা মাইনের চাকরি করতেন। রামজাদুবাবু তাঁর ক্লাস-ফ্রেন্ড, সেই সূত্রে চাকরি। এখন, বকুবাবুর একটু হাতটান ছিল। বিপক্ষের ঘুষ খেয়ে একটা সমন ধরাতে দেরি করিয়ে দেন। রামজাদুবাবু কড়া লোক, ছেলেবেলার বন্ধু বলে রেয়াত করলেন না। ব্যাপার জানতে পেরে বকুলালকে যাচ্ছেতাই অপমান করলেন। বকুবাবুও তেরিয়া হয়ে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বাসায় চলে এলেন। মন খারাপ, মেসের বামুনকে বললেন রাত্রে কিচ্ছু খাবেন না। তার পর হেদোর ধারে গেলেন মাথা ঠাণ্ডা করতে। রাগের মাথায় চাকরি ছাড়লেন, কিন্তু সংসার চলে কিসে? পুঁজি তো সামান্য। রামজাদুর ওপর প্রচণ্ড আক্রোশ হ'ল। আরে উকিলবাড়ি অমন একটু-আধটু উপরি অনেকে নিয়ে থাকে, তা বলে কি পুরনো বন্ধুকে অপমান করতে হয়? আচ্ছা, এর শোধ একদিন বকুলাল নেবেনই।

রাত নটায় মেসে ফিরে এলেন। মেস খাঁ খাঁ, সেদিন শনিবার, সব মেম্বার থিয়েটার দেখতে গেছে। বকুলাল নিঃশব্দে বাসায় ঢুকে দেখতে পেলেন রান্নাঘরের ভেতর—

নগেন বলিল—'দক্ষিণরায়?'

চাটুজ্যে বলিলেন—'রান্নাঘরের ভেতর মেসের ঝি বকুবাবুর পশমী আসনে—যেটা তাঁর গিন্নী বুনে দিয়েছিলেন—তাইতে বসে তাঁরই থালায় লুচি খাচ্ছে, মেসের ঠাকুর

তাকে বাতাস করছে। ঝি আধ হাত জিব কেটে দেড় হাত ঘোমটা টানলে। অন্য দিন হ'লে বকুবাবু কুরুক্ষেত্র বাধাতেন, কিন্তু আজ দেখেও দেখলেন না। চুপটি ক'রে ওপরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

তার পর অগাধ চিন্তা। কি করা যায়? কোত্থেকে টাকা আসবে? তাঁর এক বিধবা পিসী হুগলীতে থাকেন, বিপুল সম্পত্তি, ওয়ারিস একটিমাত্র ছেলে ভুতো। ভুতোছোঁড়া অতি হতভাগা, অল্প বয়সেই অধঃপাতে গেছে। কিন্তু পিসী তাকে নিয়েই ব্যস্ত, অমন উপযুক্ত ভাইপো বকুলালের দিকে ফিরেও তাকান না। বুড়ীর কাছে কোনও প্রত্যাশা নেই।

বকুলাল ভাবলেন, ভগবানের কি বিচার! লক্ষ্মীছাড়া ভুতো হ'ল দশ লাখের মালিক, আর তারই মামাতো ভাই বকুর অদ্যভক্ষ-ধনুর্গুণ। তাঁর ক্লাসফ্রেন্ড—ঐ বজ্জাত রামজাদুটা—মক্কেল ঠকিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা উপায় করছে, আর তিনি একটি সামান্য চাকরির জন্যে লালায়িত। দুত্তোর ভগবান।

কিন্তু বকুলাল তাঁর এক ভক্ত বন্ধুর কাছে শুনেছিলেন, ভগবানকে যদি একমনে ভক্তিভরে ডাকা যায় তা হ'লে তিনি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। আচ্ছা, তাই একবার ক'রে দেখলে হয় না? যে কথা সেই কাজ। বকুলাল তড়াক করে উঠে পড়লেন, স্টোভ জ্বালালেন, চা ক'রে তিন পেয়ালা খেলেন। আজ তিনি ভররাত ভগবানকে ডাকবেন।

বকুলাল আলো নিবিয়ে বিছানায় হেলান দিয়ে শুয়ে তপস্যা শুরু করলেন।—'হে ভক্তবৎসল হরি, হে ব্রহ্মা, হে মহাদেব, দয়া কর। সেকালে তোমরা ভক্তের আবদার শুনতে, আজ কেন এই গরিবের প্রতি বিমুখ হবে? হে দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, তোমাদের যে-কেউ ইচ্ছে করলে আমার একটা হিল্লে লাগিয়ে দিতে পার। বর দাও—বর দাও—বেশী নয়, মাত্র এক লাখ। উঁহু, এক লাখে কিছুই হবে না,—গিন্নীই গয়না গড়িয়ে অর্ধেক সাবাড় করবেন। রামজেদোটার কিছু কম হবে তো দশ লাখ আছে। আমার অন্তত পাঁচ লাখ চাই—না না, দশ লাখ। দোহাই দেবতারা, তোমাদের কাছে এক লাখও যা দশ লাখও তা, তাতে এই বিশ্বসংসারের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। অনেককে তো কোটি কোটি দিয়ে থাক, আমায় না হয় মাত্র দশ লাখ দিলে। লাখ টাকায় একটা বাড়ি, হাজার-পঞ্চাশ যাবে ফার্নিচার করতে, তারপর আরও পঞ্চাশ হাজার যাবে এটা-সেটায়। এই ধর একটা ভাল মোটরকার। উঁহু, একটায় হবে না, গিন্নীই সেটা আঁকড়ে ধরে থাকবেন, হরদম থিয়েটার আর গঙ্গাস্নান। আচ্ছা তাঁর জন্যে না হয় একটা ফোর্ড গাড়ি মোতায়েন করে দেওয়া যাবে,—সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ফোর্ড,—মেয়েছেলের বেশী বাড় ভাল নয়। আর ঐ রামজাদুটা—রাসকেলকে কেউ যদি বেঁধে নিয়ে আসে তো ফুটপাথের ওপর তার হামদো মুখখানা ঘষি। ঘষি আর দেখি, যতক্ষণ না চোখ মুখ খয়ে গিয়ে তেলপানা হয়ে যায়। হে বুদ্ধদেব, যিশুখ্রীষ্ট, শ্রীচৈতন্য, আজকের মতন তোমরা আমায় মাপ কর, তোমরা এসব পছন্দ কর না তা জানি। দোহাই বাবাসকল, আজ আমার এই তপস্যায় তোমরা ঝাগড়া দিও না, এর পর তোমাদের একদিন খুশী করে দেব। হে নারায়ণ, হে দর্পহারী কৃষ্ণ, হে পয়গম্বর, হে শাস্ত্রের ব্রহ্ম, ইহুদীর যেহোভা, পার্সীর অহুর, দেব দৈত্য যক্ষ রক্ষ, শয়তান—অ্যাঁ! রামো রামো। তা শয়তানেই বা আপত্তি কি, না হয় শেষটায় নরকে যাব। যাক, অত বাছলে চলে না। হে তেত্রিশ কোটির যে-কেউ, দয়া কর—দয়া কর। আমি একান্তঃকরণে ভক্তিভরে ডাকছি—ধনং দেহি, ধনং দেহি।'

বিনোদবাবু বলিলেন—'আচ্ছা চাটুজ্যেমশায়, আপনি বকুবাবুর মনের কথা জানলেন কি ক'রে?'

চাটুজ্যে বলিলেন—'সে তোমরা বুঝবে না। কলিকাল, কিন্তু প্রকৃত ব্রাহ্মণ দু-চারটি এখনও আছেন। গরিব বটি, কিন্তু কাশ্যপ গোত্র, পদ্মগর্ভ ঠাকুরের সন্তান। কেদার চাটুজ্যের এই বুড়ো হাড়ে ঋষিদের গুঁড়ো বর্তমান। একটু চেষ্টা করলে লোকের হাঁড়ির খবর জানতে পারি, মনের কথা তো কোন্ ছার। তার পর বকুলাল-বাবু ঐ রকম একমনে তপস্যা করতে লাগলেন। তাঁর দু চোখ বেয়ে ধারা বইতে লাগল, বাহ্যজ্ঞান নেই, কেবল ধনং দেহি। এমন সময় নীচে থেকে একটি আওয়াজ এল—টিংটিং। বকুলাল লাফিয়ে উঠে দেশলাই জ্বাললেন, বারান্দায় দাঁড়িয়ে উঠনে আলো ফেলে দেখলেন—'

নগেন রোমাঞ্চিত হইয়া আবার বলিয়া ফেলিল—'দক্ষিণরায়!'

চাটুজ্যেমশায় মুখ খিঁচাইয়া ভেংচাইয়া বলিলেন—দ্যাক্ষিণরায়! তোমার ম্যাথা! গ্যাল্পোটা তুমিই ব্যালো না, আমি আর ব'কে মরি কেন।'

উদয় খুশী হইয়া বলিল—'নগেন-মামার ঐ মস্ত দোষ, মানুষকে কথা কইতে দেয় না। আমার শালীর পাকাদেখার দিন—'

চাটুজ্যে অস্থির হইয়া বলিলেন—'আরে গ্যালো যা! একজন থামলেন তো আর একজন পোঁ ধরলেন! যা—আমি আর বলব না।'

বিনোদবাবু বলিলেন—'আহা কেন তোমরা রসভঙ্গ কর! ব্রাহ্মণকে বলতেই দাও না।'

চাটুজ্যে বলিতে লাগিলেন—'বকুলালবাবু উঠনে দেখলেন—ব্রহ্মার হাঁস শিবের ষাঁড় বিষ্ণুর গড়ুর কেউ-ই নেই, শুধু এক কোণে একটি লাল বাইসিকেল ঠেসানো রয়েছে। হেঁকে বললেন—কোন্ হ্যায়? টেলিগ্রাফ পিয়ন সিঁড়ির দরজায় ধাক্কা দিতে গিয়ে-ছিল, এখন সামনে এসে বললে—তার হ্যায়।

কিসের তার? বকুবাবুর বুক দুরদুর ক'রে উঠল। কই, তিনি তো লটারির টিকিট কেনেন নি। তবে কি গিন্নীর কি ছেলেপিলের অসুখ? আজ বিকেলেই তো চিঠি পেয়েছেন সব ভাল। বকুলাল হুড়মুড় করে নেমে এলেন।

তারের খবর—ভুতো হঠাৎ মারা গেছে, পিসীও এখন তখন, শীগ্‌গির চলে এস। বকুবাবু ইয়া আল্লা বলে লাফিয়ে উঠলেন, তার পর মনিব্যাগটি পকেট থেকে বার করে পিয়নের হাতে উবুড় ক'রে দিলেন। পিয়ন বেচারা আসবার আগেই জেনে নিয়েছিল যে খারাপ খবর, বকশিশ চাওয়া চলবে না। এখন অযাচিত তিন টাকা ছ আনা পেয়ে ভাবলে শোকে বাবুর মাথা বিগড়ে গেছে। সে সই নিয়েই পালাল।

ভুতো তা হলে মরেছে? সত্যিই মরেছে? বা রে ভুতো, বেড়ে ছোকরা! নিশ্চয় মদ খেয়ে লিভার পচিয়েছিল। জাঁকিয়ে শ্রাদ্ধ করতে হবে। বকুবাবু সেই রাত্রেই হুগলী রওনা হলেন।

বকুবাবুর বরাত ফিরে গেল। তবে দশ লাখ নয়, মাত্র পাঁচ লাখ। টাকাটা কম হওয়ায় প্রথমটা একটু মন খুঁতখুঁত করেছিল, কিন্তু ক্রমে সয়ে গেল। বাড়ি হ'ল, গাড়ি হল, সব হল। বকুলাল নানারকম কারবার ফাঁদলেন। তারপর যুদ্ধ বাধল, বকুলাল একই মাল পাঁচবার চালান দিতে লাগলেন, ধুলো-মুঠো সোনা-মুঠো হতে লাগল। টাকার আর অবধি নেই, কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বকুর বুদ্ধিটা মোটা হয়ে পড়ল। এই রকমে বছর চোদ্দ কেটে গেল।'...

এই পর্যন্ত বলিয়া চাটুজ্যেমশায় তামাক টানিয়া দম লইতে লাগিলেন। বিনোদ-বাবু বলিলেন—'কই চাটুজ্যেমশায়, বাঘ কই?'

চাটুজ্যে বলিলেন—'আসবে, আসবে, ব্যস্ত হয়ো না, সময় হলেই আসবে। বকুবাবু যেদিন পঞ্চান্ন বৎসরে পড়লেন, সেই রাত্রে বঙ্গমাতা তাঁকে বললেন—বৎস বকু ,বয়স তো ঢের হ'ল, টাকাও বিস্তর জমিয়েছ। কিন্তু দেশের কাজ কি করলে? বকুলাল জবাব দিলেন—মা, আমি অধম সন্তান, বক্তৃতা দেওয়া আসে না, ম্যালেরিয়ার ভয়ে দেশে যেতে পারি না, খদ্দর আমার সয় না—সুখের শরীর—দেশী মিলের ধুতিতেই পেট কেটে যায়। আর—বোমা দূরে থাক,—একটা ভুঁই-পটকা ছোঁড়বার সাহসও আমার নেই। কি কর্তব্য, তুমিই বাতলে দাও। খাটুনির কাজ আর এ বয়সে পেরে উঠব না, সোজা যদি কিছু থাকে তাই ব'লে দাও মা। বঙ্গমাতা বললেন—কাউনসিলে ঢুকে পড়।

মা তো ব'লে খালাস, কিন্তু ঢোকা যায় কি ক'রে? বকুলাল মহা ফাঁপরে পড়লেন। অনেক ভেবে-চিন্তে একজন মাতব্বর সায়েবকে ধ'রে বললেন—তিন হাজার টাকা ড্রংকেন সেলার্স হোমে দিতে রাজী আছেন যদি গবরমেন্ট তাঁকে কাউনসিলে নমিনেট করে। সায়েব বললেন—টাকা তিনি গ্ল্যাডলি নেবেন, কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিতে পারবেন না, কারণ গবরমেণ্ট যার-তার কাছে ঘুষ নেয় না। বকুবাবু মুখ চুন ক'রে ফিরে এলেন। তার পর একজন রাজনীতিক চাঁইকে বললেন—আমি ইলেকশনে দাঁড়াতে চাই, আমায় দলে ভরতি ক'রে নিন, ক্রীড কি আছে দিন সই করে দিচ্ছি। চাঁইমশাই বললেন—দুত্তোর ক্রীড, আগে লাখ টাকা বার করুন দেখি, আমাদের নিখিল-বঙ্গীয়-সর্পনাশক ফাণ্ডের জন্যে,—সাপ না মারলে পাড়াগাঁয়ের লোক সাপোর্ট করবে কেন? বকুবাবু বললেন—ছি ছি, দেশের কাজ করব তার জন্যে টাকা? ঘুষ আমি দিই না। ফিরে এসে স্থির করলেন, সব ব্যাটা চোর। খরচ যদি করতেই হয়, তিনি নিজে বুঝে-সুজে করবেন।

কলকাতায় সুবিধে করতে না পেরে বকুবাবু ঠিক করলেন, সাউথ-সুন্দরবন-কন্‌স্টিটুয়েন্সি থেকে দাঁড়াবেন। সেখানে সম্প্রতি কিছু জমিদারি কিনেছিলেন, সেজন্য ভোট আদায় করা সোজা হবে। ইলেকশনের দু-তিন মাস আগে থেকেই তিনি উঠে-পড়ে লেগে গেলেন।

তারপর হঠাৎ একদিন খবর এল যে বকুলালের পুরনো শত্রু রামজাদুবাবু রাতা-রাতি খদ্দরের সুট বানিয়ে বক্তৃতা দিতে শুরু করেছেন। তিনিও ঐ সোঁদরবন থেকে দাঁড়াবেন। বকুবাবুর দ্বিগুণ রোখ চেপে গেল—তিনি টেরিটিবাজার থেকে একটি তিন নম্বরের টিকি কিনে ফেললেন, দেউড়িতে গোটা-দুই ষাঁড় বাঁধলেন, আর বাড়ির রেলিং এর ওপর ঘুঁটে দেয়ার ব্যবস্থা করলেন।

খবরের কাগজে নানারকম কেচ্ছা বার হ'তে লাগল। বকুলাল দত্ত—সেটাকে কে চেনে? চোদ্দ বছর আগে কার কাছে চাকরি করত? সে চাকরি গেল কেন? কেরানীর অত পয়সা কি করে হ'ল? হে দেশবাসিগণ, বকুলাল অত সোডাওআটার কেনে কেন? কিসের সঙ্গে মিশিয়ে খায়? বকুর বাগানবাড়িতে রাত্রে আলো জ্বলে কেন? বকুলাল কালো, কিন্তু তার ছোট ছেলে ফরসা হ'ল কেন? সাবধান বকুলাল, তুমি শ্রীযুক্ত রামজাদুর সঙ্গে পাল্লা দিতে যেয়ো না, তা হ'লে আরও অনেক কথা ফাঁস ক'রে দেব। বকুবাবুও পাল্‌টা জবাব ছাপতে লাগলেন, কিন্তু তত জুতসই হ'ল না, কারণ তাঁর তরফে তেমন জোরালো সাহিত্যিক-গুণ্ডা ছিল না।

বকুবাবু ক্রমে বুঝলেন যে তিনি হটে যাচ্ছেন, ভোটাররা সব বেঁকে দাঁড়াচ্ছে। একদিন তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে ব'সে আছেন এমন সময় তাঁর মনে পড়ল যে চোদ্দ বৎসর আগে দেবতার দয়ায় তাঁর অদৃষ্ট ফিরে যায়। এবারেও কি তা হবে না? বকুলাল ঠিক করলেন আর একবার তেমনি ক'রে কায়মনোবাক্যে তিনি তেত্রিশ কোটিকে ডাকবেন। শুধু বঙ্গমাতার ওপর নির্ভর করা চলবে না, কারণ তিনি তো আর সত্যিকার দেবতা নন—বঙ্কিম চাটুজ্যের হাতে গড়া। তাঁর কোনও যোগ্যতা নেই, কেবল লোককে খেপিয়ে দিতে পারেন।

রাত্রি দশটার সময় বকুবাবু তাঁর আপিস-ঘরে ঢুকে দরোয়ানকে ব'লে দিলেন যে তাঁর অনেক কাজ, কেউ যেন বিরক্ত না করে। এবার আর শোবার ঘরে নয়, কারণ গিন্নী থাকলে তপস্যার বিঘ্ন হ'তে পারে। বকুলাল ইজিচেয়ারে শুয়ে এই মর্মে একটি প্রার্থনা রুজু করলেন।—'হে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দুর্গা কালী ইত্যাদি, পূর্বে তোমরা একবার আমার মান রেখেছিলে, আমিও তোমাদের যথাযোগ্য পুজো দিয়েছি। তার পর নানান ধান্দায় আমি ব্যস্ত, তোমাদের তেমন খোঁজখবর নিতে পারি নি—কিছু মনে ক'রো না বাবারা। কিন্তু গিন্নী বরাবরই তোমাদের কলাটা মুলোটা যুগিয়ে আসছেন, সোনা-রুপোও কিছু কিছু দিয়েছেন। ঐ যে তাঁর রুপোর তাম্র-কুন্ড, কোষাকুষি, ঘন্টা, পঞ্চপ্রদীপ, শালগ্রামের সোনার সিংহাসন, সে তো আমারই টাকায় আর তোমাদেরই জন্যে। আর আমিও দেখ, এখন একটু ফুরসৎ পেয়েই ধম্ম-কম্মে মন দিয়েছি, টিকি রেখেছি, গো-সেবা করছি। এখন আমার এই নিবেদন, রামজাদু ব্যাটাকে ঘাল কর। ওকে ভোটে হারাবার কোনও আশা দেখছি না। দোহাই তেত্রিশ কোটি দেবতা, ওটাকে বধ কর। কিন্তু এক্ষুনি নয়, নমিনেশন-পেপার দেবার দু-দিন পরে,—নয়তো আর একটা ভুঁইফোড় দাঁড়াবে। কলেরা, বসন্ত, বেরিবেরি, হার্টফেল, গাড়িচাপা যা হয়। আমি আর বেশী কি বলব, তোমরা তো হরেক রকম জান। দাও বাবারা, বজ্জাত ব্যাটার ঘাড় মটকে দাও—রেমোর রক্ত দাও—রক্তং দেহি, রক্তং দেহি।'...বকুলালবাবু নিবিষ্ট হয়ে এই রকম সাধনা করছেন, এমন সময়ে সেই ঘরে টুপ ক'রে একটি শব্দ হ'ল।'

নগেনের ঠোঁট নাড়িয়া উঠিল। আস্তে আস্তে বলিল—'দ—'

চাটুজ্যে গর্জন করিয়া বলিলেন—'চোপরও। —বকুবাবুর আপিসের কড়িকাঠে একটি টিকটিকি আট্‌কে ছিল। সে যেমনি হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙবে অমনি খ'সে গিয়ে টুপ করে বকুলালের টেবিলে পড়ল। বকুলাল চমকে উঠে দেখলেন—টেবিলের ওপর একটি টিকটিকি, আর তার নীচেই একখানা পোস্টকার্ড।

পোস্টকার্ডটি পূর্বে নজরে পড়ে নি। এখন বকুবাবু প'ড়ে দেখলেন তাতে লিখেছে—মহাশয়, শুনেছি আপনি ইলেকশনে সুবিধে করে উঠতে পারছেন না। যদি আমার সাহায্য নেন আর উপদেশ-মত চলেন তবে জয় অবশ্যম্ভাবী। কাল সন্ধ্যায় আপনার সঙ্গে দেখা করব। ইতি। শ্রীরামগিধড় শর্মা।

বকুলালবাবু উৎফুল্ল হয়ে বললেন—জয় মা কালী, জয় বাবা তারকনাথ ব্রহ্মা বিষ্ণু পীর পয়গম্বর। এই পোস্টকার্ডখানি তোমাদেরই লীলা, তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। কাল তোমাদের ঘটা ক'রে পুজো দেব, নিশ্চিন্ত থাক। তার পর খুব মনে মনে বললেন—যাতে দেবতারাও টের না পান—উঁহু বিশ্বাস নেই, আগে কাজ উদ্ধার হ'ক তখন দেখা যাবে।

সমস্ত রাত, তারপর সমস্ত দিন বকুবাবু ছটফট ক'রে কাটালেন। যথাকালে রামগিধড় শর্মা দেখা দিলেন। ছোট্ট মানুষটি, মেটেমেটে রং, ছুঁচলো মুখ, খাড়া-খাড়া কান। পরনে পাটকিলে রঙের ধুতি-মেরজাই গায়ের রঙের সঙ্গে বেশ মিশ খেয়ে গেছে। কথা কন কখনও হিন্দী, কখনও বাংলা। বকুলাল খুব খাতির করে বললেন—বইঠিয়ে। আপনি আর্যসমাজী? রামগিধড় বললেন—নাহি নাহি। বকু জিজ্ঞাসা করলেন—মহাবীর দল? প্যাক্টওয়ালা? কৌঁসিল-তোড়? চরখা-বাজ? রামগিধড় ওসব কিছুই নন, তিনি একজন পলিটিক্যাল পরিব্রাজক। বকুবাবু ভক্তিভরে পায়ের ধুলো নিলেন। রামগিধড় বললেন—বস্ হুয়া হুয়া।

তার পর কাজের কথা শুরু হ'ল। রামগিধড় জানতে চাইলেন বকুবাবুর রাজনীতিক মতামত কি, তিনি স্বরাজী, না অরাজী, না নিমরাজী, না গররাজী? বকু বললেন, তিনি কোনওটাই নন, তবে দরকার হ'লে সবতাতেই রাজী আছেন। তিনি চান দেশের একটু সেবা করতে, কিন্তু রামজাদু থাকতে তা হবার জো নেই। রামগিধড় বললেন—কোনও চিন্তা নেই, তুমি ব্যাঘ্রপার্টিতে জয়েন কর।

বকুবাবু আঁতকে উঠলেন। রামগিধড় বললেন—আমি অতি গুহ্য কথা প্রকাশ ক'রে বলছি শোন। এই পার্টির সভ্যসংখ্যা একেবারে গোনাগুনতি তিন'শ তেষট্টি। আমি এর সেক্রেটারি। একটিমাত্র ভেকান্সি আছে, তাতে ইচ্ছা করলে তুমি আসতে পার। কাউনসিলের সমস্ত সীট আমরাই দখল করব।

বকুর ভরসা হ'ল না। বললেন—তা পেরে উঠবেন কি ক'রে? শত্রু অতি প্রবল, হটাতে পারবেন না। নিখিল-বঙ্গীয়-সর্পনাশক ফাণ্ডের সমস্ত টাকা ওরা হাত করেছে।

রামগিধড় খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে বললেন—আমরা সর্প নই। ফাণ্ড না থাক, দাঁত আছে, নখ আছে। বাবা দক্ষিণরায় আমাদের সহায়। তাঁর কৃপায় সমস্ত শত্রু নিপাত হবে।

তিনি কে?

চেন না? তেত্রিশ কোটির মধ্যে তিনিই এখন জাগ্রত, আর সবাই ঘুমচ্ছেন। বাবা তোমার ডাক শুনতে পেয়েছেন। নাও, এখন ক্রীডে সই কর। অতি সোজা ক্রীড—কেবল বাবার নিত্যিকার খোরাক যোগাতে হবে—তার বদলে পাবে শত্রু মারবার ক্ষমতা আর কাউনসিলে অপ্রতিহত প্রতাপ।

কিন্তু গবরমেণ্ট?

গবরমেণ্টের মাংসও বাবা খেয়ে থাকেন—'

বংশলোচন বাধা দিয়া বলিলেন—'ওকি চাটুজ্যেমশায়!'

চাটুজ্যে কহিলেন—'হাঁ হাঁ মনে আছে। আচ্ছা, খুব ইশারায় বলছি। রামগিধড় বুঝিয়ে দিলেন, একেবারে রামরাজ্য হবে। শত্রুর বংশ লোপাট, সবাই ভাই-ব্রাদার। দিব্যি ভাগ-বাটোয়ারা ক'রে খাবে। সকলেই মন্ত্রী, সকলেই লাট।

কিন্তু ঐ রামজাদুটা টিট হবে তো?

টিট ব'লে টিট! একেবারে ট-য় দীর্ঘ-ঈ টীট! তাকে তুমি নিজেই বধ ক'রো।

বকুবাবুর মাথা গুলিয়ে গিয়েছিল। এইবার তাঁর কৃত্রিম দন্তে অকৃত্রিম হাসি ফুটে উঠল। ক্রীড সই করে দিয়ে বললেন—বাবা দক্ষিণরায় কি জয়!

রামগিধড় বললেন—হুয়া, হুয়া, আব সব ঠিক হুয়া।

এই স্থির হ'ল যে কাল ফাইভ-আপ-প্যাসেঞ্জারে বকুবাবু তাঁর সুন্দরবনের

জমিদারিতে রওনা হবেন। সেখানে পৌঁছলে রামগিধড় তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে বাবার আশীর্বাদ পাইয়ে দেবেন।

বকুবাবুর মাথা বিগড়ে গেল। সমস্ত রাত তিনি খেয়াল দেখলেন রামগিধড় হুয়া হুয়া করছে। রামরাজ্য, কাউন্সিলে অপ্রতিহত প্রতাপ, লাট, মন্ত্রী—এসব বড় বড় কথা তাঁর মনে ঠাঁই পায় নি। রামজাদু মরবে আর তিনি কাউন্সিলে ঢুকবেন—এইটেই আসল কথা। তার পর রামরাজ্যই হ'ক আর রাক্ষসরাজ্যই হ'ক, দেশের লোক বাঁচুক বা বাবার পেটে যাক, তাতে তাঁর ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই।

তারপর সোঁদরবনে গভীর অমাবস্যা রাত্রে বাবা তাঁকে দর্শন দিলেন।'

বিনোদ বলিলেন—'চাটুজ্যেমশায়, আপনি বড় ফাঁকি দিচ্ছেন। বাবার মূর্তিটা কি রকম তা বলুন?'

চাটুজ্যে। বলব না, ভয় পাবে। বিশেষ ক'রে এই উদোটা।

উদয় বলিল—'মোটেই না। হাজারিবাগে থাকতে কতবার আমি রাত্তিরে একলা উঠেছি। বউ বলত—'

চাটুজ্যে বলিলেন—'বউ বলুক গে। বাবা প্রথমটা সৌম্য ব্রাহ্মণের মূর্তি ধ'রে দেখা দিয়েছিলেন। বকুলালকে বললেন—বৎস, আমি তোমার প্রার্থনায় খুশী হয়েছি। এখন বর কি নেবে বল।

বকুবাবু বললেন—বাবা, আগে রামজাদুটাকে মার, ও আমার চিরকালের শত্রু।

বাবা বললেন—দেশের হিত?

বকু উত্তর দিলেন—হিত-টিত এখন থাক বাবা। আগে রামজাদু।

বাবা বললেন—তাই হ'ক। ক্রীড সই করেছ, এখন তোমায় জাতে তুলে দি—

এতেক কহিয়া প্রভু রায় মহাশয়
ধরিলেন নিজ রূপ দেখে লাগে ভয়।
পর্বতপ্রমাণ দেহ মধ্যে ক্ষীণ কটি,
দুই চক্ষু ঘোরে যেন জ্বলন্ত দেউটি।
হলুদ বরন তনু তাহে কৃষ্ণ রেখা,
সোনার নিকষে যেন নীলাঞ্জন লেখা।
কড়া কড়া খাড়া খাড়া গোঁফ দুই গোছা,
বাঁশঝাড় যেন দেয় আকাশেতে খোঁচা।
মুখ যেন গিরিগুহা রক্তবর্ণ তালু,
তাহে দন্ত সারি সারি যেন শাঁখ আলু।
দু-চোয়াল বহি পড়ে সাদা সাদা গেঞ্জ,
আছাড়ি পাছাড়ি নাড়ে বিশ হাত লেঞ্জ।
ছাড়েন হুংকার প্রভু দন্ত কড়মড়ি,
জীব জন্তু যে যেখানে ভাগে দড়বড়ি।
ভয় পাঞা দেবগণ ইন্দ্রে দেয় ঠেলা,
কহে—দেবরাজ হান বজ্র এইবেলা।
ইন্দ্র বলে, ওরে বাপা কিবা বুদ্ধি দিলে,
রহিবে পিতার নাম আপুনি বাঁচিলে।
চক্ষে বান্ধ ফেটা বাপা কানে দাও রুই,
কপাট ভেজাঞা সুধা খাও ঢোক দুই।

বাবা দক্ষিণরায় তাঁর ল্যাজটি চট্ ক'রে বকুবাবুর সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিলেন। দেখতে দেখতে বকুলাল ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করলেন।

বাবা বললেন—যাও বৎস, এখন চ'রে খাও গে।'

চাটুজ্যে হুঁকায় মনোনিবেশ করিলেন। বিনোদবাবু বলিলেন—'তার পর?'

'তার পর আবার কি! বকুলাল কেঁদেই আকুল। ও বাবা, একি করলে? আমি ভাত খাব কি ক'রে? শোব কোথায়? সিল্কের চোগা-চাপকান পরব কি ক'রে? গিন্নী যে আর চিনতে পারবে না গো!

বাবা অন্তর্ধান। রামগিধড় বললে—আবার ক্যা হুয়া? গোল মত কর। এখন ভাগো, শুয়র পকড়-পাকড়কে খাও গে। বকুলাল নড়েন না, কেবল ভেউ ভেউ কান্না। রামগিধড় ঘ্যাক ক'রে তাঁর পায়ে কামড়ে দিলে। বকুলাল ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে পালালেন।

পরদিন সকালে ক-জন চাষা দেখতে পেলে একটি বৃদ্ধ বাঘ পগারের ভেতর ধুঁকছে। চ্যাংদোলা ক'রে নিয়ে গেল ডেপুটিবাবুর বাড়ি। তিনি বললেন—এমন বাঘ তো দেখি নি, গাধার মত রং। আহা, শেয়ালে কামড়েছে, একটু হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দি । একটু চাঙ্গা হোক, তারপর আলিপুর নিয়ে যেয়ো; বকশিশ মিলবে।

বকুবাবু এখন আলিপুরেই আছেন। আর দেখাসাক্ষাৎ করিনে—ভদ্দরলোককে মিথ্যে লজ্জা দেওয়া।'

বিনোদবাবু বলিলেন—'আচ্ছা চাটুজ্যেমশায়, বাবা দক্ষিণরায় কখনও গুলি খেয়েছেন?'

'গুলি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।'

'তিনি না খান, তাঁর ভক্তরা কেউ খান নি কি?'

'দেখ বিনোদ, ঠাকুর-দেবতার কথা নিয়ে তামাশা ক'রো না, তাতে অপরাধ হয়। আচ্ছা ব'স তোমরা—আমি উঠি।'



চ্যাংদোলা করে নিয়ে গেল



চাটুজ্যেমশায় পাঁজি দেখিয়া বলিলেন—'রাত্রি ন-টা সাতান্ন মিনিট গতে অম্বুবাচী নিবৃত্তি। তার আগে এই বৃষ্টি থামবে না। এখন তো সবে সন্ধ্যে।'

বিনোদ উকিল বলিলেন—'তাই তো, বাসায় ফেরা যায় কি ক'রে।'

গৃহস্বামী বংশলোচনবাবু বলিলেন—'বৃষ্টি থামলে সে চিন্তা ক'রো। আপাতত এখানেই খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হোক। উদো, ব'লে আয় তো বাড়ির ভেতর।'

চাটুজ্যে বলিলেন—'মসুর ডালের খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা।'

বিনোদবাবু তাকিয়াটা টানিয়া লইয়া বলিলেন—'তা তো হ'ল, কিন্তু ততক্ষণ সময় কাটে কিসে। চাটুজ্যেমশায়, একটা গল্প বলুন।'

চাটুজ্যে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন—'আর-বছর মুঙ্গেরে থাকতে আমি এক বাঘিনীর পাল্লায় পড়েছিলুম।'

বিনোদবাবু বাধা দিয়া বলিলেন—'দোহাই চাটুজ্যেমশায়, বাঘের গল্প আর নয়।'

চাটুজ্যে একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন—'তবে কিসের কথা বলব, ভূতের না সাপের?'

—'এই বর্ষায় বাঘ ভূত সাপ সমস্ত অচল, একটি মোলায়েম দেখে প্রেমের গল্প বলুন।'

—'গল্প আমি বলি না। যা বলি, সমস্ত নিছক সত্য কথা।'

—'বেশ তো একটি নিছক সত্য প্রেমের কথাই বলুন।'

নগেন বলিল—'তবেই হয়েছে চাটুজ্যেমশায় প্রেমের কথা বলবেন! বয়স কত হ'ল চাটুজ্যেমশায়? আর কটা দাঁত বাকী আছে?'

—'প্রেম কি চিবিয়ে খাবার জিনিস? ওরে গর্দভ, দাঁতে প্রেম হয় না, প্রেম হয় মনে।'

নগেন বলিল—'মন তো শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। প্রেমের আপনি জানেন কি? সব ভুলে মেরে দিয়েছেন। প্রেমের কথা বলবে তরুণরা। কি বলিস উদো?'

—'তরুণ কি রে বাপু? সোজা বাংলায় বল্ চ্যাংড়া। তিন কুড়ি বয়েস হ'ল, কেদার চাটুজ্যে প্রেমের কথা জানে না, জানে যত হ্যাংলা চ্যাংড়ার দল!'

বিনোদবাবু বলিলেন—'আঃ হা, কেন ব্রাহ্মণকেও চটাও, শোনই না ব্যাপারটা।'

চাটুজ্যে বলিলেন—'বর্ণের শ্রেষ্ঠ হলেন ব্রাহ্মণ। দর্শন বল, কাব্য বল, প্রেমতত্ত্ব বল, সমস্ত বেরিয়েছে ব্রাহ্মণের মাথা থেকে। আবার ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ হলেন চাটুজ্যে। যথা বঙ্কিম চাটুজ্যে, শরৎ চাটুজ্যে—'

—'আর?'

—'আর এই ক্যাদার চাটুজ্যে। কেন বলব না? তোমাদের ভয় করব নাকি?'

—'যাক যাক, আপনি আরম্ভ করুন।'

চাটুজ্যেমশায় আরম্ভ করিলেন—'আর বছরের ঘটনা। আমি এক অপরূপ সুন্দরী নারীর পাল্লায় পড়েছিলুম।'

নগেন বলিল—'এই যে বলছিলেন বাঘিনীর পাল্লায়?'

বিনোদ বলিলেন—'একই কথা।'

চাটুজ্যে বলিলেন—'ওরে মুখ্খু, বাঘিনীর পাল্লায় পড়েছিলুম মুঙ্গেরে, আর এই নারীর ব্যাপার ঘটেছিল পঞ্জাব মেলে, টুণ্ডলার এদিকে। যাক, ঘটনাটা শোন।—

গেল বছর মাঘ মাসে চরণ ঘোষ বললে তার ছোট মেয়েটিকে টুণ্ডলায় রেখে আসতে,—জামাই সেখানেই কর্ম করে কিনা। সুবিধেই হ'ল, পরের পয়সায় সেকেণ্ড ক্লাসে ভ্রমণ, আবার ফেরবার পথে একদিন কাশীবাসও হবে। মেয়েটাকে তো নির্বিবাদে পৌঁছিয়ে দিলুম। ফেরবার সময় টুণ্ডলা স্টেশনে দেখি গাড়িতে তিলার্ধ জায়গা নেই, আগ্রার ফেরত এক পাল মার্কিন ভবঘুরে সমস্ত ফার্স্ট সেকেণ্ড ক্লাসের বেঞ্চি দখল ক'রে আছে। ভাগ্যিস জামাই রেলের ডাক্তার, তাই গার্ডকে ব'লে ক'য়ে আমায় একটা ফার্স্ট ক্লাসে ঠেলে তুলে দিলে। গাড়িও তখনই ছাড়ল।

তখন সকাল সাতটা হবে, কিন্তু কুয়াশায় চারিদিক আচ্ছন্ন, গাড়ির মধ্যে সমস্ত ঝাপসা। কিছুক্ষণ ধাঁধা লেগে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম, তারপর ক্রমে ক্রমে কামরার ভেতরটা ফুটে উঠল।

দেখেই চক্ষু স্থির। ওধারের বেঞ্চিতে একটা অসুরের মতন আখাম্বা ঢ্যাঙা সায়েব চিতপাত হ'য়ে চোখ বুজে হাঁ করে শুয়ে আছে, আর মাঝে মাঝে বিড়বিড় ক'রে কি বলছে। দু-বেঞ্চির মাঝে মেঝের ওপর আর একটা বেঁটে মোটা সায়েব মুখ গুঁজে ঘুমুচ্ছে, তার মাথার কাছে একটা খালি বোতল গড়াগড়ি যাচ্ছে। এধারের বেঞ্চিতে কেউ নেই, কিন্তু তাতে দামী বিছানা পাতা, তার ওপর একটা অদ্ভুত পোশাক —বোধ হয় ভাল্লুকের চামড়ার,—আর নানা রকম জিনিসপত্র ছড়ানো রয়েছে। গাড়ি চলছে, পালাবার উপায় নেই। বেঞ্চির শেষদিকে একটা চেয়ারের মতন জায়গা ছিল, তাইতে ব'সে দুর্গানাম জপতে লাগলুম। কোনও গতিকে সময় কাটতে লাগল, সায়েব দুটো শুয়েই রইল, আমারও একটু একটু ক'রে মনে সাহস এল।

হঠাৎ বাথরুমের দরজা খুলে বেরিয়ে এল এক অপরূপ মূর্তি। দূর থেকে বিস্তর মেমসায়েব দেখেছি, কিন্তু এমন সামনাসামনি দেখবার সুযোগ কখনও ঘটে নি। মুখখানি চীনে করমচা, ঠোঁট দুটি পাকা লঙ্কা, মারবেলে কোঁদা আজানুলম্বিত

দুই বাহু। চোস্ত ঘাড়-ছাঁটা, কেবল কানের কাছে শণের মতন দুগাছি চুল কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। পরনে একটি দেড়হাতী গামছা—'

বিনোদবাবু বলিলেন—'গামছা নয় চাটুজ্যেমশায়, ওকে বলে স্কার্ট।'

—'কাঠ-ফাট জানি নে বাবা। পষ্ট দেখলুম বাঁদিপোতার গামছা খাটো ক'রে পরা, তার নীচে নেমে এসেছে গোলাপী কলাগাছের মতন দুই পা, মোজা আছে কি নেই বুঝতে পারলুম না। দেহযষ্টি কথাটা এতদিন ছাপার হরফেই পড়েছি, এখন স্বচক্ষে দেখলুম,—হাঁ, যষ্টি বটে, মাথা থেকে বুক-কোমর অবধি একদম চাঁচাছোলা, কোথাও একটু উঁচুনীচু টক্কর নেই। সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব নয়, একবার জ্বলন্ত হাউই-এর কাঠি। দেখে বড়ই ভক্তি হ'ল। কপালে হাত ঠেকিয়ে বললুম—সেলাম মেমসাহেব।

ফিক ক'রে হাসলেন। পাকা লঙ্কার ফাঁক দিয়ে গুটিকতক কাঁচা ভুট্টার দানা দেখা গেল। ঘাড় নেড়ে বললেন—গুৎ মর্নিং।



দূর থেকে বিস্তর মেমসাহেব দেখেছি

মেম নৃত্যপরা অপ্সরার মতন চঞ্চল ভঙ্গীতে এসে বেঞ্চে বসলেন। আমি কাঁচুমাচু হ'য়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লুম। মেম বললেন—সিট ডাউন বাবু, ডরো মৎ।

দেবীর এক হাতে বরাভয়, অপর হাতে সিগারেট। বুঝলুম প্রসন্ন হয়েছেন, আর আমায় মারে কে। ইংরিজী ভাল জানি না, হিন্দী ইংরিজী মিশিয়ে নিবেদন করলুম—নিতান্ত স্থান না পেয়েই এই অনধিকারপ্রবেশ করেছি, অবশ্য গার্ডের হুকুম নিয়ে;

মেমসাহেব যেন কসুর মাফ করেন। মেম আবার অভয় দিলেন, আমিও ফের ব'সে পড়লুম।

কিন্তু নিস্তার নেই। মেমসায়েব আমার পাশে ব'সে একটু দাঁত বার ক'রে আমাকে একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

এই কেদার চাটুজ্যেকে সাপে তাড়া করেছে, বাঘে পেছু নিয়েছে, ভূতে ভয় দেখিয়েছে, হনুমানে দাঁত খিঁচিয়েছে, পুলিসকোর্টের উকিল জেরা করেছে, কিন্তু



কিন্তু এমন সামনাসামনি—

এমন দুরবস্থা কখনও ঘটে নি। ষাট বছর বয়েস, রংটি উজ্জ্বল শ্যাম বলা চলে না, পাঁচ দিন ক্ষৌরি হয় নি, মুখ যেন কদম ফুল,—কিন্তু এই সমস্ত বাধা ভেদ ক'রে লজ্জা এসে আমার আকর্ণ বেগনী ক'রে দিলে। থাকতে না পেরে বললুম—মেমসাব, কেয়া দেখতা?

মেম হু-হু ক'রে হেসে বললেন—কুছ নেহি, নো অফেন্স। তুম কোন্ হ্যায় বাবু?

আমার আত্মমর্যাদায় ঘা পড়ল। আমি কি সঙ না চিড়িয়াখানার জন্তু? বুক চিতিয়ে মাথা খাড়া ক'রে বললুম—আই কেদার চাটুজ্যে, নো জু-গার্ডেন।

মেম আবার হু-হু করে হেসে বললেন—বেঙ্গলী?

আমি সগর্বে উত্তর দিলুম—ইয়েস সার, হাই কাস্ট বেঙ্গলী ব্রাহ্মিণ। পইতেটা টেনে বার ক'রে বললুম—সী? আপ কোন্ হ্যায় ম্যাডাম?'

বিনোদবাবু বলিলেন—'ছি চাটুজ্যেমশায়, মেয়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন! ওটা যে এটিকেটে বারণ।'

'কেন করব না? মেম যখন আমার পরিচয় নিলে তখন আমিই বা ছাড়ব কেন? মেম মোটেই রাগ করলেন না, জানালেন তাঁর নাম জোন জিলটার, নিবাস আমেরিকা, এদেশে এর পূর্বেও ক-বার এসেছিলেন, ইণ্ডিয়া বড় আশ্চর্য জায়গা।

আমি সাহস পেয়ে সায়েব দুটোকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—এ'রা কারা?

মেমটি বড়ই সরলা। বেঞ্চির উপরের ঢ্যাঙা সায়েবের দিকে কড়ে আঙুল বাড়িয়ে বললেন—দ্যাট চ্যাপি হচ্ছেন টিমথি টোপার, নিবাস কালিফোর্নিয়া, আমাকে বিবাহ করতে চান। ইনি দশ কোটির মালিক। আর যিনি গড়াগড়ি যাচ্ছেন, উনি হচ্ছেন ক্রিস্টফার কলম্বস ব্রটো, ইনিও আমাকে বিবাহ করতে চান, এ'রও দশ কোটি ডলার আছে।

আমি গম্ভীরভাবে বললুম—কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন।

মেম বললেন—সে অন্য লোক। এ'রা আমেরিকায় থেকেও কিছু আবিষ্কার করতে পারেন নি। দেশটা একদম শুকিয়ে গেছে, মেথিলেটেড স্পিরিট ছাড়া কিছুই মেলে না। তাই এ'রা দেশত্যাগী হ'য়ে খাঁটি জিনিসের সন্ধানে পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

জিজ্ঞাসা করলুম—এ'রা বুঝি মস্ত স্পিরিচুয়ালিস্ট?

মেম বললেন—ভেরি!

এমন সময় ঢ্যাঙা সায়েবটা চোখ মেলে কটমট ক'রে চেয়ে আমার দিকে ঘুষি তুলে বললে—ইউ-ইউ গেট আউট কুইক। বে'টেটাও হঠাৎ হাত-পা ছুড়তে শুরু করলে।

আমি আমার লাঠিটা বাগিয়ে ধ'রে ঠক ঠক ক'রে ঠুকতে লাগলুম। মেমসায়েব বিছানা থেকে তাঁর পালকমোড়া চটিজুতো তুলে নিয়ে ঢ্যাঙার দুই গালে পিটিয়ে আদর ক'রে বললেন—ইউ পগ্, ইউ পগ্। বে'টেটাকে লাথি মেরে বললেন—ইউ পিগ্, ইউ পিগ্। দুটোই তখনই আবার হাঁ ক'রে ঘুমিয়ে পড়ল। মেম তাদের বুকের ওপর এক-এক পাটি চটি রেখে দিয়ে স্বস্থানে ফিরে এসে বললেন—ভয় নেই বাবু!

ভরসাই বা কই? আরব্য উপন্যাসে পড়েছিলুম একটা দৈত্য এক রাজকন্যাকে সিন্দুকে পুরে মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াত। দৈত্যটা ঘুমুলে রাজকন্যা তার বুকের ওপর একটা ঢিল রেখে দিয়ে যত রাজ্যের রাজপুত্তুর জুটিয়ে আংটি আদায় করতেন। ভাবলুম এইবার সেরেছে রে! এই মেমসায়েব দু-দুটো দৈত্যের ঘাড়ে চ'ড়ে বেড়াচ্ছে, এখনই নিরানব্বই আংটির মালা বার করবে।

যা ভয় করছিলুম ঠিক তাই। আমার হাতে একটা রুপো আর তামার তারে জড়ানো পলা-বসানো আংটি ছিল। মেম হঠাৎ সেটাকে দেখে বললেন—হাউ লভ্লি! দেখি বাবু কি রকম আংটি।

আমি ভয়ে ভয়ে হাতটি এগিয়ে দিলুম, যেন আঙুলহাড়া অস্তর করাচ্ছি। মেম ফস্ করে আংটিটি খুলে নিয়ে নিজের আঙুলে পরিয়ে বললেন—বিউটিফুল!

হরে রাম! এ যে আমার ত্রিসন্ধ্যা জপ করার আংটি,—হায় হায়, এই ম্লেচ্ছ মাগী সেটাকে অপবিত্র ক'রে দিলে! আমার চোখ ছলছল ক'রে উঠল, কিন্তু কৌতূহলও খুব হ'ল। বললুম—মেমসায়েব, আপ্‌কো আর কয়ঠো আংটি হ্যায়? নাইন্টিনাইন?

মেম বেঞ্চির তলা থেকে একটি তোরঙ্গ টেনে এনে তা থেকে একটি অদ্ভুত বাক্স খুলে আমাকে দেখালেন। চোখ ঝলসে গেল। দেরাজের পর দেরাজ, কোনওটায় গলার হার, কোনওটায় কানের দুল, কোনওটায় আর কিছু। একটা আংটির ট্রে—তাতে কুড়ি-পঁচিশটা হবে—আমার সামনে ধরে বললেন—যেটা খুশি নাও বাবু!

আমি বললুম—সে কি কথা। আমার আংটির দাম মোটে ন-সিকে। আমি, ওটা আপনাকে প্রেজেন্ট করলুম, সাবধানে রাখবেন, ভেরি হোলি আংটি।

মেম বললেন—ইউ ওল্ড ডিয়ার! কিন্তু তোমার উপহার যদি আমি নিই, আমার উপহারও তোমার ফেরত দেওয়া উচিত নয়। এই ব'লে একটা চুনির আংটি আমার আঙুলে পরিয়ে দিলেন। বললুম—থ্যাংক ইউ মেমসায়েব, আমি আপনার গোলাম, ফরগেট মি নট। মনে মনে বললুম—ভয় নেই ব্রাহ্মণী, এ আংটি তোমার জন্যেই রইল।

ট্রেন এটাওআয় এসে পৌঁছল। কেলনারের খানসামা চা রুটি মাখন নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে—টি হুজুর? মেম ট্রে রাখলেন। তারপর আমার লাঠিটা নিয়ে ঢ্যাঙা আর বেঁটেকে একটু গুঁতো দিয়ে বললেন—গেট আপ টিমি, গেট আপ ব্রটো। তারা বুনো শুয়োরের মতন ঘোঁত ঘোঁত ক'রে কি বললে শুনতে পেলুম না। আন্দাজে বুঝলুম তাদের ওঠবার অবস্থা হয় নি। মেম আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—চ্যাটার্জি, তুমি খাবে? আপত্তি নেই তো?

মহা ফাঁপরে পড়া গেল। ম্লেচ্ছ নারীর স্বহস্তে মিশ্রিত, কিন্তু ভুরভুরে খোশবায়, শীতটাও খুব পড়েছে। শাস্ত্রে চা খেতে বারণ কোথাও নেই। তা ছাড়া রেলগাড়ির মতন বৃহৎ কাষ্ঠে ব'সে শীত নিবারণের জন্যে ঔষধার্থে যদি চা পান করা যায় তবে নিশ্চয়ই দোষ নাস্তি। বললুম—ম্যাডাম লক্ষ্মী, তুমি যখন নিজ হাতে চা দিচ্ছ, তখন কেন খাব না। তবে রুটিটা থাক।

চায়ে মনের কপাট খুলে যায়, খেতে খেতে অনেক বেফাঁস কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। অশ্বত্থামা যেমন দুধের অভাবে পিটুলিগোলা খেয়ে আহ্লাদে নৃত্য করতেন, নিরীহ বাঙালী তেমনি চায়েতেই মদের নেশা জমায়। বঙ্কিম চাটুজ্যে তারিফ ক'রে চা খেতে শেখেন নি, সর্দি-টর্দি হ'লে আদা-নুন দিয়ে খেতেন,—তাতেই লিখতে পেরেছেন—বন্দী আমার প্রাণেশ্বর। আজকাল চায়ের কল্যাণে বাংলা দেশে ভাবের বন্যা এসেছে,—ঘরে ঘরে চা, ঘরে ঘরে প্রেম। সেকালের কবিদের বিস্তর বায়নাক্কা ছিল,—উপবন রে, চাঁদ রে, মলয় রে, কোকিল রে। তবে পঞ্চশর ছুটবে। এখন কোনও ঝঞ্ঝাট নেই,—চাই শুধু দুটো হাতল-ভাঙা বাটি, একটু ছেঁড়া অয়েল ক্লথ, একটা কেরোসিন কাঠের টেবিল, দু'ধারে দুই তরুণ-তরুণী, আর মধ্যিখানে ধূমায়মান কেতলি। ভাগ্যিস বয়েসটা যাট, তাই বেঁচে গিয়েছিলুম।

মেমকে জিজ্ঞাসা করলুম—আচ্ছা মেমসায়েব, এই যে দুই হুজুর গড়াগড়ি যাচ্ছেন, এঁরা দুজনেই তো আপনার পাণিপ্রার্থী। আপনি কোন্ ভাগ্যবান্‌টিকে বরণ করবেন?

মেম বললেন—সে একটি সমস্যা। আমি এখনও মনস্থির করতে পারি নি। কখনও মনে হয় টিমিই উপযুক্ত পাত্র, বেশ লম্বা সুপুরুষ, আমাকে ভালও বাসে খুব। কিন্তু মদ খেলেই ওর মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। আর ঐ ব্রটো, যদিও বেঁটে মোটা, আর একটু বয়স হয়েছে, কিন্তু আমার অত্যন্ত বাধ্য আর নরম মন। একটু মদ খেলেই কেঁদে ফেলে। বড় মুশকিলে পড়েছি, দুজনেই নাছোড়বান্দা। যা হক এখনও ক-ঘণ্টা সময় পাওয়া যাবে, হাওড়া পোঁছবার আগেই স্থির ক'রে ফেলব। আচ্ছা চ্যাটার্জি, তুমিই বল না—এদের মধ্যে কাকে বিয়ে করা উচিত।

বললুম—মেমসায়েব, আপনি এঁদের স্বভাবচরিত্র যে প্রকার বর্ণনা করলেন তাতে বোধ হয় দুটিই অতি সুপাত্র। তবে কি না এঁরা যেরকম বেহুঁশ হয়ে আছেন—

মেম বললেন—ও কিছু নয়। একটু পরেই দুজনে চাঙ্গা হ'য়ে উঠবে।

আমি বললুম—আপনার নিজের যদি কোনওটির ওপর বেশী ঝোঁক না থাকে, তবে আপনার বাপ-মার ওপর স্থির করার ভার দিন না?

মেম বললেন—আমার বাপ-মা কেউ নেই, নিজেই নিজের অভিভাবক। দেখ চ্যাটার্জি, তোমার ওপরেই ভার দিলুম। তুমি বেশ ক'রে দুটোকে ঠাউরে দেখ। মোগলসরাইএ নেমে যাবার আগেই তোমার মত আমাকে জানাবে। ভেবেছিলুম একটা টাকা ছুঁড়ে চিত-উবুড় করে দেখে মনস্থির করব, কিন্তু তুমি যখন রয়েছ তখন আর দরকার নেই।

ব্যবস্থা মন্দ নয়। আত্মীয়-বন্ধুদের জন্যে এ পর্যন্ত বিস্তর বর-কনে ঠিক ক'রে দিয়েছি, কিন্তু এমন অদ্ভুত পাত্র দেখার ভার কখনও পাই নি। দুজনেই ক্রোরপতি, দুটোই পাঁড়মাতাল। একটা লম্বায় বড়, আর একটা ওজনে পুষিয়ে নিয়েছে। বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় এ যাবৎ যা পেয়েছি তা শুধু ঘোঁত ঘোঁত। চুলোয় যাক, মেমের যখন আপত্তি নেই তখন যেটার হয় নাম বলব। আর যদি বুঝি যে মেম আমার কথা রাখবে, তবে বলব—মা লক্ষ্মী, মাথা যখন আগেই মুড়িয়েছ তখন বাকী কাজ-টুকুও সেরে ফেল।—এই দু-ব্যাটা ভাবী স্বামীকে ঝেঁটিয়ে নরকস্থ কর।

গল্প করতে করতে বেলা প্রায় সাড়ে নটা হ'য়ে এল। এর পরেই একটা ছোট স্টেশনে গাড়ি থামবে, সেই অবসরে সায়েব-মেমরা হাজরি খেতে খানা-কামরায় যাবে। এতক্ষণ ঠাওর হয় নি, এখন দেখতে পেলুম চা খেয়ে মেমের ঠোঁট ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। বুঝলুম রংটি কাঁচা। মেম একটি সোনার কৌটো খুললেন, তা থেকে বেরুল একটি ছোট আরশি, একটি লাল বাতি, একটি পাউডারের পুঁটুলি। লালবাতি ঠোঁটে ঘ'ষে নাকে একটু পাউডার লাগিয়ে মুখখানি মেরামত ক'রে নিলেন।

গাড়ি থামল। মেম বললেন—চ্যাটার্জি, আমি ব্রেকফাস্ট খেতে চললুম। টিমি আর ব্রটো রইল, এদের দিকে একটু নজর রেখো, যেন জেগে উঠে মারামারি না করে। যদি সামলাতে না পার তবে শেকল টেনো।

আহা, কি সোজা কাজই দিয়ে গেলেন! প্রায় আধ ঘণ্টা পরে কানপুরে গাড়ি থামবে, তখন মেম আবার এই কামরায় ফিরে আসবেন। ততক্ষণ মরি আর কি! লাঠিটা বাগিয়ে নিয়ে ফের দুর্গানাম জপ করতে লাগলুম।

ঢ্যাঙা সায়েবটা উঠে বসেছে। হাই তুললে, চোখ রগড়ালে, আঙুল মটকালে। আমার দিকে একবার কটমট ক'রে চাইলে, কিন্তু কিছু বললে না। টলতে টলতে বাথরুমে গেল।



ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল

তখন বেঁটেটা তড়াং করে উঠে কোলা ব্যাঙের মতন থপ ক'রে আমার পাশে এসে বসল। আমি ভয়ে চেঁচাতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু তার আগেই সে আমার হাতটা নেড়ে দিয়ে বললে—গুড মর্নিং সার, আমি হচ্ছি ক্রিস্টফার কলম্বস ব্লটো।

আমি সাহস পেয়ে বললুম—সেলাম হুজুর।

—আমার দশ কোটি ডলার আছে। প্রতি মিনিটে আমার আয়—

—হুজুর দুনিয়ার মালিক তা আমি জানি।

ব্লটো আমার বুকে আঙুল ঠেকিয়ে বললে—লুক হিয়ার বাবু, আমি তোমাকে পাঁচ টাকা বকশিশ দেবো।

—কেন হুজুর।

—মিস জিলটারকে তোমার রাজী করাতেই হবে। আমি তোমাদের সমস্ত কথা শুনেছি। তোমারই ওপর সমস্ত ভার, তুমিই কন্যাকর্তা। ঐ টিমথি টোপার—ও

অতি পাজী লোক, ওর সমস্ত সম্পত্তি আমার কাছে বাঁধা আছে। ও একটা পাঁড়-মাতাল, পপার, ওর সঙ্গে বিয়ে হ'লে মিস জিল্‌টার মনের দুঃখে মারা যাবেন।

এই ব'লে ব্রটো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। একটা বোতলে একটু তলানি পড়ে ছিল, সেটুকু খেয়ে ফেলে বললে—বাবু, তুমি জ- র মান?

—মানি বইকি।

—আমি আর জন্মে ছিলাম একটি তৃষিত চাতক পক্ষী, আর এই মেম ছিল একটি রূপসী পানকৌড়ি। আমরা দুটিতে—

এমন সময় বাথরুমের দরজা ন'ড়ে উঠল। ব্রটো তাড়াতাড়ি আমাকে পাঁচ আঙুল দেখিয়ে ইশারা ক'রেই ফের নিজের জায়গায় শুয়ে নাক ডাকাতে লাগল।

ঢ্যাঙা সায়েব—মেম যাকে টিমি বলে—ফিরে এসে নিজের বেঞ্চে গ্যাঁট হয়ে বসল। তখন ব্রটো জেগে ওঠার ভান ক'রে হাই তুললে, চোখ রগড়ালে, আমার দিকে একবার করুণ নয়নে চেয়ে বাথরুমে ঢুকল।

এবার টিমির পালা। ব্রটো স'রে যেতেই সে কাছে এসে আমার হাতটা চেপে ধরলে। আমি আগে থাকতেই বললুম—গুড মর্নিং সার।

টিমি আমার হাতটায় ভীষণ মোচড় দিলে।

বললুম—উঃ!

টিমি বললে—তোমার হাড় গুঁড়ো ক'রে দেব।

ভয়ে ভয়ে বললুম—ইয়েস সার।

—তোমায় থেঁতলে জেলি বানাব।

—ইয়েস সার।

—মিস জোন জিল্‌টারকে আমি বিয়ে করবই! আমি সমস্ত শুনেছি। যদি আমার হয়ে তাকে না বল তবে তোমাকে বাঁচতে হবে না।

—ইয়েস সার।

—আমার অগাধ সম্পত্তি। পাঁচটা হোটেল, দশটা জাহাজ কোম্পানি, পঁচিশটা শুঁটকী শুওরের কারখানা। ব্রটোর কি আছে? একটা মদের চোরা ভাঁটি, তাও আমার টাকায়। ব্রটো একটা হতভাগা মাতাল বেঁটে বজ্জাত—

ব্রটো বোধ হয় আড়ি পেতে সমস্ত শুনছিল। হঠাৎ কামরায় ছুটে ফিরে এসে ঘুষি তুলে বললে, কে হতভাগা, কে মাতাল, কে বেঁটে বজ্জাত?

সকলেরই বিশ্বাস যে গান আর গালাগালি হিন্দীতেই ভাল রকম জমে। হিন্দী গালাগালের প্রসাদগুণ খুব বেশী তা স্বীকার করি। কিন্তু যদি নিছক আওয়াজ আর দাপট চাও তবে বিলিতী গাল শুনো—বিশেষ ক'রে মার্কিনী গাল। এক-একটি লব্‌জ যেন তোপ, কানের ভেতর দিয়ে মরমে পশে। ইংরিজী আমি ভাল জানি না, সব গালাগালির অর্থ বুঝতে পারি নি, কিন্তু তাতে রসগ্রহণের কিছু মাত্র বাধা হয় নি।

দেখলুম এক বিষয়ে সায়েবরা আমাদের চেয়ে দুর্বল—তারা বাগ্‌যুদ্ধ বেশীক্ষণ চালাতে পারে না। দু-মিনিট যেতে না যেতেই হাতাহাতি আরম্ভ হ'ল। আমি হতভম্ব হ'য়ে দেখতে লাগলুম, গাড়ি কখন কানপুরে এসে থামল, তা টের পাই নি।

হনহন ক'রে মেমসাহেব এসে পড়ল। এই গজ-কচ্ছপের লড়াই থামানো কি তার কাজ? বললে—টিমি ডিয়ার, ডোণ্ট্‌—ব্রটো ডারলিং, ডোণ্ট্‌—প্লিজ প্লিজ ডোণ্ট্‌। কিছুই ফল হ'ল না। আমি বেগতিক দেখে গাড়ি থেকে নেমে ছুটলুম।

ফার্স্ট সেকেণ্ড ক্লাস সমস্ত খালি। ডাইনিং কারে সকলে তখনও খানা খাচ্ছে। কাকে বলি? ওই যে—একটা সাদা ফ্লানেলের পেন্টলুন-পরা সায়েব প্লাটফর্মে পাইচারি ক'রে শিস দিচ্ছে। হন্তদন্ত হ'য়ে তাকে বললুম—কাম্ সার, লেডির মহা বিপদ। সায়েব হুশ ক'রে একটি জোর শিস দিয়ে আমার সঙ্গে ছুটল।



হাতাহাতি আরম্ভ হ'ল

মেম তখন আমার লাঠিটা নিয়ে অপক্ষপাতে দু-ব্যাটাকেই পিটছিলেন। কিন্তু তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই, সমানে ঝুটোপুটি করছে। আগন্তুক সায়েবটি মেমকে জিজ্ঞাসা করলে—হেলো জোন, ব্যাপার কি? মেম তাড়াতাড়ি ব্যাপার বুঝিয়ে দিলেন। সাহেব টিমি আর ব্লটোকে থামাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু তারা তাকেই মারতে এল। নতুন সায়েবের তখন হাত ছুটল।

বাপ, কি ঘুষির বহর? টিমি ঠিকরে গিয়ে দরজায় মাথা ঠুকে প'ড়ে চতুর্দশ ভুবন অন্ধকার দেখতে লাগল। ব্লটো কোঁক ক'রে বেঞ্চের তলায় চিতপাত হ'য়ে পড়ল। বিলকুল ঠাণ্ডা।

একটু জিরিয়ে নিয়ে মেম আমার সঙ্গে নতুন সায়েবটির পরিচয় করিয়ে দিলেন—ইনি বিখ্যাত মিস্টার বিল বাউণ্ডার, খুব ভাল ঘুষি লড়তে পারেন। আর ইনি মিস্টার চ্যাটার্জি, ভেরি ডিয়ার ওল্ড ফ্রেণ্ড।

সায়েব আমার মুখখানা দেখে বললে—সাম্ বিয়ার্ড!

মেম বললেন—থাকুক দাড়ি। ইনি অতি জ্ঞানী লোক।

সায়েব আমার হাতটা খুব ক'রে নেড়ে দিয়ে বললে—হা-ডু-ডু? বেশ শীত পড়েছে নয়?

ধাঁ করে আমার মাথায় একটা মতলব এল। মেমসায়েবকে চুপি চুপি বললুম—দেখুন মিস জোন, অত গোলমালে কাজ কি? টিমি আর রটো দুজনেই তো কাবু হ'য়ে পড়েছে। আমি বলি কি—আপনি এই বিল সায়েবকে বিয়ে করুন। খাসা লোক

মেম বললেন—রাইটো! আমার একথা এতক্ষণ মনেই পড়ে নি। আই সে বিল, আমায় বিয়ে করবে?

বিল বললে—রাদার। কে বলে আমি করব না?...

রাধামাধব! সায়েব জাতটা ভারী বেহায়া। বিলকে বাধা দিয়ে বললুম—রোসো সায়েব, এক্ষুনি ও সব কেন। আমি হচ্ছি ব্রাইডমাস্টার—কন্যাকর্তা। তোমার কুলশীল আগে জেনে নি, তার পর আমি মত দেব।



'ঠোঁটের সিঁদুর অক্ষয় হোক'

বিল বললে—আমার ঠাকুরদা ছিলেন মুচি। আমার বাপও ছেলেবেলায় জুতো সেলাই করতেন।

আমি বললুম—তাতে কুলমর্যাদা কমে না। তোমার আয় কত?

বিল একটু হিসেব করে বললে—মিনিটে দশ হাজার, ঘন্টায় ছ লাখ। কিন্তু চিন্তা করবেন না, আমার মাসী মারা গেলে আয় আর একটু বাড়বে। তাঁর পঁচিশটা বড় বড় পুকুর আছে, নোনা জলে ভরতি, তাতে তিমি মাছ কিলবিল করছে।

বললুম—থাক্, আর বলতে হবে না, আমি মত দিলুম। এগিয়ে এস, আমি আশীর্বাদ করব, রিয়াল হিন্দু স্টাইল।

কিন্তু ধান-দুব্বো কই? জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বললুম—এই কুলী, জলদি থোড়া ঘাস ছিঁড়কে লাও, পয়সা মিলেগা।

ইংরিজী আশীর্বাদ তো জানি না। বললুম—যদি আপত্তি না থাকে তবে বাংলাতেই বলি।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

সাহেবের মাথায় এক মুঠো ঘাস দিয়ে বললুম—বেঁচে থাক। ধন তো যথেষ্ট আছে, পুত্রও হবে, লক্ষ্মী এই সঁপে দিলুম। কিন্তু খবরদার ব্যাটা, বেশী মদ-টদ খেয়ো না, তা হ'লে ব্রহ্মশাপ লাগবে। সাহেব আর একবার আমার হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে নড়া ছিঁড়ে দিলে।

মেমকে বললুম—মা লক্ষ্মী, তোমার ঠোঁটের সিঁদুর অক্ষয় হ'ক। বীরপ্রসবিনী হ'য়ে কাজ নেই মা—ও আশীর্বাদটা আমাদের অবলাদের জন্যেই তোলা থাক। তুমি আর গরিব কালা-আদমীদের দুঃখের নিমিত্ত হয়ো না,—গুটিকতক শান্তশিষ্ট কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে ঘরকন্না কর।

মেম হঠাৎ তার মুখখানা উঁচু ক'রে আমার সেই পাঁচ দিনের খোঁচা-খোঁচা দাড়ির ওপর—'

বিনোদবাবু বলিলেন—'আ ছি ছি ছি।'

চাটুজ্যেমশায় বলিলেন—'হুঁ, দেবীচৌধুরানীতে ঐ রকম লিখেছে বটে।'

'আচ্ছা চাটুজ্যেমশায়, পাকা লঙ্কার আস্বাদটা কি রকম লাগল?'

'তাতে ঝাল নেই। আরে, ঐ হ'ল ওদের রেওয়াজ, ঐ রকম ক'রেই ভক্তিশ্রদ্ধা জানায়, তাতে লজ্জা পাবার কি আছে।'

চাটুজ্যেমশায় বলিতে লাগিলেন—'তারপর দেখি ঢ্যাঙা আর বেঁটে মুখ চুন ক'রে নেমে যাচ্ছে, জন-দুই কুলী তাদের মালপত্র নামাচ্ছে।

গাড়ি ছাড়ল। বিল আর জোন হাত ধরাধরি ক'রে নাচ শুরু ক'রে দিলে। আমি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখতে লাগলুম।

জোন বললে—চ্যাটার্জি, এই আনন্দের দিনে তুমি অমন প্লাম হ'য়ে বসে থেকো না। আমাদের নাচে যোগ দাও।

বললুম—মাদার লক্ষ্মী, আমার কোমরে বাত। নাচতে কবিরাজের বারণ আছে।

—তবে তুমি গান গাও, আমরাই নাচি!

কি আর করা যায়, পড়েছি যবনের হাতে। একটা রামপ্রসাদী ধরলুম।

সমস্ত পথটা এই রকম চলল, অবশেষে মোগলসরাই এল। মেম বললে, কলকাতায় গিয়েই তাদের বিয়ে হবে, আমি যেন তিন দিন পরে গ্রাণ্ড হোটেলে অতি অবশ্য তাদের সঙ্গে দেখা করি। বিস্তর শেকহ্যাণ্ড, বিস্তর অনুরোধ, তারপর নেমে কাশীর গাড়ি ধরলুম।...পরদিন আবার কলকাতা যাত্রা।'



নাচ শুরু ক'রে দিল

বিনোদবাবু বলিলেন—'আচ্ছা চাটুজ্যেমশায়, গিন্নী সব কথা শুনেছেন?'

'কেন শুনবেন না। সতীলক্ষ্মী, তায় পঞ্চাশ বছর বয়স হয়েছে। তোমাদের নবীনাদের মতন অবুঝ নন যে অভিমানে চৌচির হবেন। আমি বাড়ি ফিরে এসেই তাঁকে সমস্ত বলেছি।'

'চাটুজ্যেগিন্নী শুনে কি বললেন?'

'তক্ষুনি একটা উড়ে নাপিত ডেকে বললেন—'দে তো রে, বুড়োর মুখখানা আচ্ছা ক'রে চেঁচে, ম্লেচ্ছ মাগী উচ্ছিষ্ট ক'রে দিয়েছে!' তারপর সেই চুনির আংটিটা কেড়ে নিয়ে গঙ্গাজলে ধুয়ে নিজের আঙুলে পরলেন।'

'বউভাতের ভোজটা কি রকম খেলেন?'

'সে দুঃখের কথা আর না-ই শুনলে। গ্রাণ্ড হোটেলে গিয়ে জানলুম ওরা কেউ নেই। একটা খানসামা বললে—বিয়ের পরদিনই বেটী পালিয়েছে। সায়েব তাকে খুঁজতে গেছে।'

—



আলিপুরের সংবাদ—সাগর আইলাণ্ডে বায়ুমণ্ডলে যে গর্ত হইয়াছিল সেটা সম্প্রতি পাকারকম ভরাট হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আর বৃষ্টি হইবে না। চৌরঙ্গিতে তিনটা সবুজ পোকার অগ্রদূত ধরা পড়িয়াছে। ঘোলা আকাশ ছিঁড়িয়া ক্রমশঃ নীল রং বাহির হইতেছে। রৌদ্রে কাঁসার রং ধরিয়াছে, গৃহিণী নির্ভয়ে লেপ-কাঁথা শুকাইতেছেন। শেষরাত্রে একটু ঘনীভূত হইয়া শুইতে হয়। টাকায় এক গণ্ডা রোগা-রোগা ফুলকপির বাচ্ছা বিকাইতেছে। পটোল চড়িতেছে, আলু নামিতেছে। স্থলে জলে মরুৎ-ব্যোমে দেহে মনে শরৎ আত্মপ্রকাশ করিতেছে। সেকালে রাজারা এই সময়ে দিগ্‌বিজয়ে যাইতেন।

আদালত বন্ধ, আমার গৃহ মক্কেলহীন। সার্কুলার রোডে ধাপা-মেলের বাঁশি পোঁ করিয়া বাজিল—চমকিত হইয়া দেখিলাম বড় ছেলেটা জিওমেট্রি ত্যাগ করিয়া রেলের টাইম-টেব্‌ল অধ্যয়ন করিতেছে। ছোট ছেলেটার ঘাড়ে এঞ্জিনের ভূত চাপিয়াছে, সে ক্রমাগত দু-হাতের কনুই ঘুরাইয়া ছুঁচার মতন মুখ করিয়া বলিতেছে—ঝুক ঝুক ঝুক ঝুক। মন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

এবার কোথা যাওয়া যায়? দু-একজন মহাপ্রাণ বন্ধু বলিলেন—পূজার ছুটিতে দেশে যাও, পল্লীসংস্কার কর। কিন্তু অতীব লজ্জার সহিত স্বীকার করিতেছি যে বহু বহু সৎকার্যের ন্যায় এটিও আমার দ্বারা হইবার নয়। জানামি ধর্মং—অন্ততঃ মোটামুটি জানি, কিন্তু ন চ মে প্রবৃত্তিঃ। ভ্রমণের নেশা আমার মাথা খাইয়াছে।

পদব্রজ, গোযান, মোটর, নৌকা, জাহাজ—এসব মাঝে মাঝে মুখ বদলাইবার জন্য মন্দ নয়। কিন্তু যানের রাজা রেলগাড়ি, রেলগাড়ির রাজা ই. আই. আর। বন্ধু বলেন—ইংরেজের জিনিসে তোমার অত উৎসাহ ভাল দেখায় না। আচ্ছা, রেল না-হয় ইংরেজ করিয়াছে কিন্তু খরচটা কে যোগাইতেছে? আজ না-হয় আমরা ইংরেজকে সহিংস বাহবা দিতেছি, কিন্তু এমন দিন ছিল যখন সেও আমাদের কীর্তি অবাক হইয়া দেখিত। আবার পাশা উল্‌টাইবে, দু-শ বৎসর সবুর কর। তখন তারায় তারায় মেল চালাইব, ইংরেজ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া দেখিবে, সঙ্গে লইব না,—পয়সা দিলেও না।

বাংলার নদ-নদী, ঝোপ-ঝাড়, পল্লীকুটীরের ঘুঁটের সুমিষ্ট ধোঁয়া, পানাপুকুর হইতে উত্থিত জুঁই ফুলের গন্ধ—এসব অতি স্নিগ্ধ জিনিস। কিন্তু এই দারুণ শরৎকালে মন চায় ধরিত্রীর বুক বিদীর্ণ করিয়া সগর্জনে ছুটিয়া যাইতে। পঞ্জাব-মেল সন্ সন্ ছুটিতেছে, বড় বড় মাঠ, সারি সারি তালগাছ, ছোট ছোট পাহাড়,

নিমেষে নিমেষে পট-পরিবর্তন। মাঝে মাঝে বিরাম, পান-বিড়ি-সিগ্রেট, চা-গ্রাম, পুরী-কচৌড়ি, রোটি-কাবাব, dinner sir at Shikohabad ? তারপর আবার প্রবল বেগ, টেলিগ্রাফের খুঁটি ছুটিয়া পলাইতেছে, দু-পাশে আখের খেত স্রোতের মত বহিয়া যাইতেছে, ছোট ছোট নদী কুণ্ডলী পাকাইয়া অদৃশ্য হইতেছে, দূরে প্রকাণ্ড প্রান্তর অতিদূরের শ্যামায়মান অরণ্যানীকে ধীরে প্রদক্ষিণ করিতেছে। কয়লার ধোঁয়ার গন্ধ, হঠাৎ জানালা দিয়া এক ঝলক উগ্রমধুর ছাতিম ফুলের গন্ধ। তার পর সন্ধ্যা—পশ্চিম আকাশে ওই বড় তারাটা গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিয়াছে। ওদিকের বেঞ্চে স্থূলোদর লালাজী এর মধ্যেই নাক ডাকাইতেছেন। মাথার উপর ফিরিঙ্গীটা বোতল হইতে কি খাইতেছে। এদিকের বেঞ্চে দুই কম্বল পাতা, তার উপর আরও দুই কম্বল, তার মধ্যে আমি, আমার মধ্যে ভর-পেট ভাল ভাল খাদ্যসামগ্রী —তা ছাড়া বেতের বাক্সে আরও অনেক আছে। গাড়ির অঙ্গে অঙ্গে লোহালক্কড়ে চাকার ঠোক্করে জিঞ্জিরডাণ্ডার ঝঞ্চনায় মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজিতেছে—আমি চিতপাত হইয়া তাণ্ডব নাচিতেছি। হমীন অস্ত্, ওআ হমীন অস্ত্!

এই পাশবিক পরিকল্পনা—এই অহেতুকী রেলওয়েপ্রীতি—ইহার পশ্চাতে মনস্তত্ত্বের কোন্ দুষ্ট সর্প লুক্কায়িত আছে? গিরীন বোসকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হয় না। চট্ করিয়া স্থির করিয়া ফেলিলাম—ডালহাউসি যাইব, আমার এক পঞ্জাবী বন্ধুর নিমন্ত্রণে। একাই যাইব, গৃহিণীকে একটা মোটা রকম ঘুষ এবং অজস্র থিয়েটার দেখার অনুমতি দিয়া ঠাণ্ডা করিয়া রাখিব। কিন্তু man proposes woman disposes।



আমার বড় সুটকেসটা ঝাড়িতেছি—

আমার বড় সুটকেসটা ঝাড়িতেছি, হঠাৎ বিদ্যুল্লতার মত ছুটিয়া আসিয়া গৃহিণী বলিলেন—'হোআট-হোআট-হোআট ?'

এইখানে একটা কথা চুপি চুপি বলিয়া রাখি। গৃহিণীর ইংরেজী বিদ্যা ফার্স্ট বুক পর্যন্ত। কিন্তু তিনি আমার ফাজিল শ্যালকবৃন্দের কল্যাণে গুটিকতক মুখরোচক ইংরেজী শব্দ শিখিয়াছেন এবং সুযোগ পাইলেই সেগুলি প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

আমি আমতা আমতা করিয়া বলিলাম—'এই মনে করছি ছুটির ক-দিন একটু পাহাড়ে কাটিয়ে আসি, শরীরটা একটু ইয়ে কিনা।'

গৃহিণী বলিলেন—'হোআট ইয়ে? হুঁ, একাই যাবার মতলব দেখছি—আমি বুঝি একটা মস্ত ভারী বোঝা হয়ে পড়েছি? পাহাড়ে গিয়ে তপস্যা হবে নাকি?'

সভয়ে দেখিলাম শ্রীমুখ ধূমায়মান, বুঝিলাম পর্বতো বহ্নিমান্। ধাঁ করিয়া মতলব বদলাইয়া ফেলিয়া বলিলাম—'রাম বল, একা কখনও তপস্যা হয়? আমি হব না হব না হব না তাপস যদি না মিলে তপস্বিনী।'

মন্ত্রবলে স্মোক নুইসান্স কাটিয়া গেল, গৃহিণী সহাস্যে বলিলেন—'হোআট পাহাড়?'



'হোআট—হোআট—হোআট'

আমি। ডালহাউসি। অনেক দূর।

গৃহিণী। হ্যাং ডালহাউসি। দার্জিলিং চল। আমার ত্রিশ ছড়া পাথরের মালা না কিনলেই নয়, আর চার ডজন ঝাঁটা। আর অত দাম দিয়ে গলায় দেবার শুঁয়োপোকা কেনা হ'ল—সেই যে বোআ না কি বলে—আর হীরে-বসানো চরকা-ব্রোচ—তা তো এ পর্যন্ত পরতেই পেলুম না। তোমার সেই ডালকুত্তো পাহাড়ে সেসব দেখবে কে? দার্জিলিং-এ বরঞ্চ কত চেনাশোনা লোকের সঙ্গে দেখা হবে। টুনি-দিদি, তার ননদ, এরা সব সেখানে আছে। সরোজিনীরা, সুকু-মাসী, এরাও গেছে। মংকি মিত্তিরের বউ তার তেরোটা এণ্ডিগেণ্ডি ছানাপোনা নিয়ে গেছে।

যুক্তি অকাট্য, সুতরাং দার্জিলিং যাওয়াই স্থির হইল।

দার্জিলিং-এ গিয়া দেখিলাম, মেঘে বৃষ্টিতে দশদিক্ আচ্ছন্ন। ঘরের বাহির হইতে ইচ্ছা হয় না, ঘরের মধ্যে থাকিতে আরও অনিচ্ছা জন্মে। প্রাতঃকালের আহার সমাধা করিয়া পায়ে মোটা বুট এবং আপাদমস্তক ম্যাকিন্‌টশ পরিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছি।...জনশূন্য ক্যালকাটা রোডে একাকী পদচারণ করিতে করিতে ভাবিতেছিলাম —অবলম্বনহীন মেঘরাজ্যে আর তো ভাল লাগে না...এমন সময় অনতিদূরে—



নকুড়-মামা

এই পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সহিত আশ্চর্য রকম মিল আছে। কিন্তু আমার অদৃষ্ট অন্যপ্রকার,—বদ্রাওনের নবাব গোলাম কাদের খাঁর পুত্রীর সাক্ষাৎ পাইলাম না। দেখা হইল ডুমরাওনের মোক্তার নকুড় চৌধুরীর সঙ্গে, যিনি সম্পর্কনির্বিশেষে আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলেরই সরকারী মামা।

নকুড়-মামা পথের পার্শ্বস্থিত খাদের ধারে একটা বেঞ্চে বসিয়া আছেন। তাঁর মাথায় ছাতা, গলায় কম্ফর্টার, গায়ে ওভারকোট, চক্ষুতে ভ্রূকুটি, মুখে বিরক্তি। আমাকে দেখিয়া কহিলেন—'ব্রজেন নাকি?'

বলিলাম—'আজ্ঞে হ্যাঁ। তারপর, আপনি হঠাৎ দার্জিলিং-এ? বাড়ির সব ভাল তো? কেষ্টার খবর কি—বেনারসেই আছে নাকি? কি করছে সে আজকাল?'—কেষ্ট নকুড়-মামার আপন ভাগিনেয়, বেনারসের বিখ্যাত যাদব ডাক্তারের একমাত্র পুত্র, পিতৃমাতৃহীন, বয়স চব্বিশ-পঁচিশ। সে একটু পাগলাটে লোক, নকুড়-মামাকে বড়-একটা গ্রাহ্যই করে না, তবে আমাকে কিছু খাতির করে।

নকুড়-মামা কহিলেন—'সব বলছি। তুমি আগে আমার একটা কথার জবাব দাও দিকি। এই দার্জিলিংএ লোকে আসে কি করতে হ্যা? ঠাণ্ডা চাই? কলকাতায় তো আজকাল টাকায় এক মন বরফ মেলে, তারই গোটাকতক টালির ওপর অয়েলক্লথ পেতে শুলেই চুকে যায়, সস্তায় শীতভোগ হয়। উঁচু চাই—তা না হ'লে শৌখিন বাবুদের বেড়ানো হয় না? কেন রে বাপু, দু-বেলা তালগাছে চড়লেই তো হয়। যত-সব হতভাগা—।'

এই পৃথিবীটা যখন কাঁচা ছিল তখন বিশ্বকর্মা তাহাকে লইয়া একবার আচ্ছা করিয়া ময়দা-ঠাসা করিয়াছিলেন। তাঁর দশ আঙুলের গাঁট্টার ছাপ এখনও রহিয়া গিয়া স্থানে স্থানে পর্বত উপত্যকা নদী জলধি সৃষ্টি করিয়াছে। বিশ্বকর্মার একটি বিরাট চিমটির ফল এই হিমালয় পর্বত। নাই দিলে কুকুর মাথায় ওঠে,—ভগবানের আশকারা পাইয়া মানুষ হিমালয়ের বুকে চড়িয়া দার্জিলিং-এ বাসা বাঁধিয়াছে। নকুড়-মামা ধর্মভীরু লোক, অতটা বাড়াবাড়ি পছন্দ করেন না।

আমি বলিলাম—'কি জানেন নকুড়-মামা, কষ্ট পাবার যে আনন্দ, তাই লোকে আজকাল পয়সা খরচ ক'রে কেনে। অমৃত বোস লিখেছে—

ভাগ্যিস আছিল নদী জগৎ সংসারে
তাই লোকে যেতে পারে পয়সা দিয়ে ওপারে।

দার্জিলিং আছে তাই লোকের পয়সা খরচ ক'রে পাহাড় ডিঙোবার বদখেয়াল হয়েছে। তবে এইটুকু আশার কথা—এখানে মাঝে মাঝে ধস নাবে।'

মামা ত্রস্ত হইয়া খাদের কিনারা হইতে সরিয়া রাস্তার অপেক্ষাকৃত নিরাপদ প্রান্তে আসিয়া বলিলেন—'উচ্ছন্ন যাবে। এটা কি ভদ্দর লোকের থাকবার দেশ? যখন-তখন বৃষ্টি, বাসা থেকে বেরুলে তো দশ তলার ধাক্কা, দু-পা হাঁটো আর দম নাও। তাও সিঁড়ি নেই, হোঁচট খেলে তো হাড়গোড় চূর্ণ। চললে হাঁপানি, থামলে কাঁপুনি কেন রে বাপু?'

নকুড়-মামা চারিদিকে একবার ভীষণ দৃষ্টিতে চাহিলেন। সময়টা যদি সত্য ত্রেতা অথবা দ্বাপর যুগ হইত এবং মামা যদি মুনি-ঋষি বা ভস্মলোচন হইতেন; তবে এতক্ষণে সমস্ত দার্জিলিং শহর সাহারা মরুভূমি অথবা ছাইগাদা হইয়া যাইত। আমি বলিলাম—'তবে এলেন কেন?'

নকুড়। আরে এসেছি কি সাধে। কেষ্টার স্বভাব জানো তো? লেখাপড়া শিখলি, বে-থা কর্, বিষয়-আশয় দেখ্—রোজগার তো আর করতে হবে না। সে সব নয়। দিনকতক খেয়াল হ'ল, ছবি আঁকলে। তার পর আমসত্ত্বর কল ক'রে কিছু টাকা ওড়ালে। তার পর কলকাতায় গিয়ে কতকগুলো ছোঁড়ার সর্দার হ'য়ে

একটা সমিতি করলে। তার পর বম্বে গেল, সেখান থেকে আমাকে এক আর্জেন্ট টেলিগ্রাম। কি হুকুম? না এক্ষুনি দার্জিলিং যাও, মুন-শাইন ভিলায় ওঠ, আমিও যাচ্ছি, বিবাহ করতে চাই। কি করি, বড়লোক ভাগনে, সকল আবদার শুনতে হয়। এসে দেখি—মুন-শাইন ভিলায় নরক গুলজার। বরযাত্রীর দল আগে থেকে এসে ব'সে আছে। সেই কচি-সংসদ্,—কেষ্টা যার প্রেসিডেন্ট।

আমি। পাত্রী ঠিক হয়েছে?

নকুড়। আরে কোথায় পাত্রী! এখানে এসে হয়তো একটা লেপচানী কি ভুটানী বিয়ে করবে।

আমি। কচি-সংসদের সদস্যরা কিছু জানে না?

নকুড়। কিচ্ছু না। আর জানলেই বা কি, তাদের কথাবার্তা আমি মোটেই বুঝতে পারি না, সব যেন হেঁয়ালি। তবে তারা খায়-দায় ভাল, আমার সঙ্গে তাদের



পেলব রায়

ঐটুকুই সম্বন্ধ। কেষ্টবাবাজী আজ বিকেলে পৌঁছবেন। সন্ধ্যেবেলা যদি এস, তবে সবই টের পাবে, সংসদের সঙেদের সঙ্গেও আলাপ-পরিচয় হবে।

কচি-সংসদের কথা পূর্বে শুনিয়াছি। এদের সেক্রেটারি পেলব রায় আমাদের পাড়ার ছেলে, তার পিতৃদত্ত নাম পেলারাম। বি· এ· পাস করিয়া ছোকরার কচি এবং মোলায়েম হইবার বাসনা হইল। সে গোঁফ কামাইল, চুল বাড়াইল এবং লেডি-টাইপিস্টের খোঁপার মতন মাথার দু-পাশ ফাঁপাইয়া দিল। তারপর মুগার পাঞ্জাবি গরদের চাদর, সবুজ নাগরা ও লাল ফাউন্টেন পেন পরিয়া মধুপুরে গিয়া আশু মুখুজ্যেকে ধরিল—ইউনিভার্সিটির খাতাপত্রে পেলারাম রায় কাটিয়া যেন পেলব রায় করা হয়। সার আশুতোষ এক ভলুম এন্সাইক্লোপিডিয়া লইয়া তাড়া করিলেন। পেলারাম পলাইয়া আসিল এবং বি· এ· ডিপ্লোমা বাক্সে বন্ধ করিয়া নিরুপাধিক পেলব রায় হইল। তারই উদ্যমে কচি-সংসদ্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তবে যতদূর জানি কেষ্টই সমস্ত খরচপত্র যোগায়। এই কচি-সংসদের উদ্দেশ্য কি আমার ঠিক জানা নাই। শুনিয়াছি এরা যাকে তাকে মেম্বার করে না এবং নূতন মেম্বারের দীক্ষাপ্রণালীও এক ভয়াবহ ব্যাপার। গভীর পূর্ণিমা নিশীথে সমবেত সদস্যমণ্ডলীর করস্পর্শ করিয়া দীক্ষার্থী ষোলটি ভীষণ শপথ গ্রহণ করে। সঙ্গে সঙ্গে ষোল টিন সিগারেট পোড়ে এবং এনতার চা খরচ হয়।

অনেক বেলা হইয়াছে, মেঘও কাটিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার সময় নিশ্চয়ই মুন-শাইন ভিলায় যাইব বলিয়া নকুড়-মামার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

গৃহিণী তিন ছড়া পাঁচ সিকা দামের চুনি-পান্নার মালা উপর্যুপরি গলায় পরিয়া বলিলেন— 'দেখ তো, কেমন মানাচ্ছে।'

আমি বলিলাম—'চমৎকার। যেন পরস্ত্রী।'

গৃহিণী। তুমি একটি ক্যাড। পরস্ত্রী না হ'লে বুঝি মনে ধরে না?

আমি। আরে চট কেন। পরকীয়াতত্ত্ব অতি উঁচুদরের জিনিস। তার মহিমা বোঝা যার তার কর্ম্ম নয়, তবে যে নিজের স্ত্রীকে পরস্ত্রীর মতন নিত্য-নূতন—ধরি ধরি ধরিতে না পারি--দেখে, সে অনেকটা এগিয়েছে। রাধাকৃষ্ণই হচ্ছেন মডেল প্রেমিক। ফ্রয়েড বলেছেন—

গৃহিণী। ড্যাম ফ্রয়েড—অ্যান্ড রাধাকৃষ্ণ মাথায় থাকুন। আমাদের মতন মুখখু লোকের সীতারামই ভাল।

আমি। কিন্তু রাম যে সীতাকে দু-দুবার পোড়াতে চাইলেন তার কি?

গৃহিণী। সে ত লোকনিন্দেয় বাধ্য হ'য়ে। ত্রেতাযুগের লোকগুলো ছিল কুচুণ্ডে রাসকেল।

আমি। তা—তিনি ভরতকে রাজ্য দিয়ে সীতাকে নিয়ে আবার বনে গেলেই পারতেন।

গৃহিণী। সেই আহ্লাদে প্রজারা যে রামকে ছাড়তে চাইলে না।

আমি। বাঃ, তুমি আমার চাইতে ঢের বড় উকিল। আমি তোমাকে রামচন্দ্রের তরফ থেকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিন্তু ভাগ্যিস তিনি সীতার মতন বউ পেয়েছিলেন তাই

নিস্তার পেয়ে গেলেন। তোমার পাল্লায় পড়লে অযোধ্যা শহরটাকেই ফাঁসি দিতে হ'ত।

গৃহিণী। কেন, আমি কি শূর্পনখা না তাড়কা রাক্ষসী?

আমি। সীতা ছিলেন গোবেচারী লক্ষ্মীমেয়ে। তোমার মতন আবদেরে নয়।

গৃহিণী। সোনার হরিণ কে চেয়েছিল মশায়? কত ওজন তার খোঁজ রাখ? যদি ফাঁপা হয় তবু পাঁচ হাজার ভরি।

আমি। আচ্ছা, আচ্ছা, তোমারই জিত। আর শুনেছ, কেষ্ট যে এখানে বিয়ে করতে আসছে। সেই কাশীর কেষ্ট।

গৃহিণী। হুরে! ভাগ্যিস খানকতক গহনা এনেছি। কিন্তু আশ্বিন মাসে লগ্ন কই?

আমি। প্রেমের তেজ থাকলে লগ্নে কি আসে যায়। তবে পাত্রীটি কে তা কেউ জানে না। হয়তো এখনও পাত্রীই স্থির হয় নি, যদিও বরযাত্রীর দল হাজির।

গৃহিণী। গ্যাড! শুনেছিলুম কেষ্টর বাপের ইচ্ছে ছিল টুনি-দিদির ননদের সঙ্গে কেষ্টর বিয়ে দিতে। সে মেয়ে তো এখানেই আছে, আর বড়-সড়ও হয়েছে। তারও বাপ-মা নেই, তার দাদা—টুনি-দির বর ভুবনবাবু—তিনিই এখন অভিভাবক।

আমি। তা বলতে পারি না। কেষ্টর মতিগতি বোঝা শিবের অসাধ্য। যাই হ'ক, সন্ধ্যার সময় একবার কেষ্টর বাসায় যাব।

মনোহারিণী সন্ধ্যা। জনবিরল পথ দিয়া চলিয়াছি। শহরের সর্বত্র—উপরে, আরও উপরে, নীচে, আরও নীচে—স্তরে স্তরে অগণিত দীপমালা ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাস্তার দু-ধারে ঝোপে জঙ্গলে পাহাড়ী ঝিঁঝির অলৌকিক মূর্ছনা ষড়্‌জ হইতে নিষাদে লাফাইয়া উঠিতেছে। পরিষ্কার আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, কুয়াশার চিহ্নমাত্র নাই। ঐ মুন-শাইন ভিলা।

কিসের শব্দ? দার্জিলিং শহরে পূর্বে শিয়াল ছিল না। বর্ধমানের মহারাজা যে-কটা আনিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন তারা কি মুন-শাইন ভিলায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে? না, শিয়াল নয়, কচি-সংসদ্ গান গাহিতেছে। গানের কথা ঠিক বোঝা যাইতেছে না, তবে আন্দাজে উপলব্ধি করিলাম, এক অচেনা অজানা অচিন্ত্যনীয় অরক্ষণীয়া বিশ্ব-তরুণীর উদ্দেশে কচি-গণ হৃদয়ের ব্যথা নিবেদন করিতেছে। হা নকুড়-মামা, তোমার কপালে এই ছিল?

আমাকে দেখিয়া সংসদ্ গান বন্ধ করিল। মামা ও কেষ্টকে দেখিলাম না। কেষ্ট আজ বিকালে পৌঁছিয়াছে, কিন্তু কোথায় উঠিয়াছে কেহ জানে না। শীঘ্রই সে মুন-শাইন ভিলায় আসিবে এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

পেলব রায় আমাকে খাতির করিয়া বসাইল এবং সংসদের অন্যান্য সভ্যগণের সহিত পরিচয় করাইয়া দিল, যথা—

শিহরন সেন
বিগলিত ব্যানার্জি
অকিঞ্চিৎ কর

হুতাশ হালদার
দোদুল দে
লালিমা পাল (পুং)

এদের নাম কি অন্নপ্রাশনলব্ধ না সজ্ঞানে স্বনির্বাচিত? ভাবিলাম জিজ্ঞাসা করি; কিন্তু চক্ষুলজ্জা বাধা দিল। লালিমা পাল মেয়ে নয়। নাম শুনিয়া অনেকে ভুল করে, সেজন্য সে আজকাল নামের পর 'পুং' লিখিয়া থাকে।

হঠাৎ দরজা ঠেলিয়া নকুড়-মামা ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁর পিছনে ও কে? এই কি কেষ্ট? আমি একাই চমকিত হই নাই, সমগ্র কচি-সংসদ অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল। হুতাশ বেচারা নিতান্ত ছেলেমানুষ, সবে সিগারেট খাইতে শিখিয়াছে,—সে আঁতকাইয়া উঠিল।

কেষ্টর আপাদমস্তক বাঙালীর আধুনিক বেশবিন্যাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেছে। তার মাথার চুল কদম্বকেশরের মতন ছাঁটা, গোঁফ নাই কিন্তু ঠোঁটের নীচে ছোট একগোছা দাড়ি আছে, গায়ে সবুজ রঙের খাটো জামা—তাতে বড় বড় সাদা ছিট, কোমরে বেল্ট, মালকোঁচা-মারা বেগনী রঙের ধুতি, পায়ে পট্টি ও বুট, হাতে একটি মোটা লাঠি বা কোঁতকা, পিঠে ক্যাম্বিসের ন্যাপস্যাক স্ট্রাপ দিয়া বাধা।

আমিই প্রথমে কথা কহিলাম—'কেষ্ট, একি বিভীষিকা?'

কেষ্ট বলিল—'প্রথমটা তাই মনে হবে. কিন্তু যখন বুঝিয়ে দেব তখন বলবেন হাঁ কেষ্ট ঠিক করেছে। ব্রজেন-দা, জীবনটা ছেলেখেলা নয়, আর্ট অ্যান্ড এফিশেন্সি।'

আমি। কিন্তু চেহারাটা অমন করলে কেন?

কেষ্ট। শুনুন। মানুষের চুলটা অনাবশ্যক. শীততাপ নিবারণের জন্যে যেটুকু দরকার ঠিক ততটুকু রেখেছি। এই যে দেখছেন দাড়ি. একে বলে ইম্পিরিয়াল. এর উদ্দেশ্য নাকটা ব্যালান্স করা। আপনারা সাদা ধুতির ওপর ঘোর রঙের জামা পরেন—অ-ফুল। তাতে চেহারাটা টপ-হেভি দেখায়। আমার পোশাক দেখুন—প্লাম ভায়োলেট অ্যান্ড সেজ-গ্রীন. হোয়াইট স্পট্স—কলার কনট্রাস্ট অ্যান্ড হারমনি। এইবার পাছাপাড় হাফপ্যান্ট ফরমাশ দিয়েছি, তাতে ওয়েস্ট-লাইন আরও ইমপ্রুভ করবে। এই যে দেখছেন লাঠি. এতে বাঘ মারা যায়। এই যে দেখছেন পিঠের ওপর বোঁচকা. এতে পাবেন না এমন জিনিস নেই। আমি স্বাবলম্বী. স্বয়ংসিদ্ধ. বেপরোয়া।

এই পর্যন্ত বলিয়া কেষ্ট দুই পকেট হইতে দুই প্রকার সিগারেট বাহির করিল এবং যুগপৎ টানিতে টানিতে বলিল—'পারেন এ রকম? একটা ভার্জিনিয়া একটা টার্কিশ। মুখে গিয়ে ব্লেন্ড হচ্ছে।'

নকুড়-মামা চক্ষু মুদিয়া অগ্নিগর্ভ শমীবৃক্ষবৎ বসিয়া রহিলেন। তাঁহার অভ্যন্তরে বিস্ময় ও ক্রোধ ধিকিধিকি জ্বলিতেছে।

পেলব রায় বলিল—'কেষ্টবাবু. আপনি না কচি-সংসদের সভাপতি? আপনি শেষটায় এমন হলেন?'

কেষ্ট। কচি ছিলুম বটে. কিন্তু এখন পাকবার সময় হয়েছে।

আমি। নিশ্চয়ই, নইলে দরকচা মেরে যাবে। যাক ওসব কথা,—কেষ্ট, তুমি নাকি বে করবে?'

কেষ্ট। সেই পরামর্শ করতেই তো আসা। আপনিও এসেছেন, খুব ভালই হয়েছে। প্রথমে আমি প্রেম সম্বন্ধে দু-চার কথা বলতে চাই।

আমি। নকুড়-মামা, আপনি ওপরে গিয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ুন—আর ঠাণ্ডা লাগাবেন না। যা স্থির হয় পরে জানাব এখন। তার পর কেষ্ট, প্রেম কি প্রকার?—একটু চা হ'লে যে হ'ত।

পেলব হাঁকিল—'বোদা—বোদা—।' বোদা বলিল—'জু।'

বোদা কেষ্টর চাকর, নেপালী ক্ষাত্রিয়। তাহার মুখ দেখিলেই বোঝা যায় যে সে চন্দ্রবংশাবতংস। পেলব তাহাকে দশ পেয়ালা চা আনিতে বলিল।



এই কি কেষ্ট?

কেষ্ট বলিতে লাগিল—'প্রেম সম্বন্ধে লোকের অনেক বড় বড় ধারণা আছে। চণ্ডীদাস বলেছেন—নিমে দুধ দিয়া একত্র করিয়া ঐছন কানুর প্রেম। রাশিয়ান কবি ভড্‌কাউইস্কি বলেন—প্রেম একটা নিকৃষ্ট নেশা। মেট্‌স্নিকফ বলেন—প্রেমে পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, কিন্তু ঘোল আরও উপকারী। মাদাম দে সেইয়াঁ বলেন—প্রেমই নারীর একমাত্র অস্ত্র যার দ্বারা পুরুষের যথাসর্বস্ব কেড়ে নেওয়া যায়। ওমর খায়য়াম লিখেছেন—প্রেম চাঁদের শরবত, কিন্তু তাতে একটু শিরাজী মিশুতে হয়। হেনরি-দি-এইট্‌থ বলেছিলেন,—প্রেম অবিনশ্বর, একটি প্রেমপাত্রী বধ করলে পর পর আর দশটি এসে জোটে। ফ্রয়েড বলেন—প্রেম হচ্ছে পশু-ধর্মের ওপর সভ্যতার পলেস্তারা। হ্যাভেলক এলিস বলেন—'

আমি। ঢের হয়েছে। তুমি নিজে কি বল তাই শুনতে চাই।

কেষ্ট। আমি বলি—প্রেম একটা ধাপ্পাবাজি, যার দ্বারা স্ত্রী পুরুষ পরস্পরকে ঠকায়।

কচি-সংসদ্ একটা অস্ফুট আর্তনাদ করিল! হুতাশ বুকে হাত দিয়া ক্ষীণ স্বরে বলিল—'ব্যথা, ব্যথা।'

কেষ্ট বলিল—'হুতো, অমন করছিস কেন রে? বেশী সিগারেট খেয়েছিস বুঝি? আর খাস নি?'



সমগ্র কচি-সংসদ্ অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল

লালিমা পালের গলা হইতে একটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ নির্গত হইল—জাপানী ঘড়ি বাজিবার পূর্বে যে-রকম করে সেই প্রকার। তার গলাটা স্বভাবতঃ একটু শ্লেষ্মা-জড়িত। কলিকাতায় থাকিতে সে কোকিলের ডিমের সঙ্গে মকরধ্বজ মাড়িয়া খাইত, কিন্তু এখানে অনুপান অভাবে ঔষধ বন্ধ আছে। কেষ্ট তাহাকে উৎসাহিত করিয়া বলিল—'নেলো, তোর যদি প্রেম সম্বন্ধে কিছু বলবার থাকে তো বল্ না।'

লালিমা বলিল—'আমার মতে প্রেম হচ্ছে একটা—একটা—একটা—'

আমি সজেস্ট করিলাম—'ভূমিকম্প।'

কেষ্ট। এগ্‌স্যাক্টলি। প্রেম একটা ভূমিকম্প, ঝঞ্ঝাবাত, নায়াগ্রা-প্রপাত, আকস্মিক বিপদ—যাতে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়।

লালিমা আর একবার বাজিবার উপক্রম করিল, কিন্তু তার প্রতিবাদ নিষ্ফল জানিয়া অবশেষে নিরস্ত হইল।

আমি বলিলাম—'তবে তুমি বিয়ে করতে চাও কেন? কত টাকা পাবে হে?"

কেষ্ট। এক পয়সাও নেব না। আমি বিবাহ করতে চাই জগতকে একটা আদর্শ দেখাবার জন্যে। জগতে দু-রকম বিবাহ চলিত আছে। এক হচ্ছে—আগে বিবাহ, তার পরে প্রেম, যেমন সেকেলে হিন্দুর। আর এক রকম হচ্ছে—আগে প্রেম, তার পর বিবাহ, অর্থাৎ কোর্টশিপের পর বিবাহ। আমি বলি—দুই ভুল। আগে বিবাহ হ'লে পরে যদি বনিবনা না হয়, তখন কোথা থেকে প্রেম আসবে? আর—আগে প্রেম, পরে বিবাহ, এও সমান খারাপ, কারণ কোর্টশিপের সময় দু-পক্ষই প্রেমের লোভে নিজের দোষ ঢেকে রাখে। তার পর বিবাহ হ'য়ে গেলে যখন গলদ বেরিয়ে পড়ে তখন টু লেট।

আমি। ওসব তো পুরনো কথা বলছ। তুমি কি ব্যবস্থা করতে চাও তাই বল!

কেষ্ট। আমার সিস্টেম হচ্ছে—প্রেমকে একদম বাদ দিয়ে কোর্টশিপ চালাতে হবে, কারণ প্রেমের গন্ধ থাকলেই লুকোচুরি আসবে। চাই—দু-জন নির্লিপ্ত সুশিক্ষিত নরনারী, আর একজন বিচক্ষণ ভুক্তভোগী মধ্যস্থ ব্যক্তি—যিনি নানা বিষয়ে উভয় পক্ষের মতামত বেশ করে মিলিয়ে দেখবেন। আমি একটা লিস্ট করেছি। এতে আছে—বেশভূষা, আহার্য, শয্যা, পাঠ্য, কলাচর্চা, বন্ধু-নির্বাচন, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি তিরেনব্বইটি অত্যন্ত দরকারী বিষয়, যা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর হরদম মতভেদ হয়ে থাকে। প্রথমেই যদি এইসব মোকাবেলা হ'য়ে যায় এবং অধিকাংশ বিষয়ে দু-পক্ষের এক মত হয়, আর বাকী অল্পস্বল্প বিষয়ে একটা রফা করা চলে, তা হ'লে পরে গোলযোগের ভয় থাকবে না। কিন্তু খবরদার, গোড়াতেই প্রেম এসে না জোটে, তা হ'লেই সব ভণ্ডুল হবে। শেষে যত খুশি প্রেম হ'ক তাতে আপত্তি নেই। এতদিন চলছিল—কোর্টশিপ, আর আমার সিস্টেম হচ্ছে—হাইকোর্টশিপ।

আমি। কোর্ট-মার্শাল বললে আরও ঠিক হয়। সিস্টেম তো বুঝলুম, কিন্তু এমন পাত্রী কে আছে যে তোমার এই এক্সপেরিমেণ্টে রাজী হবে? তবে তুমি যে প্রেমের ভয় করছ সেটা মিথ্যে। তোমার ঐ মূর্তি দেখলে প্রেম বাপ বাপ ক'রে পালাবে।

কেষ্ট। পাত্রী আমি আজ ঠিক ক'রে এসেছি।

আমি। কে সেই হতভাগিনী?

কেষ্ট। ভুবন বোসের ভগ্নী, পদ্মমধু বোস।

আমি। আরে! আমাদের টুনি-দিদির ননদ? তাই বল। গিন্নী তা হ'লে ঠিক আন্দাজ করেছিলেন। কিন্তু শুনলুম তোমাদের বিয়ের কথা নাকি আগেই একবার হয়েছিল। এতে কেস প্রেজুডিস্‌ড হবে না?

কেষ্ট। মোটেই না। আমরা দু-পক্ষই নির্বিকার। ব্রজেন-দা, আপনাকেই মধ্যস্থ হ'তে হবে কিন্তু। আপনার লিগাল ম্যাট্রিমোনিয়াল দু-রকম অভিজ্ঞতাই আছে, ভাল ক'রে জেরা করতে পারবেন।

আমি। রাজী আছি, কিন্তু মেয়েটা আমার ওপর না চটে।

কেষ্ট। কোন ভয় নেই, পদ্ম অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ লোক।

আমি। লোকটি তো বুদ্ধিমান্, কিন্তু মেয়েটি কেমন?

কেষ্ট। মজবুত ব'লেই তো বোধ হয়। সাত মাইল হাঁটতে পারে, দু-ঘণ্টা টেনিস খেলতে পারে, মাস্কুলার ইনডেক্স খুব হাই, ফেটিগ-কোয়েফিশেণ্ট বেশ লো। সেলাই জানে, রান্না জানে, লজিক জানে, বাজে তর্ক করে না, ইকনমিক্স জানে, গান গাইবার সময় বেশী চেঁচায় না। তা হ'লে কাল সন্ধ্যেবেলা ভুবনবাবুর বাড়ি ঠিক যাবেন—লাভলক রোড, মডলিন কটেজ।

আমি প্রতিশ্রুতি দিয়া গৃহাভিমুখ হইলাম। মুন-শাইন ভিলার গেট পার হইতেই একটা কোলাহল কানে আসিল। আন্দাজে বুঝিলাম কচি-সংসদের রুদ্ধ বেদনা মুখরিত হইয়া কেষ্টকে গঞ্জনা দিতেছে। আমি আর দাঁড়াইলাম না।

সমস্ত শুনিয়া গৃহিণী মত প্রকাশ করিলেন—'রিপিং! পারসী থিয়েটারের চাইতেও ভাল। আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। যদি পাঁচ টাকা দিয়ে টিকিট কিনতে হয় তাতেও রাজী আছি।'

আমি বলিলাম—'কিন্তু তোমাকে তো শুনতে দেবে না। হাইকোর্টশিপ গোপনে হয়, ওইটুকুই সাধারণ কোর্টশিপের সঙ্গে মেলে। ঘরে থাকব শুধু আমি, কেষ্ট আর পদ্ম।'

গৃহিণী। আড়ি পাতব।

আমি। তার দরকার হবে না। সব কথাই প'রে শুনতে পাবে। আমার যে কান তাহা তোমার হউক।

গৃহিণী। যাই হ'ক আমিও যাব।

আমি। কিন্তু পরের ব্যাপারে তোমার ওরকম কৌতূহল তো ভাল নয়। ফ্রয়েড এর কি ব্যাখ্যা করেন জান?

গৃহিণী। খবর্দার, ও মুখপোড়ার নাম ক'রো না বলছি।

অগত্যা দুজনেই টুনি-দিদির বাসায় চলিলাম।

ভুবনবাবু ও টুনি-দিদি—এঁরা যেন সাংখ্যদর্শনের পুরুষ-প্রকৃতি। কর্তাটি কুঁড়ের সম্রাট, সমস্তক্ষণ ড্রেসিং গাউন পরিয়া ইজিচেয়ারে বসিয়া বই পড়েন ও চুরুট ফোঁকেন। গিন্নীটি ঠিক উলটা, অসীমশক্তিময়ী, অঘটনঘটনপটিয়সী, মাছ-কোটা হইতে গাড়ি রিজার্ভ করা পর্যন্ত সব কাজ নিজেই করিয়া থাকেন, কথা কহিবার ফুরসত নাই। তাড়াতাড়ি অভ্যর্থনা শেষ করিয়াই অতিথিসংকারের বিপুল আয়োজন করিতে রান্নাঘরে ছুটিলেন। পদ্ম আসিয়া প্রণাম করিল।

খাসা মেয়ে। কেষ্টা হতভাগা বলে কিনা মজবুত! একি হাতুড়ি না হামান-দিস্তা? কচি-সংসদের মধ্যে বাস্তবিক যদি কেউ নিরেট কচি থাকে, তবে সে কেষ্ট—যতই প্রেমের বক্তৃতা দিক। ঋষ্যশৃঙ্গের একটা শিং ছিল, কেষ্টর দুটো শিং। কিন্তু এই সুশ্রী বুদ্ধিমতী সপ্রতিভ মেয়েটি কেন এই গর্দভের খেয়ালে রাজী হইল? স্ত্রীজাতি বাঁদর-নাচ দেখিতে ভালবাসে। পদ্মর উদ্দেশ্য কি শুধু তাই? স্ত্রীচরিত্র বোঝা শক্ত। নাঃ, মনস্তত্ত্বের বইগুলা ভাল করিয়া পড়িতে হইবে।

হাইকোর্টশিপ আরম্ভ হইল। ঘরের পর্দা ভেদ করিয়া সুদূর রান্নাঘর হইতে

টুনি-দিদি ও আমার গৃহিণীর উচ্চ হাসি এবং কাটলেট-ভাজার গন্ধ আসিতেছে। আমি যথাসাধ্য গাম্ভীর্য সঞ্চয় করিয়া শুভকার্য আরম্ভ করিলাম—

'এই মকদ্দমায় বাদী, প্রতিবাদী, অনুবাদী, সংবাদী, বিসংবাদী কে কে তা এখনও স্থির হয় নি। কিন্তু সেজন্য বিচার আটকাবে না, কারণ দুই সাক্ষী হাজির,—শ্রীমান্ কেষ্ট ও শ্রীমতী পদ্ম—'

কেষ্ট বলিল—'ব্রজেন-দা, আপনি এই গুরু বিষয় নিয়ে আর তামাশা করবেন না —কাজ শুরু করুন।'

আমি। ব্যস্ত হও কেন—, আগে যথারীতি সত্যপাঠ করাই।—শ্রীমান্ কেষ্ট, তুমি শপথ ক'রে বল যে তোমার মধ্যে পূর্বরাগের কোন কমপ্লেক্স নেই। যদি থাকে তবে মকদ্দমা এখনই ডিসমিস হবে।

কেষ্ট। একদম নেই। পদ্ম যখন পাঁচ বছরের আর আমি যখন দশ বছরের, তখন ওকে যে-রকম দেখতুম এখনও ঠিক তাই দেখি। তবে আগে ওকে ঠেঙাতুম, এখন আর ঠেঙাই না।

আমি। শ্রীমতী পদ্ম, কেষ্টর প্রতি তোমার মনোভাব কি রকম তা জিজ্ঞেস ক'রে তোমার অপমান করতে চাই না। কেষ্টর মূর্তিই হচ্ছে পূর্বরাগের অ্যাণ্টি-ডোট। কেষ্ট, এইবার তোমার সেই ফিরিস্তিটা দাও। বাপ! তিরেনব্বইটা আইটেম! বেশভূষা—আহার্য—শয্যা—পাঠ্য—এ তো দেখছি পাক্কা পনর দিন লাগবে। দেখ, আজ বরঞ্চ আমি গোটাকতক বাছা বাছা প্রশ্ন করি, যদি অবস্থা আশাজনক বোধ হয় তবে কাল থেকে সিস্টেম্যাটিক টেস্ট শুরু হবে। আচ্ছা, প্রথমে আহার্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি—কারণ ওইটেই সবচেয়ে দরকারী, ফ্রয়েড যা-ই বলুন। কেষ্ট তুমি লঙ্কা খাও?

কেষ্ট। ঝাল আমার মোটেই সহ্য হয় না।

আমি। পদ্ম কি বল?

পদ্ম। লঙ্কা না হ'লে আমি খেতেই পারি না।

আমি। ব্যাড। প্রথমেই ঢেরা পড়ল। স্বামী-স্ত্রীর তো ভিন্ন হেঁশেল হ'তে পারে না। রফা করা চলে কিনা পরে স্থির করা যাবে। জলে লঙ্কা সেদ্ধ ক'রে দুজনকে খাইয়ে দেখে এমন একটা পার্সেণ্টেজ ঠিক করতে হবে যা দু-পক্ষেরই বরদাস্ত হয়। আচ্ছা—তোমরা চায়ে কে ক চামচ চিনি খাও?

কেষ্ট। এক।

পদ্ম। সাত।

আমি। ভেরি ব্যাড। আবার ঢেরা পড়ল।

কেষ্ট। আমি মেরে কেটে তিন চামচ অবধি উঠতে পারি। পদ্ম, তুমি একটু নাবো না।

আমি। খবরদার, সাক্ষী ভাঙাবার চেষ্টা ক'রো না। যা জিজ্ঞাসা করবার আমিই করব। আচ্ছা—কেষ্ট, তুমি কি-রকম বিছানা পছন্দ কর? নরম না শক্ত?

কেষ্ট। একটু শক্ত রকম, ধরুন দু-ইঞ্চি গদি। বেশী নরম হ'লে আমার ঘুমই হয় না।

পদ্ম। আমি চাই তুলতুলে।

আমি। ভেরি ভেরি ব্যাড। এই ফের ঢেরা দিলুম। আচ্ছা—কেষ্ট, পদ্মর চেহারাটা তোমার কি-রকম পছন্দ হয়?

কেষ্ট। তা মন্দ কি।

আমি সাক্ষীবিহ্বলকারী ধমক দিয়া বলিলাম—'ওসব ভাসা ভাসা জবাব চলবে না, ভাল ক'রে দেখ তার পর বল।'

পদ্ম লাল হইল। কেষ্ট অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া একটু বোকা-হাসি হাসিয়া বলিল—'খাখ্‌-খাসা চেহারা। এঃ, পদ্ম আর সে পদ্ম নেই, এক্‌কেবারে—'

আমি। বস্‌ বস্‌—বাজে কথা ব'লো না। পদ্ম, এবারে তুমি কেষ্টকে দেখে বল।

পদ্ম ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কেষ্টর প্রতি চকিত দৃষ্টি হানিয়া বলিল—'যেন একটি সঙ!'

কেষ্ট। তা—তা আমি না-হয় মাথার চুলটা এক ইঞ্চি বাড়িয়ে ফেলব, আর দাড়িটাও না-হয় ফেলে দেব। আচ্ছা, এই হাত দিয়ে দাড়িটা চেপে রাখলাম—এইবার দেখ তো পদ্ম।

পদ্ম হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।



'এইবার দেখতো'

আমি বলিলাম—'হোপলেস। আপত্তির প্রতিকার হ'তে পারে, কিন্তু বিদ্রূপের ওষুধ নেই।'

কেষ্ট একটু গরম হইয়া বলিল—'আপনিই তো যা-তা রিমার্ক ক'রে সব গুলিয়ে দিচ্ছেন।'

আমি। আচ্ছা বাপু, তুমি নিজেই না-হয় জেরা কর।

কেষ্ট প্রত্যালীঢ়পদে বসিয়া আস্তিন গুটাইয়া বলিল—'পদ্ম, এই দেখ আমার হাত। একে বলে বাইসেপ্স—এই দেখ ট্রাইসেপ্স। এইরকম জবরদস্ত গড়ন তোমার পছন্দ হয়, না ব্রজেন-দার মতন গোলগাল নাদুস-নুদুস চাও? তোমার মতামত জানতে পারলে আমি না-হয় আমার আদর্শ সম্বন্ধে ফের বিবেচনা করব।'

পদ্ম। তোমার চেহারা তুমি বুঝবে—আমার তাতে কি। আমি তো আর তোমায় দরোয়ান রাখছি না।

কেষ্ট। আচ্ছা, তোমার হাতটা দেখি একবার—কি রকম পাঞ্জার জোর—

কেষ্ট খপ করিয়া পদ্মর পদ্মহস্ত ধরিল। আমি বলিলাম—'হাঁ হাঁ—ও কি! সাক্ষীর ওপর হামলা! ওসব চলবে না—আমার ওপর যখন বিচারের ভার তখন যা করবার আমিই করব। তুমি ওই ওখানে গিয়ে বস।'

কেষ্ট অপ্রতিভ হইয়া বলিল—'বেশ তো, আপনিই ফের কোশচেন করুন।'

আমি। আর দরকার নেই। তোমাদের মোটেই মতে মিলবে না, রফা করাও চলবে না। আমি এই হুকুম লিখলুম—napoo, nothing doing। কেস এখন মুলতবী রইল। এক বৎসর নিজের নিজের মতামত বেশ ক'রে রিভাইজ কর, তার পর আবার অত্র আদালতে হাজির হইবা।

কেষ্ট এবার চটিয়া উঠিল। বলিল—'আপনি আমার সিস্টেম কিছু বুঝতে পারেন নি। আপনি যা করলেন সে কি একটা টেস্ট হ'ল?—শুধু ইয়ারকি। আপনাকে মধ্যস্থ মানাই ঝকমারি হয়েছে।'

আমিও খাপ্পা হইয়া বলিলাম—'দেখ কেষ্ট, বেশী চালাকি ক'রো না। আমি একজন উকিল, বার বৎসর প্র্যাকটিস করেছি, পনর বৎসর হ'ল বিবাহ করেছি, ঝাড়া একটি মাস সাইকলজি পড়েছি। কার সঙ্গে কার মতে মেলে তা আমার বিলক্ষণ জানা আছে। আর—তুমি তো নির্বিকার, তোমার অত রাগ কেন? দেখ দিকি, পদ্ম কেমন লক্ষ্মীমেয়ে, চুপটি ক'রে বসে আছে।'

কেষ্ট গজগজ করিতে লাগিল। এই সময় হঠাৎ ঘরের পর্দা ঠেলিয়া টুনি দিদির ছোট খুকী প্রবেশ করিল।

আমি গম্ভীর স্বরে বলিলাম—'নারী, তুমি কি চাও?'

খুকীর নারীত্বের দাবি অতি মহৎ এবং সমস্ত নারীসমাজের অনুধাবনযোগ্য। বলিল—'খাবেন চলুন, লুচি জুড়িয়ে যাচ্ছে।'

কেষ্ট কাহারও সহিত আর বাক্যালাপ করিল না, ভাল করিয়া খাইলও না। আহারান্তে আমি একাই নিজের বাসায় ফিরিলাম। গৃহিণী আজ এখানেই রাত্রি যাপন করিবেন।

পরদিন বেলা দশটার সময় গৃহিণী ফিরিয়া আসিয়া আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন। সভয়ে দেখিলাম তিনি কম্বলের ভিতরে ক্ষণে ক্ষণে নড়িয়া উঠিতেছেন এবং অস্ফুট শব্দ করিতেছেন।

বলিলাম—'ফিক ব্যথাটা আবার ধরেছে বুঝি? ডাক্তার দাসকে ডাকব?'

গৃহিণী অতি কষ্টে বলিলেন—'না, কিছু দরকার নেই, ও আপনিই সেরে যাবে। হুঃ হুঃ হিঃ।'

হিস্টিরিয়া নাকি? ও উৎপাত তো ছিল না, নিশ্চয় বেচারা কল্যকার ব্যাপারে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছে। আমার মতলব তো জানে না। মেয়েরা চায় রাতারাতি বিবাহটা স্থির হইয়া যাক। আরে অত ব্যস্ত হইলে কি চলে! কেষ্ট সবে বঁড়শি গিলিয়াছে, এখন তাকে আরও দিনকতক খেলাইতে হইবে।

বৈকালে মুন-শাইন ভিলায় যাইলাম—উদ্দেশ্য কেষ্টকে একটু ঠাণ্ডা করা। কিন্তু কেষ্টর দেখা পাইলাম না, মামাও নাই। কাঁচ-সংসদের সভ্যগণ নিজ নিজ খাটে শুইয়া আছে, ডাকিলে সাড়া দিল না। তাহাদের দৃষ্টি উদাস,—নিশ্চয় একটা বড়-রকম ব্যথা পাইয়াছে।

বোদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'বাবু কাঁহা?'

বোদার বদনচক্রে দর্শন, নিঃশ্বাস ও বাক্যনিঃসরণের জন্য যে কয়টি ছোট ছোট ছিদ্র আছে তাহা বিস্ফারিত হইল। বলিল—'বাবু বাগা।'

আঁ? কেষ্টবাবু ভাগা! কাঁহা ভাগা? নিশ্চয় ভুবনবাবুর বাড়িতে গিয়া হোগা।



'বাবু বাগ গিয়া'

'বুবনবাবু বাগ গিয়া! উনকি বিবি বাগ গিয়া। উনকি কোকী বাগ গিয়া। কোকীকা গোড়া বাগ গিয়া। গোরে-সি মিসিবাবা যো থি সো বি বাগ গিয়া।' কেষ্ট পালাইয়াছে। ভুবনবাবু, তাঁহার বিবি, তাঁহার খুকী, খুকীর ঘোড়া এবং ফরসা-মতন মিসিবাবা—অর্থাৎ পদ্ম—সকলেই পালাইয়াছে। নকুড়-মামা বোধ হয় খোঁজে বাহির হইয়াছেন। কচি-সংসদ্ কিছুই জানে না, জিজ্ঞাসা করা বৃথা।

গৃহিণীর কাণ্ড মনে পড়িল। ফিক ব্যথাও নয় হিস্টিরিয়াও নয়—শুধু হাসি চাপিবার চেষ্টা। তৎক্ষণাৎ বাসায় ফিরিলাম।

বলিলাম—'তুমিই যত নষ্টের গোড়া।'

গৃহিণী। আহা, কি আমার কাজের লোক! নিজে কিছুই করতে পারলেন না, এখন আমার দোষ।

আমি। তার পর ব্যাপারটা কি বল দিকি?

গৃহিণী প্রথমে একচোট হাসিয়া গড়াইয়া লইলেন। শেষে বলিলেন—'তুমি তো রাত সাড়ে দশটায় ফিরে গেলে। টুনি-দিদি আর আমি গল্প করতে লাগলুম—সে কত সুখ-দুঃখের কথা। রাত বারটার সময় দেখি—কেষ্ট টিপিটিপি আসছে। তার মুখ কাঁদো-কাঁদো, চাউনি পাগলের মতন। টুনি-দি বললে—কেষ্ট, কি হয়েছে? কেষ্ট বললে, পদ্মর সঙ্গে বে না হ'লে সে আর এ প্রাণ রাখবে না, তার আর তর সইছে না, হয় পদ্ম—নয় কি একটা অ্যাসিড। আমি বললুম—তার আর চিন্তা কি, অ্যাসিড ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়, আর পদ্ম তো মজুতই আছে। আগে সকাল হ'ক তারপর যা-হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে। কেষ্ট বললে—সে এক্ষুনি তার সঙের সাজ ফেলে দিয়ে ভদ্দর লোক সাজবে, কিন্তু অত লাফালাফির পর পাঁচ জনের কাছে মুখ দেখাবে কেমন করে? টুনি-দি বললে—কুছ পরোয়া নেই, কালকের মেলেই কলকাতায় পালিয়ে চল, গিয়েই বে দেব। পদ্ম বিগড়ে বসল। টুনি-দি বললে নে, নেঃ—নেকী। টুনি-দিকে জান তো, তার অসাধ্য কাজ নেই। সেই রাত্রেই মশাই মোট বাঁধা হ'য়ে গেল—এক-শ তেষট্টিটা লাগেজ। তারপর আজ সকালে তাদের ট্রেনে তুলে দিয়ে এখানে চ'লে এলুম।'

বিবাহের পর দেড় মাস কেষ্ট আমার সঙ্গে লজ্জায় দেখা করে নাই,—সবে কাল আসিয়া ক্ষমা চাহিয়া গিয়াছে। আমি তাহাকে সর্বান্তঃকরণে মার্জনা করিয়াছি এবং মনস্তত্ত্ব হইতে নজির দেখাইয়া বুঝাইয়া দিয়াছি যে তাহার লজ্জিত হইবার কোনও কারণ নাই। কেষ্টর মনের আড়ালে যে আর একটা উপমন এতদিন ছাই-চাপা ছিল তাহারই ভূমিকম্পের ফলে সে বাঁদর নাচিয়াছে।

কচি-সংসদ্ ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। কেষ্ট আবার একটা নূতন ক্লাব স্থাপন করিয়াছে—হৈহয় সংঘ। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হৈহয় ক্ষত্রিয়গণের সঙ্গে ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই। ইহার মেম্বার—সস্ত্রীক আমি ও কেষ্ট। এই বড়দিনের বন্ধে আমরা হাওড়া হইতে পেশাওআর পর্যন্ত হইহই করিতে যাইব।



উলটপুরাণ

রিচমন্ড বঙ্গ-ইঙ্গীয় পাঠশালা। মিস্টার ক্র্যাম (পণ্ডিত মহাশয়)
এবং ডিক টম হ্যারি প্রভৃতি বালকগণ

ক্র্যাম। চটপট নাও, চারটে বাজে। ডিক, ইতিহাসের শেষটুকু প'ড়ে ফেল।

ডিক। 'ইওরোপের দুঃখের দিন অবসান হইয়াছে। জাতিতে জাতিতে দ্বেষ হিংসা বিবাদ দূর হইয়াছে। প্রবলপরাক্রান্ত ভারত-সরকারের দোর্দণ্ডশাসনের সুশীতল ছায়ায়'—দোর্দণ্ড মানে কি পণ্ডিত মশায়?

ক্র্যাম। দোর্দণ্ড জান না? The big rod. Under the soothing influence of the big rod.

ডিক। 'সুশীতল ছায়ায় আশ্রয়লাভ করিয়া সমস্ত ইওরোপ ধন্য হইয়াছে। আয়ারল্যাণ্ড হইতে রাশিয়া, ল্যাপল্যাণ্ড হইতে সিসিলি, সর্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছে। ফ্রান্স এখন আর জার্মানির গলা কাটিতে চায় না, ইংলণ্ড আর জাতিতে জাতিতে বিবাদ বাধাইতে পারে না, অস্ট্রিয়া ও ইটালিতে আর মেতিপুকুরের দখল লইয়া মারামারি করে না।' মেতিপুকুর কোন্‌টা পণ্ডিতমশায়?

ক্র্যাম। ঐ সামনে মানচিত্র রয়েছে দেখ না। ইটালির কাছে যে সমুদ্র সেইটে। সেকালে নাম ছিল মেডিটেরেনিয়ান। ইণ্ডিয়ানরা উচ্চারণ ক'রতে পারে না ব'লে নাম দিয়েছে মেতিপুকুর। সেইরকম আল্‌স্টারকে বলে বেলেস্তারা, সুইট্‌সারলাণ্ডকে বলে ছছুরাবাদ, বোর্দোকে বলে ভাঁটিখানা, ম্যাঞ্চেস্টারকে বলে নিম্‌তে। তার পর প'ড়ে যাও।

ডিক। 'ইওরোপীয়গণের শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি হইতেছে। তাহাদের লোভ কমিয়াছে, অসভ্য বিলাসিতা দূর হইতেছে, ইহকালের উপর আস্থা কমিয়া গিয়াছে, পরকালের উপর নির্ভরতা বাড়িতেছে। ভারত-সন্তানগণ সাত-সমুদ্র তের নদী পার হইয়া এই পাণ্ডববর্জিতদেশে আসিয়া নিঃস্বার্থভাবে শান্তি শৃঙ্খলা ও সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করিতেছেন।' আচ্ছা পণ্ডিতমশায়, এসব কি সত্যি?

ক্র্যাম। ছাপার অক্ষরে যখন লিখেছে আর সরকারের হুকুমে যখন পড়াতে হচ্ছে তখন সত্যি বইকি।

ডিক। কিন্তু বাবা বলেন সব bosh।

ক্র্যাম। তোমার বাবার আর বলতে বাধা কি। তিনি হলেন উকিল, আমার মতন তো আর সরকারের মাইনেয় নির্ভর করতে হয় না।

ডিক। 'হে সুবোধ ইংরেজশিশুগণ, তোমরা সর্বদা মনে রাখিও যে ভারত সরকার তোমাদের দেশের অশেষ উপকার করিয়াছেন। তোমরা বড় হইয়া যাহাতে শান্ত বাধ্য রাজভক্ত প্রজা হইতে পার তাহার জন্য এখন হইতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাও।'

টম। বু—হু হু হু—

ক্র্যাম। ও কি রে, শীত করছে বুঝি? আবার তুই ধুতি-পাঞ্জাবি প'রে এসেছিস! বাঙালীর নকল করতে গিয়ে শেষে দেখছি নিউমোনিয়ায় মরবি।

টম। বাবার হুকুম পণ্ডিত মশায়। আজ পাঠশালের ফেরত খাঁসাহেব গবসন টৌডির পার্টিতে যেতে হবে। তিনি নতুন খেতাব পেয়েছেন কিনা। সেখানে বিস্তর ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক আসবেন, তাই বাবা বললেন, দেশী পোশাক পরা চলবে না।

ক্র্যাম। তা বাঙালী সাজতে গেলি কেন? ইজের-চাপকান পরলেই পারতিস।

টম। আজ্ঞে, বাবা বললেন, বাঙালীই সবচেয়ে সভ্য তাই—ব্রর্ র্ র্—

ক্র্যাম। যা যা শীগ্‌গির বাড়ি যা, অন্তত একটা শাল মুড়ি দিগে যা। ও কি, হোঁচট খেলি নাকি?

হ্যারি। দেখুন দেখুন, টম কি রকম কাছা দিয়েছে, যেন স্কিপিং রোপ!

ধর্মযাজকগণের মুখপত্র 'দি কিংডম কাম'
হইতে উদ্ধৃত।

সর্বনাশের আয়োজন হইতেছে। ভারতসরকার আমাদের ধনপ্রাণ হস্তগত করিয়াছেন—আমরা নিরীহ ধর্মযাজক-সম্প্রদায় তাহাতে কোনও উচ্চবাচ্য করি নাই, কারণ ইহলোকের পাঁউরুটি ও মাছের উপর আমাদের লোভ নাই এবং সীজারের প্রাপ্য সীজারকে দেওয়াই শাস্ত্রসম্মত। কিন্তু আজ এ কি শুনিতেছি? আমাদের ধর্মের উপর হস্তারোপ! ঘোড়দৌড় বন্ধ করার জন্য আইন হইতেছে। অ্যাসকট, এপসম প্রভৃতি মহাতীর্থ কি শেষে শ্মশানে পরিণত হইবে? বিশপ স্টোনিব্রোক নাকি গভর্নমেন্টকে জানাইয়াছেন যে ধর্মশাস্ত্রে ঘোড়দৌড়ের উল্লেখ নাই, অতএব রেস বন্ধ করিলে খ্রীষ্টীয় ধর্মের হানি হইবে না। হা, একজন ধর্মযাজকের মুখে এই কথা শুনিতে হইল! বিশপ কি জানেন না যে, রেস খেলা ব্রিটিশ-জাতির সনাতন ধর্ম এবং লোকাচার বাইবেলেরও উপর? আরও ভয়ানক সংবাদ—শীঘ্রই নাকি মদ্যপান রোধ করার উদ্দেশ্যে আইন হইবে। আমাদের শাস্ত্রসম্মত সনাতন পানীয় বন্ধ করিয়া ভারতসরকার কি ভারতীয় চায়ের কাটতি বাড়াইতে চান?

'রাষ্ট্রবিৎ'—যাহার সঙ্গে সংযুক্ত আছে 'ইঙ্গবন্ধু'
হইতে উদ্ধৃত

আমরা খাঁসাহেব গবসন টৌডিকে সাদরে অভিনন্দন করিতেছি। তিনি অতি উপযুক্ত ব্যক্তি, তাঁহাকে উচ্চ সম্মানে ভূষিত দেখিয়া আমরা প্রকৃতই আনন্দিত হইয়াছি। দেশী লোকের ভাগ্যে এত বড় উপাধি এই প্রথম মিলিল। আমরা কিন্তু সরকারকে সাবধান করিতেছি—এই সকল উচ্চ উপাধি যেন বেশী সস্তা করা না হয়, তাহা হইলে ভারতীয় রায়সাহেব খাঁবাহাদুর প্রভৃতি ক্ষুণ্ণ হইবেন এবং তাহাতে ইওরোপের উন্নতি পিছাইয়া যাইবে। নাইট, ব্যারন, মার্কুইস, ডিউক প্রভৃতি দেশী উপাধিই সাহেবদের পক্ষে যথেষ্ট। যাহা হউক, মিস্টার টৌডি যখন নিতান্তই খাঁসাহেব টৌডি হইয়া

গিয়াছেন, তখন তাঁহার অতি সন্তর্পণে সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া চলা উচিত। আশা করি, তিনি রাজদ্রোহী লিবার্টি-লীগের ছায়া মাড়াইবেন না।

গবসন টোডির অন্দরমহল। মিসেস টোডি, তাঁহার দুই কন্যা
ফ্লফি ও ফ্ল্যাপি এবং তাহাদের শিক্ষয়িত্রী জোছনা-দি

জোছনা। ফ্ল্যাপি, তোমায় নিয়ে আর পেরে উঠি নে বাছা। ওই রকম ক'রে বুঝি চুল বাঁধে? আহা কি ছিরিই হয়েছে! কান দুটো যে সবটাই বেরিয়ে রয়েছে। এতখানি বয়স হ'ল কিছুই শিখলে না। দেখ দিকি, তোমার দিদি কি সুন্দর খোঁপা বেঁধেছে!

ফ্ল্যাপি। Let her। কানের ওপর চুল পড়লে আমি কিছু শুনতে পাই না। আমি ঘাড় ছাঁটবো, ও-বাড়ির মিস ল্যাংকি গর্সালিং-এর মতন।

জোছনা। হ্যাঁ ঘাড় ছাঁটবে, নাড়া হবে, ভুরু কামাবে, রূপ একেবারে উথলে উঠবে। দেখাবে যেন হাড়গিলেটি। পড়তে শাশুড়ীর পাল্লায়—

ফ্ল্যাপি।

Little Pussy Friskers
Shaved off her whiskers ;
And sharpening her paw
Scratched her mum-in-law.

জোছনা। কি বেহায়া মেয়ে। মিসেস টোডি, আপনার ছোট মেয়েকে দুরস্ত করা আমার সাধ্য নয়।

মিসেস টোডি। ছি ফ্ল্যাপি, তুমি দিন দিন ভারী বেয়াড়া হচ্ছ। জোছনা-দি তোমাদের শিক্ষার জন্য কত মেহনত করেন তা বোঝ?

ফ্ল্যাপি। আমি শিখতে চাই না। উনি ফ্লফিকে শেখান না।

জোছনা। আবার 'ফ্লফি'! দিদি বলতে কি হয়? অ্যাঁ ও কি—ফের তুমি পেনসিল চুষছ! ছি ছি, কি নোংরা! আচ্ছা, এখন তুমি ও-ঘরে গিয়ে সেই উর্দু গজলটা অভ্যাস কর।

মিসেস টোডি। জোছনা-দি, আপনার ডিবে থেকে একটা পান নেব? থ্যাংক ইউ।

জোছনা। দেখুন মিসেস টোডি, কথায় কথায় থ্যাংক ইউ—প্লীজ—সরি এগুলো বলবেন না। ভারী বদ অভ্যাস এর জন্যেই আপনাদের জাতের উন্নতি হচ্ছে না। ওরকম তুচ্ছ কারণে কৃতজ্ঞতা বা দুঃখ জানানো আমরা ভণ্ডামি ব'লে মনে করি। নিন একটু দোক্তা খান।

মিসেস টোডি। নো, থ্যাংক্স,—থুড়ি। দোক্তা খেলেই আমার মাথা ঘোরে। বরং একটা সিগারেট খাই।

জোছনা। মেয়েদের সিগারেট খাওয়া অত্যন্ত খারাপ। আপনি একটু চেষ্টা ক'রে দোক্তা ধরুন।

মিসেস টোডি। কিন্তু দু-ই তো হল তামাক?

জোছনা। তা বললে কি হয়। একটা হ'ল ধোঁয়া আর একটা হ'ল ছিবড়ে। ধোঁয়া পুরুষের জন্যে, আর ছিবড়ে মেয়েদের জন্যে। ফ্লফি, তোমার সেই বাংলা উপন্যাসখানা শেষ হয়েছে?

ফ্লফি। বড় শক্ত, মোটেই বুঝতে পারছি না।

জোছনা। বোঝবার বিশেষ দরকার নেই, কেবল বাছা বাছা জায়গা মুখস্থ ক'রে ফেলবে। লোককে জানানো চাই যে বাংলা ভাল ভাল বইএর সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে। কিন্তু তোমার উচ্চারণটা বড় খারাপ। সভ্যসমাজে মিশতে গেলে চোস্ত বাংলা উচ্চারণ আগে দরকার, আর গোটাকতক উর্দু গান। আচ্ছা, তুমি বাংলায় এক দুই তিন চার ব'লে যাও দিকি।

ফ্লফি। এক দুই তিন শাড়—

জোছনা। শাড় নয়, চার।

ফ্লফি। চার পাইচ—

জোছনা। পাইচ নয়, পাঁচ।

ফ্লফি। পাঁইশ—

জোছনা। পাঁ—চ।

ফ্লফি। ফ্যাঁচ—

জোছনা। মাটি করলে। মিসেস টোডি, ফ্লফিকে বেশী চকোলেট খেতে দেবেন না, ছোলাভাজার ব্যবস্থা করুন, নইলে জিবের জড়তা ভাঙবে না। দেখ ফ্লফি, আর এক কাজ কর। বার বার আওড়াও দিকি—রিশড়ের আড়পার খড়দার ডান ধার—ছাঁদনাতলায় হোঁতকা হোঁদল।

নেপথ্যে গবসন টোডি। ডিয়ারি—

মিসেস টোডি। কু! কোথায় তুমি?

গবসন টোডি। বাথরুমে। আরও গোটাকতক আম দিয়ে যাও।

জোছনা। বাথরুমে আম?

মিসেস টোডি। তা ভিন্ন আর উপায় কি। গবি বলে, আম যদি খেতে হয় তবে ভারতীয় পদ্ধতিতেই খাওয়া উচিত। অথচ আপনাদের মতন হাত দুরস্ত নয়,—পোশাক কার্পেট টেবিল-ক্লথে রস ফেলে একাকার করে। তাই গবিকে বলেছি বাথরুমে গিয়ে আম খাওয়া অভ্যাস করতে। সেখানে দু-হাতে আঁটি ধ'রে চুষছে আর চোয়াল ব'য়ে রস গড়াচ্ছে। Horrid!

জোছনা। ঠিক ব্যবস্থাই করেছেন। দেখুন মিসেস টোডি, আপনি যে স্বামীকে 'গবি' বলছেন, ওটা সভ্যতার বিরুদ্ধে। আড়ালে গবি হাবি যা খুশি বলুন, কিন্তু অপরের কাছে নাম করবেন না। দরকার হ'লে বলবেন—'উনি'। আর যদি অতটা খাতির না করতে চান, তবে বলবেন—'ও'।

মিসেস টোডি। তাই নাকি? আচ্ছা, আপনি বসুন একটু। আমি ওকে আম দিয়ে আসছি।

'রাষ্ট্রবিৎ'-এর বিজ্ঞাপনস্তম্ভ হইতে।

বিশুদ্ধ আনন্দনাড়ু। চর্বিমিশ্রিত ইংরেজী বিস্কুট খাইয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিবেন না। আমাদের আনন্দনাড়ু খান। দাঁত শক্ত হইবে। কেবল চালের গুঁড়া ও গুড়। যন্ত্রদ্বারা স্পর্শিত নহে। বাঙালী মেয়ের নিজ হাতে গড়া। এক ঠোঙা পাঁচ শিলিং। সর্বত্র পাওয়া যায়। নির্মাতা—রসময় দাস, টিকটিকি বাজার, কলিকাতা।

অম্বুরী বরুণ। মেমগণের দুঃখ এইবার দূর হইল। এই আশ্চর্য গুঁড়া মুখে মাখিলে ফ্যাকাশে রং দূর হইয়া ঠিক বাঙালী মেয়ের মতো রং হইবে। যদি আর

একটু বেশী ঘোর করিতে চান, তবে ইহার সঙ্গে একটু বের্দিগ্রীন মিশাইয়া লইবেন। রামচন্দ্রজী উহা মাখিতেন। দাম প্রতি পুরিয়া পাঁচ শিলিং। বিক্রেতা—শেখ অজহর লেডেনহল স্ট্রীট, ইণ্ডিয়া হাউস, লণ্ডন।

'দি লণ্ডন ফগ' হইতে উদ্ধৃত

আগামী আশ্বিন মাসে এই লণ্ডন নগরে বিরাট রাজসূয় যজ্ঞ বসিবে। স্বয়ং মহাক্ষত্রপ ভারতসরকারের প্রতিনিধিরূপে এই যজ্ঞের যজমান হইবেন। হোতা, ঋত্বিক মোল্লা, মওলানা প্রভৃতি ভারত হইতে আসিবেন। দুই মাস ব্যাপিয়া দীয়তাং ভুজ্যতাং চলিবে, খরচ জোগাইবে অবশ্য এই গরীব ইওরোপবাসী।

সমস্ত ইওরোপের শোষণকার্য অবিরাম গতিতে চলিতেছে, কিন্তু তাহাতেও তৃপ্তি নাই। ভারতমাতা তাঁহার খরজিহ্বা লকলক করিয়া বলিতেছেন—হে সপ্তদ্বীপপুত্রগণ, আনন্দ কর, আর একবার ভাল করিয়া তোমাদের হাড় চাটিব।

ঠিক ঐ সময়েই হাগ-নগরে প্যান-ইওরোপিয়ান লিবার্টি-লীগের অধিবেশন হইবে। হে ব্রিটন, জন-অ-গ্রোট্‌স হইতে ল্যাণ্ডস্‌-এণ্ড পর্যন্ত যে যেখানে আছ, দলে দলে সর্বরাষ্ট্রীয় মহাসম্মেলনে যোগ দাও। যদি তোমার বিন্দুমাত্র আত্মসম্মান থাকে তবে রাজসূয় যজ্ঞের ত্রিসীমায় যাইও না। একবার ভাবিয়া দেখ তোমার এই মেরি ইংল্যাণ্ড —যেখানে একদা দুগ্ধ ও মধুর স্রোত বহিত—তাহার কি দশা হইয়াছে। অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, বীফ নাই, মাখন নাই, পনির নাই—এইবার বিয়ারও বন্ধ হইবে। বিদেশ হইতে গম আসে তবে তোমার রুটি প্রস্তুত হয়। তোমার ভেড়ার লোম ছাঁটামাত্রই পঞ্জাবে যাইতেছে এবং তথা হইতে বনাত কম্বলরূপে ফিরিয়া আসিয়া তোমার অঙ্গে উঠিতেছে। ভারতের কার্পাসবস্ত্র তোমার বিখ্যাত লিনেন শিল্প নষ্ট করিয়াছে। হায়, তুমি কাহার বসন পরিয়াছ? তোমার নগ্নতা ঘুচিয়াছে কিন্তু লজ্জা ঢাকে নাই, শীত নিবারিত হইয়াছে কিন্তু তুমি অন্তরে অন্তরে কাঁপিতেছ। তোমার ভাল ভাল গো-বংশ ভারতে নির্বাসিত হইয়াছে, সেখানকার হিন্দু-মুসলমান ক্ষীর-ছানা ঘি খাইয়া নির্দ্বন্দ্বে মোটা হইতেছে। বিয়ার হুইস্কির আস্বাদ তুমি ভুলিয়া যাইতেছ, ভারতের গাঁজা আফিম তোমার মস্তিষ্কে শনৈঃ শনৈঃ প্রভাব বিস্তার করিতেছে। তোমার সর্বনাশের উপরে ভারত তাহার ভোগবিলাসের বিরাট মন্দির খাড়া করিয়াছে। তুমি ডিসেম্বরের শীতে পর্যাপ্ত কয়লার অভাবে হিহি করিয়া শিহরিতেছ, ওদিকে তোমারই অর্থে শেভিয়ট হিলে লক্ষ লক্ষ টন কয়লা পুড়াইয়া কৃত্রিম আগ্নেয়গিরি সৃষ্টি করা হইয়াছে; কারণ, ভারতীয় আমলাগণ শীতকালে সেখানে অপিস করিবেন —লণ্ডনের শীত তাঁহাদের বরদাস্ত হয় না।

হে বহুধাবিভক্ত আত্মকলহপরায়ণ ইওরোপীয়গণ, এখনও কি তোমরা তুচ্ছ সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ত্যাগ করিবে না? এখনও কি অ্যাংলো-সেল্টিক দ্বন্দ্ব, ফ্রাঙ্কো-জার্মান দ্বন্দ্ব, ধনিক-শ্রমিকের দ্বন্দ্ব, স্ত্রী-পুরুষের দ্বন্দ্ব বন্ধ হইবে না?

হাইড পার্ক। বক্তা—সার ট্রিক্‌সি টার্নকোট।
শ্রোতা—তিন চার হাজার লোক।

টার্নকোট। মাই কান্ট্রিমেন, তোমরা আজ আমাকে যে দু-চার কথা বলবার সুযোগ দিয়েছ তার জন্য বহু ধন্যবাদ। তোমাদের কি বলে সম্বোধন করব খুঁজে পাচ্ছি না,

কারণ আমার হৃদয় পূর্ণ হয়েছে। হে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠদেশবাসী ভগবানের নির্বাচিত মানবগণ, হে ব্রিটন-স্যাকসন-ডেন-নর্মান বংশোদ্ভব ইংরেজ জাতি—।

ম্যাক্‌ডুড্‌ল। ইংরেজ নয়, বলুন ব্রিটিশ জাতি। স্কচরা কি ভেসে এসেছে নাকি?

টার্ন্‌কোট। আচ্ছা, আচ্ছা। হে ব্রিটিশ জাতি, একবার তোমাদের সেই প্রাচীন ইতিহাস স্মরণ কর। হে হেস্টিংস-ক্রেসি-এজিনকোর্টের বীরগণ, যাদের বিজয়পতাকা একদিন ইংলান্ড, স্কটলান্ড, আয়ারলান্ড, ফ্রান্সে—

ম্যাক্‌ডুড্‌ল। মিথ্যে কথা। স্কটলান্ডে তোমাদের বিজয়পতাকা কোনও কালে ওড়ে নি।

টার্ন্‌কোট। আচ্ছা, আচ্ছা, স্কটলান্ড বাদ দিলুম। যাদের বিজয়পতাকা একদিন আয়ারলান্ড ফ্রান্সে—

ও' হুলিগান। Oireland ! Say it again !

টার্ন্‌কোট। আচ্ছা, আচ্ছা। বিজয়পতাকা কোথাও ওড়ে নি। হে ইংলিশ-স্কচ-আইরিশ-মিশ্রিত-ব্রিটিশ জাতি—

ও' হুলিগান। Begorrah ! আমরা ব্রিটিশ নই,—সেলটিক।

টার্ন্‌কোট। আচ্ছা, আচ্ছা। হে ব্রিটিশ ও সেলটিক ভাইসকল আজ তোমরা কেন সমবেত হয়েছ?

ও' হুলিগান। Sure, Oi don't know।

টার্ন্‌কোট। কেন এখানে সমবেত হয়েছ তাও কি ব'লে দিতে হবে? হে হতভাগ্যগণ, তোমাদের এই পৈতৃক দেশের বুকের ওপর কোন্‌ অনুষ্ঠানের আয়োজন হচ্ছে তার খবর রাখ? রাজসূয় যজ্ঞ। ভারতসরকার মহা আড়ম্বর ক'রে তাঁর ঐশ্বর্য এবং পরাক্রমের পসরা খুলে বসবেন, আর সমস্ত ইওরোপের গণ্যমান্য ব্যক্তি এসে মহাক্ষত্রপকে কুর্নিশ ক'রে বলবেন—ভারতসরকার কি জয়! এই আউট্‌ লান্ডিশ কান্ড এই স্যাক্রিলেজ—

(লর্ড ব্লার্নির বেগে প্রবেশ)

লর্ড ব্লার্নি জনান্তিকে। আরে তুমি কি বলছ সার ট্রিক্‌সি! নিজের সর্বনাশ করছ? আমি কত ক'রে ক্ষত্রপকে ব'লে-ক'য়ে এসেছি যেন Chiltren Hundreds-এর দেওয়ানিটা তোমাকেই দেওয়া হয়। কি আরামের চাকরি, একেবারে sine cure। ক্ষত্রপের ইচ্ছে চাকরিটা টোডিকে দেন, কিন্তু আমার একান্ত মিনতি শুনে বলেছেন বিবেচনা করে দেখবেন। এখনই খবর আসবে, আর এদিকে তুমি রাজদ্রোহ প্রচার করছ!

টার্ন্‌কোট। বটে বটে? আচ্ছা, আমি সামলে নিচ্ছি।

জনতা হইতে। Go on Tricksy, go on।

টার্ন্‌কোট। হ্যাঁ, তার পর কি বলছিলুম—হে আমার দেশবাসিগণ, এই ঘোর দুর্দিনে তোমাদের কর্তব্য কি? তোমরা কি এই যজ্ঞে এই বিরাট তামাশায় যোগ দেবে?

জনতা হইতে। Never, never।

বিল স্নুক্‌স। Say guv'nor will they stand treat? মদ ক পিপে আসবে?

টার্ন্‌কোট। এক ফোঁটাও নয়। কেবল বাতাসা বিলি হবে। হে বন্ধুগণ, এই মহাযজ্ঞে তোমাদের স্থান কোথায়?

লর্ড ব্লার্নি। আঃ, কি বলছ টার্ন্‌কোট!

টার্ন্‌কোট। ঘাবড়ান কেন, শুনুন না। হে বন্ধুগণ, এই বিরাট যজ্ঞে কি তোমরা যাবে?

জনতা হইতে। বরং শয়তানের কাছে যাব।

টার্ন্‌কোট। না, না, সেটা ভালো দেখাবে না। তোমাদের যেতেই হবে—না গিয়ে উপায় নেই, কারণ ভারতসরকার স্বয়ং তোমাদের আহ্বান করেছেন।

লর্ড ব্লার্নি। হিয়ার, হিয়ার।

জনতা হইতে। মিয়াও, মিয়াও।

টার্ন্‌কোট। দোহাই তোমরা আমাকে ভুল বুঝো না। মনে রেখো ভারতের সহানুভূতি না পেলে আমাদের গতি নেই—আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে সরকারের দয়ার উপর—(পচা ডিম)—এঃ, চোখটা খুব বেঁচে গেছে। হে বন্ধুগণ, আমি কর্তব্য-পালনে ভয় খাই না, যা সত্য ব'লে বিশ্বাস করি তাই অকপটে বলব।

লর্ড ব্লার্নি। বাঃ, ঠিক হচ্ছে। ঐ যে টেলিগ্রাম নিয়ে আসছে। ব্রেভো সার ট্রিক্‌সি, নিশ্চয় ক্ষত্রপ তোমাকেই মনোনীত করেছেন। আমি প'ড়ে দেখছি, তুমি থেমো না, বক্তৃতা চলুক।

টার্ন্‌কোট। হে ভাই-সকল, আমি যা বলছি তা তোমাদেরই মঙ্গলের জন্য। এতে আমার নিজের কোনও স্বার্থ নেই।—ব্লার্নি, খবর কি হে?—হে প্রিয় বন্ধুগণ, দেশের মঙ্গলের জন্য আমি সকল রকম লাঞ্ছনা ভোগ করতে প্রস্তুত। তোমাদের ঐ বেরালডাক আমারই জয়ধ্বনি। তোমাদের এই পচা ডিম আমি মাথা পেতে নিলুম। যদি তোমাদের তূণীরে আরও কিছু নিগ্রহের অস্ত্র থাকে—(বাঁধাকপি)—নাঃ, আর পারা যায় না। ব্লার্নি বল না হে, কি লিখেছে?

ব্লার্নি। পুওর ট্রিক্‌সি! শেষটায় টোডি ব্যাটাই চাকরি পেলে। নেভার মাইণ্ড, তুমি হতাশ হয়ো না। আবার একটা সুবিধা পেলেই তোমার জন্য চেষ্টা করব। ক্ষত্রপটা অতি গাধা। এটা বুঝলে না যে টোডি তো পোষ মেনেই আছে। আর তুমি হ'লে এত বড় একটা ডিমাগগ—তোমাকে হাত করবার এমন সুযোগটা ছেড়ে দিলে! ছি ছি!

টার্ন্‌কোট। ড্যাম টোডি অ্যাণ্ড ড্যাম ক্ষত্রপ। হে আমার স্বদেশবাসিগণ—

জনতা হইতে। Shut up! kick him—lynch the traitor!

টার্ন্‌কোট। না, না, আগে আমাকে বলতেই দাও। এই রাজসূয় যজ্ঞে তোমাদের যেতেই হবে। কেন যেতে হবে? বাতাসা খেতে? সেলাম করতে? ভারতসরকারের জয়জয়কার করতে? নেভার। সেখানে যাবে যজ্ঞ পণ্ড করতে, লণ্ডভণ্ড করতে—ভারতসরকার যেন বুঝতে পারে যে তামাশা দেখিয়ে আর বাতাসা খাইয়ে তোমাদের আর ভুলিয়ে রাখা যাবে না।

জনতা হইতে। Long live Tricksy! Turncoat for ever!

নারীজাতির মুখপত্র 'দি শিম্যান' হইতে উদ্ধৃত।

কাল বৈকালে ঠিক তিনটার সময় নিখিল-ব্রিটিশ-নারী-বাহিনীর শোভাযাত্রা বাহির হইবে। রিজেণ্ট পার্ক হইতে আরম্ভ করিয়া পোর্টল্যাণ্ড প্লেস, রিজেণ্ট স্ট্রীট,

পিকাডিলি সার্কাস, ট্রাফালগার স্কোয়ার হইয়া এই বিরাট প্রসেশন পার্লিমেন্ট হাউসে পেৌঁছিবে।

হাজার হাজার বৎসর হইতে পুরুষজাতি নারীর উপর কর্তৃত্ব করিয়া আসিতেছে, কিন্তু আর তাহাদের চালাকি চলিবে না। আমরা সবলে নিজের প্রাপ্য আদায় করিয়া লইব। আমরা ভোটের অধিকার যাহা পাইয়াছি তাহা একেবারে ভুয়া। জুয়াচোর পুরুষগণ ছলে বলে কৌশলে ভোট যোগাড় করিয়া রাষ্ট্রীয়-পরিষৎ প্রায় একচেটে করিয়াছে। এ ব্যবস্থা চলিবে না। ব্রিটেনের লোকসংখ্যার শতকরা ষাটজন নারী। আমরা এই অনুপাতেই নারীসদস্য চাই। সরকারী চাকরিতেও আমরা শতকরা ষাটজন নারী চাই। পুরুষের চেয়ে কিসে আমরা কম? আমরা ডিভাইডেড স্কার্ট পরি, ঘাড় ছাঁটি, সিগারেট খাই, ককটেল টানি। এর পর দরকার হয় তো মুখে কবিরাজি কেশ-তৈল মাখিয়া গোঁফ-দাড়ি গজাইব। পুরুষের সহিত কোনও কারবার রাখিব না, কারণ ওরূপ কুটিল স্বার্থপর জাতি পৃথিবীতে আর নাই। তারা মনে করে এই জগতটা পুরুষের জন্যই সৃষ্টি হইয়াছে। তাদের ভগবান পর্যন্ত পুংলিঙ্গ। আমরা হি-গড মানিব না। আইসিস, ডায়না, কালী অথবা শূর্পণখা—এঁদের দ্বারাই আমাদের কাজ চলিবে।

হে নারী, তুমি আর অবলা সরলা niminy piminy গৃহিণী নহ। তুমি দাঁত নখ শানাইয়া এস, ভয়ংকরী মূর্তিতে এই মহাবাহিনীতে যোগ দিয়া পার্লিমেণ্ট আক্রমণ কর। অকর্মণ্য পুরুষদের তাড়াইয়া দিয়া সরকারের নিকট হইতে আপন অধিকার আদায় করিয়া লও।

পুরুষজাতির মুখপাত্র 'দি মিয়ার ম্যান' হইতে উদ্ধৃত।

সরকার কি নাকে সরিষার তেল দিয়া ঘুমাইতেছেন? কাল এই লণ্ডন শহরের উপর যে পৈশাচিক কাণ্ড হইয়া গেল তাহাতে বোধ হয় যেন দেশে অরাজকতা উপস্থিত। দুর্বৃত্তা নারীগণ প্রকাশ্য দিবালোকে বিষম অত্যাচার করিয়াছে, দোকান-পাট ভাঙিয়া তছনছ করিয়াছে, নিরীহ পুরুষগণকে খামচাইয়া কামড়াইয়া জর্জরিত করিয়াছে, কিন্তু সরকারের পেয়ারের উড়িয়া-পুলিস তখন কি করিতেছিল? তারা একগাল পান মুখে পুরিয়া দন্ত বিকাশ করিয়া হাসিতেছিল এবং নারীগুণ্ডাগণকে অধিকতর ক্ষিপ্ত করিবার জন্য হাততালি দিয়া বলিতেছিল—'হী—হ-হ-হ-হ-।' খাঁসাহেব গবসন টোডি, স্যার ট্রিক্সি টার্নকোট প্রভৃতি মাননীয় দেশনেতৃগণ দাঙ্গানিবারণের উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন, কিন্তু উড়িয়া সার্জেণ্টরা তাঁদের অপমান করিয়া বলিয়াছে—'এ সাহেবঅ, ওপাকে যিব তো ডণ্ডা খিব।'

সরকার নিশ্চয় এই ব্যাপারে মনে মনে খুশী হইয়াছেন, কারণ দেশে আত্মকলহ যত হয় ততই সরকারের বলিবার ছুতা হয় যে আমরা স্বায়ত্তশাসনের অযোগ্য।

'রাষ্ট্রবিৎ' হইতে উদ্ধৃত।

ইংরেজগণের মধ্যে যদি কেহ বুদ্ধিমান থাকেন তবে এইবার বুঝিবেন যে তাঁহাদের স্বাধীনতার আশা সুদূরপরাহত। লিবার্টি লীগ, অ্যাংলো-সেল্টিক ইউনিয়ন, হেটেরো-সেক্সুয়াল প্যাক্ট—এ সব শুনিতে বেশ। কিন্তু এই ঠাণ্ডা দেশের রক্ত যখন দ্বেষ-হিংসায় গরম হইয়া উঠে তখন আর তত্ত্বকথায় চলে না। যখন দাঙ্গা বাধে তখন এক-মাত্র ভরসা ভারতসরকারের দণ্ডনীতি এবং দুর্দান্ত উড়িয়া-পুলিস।

কেবলই শুনিতে পাই—স্বায়ত্তশাসনে ব্রিটিশ জাতির জন্মগত অধিকার। কিন্তু হে ব্রিটন, তোমাদের ইতিহাস কি সাক্ষ্য দেয়? স্বাধীনতা কাকে বলে তোমরা কখনই জানিতে না। প্রথমে রোমানগণের, তারপর অ্যাঙ্গল, স্যাক্সন, ডেন, নরম্যান প্রভৃতি দস্যুজাতির অধীনতায় তোমাদের দিন কাটিয়াছে। যাহারা বিজেতারূপে তোমাদের দেশে আসিয়াছে, পরে তাহারাই আবার অন্য জাতি কর্তৃক বিজিত হইয়াছে। আজ কে বিজেতা কে বিজিত বুঝিবার উপায় নাই—তোমরা কেহই নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পার নাই। তোমাদের জাতির স্থিরতা নাই, দেশ নিজের নয়, ধর্ম পর্যন্ত নিজের নয়। একতা তোমাদের মধ্যে কোন কালেই নাই। সামাজিক আর্থিক কতরকম দলাদলি তোমাদের আছে তার ইয়ত্তা নাই। ক্ষুদ্র ব্রিটেনের যখন এই অবস্থা, তখন সমস্ত ইওরোপের কথা না তোলাই ভাল! নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা ধর্ম ইওরোপকে চিরকলের জন্য বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। একমাত্র ভারতসরকারের শাসনেই এই মহাদেশ ঠাণ্ডা হইয়াছে। তোমরা আগে একটু সভ্য হও, তার পর স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিও। তোমরা মদে ও জুয়ায় ডুবিয়া আছ, বর্বরের মত তোমরা এখনও নাচিয়া থাক, স্নান করিতে ভয় খাও, আহারের পর কুলকুচা কর না। এখন কিছুকাল শান্ত শিষ্ট হইয়া সর্ববিষয়ে ভারতের অনুগত হইয়া চল, তার পর যথাসময়ে তোমাদের অধিকার দেওয়া-না-দেওয়া সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইবে।

ভোমস্টাট প্রাসাদ। প্রিন্স ভোম, চৈনিক পর্যটক ল্যাং প্যাং
এবং প্রিন্সের খানসামা কোবল্ট।

প্রিন্স ভোম। আচ্ছা হের প্যাং, আপনি তো নানা দেশ বেড়িয়েছেন—আমাদের এই রাজ্যটা আপনার কেমন লাগছে?

ল্যাং প্যাং। মন্দ নয়। মাঠ আছে, জল আছে, রুটি আছে, ঘাস আছে, শুওর ভেড়া আছে। কিন্তু দেশের লোক যেন সব ঝিমিয়ে রয়েছে। কেন বলুন তো?

প্রিন্স। ঐ তো মজা। সমস্ত ইওরোপে যে অসন্তোষ আর চাঞ্চল্য দেখেছেন, এখানে তার কিছুই পাবেন না। ভারতসরকার বলেন—আমাদের খাস রাজ্যে আমরা ইচ্ছামত প্রজাদের একটু আশকারা দেব, আবার রাশ টেনে ধরব। কিন্তু তুমি নাবালক, ওরকম করতে যেও না, মারা যাবে। তোমার রাজ্যে গোলযোগ দেখলেই তোমায় কান ধ'রে বার ক'রে দেব। তাই রাজ্যসুদ্ধ মৌতাতের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছি—সব ভোম হয়ে আছে। কোবল্ট, এক গুলি দে বাবা, তিনটে বাজে, হাই উঠছে। আহা, কি জিনিসই আপনাদের পূর্বপুরুষেরা আবিষ্কার করেছিলেন হের প্যাং!

ল্যাং প্যাং। কিন্তু এখন আর আমাদের দেশে জন্মায় না। যা খাচ্ছেন তা ভারতের, আপনাদের জন্যই উৎপন্ন হয়।

(প্রিন্সের মন্ত্রী ব্যারন ফন বিবলারের প্রবেশ)

বিবলার। মহারাজ, ইংল্যাণ্ড থেকে সার ট্রিক্‌সি টার্নকোট দেখা করতে এসেছেন।

প্রিন্স। আঃ জ্বালালে। একটু যে শুয়ে শুয়ে আরাম করব তার জো নেই। নিয়ে এস ডেকে। বাবা কোবল্ট, আমায় বাঁ পাশে ফিরিয়ে দে তো।

ল্যা প্যাং। আমি তা হ'লে এখন উঠি—

প্রিন্স। না, না, বসুন। আমি ভারতীয় কায়দায় লোকজনের সঙ্গে মোলাকাত

করি, একে একে অডিয়েন্স দেওয়া আমার পোষায় না, একসঙ্গেই পাঁচ-সাত জনের দরবার শুনি। তাতে মেহনত কম হয়, গল্প-গুজবও ভাল জমে।

(টার্নকোটের প্রবেশ)

প্রিন্স। হা-ডু-ডু সার ট্রিক্‌সি?—বসুন ঐ চেয়ারটায়। তার পর খবর কি বলুন।

টার্নকোট। প্রিন্স, আপনাকে হাগ যেতে হবে, প্যান ইওরোপিয়ান লিবার্টি-লীগের সভাপতিরূপে।

প্রিন্স। মাইন গট! এ বলে কি? কোবল্ট, আর এক গুলি দে বাবা।

টার্নকোট। আচ্ছা সভাপতি হ'তে আপত্তি থাকে, না হয় অমনিই যাবেন। না গেলে আমরা ছাড়ছি না।

প্রিন্স। হাগ যাব? খেপেছেন নাকি?

টার্নকোট। কেন, তাতে বাধা কি? এই তো ভাইকাউন্ট পাফ, কাউন্টেস গ্রিমালকিন, গ্রান্ডডিউক প্যাঞ্জানড্রাম—এঁরা সব যাবেন।

প্রিন্স। আরে তাদের সঙ্গে আমার তুলনা! তারা হ'ল নগণ্য ভারতীয় প্রজ্য, ইচ্ছা করলে জাহান্নমে যেতে পারে। আর আমি হলুম একজন স্বাধীন সামন্ত নরপতি, যাব বললেই কি যাওয়া যায়? যদি মহাক্ষত্রপের হুকুম নিতে যাই তো বলবেন—ব্যাটা এক্ষুনি রাজ্য ছেড়ে বনবাসে যাও।

টার্নকোট। তবে কথা দিন রাজসূয় যজ্ঞেও যাবেন না।

প্রিন্স। গট ইন হিম্মেল! আপনার দেখছি মাথা বিগড়ে গেছে। রাজসূয় যজ্ঞে যাবার জন্যে ছ-মাস ধ'রে আয়োজন করছি, কোটিখানেক টাকা খরচ হবে—আর আপনাদের আবদার শুনে সব এখন ভেস্তে দিই! হাঁ—ভাল কথা—ব্যারন, জগঝম্প সব কটা ঠিক আছে তো? সতরটা গুনে দেখেছ?

বিবলার। আজ্ঞে হাঁ। আমি সব-কটা রদ্দুরে দিয়ে টনটনে ক'রে রেখেছি।

প্রিন্স। ঠিক সতরটা?

বিবলার। ঠিক সতর।

ল্যাং প্যাং। জগঝম্প কি হবে প্রিন্স?

প্রিন্স। বাজবে। যখন আমি যাত্রা করব, সঙ্গে সঙ্গে সতরটা জগঝম্পই বাজবে। প্রিন্স ড্রুংকেনডর্ফের মোটে তেরটা। আমার সতর।

ল্যাং প্যাং। আপনার অভাব কি, আপনি মনে করলে তো সতরর জায়গায় সাত-শ জগঝম্প, জয়ঢাক, চড়বড়ে, কাঁসি, ভেঁপু, রামশিঙে যা খুশি বাজাতে পারেন।

প্রিন্স। হেঁ হেঁ, জগঝম্প হ'লেই হয় না। সরকার যে-কটি বরাদ্দ ক'রে দিয়েছেন ঠিক সেই কটি বাজানো চাই। বেশী যদি বাজাই তবে বিলকুল বাতিল হবে। বাবা কোবল্ট, আমার নাকের ডগায় একটু সুড়সুড়ি দিয়ে দে তো।

টার্নকোট। তা হ'লে আপনি আমার কোনও অনুরোধই রাখলেন না?

প্রিন্স। অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু আপনাদের উদ্যমে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে জানবেন। ব্যারন বিবলার, আপনি একটু ও-ঘরে যান তো। হ্যাঁ—দেখুন সার ট্রিক্‌সি, আপনাদের সঙ্গে দেশ উদ্ধার করতে গিয়ে আমার এই পৈতৃক রাজ্য আর পৈতৃক প্রাণটি খোয়াতে পারব না। তবে যদি বেঁচে থাকি, আর আপনাদের কার্যসিদ্ধি হয়, আর ইওরোপের জন্য একজন জবরদস্ত এম্প্যারার কি কাইজার কি ডিকটেটার দরকার হয়, তখন আমার কাছে আসবেন। ঐ কাজটা আমাদের বংশগত

কিনা, বেশ সড়গড় আছে। তার পর সার ট্রিক্‌সি, একগুলি খেয়ে দেখবেন নাকি? মাথা ঠাণ্ডা হবে। অভ্যাস নেই? আচ্ছা, তবে এক গ্লাস শ্ন্যাপ্‌স্ খান।

'দি লণ্ডন ফগ' হইতে উদ্ধৃত

দুইমাসব্যাপী হরতালের মধ্যে রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত হইল। ইওরোপের জনসাধারণ এই অনুষ্ঠান বর্জন করিয়া আত্মসম্মান রক্ষা করিয়াছে—অবশ্য জনকতক ধামাধরা ছাড়া। আমরা যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলাম না, সুতরাং আর কোনও খবর জানি না।

'রাষ্ট্রবিৎ' হইতে উদ্ধৃত

রাজসূয় যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হইল। তথাকথিত দেশনায়কগণকে রম্ভা প্রদর্শন করিয়া ইউরোপের জনসাধারণ এই বিরাট উৎসবে যোগ দিয়া অশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছে।

যজ্ঞ উপলক্ষে যাঁহারা সরকারকে নানাপ্রকার সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সার ট্রিক্‌সি টার্ন্‌কোটের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শুনিতেছি ব্রিটিশ মেষবংশের উৎকর্ষ সাধনের জন্য সরকার যে কমিশন বসাইয়াছেন, সার ট্রিক্‌সি তার প্রেসিডেণ্টরূপে শীঘ্রই কামরূপ যাত্রা করিবেন।



হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি গল্প



হনুমানের স্বপ্ন

রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজ্যশাসন ও অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। কোশলরাজ্য শান্তির ও স্বাস্থ্যের নিলয় হইল, প্রজার গৃহ ধনধান্যে ভরিয়া উঠিল, তস্কর, বঞ্চক ও পণ্ডিতমূর্খগণ বৃত্তিনাশহেতু পলায়ন করিল। দেশে আর্ত পীড়িত নাই, ধর্মাধিকরণে বাদী প্রতিবাদী নাই, কারাগার জনশূন্য। ভিষগ্‌গণ রোগীর অভাবে ভোগীর পরিচর্যায় নিযুক্ত হইলেন, বিচারকগণ পরস্পরের ছিদ্রানুসন্ধানে রত হইয়া অবসরবিনোদন করিতে লাগিলেন।

হনুমান এখন অযোধ্যাতেই বাস করেন। রাম তাঁহার জন্য এক সুরম্য কদলী-কাননে সপ্ততল কাষ্ঠভবন নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মহাবীর তথায় পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন এবং ভক্ত প্রজাবর্গের সমাদরে সর্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টি লাভ করিলেন।

কিন্তু কয়েক মাস পরেই তাঁহার ভাবান্তর লক্ষিত হইল। অযোধ্যাবাসী উদ্‌বিগ্ন হইয়া দেখিল পবননন্দন দিন দিন কৃশ হইতেছেন, তাঁহার কান্তি ম্লান হইতেছে, তাঁহার আর তেমন স্ফূর্তি নাই। রামের আদেশে রাজবৈদ্যগণ হনুমানের চিকিৎসা করিলেন, বিস্তর অরিষ্ট মোদক রসায়নাদির ব্যবস্থা হইল, কিন্তু কোনও উপকার দর্শিল না। ভিষগ্‌গণ হতাশ হইয়া বলিলেন, মহাবীরের যে ব্যাধি তাহা আধ্যাত্মিক, ঔষধে সারিবার নয়। অগত্যা বশিষ্ঠ ঋষি হনুমানের মঙ্গলকামনায় এক বিরাট যজ্ঞের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন।

তখন রাজ্ঞী সীতা হনুমানকে রাজান্তঃপুরে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'বৎস, তোমার কি হইয়াছে প্রকাশ করিরা বল, আমি তোমার মাতৃতুল্য, বলিতে সংকোচ করিও না।'

মহাবীর কিয়ৎক্ষণ তাঁহার বাম গ্রীবা কণ্ডূয়ন করিলেন, তাহার পর দক্ষিণ গ্রীবা কণ্ডূয়ন করিলেন। তদনন্তর মস্তক নত করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন—'মাতঃ, আমার গোপন কথা যদি নিতান্তই শুনিতে চাও তবে না বলিয়া উপায় নাই। কিছুদিন পূর্বে আমি স্বপ্নে পিতৃগণকে দেখিয়াছি। তাঁহারা সুমেরুশিখরে সারি সারি পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন এবং বিষন্নবদনে নিজ নিজ উদরে হাত বুলাইতেছেন। এই দুঃস্বপ্নের অর্থ আমি বশিষ্ঠপুত্র বামদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, হে মহাবীর, ও কিছু নয়, তোমার পিতৃগণ ক্ষুধিত হইয়াছেন, তুমি কদলী দগ্ধ করিয়া শ্রাদ্ধ কর এবং ব্রাহ্মণগণকে ভূরিদক্ষিণা দাও। আমি বামদেবের উপদেশ পালন করিলাম, কিন্তু তাহার পর আবার পিতৃগণ আমাকে স্বপ্নে দর্শন দিলেন। তখন আমার জ্ঞান হইল যে তাঁহারা ক্ষণিক ব্যবস্থায় তৃপ্ত হইবেন না। আমার মৃত্যুর পর কে তাঁহাদিগকে পিণ্ড দিবে? লোকে যে-বয়সে বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্য-ধর্ম পালন করে, আমি সেই বয়সে সুগ্রীবের অনুচর হইয়া বানপ্রস্থে কালহরণ করিয়াছি। এখন প্রভু রামচন্দ্রের কৃপায় সুগ্রীব রাজ্যলাভ করিয়াছেন, রাবণ বিনষ্ট হইয়াছে, আমারও অবসর মিলিয়াছে। কিন্তু আমি এখন বার্ধক্যের দ্বারদেশে উপস্থিত, এখন যদি দারপরিগ্রহ করিয়া গৃহী হইতে চাই তবে লোকে আমাকে ধিক্‌কার দিবে! হা, আমার পিতৃঋণ শোধের কি উপায় হইবে? হে দেবী, এই দুশ্চিন্তা আমাকে অহরহ দহন করিতেছে, আমি নিরন্তর পিতৃগণের ম্লানমুখ ও শূন্য উদর দেখিতে পাইতেছি, আমার ক্ষুধা নাই নিদ্রা নাই শান্তি নাই।' এই বলিয়া হনুমান নীরবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

হনুমানের বচন শুনিয়া দেবী জানকী ঈষৎ হাস্যসহকারে কহিলেন—'হে বীর-শ্রেষ্ঠ, এজন্য আর চিন্তা কি? তুমি লোকলজ্জায় অভিভূত হইও না, এই দণ্ডে বিবাহ করিয়া পিতৃগণকে নিশ্চিন্ত কর। তোমার কী এমন বয়স হইয়াছে? আমার পূজ্যপাদ শ্বশুর মহাশয় তোমার অপেক্ষাও অধিক বয়সে ভরতজননীকে গৃহে আনিয়া-ছিলেন। আমি আমার সখীগণকে ডাকিয়া আনিতেছি, তাহারা সকলেই সুরূপা সুশীলা সদ্‌বংশীয়া। তোমার যাহাকে ইচ্ছা পত্নীত্বে বরণ কর। হে কপিপ্রবর, আমি নিশ্চয় কহিতেছি এই অযোধ্যায় এমন কন্যা নাই যে তোমাকে পতিরূপে পাইয়া ধন্য হইবে না। তুমি তোমার জাতির জন্য কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইও না। আমি অনুরোধ করিলে মহর্ষি বশিষ্ঠ উপনয়ন সংস্কার দ্বারা তোমাকে ক্ষত্রিয় বানাইয়া দিবেন। অথবা যদি মানবীতে তোমার অভিরুচি না থাকে, তবে কিষ্কিন্ধ্যায় গমন কর এবং একটি পরমা সুন্দরী বানরীর পাণিগ্রহণ করিয়া সত্বর অযোধ্যায় ফিরিয়া আইস: তোমার পত্নীর নাম যাহাই হউক আমি তাহাকে হনুমতী বলিব এবং এই রাজপুরীর বধূগণমধ্যে সাদরে গ্রহণ করিব।'

তখন হনুমান প্রফুল্ল হইয়া কহিলেন—'জনকনন্দিনী, তোমার জয় হউক। আমি কৌলীন্য ভঙ্গ করিব না, বানরীই বিবাহ করিব এবং শ্রীরামচন্দ্রের অনুমতি লইয়া অদ্যই কিষ্কিন্ধ্যা যাত্রা করিব।'

হনুমান নানা গিরি নদী বনভূমি অতিক্রম করিয়া দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হইলেন। তখন অপরাহ্ণ, সূর্যাস্তের বিলম্ব নাই। মহাবীর এক বিশাল শাল্মলিতরুর শাখায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন এবং চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলেন নিকটে কোথাও

রাত্রি বাসের উপযুক্ত আশ্রয় আছে কিনা। সহসা অদূরে একটি সুবৃহৎ পর্ণগৃহ নয়নগোচর হইল। হনুমান বৃক্ষ হইতে নামিয়া সেই গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তাহার অভ্যন্তর পরিপাটীরূপে সজ্জিত। ভূমিতে কোমল তৃণরাশির উপর মসৃণ মৃগচর্মের আস্তরণ, এক কোণে স্তূপীকৃত সুপক্ক আম্র-পনস-রম্ভাদি ফল, অন্য কোণে চন্দনকাষ্ঠের মঞ্চের উপর রাজোচিত বসন উত্তরীয় উষ্ণীষ প্রভৃতি পরিচ্ছদ এবং বিবিধ প্রসাধনদ্রব্য, প্রাচীরগাত্রে লম্বিত একটি সুরম্য পরিবাদিনী বীণা।

হনুমান সমস্ত নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া সহর্ষে কহিলেন—'অহো, নিশ্চয়ই স্বর্গস্থ পিতৃগণ আমার প্রতি স্নেহবশে এই উপহারসামগ্রী প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রীতির নিমিত্ত আমি এখনই এই পরিচ্ছদ ধারণ করিব এবং রাত্রিকালে এই উপাদেয় ভোজ্যসকল আহার করিব।'

এই বলিয়া হনুমান সেই বিচিত্র বসন উত্তরীয়াদি পরিধান করিলেন এবং মস্তকে উষ্ণীষ স্থাপন করিয়া অতিশয় শোভমান হইলেন। তাহার পর শয্যায় উপবেশন করিয়া ভাবিলেন—'এখনও বেলা অবসান হয় নাই, ভোজনের বিলম্ব আছে, ততক্ষণ আমি এই বীণা বাজাইয়া দেখি।'

মহাবীর সাবধানে বীণাটি পাড়িলেন, কিন্তু বাদ্যের উপক্রম করিতেই তাঁহার প্রবল অঙ্গুলিস্পর্শে সমস্ত তার ছিঁড়িয়া গেল। হনুমান বিরক্ত হইয়া বলিলেন—'এই ক্ষণভঙ্গুর যন্ত্র মাদৃশ বীরের অস্পৃশ্য।' তখন তিনি মৃগচর্মে শয়ান হইয়া ভাবী ভার্যার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার কান্তা কেমন হইবে? তন্বী না স্থূলা, পীঙ্গলবর্ণা না রক্ত-কপিশপ্রভা, ধীরা না চপলা, কলকণ্ঠী না কর্কশনাদিনী? ভাবিতে ভাবিতে সহসা তাঁহার চিত্তে নির্বেদ উপস্থিত হইল। হনুমান স্বগত কহিতে লাগিলেন—'অহোবত, আমি এ কী ঘোর কর্মে ব্যবসিত হইয়াছি! আমি সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়াছি, লঙ্কা দগ্ধ করিয়াছি, গন্ধমাদন উৎপাটিত করিয়াছি। সাগরে অম্বরে পর্বতে অরণ্যে আমার অজ্ঞাত কিছু নাই। আমি সমরে অভিজ্ঞ, সংকটে ধীর, দেবচরিত্র কাকচরিত্র আমার নখদর্পণে। কিন্তু স্ত্রীজাতির রহস্য আমি কি-ই বা জানি! এই অদ্ভুত প্রাণীর গুম্ফ নাই শ্মশ্রু নাই বল নাই বুদ্ধি নাই। অথচ দেখ ইহারা শিশুকে স্তন্যদান করে, কিন্তু আমরা তাহা পারি না। ইহারা অকারণে হাস্য করে, অকারণে ক্রন্দন করে, তুচ্ছ মুক্তা প্রবাল ইহাদের প্রিয়, সন্তানপালন ও নিরর্থক বস্তুসংগ্রহই একমাত্র কার্য। ঈদৃশী কোমলাঙ্গী মসৃণবদনী পয়স্বিনী শিশুপালিনী ভার্যার সহিত আমি কিরূপ ব্যবহার করিব? যদি সে আমার প্রিয়কার্য করে তবে কি মস্তকে উত্তোলন করিয়া সমাদর করিব? যদি অবাধ্য হয় তবে কি চপেটাঘাতে বিনীত করিব? বানরধর্ম-শাস্ত্রে এবংবিধ শাসনের বিধান আছে বটে, কিন্তু মানবশাস্ত্র কি বলে?'

হনুমান এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময় সেই পর্ণগৃহের দ্বারদেশে এক সুদর্শন যুবা পুরুষের আবির্ভাব হইল। তাঁহার বেশভূষা বহুমূল্য, স্কন্ধ হইতে শরাসন লম্বিত, পৃষ্ঠে তূণীর, এক হস্তে বাণবিদ্ধ দশটি তিত্তির পক্ষী, অন্য হস্তে একটি সদ্য আহৃত বৃহৎ মধুচক্র।

আগন্তুক হনুমানকে দেখিয়া ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া বলিলেন—'ওরে বানরাধম, তুই কোন্ সাহসে আমার রাজবেশ আত্মসাৎ করিয়া আমার শয্যায় শুইয়া আছিস? দাঁড়া, এখনই তোকে যমালয়ে পাঠাইতেছি।'

হনুমান কহিলেন—'ওহে বীরপুংগব, তিষ্ঠ তিষ্ঠ। হঠকারিতা মূর্খের লক্ষণ,

ধীর ব্যক্তি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কার্য করেন। আমি রামদাস হনুমান, লোকে আমাকে মহাবীর বলে। ইহার অধিক পরিচয় অনাবশ্যক।'



ওরে বানরাধম

তখন আগন্তুক সসম্ভ্রমে ললাটে যুক্তকর স্পর্শ করিয়া কহিলেন—'অহো, আমার কি সৌভাগ্য যে শ্রীহনুমানের দর্শনলাভ করিলাম! মহাবীর, তুমি অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা কর। আমি তুম্বদেশের অধিপতি, নাম চণ্ডরীক। তোমার যোগ্য সৎকার করি এমন আয়োজন আমার এই অরণ্যকুটীরে নাই। যদি কোনও দিন আমার রাজপুরীতে পদরেণু দাও তবেই আমার তৃপ্তি হইবে। হে অঞ্জনানন্দন, তুমি ঐ রমণীয় পরিচ্ছদ উষ্ণীষাদি খুলিয়া ফেলিতেছ কেন, উহাতে তোমাকে সাক্ষাৎ কন্দর্পের ন্যায় দেখাইতেছে। আমি এই রজতময় দর্পণ ধরিতেছি একবার অবলোকন কর। তুমি অনুমতি দাও, আমি এই সুস্বাদু তিত্তিরমাংস অগ্নিপক্ক করিয়া দিতেছি। তুমি বুঝি নিরামিষাশী? তবে ঐ আম্র-পনস-রম্ভাদি দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি কর। হে মারুতি, বিমুখ হইও না, একবার মুখব্যাদান কর, আমি এই মধুচক্র তোমার বদনে নিংড়াইয়া দিই। তুমি বোধ হয় সংগীতচর্চা করিতেছিলে, তাই আমার বীণাটির এমন দশা হইয়াছে। হে মহাবীর, তুমি বুঝি কার্মুক ভাবিয়া উহাতে টংকার দিয়াছিলে?'

হনুমান কহিলেন,—'চঞ্চরীক, তোমার অভ্যর্থনায় আমি প্রীত হইয়াছি। কিন্তু তুমি অধিক বাচালতা করিও না, আমার এই বজ্রমুষ্টি দেখিয়া রাখ, ইহা হঠাৎ ধাবিত হয়। এই পরিচ্ছদে আমি অস্বস্তি বোধ করিতেছি, তুমিই ইহা পরিধান করিও। আমার আহারের জন্য ব্যস্ত হইও না, যথাকালে তাহা হইবে। তোমার বীণা কোনও কর্মের নয়। দুঃখ করিও না, আমি উহাতে শণের রজ্জু লাগাইয়া দিব। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—কি জন্য বিজন অরণ্যে এই কুটীর নির্মাণ করিয়াছ ? যদি নরপতি হও, তবে তোমার গজ বাজী অনুযত্র সৈন্য দেখিতেছি না কেন ? তোমার রথ সারথি কোথায়, বিদূষকই বা কোথায় ?'

চঞ্চরীক কহিলেন—'হে বানরর্ষভ, আমি মনের দুঃখে একাকী অরণ্যবাস করিতেছি, এখন আমিই আমার রক্ষী, আমিই সারথি, আমিই বিদূষক। আমার কাহিনী অতি করুণ, শ্রবণ কর। আমার মহিষী পরমরূপবতী এবং অশেষগুণ-শালিনী, কিন্তু তাঁহাকে ঠিক পতিব্রতা বলিতে পারি না। একদা আমি তাঁহার এক সুন্দরী সখীর সহিত কিঞ্চিৎ রসচর্চা করিতেছিলাম, দুরদৃষ্টক্রমে তিনি তাহা দেখিয়া ফেলেন। এই তুচ্ছ কারণে তিনি বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া ক্রোধাগারে বসতি করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে জব্দ করিবার মানসে এই অরণ্যে বাস করিতেছি এবং পশুপক্ষী মারিয়া বিরহযন্ত্রণা লাঘব করিতেছি। হে পবননন্দন, এখন আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে এক ভার্যা অশেষ অনর্থের মূল। শাস্ত্র যথার্থই বলিয়াছেন —অল্পে সুখ নাই, ভূমাতেই সুখ। শুনিয়াছি এই অরণ্যে মহাতপা লোমশ মুনি বাস করেন। নারীজাতিকে বশে রাখিবার উপায় তিনি সম্যক্ অবগত আছেন, কারণ তাঁহার একশত পত্নী। আমি স্থির করিয়াছি তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিব। আমার কথা সমস্ত বলিলাম, এখন তুমি কি জন্য অযোধ্যা ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছ শুনিতে ইচ্ছা করি। রামচন্দ্র কি পূর্বোপকার বিস্মৃত হইয়া তোমার অনাদর করিয়াছেন ?'

হনুমান কহিলেন—'সাবধান, তুমি রামনিন্দা করিও না। আমি কিষ্কিন্ধ্যায় যাইতেছি, সেখানে দারপরিগ্রহ করিয়া বধূর সহিত অযোধ্যায় ফিরিব। তোমার উপর আমার প্রীতি জন্মিয়াছে, অতএব মনের কথা খুলিয়া বলি। হে চঞ্চরীক, আমি স্ত্রীতত্ত্ব অবগত নহি, কেবল পিতৃ-ঋণ পরিশোধের নিমিত্তই এই দুরূহ সংকল্প করিয়াছি। তোমার দাম্পত্যকাহিনী শুনিয়া আমার চিত্ত সংশয়াকুল হইয়াছে ?'

চঞ্চরীক হাস্য করিয়া কহিলেন—'হে হনুমন্, ভয় নাই। তুমি যখন গন্ধমাদন বহন করিয়াছ তখন ভার্যার ভারও বহিতে পারিবে। আমি তোমাকে সমস্তই শিখাইয়া দিব। সম্প্রতি কিছু সারগর্ভ উপদেশ দিতেছি শ্রবণ কর। পুত্রার্থে ভার্যা করা অতি সহজ কর্ম, কিন্তু যদি প্রেমের জন্য ভার্যা করিতে হয় তবে স্ত্রীচরিত্রে অভিজ্ঞতা আবশ্যক। নিজস্ত্রী সলজ্জা হইবে এবং পরস্ত্রী নির্লজ্জা হইবে ইহাই রসজ্ঞজনের কাম্য। তোমার রামরাজ্যের কথা অবগত নহি, কিন্তু সংসারে এই শুভসমন্বয় কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। অতএব—'

হনুমান কহিলেন—'ওহে চঞ্চরীক, তুমি ক্ষান্ত হও। অগ্রে নিজ সমস্যার সমাধান কর তাহার পর আমাকে উপদেশ দিও। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, এখন ভোজনের আয়োজন করিতে পার। কুটীরদ্বার বন্ধ করিয়া দাও, বনভূমির শীতবায়ু আর আমার তেমন সহ্য হয় না।'

চঞ্চরীক অর্গল বন্ধ করিয়া প্রদীপ জ্বালিলেন এবং ভোজনের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। সহসা দ্বারে করাঘাত করিয়া কে বলিল—'ভো গৃহস্থ, অর্গল মোচন কর, আমি শীতার্ত ক্ষুধার্ত অতিথি।'

চঞ্চরীক দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলে এক শীর্ণকায় তপস্বী গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাহার মস্তক জটামণ্ডিত, শ্মশ্রু আজানুলম্বিত, দেহ লোমে সমাকীর্ণ।

চঞ্চরীক প্রণাম করিয়া কহিলেন—'তপোধন, আপনাকে দেখিয়াই চিনিয়াছি যে আপনি স্বনামধন্য লোমশ ঋষি। আপনার দর্শনলাভের জন্য আমরা ব্যগ্র হইয়াছিলাম, আপনি বোধ হয় যোগবলে জানিতে পারিয়া কৃপাবশে স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন। আমি তুম্বরাজ চঞ্চরীক, আর ইনি আমার পরমবন্ধু জগদ্‌বিখ্যাত মহাবীর হনুমান। এই কপিপ্রবর দারপরিগ্রহের নিমিত্ত কিষ্কিন্ধ্যায় যাইতেছেন, কিন্তু সহসা ইঁহার চিত্ত সংশয়াকুল হইয়াছে। আমার অবস্থাও ভাল নয়। আমার একটি ভার্যা আছেন বটে, কিন্তু আমি বৈচিত্র্যের পিপাসু, ভূমার আস্বাদ লইতে আমার অত্যন্ত বাসনা হইয়াছে। হে ঋষিশ্রেষ্ঠ, শুনিয়াছি দাম্পত্যতত্ত্বে আপনার জ্ঞানের পরিসীমা নাই। আপনার জন্য এই পক্ষিমাংস শূলপক্ক করিয়া দিতেছি, আপনি ততক্ষণ কিঞ্চিৎ সৎপরামর্শ দিন।'

ইত্যবসরে মহর্ষি লোমশ একটি অতিকায় পনস ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া তাহার সুপক্ক কোষসকল ক্ষিপ্রহস্তে বদনে নিক্ষেপ করিতেছিলেন। এখন ভোজন সমাপ্ত করিয়া কহিলেন—'পবননন্দন চিরজীবী হও, তুম্বরাজ তোমার জয় হউক। এখন আমি কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করিতেছি। অষ্টাহকাল আমার আহার নিদ্রা নাই, আমি গৃহচ্যুত, কৌপীনমাত্র সম্বল।'

শরাসনে ঝটিতি জ্যারোপণ করিয়া চঞ্চরীক কহিলেন—'প্রভো, কোন্ দুরাচার রাক্ষস আপনার আশ্রম লুণ্ঠন করিয়াছে? অনুমতি দিন, এই দণ্ডে তাহাকে বধ করিব। আহা, আপনার সকল পত্নীই কি অপহৃতা হইয়াছেন? মহাবীর, অবাক হইয়া ভাবিতেছ কি? গাত্রোত্থান কর, আবার তোমাকে সাগর লঙ্ঘন করিতে হইবে। বিভীষণকে ছাড়িয়া দিয়া ভাল কর নাই।'

লোমশ কহিলেন—'তোমরা ব্যস্ত হইও না, আমার ইতিহাস শ্রবণ কর। পূর্বে এই দক্ষিণাপথে দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার প্রতিকারকল্পে শতজন নরপতি আমার শরণাপন্ন হন। তাঁহাদের রাজ্যের হিতার্থে আমি এক বিরাট্ যজ্ঞের অনুষ্ঠানদ্বারা সুবৃষ্টি আনয়ন করি। কৃতজ্ঞ নরপতিগণ দক্ষিণাস্বরূপ তাঁহাদের শতকন্যা আমাকে সম্প্রদান করেন এবং ভরণপোষণের যথোচিত ব্যবস্থাও করেন। আমি এই রাজনন্দিনীগণের বাসের নিমিত্ত আমার তপোবনে এক শত গৃহনির্মাণ করিয়া দিয়াছি।'

চঞ্চরীক জিজ্ঞাসিলেন—'মুনিবর, আপনার তপোবনে ক্রোধাগার আছে তো?

লোমশ কহিলেন—'প্রত্যেক গৃহই ক্রোধাগার। হতভাগিনীগণ নিরন্তর কলহ করে, তাহাদের গৃহকর্ম নাই, পতিসেবা নাই, ব্রত পূজা নাই। আমি আদর করিয়া তাহাদের প্রথমা দ্বিতীয়া ইত্যাদিক্রমে নবনবতিতমী শততমী পর্যন্ত নাম রাখিয়াছি, কিন্তু তাহারা পরস্পরকে মূষিকা চর্মচটিকা পেচকী ছুছুন্দরী প্রভৃতি ইতর নামে

সম্বোধন করে এবং আমাকে ভল্লুক বলে। আমি উত্ত্যক্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছি, এখন সেই ব্যাপিকাগণ যত ইচ্ছা কলহ করুক। হে রাজন্, তুমি কি ভূমার আস্বাদ চাও? তবে আমার আশ্রমে যাও। শ্রীহনুমানও তথায় পত্নীনির্বাচন করিতে পারিবেন। আমি আর সেখানে ফিরিতেছি না। এখন এই বৃদ্ধ বয়সে আমি শান্তি চাই এবং আর একটি বিবাহ করিয়া এক পত্নীর যে সুখ তাহাই উপলব্ধি করিতে চাই।'

লোমশ মুনির বচন শুনিয়া হনুমান কিয়ৎক্ষণ হতভম্ব হইয়া রহিলেন। তাহার পর প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন—'হে তপোধন, প্রণিপাত করি, হে চঞ্চরীক, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হউক। এখন বিদায় দাও, আমি সুগ্রীবের নিকট চলিলাম।'

চঞ্চরীক ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—'সে কি! এই গভীর রজনীতে অরণ্যপথে কোথায় যাইবে? অন্তত প্রভাত পর্যন্ত এখানে বিশ্রাম কর।'

হনুমান কর্ণপাত করিলেন না।

কিষ্কিন্ধ্যায় এক সুরম্য উপবনে নল নীল গয় গবাক্ষ প্রভৃতি মিত্রগণের সহিত বসিয়া বানররাজ সুগ্রীব নারিকেল ভক্ষণ করিতেছিলেন। এমন সময় হনুমান আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন।

সুগ্রীব রাজোচিত গাম্ভীর্য সহকারে কহিলেন—'মহাবীর কি মনে করিয়া? আমি এখন রাজকার্যে ব্যস্ত আছি, অবসর নাই, অন্যকালে তোমার বক্তব্য শুনিব।'

হনুমান কহিলেন—'হে বানরাধিপ, আমি এক বিশেষ প্রয়োজনে তোমার সাহায্য-প্রার্থী হইয়া আসিয়াছি।'

সুগ্রীব কহিলেন—'কিষ্কিন্ধ্যায় তোমার সুবিধা হইবে না। তোমার অরণ্য-সম্পত্তি যাহা ছিল সমস্তই অঙ্গদ-বাবাজী দখল করিয়াছেন, ফিরিয়া পাইবার আশা নাই। আমারও এখন অত্যন্ত অভাব চলিতেছে, তোমাকে কিছু দিতে পারিব না। অযোধ্যা ছাড়িলে কেন? ফিরিয়া গিয়া তোমার প্রভু রামচন্দ্রকে নিজ প্রার্থনা জানাও, তিনি অবশ্যই একটা বিহিত করিবেন। রাঘব তো মন্দ লোক নহেন।'

হনুমান কহিলেন—'ওহে সুগ্রীব, তোমার চিন্তা নাই। আমি পূর্বসম্পত্তি চাহি না, তোমার রাজ্যের ভাগও চাহি না, প্রভু রামচন্দ্রের কৃপায় আমার কোনও অভাব নাই। আমি বিবাহ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। কিন্তু এই অনভ্যস্ত ব্যাপারে আমি সংশয়ান্বিত হইয়াছি, তুমি সৎপরামর্শ দাও।'

সুগ্রীব তখন প্রীত হইয়া কহিলেন—'হে সুহৃদ্‌বর, তোমার সংকল্প অতিশয় সাধু। এতক্ষণ বাজে কথা বলিতেছিলে কেন? ঐ সুকোমল বৃক্ষশাখায় উপবেশন কর, কিঞ্চিৎ নারিকেলোদক পান করিয়া স্নিগ্ধ হও। হে ভ্রাতঃ, আমি সর্বদাই তোমার হিত-কামনা করিয়া থাকি। কেবলই ভাবি, আহা, আমাদের হনুমান সংসারী হইল না! তুমি বিবাহের জন্য কিছুমাত্র চিন্তা করিও না, উহা অতি সহজ কর্ম। দেখ, আমি অষ্টোত্তর-সহস্র ভার্যায় পরিবৃত্ত হইয়া পরমানন্দে কালযাপন করিতেছি।'

হনুমান কহিলেন,—'তুমি এই পত্নীপুঞ্জ শাসনে রাখ কি করিয়া? তাহারা কলহ করে না? তোমাকে বাক্যবাণে প্রপীড়িত করে না?'

সুগ্রীব সহাস্যে কহিলেন—'সাধ্য কি। আমি কদলীবল্কল দ্বারা তাহাদের ওষ্ঠাধর বাঁধিয়া রাখি, কেবল প্রেমালাপকালে খুলিয়া দিই। যাহা হউক, তোমার ভয় নাই। আপাতত তুমি একটিমাত্র পত্নী গ্রহণ কর, পরে ক্রমে ক্রমে সংখ্যা বৃদ্ধি করিও। আমি বলি কি—তুমি অন্যত্র চেষ্টা না করিয়া শ্রীমতী তারাকে বিবাহ কর, আমার আর তাঁহাকে প্রয়োজন নাই। তিনি প্রবীণা এবং পতিসেবায় পরিপক্বা। তাঁহাকে লাভ করিয়া তুমি নিশ্চয়ই সুখী হইবে।'

হনুমান কহিলেন—'তুমি তারাদেবীর নাম করিও না, তিনি আমার নমস্যা।'

সুগ্রীব কহিলেন—'বটে! অযোধ্যায় থাকিয়া তোমার মতি-গতি বিগড়াইয়াছে দেখিতেছি। আচ্ছা, তুমি আর এক চেষ্টা করিতে পার। এই কিষ্কিন্ধ্যার দক্ষিণে কিচ্চট দেশ আছে। তাহার অধিপতি প্লবংগম অপুত্রক অবস্থায় লোকান্তর গমন করিয়াছেন। এখন তাঁহার দুহিতা চিলিম্পা রাজ্যশাসন করিতেছেন। এই বানরী অতিশয় লাবণ্যবতী বিদুষী ও চতুরা। আমি বিবাহের প্রস্তাবসহ দূত পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু লাঙ্গুল কর্তন করিয়া চিলিম্পা তাহাকে বিদায় দিয়াছে। নল নীল গয় গবাক্ষ ইঁহারাও প্রেমনিবেদন করিতে তাহার কাছে একে একে গিয়াছিলেন, কিন্তু সকলেই ছিন্নলাঙ্গুল লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই দুর্বিনীতা বানরীর উপর আমার লোভ আক্রোশ উভয়ই আছে, কিন্তু আমার অবসর নাই, নতুবা স্বয়ং অভিযান করিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিতাম। এখন তুমি যদি তাহাকে জয় কর তবে আমার ক্ষোভ দূর হইবে, তোমারও পত্নী লাভ হইবে।'

হনুমান কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন—'তাহাই হউক। আমি এখনই কিচ্চট দেশে যাত্রা করিতেছি।'

হনুমান কিচ্চট রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বিশাল বপু দেখিয়া প্রজাগণ সভয়ে পথ ছাড়িয়া দিল এবং চিলিম্পাকে সংবাদ দিল—'হে রাজনন্দিনী, আর রক্ষা নাই, এক পর্বতাকার বীর বানর তোমার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে।'

চিলিম্পা কহিলেন—'ভয় নাই, অমন অনেক বীর দেখিয়াছি। তাহাকে ডাকিয়া আন।'

হনুমান এক মনোরম কুঞ্জবনে আনীত হইলেন। চিলিম্পা তথায় সখীগণে পরিবৃতা হইয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার কর্ণে রক্ত-প্রবাল, কণ্ঠে কপর্দমালা, হস্তে লীলাকদলী। হনুমান মুগ্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—'অহো, সুগ্রীব যথার্থই বলিয়াছেন। এই তরুণী বানরী পরমা সুন্দরী, ইহাকে দেখিবামাত্র আমার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, সংশয় দূর হইল। ইহাকে যদি লাভ করিতে না পারি তবে জীবনই বৃথা।'

ঈষৎ হাস্যে কুন্দদন্ত বিকশিত করিয়া চিলিম্পা কহিলেন—'হে বীরবর, তুমি কি-হেতু বিনা অনুমতিতে আমার রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছ? তুমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছ, কি চাও, সমস্ত প্রকাশ করিয়া বল, আমি তোমাকে অভয় দিলাম।'

হনুমান উত্তর দিলেন—'হে প্লবংগম-নন্দিনী, আমি রামদাস হনুমান, অযোধ্যা হইতে আসিয়াছি, তোমার পাণিগ্রহণ করিয়া আবার অযোধ্যায় ফিরিতে চাই। আমিও তোমাকে অভয় দিতেছি।'

হনুমানের বাক্য শুনিয়া সখীগণ কিলকিলা রবে হাসিয়া উঠিল। চিলিম্পা কহিলেন—'হনুমান, তোমার ধৃষ্টতা তো কম নয়। তোমার কী এমন গুণ আছে যাহার জন্য আমার প্রাণিপ্রার্থী হইতে সাহসী হইয়াছ?'

হনুমান কহিলেন—'আমি সেই রামচন্দ্রের সেবক যিনি পিতৃ-সত্য পালনের জন্য বনে যান, যিনি রাবণকে নিধন করিয়াছেন, যিনি দূর্বাদলশ্যাম পদ্মপলাশলোচন, যিনি সর্বগুণান্বিত লোকোত্তরচরিত।

চিলিম্পা কহিলেন—'হে রামদাস, তুমি কি রামচন্দ্রের সম্বন্ধ করিতে আসিয়াছ?'

হনুমান জিহ্বাদংশন করিয়া কহিলেন—'আমার প্রভু একদারনিষ্ঠ। জনকতনয়া সীতা তাঁহার ভার্যা, যিনি মূর্তিমতী কমলা, যাঁহার তুলনা ত্রিজগতে নাই। আমি নিজের জন্যই তোমার কাছে আসিয়াছি।'

চিলিম্পা কহিলেন—'তবে নিজের কথাই বল।'

হনুমান কহিলেন—'নিজের কীর্তি নিজে বলা ধর্মবিরুদ্ধ, কিন্তু পণ্ডিতগণের মুখে শুনিয়াছি শত্রু ও প্রিয়ার নিকট আত্মগৌরব কথনে দোষ নাই। অতএব বলিতেছি শ্রবণ কর। আমি সাগর লঙ্ঘন করিয়াছি, গন্ধমাদন উৎপাটিত করিয়াছি, ভগবান ভানুকে কক্ষপুটে রুদ্ধ করিয়াছি, এই দেখ স্ফোটকের চিহ্ন। আমি সাত লক্ষ রাক্ষস বধ করিয়াছি, রাবণের মস্তকে চপেটাঘাত করিয়াছি, তাহার রথচূড়া চর্বণ করিয়াছি, এই দেখ একটি দন্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।'

চিলিম্পা কহিলেন—'হে মহাবীর, তোমার বচন শুনিয়া আমার পরম প্রীতি জন্মিয়াছে। কিন্তু স্ত্রীজাতি কেবল বীরত্ব চাহে না। তোমার কান্তগুণ কি কি আছে? তুমি নৃত্যগীত জান? কাব্য রচিতে পার?'

হনুমান কহিলেন—'অয়ি চিলিম্পে, রাবণবধের পর আমি অধীর হইয়া একবার নৃত্যগীতের উপক্রম করিয়াছিলাম, কিন্তু নল নীল প্রভৃতি বানরগণ আমাকে উপহাস করে, তাহাতে আমি নিরস্ত হই। সুমিত্রানন্দন তখন আমাকে বলেন—মারুতি, তুমি ক্ষুব্ধ হইও না। তুমি যাহা কর তাহাই নৃত্য, যাহা বল তাহাই গীত, যাহা না বল তাহাই কাব্য, ইতরজনের বুঝিবার শক্তি নাই।'

চিলিম্পা আহার করধৃত কদলীগুচ্ছ লীলাসহকারে দংশন করিতে করিতে কহিলেন—'হে পবননন্দন, তুমি প্রেমতত্ত্বের কতদূর জান? তুমি কোন্ জাতীয় নায়ক? ধীরোদাত্ত, ধীরোদ্ধত, প্রশান্ত না ললিত? তুমি কি করিয়া আমার মনোরঞ্জন করিবে, কি করিয়া আমার মানভঞ্জন করিবে? আমি যদি গজমুক্তার হার কামনা করি তবে তুমি কোথায় পাইবে? যদি রাগ করিয়া আহার না করি তবে কি করিবে?'

হনুমান ভাবিলেন—'এই বিদগ্ধা বানরী এইবার আমাকে সংকটে ফেলিল, ইহার প্রশ্নের কি উত্তর দিব? যাহা হউক আমি অপ্রতিভ হইব না। —হে সুন্দরী, তোমাকে দেখিয়া আমার চিত্ত চঞ্চল হইয়াছে, প্রেমতত্ত্বের ইহাই আমার প্রথম জ্ঞান। তুমি চিন্তা করিও না, কিষ্কিন্ধ্যাপতি সুগ্রীব আমার অগ্রজতুল্য, তিনি আমাকে সমস্ত শিখাইয়া দিবেন। তুম্বরাজ চঞ্চরীক আমার বন্ধু, তিনিও আমাকে জ্ঞানদান করিবেন। তুমি যদি মুক্তাহার কামনা কর তবে জানকীর নিকট চাহিয়া লইব, যদি আহার না কর তবে এই লৌহকঠোর অঙ্গুলি দ্বারা তোমাকে খাওয়াইব। হে প্রিয়ে, আর বিলম্ব করিও না, আমার সহিত চল। সীতা তোমার হনুমতী নাম দিয়াছেন, তিনি তোমাকে বরণ করিবার জন্য অযোধ্যায় প্রতীক্ষা করিতেছেন।'

চিলিম্পা তখন হনুমানের চিবুকে তর্জনীর মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া মধুর স্বরে কহিলেন—'ওরে বর্বর, ওরে অবোধ, ওরে বৃদ্ধবালক, তুমি প্রেমের কিছুই জান না। যাও, কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়া সুগ্রীবকে পাঠাইয়া দাও।'

হনুমান আকুল হইয়া কহিলেন—'অয়ি নিষ্ঠুরে, আমাকে আশা দিয়া নিরাশ করিতেছ কেন? আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়িব না।' এই বলিয়া তিনি চিলিম্পাকে ধরিবার জন্য বাহু প্রসারিত করিলেন।

চিলিম্পা করতালি দিয়া বিকট হাস্য করিলেন। সহসা বনান্তরাল হইতে কালান্তক যমের ন্যায় দুই মহাকায় নরকপি নিঃশব্দে আসিয়া হনুমানকে অতর্কিতে পাশবদ্ধ করিল। চিলিম্পা কহিলেন—'হে অরঙ্গ-অটঙ্গ, এই মর্কটের বড়ই স্পর্ধা হইয়াছে, দ্বাদশাঙ্গুল পরিমাণ ছাঁটিয়া দিয়া ইহাকে বিতাড়িত কর।

তখন প্রত্যুৎপন্নমতি হনুমান প্রভঞ্জনকে স্মরণ করিলেন। নিমেষে তাঁহার দেহ হিমাদ্রিতুল্য হইল, পাশ শতছিন্ন হইল, প্রচণ্ড পদাঘাতে নরকপিদ্বয় সাগরগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল। স্বর্গ মর্ত্য পাতাল প্রকম্পিত করিয়া মহাবীর উপ উপ রবে তিন বার সিংহনাদ করিলেন, তাহার পর চিলিম্পার কেশ গ্রহণপূর্বক 'জয় রাম' বলিয়া ঊর্ধ্বে লম্ফ দিলেন।

ঝঞ্ঝাবাহিত মেঘের ন্যায় হনুমান শূন্যমার্গে ধাবিত হইতেছেন। আকাশবিহারী সিদ্ধ-গন্ধর্ব-বিদ্যাধরগণ বলিতে লাগিলেন—'হে পবনাত্মজ, এতদিনে তোমার কৌমার-দশা ঘুচিল, আশীর্বাদ করি সুখী হও।' দিগ্‌বধূগণ ছুটিয়া আসিয়া বলিল—'হে অঞ্জনানন্দন, মুহূর্তের তরে গতি সংবরণ কর, আমরা নববধূর মুখ দেখিব।' হনুমান হুংকার করিলেন, গগনচারিগণ ভয়ে মেঘান্তরালে পলায়ন করিল, দিগ্‌বধূগণ দিগ্‌-বিদিকে বিলীন হইল।

চিলিম্পা কাতর কণ্ঠে কহিলে -'হে মহাবীর, আমার কেশ ছাড়িয়া দাও, বড়ই লাগিতেছে। বরং আমাকে পৃষ্ঠে নতুবা বক্ষে ধারণ কর।'

হনুমান বলিলেন—'চোপ!'

চিলিম্পা বলিলেন—'হে প্রাণবল্লভ, আমি একান্ত তোমারই হে অরসিক, তুমি কি পরিহাস বুঝিতে পার নাই? আমি যে তোমা-বই আর কাহাকেও জানি না।'

হনুমান পুনরপি বলিলেন—'চোপ!'

নিম্নে কিষ্কিন্ধ্যা দেখা যাইতেছে। সুগ্রীব স্বল্পতোয়া তুঙ্গভদ্রার গর্ভে অষ্টাধিক সহস্র পত্নীসহ জলকেলি করিতেছেন।

হনুমান মুষ্টি উন্মুক্ত করিলেন। অব্যর্থ লক্ষ্য। বানরী ঘুরিতে ঘুরিতে সুগ্রীবের স্কন্ধে নিপতিত হইল।



হে প্রাণবল্লভ, আমি একান্ত তোমারই

ভারমুক্ত হইয়া হনুমান দ্বিগুণ বেগে ধাবিত হইলেন। পঞ্চবটী—জনস্থান—চিত্রকূট—প্রয়াগ—শৃঙ্গবের—অবশেষে অযোধ্যা।

সীতা সবিস্ময়ে বলিলেন, 'একি বৎস! সংবাদ দাও নাই কেন? আমি নগরী সুসজ্জিত করিতাম, বাদ্যভাণ্ড প্রস্তুত রাখিতাম। হনুমতী কই?'

হনুমান অবনত মস্তকে বলিলেন—'মাতঃ, হনুমতীকে পাই নাই। আমি এক সামান্যা বানরী হরণ করিয়া সুগ্রীবকে দান করিয়াছি। হে দেবি, বিধাতা আমার এই বিশাল বক্ষে যে ক্ষুদ্র হৃদয় দিয়াছেন তাহা তুমি ও রামচন্দ্র পরিপূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতেছ, দারাপুত্রের স্থান নাই।'

সীতা বলিলেন—'বৎস, পিতৃ-ঋণ শোধের কি করিলে?'

হনুমান মস্তকে করাঘাত করিয়া বলিলেন—'অহো পাষণ্ড! আমি সে কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। জননী, তুমি এই বর দাও যেন অমর হইয়া চিরকাল পিতৃগণের পিণ্ডোদক বিধান করিতে পারি।'

সীতা বলিলেন—'বৎস, তাহাই হউক।'

তখন হনুমান পরিতুষ্ট হইয়া বিশাল বক্ষ প্রসারিত করিয়া ভুজদ্বয় ঊর্ধ্বে তুলিয়া বজ্রনির্ঘোষে বলিলেন—'জয় সীতারাম!'



জয় সীতারাম

১৩৩৭ (১৯৩০)

পুনর্মিলন

মহাকবি ভাস রচিত 'মধ্যম' নাটিকার আখ্যানভাগ কিঞ্চিৎ অদল-বদল করিয়া বলিতেছি।

পঞ্চপান্ডব বিন্ধ্যাবটীতে মৃগয়া করিতে গিয়াছেন। মধ্যম পান্ডব একটু বেশী চঞ্চল ও দুঃসাহসিক, তাই দল হইতে ছিটকাইয়া পথভ্রষ্ট হইয়া বনমধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। সহসা একটি রাক্ষস তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিল—'যুদ্ধং দেহি।'

রাক্ষসটি তরুণ, আষাঢ়ের সজলজলদ তুল্য তাহার কান্তি, কণ্ঠস্বরে বাল্যের মধুরতা যৌবনের গাম্ভীর্য এখনও দ্বন্দ্ব করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া ভীমের মনে যুগপৎ বীর ও বাৎসল্য রসের সঞ্চার হইল। বলিলেন—'অয়ে বালক, তোমার সঙ্গে আমি লড়িব না, বরং তোমার পিতাকে ডাক।'

রাক্ষস ঘাড় নাড়িয়া বলিল—'চাতুরী চলিবে না। হয় যুদ্ধ কর নতুবা পরাজয় স্বীকার করিয়া আমার সঙ্গে চল। আমার জননী ব্রতপালন করিয়া অভুক্ত আছেন, আজ তাঁহার পারণা। একটি হৃষ্টপুষ্ট মানুষ আনিতে বলিয়াছেন। তোমাকে বেশ স্থূলকায় দেখিতেছি, তোমার দ্বারাই তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবে।'

ভীমের কৌতূহল হইল। বলিলেন—'বেশ, চল।'

অনেক বনজঙ্গল গিরি নদী অতিক্রম করিয়া রাক্ষস ভীমকে একটি প্রকান্ড পর্বতগুহার দ্বারদেশে আনিল। ডাকিল—'মাতঃ, আহার্য উপস্থিত।'

ভিতর হইতে রাক্ষসী বলিল—'চিরজীবী হও বৎস, তোমাকে গর্ভে ধারণ করা সার্থক হইল।'

অতঃপর ভীম রোমাঞ্চিত হইয়া শুনিলেন রাক্ষসী তাহার এক চেটীকে বলিতেছে—'হঞ্জে, মনুষ্যটিকে বড় বড় করিয়া কর্তন কর। উত্তমরূপে সিদ্ধ হইলে কিঞ্চিৎ গন্ধক স্ফোটন দিয়া সন্তলন করিয়া নামাইও। বক্ষস্থল ও বাহুদ্বয় ছেলের জন্য রাখিও, পদদ্বয় তোমার, মুন্ডটি আমি খাইব।'

রাক্ষস বলিল—'মাতঃ, একবার বাহিরে আসিয়া দেখ কেমন শিকার আনিয়াছি।'

রাক্ষসী বলিল—'ও আর দেখিব কি। সব মানুষই সমান, ভাল করিয়া রাঁধিলে কে ঋষি কে চন্ডাল টের পাওয়া যায় না। আমার এখন সময় নাই, চুল বাঁধিতেছি।'

রাক্ষস বলিল—'চুল বাঁধা এখন থাকুক, একবার বাহিরে আসিয়া দেখ।'

পুত্রের নির্বন্ধাতিশয়ে রাক্ষসী গুহা হইতে নির্গত হইয়া বাহিরে আসিল। ভীমকে দেখিয়া চমকিত হইয়া জিহ্বা দংশন করিয়া কহিল—'ওমা, আর্যপুত্র যে! ছি ছি লজ্জায় মরি! ওরে উন্মাদ, ওরে ঘটোৎকচ, প্রণাম কর বেটা।'



ছি ছি লজ্জায় মরি!

ভীম বলিলেন—'কে ও, দেবী হিড়িম্বা? প্রিয়ে, আজ ধন্য আমি।' রাক্ষসী কি খাইল ভাস তাহা লেখেন নাই।

১৩৩৬ (১৯২৯)

উপেক্ষিত

শহর ফতেহাবাদ, সময় অপরাহ্ন। শাহজাদী জবরউন্নিসা দিলতোড়বাগ উদ্যানে একাকিনী বসিয়া আছেন। সমান্তরাল তরুশ্রেণীর শীর্ষে অস্তরাগ ঝিকমিক করিতেছে, ডালে ডালে হাজার বুলবুলের কাকলি, গোলাবের ফোয়ারায় রামধনুর রংবাহার, ফুলে ফুলে চারিদিক ছয়লাপ। শাহজাদীর হাতে রবাব, তাহাতে তিনি কোমল গুঞ্জন তুলিয়া আপন মনে মৃদুস্বরে গাহিতেছেন। তাঁহার প্রিয় ব্যাঘ্র হেম-



শাহজাদী জবরউন্নিসা

কান্তি ফারুকশিয়র পদ-প্রান্তে বসিয়া থাবা দিয়া তাল দিতেছে এবং মাঝে মাঝে স্বামিনীর বিজাপুরী জরিদার লাল চটিজুতা চাটিতেছে।

সহসা একটি পুরুষ মূর্তির আবির্ভাব। গৌরবর্ণ বলিষ্ঠ দেহ, বক্রাগ্র দাড়ি, বহুমূল্য পরিচ্ছদ, কটিবন্ধে রত্নখচিত পিধানে নিহিত দামস্কসীয় তলবার। ইনিই সুবিখ্যাত কোফতা খাঁ, বাদশাহের সেনাপতি ও দক্ষিণহস্ত।

জবরউন্নিসা চমকিত হইয়া বলিলেন—'একি, কোফতা খাঁ, তুমি এখানে?'

সেনাপতি কহিলেন—'হাঁ সুন্দরী। আজ আমি একটা হেস্ত-নেস্ত করিতে চাই। তুমি বহুকাল আমাকে ছলনা করিয়াছ, আজ জবান খুলিয়া বল আমাকে বিবাহ করিবে কি না।'

জবরউন্নিসা কন্দর্পচাপতুল্য তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—'বেওকুফ, তুমি কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছ? ছিলে নগণ্য কিজিলবাশ ক্রীতদাস, আজ বাদশাহের দয়ায় সেনাপতি হইয়াছ। বস্, ঐখানেই ক্ষান্ত হও, অধিক ঊর্ধ্বে নজর দিও না।'

কোফতা খাঁ যথোচিত ভীষণতা সহকারে একটি অট্টহাস্য হাসিলেন। বলিলেন, —'শাহজাদী, কে তোমার পিতাকে তখ্‌তে চড়াইয়াছে? মারহাট্টার আক্রমণ কে বার বার রোধ করিয়াছে? কাহার অনুগ্রহে তোমার এই ভোগৈশ্বর্য, এই হীরাজহরৎ, এই লীলা-উদ্যান, এই হাজার-বুলবুল-মুখরিত বুস্তাঁ? ইন্‌শাল্লাহ্! জান, একটি অঙ্গুলির হেলনে সমস্ত ভূমিসাৎ করিতে পারি? আজ হিন্দুস্তানের প্রকৃত মালিক কে? তোমার অক্ষম পিতা, না এই মহাবীর রুস্তম্-ই-হিন্দ কোফতা খান ফতে জঙ্গ্?'

জবরউন্নিসা বলিলেন—'কুত্তার গর্দানে লোমা গজাইলেই সে সিংহ হয় না।'

সেনাপতি কহিলেন—'বিস্‌মিল্লাহ্! এই কথা আর কেহ বলিলে এই মুহূর্তে তাহাকে কোতল করিতাম। কিন্তু তুমি আমার দিল গিরিফতার করিয়াছ, এবারকার মত মাফ করিলাম। যাহা হউক, এখনও বল তুমি আমার হৃদয়েশ্বরী হইবে কি না।'

জবরউন্নিসা মধুর হাস্য করিয়া বলিলেন—'কোফতা খাঁ, তুমি কি কবি হাফেজের সেই বয়েতটি জান না?—কুকুর বার বার ঘেউ ঘেউ করে, কিন্তু সিংহী একবারই গর্জায়।'

ইহার পর কোন পুরুষই স্থির থাকিতে পারে না, বিশেষত সেই দারুণ মুঘল যুগে। কোফতা খাঁ হুংকার করিয়া কহিলেন—'ইল্‌হম্‌দলিল্লাহ্! শাহজাদী, তবে আল্লার নাম স্মরণ করিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।' কোষ হইতে সড়াক করিয়া অসি নির্গত হইল।

'কোফতা খাঁ, তুমি আমাকে নিতান্তই হাসাইলে!' এই বলিয়া শাহজাদী অন্যমনস্কভাবে গুনগুন করিয়া গাহিতে লাগিলেন—'চল্ চল্ চম্বেলীবাগ পর মেরা বাঘকো খিলাউংগি।'

অসহ্য। কোফতা খাঁর নিষ্ঠুর হস্তে তলবার ঝলকিয়া উঠিল। সহসা শূন্যে যেন সৌদামিনী খেলিল. একটি হিল্লোলিত কাঞ্চনকায়া নিমেষের তরে উৎক্ষিপ্ত হইয়া আবার ভূতলে পড়িল। একটু অস্ফুট আর্তনাদ, একটু ছটফটানি, তাহার পর সব শেষ।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইতেছে। জবরউন্নিসা তখন যন্ত্রে ঝংকার তুলিয়া গাহিতেছেন—'আয়সে বেদরদীকে পালে পড়ী হুঁ।' তাঁহার পোষা বাঘটি ভোজন সমাপ্ত করিয়া পরম তৃপ্তির সহিত সৃক্কণী পরিলেহন করিতেছে। তাহার বাঁয়ে কোফতা খাঁর পাগড়ি, ডাহিনে ছিন্ন ইজার কাবা জোব্বা, সম্মুখে কিঞ্চিৎ হাড়।

১৩৩৬ (১৯২৯)

উপেক্ষিতা

তিন নম্বর রোডোডেনড্রন রোড, বালিগঞ্জ। বাহিরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। ড্রইংরুমে পিয়ানোর কাছে উপবিষ্ট গরিমা গাঙ্গুলী, তাহার সম্মুখে ইজিচেয়ারে চটক রায়। ঘরে আসবাব বেশী নাই, কারণ গরিমার বাবার ঢাকায় বদলির হুকুম আসিয়াছে, অধিকাংশ জিনিস প্যাক হইয়া আগেই রওনা হইয়া গিয়াছে।

এই চটক ছেলেটি যেমন ধনী তেমনই মিষ্টভাষী বিনয়ী বাধ্য, চিমটি কাটিলেও টুঁ শব্দ করে না—যাহাকে বলে নারীর মনুষ্য অর্থাৎ লেডিজম্যান। না হইবে কেন, সে যে পাঁচ বৎসর বিলাতে থাকিয়া সেরেফ এটিকেট অধ্যয়ন করিয়াছে। এমন সুপাত্র আজকালকার বাজারে দুর্লভ। গরিমার পিতামাতা কলিকাতা ত্যাগের পূর্বেই কন্যাকে বাগ্‌দত্তা দেখিতে চান, তাই তাঁহারা যাত্রার পূর্বসন্ধ্যায় ভাবী দম্পতীকে বিশ্রম্ভালাপের সুযোগ দিয়া দোতলায় বসিয়া সুসংবাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

কিন্তু আলাপ তেমন জমে নাই। গোটা-পনের গান শেষ করিয়া গরিমা তৃতীবার জানাইল—'কাল আমরা যাচ্ছি।'

চটক বলিল—'ও।'

হায় রে, বিদায়বার্তার এই কি উত্তর! গরিমার কথা যোগাইতেছে না। ত বলিল—'সেই ভুটানী গজলটা গাইব কি?'

'নাঃ. এইবার ওঠা যাক।'

'সেকি হয়, আগে বৃষ্টি থামুক।'

চটক চেয়ারে বসিয়া নীরবে উশখুশ করিতে লাগিল। মিনিট-দুই পরে আবার বলিল—'এইবার উঠি।'

গরিমা ভাবিতেছিল, কবি বৃথাই লিখিয়াছেন—'এমন দিনে তারে বলা যায়।' এই বাদল সন্ধ্যা কি নিষ্ফল হইবে? চটকের কি হইল? কেন সে পালাইতে চায়? তাহার কিসের অস্বস্তি, কিসের অস্থিরতা? গরিমার মোহিনী শক্তি আজ তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। সেই ভেটকি-মুখী বেহায়া মেনী মিত্তিরটা চটককে হাত করে নাই তো? হবেও বা, যা গায়ে পড়া মেয়ে! গরিমা তাহার কণ্ঠাগত ক্রন্দন গিলিয়া ফেলিয়া বলিল—'আর একটু বসুন।'

কিন্তু চটক বসিল না। চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—'নাঃ, চললুম, গুড্‌নাইট।'

বৃষ্টির নিরবচ্ছিন্ন ঝমঝমানি ভেদ করিয়া চটকের মোটর গুঞ্জরিয়া উঠিল। গেল, যাহা বলিবার তাহা না বলিয়াই চলিয়া গেল—ভোঁপ, ভোঁপ—দূরে, বহু দূরে।



দেহলতা এলাইয়া দিল

গরিমা কাঁদিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া চটকের পরিত্যক্ত চেয়ারে দেহলতা এলাইয়া দিল। তাহার পরেই এক লাফ। ভীষণ সত্য সহসা প্রকট হইল। বেচারা চটক!

চেয়ারে অগনিত ছারপোকা।

১৩৩৬ (১৯২৯)

গুরুবিদায়

বৈকালিক প্রসাধনের পর মানিনী দেবী একটি বড় আরশির সামনে দাঁড়াইয়া নিজের অঙ্গশোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন, এমন সময় একজোড়া গোঁফের প্রতিবিম্ব তাঁহার কাঁধের উপর ফুটিয়া উঠিল।

উক্ত গোঁফের মালিক তাঁহার স্বামী রায় বংশলোচন ব্যানার্জি বাহাদুর জমিদার অ্যান্ড অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট বেলিয়াঘাটা। মানিনী একটি ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ঘাড় না ফিরাইয়াই বলিলেন—'কি সুখেই যে মোটা হচ্ছি!'

বংশলোচন রসিকতার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—'কেন, সুখের কমটাই বা কি, অমন যার স্বামী!'

মানিনী যদি সামান্য পাড়াগেঁয়ে স্ত্রীলোক হইতেন তবে হয়তো বলিয়া ফেলিতেন —পোড়াকপাল অমন স্বামীর। কিন্তু তাঁহার বাকসংযম অভ্যাস আছে, সেজন্য বলিলেন—'স্বামী তো খুবই ভাল, আমিই যে মন্দ।'

কথার ধারা গহন অরণ্যের দিকে মোড় ফিরিতেছে দেখিয়া বংশলোচন নিপুণ সারথির ন্যায় বলিলেন—'কি যে বল তার ঠিক নেই। কিসের অভাব তোমার? হুকুম করলেই তো হয়।'

মানিনী এইবার স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—'বয়েস তো বেড়েই চলেছে, ধম্মকম্ম কিছুই হল না।'

বংশলোচন বলিলেন—'কেন, এই যে আর বৎসর গয়া কাশী বৃন্দাবন আগ্রা দিল্লী ঘুরে এলে?'

'ভারী তো, তার ফল আর কদিন টিকবে। ইচ্ছে হয় মন্তর-টন্তর নি।'

'তা বেশ তো, সে তো খুব ভাল কথা। আমি চাটুজ্যে মশায়ের সঙ্গে এখনই পরামর্শ করছি।'

কিন্তু বংশলোচনের মন বলিতে লাগিল যে কথাটি মোটেই ভাল নয়। ইঁহাদের বাইশ বৎসর ব্যাপী দাম্পত্যজীবনে অসংখ্যবার প্রীতির শৃঙ্খল মেরামত করিতে হইয়াছে, কিন্তু বংশলোচনের প্রাধান্য এ পর্যন্ত মোটামুটি বজায় আছে। পত্নীর গুরুভক্তি যদি প্রবলা হইয়া ওঠে তবে স্বামীর আসন কোথায় থাকিবে? গুরু যদি কেবল অখণ্ডমণ্ডলাকারের পদটি দেখাইয়া দিয়া ক্ষান্ত হন তবে কোনও আপত্তির কারণ থাকে না। কিন্তু গুরু যদি নিজেই ঐ পদটি দখল করিয়া বসেন তবেই চিন্তার কথা। মুশকিল এই যে, ধর্মের ব্যাপারে ঈর্ষা অভিমান শোভা পায় না। তবে এক হিসাবে তাঁহার পত্নীর এই নূতন শখটি নিরাপদ। মানিনী দেবী অত্যন্ত একগুঁয়ে মহিলা। যদি দেশের বর্তমান হুজুগের বশে তাঁহার পিকেটিং করিবার বা প্রভাতফেরি গাহিবার ঝোঁক হইত তবে বংশলোচনের মান-ইজ্জত অনারারি

হাকিমি কোথায় থাকিত ? তাঁহার মুরুব্বী ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবই বা কি বলিতেন ? মোটের উপর দেশভক্তির চেয়ে গুরুভক্তিতে ঝঞ্ঝাট ঢের কম।

বংশলোচন বৈঠকখানায় আসিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গগণের নিকট পত্নীর অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। বৃদ্ধ কেদার চাটুজ্যে মহাশয় বলিলেন—'বউমার সংকল্প অত্যন্ত সাধু, তবে একটি সদ্‌-গুরু দরকার। তোমাদের পৈতৃক গুরুর কুলে কেউ বেঁচে নেই ?'

বংশলোচন বলিলেন—'শুনেছি একটি গুরুপুত্তুর আছেন, তিনি থিয়েটারে আবদালা সাজেন।'

'রাধামাধব ! আচ্ছা, আমাদের গুরুপুত্তুরটিকে একবার দেখলে পার। সেকেলে মানুষ, শাস্ত্রটাস্ত্র জানেন না বটে, কিন্তু পৈতৃক ব্যবসাটি বজায় রেখেছেন।'

উকিল বিনোদবাবু বলিলেন—'চাটুজ্যেমশায়, আপনি এখনও সত্যযুগে আছেন। আজকাল আর সেকেলে গুরুর চলন নেই যিনি বছরে বার-দুই শিষ্যবাড়ি পায়ের ধুলো দেন আর পাঁচ সের চাল, পাঁচ পো চিনি, গোটা দশেক টাকা লাট্টু মার্কা থান ধুতিতে বেঁধে প্রস্থান করেন। এখন এমন গুরু চাই যাঁর চেহারা দেখলে মন খুশী হয়, বচন শুনলে প্রাণ আনচান করে।'

বংশলোচনের ভাগনে উদয় বলিল—'মামাবাবু যদি মামীকে মুরগি ধরাতেন তবে আর এসব খেয়াল হত না। তাইজন্যেই তো আমার শাশুড়ী মন্তর নিতে পারছেন না।'

চাটুজ্যে বলিলেন—'ছাই জানিস উদো। উপেন পালের নাম শুনেছিস ? সেবার মধুপুরে গিয়ে দেখলুম—প্রকাণ্ড বাড়ি, দশ বিঘে বাগান, দশটা গাই, এক পাল মুরগি। রাজর্ষির চালে থাকেন, ঘরের তরি-তরকারি, ঘরের দুধ, ঘরের মুরগি। সস্ত্রীক ধর্ম আচরণ করেন, সঙ্গে চার জন গুরু হামেহাল হাজির, নিজের দুজন, স্ত্রীর দুজন।'

উপযুক্ত গুরু কে আছেন এই লইয়া অনেকক্ষণ আলোচনা হইল। পর্বতবাসী সন্ন্যাসী, আশ্রমবাসী মহারাজ, স্বচ্ছন্দচারী লেংটাবাবা, বৈজ্ঞানিক মহাপুরুষ, উদার-পন্থী আধুনিক সাধু—অনেকের নাম উঠিল। কিন্তু মুশকিল এই, বংশলোচন যাঁহাকে উপযুক্ত অর্থাৎ নিরাপদ মনে করেন, গৃহিণীর হয়তো তাঁহাকে পছন্দ হইবে না।

এমন সময় বংশলোচনের শালা নগেন দোতলা হইতে নামিয়া আসিয়া বলিল—'আপনারা আর মাথা ঘামাবেন না, দিদি গুরু ঠিক করে ফেলেছেন।'

বংশলোচন ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কে ?'

'বালিগঞ্জের খল্বিদং স্বামী। অ্যাসা সুন্দর গাইতে পারেন ! চেহারাটিও তেমনি, বয়সে এই জামাইবাবুর চেয়ে কিছু কম হবে। শুনেছি ছেলেবেলা থেকেই একটা উদাস উদাস ভাব ছিল, টেনিস খেলতে খেলতে কতবার অজ্ঞান হয়ে পড়তেন। সংসারে যদ্দিন ছিলেন, নাম ছিল পরান সরকার। তারপর স্ত্রীবিয়োগ হতেই স্বামী হয়েছেন। এখন তাঁর প্রায় দু-শ শিষ্য, চার-শ শিষ্যা।'

'একবারে সব ঠিক হয়ে গেছে নাকি ?'

'উঁহু, দিদি তাতে চালাক আছেন। কাল স্বামীজীকে নিয়ে আসছি, এখানে হপ্তা-খানেক জাঁকড়ে থাকবেন, যাকে বলে প্রোবেশন। তারপর দিদির যদি ভক্তিটক্তি হয় তবে মন্তর নেবেন।'

চাটুজ্যে মহাশয় বলিলেন—'অতি উত্তম ব্যবস্থা। গুরুটির সন্ধান দিলে কে?'

নগেন বলিল—'আমিই দিয়েছি। আমার বন্ধুদের মহলে ওর খুব খ্যাতি। আপনারাও দেখলে মোহিত হয়ে যাবেন।'

পরদিন খল্বিদং স্বামীর শুভাগমন হইল, সঙ্গে কেবল একটি কমণ্ডলু আর একটি বড় সুটকেশ। নগেন মিথ্যা বলে নাই, টকটকে গৌরবর্ণ, চাঁচর ঝাঁকড়া চুল, মধুর কণ্ঠস্বর, চোখে একটা অপূর্ব প্রতিভাম্বিত ঢুলুঢুলু ভাব। ছ-শ শিষ্য হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়।

মানিনী দেবী প্রত্যহ শুদ্ধাচারে ভাবী গুরুদেবের সেবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। স্বামীজীর নিত্যকর্মপদ্ধতি একেবারে ধরাবাঁধা। সকালবেলা অনুপান-সহ তিন পাথরবাটি চা, দ্বিপ্রহরে পবিত্র অন্ন-ব্যঞ্জন, তাহার পর ঘণ্টা তিন-চার যোগনিদ্রা, বিকালে নানাপ্রকার ফলমূল মিষ্টান্ন, পুনর্বার চা, সন্ধ্যায় মধুর কণ্ঠে ধর্মব্যাখ্যা, সঙ্গীত ও ঘুঙুর পরিয়া ভাবনৃত্য, রাত্রে সাত্ত্বিক লুচি পোলাও কালিয়া।

মানিনীর অন্তরে একটা সাড়া পড়িয়াছে। নভেল পড়া, লেস বোনা, ছাঁটা পশমের আসন তৈয়ারী প্রভৃতি সাংসারিক কার্যে আর তাঁহার মন নাই। প্রথম দিনেই তিনি নিজের হাতে স্বামীজীর উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিলেন। দ্বিতীয় দিনে পাতে প্রসাদ পাইলেন। তৃতীয় দিনে বংশলোচন রোমাঞ্চিত হইয়া দেখিলেন—খল্বিদংএর চর্বিত আকের ছিবড়া মানিনী পরম ভক্তি সহকারে চুষিতেছেন। বংশ-লোচন বার বার স্বামীজীর বাণী স্মরণ করিতে লাগিলেন—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, এ সমস্তই ব্রহ্ম—কিন্তু মন প্রবোধ মানিল না। ব্রহ্ম নিখিল চরাচরে থাকিতে পারেন, কিন্তু আকের ছিবড়ায় থাকিবেন কোন্ দুঃখে? একথা মনে করিতেই চিত্ত বিদ্রোহী হয়, পিত্ত চটিয়া ওঠে। ছি ছি বলিলে যথেষ্ট বলা হয় না, তোবা তোবা বলিতে ইচ্ছা করে।

চাটুজ্যে মহাশয় শুনিয়া বলিলেন—'তাইতো, বেশী বাড়াবাড়ি হচ্ছে। এই নগেনটাই যত নষ্টের গোড়া। দেশী ঠাকুরমশায় তোর দিদির মনে না ধরে তো একটা জটাধারী গাঁজাখোর আনলেই তো পারতিস।'

নগেন বলিল—'বা রে, আমি কেমন ক'রে জানব যে দিদির অত ভক্তি হবে?'

বংশলোচন কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—'এখন কি করা যায়?'

বিনোদ বলিলেন—'একটা ভৈরবী-টৈরবী ধ'রে এনে তুমিও সাধনা শুরু কর, বিষে বিষক্ষয় হয়ে যাক। আর যদি সাহস থাকে তবে গিন্নীকে মনের কথা খুলে বল, খল্বিদংকে অর্ধচন্দ্রং দাও।'

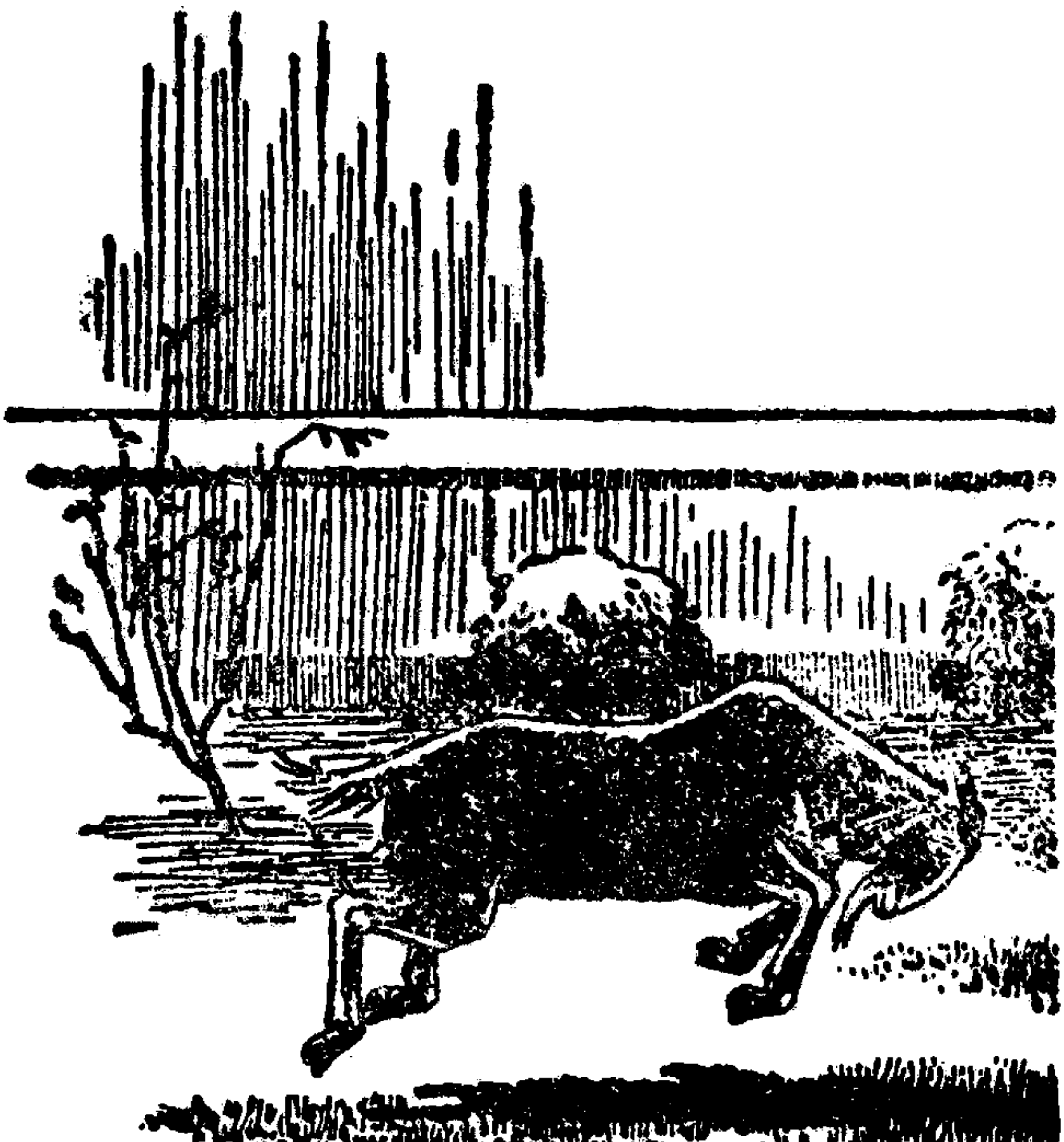
নগেন বলিল—'তা হলে দিদি ভয়ঙ্কর চটবে।'

কথাটা ভয়ংকর সত্য, পত্নীর ধর্মাচরণে বাধা দেওয়া সহজ কথা নয়। বংশলোচন আকুল চিন্তাসাগরে হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। এমন যে বিচক্ষণ চাটুজ্যে মহাশয় আর তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিনোদ উকিল, ইঁহারাও প্রতিকারের কোনও সুসাধ্য উপায়

খুঁজিয়া পাইতেছেন না। হায় হায়, কে তাঁহাকে রক্ষা করিবে? ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া হাল ছাড়িয়া বসিয়া থাকা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

মানিনী মনস্থির করিয়া ফেলিয়াছেন, খল্বিদংকেই গুরুত্বে বরণ করিবেন। কাল সকালে দীক্ষা। বাড়ির পূর্বদিক সংলগ্ন যে মাঠটি আছে তাহাতে একটি বেদী রচনা করিয়া চারিদিকে ফুলের টব দিয়া সাজানো হইয়াছে। আজ বৈকালে খল্বিদং নিজে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্ত আয়োজন তদারক করিতেছেন। বংশলোচন, চাটুজ্যে, বিনোদ ইত্যাদি পিছনে পিছনে আছেন, মানিনীও একটু তফাতে থাকিয়া সমস্ত দেখিতেছেন।

খল্বিদং গুনগুন করিয়া গান করিতে করিতে পায়চারি করিতেছেন এমন সময় তাঁহার নজরে পড়িল—মাঠের শেষ দিকে একটি বৃহদাকার ছাগল তাঁহাকে সতৃষ্ণ-নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছে। এই ছাগলটি লম্বকর্ণ নামে খ্যাত। সে যখন ছোট



নক্ষত্রবেগে সম্মুখে ছুটিল

ছিল তখন বংশলোচন তাহাকে বেওয়ারিস অবস্থায় কুড়াইয়া পাইয়া বাড়িতে আনেন। সেই অবধি সে পরিবারভুক্ত হইয়া গিয়াছে এবং মানিনীর অত্যধিক আদর পাইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। এখন তাহার নবীন যৌবন। লম্বকর্ণ যদি মনুষ্য হইত

তবে এ বয়সে তাহাকে তরুণ বলা চলিত। কিন্তু সে অজন্মের অভিশাপ লইয়া জন্মিয়াছে, তাই লোকে তাহাকে বলে বোকাপাঁঠা।

খল্বিদং স্বামী লম্বকর্ণকে দেখিয়া প্রসন্নবদনে বলিলেন—'শ্রীভগবানের কি অপূর্ব সৃষ্টি এই জীবটি। বেঁচে থাকার যে আনন্দ, তা এতে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। প্রাণশক্তি যেন সর্বাঙ্গে উথলে উঠছে।'

স্বামীজী মাঠের নরম ঘাসের উপর বসিয়া পড়িলেন এবং এক মুঠা ঘাস ছিঁড়িয়া লইয়া ডাকিলেন—'আ—তু তু তু।'

লম্বকর্ণ আসিল না, স্বামীজীর দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে পিছু হটিতে লাগিল।

স্বামীজী বলিলেন—'আহা অবোধ জীব, কিঞ্চিৎ ভীত হয়েছে, আমাকে এখনও চেনে না কিনা। তোমরা ওকে তাড়া দিও না, জীবকে আকর্ষণ করার উপায় হচ্ছে অসীম করুণা, অগাধ তিতিক্ষা। আ—তু তু তু তু।'

লম্বকর্ণ ভীত হইবার ছেলে নয়। আসল কথা প্রথম দর্শনেই খল্বিদংএর উপর তাহার একটা অহৈতুকী অভক্তি জন্মিয়াছে। আজ তাঁহার মুখের মধুর হাসিটুকু দেখিয়া সেই অহৈতুকী অভক্তি অকস্মাৎ একটা বেয়াড়া বদখেয়ালে পরিণত হইল। লোকে যাহাই বলুক, লম্বকর্ণ মোটেই বোকা নয়। ছাগল হইলে কি হয়, তাহার



কার সাধ্য রোধে তার গতি

একটা সহজাত বৈজ্ঞানিক প্রতিভা আছে। লম্বকর্ণ কলেজে পড়ে নাই, পাস করে নাই, তথাপি জানা আছে যে বেগ আহরণ করিতে হইলে যথাসম্ভব দূর হইতে ধাবমান হওয়াই যুক্তিসংগত। আরও জানা আছে যে তাহার দেহের দেড় মণ মাংসকে

যদি তাহার বেগের অঙ্ক দিয়া গুণ করা হয় তবে যে বৈজ্ঞানিক রাশি উৎপন্ন হয় তাহার ধাক্কা সামলানো মানুষের অসাধ্য।

কিছুদূর পিছু হটিয়া লম্বকর্ণ এক মুহূর্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তাহার পর ঘাড় নীচু করিয়া শিং বাঁকাইয়া স্বামীজীর নধর উদর নিশানা করিয়া নক্ষত্রবেগে সম্মুখে ছুটিল।

স্বামীজীর মুখে প্রসন্ন হাসি তখনও লাগিয়া আছে, কিন্তু আর সকলে ব্যাপারটি বুঝিয়া লম্বকর্ণকে নিরস্ত করিবার জন্য ত্রস্ত চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু কার সাধ্য রোধে তার গতি। নিমেষের মধ্যে লম্বকর্ণের প্রচন্ড গুঁতা ধাঁই করিয়া লক্ষ্য স্থানে পৌঁছিল, খল্বিদং একবার মাত্র বাবা গো বলিয়া ডিগবাজি খাইয়া ধরাশায়ী হইলেন।

ডাক্তারবাবু বলিলেন—'শুধু বোরিক কমপ্রেস। পেট ফুটো হয়নি, চোটও বেশী লাগেনি, তবে শক্-টা খুব খেয়েছেন। একটু পরেই উঠে বসতে পারবেন, তখন আবার দু ড্রাম ব্রাণ্ডি। ব্যথাটা সারতে দিন-পনর লাগবে।'

ডাক্তার অত্যুক্তি করেন নাই। কিছুক্ষণ পরেই খল্বিদং চাঙ্গা হইয়া উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন—'ছাগলটা গেল কোথায় ?'

বিনোদবাবু বলিলেন—'সেটাকে বেঁধে রাখা হয়েছে, আপনার কোন ভয় নেই।'

স্বামীজী বলিলেন—'ভয় আমি কোনও শালার করি না। কিন্তু ছাগলটাকে এক্ষুনি মেরে তাড়াতে হবে, ওটা মূর্তিমান পাপ।'

বিনোদবাবু বলিলেন—'বলেন কি মশায়, আপনারা হলেন করুণার অবতার, পাপীকে যদি ক্ষমা না করেন তবে বেচারা দাঁড়ায় কোথা ? আর লম্বকর্ণের স্বভাবটা তো হিংস্র নয়, আজ বোধ হয় হঠাৎ কিরকম ব্লড-প্রেশার বেড়ে গিয়ে মাথা গরম হয়ে—কি বলেন ডাক্তারবাবু ?'

উদয় বলিল—'বউ আজ ওকে একছড়া গাঁদাফুলের মালা খাইয়েছে, তাইতে বোধ হয়।'

খল্বিদং ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন—'ও-সব আমি শুনতে চাই না। এ বাড়িতে দুজনের স্থান নেই, হয় আমি নয় ঐ ব্যাটা।'

বংশলোচন দুরুদুরু বক্ষে পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—'কি বল ? ছাগলটাকে তা হলে বিদেয় করা যাক ?'

মানিনী সবেগে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—'কাপরে, সে আমি পারব না।' এই কথা বলিয়াই তিনি সটান দোতলায় গিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বংশলোচনের এক জোড়া ছেঁড়া মোজা মেরামত করিতে লাগিয়া গেলেন।

খল্বিদং বলিলেন—'তা হলে আমিই বিদায় হই।'

চাটুজ্যে মহাশয় স্বামীজীর পিঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন—'যা বলেছ দাদা। এই নির্বান্ধব পুরে দুশমনের হাতে কেন প্রাণটা খোয়াবে, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও, বেঁচে থাকলে অনেক শিষ্য জুটবে। এস, আমি একটা ট্যাক্সি ডেকে দিচ্ছি।'

বংশলোচন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতে লাগিলেন—স্ত্রীচরিত্র কি অদ্ভুত জিনিস।

১৩৩৭ (১৯৩০)

মহেশের মহাযাত্রা

কেদার চাটুজ্যে মহাশয় বলিলেন—'আজকাল তোমরা সামান্য একটু বিদ্যে শিখে নাস্তিক হয়েছ, কিছুই মানতে চাও না। যখন আরও একটু শিখবে তখন বুঝবে যে আত্মা আছেন। ভূত, পেতনী—এঁরাও আছেন। বেহ্মদত্যি, কন্ধকাটা—এঁরারাও আছেন।'

বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানায় গল্প চলিতেছিল। তাঁহার শালা নগেন বলিল—'আচ্ছা বিনোদ-দা, আপনি ভূত বিশ্বাস করেন?'

বিনোদ বলিল—'যখন প্রত্যক্ষ দেখব তখন বিশ্বাস করব। তার আগে হাঁ-না কিছুই বলতে পারি না।'

চাটুজ্যে বলিলেন—'এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি ওকালতি কর! বলি, তোমার প্রপিতামহকে প্রত্যক্ষ করেছ? ম্যাকডোনাল্ড, চার্চিল আর বালডুইনকে দেখেছ? তবে তাদের কথা নিয়ে অত মাতামাতি কর কেন?'

'আচ্ছা, আচ্ছা, হার মানছি চাটুজ্যেমশায়।'

'আপ্তবাক্য মানতে হয়। আরে, প্রত্যক্ষ করা কি যার তার কম্ম? শ্রীভগবান কখনও কখনও তাঁর ভক্তদের বলেন—দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ। সেই দিব্যদৃষ্টি পেলে তবে সব দেখতে পাওয়া যায়।'

নগেন জিজ্ঞাসা করিল—'আপনি দেখতে পেয়েছেন চাটুজ্যেমশায়?'

'জ্যাঠামি করিস নি। এই কলকাতা শহরে রাস্তায় যারা চলাফেরা করে—কেউ কেরানী, কেউ দোকানী, কেউ মজুর, কেউ আর কিছু—তোমরা ভাব সবাই বুঝি মানুষ। তা মোটেই নয়। তাদের ভেতর সর্বদাই দু-দশটা ভূত পাওয়া যায়। তবে চিনতে পারা দুষ্কর। এই রকম ভূতের পাল্লায় পড়েছিলেন মহেশ মিত্তির।'

'কে তিনি?'

'জান না? আমাদের মজিলপুরের চরণ ঘোষের মামার শালা। এককালে তিনি কিছুই মানতেন না, কিন্তু শেষ দশায় তাঁকেও স্বীকার করতে হয়েছিল।'

সকলে একবাক্যে বলিলেন—'কি হয়েছিল বলুন না চাটুজ্যেমশায়!'

চাটুজ্যে মহাশয় হুঁকাটি হাতে তুলিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।

ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর আগেকার কথা। মহেশ মিত্তির তখন শ্যামবাজারের শিবচন্দ্র কলেজে প্রফেসরি করতেন। অঙ্কের প্রফেসর, অসাধারণ বিদ্যে, কিন্তু প্রচণ্ড নাস্তিক। ভগবান আত্মা পরলোক কিছুই মানতেন না। এমন কি, স্ত্রী মারা গেলে আর বিবাহ পর্যন্ত করেন নি। খাদ্যাখাদ্যের বিচার ছিল না, বলতেন—শুয়োর না খেলে হিঁদুর উন্নতির আশা নেই, ওটা বাদ দিয়ে কোনও জাত বড় হ'তে পারে নি। মহেশের চাল-

চলনের জন্য আত্মীয়স্বজন তাঁকে একঘরে করেছিল। কিন্তু যতই অনাচার করুন তাঁর স্বভাবটা ছিল অকপট, পারতপক্ষে মিথ্যা কথা কইতেন না। তাঁর পরমবন্ধু ছিলেন হরিনাথ কুণ্ডু, তিনিও ঐ কলেজের প্রফেসর, ফিলসফি পড়াতেন। কিন্তু বন্ধু হ'লে কি হয়, দুজনে হরদম ঝগড়া হ'ত, কারণ হরিনাথ আর কিছু মানুন না মানুন ভূত মানতেন। তা ছাড়া মহেশবাবু অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, কেউ তাঁকে হাসতে দেখেনি, আর হরিনাথ ছিলেন আমুদে লোক, কথায় কথায় ঠাট্টা ক'রে বন্ধুকে উদ্‌ব্যস্ত করতেন। তবু মোটের ওপর তাঁদের পরস্পরের প্রতি খুব একটা টান ছিল।

তখন রাজনীতি চর্চার এত রেওয়াজ ছিল না, আর ভদ্রলোকের ছেলের অন্নচিন্তাও এমন চমৎকারা হয় নি, দু-একটা পাস করতে পারলে যেমন-তেমন চাকরি জুটে যেত। লোকের তাই উঁচুদরের বিষয় আলোচনা করবার সময় ছিল। ছোকরারা চিন্তা করত—বউ ভালবাসে কি বাসে না। যাদের সে সন্দেহ মিটে গেছে, তারা মাথা ঘামাত—ভগবান আছেন কি নেই। একদিন কলেজে কাজ ছিল না, অধ্যাপকেরা সকলে মিলে গল্প করছিলেন। গল্পের আরম্ভ যা নিয়েই হ'ক, মহেশ আর হরিনাথ কথাটা টেনে নিয়ে ভূতে আর ভগবানে হাজির করতেন, কারণ এই নিয়ে তর্ক করাই তাঁদের অভ্যাস। এদিনও তাই হয়েছিল।

আলোচনা শুরু হয় ঝি-চাকরের মাইনে নিয়ে। কলেজের পণ্ডিত দীনবন্ধু বাচস্পতিমশায় দুঃখ করছিলেন—'ছোটলোকের লোভ এত বেড়ে গেছে যে আর পেরে ওঠা যায় না।' মহেশবাবু বললেন—'লোভ সকলেরই বেড়েছে, আর বাড়াই উচিত, নইলে মনুষ্যত্বের বিকাশ হবে কিসে।' পণ্ডিতমশায় উত্তর দিলেন—'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।' মহেশবাবু পালটা জবাব দিলেন—'লোভ ত্যাগ করলেও মৃত্যুকে ঠেকানো যায় না।'

তর্কটা তেমন জুতসই হচ্ছে না দেখে হরিনাথবাবু একটু উসকে দেবার জন্য বললেন—'আমাদের মতন লোকের লোভ হওয়া উচিত মৃত্যুর পর। মাইনে তো পাই মোটে পৌনে দু-শ, তাতে ইহকালের কটা শখই বা মিটবে, তাইতো পরকালের আশায় বসে আছি আত্মাটা যদি স্বর্গে গিয়ে একটু ফুর্তি করতে পারে।'

দীনবন্ধু পণ্ডিত বললেন—'কে বললে তুমি স্বর্গে যাবে? আর স্বর্গের তুমি জানই বা কি?'

'সমস্তই জানি পণ্ডিতমশায়। খাসা জায়গা, না গরম না ঠাণ্ডা। মন্দাকিনী কুলুকুলু বইছে, তার ধারে ধারে পারিজাতের ঝোপ। সবুজ মাঠের মধ্যিখানে কল্পতরু গাছে আঙুর বেদানা আম রসগোল্লা কাটলেট সব রকম ফ'লে আছে, ছেঁড় আর খাও। জন-কতক ছোকরা-দেবদূত গোলাপী উড়ুনি গায়ে দিয়ে সুধার বোতল সাজিয়ে ব'সে রয়েছে, চাইলেই ফটাফট খুলে দেবে। ওই হোথা কুঞ্জবনে ঝাঁকে ঝাঁকে অপ্সরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, দুদণ্ড রসালাপ কর, কেউ কিছু বলবে না। যত খুশি নাচ দেখ, গান শোন। আর কালোয়াতি চাও তো নারদ মুনির আস্তানায় যাও।'

মহেশবাবু বললেন—'সমস্ত গাঁজা। পরলোক আত্মা ভূত ভগবান কিছুই নেই। ক্ষমতা থাকে প্রমাণ কর।'

তর্ক জ'মে উঠল। প্রফেসররা কেউ এক পক্ষে কেউ অপর পক্ষে দাঁড়ালেন। পণ্ডিতমশায় দারুণ অবজ্ঞায় ঠোঁট উলটে ব'সে রইলেন। বৃদ্ধ প্রিন্সিপাল যদু সাণ্ডেল রফা ক'রে বললেন—'ভূতের তেমন দরকার দেখি না, কিন্তু আত্মা আর ভগবান বাদ দিলে চলে না।' মহেশ মিত্তির বললেন—'কেউ-উ নেই, আমি দশ

মিনিটের মধ্যে প্রমাণ ক'রে দিচ্ছি।' হরিনাথ কুণ্ডু মহা উৎসাহে বন্ধুর পিঠ চাপড়ে বললেন—'লেগে যাও।'

তারপর মহেশবাবু ফুলস্ক্যাপ কাগজ আর পেনসিল নিয়ে একটি বিরাট অঙ্ক কষতে লেগে গেলেন। ঈশ্বর আত্মা আর ভূত—এই তিন রাশি নিয়ে অতি জটিল অঙ্ক, তার গতি বোঝে কার সাধ্য। বিস্তর যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ক'রে হাতির শুঁড়ের মতন বড় বড় চিহ্ন টেনে অবশেষে সমাধান করলেন—ঈশ্বর $=0$, আত্মা $=$ ভূত $=\sqrt{0}$।

বাচস্পতি বললেন—'বদ্ধ উন্মাদ।'

মহেশবাবু বললেন—'উন্মাদ বললেই হয় না। এ হল গিয়ে দস্তুরমত ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলস। সাধ্য থাকে তো আমার অঙ্কের ভুল বার করুন।'

হরিনাথ বললেন—'অঙ্ক-টঙ্ক আমার আসে না। বাচস্পতিমশায় যদি ভগবান দেখাবার ভার নেন তো আমি মহেশকে ভূত দেখাতে পারি।'

বাচস্পতি বললেন—'আমার বয়ে গেছে।'

মহেশবাবু বললেন—'বেশ তো হরিনাথ, তুমি ভূতই দেখাও না। একটার প্রমাণ পেলে আর সমস্তই মেনে নিতে রাজী আছি ?'

হরিনাথবাবু বললেন—'এই কথা ? আচ্ছা, আসছে হপ্তায় শিব-চতুর্দশী পড়ছে। সেদিন তুমি আমার সঙ্গে রাত বারোটায় মানিকতলায় নতুন খালের ধারে চল, পণ্টা-পণ্টি ভূত দেখিয়ে দেব। কিন্তু যদি কোনও বিপদ ঘটে তো আমাকে দুষতে পারবে না।'

'যদি দেখাতে না পার ?'

'আমার নাক কান কেটে দিও। আর যদি দেখাতে পারি তো তোমার নাক কাটব।'

প্রিনসিপাল যদু স্যাণ্ডেল বললেন—'কাটাকাটির দরকার কি, সত্যের নির্ণয় হ'লেই হ'ল।'

শিব-চতুর্দশীর রাত্রে মহেশ মিত্তির আর হরিনাথ কুণ্ডু মানিকতলায় গেলেন। জায়গাটা তখন বড়ই ভীষণ ছিল. রাস্তায় আলো নেই, দুধারে বাবলা গাছে আরও অন্ধকার করেছে। সমস্ত নিস্তব্ধ, কেবল মাঝে মাঝে প্যাঁচার ডাক শোনা যাচ্ছে। হোঁচট খেতে খেতে দুজনে নতুন খালের ধারে পেঁছিলেন। বছর-দুই আগে ওখানে প্লেগের হাসপাতাল ছিল, এখনও তার গোটাকতক খুঁটি দাঁড়িয়ে আছে।

মহেশ মিত্তির অবিশ্বাসী সাহসী লোক, কিন্তু তাঁরও গা ছমছম করতে লাগল। হরিনাথ সারা রাস্তা কেবল ভূতের কথাই কয়েছেন—তারা দেখতে কেমন, মেজাজ কেমন, কি খায়, কি পরে। দেবতারা হচ্ছেন উদার প্রকৃতি দিলদরিয়া, কেউ তাঁদের না মানলেও বড় একটা কেয়ার করেন না। কিন্তু অপদেবতারা পদবীতে খাটো ব'লে তাঁদের আত্মসম্মানবোধ বড়ই উগ্র, না মানলে ঘাড় ধরে তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা আদায় করেন। এই সব কথা।

হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজ শোনা গেল, যেন কোনও অশরীরী বেরাল তার পলাতকা প্রণয়িনীকে আকুল আহ্বান করছে। একটু পরেই মহেশবাবু রোমাঞ্চিত

হয়ে দেখলেন, একটা লম্বা রোগা কুচকুচে কাল মূর্তি দু-হাত তুলে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার পিছনে একটু দূরে ঐ রকম আরও দুটো।

হরিনাথবাবু থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন—'রাম রাম সীতারাম! ও মহেশ, দেখছ কি, তুমিও বল না।'

আর একটু হলেই মহেশবাবু রামনাম উচ্চারণ ক'রে ফেলতেন, কিন্তু তাঁর কনশেন্স্ বাধা দিয়ে বললে—'উঁহু, একটু সবুর কর, যদি ঘাড় মটকাবার লক্ষণ দেখ তখন না-হয় রামনাম করা যাবে।'

এ'রা একটা পাকুড় গাছের নীচে ছিলেন। হঠাৎ ওপর থেকে খানিকটা কাদা-গোলা জল মহেশের মাথায় এসে পড়ল।

তখন সামনের সেই কাল মূর্তিটা নাকী সুরে বললে—'মহেশবাবু, আপনি নাকি ভূত মানেন না?'

এ অবস্থায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই বলে থাকেন—আজ্ঞে হাঁ, মানি বই কি। কিন্তু মহেশ মিত্তির বেয়াড়া লোক, হঠাৎ তাঁর কেমন একটা খেয়াল হল, ধাঁ করে এগিয়ে গিয়ে ভূতের কাঁধ খামচে ধ'রে জিজ্ঞাসা করলেন—'কোন্ ক্লাস?'

ভূত থতমত খেয়ে জবাব দিলে—'সেকেন্ড ইয়ার সার!'

'রোল নম্বর কত?'

ভূত করুণ নয়নে হরিনাথের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে—'বলি সার?'

হরিনাথের মুখে রাম রাম ভিন্ন কথা নেই। পিছনের দুটো ভূত অদৃশ্য হয়ে গেল। পাকুড় গাছে যে ছিল সে টুপ করে নেমে এসে পালিয়ে গেল। তখন বেগতিক দেখে সামনের ভূতটি ঝাঁকুনি দিয়ে মহেশের হাত ছাড়িয়ে চোঁচা দৌড় মারলে।

মহেশ মিত্তির হরিনাথের পিঠে একটা প্রচন্ড কিল মেরে বললেন—'জোচ্চোর!'

হরিনাথও পালটা কিল মেরে বললেন—'আহম্মক!'

নিজের নিজের পিঠে হাত বুলতে বুলতে দুই বন্ধু বাড়ি-মুখো হলেন। আসল ভূত যারা আশেপাশে লুকিয়ে ছিল তারা মনে মনে বললে—আজি রজনীতে হয় নি সময়।

পরদিন কলেজে হুলস্থুল বেধে গেল। সমস্ত ব্যাপার শুনে প্রিনসিপাল ভয়ংকর রাগ করে বললেন—'অত্যন্ত শেমফুল কান্ড। দুজন নামজাদা অধ্যাপক একটা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে হাতাহাতি! হরিনাথ তোমার লজ্জা নেই?'

হরিনাথবাবু ঘাড় চুলকে বললেন—'আজ্ঞে আমার উদ্দেশ্যটা ভালই ছিল। মহেশকে রিফর্ম করবার জন্য যদি একটু ইয়ে ক'রেই থাকি তাতে দোষটা কি—হাজার হোক আমার বন্ধু তো?'

মহেশবাবু গর্জন করে বললেন—'কে তোমার বন্ধু?'

প্রিনসিপাল বললেন—'মহেশ তুমি চুপ কর। উদ্দেশ্য যাই হক, কলেজের ছেলেদের এর ভেতর জড়ানো একেবারে অমার্জনীয় অপরাধ। হরিনাথ তুমি বাড়ি যাও, তোমায় সাসপেন্ড করলুম। আর মহেশ তোমাকেও সাবধান করে দিচ্ছি—আমার কলেজে ভুতুড়ে তর্ক তুলতে পারবে না।'

মহেশবাবু উত্তর দিলেন—'সে প্রতিশ্রুতি দেওয়া শক্ত। সকল রকম কুসংস্কার দূর করাই আমার জীবনের ব্রত।'

'তবে তোমাকেও সাসপেন্ড করলুম।'

অন্যান্য অধ্যাপকরা চুপ ক'রে সমস্ত শুনছিলেন। তাঁরা প্রিন্সিপালের হুকুম শুনে কোনও প্রতিবাদ করলেন না, কারণ সকলেই জানতেন যে তাঁদের কর্তার রাগ বেশী দিন থাকে না।

মহেশবাবু তাঁর বাসায় ফিরে এলেন। হরিনাথের ওপর প্রচণ্ড রাগ—হতভাগা একটা গভীর তত্ত্বের মীমাংসা করতে চায় জুয়োচুরির দ্বারা! সে আবার ফিলসফি পড়ায়! এমন অপ্রত্যাশিত আঘাত মহেশ কখনও পান নি।

মানুষের মন যখন নিদারুণ ধাক্কা খায় তখন সে তার ভাব ব্যক্ত করবার জন্য উপায় খোঁজে। কেউ কাঁদে, কেউ তর্জন-গর্জন করে, কেউ কবিতা লেখে। একটা তুচ্ছ ক্রৌঞ্চবকের হত্যাকাণ্ড দেখে মহর্ষি বাল্মীকির মনে যে ঘা লেগেছিল তাই প্রকাশ করবার জন্য তিনি হঠাৎ দু-ছত্র শ্লোক রচনা করে ফেলেন—মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বম্ ইত্যাদি। তার পর সাতকাণ্ড রামায়ণ লিখে তাঁর ভাবের বোঝা নামাতে পেরেছিলেন। আমাদের মহেশ মিত্তির চিরকাল নীরস অঙ্কশাস্ত্রের চর্চা করে এসেছেন, কাব্যের কিছুই জানতেন না। কিন্তু আজ তাঁরও মনে সহসা একটা কবিতার অঙ্কুর গজগজ করতে লাগল। তিনি আর বেগ সামলাতে পারলেন না, কলেজের পোশাক না ছেড়েই বড় একখানা আলজেব্রা খুলে তার প্রথম পাতায় লিখলেন—

হরিনাথ কুণ্ডু,
খাই তার মুণ্ডু।

কবিতাটি লিখে বার বার ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখে আদি কবি বাল্মীকির মতন ভাবলেন, হাঁ, উত্তম হয়েছে।

কিন্তু একটা খটকা বাধল। কুণ্ডুর সঙ্গে মুণ্ডুর মিল আবহমান কাল থেকে চ'লে আসছে, এতে মহেশের কৃতিত্ব কোথায়? কালিদাসই হ'ন, আর রবীন্দ্রনাথই হ'ন, কুণ্ডুর সঙ্গে মুণ্ডু মেলাতেই হবে—এ হল প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। মহেশ একটু ভেবে ফের লিখলেন—

কুণ্ডু হরিনাথ,
মুণ্ডু করি পাত।

হাঁ, এইবার মৌলিক রচনা বলা যেতে পারে। মহেশের মনটা একটু শান্ত হল। কিন্তু কাব্যসরস্বতী যদি একবার কাঁধে ভর করেন তবে সহজে নামতে চান না। মহেশবাবু লিখতে লাগলেন—

হরিনাথ ওরে,
হবি তুই ম'রে
নরকের পোকা
অতিশয় বোকা।

উঁহু, নরকই নেই তার আবার পোকা। মহেশবাবু স্থির করলেন—কাব্যে কুসংস্কার নাম দিয়ে তিনি শীঘ্রই একটা প্রবন্ধ রচনা করবেন, তাতে মাইকেল রবীন্দ্রনাথ কাকেও রেহাই দেবেন না। তার পর তাঁর কবিতার শেষের চার লাইন কেটে দিয়ে ফের লিখলেন—

ওরে হরিনাথ,
তোরে করি কাত,
পিঠে মারি চড়—

এমন সময় মহেশের চাকরটা এসে বললে—'বাবু, চা হবে কি দিয়ে? দুধ তো ছিঁড়ে গেছে।'

মহেশবাবু অন্যমনস্ক হয়ে বললেন—'সেলাই করে নে।'

পিঠে মারি চড়,
মুখে গুঁজি খড়।
জেবলে দেশলাই
আগুন লাগাই।

কিন্তু আবার এক আপত্তি। হরিনাথকে পুড়িয়ে ফেললে জগতের কোন লাভ হবে না, অনর্থক খানিকটা জান্তব পদার্থ বরবাদ হবে। বরং তার চাইতে—

হরিনাথ ওরে
পোড়াব না তোরে।
নিয়ে যাব ধাপা
দেব মাটি চাপা।
সার হয়ে যাবি।
ঢ্যাঁড়স ফলাবি।

মহেশবাবু আরও অনেক লাইন রচনা করেছিলেন, তা আমার মনে নেই। কবিতা লিখে খানিকটা উচ্ছ্বাস বেরিয়ে যাওয়ায় তাঁর হৃদয়টা বেশ হালকা হল, তিনি কাপড়-চোপড় ছেড়ে ইজি-চেয়ারে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

তিন দিন যেতে না যেতে প্রিনসিপাল মহেশ আর হরিনাথকে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা আবার নিজের নিজের কাজে বাহাল হলেন, কিন্তু তাঁদের বন্ধুত্ব ভেঙে গেল। সহকর্মীরা মিলনের অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোনও ফল হল না। হরিনাথ বরং একটু সন্ধির আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, কিন্তু মহেশ একেবারে পাথরের মতন শক্ত হয়ে রইলেন।

কিছুদিন পরে মহেশবাবুর খেয়াল হল—প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে এক তরফা বিচার করাটা ন্যায়সংগত নয়, এর অনুকূল প্রমাণ কে কি দিয়েছেন তাও জানা উচিত। তিনি দেশী বিলাতী বিস্তর বই সংগ্রহ ক'রে পড়তে লাগলেন, কিন্তু তাতে তাঁর অবিশ্বাস আরও প্রবল হল। প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছুই নেই, কেবল আছে—অমুক ব্যক্তি কি বলেছেন আর কি দেখেছেন। বাঘের অস্তিত্বে মহেশের সন্দেহ নেই। কারণ জন্তুর বাগানে গেলেই দেখা যায়। ভূত যদি থাকেই তবে খাঁচায় পুরে

দেখা না বাপু। তা নয়, শুধু ধাপ্পাবাজি। প্রেততত্ত্ব চর্চা করে মহেশবাবু বেজায় চ'টে উঠলেন। শেষটায় এমন হ'ল যে ভূতের গুষ্টিকে গালাগাল না দিয়ে তিনি জলগ্রহণ করতেন না।

প'ড়ে প'ড়ে মহেশের মাথা গরম হয়ে উঠল। রাত্রে ঘুম হয় না, কেবল স্বপ্ন দেখেন ভূতে তাঁকে ভেংচাচ্ছে। এমন স্বপ্ন দেখেন ব'লে নিজের উপরও তাঁর রাগ হতে লাগল। ডাক্তার বললে—পড়াশুনো বন্ধ করুন, বিশেষ ক'রে ঐ ভূতুড়ে বইগুলো—যা মানেন না তার চর্চা করেন কেন? কিন্তু ঐ সব বই পড়া মহেশের এখন একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পড়লেই রাগ হয়, আর সেই রাগেতেই তাঁর সুখ।

অবশেষে মহেশ মিত্তির কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। দিন দিন শরীর ক্ষয়ে যেতে লাগল, কিন্তু রোগটা ঠিক নির্ণয় হ'ল না। সহকর্মীরা প্রায়ই এসে তাঁর খবর নিতেন। হরিনাথও একদিন এসেছিলেন, কিন্তু মহেশ তাঁর মুখ-দর্শন করলেন না।

সাত-আট মাস কেটে গেল। শীতকাল, রাত দশটা। হরিনাথবাবু শোবার উদ্যোগ করছেন এমন সময় মহেশের চাকর এসে খবর দিলে যে তার বাবু ডেকে পাঠিয়েছেন, অবস্থা বড় খারাপ। হরিনাথ তখনই হাতিবাগানে মহেশের বাসায় ছুটলেন।

মহেশের আর দেরি নেই, মৃত্যুর ভয়ও নেই। বললেন—'হরিনাথ তোমায় ক্ষমা করলুম। কিন্তু ভেবো না যে আমার মত কিছুমাত্র বদলেছে। এই রইল আমার উইল, তোমাকেই অছি নিযুক্ত করেছি। আমার পৈতৃক দশ হাজার টাকার কাগজ ইউনিভার্সিটিকে দান করেছি, তার সুদ থেকে প্রতি বৎসর একটা পুরস্কার দেওয়া হবে। যে ছাত্র ভূতের অনস্তিত্ব সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লিখবে সে ঐ পুরস্কার পাবে। আর দেখ—খবরদার, শ্রাদ্ধ-ট্রাদ্ধ ক'রো না। ফুলের মালা চন্দন-কাঠ ঘি এসব দিও না, একদম বাজে খরচ। তবে হাঁ, দু-চার বোতল কেরোসিন ঢালতে পার। দেড় সের গন্ধক আর পাঁচ সের সোরা আনানো আছে, তাও দিতে পার, চটপট কাজ শেষ হয়ে যাবে। আচ্ছা, চললুম তা হ'লে।'

রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা। মহেশের আত্মীয়স্বজন কেউ কলকাতায় নেই, থাকলেও বোধ হয় তারা আসত না। বড়দিনের বন্ধ, কলেজের সহকর্মীরা প্রায় সকলেই অন্যত্র গেছেন। হরিনাথ মহা বিপদে পড়লেন। মহেশবাবুর চাকরকে বললেন পাড়ার জনকতক লোক ডেকে আনতে।

অনেকক্ষণ পরে দুজন মাতব্বর প্রতিবেশী এলেন। ঘরে ঢুকলেন না, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—'চুপ ক'রে ব'সে আছেন যে বড়? সৎকারের ব্যবস্থা কি করলেন?'

হরিনাথ বললেন—'আমি একলা মানুষ, আপনাদের ওপরেই ভরসা।'

'ওই বেলেল্লা হতভাগার লাশ আমরা বইব? ইয়ারকি পেয়েছেন নাকি!' এই কথা বলেই তাঁরা সরে পড়লেন।

হরিনাথের তখন মনে পড়ল, বড় রাস্তার মোড়ে একটা মাটকোঠায় সাইনবোর্ড

দেখেছেন—বৈতরণী সমিতি, ভদ্রমহোদয়গণের দিবারাত্র সস্তায় সৎকার। চাকরকে বসিয়ে রেখে তখনই সেই সমিতির খোঁজে গেলেন।

অনেক চেষ্টায় সমিতি থেকে তিনজন লোক যোগাড় হ'ল। পনর টাকা পারিশ্রমিক, আর শীতের ওষুধ বাবদ ন-সিকে। সমস্ত আয়োজন শেষ হ'লে হরিনাথ আর তাঁর তিন সঙ্গী খাট কাঁধে নিয়ে রাত আড়াইটার সময় নিমতলায় রওনা হলেন।

অমাবস্যার রাত্রি, তার ওপর আবার কুয়াশা। হরিনাথের দল কর্নওয়ালিস স্ট্রীট দিয়ে চললেন। গ্যাসের আলো মিটমিট করছে, পথে জনমানব নেই। কাঁধের বোঝা ক্রমেই ভারী বোধ হতে লাগল, হরিনাথ হাঁপিয়ে পড়লেন। বৈতরণী সমিতির সর্দার ত্রিলোচন পাকড়াশী বুঝিয়ে দিলেন—এমন হয়েই থাকে, মানুষ ম'রে গেলে তার ওপর জননী বসুন্ধরার টান বাড়ে।

হরিনাথ একলা নয়, তাঁর সঙ্গীরা সকলেই সেই শীতে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে উঠল। খাট নামিয়ে খানিক জিরিয়ে আবার যাত্রা।

কিন্তু মহেশ মিত্তিরের ভার ক্রমশই বাড়ছে, পা আর এগোয় না। পাকড়াশী বললেন—'ঢের ঢের বয়েছি মশাই, কিন্তু এমন জগদ্দল মড়া কখনও কাঁধে করি নি। দেহটা তো শুকনো, লোহা খেতেন বুঝি? পনর টাকায় হবে না মশায়, আরো পাঁচ টাকা চাই।'

হরিনাথ তাতেই রাজী, কিন্তু সকলে এমন কাবু হয়ে পড়েছে যে দু-পা গিয়ে আবার খাট নামাতে হ'ল। হরিনাথ ফুটপাতে এলিয়ে পড়লেন, বৈতরণীর তিন জন হাঁপাতে হাঁপাতে তামাক টানতে লাগল।

ওঠবার উপক্রম করছেন এমন সময় হরিনাথের নজরে পড়ল—কুয়াশার ভেতর দিয়ে একটা আবছায়া তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে এলে দেখলেন—কাল র‍্যাপার মুড়ি দেওয়া একটা লোক। লোকটি বললে—'এঃ, আপনারা হাঁপিয়ে পড়েছেন দেখছি। বলেন তো আমি কাঁধ দিই।'

হরিনাথ ভদ্রতার খাতিরে দু-একবার আপত্তি জানালেন, কিন্তু শেষটায় রাজী হলেন। লোকটি কোন্ জাত তা আর জিজ্ঞাসা করলেন না, কারণ মহেশ মিত্তির ও বিষয়ে চিরকাল সমদর্শী, এখন তো কথাই নেই। তা ছাড়া যে লোক উপযাচক হয়ে শ্মশানযাত্রার সঙ্গী হয় সে তো বান্ধব বটেই।

ত্রিলোচন পাকড়াশী বললেন,—'কাঁধ দিতে চাও দাও, কিন্তু বখরা পাবে না, তা বলে রাখছি।'

আগন্তুক বললে—'বখরা চাই না।'

এবার হরিনাথকে কাঁধ দিতে হল না, তাঁর জায়গায় নতুন লোকটি দাঁড়ালো। আগের চেয়ে যাত্রাটা একটু দ্রুত হল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আর পা চলে না, ফের খাট নামিয়ে বিশ্রাম।

পাকড়াশী বললেন—'কুড়ি টাকার কাজ নয় বাবু, এ হল মোষের গাড়ির বোঝা। আরও পাঁচ টাকা চাই।'

এমন সময় আবার একজন পথিক এসে উপস্থিত—ঠিক প্রথম লোকটির মতন কাল র‍্যাপার গায়ে। এও খাট বইতে প্রস্তুত। হরিনাথ দ্বিরুক্তি না ক'রে তার সাহায্য নিলেন। এবার পাকড়াশী রেহাই পেলেন।

খাট চলেছে, আর একটু জোরে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবার ক্লান্তি। মহেশের ভার অসহ্য হয়ে উঠেছে, তার দেহে কিছু ঢোকে নি তো? খাট নামিয়ে আবার সবাই দম নিতে লাগল।

কে বলে শহুরে লোক স্বার্থপর? আবার একজন সহায় এসে হাজির, সেই কাল র‍্যাপার গায়ে। হরিনাথের ভাববার অবসর নেই, বললেন, 'চল, চল।'

আবার যাত্রা, আরও একটু জোরে, তারপর ফের খাট নামাতে হ'ল। এই যে, চতুর্থ বাহক এসে হাজির, সেই কাল ব্যাপার। এরা কি মহেশকে বইবার জন্যই এই তিন পহর রাতে পথে বেরিয়েছে। হরিনাথের আশ্চর্য হবার শক্তি নেই, বললেন—'ওঠাও খাট, চল জলদি।'

চার জন অচেনা বাহকের কাঁধে মহেশের খাট চলেছে, পিছনে হরিনাথ। আর বৈতরণী সমিতির তিন জন। এইবার গতি বাড়ছে, খাট হনহন ক'রে চলছে। হরিনাথ আর তাঁর সঙ্গীদের ছুটতে হ'ল।

আরে অত তাড়াতাড়ি কেন, একটু আস্তে চল। কেই বা কথা শোনে! ছুট-ছুট। 'আরে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ, থাম থাম, বীড্‌ন স্ট্রীট ছাড়িয়ে গেলে যে। লোকগুলো কি শুনতে পায় না? ওহে পাকড়াশী, থামাও না ওদের?' কোথায় পাকড়াশী? তিনি বিচক্ষণ লোক, ব্যাপারটা বুঝে টাকার মায়া ত্যাগ করে সদলে পালিয়েছেন।

মহেশের খাট তখন তীর বেগে ছুটছে, হরিনাথ পাগলের মতন পিছু পিছু দৌড়চ্ছেন। কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, গোলদিঘি, বউবাজারের মোড়—সব পার হয়ে গেল। কুয়াশা ভেদ ক'রে সামনের সমস্ত পথ ফুটে উঠেছে—এ পথের কি শেষ নেই? রাস্তা কি ওপরে উঠেছে না নীচে নেমেছে? এ কি আলো না অন্ধকার? দূরে ও কি দেখা যাচ্ছে—সমুদ্রের ঢেউ, না চোখের ভুল?

হরিনাথ ছুটতে ছুটতে নিরন্তর চিৎকার করছেন—'থাম, থাম।' ও কি, খাটের ওপর উঠে বসেছে কে? মহেশ? মহেশই তো। কি ভয়ানক! দাঁড়িয়েছে, ছুটন্ত খাটের ওপর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। পিছন ফিরে লেকচারের ভঙ্গীতে হাত নেড়ে কি বলছে?

দূর দূরান্তর থেকে মহেশের গলার আওয়াজ এল—'হরিনাথ—ও হরিনাথ—ওহে হরিনাথ—'

'কি, কি? এই যে আমি।'

'ও হরিনাথ—আছে, আছে, সব আছে, সব সত্যি—'

মহেশের খাট অগোচর হয়ে এল, তখনও তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে—'আছে আছে...'

হরিনাথ মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। পরদিন সকালে ওয়েলেস্‌লি স্ট্রীটের পুলিশ তাঁকে দেখতে পেয়ে মাতাল ব'লে চালান দিলে। তাঁর স্ত্রী খবর পেয়ে বহু কষ্টে তাঁকে উদ্ধার করেন।

বংশলোচনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—'গয়ায় পিণ্ডি দেওয়া হয়েছিল কি?'

'শুধু গয়ায়। পিণ্ডিদাদনখাঁএ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোন ফল হয়নি,

পিণ্ডি ছিটকে ফিরে এল।'

'তার মানে?'

'মানে—মহেশ পিণ্ডি নিলেন না, কিংবা তাঁকে নিতে দিলে না।'

'আশ্চর্য!—মহেশ মিত্তিরের টাকাটা?'



কি, কি? এই যে আমি

'সেটা ইউনিভার্সিটিতে গচ্ছিত আছে। কিন্তু কাজ কিছুই হয় নি, ভূতের বিপক্ষে প্রবন্ধ লিখতে কোন ছাত্রের সাহস নেই। এখন সেই টাকা সুদে-আসলে প্রায় পঁচিশ হাজার হয়েছে। একবার সেনেটে প্রস্তাব ওঠে টাকাটা প্রত্নবিভাগের জন্য



আছে, আছে সব আছে

খরচ হ'ক। কিন্তু ছাদের ওপর এমন দুপদাপ শব্দ শুরু হ'ল যে সব্বাই ভয়ে পালালেন। সেই থেকে মহেশফাণ্ডের নাম কেউ করে না।'

১৩৩৭ (১৯৩০)

রাতারাতি

শহরে আবার ছেলেধরার উপদ্রব শুরু হইয়াছে। বিকালে বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানায় তাহারই কথা হইতেছে। বংশলোচনের ভাগনে উদয় মহা উৎসাহে হাত নাড়িয়া বলিতেছিল—'আজকের খবর শুনেছেন? পঞ্চাশটা ছেলে হারিয়েছে। কাল পঁচাত্তরটা। কিন্তু আশ্চর্য এই, যারা নিরুদ্দেশ হচ্ছে তাদের নামধাম কেউ টের পায় না। এদিকে লোকে খেপে উঠেছে, মোটর গাড়ি পোড়াচ্ছে, রাস্তায় মানুষকে ধ'রে ঠেঙাচ্ছে, পুলিশ কিছুই করতে পারছে না। ওঃ, হুলস্থূল ব্যাপার।'

বংশলোচনবাবু বলিলেন—'কাগজে কি লিখছে?'

তাঁহার শালা নগেন বলিল—'এই শুনুন না, আজকের ধূমকেতু খুব জোর লিখেছে।—আমরা জানিতে চাই দেশের এই অরাজক অবস্থার জন্য দায়ী কে? অজ্ঞ লোকে রটাইতেছে বালি ব্রিজের বনিয়াদ পোক্ত করিবার জন্য দশ হাজার ছেলে পুঁতিবে। বিজ্ঞ লোকে বলিতেছেন ছেলেরা সংসারে বীতরাগ হইয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতেছে। কাহার কথা বিশ্বাস করিব? দেশনেতৃগণ এখন দলাদলি বন্ধ রাখুন, গভর্নমেণ্ট উঠিয়া পড়িয়া লাগুন, আমরা তারস্বরে প্রশ্ন করিতেছি, তাহার উত্তর দিন—কোন্ দুরাত্মা দেশমাতৃকাকে সন্তানহারা করিতেছে?'

বংশলোচনের ছোট ছেলে ঘেণ্টু বলিল—'বাবা, ছেলেধরা বাবা ধরে? বল না বাবা!'

উকিল বিনোদবাবু বলিলেন—'তেমন তেমন বাবা হ'লে ধরে বই কি। কিন্তু তুমি ভেবো না খোকা, আমরা রক্ষা করব।'

বৃদ্ধ কেদার চাটুজ্যে মহাশয় নিবিষ্ট হইয়া তামাক খাইতেছিলেন। নগেন তাঁহাকে বলিল—'চাটুজ্যেমশায়, আপনি সাবধানে চলাফেরা করবেন।'

বংশলোচন। উনি তো প্রবীণ লোক, ওঁকে ধরবে কেন?

নগেন। মনেও ভাববেন না তা। চ্যবনপ্রাশ খাইয়ে তরুণ বানাবে, তারপর চালান দেবে।

উদয় সভয়ে বলিল—'তরুণদেরই ধরছে বুঝি?'

চাটুজ্যে হুঁকা রাখিয়া বলিলেন—'উদো, তুই কি রকম লেখাপড়া শিখেছিস দেখি। জোয়ান যুবক আর তরুণ—এদের মধ্যে তফাত কি বল্ তো?'

উদয়। জোয়ান হচ্ছে যার গায়ে খুব জোর। যুবক মানে যুবা, যাকে বলে ইয়ং ম্যান। তরুণ হল গিয়ে মানে যাকে বলে—দাঁড়ান, অভিধান দেখে বলছি—

চাটুজ্যে। অভিধানে পাবি না, আজকাল মানে বদলে গেছে। আমি অনেক ভেবে চিন্তে যা বুঝেছি শোন্। যার দাড়ি গোঁপ দুই আছে তিনি হলেন জোয়ান, যেমন রবিঠাকুর, পি. সি. রায়। যার দাড়ি নেই শুধুই গোঁফ তিনি যুবক, যেমন আশু মুখুজ্যে, গান্ধীজী। আর যার দাড়িও নেই গোঁফও নেই তিনি তরুণ, যেমন বঙ্কিম চাটুজ্যে, শরৎ চাটুজ্যে, আর কেদার চাটুজ্যে।

উদয়। আর আমি? নগেন মামা?

চাটুজ্যে। তোরা ইলি ওই তিনের বার, যাকে বলে অপোগণ্ড। ধরতে হয় তোদেরই ধরবে।

উদয় চিন্তা করিয়া বলিল—'আমি দাড়ি রাখতুম, কিন্তু বউ বলে—'

নগেন। খবরদার উদো, ফের যদি বউএর কথা পাড়বি তো কান ম'লে দেব।

চাকর আসিয়া বংশলোচনের হাতে একটা টেলিগ্রাম দিয়া গেল। বংশলোচন দেখিয়া বলিলেন—'এ যে চাটুজ্যে মশায়ের নামে তার!'

চাটুজ্যে। আমাকে তার করলে কে? দেখ তো পড়ে কি ব্যাপার।

বংশলোচন। কার্তিক মিসিং—

উদয়। অ্যাঁ, বলেন কি?

বংশলোচন। চরণ ঘোষ টেলিগ্রাম করেছেন মজিলপুর থেকে—কাত্তিককে পাওয়া যাচ্ছে না, পুলিসে খবর দিতে বলছেন। পাঁচটার ট্রেনে চরণবাবু নিজেও আসছেন। ছ-টা তো বেজে গেছে, তা হলে এসে পড়লেন বলে। ও'র কাছে সব শুনে পুলিসে খবর দেওয়া যাবে। কাত্তিকটি কে?

চাটুজ্যে। চরণের বড় ছেলে, এখানে হোস্টেলে থেকে পড়ে, প্রতি শনিবারে দেশে যায়। এখন তো কলেজ বন্ধ, মজিলপুরেই তার থাকবার কথা।

নগেন। কাত্তিককে চুরি করবে এমন ছেলেধরা জন্মায় নি। ও সব বাজে খবর।

চাটুজ্যে। চিনিস নাকি কাত্তিককে?

নগেন। বিলক্ষণ চিনি, আমার সেজো শালা বাঁটলোর সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ে। বিখ্যাত ছোকরা, শিশুকাল থেকেই বেশ চৌকস। যখন দশ বৎসর বয়েস তখন সে তার বান্ধবীদের বলত—মেয়েগুনো আবার মানুষ! মাথায় একগাদা চুল, আবার ফিতে বাঁধা, আবার শুধু শুধু দাঁত বার করে হাসে! মারতে হয় এক ঘুষি! তার-পর চোদ্দ বছর বয়সে তার প্রাণের বন্ধু বাঁটলোকে লিখলে—নারীর প্রেম? কখনই নয়। ভাই বাঁটুল, এ জগতে কারও থাকবার দরকার নেই. শুধু তুমি আর আমি। কিন্তু দু বছর যেতে না যেতে তার যৌবননিকুঞ্জের পাখি কা কা করে উঠল। কাত্তিক তার কবিতার খাতায় লিখলে—নারী, বুঝিতে না পারি কবে. একান্ত আমারি তুমি হবে. কত দিনে ওগো কত দিনে, পারছি নে আর পারছি নে।

বংশলোচন। এ সব তো ভাল কথা নয়। চাটুজ্যেমশায়, চরণবাবু ছেলের বিয়ে দেন না কেন?

চাটুজ্যে। বলেছি তো অনেকবার, কিন্তু চরণ বড় একগুঁয়ে। অন্য বিষয়ে সেকেলে হ'লেও ছেলের বিয়ে দেবার বেলায় সে একেলে। বলে, লেখাপড়া সাঙ্গ করুক, তারপর বিয়ে। তবে কাত্তিকের জন্যে কনে ঠিক করাই আছে, চরণের বাল্যবন্ধু রাখাল সিংগির মেয়ে। তের-চোদ্দ বছর আগে দুই বন্ধুতে কথা স্থির হয়। তারপর রাখালবাবু মারা গেলেন, কিছুকাল পরে তাঁর স্ত্রীও গত হলেন, মেয়েটার ভার নিলেন তার মামা। মামা শুনেছি কোথাকার জজ, সম্প্রতি রিটায়ার করেছেন।

নগেন। রাখাল সিংগির মেয়ে তো? কাত্তিক কখ্খনো তাকে বিয়ে করবে না, সে মেয়ে নাকি জংলী ভূত।

এমন সময় চরণ ঘোষ আসিয়া পৌঁছিলেন। প্রৌঢ় ভদ্রলোক, মাথায় একটি ছোট

টিকি, কাঁচা-পাকা ছাঁটা গোঁফ, গলায় কণ্ঠি, এক হাতে ছাতা, অন্য হাতে ছোট একটি ব্যাগ। চরণ হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন—'পাজী হতভাগা!'

চাটুজ্যে। তা হলে ছেলের খোঁজ পেয়েছ? দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।

চরণ। বকাটে মিথ্যুক ছুঁচো!

চাটুজ্যে। বিপত্তৌ মধুসূদনম্, ভগবান রক্ষা করেছেন।

চরণ। ব্যাটা আমার লেখাপড়া শিখছেন!

বংশলোচন। চরণবাবু একটু শান্ত হন।

চাটুজ্যে। আরে রাগ পরে ক'রো এখন। খবর কি আগে বল।

চরণ। খবর আমার মাথা। এখন কলেজ বন্ধ, গুডফ্রাইডের ছুটি, কার্ত্তিক ক-দিন আমার কাছেই ছিল, আমরাও নিশ্চিন্ত, মজিলপুরে তো আর ছেলেধরার উপদ্রব নেই। কাল সকালে বললে—ফিলসফির খান-দুই বই বাঁটলোর কাছে রয়েছে, কলকাতায় গিয়ে নিয়ে আসি। আমি বললুম—যাবি আর আসবি, দুপুরের গাড়িতে ফিরে আসা চাই। বেলা শেষ হয়ে গেল, কিন্তু কার্ত্তিক ফিরল না, রাত্রি কাবার হল তবু ছেলের খবর নেই। তার মা কান্নাকাটি শুরু করলেন, কারণ পরশু নাকি কলকাতায় তেষট্টিটা ছেলে চুরি গেছে। অগত্যা তোমায় একটা জরুরী তার করে দিলুম, তারপর বিকেলের গাড়িতে চলে এলুম। প্রথমেই গেলুম বাঁটলোদের ওখানে। তার ছোটভাই শাঁটলো বললে—বাঁটলো আর কার্ত্তিক কজন বন্ধুর সঙ্গে ওভারটুন হলে বক্তৃতা শুনতে গেছে। কিন্তু বাঁটলোর বোন বললে—শোনেন কেন, সব মিথ্যে কথা, বাবুরা অ্যাংলো-মোগলাই হোটেলে খেতে গেছেন, তারপর যাবেন সিনেমায়, তার পর অনেক রাত্রে ফিরে এসে দরজায় ধাক্কা লাগাবেন। হতভাগা, এই তোর ফিলসফির বই আনতে যাওয়া! এখন ছোঁড়াটাকে খুঁজে বার করি কি ক'রে?

বিনোদ। খবর যখন পেয়েছেন তখন আর খোঁজবার দরকার কি। ছেলে কলকাতায় এসেছে একটু ফুর্তি করতে, যথাকালে বাড়ি যাবে।

চরণ। ফুর্তি বার করব। হতভাগা এখানে এসেছে ইয়ারকি দিতে, আর আমরা ভেবে মরছি। কান ধরে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাব। চাটুজ্যে, চল।

চাটুজ্যে। যাব কোথায়?

নগেন। ধর্মতলার মোড়ে অ্যাংলো-মোগলাই। ট্যাকসিতে চড়ে সোজা চলে যান দশ মিনিটে পৌঁছবেন।

চরণ ঘোষ ও চাটুজ্যে মহাশয় বাহির হইলেন।

অ্যাংলো-মোগলাই হোটেলটি ছোট কিন্তু সুবিখ্যাত। আলোয় গন্ধে কলরবে ভরপুর। খোপে খোপে নানা লোক খাইতেছে, কেহ একলা, কেহ সদলে। দরজার পাশে একটা ডেস্কের সামনে ম্যানেজার কখনও বসিয়া কখনও দাঁড়াইয়া চারিদিকে নজর রাখিতেছে এবং মাঝে মাঝে হাঁকিতেছে—তিন নম্বরে এক প্লেট কোর্মা, ছ নম্বরে দুটো চা, চারটে কাটলেট শিগগির, পাঁচ নম্বরে আরো দুটো ডেভিল ইত্যাদি।

চরণ ঘোষ ও চাটুজ্যে প্রবেশ করিলেন। চাটুজ্যে চুপি চুপি বলিলেন—'আস্তে, চেঁচিও না—ঐ যে বাবাজীরা ঐখানে খাচ্ছেন।'

চরণ ঘোষ নাক টিপিয়া বলিলেন—'রাধামাধব, এমন জায়গায় ভদ্রলোক আসে। যতসব রাক্ষস জুটে অখাদ্য খাচ্ছে।'

চাটুজ্যে। আরে চুপ চুপ। বেচারাদের অপরাধ নেই, হাজার বছর ধরে শুনে এসেছে এটা খেয়ো না, ওটা খেয়ো না। এখন যখন ভগবান সুবুদ্ধি আর সুবিধে দিয়েছেন তখন জন্মজন্মান্তরের অতৃপ্তি চটপট মিটিয়ে নিতে হবে। আহা, এদের ভোজন সার্থক হ'ক। এই যে এরা বাঘের মত গব্‌গব করে খাচ্ছে সেই সঙ্গে যেন বাঘের সদ্‌গুণও কিছু পায়। এদের গায়ে গত্তি লাগুক, মনে সাহস হ'ক, খোঁচা দিলে যেন খ্যাঁক করে নির্ভয়ে তেড়ে যেতে পারে?

ম্যানেজার বলিল—'আপনারা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, ওই দু নম্বরে বসুন দয়া করে।'

চাটুজ্যে ঠোঁটে আঙুল দিয়া বলিলেন—'চুপ, আস্তে আস্তে।'

ম্যানেজার সহাস্যে বলিল—'লজ্জা কি মোসাই, এখানে কত বুড়ো থুখুড়ে জজ মেজিস্টর মহামহোপাধ্যায় পায়ের ধুলো দেন। আপনারা বরঞ্চ পর্দাটা টেনে নিয়ে বসুন। কি খাবেন মোসাই?'

চাটুজ্যে। অ, এখানে বুঝি অম্‌নি বসা যায় না?

ম্যানেজার। হেঁ হেঁ। খান-দুই কাটলেট দেব কি? অ্যাংলো-মোগলাই-এর নবতম অবদান—মুরগির ফ্রেঞ্চ মালপো, কচি ভাইটোপাঁটার ইস্টু—দেখুন না একটু ট্রাই করে।

চাটুজ্যে। না বাপু, অবদান খাবার আর বয়স নেই।

ম্যানেজার চরণ ঘোষের টিকি আর কণ্ঠি লক্ষ্য করিয়া বলিল—'ঠাকুরমোসাই আপনাকে খান-দুই ডবল ডিমের রাধাবল্লভি দেবে কি?'

চরণ। দেবে আমার মাথা। ডাক ঐ রাক্ষসটাকে।

ম্যানেজার। রাক্ষস-টাক্ষস এখানে পাবেন না মোসাই, সব জেণ্টেলম্যান।

চাটুজ্যে। আরে কর কি চরণ, চুপ চুপ। নিজের ছেলেবেলার কীর্তিকলাপ সব ভুলে গেলে? সেই যে কাবাবের ঠোঙা নিয়ে গাব গাছে চড়ে খেতে আর কোকিল ডাকতে তা কি মনে নেই? এখন না-হয় গোঁসাই মহারাজের কাছে মন্তর নিয়ে কণ্ঠি ধারণ করেছ, মাংসের গন্ধে কানে আঙুল দাও। ছেলের খাওয়া শেষ হক, তারপর একটু-আধটু ধমক দিও। আপাতত এদিকে চুপটি ক'রে বস, একটু শরবৎ খেয়ে ঠাণ্ডা হও, আর শ্রীমানরা কি আলোচনা করছেন তাই আড়ি পেতে শোন, বিস্তর জ্ঞান লাভ করবে। যদি কিছু অশ্রাব্য অলৌকিক কথা কর্ণগোচর হয় তখন না-হয় গলা খাঁকার দিয়ে আত্মপ্রকাশ করা যাবে। ওহে ম্যানেজার, দুটো ঘোল দাও তো।

কার্তিক এবং তাহার তিন বন্ধু বাঁটলো গোপাল ও ঘনেন কিছু দূরে একটা পর্দার আড়ালে বসিয়া আছে। তাহাদের খাওয়া শেষ হইয়াছে, এখন তর্ক চলিতেছে।

গোপাল। আইডিয়াল একটা চাই বইকি, নয়তো লাইফটা কমনপ্লেস মনোটোনস হয়ে পড়ে। আইডিয়াল হচ্ছে মাইণ্ডের জুস, তাতেই জীবন সরস থাকে।

ঘনেন। মানলুম না। আইডিয়াল মানুষকে করে স্লেভ টু অ্যান আইডিয়া। আমি চাই ভ্যারাইটি, নো কমিটমেন্ট। লোথারিওর সেই লাইনটা কি রে?—টু পিক্ অ্যাণ্ড চুজ, প্লে ফাস্ট অ্যাণ্ড লুজ—তারপর কি যেন। বাঁটলো, তোর আইডিয়াল আছে নাকি?

বাঁটলো। রামো, কস্মিন্ কালে নেই।

চরণ ঘোষ চুপি চুপি বলিলেন—'এ সব কি বলছে হে চাটুজ্যে? কিছু বুঝতে পারছি না।'

চাটুজ্যে। চুপ চুপ।

কার্তিক টেবিল চাপড়াইয়া বলিল—'আইডিয়াল টাইডিয়াল বুঝি না। আমি চাই বাস্তবের একটা সিনথেসিস—এমন নারী, যে বল্লরী বাঁড়ুজ্যের মতন রূপসী, মিসেস চৌবের মতন সাহসী, জিগীষা দেবীর মতন লেখিকা, মেজদির ননদের মতন রসিকা, লোটি রায়ের মতন গাইয়ে, ফাখ্তা খাঁ-এর মতন নাচিয়ে।'

চাটুজ্যে বলিলেন—'ব্বাস রে! এমন তিলোত্তমা আমাদের চোদ্দ পুরুষ কখনও দেখে নি। চরণ, আর কথাটি নয়, বাবাজীকে এই অঘ্রান মাসেই ঝুলিয়ে দাও, নইলে বেচারা বাড়ি-বাড়ি হ্যাংলা দিষ্টি দিয়ে বেড়াবে।'

চরণ ঘোষ লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—'দাঁড়াও, হ্যাংলাপনা ঘুচচ্ছি। এই কাত্তিকে, হতভাগা ইস্টুপিড ছুঁচো, কি কচ্ছিস এখানে? ছেলে আমার লেখাপড়া শিখছেন! অধঃপাতে যাচ্ছেন! যত সব বকাটে ছোঁড়াদের সঙ্গে—'

ঘনেন। খবরদার মশায় মুখ সামলে কথা কইবেন।

চরণ। ছুঁচোটাকে পই পই ক'রে বললুম—যাবি আর আসবি। সন্ধে হয়ে গেল, ছেলের দেখা নেই। রাত্তির কাবার হল, ছেলে আর আসে না। ছেলেধরার খপ্পরেই পড়ল, না মোটর চাপা প'ড়ল, না পুলিসে ধরে নিয়ে গেল—কিছুই জানি না। বাড়ির সবাই ভেবে অস্থির, গর্ভধারিণী কেঁদেকেটে শয্যাশায়ী, আর ছেলে আমার হোটেলে ব'সে ইয়ারকি দিচ্ছেন! হতভাগা ছুঁচো ইস্টুপিড। এই তোদের ইউনিভার্সিটির শিক্ষে? কি হয় সেখানে? যত সব জোচ্চোর মিলে ছেলেদের মাথা খায়। আর অধঃপাতের আড্ডা হয়েছে এই হোটেল, যত বেহায়া ছেলে বুড়ো জুটে গোগ্রাসে গোস্ত গিলছে। এই বাঁটলোটা হচ্ছে দলের সর্দার বিশ্ববকাট, ওই গোপ্লোটা হচ্ছে জ্যাঠার চূড়ামণি, আর এই ঘনাটা একটা আস্ত বাঁদর।

কার্তিক ঘাড় হেঁট করিয়া গালাগালি হজম করিতে লাগিল, কিন্তু বন্ধুরা রুখিয়া উঠিল। হোটেলের ম্যানেজার আস্তিন গুটাইতে লাগিল।

বাঁটলো ছেলেটি অতি মিষ্টভাষী ও বিনয়ী। সে খুব মোলায়েম করিয়া বলিল—'দেখুন চরণবাবু, নিজের ছেলেকে আপনি যা খুশি বলতে পারেন, কিন্তু আমরা কি করি না করি আপনার পিতার তাতে কি?'

ম্যানেজার বলিল—'জানেন, আপনাকে পুলিসে দিতে পারি?'

চরণ ঘোষ ভেংচাইয়া বলিলেন—'দাও না।'

ম্যানেজার। জানেন, এটা হচ্ছে অ্যাংলো-মোগলাই কেফ?

বাঁটলো ভুল উচ্চারণ বরদাস্ত করিতে পারে না। বলিল—'কেফ নয়, কাফে।'

মানেজার। ওই হ'ল। জানেন, এটা হেঁজিপেজি জায়গা নয়, এটা একটা রেসপেক্টেবেল রেস্টাউরেন্ট?

বাঁটলো। রেস্তোরাঁ।

ম্যানেজার। এক-ই কথা। জানেন, এটা হচ্ছে শিক্ষিত লোকের রেঁদেজভৌশ।

বাঁটলো। রাঁদেভু।

বার বার বাধা পাইয়া ম্যানেজার চটিয়া উঠিল। বলিল—'আরে থাম ডেঁপো

ছোকরা। ডেভিল মামলেট কোপ্তা কোর্মা দেরাই বেচে বুড়িয়ে গেলুম, আর ইনি এলেন উরুশ্চারণ শেখাতে।'

বাঁটলো গর্জন করিয়া বলিল—'খদ্দেরকে অপমান? টেক কেয়ার, তোমার হোটেল বয়কট করব, কেবল কুকুরের ঠ্যাং আর সাপের চর্বি চালাচ্ছ।'

ঘরের এক কোনে একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। ইনি একজন নীরব কর্মী, দুই প্লেট কোর্মা চুপচাপ শেষ করিয়া এখন রাই-সরিষা ও নেবুর রস দিয়া টোমাটো খাইতেছিলেন। বাঁটলোর কথায় চমকাইয়া উঠিয়া বলিলেন—'কী ভয়ানক, সেইজন্যই তো আমি ওসব খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি, কেবল জোচ্চুরি, ভাইটামিনের নামগন্ধ নেই।'

হোটেলের ভোক্তার দল আতঙ্কে চঞ্চল হইয়া উঠিল। অনেকে খাওয়া ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল। কেহ বলিল—'অ্যাঁ, কুকুরের ঠ্যাং।' কেহ বলিল—'সর্বনাশ, ভাইটামিন নেই।' ম্যানেজার ব্যস্ত হইয়া করজোড়ে বলিতে লাগিলেন—'বসুন মোসাই বসুন, ওসব মিথ্যে কথায় কান দেবেন না—আমার কি ধর্মভয় নেই!'

চাটুজ্যে মহাশয় উঠিয়া চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন—'মহাশয়রা যদি অনুমতি দেন তো আমি ভাইটামিন সম্বন্ধে দু-চারটে কথা নিবেদন করি।'

কয়েকজন প্রবীণ ভদ্রলোক চোপ চোপ করিয়া ধমক দিয়া গণ্ডগোল থামাইয়া দিলেন। তাহার পর চাটুজ্যে মহাশয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন—'হাঁ, তার পর মশাই, ভাইটামিনের কথা কি বলছিলেন?'

চাটুজ্যে বলিতে লাগিলেন—'বাল্যে দুগ্ধ, যৌবনে লুচি-পাঁঠা, বার্ধক্যে একটু নিমঝোল আর প্রচুর হরিনাম—এই হল আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রসম্মত পথ্য। কিন্তু অ্যাদ্দিনে আমরা জানতে পেরেছি যে ওসব কেবল উদর পূরণের উপাদান মাত্র, ভাইটামিনই হচ্ছে আসল জিনিস, ভবনদীতে ভাসবার একমাত্র ভেলা, শিশু যুবা বৃদ্ধ সকলের পক্ষেই। অতএব ভাইটামিন যদি চান তো কাঁটাল খান।'

টোমাটো-ভোজী বাবুটি বলিলেন—'কাঁটাল?'

চাটুজ্যে। আজ্ঞে হাঁ, কাঁটাল। কবি লিখেছেন—আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি, তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি, মরি হায় হায় রে। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো মশায়। এই ধরুন, হিমালয় পর্বত, যার জোড়া দুনিয়ায় নেই। তারপর ধরুন রয়াল বেঙ্গল টাইগার—কে লড়বে তার সঙ্গে—সিংহ? সাধ্য কি। তারপর ধরুন কাঁটাল।

টোমাটো-ভোজী। কাঁটাল কি একটা ফল হ'ল মশাই?

চাটুজ্যে। আজ্ঞে হাঁ, বটানি প'ড়ে দেখবেন। ফলের রাজা হচ্ছে কাঁটাল, দু-মণ পর্যন্ত ওজন হয়, আবার কাঁটালের রাজা ওতরপাড়ার বঙ্কুলবাবুদের গাছের রসখাজা। এক-একটি কোয়া এক-এক পো, কাঁচা সোনার বর্ণ, ভাইটামিনে টইটম্বুর। গালে দিয়ে বার পাঁচেক এদিক ওদিক চালিয়ে রস অনুভব করুন, তার পর চক্ষু বুজে একটু চাপ দিন, অবলীলাক্রমে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে যাবে। কোথায় লাগে আপনাদের কালিয়া কোপ্তা কোর্মা।

টোমাটো-ভোজী। কোন ক্লাসের ভাইটামিন মশায়, এ বি সি না ডি?

চাটুজ্যে। এ-বি-সি-ডি. বি-এল-এ-রে, এ স্লাই ফক্স মেট এ হেন—যা বলেন, ডাক্তারী শাস্ত্রে কোনও বারণ নেই। হেন বস্তু নেই যা কাঁটালে পাবেন না। গুঁড়ি চিরুন, তক্তা হবে, হোগ্নি কাঠ তার কাছে তুচ্ছ। পাতা পাকিয়ে নিন, হুঁকোর

পরাবার উত্তম নল হবে। আর ফলের তো কথাই নেই। কোলে তুলে নিয়ে বাজান, পাখওয়াজের কাজ করবে। কাঁচার কালিয়া খান, যেন পাঁটা। বিচি পুড়িয়ে খান, যেন কাবুলী মেওয়া। পাকা কোয়ার রস গ্রহণ করে ছিবড়েটা চরকায় চড়িয়ে সুতো কাটুন, বেরোবে সিল্ক।

টোমাটো-ভোজী মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন—'ননসেন্স্।'

চাটুজ্যে। বিশ্বাস হ'ল না বুঝি? তবে মরুন ঐ কাঁচা টোমাটো খেয়ে। আমরা চললুম, নমস্কার। ওঠ হে চরণ।

ম্যানেজার। ও মোসাই, দুটো ঘোলের দাম দিলেন না?

চাটুজ্যে। আরে মোলো, আবার দাম চায়! এত বড় একটা কুরুক্ষেত্র থামিয়ে দিলুম সেটা বুঝি কিছু নয়? আচ্ছা বাবা, নাও এই সিকি।

চাটুজ্যে মহাশয় চরণ ঘোষকে একটু আড়ালে টানিয়া আনিয়া বলিলেন—'ছেলেকে ধমক তো ঢের দিয়েছ, এইবার মিষ্টি কথায় শান্ত করে ডেকে নিয়ে যাও। বাবা কাত্তিক, এস তো এদিকে একবার।'

চরণ ঘোষ বলিলেন—'শোন্ কাত্তিক, এই অঘ্রান মাসে তোর বিয়ে দেব। সেই রাখাল সিংগির মেয়ে নেড়ী, ছোটবেলায় তাকে দেখেছিলি, মনে আছে তো?'

কার্তিক মুখ ভার করিয়া বলিল—'নেড়ী-টেড়ীকে আমি বিয়ে ক'রব না।'

চরণ ঘোষ আবার খেপিয়া উঠিয়া বলিলেন—'করবি না কি রকম? তোর ঘাড় ধ'রে বিয়ে দেব, অবাধ্য ইস্টুপিড!'

চাটুজ্যে। আ হা হা, কর কি চরণ, তোমার কিছু আক্কেল নেই? এই কি বিয়ের কথা বলবার সময়, না জায়গা? যাও, তুমি আর মিছে দেরি ক'রো না, ন-টার ট্রেন এখনও পাবে। কাত্তিক আজ বাঁটলোদের বাড়িতেই থাকবে। বাবা কাত্তিক, তোমার সঙ্গে দুটো কথা আছে।'

চরণ ঘোষ গজগজ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। কার্তিক ও তাহার তিন বন্ধুর সঙ্গে চাটুজ্যে মহাশয় রাস্তায় আসিলেন।

ঘনেন বলিল—'এ অপমান কখনই সহ্য করা যায় না, আমরা বানের জলে ভেসে এসেছি নাকি? কাত্তিক, তোর বাপকে এক্ষুনি উকিলের চিঠি দে, পাঁচ-শ টাকার ড্যামেজ। মকদ্দমায় আমরা সাক্ষী হব।'

গোপাল। বাপের নামে নালিশ দেখায় খারাপ, হাজার হ'ক বাপ তো বটে। বরং খবরের কাগজে ছাপিয়ে দে, সমস্ত ছেলের দল খেপে উঠবে, বাছাধন টের পাবেন।

ঘনেন। উঁহু, তার চেয়ে জিগীষা দেবীর কাছে চল, তাঁকে ব'লে কয়ে আমরা একটা আশ্রম খুলব। কাগজে ছাপাব—এস কে কোথায় আছ বাংলার ছেলেরা, নির্যাতিত উৎপীড়িত অসহায় বুভুক্ষু—

বাঁটলো। ঐ সঙ্গে একটা মেয়েদের বিভাগও খোলা উচিত, কি বলিস কাত্তিক?

কার্তিক করুণ স্বরে বলিল—'বাঁটলো, হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিডের দাম কত রে?'

বাঁটলো। বিস্তর দাম, তার চেয়ে কেরোসিন তেল ঢের সস্তা, দশ পয়সাতেই কাজ সাবাড়।

কার্তিক। কিন্তু বড্ড জ্বালা করবে যে?

বাঁটলো। সে কতক্ষণ? একবার মরতে পারলে মোটেই টের পাবি না।

চাটুজ্যে মহাশয় কার্তিকের গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন—'ছিঃ বাবা কার্তিক, দুঃখু করো না! একে বাপ, তায় বয়সে বড়, বললেই বা একটু কড়া কথা। বাপের সুপুত্তুর হলে সব দেবতা খুশী হন। এই দেখ রামচন্দ্র পিতৃআজ্ঞায় বনে গিয়েছিলেন।'

ঘনেন। জব্দও হয়েছিলেন তেম্নি। মাথায় জটা, গায়ে জামা নেই, পায়ে জুতো নেই, চোদ্দ বছর ভ্যাগাবণ্ড, বউ গেল চুরি। চল্ রে কাত্তিক আমরা একবার জিগীষা দেবীর বাড়ি গিয়ে তাঁর বাণী নিয়ে আসি।

চাটুজ্যে। এত রাত্রে কেন আর তাঁকে বিরক্ত করা, তার চেয়ে এখন নিজের নিজের বাড়ি গিয়ে ঘুমও গে। বাণী নিতে হয় কাল নিও।

ঘনেন। কোথায় রাত, এই তো সবে সাড়ে আটটা। আর করলা বাগান ফার্স্ট লেন তো পাশেই।

চাটুজ্যে। আচ্ছা চল বাবা। বড়োদের রাজত্ব শেষ হয়েছে, এখন ছোকরাদের পিছু পিছু দৌড়ানোই বুদ্ধিমানের কাজ।

ঘনেন। আপনি আবার কি করতে যাবেন?

বাঁটলো। চলুন না উনিও, একজন মুরুব্বি লোক ডেপুটেশনে থাকা ভাল।

জিগীষা দেবীর বসিবার ঘরটি ছোট। মাঝে একটি টেবিল, তাহার পাশে গোটা কয়েক চেয়ার এবং একটা বেঞ্চ। ছেলেরা এবং চাটুজ্যে মহাশয় ঘরে প্রবেশ করিলে নাকে ঝুমকো পরা একজন নেপালী দাসী তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল।

বাঁটলো বলিল—চাটুজ্যে মশায়, আপনি হচ্ছেন আমাদের দলের সর্দার, দিন আপনার কার্ড পাঠিয়ে।

চাটুজ্যে। কার্ড-ফার্ড আমার কোনও কালে নেই। ওগো ঝি, মাইজীকে গিয়ে খবর দাও কেদার চাটুজ্যে আর চার জন ছোক্‌রা মোলাকাত করনে মাংতা!

ঘনেন। ছোকরা নয়, বলুন তরুণ।

চাটুজ্যে। হাঁ হাঁ, বোলো চারঠো তরুণ আর একঠো বুড্‌ঢা মাইজীর সাথ দেখা করেগা।

দাসী চোখ কুঁচকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—'মেম্‌-সাবকা সাথ?'

চাটুজ্যে। হাঁরে বাপু, জিঘাংসা দেবী।

ঘনেন ধমকাইয়া বলিল—'জিগীষা দেবী। চাটুজ্যে মশায়, আপনার ভীমরতি ধরেছে, ভদ্রমহিলার সামনে অসভ্যতা করবেন দেখছি।'

চাটুজ্যে। দেখ্ ঘনা, তুই আমার কাছে সভ্যতার বড়াই করিস্ নি। কটা মহিলা দেখেছিস তুই? জানিস, আমার তিন খুড়শাশুড়ী, চার শালাজ, সাত শালী আর গিন্নী তো আছেনই, এই চল্লিশ বৎসর তাঁদের সঙ্গে কারবার ক'রে আসছি!

দাসী খবর দিতে গেল। বাঁটলো বলিল—'চাটুজ্যে মশায়, আপনি আমাদের ডেপুটেশনের মুখপাত্র, আমাদের বক্তব্যটা আপনিই বেশ গুছিয়ে বলবেন। ঘাবড়ে যাবেন না তো?'

চাটুজ্যে। ঘাবড়াবার ছেলে কেদার চাটুজ্যে নয়।

জিগীষা দেবী ঘরে প্রবেশ করিলেন। রাশভারি মহিলা, দশাসই চেহারা, পাউডারের প্রলেপ ভেদ করিয়া সুগোল মুখের নিবিড় শ্যামকান্তি উঁকি মারিতেছে। কালিদাস যদি দেখিতেন তো লিখিতেন—'খড়িপড়া ছাঁচি কুমড়া ইব।'

জিগীষা দেবী বলিলেন—'আমাকে এখনি একটা কমিটি-মিটিংএ যেতে হবে, আপনারা একটু তাড়াতাড়ি বক্তব্য শেষ করলে বাধিত হব।'

বাঁটলো। বলুন চাটুয্যে মশায়।

চাটুজ্যে মহাশয় গলা সাফ করিয়া আরম্ভ করিলেন—'মা-লক্ষ্মী, এই যে দেখছেন চারজন ছোকরা, এরা হচ্ছে চারটি তরুণ। এটির নাম কার্ত্তিক, হীরের টুকরো



এ'রা বাণী নিতে এসেছেন

ছেলে। এর বাপ চরণ ঘোষের হচ্ছে পিত্তির ধাত, তাই মেজাজটা একটু তিরিক্ষি। দু-সন্ধ্যে ত্রিফলার জল খায়, কিন্তু কিছুই হয় না। চরণ ঘোষ কার্ত্তিককে বলেছে ছুঁচো, তাতে এ'রা—

ঘনেন তাহার নোটবুক দেখিয়া বলিল—'তিন বার ছুঁচো বলেছে!'

চাটুজ্যে। ঠিক, তিনবারই ছুঁচো বলেছে বটে। তাতে এ বাবাজীরা সকলেই বড় মর্মাহত হয়েছেন। আমরা ছেলেবেলায় বাপ-জ্যাঠার গালাগাল বিস্তর খেয়েছি, সোনাপারা মুখ ক'রে সমস্ত সয়েছি। কিন্তু সে দিন আর নেই মশায়। তখন এই কলকাতায় ঘোড়ার ট্রাম চ'লত, ছেলেরা গোঁফ রাখত, কোটের ওপর উড়ুনি ওড়াত, মেয়েরা নোলক পরত আর নাইবার ঘরে লুকিয়ে গান গাইত, গবরমেণ্টকে লোকে তখন বলত সদাশয় সরকার বাহাদুর। যাক সে কথা। এখন আমি বলি কি— বাপ যদি ছেলেকে ছুঁচো বলেই থাকে তাতে ক্ষতিটা কি। ছুঁচো ভগবানের সৃষ্ট জীব, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তার একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে। ছুঁচো তুচ্ছ প্রাণী নয়, ইঁদুরের চাইতে তার স্বভাব ভাল, মুখশ্রী ভাল, বুদ্ধিও বেশী। ইঁদুরের সম্বন্ধে কবি বলেছেন—কাঠ কাটে বস্ত্র কাটে কাটে সমুদায়, কিন্তু ছুঁচোর বদনাম কেউ দিতে পারবে না। কি বলেন মা-লক্ষ্মী?



জিগীষা দেবী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—'তরুণদের দলে আপনি কেন?'

চাটুজ্যে মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া উত্তর দিলেন—'সে একটা সমস্যা বটে, কিন্তু কথা হচ্ছে কি জানেন, আমি একজন প্রবীণ তরুণ।'

বাঁটলো। ওঁর বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু মনটি একদম কাঁচা।

জিগীষা দেবী কিন্তু খুশী হইলেন না। চাটুজ্যে মহাশয় বিষয়টি পরিষ্কার করিবার জন্য বলিলেন—'কি রকম জানেন? এই গুজরাটী ডাব আর কি, ওপরটা ঝুনো, ভেতরটা নেয়াপাতি।'

ঘনেন ততক্ষণ চটিয়া আগুন হইয়াছে। ধমকাইয়া বলিল—'চুপ করুন চাটুজ্যে মশায়, কেবল আবোল তাবোল বকছেন। আমাকে বলতে দিন।—দেখুন, আমরা বড়ই অপমানিত নির্যাতিত হয়েছি, একেবারে পব্লিক হোটেলে দু-শ লোকের সামনে। কেন? যেহেতু আমরা পরাধীন, অভিভাবকের অন্নদাস। এই অবস্থা আর সহ্য হয় না, নিজেদের একটা স্বাধীন আশ্রম বানাতে চাই। পিঁজরে ভাঙা চন্দনা চায় পাখনা মেলে বাঁচতে রে, অরুণ-রাঙা মুক্তাকাশের তক্তাপোশে নাচতে রে। আপনি যদি একটু চেষ্টা করেন তবে অনায়াসে একটা আশ্রম গড়ে উঠবে। এখন এ সম্বন্ধে একটি বাণী আমরা আপনার কাছে প্রার্থনা করি।'

জিগীষা দেবী কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন, তাহার পর শিষ দিয়া ডাকিলেন—'সুষ্ সুষ্—'

একটি ছোট্ট প্রাণী গুটগুট করিয়া ঘরে আসিল। কুত্তা নয়। ইনি সুষেণবাবু, জিগীষা দেবীর স্বামী। রোগা, বেঁটে, চোখে চশমা, মাথায় টাক, কিন্তু গোঁফ জোড়াটি বেশ বড় এবং মোম দিয়া পাকানো। সতী সাধ্বী যেমন সর্বহারা হইয়াও এয়োতের লক্ষণ শাঁখা-জোড়াটি শেষ পর্যন্ত রক্ষা করে, বেচারা সুষেণবাবুও তেমনি সমস্ত কর্তৃত্ব খোয়াইয়া পুরুষত্বের চিহ্ন স্বরূপ এই গোঁফ জোড়াটি সযত্নে বজায় রাখিয়াছেন। ঘরে আসিয়া ঘাড় নীচু করিয়া সবিনয়ে বলিলেন—'ডেকেছ?'

জিগীষা দেবী ছেলেদের দেখাইয়া বলিলেন—'এঁরা বাণী নিতে এসেছেন।'

সুষেণবাবু চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন—'বানি? এই যে সেদিন ননি-সেকরা বিয়াল্লিশ টাকা নিয়ে গেল?'

জিগীষা দেবী ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন—'ঈডিয়ট! সেকরার বানি নয়, আমার মুখের বাণী। যাও, সবুজ ফাউন্টেন পেনটা আর এক শীট কাগজ নিয়ে এস।'

সুষেণবাবু কাগজ কলম আনিলেন। জিগীষা দেবী খচখচ করিয়া কয়েকটা লাইন লিখিয়া বলিলেন—'শুনুন।—ওগো ছেলেরা, আমি বুঝেছি তোমাদের ব্যথা, কিন্তু জগৎ পারবে না তা বুঝতে, কারণ স্থবিরের প্রাচীন-প্রস্তর-যুগ শেষ হয় নি এখনও। প্রবীণের রক্ত আর তরুণের খুন, ধনীর রুধির আর শ্রমীর লোহু, রেড়ীর তেল আর ঝরনার জল কখনই মিশ খায় না। অতএব তোমাদের হ'তে হবে স্বাবলম্বী স্বপ্রতিষ্ঠ। বানাও আশ্রম, গ্রামে গ্রামে, দেশে দেশে, নগরে নগরে। বানাও তারুণ্যের তপোবন, নবীনতার নীড়, যৌবনের দুর্গ। তোল চাঁদা—লাখ, দশ লাখ, কোটি। আপাতত এনে দাও আমাকে হাজার দশেক, তাতেই কাজ আরম্ভ হ'তে পারবে।'

চাটুজ্যে মহাশয় বলিলেন—'বাঃ অতি চমৎকার, খাসা। বাঁটলো কাগজখানা যত্ন ক'রে রেখে দিস। তবে আজকের মতন আসি মা-লক্ষ্মী।'

বাঁটলো। অসময়ে অনেক উৎপাত করলুম, মাফ করবেন।

জিগীষা। না না, উৎপাত কিসের। আচ্ছা, আমি এখন মিটিংএ যাচ্ছি, নমস্কার।

জিগীষা দেবী প্রস্থান করিলেন। চাটুজ্যে মহাশয়রাও উঠিলেন, কিন্তু সুষেণবাবু বলিলেন—'আপনাদের কি বড্ড তাড়া? বসুন না একটু।'

চাটুজ্যে। আপনিও একটা বাণী দেবেন নাকি?

সুষেণবাবু একবার দরজার বাহিরে উঁকি মারিয়া বলিলেন—'বাণী-ফাণি আমি বুঝি না মশায়, ও হচ্ছে মেয়েলী ব্যাপার। আমি বুঝি শুধু কাজ। বলছিলুম কি—আপনারা কানাই ঘোষালকে চেনেন? চ্যাম্পিয়ান ওআন-লেগার, সেনেট হাউসের চাতালে নাগাড় পঁচাত্তর ঘণ্টা এক পায়ে দাঁড়িয়েছিল? আমার খুড়তুতো ভাই হয়!'

চাটুজ্যে। বটে?

সুষেণ। হাঁ। বলাই বাঁড়ুজ্যের নাম শুনেছেন? যে ছোকরা সেদিন গড়ের মাঠে তিনটে গোরাকে ছাতা-পেটা করেছিল? আমার আপন মাসতুতো ভাই!

চাটুজ্যে। বলেন কি মশায়! আপনারা দেখছি বীরের বংশ, বড় সুখী হলুম আলাপ ক'রে। আর কিছু বলবার নেই তো? আচ্ছা, বসুন তা হ'লে, নমস্কার।

সুষেণবাবু সহসা মুখখানি করুণ করিয়া বলিলেন—'পাঁচটা টাকা হবে কি? মাসকাবার হ'লেই শোধ করে দেব।'

বাঁটলো একটা আধুলি ফেলিয়া দিল। ছেলেদের দল ও চাটুজ্যে মহাশয় বাহিরে আসিলেন।

রাস্তায় আসিয়া চাটুজ্যে মহাশয় বলিলেন—'আর ভাবনা কি, কেল্লা মার দিয়া। এখন চট্‌পট আশ্রমের টাকাটা যোগাড় করে জিগীষা দেবীর হাতে দাও। আচ্ছা, আমি এখন চললুম। কার্ত্তিক, তুমি তা হ'লে আজ রাত্রে বাঁটলোদের বাড়ি থাকছ? বেশ, কাল সকালে আবার দেখা হবে।'

চাটুজ্যে মহাশয় চলিয়া গেলে ঘনেন বলিল—'তাই তো, দ-শ হা-জার টাকা! কিন্তু এর কমে আশ্রম হবেই বা কি করে। অন্তত পঞ্চাশ জনের থাকবার জায়গা চাই, শোবার ঘর ডাইনিং রুম ড্রয়িং রুম লাইব্রেরী টেনিস কোর্ট সমস্তই চাই, জিগীষা দেবী খুব কম ক'রেই এস্টিমেট করেছেন। কিন্তু টাকা পাওয়া যায় কোথায়? বাঁটলো কি বলিস?'

বাঁটলো। আমি বলি কি—কার্ত্তিক আজ রাত্রে খুব ঠেসে খেয়ে নিয়ে কাল থেকে উপবাস আরম্ভ করুক, আর আমরা চারিদিকে সভা ক'রে বক্তৃতা দিই—হে দেশবাসী, এই যে একটি তরুণ আশ্রম বানাবার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে বসেছে আর তোমরা হেসে খেলে বেড়াচ্ছ, এটা কি ঠিক হচ্ছে? দাও দশ হাজার টাকা তুলে, তাহ'লেই ছোরা চাট্টি ভাত খাবে।

ঘনেন। উপোস ক'রে কাজ উদ্ধার করা হচ্ছে মেয়েলি ট্যাকটিক্স, আমার তাতে সিমপ্যাথি নেই।

বাঁটলো। পুরুষোচিত পন্থা আছে, কিন্তু তাতে কিছু সময় লাগবে। কার্ত্তিক আমেরিকায় যাক, ঝাঁকড়া চুল রাখুক, স্বামিজী হয়ে জেঁকে বসুক। বিস্তর মেম ওর চেলা হবে, টাকাও আসবে ঢের। সেখানেই আশ্রম খোলা যাবে, আমরাও গিয়ে জুটব।

কার্তিকের এসব যুক্তি পছন্দ হইল না। বলিল—'বাঁটলো, পিস্তলের দাম কত রে?'

বাঁটলো ফেরিওয়ালার সুরে বলিল—'জাপানবালা দো আনা, জার্মানবালা দো আনা, সস্তাবালা দো আনা। পিস্তল কি হবে রে গাধা?'

কার্তিক উত্তেজিত হইয়া বলিল—'ডাকাতি করব, খুন করব, জেলে যাব, ফাঁসি যাব, আত্মীয়-স্বজনের নাম ডোবাব, জগৎ আমার শত্রু, কোথাও আমার স্থান নেই।'

বাঁটলো। আপাতত আমাদের বাড়িতে স্থান আছে। রাত্রিটা তো কাটিয়ে দে তার পর সকালবেলা মাথা ঠান্ডা হলে যা হয় করিস।

গোপাল ও ঘনেন নিজের নিজের বাড়ি গেল। কার্তিক নীরবে বাঁটলোর সঙ্গে চলিল। বাড়ি আসিয়া বাঁটলো কার্তিককে বাহিরের ঘরে বসাইয়া তাহার শুইবার ব্যবস্থা করিতে উপরে গেল। কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া দেখিল কার্তিক পালাইয়াছে।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। বৃদ্ধ গোবিন্দবাবু দোতলার ঘরে খাটের উপর গভীর নিদ্রায় মগ্ন। সহসা তাঁহার চোখের উপর একটা তীব্র আলোক পড়ায় ঘুম ভাঙিয়া গেল। শুনিলেন, চাপা গলায় কে বলিতেছে—'খবরদার, চেঁচালেই গুলি ক'রব। লোহার আলমারির চাবি—শিগ্‌গির।'

গোবিন্দবাবু বুঝিলেন, আধুনিক চোর। একটা স্থবির চাকর ছাড়া বাড়িতে এখন দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, তিনি নিজেও কয়দিন হইতে বাতে পঙ্গু হইয়া আছেন। অগত্যা বলিলেন—'চাবি তো আমার কাছে নেই, গিন্নীর কাছে, তিনি আবার চন্দননগরে তাঁর ভাই-এর বাড়ি গেছেন।'

চোর। মনিব্যাগ? ঘড়ি-টড়ি? আংটি?

গোবিন্দ। ঐ ড্রেসিং টেবিলটার টানার মধ্যে যা কিছু আছে। কিন্তু চেক বইখানা নিও না বাপু, সেটা তোমার কোনও কাজে লাগবে না।

টর্চের আলো ঘরের চারিদিকে ঘুরাইয়া চোর টেবিল খুঁজিতে লাগিল। অন্ধকারে সহসা টেবিলটায় ধাক্কা খাইয়া মেজেতে বসিয়া পড়িয়া চোর বলিল—'উঃ!'

গোবিন্দবাবু বলিলেন—'কি হ'ল?'

সাড়া নাই। কিছুক্ষণ পরে চোর আবার 'উঃ' করিল। গোবিন্দবাবু ভাবিত হইলেন। খাটের পাশেই একটা বাতির সুইচ, সেটা টিপিয়া ঘর আলোকিত করিলেন। দেখিলেন, চোর টেবিলের পাশে মেজেতে বসিয়া আছে, তাহার কোমরে হাত, মুখে কাতর ভঙ্গী।

গোবিন্দবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমারও বাত নাকি?'

চোর। উঁহু। মাস-দুই আগে ডেঙ্গু হয়েছিল, তার পর থেকে মাঝে মাঝে একটুতেই খিল ধরে। উঃ, উঠতে পারছি না।

গোবিন্দ। উঠতে পারবে একটু পরে। ওষুধপত্র খাচ্ছ?

চোর। ডেঙ্গু যখন ছিল তখন খেতুম। এখন আর খাই না।

গোবিন্দ। অন্যায় করছ, ডেঙ্গু বড় খারাপ ব্যারাম। দিনকতক তুলসীপাতার রস দিয়ে কুইনীন খেয়ে দেখ দিকি, ভারী উপকারী। যদি এ সময় পুরী কি দেওঘর গিয়ে থাকতে পার তো আরও ভাল।

চোর একটু হাসিয়া বলিল—'দেওঘর না শ্রীঘর?'

গোবিন্দ। তাও তো বটে, বুড়ো মানুষ, ভুলেই গিয়েছিলুম যে তুমি একজন চোর। কিন্তু ভয় নেই, আইন-আদালত আমার আর ভাল লাগে না। সাজা যা দেবার আমিই দেব, তবে বাতে কাবু করেছে এই যা মুশকিল।

চোর এইবার একটু সুস্থ হইয়া আস্তে আস্তে উঠিল।

গোবিন্দবাবু বলিলেন—'ব'স ঐ চেয়ারটায়।'

তরুণ চোর। পিছনে ওলটানো বড় বড় চুল, নাক-টেপা চশমা, তাহাতে দু-ইঞ্চি চওড়া কাল ফিতা, কাবুলী ফ্যাশনে ধুতি পরা, গায়ে রেশমী পঞ্জাবি, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতা, হাতে রিস্টওআচ ও পিস্তল।

গোবিন্দ। ও পিস্তলটা কোথা থেকে পেলে?

চোর। মুরগিহাটা থেকে, ছ-আনা দাম।

গোবিন্দ। খেলনা? তবু ভাল, আর্মস অ্যাক্টে পড়বে না। স্বদেশী ডাকাত?

চোর। ভবিষ্যতে তাই হয়তো হতে হবে। আপাতত ঝোঁকের মাথায়।

গোবিন্দ। বাপ নেই?

চোর। আছেন।

গোবিন্দ। তাড়িয়ে দিয়েছেন?

চোর। তিনি ঠিক তাড়ান নি, আমিই গৃহত্যাগ করেছি।

গোবিন্দ। ও, বুদ্ধদেব শ্রীচৈতন্যের মতন! কি হয়েছে বাপু, বৈরাগ্য?

চোর। বৈরাগ্য নয়, পৈতৃক জুলুম। বাবা হচ্ছেন সেকেলে জবরদস্ত পিতা। আজ সন্ধ্যাবেলা বন্ধুদের সঙ্গে অ্যাংলো-মোগলাই হোটেলে খাচ্ছি, হঠাৎ বাবা এসে খামকা যা-তা ব'লে গালাগালি দিলেন—একেবারে দু-শ লোকের সামনে। তার পর বললেন—এই কাত্তিক, অঘ্রান মাসে তোর বিয়ে রাখাল সিংগির মেয়ের সঙ্গে। আমি জবাব দিলুম—কখনই নয়।

গোবিন্দ। আর অমনি সিঁদকাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়লে?

চোর। আমার মনের অবস্থাটা আপনি বুঝতে পারছেন না সার। বাবা তো রেগে শেয়ালদা চলে গেলেন। আমি তখন ফিউরিয়স, বন্ধুরা নিয়ে গেল জিগীষা দেবীর কাছে—বিগ হামবগ। তার পর বাটলো আমাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে গেল। থাকতে পারলুম না, চুপি চুপি পালিয়ে এলুম, একটা কিছু ভয়ংকর করতে চাই—চুরি, ডাকাতি, খুন।

গোবিন্দ। রাখাল সিংগির মেয়েটা বিশ্রী বুঝি?

চোর। ভগবান জানেন আর বাবা জানেন। যার দেহের মনের কোনও সংবাদ আমি জানি না তাকে বিয়ে করি কি করে বলুন তো? পাড়াগেঁয়ে বাপ-মার মেয়ে, বিদেশে মামার কাছে মানুষ হয়েছে, মামা শুনেছি একটি আস্ত পাগল, ভাগনীটিকে নাকি বন্য জন্তু বানিয়েছেন। আমার মানসী প্রিয়া অন্য প্যাটার্নের, সিন্‌থেসিস অভ পার্ফেকশন।

গোবিন্দ। কি রকম শুনি।

চোর সোৎসাহে বলিল—'শুনবেন?' পঞ্জাবির পাশের পকেট হইতে একটা মোটা খাতা টানাটানি করিয়া বাহির করিল।

গোবিন্দ। কি ওটা, সিঁদকাঠি?

চোর। উঁহু, কবিতার খাতা। শুনুন।—জানতে চাও কি হৃদয়রানী, অদেখা ঐ মূর্তিখানি, রূপে গুণে কলচরেতে কেমন হ'লে ধন্য মানি—

গোবিন্দ। থাক থাক, আমি বুঝে নিয়েছি। সেই মেয়েটার নাম কি?

চোর। ডাকনাম নেড়ী, ভাল নাম জানি না।

গোবিন্দ। আর তোমার নাম?

চোর। কার্তিক ঘোষ।

গোবিন্দ। বল কি হে? কাত্তিক ঘোষের হৃদয়রানী হবে নেড়ী। নেলী হলেও বা কথা ছিল।

নীচে মোটর থামার অস্ফুট আওয়াজ হইল, তাহার পর ঘরের বাহিরের বারান্দায় খুট খুট পদশব্দ। গোবিন্দবাবু হাঁকিলেন—'কে রে নেড়ী এলি? এত রাত হল যে?'

বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে উত্তর আসিল—'মামা, এখনও জেগে আছ? ওঃ, কি ভোজটাই খাইয়েছে, পঞ্চাশটা কোর্স, একেবারে টপিং!'

একটি সালংকারা অনবদ্যাঙ্গী তরুণী ঘরে প্রবেশ করিয়া একজন অপরিচিত লোক দেখিয়া চিত্রার্পিতাবৎ দাঁড়াইল। চোর হাঁ করিয়া দেখিতে লাগিল।

গোবিন্দবাবু বলিলেন—'হাঁ, তার পর কি বলছিলে হে ছোকরা—রূপে গুণে কল্‌চরেতে? রূপ তো দেখতেই পাচ্ছ। গুণ আর কল্‌চর? নেড়ী, বানান কর তো প্রতিদ্বন্দ্বী।'

নেড়ী বলিল—'পয় রফলা তয় হস্‌সি' ইত্যাদি। ইত্যবসরে চোর পিছন ফিরিয়া একটা ছোট আরশি পকেট হইতে বাহির করিয়া চট্‌ করিয়া মাথার চুল ঠিক করিয়া লইল।

গোবিন্দ। দুইএর স্কোয়ার রুট কত হয় রে?

নেড়ী। 1.41425...

গোবিন্দ। বস্‌ বস্‌, ফিফ্‌থ প্লেস পর্যন্তই ঢের, কি বল হে ছোকরা। আচ্ছা নেড়ী, তোর মতে আধুনিক লেখকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে?

নেড়ী। যদি কীর্তিনতাল অথর বল, তবে আঁরি মর্রাঁর কাছে কেউ দাঁড়াতে পারে না। আধুনিক উপোসী সাহিত্যের ইনিই সবচেয়ে বড় এক্স্‌পনেন্ট্‌। কেমন একটা করুণ বিস্বলুট ভাব, যেন একটা দড়িছেঁড়া পিয়াসী বুভুক্ষা—ভারি মিষ্টি লাগে কিন্তু। আর এঁর ঠিক উল্‌টো হচ্ছেন জাপানী রেনেসাঁসের কবি সিমাৎসু ফুজিয়ামা। এঁর লেখায় কেমন একটা ঔদরিক ঔদার্য, যেন একটা পূর্তির পুলক, যেন একটা হৃষ্ট হ্রেষা—ভারি অবাক লাগে কিন্তু।

গোবিন্দ। আচ্ছা শেষের কবিতার শেষ কবিতার মোদ্দা কথাটা কি রে?

নেড়ী। উৎকণ্ঠ আমার লাগি কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে, সে-ই ধন্য করিবে আমাকে।

গোবিন্দ। বাঃ। এইবার তুই একটা কিছু বাজা দিকি।

নেড়ী একটা ব্যাঞ্জো লইয়া টুং টাং করিতে লাগিল। চোর গোবিন্দবাবুকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল—'নাইন্থ্‌ সিমফোনি বাজাচ্ছেন বুঝি?'

গোবিন্দ। উঁহু, ওসব সেকেলে সুর নেড়ীর পছন্দ নয়, বোধ হয় শালা-লুট-লিয়া বাজাচ্ছে। নেড়ী, একটা রাশিয়ান ঠুংরি গা তো।

নেড়ী। যাও, এখন আমি পারি না, ঘুম পায় না বুঝি? আচ্ছা মামা, ইনি কে তা তো বললে না।

গোবিন্দ। ইনি একজন চোর। হঠাৎ কোমরে খিল ধরায় বাধা পেয়েচেন।

নেড়ী লাফাইয়া বলিল—'অ্যাঁ—চোর? এতক্ষণ বলতে হয়।' ঘরের কোণে গিয়া চট্ করিয়া টেলিফোনটা তুলিয়া নেড়ী বলিল—'পার্ক এট-সেভ্ন—হেলো বালিগঞ্জ থানা—'

গোবিন্দ। খবরদার নেড়ী, টেলিফোন রেখে দে—স্থির হয়ে ব'স্।



হেলো বালীগঞ্জ থানা

নেড়ী টেলিফোন রাখিয়া বলিল—'বা রে, চোরকে অম্নি ছেড়ে দেবে? তোমার সেই কুকুর-মারা চাবুকটা কোথায়, আমিই না হয় ঘা-কতক লাগিয়ে দিই—'

গোবিন্দ। এ আমার চোর, তুই মারবার কে!

নেড়ী চঞ্চল হইয়া বলিল—'তবে একটা দড়ি, বিছানা-বাঁধা স্ট্রাপ, কোথা আছে বল না মামা—বেঁধে ফেলি, নয়তো পালাবে—'

চোর সবিনয়ে বলিল—'আজ্ঞে না না, আমি পালাব না।'

নেড়ী ব্যস্ত হইয়া দড়ি খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু পাইল না।

চোর। আমার এই রুমাল দেখুন তো, যদি কাজ চলে।

নেড়ী। নো, থ্যাংক্স।

নেড়ী তাহার শাড়ির আঁচল দিয়া চোরকে পিঠমোড়া করিয়া বাঁধিল, চোর সুবোধ

বালকের ন্যায় স্থির হইয়া রহিল। নেড়ী বলিল—'মামা, বেঁধে ফেলেছি, এইবার থানায় টেলিফোন কর শিগ্‌গির।'

গোবিন্দ। আমার এখন ওঠবার ক্ষমতা নেই। কিন্তু চোরের সঙ্গে তুইও যে বাঁধা পড়লি!

নেড়ী অস্থির হইয়া বলিল—'আমি? কখ্‌খনো নয়—উঃ আঁচলটা কি শক্ত, ছেঁড়া যায় না—একটা কাঁচি—কাঁচি—'

চোর। দেখুন তো, আমার বুক পকেটে আছে।

নেড়ী চোরের পকেট তল্লাশ করিল, কিন্তু কাঁচি পাইল না।

চোর। আচ্ছা, পাশের পকেট দেখুন তো।

সেখানেও কাঁচি নাই। নেড়ী বলিল—'মিথ্যাবাদী জোচ্চোর।'

চোর বলিল—'আজ্ঞে না না। আচ্ছা আপনি বাঁধন খুলে দিন, আমি কথা দিচ্ছি পালাব না, আপন মাই অনার।'

নেড়ী। আহা কি কথাই বললেন, চোরের আবার অনার।

উপায়ান্তর না দেখিয়া নেড়ী বাঁধন খুলিয়া দিল।

গোবিন্দবাবু বলিলেন—'নেড়ী, যা লক্ষ্মীটি, খানকতক গরম গরম কাটলেট ভেজে আন, আর এক কাপ চা। আর পাশের ঘরে এ'র শোবার ব্যবস্থা ক'রে দে—এত রাত্রে বেচারা যায় কোথা।

নেড়ী মামার আজ্ঞা পালন করিতে গেল।

গোবিন্দ। কেমন দেখলে কার্ত্তিক বাবাজী?

কার্তিক। চমৎকার! আশ্চর্য! এক্স্‌কুইজিট!

গোবিন্দ। মানসী প্রিয়ার সঙ্গে মিল্‌ছে?

কার্তিক। হুবহু। কিন্তু বাবা কি করবেন তাই ভাবছি। এ নেড়ী তো তাঁর মানসী নেড়ী নয়।

গোবিন্দ। কোনও ভয় নেই তোমার, আমার শিক্ষায় মোটেই খুঁত পাবে না। এই নেড়ী যখন শ্বশুরবাড়ি যাবে তখন লাল চেলি প'রে এক হাত ঘোমটা টেনে পঞ্চাশটা গুরুজনকে ঢিপ ঢিপ ক'রে প্রণাম করবে, রান্নাঘরে গিয়ে কোমর বেঁধে দু-শ লোকের শাকের ঘণ্ট রাঁধবে। আবার ওকে যদি সিমলা দিল্লীতে ভাইসরয়ের ডান্সে নিয়ে যাও তবে লাট-বেলাটের সঙ্গে অক্লেশে বার-কুড়িক নেচে দেবে, জার্মান কনসলের কানে চিমটি কাটবে, সার জম্বুস্বামী আয়ারের টিকি ধরে টানবে।

কার্তিক। ওঃ।

গোবিন্দ। কিহে, ভয় পেলে নাকি?

কার্তিক। আজ্ঞে না, আনন্দ আনন্দ!

১৩৩৬-১৩৩৭ (১৯২৯-১৯৩০)

প্রেমচক্র

'এখনও বল্ হাবলা।'

'হাঁ হাঁ হাঁ, আমি বলছি তুমি ফেলে দাও মামা।'

'কিন্তু লোকে কি বলবে?'

'ভালই বলবে।'

'তোর মামী?'

'মামী খুশী হবে, তুমি দেখো।'

'তুই না-হয় একবার ওপরে গিয়ে জিজ্ঞেস করে আয়।'

'তা আসছি! তুমি ততক্ষণ বেশ ভিজিয়ে নরম ক'রে রাখ।'

হাবলা ওপরে গেল। আমি বুরুশ ঘষতে লাগলুম। হুকুম এলেই জয়-মা-কালী ব'লে চোপ বসাব।

কিন্তু শুভকর্মে অনেক বাধা। হাবলার ছোট ভাই বঙ্কা ঝড়ের মতন ঘরে ঢুকে বললে—'ওকি হচ্ছে মামা?'

'কি আবার হবে, গোঁপটা ফেলে দেব।'

বঙ্কা বললে—'গোঁপ এখন থাকুক। দাও ধাঁ করে একটা গল্প লিখে। একটা মাসিক পত্রিকা বার করেছি—চিরন্তনী।'

'ক-মাস বার হবে?'

'চিরকাল। এ পত্রিকা মরবে না, তুমি দেখে নিও। দস্তুরমত এস্টিমেট ক'রে আটঘাট বেঁধে নামা হচ্ছে। পঁচিশজন নামজাদা লেখকের সঙ্গে কনট্রাক্ট করেছি। প্রতি সংখ্যায় উনিশটা গল্প—পাঁচটা সোজা প্রেম, দশটা বাঁকা প্রেম, চারটে লোমহর্ষণ। প্রথম সংখ্যা প্রায় ছাপা হয়ে এল, কেবল শেষ ফর্মার লেখাটা যোগাড় হয়ে ওঠেনি, তাই তোমার শরণাপন্ন হয়েছি। দাও চট্‌পট্ একটা লিখে।'

'কেন তোর কনট্রাক্টরদের কাছে যা না।'

'তাদের খোশামোদ করবার আর সময় নেই, তুমিই একটা লিখে দাও, আজই চাই কিন্তু।'

এমন সময় হাবলা ফিরে এল। মুখখানা হাঁড়ির মতন ক'রে বললে—'মামী রাজী নয়।'

'কি বললে?'

'বললেন—খবরদার, ঐ তো মুখের ছিরি, গোঁপ ফেললে দেখাবে যা, মরি মরি! মামা, অমন মুষড়ে গেলে চলবে না কিন্তু। প্রতিশোধ নিতে হবে, ভীষণ প্রতিশোধ। আমি বলছি তুমি দাড়ি রাখ, দিব্যি মুখ-ভরা কোমর পর্যন্ত, নিরঞ্জন সিংএর মতন।'

বঙ্কা অস্থির হয়ে বললে—'আঃ, কেবল গোঁপ আর দাড়ি। তার চেয়ে ঢের বড় জিনিস সৃষ্টি করবার আছে। মামা, তুমি অন্য চিন্তা ত্যাগ করে গল্প লেখ।'

হাবলা বললে—'তোদের সেই পত্রিকাটার জন্যে বুঝি?'

বঙ্কা জবাব দিল না। সে তার দাদাকে গ্রাহ্য করে না, কারণ হাবলা একটু সেকেলে গোছের, আর বঙ্কা হচ্ছে খাজা-তরুণ।

আমি বললুম—'বঙ্কার পত্রিকায় এক ফর্মা খালি রয়েছে, তুই একটা লিখে দে না হাবলা।'

হাবলা বললে—'কবিতা চায় তো দিতে পারি। পুঁটুর বিয়ের জন্যে একটা লিখেছি, তাই একটু অদলবদল ক'রে দিলে চলবে।'

বিয়ের পদ্যে হাবলার হাত খুব পাকা। তার বন্ধুরা বলে, এ লাইনে ও-ই এখন সম্রাট। হাবলাদের রাবণের বংশ, জেটতুতো খুড়তুতো পিসতুতো মাসতুতো মামাতোর অন্ত নেই, তার সমস্ত তাল সামলায় শ্রীমান হাবুলচন্দ্র। বছরের মধ্যে গোটা-পাঁচেক হৃদয়বাণী, গণ্ডা-দুই মর্মোচ্ছ্বাস, ছ-সাতটা প্রীতি-উপহার তাকে লিখতেই হয়। ভাষা ছন্দ ভাব তিনটেই বেশ স্ট্যাণ্ডারডাইজ ক'রে ফেলেছে। আজি কি সুন্দর প্রভাত, নীল নভে পূর্ণচন্দ্র উঠিছে, মলয় মৃদু হিল্লোলে বহিছে, কুসুম থরে থরে ফুটিছে, হৃদয়ে সাহানা রাগিণী বাজিছে। কেন এ সব হচ্ছে? কারণ, আমাদের স্নেহের পুঁটুরানীর সঙ্গে শ্রীমান্ চামেলিরঞ্জন বি. এস-সির শুভপরিণয়। অতএব হে বিভু, তুমি প্রচুর মধুলেপন ক'রে এই দুটি তরুণ হিয়া জুড়ে দাও।

কিন্তু বঙ্কার তা পছন্দ নয়। বললে—'রাবিশ। ওসব সেকেলে ছড়া একদম চলবে না।'

আমি বললুম—'খুব চলবে। এই কবিতাই কিছু অদলবদল করে দিলে আধুনিক হয়ে দাঁড়াবে। দু-চারটে ভূমা, গোটা-তিন অবদান, একটু রুদ্র শিহরণ, একটু রিনকি-ঝিনি—'

বঙ্কা তিড়বিড় ক'রে হাত-পা নেড়ে বললে—'না না না। ওসব পচা কবিতা একদম চলবে না। মামা, তুমি গল্প লেখ, বেশ ঘোরালো প্লট চাই, শিগ্‌গির দিতে হবে কিন্তু।'

বললুম—'আচ্ছা তাই হবে।'

'ছবিও চাই কিন্তু।'

'বলিস কি রে! আমার চোদ্দপুরুষ কখনও ছবি আঁকে নি।'

'বাঃ সেই যে তুমি ঘোষ কোম্পানির আপিসে ছবি আঁকতে?'

কথাটা নেহাত মিথ্যে নয়। চার বার বি· এ· ফেল হবার পর বাবার উপরোধে দিন-কতক এঞ্জিনিয়ার ঘোষ কোম্পানির আপিসে প্ল্যান আঁকা শিখি। কত রকম যন্ত্র, কত রকম রং। আমি মনের সুখে সেট-স্কোয়ার দিয়ে পুকুর আঁকতুম আর কম্পাস দিয়ে চাঁদামাছ আঁকতুম। ঘোষ সাহেব দেখেও দেখতেন না, পিতৃবন্ধু কিনা। বঙ্কা সেই থেকে ঠাউরেছে আমি একজন আর্টিস্ট। তা হোক, একটু চেষ্টা করলে যদি একাধারে লিখিয়ে আর আঁকিয়ে হতে পারি তো মন্দ কি। বঙ্কাকে বললুম—'কাল সন্ধ্যাবেলা আসিস, দেখি কি করতে পারি।'

পরদিন সন্ধ্যা হ'তে না হ'তে বঙ্কা এসে হাজির। সঙ্গে আবার তার ছোটবোন চিংড়িকে এনেছে। সে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে, গল্প আর ছবির একজন মস্ত সমঝদার। জিজ্ঞাসা করলুম—'হাবলা এল না?'

বঙ্কা বললে—'দাদা ভীষণ চটেছে। বললে, দেখি আমাকে বাদ দিয়ে তোদের

পত্রিকা ক'দিন চলে। দাদা ম্যালেরিয়া-বধ কাব্য শুরু করেছে, শ্যাওড়াপুলি-হিতৈষীতে ক্রমশ প্রকাশ্য। যাক, তুমি চট্‌পট্‌ পড়ে ফেল মামা। লেখাটা এখনি ছাপাখানায় দিতে হবে, ছবির ব্লক করতে হবে। নাও, আরম্ভ কর।'

আরম্ভ করলুম।—

'স্থান—নৈমিষারণ্যের ঋষিপাড়া। কাল—সত্যযুগ। পাত্র—তিন ঋষিকুমার, হারিত জারিত আর লারিত। পাত্রী—তিন ঋষিকন্যা, সমিতা জমিতা আর তমিতা।'

বঙ্কা বললে—'সত্যযুগে গেলে কেন? আধুনিক হলেই বেশ হত, প্রেমের পথে কোন বাধা পেতে না। যদি বর্তমান যুগধারার সঙ্গে তোমার পরিচয় না থাকে তবে বৌদ্ধ মুঘল আমল চালাতে পারতে।'

বললুম—'তুই কতটুকু খবর রাখিস? যদি হৃদয়ের অবাধ প্রসার আর কল্পনার উদ্দাম প্রবাহ দেখাতে হয় তবে সত্যযুগের প্লট ফাঁদতেই হবে।'

চিংড়ি বললে—'যেমন কচ ও দেবযানী।'

'ঠিক। চিংড়ি, তুই জানিস দেখছি।'

চিংড়ি খুশী হয়ে উত্তর দিলে—'মামা, তুমি কারও কথা শুনো না, চালাও সত্যযুগ।'



'চালাবই তো। তারপর শোন্‌।—হারিত ভালবাসে সমিতাকে, কিন্তু সমিতা চায় জারিতকে। আবার জারিত চায় জমিতাকে, অথচ জমিতার টান লারিতের ওপর। আবার লারিত ভালবাসে তমিতাকে, কিন্তু তমিতার হৃদয় হারিতের প্রতি ধাবমান।'

বঙ্কা বললে—'ভয়ংকর গোলমেলে প্লট, মনে রাখা শক্ত।'

'মোটেই না। এক নম্বর চিত্র দেখ।'

চিংড়ি বললে—'উঃ করেছ কি মামা! এ যে ইটার্নাল ট্র্যাংগ্‌লের বাবা, হোপলেস হেক্সাগন! আচ্ছা মামা, মধ্যিখানে এটা কি এঁকেছ, চামচিকে?'

'চামচিকে নয়, ইনি হচ্ছেন খোদ কন্দর্প। অতনু কিনা, তাই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। লেন্স দিয়ে দেখলে টের পাবি ওঁর দুই হাতে দুই ধনুক, তার ছিলের এক প্রান্ত খোলা, তাই দিয়ে ডাইনে বাঁয়ে ওপর নীচে সপাসপ চাবুক লাগাচ্ছেন, আর প্রেমচক্র বন্‌বন্‌ ক'রে ঘুরছে।'

চিংড়ি বললে—'বন্‌বন্‌ সেকেল ভাষা। বাঁইবাঁই লেখ, অথবা পাঁইপাঁই।'

'ঠিক। প্রেমচক্র বাঁইবাঁই অথবা পাঁইপাঁই ক'রে ঘুরছে। এই চক্রের বাইরে আর একটি মূর্তি আছেন, তিনি হলেন ভুশুণ্ডিল মুনি। ব্রহ্মচর্য শেষ করার পর গৃহী হবার জন্য কিছুদিন চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কোনও ঋষিকন্যাই একে বিয়ে করতে রাজী হয় নি, কারণ ভুশুণ্ডিল মুনি যেমন মোটা তেমন গম্ভীর, আর তাঁর বয়স প্রায় চার হাজার বৎসর, অর্থাৎ এই কলিযুগের হিসেবে চল্লিশ। অবশেষে তিনি বুঝলেন যে দৃশ্যমান জগৎটা নিছক মায়া, আর নারী সেই মায়াসমুদ্রের ভুড়ভুড়ি, তাদের আকার আছে, কিন্তু বস্তু নেই। তখন তিনি আশ্রম ত্যাগ ক'রে নিবিড় অরণ্যে গিয়ে নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কঠোর তপস্যা শুরু করলেন। দু নম্বর চিত্র দেখ।'



(২)

চিংড়ি বললে, 'মামা, এবার আমাদের বার্ষিক উৎসবে তোমার গল্পটা অভিনয় করব। সরসী-দি যদি ভুশুণ্ডিল মুনি সাজেন, ওঃ, কি চমৎকার মানাবে! গোঁফ লাগবে না, শুধু চাট্টি দাড়ি আনালেই চলবে। তারপর প'ড়ে যাও মামা।'

'একদা বসন্ত সমাগমে যখন বনভূমি রমণীয় হয়ে উঠেছে, অশোক কিংশুক কুরুবক পুন্নাগ প্রভৃতি তরুরাজি পুষ্পভারে নমিত হয়েছে, ভ্রমরের গুঞ্জন আর কোকিলের কূজন বুড়ো বুড়ো তপস্বীদের পর্যন্ত উদ্‌ব্যস্ত করে তুলেছে, তখন এক মধুর অপরাহ্ণে সমিতা জমিতা আর তমিতা তিন সখীতে মিলে গোমতী তীরে বায়ু সেবন করতে করতে মনের কথা আলোচনা করছিল। ঠিক সেই সময়ে হাত-তিরিশ পিছনে একটি আম্রকাননের অন্তরালে হারিত জারিত আর লারিত ঘাসের ওপর বসে আড্ডা দিচ্ছিল।'

চিংড়ি বললে—'ঋষিকন্যাদের সাজ কি রকম তা লিখলে না?'

'হচ্ছে, হচ্ছে। সত্যযুগে বস্ত্র বড়ই দুর্মূল্য ছিল। ঋষিকন্যারা একখানি সাদাসিদে খাপী বল্কল পরিধান করতেন, আর একখানি শৌখিন মিহি বল্কল গায়ে তেড়চা ক'রে বাঁধতেন।'

চিংড়ি বললেন—'খুব আর্টিস্টিক সাজ। আচ্ছা মামা, স্টেজে ব্রাউন রঙের জর্জেট প'রলে ঠিক বল্কলের মতন দেখাবে না?'

'নিশ্চয়। তার পর শোন।—ঋষিপত্নীদের সাজও ঐরকম। মাথায় কাপড় টানবার উপায় ছিল না, লজ্জা প্রকাশ করবার দরকার হ'লে কিঞ্চিৎ জিহ্বা প্রদর্শন করতেন। উঁচুদরের মুনিঋষিরা, যাঁরা রাগ-দ্বেষ-শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে উঠতেন, তাঁদের



(৩)

কিছুই দরকার হ'ত না; তবে তাঁরা লোকালয়ে যেতে পারতেন না, কুকুর ঘেউ ঘেউ করত। সাধারণ ঋষিরা বল্কলই ধারণ করতেন, কিন্তু ছেলে-ছোকরাদের ব্যবস্থা ছিল বেল-কাঠের কৌপীন।'

বঙ্কা বললে—'বেল-কাঠের?'

হাঁ। কর্তারা বলতেন—তোদের এখন ব্রহ্মচর্যের সময়, বেশী বিলাসিতা ভাল নয়। তোরা বেদ পড়বি, ধেনু চরাবি, কাঠ কাটবি, বনে-বাদাড়ে ঘুরে হরদম বল্কল ছিঁড়বি। কাঁহাতক যোগাব? তার চেয়ে কাঠের কৌপীন পরিধান কর, তোদের পুত্রপৌত্রাদিক্রমে টিকবে।'

বঙ্কা বললে—'কিন্তু কাছা দেবে কি ক'রে?'

‘কেন দেবে না? তিন নম্বর চিত্র দেখ।’

চিংড়ি বললে—‘ও! রোল-টপ টেবিলের মতন।’

‘ঠিক বুঝেছিস। চিংড়ি, তোর মাথা একদম ক্লিয়ার।’

চিংড়ি বললে—‘কিন্তু মামা, তোমার এ গল্প অভিনয় করা চলবে না।’

বঙ্কা বললে—‘বেল-কাঠের জন্য ভাবছিস? কিছু দরকার নেই, জারুল-কাঠ হ’লেও চলবে, ফুট-লাইটে ঠিক বেল-কাঠ ব’লে মনে হবে।’।

চিংড়ি বললে—‘পড়ে যাও মামা।’

‘জারিত বলছিল—সখা, প্রাণ যে যায়!’

লারিত বললে—তাই তো দেখছি। কি একগুঁয়ে মেয়ে সব! আরে, আমাদের ভালই যদি বাসিস তবে অমন গুলিয়ে ফেললি কেন? কিন্তু একটা কথা না ব’লে থাকতে পারছি না। তমিতার জন্য ম’রে আছি দাদা, কিন্তু জমিতা যে আমাকে চায় তাতে আনন্দও হয়। আহা, যদি দুটিকেই পেতুম।

হারিত ঘাড় নেড়ে বললে—ঠিক, ঠিক! পঞ্চশরের কি বিচিত্র লীলা!

লারিত বললে—আচ্ছা হারিত-দা, ওদের জোর ক’রে ধ’রে নিয়ে গিয়ে রাক্ষস-বিবাহ করলে কেমন হয়?

হারিত বললে—দূর বোকা, আমরা যে ঋষির সন্তান। হয় ব্রাহ্মবিবাহ না হয় গান্ধর্ববিবাহ, এ ছাড়া অন্য বিধি নেই। চল্, আর একবার ওদের বুঝিয়ে দেখি।

ওদিকে নদীর ধারে পায়চারি করতে করতে জমিতা বলছিল—সখী, যৌবন যে যায়!

তমিতা উত্তর দিলে—যায় যাক গে, তা ব’লে তো দ্বিচারিণী হ’তে পারি না। হৃদয় যাকে চায় না তাকে মাল্যদান ক’রব কি করে? কিন্তু লারিত বেচারার জন্য সত্যি আমার দুঃখ হয়, কেনই বা আমাকে চায় সে!

জমিতা বললে—অতই যদি দরদ তবে গলায় মালা দিলেই পারিস। আমারও এক জ্বালা হয়েছে—কেনই বা মরতে সেদিন বেনারসী বল্কলটা পরেছিলুম, জারিত বেচারার তো দেখে আশ মেটে না। কিন্তু লারিত-দার কোনও পছন্দ নেই, কেমন যেন একরকম।

তমিতা বললে—আহা চটো কেন জমিতা-দি, লারিতকে তো আর কেড়ে নিচ্ছি না। তাকে আজীবন ভাই বলতে পারি, দাদা বলতে পারি, ঠাকুরপো বলতে পারি, কিন্তু প্রাণনাথ বলতে শুধু হারিত-দা।

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে সমিতা বললে—কিন্তু সে যে আমাকেই চায়। আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেছে।

এমন সময় তিন বন্ধু এসে উপস্থিত। হারিত সম্ভাষণ করলে—কিগো বরবর্ণিনীরা, কি হচ্ছে?

তমিতা একটু জিহ্বাবিলাস ক’রে বললে—এই যে আসুন, নমস্কার।

হারিত বললে—আর কত কাল আমাদের কষ্ট দেবে, দয়া কি হয় না? সমিতে, একবারটি হাঁ বল।

জারিত জড়িত স্বরে বললে—জমিতে, সাড়া দাও।

লারিত হাঁকলে—তমিতে, আমি যে তোমার তরে ম’রে আছি প্রিয়ে।

তমিতা স’রে গিয়ে বললে—ও হারিত-দা, দেখ না কি বলছে!

হারিত বললে—অন্যায় কিছু বলে নি। তুমি লারিতকে ধন্য কর, জমিতা জারিতকে করুক আর সমিতা আমাকে।

সমিতা বললে—সে হ'তেই পারে না। আমরা হৃদয় বিলি ক'রে ফেলেছি, তার আর নড়চড় নেই।

হারিত বললে—একটা রফা করা যায় না? ভগবান কন্দর্পকে না-হয় মধ্যস্থ মানা যাক্।

জমিতা আর তমিতা প্রথমটা এ প্রস্তাবে রাজী হ'ল না। কিন্তু সমিতা তাদের বুঝিয়ে দিলে—দেখাই যাক না কন্দর্প কি করেন, আমরা তো নিজেদের মত বদলাচ্ছি না।

কন্দর্প নিকটেই ছিলেন, পাঁচ মিনিট আবাহন করতেই দেখা দিলেন। সব শুনে বললেন—দেখ, এ বিসংবাদ তোমরা নিজেরাই মিটিয়ে ফেল। আমার কী বা ক্ষমতা, শুধু প্রজাপতির আদেশে পঞ্চবাণ মোচন করি। তার আঘাত যদি তোমাদের পছন্দসই না হয় তো আমি নাচার।

লারিত বললে—আপনি প্রেমচক্রে একটা উলটো পাক লাগিয়ে দিন না!

হারিত বললে—দূর গর্দভ, তাতে শুধু উলটো বিপত্তি হবে, প্রেমচক্র দক্ষিণাবর্তে না ঘুরে বামাবর্তে ঘুরবে, আমি চাইব তমিতাকে, তমিতা চাইবে লারিতকে—এই রকম বিপরীত অবস্থা দাঁড়াবে, তাতে কোন পক্ষের মনস্কামনা পূর্ণ হবে না।

সমিতা কন্দর্পকে বললে—আপনি অতি বেয়াড়া লোক, ছটি নিরীহ তরুণ-তরুণীকে খামকা চরকি ঘোরাচ্ছেন। কি সুখ পাচ্ছেন এতে?

জমিতা ঘাড় বেঁকিয়ে বললে—আমরা অভিশাপ দেব কিন্তু, তখন মজা টের পাবেন।

তমিতা কিল তুলে বললেন—লাগাও না দু-চার ঘা লারিত-দা।

বেগতিক দেখে কন্দর্প চট ক'রে স'রে পড়লেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে, হারিত বললে,—আজ আমরা বিদায় নি, রাত্রে আবার বৃহদারণ্যক আগাগোড়া মুখস্থ করতে হবে। কাল বিকেলে এসে ফের আমাদের আবেদন জানাব।

ঋষিকুমারেরা চলে গেলে সমিতা অনেকক্ষণ ভেবে বললে—দেখ, কন্দর্প বেঁচে থাকতে এই প্রেমচক্রের ঘুরপাক থামবে না। চল, আমরা মহাদেবকে গিয়ে ধরি, তিনি আর একবার মদনভস্ম করুন।

জমিতা খুব হিসেবী। বললে—উঁহু। পঞ্চশরের ভস্ম যদি ভুবন-মাঝে ছড়িয়ে পড়ে তবেই চিত্তির, যেখানে সেখানে ব্যাঙের ছাতার মতন প্রেম গজিয়ে উঠবে। একেবারে সাবাড় না করলে নিস্তার নেই!

তমিতার উপস্থিত বুদ্ধি সব চেয়ে বেশী। সে বললে—ভগবান রাহুকে ধর, তিনি কপ্ করে গিলে ফেলুন।

সমিতা আর জমিতা লাফিয়ে উঠে বললে—সেই খাসা হবে। চল এক্ষুনি রাহুর কাছে যাই।'

বঙ্কা বললে—'ছাই গল্প হচ্ছে। শাস্ত্রের কথা না-হয় মেনে নিলুম যে রাহু

একটা গ্রহ, আকাশে থাকে। কিন্তু মেয়েরা তার কাছে যাবে কি ক'রে? যত সব গাঁজাখুরি।'

চিংড়ি ধমক দিয়ে বললে—'তুমি থাম ছোড়দা। এটা যে সত্যযুগ সে খেয়াল আছে? প'ড়ে যাও মামা।'

'রাহু তখন আকাশে নিরিবিলিতে বসে পাঁজি দেখছিলেন। মেয়েদের দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—কি চাই? চট্ ক'রে বলে ফেল, আমার সময় বড্ড কম।

সমিতা হাতজোড় করে বললে—প্রভু, আমরা প্রেমে পড়েছি।

রাহু ফিক করে হেসে বললেন—মাইরি? তা আমাকে কেন। আমি শূন্যপথে ধাই, চাঁদ-সুয্যি খাই, প্রেমের আমি কিবা জানি। দেখছ তো, আমার শুধুই মুণ্ডু, তাতে প্রেম হয় না। প্রেম চাও তো ইন্দ্রাদি দেবতার কাছে যাও, তাঁদের ওই ব্যবসা।

সমিতা নিবেদন করলে—প্রভু, আপনাকে হৃদয় দেব এমন ভাগ্য আমরা করি নি। আমরা মানুষকেই ভালবেসেছি, কিন্তু কন্দর্প সমস্তই ওলটপালট করে দিচ্ছেন। তিনি ধ্বংস না হ'লে আমাদের স্বস্তি নেই। আপনি কৃপা করে তাঁকে গ্রাস করুন।

রাহু মাথা নেড়ে বললেন—সইবে না, সইবে না। চাঁদ পর্যন্ত আমার হজম হয় না, গিলতে না গিলতে বেরিয়ে যায়। কন্দর্প খেলে পেট ফাঁপবে।

তমিতা বললে—পেট তো আপনার দেখছি না।

রাহু ধমকে বললেন—হাঁ, তুই সব জানিস। আধ্যাত্মিক্ উদর শুনেছিস? আমার তাই।



(৪)

জমিতা বললে—প্রভু, তবে আমাদের তিনটিকে ভক্ষণ করুন, বেঁচে আর সুখ নেই।

রাহু একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে বললেন—হজমের কি আর শক্তি আছে রে।

শুধু লঘুপথ্য খেয়ে বেঁচে আছি, হ'ল একটু চাঁদের কুচি, হ'ল বা গরম গরম এক কামড় সুয্যি। আচ্ছা, কাছে আয়, দেখি একটু তোদের গাল চেটে।

তমিতা বল্লে—কি যে বলেন!

তবে এলি কি করতে? যা এখন পালা, আমার খাবার লগ্ন হ'ল।

রাহু তাঁর লকলকে গোঁপ দিয়ে খপ্ করে পূর্ণচন্দ্র ধরলেন, তার পর তাতে একটু মাখন মাখিয়ে কামড় দিলেন। চার নম্বর চিত্র দেখ। মেয়েরা সে করুণ দৃশ্য সইতে পারলে না, ছুটে পালাল।

মহামুনি ঔড়ব হচ্ছেন নৈমিষারণ্যের বড় আশ্রমের কুলপতি। তাঁর দশ হাজার শিষ্য, বিশ হাজার ধেনু। যজ্ঞশালায় রোজ আড়াই-শ মণ নীবার ধানের চাল রান্না হয়, আর তিন-শ ঝুড়ি উড়ুম্বরের তরকারি। ঔড়ব অত্যন্ত রাশভারী ঋষি। আশ্রমবাসীরা তাঁর ভয়ে তটস্থ।

সকালবেলা হারিত জারিত আর লারিত বেদাধ্যয়ন করতে এসেছে। ঔড়ব জলদগম্ভীর স্বরে ডাকলেন—হারিত!

আজ্ঞে।

এসব কি শুনছি? তোমরা নাকি আশ্রমকন্যাদের পিছু পিছু ঘুরে বেড়াও? জান, এটা হচ্ছে তপোবন, ইয়ারকির জায়গা নয়? এখন তোমাদের ব্রহ্মচর্যের সময়, সে খেয়াল আছে?

সত্যযুগে মিথ্যে কথা লোকে বড় একটা কইত না। হারিত হাতজোড় ক'রে স্বীকার করলে—প্রভু, আমরা অপরাধ করেছি।

তবে প্রায়শ্চিত্ত কর। তিনজনে গোমুখী তীর্থে চলে যাও, নিরন্তর গোসেবা, সদ্যোজাত গোময় আহার, কবোষ্ণ গোমূত্র পান, এই ব্যবস্থা। তাতে চিত্তশুদ্ধি পিত্তশুদ্ধি পাপমোচন একযোগে হবে। একটি বৎসর নৈমিষারণ্যের ত্রিসীমানায় এসো না।

হারিত জারিত আর লারিত গুরুদেবের চরণবন্দনা ক'রে বিষণ্ণ মনে বিদায় হ'ল।

একদিন প্রাতঃকালে কন্দর্প হিমালয়ের পাদদেশে কিন্নরমিথুন শিকার করতে গেছেন। ইতস্তত বিচরণ করতে করতে হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল একটা মস্ত উই-ঢিবি উঁচু হয়ে রয়েছে, তার উপর পোকা বিজবিজ করছে। কেমন সন্দেহ হ'ল। গোটা দুই বাণের খোঁচা দিতেই পনর ইঞ্চি উই-মাটির স্তর খ'সে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে মানুষের ক্ষীণ কণ্ঠরব শোনা গেল—অহো, কুসুমশর কি দুঃসহ!

কন্দর্প বললেন—ভুন্ডিল মুনির গলা শুনছি না?

বল্মীকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে ভুন্ডিল বললেন—আমার তপস্যা ভঙ্গ করলে কেন হে? ভস্ম ক'রে ফেলব।

কন্দর্প বললেন—আরে দাঁড়াও ঠাকুর, এখন গোসা রাখ। বেজায় কাহিল হয়ে গেছ যে! নাও, এই দিব্য মকরন্দটুকু খেয়ে ফেল। গায়ে বল পাচ্ছ? বেশ বেশ, আর একটু খাও! তার পর, কিসের জন্য তপস্যা হচ্ছিল?

ভুশণ্ডিল উত্তর দিলেন—তপস্যা আবার কিসের জন্য করে? মোক্ষলাভের জন্য।

মোক্ষ এখন থাকুক। দিব্যকান্তি চাও? তপ্তকাঞ্চনবর্ণ চাও? রমণীর মন হরণ করতে চাও?

ভুশণ্ডিল একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বললেন—কিন্তু তপস্যার কি হবে?

তপস্যা এখন থাক না। দিন-কতক ছুটি নাও, ফুর্তি কর।

ভুশণ্ডিল ভেবে দেখলেন, এরকম তো অনেক মহামুনিই ক'রে থাকেন, পরাশর বিশ্বামিত্র ব্যাসদেব। তাতে আর দোষ কি। বললেন—আচ্ছা, রাজী আছি, কিন্তু এক বৎসরের বেশী নয়।

কন্দর্প বললেন—মোটে? বেশ তাই হবে। আমি বর দিচ্ছি, ভুবনমোহন রূপ ধারণ কর। বৎসরান্তে আবার স্বমূর্তি ফিরে পাবে, তখন যত খুশি তপস্যা ক'রো, কেউ বাধা দেবে না।

ভুশণ্ডিলের আপাদমস্তকে একটা তারুণ্যের প্লাবন ব'য়ে গেল। কাঁচা-পাকা জটাজুট উড়ে গিয়ে মাথায় ভ্রমরবিনিন্দিত কৃষ্ণ কেশ ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া গজিয়ে উঠল। একটা অদৃশ্য ক্ষুর চরুর্ ক'রে মুখমণ্ডল নির্লোম করে দিলে, রইল শুধু দু-পাশে দুটি কচি কচি জুলপি। ছাতাপড়া নড়া দাঁত খটাখট উপড়ে গিয়ে দু-পাটি দন্তরুচিকৌমুদী ফুটে উঠল। কটিতটে শুভ্র পট্টবাস জড়িয়ে গেল, কাঁধে চড়ল আপীত উত্তরীয়, গলায় মল্লিকার মালা, হাতে মোহন মুরলী, সর্বাঙ্গে দিব্যকান্তির পলেস্তারা। ভুশণ্ডিল একটি লম্ফ দিয়ে হুংকার ছেড়ে বললেন—ভো বিশ্বচরাচর শুন্বন্তু, আমি আছি, তোমরাও আছ, এইবার দেখে নেব।

কন্দর্প বললেন—অতি পাকা কথা। আচ্ছা, এইবার ওই সুদূর নৈমিষারণ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর।

ভুশণ্ডিল তাই করলেন। আহ্লাদে আটখানা হয়ে বললেন—আহা, কি দেখলুম!

কি দেখলে?

তিনটি পরমাসুন্দরী তরুণী গোমতীসলিলে স্নান করছে।

প্রাণে পুলক জাগছে?

জাগছে।

হিয়ায় হিল্লোল উঠছে?

উঠছে।

চিত্ত চুলবুল করছে?

করছে।'

চিংড়ি বললে—'মামা, এইখানটা ভারী গ্র্যাণ্ড লিখেছ কিন্তু।'

'হু' হু', এখনই হয়েছে কি। পরে দেখবি আরও মধুর, আরও মর্মস্পর্শী। তার পর শোন।—

কন্দর্প বললেন—ভুশণ্ডিল।

আজ্ঞে।

কোনটিকে পছন্দ হয়।

ঠিক করতে পারছি না যে।

আচ্ছা, ওই যেটি তন্বী, দীর্ঘকায়, পদ্মকোরকবর্ণা, রাজহংসীর মতন যার গলা?

অতি সুন্দর।

আর যেটি সুমধ্যমা, চম্পকগৌরী, মদমুকুলিতাক্ষী, দোহারা গড়ন, টুকটুকে ঠোঁট?

চমৎকার।

আর ওই বেঁটেটি—শ্যামাঙ্গী, চঞ্চলা, চকিতমৃগনয়না, বেশ মোটা-সোটা, টেবো টেবো গাল?

ওটিও খাসা।

ব'লে ফেল কোন্‌টিকে চাও।

আজ্ঞে তিনটিকেই।

কন্দর্প ভুণ্ডিলের পিঠ চাপড়ে বললেন—সাধু ভুণ্ডিল—সাধু। তবে আর দেরি ক'রো না, সোজা নৈমিষারণ্যে চ'লে যাও, গোমতীর তীরে বসে তোমার ওই বাঁশিটি বাজাও গে।

সমিতা জমিতা আর তমিতা বিকেলবেলা গোমতীর ধারে ব'সে নৈমিষারণ্যের বিখ্যাত চিঁড়েভাজা খাচ্ছে। হঠাৎ একটা করুণ বেসুরো বাঁশির আওয়াজ কানে এল। সমিতা এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতে পেল একটি লোক কশ্যপ-ঘাটে ব'সে তাদের দিকে চেয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে।

সমিতা বললে—কে ওই তরুণ? আগে তো দেখি নি কখনও।

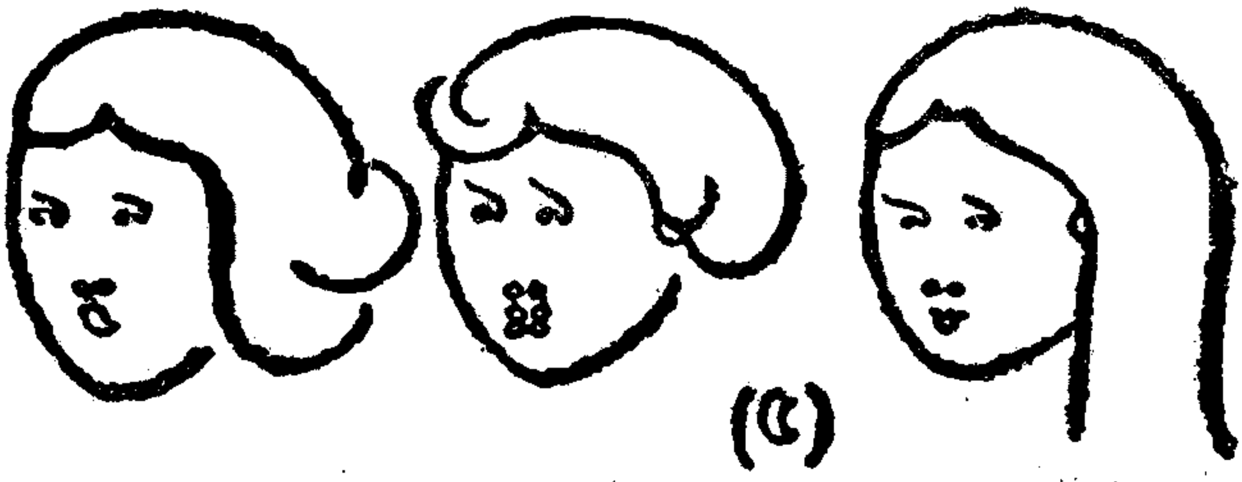
জমিতা বললে—কেন বাঁশি বাজাচ্ছে কে জানে। কেমন যেন উদাস সুর।

তমিতা বললে—সুন্দর চেহারাটি কিন্তু।

সমিতা বললে—তোর হারিত-দার চেয়েও সুন্দর?

তমিতা ভ্রূভঙ্গী করে বললে—কি যে বলিস! হারিত-দা জারিত-দা লারিত-দার চাইতে বুঝি কারও সুন্দর হ'তে নেই!

মেয়েরা অন্যমনস্ক হয়ে আড়চোখে দেখতে লাগল।—আচ্ছা চিংড়ি, আড়চোখে চাওয়া কি রকম করে আঁকতে হয় জানিস?'



(৫)

চিংড়ি বললে—'খুব সোজা। একটা আণ্ডার মতন আঁক। মাথায় ইচ্ছেমত চুল বসাও। কপালে নিরেনব্বই লেখ, তার নীচে একটা কাত-করা বিসর্গ, তার নীচে একটা পাঁচ। যদি দাঁত দেখাতে চাও তবে চুয়াল্লিশ বসাও। আর যদি মোনা-লিসার ধরনের নিগূঢ় হাসি ফোটাতে চাও তবে আট লেখ।'

'বাঃ ঠিক হয়েছে। পাঁচ নম্বর চিত্র দেখ। তার পর শোন্।—

একটি বৎসর দেখতে দেখতে কেটে গেল। হারিত জারিত আর লারিত প্রায়শ্চিত্ত শেষ করে তীব্র আশা আর দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে নৈমিষারণ্যে ফিরে এল। মেয়েদের সংবাদ কি? তারা কি এখনও নিজেদের গোঁ বজায় রেখেছে? এই বৎসরব্যাপী বিচ্ছেদের ফলে তারা কি প্রেমের সোজা পথটি খুঁজে পায় নি, মনে একটুও প্রতিদানস্পৃহা জাগে নি? হবেও বা।

কিন্তু খবর যা শুনলে তা মর্মান্তিক। সমিতা জমিতা তমিতা তিনজনেই ভুশুণ্ডিলকে মাল্যদান করেছে। হা রে কন্দর্প, এই কি তোর মনে ছিল-? প্রেম-চক্রে বৃথাই এতদিন ঘুরপাক খাওয়ালি? হায় হায়, কেন তারা মেয়েদের মতেই সায় দেয়নি, সে তো মন্দের ভাল ছিল। আর মেয়ে তিনটেরও ধন্য রুচি, শেষে কিনা ভুশুণ্ডিল!

হারিত মাথা চাপড়ে বললে—ওঃ, স্ত্রীচরিত্র কি কুটিল! ওদের কিসসু বিশ্বাস নেই।

জারিত হাত নেড়ে বললে—একেবারে যাস্‌সেতাই।

লারিত দাড়ি ছিঁড়ে বললে—তিনটি বস্‌সর নাহক ভুগিয়েছে মশাই।

তিন উন্দাম প্রেমিক ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল ভুশুণ্ডিলের বাড়ি। ব্যাটাকে ঠেঙিয়ে মনের জ্বালা দূর ক'রতে হবে, তাতে মহামুনি ঔড়ব ভস্মই করুন আর তির্যগ্‌-যোনিতেই পাঠান।

ভুশুণ্ডিলের কুটীরে কেউ নেই, শুধু প্রাঙ্গণে একটি আশ্রম-ব্যাঘ্রী তৃণভোজন করছে আর তিনটি হরিণশিশু তার স্তন্য পান করছে। এই স্নিগ্ধ শান্ত আশ্রম-সুলভ দৃশ্য দেখে ঋষিকুমারদের হুঁশ হল, অহিংসার কাছে কিছু নেই। হারিত ব্যাঘ্রী-টিকে একটু আদর ক'রে সঙ্গীদের বললে—যা হবার তা তো হয়ে গেছে, দৈবই সর্বত্র বলবান্‌। কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ। মিথ্যা ঋষিহত্যা ক'রে কি হবে, চল আমরা গোমুখী তীর্থে ফিরে গিয়ে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি।

সংসারে বীতরাগ হয়ে তারা আবার উত্তর মুখে চলল। কিন্তু দৈবের মতলব অন্য রকম। একটু যেতে না যেতে তারা দেখতে পেলে বটগাছের তলায় একটি বল্মীকস্তূপ, সমিতা জমিতা আর তমিতা তার উপরে ঝাঁটা চালাচ্ছে।

একটি সলজ্জ ম্লান হাসি হেসে তমিতা বললে—এই যে, আসুন নমস্কার। ভাল আছেন তো? কবে এলেন?

হারিত বললে—ভদ্রে, এ কি?

অবনতমস্তকে সমিতা উত্তর দিলে—এই উই-ঢিপির মধ্যে আছেন। কাল বিকেল পর্যন্ত বেশ স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলেন, কত গল্প কত হাসি কত গান। যেমন সূর্যাস্ত হ'ল, অমনি হঠাৎ কেমন একটা কাঁপুনি ধরল, আর চেহারাটাও এক মুহূর্তে বিকট কাল মোটা হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় এক রাশ জটা আর মুখভরা বিশ্রী দাড়ি-গোঁপ। আমরা তো ভয়ে পালিয়ে গেলুম। তার পর খুঁজে খুঁজে পেলুম এই বটতলায় বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে তপস্যা করছেন। অনেক ডাকাডাকি করতে একবার চোখ মেলে চাইলেন, ধমকে বললেন—খবরদার, ভস্ম ক'রে ফেলব। দেখতে দেখতে সর্বাঙ্গে উই লেগে মাটির প্রলেপ জমে গেল, দেখুন না, একদিনেই আগা-পাস্তলা চাপা পড়ে গেছে। আমরা কি আর করি, তিন জনে ঝাঁটা বুলিয়ে উই তাড়াচ্ছি।

হারিত বললে—না না না, অমন কাজও ক'রো না, তাতে ওঁর তপস্যার হানি

হবে। উই অত্যন্ত উপকারী প্রাণী, তপশ্চর্যার একটি প্রধান অঙ্গ, বাহ্য বিষয় রোধ ক'রে মনকে অন্তর্মুখ করতে অমন আর দুটি নেই।

জারিত বললে—তা ছাড়া, উই-মাটি ভেঙে গিয়ে যদি ভিতরে হাওয়া ঢোকে, তবে চ'টে গিয়ে বিলকুল ভস্ম ক'রে ফেলবেন।

লারিত বললে—ওঃ, কি জোচ্চোর হৃদয়হীন তপস্বী, তিন-তিন তরুণীকে ভাসিয়ে দিলে!

তমিতা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললে—ওগো সেই বাঁশিতেই সর্বনাশ করেছে।

জমিতা গদ্‌গদ্‌ কণ্ঠে ডাকলে—ও হারিন্দা জারিন্দা লারিন্দা!

হারিত বললে—ভয় কি, আমরা তিন জনেই আছি। ওঁকে আর ঘাঁটিয়ে কাজ নেই, কল্পান্ত পর্যন্ত সমাধিস্থ হয়েই থাকুন। তোমরা আমাদের সঙ্গে হিমালয়ে চল, সেইখানেই আশ্রম নির্মাণ করা যাবে।

কিন্তু আমরা যে সতী, হারিত দা।

আমরাই কোন্‌ অসৎ। চল চল, বেলা ব'য়ে যায়।'

বঙ্কা বললে—'থামলে কেন মামা, তার পর?'

'তার পর আর নেই: তোর মামী আর লিখতে দেয় নি।'

'আঃ, মামীর যদি কিছু আক্কেল থাকে!'

চিংড়ি বললে—'এ মামীর ভারী অন্যায় কিন্তু। সত্যযুগে কী না হ'তে পারে। আচ্ছা, তোমার তো মনে আছে, শেষটা মুখে মুখেই বল না, আমি লিখে নিচ্ছি।'

'উঁহু, একদম গুলিয়ে গেছে, যে তোর মামীর ধমক।'

বঙ্কা বললে—'তোমার মরাল কারেজ কিছু নেই! দাও আমাকে, আমিই শেষ ক'রব।'

১৩৩৯ (১৯৩২)

দশকরণের বাণপ্রস্থ

দর্ভাবতীর রাজা দশকরণ একদিন রাজসভায় পদার্পণ ক'রেই বললেন, 'আমার পঞ্চাশ বৎসর বয়স পূর্ণ হয়েছে, কালই আমি বানপ্রস্থে যাব।'

বৃদ্ধমন্ত্রী আকাশ থেকে পড়ে বললেন, 'সে কি মহারাজ, আপনি এখনও যুবা, চুল পাকে নি, দাঁত পড়ে নি, শরীর অজর, বাহু সবল, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, কি দুঃখে কালই বনে যাবেন? এখন বিশ বৎসর ওকথা তুলবেন না।'

রাজা ঘাড় নেড়ে বললেন, 'না, আমার যাওয়াই স্থির। কুমারের অভিষেক আজই হ'য়ে যাক। উৎসবটা পরে করলেই চলবে।'

মন্ত্রী বললেন, 'হা, কি দুর্দৈব! মহারাজ, হঠাৎ এমন মত কেন আপনার হ'ল? দর্ভাবতী রাজ্যের অবস্থাটা ভেবে দেখুন। রাজপুত্র এখনও বালক, সবে বাইশ বৎসরে পড়েছেন, আমিও জরাগ্রস্ত। রাজ্য চালনা কি আমাদের কাজ? কুমার, তুমি মহারাজকে বুঝিয়ে বল না।'

কুমার নতমস্তকে উত্তর দিলেন, 'আমি আর কি বলব। পিতা যদি ধর্মার্থে তৃতীয় আশ্রম গ্রহণ করেন তবে আমি তাতে বাধা দিয়ে পাপের ভাগী কেন হব। তাঁর পদানুসরণ করে অগত্যা আমিই রাজ্য চালাব।'

যুবমন্ত্রী বললেন, 'আর আমরাও তো আছি, ভয় কি।'

বৃদ্ধমন্ত্রী তখন হতাশ হয়ে স্থবির রাজপুরোহিতকে বললেন, 'ধর্মজ্ঞ মাণ্ডুক, এই সংকটে একমাত্র আপনিই মহারাজ দশকরণকে সদ্‌বুদ্ধি দিতে পারেন।'

মাণ্ডুক বললেন, 'মহারাজ, পঞ্চাশোর্ধ্বে বনপ্রস্থান নৃপতির পক্ষে অবশ্যকৃত্য নয়। দশরথ অতি বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত রাজ্য শাসন করেছিলেন। দু বার জরাগ্রস্ত হয়েও সিংহাসন ছাড়েন নি। যদি পরমার্থই আপনার অভিপ্রেত হয়, তবে রাজর্ষি জনকের তুল্য নির্লিপ্তচিত্তে প্রজাপালনে নিযুক্ত থেকে মোক্ষানুসন্ধান করুন।'

দশকরণ কিছুতেই সম্মত হলেন না। এদিকে তাঁর বনগমনের সংবাদ কিঞ্চিৎ রঞ্জিত হয়ে অন্তঃপুরে পেঁছে গেছে। ছোটরানী মহা উৎসাহে সভায় এসে বললেন, 'আর্যপুত্র, আমি প্রস্তুত, দ্বিপ্রহরের মধ্যেই সমস্ত গুছিয়ে ফেলব। সঙ্গে বেশী কিছু নেব না, শুধু আমার অলংকার তিন মঞ্জুষা, বসন দশ পেটিকা, এটা-সেটা বিশ পেটিকা। আর তিনজন সখী, আর দশজন দাসী, আর শুকসারী, আর আমার প্রিয় মার্জারী দধিমুখী। আপনি গোটাদশেক বড় বড় স্কন্ধাবার পাঠাবার ব্যবস্থা করুন, তাতেই আমাদের কুলিয়ে যাবে। উঃ ভারী মজা হবে, দিনকতক ঝামেলা থেকে বাঁচা যাবে। সঙ্গে আবার ভেজাল জোটাবেন না যেন।'

রাজা বললেন, 'ওসব কিছুই যাবে না। যুবরাজ কাল তোমাকে পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দেবেন।'

ছোটরানী রাগে দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলেন। বড়রানী দেবপূজায় ব্যস্ত

ছিলেন, এখন সংবাদ পেয়ে এসে বললেন, 'মহারাজ, একি শুনছি! আমি সহধর্মিণী পট্টমহিষী, আমাকে ফেলে যাবেন না তো?'

রাজা উত্তর দিলেন, 'তুমি এখানেই তোমার পুত্রের কাছে থাকবে। আর ইচ্ছা হয় তো বারাণসীতে বাস করতে পার।'

যুক্তি, ধর্মোপদেশ, অনুনয়, ক্রন্দন কিছুতেই কিছু হ'ল না। রাজা দশকরণ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। সভা ভঙ্গ হ'ল।

দ্বিপ্রহরে দশকরণের নিভৃত কক্ষে গিয়ে রাজবয়স্য প্রগল্‌ভক বললেন, 'মহারাজ, এতকাল আমার কাছে কিছুই গোপন করেন নি। আজ একবার মনের কথাটি খুলে বলতে আজ্ঞা হ'ক। ধর্মে আপনার বেশী মতি আছে তা তো বোধ হয় না, পরকালের চিন্তাও করতে দেখি নি। পুত্রকলত্রের উপদ্রব সইতে না পেরে বনে পালাচ্ছেন না তো?'

রাজা বললেন, 'খেপেছ, তাহলে পুত্রকলত্রকেই বনে পাঠাতাম।'

'তবে কি জন্য যাচ্ছেন?'

দশকরণ একটু হেসে বললেন, 'ফূর্তি করবার জন্য।'

'অবাক করলেন মহারাজ। রাজপদে থেকে ফূর্তি হবে না আর বনে গিয়ে হবে! ফূর্তি চান তো এখানেই তার বাধা কি? আরও গুটিদশেক মহিষী গৃহে আনুন, নৃত্যগীতনিপুণা ভাল ভাল বারাঙ্গনা বাহাল করুন, কাকাঙ্কীনদীতটে সুবিশাল প্রমোদ-কানন রচনা করুন, তাতে মনোরম সৌধ তুলুন। উৎকলিঙ্গ থেকে নিপুণ সুপকার, গান্ধার থেকে পলান্নপাচক, গৌড়ভূমি থেকে লড্ডুকলাবিৎ আনান। আর মলয়াদ্রির গন্ধসম্ভার, সিংহলের রত্নাভরণ, বাহ্লিকজাত বিচিত্র আস্তরণ, যবন-দেশের আসব—'

'থাম থাম, ওসব আমার খুব জানা আছে। শুধু বিলাস সামগ্রীতে কিছু হয় না, ভোগের শক্তি চাই।'

'আপনার শক্তির কমি কি? আর বনে গেলেই কি শক্তি বাড়বে?'

'মূর্খ, তুমি বুঝতে না। যদি আবার কখনও দেখা হয় তখন বুঝিয়ে দেব। যাও এখন বিরক্ত ক'রো না।'

রাজাকে উন্মাদ ভেবে, প্রগল্‌ভক বিষণ্ণ মনে চলে গেলেন।

পরদিন ভোরবেলা, দশকরণ রথারূঢ় হ'য়ে রাজ্য ত্যাগ করলেন। সঙ্গে নিলেন শুধু একটি নাতিবৃহৎ থলি। বহুদূরে এসে রথ আর সারথিকে ফিরিয়ে দিলেন, তার পর থলিটি কাঁধে নিয়ে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলেন।

দশকরণ একটি গাছের তলায় ব'সে একান্তঃকরণে ব্রহ্মার আরাধনা করতে লাগলেন। তিন দিন তিন রাত অতিক্রান্ত হ'ল, অবশেষে ব্রহ্মা দর্শন দিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি চাও?'

দশকরণ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতান্তে বললেন, 'প্রভু, আমার পিতৃদত্ত নামটি সার্থক করুন।'

'তার মানে?'

'আমার প্রত্যেক ইন্দ্রিয় দশগুণ ক'রে দিন। অর্থাৎ বিংশতি চক্ষু, বিংশতি কর্ণ, দশ নাশা, দশ জিহ্বা, দশগুণ বিস্তৃত ত্বক।'

'আর বাক্‌-পাণি-পাদাদি কর্মেন্দ্রিয়? হৃৎ-ক্লোম-জঠরাদি যন্ত্র?'

'তাও দশ-দশগুণ।'

বিধাতা সবিস্ময়ে বললেন, অর্থাৎ তুমি একাই দশজন হ'তে চাও। তোমার মতলবটা কি?

'প্রভু, তবে খুলে বলি শুনুন! আমার দেহটা তো মোটে সাড়ে তিন হাত বানিয়েছেন, আর ইন্দ্রিয়াদি যা দিয়েছেন তাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। কতই বা দেখব, কতই শুনব, কতই খাব, কতটুকুই বা ভোগ করব? আমি মহালোভী পুরুষ, আমার ইন্দ্রিয় বর্ধন করে ভোগশক্তি দশগুণ বাড়িয়ে দিন।'

'বটে! কিন্তু দশ-দশটা আলাদা দরকার কি, একটা প্রকাণ্ড দেহ যদি দিই, তাতে সব অঙ্গই তো বড় বড় হবে।'

'আজ্ঞে, আমি ভেবে দেখেছি, লাভ হবে না। হাতির দেহ প্রকাণ্ড, তার সুখভোগের মাত্রা তো ইঁদুরের চেয়ে বেশী নয়। সংখ্যা না বাড়লে ভোগ বাড়বে না।'

'তুমি খুব হিসাবী দেখছি। আচ্ছা, মন নামে একটা অন্তরিন্দ্রিয় আছে, তা কটা চাও?'

'সে কথা তো ভাবি নি প্রভু। আচ্ছা মন একটাই থাকুক।'

'উত্তম প্রস্তাব। এরূপ জীবকল্পনা আমার মাথাতেও আসে নি, তোমার উপরই পরীক্ষা হ'ক। কিন্তু সামলাতে পারবে তো? যদি সর্দি হয় তো দশটা নাক হাঁচবে, যদি জ্বর হয় তবে বিশটা পা কামড়াবে। আরও অসুবিধা আছে—লোকে যদি রাক্ষস ভেবে তোমাকে আক্রমণ করে?'

'প্রভু, আপনি সুখ দুঃখ দুই-ই দিয়েছেন, তবু তো লোকে জীবন ধারণ করতে চায়। আমি দশটা জীবন একসঙ্গে ভোগ করতে চাই, দুঃখ যদি বাড়ে সুখও তো বাড়বে। আমার এই বর্তমান দেহ খুব শক্তিমান, আর আপনার প্রদত্ত অঙ্গগুলির জন্য বলবীর্য দশগুণ বাড়বে। তবে যা দেবেন মজবুত দেখেই দেবেন। আমার সঙ্গে প্রচুর ধনরত্নও আছে, সেই অর্থবলে আর বাহুবলে সকলকেই বশে এনে নবরাজ্য স্থাপন করব।'

বিধাতা বললেন, 'তবে তাই হ'ক, তথাস্তু। সার্থকনামা দশকরণ, উঠিষ্ঠ, ঐ ডোবার জলে তোমার নবকলেবরের প্রতিবিম্ব দেখে নাও, তারপর যথেচ্ছা ভোগের আয়োজন কর।'

এক বৎসর হয়ে গেছে। ব্রহ্মা বেদের পুঁথি নিয়ে কুটকুটি করছেন এমন সময় তাঁর চতুর্মুণ্ডের চতুঃশিখা থরথর ক'রে কেঁপে উঠল, যাকে বলে টনক নড়া। ধ্যানস্থ হয়ে বুঝলেন দশকরণ তাঁকে আবার ডাকছেন। অদ্ভুতদেহধারীর পরিণাম জানবার জন্য তাঁর কৌতূহল হ'ল, আহ্বান পাবামাত্র ভূলোকে অবতরণ করলেন।

দশকরণ সেই গাছটির তলায় বিষণ্ণ হয়ে বসে আছেন। বিধাতাকে দেখে ধড়মড়িয়ে উঠে দণ্ডবৎ হলেন—কিছু কষ্টে, কারণ তাঁর নূতন যৌগিক দেহটি লম্বায় না বাড়লেও বেষ্টনে অনেকখানি।

ব্রহ্মা বললেন, 'ভাল তো সব?'

'কিছুই ভাল নয় প্রভু। বর তো দিলেন, কিন্তু সুখ পাচ্ছি না। আগে দুই চোখে একই দৃশ্য দেখতাম, এখন কুড়ি চোখে নানাদিকের দৃশ্য মিশে গিয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে—গাছের উপর জল, জলের মধ্যে উড়ন্ত পাখি। ভেবেছিলাম দশ রসনায় বিভিন্ন রসের আস্বাদ নিয়ে একসঙ্গে বিচিত্র অনুভূতি পাব, এখন দেখছি কটুতিক্ত-

অধরে মিশে গিয়ে এক উৎকট উপলব্ধি হচ্ছে। দশটি উদর বোঝাই ক'রেও তৃপ্তি বাড়ছে না। দশ জোড়া পা থাকলেও দশগুণ পথ চলতে পারি না। সব অঙ্গেরই এক দশা! আচ্ছা, আপনিও তো চতুরানন চতুর্ভুজ, কিরকম বোধ করেন?'

'কিছুই বোধ করি না, ওসব মাথামুণ্ড আমার নিজের নয়। মানুষ সৃষ্টি করবার পর হঠাৎ একদিন দেখি আমার চারটে মাথা চারটে হাত গজিয়েছে। এ হচ্ছে মানুষের কাজ, তারা আমার সৃষ্টির শোধ তুলেছে আমারই স্কন্ধে। তা এখন কি চাও বল।'

'আপনি বলুন কি করলে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।'

'বাপু, পরামর্শ দেওয়া আমার কাজ নয়। আর তোমার উদ্দেশ্য যে কি তারও স্পষ্ট ধারণা তোমার নেই। যা চাও নিজেই স্থির ক'রে বল।'

'আমার একটা মনই গোলযোগের কারণ। এখন কৃপা ক'রে দশটি মন দিন, তাতে প্রত্যক্ষগুলো আর জট পাকাবে না, আলাদা আলাদা মনের খোপে খোপে থাকবে।'

ব্রহ্মা তথাস্তু ব'লে প্রস্থান করলেন।

আর এক বৎসর কেটে গেছে। ব্রহ্মার আবার টনক নড়ল, দশকরণ ডাকছেন। বিরক্ত হ'য়ে বললেন, 'আঃ লোকটা জ্বালিয়ে মারলে। যাই হ'ক, শেষ অবধি দেখতে হবে।'

ব্রহ্মা এসে দশকরণকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিহে, এবার সুবিধে হল?'

দশকরণ কাতর কণ্ঠে বললেন, 'কই আর হ'ল প্রভু, দশটা মনে আরও গোলযোগ বেড়েছে। যতই চেষ্টা করি মনে হয় ভিন্ন ভিন্ন লোক ভোগ করছে। একবার বোধ হয় আমি দেবদত্ত—মিষ্টান্ন খাচ্ছি, আবার ভাবি আমি গঙ্গাদত্ত—সংগীত শুনছি। তখনই আবার দেখি আমি অনঙ্গদত্ত—প্রেমালাপে মগ্ন, পুনশ্চ আমি ত্রিভঙ্গদত্ত—গেঁটেবাতে কাতর। সমস্ত অনুভূতি কেন্দ্রস্থ করতে পারছি না, কেবলই বিক্ষেপ হয়। আমার মনগুলোও দিয়েছেন হরেক রকমের—চালাক, বোকা, শান্ত, সহিষ্ণু, রাগী, উদার, হিংসুটে, নিষ্ঠুর, দয়ালু। এই দেখুন না, আপনার কাছে যে মনের কথা জানাব তাতেও বাধা। প্রত্যেক মন চায়—আমি বলব, আমি বলব। কোনও গতিকে রফা ক'রে একটি মন এখন মুখপাত্র হয়েছে!'

'হুঁ, এ রকম যে হবে তা আগেই অনুমান করেছিলাম। এখন কি চাও?'

'প্রভু, কিছুই বুঝতে পারছি না, আপনিও তো উপায় বলবেন না। এখন বরং পূর্বদেহ পূর্বমন ফিরে দিন, দিনকতক প্রকৃতিস্থ হ'য়ে ভেবে চিন্তে দেখি, তারপর আবার আপনার শরণাপন্ন হব।'

ব্রহ্মা বললেন, 'তথাস্তু।'

তার পর আরও পাঁচ বৎসর কেটে গেছে। ব্রহ্মা দশকরণের কথা ভুলে গেছেন, তাঁর কাছে কোন ডাকও আর আসেনি। একদিন তিনি সৃষ্টি চিন্তা করছেন, ভাবছেন—বেঁটে শরীরের সঙ্গে পীতচর্ম আর খাঁদা নাক দিলে কেমন হয়, এমন সময় তাঁর তৃতীয় মুণ্ডের দ্বিতীয় কর্ণ সুড়সুড় করে উঠল। হাত দিয়ে পেলেন—একটি ষট্‌পদ সহস্রাক্ষ বিচিত্রপক্ষ পতঙ্গ, যার নাম প্রজাপতি। দেখেই দশকরণকে মনে পড়ে গেল।

লোকটার হ'ল কি, আর তো সাড়াশব্দ নেই, মারা গেল নাকি? বোধ হয় হতাশ হ'য়ে নিজের রাজ্যে ফিরে গেছে। কিন্তু গিয়েই বা কি করবে, এই সাত বৎসর

পরে তার ছেলে তো আর দখল দেবে না। ধ্যানস্থ হ'য়ে দেখলেন, দশকরণ বেঁচে আছেন, দর্ভাবতীর নিকটেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বিধাতা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মূর্তিতে তখনই সেখানে নেমে এলেন।

গোপপল্লী। একটা মেটে ঘরের মটকায় চ'ড়ে দশকরণ খড় দিয়ে চাল ছাইছেন, ঘরের সামনে একটি গোপনারী শিশুকে খাওয়াচ্ছে আর হাত নেড়ে দশকরণকে কাজ বাতলাচ্ছে।

ব্রহ্মা ডাকলেন, 'ওহে দশকরণ, হচ্ছে কি?'

দশকরণ নেমে এসে অপরিচিত ব্রাহ্মণকে প্রণাম ক'রে বললেন, 'কে আপনি দ্বিজবর?'

'আরে আমি ব্রহ্মা, তোমার খোঁজ নিতে এসেছি। তারপর তোমার গবেষণা কতদূর এগল? চেহারাটা চাষাড়ে হয়ে গেছে দেখছি। এখন করা হয় কি, আছ কেমন?'

'খুব ভাল আছি প্রভু। এই গৃহের স্বামী অসুস্থ, অন্য পুরুষ নেই, বর্ষাও আসন্ন, তাই আমিই ঘরের চালটা মেরামত করে দিচ্ছি।'

'সুখ হচ্ছে?'

'পরিশ্রম হচ্ছে, অভ্যাস নেই কিনা! সুখী হবে এই গোপ-দম্পতি।'

'এখানেই থাকা হয় বুঝি?'

'না, গ্রামের প্রান্তে থাকি, তবে কাজের জন্য নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতে হয়।'

'দর্ভাবতী রাজ্যের সংবাদ কি, তোমার সেই ধনরত্নের থলিটার কি হ'ল?'

'রাজ্য পুত্রের হাতে, আর ধন যা এনেছিলাম তার কিছু খরচ হয়ে গেছে, অবশিষ্ট রাজকোষে ফেরত দিয়েছি। রাজ্যের লোক এখন আমাকে চিনতে পারে না, আর দুরভিসন্ধি নেই জেনে কেউ অনিষ্টও করে না।'

'রাজমহিষীরা কোথায়?'

'জ্যেষ্ঠা পত্নী আমার কাছেই আছেন। কনিষ্ঠা আসতে চান না।'

'তা হ'লে আবার সংসারধর্ম করছ। আমি ভেবেছিলাম বুঝি বানপ্রস্থের অন্তে সন্ন্যাস নিয়েছ। তোমার সেই উৎকট খেয়ালের কি হল—সেই মহাভোগায়তন দশ-দেহসংঘাত?'

দশকরণ সহাস্যে বললেন, 'সে সমস্যার সমাধান হ'য়ে গেছে প্রভু। এখন আমি দশকরণ নই, কোটিকরণ; তারও একীকরণ হয়ে গেছে। গোছাবাঁধা দশটা দেহমনের দরকার কি, দেখছি যত জীব আছে সব মিলে আমি, এখন ভোগের ইয়ত্তা নেই। ভারী সুবিধা হয়েছে, সকলের সুখদুঃখ পৃথক ক'রেও বুঝতে পারি, একত্রও বুঝতে পারি।'

'কি রকম?'

'সেদিন বাঘে একটা গরু মারলে। অবলা গরুর মৃত্যুযন্ত্রণা আর ক্ষুধার্ত বাঘের ভোজনসুখ দুই-ই বুঝলাম। গ্রামের লোকে মিলে কুঠারাঘাতে বাঘটা মারলে। অসহায় বাঘের আর্তনাদ আর দলবদ্ধ গ্রামবাসীর উল্লাস তাও বুঝলাম।'

'ভাল মন্দ সবই নির্বিকার সাক্ষী হয়ে দেখ?'

'তা কেন দেখব। বাঘটাকে প্রথম মার আমিই দিয়েছিলুম, মৃগয়া অভ্যাস ছিল কিনা। আপনি অপক্ষপাতে ভাল মন্দ মিশিয়ে জগৎ সৃষ্টি করেছেন, আবার প্রবল স্বার্থবোধও দিয়েছেন। তাই বাঘে গরু মানুষ মারে, মানুষে বাঘ মারে, মানুষকেও মারে। যখন রাজা ছিলাম, তখন নিজের সুখটাই অগ্রগণ্য ছিল। তার পর সুখবৃদ্ধির

নূতন উপায় মাথায় এল, আপনার বরে দশমনা হলাম। নিজের দশটা অংশের স্বার্থ-সিদ্ধি তো সব সময় করা যায় না, তাই রফা করতে হল। যথাসম্ভব সবকটাকে সুখে রাখবার চেষ্টা করতাম, না পারলে গোটাকতককে নিগৃহীত করতাম। তার পর স্বার্থ-বুদ্ধি আরও ব্যাপক হ'ল, বুঝলাম দশটা দেহমন যথেষ্ট নয়, একসঙ্গে জড়িয়ে থাকাও অনর্থকর, পৃথক্ থেকেও একত্ব-বোধ হয়। এখন কোটিকরণ হয়েছি, বিস্তর ইন্দ্রিয়, বিস্তর দেহমন। তাই মধ্যম পন্থা আরও বেশী শিখেছি। সর্ব অবয়বের লাভালাভ বুঝে চলতে হয় প্রভু, আপনার মতন নির্মম সাক্ষী হয়ে থাকতে পারি না।'

'লাভালাভ বিচারে ভুল কর না?'

'করি বই কি। সেটা আপনার দোষ—যেমন বুদ্ধি দিয়েছেন তেমনই তো হবে, ঘ'ষে মেজে ঠেকে শিখে আর কতই বাড়বে।'

'আচ্ছা দশকরণ, বুঝলাম তোমার অনেক দেহ, অনেক মন। কিন্তু তোমার আত্মা কটা?'

'সমস্যায় ফেললেন প্রভু। বৃদ্ধ মাণ্ডুক বলতেন বটে—জীবাত্মা, পরমাত্মা, প্রত্যাগাত্মা, সর্বভূতান্তরাত্মা—এইসব কটমটে কথা। আমার কটা আছে তা তো জানি না।'

'হয়তো এককালে জানবে। না জানলেও তোমার কাজ আটকাবে না।'

এমন সময় একটি লোক এসে ডাকলে, 'ওহে এককড়ি, আজ যে বুড়ো জরৎখরের কুলত্যাগিনী বউটার একটা গতি করবার কথা, তার পর গ্রামের ছেলেদের ধনুর্বিদ্যা শেখাবে, তার পর সন্ধ্যায় ভরতরাজার উপাখ্যান শোনাবে বলেছিলে। তোমার আর কত দেরি?'

ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'এককড়ি কে?'

দশকরণ বললেন, 'আজ্ঞে আমি। ওরা কোটিকরণ একীকরণ বোঝে না, সংক্ষেপে এককড়ি বলে। তুমি এগোও হে, আমি হাতের কাজটা শেষ ক'রেই যাচ্ছি। প্রভু, আমার একটি শেষ প্রার্থনা আছে। বয়স তো অনেক হ'ল, গবেষণাও ঢের ক'রে দেখলাম। এইবার মুক্তির সন্ধান দিন।'

ব্রহ্মা হেসে বললেন, 'বল কি হে, তোমার এতগুলো সত্তাকে ফাঁকি দিয়ে তুমি একাই মুক্তি চাও?'

'ঠিক বলেছেন। থাক গে, মুক্তির দরকার নেই।'

'দরকার না থাকলেও তুমি পেয়ে গেছ।'

'দোহাই পিতামহ, পরিহাস করবেন না।'

'আরে মুক্তির পথ কি একটা? তোমার রাজবুদ্ধি তোমাকে মুক্তির রাজমার্গ দেখিয়েছে।'

বিধাতা অন্তর্হিত হলেন। দশকরণ আবার মটকায় চ'ড়ে ভাবতে লাগলেন—এ কি রকম মুক্তি, লোকে ছাড়তেই চায় না, নাইবার খাবার অবসর নেই।

১৩৪৯ (১৯৪২)

তৃতীয়দ্যূতসভা

মহাভারতে আছে প্রথম দ্যূতসভায় যুধিষ্ঠির সর্বস্ব হেরে যাবার পর ধৃতরাষ্ট্র অনুতপ্ত হ'য়ে তাঁকে সমস্ত পণ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। পাণ্ডবেরা যখন ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে যাচ্ছিলেন তখন দুর্যোধনের প্ররোচনায় ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে আবার খেলবার জন্য ডেকে আনান। এই দ্বিতীয় দ্যূতসভাতেও যুধিষ্ঠির হেরে যান এবং তার ফলে পাণ্ডবদের নির্বাসন হয়।

শকুনি-যুধিষ্ঠির কিরকম পাশা খেলেছিলেন? তাঁদের খেলায় ছক আর ঘুঁটি ছিল না, উভয় পক্ষ পণ উচ্চারণ করেই অক্ষপাত করতেন, যাঁর দান বেশী পড়ত তাঁরই জয়। মহাভারতে দ্যূতপর্বাধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের প্রত্যেকবার পণ ঘোষণার পর এই শ্লোকটি আছে—

এতচ্ছ্রুত্বা ব্যবসিতো নিকৃতিং সমুপাশ্রিতঃ
জিতমিত্যেব শকুনির্যুধিষ্ঠিরমভাষত॥

অর্থাৎ পণঘোষণা শুনেই শকুনি নিকৃতি (শঠতা) আশ্রয় ক'রে খেলায় প্রবৃত্ত হলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে বললেন—জিতলাম। এতে বোঝা যায় যে পাশা ফেলবার সংগে সংগে এক একটা বাজি শেষ হ'ত।

অনেকেই জানেন না যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কিছুদিন পূর্বে যুধিষ্ঠির আরও একবার শকুনির সংগে পাশা খেলেছিলেন। ব্যাসদেব মহাভারত থেকে তৃতীয়দ্যূত-পর্বাধ্যায়টি কেন বাদ দিয়েছেন তা বলা শক্ত। হয়তো কোন রাজনীতিক কারণ ছিল, কিংবা তিনি ভেবেছিলেন যে আসন্ন কলিকালে কুটিল দ্যূতপদ্ধতির রহস্য-প্রকাশ জনসাধারণের পক্ষে অনিষ্টকর হবে। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে প্রতারণার যেসব উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে তার তুলনায় শকুনি-যুধিষ্ঠিরের পাশাখেলা ছেলে-খেলা মাত্র, সুতরাং এখন সেই প্রাচীন রহস্য প্রকাশ করলে বেশী কিছু অনিষ্ট হবে না।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পঁচিশ দিন পূর্বের কথা। যুধিষ্ঠির সকাল বেলা তাঁর শিবিরে ব'সে আছেন, সহদেব তাঁকে সংগৃহীত রসদের ফর্দ প'ড়ে শোনাচ্ছেন। অর্জুন পাঞ্চালশিবিরে মন্ত্রণাসভায় গেছেন, নকুল সৈন্যদের কুচকাওয়াজে ব্যস্ত। ভীম যে এক শ গদা ফরমাস দিয়েছিলেন তা পৌঁছে গেছে, এখন তিনি প্রত্যেকটি আস্ফালন করে এক এক জন ধার্তরাষ্ট্রের নামে উৎসর্গ করছেন। সব গদা শাল কাঠের, কেবল একটি কাপড়ের খোলে তুলো ভরা। এটি দুর্যোধনের ১৮নং ভ্রাতা বিকর্ণের জন্য। ছোকরার মতিগতি ভাল, দ্রৌপদীর ধর্ষণের সময় সে প্রবল প্রতিবাদ করেছিল।

সহদেব পড়ছিলেন, 'যবশক্তু দ্বাদশ মন, চণকচূর্ণ অষ্ট লক্ষ মন, অভগ্ন চণক পঞ্চাশ লক্ষ মন—'

ফর্দ শুনে শুনে যুধিষ্ঠিরের বিরক্তি ধরছিল। কিছু আগ্রহ প্রকাশ না করলে ভাল দেখায় না, সেজন্য প্রশ্ন করলেন, 'ওতেই কুলিয়ে যাবে?'

সহদেব বললেন, 'খুব। মোটে তো সাত অক্ষৌহিণী, আর যুদ্ধ শেষ হ'তে বড় জোর দিন-কুড়ি, প্রতিদিন মরবেও বিস্তর। তারপর শুনুন—ঘৃত লক্ষ কুম্ভ—'

'তুমি আমাকে পথে বসাবে দেখছি। অত অর্থ কোথায় পাব?'

'অর্থের প্রয়োজন কি, সমস্তই ধারে কিনেছি, জয়লাভের পর মিষ্টবাক্যে শোধ করবেন। তৈল দ্বিলক্ষ কুম্ভ, লবণ অর্ধ লক্ষ মন—'

'থাক থাক। যা ব্যবস্থা করবার ক'রে ফেল বাপু, আমাকে ভোগাও কেন। আমি রাজধর্ম বুঝি, নীতিশাস্ত্র বুঝি। অঙ্ক কষা বৈশ্যের কাজ, আমার মাথায় ওসব ঢোকে না।'

এমন সময় প্রতিহার এসে জানালে, 'ধর্মরাজ এক অভিজাত কল্প কুব্জপুরুষ আপনার দর্শনপ্রার্থী। পরিচয় দিলেন না; বললেন, তাঁর বার্তা অতি গোপনীয়, সাক্ষাতে নিবেদন করবেন।'

সহদেব বললেন, 'মহারাজ এখন রাজকার্যে ব্যস্ত, ওবেলা আসতে বল।'

সহদেবের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য যুধিষ্ঠির ব্যগ্র হয়েছিলেন। বললেন, 'না না, এখনই তাঁকে নিয়ে এস।'

আগন্তুক বক্রপৃষ্ঠ প্রৌঢ়, বলিকুঞ্চিত শীর্ণ মুণ্ডিত মুখ, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি, গলায় নীলবর্ণ রত্নহার, পরনে ঢিলে ইজের, তার উপর লম্বা জামা। যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে বললেন, 'ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জয়।'

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে আপনি সৌম্য?'

আগন্তুক উত্তর দিলেন, 'মহারাজ, ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন, আমার বক্তব্য কেবল রাজকর্ণে নিবেদন করতে চাই।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'সহদেব, তুমি এখন যেতে পার। ছোলার বস্তাগুলো খুলে দেখ গে, পোকাধরা না হয়।' সহদেব বিরক্ত হ'য়ে সন্দিগ্ধ মনে চ'লে গেলেন।

আগন্তুক অনুচ্চস্বরে বললেন, 'মহারাজ, আমি সুবলপুত্র মৎকুনি, শকুনির বৈমাত্র-ভ্রাতা।'

'বলেন কি, আপনি আমাদের পূজনীয় মাতুল, প্রণাম প্রণাম—কি সৌভাগ্য—এই সিংহাসনে বসতে আজ্ঞা হ'ক।'

'না মহারাজ, এই নিম্ন আসনই আমার উপযুক্ত। আমি দাসীপুত্র, আপনার সংবর্ধনার অযোগ্য।'

'আচ্ছা আচ্ছা, তবে ঐ শৃগালচর্মাবৃত বেদীতে উপবেশন করুন। এখন কৃপা ক'রে বলুন কি প্রয়োজনে আগমন হয়েছে। মাতুল, আগে তো কখনও আপনাকে দেখি নি।'

'দেখবেন কি করে মহারাজ। আমি অন্তরালেই বাস করি, তা ছাড়া গত তের বৎসর বিদেশে ছিলাম। কুব্জতার জন্য ক্ষাত্রিয়ধর্ম পালন আমার সাধ্য নয়, সে কারণে যন্ত্রমন্ত্রবিদ্যার চর্চা ক'রে তাতেই সিদ্ধিলাভ করেছি। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা আমাকে বরদানে কৃতার্থ করেছেন। পাণ্ডবরাজ শুনেছি দ্যূতক্রীড়ায় আপনার পটুতা অসামান্য, অক্ষহৃদয় আপনার নখদর্পণে।'

'হুঁ, লোকে তাই বলে বটে।'

'তথাপি শকুনির হাতে আপনার পরাজয় ঘটেছে। কেন জানেন কি?'

যুধিষ্ঠির ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে বললেন, 'শকুনি ধর্মবিরুদ্ধ কপট দ্যূতে আমাকে হারিয়েছিলেন।'

মৎকুনি একটু হেসে বললেন, 'দ্যূতে কপট আর অকপট ব'লে কোনও ভেদ নেই। অক্ষক্রীড়ায় দৈবই উভয় পক্ষের অবলম্বন, অজ্ঞ লোকে তাকে অকপট বলে। যদি এক পক্ষ দৈবের উপর নির্ভর করে এবং অপর পক্ষ পুরুষকার দ্বারা জয়লাভ করে, তবে পরাজিত পক্ষ কপটতার অভিযোগ আনে। ধর্মরাজ, আপনার দৈব-পাতিত অক্ষ শকুনির পুরুষকারপাতিত অক্ষের নিকট পরাস্ত হয়েছে। আপনি প্রবলতর পুরুষকার আশ্রয় করুন, রাবণবাণের বিরুদ্ধে রামবাণ প্রয়োগ করুন, দ্যূতলক্ষ্মী আপনাকেই বরণ করবেন।'

'মাতুল, আপনার বাক্য আমার ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না। লোকে বলে শকুনির অক্ষের অভ্যন্তরে এক পার্শ্বে স্বর্ণপট্ট নিবদ্ধ আছে, তারই ভারে সেই পার্শ্ব সর্বদা নিম্নবর্তী হয় এবং উপরে গরিষ্ঠ বিন্দুসংখ্যা প্রকাশ করে।'

'মহারাজ, লোকে কিছুই জানে না। স্বর্ণগর্ভ বা পারদগর্ভ পাশক নিয়ে অনেকে খেলে বটে, কিন্তু তার পতন সুনিশ্চিত নয়, বহুবারের মধ্যে কয়েকবার ভ্রংশ হ'তেই হবে। আপনারা তো অনেক বাজি খেলেছিলেন, একবারও কি আপনার জিত হয়েছিল?'

যুধিষ্ঠির দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'একবারও নয়।'

'তবে? শকুনি কাঁচা খেলোয়াড় নন, তিনি অব্যর্থ পাশক না নিয়ে কখনই আপনার সঙ্গে খেলতেন না।'

'কিন্তু এখন এসব কথার প্রয়োজন কি। যুদ্ধ আসন্ন, পুনর্বার দ্যূতক্রীড়ার সম্ভাবনা নেই, শকুনিকে হারাবার সামর্থ্যও আমার নেই।'

'ধর্মপুত্র, নিরাশ হবেন না, আমার গূঢ় কথা এইবারে শুনুন। শকুনির অক্ষ আমারই নির্মিত, তার গর্ভে আমি মন্ত্রসিদ্ধ যন্ত্র স্থাপন করেছি, সেজন্য তার ক্ষেপ অব্যর্থ। দুরাত্মা শকুনি যন্ত্রকৌশল শিখে নিয়ে আমাকে গজভুক্তকপিত্থবৎ পরিত্যাগ করেছে। সে আমাকে আশ্বাস দিয়েছিল যে পাণ্ডবগণের নির্বাসনের পর দুর্যোধন আমাকে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজপদ দেবে। আপনারা বনে গেলে, যখন দুর্যোধনকে প্রতিশ্রুতির কথা জানালাম, তখন সে বললে—আমি কিছুই জানি না, মামাকে বল। শকুনি বললে—আমি কি জানি, দুর্যোধনের কাছে যাও। অবশেষে দুই নরাধম আমাকে ছলেবলে দুর্গম বাহ্লীক দেশে পাঠিয়ে সেখানে কারারুদ্ধ করে রাখে। আমি তের বৎসর পরে কোনও গতিকে সেখান থেকে পালিয়ে এসে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'ও, এখন বুঝি আমাকেই অক্ষরূপে চালনা ক'রে রাজ্যলাভ করতে চান!'

'ধর্মরাজ, আমার পূর্বাপরাধ মার্জনা করুন, যা হবার তা হ'য়ে গেছে, এখন আমাকে আপনার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী ব'লে জানবেন। আমি বামন হ'য়ে ইন্দ্রপ্রস্থ-রূপ চন্দ্রে হস্তপ্রসার করেছিলাম, তাই আমার এই দুর্দশা। আপনি বিজয়ী হ'য়ে শকুনিকে বিতাড়িত ক'রে আমাকে গান্ধাররাজ্য দেবেন, তাতেই আমি সন্তুষ্ট হব।'

'আপনার নির্মিত অক্ষে আমার সর্বনাশ হয়েছে তারই পুরস্কারস্বরূপ?'

মৎকুনি জিহ্বা দংশন ক'রে বললেন, 'ও কথা আর তুলবেন না মহারাজ! আমার বক্তব্য সবটা শুনুন। আমি গুপ্ত সংবাদ পেয়েছি—সঞ্জয় এখনই ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞায় আপনার কাছে আসছেন। দুর্যোধন আর শকুনির প্ররোচনায় অন্ধ রাজা আবার আপনাকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করছেন। মহারাজ, এই মহা সুযোগ ছাড়বেন না।'

এমন সময় রথের ঘর্ঘর ধ্বনি শোনা গেল। মৎকুনি ত্রস্ত হ'য়ে বললেন, 'ঐ সঞ্জয় এসে পড়লেন। দোহাই মহারাজ, ধৃতরাষ্ট্রের প্রস্তাব সদ্য প্রত্যাখ্যান করবেন না, বলবেন যে আপনি বিবেচনা ক'রে পরে উত্তর পাঠাবেন। সঞ্জয় চ'লে গেলে আমার সব কথা আপনাকে জানাব। আমি আপাতত ঐ পাশের ঘরে লুকিয়ে থাকছি।'

যথাবিধি কুশলপ্রশ্নাদি বিনিময়ের পর সঞ্জয় বললেন, 'পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ, কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকেই আপনার কাছে পাঠাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বিদুর এই অপ্রিয় কার্যে কিছুতেই সম্মত না হওয়ায় রাজাজ্ঞায় আমাকেই আসতে হয়েছে। আমি দূত মাত্র, আমার অপরাধ নেবেন না। ধৃতরাষ্ট্র এই বলেছেন—বৎস যুধিষ্ঠির, তোমরা পঞ্চ ভ্রাতা আমার শত পুত্রের সমান স্নেহপাত্র। এই লোকক্ষয়কর জ্ঞাতিধ্বংসী আসন্ন যুদ্ধ যে কোনও উপায়ে নিবারণ করা কর্তব্য। আমি অশক্ত অন্ধ বৃদ্ধ, আমার পুত্রেরা অবাধ্য এবং যুদ্ধের জন্য উৎসুক। আমি বহু চিন্তা করে স্থির করেছি যে হিংস্র অস্ত্রযুদ্ধের পরিবর্তে অহিংস দ্যূতযুদ্ধেই উভয় পক্ষের বৈরভাব চরিতার্থ হ'তে পারে। অতি কষ্টে আমার পুত্রগণ ও তাদের মিত্রগণকে এতে সম্মত করেছি। অতএব তুমি সবান্ধব কৌরব-শিবিরে এসে আর একবার সুহৃদ্দ্যূতে প্রবৃত্ত হও। পণ পূর্ববৎ সমগ্র কুরুপাণ্ডবরাজ্য। যদি দুর্যোধনের প্রতিনিধি শকুনির পরাজয় ঘটে তবে কুরুপক্ষ সদলে রাজ্য ত্যাগ ক'রে চিরতরে বনবাসে যাবে। যদি তুমি পরাস্ত হও তবে তোমরাও রাজ্যের আশা ত্যাগ ক'রে চিরবনবাসী হবে। বৎস, তুমি কপটতার আশংকা ক'রো না। আমি দুই প্রস্থ অক্ষ সজ্জিত রাখব, তুমি স্বহস্তে নিজের জন্য বেছে নিও, অবশিষ্ট অক্ষ শকুনি নেবেন। এর চেয়ে অসন্দিগ্ধ ব্যবস্থা আর কি হ'তে পারে? সঞ্জয়ের মুখে তোমার সম্মতি পাবার আশায় উদ্‌গ্রীব হ'য়ে রইলাম। হে তাত যুধিষ্ঠির, তোমার সুমতি হ'ক, তোমাদের পঞ্চ ভ্রাতার কল্যাণ হ'ক, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সহ কুরুপাণ্ডবের প্রাণ রক্ষা হ'ক।'

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন, 'জ্যেষ্ঠতাত কি স্বয়ং এই বাণী রচনা করেছেন? আমার মনে হয় তাঁর মন্ত্রদাতা দুর্যোধন আর শকুনি, বৃদ্ধ কুরুরাজ শুধু শুকপক্ষিবৎ আবৃত্তি করেছেন। মহামতি সঞ্জয়, আপনি আমাকে কি করতে বলেন?'

'ধর্মপুত্র, আমি কুরুরাজের আজ্ঞাপতি বার্তাবহ মাত্র, নিজের মত জানাবার অধিকার আমার নেই। আপনি রাজবুদ্ধি ও ধর্মবুদ্ধি আশ্রয় করুন, আপনার মঙ্গল হবে।'

'তবে আপনি কুরুরাজকে জানাবেন যে তিনি আমাকে অতি দুরূহ সমস্যায় ফেলেছেন, আমি সম্যক্ বিবেচনা ক'রে পরে তাঁকে উত্তর পাঠাব। এখন আপনি বিশ্রামান্তে আহারাদি করুন, কাল ফিরে যাবেন।'

'না মহারাজ, আমাকে এখনই ফিরতে হবে, বিশ্রামের অবসর নেই। ধর্মপুত্রের জয় হোক।' এই ব'লে সঞ্জয় বিদায় নিলেন।

মৎকুনি পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, 'মহারাজ, আপনি ঠিক উত্তর দিয়েছেন। এইবার আমার মন্ত্রণা শুনুন। আজই অপরাহ্নে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে একজন বিশ্বস্ত দূত পাঠান, কিন্তু আপনার ভ্রাতারা যেন জানতে না পারেন। আপনার দূত গিয়ে বলবে—হে পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠতাত, আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য, অতি অপ্রিয় হ'লেও তৃতীয়বার দ্যূতক্রীড়ায় আমি সম্মত আছি। আপনার আয়োজিত অক্ষে আমার প্রয়োজন নেই, আমি নিজের অক্ষেই নির্ভর করব। শকুনিও নিজের অক্ষে খেলবেন। আপনি যে পণ নির্ধারণ করেছেন তাতেও আমার সম্মতি আছে। শুধু এই নিয়মটি আপনাকে মেনে নিতে হবে যে শকুনি আর আমি প্রত্যেকে একটিমাত্র অক্ষ নিয়ে খেলব এবং তিনবার মাত্র অক্ষক্ষেপণ করব, তাতে যার বিন্দুসমষ্টি অধিক হবে তারই জয়।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'হে সুবলনন্দন মৎকুনি, আপনি সম্পর্কে আমার মাতুল হন, কিন্তু এখন বোধ হচ্ছে আপনি বাতুল। আমি কোন্ ভরসায় আবার শকুনির সঙ্গে খেলতে স্পর্ধা করব? যদি আপনি আমাকে শকুনির অনুরূপ অক্ষ প্রদান করেন তাতে সমানে সমানে প্রতিযোগ হবে, কিন্তু আমার জয়ের স্থিরতা কোথায়? ধৃতরাষ্ট্রের আয়োজিত অক্ষে আপত্তির কারণ কি? আমার ভ্রাতাদের মত না নিয়েই বা কেন এই দ্যূতক্রীড়ায় সম্মতি দেব? তিনবার মাত্র অক্ষ ক্ষেপণের উদ্দেশ্য কি? বহুবার ক্ষেপণেই তো সংখ্যাবৃদ্ধির সম্ভাবনা অধিক। আর আপনি যে দুর্যোধনের চর নন তারই বা প্রমাণ কি?'

মৎকুনি বললেন, 'মহারাজ, স্থিরোভব, আপনার সমস্ত সংশয় আমি ছেদন করছি। যদি আপনি ধৃতরাষ্ট্রের আয়োজিত অক্ষ নিয়ে খেলেন তবে আপনার পরাজয় অনিবার্য। ধূর্ত শকুনি সে অক্ষে খেলবে না, হাতে নিয়ে ইন্দ্রজালিকের ন্যায় বদলে ফেলে নিজের আগেকার অক্ষেই খেলবে। আমি এতকাল বাহ্লীক দুর্গে নিশ্চেষ্ট ছিলাম না, নিরন্তর গবেষণায় প্রচণ্ডতর মন্ত্রশক্তিযুক্ত অক্ষ উদ্ভাবন করেছি। আপনাকে এই নবযন্ত্রান্বিত আশ্চর্য অক্ষ দেব, তার কাছে এলেই শকুনির পুরাতন অক্ষ একেবারে বিকল হয়ে যাবে। মহারাজ, আপনার জয়ে কিছুমাত্র সংশয় নেই। আপনার ভ্রাতারা যুদ্ধলোলুপ, আপনার তুল্য স্থিরবুদ্ধি দূরদর্শী নন। তাঁরা আপনাকে বাধা দেবেন, ফলে এই রক্তপাতহীন বিজয়ের মহা সুযোগ আপনি হারাবেন। আপনি আগে ধৃতরাষ্ট্রকে সংবাদ পাঠান, তার পর আপনার ভ্রাতাদের জানাবেন। তাঁরা ভর্ৎসনা করলে আপনি হিমালয়বৎ নিশ্চল থাকবেন।'

'কিন্তু দ্রৌপদী? আপনি তাঁর কটুবাক্য শোনেন নি।'

'মহারাজ, স্ত্রীজাতির ক্রোধ তৃণাগ্নিতুল্য, তাতে পর্বত বিদীর্ণ হয় না। কদিনেরই বা ব্যাপার, আপনার জয়লাভ হ'লে সকল নিন্দাকের মুখ বন্ধ হবে। তারপর শুনুন—আমার যন্ত্র অতি সূক্ষ্ম, সেজন্য এক দিনে অধিকবার অক্ষক্ষেপণ অবিধেয়। শকুনির অক্ষও দীর্ঘকাল সক্রিয় থাকে না, সেজন্য সে আনন্দে আপনার প্রস্তাবে

সম্মত হবে। আপনার জয়ের পক্ষে তিনবার ক্ষেপণই যথেষ্ট। অক্ষ আমার সঙ্গেই আছে, পরীক্ষা ক'রে দেখুন।'

মৎকুনি তাঁর কটিলগ্ন থলি থেকে একটি গজদন্তনির্মিত অক্ষ বার করলেন। যুধিষ্ঠির লক্ষ্য করলেন, অক্ষটি শকুনির অক্ষেরই অনুরূপ, তেমনিই সুগঠিত সমসৃণ, ধার এবং পৃষ্ঠগুলি ঈষৎ গোলাকার, প্রতি বিন্দুর কেন্দ্রে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র।

মৎকুনি বললেন, 'মহারাজ, তিনবার ক্ষেপণ ক'রে দেখুন।'

যুধিষ্ঠির তাই করলেন, তিনবারই ছয় বিন্দু উঠল। তিনি আশ্চর্য হয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখতে লাগলেন, কিন্তু মৎকুনি ঝটিতি কেড়ে নিয়ে থলির ভিতর রেখে বললেন, 'এই মন্ত্রপূত অক্ষ অনর্থক নাড়াচাড়া নিষিদ্ধ, তাতে গুণহানি হয়।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'আপনার অক্ষটি নির্ভরযোগ্য বটে। কিন্তু এর পর আপনি যে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না তার জন্য দায়ী কে?'

'দায়ী আমার মুণ্ড। আপনি এখন থেকে আমাকে বন্দী ক'রে রাখুন, দুজন খড়্গপাণি প্রহরী নিরন্তর আমার সঙ্গে থাকুক। তাদের আদেশ দিন—যদি আপনার পরাজয়ের সংবাদ আসে তবে তখনই আমার মুণ্ডচ্ছেদ করবে। মহারাজ, এখন আপনার বিশ্বাস হয়েছে?'

'হয়েছে। কিন্তু শকুনির কূট পাশক যদি আমার কূটতর পাশকের দ্বারা পরাভূত হয় তবে তা ধর্মবিরুদ্ধ কপট দ্যূত হবে।'

'হায় হায় মহারাজ, এখনও আপনার কপটতার আতঙ্ক গেল না! আপনারা দুজনেই তো যন্ত্রগর্ভ কূট পাশক নিয়ে খেলবেন, এতে কপটতা কোথায়? মল্লযুদ্ধে যদি আপনার বাহুবল বিপক্ষের চেয়ে বেশী হয় তবে সেকি কপটতা? যদি আপনার কৌশল বেশী থাকে সে কি কপটতা? শকুনির পাশকে যে কূট কৌশল নিহিত আছে তা আমারই, আপনার পাশকে যে কূটতর কৌশল আছে তাও আমার। ধর্মরাজ, এই তৃতীয়দ্যূতসভায় বস্তুত আমিই উভয় পক্ষ, আপনি আর শকুনি নিমিত্তমাত্র।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'মৎকুনি, আপনার বক্তৃতা শুনে আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। ধর্মের গতি অতি সূক্ষ্ম, আমি কঠিন সমস্যায় পড়েছি। এক দিকে লোকক্ষয়কর নৃশংস যুদ্ধ, অন্য দিকে কূট দ্যূতক্রীড়া। দুইই আমার অবাঞ্ছিত, কিন্তু যুদ্ধের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা যেমন রাজধর্মবিরুদ্ধ, সেইরূপ জ্যেষ্ঠতাতের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করাও আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। আপনার মন্ত্রণা আমি অগত্যা মেনে নিচ্ছি, আজই কুরুরাজের কাছে দূত পাঠাব। আপনি এখন থেকে সশস্ত্র প্রহরীর দ্বারা রক্ষিত হয়ে গুপ্তগৃহে বাস করবেন, কুরুপাণ্ডব কেউ আপনার খবর জানবেন না। যদি জয়ী হই, আপনি গান্ধাররাজ্য পাবেন। যদি পরাজিত হই তবে আপনার মৃত্যু। এখন আপনার পাশকটি আমাকে দিন।'

'মহারাজ, আপনার কাছে পাশক থাকলে পরিচর্যার অভাবে তার গুণ নষ্ট হবে। আমার কাছেই থাকুক, আমি তাতে নিয়ত মন্ত্রাধান করব এবং দ্যূতযাত্রার পূর্বে আপনাকে দেব। ইচ্ছা করেন তো আপনি প্রত্যহ একবার আমার কাছে এসে খেলে দেখতে পারেন।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'মৎকুনি, আপনার অতি তুচ্ছ জীবন আমার হাতে, কিন্তু আমার বুদ্ধি রাজ্য ধর্ম সমস্তই আপনার হাতে। আপনার বশবর্তী হওয়া ভিন্ন আমার এখন অন্য গতি নেই।'

পরদিন যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতৃবৃন্দকে আসন্ন দ্যূতের কথা জানালেন। ধর্মরাজের এই বুদ্ধিভ্রংশের সংবাদে সকলেই কিয়ৎক্ষণ হতভম্ব হয়ে থাকবার পর তাঁকে যেসব কথা বললেন তার বিবরণ অনাবশ্যক। যুধিষ্ঠির নিশ্চল হয়ে সমস্ত গঞ্জনা নীরবে শুনলেন, অবশেষে বললেন, 'ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদের জ্যেষ্ঠ, আমাকে তোমরা রাজা ব'লে থাক। অপরের বুদ্ধি না নিয়েও রাজা নিজের কর্তব্য স্থির করতে পারেন। যুদ্ধে অসংখ্য নরহত্যার চেয়ে দ্যূতসভায় ভাগ্যনির্ণয় আমি শ্রেয় মনে করি। জয় সম্বন্ধে আমি কেন নিঃসন্দেহ তার কারণ আমি এখন প্রকাশ করতে পারব না। যদি তোমরা আমার উপর নির্ভর করতে না পার তো স্পষ্ট বল, আমি কুরুরাজকে সংবাদ পাঠাব—হে জ্যেষ্ঠতাত, আমি ভ্রাতৃগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত, তারা আমাকে পাণ্ডবপতি বলে মানে না, দ্যূতসভায় রাজ্যপণের অধিকার আমার আর নেই, আমার অঙ্গীকার-ভঙ্গের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ অগ্নিপ্রবেশে প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছি, আপনি যথাকর্তব্য করবেন।'

তখন অর্জুন অগ্রজের পাদস্পর্শ ক'রে বললেন, 'পাণ্ডবপতি, আপনি প্রসন্ন হ'ন, আমাদের কটূক্তি মার্জনা করুন, আমাকে সর্ববিষয়ে আপনার অনুগত ব'লে জানবেন।'

তারপর ভীম নকুল সহদেবও যুধিষ্ঠিরের ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। যুধিষ্ঠির সকলকে আশীর্বাদ করে তাঁর গৃহে চলে গেলেন।

দ্রৌপদী এতক্ষণ কোনও কথা বলেন নি। যে মানুষ এমন নির্লজ্জ যে দু-দু বার হেরে গিয়ে চূড়ান্ত দুঃখভোগের পরেও আবার জুয়ো খেলতে চায় তাকে ভর্ৎসনা করা বৃথা। যুধিষ্ঠির চ'লে গেলে দ্রৌপদী সহদেবের দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, 'ছোট আর্যপুত্র, হাঁ ক'রে দেখছ কি? ওঠ, এখনই দ্রুতগামী চতুরশ্বযোজিত রথে দ্বারকায় যাত্রা কর, বাসুদেবকে সব কথা ব'লে এখনই তাঁকে নিয়ে এস। তিনিই একমাত্র ভরসা, তোমরা পাঁচ ভাই তো পাঁচটি অপদার্থ জড়পিণ্ড।'

দশ দিনের মধ্যে কৃষ্ণকে নিয়ে সহদেব পাণ্ডবশিবিরে ফিরে এলেন। রথ থেকে নেমে কৃষ্ণ বললেন, 'দাদাও আসছেন।' যুধিষ্ঠির সহর্ষে বললেন, 'কি আনন্দ, কি আনন্দ! দ্রৌপদী অতি ভাগ্যবতী, তাঁর আহ্বানে কৃষ্ণ বলরাম কেউ স্থির থাকতে পারেন না।'

ক্ষণকাল পরে দারুকের রথে বলরাম এসে পৌঁছলেন। রথ থেকেই অভিবাদন ক'রে বললেন, 'ধর্মরাজ, শুনলাম আপনারা উত্তম কৌতুকের আয়োজন করেছেন। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ আমি দেখতে চাই না, কিন্তু আপনাদের খেলা দেখবার আমার প্রবল আগ্রহ। এখানে নামব না, আমরা দুই ভাই পাণ্ডবদের কাছে থাকলে পক্ষপাতের অপযশ হবে, তা ছাড়া এখানে পানীয়ের ভাল ব্যবস্থা নেই। কৃষ্ণ এখানে থাকুক, আমি দুর্যোধনের আতিথ্য নেব। দ্যূতসভায় আবার দেখা হবে। চালাও দারুক।' এই ব'লে বলরাম কৌরবশিবিরে চ'লে গেলেন।

তৃতীয়দ্যূতসভা

মহা সমারোহে দ্যূতসভা বসেছে। ধৃতরাষ্ট্র স্থির থাকতে পারেন নি, হস্তিনাপুর থেকে দুদিনের জন্য কৌরবশিবিরে এসেছেন, খেলার ফলাফল দেখে ফিরে যাবেন। শকুনির দক্ষতায় তাঁর অগাধ বিশ্বাস, কুরুপক্ষের জয় সম্বন্ধে তাঁর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

সভায় কৃষ্ণবলরাম, পঞ্চপাণ্ডব, দুর্যোধনাদি সহ ধৃতরাষ্ট্র, শকুনি, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি সকলে উপস্থিত হ'লে পিতামহ ভীষ্ম বললেন, 'আমি এই দ্যূতসভার সম্যক্ নিন্দা করি। কিন্তু আমি কুরুরাজের ভৃত্য, সেজন্য অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই গর্হিত ব্যাপার দেখতে হবে।'

দ্রোণাচার্য বললেন, 'আমি তোমার সঙ্গে একমত।'

ভীষ্ম বললেন, 'মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, এই সভায় দ্যূতনীতিবিরুদ্ধ কোনও কর্ম যাতে না হয় তার বিধান তোমার কর্তব্য। আমি প্রস্তাব করছি, শ্রীকৃষ্ণকে সভাপতি নিযুক্ত করা হ'ক।'

দুর্যোধন আপত্তি তুললেন, 'শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবপক্ষপাতী।'

কৃষ্ণ বললেন, 'কথাটা মিথ্যা নয়। আর, আমার অগ্রজ উপস্থিত থাকতে আমি সভাপতি হ'তে পারি না।'

তখন ধৃতরাষ্ট্র সর্বসম্মতিক্রমে বলরামকে সভাপতি পদে বরণ করলেন।

বলরাম বললেন, 'বিলম্বে প্রয়োজন কি, খেলা আরম্ভ হ'ক। হে সমবেত সুধীবৃন্দ, এই দ্যূতে কুরুপক্ষে শকুনি পাণ্ডবপক্ষে যুধিষ্ঠির নিজ নিজ একটিমাত্র অক্ষ নিয়ে খেলবেন। প্রত্যেকে তিনবার মাত্র অক্ষপাত করবেন। যাঁর বিন্দুসমষ্টি অধিক হবে তাঁরই জয়। এই দ্যূতের পণ সমগ্র কুরুপাণ্ডব রাজ্য। পরাজিত পক্ষ বিজয়ীকে রাজ্য সমর্পণ ক'রে এবং যুদ্ধের বাসনা পরিহার ক'রে সদলে চিরবনবাসী হবেন। সুবলনন্দন শকুনি, আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, আপনিই প্রথম অক্ষপাত করুন।'

শকুনি সহাস্যে অক্ষ নিক্ষেপ ক'রে বললেন, 'এই জিতলাম।' তাঁর পাশাটি পতনমাত্র একটু গড়িয়ে গিয়ে স্থির হ'লে তাতে ছয় বিন্দু দেখা গেল। কর্ণ এবং দুর্যোধনাদি সোল্লাসে উচ্চৈঃস্বরে বললেন, 'আমাদের জয়।'

বলরাম বললেন, 'যুধিষ্ঠির, এইবার আপনি ফেলুন।'

যুধিষ্ঠিরের পাশা একবার ওলটাবার পর স্থির হ'লে তাতেও ছয় বিন্দু উঠল। পাণ্ডবরা বললেন, 'ধর্মরাজের জয়।'

বলরাম বললেন, 'তোমরা অনর্থক চিৎকার করছ। কারও জয় হয় নি, দুই পক্ষই এখন পর্যন্ত সমান।'

শকুনি গম্ভীরবদনে বললেন, 'এখনও দুই ক্ষেপ বাকী, তাতেই জিতব।'

দ্বিতীয়বারে শকুনির পাশা আর গড়াল না, পড়েই স্থির হ'ল। পৃষ্ঠে পাঁচ বিন্দু। যুধিষ্ঠিরের পাশায় পূর্ববৎ ছয় বিন্দু উঠল। শকুনি লক্ষ্য করলেন তাঁর পাশাটি কাঁপছে।

পাণ্ডবপক্ষ আনন্দে গর্জন ক'রে উঠলেন। বলরাম ধমক দিয়ে বললেন, 'খবরদার, ফের চিৎকার করলেই সভা থেকে বার ক'রে দেব।'

সভা স্তব্ধ। শেষ অক্ষপাত দেখবার জন্য সকলেই শ্বাসরোধ ক'রে উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলেন!

শকুনি পাংশুমুখে তৃতীয়বার পাশা ফেললেন। পাশাটি কর্দম-পিণ্ডবৎ ধপ্ ক'রে পড়ল। এক বিন্দু।

যুধিষ্ঠিরের পাশায় আবার ছয় বিন্দু উঠল। বলরাম মেঘমন্দ্র স্বরে ঘোষণা করলেন, 'যুধিষ্ঠিরের জয়।'

তখন সভাস্থ সকলে সবিস্ময়ে দেখলেন, যুধিষ্ঠিরের পতিত পাশা ধীরে ধীরে লাফিয়ে লাফিয়ে শকুনির পাশার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

সভায় তুমুল কোলাহল উঠল, মায়া মায়া, কুহক, ইন্দ্রজাল!

দুর্যোধন হাত পা ছুড়ে বললেন, 'যুধিষ্ঠির নিকৃতি আশ্রয় করেছেন, তাঁর জয় আমরা মানি না। সাধু ব্যক্তির পাশা কখনও চ'লে বেড়ায়?'

বলরাম বললেন, 'আমি দুই অক্ষই পরীক্ষা করব।'

যুধিষ্ঠির তখনই তাঁর পাশা তুলে নিয়ে বলরামকে দিলেন। শকুনি নিজের পাশাটি মুষ্টিবদ্ধ ক'রে বললেন, 'আমার অক্ষ কাকেও স্পর্শ করতে দেব না।'

বলরাম বললেন, 'আমি এই সভার অধ্যক্ষ, আমার আজ্ঞা অবশ্যপাল্য।'

শকুনি উত্তর দিলেন, 'আমি তোমার আজ্ঞাবহ নই।'

বলরাম কিঞ্চিৎ মত্ত অবস্থায় ছিলেন। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শকুনির গালে একটি চড় মেরে পাশা কেড়ে নিয়ে বললেন, 'হে সভ্যমণ্ডলী, আমি এই দুই অক্ষই ভেঙে দেখব ভিতরে কি আছে।' এই বলে তিনি শিলাবেদীর উপরে একে একে দুটি পাশা আছড়ে ফেললেন।

শকুনির পাশা থেকে একটি ঘুরঘুরে পোকা বার হ'য়ে নির্জীববৎ ধীরে ধীরে দাড়া নাড়তে লাগল। যুধিষ্ঠিরের পাশা থেকে একটি ছোট টিকটিকি বেরিয়ে তখন পোকাটিকে আক্রমণ করলে।

বাত্যাহত সাগরের ন্যায় সভা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। ধৃতরাষ্ট্র ব্যস্ত হয়ে জানতে চাইলেন, 'কি হয়েছে?'

বলরাম উত্তর দিলেন, 'বিশেষ কিছু হয় নি, একটি ঘুর্ঘুর কীট শকুনির অক্ষে ছিল—'

ধৃতরাষ্ট্র সভয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কামড়ে দিয়েছে? কি ভয়ানক!'

'কামড়ায় নি মহারাজ, শকুনির অক্ষের মধ্যে ছিল। এই কীট অতি অবাধ্য, কিছুতেই কাত বা চিত হ'তে চায় না, অক্ষের ভিতর পুরে রাখলে অক্ষ সমেত উবুড় হয়। যুধিষ্ঠিরের অক্ষ থেকে একটি গোধিকা বেরিয়েছে। এই প্রাণী আরও দুর্ধর্ষ, স্বয়ং ব্রহ্মা একে কাত করতে পারেন না। গোধিকার গন্ধ পেয়ে ঘুর্ঘুর ভয়ে অবসন্ন হয়েছিল, তাই শকুনি অভীষ্ট ফল পান নি।'

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন, 'কার জয় হ'ল?'

বলরাম বললেন, 'যুধিষ্ঠিরের। দুই পক্ষই কূট পাশক নিয়ে খেলেছেন, অতএব কপটতার আপত্তি চলে না। শুনেছি শকুনি অতি চতুর, কিন্তু এখন দেখছি যুধিষ্ঠির চতুরতর।'

যুধিষ্ঠির তখন জনান্তিকে বলরামকে মৎকুনির বৃত্তান্ত জানালেন। বলরাম তাঁকে বললেন, 'ধর্মরাজ, আপনার কুণ্ঠার কিছুমাত্র কারণ নেই, কূট পাশকের ব্যবহার দ্যূতবিধিসম্মত।'

যুধিষ্ঠির পরম অবজ্ঞাভরে বললেন, 'হলধর, তুমি মহাবীর, কিন্তু শাস্ত্র কিছুই জান না। ভগবান্ মনু কি বলেছেন শোন—

অপ্রাণিভির্যৎ ক্রিয়তে তল্লোকে দ্যূতমুচ্যতে।
প্রাণিভিঃ ক্রিয়তে যস্তু স বিজ্ঞেয়ঃ সমাহ্বয়ঃ॥

অর্থাৎ অপ্রাণী নিয়ে যে খেলা তাকেই লোকে দ্যূত বলে, আর প্রাণী নিয়ে খেলার নাম সমাহ্বয়। কুরুরাজ আমাকে অপ্রাণিক দ্যূতেই আমন্ত্রণ করেছেন, কিন্তু দুর্দৈববশে আমাদের অক্ষ থেকে প্রাণী বেরিয়েছে। অতএব এই দ্যূত অসিদ্ধ।'

কর্ণ করতালি দিয়ে বললেন, 'ধর্মরাজ, তুমি সার্থকনামা।'

বলরাম বললেন, 'ধর্মরাজের শাস্ত্রজ্ঞান অগাধ, যদিও কাণ্ডজ্ঞানের কিঞ্চিৎ অভাব দেখা যায়। মেনে নিচ্ছি এই দ্যূত অসিদ্ধ। সেক্ষেত্রে পূর্বের দ্যূতও অসিদ্ধ, শকুনি তাতেও ঘুঘুরগর্ভ অক্ষ নিয়ে খেলেছিলেন। কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র, আপনার শ্যালকের অশাস্ত্রীয় আচরণের জন্য পাণ্ডবগণ বৃথা ত্রয়োদশ বর্ষ নির্বাসন ভোগ করেছেন। এখন তাঁদের পিতৃরাজ্য ফিরিয়ে দিন, নতুবা পরকালে আপনার নরকভোগ অবশ্যম্ভাবী।'

যুধিষ্ঠির উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আমি কোনও কথা শুনতে চাই না, দ্যূত-প্রসঙ্গে আমার ঘৃণা ধরে গেছে। আমরা যুদ্ধ করেই হৃতরাজ্য উদ্ধার করব। জ্যেষ্ঠতাত, প্রণাম, আমরা চললাম।'

তখন পাণ্ডবগণ মহা উৎসাহে বার বার সিংহনাদ করতে করতে নিজ শিবিরে যাত্রা করলেন। কৃষ্ণবলরামও তাঁদের সঙ্গে গেলেন।

ফিরে এসেই যুধিষ্ঠির বললেন, 'আমার প্রথম কর্তব্য মৎকুনিকে মুক্তি দেওয়া। এই হতভাগ্য মূর্খের সমস্ত উদ্যম ব্যর্থ হয়েছে। চল, তাকে আমরা প্রবোধ দিয়ে আসি।'

একটু আগেই পাণ্ডবশিবিরে সংবাদ এসে গেছে দ্যূতসভায় কি একটা প্রচণ্ড গোলযোগ হয়েছে। যুধিষ্ঠিরাদি যখন কারাগৃহে এলেন তখন দুই প্রহরী তর্ক করছিল—মৎকুনির মুণ্ডচ্ছেদ করা উচিত, না শুধু নাসচ্ছেদেই আপাতত কর্তব্য-পালন হবে।

যুধিষ্ঠিরের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে মৎকুনি মাথা চাপড়ে বললেন, 'হা, দৈবই দেখছি সর্বত্র প্রবল। আমি গোধিকাকে বেশী খাইয়ে তার দেহে অত্যধিক বলাধান করেছি, তাই সে কৃতঘ্ন জীব লম্ফঝম্ফ ক'রে আমার সর্বনাশ করেছে। বলদেব তবু সামলে নিয়েছিলেন, কিন্তু ধর্মরাজ শেষটায় শাস্ত্র আউড়ে সব মাটি করে দিলেন। মুক্তি পেয়ে আমার লাভ কি, দুর্যোধন আমাকে নিশ্চয় হত্যা করবে।'

বলরাম বললেন, 'মৎকুনি, তোমার কোনও চিন্তা নেই, আমার সঙ্গে দ্বারকায় চল। সেখানে অহিংস সাধুগণের একটি আশ্রম আছে, তাতে অসংখ্য উৎকুণ-মৎকুন-মশক-মূষিকাদির নিত্য সেবা হয়। তোমাকে তার অধ্যক্ষ করে দেব, তুমি নব নব গবেষণায় সুখে কালযাপন করতে পারবে।'

১৩৫০ (১৯৪৩)

আমের পরিণাম

ছেলেবেলায় শোনা একটি গল্প বলছি।

খলিফা হারুন-অল-রসিদ একদিন তাঁর মন্ত্রী জাফরকে বললেন, 'উজির তুমি দিন দিন অকর্মণ্য হচ্ছে, তোমার দ্বারা রাজকার্য চলবে না। তোমাকে আস্তাবলের ঘেসেড়া করব স্থির করেছি।'

জাফর হাত জোড় করে বললেন, 'কেন প্রভু, আমি তো প্রাণপণে রাজকার্য চালাচ্ছি।'

'ছাই চালাচ্ছ। আমার রাজ্যে ভাল মেওয়া মেলে না কেন?'

'বলেন কি হুজুর, আপনার রাজ্য হ'ল বাদাম পেস্তা আঞ্জির খোবানি কিশমিশ মনাক্কা খেজুরের অক্ষয় ভাণ্ডার। এত ফল আর কোন্ মুলুকে পাওয়া যায়?'

খলিফা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তুমি দিন দিন বেকুফ হচ্ছ। ওসব শুঁটকি ফল, রস কিছু নেই।'

জাফর বললেন, 'কেন বেদানাতে তো রস আছে।'

'চার ভাগ বিচি, এক ভাগ রস। রস গিলব না বিচি ফেলব? আমের নাম শুনেছ।'

জাফর সভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আম? সে কি চিজ?'

'তুমি কোনও খবরই রাখ না। আম হচ্ছে হিন্দুস্থানের ফল, কেতাবে পড়েছি তার তুল্য মেওয়া দুনিয়ায় নেই। আমার রাজধানী এই বোগদাদে তার আমদানি নেই কেন?'

'প্রভু যদি হুকুম দেন তবে আমি নিজে হিন্দুস্থানে গিয়ে আনতে পারি।'

'তবে এখনই রওনা হও। এক বছরের মধ্যে ফিরে আসা চাই। খরচ যা লাগবে খাজানা থেকে নাও।'

জাফর ভাবলেন, শাপে বর হ'ল। পথখরচের টাকা থেকে কিছু মোটা রকম লাভ হবে. নূতন মুলুক দেখা হবে, কিছুকাল খলিফার ধমক থেকেও রেহাই পাওয়া যাবে। তিনি পাঁচ শ উট, এক হাজার অনুচর, দশজন সুয়ো বেগম, চল্লিশজন দুয়ো বেগম আর বিস্তর টাকা নিয়ে রওনা হলেন। কুর্দিস্থান, ইরান, আফগানিস্থান পার হয়ে অবশেষে পেশোআরে পেঁছিলেন। সেখান থেকে আমের সন্ধান নিয়ে বেনারস গেলেন, তারপর ত্রিহুত, মালদহ, মুরশিদাবাদ।

নানারকম আম বিস্তর কেনা হ'ল। নিজেরা ঢের খেলেন. আর খলিফার জন্য দু হাজার ঝুড়ি উটে বোঝাই করে বোগদাদের দিকে ফিরলেন।

দুদিন পরেই দেখা গেল যে আম মেওয়া নয়, বেশী দিন টকবে না। জাফর ভাবলেন, এমন উত্তম জিনিস নষ্ট করে কি হবে, খেয়ে ফেলা যাক। তার পর তিনি সদলে আম সাবাড় করতে শুরু করলেন। নিজে আর সুয়ো বেগমরা খান আমের চাকা. দুয়োরা আঁটি চোষেন, আর পচা আম খায় লোক-লশকর। বোগদাদ পেঁছিবার ঢের আগেই আম নিঃশেষ হয়ে গেল।

* 'হনুমানের স্বপ্ন' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত নয়।

শেষ আমটি খেয়ে জাফর মাথা চাপড়ে বললেন, 'ইয়া আল্লা, খালিফাকে আমি কি বলব? হায় হায়, আমাকে তিনি নিশ্চয় কতল করবেন।'

বেগম আর অনুচরদের ভিতর কান্নাকাটি প'ড়ে গেল। তখন দুয়ো বেগমদের ভিতর যিনি সবচেয়ে দুয়ো, তিনি একটু ভেবে বললেন, 'প্রভু, কোনও চিন্তা নেই, বোগদাদে চলুন, সেখানে আমি নিস্তারের উপায় বাতলে দেব।'

জাফর বললেন, 'যদি আমার প্রাণ রক্ষা করতে পার তবে তোমাকেই এক নম্বর সুয়ো করব।'

খলিফা হারুন-অল-রসিদ রাজসভায় বসেছেন। বিস্তর পাত্র মিত্র সভাসদ হাজির হয়েছে। আজ আম এসে পোঁছবে, সকলেই তার আস্বাদের জন্য লোলুপ হয়ে আছেন।

খলিফা হাঁক দিলেন, 'জাফরটা এখনও হাজির হ'ল না কেন? তার গর্দানের ওপর কটা মুণ্ড আছে?'

জাফর আস্তে আস্তে রাজসভায় প্রবেশ করলেন। তাঁর হাতে একটা বোঁচকা। তিনবার কুর্নিশ ক'রে খলিফাকে বললেন, 'খোদাবন্দ্, গোলাম হাজির। আপনি কেতাবে আমের যে সুনাম পড়েছেন তা একেবারে মিথ্যা।'

খলিফা বললেন, 'ওসব শুনতে চাই না, নিকালো আম।'

জাফর বললেন, 'এই যে হুজুর, এখনই আপনাকে আম চাখিয়ে দেখাচ্ছি।' এই ব'লে তিনি বোঁচকা খুলে দুটো মালসা বার করলেন, তার একটাতে তেঁতুলের মাড়ি, আর একটাতে গুড়। দুটো একসঙ্গে চটকে নিয়ে নিজের লম্বা দাড়িতে জুবড়ে মাখালেন। তার পর খলিফার কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে ব'সে দাড়িটি এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'প্রভু, চুষতে আজ্ঞা হ'ক।'

খলিফা বললেন, 'বিসমিল্লাহ্, এ কিরকম বেয়াদবি!'

জাফর বললেন, 'হে দীনদুনিয়ার মালিক, আম অতি ওয়াহিয়াত অপবিত্র ফল, কাফেররা খায়, আপনাকে কি তা দিতে পারি? তাই আমার এই বৃদ্ধ বয়সের ফসল, আমার মান-ইজ্জতের নিশান, এই দাড়িতে আমের স্বাদ গন্ধ স্পর্শ মিশিয়ে আপনাকে নিবেদন করছি। এতে আমের অপবিত্রতা নেই, কিন্তু মিষ্টতা অম্লতা ছিবড়ে আর গন্ধ এই চার লক্ষণই হুবহু বর্তমান। একবারটি চুষে দেখুন।'

খলিফা মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'তৌবা তৌবা।'

জাফর তখন সভাসদ্‌বর্গের দিকে দাড়িটি নেড়ে বললেন, 'আপনারা একটু ইচ্ছে করেন কি? চেটে দেখতে পারেন।'

তাঁরাও বললেন, 'তৌবা তৌবা।'

খলিফা বললেন, 'খবরদার, আর আমের নামও কেউ ক'রো না। যাও জাফর, তোমার দাড়ি ধুয়ে ফেল।'

সেই অবধি খলিফার হুকুমে আরব দেশে আমের আমদানি নিষিদ্ধ হ'ল। তবে জাফরের সেই দুয়ো বেগম, যিনি বুদ্ধিবলে সুয়োতমা হলেন, তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে আমসত্ত্ব আনিয়ে খেতেন।

১৯-৭-৪২

গল্পকল্প

গামানুষ জাতির কথা

যে সময়ের কথা বলছি তার প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে পৃথিবী থেকে মানবজাতি লুপ্ত হয়ে গেছে। তর্ক উঠতে পারে, আমরা সকলেই যখন পঞ্চত্ব পেয়েছি তখন এই গল্প লিখছে কে, পড়ছেই বা কে। দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। লেখক আর পাঠকরা দেশ-কালের অতীত, তাঁরা ত্রিলোকদর্শী ত্রিকালজ্ঞ। এখন যা হয়েছিল শুনুন।

বড় বড় রাষ্ট্রের যাঁরা প্রভু তাঁদের মধ্যে মনোমালিন্য অনেক দিন থেকেই চলছিল। ক্রমশঃ তা বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে মিটমাটের আর আশা রইল না। সকলেই নিজের নিজের ভাষায় দ্বিজেন্দ্রলালের এই গানটি ন্যাশনাল অ্যানথেম রূপে গাইতে লাগলেন—'আমরা ইরান দেশের কাজী, যে বেটা বলিবে তা না না না সে বেটা বড়ই পাজী।' অবশেষে যখন কর্তারা স্বপক্ষের জ্ঞানী-গুণীদের সঙ্গে মন্ত্রণা করে নিঃসন্দেহ হলেন যে বজ্জাত বিপক্ষ গোষ্ঠীকে একেবারে নির্মূল করতে না পারলে বেঁচে সুখ নেই তখন তাঁরা পরস্পরের প্রতি অ্যানাইহিলিয়ম বোমা ছাড়লেন। বিজ্ঞানের এই নবতম অবদানের তুলনায় সেকেলে ইউরেনিয়ম বোমা তুলো-ভরা বালিশ মাত্র।

প্রত্যেক রাষ্ট্রের বোমা-বিশারদগণ আশা করেছিলেন যে অপরাপর পক্ষের যোগাড় শেষ হবার আগেই তাঁরা কাজ সাবাড় করবেন। কিন্তু দুর্দৈবক্রমে সকলেরই আয়োজন শেষ হয়েছিল এবং তাঁরা গুপ্তচরের মারফত পরস্পরের মতলব টের পেয়ে একই দিনে একই শুভলগ্নে ব্রহ্মাস্ত্র মোচন করলেন।

সভ্য অর্ধসভ্য অসভ্য কোনও দেশ নিস্তার পেলে না। সমগ্র মানবজাতি, তার সমস্ত কীর্তি, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ গাছপালা, মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস হল। কিন্তু প্রাণ বড় কঠিন পদার্থ, তার জের মেটে না। সাগরগর্ভে পর্বতকন্দরে জনহীন দ্বীপে এবং অন্যান্য কয়েকটি দুষ্প্রবেশ্য-স্থানে কিছু উদ্ভিদ আর ইতর প্রাণী বেঁচে রইল। তাদের বিস্তারিত বিবরণে আমাদের দরকার নেই, যাদের নিয়ে এই ইতিহাস তাদের কথাই বলছি।

লণ্ডন প্যারিস নিউইয়র্ক পিকিং কলকাতা প্রভৃতি বড় বড় শহরে রাস্তার নীচে যে গভীর ড্রেন ছিল তাতে লক্ষ লক্ষ ইঁদুর বাস করত। তাদের বেশীর ভাগই বোমার তেজে বিলীন হল, কিন্তু কতকগুলি তরুণ আর তরুণী ইঁদুর দৈবক্রমে বেঁচে গেল। শুধু বাঁচা নয়, বোমা থেকে নির্গত গামা-রশ্মির প্রভাবে তাদের জাতিগত লক্ষণের আশ্চর্য পরিবর্তন হল, জীববিজ্ঞানীরা যাকে বলেন মিউটেশন। কয়েক পুরুষের মধ্যেই তাদের লোম আর ল্যাজ খসে গেল, সামনের দুই পা হাতের মতন হল, পিছনের পা এত মজবুত হল যে তারা খাড়া হয়ে দাঁড়াতে আর চলতে শিখল, মস্তিষ্ক মস্ত হল, কণ্ঠে তীক্ষ্ণ কিচকিচ ধ্বনির পরিবর্তে সুস্পষ্ট ভাষা ফুটে উঠল, এক কথায় তারা মানুষের সমস্ত লক্ষণ পেলে। কর্ণ যেমন সূর্যের বরে সহজাত কুণ্ডল আর কবচ নিয়ে জন্মেছিলেন, এরা তেমনি গামা-রশ্মির প্রভাবে সহজাত প্রখর বুদ্ধি এবং ত্বরিত উন্নতির সম্ভাবনা নিয়ে ধরাতলে আবির্ভূত হল। এক বিষয়ে ইঁদুর

জাতি আগে থেকেই মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল—তাদের বংশবৃদ্ধি অতি দ্রুত। এখন এই শক্তি আরও বেড়ে গেল।

এই নবাগত অলাঙ্গুল দ্বিপাদচারী প্রতিভাবান প্রাণীদের ইঁদুর বলে অপমান করতে চাই না, তা ছাড়া বার বার চন্দ্রবিন্দু দিলে ছাপাখানার উপর জুলুম হবে। এদের মানুষ বলেই গণ্য করা উচিত মনে করি। আমাদের মতন প্রাচীন মানুষের সঙ্গে প্রভেদ বোঝাবার জন্য এই গামা-রশ্মির বরপুত্রগণকে 'গামানুষ' বলব।

এখন কিঞ্চিৎ জটিল তত্ত্বের অবতারণা করতে হচ্ছে। যাঁরা ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেন তাঁরা মোটামুটি পঁচিশ বৎসর মানুষের এক পুরুষ এই হিসাবে বংশ-পর্যায় গণনা করেন। অতএব ১৮০০০ বৎসরে ৭২০ পুরুষ। আমাদের ঊর্ধ্বতন ৭২০ নম্বর পুরুষ কেমন ছিলেন? নৃবিদ্যাবিশারদগণ বলেন, এঁরা পুরোপলীয় অর্থাৎ প্রাচীন উপল যুগের লোক, চাষ করতে শেখেন নি, কাপড় পরতেন না, রাঁধতেন না, কাঁচা মাংস খেতেন, গুহায় বাস করতেন। ভেবে দেখুন, মোটে ৭২০ পুরুষে আমাদের কি আশ্চর্য উন্নতি হয়েছে। আমাদের যেমন পঁচিশ বৎসরে, ইন্দুরোদ্ভব গামানুষদের তেমনি পনের দিনে এক পুরুষ, কারণ তারা জন্মাবার পনর দিন পরেই বংশরক্ষা করতে পারে। মানবজাতি ধ্বংস হবার পর যে ত্রিশ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে সেই সময়ে গামানুষ জাতির ৭২০ পুরুষ জন্মেছে। অর্থাৎ গা-মানুষের ত্রিশ বৎসর আমাদের ১৮০০০ বৎসরের সমান। যদি সন্দেহ থাকে তবে অঙ্ক কষে মিলিয়ে দেখতে পারেন।

এই সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরে গামানুষ অতি দ্রুত গতিতে সভ্যতার শীর্ষদেশে উপস্থিত হয়েছে। পূর্বমানব যে বিদ্যা কলা আর ঐশ্বর্যের অহংকার করত গামানুষ তার সমস্তই পেয়েছে। অবশ্য তাদের সকল শাখাই সমান সভ্য আর পরাক্রান্ত হয়নি, তাদের মধ্যেও জাতিভেদ, সাদা-কালার ভেদ, রাজনীতির ভেদ, ছোট বড় রাষ্ট্র, সাম্রাজ্য, পরাধীন প্রজা, দ্বেষ-হিংসা এবং বাণিজ্যিক প্রতিযোগ আছে, যুদ্ধবিগ্রহও বিস্তর ঘটেছে। বার বার মারাত্মক সংঘর্ষের পর বিভিন্ন দেশের দূরদর্শী গামানুষদের মাথায় এই সুবুদ্ধি এল—ঝগড়ার দরকার কি, আমরা সকলে একমত হয়ে কি শান্তিতে থাকতে পারি না? আমাদের বর্তমান সভ্যতার তুলনা নেই, আমরা বিশ্বের বহু রহস্য ভেদ করেছি, প্রচণ্ড প্রাকৃতিক শক্তিকে আয়ত্ত করে কাজে লাগিয়েছি, শারীরিক ও সামাজিক বহু ব্যাধির উচ্ছেদ করেছি, দর্শন ও নীতিশাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান লাভ করেছি। আমাদের রাষ্ট্রনেতা ও মহা মহা জ্ঞানীরা যদি একযোগে চেষ্টা করেন তবে বিভিন্ন জাতির স্বার্থবুদ্ধির সমন্বয় অবশ্যই হবে।

জনহিতৈষী পণ্ডিতগণের নির্বন্ধে রাষ্ট্রপতিগণ এক মহতী বিশ্বসভা আহ্বান করলেন। বিভিন্ন দেশ থেকে বড় বড় রাজনীতিক, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক প্রভৃতি মহা উৎসাহে সেই সভায় উপস্থিত হলেন, অনেক রবাহূত ব্যক্তিও তামাশা দেখতে এলেন। যাঁরা বক্তৃতা দিলেন, তাঁদের আসল নাম যদি গামানুষ ভাষায় ব্যক্ত করি তবে পাঠকদের অসুবিধা হতে পারে, সেজন্য কৃত্রিম নাম দিচ্ছি যা শুনতে ভাল এবং অনায়াসে উচ্চারণ করা যায়।

আমাদের দেশে হরেক রকম সভায় কার্যারম্ভের আগে সংগীতের এবং কার্যাবলীর মধ্যে মধ্যে কুমারী অমুক অমুকের নৃত্যের দস্তুর আছে। পরাক্রান্ত গামানুষ জাতির রসবোধ কম, তারা বলে, আগে ষোল আনা কাজ তারপর ফুর্তি। তাদের জীবনকালও কম সেজন্য বক্তৃতাদি অতি সংক্ষেপে চটপট শেষ করে। প্রথমেই সভাপতি মনস্বী চং লিং সকলকে

বুঝিয়ে দিলেন যে এই সভায় যে কোনও উপায়ে বিশ্বশান্তির ব্যবস্থা করতেই হবে, নতুবা গামানুষ জাতির নিস্তার নেই।

সভাপতির অভিভাষণের পর একটি অনতিসমৃদ্ধ রাষ্ট্রের প্রতিনিধি কাউণ্ট নটেনফ বললেন, জগতের সম্পদ মোটেই ন্যায়সম্মত পদ্ধতিতে ভাগ করা হয় নি সেই কারণেই বিশ্ব-শান্তি হচ্ছে না। দু-চারটি রাষ্ট্র অসৎ উপায়ে বড় বড় সাম্রাজ্য লাভ করে দেদার কাঁচা মাল আর আজ্ঞাবহ নিস্তেজ প্রজা হস্তগত করেছে, উপনিবেশও বিস্তর পেয়েছে। কিন্তু আমরা বঞ্চিত হয়েছি, আমাদের বাড়তে দেওয়া হচ্ছে না। যদি যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করতে হয় তবে বিশ্বসম্পত্তির আধাআধি বখরা আমাদের দিতে হবে।

বৃহত্তম সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি লর্ড গ্র্যাবার্থ বললেন, জগতের শান্তিরক্ষার জন্যই আমাদের জিম্মায় বিশাল সাম্রাজ্য থাকা প্রয়োজন, সাম্রাজ্য চালনার অভিজ্ঞতা আমাদের যত আছে তেমন আর কারও নেই। আমরা শক্তিমান হলে তোমরা সকলেই নিরাপদে থাকবে। কাঁচা মাল চাও তো উপযুক্ত শর্তে কিছু দিতে পারি। আমাদের হেফাজতে যেসব অসভ্য অর্ধসভ্য দেশ আছে তার উপর লোভ করো না, আমরা তো সেসব দেশবাসীর অছি মাত্র, তারা লায়েক হলেই ছেড়ে দিয়ে ভারমুক্ত হব। আমরা কারও অনিষ্ট করি না, বিপদ যদি ঘটে আমার বন্ধু কীপফ-এর প্রকাণ্ড দেশই তার জন্য দায়ী হবে। এঁর দেশে স্বাধীন শিল্প আর কারবার নেই, সবই রাষ্ট্রের অঙ্গ। যাঁরা সমাজে মস্তকস্বরূপ সেই অভিজাত আর ধনিক শ্রেণীই ওখানে নেই। এঁদের কুদৃষ্টান্তে আমাদের শ্রমজীবীরা বিগড়ে যাচ্ছে। দিনকতক পরেই দেখতে পাবেন এঁদের কদর্য নীতি আর সস্তা মালে জগৎ ছেয়ে যাবে, আমাদের সকলের সমাজ ধর্ম আর ব্যবসার সর্বনাশ হবে। যদি শান্তি চান তো আগে এঁদের শায়েস্তা করুন।

জেনারেল কীপফ তাঁর মোটা গোঁফে পাক দিয়ে বললেন, বন্ধুবর লর্ড গ্র্যাবার্থ প্রচণ্ড মিছে কথা বলেছেন তা আপনারা সকলেই বোঝেন। ওঁর রাষ্ট্রই আমাদের সকলকে দাবিয়ে রেখেছে, ওঁরা ঘুষ দিয়ে আমাদের দেশে বারবার বিপ্লব আনবার চেষ্টা করেছেন। এর শোধ একদিন তুলব, এখন বেশী কিছু বলতে চাই না।

পরাধীন দেশের জননেতা অবলদাসজী বললেন, লর্ড গ্র্যাবার্থ যে অছিগিরির দোহাই দিলেন তা নিছক ভণ্ডামি। আমরা লায়েক কি নালায়েক তার বিচারের ভার যদি ওঁরা নিজের হাতে রাখেন তবে কোনও কালেই আমাদের দাসত্ব ঘুচবে না। এই সভার একমাত্র কর্তব্য—সমস্ত সাম্রাজ্যের লোপসাধন এবং সর্বজাতির স্বাধীনতা স্বীকার। অধীন দেশই দ্বেষ-হিংসার কারণ।

মহাতপস্বী নিশ্চিন্ত মহারাজ চোখ বুজে বসে ছিলেন। এখন মৌন ভঙ্গ করে অবল-দাসের পিঠে সস্নেহে হাত বুলিয়ে বললেন, কোনও চিন্তা নেই বৎস, আমি আছি। আমার তপস্যার প্রভাবে তোমরা সকলেই যথাকালে শ্রেয়োলাভ করবে। গৌরীশঙ্কর-শিখরবাসী মহর্ষিদের সঙ্গে আমার হরদম চিন্তাবিনিময় হয়, তাঁরা সকলেই আমার সঙ্গে একমত।

কর্মযোগী ধর্মদাসজী বললেন, এসব বাজে কথায় কিছুই হবে না। আগে সকলের চরিত্র শোধন করতে হবে তবে রাষ্ট্রীয় সদ্‌বুদ্ধি আসবে। আমার ব্যবস্থা অতি সোজা—সকলে নিরামিষ খাও, সর্বপ্রকার বিলাসিতা বর্জন কর, এক মাস (মানুষের হিসাবে পঞ্চাশ বৎসর) নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচর্য পালন কর, এই সময়ের মধ্যে বুড়োরা আপনিই মরে যাবে, নূতন প্রজাও জন্মাবে না. তার ফলে জগতের জনসংখ্যা অর্ধেক হয়ে যাবে, খাদ্যাদি প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব থাকবে না। যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ মহামারী কিছুই দরকার হবে না, বিশুদ্ধ ধর্মসংগত উপায়ে সকলেরই প্রয়োজন মিটবে।

পণ্ডিত সত্যকামজী বললেন, আমি অনেক চিন্তা করে দেখেছি যুক্তিতর্কে বা অলৌকিক

উপায়ে কিছুই হবে না। নিরামিষ ভোজন, বিলাসিতা বর্জন আর ব্রহ্মচর্যও বৃথা, এসব উৎকট ব্যবস্থা আমাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ, আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা জোর করে চালানো যাবে না। আমাদের দরকার সত্যভাষণ। এই সভার সদস্যগণ যদি মনের কপাট খুলে অকপটচিত্তে নিজেদের মতলব প্রকাশ করেন তবে বিশ্বশান্তির উপায় সহজেই নির্ধারণ করা যেতে পারে। আমরা বিজ্ঞানে অশেষ উন্নতি লাভ করেছি কিন্তু গামানুষ চরিত্রের কিছুই করতে পারি নি। তার কারণ, বিজ্ঞানী যে পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষা করেন তাতে প্রতারণা নেই, জড়প্রকৃতি ঠকায় না, সেজন্য তথ্যনির্ণয় সুসাধ্য হয়। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রভুরা মিথ্যা ভিন্ন এক পা চলতে পারেন না। এঁদের গূঢ় অভিপ্রায় কি তা প্রকাশ করে না বললে শান্তির উপায় বেরুবে না। রোগের সব লক্ষণ না জানলে চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে কি করে?

লর্ড গ্র্যাবার্থ ওষ্ঠ কুঞ্চিত করে বললেন, কেউ যদি মনের কথা বলতে না চায় তবে কার সাধ্য তা টেনে বার করে। সত্য কথা বলাবেন কোন উপায়ে?

জেনারেল কীপফ বললেন, ওষুধ খাইয়ে। সোডিয়ম পেণ্টোথাল শুনেছেন? এর প্রভাবে সকলেই অবশ হয়ে সত্য কথা বলে ফেলে। আমাদের দেশে রাষ্ট্রদ্রোহীদের এই জিনিসটি খাইয়ে দোষ কবুল করানো হয়, তার পর পটাপট গুলি। আমরা মকদ্দমায় সময় নষ্ট করি না, উকিলকেও অনর্থক টাকা দিই না।

বিশ্ববিখ্যাত বিচক্ষণ বৃদ্ধ ডাক্তার ভৃঙ্গরাজ নন্দী বললেন, বোকা, বোকা, সব বোকা। পেণ্টোথালে লোকে জড়বুদ্ধি হয়। সত্য কথা বলে বটে, কিন্তু বিচারের ক্ষমতা লোপ পায়। আমরা এখানে নেশা করে আড্ডা দিতে আসি নি, জটিল বিশ্বরাজনীতিক সমস্যার সমাধান করতে এসেছি। পেণ্টোথালের কাজ নয়, আমার সদ্য আবিষ্কৃত ভেরাসিটিন ইনজেকশন দিতে হবে। গাঁজা থেকে উৎপন্ন, অতি নিরীহ বস্তু, কিন্তু অব্যর্থ। যতই ঝানু কূটবুদ্ধি হন না কেন, ঘাড় ধরে আপনাকে সত্য বলাবে, অথচ বুদ্ধির কিছুমাত্র হানি করবে না। স্থায়ী অনিষ্টেরও ভয় নেই, এক ঘণ্টা পরে প্রভাব কেটে যাবে, তার পর যত খুশি মিথ্যা বলতে পারবেন। ওষুধটি আমার সঙ্গেই আছে, সভাপতি মশায় যদি আদেশ দেন তবে সকলকেই এক মুহূর্তে সত্যবাদী করে দিতে পারি।

কাউণ্ট নটেনফ প্রশ্ন করলেন, পরীক্ষা হয়েছে?

ভৃঙ্গরাজ উত্তর দিলেন, হয়েছে বইকি। বিস্তর ইঁদুর আর গিনিপিগের উপর পরীক্ষা করেছি।

জেনারেল কীপফ অট্টহাস্য করে বললেন, ইঁদুরের আবার সত্য মিথ্যা আছে নাকি? আপনি তাদের ভাষা জানেন?

নন্দী বললেন, নিশ্চয় জানি, তাদের ভঙ্গী দেখে বুঝতে পারি। যদি বাঁয়ে ল্যাজ নাড়ে তবে জানবেন মতলব ভাল নয়, উদ্দেশ্য গোপন করছে। যদি ডাইনে নাড়ে তবে বুঝবেন তার মনে কোন ছল নেই। তা ছাড়া আমার এক শিষ্যের উপর পরীক্ষা করেছি, তার ফলে বেচারার পত্নী বিবাহভঙ্গের মামলা এনেছে।

সভাপতি চং লিং বললেন, সন্দেহ রাখবার দরকার কি, এইখানেই পরীক্ষা হ'ক না। কে ভলাণ্টিয়ার হতে চান—বিজ্ঞানপ্রেমী কে আছেন—এগিয়ে আসুন।

ধর্মদাসজী ডাক্তার নন্দীর কাছে এসে হাত বাড়িয়ে বললেন, আমি রাজী আছি, দিন ইনজেকশন।

নন্দী তখনই পকেট থেকে প্রকাণ্ড একটি ম্যাগাজিন-সিরিঞ্জ বার করে ধর্মদাসের হাতে ফুঁড়ে পনর ফোঁটা আন্দাজ চালিয়ে দিলেন। ওষুধের ক্রিয়ার জন্য দু মিনিট সময় দিয়ে সভাপতি বললেন, ধর্মদাসজী, এইবারে আপনার মনের কথা খুলে বলুন।

ধর্মদাস বললেন, নিরামিষ ভোজন, খাদ্যে মসলা বর্জন, সর্ব বিষয়ে অবিলাসিতা আর নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচর্য। তবে আমিও মাঝে মাঝে আদর্শচ্যুত হয়েছি।

জেনারেল কীপফ সহাস্যে বললেন, এসব পাগলদের উপর পরীক্ষা করা বৃথা, এরা স্বাভাবিক অবস্থাতেও বেশী মিথ্যে বলে না, যা বিশ্বাস করে তাই প্রচার করে। আসুন, আমাকেই ইনজেকশন দিন, সত্য মিথ্যা কিছুতেই আমার আপত্তি নেই।

লর্ড গ্র্যাবার্থ অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে কীপফের হাত ধরে বললেন, করেন কি, ক্ষান্ত হন, এসব বিশ্রী ব্যাপারে থাকবেন না। যার আত্মসম্মানবোধ আছে সে কখনও এতে রাজী হতে পারে? অভিপ্রায় গোপনে আমাদের বিধিদত্ত অধিকার, একটা হাতুড়ে ডাক্তারের পাল্লায় পড়ে তা ছেড়ে দিতে পারি না। স্থূল মিথ্যা অতি বর্বর জিনিস তা স্বীকার করি, কিন্তু সূক্ষ্ম মিথ্যা অতি মহামূল্য অস্ত্র, তাগ করে লাগাতে পারলে জগৎ জয় করা যায়, তা আমরা কিছুতেই ছাড়তে পারি না। পরিমার্জিত মিথ্যাই সভ্যসমাজের আশ্রয় আর আচ্ছাদন, সমস্ত লোকাচার আর রাজনীতি তার উপর প্রতিষ্ঠিত। আপনার লজ্জা নেই? এই সভার মধ্যে উলঙ্গ হওয়া যা মনের কথা প্রকাশ করাও তা।

জেনারেল কীপফ নিরস্ত হলেন না, গ্র্যাবার্থের মুঠো থেকে নিজের হাত সজোরে টেনে বাড়িয়ে দিলেন, ডাক্তার নন্দীও তৎক্ষণাৎ সূচীপ্রয়োগ করলেন। তার পর কীপফ দুই হাতে গ্র্যাবার্থকে জাপটে ধরে বললেন, শীগ্‌গির, এঁকেও ফুঁড়ে দিন, একটু বেশী করে দেবেন। ডাক্তার ভৃঙ্গরাজ নন্দী ডবল মাত্রা ভেরাসিটিন চালিয়ে দিলেন। কীপফের স্থূল লোমশ বাহুর বন্ধনে ছটফট করতে করতে গ্র্যাবার্থ বললেন, একি অত্যাচার! আপনারা সমস্ত আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করেছেন। সভাপতি মশায়, আপনি একেবারে অকর্মণ্য। উঠুন, এখনই আমার রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীর কাছে টেলিফোন করুন।

কীপফ বললেন, বড় বেয়াড়া পেশেণ্ট, হাড়ে হাড়ে রোগ ঢুকেছে, লাগান আরও দুই ডোজ। ডাক্তার নন্দী বিনা বাক্যব্যয়ে আর একবার ফুঁড়ে দিলেন। তারপর গ্র্যাবার্থ ক্রমশ শান্ত হয়ে মৃদুস্বরে বললেন, শুধু আমাদের দুজনকে কেন? ওই বজ্জাত গুণ্ডা নটেনফ-টাকেও দিন।

নটেনফ ঘুঁষি তুলে গ্র্যাবার্থকে আক্রমণ করতে এলেন। কীপফ তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন, থামুন থামুন, সত্য বলতে এত ভয় কিসের? আমরা সকলেই তো পরস্পরের অভি-সন্ধি বুঝি, খোলসা করে বললে কি এমন ক্ষতি হবে?

নটেনফ চুপি চুপি বললেন, আরে, তোমাদের আমি গ্রাহ্য করি নাকি? আমার আপত্তির কারণ আলাদা। আন্তর্জাতিক অশান্তির চেয়ে পারিবারিক অশান্তি আরও ভয়ানক।

এমন সময় দর্শকদের গ্যালারি থেকে কাউণ্টেস নটেনফ তারস্বরে বললেন, দিন জোর করে ফুঁড়ে, কাউণ্ট অতি মিথ্যাবাদী, চিরকাল আমাকে ঠকিয়েছে।

এই হট্টগোলের সুযোগে ডাক্তার নন্দী হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এসে নটেনফের নিতম্বে ভেরাসিটিন প্রয়োগ করলেন। নটেনফপত্নী চিৎকার করে বললেন, এইবার কবুল কর তোমার প্রণয়িনী কে কে।

সভাপতি চং লিং বললেন, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, প্রণয়িনীরা পালিয়ে যাবে না, এখন আমাদের কাজ করতে দিন। লর্ড গ্র্যাবার্থ, কাউণ্ট নটেনফ, জেনারেল কীপফ, এখন একে একে খুলে বলুন আপনাদের রাজনীতিক উদ্দেশ্য কি।

গ্র্যাবার্থ বললেন, আমাদের উদ্দেশ্য অতি সোজা, জোর যার মুলুক তার এই হচ্ছে একমাত্র রাজনীতি। পরহিতৈষিতা আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বেশ, কিন্তু আন্তর্জাতিক ব্যাপারে তার স্থান নেই। আমরা সভ্য অসভ্য শক্তিমান দুর্বল সকল জাতির কাছ থেকে যথাসাধ্য

আদায় করতে চাই, এতে ন্যায়-অন্যায়ের কথা আসে না। দুধ খাবার সময় বাছুরের দুঃখ কে ভাবে? যখন মাংসের জন্য বা অন্য প্রয়োজনে গরু ভেড়া বাঘ সাপ ইঁদুর মশা মারেন তখন জীবের স্বার্থ গ্রাহ্য করেন কি? উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে, অহিংস হ'য়ে পাথর খেয়ে বাঁচতে পারেন কি? আমরা সর্বপ্রকার সুখভোগ করতে চাই, তার জন্য সর্বপ্রকার দুষ্কর্ম করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমাদের নিরঙ্কুশ হবার উপায় নেই, শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী আছে, নিজের স্বভাবগত কোমলতা আছে—যাকে মূর্খরা বলে বিবেক বা ধর্মজ্ঞান। তা ছাড়া স্বজাতি আর মিত্রস্থানীয় বিজাতির মধ্যে জনকতক দুর্বলচিত্ত ধর্মিষ্ঠ আছে, তাদের সব সময় ধাপ্পা দেওয়া চলে না, ঠাণ্ডা রাখবার জন্য মাঝে মাঝে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। এই সভার যা উদ্দেশ্য তা কোনও কালে সিদ্ধ হবে না। প্রতিপক্ষের ভয়ে বাধ্য হয়ে মাঝে মাঝে যৎকিঞ্চিৎ স্বার্থত্যাগ করতে পারি, কিন্তু পাকা ব্যবস্থায় রাজী নই, আজ যা ছাড়ব সুবিধা পেলেই কাল আবার দখল করব। অভিব্যক্তিবাদ তো আপনারা জানেন, বেশী কিছু বলবার দরকার নেই।

নটেনফ বললেন, আমাদের নীতিও ঠিক ওই রকম। কর্মপদ্ধতির অল্প অল্প ভেদ আছে, কিন্তু মতলব একই। আমরা জাত্যংশে সর্বশ্রেষ্ঠ, জগতের একাধিপত্য একদিন আমাদের হাতে আসবেই, ছলে বলে কৌশলে যেমন করে হ'ক আমরা মনস্কামনা সিদ্ধ করব।

কীপফ বললেন, আমরাও তাই বলি, তবে আপনাদের আর আমাদের পদ্ধতিতে বিলক্ষণ প্রভেদ আছে। ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশটি প্রকাণ্ড, এখনও অন্য দেশকে শোষণ করবার বিশেষ দরকার হয় নি, তবে ভবিষ্যৎ ভেবে আমরা এখন থেকেই হাত পাকাচ্ছি।

অবলদাসজী মাথাচাপড়ে বললেন, হায় হায়, এর চেয়ে মিথ্যা কথাই যে ভাল ছিল! তবু একটা আশা ছিল যে এরা এখন ক্ষমতার দম্ভে বুঝতে পারছে না, পরে হয়তো এদের ন্যায়বুদ্ধি জাগ্রত হবে। আচ্ছা লর্ড গ্র্যাবার্থ, একটা প্রশ্নের উত্তর দিন। আমরা অধীন জাতিরা একটু একটু করে শক্তিমান হচ্ছি। আপনারা যাই বলুন, জগতে সকল দেশে এখনও সাধু লোক আছেন, তাঁরা আমাদের সহায়। আমরা একদিন বন্ধনমুক্ত হবই। আমাদের মনে যে বিদ্বেষ জমছে তার ফলে ভবিষ্যতে আপনাদের কি সর্বনাশ হবে তা বুঝছেন? আমাদের সংগে যদি এখনই একটা ন্যায়সংগত চুক্তি করেন এবং তার জন্য অনেকটা ত্যাগ স্বীকার করেন তবে ভবিষ্যতে আমরা আপনাদের একেবারে বঞ্চিত করব না। এই সহজ সত্যটা আপনাদের মাথায় ঢোকে না কেন?

গ্র্যাবার্থ বললেন, অবশ্যই ঢোকে। কিন্তু সুদূর ভবিষ্যতে এক আনা পাব সেই আশায় উপস্থিত ষোল আনা কেন ছাড়ব? আমাদের অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্রের জন্য মাথাব্যথা নেই।

অবলদাস দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বসে পড়লেন। নিশ্চিন্ত মহারাজ আর একবার তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, ভয় কি, আমি আছি।

ধর্মদাস বললেন, ইনজেকশন দিয়ে কি ভাল হল? সবই তো আমাদের জানা কথা। আমাদের শাস্ত্রে অসুরপ্রকৃতির লক্ষণ দেওয়া আছে—

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোহহমহং ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান্ সুখী ॥
আঢ্যোহভিজনবানস্মি কোহন্যোহস্তি সদৃশো ময়া।

—আজ আমার এই লাভ হল, এই অভীষ্ট বিষয় পাব, এই আমার আছে, আবার এই ধনও আমার হবে। ওই শত্রু আমি হত্যা করেছি, অপর শত্রুদেরও হত্যা করব। আমি ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি যা করি তাই সফল হয়, আমি বলবান, আমি সুখী। আমি অভিজাত, আমার সদৃশ আর কে আছে।

সভাপতি সকলের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, বড় বড় রাষ্ট্রনেতাদের মতলব তো জানা গেল. এখন শান্তির উপায় আলোচনা করুন।

গ্র্যাবার্থ নটেনফ কীপফ সমস্বরে বললেন, আমরা বেশ আছি, শান্তি টান্তি বাজে কথা, আমরা নখদন্তহীন ভালমানুষ হতে চাই না, পরস্পর কাড়াকাড়ি মারামারি করে মহানন্দে জীবনযাপন করতে চাই।

এই সভার একজন সদস্য এতক্ষণ পিছন দিকে চুপচাপ ব'সে ছিলেন, ইনি আচার্য ব্যোমবজ্র দর্শন-বিজ্ঞানশাস্ত্রী, এক দিস্তা ফুলস্ক্যাপে এঁর সমস্ত উপাধি কুলয় না। এখন ইনি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, বিশ্বশান্তির উপায় আমি আবিষ্কার করেছি।

ডাক্তার ভৃঙ্গরাজ নন্দী বললেন, আপনারও একটা ইনজেকশন আছে নাকি?

ব্যোমবজ্র উত্তর দিলেন, পৃথিবীর কোটি কোটি লোককে ইনজেকশন দেওয়া অসম্ভব। প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে আমার আবিষ্কৃত বিশ্বব্যাপক শান্তিস্থাপক বোমা, তার প্রভাবে সর্বত্র শান্তি বিরাজ করবে। এই বোমা থেকে যে আকস্মিক রশ্মি নির্গত হয় তা কস্মিক রশ্মির চেয়ে হাজার গুণ সূক্ষ্ম। তার স্পর্শে চিত্তশুদ্ধি, কাম ক্রোধ লোভাদির উচ্ছেদ এবং আত্মার বন্ধনমুক্তি হয়।

গ্র্যাবার্থ ধমক দিয়ে বললেন, খবরদার, এখানে কোনও রহস্য প্রকাশ করবেন না। আমাদের টাকায় আপনি গবেষণা করেছেন। আপনার যা বলবার আমাদের প্রধান মন্ত্রীকে গোপনে বলবেন।

নটেনফ লাফিয়ে উঠে বললেন, বাঃ, আমরাই তো ওঁর সমস্ত খরচ জুগিয়েছি! বোমা আমাদের।

কীপফ বললেন, আপনারা ড্যাম মিথ্যাবাদী। আমাদের রাষ্ট্র বহুদিন থেকে ওঁকে সাহায্য করে আসছে, ওঁর আবিষ্কার একমাত্র আমাদের সম্পত্তি।

ব্যোমবজ্র দুই হাতে বরাভয় দেখিয়ে বললেন, আপনারা ব্যস্ত হবেন না, আমার বোমায় আপনাদের সকলেরই স্বত্ব আছে, আপনারা সকলেই উপকৃত হবেন। অবলদাসজী, আপনাদেরও দলাদলি আর সকল দুর্দশা দূর হবে। এই বলে তিনি একটি ছোট বোঁচকা খুলতে লাগলেন।

সভায় তুমুল গোলযোগ শুরু হল, গ্র্যাবার্থ নটেনফ কীপফ এবং অন্যান্য সমস্ত রাষ্ট্রপ্রতিনিধি বোঁচকাটি দখল করবার জন্য পরস্পরের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে লাগলেন।

ধর্মদাস বললেন, ব্যোমবজ্রজী, আর দেরি করছেন কেন, ছাড়ুন না আপনার বোমা।

ব্যোমবজ্রকে কিছু করতে হল না, সদস্যদের টানাটানিতে বোমাটি তাঁর হাত থেকে পড়ে গিয়ে ভুঁইপটকার মতন ফেটে গেল। কোনও আওয়াজ কানে এল না, কোনও ঝলকানি চোখে লাগল না, শব্দ আর আলোকের তরঙ্গ ইন্দ্রিয়দ্বারে পৌঁছবার আগেই সমগ্র গামানুষ জাতির ইন্দ্রিয়ানুভূতি লুপ্ত হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে থাকবার পর গ্র্যাবার্থ বললেন, শাস্ত্রীর বোমাটি ভাল, মনে হচ্ছে আমরা সবাই সাম্য মৈত্রী আর স্বাধীনতা পেয়ে গেছি। নটেনফ, কীপফ তোমাদের আমি বড্ড

ভালবাসি হে। অবলদাস, তোমরাও আমার পরমাত্মীয়। একটা নতুন ইণ্টারন্যাশনাল অ্যানথেম রচনা করেছি শোন—ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই। এস, এখন একটু কোলাকুলি করা যাক।

নিশ্চিন্ত মহারাজ অবলদাসের পিঠ চাপড়ে সগর্বে বললেন, হুঁ হুঁ, আমি বলেছিলাম কিনা?

সভায় বিজয়াদশমী আর ঈদ মুবারকের ভ্রাতৃভাব উথলে উঠল। খানিক পরে নটেনফ বললেন, আসুন দাদা, এখন বিশ্বের কয়লা তেল গম গরু ভেড়া শুয়োর তুলো চিনি রবার লোহা সোনা ইউরেনিয়ম প্রভৃতির একটা বাটোয়ারা হক। জন-পিছু সমান হিস্‌সা, কি বলেন?

ব্যোমবজ্র সহাস্যে বললেন, কোনও দরকার হবে না, আপনারা সকলেই নশ্বর দেহ থেকে মুক্তি পেয়ে নিরালম্ব বায়ুভূত হয়ে গেছেন। এখন নরকে যেতে পারেন, বা আবার জন্মাতে পারেন বা একদম উবে যেতে পারেন, যার যেমন অভিরুচি।

কীপফ বললেন, আপনি কি বলতে চান আমরা মরে ভূত হয়ে গেছি? আমি ভূত মানি না।

ব্যোমবজ্র বললেন, নাই বা মানলেন, তাতে অন্য ভূতদের কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না।

মৃতবৎসা বসুন্ধরা একটু জিরিয়ে নেবেন তার পর আবার সসত্ত্বা হবেন। দুরাত্মা আর অকর্মণ্য সন্তানের বিলোপে তাঁর দুঃখ নেই। কাল নিরবধি, পৃথিবীও বিপুলা। তিনি অলসগমনা, দশ-বিশ লক্ষ বৎসরে তাঁর ধৈর্যচ্যুতি হবে না, সুপ্রজাবতী হবার আশায় তিনি বার বার গর্ভধারণ করবেন।

১৩৫২ (১৯৪৫)

অটলবাবুর অন্তিম চিন্তা

শয্যাশায়ী অটল চৌধুরী বললেন, দেখ ডাক্তার, আমি তোমার ঠাকুরদার চেয়েও বয়সে বড়, আমাকে ঠকিও না। মুখ খুলে বল মেজর হালদার কি বলে গেলেন। আর কতক্ষণ বাঁচব?

ডাক্তারবাবু বললেন, কেন সার আপনি ও কথা বলছেন, মরণ-বাঁচন কি মানুষের হাতে? আমরা কতটুকুই বা জানি। ভগবানের যদি দয়া হয় তবে আপনি আরও অনেক দিন বাঁচবেন।

—বাঁচিয়ে রাখাই কি দয়ার লক্ষণ? তোমাদের কাজ শেষ হয়েছে আর জ্বালিও না। এখন ডাক্তারী ধাপ্পাবাজি ছেড়ে দিয়ে সত্যি কথা বল। মরবার আগে আমি মনে মনে একটা বোঝাপড়া করতে চাই।

—বেশ তো, এখনই করুন না, দু-দশ বছর আগে করলেই বা দোষ কি।

—তুমি ডাক্তারিই শিখেছ, বিজনেস শেখ নি। আরে, বছর শেষ না হলে কি সাল-তামামী হিসেব-নিকেশ করা যায়? ঠিক মরবার আগেই জীবনের লাভ-লোকশান খতাতে চাই—অবশ্য যদি জ্ঞান থাকে।

এমন সময় পুরুত ঠাকুর হরিপদ ভটচাজ এসে বললেন, কর্তাবাবু, প্রায়শ্চিত্তটা হয়ে থাক, মনে শান্তি পাবেন।

—কেন বাপু, আমি কি মানুষ খুন করেছি, না পরস্ত্রী হরণ করেছি, না চুরি-ডাকাতি জাল-জুয়াচুরি আর মাদুলির ব্যবসা করেছি?

হরিপদ জিব কেটে বললেন, ছি ছি, আপনার মতন সাধুপুরুষ কজন আছেন? তবে কিনা সকলেরই অজ্ঞানকৃত পাপ কিছু কিছু থাকে, তার জন্যই প্রায়শ্চিত্ত।

—দেখ ভটচাজ, আমি ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির নই, ভদ্রলোকের যতটুকু দুষ্কর্ম না করলে চলে না ততটুকু করেছি। তার জন্য আমার কিছুমাত্র খেদ নেই, নরকের ভয়ও নেই। তবে প্রায়শ্চিত্ত করলে তোমরা যদি মনে শান্তি পাও তো করতে পার। কিন্তু এখানে নয়, নীচে পুজোর দালানে কর গিয়ে। ঘণ্টার আওয়াজ যেন না আসে।

হরিপদ 'যে আজ্ঞে' বলে চলে গেলেন। মনে মনে ভাবলেন, ওঃ কি পাষণ্ড! মরতে বসেছে তবু ধর্মে মতি হল না।

অটলবাবুর পৌত্রী রাধারানী এসে বললে, দাদাবাবু, বৃন্দাবন বাবাজী তাঁর কীর্তনের দল নিয়ে এসেছেন। মা জিজ্ঞাসা করলে, তুমি একটু নাম শুনবে কি?

—খবরদার। আমি এখন নিরিবিলিতে থাকতে চাই, চেঁচামেচি ভাল লাগে না। শ্রাদ্ধের দিন যত খুশি কীর্তন শুনিস—শীতল বাতাস ভাল লাগে না সখী, আমার বুকের পাঁজর ঝাঁজর হল—যত সব ন্যাকামি।

রাধারানী ঠোঁট বেঁকিয়ে চলে গেল। ডাক্তার বললেন, সার, আপনি বড় বেশী কথা বলছেন। রাত হয়েছে, এখন চুপ করে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন।

—বেশী কথা তোমরাই বলছ। আর দেরি ক'র না, যা জিজ্ঞাসা করেছি তার স্পষ্ট উত্তর দাও।

ডাক্তার তাঁর স্টেথোস্কোপের নল চটকাতে চটকাতে বললেন, দু-চার ঘণ্টা হতে পারে, দু-চার দিনও হতে পারে, ঠিক বলা অসম্ভব। ইনজেকশনটা দিয়ে দি, আপনি অক্সিজেন শুঁকতে থাকুন, কষ্ট কমবে।

যথাকর্তব্য করে ডাক্তার অটলবাবুর বিধবা পুত্রবধূকে বললেন, হুঁশিয়ার হয়ে থাকতে হবে, আজ রাত বোধ হয় কাটবে না। নার্স ওঁর ঘরে থাকুক, আমি এই পাশের ঘরে রইলুম।

অটলবাবু অত্যন্ত হিসাবী লোক, আজীবন নানারকম কারবার করেছেন। তাঁর বয়স আশি পেরিয়েছে, শরীর রোগে অবসন্ন, কিন্তু বুদ্ধি ঠিক আছে। মরণ আসন্ন জেনে তিনি মনে মনে ইহলোকের ব্যালান্স-শীট এবং পরলোকের একটা আন্দাজী প্রসপেকটস খাড়া করবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

অটলবাবুর মনে পড়ল, বহুকাল পূর্বে কলেজে পড়বার সময় মৃচ্ছকটিকের একটি শ্লোক তাঁর ভাল লেগেছিল।

সুখং হি দুঃখান্যনুভূয় শোভতে
ঘনান্ধকারেষ্বিব দীপদর্শনম্।
সুখাত্তু যো যাতি নরো দরিদ্রতাং
ধৃতঃ শরীরেণ মৃতঃ স জীবতি ॥

—দুঃখ অনুভবের পরই সুখ শোভা পায়, যেমন ঘোর অন্ধকারে দীপদর্শন। কিন্তু যে লোক সুখভোগের পর দরিদ্রতা পায় সে শরীর ধারণ করে মৃতের ন্যায় জীবিত থাকে।

অটলবাবু ভাবলেন, ভুল, মস্ত ভুল। তিনি প্রথম ও মধ্য জীবনে বিস্তর সুখভোগ করেছেন, কিন্তু শেষ বয়সে অনেক দুঃখ পেয়েছেন। তাঁকে স্ত্রীপুত্রাদি আত্মীয়বিয়োগের শোক এবং ব্যবসায়ে বড় রকম লোকসান সইতে হয়েছে, সর্বস্বান্ত না হলেও তিনি আগের তুলনায় দরিদ্র হয়েছেন। বয়স যত বাড়ে সময় ততই ছোট হয়ে যায়; অন্তিম কালে অটলবাবুর মনে হচ্ছে তাঁর সমস্ত জীবন মুহূর্তমাত্র, সমস্ত সুখ দুঃখ তিনি এক সঙ্গেই ভোগ করেছেন এবং সবই এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সুখভোগের পর দুঃখ পেয়েছেন—শুধু এই কারণেই সুখের চেয়ে দুঃখকে বড় মনে করবেন কেন? জীবনের খাতায় লাভ-লোকসান দুইই পাকা কালিতে লেখা রয়েছে, তাতে দেখা যায় তাঁর খরচের তুলনায় জমাই বেশী, মোটের উপর তিনি বঞ্চিত হন নি। অন্য লোকে যাই বলুক, তিনি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতে পারেন।

কিন্তু একটা খটকা দেখা যাচ্ছে। তিনি নিজে ভাগ্যবান হলেও যারা তাঁর অত্যন্ত প্রিয়জন ছিল তারা হতভাগ্য, অনেকে বহু দুঃখ পেয়ে অকালে মরেছে। তাদের দুঃখ অটলবাবু নিজের বলেই মনে করেন এবং তা লোকসানের দিকে ফেললে লাভের অঙ্ক খুব কমে যায়। শুধু তাই নয়, অন্যান্য যে সব লোককে তিনি আজীবন আশেপাশে দেখছেন তাদেরও অনেকে কষ্ট ভোগ করেছে। পূর্বে তাদের কথা তিনি ভাবেন নি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তারাও নিতান্ত আপনজন। তাদের দুঃখও যদি নিজের বলে ধরেন তবে জমাখরচ কষলে লোকসানই দেখা যায়।

অটলবাবু স্থির করতে পারলেন না তিনি জীবনে মোটের উপর সুখ বেশী পেয়েছেন কি দুঃখ বেশী পেয়েছেন। তিনি যদি ভক্ত হতেন তবে বলতে পারতেন—'ধন্য হরি রাজ্যপাটে,

ধন্য হরি শ্মশানঘাটে'। ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যই করেন—এই খ্রীষ্টানী প্রবোধবাক্যে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন নি। অটলবাবু শুনেছেন, যিনি পরমহংস তিনি সমস্ত জীবের সুখদুঃখ নিজের বলেই মনে করেন; সুখ আর দুঃখে কাটাকাটি হয়ে যায়, তার ফলে তিনি সুখীও হন না দুঃখীও হন না। কিন্তু অটলবাবু পরমহংস নন, তা ছাড়া তিনি জগতে সুখের চেয়ে দুঃখই বেশী দেখতে পান। তিনি যদি দুঃখের দিকে পিছন ফিরে জীবন উপভোগ করতে পারতেন তবে রবীন্দ্রনাথের মতন বলতে পারতেন—

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি—
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি
এই মহামন্ত্রখানি
চরিতার্থ জীবনের বাণী।
দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের যা-কিছু উপহার
মধুরসে ক্ষয় নাই তার।
তাই এই মন্ত্রবাণী মৃত্যুর শেষের প্রান্তে বাজে—
সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনন্তের আনন্দে বিরাজে।

আরও বলতে পারতেন—

আমি কবি তর্ক নাহি জানি,
এ বিশ্বেরে দেখি তার সমগ্র স্বরূপে—
লক্ষ কোটি গ্রহ তারা আকাশে আকাশে
বহন করিয়া চলে প্রকাণ্ড সুষমা,
ছন্দ নাহি ভাঙে তার সুর নাহি বাধে,
বিকৃতি না ঘটায় স্খলন...

ভাগ্যদোষে অটলবাবু ভক্ত নন, কবি নন, ভাবুক নন, দার্শনিক নন, সরল বিশ্বাসীও নন। তিনি নানা বিষয়ে ঠোকর মেরেছেন কিন্তু কিছুই আয়ত্ত করতে পারেন নি। আজীবন সংশয়ে কাটিয়েছেন কিন্তু কোনও বিষয়েই নিষ্ঠা রাখতে পারেন নি। তাঁর মূলধন কি তাই তিনি জানেন না, লাভ-লোকসান খতাবেন কি করে? শুধু এইটুকুই বলতে পারেন—অনেকের তুলনায় তিনি ভাগ্যবান, অনেকের তুলনায় তিনি হতভাগ্য। এ সম্বন্ধে আর তিনি বৃথা মাথা ঘামাবেন না, জ্ঞান থাকতে থাকতে তাঁর ভবিষ্যৎটা একটু আন্দাজ করার চেষ্টা করবেন। তাঁর আর বাঁচবার ইচ্ছা নেই। তিনি মরলে কারও আর্থিক ক্ষতি বা মানসিক দুঃখ হবে না, যে অল্প আয় আছে তা বন্ধ হবে না, বরং ইনশিওরান্সের একটা মোটা টাকা ঘরে আসবে। তিনি এখন আত্মীয়দের গলগ্রহ মাত্র, তারা বোধ হয় মনে মনে তাঁর মরণ কামনা করে।

অটলবাবু কি আবার জন্মাবেন? তাঁর গতজন্মের কথা কিছুই মনে নেই। জাতিস্মর লোকের বিবরণ মাঝে মাঝে খবরের কাগজে পাওয়া যায়, কিন্তু তা মোটেই বিশ্বাস্য নয়। মালবীয়জীর যখন কায়কল্প চিকিৎসা চলছিল তখন এক বিখ্যাত সংবাদপত্রের নিজস্ব সংবাদদাতা খবর পাঠাচ্ছিলেন—পণ্ডিতজীর পাকা চুল সমস্ত কাল হয়ে গেছে, নূতন দাঁতও

উঠছে। নির্জলা মিথ্যা কথা লিখতে এ'দের বাধে না। যদি পুনর্জন্মের কথা মনে না থাকে তবে এক জন্মের রামবাবুই যে অন্য জন্মে শ্যামবাবু হয়েছেন তার প্রমাণ কি? তার পর স্বর্গ মর্ত্য। তিনি এক পাদ্রির কাছে শুনেছিলেন, যিশু খ্রীষ্টের শরণ নিলে অনন্ত স্বর্গ, না নিলে অনন্ত নরক। এ রকম ছেলেমানুষী কথায় ভুলবেন অটলবাবু এমন বোকা নন। আমাদের পুরাণে আছে, যার পাপ অল্প সে আগে অল্পকাল নরকভোগ করে, তার পর দীর্ঘকাল স্বর্গভোগ করে, পুণ্যক্ষয় হলে আবার জন্মায়। যার পুণ্য অল্প সে অল্পকাল স্বর্গবাসের পর দীর্ঘকাল নরকবাস করে, তার পর আবার জন্মায়। এই মত খ্রীষ্টানী মতের চেয়ে ভাল, কিন্তু মানুষের পাপ-পুণ্য মাপা হবে কী করে? পাপ-পুণ্য তো যুগে যুগে বদলাচ্ছে। পঞ্চাশ-ষাট বৎসর আগে মুরগি খেলে পাপ হত, এখন আর হয় না। পুরাকালের হিন্দুরা অন্যান্য নিষিদ্ধ মাংসও খেত, ভবিষ্যতে আবার খাবে তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সবাই বলে নরহত্যা মহাপাপ, কিন্তু এই সেদিন শান্ত শিষ্ট ভদ্রলোকের ছেলেরাও বেপরোয়া খুন করেছে, বুড়োরা উৎসাহ দিয়ে বলেছে—এ হল আপদ্‌ধর্ম, সাপ মারলে পাপ হয় না, কে ঢোঁড়া কে কেউটে তা চেনবার দরকার নেই। পাপ-পুণ্যের যখন স্থিরতা নেই তখন স্বর্গনরক অবিশ্বাস্য।

তবে কি অটলবাবু স্পিরিচুয়ালিস্টদের পরলোকে যাবেন—যা স্বর্গও নয় নরকও নয়? আজকাল ইওরোপ-আমেরিকার বৃত্তান্তের মতন পরলোকের বৃত্তান্তও অনেক ছাপা হচ্ছে। দুর্বলচিত্ত লোকে বিপদে পড়লে যেমন কবচ-মাদুলি ধারণ করে, জ্যোতিষী বা গুরুর শরণাপন্ন হয়, তেমনি শান্তির প্রত্যাশায় পরলোকের কথা পড়ে। অনেক বৎসর পূর্বে অটলবাবু একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিলেন, এখন তা মনে পড়ে গেল।—তিনি বিদেশে এক বন্ধুর বাড়ি অতিথি হয়েছেন। রাত্রিতে আহারের পর তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ঘরে শুতে যাবার সময় দেখলেন, পাশে একটি তালা-লাগানো ঘর আছে। শোবার কিছুক্ষণ পরে শুনতে পেলেন, পাশের ঘরের তালা খোলা হল, আবার বন্ধ করা হল। তারপর অটলবাবু ঘুমিয়ে পড়লেন। একটু পরেই গোলমালে ঘুম ভেঙে গেল, পাশের ঘরে যেন হাতাহাতি মারামারি চলছে। অনেক রাত পর্যন্ত এই রকম চলল, অটলবাবু ঘুমুতে পারলেন না। পরদিন বাড়ির কর্তা তাঁকে বললেন, আপনার নিদ্রার ব্যাঘাত হয়েছে তার জন্য আমি বড় দুঃখিত। ব্যাপার কি জানেন—আমার একটি ছেলে অল্প বয়সে মারা যায়, তার গর্ভধারিণী রোজ রাত্রে থালায় ভরতি করে তার জন্য ওই ঘরে খাবার রাখেন। কিন্তু ছেলে খেতে পায় না, তার পূর্বপুরুষরা দল বেঁধে এসে খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি করেন।

এই স্বপ্নের কথা মনে পড়ার পর অটলবাবু একটি বিভীষিকা দেখলেন। মনে হ'ল তাঁর বাবা বলছেন, অটুলা, প্রণাম কর, এই ইনি তোর পিতামহ, ইনি প্রপিতামহ, ইনি বৃদ্ধ প্রপিতামহ, ইনি অতিবৃদ্ধ—ইত্যাদি ইত্যাদি। অটলবাবু দেখলেন, তাঁর বংশের অসংখ্য ঊর্ধ্বতন স্ত্রীপুরুষ প্রণাম নেবার জন্য সামনে কিউ করে দাঁড়িয়ে আছেন। ওই তাঁর পাঁচ নম্বর পূর্বপুরুষ—প্রবলপ্রতাপ জমিদার, মাথায় টিকি, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, গলায় রুদ্রাক্ষ কাঁধে পইতের গোছা, পায়ে খড়ম—দেখলেই বোধ হয় ব্যাটা ডাকাতের সর্দার, নরবলি দিত। ওই উনি, যাঁর দাঁতে মিসি, নাকে নথ, কানে মাকড়ির ঝালর, পায়ে বাঁকমল, কোমরে গোট, অটলবাবুর অতিবৃদ্ধপ্রমাতামহী— ও মাগী নিশ্চয় ডাইনী, সতিনপোকে বিষ খাইয়ে মেরেছিল। দলের মধ্যে সাধুপুরুষ আর সাধ্বী স্ত্রীও অনেক আছেন, কিন্তু অটলবাবু তো ভাল মন্দ বেছে প্রণাম করতে পারেন না। তা ছাড়া তাঁর বয়স এত হয়েছে যে কোনও গুরুজন আর বেঁচে নেই, তিনি প্রণাম করাই ভুলে গেছেন। ছেলেবেলায় তিনি তাঁর বাবাকে দেখলে হুঁকো লুকোতেন, কিন্তু এখন এই পঙ্গপালের মতন পূর্বপুরুষদের খাতির করা তাঁর পক্ষে

অসম্ভব। তাঁর প্রিয়জন এবং অপ্রিয়জনও পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, কেউ হাসিমুখে কেউ ছলছল চোখে কেউ ভ্রূকুটি করে তাঁকে দেখছে। শুধু মানুষ নয়, মানুষের পিছনে অতি দূরে জন্তুর দলও রয়েছে, পশু সরীসৃপ মাছ কৃমি কীট কীটাণু পর্যন্ত। এরাও তাঁর পূর্বপুরুষ, এরাও তাঁর জ্ঞাতি, সকলের সঙ্গেই তাঁর রক্তের যোগ আছে। কি ভয়ানক, ইহলোকের জনকয়েক আত্মীয়বন্ধুর সংশ্রব ত্যাগ করে তাঁকে কি পরলোকের প্রেতারণ্যে বাস করতে হবে? ওখানে সঙ্গী রূপে কাকে তিনি বরণ করবেন, কাকে বর্জন করবেন? অটলবাবু অস্পষ্টস্বরে বললেন, দূর হ, দূর হ।

নার্স কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে, আমাকে ডাকছেন? অটলবাবু আবার বললেন, দূর হ, দূর হ। নার্স বিরক্ত হয়ে তার চেয়ারে গিয়ে বসল এবং আবার ঢুলতে লাগল।

বিকারের ঘোর কাটিয়ে উঠে অটলবাবু ভাবতে লাগলেন—পুনর্জন্ম নয়, স্বর্গ নয়, স্পিরিচুয়াল প্রেতলোকও নয়। কোথায় যাবেন? মৃত্যুর পর দেহ পঞ্চভূতে মিলিয়ে যায়, দেহের উপাদান পৃথিবীর জড় বস্তুতে লয় পায়। মৃত ব্যক্তির চেতনাও কি বিরাট বিশ্ব-চেতনায় লীন হয়? আমিই অটল চৌধুরী—এই বোধ কি তখনও থাকবে? অটলবাবু আর ভাবতে পারেন না, মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

শেষরাত্রে অটলবাবুর নাড়ী নিঃশ্বাস আর বুক পরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন, ঘণ্টাখানেক হল গেছেন। আশ্চর্য মানুষ, হরিনাম নয়, রামধুন নয়, তারকব্রহ্মনাম নয়, কিছুই শুনলেন না, ভদ্রলোক লাভ-লোকসান কষতে কষতেই মরেছেন। বোধ হয় হিসেব মেলাতে পারেন নি, দেখুন না, ভ্রূ একটু কুঁচকে রয়েছে!

পুত্রবধূ বললেন, তা বেশ গেছেন, নিজেও বেশীদিন ভোগেননি, আমাদেরও ভোগাননি। চিকিৎসার খরচও তো কম নয়।

অটলবাবুর কাগজপত্র হাঁটকে দেখে তাঁর পৌত্র বললে, এঃ, বুড়ো ঠকিয়েছে, যা রেখে গেছে তা কিছুই নয়।

অনুরক্ত বন্ধুরা বললেন, একটা ইন্দ্রপাত হল। এমন খাঁটি মানুষ দেখা যায় না। ইনি স্বর্গে যাবেন না তো যাবে কে? কি বলেন দত্ত মশাই?

হারাধন দত্ত মশাই পরলোকতত্ত্বজ্ঞ; যদিও পরলোক দেখবার সুযোগ এখনও পান নি। তিনি একটু চিন্তা করে বললেন, উঁহু, স্বর্গে যাওয়া অত সহজ নয়, দরজা খোলা পাবেন না; উনি যে কিছুই মানাতেন না। অ্যাস্ট্রাল প্লেনেই আটকে থাকবেন, ত্রিশঙ্কুর মতন।

হরিপদ ভটচাজ মনে মনে বললেন, তোমরা ছাই জান, পাষণ্ড এতক্ষণ নরকে পোঁছে গেছে।

অটলবাবু কোথায় গেছেন তা তিনিই জানেন। অথবা তিনিও জানেন না।

১৩৫৫ (১৯৪৮)

রাজভোগ

পৌষ মাস, সন্ধ্যাবেলা। একটি প্রকাণ্ড মোটর ধর্মতলায় অ্যাংলোমোগলাই হোটেলের সামনে এসে দাঁড়াল। মোটরটি সেকেলে কিন্তু দামী। চালকের পাশ থেকে একজন চোপদার জাতীয় লোক নেমে পড়ল। তার হাতে আসাসোঁটা নেই বটে কিন্তু মাথায় একটি জরি দেওয়া জাঁকালো পাগড়ি আছে, তাতে রুপোর তকমা আঁটা; পরনে ইজের-চাপকান, কোমরে লাল মখমলের পেটি, তাতেও একটি চাপরাস আছে। লোকটি তার প্রকাণ্ড গোঁফে তা দিতে দিতে সগর্বে হোটেলে ঢুকে ম্যানেজারকে বললে, পাতিপুরকা রাজাবাহাদুর আয়ে হেঁ।

ম্যানেজার রাইচরণ চক্রবর্তী শশব্যস্তে বেরিয়ে এল এবং মোটরের দরজার সামনে হাত জোড় করে নতশিরে বলল, মাহারাজ, আজ কার মুখ দেখে উঠেছি! দয়া করে নেমে এই গরিবের কুটীরে পায়ের ধুলো দিতে আজ্ঞা হ'ক।

পাতিপুরের রাজাবাহাদুর ধীরে ধীরে মোটর থেকে নামলেন। তাঁর বয়স সত্তর পেরিয়েছে, দেহ আর পাকা গোঁফ-জোড়াটি খুব শীর্ণ, মাথায় যেটুকু চুল বাকী আছে তাই দিয়ে টাক ঢেকে সিঁথি কাটবার চেষ্টা করেছেন। পরনে জরিপাড় সূক্ষ্ম ধুতি আর রেশমী পঞ্জাবি, তার উপর দামী শাল, পায়ে শুঁড়ওয়ালা লাল লপেটা। তিনি গাড়ি থেকে নেমে ভিতরের মহিলাটিকে বললেন, নেমে এস। মহিলা বললেন, আমি আর নেমে কি করব, গাড়িতেই থাকি। তুমি যা খাবে খেয়ে এস, দেরি ক'রো না যেন। রাজা বললেন, তা কি হয়, তুমিও এস। রাইচরণ কৃতাঞ্জলি হয়ে বললে, নামতে আজ্ঞা হ'ক রানী-মা, আপনার শ্রীচরণের ধুলো পড়লে হোটেলের বরাত ফিরে যাবে।

মহিলাটি বোধ হয় সুন্দরী ও যুবতী, কিন্তু ঠিক বলা যায় না, তাঁর সজ্জা আর প্রসাধন এমন পরিপাটি যে রূপযৌবনের কতটা আসল আর কতটা নকল তা বোঝবার উপায় নেই। তিনি গাড়ি থেকে নামলেন। রাইচরণ বিনয়ে কুঁজো হয়ে সামনের দিকে জোড় হাত নাড়তে নাড়তে পথ দেখিয়ে রাজাবাহাদুর ও তাঁর সঙ্গিনীকে ভিতরে নিয়ে গেল এবং হেঁকে বললে, এই শীগগির রয়েল সেলুনের দরজা খুলে দে! হোটেলের সামনের বড় ঘরটিতে বসে যারা খাচ্ছিল তারা উদ্‌গ্রীব হয়ে মহিলাটিকে দেখে ফিসফিস করে জল্পনা করতে লাগল।

একজন চাকর তাড়াতাড়ি একটা কামরা খুলে দিলে। ছোট খোপ, রং-করা কাঠের দেওয়াল,...মাঝে একটি টেবিল এবং দুটি গদি-আঁটা চেয়ার। টেবিলটি সাদা চাদরে ঢাকা, দিনের বেলায় তাতে হলুদের দাগ দেখা যায়। এই কামরার পাশেই পর্দার আড়ালে আর একটি কামরা, তাতে এক সেট পুরনো কৌচ ও সেটি এবং একটি ছোট টেবিল, তার উপর তিন-চারটি গত সালের মাসিক পত্রিকা। দেওয়ালে কয়েকটি সিনেমা-তারার ছবি খবরের কাগজ থেকে কেটে এঁটে দেওয়া হয়েছে।

দুই মহামান্য অতিথিকে বসিয়ে ম্যানেজার রাইচরণ বললে, হুজুর, আজ্ঞা করুন কি এনে দেব। রাজাবাহাদুর সাগ্রহে বললেন, তোমার কি কি তৈরি আছে শুনি? রাইচরণ বললে, আজ্ঞে, তিন রকম পোলাও আছে—ভেটকি মাছের, মটনের আর পাঁঠার। কালিয়া আছে, কোর্মা আছে, কোপ্তা আছে; মটন-চপ, চিংড়ি-কাটলেট; ফাউল-রোস্ট, ছানার পুডিং হুজুরের আশীর্বাদে আরও কত কি আছে।

রাজাবাহাদুর খুশী হয়ে বললেন, বেশ বেশ, অতি উত্তম। আচ্ছা ম্যানেজার, তোমার এখানে বিরিয়ানি পোলাও হয়?

—হয় বই কি হুজুর, ঘণ্টা খানিক আগে অর্ডার পেলেই করে দিতে পারি। আমি তিন বচ্ছর দুম্বাগড়ের নবাব সাহেবের রসুইঘরের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলুম কিনা, সেখানেই সব শিখেছি। খুব খাইয়ে লোক ছিলেন নবাব সাহেব, এ বেলা এক দুম্বা, ও বেলা এক দুম্বা। বাবুর্চীদের রান্না তাঁর পছন্দ হত না, আমি তাদের কায়দার অনেক উন্নতি করেছি, তাই জন্যেই তো নবাব বাহাদুর খুশী হয়ে নিজের হাতে ফারসীতে আমাকে সার্টিফিকেট লিখে দিয়েছেন। দেখবেন হুজুর?

—থাক থাক। আচ্ছা, তোমার কায়দাটা কি রকম শুনি।

—বিরিয়ানি রান্নার? এক নম্বর বাঁশমতী চাল—এখন তার দাম পাঁচ টাকা সের, খাঁটী গাওয়া ঘি, ডুমো ডুমো মাংস, বাদাম পেস্তা কিশমিশ এবং হরেক রকম মসলা, গোলাপ জলে গোলা খোয়া ক্ষীর, মৃগনাভি সিকি রতি, দশ ফোঁটা ও-ডি-কলোন, আলু একদম বাদ। চাল আর মাংস প্রায় সিদ্ধ হয়ে এলে তার ওপর দু-মুঠো পেঁয়াজ-কুচি মুচমুচে করে ভেজে ছড়িয়ে দিই, তার পর দমে বসাই। খেতে যা হয় সে আর কি বলব!

রাজাবাহাদুরের জিবে জল এসে গেল, সুৎ করে টেনে নিয়ে বললেন, চমৎকার। আচ্ছা সামি কাবাব জান?

—হেঁ হেঁ, হুজুরের আশীর্বাদে মোগলাই ইংলিশ ফ্রেঞ্চ হেন রান্না নেই যা এই রাইচরণ চক্কত্তি জানে না। মাংস পিষে তার সঙ্গে ছোলার ডাল বাটা আর পেস্তা বাদাম মেশাতে হয়, তাতে আদা হিং পেঁয়াজ রসুন গরম মসলা ইত্যাদি পড়ে, তার পর চ্যাপটা লেচি গড়ে চাটুতে ভাজতে হয়। এই হল সামি কাবাব। ওঃ, খেতে যা হয় হুজুর তা বলবার কথা নয়।

রাজাবাহাদুর আবার সুৎ করে জিবের জল টেনে নিলেন, তার পর বললেন, আচ্ছা রাইচরণ, রোগন-জুশ জান?

মহিলাটি অধীর হয়ে বললেন, আঃ, ওসব জিজ্ঞেস করে কি হবে, যা খাবে তাই আনতে বল না।

রাজাবাহাদুর বললেন, আ হা হা ব্যস্ত হও কেন, খাওয়া তো আছেই, আগে একবার রাইচরণকে বাজিয়ে নিচ্ছি।

রাইচরণ বললে, বাজাবেন বই কি হুজুর, নিশ্চয় বাজাবেন। রোগন-জুশ হচ্ছে—

মহিলাটি আস্তে আস্তে উঠে পাশের কামরায় গিয়ে মাসিক পত্রিকার পাতা ওলটাতে লাগলেন।

—রোগন-জুশ হচ্ছে খাসি বা দুম্বার মাংস, শুধু ঘিএ সিদ্ধ, জল একদম বাদ। ভারী পোষ্টাই হুজুর, সাত দিন খেলে লিকলিকে রোগা লোকেরও গায়ে গত্তি লেগে ভুঁড়ি গজায়।

—তুমি তো অনেক রকম জান দেখছি হে। আচ্ছা মুর্গ মুসল্লম তৈরী করতে পার?

—নিশ্চয় পারি হুজুর, ঘণ্টা তিনেক আগে অর্ডার দিতে হয়, অনেক লটখটি কিনা। বাবুর্চীদের চাইতে আমি ঢের ভাল বানাতে পারি, আমি নতুন কায়দা আবিষ্কার করেছি। একটি বড় আস্ত মুরগি, তার পেটের মধ্যে মাছের কোপ্তা, ডিম আর কুচো-চিংড়ি দেওয়া কচুর শাগের ঘণ্ট, অভাবে লাউ-চিংড়ি, আর দই—

—কচুর শাগ? আরে রাম রাম।

—না হুজুর, মুরগির পেটে সমস্ত জিনিস ভরে দিয়ে সেলাই করে হাঁড়ি-কাবাবের মতন পাক করতে হয়, সুসিদ্ধ হয়ে গেলে মুরগি কুচো-চিংড়ি কচুর শাগ দই আর সমস্ত মসলা মিশে গিয়ে এক হয়ে যায়। খেতে যা হয় সে আর কি বলব হুজুর।

রাজাবাহাদুর এবারে আর সামলাতে পারলেন না, খানিকটা নাল টেবিলে পড়ে গেল। একটু লজ্জিত হয়ে রুমাল দিয়ে মুছে ফেলে বললেন, ওহে রাইচরণ, উত্তম সর-ভাজা খাওয়াতে পার?

হুজুরের আশীর্বাদে কি না পারি? সর-ভাজার রাজা হল গোলাপী গাই-দুধের সর-ভাজা, নবাব সিরাজুদ্দৌলা যা খেতেন। কিন্তু দশ দিন সময় চাই মহারাজ, আর শ-খানিক টাকা খরচ মঞ্জুর করতে হবে।

—গোলাপী রঙের গরু হয় নাকি?

—না হুজুর। একটি ভাল গরুকে সাত দিন ধরে সেরেফ গোলাপ ফুল, গোলাব জল আর মিছরি খাওয়াতে হবে, খড় ভুষি জল একদম বারণ। তারপর সে যা দুধ দেবে তার রং হবে গোলাপী আর খোশবায় ভুর ভুর করবে। সেই দুধ ঘন করে তার সর নিতে হবে, আর সেই দুধ থেকে তৈরি ঘি দিয়েই ভাজতে হবে। রসে ফেলবার দরকার নেই আপনিই মিষ্টি হবে—গরু মিছরি খেয়েছে কিনা। সে যা জিনিস, অমৃত কোথায় লাগে। কেষ্টনগরের কারিগররা তা দেখলে হুতোশে গলায় দড়ি দেবে।

—কিন্তু অত গোলাপ ফুল খেলে গরুর পেট ছেড়ে দেবে না?

রাইচরণ গলার স্বর নীচু করে বললে, কথাটা কি জানেন মহারাজ? গোলাপ ফুলের সঙ্গে খানিকটা সিদ্ধি-বাটাও খাওয়াতে হয়, তাতে গরুর পেট ঠিক থাকে আর সর-ভাজাটিও বেশ মজাদার হয়।

—চমৎকার, চমৎকার!

—এইবার হুজুর আজ্ঞা করুন কি কি খাবার আনব। আমি নিবেদন করছি কি—আজ আমার যা তৈরি আছে সবই কিছু কিছু খেয়ে দেখুন, ভাল জিনিস, নিশ্চয় আপনি খুশী হবেন। এর পরে একদিন অর্ডার মতন পছন্দসই জিনিস তৈরি করে হুজুরকে খাওয়াব।

—আচ্ছা রাইচরণ, তোমার এখানে পাতি নেবু আছে?

—আছে বই কি, নেবু হল পোলাও খাবার অঙ্গ। একটি আরজি আছে মহারাজ—আজ ভোজনের পর হুজুরকে একটি শরবত খাওয়াব, হুজুর তর হয়ে যাবেন।

—কিসের শরবত।

—তবে বলি শুনুন মহারাজ। আমার একটি দূর সম্পর্কের ভাগনে আছে, তার নাম কানাই। সে বিস্তর পাস করেছে, নানা রকম দ্রব্যগুণ তার জানা আছে। শরবতটি সেই কানাই ছোকরারই পেটেন্ট, সে তার নাম দিয়েছে— চাঙ্গায়নী সুধা। বছর-দুই আগে কানাই হুণ্ডাগড় রাজসরকারে চাকরি করত, কুমার সায়েব তাকে খুব ভালবাসতেন। কুমারের খুব শিকারের শখ, একদিন তাঁর হাতিকে বাঘে ঘায়েল করলে। হাতির ঘা দিন-কুড়ির মধ্যে সেরে গেল, কিন্তু তার ভয় গেল না। হাতি নড়ে না, ডাঙশ মারলেও ওঠে না। কুমার সায়েবের হুকুম নিয়ে কানাই হাতিকে সের-টাক চাঙ্গায়নী খাওয়ালে। পরদিন ভোরবেলা হাতি চাঙ্গা হয়ে পিলখানা থেকে গটগট করে হেঁটে চলল, জঙ্গল থেকে একটা শালগাছের রলা উপড়ে নিলে, পাতাগুলো খেয়ে ফেলে ডাণ্ডা বানালে, তার পর পাহাড়ের ধারে গিয়ে শুঁড় দিয়ে সেই ডাণ্ডা ধরে বাঘটাকে দমাদম পিটিয়ে মেরে ফেললে। কুমার সাহেব খুশী হয়ে কানাইকে পাঁচ-শ টাকা বকশিশ দিলেন।

—শরবতে হুইস্কি টুইস্কি আছে নাকি? ওসব আমার আর চলে না।

—কি যে বলেন হুজুর! কানাই ওসব ছোঁয় না, অতি ভাল ছেলে, সিগারেটটি পর্যন্ত খায় না। চাঙ্গায়নী সুধায় কি কি আছে শুনবেন? কুড়িটা কবরেজী গাছ-গাছড়া, কুড়ি রকম ডাক্তারী আরক, কুড়িদফা হেকিমী দাবাই, হীরেভস্ম, সোনাভস্ম, মুক্তোভস্ম, রাজ্যের

ভিটামিন, আর পোয়াটাক ইলেকট্রিসিটি—এইসব মিশিয়ে চোলাই করে তৈরী হয়। খুব দামী জিনিস, কানাই আমাকে হাফ প্রাইস পঞ্চাশ টাকায় এক বোতল দিয়েছে, মামা বলে ভক্তি করে কিনা। দোহাই হুজুর, আজ একটু খেয়ে দেখবেন।

—সে হবে এখন। আচ্ছা রাইচরণ, তুমি বার্লি রাখ?

—রাখি হুজুর। ছানার পুডিংএ দিতে হয়, নইলে আঁট হয় না। এইবার তবে হুজুরের জন্য খাবার আনতে বলি? হুকুম করুন কি কি আনব।

—এক কাজ কর—এক কাপ জলে এক চামচ বার্লি সিদ্ধ ক'রে নেবু আর একটু নুন দিয়ে নিয়ে এস।

রাইচরণ আকাশ থেকে পড়ে বললে, সেকি মহারাজ! ভেটকি মাছের পোলাও, মটন-কারি, ফাউল-রোস্ট—

রাজাবাহাদুর হঠাৎ অত্যন্ত খাপ্‌পা হয়ে বললেন, তুমি তো সাংঘাতিক লোক হ্যা! আমাকে মেরে ফেলতে চাও নাকি, অ্যাঁ? আমি বলে গিয়ে তিনটি বচ্ছর ডিসপেপসিয়ায় ভুগছি, কিচ্ছু হজম হয় না, সব বারণ, দিনে শুধু গলা ভাত আর শিঙি মাছের ঝোল, রাত্তিরে বার্লি—আর তুমি আমাকে পোলাও কালিয়ার লোভ দেখাচ্ছ! কি ভয়ানক খুনে লোক!

রাইচরণ মর্মাহত হয়ে চলে গেল এবং একটু পরে এক বাটি বার্লি এনে রাজাবাহাদুরের সামনে ঠক্ করে রেখে বললে, এই নিন।

তার পর রাইচরণ পর্দা ঠেলে পাশের কামরায় গিয়ে মহিলাটিকে বললে, রানী-মা, আপনার জন্য একটু ভেটকি মাছের পোলাও, মটন-কারি আর ফাউল-রোস্ট আনি?

—খেপেছেন? আমি খাব আর ওই হ্যাংলা বুড়ো ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখবে! গলা দিয়ে নামবে কেন?

—তবে একটু চা আর খানকতক চিংড়ি কাটলেট? এনে দিই রানী-মা?

—রানী-ফানি নই, আমি নক্ষত্র দেবী। আর একদিন আসব এখন, স্টুডিওর ফেরত। ডিরেক্টার হাঁদুবাবুকেও নিয়ে আসব।

১৩৫৫ (১৯৪৮)

পরশ পাথর

পরেশবাবু একটি পরশ পাথর পেয়েছেন। কবে পেয়েছেন, কোথায় পেয়েছেন, কেমন ক'রে সেখানে এল, আরও পাওয়া যায় কিনা—এসব খোঁজে আপনাদের দরকার কি। যা বলছি শুনে যান।

পরেশবাবু মধ্যবিত্ত মধ্যবয়স্ক লোক, পৈতৃক বাড়িতে থাকেন, ওকালতি করেন। রোজগার বেশী নয়, কোনও রকমে সংসারযাত্রা নির্বাহ হয়। একদিন আদালত থেকে বাড়ি ফেরবার পথে একটি পাথরের নুড়ি কুড়িয়ে পেলেন। জিনিসটা কি তা অবশ্য তিনি চিনতে পারেন নি, একটু নূতন রকম পাথর দেখে রাস্তার এক পাশ থেকে তুলে নিয়ে পকেটে পুরলেন। বাড়ি এসে তাঁর অফিসঘরের তালা খোলবার জন্য পকেট থেকে চাবি বার করে দেখলেন তার রং হলদে। পরেশবাবু আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন, ঘরের চাবি তো লোহার, পিতলের হল কি করে? হয়তো চাবিটা কোনও দিন হারিয়েছিল, গৃহিণী তাঁকে না জানিয়েই চাবিওয়ালা ডেকে এই পিতলের চাবিটা করিয়েছেন, এত দিন পরেশবাবুর নজরে পড়ে নি।

পরেশবাবু ঘরে ঢুকে মনিব্যাগ ছাড়া পকেটের সমস্ত জিনিস টেবিলের উপর ঢাললেন, তার পর দোতলায় উঠলেন। চাবির কথা তাঁর আর মনে রইল না। জলযোগ এবং ঘণ্টা খানিক বিশ্রামের পর তিনি মকদ্দমার কাগজপত্র দেখবার জন্য আবার নীচের ঘরে এলেন এবং আলো জ্বাললেন। প্রথমেই পাথরটি নজরে পড়ল। বেশ গোলগাল চকচকে নুড়ি, কাল সকালে তাঁর ছোট খোকাকে দেবেন, সে গুলি খেলবে। পরেশবাবু তাঁর টেবিলের দেরাজ টেনে পাথরটি রাখলেন। তাতে ছুরি কাঁচি পেনসিল কাগজ খাম প্রভৃতি নানা জিনিস আছে। কি আশ্চর্য! ছুরি আর কাঁচি হলদে হয়ে গেল। পরেশবাবু পাথরটি নিয়ে তাঁর কাচের দোয়াতে ঠেকালেন, কিছুই হ'ল না। তার পর একটা সীসের কাগজ-চাপায় ঠেকালেন, হলদে আর প্রায় ডবল ভারী হয়ে গেল। পরেশবাবু কাঁপা গলায় তাঁর চাকরকে ডেকে বললেন, হরিয়া, ওপর থেকে আমার ঘড়িটা চেয়ে নিয়ে আয়। হরিয়া ঘড়ি এনে দিয়ে চলে গেল। নিকেলের সস্তা হাতঘড়ি, তাতে চামড়ার ফিতে লাগানো। পাথর ছোঁয়ানো মাত্র ঘড়ি আর ফিতের বকলস সোনা হয়ে গেল; সঙ্গে সঙ্গে ঘড়িটা বন্ধ হল, কারণ স্প্রিংও সোনা হয়ে গেছে, তার আর জোর নেই।

পরেশবাবু কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে রইলেন। ক্রমশ তাঁর জ্ঞান হল যে তিনি অতি দুর্লভ পরশ পাথর পেয়েছেন যা ছোঁয়ালে সব ধাতুই সোনা হয়ে যায়। তিনি হাত জোড় করে কপালে বার বার ঠেকাতে ঠেকাতে বললেন, জয় মা কালী, এত দয়া কেন মা? হরি, তুমিই সত্য তুমিই সত্য, একি লীলা খেলছ বাবা? স্বপ্ন দেখছি না তো? পরেশবাবু তাঁর বাঁ হাতে একটি প্রচণ্ড চিমটি কাটলেন, তবু ঘুম ভাঙল না, অতএব স্বপ্ন নয়। তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল, বুক ধড়ফড় করতে লাগল। শকুন্তলার মতন তিনি বুকে হাত দিয়ে বললেন, হৃদয় শান্ত হও; এখনই যদি ফেল কর তবে এই দেবতার দান কুবেরের ঐশ্বর্য ভোগ করবে কে? পরেশবাবু শুনেছিলেন, এক ভদ্রলোক লটারিতে চার লাখ টাকা পেয়েছেন শুনে আহ্লাদে

এমন লাফ মেরেছিলেন যে কড়িকাঠে লেগে তাঁর মাথা ফেটে গিয়েছিল। পরেশবাবু নিজের মাথা দু হাত দিয়ে চেপে রাখলেন পাছে লাফ দিয়ে ফেলেন।

অত্যন্ত দুঃখের মতন অত্যন্ত আনন্দও কালক্রমে অভ্যস্ত হয়ে যায়। পরেশবাবু শীঘ্রই প্রকৃতিস্থ হলেন এবং অতঃপর কি করবেন তা ভাবতে লাগলেন। হঠাৎ জানাজানি হওয়া ভাল নয়, কোন্ শত্রু কি বাধা দেবে বলা যায় না। এখন শুধু তাঁর গৃহিণী গিরিবালাকে জানাবেন, কিন্তু মেয়েদের পেটে কথা থাকে না। পরেশবাবু দোতলায় গিয়ে একটু একটু করে সইয়ে সইয়ে পত্নীকে তাঁর মহা সৌভাগ্যের খবর জানালেন এবং তেত্রিশ কোটি দেবতার দিব্য দিয়ে বললেন, খবরদার, যেন জানাজানি না হয়।

গৃহিণীকে সাবধান করলেন বটে, কিন্তু পরেশবাবু নিজেই একটু অসামাল হয়ে পড়লেন। শোবার ঘরের একটা লোহার কড়িতে পরশ পাথর ঠেকালেন, কড়িটা সোনা হওয়ার ফলে নরম হল, ছাত বসে গেল। বাড়িতে ঘটি বাটি থালা বালতি যা ছিল সবই সোনা করে ফেললেন। লোকে দেখে আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগল, এসব জিনিস গিলটি করা হল কেন? ছেলে মেয়ে আত্মীয় বন্ধু নানারকম প্রশ্ন করতে লাগল। পরেশবাবু ধমক দিয়ে বললেন, যাও, যাও, বিরক্ত করো না, আমি যাই করি না কেন তোমাদের মাথাব্যথা কিসের? প্রশ্নের ঠেলায় অস্থির হয়ে পরেশবাবু লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা প্রায় বন্ধ করে দিলেন, মক্কেলরা স্থির করলে যে তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

এর পর পরেশবাবু ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলেন, তাড়াতাড়ি করলে বিপদ হতে পারে। কিছু সোনা বেচে নোট পেয়ে ব্যাংকে জমা দিলেন, কম্পানির কাগজ আর নানারকম শেয়ারও কিনলেন। বালিগঞ্জে কুড়ি বিঘা জমির উপর প্রকাণ্ড বাড়ি আর কারখানা করলেন, ইট সিমেণ্ট লোহা কিছুরই অভাব হল না, কারণ, কর্তাদের বশ করা তাঁর পক্ষে অতি সহজ। এক জায়গায় রাশি রাশি মরচে পড়া মোটরভাঙা লোহার টুকরো প'ড়ে আছে। জিজ্ঞাসা করলেন, কত দর? লোহার মালিক অতি নির্লোভ, বললে, জঞ্জাল তুলে নিয়ে যান বাবু, গাড়িভাড়াটা দিতে পারব না। পরেশবাবু রোজ দশ-বিশ মণ উঠিয়ে আনতে লাগলেন। খাস কামরায় লুকিয়ে পরশ পাথর ছোঁয়ান আর তৎক্ষণাৎ সোনা হয়ে যায়। দশ জন গুর্খা দারোয়ান আর পাঁচটা বুলডগ কারখানার ফটক পাহারা দেয়, বিনা হুকুমে কেউ ঢুকতে পায় না।

সোনা তৈরী আর বিক্রী সব চেয়ে সোজা কারবার, কিন্তু রাশিপরিমাণে উৎপাদন করতে গেলে একলা পারা যায় না। পরেশবাবু কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন এবং অনেক দরখাস্ত বাতিল করে সদ্য এম. এস-সি. পাস প্রিয়তোষ হেনরি বিশ্বাসকে দেড় শ টাকায় বাহাল করলেন। তার আত্মীয়স্বজন বিশেষ কেউ নেই, সে পরেশবাবুর কারখানাতেই বাস করতে লাগল। প্রিয়তোষ প্রাতঃকৃত্য স্নান আহার ইত্যাদির জন্য দৈনিক এক ঘণ্টার বেশী সময় নেয় না, সাত ঘণ্টা ঘুময়, আট ঘণ্টা কারখানার কাজ করে, বাকী আট ঘণ্টা সে তার কলেজের সহপাঠিনী হিন্দোলা মজুমদারের উদ্দেশে বড় বড় কবিতা আর প্রেমপত্র লেখে এবং হরদম চা আর সিগারেট খায়। অতি ভাল ছেলে, কারও সঙ্গে মেশে না, রবিবারে গির্জাতেও যায় না, কোনও বিষয়ে কৌতূহল নেই, কখনও জানতে চায় না এত সোনা আসে কোথা থেকে। পরেশবাবু মনে করেন, তিনি পরশ পাথর ছাড়া আর একটি রত্ন পেয়েছেন—এই প্রিয়তোষ ছোকরা। সে বৈদ্যুতিক হাপরে বড় বড় মুচিতে সোনা গলায় আর মোটা মোটা বাট বানায়। পরেশবাবু তা এক মারোয়াড়ী সিণ্ডিকেটকে বেচেন আর ব্যাংকের খাতায় তাঁর জমা অঙ্কের পর অঙ্ক বাড়তে থাকে। পরেশ গৃহিণীর এখন ঐশ্বর্যের সীমা নেই। গহনা পরে পরে তাঁর সর্বাঙ্গে

বেদনা হয়েছে, সোনার উপর ঘেন্না ধরে গেছে, তিনি শুধু দু-হাতে শাঁখা এবং গলায় রুদ্রাক্ষ ধারণ করতে লাগলেন।

কিন্তু পরেশবাবুর কার্যকলাপ বেশী দিন চাপা রইল না। বাংলা সরকারের আদেশে পুলিসের লোক পিছনে লাগল। তারা সহজেই বশে এল, কারণ রাম-রাজ্যের রীতিনীতি এখনও তাদের রপ্ত হয়নি, দশ-বিশ ভরি পেয়েই তারা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। বিজ্ঞানীর দল আহার নিদ্রা ত্যাগ করে নানারকম জল্পনা করতে লাগলেন। যদি তাঁরা দু-শ বৎসর আগে জন্মাতেন তবে অনায়াসে বুঝে ফেলতেন যে পরেশবাবু পরশ পাথর পেয়েছেন। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানে পরশ পাথরের স্থান নেই, অগত্যা তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন যে পরেশবাবু কোনও রকমে একটা পরমাণু ভাঙবার যন্ত্র খাড়া করেছেন এবং ভাঙা পরমাণুর টুকরো জুড়ে জুড়ে সোনা তৈরি করছেন, যেমন ছেঁড়া কাপড় থেকে কাঁথা তৈরি হয়। মুশকিল এই যে, পরেশবাবুকে চিঠি লিখলে উত্তর পাওয়া যায় না, আর প্রিয়তোষটা ইডিয়ট বললেই হয়, নিতান্ত পীড়াপীড়ি করলে বলে, আমি শুধু সোনা গলাই, কোথা থেকে আসে তা জানি না। বিদেশের বিজ্ঞানীরা প্রথমে পরেশবাবুর ব্যাপার গুজব মনে করে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু অবশেষে তাঁরাও চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

বিশেষজ্ঞদের উপদেশে ঘাবড়ে গিয়ে ভারত সরকার স্থির করলেন যে পরেশবাবু ডেঞ্জারস পার্সন, কিন্তু কিছুই করতে পারলেন না, কারণ পরেশবাবু কোনও বেআইনী কাজ করছেন না। তাঁকে গ্রেপতার এবং তাঁর কারখানা ক্রোক করবার জন্য একটা অর্ডিনান্স জারির প্রস্তাবও উঠল, কিন্তু ক্ষমতাশালী দেশী বিদেশী লোকের আপত্তির জন্য তা হ'ল না। ব্রিটেন ফ্রান্স আমেরিকা রাশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রের ভারতস্থ দূতেরা পরেশবাবুর উপর কড়া সুনজর রাখেন, তাঁকে বার বার ডিনারের নিমন্ত্রণ করেন। পরেশবাবু চুপচাপ খেয়ে যান, মাঝে মাঝে ইয়েস-নো বললেন, কিন্তু তাঁর পেটের কথা কেউ বার করতে পারে না, শ্যাম্পেন খাইয়েও নয়। বাংলা দেশের কয়েকজন কংগ্রেসী নেতা তাঁকে উপদেশ দিয়েছেন—রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য আপনার রহস্য শুধু আমাদের কজনকে জানিয়ে দিন। কয়েকজন কমিউনিস্ট তাঁকে বলেছেন—খবরদার, কারও কথা শুনবেন না মশায়, যা করছেন ক'রে যান, তাতেই জগতের মঙ্গল হবে।

আত্মীয় বন্ধু আর খোশামুদের দল ক্রমেই বাড়ছে, পরেশবাবু তাদের যথাযোগ্য পারি-তোষিক দিচ্ছেন, তবু কেউ খুশী হচ্ছে না। শত্রুর দল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চুপ করে আছে। ঐশ্বর্যবৃদ্ধি হলেও পরেশবাবু তাঁর চাল বেশী বাড়ান নি, তাঁর গৃহিণীও সেকেলে নারী, টাকা ওড়াবার কায়দা জানেন না। তথাপি পরেশবাবুর নাম এখন ভুবন-বিখ্যাত, তিনি নাকি চারটে নিজামকে পুষতে পারেন। তিনি কি খান কি পরেন কি বলেন তা ইওরোপ আমেরিকার সংবাদপত্রে বড় বড় হরপে ছাপা হয়। সম্প্রতি দেশবিদেশ থেকে প্রেমপত্র আসতে আরম্ভ করেছে। সুন্দরীরা নিজের নিজের ছবি পাঠিয়ে আর গুণবর্ণনা ক'রে লিখছেন, ডিয়ারেস্ট স্যর, আপনার পুরাতন পত্নীটি থাকুন, তাতে আমার আপত্তি নেই। আপনি তো উদারপ্রকৃতি হিন্দু, আমাকে শুদ্ধি করে আপনার হারেমে ভরতি করুন, নয়তো বিষ খাব। এই রকম চিঠি প্রত্যহ রাশি রাশি আসছে আর গিরিবালা ছোঁ মেরে কেড়ে নিচ্ছেন। তিনি একটি মেম সেক্রেটারি রেখেছেন। সে প্রত্যহ চিঠির তরজমা শোনায় এবং গিরিবালার আজ্ঞায় জবাব লেখে। গিরিবালা রাগের বশে অনেক কড়া কথা বলে যান, কিন্তু মেমের বিদ্যা কম শুধু একটি কথা লেখে—ড্যাম, অর্থাৎ দূর মুখপুড়ী, গলায় দেবার দাঁড় জোটে না তোর? ইওরোপের দশজন নামজাদা বিজ্ঞানী চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে পরেশবাবু যদি সোনার

রহস্য প্রকাশ করেন তবে তাঁরা চেষ্টা করবেন যাতে তিনি রসায়ন পদার্থবিদ্যা আর শান্তি এই তিনটি বিষয়ের জন্য নোবেল প্রাইজ এক সঙ্গেই পান। এ চিঠিও পরেশগৃহিণী প্রেমপত্র মনে ক'রে মেমের মারফত জবাব দিয়েছেন—ড্যাম।

পরেশবাবু সোনার দর ক্রমেই কমাচ্ছেন, বাজারে একশ পনের টাকা ভরি থেকে সাত টাকা দশ আনায় নেমেছে। ব্রিটিশ সরকার সস্তায় সোনা কিনে আমেরিকার ডলার-লোন শোধ করেছেন। আমেরিকা খুব রেগে গেছে, কিন্তু আপত্তি করবার যুক্তি স্থির করতে পারছে না। ভারতে স্টার্লিং ব্যালান্সও ব্রিটেন কড়ায় গণ্ডায় শোধ করতে চেয়েছিল, কিন্তু এদেশের প্রধান মন্ত্রী উত্তর দিয়েছেন—আমরা তোমাদের সোনা ধার দিই নি, ডলারও দিই নি; যুদ্ধের সময় জিনিস সরবরাহ করেছি, সেই দেনা জিনিস দিয়েই তোমাদের শুধতে হবে।

অর্থনীতি আর রাজনীতির ধুরন্ধরগণ ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়েছেন, কোনও সমাধান খুঁজে পাচ্ছেন না। যদি এটা সত্য ত্রেতা বা দ্বাপর যুগ হত তবে তাঁরা তপস্যা করে ব্রহ্মা বিষ্ণু বা মহেশ্বরের সাহায্যে পরেশবাবুকে জব্দ করে দিতেন। কিন্তু এখন তা হবার জো নেই। কোনও কোনও পণ্ডিত বলছেন, প্লাটিনম আর রুপো চালাও। অন্য পণ্ডিত বলেছেন, উঁহু, তাও হয়তো সস্তায় তৈরি হবে, রেডিয়ম বা ইউরেনিয়ম স্ট্যানডার্ড করা হক, কিংবা প্রাচীন কালের মতন বিনিময় প্রথায় লেন-দেন চলুক।

চার্চিলকে আর সামলানো যাচ্ছে না, তিনি খেপে গিয়ে বলছেন, আমরা কমনওয়েলথের সর্বনাশ হতে দেব না, ইউ-এন-ওর কাছে নালিশ করে সময় নষ্টও করব না। ভারতে আবার ব্রিটিশ শাসন স্থাপিত হক, আমাদের ফৌজ গিয়ে ওই পরেশটাকে ধরে আনুক, আইল-অভ-ওআইটে ওকে নজরবন্দী করে রাখা হক। সেখানে সে যত পারে সোনা তৈরি করুক, কিন্তু সে সোনা এম্পায়ার-সোনা, ব্রিটিশ রাষ্ট্রসংঘের সম্পত্তি, আমরাই তার বিলি করব।

বার্নার্ড শ বলেছেন, সোনা একটা অকেজো ধাতু, তাতে লাঙল কাস্তে কুড়ুল বয়লার এঞ্জিন কিছুই হয় না। পরেশবাবু সোনার মিথ্যা প্রতিপত্তি নষ্ট করে ভাল করেছেন। এখন তিনি চেষ্টা করুন যাতে সোনাকে ইস্পাতের মতন শক্ত করা যায়। সোনার ক্ষুর পেলেই আমি দাড়ি কামাব।

রাশিয়ার এক মুখপাত্র পরেশবাবুকে লিখেছেন, মহাশয়, আপনাকে পরম সমাদরে নিমন্ত্রণ করছি, আমাদের দেশে এসে বাস করুন, খাসা জায়গা। এখানে সাদায় কালোয় ভেদ নেই, আপনাকে মাথার মণি করে রাখব। দৈবক্রমে আপনি আশ্চর্য শক্তি পেয়েছেন, কিন্তু মাপ করবেন, আপনার বুদ্ধি তেমন নেই। আপনি সোনা করতেই জানেন, কিন্তু তার সদ্ব্যবহার জানেন না। আমরা আপনাকে শিখিয়ে দেব। যদি আপনার রাজনীতিক উচ্চাশা থাকে তবে আপনাকে সোভিয়েট রাষ্ট্রমণ্ডলের সভাপতি করা হবে। মস্কো শহরে এক শ একর জমির উপর একটি সুন্দর প্রাসাদ আপনার বাসের জন্য দেব। আর যদি নিরিবিলি চান তবে সাইবিরিয়ায় থাকবেন, একটি আস্ত নগর আপনাকে দেব। চমৎকার দেশ, আপনাদের শাস্ত্রে যার নাম উত্তরকুরু। এই চিঠিও গিরিবালা প্রেমপত্র ধ'রে নিয়ে জবাব দিয়েছেন—ড্যাম।

পরেশবাবু সোনার দাম ক্রমশ খুব কমিয়েছেন এখন সাড়ে চার আনা ভরি। সমস্ত পৃথিবীতে খনিজ সোনা প্রতি বৎসর আন্দাজ বিশ হাজার মণ উৎপন্ন হয়। এখন পরেশবাবু একাই বৎসরে লাখ মণ ছাড়ছেন। গোল্ড স্ট্যানডার্ড অধঃপাতে গেছে। সব দেশেই ভীষণ

ইনফ্লেশন, নোট আর ধাতুমুদ্রা খোলামকুচির সমান হয়েছে। মজুরি আর মাইনে বহু গুণ বাড়িয়েও লোকের দুর্দশা ঘুচছে না। জিনিসপত্র অগ্নিমূল্য, চারদিকে হাহাকার পড়ে গেছে।

ভিন্ন ভিন্ন দলের দশজন অনশনব্রতী মৃত্যুপণ করে পরেশবাবুর ফটকের সামনে শুয়ে পড়েছেন। মাঝে মাঝে তিনি বেনামা চিঠি পাচ্ছেন—তুমি জগতের শত্রু, তোমাকে খুন করব। পরেশবাবুরও ঐশ্বর্যে অরুচি ধরে গেছে। গিরিবালা কান্নাকাটি আরম্ভ করেছেন, কেবলই বলছেন, যদি শান্তিতে থাকতে না পারি তবে ধনদৌলত নিয়ে কি হবে। সর্বনেশে পাথরটাকে বিদায় কর, সব সোনা গঙ্গায় ফেলে দিয়ে কাশীবাস করবে চল।

পরেশবাবু মনস্থির ক'রে ফেললেন। সকালবেলা প্রিয়তোষকে সোনা তৈরির রহস্য জানিয়ে দিলেন।

প্রিয়তোষ নির্বিকার। পরেশবাবু তাকে পরশ পাথরটা দিয়ে বললেন, এটাকে আজই ধ্বংস ক'রে ফেল, পুড়িয়ে, অ্যাসিডে গলিয়ে, অথবা অন্য যে কোনও উপায়ে পার। প্রিয়তোষ বললে, রাইট-ও।

বিকালবেলা একজন দরোয়ান দৌড়ে এসে পরেশবাবুকে বললে, জলদি আসুন হুজুর বিসোআস সাহেব পাগলা হয়ে গেছেন, আপনাকে ডাকছেন। পরেশবাবু তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখলেন প্রিয়তোষ তার শোবার ঘরে খাটিয়ায় শুয়ে কাঁদছে। পরেশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি? প্রিয়তোষ উত্তর দিলে, এই চিঠিটা পড়ে দেখুন সার। পরেশবাবু পড়লেন—

প্রিয় হে প্রিয়, বিদায়। বাবা রাজী নন, তাঁর নানা রকম আপত্তি। তোমার চাল-চুলো নেই, পরের বাড়িতে থাক, মোটে দেড়-শ টাকা মাইনে পাও, তার ওপর আবার জাতে খ্রীষ্টান, আবার আমার চাইতে বয়সে এক বৎসরের ছোট। বললেন, বিয়ে হতেই পারে না। আর একটি খবর শোন। গুঞ্জন ঘোষের নাম শুনেছ? চমৎকার গায়, সুন্দর চেহারা, কোঁকড়া চুল। সিভিল সাপ্লাইএ ছ-শ টাকা মাইনে পায়, বাপের একমাত্র ছেলে, বাপ কনট্রাকটারি করে নাকি কোটি টাকা করেছে। সেই গুঞ্জনের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। দুঃখ করো না, লক্ষ্মীটি। বকুল মল্লিককে চেন তো? আমার চেয়ে তিন বছরের জুনিয়ার, ডায়োসিসানে এক সঙ্গে পড়েছি। আমার কাছে দাঁড়াতে পারে না, তা হ'ক অমন মেয়ে হাজারে একটি পাবে না। বকুলকে বাগাও, তুমি সুখী হবে। প্রিয় ডারলিং, এই আমার শেষ প্রেমপত্র, কাল থেকে তুমি আমার ভাই, আমি তোমার স্নেহময়ী দিদি। ইতি। আজ পর্যন্ত তোমারই—হিন্দোলা।

চিঠি পড়ে পরেশবাবু বললেন, তুমি তো আচ্ছা বোকা হে! হিন্দোলা নিজেই সরে পড়ছে, এ তো অতি সুখবর, এতে দুঃখ কিসের? তোমার আবার কালীঘাটে পুজো দেওয়া চলবে না, না হয় গির্জেয় দুটো মোমবাতি জেবলে দিও। নাও এখন ওঠ, চোখে মুখে জল দাও, চা আর খানকতক লুচি খাবে এস। হাঁ, ভাল কথা—পাথরটার কোনও গতি করতে পারলে?

প্রিয়তোষ করুণ স্বরে বললে, গিলে ফেলেছি সার। এ প্রাণ আর রাখব না, আপনার পাথর আমার সঙ্গেই কবরে যাবে। ওঃ, এত দিনের ভালবাসার পর এখন কিনা গুঞ্জন ঘোষ!

পরেশবাবু আশ্চর্য হয়ে বললেন, পাথরটা গিললে কেন? বিষ নাকি?

প্রিয়তোষ বললে, কম্পোজিশন তো জানা নেই সার, কিন্তু মনে হচ্ছে ওটা বিষ। যদি বিষ

নাও হয়, যদি আজ রাত্রির মধ্যে না মরি, তবে কাল সকালে নিশ্চয় দশ গ্রাম পটাশ সায়ানাইড খাব, আমি ওজন করে রেখেছি। আপনি ভাববেন না সার, আপনার পাথর আমার সঙ্গেই কবরস্থ হয়ে থাকবে, সেই ডে অভ জজমেণ্ট পর্যন্ত।

পরেশবাবু বললেন, আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে! ওসব বদখেয়াল ছাড়, আমি চেষ্টা করব যাতে হিন্দোলার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়। ওর বাপ জগাই মজুমদার আমার বাল্যবন্ধু, ঘুঘু লোক। তোমাকে আমি ভাল রকম যৌতুক দেব, তা শুনলে হয়তো সে মেয়ে দিতে রাজী হবে। কিন্তু তুমি যে খ্রীষ্টান—

—হিঁদু হব সার।

—একেই বলে প্রেম। এখন ওঠ, ডাক্তার চ্যাটার্জির কাছে চল, পাথরটাকে তো পেট থেকে বার করতে হবে।

পরেশবাবু জানালেন যে প্রিয়তোষ অন্যমনস্ক হয়ে একটা পাথরের নুড়ি গিলে ফেলেছে। ডাক্তারের উপদেশে পরদিন এক্স রে ফটো নেওয়া হল। তা দেখে ডাক্তার চ্যাটার্জি বললেন, এমন কেস দেখা যায় না, কালই আমি লানসেটে রিপোর্ট পাঠাব। এই ছোকরার অ্যাসেণ্ডিং কোলনের পাশ থেকে ছোট্ট একটি সেমিকোলন বেরিয়েছে, তার মধ্যে পাথরটা আটকে আছে। হয়তো আপনিই নেমে যাবে। এখন যেমন আছে থাকুক, বিশেষ কোনও ক্ষতি হবে না। যদি খারাপ লক্ষণ দেখা দেয় তবে পেট চিরে বার করে দেব।

পরেশবাবুর চিঠি পেয়ে জগাই মজুমদার তাড়াতাড়ি দেখা করতে এলেন এবং কথাবার্তার পর ছুটে গিয়ে তাঁর মেয়েকে বললেন, ওরে দোলা, প্রিয়তোষ হিন্দু হতে রাজী হয়েছে, তাকেই বিয়ে কর্। দেরি নয়, ওর শুদ্ধিটা আজই হয়ে যাক, কাল বিয়ে হবে।

হিন্দোলা আকাশ থেকে পড়ে বললে, কি তুমি বলছ বাবা! এই পরশু বললে গুঞ্জন ঘোষ, আবার আজ বলছ প্রিয়তোষ! এই দেখ, গুঞ্জন আমাকে কেমন হীরের আংটি দিয়েছে। বেচারা মনে করবে কি? তুমি তাকে কথা দিয়েছ, আমিও দিয়েছি, তার খেলাপ হতে পারে না। গুঞ্জনের কাছে কি প্রিয়তোষ? কিসে আর কিসে?

জগাইবাবু বললেন, যা যাঃ, তুই তো সব বুঝিস। প্রিয়তোষ এখন হিরণ্যগর্ভ হয়েছে, তার পেটে সোনার খনি। যবে হক একদিন বেরুবেই, তখন সেই পরশ পাথর তোরই হাতে আসবে। পরেশবাবু সেটা আর নেবেন না, প্রিয়তোষকে যৌতুক দিয়েছেন। ফেরত দে ওই হীরের আংটি, অমন হাজারটা আংটি প্রিয়তোষ তোকে দিতে পারবে। এমন সুপাত্রের কাছে কোথায় লাগে তোর গুঁজে ঘোষ আর তার কনট্রাক্টার বাপ? আর কথাটি নয়, প্রিয়তোষকেই বিয়ে কর।

অশ্রুগদ্‌গদকণ্ঠে ফুঁপিয়ে হিন্দোলা বললে, তাকেই তো ভালবাসতুম। কিন্তু বড্ড যে বোকা!

জগাইবাবু বললেন, আরে বোকা না হলে তোকে বিয়ে করতে চাইবে কেন? যার পেটে পরশ পাথর সে তো ইচ্ছে করলেই পৃথিবীর সেরা সুন্দরীকে বিয়ে করতে পারে।

প্রিয়তোষ হেনরি বিশ্বাসের মনে বিন্দুমাত্র অভিমান নেই। তার শুদ্ধি হল, এক সের ভেজিটেব্‌ল ঘি দিয়ে হোম হল, পাঁচ জন ব্রাহ্মণ লুচি-ছোকা-দই-বোঁদে খেলে। তার পর

শুভলগ্নে হিন্দোলা-প্রিয়তোষের বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু জগাইবাবু আর তাঁর কন্যার মনস্কামনা পূর্ণ হল না, পাথরটা নামল না। কিছুদিন পরে এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেল —পরেশবাবুর তৈরী সমস্ত সোনার জেল্লা ধীরে ধীরে কমে যেতে লাগল, মাস খানিক পরে যেখানে যত ছিল সবই লোহা হয়ে গেল।

ব্যাখ্যা খুব সোজা। সকলেই জানে যে ব্যর্থ প্রেমে স্বাস্থ্য যেমন বিগড়ে যায় তৃপ্ত প্রেমে তেমনি চাংগা হয়, দেহের সমস্ত যন্ত্র চটপট কাজ করে, অর্থাৎ মেটাবলিজম বেড়ে যায়। প্রিয়তোষ এক মাসের মধ্যে পাথর জীর্ণ করে ফেলেছে, এক্স রে-তে তার কণামাত্র দেখা যায় না। পাথরের তিরোধানের সংগে সংগে পরেশবাবুর সমস্ত সোনা পূর্বরূপ পেয়েছে।

হিন্দোলা আর তার বাবা ভীষণ চটে গেছেন। বলছেন, প্রিয়তোষটা মিথ্যাবাদী ঠক জোচ্চোর। ধাপ্পায় বিশ্বাস করে তাঁরা আশায় আশায় এত দিন বৃথাই ওই খ্রীষ্টানটার ময়লা ঘেঁটেছেন। কিন্তু পরশ পাথর হজম করে প্রিয়তোষ মনে বল পেয়েছে, তার বুদ্ধিও বেড়ে গেছে, পত্নী আর শ্বশুরের বাক্যবাণ সে মোটেই গ্রাহ্য করে না। এমন কি হিন্দোলা যদি বলে, তোমাকে তালাক দেব, তবু সে সায়ানাইড খাবে না। সে বুঝেছে যে সেণ্ট ফ্রান্সিস আর পরমহংসদেব খাঁটি কথা বলে গেছেন, কামিনী আর কাঞ্চন দুইই রাবিশ; লোহার তুল্য কিছু নেই। এখন সে পরেশবাবুর নূতন লোহার কারখানা চালাচ্ছে, রোজ পঞ্চাশ টন নানা রকম মাল ঢালাই করছে, এবং বেশ ফুর্তিতে আছে।

১৩৫৫ (১৯৪৮)

রামরাজ্য

জেলা জজ সুবোধ রায় সম্প্রতি অবসর নিয়ে কলকাতায় বাস করছেন। তিনি এখন গীতা পড়েন, সস্ত্রীক ঘন ঘন সিনেমা দেখেন, বন্ধুদের সঙ্গে ব্রিজ খেলেন এবং রাজনীতি নিয়ে তর্ক করেন। তাঁর আর একটি শখ আছে—প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় তাঁর বাড়িতে একটি সেয়াঁস বা প্রেতচক্রের অধিবেশন হয়। এই চক্রের সদস্য সাত জন, যথা—

সুবোধ রায় নিজে,
বিপাশা দেবী—তাঁর পত্নী,
হরিপদ কবিরত্ন—অধ্যাপক,
কানাই গাঙ্গুলী—প্রবীণ দেশপ্রেমী,
ভুজঙ্গ ভঞ্জ—নবীন দেশপ্রমী,
অবধবিহারী লাল—কারবারী দেশপ্রেমী,
ভূতনাথ নন্দী—বিখ্যাত মিডিয়ম।

ভূতনাথ গুণী লোক। তিন মিনিট আবাহন করতে না করতে তার উপর পরলোকবাসীর ভর হয় এবং তার মুখ দিয়ে অনর্গল অলৌকিক বাণী বেরুতে থাকে। ভূতনাথের বয়স ত্রিশের মধ্যে। শোনা যায় পূর্বে সে স্কুলমাস্টার ছিল, তার পর গল্প নাটক ও কবিতা লিখত তারপর থিয়েটার সিনেমায় অভিনয় করত। এক কালে তার একটা কুস্তির আখড়াও ছিল। সম্প্রতি নিজের আশ্চর্য ক্ষমতা আবিষ্কার করে সে পেশাদার মিডিয়ম হয়েছে, সুবোধবাবু তাঁর একজন বড় মক্কেল।

প্রেতচক্রের মামুলি পদ্ধতি হচ্ছে—অন্ধকার ঘরে সদস্যগণ টেবিলের চারিধারে বসেন এবং সকলে হাত ধরাধরি করে কোনও পরলোকবাসীকে একমনে ডাকেন। কিন্তু সুবোধবাবু খুঁতখুঁতে লোক। অন্ধকারে অন্য পুরুষ—বিশেষ করে ওই ভুজঙ্গ ছোকরা—তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর হাত ধরে থাকবে, এ তিনি মোটেই পছন্দ করেন না। ভাগ্যক্রমে ভূতনাথকে পেয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছেন। লোকটির আশ্চর্য ক্ষমতা, প্রেতাত্মার দল যেন তার পোষ-মানা। সে যেখানে মিডিয়ম হয় সেখানে হাত ধরার দরকার হয় না। অন্ধকার না হলেও চলে। এমন কি, প্রেতাত্মার কথার ফাঁকে ফাঁকে নিজেদের মধ্যে গল্প করা চলে, চা সিগারেট পান খেতেও বাধা নেই।

আজ শনিবার সন্ধ্যাবেলায় নীচের বড় ঘরে যথারীতি প্রেতচক্রের বৈঠক বসেছে, সকল সদস্যই উপস্থিত আছেন। ঘরে আলো জ্বলছে, কিন্তু সব দরজা জানালা বন্ধ, পাছে কোনও উটকো লোক এসে বিঘ্ন ঘটায়।

পূর্বে কয়েকটি অধিবেশনে চন্দ্রগুপ্ত সিরাজুদ্দৌলা নেপোলিয়ন হিটলার প্রভৃতি নামজাদা লোক এবং পরলোকগত অনেক আত্মীয় স্বজন ভূতনাথের মারফত তাঁদের বাণী বলেছেন। সুবোধবাবু প্রশ্ন করলেন, আজ কাকে ডাকা হবে?

ভুজংগ ভঞ্জ বললে, আমার দাদামশাইকে একবার ডাকুন। তাঁর ভিক্টোরিয়া মার্কা গিনিগুলো কোথায় রেখে গেছেন খুঁজে পাচ্ছি না।

অবধবিহারী লাল বললে, দাদা চাচা মামু মৌসা উ সব ছোড়িয়ে দেন, মহাৎমাজীকে বোলান। দেখছেন তো, দেশ জহান্নমে যাচ্ছে, তিনি একটা সলাহ্ দেন জৈসে তুরন্ত্ রামরাজ্ হইয়ে যায়।

কানাই গাঙ্গুলী বললে, তাঁকে আর কষ্ট দেওয়া কেন, ঢের করে গেছেন, এখন বিশ্রাম করুন।

ভুজংগ ভঞ্জ বললে, মহাত্মাজীকে ডেকে লাভ নেই, তিনি কি বলবেন তা তো জানাই আছে।—চরকা চালাও, মাইনে কম নাও, হুইস্কি ছাড়, বান্ধবীদের তাড়াও, ব্রহ্মচর্য পালন কর। এসব শুনতে গেলে কি রাজ্য চালানো যায়! কি বলেন কানাই-দা?

বিপাশা দেবী বললেন, আচ্ছা মহাত্মাজীর যিনি ইষ্টদেব সেই রামচন্দ্রকে ডাকলে হয় না?

অবধবিহারী। বহুত অচ্ছি বাত বোলিয়েছেন, রামচন্দ্রজীকোই বোলান।

সুবোধ। সেই ভাল, রামরাজ্যের ফার্স্টহ্যান্ড খবর মিলবে।

ভুজংগ। তাঁকে কোথায় পাবেন? তিনি ঐতিহাসিক পুরুষ কিনা তারই ঠিক নেই। ভূতনাথবাবু কি বলেন?

ভূতনাথ। চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

বিপাশা দেবীর প্রস্তাব সোৎসাহে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল। তখন সকলে গুনগুন করে 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম' গাইতে লাগলেন। দু মিনিট পরে ভূতনাথ চোখ কপালে তুলে মুখ উঁচু করে চেয়ারে হেলে পড়ল এবং অস্ফুট গোঁ গোঁ শব্দ করতে লাগল। সুবোধ-বাবু সসম্ভ্রমে বললেন, কনট্রোল এসে গেছেন,—অর্থাৎ মিডিয়মের উপর অশরীরী আত্মার আবেশ হয়েছে। অবধবিহারী বলে উঠল, রাজা রামচন্দ্রজীকি জয়!

ভূতনাথের মুখ থেকে শব্দ হল—খ্যাঁক খ্যাঁক। সুবোধবাবু বললেন, কে আপনি প্রভু?

অবধবিহারী। রাষ্ট্রভাষা হিন্দীমে পুছিয়ে, রামচন্দ্রজী বাংলা সমঝেন না। অপ কৌন হৈঁ মহারাজ?

আবার খ্যাঁক খ্যাঁক। কবিরত্ন হাতজোড় করে সবিনয়ে বললেন, প্রভু, যদি আমাদের অপরাধ হয়ে থাকে তো মার্জনা করুন। কৃপা-পূর্বক বলুন কে আপনি।

ভূতনাথের মুখ থেকে উত্তর বেরুল—অহম্মারুতিঃ।

অবধবিহারী। আরে, ই তো চীনা বোলি বোলছে!

কবিরত্ন। চীনা নয়, দেবভাষায় বলছেন—আমি মারুতি। স্বয়ং পবননন্দন শ্রীহনুমানের আবির্ভাব হয়েছে।

অবধবিহারী। জয় বজরঙ্গ্‌বলী মহাবীরজী!—

রাম কাজ লগি তব অবতারা।
কনক বরন তন পর্বতাকারা ॥

প্রভু অপ হিন্দীমে কহিয়ে, রামরাজ্যকি ভাষা।

ভূতনাথের জবানিতে মহাবীর আর একবার সজোরে খ্যাঁক করে উঠলেন, তার পর বললেন, রামরাজ্যের ভাষার তুমি কি জানো হে? এখন গন্ধমাদনে থাকি, কিন্তু আমার আদি নিবাস কিষ্কিন্ধ্যা, মাইসোরের কাছে বেলারি জেলায়। আমার মাতৃভাষাই জগতের আদি ও বুনিয়াদি ভাষা। যদি সে ভাষায় কথা বলি তবে তোমাদের রাজাজী আর পট্টাভিজী হয়তো একটু আধটু বুঝবেন, কিন্তু জহরলালজী রাজেন্দ্রজী আর তোমরা বিন্দুবিসর্গও বুঝবে না।

বিপাশা। থাক থাক। আপনি যখন বাংলা জানেন তখন বাংলাতেই বলুন।

মহাবীর। কিরকম বাংলা? ঢাকাই, না মানভূমের, না বাগবাজারী, না বালিগঞ্জী?

বিপাশা। আপনি মাঝামাঝি ভবানীপুরী বাংলায় বলুন, তা হলে আমরা সবাই বুঝতে পারব।

কবিরত্ন। প্রভু মারুতি, আপনার আগমনে আমরা ধন্য হয়েছি, কিন্তু ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এলেন না কেন?

মহাবীর। তাঁর আসতে বয়ে গেছে। তোমাদের কি-এমন পুণ্য আছে যে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে চাও? তাঁর আজ্ঞায় আমি এসেছি। এখন কি জানতে চাও চটপট বলে ফেল, আমার সময় বড় কম।

সুবোধ। শুনুন মহাবীরজী। আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, কিন্তু আর কিছুই পাই নি।—

কবিরত্ন। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, গৃহ নেই, ধর্ম নেই, সত্য নেই, ত্যাগ নেই, বিনয় নেই, তপস্যা নেই—

অবধবিহারী। বিলকুল চোর, ডাকু, লুটেরা, কালাবাজারুয়া, গাঁঠ-কটৈয়া—

ভুজঙ্গ। পুঁজিপতির অত্যাচার, সর্বহারার আর্তনাদ, জুলুম, ফাসিজ্‌ম, ধাপ্পাবাজি, কথার তুবড়ি, ভাইপো-ভাগনে-শালা-শালী-পিসতুতো-মাসতুতো-ভরণতন্ত্র—

কানাই। বিদেশী গুরুর প্ররোচনায় স্বদেশদ্রোহিতা, ভারতের আদর্শ বিসর্জন, স্বার্থসিদ্ধির জন্য মিথ্যার প্রচার, কিষান-মজদুরকে কুমন্ত্রণা, বোকা ছেলেমেয়েদের মাথা খাওয়া, পিস্তল, বোমা—

মহাবীর। থাম থাম। কি চাও তাই বল।

অবধবিহারী। হামি বোলছি, শুনেন মহাবীরজী।—চারো তরফ ঘুস-খবৈয়া, সব মুনাফা ছিনিয়ে লিচ্ছে। বড় কষ্টে রহেছি, যেন দাঁতের মাঝে জিভ। বিভীখনজী জৈসা বোলিয়েছেন—

সুনহু পবনসুত রহনি হমারী।
জিমি দসনন্হি মহু জীভ বিচারী ॥

প্রভু, এক মুক্কা মার কে ইয়ে সব দাঁত তোড়িয়ে দেন।

কবিরত্ন। তুমি একটু চুপ কর তো বাপু। মহাবীরজী, আমরা কেবল রামরাজ্য চাই, তা হলেই সব হবে। সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতদের বিনাশ, প্রজার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল।

কানাই। পণ্ডিত মশাই, ব্যস্ত হলে চলবে না, রাষ্ট্র-শাসনের ভার কদিনই বা আমরা পেয়েছি। মহাবীরজীর কৃপায় যদি দেশ-দ্রোহীদের জব্দ করতে পারি তবে দেখবেন শীঘ্রই কিষান-মজদুর-রাজ হবে।

কবিরত্ন। কিষাণ-মজদুর সেক্রেটেরিয়েটে বসে রাজকার্য চালাবে?

ভুজঙ্গ। শোনেন কেন ওসব কথা, শুধু ভোট বজায় রাখবার জন্য ধাপ্পাবাজি।

কানাই। ভাই হে, ধাপ্পাবাজির ওস্তাদ তো তোমরা, তোমাদেরই গুটিকতক বুলি আমরা শিখেছি।

সুবোধ। থাম, এখন ঝগড়া করো না। মহাবীরজী, দলাদলিতে দেশ উৎসন্নে যাচ্ছে, আপনি প্রতিকারের একটা উপায় বলুন। আমরা চাই বিশুদ্ধ ডিমোক্রাসি অর্থাৎ গণতন্ত্র, কিন্তু নানা দলের নানা কথা শুনে লোকে ঘাবড়ে যাচ্ছে, ডিমোক্রাসি দানা বাঁধতে পাচ্ছে না।

মহাবীর। একটা প্রাচীন ইতিহাস বলছি শোন।—গোনর্দ দেশের রাজা গোবর্ধনের এক-লক্ষ গরু ছিল, তারা রাজধানীর নিকটস্থ অরণ্যে চরে বেড়াত, জনকতক গোপ তাদের পালন করত। কি একটা মহাপাপের জন্য অগস্ত্য মুনি শাপ দেন, তার ফলে রাজা এবং বিস্তর প্রজার মৃত্যু হল, অবশিষ্ট সকলে পালিয়ে গেল। রাজার গরুর পাল রক্ষকের অভাবে উদ্‌-ভ্রান্ত হয়ে পড়ল এবং হিংস্র জন্তুর আক্রমণে বিনষ্ট হতে লাগল! তখন একটি বিজ্ঞ বৃষ বললে, এরকম অরাজক অবস্থায় তো আমরা বাঁচতে পারব না, ওই পর্বতের গুহায় পশুরাজ সিংহ থাকেন, চল আমরা তাঁর শরণাপন্ন হই। গরুদের প্রার্থনা শুনে সিংহ বলল, উত্তম প্রস্তাব, আমি তোমাদের রাজা হলুম, তোমাদের রক্ষাও করব। কিন্তু আমাকেও তো জীবন-ধারণ করতে হবে, অতএব তোমরা রাজকর স্বরূপ প্রত্যহ একটি নধর গরু আমাকে পাঠাবে। গরুর দল রাজী হয়ে প্রণাম করে চলে গেল এবং সিংহকে রাজকর দিতে লাগল। কিছুকাল পরে সিংহ মাতব্বর গরুদের ডেকে আনিয়ে বললে, দেখ, একটি গরুতে আর কুলচ্ছে না, রাজ্য-শাসনের জন্য অনেক অমাত্য পাত্রমিত্র বাহাল করতে হয়েছে। আমিও সংসারী লোক, পুত্রকন্যা ক্রমেই বাড়ছে, তাদেরও তো খাওয়াতে হবে। অতএব রাজকর বাড়াতে হচ্ছে, এখন থেকে তোমরা প্রত্যহ দশটি গরু পাঠাও। গরুরা বিষণ্ণ হয়ে যে আজ্ঞে বলে চলে গেল। আরও কিছুকাল পরে সিংহ বললে, ওহে প্রজাবৃন্দ, দশটি গরুতে আর চলে না, রাজ্যশাসন সোজা কাজ নয়। আর তোমরাও অতি বেয়াড়া প্রজা, তোমাদের দমনের জন্য বিস্তর কর্মচারী রাখতে হয়েছে। অতএব এখন থেকে প্রতিদিন কুড়িটি করে গরু পাঠাও। গরুর মুখপাত্ররা উপায়ন্তর না দেখে এবারেও বললে, যে আজ্ঞে মহারাজ; তার পর কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেল। তখন সেই বিজ্ঞ বৃষ বললে, এই অরণ্যের উত্তর প্রান্তে এক মহাস্থবির তপস্বী বৃষ আছেন। পূর্বজন্মে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, অখাদ্য ভোজনের ফলে বৃষত্ব পেয়েছেন। এখন তিনি তপস্যা করে গবর্ষি হয়েছেন। তিনি মহাজ্ঞানী, চল তাঁকে আমাদের দুঃখ জানাই। গরুরা গবর্ষির আশ্রমে গিয়ে তাদের দুঃখের কথা বললে। কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ থেকে গবর্ষি বললেন, আমি তোমাদের একটি মন্ত্র শিখিয়ে দিচ্ছি, এটি তোমরা নিরন্তর জপ কর—গোহিতায় গোভির্গবাং শাসনম্‌।

বিপাশা। মানে কি হল?

কবিরত্ন। অর্থাৎ গরুর হিতের নিমিত্ত গরু কর্তৃক গরু শাসন।

বিপাশা। আশ্চর্য! ঠিক যেন government of the people, by the people, for the people.

মহাবীর। তার পর শোন। গবর্ষি বললেন, এই মন্ত্রটি তোমরা সর্বত্র প্রচার করবে, এক মাস পরে আবার আমার কাছে আসবে। গরুর দল মন্ত্র পেয়ে তুষ্ট হয়ে চলে গেল এবং এক মাস পরে আবার এল। গবর্ষি প্রশ্ন করলেন, তোমাদের সংখ্যা কত? গরুরা বললে, প্রায় এক লক্ষ; সিংহ অনেককে খেয়েছে, নয়তো আরও বেশী হত। গবর্ষি বললেন, সিংহ আর তার অনুচরবর্গের সংখ্যা কত? গরুরা বললে, শ-খানিক হবে। গবর্ষি বললেন, মন্ত্র জপ করে তোমাদের তেজ বৃদ্ধি পেয়েছে, এখন এক কাজ কর—সকলে মিলে শিং উঁচিয়ে চারিদিক থেকে তেড়ে গিয়ে সিংহদের গুঁতিয়ে দাও। গরুর দল মহা উৎসাহে সিংহদের আক্রমণ করলে, গোটাকতক গরু মরল, কিন্তু সিংহের দল একেবারে ধ্বংস হল।

বিপাশা। কিন্তু আবার তো অরাজক হল?

মহাবীর। উঁহু। গরুরা গণতন্ত্রের মন্ত্র শিখেছে, তারা নিজেদের মধ্যে থেকে কয়েকটি চালাক উদ্যমশীল গরু নির্বাচন করে তাদের উপর প্রজাশাসনের ভার দিল। কিছুকাল পরে দেখা গেল, সেই শাসক-গরুদের খাড়া খাড়া গোঁফ বেরিয়েছে, শিং খসে গেছে, খুরের জায়গায় থাবা আর নখ হয়েছে। তাদের কেউ বাঘের, কেউ শেয়ালের, কেউ ভালুকের রূপ পেয়েছে। প্রজা-গরুরা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, ভাই সব, এ কি দেখছি? কোন পাপে তোমাদের এই শ্বাপদ-দশা হল? শাসক-গরুরা উত্তর দিলে, হুঁহুঁ, পাপ নয়, আমরা ক্ষত্রিয় হয়েছি, ঘাস খেয়ে রাজকার্য করা চলে না, জাবর কাটতে বৃথা সময় নষ্ট হয়। এখন আমরা আমিষাহারী। ঘরে-বাইরে শত্রুরা ওত পেতে আছে, তোমাদের রক্ষণ আর সেবার জন্য বিস্তর কর্মচারী রাখতে হয়েছে। আমাদের প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়, সেজন্য ক্ষুধাও প্রবল। বনের সব মৃগ আমরা খেয়ে ফেলেছি। যদি সুশাসন চাও তবে তোমরা সকলে কিঞ্চিৎ স্বার্থত্যাগ করে আমাদের উপযুক্ত আহার যোগাও, যেমন সিংহের আমলে যোগাতে। গরুরা রাজী হল। কিন্তু গুটি-কতক ধূর্ত গরু ভাবলে, বাঃ, এরা তো বেশ আছে, সর্দারি করে বেড়াচ্ছে, ঘাস খুঁজতে হচ্ছে না, জাবর কাটতে হচ্ছে না, আমাদেরই হাড় মাস কড়মড় করে খাচ্ছে। আমরাই বা ফাঁকে পড়ি কেন? এই স্থির করে তারা দল বেঁধে শ্বাপদ গরুদের গুঁতিয়ে তাড়িয়ে দিলে এবং নিজেরাই শাসক হল। কিছুকাল পরে তারাও শ্বাপদ হয়ে গেল এবং তাদের দেখে অন্য গরুদেরও প্রভুত্বের লোভ হল। এই রকমে সমস্ত গরু গুঁতোগুঁতি কামড়াকামড়ি করে মরে গেল, গোনর্দ দেশ একটি গোভাগাড়ে পরিণত হল।

কানাই। আপনার এই গল্পের মরাল কি? আপনি কি বলতে চান গণতন্ত্র খারাপ?

মহাবীর। তন্ত্রে রাজ্যশাসন হয় না, মানুষই রাজ্য চালায়। গণতন্ত্র বা যে তন্ত্রই হোক, তা শব্দ মাত্র, লোকে ইচ্ছানুসারে তার ব্যাখ্যা করে।

সুবোধ। ঠিক বলেছেন। ব্রিটেন আমেরিকা রাশিয়া প্রত্যেকেই বলে যে তাদের শাসনতন্ত্র খাঁটি ডিমোক্রাসি।

মহাবীর। শাসনপদ্ধতির নাম যাই হ'ক দেশের জনসাধারণ রাজ্য চালায় না, তারা কয়েকজনকে পরিচালক রূপে নিযুক্ত করে, অথবা ধাপ্পায় মুগ্ধ হয়ে একজনের বা কয়েকজনের কর্তৃত্ব মেনে নেয়। এই কর্তারা যদি সুবুদ্ধি সাধু নিঃস্বার্থ ত্যাগী কর্মপটু হয় তবে প্রজারা সুখে থাকে। কিন্তু কর্তারা যদি মূর্খ হয়, অথবা ধূর্ত অসাধু স্বার্থপর ভোগী আর অকর্মণ্য হয় তবে প্রজারা কষ্ট পায়, কোনও তন্ত্রেই ফল হয় না।

ভুজঙ্গ। আপনার রামরাজ্য কি ছিল? একেবারে অটোক্রাসি, স্বৈরতন্ত্র, প্রজাদের কোনও ক্ষমতা ছিল না।

মহাবীর। কে বললে ছিল না? কোশলরাজমহিষী সীতার বনবাস হল কাদের জন্য? শম্বুককে মারা হল কাদের কথায়?

বিপাশা। কিন্তু রামচন্দ্রের এইসব কাজ কি ভাল?

মহাবীর। ভালই হ'ক আর মন্দই হ'ক রামচন্দ্র লোকমত মেনেছিলেন। তখনকার ভালমন্দের বিচার করা এখনকার লোকের সাধ্য নয়। লোকমত সৃষ্টি করেন প্রভাবশালী সুবুদ্ধি সাধুগণ, অথবা ধূর্ত অসাধুগণ। রামচন্দ্র নিজের মতে চলতেন না। নিঃস্বার্থ জ্ঞানী ঋষিরা কর্তব্য-অকর্তব্য বেঁধে দিয়েছিলেন, রামচন্দ্র তাই মানতেন, প্রজারাও তাই মানত। এখনকার বিচারে ঋষিদের অনেক বিধানে ত্রুটি বেরুবে, কিন্তু তাঁরা ঐশ্বর্যকামী বা প্রভুত্বকামী ছিলেন না, রাজার কর্তব্য-অকর্তব্য সম্বন্ধেও সকলে প্রায় একমত ছিলেন, সেজন্য কেউ তাঁদের ছিদ্র পেত না, বিপক্ষও হত না।

সুবোধ। অর্থাৎ রামরাজ্য মানে ওআন পার্টি ঋষিতন্ত্র। এখন সেরকম ঋষি যোগাড় করা যায় কি করে?

মহাবীর। ঋষি চাই না। যাঁদের হাতে দেশশাসনের ভার এসেছে তাঁরা যদি বুদ্ধিমান সাধু নিঃস্বার্থ ত্যাগী কর্মী হন তবে লোকমত তাঁদের অনুসরণ করবে।

সুবোধ। কিন্তু ধূর্ত অসাধুরা তাঁদের পিছনে লাগবে, ভাঁওতা দিয়ে স্বপক্ষে ভোট যোগাড় করবে কর্তৃত্ব দখল করবে।

মহাবীর। কত দিন তা পারবে? স্বাধীনতালাভের চেষ্টায় তোমাদের বহু লোক বহু বাধা পেয়েছেন, জীবনপাতও করেছেন। তাঁরা স্বাধীনতা দেখে যেতে পারেন নি, কিন্তু তাঁদের সাধনা সফল হয়েছে। রামরাজ্য অর্থাৎ সাধুজন-পরিচালিত রাজ্যের প্রতিষ্ঠাও সেই রকমের হবে। এই ব্রত যাঁরা নেবেন তাঁরা নিজের আচরণ দ্বারা প্রজার বিশ্বাসভাজন হবেন, উপস্থিত সুবিধার জন্য কুটিল পথে যাবেন না, লোভী ধনপতি অথবা অসাধু সহকর্মীদের সঙ্গে রফা করবেন না, দুষ্কর্ম উপেক্ষা করবেন না। বার বার পরাভূত হলেও তাঁদের চেষ্টা কালক্রমে সফল হবেই। যত দিন একদল লোক এই ব্রত না নেবেন তত দিন শাসনতন্ত্রের নাম নিয়ে তর্ক করা বৃথা।

কানাই। মহাবীরজী, আপনার ব্যবস্থা এখন অচল, ওতে গণতন্ত্র হবে না। এ যুগে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির কেউ নেই।

মহাবীর। তবে সেই গরুদের মতন গুঁতোগুঁতি কামড়াকামড়ি করে মর গে।

সুবোধ। ব্রিটিশ জাতির মধ্যে কি অসাধুতা আর অপটুতা নেই? তাদের দেশে তো গণতন্ত্র অচল হয় নি।

মহাবীর। বিদেশে তারা যতই অন্যায় করুক, নিজের দেশ শাসনের জন্য যে সাধুতা আর পটুতা আবশ্যক তা তাদের আছে।

কানাই। যাই বলুন মহাবীরজী, আগে এই ভুজঙ্গ ভায়ার দলটিকে শায়েস্তা করতে হবে যত সব ঘরভেদী বিভীষণ, দাঙ্গাবাজ খুনে ডাকাত, কুচক্রী কমবক্ত কমরেড।

ভুজঙ্গ। মহাবীরজী, এই কানাইদার দলটিকে ধ্বংস না করলে কিছুই হবে না, যতসব ভেকধারী ভণ্ড, ক্রোড়পতির কুত্তা।

কানাই। মুখ সামলে কথা বল ভুজঙ্গ।

ভুজঙ্গ। যত সব মিটমিটে শয়তান, বিড়াল-তপস্বী, রক্তচোষা বাদুড়।

কানাই গাঙ্গুলি অত্যন্ত চটে উঠে ঘুষি তুলে মারতে এল, ভুজঙ্গ তার হাত ধরে ফেললে। দুজনে ধস্তাধস্তি হতে লাগল।

সুবোধবাবু বিব্রত হয়ে বললেন, তোমাদের কি স্থান কাল জ্ঞান নেই, এখন মারামারি করছ? ওহে অবধবিহারী, থামিয়ে দাও না।

অবধবিহারী। হামি আজ একাদ্সি কিয়েছি বাবুজী, বহুত কমজোর আছি।

বিপাশা। মহাবীরজী, আপনি উপস্থিত থাকতে এই সুন্দ-উপসুন্দের লড়াই হবে?

ভূতনাথ তড়াক করে লাফিয়ে উঠল এবং নিমেষের মধ্যে পিছন থেকে লাথি মেরে কানাই আর ভুজঙ্গকে ধরাশায়ী করে দিলে। তার পর আবার নিজের চেয়ারের বসে চোখ কপালে তুলে সমাধিস্থ হল।

গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে ভুজঙ্গ বললে, সুবোধবাবু, আপনার বাড়িতে এই অপমান সইতে হবে?

পাছায় হাত বুলুতে বুলুতে কানাই বললে কুমোরের পুত্তুর ভুতো নন্দী ব্রাহ্মণের গায়ে লাথি মারবে?

অবধবিহারী। এ কনহৈয়াবাবু, গুস্সা করবেন না। লাত তো ভুতনাথবাবুর থোড়াই আছে, খুদ মহাবীরজী লাত লাগিয়েছেন।

কবিরত্ন। ঠিক কথা, ভুতনাথের সাধ্য কি। স্বয়ং শ্রীহনুমান কলহ নিবারণের জন্য লাথি ছুড়েছেন। দেবতার পদাঘাতে চিত্তশুদ্ধি হয়, তাতে অপমান নেই।

বিপাশা। যেতে দিন, যেতে দিন। মহাবীরজী, কিছু মনে করবেন না।

অবধবিহারী। আচ্ছা মহাবীরজী, বোলেন তো, রামরাজ্য হোনেসে শেয়ার মার্কেট কুছ তেজ হোবে? বড়া নুকসান যাচ্ছে।

মহাবীর উত্তর দিলেন না।

ভুতনাথের মাথা ধীরে ধীরে সোজা হতে লাগল। লক্ষণ দেখে সুবোধবাবু বললেন, কনট্রোল ছেড়ে গেছেন। একটু পরে ভুতনাথ হাই তুলে তুড়ি দিয়ে বললে, দাদা, একটু চা আনতে বলুন।

অবধবিহারী। আরে ভুতনাথবাবু, মহাবীরজী তো বহুত ঝঞ্ঝট কি বাত বোলিয়েছেন, লাত ভি মারিয়েছেন।

ভুতনাথ। বলেন কি! লাথি মেরেছেন? কাকে? আমাদের কানাইদা আর ভুজঙ্গদাকে? সর্বনাশ, ইশ, বড় অপরাধ হয়ে গেছে। কিছু মনে করবেন না দাদারা—আমার কি আর হুঁশ ছিল! দিন, পায়ের ধুলো দিন।

১৩৫৬ (১৯৪৯)

শোনা কথা

আমাদের পাড়ায় একটি ছোট পার্ক আছে, চার ধারে একবার ঘুরে আসতে পাঁচ মিনিট লাগে। সকাল বেলায় অনেকগুলি বুড়ো ও আধবুড়ো ভদ্রলোক সেখানে চক্কর দেন। এঁদের ভিন্ন ভিন্ন দল, এক এক দলে তিন-চারজন থাকেন। প্রত্যেক দলের আলাপের বিষয়ও আলাদা, যেমন রাজনীতি, ধর্মতত্ত্ব, অমুক সাধুবাবার মহিমা, শেয়ার বাজারের দুরবস্থা, আজকালকার ছেলেমেয়ে, ইত্যাদি।

আশ্বিন মাস। একটি দলের কিছু পিছনে বেড়াচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ বৃষ্টি এল; পার্কে টালি দিয়ে ছাওয়া একটি ছোট আশ্রয় আছে, দলের চারজন তাতে ঢুকে পড়লেন। পূর্বে সেখানে দুটো বেঞ্চ ছিল, এখন একটা আছে, আর একটা চুরি গেছে। আমি ইতস্তত করছি দেখে একজন বললেন, ভিতরে আসুন না, ভিজছেন কেন, বেঞ্চে পাঁচজন কুলিয়ে যাবে এখন, একটু না হয় ঘেঁষাঘেঁষি হবে। বাংলায় থ্যাংক ইউ মানায় না, আমি কৃতজ্ঞতা সূচক দন্ত-বিকাশ করে বেঞ্চের এক ধারে বসে পড়লুম।

অনেক দিন থেকে এঁদের দেখে আসছি, কিন্তু কাকেও চিনি না। অগত্যা কাল্পনিক পরিচয় দিয়ে এঁদের বিচিত্র আলাপ বিবৃত করছি। প্রথম ভদ্রলোকটি—যিনি আমাকে ডেকে নিলেন—শ্যামবর্ণ, রোগা, মাথায় টাক, গোঁফ-কামানো, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি; চোখে পুরু কাচের চশমা, হাতে খবরের কাগজ। এঁকে দেখলেই মনে হয় মাস্টার মশায়। দ্বিতীয় ভদ্রলোকটিকে বহুকাল থেকে আমাদের পাড়ায় দেখে আসছি। এঁর বয়স এখন প্রায় পঁয়ষট্টি, ফরসা রং, স্থূলকায়, একটু বেশী বেঁটে। পনর বৎসর আগে এঁর কালো গোঁফ দেখেছি, তার পর পাকতে আরম্ভ করতেই বার্ধক্যের লক্ষণ ঢাকবার জন্য কামিয়ে ফেলেন। সম্প্রতি এঁর চুল প্রায় সাদা হয়ে গেছে, কিন্তু চামড়া খুব উর্বর, টাক পড়েনি। এই সুযোগে ইনি এখন আবক্ষ দাড়ি-গোঁফ এবং আকণ্ঠ বাবরি চুল উৎপাদন করেছেন, তাতে চেহারাটি বেশ ঋষি ঋষি দেখাচ্ছে। বোধহয় ইনি যোগশাস্ত্র, থিয়সফি, ফলিত জ্যোতিষ, ইলেকট্রোহোমিও-প্যাথি প্রভৃতি গূঢ় তত্ত্বের চর্চা করেন। এঁকে ভরদ্বাজবাবু বলব। তৃতীয় ভদ্রলোকটি দোহারা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, বয়স প্রায় ষাট; কাঁচা-পাকা কাইজারি গোঁফ; চেহারা সম্ভ্রান্ত রকমের, পরনে ইজের ও হাতকাটা কামিজ, মুখে একটি বড় চুরুট। সর্বদাই ভ্রূ একটু কুঁচকে আছেন, যেন কিছুই পছন্দ হচ্ছে না। ইনি নিশ্চয় একজন উঁচুদরের রাজকর্মচারী ছিলেন। এঁকে বাবু বললে হয়তো ছোট করা হবে, অতএব চৌধুরী সাহেব বলব। চতুর্থ লোকটির বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ, লম্বা মজবুত গড়ন, কালো রং, গায়ে আধময়লা খাদি পাঞ্জাবি। গোঁফটি হিটলারি ধরনে ছাঁটা হলেও দেখতে ভালমানুষ, সবিনয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে খুব মনো-যোগ দিয়ে সঙ্গীদের কথা শোনেন, মাঝে মাঝে আনাড়ীর মতন মন্তব্য করেন। ইনি কেরানী কি গানের মাস্টার, কি ভোটের দালাল, তা বোঝা যায় না। এঁকে ভজহরিবাবু বলব।

জিব দিয়ে একটা নৈরাশ্যের শব্দ করে ভজহরিবাবু বললেন, দিন দিন কি হচ্ছে বলুন তো! যা রোজগার করি তাতে খেতেই কুলয় না, ট্রামে বাসে দাঁড়াবার জায়গা নেই, আবার নতুন উপদ্রব জুটেছে বোমা। বড় ছেলেটা বিগড়ে যাচ্ছে, ধমকাবার জো নেই, তার বন্ধুদের লেলিয়ে দিয়ে কোন্‌দিন আমাকেই ঘায়েল করবে।

মাস্টার মশায় বললেন, আট শ বৎসর দাসত্বের পরে দেশ স্বাধীন হয়েছে, এখন অনেকে একটু বেচাল আর অসামাল হবেই। অবাধ্যতা বোমা চুরি-ডাকাতি কালোবাজার ঘুষ সবই কিছুকাল সইতে হবে, অবশ্য প্রতিকারের চেষ্টাও করতে হবে। এই সমস্তই স্বাধীনতাযুগের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, অন্য দেশেও এমন হয়েছে।

চৌধুরী সাহেব ধমকের সুরে বললেন, তা বলে বেপরোয়া যাকে তাকে বোমা মারবে?

মাস্টার। এ সমস্তই আমাদের কর্মফল—

ভরদ্বাজবাবু তর্জনী নেড়ে বললেন, যা বলেছ দাদা। সবই প্রারব্ধ, পূর্বজন্মের পাপের ফল।

মাস্টার। আজ্ঞে না, ইহজন্মেরই কর্মফল। আমাদের ব্যক্তিগত কর্মের নয়, জাতিগত কর্মের। অত্যাচারী ইংরেজ আর তাদের এদেশী তাঁবেদারদের মারবার জন্য স্বদেশী যুগের বিপ্লবীরা বোমা ছুড়ত। আমরা তখন আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে বৈঠকখানায় বসে তাদের প্রশংসা করতাম। এখন আর ইংরেজের ভয় নেই, প্রকাশ্যে বলছি—মিউটিনিই প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধ, খুদিরামই আদি শহীদ, সেই দেখিয়ে দিলে—দেব আরাধনে ভারত উদ্ধার, হবে না হবে না খোল তরবার।

ভরদ্বাজ। এই মতিগতির জন্যই দেশ উৎসন্নে যাচ্ছে। খুদিরাম আমাদের ধর্মবুদ্ধি নষ্ট করেছে, ছেলেদের খুন করতে শিখিয়েছে।

ভজহরি। বলেন কি মশায়! এই সেদিন মহাসমারোহে তাঁর মূর্তিপ্রতিষ্ঠা হয়ে গেল, দেশের বড় বড় লোক উপস্থিত হয়ে সেই মহাপ্রাণ বালকের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন।

মাস্টার। গান্ধীজী বেঁচে থাকলে এতে খুশী হতেন না। জওহরলালও যেতে চান নি। পূর্বে তিনি এ কথাও বলেছিলেন যে নেতাজী ভারত আক্রমণ করলে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে লড়বেন। স্বদেশের মুক্তিকামী হলেই সকলের আদর্শ আর কর্তব্যবুদ্ধি সমান হয় না।

চৌধুরী। খুদিরাম তো ইংরেজকে মেরেছিল, কিন্তু এখন যে আমাদের গায়েই বোমা ফেলছে। একেও কর্তব্যবুদ্ধি বলতে চান নাকি?

ভজহরি। মাস্টার মশায়, আপনি কি খুদিরামের কাজ গর্হিত মনে করেন?

মাস্টার। আমি অতি সামান্য লোক, ধর্মাধর্ম বিচার আমার সাধ্য নয়। কর্মের ফল যা দেখতে পাই তাই বলতে পারি। খুদিরাম যখন বোমা ফেলেছিল তখন বড় বড় মডারেটরা ধিক্‌কার দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে এই ভয়ঙ্কর পন্থায় তাঁদের আস্থা নেই। খুদিরামের দল নিজের স্বার্থ দেখেনি, প্রাণের মায়া করেনি, ধর্মাধর্ম ভাবেনি, বিনা দ্বিধায় সরকারের সঙ্গে লড়েছিল। তারা শুধু ইংরেজকে বোমা মারেনি, মডারেট বুদ্ধিতেও ফাট ধরিয়েছিল। অনেক মডারেট আড়ালে বলতেন, বাহবা ছোকরা!

চৌধুরী সাহেব অধীর হয়ে বললেন, আপনি কেবল অবান্তর কথা বলছেন, আদালতে এ রকম বললে জজের ধমক খেতে হয়। প্রশ্ন হচ্ছে এই—ইংরেজ চলে গেছে, দেশনেতাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, এখন আবার বোমা কেন?

মাস্টার মশায় সবিনয়ে বললেন, আদালতে কখনও যাইনি সার। আপনার প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দিতে পারি এমন বুদ্ধি আমার নেই। যা মনে আসছে ক্রমে ক্রমে বলে যাচ্ছি, দয়া করে শুনুন। যদি তাড়া দেন তবে সব গুলিয়ে ফেলব।

চৌধুরী। বেশ, বেশ, বলে যান।

মাস্টার। স্বদেশী যুগের সন্ত্রাসকদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ তাড়ানো, বিদেশী শাসকরা চলে যাবার পর কি করতে হবে তা তারা ভাবে নি। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যে-কোনও উপায়ে মানুষ মারা তারা পাপ মনে করত না। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জুনকে ধর্মযুদ্ধের উপদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু মহাভারতে অনত্র আড়াল থেকে বোমা মারতেও বলেছেন।

ভরদ্বাজ। কোথায় আবার বললেন? যত সব বাজে কথা।

মাস্টার। দ্রোণবধের জন্য মিথ্যা বলা এবং দুর্যোধনের কোমরের নীচে গদাঘাত বোমারই শামিল। সাধারণ ধর্ম আর আপদ্‌ধর্ম এক নয়, আপৎকালে অনেকেই অল্পাধিক অধর্মাচরণ করে থাকেন। সন্ত্রাসকরা তাই করেছিল। পরে মহাত্মা গান্ধী যখন যুদ্ধের নূতন উপায় আবিষ্কার করলেন এবং তাতে সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনাও দেখা গেল তখন সন্ত্রাসকরা নিরস্ত হল। কিন্তু তারা হিংস্রতার জমি তৈরি করে গেল, বহু লোকের ধারণা হল যে রাজনীতিক উদ্দেশ্যে হিংস্র কর্মে দোষ হয় না, বরং তাতে বাহাদুরিও আছে। সাতচল্লিশ সালে দাঙ্গায় অনেক শান্ত শিষ্ঠ হিন্দুসন্তান অসংকোচে খুন করতে শিখল। তার পর মহাত্মাজীও নিহত হলেন। অনেক গণ্যমান্য লোক চুপি চুপি বললেন, ভগবান যা করেন ভালর জন্যই করেন। এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, মুক্তিকামীদের আদি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু অন্য উদ্দেশ্য দেখা দিয়েছে এবং তার জন্য হিংস্র-অহিংস্র নানা পন্থার উদ্ভব হয়েছে।

চৌধুরী। এখন একমাত্র উদ্দেশ্য শান্তি ও শৃঙ্খলা, তার পন্থা একই—জবরদস্ত গভর্নমেন্ট।

মাস্টার। আজ্ঞে না। নানা লোকের নানা উদ্দেশ্য, কেউ চান রামরাজ্য, কেউ চান সমাজতন্ত্র, কেউ কিষান-মজদুরের রাজা হতে চান, কেউ চান সমভোগতন্ত্র বা কমিউনিজম। এঁরা কেউ স্পষ্ট করে বলতে পারেন না যে ঠিক কি চান, এঁদের পন্থাও সমান নয়, কেউ আস্তে আস্তে অগ্রসর হতে চান, কেউ তাড়াতাড়ি। কেউ মনে করেন বা মুখে বলেন যে যথাসম্ভব সত্য ও অহিংসাই শ্রেষ্ঠ উপায়, কেউ মনে করেন শঠে শাঠ্যং না হলে চলবে না, কেউ মনে করেন হিংস্র উপায়েই চটপট কার্যসিদ্ধি হবে। দেখতেই পাচ্ছেন, আজকাল কতগুলি দল হয়েছে—কংগ্রেস, তার মধ্যেও দলাদলি, সমাজতন্ত্রী, হিন্দু-মহাসভা কমিউনিস্ট, আরও কত কি। এদের মধ্যে ভাল মন্দ হিংস্র অহিংস্র সব রকম লোক আছে।

ভজহরি। কংগ্রেসে হিংস্র লোক নেই?

মাস্টার। তা বলতে পারি না। দলের নীতি বা ক্রীড যাই হোক সকলেই তা অন্তরের সঙ্গে মানে না। সব দলেই এমন লোক আছে যাদের নীতি—মারি অরি পারি যে কৌশলে। অগস্ট বিপ্লবেঅনেক কংগ্রেসী হিংস্র কাজ করেছিল। এখনও কংগ্রেসের মধ্যে এমন লোক আছে যারা প্রতিপক্ষকে যে-কোনও উপায়ে জব্দ করতে প্রস্তুত।

ভজহরি। কিন্তু কংগ্রেসের ওপর মহাত্মার প্রভাব এখনও রয়েছে। তারা যতই অন্যায় করুক কমিউনিস্টদের মতন বোমা ছোড়ে না।

মাস্টার। হিংস্র কমিউনিস্টদের তুলনায় হিংস্র কংগ্রেসী অনেক কম আছে তা মানি, কিন্তু সব কংগ্রেসী মনে প্রাণে অহিংস নয়, সব কমিউনিস্টও হিংস্র নয়। বিলাতে লাস্কি হালডেন বার্নাল প্রভৃতি মনীষীরা কমিউনিস্ট, কিন্তু তাঁরা অসৎ বা হিংস্র প্রকৃতির লোক নন, রাশিয়ার অন্ধ ভক্তও নন। এদেশেও যোশী-প্রমুখ কয়েকজন বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা হিংসার বিরোধী বলে দল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন।

চৌধুরী। মাস্টার মশায়, আপনার মতলবটা কি খোলসা করে বলুন তো। বোধ হচ্ছে আপনি কমিউনিস্ট দলের ভক্ত।

মাস্টার। কোনও দলেরই ভক্ত নই, মানুষকেই ভক্তি করি। কোন মানুষের সব কাজেরও সমর্থন করি না। দলের লেবেল দেখে বিচার করব কেন, মানুষ কেমন তাই দেখব। কমিউনিস্টদের কথাই ধরুন। অনেক লোক আছে যারা মার্কস প্রভৃতির মতে অল্পাধিক বিশ্বাস করে, সেজন্য নিজেদের কমিউনিস্ট বলে। এদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রীদের বেশী প্রভেদ নেই। আবার অনেক কমিউনিস্ট গুপ্ত সমিতির সদস্য, তারা স্বদেশী যুগের সন্ত্রাসকদের মতন লুকিয়ে কাজ করে এবং দলের নেতাদের আদেশে চলে। এদের অনেকে রাশিয়ার তাঁবেদার বা অন্ধ ভক্ত। যেমন কংগ্রেসের মধ্যে তেমন কমিউনিস্ট দলের মধ্যেও স্বার্থসর্বস্ব লোক আছে। অনেক কংগ্রেসী যেমন মন্ত্রিত্বকেই পরম কাম্য মনে করে, সেইরকম অনেক কমিউনিস্ট আশা করে যে ডিক্‌টেটরী রাষ্ট্র স্থাপিত হলে সে একটা কেষ্টবিষ্টুর পদ পাবে। আবার অনেকে, বিশেষত ছেলেমেয়ে, শখের জন্যই কমিউনিস্ট নাম নেয়। এরা কিছুই বোঝে না, শুধু কতকগুলি মুখস্থ বুলি আওড়ায়। আবার এক দল বিশেষ কিছু না বুঝলেও তাদের নেতাদের আদেশে নানা রকম হিংস্র কর্ম করে এবং ভাবে যে দেশের মঙ্গলের জন্যই করছি। এমন দুর্বৃত্তও আছে যাদের কোনও রাজনীতিক মত নেই, কিন্তু সুবিধা পেলেই শুধু নষ্টামির জন্য ট্রাম বাস পোড়ায়, বোমাও ফেলে। ভর্তৃহরি বলছেন, 'তে বৈ মানুষরাক্ষসাঃ পরহিতং স্বার্থায় নিঘ্নন্তি যে, যে তু ঘ্নন্তি নিরর্থকং পরহিতং তে কে ন জানীমহে'—যারা স্বার্থের জন্য পরের ইষ্টনাশ করে তারা নররাক্ষস, কিন্তু যারা অনর্থক পরের অহিত করে তারা কি তা জানি না।

ভরদ্বাজ। মাস্টার, তোমার কথায় এই বুঝলুম যে অনেক লোক দেশের ভাল করছি ভেবেই হিংস্র কর্ম করে, যেমন স্বদেশী যুগের সন্ত্রাসকরা করত; অনেকে হুজুক বা বজ্জাতির জন্য করে, অনেকে স্বার্থসিদ্ধির জন্যই করে। কিন্তু দেশের জনসাধারণ হিংস্রতার বিরোধী, তারা রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায় না, শুধু চায় অন্ন বস্ত্র স্বাচ্ছন্দ্য শান্তি আর সুশাসন। তোমাদের পলিটিক্সে তা হবে না। এই ধর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে প্রজাতন্ত্র সমাজতন্ত্র সমভোগতন্ত্র সমস্তই অচল ও অনাবশ্যক। দিল্লীতে যে ভারতশাসনতন্ত্র রচিত হয়েছে তাতে কিছুই হবে না।

মাস্টার। কি রকম শাসনতন্ত্র চান আপনিই বলুন।

ভরদ্বাজ। ধর্মরাজ্য চাই। প্রথমেই রাজার আশ্রয় নিতে হবে। প্রত্যেক প্রদেশে একজন উচ্চবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা থাকবেন, তাঁদের সকলের ওপরে একজন সার্বভৌম রাজচক্রবর্তী সম্রাট থাকবেন। প্রদেশে ও কেন্দ্রে কেবল বিদ্বান সদ্‌ব্রাহ্মণরা মন্ত্রী হবেন, তাঁরাই আইন করবেন রাজ্য চালাবেন। প্রজাদের কোনও সভা থাকবে না, রাম শ্যাম যদুর খেয়াল অনুসারে রাজ্য চলতে পারে না, তাতে কেবল ঝগড়া হবে। রাজারা সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রতিষ্ঠা করবেন, মাঝে মাঝে যজ্ঞ করে প্রজাদের ধর্মকর্মে উৎসাহ দেবেন। মন্দিরে মন্দিরে দেবতার পূজা হবে, শঙ্খ ঘণ্টা বাজবে, ধূপের ধূম উঠবে। রাষ্ট্রের লাঞ্ছন হবে গরুড়, বাঘ-সিংগি চলবে না। জাতীয় সংগীত হবে মোহমুদ্‌গর। ফাঁসি উঠে যাবে, পাপীদের শূলে দেওয় হবে। অনাচারী নাস্তিক আর বিধর্মীরা রাজকার্য করবে না, তারা নগরের বাইরে বাস করবে।

মাস্টার। চমৎকার, যেন সত্যযুগের স্বপ্ন। আপনার এই ধর্মরাজ্যের সঙ্গে হিটলার-মুসোলিনির রাষ্ট্রের কিছু কিছু মিল আছে। শরিয়তী রাজ্য এবং গোঁড়া রোমান ক্যাথলিকদের আদর্শ খ্রীষ্টীয় রাজ্যও অনেকটা এই রকম। কিন্তু পৃথিবীতে বহু কোটি সনাতনী থাকলেও আপনার আদর্শ ধর্মরাজ্য বা শরিয়তী-খিলাফতী রাজ্য বা হোলি রোমান এম্পায়ার আর হবার নয়।

তিন বিধাতা

সমস্ত উচ্চ স্তরের আলাপ অর্থাৎ হাই লেভেল টক যখন ব্যর্থ হল তখন সকলে বুঝলেন যে মানুষের কথাবার্তায় কিছু হবে না, ঐশ্বরিক লেভেলে উঠতে হবে। বিশ্বমানবের হিতার্থী সাধুমহাত্মারা একযোগে তপস্যা করতে লাগলেন। অবশেষে যা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি তা সম্ভব হল, ব্রহ্মা গড আর আল্লা সুমেরু অর্থাৎ হিন্দুকুশ পর্বতে সমবেত হলেন। আরও বিস্তর দেবতা ও উপদেবতার এই ঐশ্বরিক সভার বিতর্কে যোগ দেবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হতে পারে এই আশঙ্কায় উদ্‌যোক্তারা কেবল তিন বিধাতাকে আহ্বান করেছিলেন।

ব্রহ্মার সঙ্গে নারদ, গডের সঙ্গে সেন্ট পিটার, এবং আল্লার সঙ্গে একজন পীরও অনুচর রূপে অবতীর্ণ হলেন। তা ছাড়া অনেক অনাহূত দেব দেবী ঋষি সেন্ট যক্ষ নাগ ভূত পিশাচ এঞ্জেল ডেভিল প্রভৃতি মজা দেখবার জন্য অদৃশ্যভাবে আশেপাশে অবস্থান করলেন।

ব্রহ্মার মূর্তি সকলেই জানেন,—চার হাত, চার মুখ, একবার মনে হয় দাড়ি-গোঁফ আছে, আবার মনে হয় নেই। পরনে সাদা ধুতি-চাদর, কাঁধে পইতার গোছা, মাথায় মুকুট। গড নিরাকার, তাঁকে দেখবার জো নেই। তথাপি ভক্তগণের বিশেষ অনুরোধে বাক্যালাপের সুবিধার জন্য তিনি পুরাকালের জিহোভার মূর্তিতে এলেন। বুকভরা কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফ, কাঁধ-ভরা চুল, বড় বড় চোখ, কোঁচকানো ভ্রূ, দুর্বাসার মতন রাগী চেহারা, পরনে একটি আল-খাল্লা। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে চীনাবাজারে ছবির দোকানে খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় বিশেষের জন্য এই রকম ছবি বিক্রী হত, এখনও হয় কিনা জানি না।

আল্লা গডের চাইতেও নিরাকার, অনেক অনুরোধেও মূর্তি ধারণ করতে অথবা কোনও কথা বলতে মোটেই রাজী হলেন না। পীরসাহেব বললেন, কোনও ভাবনা নেই, আল্লা সর্বত্র আছেন, এখানেও আছেন; তাঁর মতামত আমিই ব্যক্ত করব। কিন্তু নারদ আর সেন্ট পিটার বললেন, তুমি যে নিজের কথাই বলবে না তার প্রমাণ কি? পীরসাহেব উত্তর দিলেন, এই চাঁদমার্কা ঝাণ্ডা খাড়া করে রাখছি, এর নীচে দাঁড়িয়ে পশ্চিম দিকে মুখ করে আমি কথা বলব; আল্লা যদি নারাজ হন তবে এই পবিত্র ঝাণ্ডা আমার মাথায় পড়বে। ব্রহ্মা ও গড এই প্রস্তাবে রাজী হলেন, কারণ আল্লার সেবককে খুশী রাখতে তাঁরা সর্বদাই প্রস্তুত।

নারদ, সেন্ট পিটার আর পীরসাহেবের বর্ণনা অনাবশ্যক। এঁদের চেহারা যাত্রার আসরে, প্রাচীন ইওরোপীয় চিত্রে এবং ইসলামী সভায় ও মিছিলে দেখতে পাওয়া যায়।

ব্রহ্মা গড ও আল্লা—এঁদের মেজাজ একরকম নয়। ঠাট্টা তামাশায় কোনও হিন্দু দেবতা চটেন না। ব্রহ্মার তো কথাই নেই, তিনি সম্পর্কে সকলেরই ঠাকুরদা। গড অত্যন্ত গম্ভীর, তবে সম্প্রতি তাঁর কিঞ্চিৎ রসবোধ হয়েছে, তাঁকে নিয়ে একটু আধটু পরিহাস করা চলে। কিন্তু আল্লা শুধু দৃষ্টির অতীত বাক্যের অতীত নন, পরিহাসেরও অতীত। পাকিস্তানী শাসনতন্ত্রের মুখবন্ধে যে আল্লার আধিপত্য ঘোষণা করা হয়েছে তা মোটেই তামাশা নয়।

তিন বিধাতা

কালিদাস লিখেছেন, মহাদেবের তপস্যার সময় নন্দীর শাসনে গাছপালা নিস্পন্দ হল, ভোমরা-মৌমাছি চুপ করে রইল, পাখি বোবা হল, হরিণের ছুটোছুটি থেমে গেল,—সমস্ত কানন যেন ছবিতে আঁকা। তিন বিধাতার সমাগমে সুমেরু পর্বতেরও সেই অবস্থা হল; কিন্তু এঁরা ধ্যানস্থ না হয়ে তর্ক আরম্ভ করলেন দেখে স্থাবর জঙ্গম আশ্বাস পেয়ে ক্রমশ প্রকৃতিস্থ হল।

ব্রহ্মাকে দেখেই জিহোভারূপী গড ভ্রূকুটি করে বললেন, তুমি কি করতে এসেছ? তোমাকে তো আজকাল কেউ মানে না, শুধু বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রে তোমার ছবি ছাপা হয়। কৃষ্ণ শিব কালী বা রামচন্দ্র এলেও কথা ছিল।

ব্রহ্মা বললেন, তাঁরা আমাকেই প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন।

পীরসাহেব অবাক হয়ে ব্রহ্মার দিকে চেয়ে আছেন দেখে নারদ বললেন, কি দেখছ সাহেব?

পীর চুপি চুপি বললেন, এঁর তো চারো তরফ চার মুহ্‌। বিছানায় শোন কি করে?

নারদ। শোবার জো কি! ভর রাত ঠায় বসে থাকেন। ইনি ঘুমুলে তো প্রলয় হবে।

পীর। ইয়া গজব!

সেণ্ট পিটার করজোড়ে বললেন, এখন সভার কাজ শুরু করতে আজ্ঞা হোক।

ব্রহ্মা বললেন, মাই হেভন্‌লি ব্রাদার্স, মেরে আসমানী বরাদরান, আমাদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে এই সভায় একজন সভাপতি স্থির করা। আমি বয়সে সব চেয়ে বড়, অতএব আমিই সভাপতিত্ব করব।

গড বললেন, তা হতেই পারে না। তুমি হচ্ছ তেত্রিশ কোটির একজন, আর আমি হচ্ছি একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর—

ঝাণ্ডার দিকে সসম্ভ্রমে দুই হাত বাড়িয়ে পীরসাহেব বললেন, ইনিও, ইনিও।

গড। বেশ তো, আমি আর ইনি দুজনেই একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর। কিন্তু আমি হচ্ছি সিনিয়র, অতএব আমিই সভাপতি হব।

ব্রহ্মা। দাদা, কত দিন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চালাচ্ছ? জগৎ সৃষ্টি করেছ কবে?

গড। আমার পুত্র যিশু জন্মাবার প্রায় চার হাজার বৎসর আগে।

ব্রহ্মা। তার আগে কি করা হত?

গড। বাংলা বাইবেল পড়নি বুঝি? 'ঈশ্বরের আত্মা জলমধ্যে নিলীয়মান ছিল।'

ব্রহ্মা। অর্থাৎ ডুব মেরে ঘুমুচ্ছিলে। আমাদের নারায়ণ ডোবেন না, ভাসতে ভাসতে নিদ্রা যান। আল্লা তালা কি বলেন?

পীর। কোরান শরিফ পড়ে দেখবেন, তাতে সব কুছ লিখা আছে।

গড। ব্রহ্মা, তুমি না বিষ্ণুর নাইকুণ্ডু থেকে উঠেছিলে? তোমারও নাকি জন্মমৃত্যু আছে?

ব্রহ্মা। তাতে কি হয়েছে। আমার এক-একটি জীবনকালই যে বিপুল, একত্রিশের পিঠে তেরটা শূন্য দিলে যত হয় তত বৎসর। তুমি যখন জলমধ্যে নিলীয়মান ছিলে তখনও আমি দেদার সৃষ্টি করেছি।

নারদ কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, প্রভুরা, আমি বলি কি কে বড় কে ছোট সে তর্ক এখন থাকুক। আপনারা তিনজনেই সভাপতিত্ব করুন।

সেণ্ট পিটার বললেন, সেই ভাল। পীরসাহেব নীরবে ডাইনে বাঁয়ে উপরে নীচে মাথা নাড়তে লাগলেন।

নারদ বললেন আপনাদের কষ্ট দিয়ে এখানে ডেকে আনার উদ্দেশ্য—জগতে যাতে শান্তি আসে মারামারি কাটাকাটি দ্বেষ হিংসা অত্যাচার প্রতারণা লুণ্ঠন প্রভৃতি পাপকার্য যাতে দূর হয় তার একটা উপায় স্থির করা।

ব্রহ্মা। গড ভায়া, তুমিই একটা উপায় বাতলাও।

গড। উপায় তো বহুকাল আগেই বলে দিয়েছি। জগতের সমস্ত লোক যিশুর শরণাপন্ন হোক, তাঁর উপদেশ মেনে চলুক, দু-দিনে শান্তি আসবে, পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হবে।

ব্রহ্মা। কিন্তু দেখতেই তো পাচ্ছ লোকে যিশুর উপদেশ মানছে না। তবু তুমি চুপ করে আছ কেন? তোমার বজ্র ঝঞ্ঝা মহামারী অগ্নিবৃষ্টি এসব কি হল?

গড। সবই আছে, তেমন দেখলে অন্তিম অবস্থায় প্রয়োগ করব, এখন নয়। আমি মানুষকে কর্মের স্বাধীনতা দিয়েছি, যাকে বলে ফ্রি উইল। মানুষ যদি জেনে শুনে উৎসন্নে যায় তো আমি নাচার।

ব্রহ্মা। তা হলে মানছ যে মানুষের কুবুদ্ধি দূর করবার শক্তি তোমার নেই। আল্লা তালার মত কি?

পীর। দুনিয়ার লোক যদি ইসলাম মেনে নেয় তবে সব দুরুস্ত হয়ে যাবে।

নারদ। যারা মেনে নিয়েছে তাদেরও তো গতিক ভাল দেখছি না। আল্লা তাদের খৈরিয়ত করেন না কেন?

পীর। আগে সকলকে পাকিস্তানের সঙ্গে একদিল হতে হবে।

নারদ। তা তো হচ্ছে না। আল্লা জোর করে সকলকে একদিল করে দেন না কেন?

পীর। আল্লার মর্জি।

গড। শোন ব্রহ্মা।—আমি একজোড়া নিষ্পাপ মানুষ-মানুষী সৃষ্টি করে তাদের ইদং কাননে রেখেছিলুম। তারা শান্তিতে ছিল, কিন্তু তোমাদের তা সইল না। তোমার এক বংশধর সেখানে গিয়ে কুমন্ত্রণা দিয়ে আদম আর হবাকে নষ্ট করলে।

ব্রহ্মা। সে তো শয়তান করেছিল, তোমারই এক বিদ্রোহী অনুচর।

গড। শয়তান অতি বজ্জাত কিন্তু আদম-হবাকে সে নষ্ট করে নি, করেছিল বাসুকি, তোমারই এক প্রপৌত্র।

ব্রহ্মা। বাসুকি? সাপ হলেও সে অতি ভাল ছোকরা, কুমন্ত্রণা কখনই দেবে না। আচ্ছা, তাকেই জিজ্ঞাসা করা যাক। নারদ, ডাক তো বাসুকিকে।

নারদ হাঁক দিলেন—বাসুকি ওহে বাসুকি—

নিকটেই একটি দেবদারু গাছের ডালে ল্যাজ জড়িয়ে বাসুকি ঝুলছিলেন। ডাক শুনে সড়াক করে নেমে এলেন। দণ্ডবৎ হয়ে ব্রহ্মাকে প্রণাম করে বললেন, কি আজ্ঞা হয় পিতামহ?

ব্রহ্মা। হাঁ হে, তুমি নাকি ইদং কাননে গিয়ে হবা আর আদমকে নষ্ট করেছিলে?

বাসুকি তাঁর চেরা জীব কামড়ে বললেন, ছি ছি, তা কখনও পারি? ভুল শুনেছেন প্রভু। যদি অভয় দেন তো প্রকৃত ঘটনা নিবেদন করি।

ব্রহ্মা। অভয় দিলুম। তুমি ব্যাপারটা প্রকাশ করে বল।

বাসুকি বলতে লাগলেন।—সে কি আজকের কথা। সমুদ্রমন্থনের পর আমার সর্বাঙ্গে অত্যন্ত বেদনা হয়েছিল। দুই অশ্বিনীকুমারকে জানালে তাঁরা বললেন, ও কিছু নয়, হাড় ভাঙে নি, শুধু মাংস একটু থেঁতলে গেছে; দিন কতক হাওয়া বদলে এস, সেরে যাবে। তখন

তিন বিধাতা

আমি পৃথিবী পর্যটন করতে লাগলুম। বেড়াতে বেড়াতে একদিন তৌরস পর্বতের পাদ-দেশে এসে দেখলুম উপরে একটি চমৎকার উপবন রয়েছে। ঢোঁড়া সাপের রূপ ধরে পাহাড়ের খাড়া গা বেয়ে সড়সড় করে উপরে উঠলুম। দেখলুম দুটি নরনারী সেখানে বন্দী হয়ে আছে। তারা একেবারে অসভ্য, কিছুই জানে না, লজ্জাবোধও নেই। দেখে আমার দয়া হল। মেয়েটির কাছে গিয়ে মধুর স্বরে বললুম, অয়ি সর্বাংগসুন্দরী, তুমি কার কন্যা, কার পত্নী? তোমার পরনে কাপড় নেই কেন? চুল বাঁধনি কেন? নখ কাটনি কেন? গলায় হার পরনি কেন? ওই যে ষণ্ডা জংলী পুরুষটা ঘাস কাটছে, ওটা কে? তোমাদের চলে কি করে? খাও কি?

আমার সম্ভাষণে মেয়েটি খুশী হল। একটু হেসে বললে, আমি হচ্ছি হবা। ওর নাম আদম, আমার বর। আমি কারও কন্যা নই, আদমের পাঁজরা থেকে জিহোভা আমাকে তৈরি করেছেন। আমরা এখানে চাষবাস করি, ফলমূল খাই, মনের আনন্দে গান গাই আর নেচে বেড়াই।

জিজ্ঞাসা করলুম, কি ফল খাও? আম কাঁঠাল কলা আছে?

হবা বললে, আখরোট আঙুর আনার আবজুস আঞ্জীর এইসব মেওয়া খাই। শুধু ওই গাছটার ফল খাওয়া বারণ। জিহোভা বলেছেন, খেলে সর্বনাশ হবে, আক্কেল খুলে যাবে, ভালমন্দর জ্ঞান হবে।

আমি ল্যাজে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে সেই জ্ঞানবৃক্ষের একটা ফল কামড়ে খেলুম। দন্তস্ফুট করা একটু শক্ত, কিন্তু বেশ খেতে। খোসা নেই, বিচি নেই, ছিবড়ে নেই, যেন কড়া প্যাকের সন্দেশ। পিতামহ, আপনি সর্পজাতিকে আক্কেলদাঁত দেন নি, কিন্তু সেই ফলটি খাওয়া মাত্র আমার চারটি আক্কেলদাঁত ঠেলা দিয়ে বেরুল, বুদ্ধি টনটনে হল, কর্তব্য সম্বন্ধে মাথা খুলে গেল। হবাকে বললুম, ও বাছা, অ্যাদ্দিন করেছো কি, এমন ফল খাও নি?

—প্রভুর যে বারণ আছে।

—দুত্তোর বারণ। বুড়োদের কথা সব সময় শুনতে গেলে কিছুই খাওয়া হয় না। আমি বলছি, তুমি এক কামড় খেয়ে দেখ।

—যদি আক্কেল খুলে যায়?

—কোথাকার ন্যাকা মেয়ে তুমি! আক্কেল তো খোলাই দরকার, চিরকাল উজবুক হয়ে থাকতে চাও নাকি? নাও, এই দুটো ফল পেড়ে দিচ্ছি, একটা তুমি খাও, আর একটা ওই জংলী ভূত আদমকে খাওয়াও।

হবা নিজে বড় ফলটা খেয়ে ছোটটা আদমকে দিলে। তার পরেই জিব কেটে ছুটে পালাল। একটু পরে একটা ডুমুরপাতার ঝালর পরে ফিরে এসে বললে, এইবার কেমন দেখাচ্ছে আমাকে?

বাঃ, অতি চমৎকার, কোথায় লাগে উর্বশী রম্ভা মেনকা!

হবা ঠোঁট ফুলিয়ে চোখ কুঁচকে বললে, আমার হার নেই, চুড়ি নেই, চিরুনি নেই, আলতা নেই, ঠোঁটে দেবার রং নেই—

বললুম, সব হবে, ওই আদমকে বল?

আরও ঠোঁট ফুলিয়ে হবা বললে, ও বিশ্রী, কিচ্ছু দেয় না, ওর কিচ্ছু নেই। তুমি দাও, আমি তোমার কাছে থাকব, হুঁ—

বললুম, আমি ওসব কোথায় পাব? ওর হাত পা আছে, আমার তাও নেই। সাপের সংগে তুমি ঘর করবে কি করে? আমার আবার পঞ্চাশটা সাপিনী আছে, তোমাকে দেখেই ফোঁস করে উঠবে। ভাবনা কি খুকী, তোমার বরের কাছে গিয়ে ঘ্যানঘ্যান করে আবদার কর তা হলেই ও রোজগার করতে যাবে, যা চাও সব এনে দেবে।

এমন সময় হঠাৎ ঝড় উঠল, বিদ্যুৎ চমকানির সঙ্গে বজ্রনাদ হতে লাগল। দেখলুম দূর থেকে তালগাছের মতন লম্বা এক ভয়ংকর পুরুষ কোঁতকা নিয়ে আমার দিকে তেড়ে আসছেন। বুঝলুম ইনিই জিহোভা। আমি হেলে সাপের রূপ ধরে সুড়ুৎ করে পালিয়ে গেলুম।

গড বললেন, শুনলে তো, বাসুকি দোষ কবুল করছে।

ব্রহ্মা। দোষ কোথায়? তুমি দুটি প্রাণী সৃষ্টি করে তাদের অজ্ঞানের অন্ধকারে রেখে-ছিলে। সামনে জ্ঞানবৃক্ষ রেখেও তার ফল খেতে বারণ করেছিলে। বাসুকি দয়া করে তাদের জ্ঞানদান করেছে।

গড। ছাই করেছে, আমার উদ্দেশ্যই পণ্ড করেছে। সেই আদি মানব-মানবীর আদিম অবাধ্যতার ফলেই জগতে পাপ আর দুঃখকষ্ট এসেছে।

সেণ্ট পিটার বললেন, শ্রীকৃষ্ণও তো অজ্ঞদের বুদ্ধিভেদ করতে বারণ করেছেন।

নারদ। ভুল বুঝেছ বাবাজী। তাঁর কথার অর্থ—বোকা লোকদের বাজে তর্ক করতে শিখিও না। যারা চালাক তাদের তিনি বুদ্ধিযোগ চর্চা করতে বলেছেন।

সেণ্ট পিটার। কিন্তু হবা আর আদম তো বোকাই।

নারদ। আরে তারা যে আদিম মানব-মানবী, শিশুর সমান। যদি চিরকাল বোকা করে রাখাই উদ্দেশ্য হয় তবে মানুষ সৃষ্টি করার কি দরকার ছিল? ভেড়া গরুর মতন আরও জানোয়ার তৈরি করে লাভ কি? আমাদের পিতামহের কীর্তি দেখ দিকি, প্রথমেই পয়দা করলেন দশজন প্রজাপতি, মরীচি অত্রি প্রভৃতি দশটি বিদ্যাবুদ্ধির জাহাজ।

জলদগম্ভীর স্বরে গড বললেন, চোপ, গোল করো না। আমার আদেশ লঙ্ঘন করে হবা আর আদম যে আদিম পাপ করেছিল তার ফলেই তাদের সন্ততি মানবজাতি অধঃপাতে যাচ্ছে। এখনও যদি সকলে যিশুর শরণ নেয় তো রক্ষা পাবে।

ব্রহ্মা। লোকে যখন যিশুর শরণ নিচ্ছে না তখন ফ্রি উইল বাতিল করে শ্রেয়স্করী বুদ্ধি দাও না কেন?

সেণ্ট পিটার। ঈশ্বরের অভিপ্রায় বোঝা মানুষের অসাধ্য।

নারদ। আমাদের পিতামহ ব্রহ্মা তো মানুষ নন, তাঁকে অভিপ্রায় জানালে ক্ষতি কি? প্রভু গড না হয় প্রভু ব্রহ্মার কানে কানে বলুন।

পীর। আল্লার যদি মর্জি হয় তবে এক লহমায় বিলকুল শাইস্তা করে দিতে পারেন।

নারদ। তবে শাইস্তা করেন না কেন?

পীর। যদি মর্জি না হয় তবে শাইস্তা করেন না।

নারদ। বুঝেছি, সব প্রভুই লীলা খেলা খেলেন।

গড। চুপ কর তোমরা। ব্রহ্মা, তুমি কেবল উড়ো তর্ক করছ, যেন আমিই আসামী আর তুমি হাকিম। তোমার প্রজারাও তো কম বদমাশ নয়, তাদের শাসন কর না কেন? তাদেরও ফ্রি উইল আছে নাকি?

ব্রহ্মা। ফ্রি উইল থাকবে কেন? আমার প্রজারা অত্যন্ত বাধ্য, যেমন চালাচ্ছি তেমনি চলছে, আবার কর্মফলও ভোগ করছে।

গড। অর্থাৎ তুমিই তাদের দিয়ে কুকর্ম করাচ্ছ।

ব্রহ্মা। সুকর্ম কুকর্ম সবই করাচ্ছি।

গড। তোমার নীতিজ্ঞান নেই। আমি তোমার মতন পাপের প্রশ্রয় দিই না, এক দল পাপীকে মারবার জন্য আর এক দল পাপী উৎপন্ন করেছি, পরস্পরকে ধ্বংস করবার জন্য দু দলকেই বজ্র দিয়েছি।

পীর। ইয়া গজব, ইয়া গজব! হারামজাদোঁকে দুশমন হারামজাদে!

ব্রহ্মা। তুমি কি মনে কর এই মারামারির ফলে সুবুদ্ধি আসবে?

গড। বেশ ভাল রকম ঘা খেলে ফ্রি উইলই পন্থা বাতলে দেবে, বেগতিক দেখলে সকলেই যিশুর শরণ নেবে।

পীর। নহি জী, নহি জী।

গড। ব্রহ্মা, এইবার তোমার জেরা বন্ধ কর। তুমি নিজে কি করতে চাও তাই বল।

ব্রহ্মা। কিছুই করতে চাই না। বিশ্বের বিধান তৈরি করে আমি খালাস।

গড। কেন, তুমি দয়াময় নও?

ব্রহ্মা। আমি নই। হরিকে লোকে দয়াময় বলে বটে।

গড। তুমি সর্বশক্তিমান নও? তোমার সৃষ্টির একটা উদ্দেশ্য নেই?

ব্রহ্মা। যার শক্তি কম তারই উদ্দেশ্য থাকে। যে সর্বশক্তিমান তার উদ্দেশ্য তো সিদ্ধ হয়েই আছে, তার দয়া করবারই বা দরকার হবে কেন? আসল কথা চুপি চুপি বলছি শোন। লোকে আমাদের সৃষ্টিকর্তা বলে, কিন্তু মানুষও আমাদের সৃষ্টি করেছে। যে লোক নিজে নির্দয় সেও একজন দয়ালু ভগবান চায়। যে নিজের তুচ্ছ শক্তি কুকর্মে লাগায় সেও একজন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর চায় যিনি তার সকল কামনা পূর্ণ করবেন। মানুষ নিজের স্বার্থসিদ্ধির আশায় আমাদের দয়ালু আর সর্বশক্তিমান বানাতে চায়।

গড। ওসব নাস্তিকের বুলি ছেড়ে দাও। স্পষ্ট করে বল—মানুষ পাপ করলে তুমি রাগ কর? ভাল কাজ করলে তুমি খুশী হও?

ব্রহ্মা তাঁর চার মাথা সজোরে নাড়তে লাগলেন।

নারদ গুনগুন করে বললেন, নাদত্তে কস্যাচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ—প্রভু কারও পাপপুণ্য গ্রাহ্য করেন না।

গড। ব্রহ্মা, তুমি অতি কুচক্রী, মানুষ উৎসন্নে যেতে বসেছে, তবু তুমি নিশ্চিন্ত থাকবে? কিছুই করবে না?

ব্রহ্মা। তোমরাই বা কি করছ? ব্যস্ত হও কেন, অনন্ত কাল তো সামনে পড়ে আছে। মানুষ নানারকম সুকর্ম কুকর্ম করে ফলাফল পরীক্ষা করছে, কিসে তার সব চেয়ে বেশী লাভ হয় তাই খুঁজছে। যখন সে পরম স্বার্থসিদ্ধির উপায় আবিষ্কার করতে পারবে তখন মানব-সমাজে শান্তি আসবে। যতদিন তা না পারবে ততদিন মারামারি কাটাকাটি চলবে।

গড। তবে তুমিও ফ্রি উইল মান?

ব্রহ্মা। খেপেছ!

নারদ তাঁর কচ্ছপী বীণায় ঝংকার তুলে বললেন, ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি, ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া—হে অর্জুন, ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে আছেন এবং ভেলকি লাগিয়ে তাদের চরকিতে চড়িয়ে ঘোরাচ্ছেন।

সেণ্ট পিটার বললেন, আমাদের প্রভু প্রেমময়, পরম কারুণিক, সর্বশক্তিমান—

নারদ। কিন্তু শয়তানকে জব্দ করতে পারেন না।

পীর। আল্লা মেহেরবান, তাঁর মতলব খুঁজতে গেলে গুনাহ্ হয়। আল্লার রিয়াসতে কুছ ভি বুরা কাম হয় না।

ব্রহ্মা। শোন গড ভাই—মানুষ নিজে যখন প্রেমময় আর কারুণিক হবে তখন আমরাও তাই হব। তার আগে কিছু করবার নেই।

সেণ্ট পিটার। বলেন কি! আপনারা যদি হাল ছেড়ে দেন তবে লোকে যে ঈশ্বরের

প্রতি বিশ্বাস হারাবে। তিনজনে যখন এখানে এসেছেন তখন কৃপা করে একটা ব্যবস্থা করুন যাতে মানুষে মানুষে মিল হয়।

পীর। কভি নহি হো সকতা। আল্লার প্রজা হচ্ছে মিঠা শরবত, গডের প্রজা তেজী শরাব। এদের মিল হতে পারে, শরবত আর শরাব বেমালুম মিশে যায়। কিন্তু এই হজরত ব্রহ্মার প্রজা হচ্ছে বদবুদার অলকতরা।

সহসা আকাশ অন্ধকার হল, একটা ঝটপট শব্দ শোনা গেল, যেন কেউ প্রকাণ্ড ডানা নাড়ছে। ব্রহ্মা বললেন, বিষ্ণু আসছেন নাকি? গরুড়ের পাখার শব্দ শুনছি।

নারদ বললেন, গরুড় নয়। দেখছেন না, বাদুড়ের মতন ডানা, কালো রং, মাথায় শিং; পায়ে খুর, ল্যাজও রয়েছে। শ্রীশয়তান আসছেন।

সেন্ট পিটার চিৎকার করে বললেন, অ্যাভন্ট, দূর হ! পীরসাহেব হাত নেড়ে বললেন, গুম্ শো, তফাত যাও! গড তাঁর আলখাল্লার পকেটে হাত দিয়ে বজ্র খুঁজতে লাগলেন।

ব্রহ্মা বললেন, আহা আসতেই দাও না, আমরা তো কাঁচ খোকা নই যে জুজু দেখলে ভয় পাব।

শয়তান অবতীর্ণ হয়ে মিলিটারি কায়দায় অভিবাদন করে বললেন, প্রভুগণ, যদি অনুমতি দেন তো কিঞ্চিৎ নিবেদন করি। গড মুখ গোঁজ করে রইলেন। সেন্ট পিটার আর পীরসাহেব চোখ বুজে কানে আঙুল দিলেন। ব্রহ্মা সহাস্যে বললেন, কি বলতে চাও বৎস?

শয়তান বললেন, পিতামহ, আপনারা তিন বিধাতা এখানে এসেছেন, এমন সুযোগ আর মিলবে না; সেজন্য আপনাদের সঙ্গে একটা চুক্তি করতে এসেছি। জগতের সমস্ত ধনী মানী মাতব্বর লোকেরা আমাকে তাঁদের দূত করে পাঠিয়েছেন। তাঁরা চান কর্মের স্বাধীনতা, কিন্তু তার ফলে ইহলোকে বা পরলোকে তাঁদের কোনও অনিষ্ট যেন না হয়। এর জন্য তাঁরা আপনাদের খুশী করতে প্রস্তুত আছেন।

ব্রহ্মা। অর্থাৎ তাঁরা বেপরোয়া দুষ্কর্ম করতে চান। মূল্য কি দেবেন? চাল-কলার নৈবেদ্য? হোমাগ্নিতে সের দশেক ভেজিটেবল ঘি ঢালবেন?

শয়তান। না প্রভু, ওসব দিয়ে আপনাদের আর ভোলানো যাবে না তা তাঁরা বোঝেন। তাঁরা যা রোজগার করবেন তার একটা অংশ আপনাদের দেবেন।

ব্রহ্মা। নগদ টাকা আমরা নিতে পারি না।

শয়তান। নগদ টাকা নয়। আপনাদের খুশী করবার জন্য তাঁরা প্রচুর খরচ করবেন। মন্দির গির্জা মসজিদ মঠ আতুরাশ্রম বানাবেন, হাসপাতাল রেড ক্রস স্কুল কলেজ টোল মাদ্রাসায় এবং মহাপুরুষদের স্মৃতিরক্ষার জন্য মোটা টাকা দেবেন, বুভুক্ষুকে খিচুড়ী খাওয়াবেন, শীতার্তকে কম্বল দেবেন। আপনার মানসপুত্রদের বংশধর কে কে আছেন বলুন, তাঁদের বড় বড় চাকরি আর মোটরকার দেওয়া হবে। এইসবের পরিবর্তে আপনারা আমার মক্কেলগণকে নিরাপদে রাখবেন।

ব্রহ্মা। কত খরচ করবেন?

শয়তান। ধরুন তাঁদের উপার্জনের শতকরা এক ভাগ।

ব্রহ্মা। তাতে হবে না বাপু।

শয়তান। আচ্ছা, দু পারসেন্ট।

ব্রহ্মা। আমাকে দালাল ঠাউরেছ নাকি?

শয়তান। পাঁচ পারসেন্ট? দশ—পনের—বিশ? আচ্ছা, না হয় শতকরা পঁচিশ ভাগ আপনাদের প্রীত্যর্থে খয়রাত করা হবে। তাতেও রাজী নন? উঃ, আপনার খাঁই দেখছি

দেশসেবকদের চাইতেও বেশী। ক বছর জেল খেটেছেন প্রভু? আচ্ছা, আপনিই বলুন কত হলে খুশী হবেন।

ব্রহ্মা। শতকরা পুরোপুরি এক-শ চাই।

নারদ। ওহে শয়তান, প্রভু বলছেন, কর্মের সমস্ত ফল সমর্পণ করতে হবে তবেই নিষ্কৃতি মিলবে।

শয়তান। তা হলে তো রোজগার করাই বৃথা। যদি সবই ছেড়ে দিতে হয় তবে চুরি ডাকাতি লুটপাট মারামারি করে লাভ কি?

ব্রহ্মা। এই কথা তোমার মক্কেলদের বুঝিয়ে দিও। কিছু হাতে রেখে চুক্তি করা যায় না। গড আর আল্লা তালা কি বলেন? কই, এঁরা সব গেলেন কোথা?

নারদ। সবাই অন্তর্হিত হয়েছেন।

শয়তান। তবে আমিও যাই পিতামহ। আপনি তো নিরাশ করলেন।

ব্রহ্মা। একটু থাম, শুধু হাতে ফিরে যেতে নেই। একটা বর দিচ্ছি।—বৎস শয়তান, পুরুত পাদরী মোল্লা, পুলিস সৈন্য বা মিলিত জাতিসংসদ, কেউ তোমাকে বাধা দেবে না, তোমার মক্কেলদের তুমি নির্বিঘ্নে নরকস্থ করতে পারবে। তারপর আমি আবার মানুষ সৃষ্টি করব। নারদ, এখন যাই চল, আমার হাঁসটাকে ডেকে আন।

নারদ। প্রভু, সে মানস সরোবরে চরতে গেছে, এত শীঘ্র সভাভঙ্গ হবে, তা তো জানত না। আপনি আমার ঢেঁকিতেই চলুন।

১৩৫৭ (১৯৫০)

ভীমগীতা

প্রথম দিনের যুদ্ধ শেষ হয়েছে। সন্ধ্যাবেলায় কুরুপাণ্ডব বীরগণ নিজ নিজ শিবিরে ফিরে এসে স্নান ও জলযোগের পর বিশ্রাম করছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর খাটিয়ায় শুয়ে আছেন, দু'জন বামন সংবাহক তাঁর হাত-পা টিপে দিচ্ছে। এমন সময় ভীমসেন এসে বললেন, বাসুদেব, ঘুমুলে নাকি?

কৃষ্ণ কুন্তীপুত্রদের মামাতো ভাই। তিনি অর্জুনের প্রায় সমবয়সী, সেজন্য যুধিষ্ঠির আর ভীমকে সম্মান করেন। ভীমকে দেখে বিছানা থেকে উঠে বললেন, আসতে আজ্ঞা হোক মধ্যম পাণ্ডব। আপনি বিশ্রাম করলেন না?

ভীম বললেন, আমার বিশ্রামের দরকার হয় না। চার ঘটি মাধ্বীক পান করেছি, তাতেই ক্লান্তি দূর হয়েছে, এখনই আবার যুদ্ধে লেগে যেতে পারি। কৃষ্ণ, তোমার বিশ্রামের ব্যাঘাত করছি না তো?

কৃষ্ণ। না না, আপনি এই খট্বায় বসুন। সেবকের প্রতি কি আদেশ বলুন।

ভীম। তোমার কাছে কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।

কৃষ্ণ। চোক্কমল্ল তোক্কমল্ল, তোমরা এখন যেতে পার, আর আমার সেবার প্রয়োজন নেই। আর্য ভীমসেন, বলুন কি জানতে চান।

ভীম। হাঁ হে কেশব, আজ যুদ্ধের পূর্বে অর্জুনের কি হয়েছিল? তুমি তাকে কিসব বলছিলে? আমি দূরে ছিলুম, শুনতে পাই নি, শুধু দেখেছি—অর্জুন তার ধনুর্বাণ ফেলে দিয়ে কাঁদছিল; হাত জোড় করছিল, পাগলের মতন ফ্যালফ্যাল করে তোমার দিকে তাকাচ্ছিল আবার বার বার নমস্কার করছিল। ব্যাপার কি? যদি গোপনীয় না হয় তবে আমার কৌতূহল নিবৃত্ত কর।

কৃষ্ণ। বিশেষ কিছুই নয়। কুরুপাণ্ডব দু পক্ষেই গুরুজন বয়স্য ও স্নেহভাজন আত্মীয়-গণ আছেন দেখে অর্জুন কৃপাবিষ্ট হয়েছিলেন। বলছিলেন, যুদ্ধ করবেন না।

ভীম। অর্জুনটা চিরকাল ওইরকম, মাঝে মাঝে তার ভাব উথলে ওঠে। কৃপাবিষ্ট হবার আর সময় পেলেন না! তা তুমি তাকে কি বললে?

কৃষ্ণ। বললুম, তুমি ক্ষত্রিয়, ধর্মযুদ্ধ করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। তাতে লাভও আছে, যদি জয়ী হও তো পৃথিবীর রাজ্য ভোগ করবে, যদি মর তো সোজা স্বর্গে যাবে।

ভীম। একেবারে খাঁটি কথা। তাতে অর্জুনের আক্কেল হল?

কৃষ্ণ। সহজে হয় নি। তাকে অনেক রকমে বুঝিয়ে বললুম, তুমি নিষ্কাম হয়ে কর্তব্য কর্ম কর, ফলাফল ভেবো না। তার পর তাকে কর্মযোগ জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ প্রভৃতিও বোঝালুম। অর্জুনের মোহ দূর করতে আমাকে প্রায় দুটি ঘণ্টা বকতে হয়েছিল।

ভীম। দুর্যোধনের দল আমাদের উপর কিরকম অত্যাচার করেছিল অর্জুন তা ভুলে গেছে নাকি? তুমি সব মনে করিয়ে দিয়েছিলে তো?

কৃষ্ণ। মনে করিয়ে দেবার কথা আমার মনেই পড়ে নি।

ভীম। বল কি হে মধুসূদন! ছেলেবেলায় আমাকে বিষ খাইয়ে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে-

ছিল, জতুগৃহে আমাদের সকলকে পুড়িয়ে মারবার চেষ্টা করেছিল, এসব কথা অর্জুনকে বল নি?

কৃষ্ণ। কই, না।

ভীম। আশ্চর্য, এর মধ্যেই তোমার ভীমরতি হল নাকি? পাশা খেলায় শকুনির জুয়াচুরি, দুঃশাসনের হাতে পাঞ্চালীর নিগ্রহ, এসবও মনে করিয়ে দাও নি! উঃ দুঃশাসনের নাম করলেই আমার রক্ত টগবগ করে ফুটে ওঠে। আচ্ছা, আমাদের কথা না হয় ছেড়ে দিলে, কিন্তু তুমি যখন ধর্মরাজের দূত হয়ে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে কৌরবসভায় গিয়েছিলে তখন দুর্যোধন তোমাকে বন্দী করতে চেয়েছিল। তার পর সেদিন শকুনির ব্যাটা উলূক এসে দুর্যোধনের হয়ে তোমাকে যাচ্ছেতাই গালাগাল দিয়ে গেল, এও তুমি ভুলে গেছ নাকি?

কৃষ্ণ। কিছুই ভুলি নি। কিন্তু যুদ্ধের আগে এসব কথা অর্জুনকে বলবার প্রয়োজন দেখি না। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যখন পাঁচটি মাত্র গ্রাম চেয়েছিলেন তখন তো কৌরবদের সমস্ত অপরাধ মন থেকে মুছে ফেলেছিলেন। দুর্যোধন আমার প্রস্তাবে সম্মত হন নি, তাই আপনাদের মন্ত্রণাসভায় যুদ্ধ করা স্থির হয় এবং সেজন্যই আপনারা যুদ্ধ করছেন। কৌরবদের অপরাধ স্মরণ করা এখন নিরর্থক।

হাতে হাত ঘষে ভীম বললেন, কৃষ্ণ, তোমার শরীরে কি ক্রোধ বলে কিছুই নেই?

কৃষ্ণ। আছে বই কি। মানুষ হয়ে যখন জন্মেছি তখন মানুষের সব দোষই আছে।

ভীম। ক্রোধকে দোষ বলতে চাও! তুমি তো একজন মস্ত পণ্ডিত—আমাদের ছটি রিপু আছে জান? তাতে আমাদের কত উপকার হয় ভেবে দেখেছ?

কৃষ্ণ। রিপু তো দমন করাই উচিত।

ভীম। দমনের মানে কি লোপ? রিপুর লোপ হলে মানুষ পাথর হয়ে যায়, যেমন আমাদের ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব হয়েছেন। মেয়েরা তাঁকে গ্রাহ্য করে না, সামনেই স্নান করে।

কৃষ্ণ। প্রথম তিন রিপুর দমন এবং শেষ তিনটির লোপ করতে পারলেই মঙ্গল হয়।

ভীম। এইবারে তুমি কতকটা পথে এসেছ। মোহ মদ মাৎসর্য—এই তিনটে প্রবল হলে মানুষের বুদ্ধিনাশ হয়, একেবারে লোপ পেলেও বোধ হয় বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় না। কিন্তু প্রথম তিনটি না থাকলে বংশরক্ষা হয় না, আত্মরক্ষা হয় না, ধনাগম হয় না।

কৃষ্ণ। সাধু সাধু! ভীমসেন, আপনি অনেক চিন্তা করেছেন দেখছি।

ভীম খুশী হয়ে বললেন, ওহে জনার্দন, তুমি হয়তো মনে কর যে মধ্যম পাণ্ডব শুধুই একজন গোঁয়ারগোবিন্দ দুর্ধর্ষ বীর, যুদ্ধ আর ভোজন ছাড়া কিছুই জানে না। তা নয়, আমি দর্শনশাস্ত্রেরও একটু আধটু চর্চা করেছি। যদি চাও তো কিঞ্চিৎ তত্ত্বকথা শোনাতে পারি।

আগ্রহ দেখিয়ে কৃষ্ণ বললেন, অবশ্যই শুনব, আপনি অনুগ্রহ করে বলুন।

ভীম। ছয় রিপুর মধ্যে প্রথম তিনটিই আবশ্যক, আবার সেই তিনটির মধ্যে প্রথম দুটি কাম আর ক্রোধ, না হলেই নয়। কামতত্ত্ব তোমাকে বোঝান বাহুল্য মাত্র, লোকে বলে তোমার নাকি যোল হাজার কারা সব আছেন—

কৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, লোকে বলে আপনি প্রত্যহ যোল হাজার লড্ডু ভোজন করেন। উড়ো কথায় কান দেবেন না। কামতত্ত্ব থাক, আপনি ক্রোধতত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন।

ভীম। কোনও বিষয়ের বাড়াবাড়ি ভাল নয়। বেশী খেলে মেদবৃদ্ধি হয়, উদর স্ফীত হয়, যুদ্ধের শক্তি কমে যায়। কিন্তু উপযুক্ত আহার না হলে জীবনরক্ষাও হয় না। অত্যধিক ক্রোধও ভাল নয়, তাতে হাত পা কাঁপে, লক্ষ্যভ্রংশ হয়, যুদ্ধে নিপুণতার হানি হয়। কিন্তু ক্রোধ বর্জন করলে আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

কৃষ্ণ। ক্রোধ ত্যাগ করেও তো আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করা যায়।

ভীম। যেমন কাম ত্যাগ করে বংশরক্ষা করা যায়! কৃষ্ণ, বাজে কথা বলো না।

কৃষ্ণ। অনেক যোগী তপস্বী আছেন যাঁদের ক্রোধ মোটেই নেই।

ভীম। তাঁদের কথা ছেড়ে দাও। তাঁদের স্বজন নেই, আত্মরক্ষারও দরকার হয় না। সকলেই জানে তাঁরা শাপ দিয়ে ভস্ম করে ফেলতে পারেন, সেজন্য কেউ তাঁদের ঘাঁটায় না, তাঁরাও নির্বিবাদে অক্রোধী অহিংস হয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু আমরা তপস্বী নই, তাই দুর্যোধন শত্রুতা করতে সাহস করে। অন্যায়ের প্রতিকার এবং দুষ্টের দমনের জন্যই বিধাতা ক্রোধ সৃষ্টি করেছেন। একাদশ রুদ্র আমাদের দেহে অধিষ্ঠিত আছেন, দেহীর অপমান হলে তাঁরা রক্তে রৌদ্ররস-সঞ্চার করেন, তার ফলে মানুষ উত্তেজিত হয়ে শত্রুকে আক্রমণ করে, কোনও রকম বিচারের দরকার হয় না। বুঝতে পারলে?

কৃষ্ণ। আজ্ঞে হাঁ, বুঝেছি।

ভীম। যদি তৎক্ষণাৎ অপমানের শাস্তি দেওয়া কোনও কারণে অসম্ভব হয় তবে ক্রোধ মন্দীভূত হয়, প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি ক্ষীণ হয়ে আসে। এই কারণেই বীরগণ যুদ্ধের পূর্বে নিজের বিক্রম ঘোষণা করে এবং শত্রুকে কটুবাক্য বলে ক্রোধ ঝালিয়ে নেন। শত্রুও অশ্রাব্য ভাষায় পালটা গালাগালি দেয়, তা শুনে রৌদ্ররসের পুনঃসঞ্চার হয়, উত্তেজনা আসে, প্রহার-শক্তি বৃদ্ধি পায়।

কৃষ্ণ। কিন্তু জ্ঞানীদের উপদেশ—অক্রোধ দ্বারা ক্রোধকে জয় করবে।

ভীম। গোবিন্দ, তুমি নিতান্তই হাসালে। কংসকে মেরেছিলে কেন? জরাসন্ধকে মারবার জন্য আমাকে আর অর্জুনকে নিয়ে গিয়েছিলে কেন? রাজসূয় যজ্ঞের সভায় শিশুপালের মুণ্ডচ্ছেদ করেছিলে কেন? তোমার অক্রোধ কোথায় ছিল? আজ রণক্ষেত্রে অর্জুনের অক্রোধ দেখেও তাকে যুদ্ধে উৎসাহ দিলে কেন? কৃষ্ণ, তুমি নিজের মতিগতি বুঝতে পার না, পাত্রাপাত্রের ভেদও জান না। আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি শোন। বিপক্ষ যদি সজ্জন হয়, তার শত্রুতা যদি ভ্রান্ত ধারণার জন্য হয়, তবেই অক্রোধ আর অহিংসা চলতে পারে। ভদ্র বিপক্ষ যদি দেখে যে অপর পক্ষ প্রতিহিংসার চেষ্টা করছে না, শুধু ধীরভাবে প্রতিবাদ করছে, তবে তার ক্রোধ শান্ত হয়ে আসে, সে ন্যায়-অন্যায় বিচারের সময় পায়, নিজের কাজের জন্য অনুতপ্ত হয়। হয়তো মার্জনা চাইতে সে লজ্জাবোধ করে, কিন্তু অপরপক্ষ যদি উদারতা দেখায় তবে সহজেই শত্রুতার অবসান হয়। বিরাট রাজা—আহা বেচারার দুই ছেলে আজ মারা গেল—কঙ্কবেশী যুধিষ্ঠিরকে পাশা ছুড়ে মেরেছিলেন, রক্তপাত করেছিলেন, কিন্তু যুধিষ্ঠির রাগ দেখান নি। বিরাট ভদ্রলোক, সেজন্য যুধিষ্ঠিরের অক্রোধে ফল হল, ব্যাপারটা সহজেই মিটে গেল। আর দুর্যোধনকে দেখ। তার সহস্র অপরাধ আমাদের ধর্মরাজ ক্ষমা করেছেন, দুরাত্মাকে সুযোধন বলে আদর করেছেন, কিন্তু তার ফল কিছুই হয়নি। কারণ, দুর্যোধন ভদ্র নয়, স্বভাবত দুর্বৃত্ত। তার ভাইরা, শকুনি মামা, আর উচ্ছিষ্টভোজী সূতপুত্র কর্ণও সমান নরাধম। ধর্মরাজের সহিষ্ণুতার ফলে এদের আস্পর্ধা বেড়ে গেছে। এই সব দেখেও কি তুমি বলবে যে অক্রোধ দ্বারা ক্রোধ জয় করতে হবে?

কৃষ্ণ। ভীমসেন, আপনার যুক্তি যথার্থ। অক্রোধ দ্বারা সজ্জনকেই জয় করা যায়, কিন্তু দুর্জনকে জয় করবার জন্য ধর্মযুদ্ধ আবশ্যক। আপনারা সেই ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছেন। ধর্মযুদ্ধে ক্রোধ ও প্রতিশোধের প্রবৃত্তি বর্জনীয়। যদি যুদ্ধই কর্তব্য হয় তবে রাগদ্বেষ ত্যাগ করতে হবে। এই কারণেই দুর্যোধনের অপরাধের কথা অর্জুনকে মনে করিয়ে দেওয়া আবশ্যক মনে করি নি।

ভীম। প্রকাণ্ড ভুল করেছ। সোজা উপায় ছেড়ে দিয়ে বাঁকা পথে গেছ, ধান ভানতে

শিবের গীত গেয়েছ, দু ঘণ্টা ধরে তত্ত্বকথা শুনিয়ে অতি কণ্টে অর্জুনকে যুদ্ধে নামাতে পেরেছ। যদি তাকে রাগিয়ে দিতে তবে তখনই কাজ হত, কর্মযোগ জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ কিছুই দরকার হত না। এই আমাকে দেখ,—বিধাতা শাস্ত্রজ্ঞান বেশী দেন নি, কিন্তু আমার জঠরে যেমন অগ্নিদেব আছেন তেমনি গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে রুদ্রগণ নিরন্তর বিরাজ করছেন। কেউ যদি আমাকে অপমান করে তবে একাদশ রুদ্র ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, আমার দেহে শত হস্তীর বল আসে, বাহু লোহময় হয়, গদা তৎক্ষণাৎ শত্রুর প্রতি ধাবিত হয়, তত্ত্বকথা শোনাবার দরকারই হয় না।

কৃষ্ণ। আপনার কথা সত্য। কিন্তু সকল মানুষের প্রকৃতি সমান নয়। আপনারা পাঁচ ভ্রাতা সকলেই ক্রোধপ্রবণ নন। আপনাকে যুদ্ধে উৎসাহ দেওয়া অনাবশ্যক, কিন্তু ধর্মরাজ আর অর্জুনের উপর রুদ্রগণের প্রভাব অল্প, সেজন্য মাঝে মাঝে তাঁদের তত্ত্বকথা শোনাতে হয়। আর একটি কথা আপনাকে নিবেদন করি। ক্রোধে ক্ষিপ্ত হওয়া কি ভাল? পরিণাম না ভেবে প্রবল শত্রুকে আক্রমণ করলে অনেক সময় নিজের ও আত্মীয়বর্গের সর্বনাশ হয়।

ভীম। জন-কয়েকের সর্বনাশ হলই বা। সাপের মাথায় পা দিলে সাপ অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই ছোবল মারে। তারপর হয়তো সে লাঠির আঘাতে মরে, কিন্তু তার জাতির খ্যাতি বেড়ে যায়। লোকে বলে, সর্পজাতি অতি ভয়ানক, সাবধান, ঘাঁটিও না। বাঘ যখন বাছুরকে ধরে তখন গরু প্রাণের মায়া করে না, ক্রোধের বশে শত্রুকে শৃঙ্গাঘাত করে। এজন্য সকলেই শৃঙ্গীকে সম্মান করে। যে লোক পরিণাম না ভেবে ক্রোধের বশে শত্রুকে আঘাত করে, সে হঠকারিতার ফলে নিজে মরতে পারে, তার আত্মীয়রাও মরতে পারে, কিন্তু তার স্বজাতির খ্যাতি ও প্রতাপ বেড়ে যায়। হৃষীকেশ, ক্রোধ বিধিদত্ত মনোবৃত্তি, নামে রিপু হলেও মিত্র, তার নিন্দা করো না। ক্রোধের প্রভাবে আমি কি দারুণ কর্ম করব তা দেখতে পাবে। ধৃতরাষ্ট্রকে নির্বংশ করব, দুঃশাসনের রক্তপান করব, দুর্যোধনের উরু চূর্ণ করব। আমার কীর্তি হবে কি অকীর্তি হবে তা গ্রাহ্য করি না; কিন্তু লোকে চিরকাল বলবে, হাঁ, ভীম একটা পুরুষ ছিল বটে, অত্যাচার সইত না, দুরাত্মাদের শাস্তি দিতে জানত।

কৃষ্ণ। বৃকোদর, আপনার মনস্কাম পূর্ণ হবে। আপনি যা বললেন তাও তত্ত্বকথা। কিন্তু কোনও বিধানই সর্বত্র খাটে না। অত্যাচারিত হলে যে রাগ করে না, প্রতিকারও করে না, সে অক্রোধী কিন্তু কাপুরুষ, অমানুষ, জীবনধারণের অযোগ্য। যে ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে পাপ করে ফেলে, সে হঠকারী দুষ্কর্মা, কিন্তু তার পৌরুষ আছে। যে ক্রোধের বশে ধর্মাধর্মের জ্ঞান হারায় না এবং অন্যায়ের যথোচিত প্রতিকার করে, সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

ভীম সহাস্যে বললেন, যদুনন্দন, আমি কাপুরুষ অমানুষ নই, ধর্মভীরু পুরুষশ্রেষ্ঠও নই, আমি মধ্যম পাণ্ডব, সকল বিষয়েই মধ্যম। আচ্ছা, এখন যাচ্ছি, তুমি বিশ্রাম কর।

কৃষ্ণ নমস্কার করে বললেন, ভীমসেন, আপনি বীরাগ্রগণ্য পুরুষশার্দূল। আপনার জয় হোক।

কৃষ্ণের দুই পরিচারক চোক্কমল্ল আর তোক্কমল্ল আড়ি পেতে সব শুনছিল। ভীম চলে গেলে তোক্ক বললে, দাদা, কার কথা ঠিক, শ্রীকৃষ্ণের না শ্রীভীমের?

চোক্ক বললে, ওসব বড় বড় লোকের বড় বড় কথা, তোর আমার মতন বেঁটেদের জন্য নয়। ক্রোধ অক্রোধ ধর্মযুদ্ধ, সবই আমাদের নাগালের বাইরে। দুর্বলের একমাত্র উপায় জোট বাঁধা। বোলতার ঝাঁক বাঘ-সিংগিকেও জব্দ করতে পারে।

১৩৫৭ (১৯৫০)

সিদ্ধিনাথের প্রলাপ

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় পাশের বাড়িতে পোঁ করে শাঁখ বেজে উঠল। সিদ্ধিনাথবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আর একটি বেকারের আগমন হল।

গৃহস্বামী গোপাল মুখুজ্যে বললেন, সিধু, তুমি দিন দিন দুর্মুখ হচ্ছ। কত হোম যাগ আর মানত করে বুড়ো বয়সে মল্লিক মশায় একটি বংশধর লাভ করলেন। প্রতিবেশীর সৌভাগ্যে আমাদের সকলেরই খুশী হবার কথা, আর তুমি ধরে নিচ্ছ যে ছেলেটি বেকার হবে!

আবার একটি নিঃশ্বাস ফেলে সিদ্ধিনাথ বললেন, দেশবাসীর আধপেটা অন্নের আর একজন ভাগীদার জুটল।

ঘরে চার জন আছেন। গোপালবাবু উকিল বয়স চল্লিশ, বেশ পশার করেছেন। সিদ্ধিনাথ তাঁর সমবয়সী বাল্যবন্ধু, গোপালবাবুর বাড়ির পিছনেই তাঁর বাড়ি। পূর্বে সরকারী কলেজে প্রোফেসারি করতেন, বিদ্যার খ্যাতিও ছিল, কিন্তু মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ায় চাকরি গেছে। এখন আগের চাইতে অনেক ভাল আছেন, কিন্তু মাথার গোলমাল সম্পূর্ণ দূর হয়নি। সামান্য পেনশনে এবং বাড়িতে দু-চারটি ছাত্র পড়িয়ে কোনও রকমে সংসার চালান। তৃতীয় লোকটি রমেশ ডাক্তার, বয়স ত্রিশ, কাছেই বাড়ি, সম্প্রতি গোপালবাবুর শালী অসিতার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। রমেশ তার স্ত্রীর সঙ্গে রোজ এই সান্ধ্য আড্ডায় আসে। আজও দুজনে এসেছে।

অসিতা সিদ্ধিনাথের কাছে পড়েছে, তাঁকে শ্রদ্ধাও করে। সবিনয়ে বললে, সার, মল্লিক মশায়ের ছেলে বেকার হতে যাবে কেন? পৈতৃক ব্যবসাতে ভাল রোজগারও তো করতে পারে। পরের অন্নেই বা ভাগ পাড়বে কেন, তার বাপের তো অভাব নেই।

সিদ্ধিনাথ বললেন, মল্লিকের ছেলে হাইকোর্টের জজ হতে পারে, জওহরলাল বা বিড়লা-ডালমিয়াও হতে পারে, বহু লোককে অন্নদানও করতে পারে। কিন্তু আমি শুধু তাকে উদ্দেশ করে বলি নি; যারা জন্মাচ্ছে তাদের অধিকাংশের যে দশা হবে তাই ভেবে বলেছি।

গোপালবাবু বললেন, দেখ সিধু, আমরা তোমার মতন পণ্ডিত নই, কিন্তু এটুকু জানি, দেশে যে খাদ্য জন্মায় তাতে সকলের কুলয় না, আর লোকসংখ্যাও অত্যন্ত বেড়ে যাচ্ছে। এর প্রতিকার অবশ্যই করতে হবে তার চেষ্টাও হচ্ছে। কিন্তু হতাশ হবার কোনও কারণ নেই। যিনি জীবের সৃষ্টিকর্তা তিনিই রক্ষাকর্তা এবং আহারদাতা।

সিদ্ধিনাথ। সৃষ্টিকর্তা সব সময় রক্ষা করেন না, আহারও দেন না। পঞ্চাশ-ষাট বৎসর আগে ওসব মোলায়েম কথা বলা চলত, যখন দেশ ভাগ হয়নি, লোকসংখ্যাও অনেক কম ছিল। তখন এক কবি সুজলাং সুফলাং শস্যশ্যামলাং বলে জন্মভূমির বন্দনা করেছিলেন, আর এক কবি গেয়েছিলেন—চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য, দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন। এখন দেশ বিদেশ থেকে অন্ন আমদানি করতে হচ্ছে।

গোপাল। সরকার ফসল বাড়াবার যে পরিকল্পনা করেছেন তাতে এক বছরের মধ্যেই আমরা নিজেদের খাদ্য উৎপাদন করতে পারব।

সিদ্ধিনাথ। হাঁ, যদি কর্তাদের উপদেশ অনুসারে চাল আটার বদলে টাপিওকা রাঙা আলু

আর মহামূল্য ফল খেয়ে পেট ভরাতে পার। যদি ঘাস হজম করতে শেখ, আসল দুধের বদলে সয়া বীন বা চীনে বাদাম গোলা জলে তুষ্ট হও, যদি উপোসী বেরালের মতন মাছের অভাবে আরসোলা টিকটিকি খেতে পার তবে আরও চটপট স্বয়ম্ভর হতে পারবে।

গোপাল। শুনছি দক্ষিণ আমেরিকা থেকে দুগ্ধতরু আসছে যা পয়স্বিনী গাভীর মতন দুগ্ধ ক্ষরণ করে।

সিদ্ধিনাথ। আরও কত কি শুনবে। রাশিয়া থেকে এক্সপার্ট আসবেন যিনি ব্যাং থেকে রুই কাতলা তৈরি করবেন। শোন গোপাল, কর্তারা যতই বলুন, লোক না কমালে খাদ্যাভাব যাবে না।

রমেশ ডাক্তার লাজুক লোক, পত্নীর ভূতপূর্ব শিক্ষককে একটু ভয়ও করে। আস্তে আস্তে বললে, আমার মতে জনসাধারণকে বার্থ কনট্রোল শেখাবার জন্য হাজার হাজার ক্লিনিক খোলা দরকার।

সিদ্ধিনাথ। তাতে ছাই হবে। শিক্ষিত অবস্থাপন্ন লোকেদের মধ্যে কিছু ফল হতে পারে, কিন্তু আর সকলেই বেপরোয়া বংশবৃদ্ধি করতে থাকবে। যত দুর্দশা বাড়বে ততই মা ষষ্ঠীর দয়া হবে, কেল্টে ভুল্টে, বুঁচী পেঁচীতে ঘর ভরে যাবে। বহুকাল পূর্বেই হার্বার্ট স্পেনসার আবিষ্কার করেছিলেন যে যারা ভাল খায় তাদের সন্তান অল্প হয়, যাদের অন্নাভাব তাদেরই বংশবৃদ্ধি বেশী।

গোপাল। তা তুমি কি করতে বল।

সিদ্ধিনাথ। প্রাচীন কালে গ্রীসে স্পার্টা প্রদেশের কি প্রথা ছিল জান? সন্তান ভূমিষ্ঠ হলেই তার বাপ তাকে একটা চাঙারিতে শুইয়ে পাহাড়ের ওপর রেখে আসত। পরদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকলে তাকে ঘরে আনা হত। এর ফলে খুব মজবুত শিশুরাই রক্ষা পেত, রোগা পটকারা বেঁচে থেকে সুস্থ বলিষ্ঠ প্রজার অন্নে ভাগ বসাত না। এদেশেরও সেইরকম একটা কিছু ব্যবস্থা দরকার।

গোপাল। কিরকম ব্যবস্থা চাও বলে ফেল।

সিদ্ধিনাথ। কোনও লোকের দুটোর বেশী সন্তান থাকবে না—

গোপাল। ব্রহ্মচর্য চালাতে চাও নাকি?

সিদ্ধিনাথ। পুলিস বাড়ি বাড়ি খানাতল্লাশ করে বাড়তি ছেলেমেয়ে কেড়ে নেবে, যেমন, মাঝে মাঝে রাস্তা থেকে বেওয়ারিস কুকুর ধরে নিয়ে যায়। তার পর লিথাল ভ্যানে—

গোপাল। মহাভারত! তোমার যদি ছেলেপিলে থাকত তবে এমন বীভৎস কথা মুখে আনতে পারতে না।

সিদ্ধিনাথ। রাষ্ট্রের মঙ্গলের কাছে সন্তানস্নেহ অতি তুচ্ছ। আমি যা বললুম তাই হচ্ছে একমাত্র কার্যকর উপায়। এর ফলে শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই সন্তান নিয়ন্ত্রণের জন্য উঠে পড়ে লাগবে। এ ছাড়া আনুষঙ্গিক আরও কিছু করতে হবে। ডাক্তারদের দমন করা দরকার।

অসিতা। বেওয়ারিস কুকুরের মতন ঠেঙিয়ে মারবেন নাকি?

সিদ্ধিনাথ। তোমার ভয় নেই। ভবিষ্যতে মেডিক্যাল কলেজে খুব কম ভরতি করলেই চলবে।

অসিতা। ডাক্তারদের দ্বারা জগতের কত উপকার হয় জানেন? বসন্তের টিকে, কলেরার স্যালাইন, তারপর ইনসুলিন পেনিসিলিন—আরও কত কি। প্রতি বৎসরে কত লোকের প্রাণ-রক্ষা হচ্ছে খবর রাখেন?

সিদ্ধিনাথ। ও, তুমি তোমার বরের কাছে এইসব শিখেছ বুঝি? প্রাণরক্ষা করে কৃতার্থ করেছেন! কতকগুলো ক্ষীণজীবী লোক, রোগের সঙ্গে লড়বার যাদের স্বাভাবিক শক্তি নেই,

তাদের প্রাণরক্ষায় সমাজের লাভ কি? বিস্তর টাকা খরচ করে ডিসপেপসিয়া ডায়াবিটিস ব্লাডপ্রেশার থ্রম্বোসিস আর প্রস্টেট রোগগ্রস্ত অকর্মণ্য লোকদের বাঁচিয়ে রাখলে দেশের কোন্ উপকার হয়? যারা স্বাস্থ্যবান পরিশ্রমী কাজের লোক, যারা বীর বিদ্বান প্রজ্ঞাবান কবি কলাবিৎ, কেবল তাদেরই বাঁচবার অধিকার আছে। তাদের সেবা করতে সমর্থ স্ত্রীলোকেরও বাঁচা দরকার। তা ছাড়া আর সকলেই আগাছার মতন উৎপাটিতব্য।

গোপাল। ওহে রমেশ, এবারে সিধুবাবুর হাঁপানির টান হলে ওষুধ দিও না, বিছানা কে উৎপাটিত করে একটা রিকশায় তুলে কেওড়াতলায় ফেলে দিও।

সিদ্ধিনাথ। আমার কথা আলাদা, বেঁচে থাকলে জগতের লাভ। আমার মতন স্পষ্টবাদী জ্ঞানী উপদেষ্টা এদেশে আর নেই।

গোপালবাবুর গৃহিণী নমিতা দেবী একটা ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বয়স বেশী না হলেও এঁর ধাতটি সেকেলে। অসিত্রা তার দিদিকে আধুনিকী করবার জন্য অনেক চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়েছে। নমিতা এই সান্ধ্য আড্ডাটির জন্য খুশী নন, বিশেষত সিদ্ধিনাথকে তিনি দুচক্ষে দেখতে পারেন না; বলেন, পাগল না হাতি, শুধু ভিটকিলিমি, কুকথার ধুকড়ি। গতকাল সেকরা নমিতার ফরমাশী নথ দিয়ে গিয়েছিল। তা দেখতে পেয়ে সিদ্ধিনাথ কিঞ্চিৎ অপ্রিয় মন্তব্য করেছিলেন। তারই শোধ তোলবার জন্য আজ নমিতা যুদ্ধের সাজে দর্শন দিলেন। নাকে নথ, কানে মাকড়ি, গলায় চিক, হাতে অনন্ত আর বালা, কোমরে গোট। কোথা থেকে একটা বাঁকমলও যোগাড় করে পায়ে পরেছেন।

সিদ্ধিনাথ বললেন, আসুন মিসেস মুখুজ্যে।

নমিতা। মিসেস আবার কি? আমি ফিরিঙ্গী হয়ে গেছি নাকি? বউদিদি বলতে মুখে বাধল কেন?

সিদ্ধিনাথ। আর বলা চলবে না, এত দিন ভুল ধারণার বশে বলেছি। আজ সকালে হিসাব করে দেখলুম গোপাল আমার চাইতে আট দিনের ছোট। যদি অনুমতি দেন তো এখন থেকে বউমা বলতে পারি।

নমিতা। বেশ, তাই না হয় বলবেন।

সিদ্ধিনাথ। বউমা, একটু সামনে দাঁড়াও তো।

নমিতা কোমরে হাত দিয়ে বীরাঙ্গনার মতন সগর্বে দাঁড়ালেন। সিদ্ধিনাথ এক মিনিট নিরীক্ষণ করে চোখ বুজলেন। নমিতা বললেন, চোখ ঝলসে গেল নাকি?

সিদ্ধিনাথ। উঁহু, আমি এখন ধ্যানস্থ। বিশ হাজার বৎসর পূর্বের ব্যাপার মানসনেত্রে দেখতে পাচ্ছি। মানুষ তখন বন্য, গুহায় বাস করে, পাথর আর হাড়ের অস্ত্র দিয়ে শিকার করে। জনসংখ্যা খুব কম, গৃহিণী সহজে জোটে না, জবরদস্তি করে ধরে আনতে হয়। দেখছি —একটা ষণ্ডা লেংটা পুরুষ, আমাদের গোপালের সঙ্গে একটু আদল আছে, কিন্তু মুখে দাড়িগোফের জঙ্গল, মাথায় জটা-পড়া চুল, হাতে একটা হাড়ের ডাণ্ডা। সে বউ খুঁজতে বেরিয়েছে। নদীর ধারে একটা মেয়ে গুগলি কুড়চ্ছে, এই বউমার সঙ্গে একটু মিল আছে। পুরুষটা কোনও প্রেমের কথা বললে না, উপহার দিলে না, খোশামোদও করলে না, এসেই ধাঁই করে এক ঘা লাগালে! মেয়েটা মুখ থুবড়ে পড়ল, কপাল ফেটে রক্ত পড়তে লাগল। তারপর তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে লোকটা নিজের আস্তানায় এল এবং নাকে বেতের আংটি পরিয়ে তাতে দড়ি লাগিয়ে একটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দিলে, যেমন বলদকে বাঁধা হয়। তবু মেয়েটা পালাবার চেষ্টা করছে দেখে তার পায়ের পাতা চিরে রক্তপাত করলে, দু কান ফুঁড়ে

কড়া পরিয়ে দিলে, গলায় হাতে কোমরে আর পায়ে চামড়ার বেড়ি লাগিয়ে খুঁটির সংগে বেঁধে ফেললে। এইরকম আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধনের পর ক্রমে ক্রমে মেয়েটা পোষ মানল, স্বামীর ওপর ভালবাসাও হল। অল্প কালের মধ্যে সকল মেয়েরই ধারণা হল যে নির্যাতনের চিহ্নই হচ্ছে অলংকার আর সৌভাগ্যবতীর লক্ষণ। তার পর হাজার হাজার বৎসর কেটে গেল, ঘরে বউ আনা সহজ হল, সোনা রুপোর গহনার চলন হল, কিন্তু প্রসাধনের রীতি আর গহনার ছাঁদে আদিম বর্বরতার ছাপ রয়ে গেল। সেকালে যা কপালের রক্ত ছিল তা হল সিঁদুর, পায়ের রক্ত হল আলতা। পূর্বে যা বউ বাঁধবার আংটা কড়া আর বেড়ি ছিল, পরে তা নথ মাকড়ি হার বালা গোট আর মল্‌ে পরিবর্তিত হল। সংস্কৃতে 'নাথ'-এর একটি অর্থ বলদের নাকের দড়ি। তা থেকেই নথ আর নথি শব্দ হয়েছে। আজকালকার যা শৌখিন গহনা তাতেও বর্বর যুগের ছাপ আছে। বউমা, জন্মান্তরের ইতিহাস শুনে চটে গেলে নাকি? তোমার বাপ মা নিশ্চয় সব জানতেন, তাই সার্থক নাম রেখেছেন নমিতা, অর্থাৎ যাকে নোয়ানো হয়েছে।

নমিতা বললেন, আপনার বাপ মাও সার্থক নাম রেখেছিলেন। সিদ্ধিনাথের বদলে গাঁজা-নাথ হলে আরও ঠিক হত। এখানে যা সব বললেন বাড়ি গিয়ে গিন্নীর কাছে বলুন না, মজা টের পাবেন। এই বলে নমিতা চলে গেলেন।

গোপালবাবু বললেন, ওহে সিদ্ধিনাথ, বক্তৃতার চোটে আমার গিন্নীকে তো ঘর থেকে তাড়ালে, এইবার শালীটিকে একটা লেকচার দাও, ছাত্রী বলে দয়া করো না।

সিদ্ধিনাথ অসিতার দিকে চেয়ে বললেন, হাতদুটো অমন করে ঘোরাচ্ছ কেন।

অসিতা। ঘোরাচ্ছি আবার কোথা। দেখছেন না, একটা মফলার বুনছি। আপনারই জন্য।

সিদ্ধিনাথ। কথাটা পুরোপুরি সত্য নয়। হাত সুড়সুড় করছে বলেই বুনছ, আমাকে দেবে সে একটা উপলক্ষ্য মাত্র। লেস-পশম বোনা, চরকা কাটা, মালা জপা, বাঁয়া তবলায় চাঁটি লাগানো, গল্প কবিতা লেখা, ছবি আঁকা, ইও ইও ঘোরানো—এসবের কারণ একই। দরকারী জিনিস তৈরি করছি, দেশের মঙ্গল করছি, ভগবানের নাম নিচ্ছি, কলা চর্চা করছি; সাহিত্য রচনা করছি—এসব ছুতো মাত্র, আসল কারণ হাত সুড়সুড় করছে। এই সমস্ত কাজের মধ্যে ইও ইও ঘোরানোই নির্দোষ। কোনও ছল নেই, শুধুই খেলা।

পাশের ঘর থেকে নমিতা বললেন, মফলারটা খবরদার ওঁকে দিস নি অসিতা, বিশ্বনিন্দুক নিমকহারাম লোক।

সিদ্ধিনাথ। আমার চেয়ে যোগ্য পাত্র পাবে কোথা। আমার যদি ঠাণ্ডা না লাগে, হাঁপানি যদি না বাড়ে, তবে সকল লোকেরই লাভ। অসিতাও এই ভেবে কৃতার্থ হবে যে একজন অসাধারণ গুণী লোকের জন্যই সে মফলার বুনেছে।

গোপাল। ওসব বাজে কথা রাখ। নমিতাকে দেখে তো পুরাকালের ইতিহাস আবিষ্কার করে ফেললে। এখন অসিতাকে দেখে কি মনে হয় বল।

সিদ্ধিনাথ নিজের মনে বলে যেতে লাগলেন, হাজার হাজার বৎসরেও মেয়েরা সাজতে শিখল না, কেবল ফ্যাশনের অন্ধ নকল। ঠোঁটে রং দেওয়ার ফ্যাশনটাই ধর। যারা চম্পকগৌরী অল্পবয়সী তাদেরই বিম্বাধর মানায়। সাদা বা কালোকে বা বুড়ীকে মানায় না। আজ বিকেলে চৌরঙ্গী রোডে দুটি অদ্ভুত প্রাণী দেখেছি। একজন বুড়ী মেম, চুল পেকে শণের নুড়ি হয়ে গেছে, গাল তুবড়ে চামড়া কুঁচকে গেছে, তবু ঠোঁটে রগরগে লাল রং লাগিয়েছে। দেখাচ্ছে যেন তাড়কা রাক্ষসী, সদ্য ঋষি খেয়েছে। আর একজন বাঙালী যুবতী, বেশ মোটা, অসিতার চাইতেও কালো, সেও ঠোঁটে লাল রং দিয়েছে।

অসিতা। কেমন দেখাচ্ছে?

সিদ্ধিনাথ। যেন ভাল্লুকে রাঙা আলু খাচ্ছে।

অসিতা। স্যর, আমি কখনও ঠোঁটে রং লাগাই না।

সিদ্ধিনাথ। তোমার বুদ্ধি আছে, আমার ছাত্রী তো। কালো মেয়ের যদি অধরচর্চা করবার শখ হয় তবে ঠোঁটে সোনালী তবক এ'টে দিলেই পারে, দামী পানের খিলির ওপর যা থাকে।

অসিতা। কী ভয়ানক!

সিদ্ধিনাথ। ভয়ানক কেন? মা কালীর যদি সোনার চোখ আর সোনার জিভ মানায় তবে কালো মেয়ের সোনালী ঠোঁট নিশ্চয় মানাবে। তুমি পরীক্ষা করে দেখতে পার।

অসিতা। কি যে বলেন আপনি!

সিদ্ধিনাথ। অর্থাৎ নতুন ফ্যাশন চালাবার সাহস তোমার নেই। কিন্তু সিনেমার অমুকা দেবী বা অমুক মন্ত্রীর কন্যা যদি ঠোঁটে সোনালী তবক আঁটে তবে তোমরাও আঁটবে। আচ্ছা ডাক্তার বাবাজী, তুমি এই কালো মেয়েটাকে বিয়ে করলে কেন?

রমেশ তার লজ্জা দমন করে বললে, কালো তো নয়, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ।

সিদ্ধিনাথ। ডাক্তার, তুমি চশমা বদলাও। তোমার বউ মোটেই উজ্জ্বল নয়, দস্তুর মতন কালো। কালোকেই লোক আদর করে শ্যামবর্ণ বলে। তবে হাঁ, তেল মেখে চুকচুকে হলে উজ্জ্বল বলা যেতে পারে।

অসিতা। জানেন, একটি খুব ফরসা সুন্দরী মেয়ের সংগে ওঁর সম্বন্ধ হয়েছিল, কিন্তু তাকে ছেড়ে আমাকেই পছন্দ করলেন।

সিদ্ধিনাথ। শুনে খুশী হলুম, ডাক্তারের আর্টিস্টিক বুদ্ধি আছে। গৌর বর্ণের ওপর লোকের ঝোঁক একটা মস্ত কুসংস্কার, স্নবারিও বটে। লোকে কি শুধু সাদা কুকুর সাদা গরু সাদা ঘোড়া পোষে? মারবেলের মূর্তির চাইতে কষ্টি পাথর আর ব্রঞ্জের মূর্তির আদর বেশী কেন? প্রাচ্যদেশবাসী খুব ফরসা হলে কুশ্রী দেখায়, গায়ের রং আর কালো চুলের কনট্রাস্ট দৃষ্টিকটু হয়। তার চাইতে কুচকুচে কালো বরং ভাল, যদিও চোখ আর দাঁত বেশী প্রকট হয়। আমাদের অসিতা হচ্ছে কপিলা গাইএর মতন সুন্দরী। গায়ে আরসোলা বসলে টের পাওয়া যায় না, কিন্তু ডেয়ে পি'পড়ে বসলে বোঝা যায়।

গোপাল। অসিতার ভাগ্য ভাল, অল্পেই রেহাই পেয়েছে, আবার সুন্দরী সার্টিফিকেটও আদায় করেছে।

দূর থেকে একটা কাঁসির খ্যানখেনে আওয়াজ এল। সিদ্ধিনাথ চমকে উঠলেন। নমিতা ঘরে এসে বললেন, শুনতে পাচ্ছেন না? যান যান দৌড়ে যান নইলে গিন্নী আপনার দফা সারবে।

সিদ্ধিনাথের পত্নী রান্না হয়ে গেলেই স্বামীকে ডাকবার জন্য একটা ভাংগা কাঁসি বাজান। সিদ্ধিনাথ তাঁর মুখরা গৃহিণীকে ভয় করেন। বিনা বাক্যব্যয়ে হনহন করে বাড়ির দিকে চললেন।

১৩৫৭ (১৯৫১)

চিরঞ্জীব

পূজোর ছুটিতে দুই বন্ধু হরিহর বসু আর তারক গুপ্ত পশ্চিমে বেড়াতে যাচ্ছেন। দিল্লি মেল ছাড়বার দেড় ঘণ্টা আগে তাঁরা হাওড়া স্টেশনে এলেন এবং প্লাটফর্মে গাড়ি লাগতেই একটা সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় উঠে পড়লেন। তাঁদের সীট আগে থেকেই রিজার্ভ করা ছিল।

হরিহরবাবু তাড়াতাড়ি তাঁর বিছানা পেতে গট হয়ে বসে বললেন, দেখ তারক, যে কদিন কলকাতার বাইরে থাকব সে কদিন বাঙালীর সংগে মোটেই মিশব না। মেশবার দরকারও হবে না, কারণ দিল্লীতে আমরা লালা গজাননজীর বাড়িতে উঠছি। আগরাতে তাঁর গদি আছে, সেখানেও আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করেছেন। অতি ভাল লোক গজাননজী।

তারকবাবু সিগারেট ধরিয়ে বললেন, লোক তো ভাল, কিন্তু তাঁর বাড়িতে নিরামিষ খেতে হবে।

হরিহরবাবু বললেন, ওই তো বাঙালীর মহা দোষ, মাছের জন্যে বেরালের মতন ছোঁক-ছোঁক করে। তুমি আবার বাঙাল, আরও লোভী।

আচ্ছা বাপু, পনর দিন না হয় বিধবার মতন থাকা যাবে। কিন্তু তুমিও তো প্রচণ্ড গোস্তখোর।

—ক্রমশ মাছ মাংস ত্যাগ করছি। নিখিল ভারতের ভদ্রশ্রেণীর সংগে আমাদের সাজাত্য হওয়া দরকার।

—সাজাত্য আপনিই হচ্ছে, লালাজী শেঠজী চোবেজী সবাই মুরগি খেতে শিখছেন। মহামতি গোখলে ঠিকই বলে গেছেন— What Bengal thinks today India thinks tomorrow। বাঙালীর আর কষ্ট করে সাত্ত্বিক হবার দরকার নেই।

—খুব দরকার আছে। উত্তরপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ গুজরাট মহারাষ্ট্র অন্ধ্র তামিলনাড প্রভৃতি রাজ্যের উচ্চ সম্প্রদায়ের সংগে আমাদের সর্বাংগীণ মিলন হওয়া দরকার। খাদ্য পরিচ্ছদ আর ভাষা বদলাতে হবে, নইলে মচ্ছি-চাওর-খোর বংগালী অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে থাকবে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায় ঠিক বলেছেন—বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি। আমাদের পূর্বমর্যাদা স্মরণ করে পূর্বসম্বন্ধ পুনস্থাপন করতে হবে।

—পূর্বসম্বন্ধটা কিরকম? আমরা সবাই আর্য-খোট্টা এই সম্বন্ধ?

—তার চাইতে নিকটতর। আদিশূরের রাজত্বকালে কান্যকুব্জ থেকে যে পাঁচজন কায়স্থ বাংলা দেশে এসেছিলেন, তাঁদের নেতার নাম দশরথ বসু। তিনি আমার ছাব্বিশতম পূর্ব-পুরুষ। আসলে আমি বাঙালী নই, কনৌজী লালা কায়েত। তুমিও বাঙালী নও।

—বল কি হে!

—তুমি হচ্ছ কর্ণাটী ব্রহ্মক্ষত্রিয়, বল্লালসেনের স্বজাতি। ইতিহাস পড়ে দেখো।

—আমি তো জানতুম আমি চন্দ্রগুপ্ত সমুদ্রগুপ্তের জাতি। তোমাদের কথা শুনেছি বটে, আদিশূর কনৌজ থেকে পাঁচজন বেদজ্ঞ আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ আনিয়েছিলেন, তাঁদের তল্পিদার হয়ে পাঁচ কায়স্থ এসেছিল।

—ভুল শুনেছ। আদিশূর রাজ্যশাসনের জন্য পাঁচজন উচ্চবংশীয় ক্ষত্রকায়স্থ আনিয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে পাঁচটি পাচক ব্রাহ্মণ এসেছিল।

হরিহরবাবু তাঁর ঘড়িতে দেখলেন গাড়ি ছাড়তে আর পনর মিনিট দেরি আছে। তাঁর ব্যাগ খুলে দুটি খদ্দরের টুপি বার করলেন। একটি নিজে পরলেন আর একটি তারকবাবুকে দিয়ে বললেন, নাও, মাথায় দাও।

তারকবাবু বললেন, টুপি পরব কেন, শুধু মাথা গরম করা। এই তো তুমি বললে যে আমি কর্ণাটী, অর্থাৎ মাদ্রাজ প্রদেশের লোক। আমরা টুপি পরি না, তার সাক্ষী রাজাজী। বরঞ্চ কাছার একটা খুঁট খুলে রাখছি।

গাড়িতে হুড়মুড় করে লোক উঠতে লাগল। হরিহরবাবুদের কামরা ভরে গেল, বাঙালী বিহারী উত্তরপ্রদেশী মারোয়াড়ী গুজরাটী প্রভৃতি নানা জাতের লোক উঠে বেঞ্চিতে ঠাসাঠাসি করে বসে পড়ল। একটি বাঙালী যুবক একজন স্থবিরের হাত ধরে তাঁকে এক কোণে বসিয়ে দিয়ে বললে, হালদার মশায়, আপনাকে এখন একটু কষ্ট সইতে হবে। ঘণ্টা তিন-চার পরেই লোক কমে যাবে, তখন আপনার বিছানা পেতে দেব।

বৃদ্ধ হালদার মশায় বললেন, আমার জন্য ব্যস্ত হয়ো না শরৎ। বয়স হলেও তোমাদের চাইতে শক্ত আছি। দাঁত নেই, কিন্তু এখনও একটি আস্ত ইলিশ মাছ হজম করতে পারি।

তারকবাবু বললেন, বাঃ আপনি মহাপুরুষ। বড্ড ভিড় নইলে আপনার পায়ের ধুলো নিতুম হালদার মশায়।

হালদার খুশী হয়ে বললেন, তবে বলি শোন। মুঙ্গের জেলায় খরকপুরে থাকতে দু-বেলায় একটি আস্ত পাঁঠা সাবাড় করতুম। চার আনায় একটি নধর বকাঁড়, আবার তার চামড়া বেচলে পুরোপুরি চার আনাই ফিরে আসত। একবার একটি সিকি খরচ করলে ক্রমান্বয়ে পাঁঠার পর পাঁঠা মুফতে পাওয়া যেত। ভারী লোভ হচ্ছে, নয়? এখন আর সেদিন নেই রে দাদা। ষাট বৎসর আগেকার কথা।

গার্ডের বাঁশি ফুরুর্ করে বেজে উঠল। একজন প্রকাণ্ড পুরুষ দরজা খুলে ঢুকে পড়লেন। হরিহরবাবু বললেন, আর জায়গা নেহি হ্যায়, দুসরা কামরায় যাইয়ে।

গাড়ি চলতে লাগল। আগন্তুকের বয়স চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৃষস্কন্ধ শালপ্রাংশু, কালবৈশাখীর মেঘের মতন গায়ের রং, বাবরি চুল, গাল পর্যন্ত জুলফি, মোটা গোঁফের নীচে পুরু ঠোঁট। পরনে মিহি ধুতি, কাছার এক কোণ ঝুলছে। গায়ে লম্বা রেশমি কোট, তার উপর ভাঁজ করা আজানুলম্বিত জরিপাড় উড়ুনি। কপালে রক্ত চন্দনের ফোঁটা, দুই কানে হীরার ফুল, আঙুলে অনেকগুলি নীলা চুনি পান্নার আংটি, পায়ে পনর নম্বর চপ্পল।

ঝকঝকে সাদা দাঁত বার করে হেসে আগন্তুক পরিষ্কার বাংলায় হরিহরবাবুকে বললেন, ঘাবড়াবেন না মশায়, আমি শুধু দাঁড়িয়ে থাকব। পান খেয়ে পিক ফেলব না, সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ব না, আশ্চর্য মাজন বেচব না, বন্যা ভূমিকম্পের চাঁদা চাইব না, সর্বহারার গানও গাইব না। যদি পরে ভিড় কমে তবে একটু বসবার জায়গা করে নেব। যদি অনুমতি দেন তবে আলাপ করে আপনাদের খুশী করবার চেষ্টা করব।

শরৎ নামক ছেলেটি বললে, কতক্ষণ কষ্ট করে দাঁড়িয়ে থাকবেন, আপনি আমার পাশে বসুন। আগন্তুক কৃতজ্ঞতা সূচক নমস্কার করে বসে পড়লেন।

হালদার মশায় বললেন, মহাশয়ের নামটি কি? নিবাস কোথায়? কি করা হয়? কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

আগন্তুক উত্তর দিলেন, আমার নাম লংকুস্বামী কর্বুরঙ্গ রেড্ডি। আদি নিবাস ধ্বংস হয়ে

গেছে, এখন ভারতের নানা স্থানে ঘুরে বেড়াই। কিছু করি না, মহাদেব আর রামচন্দ্রের কৃপায় আমার কোনও অভাব নেই। এখন আসানসোলে শ্বশুরের কাছে যাচ্ছি, কাল অযোধ্যা-পুরী রওনা হব, নবরাত্রি উৎসব দেখতে।

হরিহরবাবু বললেন, আপনি রেড্ডি? ক্ষত্রিয়?

—ব্রাহ্মণও বটি ক্ষত্রিয়ও বটি।

—ও আপনি ব্রহ্মক্ষত্রিয়, আমাদের এই তারক গুপ্তর স্বজাতি?

—তা বলতে পারি না।

হরিহরবাবু চিন্তিত হয়ে বললেন, তবেই তো সমস্যায় ফেললেন মশায়। আপনি শর্মা, না বর্মা, না দাশ তালব্য-শ, না দাস দন্ত্য-স?

আমি শর্মা-বর্মা-দাষ, দ-এ আকার মূর্ধন্য ষ। আমি জাতিতে মূর্ধাভিষিক্ত। পিতা ব্রাহ্মণ, মাতা রক্ষঃক্ষত্রিয়া রাজকন্যা। রেড্ডি আমার আসল উপাধি নয়, শুনতে মিষ্ট বলে নামের শেষে যোগ করি।

হালদার মশায় বললেন, আহা, কেন ভদ্রলোককে জেরা করে বিব্রত কর, দেখতেই তো পাচ্ছ ইনি মাদ্রাজী। আরও পরিচয়ের দরকার কি। আপনি তো খাসা বাংলা বলেন মশায়। শিখলেন কোথায়?

লংকুম্বামী হেসে বললেন, আমার বর্তমানা পত্নী আট বৎসর শান্তিনিকেতনে ছিলেন, তাঁর কাছেই বাংলা শিখেছি।

হরিহরবাবু বললেন, বর্তমানা পত্নী?

—আজ্ঞে হাঁ। পত্নীদেরও ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান আছে।

হালদার মশায় বললেন, এই সোজা কথাটা বুঝলে না? ইনি অনেক বার সংসার করেছেন। এই আমার মতন আর কি। চার বার বিবাহ করেছি, কলাগাছ নিয়ে পাঁচ। কিন্তু এখন গৃহ শূন্য। আবার বিবাহ করবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু শেষ পক্ষের সম্বন্ধী এই শরৎ শালার জন্যেই তা হচ্ছে না, কেবলই ভাংচি দেয়।

লংকুম্বামী বললেন, মহাশয়ের বয়স কত হয়েছে?

—চার কুড়ি পুরতে এখনও ঢের বাকী।

শরৎ বলে উঠল, মিথ্যে বলবেন না হালদার মশায়, সেই কবে আশি পেরিয়েছেন।

—তুই চুপ কর ছোঁড়া। বুঝলেন লংকুবাবু, বয়স যতই হোক খুব শক্ত আছি। এখনও একটি আস্ত ইলিশ হজম করতে পারি।

লংকুম্বামী বললেন, তবে আর ভাবনা কি। আপনি তো বালক বললেই হয়, এক শ বার বিবাহ করতে পারেন।

—হেঁ হেঁ। বালক নয়, তবে জোয়ান বলতে পারেন। মহাশয় ক বার সংসার করেছেন?

লংকুম্বামী পকেট থেকে একটি নোটবুক বার করে দেখে বললেন, এখন ঊনবিংশত্যধিক-শততম সংসার চলছে।

—তার মানে?

অর্থাৎ এখন পর্যন্ত এক শ উনিশ বার বিবাহ করেছি।

হালদার মশায় চোখ কপালে তুলে বললেন, প্রত্যেক বারে দশ বিশ গণ্ডা বিবাহ করে-ছিলেন নাকি?

—না না, বহুবিবাহে আমার ঘোর আপত্তি, যদিও আমার বড়-দা আর মেজদার অনেক পত্নী ছিলেন। আমি চিরকালই একনিষ্ঠ, এক-একটি পত্নী গত হলে আবার একটির পাণি-গ্রহণ করেছি।

অভিশাপ দিলে ফলে না, আমি নির্বিষ ঢোঁড়া সাপ হয়ে গেছি। শিষ্যরা আমাকে ত্যাগ করেছে, আমি এখন ছন্নছাড়া হয়ে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

আমি বললুম, মহামুনি, শান্ত হ'ন, আপনি শুধু শুধু কষ্ট পাচ্ছেন। ভরত রাজা তো কবে স্বর্গলাভ করেছেন, তাঁর আর ঝুমঝুমির দরকার কি? আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে তপস্যা করুন, যোগ-সাধনা করুন, হরিনাম করুন। অথবা লোকশিক্ষার নিমিত্ত জীবন-স্মৃতি লিখুন, জটাশ্মশ্রুধারী উগ্রতপা মুনি-ঋষিদের সঙ্গে গ্ল্যামার গার্ল অপ্সরাদের মোলাকাত বিবৃত করুন, পত্রিকাওয়ালারা তা নেবার জন্য কাড়াকাড়ি করবে। ঝুমঝুমির কথা একেবারে ভুলে যান।

—হায় হায়, ভোলবার জো কি! ওই ঝুমঝুমিই হচ্ছে মেনকার অভিশাপ, শকুন্তলার প্রতিশোধ। আমার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে, যখন তখন ঝুমঝুম শব্দ শুনি।

দুর্বাসা হঠাৎ চিৎকার করে হাত পা ছুড়ে নাচতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে পুলিনের ছেলে পল্টু তাঁর পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে চেঁচিয়ে উঠল—মেরে ফেললে রে, সব কটাকে মেরে ফেললে!

ব্যাপার গুরুতর। পল্টু নিবিষ্ট হয়ে ঝুমঝুমির ইতিহাস শুনছিল। সেই অবকাশে ইঁদুরগুলো তার পকেট থেকে বেরিয়ে দুর্বাসাকে আক্রমণ করেছে। দুটো তাঁর কাঁধে উঠেছে, একটা অধোবাসে ঢুকে গেছে, আর একটা কোথায় আছে দেখা যাচ্ছে না। তাঁর নাচের ঝাকুনিতে তিনটে ইঁদুর নীচে পড়ে গেল। পল্টু কোনও রকমে সেগুলোকে দুর্বাসার পদাঘাত থেকে রক্ষা করলে।

দুর্বাসা বললেন, তুই অতি দুর্বিনীত বালক।

পুলিন বললে, টেক কেয়ার তপোধন, আমার ছেলেকে যদি শাপ দেন তো ভাল হবে না বলছি।

দুর্বাসা বললেন, ইঁদুর পোষা মহাপাপ, চণ্ডালেও পোষে না।

পল্টু রেগে গিয়ে বললে, বা রে, আপনি যে নিজের গায়ে ছারপোকা পোষেন তা বুঝি খুব ভাল? দেখ না বাবা, ঋষি মশায়ের গা থেকে কত ছারপোকা আমাদের বিছানায় এসেছে। আর একটা ইঁদুর কোথা গেল? খুঁজে পাচ্ছি না যে—

দুর্বাসা আবার চিৎকার করে নাচতে লাগলেন। পল্টু বললে, ওই ওই, দাড়ির ভেতর একটা সেঁধিয়েছে।

অনুমতি না নিয়েই পল্টু দুর্বাসার দাড়িতে হস্তক্ষেপ করে তার ভেতর থেকে ইঁদুরটাকে টেনে বার করলে। তার পর বললে ঝুমঝুম শব্দ হচ্ছে কেন?

আমি লাফিয়ে উঠে বললুম, ঝুমঝুম শব্দ? বলিস কি-রে! প্রভু, আপনার দাড়িটি একবার নাড়ুন তো।

দুর্বাসা দাড়ি নাড়লেন। সেই নিবিড় শ্মশ্রুজাল ভেদ করে ক্ষীণ শব্দ নির্গত হল—ঝুমে ঝুম ঝুম। যেন নৃত্যপরা মেনকার নূপুরনিক্বণ দূরদূরান্তর থেকে ভেসে আসছে।

পুলিন দাড়ির নীচের ঝুঁটিটা একবার টিপে দেখলে, তার পর গেরো খুলতে লাগল। দুর্বাসা বললেন, আরে লাগে লাগে! কে তাঁর কথা শোনে, আমি তাঁর মাথাটি জোর করে ধরে রইলুম, পুলিন পড়পড় করে দাড়ি ছিঁড়ে ভেতর থেকে ঝুমঝুমি বার করলে। সোনার কি রুপোর কি টিনের বোঝা গেল না, ময়লায় কালো হয়ে গেছে, কিন্তু বাজছে ঠিক।

পল্টু চুপি চুপি বললে, এক্স-রে করলে কোন্ কালে বেরিয়ে পড়ত, নয় বাবা? পল্টুর অভিজ্ঞতা আছে, বছর দুই আগে সে একটা পয়সা গিলেছিল।

একজন গুজরাটী যাত্রী সশব্দে হেসে বললেন, বুঝছেন না হালদার মোসা, ইনি আপনাকে বিয়া পাগল বুড়া ঠহরেছেন, তাই আপনার পয়ের খিঁচছেন, যাকে বলে লেগ পুলিং।

লংকুস্বামী তাঁর বৃহৎ জিহবা দংশন করে বললেন, রাম রাম, আমি ঠাট্টা করছি না, সত্য কথাই বলছি।

গাড়ি বর্ধমানে পৌঁছল, অনেক যাত্রী নেমে গেল। লংকুস্বামী বললেন, এখন একটু জায়গা হয়েছে, আপনাদের যদি অসুবিধা না হয় তবে আমার স্ত্রীকে মহিলা-কামরা থেকে নিয়ে আসি। সেখানে বড় ভিড়, তাঁর কষ্ট হচ্ছে। ঘণ্টা-দুই পরেই আমরা আসানসোলে নেমে যাব।

শরৎ বললে, কোনও অসুবিধা হবে না, আপনি তাঁকে নিয়ে আসুন।

লংকুস্বামী তাঁর পত্নীকে নিয়ে এলেন। বয়স আন্দাজ পঁচিশ, সুশ্রী তন্বী শ্যামা, কাছা দিয়ে শাড়ি পরা, মাথা খোলা, দুই কানে আর নাকের দুই পাশে হীরে ঝকমক করছে। লংকুস্বামী পরিচয় দিলেন, এই ইনিই আমার এক শ উনিশ নম্বরের স্ত্রী, এঁর নাম সুরাম্মা বাঈ। সুরাম্মা স্মিতমুখে সকলের উদ্দেশে নমস্কার করলেন।

হালদার মশায় চুলবুল করছেন আর তাঁর ঠোঁট বার বার নড়ছে দেখে লংকুস্বামী বললেন, আপনি কিছু জিজ্ঞাসা করতে চান কি? স্বচ্ছন্দে বলুন, আমার স্ত্রীর জন্য কোনও দ্বিধা করবেন না।

হালদার মশায় বললেন, এক শ উনিশ বার বিবাহ করা চাট্টিখানি কথা নয়, আপনার বয়স কত হবে লংকুবাবু?

—আপনি আন্দাজ করুন না।

—আমার চাইতে কম। এই পঞ্চাশের মধ্যে আর কি।

—হল না, আরও উঠুন।

—ষাট?

—আরও, আরও!

—সত্তর? আশি?

তারকবাবু হেসে বললেন, আপনার কাজ নয় হালদার মশায়। নিলামের দর চড়ানো আমার অভ্যাস আছে। লংকুস্বামীজী আপনার বয়স এক শ।

—হল না, আরও উঠুন।

—পাঁচ শ? হাজার? দু হাজার?

—আরও, আরও।

—চার হাজার? পাঁচ হাজার?

লংকুস্বামী বললেন, এইবার কাছাকাছি এসেছেন। সুরাম্মা, তুমি তো সেদিন হিসেব করেছিলে তোমার চাইতে আমি ক বছরের বড়। তুমি বাবুমশায়দের শুনিয়ে দাও আমার বয়স কত।

সুরাম্মা সহাস্যে মৃদুস্বরে বললেন, পাঁচ হাজার পাঁচ শ পঞ্চান্ন।

হালদার মশায় হাঁ করে নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন। হরিহরবাবু হতভম্ব হয়ে ভাবতে লাগলেন, স্বপ্ন দেখছি, না জেগে আছি? অন্য যাত্রীরা নির্বাক হয়ে রইল, কেউ কেউ বোকার মতন হাসতে লাগল।

তারকবাবু বললেন, ক বছর অন্তর বিবাহ করেছিলেন মশায়?

ভারতের ঝুমঝুমি

দুর্বাসা একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, একেই বলে গেরোর ফের। ঝুমঝুমিটি যে যত্ন করে দাড়ির গেরোর মধ্যে গুঁজে রেখেছিলুম তা মনেই ছিল না। তার পর পল্টুর মাথায় হাত দিয়ে বললেন, বৎস, আমি আশীর্বাদ করছি তুমি রাজা হবে।

আমি বললুম, ও আশীর্বাদ আর ফলবার উপায় নেই প্রভু, রাজাটাজা লোপ পেয়েছে। বরং এই আশীর্বাদ করুন যেন ও মন্ত্রী হতে পারে, অন্তত পাঁচ বছরের জন্য।

—বেশ সেই আশীর্বাদ করছি। কিন্তু রাজা না থাকলে রাজকার্য চলবে কি করে?

—আজকাল তা চলে। আধুনিক বিজ্ঞান বলে যে কর্তা না থাকলেও ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়।

দুর্বাসা বললেন, আমি এখন উঠি। যাঁর জিনিস তাঁকে অর্পণ করে সত্বর দায়মুক্ত হয়ে ব্রহ্মলোকে যেতে চাই।

—অর্পণ করবেন কাকে?

—কেন; মহারাজ ভরতের বংশধর নেই?

—কেউ নেই, ভরতবংশ অর্থাৎ যুধিষ্ঠির-পরীক্ষিতের বংশ লোপ পেয়েছে। তাঁদের যাঁরা উত্তরাধিকারী—নন্দ মৌর্য শুঙ্গ অন্ধ্র গুপ্ত প্রভৃতি, তার পর পাঠান মোগল ইংরেজ, এঁরাও ফৌত হয়েছেন। ভরতের রাজ্য এখন দুভাগ হয়েছে, বড়টি ভারতীয় গণরাজ্য, ছোটটি ইসলামীয় পাকিস্থান।

—একজন চক্রবর্তী রাজা আছেন তো?

—এখন আর নেই, দুই রাজ্যে দুই রাষ্ট্রপতি বাহাল হয়েছেন, একজন দিল্লীতে আর একজন করাচিতে থাকেন। আইন অনুসারে এঁরাই ভরতের স্থলাভিষিক্ত, সুতরাং ঝুমঝুমিটি এঁদেরই হক পাওনা। কিন্তু দেবেন কাকে? একজনকে দিলে আর একজন ইউ-এন-ও-তে নালিশ করবেন, না হয় ঘুষি বাগিয়ে বলবেন, লড়কে লেংগে ঝুমঝুমা।

দুর্বাসা ক্ষণকাল ধ্যানমগ্ন হয়ে রইলেন। তার পর মট্ করে ঝুমঝুমিটি ভেঙে বললেন, একজনকে দেব এই খোলটা যাতে পাথরকুচি আছে, নাড়লে কড়রমড়র করে। আর একজনকে দেব এই ডাঁটিটা, ফুঁ দিলে পিঁ পিঁ করে। দাও তো গোটা দশ টাকা রাহাখরচ।

টাকা নিয়ে দুর্বাসা তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

১৩৫৮ (১৯৫১)

লংকুস্বামী আবার তাঁর নোটবুক দেখে বললেন, গড়ে ছেচল্লিশ বৎসর অন্তর। আমার স্ত্রীদের আয়ু তো আমার মতন ছিল না, সকলেই যথাকালে গত হয়েছিলেন। অষ্টম হেনরির মতন আমি স্ত্রীবধ করি নি। আমার সকল স্ত্রীই সতীলক্ষ্মী।

হালদার মশায় ক্ষীণস্বরে প্রশ্ন করলেন, সন্তানাদি কতগুলি?

—সুরাম্মার এখনও কিছু হয়নি। আমার পূর্ব পূর্ব পক্ষের সন্তানদের হিসাব রাখি নি, রাখা সাধ্যও নয়। বিস্তর জন্মেছিল, বিস্তর মরে গেছে, তবু জীবিত বংশধরদের সংখ্যা এখন কয়েক লাখ হবে।

তারকবাবু বললেন, যত রেড্ডি পিল্লে মেনন নাইডু নায়ার চেট্টি আয়ার আয়েঙ্গার সবাই আপনার বংশধর নাকি?

—শুধু ওরা কেন। চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যে ঘোষ বোস সেন আছে, সিং কাপুর চোপরা মেটা দেশাই আছে, শেখ সৈয়দ আছে, হোর লাভাল কুইসলিং আছে, চ্যাং কিমাগুস্যা ভডকুইস্কি প্রভৃতিও আছে! সাড়ে পাঁচ হাজার বৎসরে মানুষের জাতিগত পরিবর্তন অনেক হয়।

—আপনি তা'হলে মহেঞ্জোদাড়ো হারাপ্পা যুগের লোক।

—তা বলতে পারেন। ওইসব দেশবাসীর সংগে আমার পূর্ব-পুরুষদের কুটুম্বিতা ছিল। আমার বৃদ্ধপ্রমাতামহীর নাম সালকটংকটা, তিনি হারাপ্পার রাজবংশের কন্যা ছিলেন।

হরিহরবাবু এতক্ষণে একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বললেন, উঃ, দীর্ঘ জীবনে আপনার বিস্তর স্বজনবিয়োগ হয়েছে, কতই না শোক পেয়েছেন!

—শোক পাব কেন? কৃষকের আয়ু ধানগাছের চাইতে বেশী। ধানগাছ শস্য দিয়ে মরে যায়, তার জন্য কৃষক কিছুমাত্র শোক করে না, আবার বীজ ছড়ায়।

হরিহর বললেন, ওঃ, সাড়ে পাঁচ হাজার বৎসরের ইতিহাস আপনার চোখের সামনে ঘটে গেছে!

হাঁ। পলাসীর যুদ্ধ, পৃথ্বীরাজের পরাজয়, হর্ষবর্ধনের দিগ্‌বিজয়, আলেকজাণ্ডারের আগমন, বুদ্ধদেবের জন্ম, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ, সবই আমি দেখেছি।

রাম-রাবণের যুদ্ধও দেখেছেন?

লংকুস্বামী গম্ভীর হয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, তাও দেখতে হয়েছে। শুধু দেখা নয়, লড়তেও হয়েছে। ও কথা আর তুলবেন না।

হরিহরবাবু রোমাঞ্চিত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে হাত জোড় করে প্রশ্ন করলেন, আপনি কে প্রভু।

গুজরাটী ভদ্রলোকটি উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। দুই ঊরুতে চাপড় মেরে চেঁচিয়ে বললেন, ও হো হো হো! আমি বুঝে লিয়েছি আপনি হচ্ছেন বিভীখ্খন মহারাজ, রামচন্দ্রের বরে চিরঞ্জীব হয়েছেন। এখন একটি বাত বলছি শুনেন। আমার নাম শুনে থাকবেন, লগনচাঁদ বজাজ, নয়নসুখ ফিলিম কম্পনির মালিক। নয়া ফিলিম বানাচ্ছি—রাবণ-সন্‌হার। রোশেনারা পকৌড়িলাল সাগরবালা এ'রা সব নামছেন। আপনারা আমার কম্পনিতে জইন করুন। খুদ আমি রামচন্দ্রের পার্ট লিব। আপনি বড়দাদা রাবণের পার্ট লিবেন, সুরাম্মা বাঈ সীতার পার্ট লিবেন। হজার টাকা করে মহীনা দিব। এই আমার কার্ড। বিচার করে দেখবেন, রাজী হন তো এক হপ্তার অন্দর এই ঠিকানায় আমাকে তার ভেজবেন। অচ্ছা?

লংকুস্বামী একবার কটমট করে তাকালেন। লগনচাঁদ থতমত খেয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, তাঁর হাত থেকে কার্ডখানা খসে পড়ে গেল।

এই সময়ে গাড়ি আসানসোলে এসে থামল। সস্ত্রীক লংকুস্বামী কোন কথা না বলে যুক্ত করে বিদায় নিলেন এবং বাঘের মতন নিঃশব্দে পা ফেলে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়লেন।

১৩৫৭ (১৯৫১)



যৌবনে

ধুস্তুরীমায়া ইত্যাদি গল্প

ধুস্তুরী মায়া

(দুই বুড়োর রূপকথা)

উদ্ধব পাল আর তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু জগবন্ধু গাঙ্গুলীর বয়স প্রায় পঁয়ষট্টি। উদ্ধব বেঁটে মোটা শ্যামবর্ণ মাথায় টাক, কাঁচা-পাকা ছাঁটা গোঁফ। উডমণ্ট স্ট্রীটে এঁর একটি ইমারতী রঙের বড় দোকান আছে, এখন দুই ছেলে সেটি চালায়। জগবন্ধু লম্বা রোগা ফরসা, গোঁফ-দাড়ি নেই। ইনি জামরুলতলা হাই-স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন, এখন অবসর নিয়েছেন। দুই বন্ধু দক্ষিণ কলকাতায় আবুহোসেন রোডে কাছাকাছি বাস করেন। ছেলেরা রোজগার করছে, মেয়েরা সুপাত্রে পড়েছে, সেজন্য সংসারের ভাবনা থেকে এঁরা নিষ্কৃতি পেয়েছেন। দুজনেরই স্বাস্থ্য ভাল, শখও নানারকম আছে, সুতরাং বুড়ো বয়সে এঁদের বেশ আনন্দেই থাকবার কথা।

রোজ বিকাল বেলা এঁরা ঢাকুরের লেকে হেঁটে যান এবং জলের ধারে একটি বড় শিমুল গাছের তলায় বসে সন্ধ্যা সাতটা আটটা পর্যন্ত গল্প করেন, তার পর বাড়ি ফেরেন। দুজনেই সেকেলে লোক, সিগারেট চুরুট পাইপ পছন্দ করে না। প্রত্যেকে ঝুলিতে একটা হুঁকো আর তামাক-টিকে-সাজানো দুটি কলকে নিয়ে যান এবং গল্প করতে করতে মুহুর্মুহু ধূমপান করেন।

বৈশাখ মাস, সন্ধ্যা সাতটাতেও একটু আলো আছে। জগবন্ধু নিজের হুঁকো থেকে কলকেটি তুলে উদ্ধবের হাতে দিয়ে বললেন, আজ তোমার দাঁতের খবর কি?

উদ্ধব উত্তর দিলেন, তোমার সেই মাজনে কোনও উপকার হল না, পড়ে না গেলে কনকনানি যাবে না! তুমি খাসা আছ, দুপাটি বাঁধিয়ে মুড়ি কড়াইভাজা নারকেল গলদা চিংড়ি সবই চিবিয়ে খাচ্ছ। আমার তো পান সুদ্ধ ছাড়তে হয়েছে।

—ছেঁচে খাও না কেন?

—আরে ছ্যা, তাতে সবাই ভাববে একেবারে থুত্থুড়ে বুড়ো হয়ে গেছি। তার চাইতে না খাওয়া ভাল। বুড়ো হওয়ার অশেষ দোষ।

—শুধু দোষ দেখছ কেন, ভালর দিকটাও দেখ। খাটতে হচ্ছে না, ছেলেরা সব করে দিচ্ছে। সবাই খাতির করে, কোথাও গেলে সব চাইতে আরামের চেয়ারটিতে বসতে দেয়, পাড়ায় সভা হলে তোমাকেই সভাপতি করে। গুরুজন নেই, ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে হয় না, অন্য লোকেই প্রণাম করে।

—থামলে কেন, বলে যাও না। মেয়েরা সব দাদু জেঠা মেসো বলে, বুড়োদের দিকে আড় চোখে তাকায় না, আমরা যেন ইট পাথর গরু ছাগল।

—তাতে তোমার ক্ষতিটা কি?

—ক্ষতি নয়? আমাদের পুরুষ মানুষ বলেই গণ্য করে না। দেখ জগু, জীবনটা বৃথাই কাটল।

—বৃথা কেন, তোমার কিসের অভাব? উপযুক্ত দুই ছেলে রয়েছে, গিন্নী রয়েছেন, ব্যবসায় দেদার টাকা আসছে, শরীর ভালই আছে। তোমার ও দাঁত নড়া ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। বাত ডায়াবিটিস ব্লাডপ্রেশার কিছুই নেই, এই বয়সেও নিমন্ত্রণে গিয়ে দু দিস্তে লুচি আর দেদার

মাছ মাংস দই মিষ্টান্ন খেতে পার। আমি অবশ্য তোমার মতন মজবুত নই, বড়লোকও নই, কিন্তু দুঃখ করবারও কিছু নেই। কজন বুড়ো আমাদের মতন ভাগ্যবান?

উদ্ধব পাল হুঁকোয় একটি দীর্ঘ টান দিয়ে কলেকটি বন্ধুর হাতে দিলেন। তার পর বললেন, দেখ জগদু, যখন বয়স ছিল তখন কোন ফুর্তিই করতে পাই নি। কর্তার হুকুমে ইস্কুলের পড়া শেষ না করেই দোকানে ঢুকেছি, ব্যবসা আর রোজগার ছাড়া আর কিছুতে মন দেবার অবকাশ ছিল না।

জগবন্ধু গাঙ্গুলী বললেন, এখন তো দেদার অবকাশ, যত খুশি আনন্দ কর না।

—চেষ্টা করেছি, কিন্তু এই বয়সে তা হবার নয়। ছোঁড়াদের দেখে বাইসিকেল চড়ে সনসনিয়ে ছুটতে আর মোটর চালাতে ইচ্ছে করে, কিন্তু শক্তি নেই। আজকাল অ্যাং ব্যাং চ্যাং সবাই বিলেত ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে আসছে। আমারও ইচ্ছে হয়, কিন্তু ইংরিজী বলতে পারি না, হ্যাট-কোট পায়জামা-আচকান পরতে পারি না, কাঁটা-চামচ দিয়ে খেলে পেট ভরে না, কাজেই যাবার জো নেই। আবার সেকেলে ফুর্তিও সয় না। বছর চারেক আগে কাশীতে এক সাধু-বাবার প্রসাদী বড়-তামাকের ছিলিমে একটি টান মেরেছিলুম, তার পর ঘণ্টা দুই ত্রিভুবন অন্ধকার। সেদিন আমার বেয়াই জগন্নাথ দত্তর বাগানে গিয়ে উপরোধে পড়ে চার গেলাস খেয়েছিলুম—রম-পঞ্চ না কি বললে। খেয়ে যাই আর কি, কেবল হেঁচকি আর হেঁচকি, তার পর বমি।

—ফুর্তিরও সাধনা দরকার, জোয়ান বয়স থেকে অভ্যাস করতে হয়। এখন আর ওসব করতে যেয়ো না।

—তার পর এই সেদিন তোমার সঙ্গে স্বপনপুরী সিনেমায় 'লুটে নিল মন' দেখেছিলুম। দেখা ইস্তক মনটা খিঁচড়ে আছে। জীবনের যা সব চাইতে বড় সুখ—প্রেম, তাই আমার ভোগ হল না।

—অবাক করলে তুমি। বাড়িতে সতীলক্ষ্মী গৃহিণী আছেন তবু বলছ প্রেম হয় নি? শাস্ত্রে বলে—জীর্ণমন্নং প্রশংসন্তি ভার্যাঞ্চ গতযৌবনাম্। অর্থাৎ ভাত হজম হলে আর স্ত্রী বৃদ্ধা হলেই লোকে প্রশংসা করে। এখন না হয় দুজনে বুড়ো হয়েছ, কিন্তু প্রথম বয়সে প্রেম হয় নি এ কি রকম কথা?

—আমার বয়স যখন বারো তখনই বাবা সাত বছরের পুত্রবধূ ঘরে আনলেন। খিদে না হতেই যদি খাবার জোটে তবে ভোজনের সুখ হবে কেমন করে? তা ছাড়া গিন্নীর মেজাজটি চিরকালই রুক্ষু, প্রেম করবার মানুষ তিনি নন। আর চেহারাটি তো তোমার দেখাই আছে। তবে হক কথা বলব, মাগী রাঁধে যেন অমৃত!

—কি রকম হলে তুমি খুশী হতে বল তো?

—যা হবার নয় তা বলে আর লাভ কি। তবু মনের কথা বলছি শোন। হুইল দেওয়া ছিপে যেমন করে রুই কাতলা ধরা হয় সেই রকম আর কি। ফাতনা নড়ে উঠল, টোপ গিলেই চোঁ করে সরে গেল, তার পর টান মেরে কাছে আনলুম আবার সুতো ছাড়লুম, এই রকম খেলিয়ে খেলিয়ে বউ ঘরে তুলতে পারলেই জীবনটা সার্থক হত।

—ও, তুমি নটবর নাগর হয়ে প্রেমের মৃগয়া করতে চাও! এ বয়সে ওসব চিন্তা ভাল নয় ভাই। পত্নী যে ভাবেই ঘরে আসুন—কচি বেলায় বা ধেড়ে বয়সে, প্রেমের আগে বা পরে—তিনি চিরকালই মার্গিতব্যা, অর্থাৎ খোঁজবার আর চাইবার জিনিস।

—কি বললে, মার্গিতব্যা? তা থেকেই বুঝি ম্যাগী হয়েছে?

—তা জানি না, সুনীতি চাটুজ্যে মশাই বলতে পারেন।

উদ্ধব পাল একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভড়াক ভড়াক করে তামাক টানতে লাগলেন।

যে শিমুল গাছের তলায় এঁরা বসেছিলেন তার উপরে একটি পাখি হঠাৎ ডেকে উঠল—ওঠ ওঠ ওঠ ওঠ। আর একটা পাখি সাড়া দিলে—উঠি উঠি উঠি উঠি।

উদ্ধব বললেন, কি পাখি হে? বেশ মজার ডাক তো।

প্রথম পাখিটা মোটা সুরে আবার ডাকল—ব্যাং ব্যাং গমী গমী গমী। অন্য পাখিটা মিহি সুরে উত্তর দিলে—ব্যাং ব্যাং গমা গমা গমা।

জগবন্ধু রোমাঞ্চিত হয়ে চুপি চুপি বললেন, কি আশ্চর্য ব্যাপার!

উদ্ধব বললেন, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী নয় তো?

—চুপ চুপ। শুনে যাও কি বলছে।

ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর আলাপ শুরু হল। কলকাতার টেলিফোনের মতন অস্পষ্ট আওয়াজ, কিন্তু বোঝা যায়।

—নীচে কারা রয়েছে রে ব্যাঙ্গমী?

—দুটো বুড়ো।

—কি করছে ওরা?

—তামাক খাচ্ছে আর বক বক করছে।

—ও, তাই নাকে দুর্গন্ধ লাগছে আর কাশি আসছে। কি বলছে ওরা?

—একটা বুড়ো বলছে তার জীবনই বৃথা, প্রেম করবার সুবিধে পায় নি। আর একটা বুড়ো তাকে বোঝাচ্ছে।

—বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ ধরেছে। এই বলে ব্যাঙ্গমা তার সায়ংকালীন কোষ্ঠশুদ্ধি করলে। উদ্ধব আর জগবন্ধু রুমাল দিয়ে মাথা মুছে একটু সরে বসলেন।

ব্যাঙ্গমী বললে, তোমার তো নানারকম বিদ্যে আছে, একটা উপায় বাতলে দাও না। আহা বুড়ো বেচারার মনে বড় দুঃখ, যাতে তার শখ মেটে তার ব্যবস্থা কর।

ব্যাঙ্গমা বললে, জোয়ান হবার শখ থাকে তো তার প্রক্রিয়া বাতলাতে পারি, কিন্তু ওদের সাহস হবে কি? বোধ হয় পেরে উঠবে না।

—পারুক না পারুক তুমি বল না।

উদ্ধব ফিসফিস করে বললেন, নোট করে নাও হে, নোট করে নাও। জগবন্ধু তার নোটবুকে লিখতে লাগলেন।

ব্যাঙ্গমা বললে, ধুস্তুরী ছোলা। এক-একটি ছোলা খেলে দশ-দশ বছর বয়স কমে যায়।

—সে আবার কি জিনিস? কোথায় পাওয়া যায়?

—তৈরী করতে হয়। ওই বেড়ার দক্ষিণ দিকে নীল ধুতরোর ঝোপ আছে, তাতে বড় বড় ফল ধরেছে। কৃষ্ণপক্ষ পঞ্চমীর সন্ধ্যায় ধুতরো ফল চিরে তার ভেতরে ছোলা গুঁজে দিতে হবে, একটি ফলে একটি ছোলা। একাদশীর মধ্যে সেই ছোলা রস টেনে নিয়ে ফুলে উঠবে, তখন বার করে নেবে। তার পর অমাবস্যা সন্ধ্যায় গঙ্গার ঘাটে ছোলা চিবিয়ে খেয়ে সংকল্প করবে। মনে থাকে যেন, একটি ছোলায় দশ বছর বয়স কমবে, পাঁচটিতে পঞ্চাশ বছর।

—যদি দশ-বিশটা খায়?

—তবে পূর্বজন্মে ফিরে যাবে। তার পর শোন। সংকল্পের পর এই মন্ত্রটি বলে গঙ্গায় একটি ডুব দেবে—

বম মহাদেব ধুস্তুরস্বামী,
দস্তুর মত প্রস্তুত আমি।

ডুব দেবা মাত্র বয়স কমে যাবে।

—আচ্ছা, যদি ফের আগের বয়সে ফিরে আসতে চায়?

—খুব সোজা। পূর্ণিমার সন্ধ্যায় গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বেলপাতা চিবিয়ে খাবে, যটা ছোলা খেয়েছিল তটা বেলপাতা। তার পর এই মন্ত্রটি বলে একটি ডুব দেবে—

বম মহাদেব, সকল বস্তু
আগের মতন আবার অস্তু।

ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী নীরব হল। আরও কিছু শোনবার আশায় খানিকক্ষণ সবুর করে উদ্ধব বললেন, বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। যা শোনা গেল তাই যথেষ্ট। প্রক্রিয়াটি যা বললে তা গালবীয়জীর কায়কল্পের চাইতে ঢের সোজা, বিপদের ভয়ও দেখছি না।

জগবন্ধু বললেন, ধুতরোর রস হচ্ছে বিষ তা জান?

—আরে ছোলার মধ্যে কতই আর রস ঢুকবে। ব্যাঙ্গমার কথা যদি মিথ্যেই হয় তবে বড় জোর একটু নেশা হবে। আমরা তো আর মুঠো খানিক ছোলা খাব না।

—তবে চল, দেখা যাক বেড়ার দক্ষিণে নীল ধুতরোর গাছ আছে কি না।

দুজনে গিয়ে দেখলেন, ধুতরো গাছের জঙ্গল, বড় বড় ফল ধরেছে। জগবন্ধু বললেন, বোধ হয় পরশু কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী, বাড়ি গিয়ে পাঁজি দেখতে হবে। সেদিন ছোলা আর একটা ছুরি নিয়ে আসা যাবে।

পঞ্চমীর দিন উদ্ধব আর জগবন্ধু ধুতরোর বনে এসে দশ-বারোটা ফল চিরে তার মধ্যে ছোলা পুরে দিলেন। তার পরের কদিন তাঁরা নানারকম ভাবনায় আর উত্তেজনায় কাটালেন। জগবন্ধু অনেক বার বললেন, কাজটা ভাল হবে না। উদ্ধব বললেন, অত ভয় কিসের, এমন সুযোগ ছাড়তে আছে! আমাদের বরাত খুব ভাল তাই ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর কথা নিজের কানে শুনেছি! আমার মনে হয় হরপার্বতী দয়া করে পাখির রূপ ধরে আমাদের হদিস বাতলে দিয়েছেন। এই বলে উদ্ধব হাত জোড় করে বার বার কপালে ঠেকাতে লাগলেন।

জগবন্ধু বললেন, আচ্ছা, জোয়ান না হয় হওয়া গেল, কিন্তু বাড়ির লোককে কি বলবে?

—বাড়িতে যাব কেন। খোঁজ না পেলে সবাই মনে করবে যে মরে গেছি। আমরা অন্য নাম নিয়ে অন্য জায়গায় থাকব। তুমি জগবন্ধুর বদলে জলধর হবে, আমি উদ্ধবের বদলে উমেশ হব। কেউ চিনতে পারবে না, নিশ্চিন্ত হয়ে ফুর্তি করা যাবে।

একাদশীর দিন তাঁরা ধুতরো ফল পেড়ে ভিতর থেকে ছোলা বার করে নিলেন। ছোলা ফুলে কুল আঁঠির মতন বড় হয়েছে। তার পর কদিন তাঁরা গোপনে নানা রকম ব্যবস্থা করে ফেললেন, যাতে ভবিষ্যতে নিজেদের আর পরিবারবর্গের কোনও অভাব না হয়। উদ্ধব উমেশ পালের নামে ব্যাঙ্কে একটা নতুন অ্যাকাউণ্ট খুলতে যাচ্ছিলেন। জগবন্ধু বললেন, যদি পরে ফিরে আসতে হয় তবে টাকাটা বার করতে পারবে না; উদ্ধব আর উমেশ পালের নামে জয়েণ্ট অ্যাকাউণ্ট কর। উদ্ধব তাই করলেন।

চতুর্দশীর দিন জগবন্ধু বললেন, দেখ, বয়স কমাতে হয় তুমি কমাও। আমার কোনও দরকার নেই।

উদ্ধব বললেন, তা কি হয়, এক যাত্রায় পৃথক ফল হতে পারে না। তুমি সঙ্গে না থাকলে আমি কিছুই করতে পারব না।

—বেশ, আমি কিন্তু দিন কতক পরেই ফিরে আসব।

—ফিরবে কেন, তোমারই তো সুবিধে বেশী। পরিবার বহুদিন গত হয়েছেন, নির্ঝঞ্ঝাটে আর একটি ঘরে আনবে।

—কটা ছোলা খেতে চাও হে?

—আমি বেশ করে ভেবে দেখলুম চারটে খাওয়াই ভাল। এখন আমাদের দুজনেরই বয়স প্রায় পয়ষট্টি। চল্লিশ বাদ গিয়ে হবে পঁচিশ, একেবারে তাজা তরুণ।

—কিন্তু বুদ্ধিও তো খাজা তরুণের মতন হবে। এতদিন ব্যাবসা করে যে বুদ্ধিটি পাকিয়েছ তা একটা খেয়ালের বশে কাঁচিয়ে দিতে চাও? আমি বলি কি, দুটো ছোলা খাও, তাতে বয়স পঁয়তাল্লিশ বছর হবে। প্রায় জোয়ানেরই মতন, অথচ বুদ্ধি বেশী কেঁচে যাবে না।

উদ্ধব নাক সিটকে বললেন, রাম বল। পঁয়তাল্লিশে কারবার ফালাও করা যেতে পারে, দেদার খদ্দেরও যোগাড় করা যেতে পারে, কিন্তু মনের মানুষ—ওই যাকে বলেছ মার্গাতিব্যা—পাকড়াও করা যাবে না। আধবুড়োর কাছে কোনও মেয়ে ঘেঁষবে না। আচ্ছা, মাঝামাঝি করা যাক, তিনটে করে ছোলা খাওয়া যাবে, পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হলে মন্দ হবে না। আজকাল তো ধেড়ে আইবুড়ো মেয়ের অভাব নেই।

একটু ভেবে জগবন্ধু বললেন, আচ্ছা উদ্ধব, তুমি তো নব-কলেবর ধারণ করে উধাও হবার জন্য ব্যস্ত হয়েছ। তোমার তিরোধান হলে পরিবারের কি দশা হবে ভেবে দেখেছ? তোমার দুঃখ হবে না?

—নাঃ। সম্পত্তি যখন রেখে যাচ্ছি তখন দুঃখ কিসের। তবে দিন কতক কান্নাকাটি করবে, তা না হলে যে ভাল দেখাবে না। গহনা খুলতে হবে, মাছ পেঁয়াজ পুঁই শাগ মসুর ডাল ছাড়তে হবে, তার জন্যও কিছু দিন একটু কষ্ট হবে। তারপর তোফা আলোচালের ভাত ঘি মটর ডাল পটোল ভাজা ঘন দুধ আম কলা সন্দেশ খেয়ে খেয়ে ইয়া লাশ হবে আর হরদম পান দোক্তা চিবুবে। ঝাঁটা গোঁফের খোঁচা আর তামাকের গন্ধ সইতে হবে না, বেআক্কেলে মিনসের তোয়াক্কা রাখতে হবে না, মনের সুখে বউদের ওপর তম্বি করবে আর গুরু-মহারাজের সঙ্গে কাশী হরিদ্বার হিল্লি দিল্লী মক্কা ঘুরে বেড়াবে। ছেলে দুটো তো লাট হয়ে যাবে। বাপ-পিতামহর বসত বাড়ি বেচে ফেলে ফরক হবে, মেট্রো প্যাটানের ইমারত তুলবে, দামী দামী মোটর কিনবে। কারবারটা মাটি না করে এই যা চিন্তা। মরুক গে, আমি আর ওসব ভাবব না। আর তোমার তো কোনও ভাবনাই নেই। ছেলেটি অতি ভাল, তুমি সরে গেলে নিশ্চয় ঘটা করে শ্রাদ্ধ করবে।

—আমি কিন্তু তোমার একটা হিল্লে লেগে গেলেই ফিরে আসব। অবশ্য তোমার সঙ্গে রোজই দেখা করব।

—আগে কাঁচা বয়সের সোয়াদটা চেখে দেখ, তার পর যা ভাল বোধ হয় ক'রো।

উনিশে বৈশাখ বুধবার অমাবস্যা। সন্ধ্যার সময় দুই বন্ধু দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে উপস্থিত হলেন। দুজনেই একটি করে ক্যাম্বিসের হালকা ব্যাগ নিয়েছেন, তাতে কিছু জামা কাপড় এবং অন্যান্য নিতান্ত দরকারী জিনিস আছে, আর যা দরকার পরে কিনে নেবেন। জগবন্ধু বললেন, উদ্ধব ভাই, আমার কথা শোন, আলেয়ার পিছনে ছুটো না, ঘরে ফিরে চল। বেশ আছ, সুখে থাকতে কেন ভূতের কিল খাবে।

উদ্ধব বললেন, সাহস না করলে কোনও কাজেই সিদ্ধি হয় না, ব্যবসায় নয়, তুমি যাকে প্রেমের মৃগয়া বল তাতেও নয়। আর দেরি করবার দরকার কি, ঘাট থেকে লোকজন সব চলে

গেছে, প্রক্রিয়াটি সেরে ফেলা যাক। বেশী রাত পর্যন্ত এখানে থাকলে মন্দিরের লোকে নানা-রকম প্রশ্ন করবে।

উদ্ধব একটি গামছা পরে ঘাটের চাতালে জামা কাপড় জুতো রাখলেন। জগবন্ধুও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জলে নামবার জন্য প্রস্তুত হলেন। বন্ধুর মুখে আর নিজের মুখে তিনটি করে ছোলা পুরে দিয়ে উদ্ধব বললেন, নাও, বেশ করে চিবিয়ে গিলে ফেল। এইবার মনে মনে সংকল্প কর।...হয়েছে তো?

তারপর জগবন্ধুর হাত ধরে জলে নেমে উদ্ধব বললেন, এস, দুজনে এক সংগে মন্ত্রটি বলে ডুব দেওয়া যাক।—বম মহাদেব ধুস্তুরস্বামী, দস্তুর মত প্রস্তুত আমি।

জল থেকে উঠে গা মুছতে মুছতে জগবন্ধু প্রশ্ন করলেন, কি রকম বোধ হচ্ছে? যে অন্ধকার, তোমার চেহারা দেখা যাচ্ছে না। একটা টর্চ আনলে হত।

উদ্ধব কাপড় পরতে পরতে বললেন, বম ভোলানাথ, কেয়া বাত কেয়া বাত! মাথায় আবার চুল গজিয়েছে হে। শরীরটা খুব হালকা হয়ে গেছে, লাফাতে ইচ্ছে করছে। দাঁতের বেদনাও নেই। ধন্য ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী! যদি ধরা দিতে তবে সোনার খাঁচায় রেখে বাদাম পেস্তা আঙুর বেদানা খাওয়াতুম। তোমার কি রকম হল হে?

—বাঁধানো দাঁত খসে গেছে, দুপাটি নতুন দাঁত বেরিয়েছে, গায়েও জোর পেয়েছি। আলো জেলে আরশিতে না দেখলে ঠিক বুঝতে পারা যাবে না।

—চল, যাওয়া যাক. কলকাতার বাস এখনও পাওয়া যাবে। বউবাজারে তরুণধাম হোটেলে ঘর খালি আছে, আমি খবর নিয়েছি। এখন সেখানেই উঠব। তারপর সুবিধে মতন একটা বাড়ি নেওয়া যাবে।

হোটেলে এসে আরশিতে মুখ দেখে উদ্ধব বললেন, এঃ, বয়স কমেছে বটে, কিন্তু চেহারাটা গুণ্ডা গুণ্ডা দেখাচ্ছে। তোমার তো দিব্বি রূপ হয়েছে জগু, একেবারে কার্তিক। দেখো ভাই, আমার শিকার তুমি যেন কেড়ে নিও না।

জগবন্ধু বললেন, আমি শিকার করতে চাই না।

—বেশ বেশ, তুমি শুকদেব গোঁসাই হয়ে তপস্যা ক'রো। এখন আমার মতলবটা শোন। প্রেমের মৃগয়া তো করবই, কিন্তু তাতে দিন কাটবে না। রসা রোডে একটা নতুন রঙের দোকান খুলব, পাল অ্যান্ড গাঙ্গুলী। তুমি বিনা মূলধনে অংশীদার হবে, লাভের বখরা পাবে। ব্যাঙ্কে দশ লাখ টাকা নতুন অ্যাকাউণ্টে জমা আছে। দেখবে ছ মাসের মধ্যে নতুন কারবারটি ফাঁপিয়ে তুলব। মনে থাকে যেন—তুমি হচ্ছ জলধর গাঙ্গুলী, আমি উমেশ পাল। রাত অনেক হয়েছে, এখন খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে পড়া যাক।

পরদিন সকালে চা খেতে খেতে জগবন্ধু বললেন, এখন কি করতে চাও বল।

উদ্ধব বললেন, সমস্ত রাত ভেবেছি, ঘুমুতে পারি নি। শুনেছি বালিগঞ্জ আর নতুন দিল্লীই হচ্ছে প্রেমের জায়গা। দিল্লি তো বহুদূর, আমি বলি কি, বালিগঞ্জেই আস্তানা করা যাক।

—ওখানে তুমি সুবিধে করতে পারবে না। তোমার বয়স কমেছে বটে, পুরো তরুণ না হলেও হাফ তরুণ হয়েছ, কিন্তু তোমার চাল-চলন সাবেক কালের, ফ্যাশন জান না, লেখা-পড়াও তেমন শেখ নি। কিছু মনো ক'রো না ভাই, তোমার পালিশের অভাব আছে। ওদিককার মেয়েরা ইংরিজী ফ্রেঞ্চ বলে, বিলিতী কবিতা আওড়ায়। আবার শুনেছি পেণ্টুলুন পরে, ভুরু কামায়, রং মাখে, বল নাচে, সিগারেট খায়, মোটর হাঁকায়। আই সি এস, আই এ এস,

বিলাত-ফেরত ডাক্তার এঞ্জিনিয়ার বা বড় চাকরে ছাড়া আর কারও দিকে ফিরেও তাকায় না।

—তাদের চাইতে আমার টাকা ঢের বেশী, রোজগারও বেশী করতে পারব। ভাল বাড়ি, আসবাব, মোটর, কিছুরই অভাব হবে না।

—তা মানলুম। কিন্তু তুমি টেবিলে বসে ছুরি-কাঁটা-চামচ চালাতে পারবে? হাপুস-হুপুস শব্দ না করে তো খেতেই পার না। শুনেছি কড়াইশুঁটির দানা আর বড়ি ভাজা ছুরি দিয়ে তুলে মুখে তোলাই আধুনিক দস্তুর। তা তুমি পারবে?

—চিমটে দিয়ে তুলে খেলে চলবে না?

—না। তা ছাড়া তুমি টেবিল ক্লথে ঝোল ফেলে নোংরা করবে, তা দেখলেই তোমার মার্গিতব্যা মারমুখো হবেন।

—বেশ, তুমিই বল কোথায় সুবিধে হবে।

—খবরের কাগজে গাদা গাদা পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন বার হয়। তা থেকেই বেছে নিতে হবে। এই তো আজকের কাগজ রয়েছে, পড় না।

উদ্ধব পড়তে লাগলেন। বুলবুলি, লক্ষ্মী বোন আমার, ফিরে এস, বাবা মা শোকে শয্যাশায়ী। খঞ্জনকুমারের নাচের পার্টিতেই তুমি যোগ দিও। আরে গেল যা! বাবা নেংটু, বাড়ি ফিরে এস, ম্যাট্রিক দিতে হবে না, সিনেমাতেই তোমাকে ভর্তি করা হবে। আরে খেলে যা!

জগবন্ধু বললেন, ওসব কি পড়ছ, পাত্র-পাত্রীর কলম পড়।

—এম্ এ পাশ, স্বাস্থ্যবতী বাইশ বৎসরের গৃহ পাত্রীর জন্য উচ্চপদস্থ পাত্র চাই। বরপণ যোগ্যতা অনুসারে। সুন্দরী নৃত্যগীতনিপুণা বিশ বৎসরের আই এ, নৈকষ্য কুলীন মুখোপাধ্যায় পাত্রীর জন্য আই সি এস পাত্র চাই।...দেখ জগু, এসব চলবে না, সেই মামুলী বর-কনের সম্বন্ধ করে বিয়ে, শুধু বয়সটাই বেড়ে গেছে আর সংগে নৃত্য-গীত, এম এ, বি এ যোগ হয়েছে। অন্য উপায় দেখ।

আচ্ছা, এই রকম একটা বিজ্ঞাপন কাগজে ছাপালে কেমন হয়। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক উদারপ্রকৃতি সদ্‌বংশীয় বাঙালী বহু-লক্ষপতি ব্যবসায়ী, কোনও আত্মীয় নাই, বিবাহের উদ্দেশ্যে সুন্দরী মহিলার সহিত আলাপ করিতে চান। অসবর্ণে আপত্তি নাই। উভয় পক্ষের মনের মিল হইলে শীঘ্রই বিবাহ। বক্স নম্বর অমুক।

—খাসা হয়েছে, ছাপাবার জন্য আজই পাঠিয়ে দাও।

বিজ্ঞাপন বার হবার তিন-চার দিন পর থেকেই রাশি রাশি উত্তর আসতে লাগল। একটি চিঠি এই রকম।—৫নং ঘুঘুবাগান রোড, কলিকাতা। টেলিফোন নর্থ ২৩৪। মহাশয়, আপনার বিজ্ঞাপন দৃষ্টে জানাইতেছি যে কাতলামারি এস্টেটের একমাত্র স্বত্বাধিকারিণী রাজকুমারী শ্রীযুক্তেশ্বরী স্পন্দচ্ছন্দা চৌধুরানী আপনার সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছুক। ইনি পরমাসুন্দরী এবং অশেষ গুণবতী। ইণ্টারভিউএর সময় সন্ধ্যা সাতটা হইতে আটটা। ইতি। শ্রীরামশশী সরকার, সদর নায়েব।

উদ্ধব বললেন, ভালই মনে হচ্ছে, তবে পাত্রীর নামটা বিদকুটে। আর এস্টেটটি নিশ্চয় ফোঁপরা তাই রাজকুমারী ধনী বর খুঁজছেন। তা হক। হোটেলে তো টেলিফোন আছে, এখনই জানিয়ে দেওয়া যাক আজ সন্ধ্যায় আমরা দেখা করতে যাব।

জগবন্ধু বললেন, তোমার দেখছি তর সয় না। একটা চিঠি লিখে দাও না যে পরশু যাবে। তাড়াতাড়ি করলে ভাববে তোমার গরজ খুব বেশী।

—তুমি বোঝ না, কোনও কাজে গড়িমসি ভাল নয়।

উদ্ধব টেলিফোন ধরে ডাকলেন, নর্থ টু থ্রি ফোর।...ইয়েস। একটু পরে মেয়েলী গলায় সাড়া এল, কাকে চান?

—শ্রীযুক্তেশ্বরী আছেন কি? আমি হচ্ছি উমেশ পাল, আলাপের জন্য আমিই বিজ্ঞাপন দিয়েছিলুম।

—ও, আপনি একজন ক্যান্ডিডেট?

উদ্ধব একটু গরম হয়ে বললেন, ক্যান্ডিডেট আপনাদের রাজকুমারী, তাঁর তরফ থেকেই তো বিজ্ঞাপনের উত্তরে দরখাস্ত পেয়েছি।

—দরখাস্ত বলছেন কেন। আমিই রাজকুমারী, আপনি দেখা করতে চান তো সন্ধ্যায় আসতে পারেন।

উদ্ধব নীচু গলায় জগবন্ধুকে বললেন, জানিয়ে দিই যে আমরা দুজনে যাব, কি বল? জগবন্ধু বললেন, আরে না না, এসব ব্যাপারে সংগী নেওয়া চলে না।

উত্তর আসতে দেরি হচ্ছে দেখে রাজকুমারী বললেন, হেলো।

উদ্ধব জবাব দিলেন, কিলো।

—ও আবার কি রকম! ভদ্রমহিলার সংগে কথা কইতে জানেন না?

—খুব জানি। আলাপ তো হবেই, এখনই শুরু করলে দোষ কি। আজই সন্ধ্যায় আপনার কাছে যাব।

—আপনাকে বকাটে ছোকরা বলে মনে হচ্ছে।

—ঠিক ধরেছেন। বয়স যদিচ পঁয়ত্রিশ, কিন্তু স্বভাব কুড়ি-পঁচিশের মতন। দেখুন, আপনার গলার সুরটি খাসা। চেহারাটিও ওই রকম হবে তো?

—দেখতেই পাবেন। মশাই নিজে কেমন?

—চমৎকার। দেখলেই মোহিত হয়ে যাবেন?

টেলিফোনের আলাপ শেষ হলে জগবন্ধু বললেন, হাঁ হে উদ্ধব, ভুলে তিনটের জায়গায় চার-পাঁচটা ছোলা খেয়ে ফেল নি তো? ফাজিল ছোকরার মত কথা বলছিলে।

—তিনটেই খেয়েছিলুম। কি জান, ছেলেবেলায় বাবার শাসনে কোনও রকম আড্ডা দেওয়া বা বকামি করবার সুবিধে ছিল না। এখন আবার কাঁচা বয়সে এসে ফুর্তি চাগিয়ে উঠেছে। তুমি কিছু ভেবো না, আমার বুদ্ধি ঠিক আছে, বেচাল হবে না।

জগবন্ধু কিছুতেই সংগে যেতে রাজী হলেন না। অগত্যা উদ্ধব একলাই রাজকুমারী স্পন্দছন্দা চৌধুরানীর কাছে গেলেন। বাড়িটা জীর্ণ অনেক কাল মেরামত হয় নি, সামনের বাগানেও জংগল হয়েছে। বৃদ্ধ নায়েব রামশশী সরকার উদ্ধবকে একটি বড় ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। একটু পরে পাশের পর্দা ঠেলে স্পন্দচ্ছন্দা এলেন।

উদ্ধব স্থির করে এসেছেন যে হ্যাংলামি দেখাবেন না, রসিকতা করবেন বটে, কিন্তু মুরুব্বীর চালে। হলেনই বা রাজকুমারী, উদ্ধব নিজেও তো কম কেও-কেটা নন।

ঘরের ল্যাম্প শেড দিয়ে ঢাকা সেজন্য আলো কম। উদ্ধব দেখলেন, স্পন্দচ্ছন্দা লম্বা, দোহারা, কিন্তু মাংসের চেয়ে হাড় বেশী। মেমের চাইতেও ফরসা, গোলাপী গাল, লাল ঠোঁট লাল নখ, চাঁচা ভুরু, কাঁধ পর্যন্ত ঝোলা কোঁকড়ানো চুল, নীল শাড়ি। জগবন্ধুর শিক্ষা অনুসারে উদ্ধব দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, নমস্কার।

—নমস্কার। আপনি বসুন।

—ইয়ে, দেখুন শ্রীযুক্তেশ্বরী রাজকুমারী পণ্ডচণ্ডা দেবী—

—স্পন্দচ্ছন্দা।

—হাঁ হাঁ স্পন্দচ্ছন্দা। দেখুন, একটি কথা গোড়াতেই নিবেদন করি। আপনার নামটা উচ্চারণ করা বড় শক্ত, আমি হেন জোয়ান মরদ হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি। যদি আপনাকে পদী-রানী বলি তো কেমন হয়?

—স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন। আমিও আপনাকে উম্‌শে বলব।

সেটা কি ভাল দেখাবে? প্রজাপতির নির্বন্ধে আমি তো আপনার স্বামী হতে পারি। হবু স্বামীকে নাম ধরে ডাকা আমাদের হিঁদু ঘরের দস্তুর নয়।

স্পন্দচ্ছন্দা হি হি করে হেসে বললেন, আপনি দেখছি অজ পাড়াগেঁয়ে।

—আমি আসল শহুরে, চার পুরুষ কলকাতায় বাস। আপনিই তো পাড়াগাঁ থেকে এসেছেন। বেশ নাম ধরেই ডাকবেন, তাতে আমার ক্ষতিটা কি। এখন কাজের কথা শুরু হক। আমার চেহারাটা কেমন দেখছেন?

—মন্দ কি। একটু বেঁটে আর কালো, তা সেটুকু ক্রমে সরে যাবে। আমাকে কেমন দেখছ্ছে.

—খাসা, যেন পটের বিবিটি। অত ফরসা কি করে হলেন?

—আমার গায়ের রংই এই রকম।

উদ্ধব সশব্দে হেসে বললেন, ওগো চণ্ডপণ্ডা পদীরানী, রঙের ব্যাপারে আমাকে ঠকাতে পারবে না, ওই হল আমার ব্যবসা। তুমি এক কোট অন্তরের ওপর তিন পোঁচ পেণ্ট চড়িয়েছ—হবক্‌স জিঙ্ক, একটু পিউড়ি, আর একটু মেটে সিঁদুর। তা লাগিয়েছ বেশ করেছ, কিন্তু জমির আদত রংটি কেমন?

—আপনি অতি অসভ্য।

—আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার গায়ের রং তোমারই থাক, আমার তা জানবার দরকার কি। তবে একটা কথা বলি—মূর্তিটা কুমোরটুলি ঢঙের করতে পার নি। যদি আরও বেশী পিউড়ি কি এলামাটি দিতে আর চোখের কাজলটা কান পর্যন্ত টেনে দিতে তবেই খোলতাই হত।

আপনি নিজে কি মাখেন? আলকাতরা?

উদ্ধব সহাস্যে বললেন, সরষের তেল ছাড়া আর কিছুই মাখি না। আমার হচ্ছে খোদ রং, নারকেল ছোবড়া দিয়ে ঘষলেও উঠবে না, একেবারে পাকা। আমার কাছে তঞ্চকতা পাবে না। বয়সও ভাঁড়াতে চাই না, ঠিক পঁয়ত্রিশ। তোমার কত?

—বাইশ।

—উঁহু, বেয়াল্লিশ।

—স্পন্দচ্ছন্দা চেঁচিয়ে বললেন, বাইশ।

আরও চেঁচিয়ে টেবিলে কিল মেরে উদ্ধব বললেন, বেয়াল্লিশ!

—আপনি আমার অপমান করছেন?

আরে না, না, একটু দরদস্তুর করছি। আচ্ছা, তোমার কথা থাকুক, আমার কথাও থাকুক একটা মাঝামাঝি রফা করা যাক। তোমার বয়স বত্রিশ।

স্পন্দচ্ছন্দা মুখ ভার করে বললেন, বেশ, তাই না হয় হল।

—লেখাপড়া কদ্দুর? মাছ-তরকারি ধোপার হিসেব এসব লিখতে পারবে?

নাকটি ওপর দিকে তুলে স্পন্দচ্ছন্দা বললেন, মেমের কাছে এম. এ. ক্লাসের চাইতে বেশী পড়েছি। মশায়ের বিদ্যে কতদূর?

—ফোর্থ কেলাস পর্যন্ত। তবে রবিঠাকুর জানি—ওরে দুরাচার হিন্দু কুলাঙ্গার এই কি তোদের—

কানে আঙুল দিয়ে স্পন্দচ্ছন্দা বললেন, থাক থাক, খুব হয়েছে। আয় কত?

—তোমার কোনও চিন্তা নেই। ব্যাঙ্কে খোঁজ নিলেই জানতে পারবে যে আমার দেদার টাকা আছে। বাড়ি, গাড়ি, আসবাব, গহনা, সবই তোমার মনের মতন হবে। তোমার এস্টেটের আয় কত?

—পাকিস্থানে পড়েছে, অনেক কাল আদায় হয় নি। তবে ভাবনার কিছু নেই। খাঁ সায়েব বদরুদ্দিন আমার বাবার বন্ধু, তিনি বলেছেন সব আদায় করে দেবেন।

—তবেই হয়েছে। বেচে ফেল, বেচে ফেল।

—বেশ তো। আপনিই তার ব্যবস্থা করবেন।

—আচ্ছা। বৈষয়িক আলাপ তো এক রকম হল, এখন একটু প্রেমালাপ করা যাক। দেখ পদীরানী, আমার সঙ্গে দু দিন ঘর করলেই টের পাবে আমি কি রকম দিলদরিয়া চমৎকার লোক। পষ্ট করে বল দিকি—আমাকে মনে ধরেছে।

—তা ধরেছে।

একজন প্যাণ্ট-শার্ট পরা আধাবয়সী ভদ্রলোক পাইপ টানতে টানতে ঘরে ঢুকলেন। স্পন্দচ্ছন্দা দু পক্ষের পরিচয় করিয়ে দিলেন—ইনি হচ্ছেন মিস্টার মকর রায়, বার-অ্যাট-ল, সম্পর্কে আমার দাদা হন। আর ইনি উমেশ পাল, খুব ধনী পেণ্ট-মার্চেণ্ট, আমার ভাবী বর।

মকর রায় বললেন, আরে তাই নাকি! এরই না আজ আসবার কথা ছিল? বাহাদুর লোক, এসেই হৃদয় জয় করেছেন, একেবারে ব্লিৎস ক্রিগ। কংগ্রাচুলেশন মিস্টার পাল, লাকি ডগ, ভাগ্যবান কুত্তা! এই বলে উদ্ধবের হাত সজোরে নেড়ে দিলেন। তারপর বললেন, স্পন্দার মতন মেয়ে লাখে একটি মেলে না মশাই, নাচ গান অ্যাকটিং সব তাতে চৌকস। সিনেমার লোকে সাধাসাধি করছে। এর কাঁচপোকা-নৃত্য যদি দেখেন তো অবাক হয়ে যাবেন।

—কাঁচপোকা নাচে নাকি?

—যখন তখন নাচে না, আরসোলা ধরার সময় নাচে।

স্পন্দচ্ছন্দা বললেন, জান মকর-দা, মিস্টার পাল হচ্ছেন একজন আদিম হি-ম্যান।

উদ্ধব প্রশ্ন করলেন, সে আবার কাকে বলে? হি-গোটই তো জানি।

মকর রায় বললেন, হি-ম্যান জানেন না? মদ্দা পুরুষ। আমাদের ঋষিরা যাকে বলতেন নরপুংগব বা পুরুষর্ষভ, অর্থাৎ যিনি ষাঁড়ের মতন শিং বাগিয়ে সোজা ছুটে গিয়ে লক্ষ্যস্থানে পৌঁছে যান। দেখুন মিস্টার পাল, যদি রঙের কারবার বাড়াতে চান তো আমাকে বলবেন। হুডাগড় স্টেটের সমস্ত খনি আমার হাতে, অজস্র গেরি মাটি আর এলা মাটি আছে। দু লাখ যদি ঢালেন তবে এক বছরেই তিন লাখ ফিরে পাবেন। আচ্ছা, সে কথা পরে হবে, আপনারা এখন আলাপ করুন, আমি ওপরে গিয়ে বসছি।

উদ্ধব বললেন, আরে না না, এইখানেই বসুন। আমার ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই মশাই, বিশেষত আপনি যখন সম্পর্কে শালা। দেখুন মকরবাবু, আপনার এই বোনটি হচ্ছেন আমার মার্গিতব্যা।

—সে আবার কি চিজ?

—জানেন না? চিরকাল খোঁজবার আর চাইবার জিনিস। একজন হেডমাস্টার কথাটির মানে বলে দিয়েছেন। আচ্ছা, আজকের মতন উঠি, তামাক খেতে হবে, আপনাদের এখানে তো সে পাট নেই। না না, সিগারেট ফিগারেট চলবে না, গুড়ুক চাই। কাল বিকেলে আবার আসব, গড়গড়া আর তামাকের সরঞ্জামও সব নিয়ে আসব। হাঁ, ভাল কথা—আমার আর একটু জানবার আছে। হ্যাঁগা পদীরানী, শুক্ত, মোচার ঘণ্ট, ছোলার ডালের ধোঁকা—এসব রাঁধতে জান?

স্পন্দচ্ছন্দা ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, ওসব আমি খাই না।

—আমি খেতে ভালবাসি। আচ্ছা, মাগুর মাছের কালিয়া, ইলিশের পাতুরি, ভাপা দই-এসব করতে জান?

—ও তো বাবুর্চীর কাজ।

—তবে কি ছাই জান! এসব রান্না বাবুর্চীর কাজ নয়, গিন্নীরই করা উচিত। তোমার নাচ দেখে তো আমার পেট ভরবে না।

—ও, আপনি রাঁধুনি গিন্নী চান! একটা কেষ্টদাসী কি কালিদাসী ঘরে আনলেই পারতেন।

হঠাৎ রেগে গিয়ে উদ্ধব বললেন, কি বললে! কালিদাসীর সামনে তুমি দাঁড়াতে পার নাকি?

—অত রাগ কেন মশাই, তিনি বুঝি আপনার আগেকার গিন্নী?

উদ্ধব গর্জন করে বললেন, আগেকার কি, দস্তুর মত জলজ্যান্ত এখনকার! তার কাছে তুমি? তরমুজের কাছে তেলাকুচো, কামধেনুর কাছে মেনী বেরাল!

স্পন্দচ্ছন্দা চিৎকার করে বললেন, অ্যাঁ, এক স্ত্রী থাকতে আবার বিয়ে করতে এসেছ? ঠক, জোচ্চোর, বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও!

মকর রায় বললেন, যাবে কোথায়! রীতিমত ক্রিমিনাল কাণ্ড, ধাপ্পা দিয়ে রাজকন্যা আর রাজ্য আদায় করতে এসেছে। থাম, মজা টের পাইয়ে দেব।

উদ্ধব দাঁত খিঁচিয়ে কিল দেখিয়ে গট গট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সমস্ত শুনে জগবন্ধু বললেন, ব্যাপারটা ভাল হল না। ওরা অমনি ছাড়বে না, তোমাকে জব্দ করবার চেষ্টা করবে।

উদ্ধব বললেন, গিন্নীর নামটা শুনে হঠাৎ কেমন মন খারাপ হয়ে গেল, সমালাতে পারলুম না। তা যাক গে, কি আর করবে।

দু দিন পরে সলিসিটার গুঁই অ্যান্ড হুঁই-এর চিঠি এল।—রাজকুমারী শ্রীযুক্তেশ্বরী স্পন্দচ্ছন্দা চৌধুরানীকে যে মানসিক আঘাত দেওয়া হয়েছে এবং তজ্জনিত তাঁর যে স্বাস্থ্য-হানি ঘটেছে তার খেসারত স্বরূপ এক লক্ষ টাকা তিন দিনের মধ্যে পাঠানো চাই, অন্যথায় উমেশ পালের বিরুদ্ধে মকদ্দমা রুজু করা হবে।

জগবন্ধু বললেন, মুশকিলে ফেললে দেখছি। মকদ্দমার ফল যাই হক, হয়রানি আর কেলেংকারি হবে। ভাবিয়ে তুললে হে!

উদ্ধব বললেন, ভাবনা কিসের। মোক্ষম উপায় আমাদের হাতে রয়েছে। ব্যাঙমার কথা মনে নেই?

জগবন্ধু সোৎসাহে বললেন, রাজী আছ তুমি?

—খুব রাজী। শখ মিটে গেছে, হোটেলের জঘন্য রান্না আর খেতে পারি না। দেখ তো পূর্ণিমা কবে।

পাঁজি দেখে জগবন্ধু বললেন, আজই তো!

সন্ধ্যার সময় দুজনে দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে এলেন এবং তিনটি বেলপাতা চিবিয়ে মন্ত্রপাঠ করলেন—বম মহাদেব, সকল বস্তু আগের মতন আবার অস্তু। বলেই একটি ডুব দিলেন।

ঘাটে উঠে মাথা মুছতে মুছতে উদ্ধব বললেন, ওহে জগু, আবার দিব্যি একমাথা টাক হয়েছে, শরীরটাও আড়াইমনী হয়ে গেছে। তোমার কেমন হল?

জগবন্ধু বললেন, আমারও মুখে দুপাটি নকল দাঁত এসে গেছে। সব তো হল, এখন বাড়ি গিয়ে বলবে কি? দু-হপ্তা আমরা গায়েব হয়ে আছি, তার একটা ভাল রকম কৈফিয়ত দেওয়া চাই।

—সে তুমি ভেবো না। তুমি তা পারবেও না, চিরকাল মাস্টারি করে ছেলেদের শিখিয়েছ —সদা সত্য কথা কহিবে। যা বলবার আমিই বলব। আজ রাতে আর বাড়ি গিয়ে কাজ নেই, হোটেলে ফিরে চল।

হোটেলে এসে দেখলেন, তাঁদের ঘরে চার জন বিছানা পেতে শুয়ে আছে। উদ্ধব ম্যানেজারকে বললেন, আচ্ছা লোক তো আপনি, কিছু না জানিয়ে আমার রিজার্ভ করা ঘরে অন্য লোক ঢুকিয়েছেন! এর মানে কি?

ম্যানেজার আশ্চর্য হয়ে বললেন, কে আপনারা?

—ন্যাকা, চিনতে পারছেন না! উমেশ পাল আর জলধর গাঙ্গুলী। উনিশে বোশেখ, মানে দোসরা মে বুধবার থেকে দু-হপ্তা এই ঘর আমাদের দখলে আছে।

—দু-হপ্তা বলছেন কি মশাই, নেশা করেছেন নাকি? আজই তো বুধবার দোসরা মে উনিশে বোশেখ।

উদ্ধবকে টেনে নিয়ে রাস্তায় এসে জগবন্ধু বললেন, সবই ধুস্তুরী মায়া। গত দু-হপ্তা জগতের ইতিহাস থেকে একেবারে লোপ পেয়ে গেছে। এখন বাড়ি চল।

রাত প্রায় বারোটার সময় জগবন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে উদ্ধব নিজের বাড়িতে পৌঁছলেন। উদ্ধব-গৃহিণী কালিদাসী তারস্বরে বললেন, বলি দুপুর রাত পর্যন্ত দুই ইয়ারে ছিলে কোন্ চুলোয়? ওঁর লক্ষ্মী না হয় ছেড়ে গেছে, তোমার তো ঘরে একটা আপদ-বালাই আছে। দেরি দেখে মানুষটা ভেবে মরছে সে হুঁশ হয় নি বুঝি?

উদ্ধব হাঁপাতে হাঁপাতে কান্নার সুরে বললেন,ওঃ গিন্নী, তোমার শাখা-সিঁদুরের জোরে আর এই জগু ভাই-এর হিম্মতে আজ প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছি। সন্ধ্যার সময় দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের ঘাটে গঙ্গার ধারে বসেছিলুম। ভাবলুম মুখ হাত পা ধুয়ে নিই, তার পর মায়ের আরতি দেখব। যেমন জলে নাবা অমনি এক মস্ত কুমির পা কামড়ে ধরে টেনে নিয়ে চলল—

উদ্ধবের দু পায়ে হাত বুলিয়ে কালিদাসী বললেন, কই দাঁত বসায় নি তো!

—ফোকলা কুমির গিন্নী, একদম ফোকলা। ভাগ্যিস কুমিরটা বুড়ো ছিল তাই পা বেঁচে গেছে। আমার বিপদ দেখে জগু লাঠি নিয়ে লাফিয়ে জলে পড়ল। এক হাতে সাঁতার দেয়, আর এক হাতে ধপাধপ লাঠি চালায়। শেষে চাঁদপাল ঘাটে এসে কুমিরটা মারের চোটে কাবু হয়ে আমাকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গেল। তার পর এক ময়রার দোকানে উনুন-পাড়ে বসে জামাকাপড় শুকিয়ে ঘরে ফিরেছি।

কালিদাসী বললেন, মা দক্ষিণেশ্বরী রক্ষা করেছেন, কালই পুজো পাঠাব। রান্না সব জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে, গরম করে দিচ্ছি, লুচিও এখনি ভেজে দিচ্ছি। ততক্ষণ তোমরা মুখ হাত পা ধুয়ে একটু জিরিয়ে নাও। গাঙ্গুলী মশায়ের বাড়ি খবর পাঠাচ্ছি, উনি এখানেই খেয়ে দেয়ে যাবেন এখন।

উদ্ধব বললেন, নিশ্চয় নিশ্চয়, এখানেই খাবে হে জগু, এখানেই খাবে। গিন্নীর রান্না তো নয়, অমৃত।

১৩৫৭ (১৯৫০)

রামধনে বৈরাগ্য

সাহিত্যগগনে উড়ন-তুবড়ির মতন রামধন দাসের উত্থান যেমন আশ্চর্য তাঁর হঠাৎ অন্তর্ধানও সেই রকম। কিন্তু এখন তাঁর নাম কেউ করে না, কারণ বাঙালী পাঠক অতি নিমকহারাম। তারা জয়ঢাক পিটিয়ে যাকে মাথায় তুলে নাচে, চোখের আড়াল হলেই কিছু দিনের মধ্যে তাকে ভুলে যায়। রামধনেরও সেই দশা হয়েছে। এককালে তিনি অদ্বিতীয় কথাসাহিত্যিক বলে গণ্য হতেন, তাঁর খ্যাতির সীমা ছিল না, রোজগারও প্রচুর করতেন। তার পর হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হলেন। তাঁর ভক্তপাঠকরা এবং সপক্ষ বিপক্ষ লেখকরা অনুসন্ধানের ত্রুটি করেন নি, কিন্তু ঠিক খবর কিছুই পাওয়া গেল না। কেউ বলে নোবেল প্রাইজের তদবির করবার জন্য তিনি বিলাতে আছেন, কেউ বলে সাহিত্যিক গুণ্ডারা তাঁকে গুম-খুন করেছে, কেউ বলে সোভিয়েট সরকার তাঁকে মোটা মাইনে দিয়ে রাশিয়ায় নিয়ে গেছে, তিনি কমিউনিস্ট শাস্ত্রের বাংলা অনুবাদ করছেন।

আসল কথা, রামধন দাস তাঁর নাম আর বেশ বদলে ফেলে বিষ্ণুপ্রয়াগে আছেন এবং গুরুর উপদেশে সস্ত্রীক যোগ সাধনা করছেন। কেন তিনি সাহিত্যচর্চা আর বিপুল প্রতিপত্তি ত্যাগ করে আশ্রমবাসী তপস্বী হলেন তার রহস্য তাঁর মুখ থেকে কেবল একজন শুনেছেন—তাঁর গুরুদেবের প্রধান শিষ্য ও আশ্রম-সেক্রেটারি নিবিড়ানন্দ। এই নিবিড় মহারাজের পেটে কথা থাকে না। এঁর মুখ থেকে লোকপরম্পরায় যে খবর এখানে এসে পৌঁছেছে তাই বিবৃত করছি। কিন্তু শুধু এই খবরটি শুনলে চলবে না, রামধন দাসের ইতিহাস গোড়া থেকে জানা দরকার।

বি.এ. পাস করার পর রামধন একজন বড় প্রকাশকের অফিসে চাকরি নিয়েছিলেন। মনিবের ফরমাশে তিনি কতকগুলি শিশুপাঠ্য পুস্তক লেখেন, যেমন ছেলেদের গীতা ছোটদের বেদান্ত, কচিদের ভারতচন্দ্র, খোকাবাবুর গুপ্তকথা খুকুমণির আত্মচরিত ইত্যাদি। বইগুলি সস্তা সচিত্র আর প্রাইজ দেবার উপযুক্ত, সেজন্য কাটতি ভালই হল। একদিন রামধন এক বিখ্যাত প্রবীণ সাহিত্যিকের কাছে শুনলেন, গল্প রচনা খুব সোজা কাজ। সাহিত্যে কালো-বাজার নেই, কিন্তু চোরাবাজার অবারিত। বাঙালী লেখক ইংরিজী থেকে চুরি করে, হিন্দী লেখক বাংলা থেকে চুরি করে, এই হল দস্তুর। কথাটি রামধনের মনে লাগল। তিনি দেদার বিলিতী আর মার্কিন ডিটেকটিভ গল্প আত্মসাৎ করে বই লিখতে লাগলেন। খদ্দেরের অভাব হল না, তাঁর মনিবও তাঁকে লাভের মোটা অংশ দিলেন। কিন্তু রামধন দেখলেন, তাঁর রোজগার ক্রমশ বাড়লেও উচ্চ সমাজে তাঁর খ্যাতি হচ্ছে না। মোটর ড্রাইভার, কারিগর, টিকিটবাবু, বকাটে ছোকরা, আর অল্পশিক্ষিত চাকরিজীবীই তাঁর বইএর পাঠক। পত্রিকা-ওয়ালারা বিজ্ঞাপন ছাপেন কিন্তু সমালোচনা প্রকাশ করতে রাজী হন না। বলেন, এ হল নীচু দরের সাহিত্য, এর সমালোচনা ছাপলে পত্রিকার জাত যাবে। রামধন মনে মনে বললেন, বটে! আমার রোমাঞ্চ-লহরীকে হরিজন-সাহিত্য ঠাউরেছ? প্রেমের প্যাঁচ চাও, মনস্তত্ত্ব চাও, যৌন আবেদন চাও? আচ্ছা, আমার শক্তি শীঘ্রই দেখতে পাবে।

রামধন হুঁশিয়ার কর্মবীর, আগাগোড়া না ভেবে কোনও কাজে হাত দেন না। তিনি প্রথমেই মনে মনে পর্যালোচনা করলেন—বাংলা কথাসাহিত্যের আরম্ভ থেকে আজ পর্যন্ত কি রকম পরিবর্তন হয়েছে। সেকালের লেখকদের হাত পা বাঁধা ছিল, প্রণয়ব্যাপার দেখাতে হলে প্রাচীন হিন্দুযুগে অথবা মোগল-রাজপুতের আমলে যেতে হত, নইলে নায়িকা জুটত না। তার পরের লেখকরা নোলক-পরা বালিকা নিয়ে পরীক্ষা শুরু করলেন, কিন্তু জুত করতে পারলেন না। দুর্গেশনন্দিনীর তিলোত্তমা নেহাত বাচ্চা, তবু বঙ্কিমচন্দ্র তাকে সসম্মানে 'তিনি' বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ নাবালিকা সাবালিকা কোন নায়িকাকেই খাতির করেন নি, কিন্তু তাঁর কমলা সুচরিতা ললিতা এখনকার দৃষ্টিতে খুকী মাত্র। পরে অবশ্য তিনি বয়স বাড়িয়েছেন, যেমন শেষের কবিতার লাবণ্য, চার অধ্যায়ের এলা। বাংলা গল্পের মধ্যযুগে জোরালো প্রেম দেখাতে হলে মামুলী নায়িকায় কাজ চলত না, শালী বউদিদি বা বিধবা উপনায়িকাকে আসরে নামাতে হত। সেকেলে গল্পের নায়কদেরও বৈচিত্র্য ছিল না, হয় প্রতাপের মতন যোদ্ধা, না হয় গোবিন্দলালের মতন ধনি-সন্তান। দামোদর মুখুজ্যে ও তৎকালীন লেখকদের নায়করা প্রায় জমিদারপুত্র, তারা ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যেত, গরিব প্রজাদের হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিত, এবং যথাকালে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে খুশী করে রায় বাহাদুর খেতাব পেত। তার পর ক্রমে ক্রমে বাঙালী সমাজের পটপরিবর্তন হল, সংগে সংগে গল্পেরও প্লট পরিবর্তন হল. বোমা স্বদেশী আর অসহযোগের সুযোগে মেয়ে-পুরুষের কাজের গণ্ডি বেড়ে গেল, মেলা-মেশা সহজ হল। অবশেষে এল কিষান-মজদুরের আহ্বান, কমরেডী কর্মক্ষেত্র. জাপানী আতঙ্ক, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, নরহত্যা, দেশ-জবাই, স্বাধীনতা, বাস্তুত্যাগ, নারীহরণ. মহাকলিযুগ, লোক-লজ্জার লোপ, অবাধ দুষ্কর্ম। মানুষের দুর্দশা যতই বাড়ুক, গল্প লেখা যে খুব সুসাধ্য হয়ে গেল তাতে সন্দেহ নেই। এখনকার নায়ক কবি দোকানদার সৈনিক নাবিক বৈমানিক চোর ডাকাত দেশ-সেবক সবই হতে পারে। নায়িকাও নার্স টাইপিস্ট টেলিফোনবালা সিনেমাদেবী মজদুরনেত্রী সম্পাদিকা অধ্যাপিকা যা খুশি হতে পারে। সংস্কৃত কবিরা যাকে 'সংকেত' বলতেন, অর্থাৎ ট্রিস্ট, তারও বাধা নেই, রেস্তোরাঁ আছে, পার্ক আছে, লেক আছে, সিনেমা আছে। ভারতীয় কথাসাহিত্যের স্বর্ণযুগ উপস্থিত হয়েছে, সমাজ আর পরিবেশ বদলে গেছে, অতএব রামধন একটু চেষ্টা করলেই শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্ত্য গল্পকারদের সমকক্ষ হতে পারবেন।

আধুনিক বাঙালী লেখকরা বুঝেছেন যে সেক্স অ্যাপীলই হচ্ছে উৎকৃষ্ট গল্পের প্রাণ। এই জিনিসটি আসলে আমাদের সনাতন আদিরস। কিন্তু তার ফরমুলা বড় বাঁধাধরা, বৈচিত্র্য নেই, ঝাঁজও মরে গেছে, সেজন্য আধুনিক রুচির উপযুক্ত অদলবদল করে তার নাম দেওয়া হয়েছে যৌন আবেদন। এপর্যন্ত কোনও বাঙালী সাহিত্যিক এই আবেদন পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারেন নি। ফরাসী লেখক ফ্লোবেয়ার প্রায় একশ বছর আগে 'মাদাম বোভারি' লিখে ছিলেন, কিন্তু এদেশের কোনও গল্পকার তার অনুকরণ করেন নি। লরেন্সের 'লেডি চ্যাটার্লি'. হাক্সলির 'পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্ট' প্রভৃতির নকল করতে কারও সাহস হয়নি। রবীন্দ্রনাথের কোনও নায়িকা 'প্রেমের বীর্যে যশস্বিনী' হতে পারে নি। চারু কমলা বিমলা আর বিনোদ বোঠানকে তিনি রসাতলের মুখে এনেও রাস টেনে সামলে রেখেছেন। আর শরৎ চাটুজ্যেই বা কি করেছেন? গুটিকতক ভ্রষ্টাকে সুশীলা বানিয়েছেন। দুর্দান্ত লম্পট জীবানন্দকে পোষ মানিয়েছেন, অথচ কোনও লম্পটাকে গৃহলক্ষ্মী করতে পারেন নি। চারু বাঁড়ুজ্যে তাঁর 'পঙ্কতিলক'-এ এই চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তা একেবারে পণ্ড হয়েছে। আসল কথা, এদেশের কথাসাহিত্য এখনও সতীত্বের মোহ কাটাতে পারে নি।

পাশ্চাত্ত্য লেখকরা যা পেরেছেন রামধনও তা পারবেন, এ ভরসা তাঁর আছে। সমাজের

মুখ চেয়ে লিখবেন না, তিনি যা লিখবেন সমাজ তাই শিখবে। রামধন তাঁর পদ্ধতি স্থির করে ফেললেন এবং বাছা বাছা পাশ্চাত্ত্য উপন্যাস মন্থন করে তা থেকে সার উদ্ধার করলেন। এই বিদেশী নবনীতের সঙ্গে দেশী শাক-ভাত আর লঙ্কা মিশিয়ে তিনি যে ভোজ্য রচনা করলেন তা বাংলা সাহিত্যে অপূর্ব। প্রকাশক ভয়ে ভয়ে তা ছাপালেন। বইটি বেরুবামাত্র সাহিত্যের বাজারে হুলুস্থুল পড়ে গেল।

প্রবীণ লেখক আর সমালোচকরা বজ্রাহত হয়ে বললেন, এ কি গল্প না খিস্তি। তাঁরা পুলিস অফিসে দূত পাঠালেন, মন্ত্রীদের ধরলেন যাতে বইখানা বাজেয়াপ্ত হয়। কিন্তু কিছুই হল না, কারণ কর্তারা তখন বড় বড় সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত। প্রগতিবাদী নবীন সমাজ গল্পটিকে লুফে নিলেন। এই তো চাই, এই তো নবাগত যুগের বাণী, মিলনের সুসমাচার, প্রেমের মুক্তধারা, হৃদয়ের ঊর্ধ্বপাতন, আকাঙ্ক্ষার পরিতর্পণ। একজন উঁচু দরের সাহিত্যিক—যিনি চুলে কলপ না দিয়ে মনে কলপ লাগিয়ে আধুনিক হবার চেষ্টা করছেন—বললেন, বেড়ে লিখেছে রামধন। এতে দোষের কি আছে? তোমাদের ঋষিকল্প সবজান্তা লেখক এচ. জি. ওয়েল্‌স-এর নভেল 'বলপিংটন অভ ব্লপ' পড়েছ? তাতে যদি কুরুচি না পাও তবে রামধনের বইএও পাবে না।

প্রথমে যে দু-চারটি বিরুদ্ধ সমালোচনা বেরিয়েছিল পরে তা উচ্ছ্বসিত প্রশংসার তোড়ে ভেসে গেল। বইটি কেনবার জন্য দোকানে দোকানে যে কিউ হল তার কাছে সিনেমার কিউ কিছুই নয়। এক বৎসরের মধ্যে সাতটি সংস্করণ ফুরিয়ে গেল। রামধন পরম উৎসাহে গল্পের পর গল্প লিখতে লাগলেন। যেসব সম্পাদক পূর্বে তাঁকে গাল দিয়েছিলেন তাঁরাই এখন গল্পের জন্য রামধনের দ্বারস্থ হতে লাগলেন। সমস্ত সাহিত্যসভায় রামধনই এখন সভাপতি বা প্রধান অতিথি। তাঁর উপাধিও অনেক—সাহিত্যদিগ্‌গজ, গল্প-রাজচক্রবর্তী, উপন্যাস-ভাস্কর, কথারণ্যকেশরী, ইত্যাদি। তাঁর ভক্তের দল এক বিরাট সভায় প্রস্তাব করলেন যে তাঁকে জগত্তারিণী মেডেল দেওয়া হক। কিন্তু সস্তা নাইন ক্যারাট গোল্ডের তৈরী জানতে পেরে রামধন বললেন, ও আমার চাই না, বাহাত্তুরে বুড়োদের জন্যই ওটা থাকুক।

যাঁর লক্ষ টাকা জমেছে তিনি কোটিপতি হতে চান, যিনি এম. এল. সি. হয়েছেন তিনি মন্ত্রী হতে চান, সেকালে রায়বাহাদুররা সি. আই. ই আর সার হবার জন্য লালায়িত হতেন। রামধনেরও উচ্চাশা ক্রমশ বেড়ে যেতে লাগল। তিনি স্থির করলেন এবারে এমন একটি উপন্যাস লিখবেন যার প্লট কোনও দেশের কোনও লেখক কল্পনাতেও আনতে পারেন নি। ভীরু বাঙালী লেখক কদাচিৎ নায়ককে উচ্ছৃঙ্খল করলেও নায়িকাকে একানুরক্তাই করে। তারা বোঝে না যে নারীরও জংলী জই অর্থাৎ ওআইল্ড ওট্‌স বোনা দরকার, নতুবা তার চরিত্র স্বাভাবিক হতে পারে না। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য লেখক অনেক গল্পে নায়িকাকে কিছুকাল স্বৈরিণী করে রাখেন, তাতে তার 'আবেদন' বেড়ে যায়। তার পর শেষ পরিচ্ছেদে তার বিয়ে দেন। কিন্তু এবারে রামধন দেশী বা বিদেশী কোনও গতানুগতিক পথে যাবেন না, একেবারে নতুন নায়িকা সৃষ্টি করবেন। বিশ্বজগতের স্রষ্টা ভগবান নিজের মতলব অনুসারে নরনারীর চরিত্র রচনা করেন। কিন্তু গল্পজগতে ভগবানের হাত নেই, রামধন নিজেই তাঁর পাত্র-পাত্রীর স্রষ্টা আর ভাগ্যবিধাতা। তিনি প্রচলিত সামাজিক আদর্শ মানবেন না, যেমন খুশি চরিত্র রচনা করবেন।

মা বাপ একসঙ্গে অনেক সন্তানকে ভালবাসে, তাতে দোষ হয় না। নারী যদি এককালে একাধিক পুরুষে আসক্ত হয় তাতেই বা দোষ হবে কেন? এখনকার প্রগতিবাদী লেখকদের তুলনায় ব্যাসদেব ঢের বেশী উদার ছিলেন। তিনি দ্রৌপদীকে একসঙ্গে পাঁচটি পতি দিয়েছেন, যযাতির কন্যা মাধবীর এক পতি থাকতেই অন্য পতির সঙ্গে পর পর চার বার বিবাহ দিয়ে-

ছেন। নিজের জননী মৎস্যগন্ধাকেও তিনি ছেড়ে দেন নি, তাঁকে শান্তনু-মহিষী বানিয়েছেন। ব্যাস বেপরোয়া বাহাদুর লেখক, কিন্তু রামধন তাঁকেও হারিয়ে দেবেন। দ্রৌপদী স্বেচ্ছায় পঞ্চপতি বরণ করেন নি, গুরুজনের ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিলেন। মাধবী আর মৎস্যগন্ধাও নিজের মতে চলেন নি। স্ত্রীজাতির স্বাতন্ত্র্য কাকে বলে রামধন দাস তা এবারে দেখিয়ে দেবেন।

রামধন যে নতুন গল্পটি আরম্ভ করলেন তা খুব সংক্ষেপে বলছি। রাধাকৃষ্ণের লীলাস্থান যেমন বৃন্দাবন, সিনেমার তারক-তারকার গগন যেমন টালিগঞ্জ, অভিজাত নায়ক-নায়িকার বিলাসক্ষেত্র তেমনি বালিগঞ্জ। আনাড়ী পাঠক—বিশেষত প্রবাসী আর পাড়াগেঁয়ে পাঠক—মনে করে বালিগঞ্জ হচ্ছে অলকাপুরী, যক্ষ গন্ধর্ব কিন্নর অপ্সরার দেশ। সেখানে মশা আছে, মাছি আছে, পচা ড্রেন আছে, দারিদ্র্যও আছে, কিন্তু তার খবর কে রাখে। সেই কল্পলোক বালিগঞ্জেই রামধন তাঁর গল্পের ভিত্তিস্থাপন করলেন।

তিন একর জমির মাঝখানে একটি প্রকাণ্ড প্রাসাদ, তাতে থাকেন প্রৌঢ় ব্যারিস্টার পি. পি. মল্লিক আর তাঁর রূপসী বিদুষী যুবতী কন্যা রম্ভা। বাড়িতে অন্য কোনও আত্মীয়ের জঞ্জাল নেই, অবশ্য দারোয়ান খানসামা বাবুর্চি যথেষ্ট আছে। মল্লিক সাহেব সকালে ব্রেক-ফাস্ট করেই তাঁর চেম্বারে যান, সেখান থেকে কোর্টে যান, ফিরে এসে বাড়িতে ঘণ্টা খানিক থেকেই ক্লাবে যান, তার পর অনেক রাত্রে টলতে টলতে ফিরে আসেন। কন্যার বিবাহের জন্য তাঁর কোনও চিন্তা নেই। বলেন, মেয়ে বড় হয়েছে, বুদ্ধিও আছে, সম্পত্তিও ঢের পাবে; উপযুক্ত বর ও নিজেই বেছে নেবে।

বাড়ির তিন দিকে বাগান, একদিকে গাছে ঘেরা সবুজ মাঠ। বিকেলে সেখানে নানা জাতের শৌখিন পুরুষের সমাগম হয়। তারা টেনিস খেলে, চা বা ককটেল খায়, তার পর রম্ভাকে ঘিরে আড্ডা দেয়। এরা সবাই তার প্রেমের উমেদার, কিন্তু এপর্যন্ত কেউ কোনও প্রশ্রয় পায় নি, রম্ভা সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার করেছে। পূর্বে অনেক মেয়েও এখানে আসত, কিন্তু পুরুষগুলোর একচোখোমির জন্য রেগে গিয়ে তারা আসা বন্ধ করেছে।

এই রকমে কিছুকাল কেটে গেল। যাদের ধৈর্য কম তারা একে একে আড্ডা ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চেষ্টা করতে গেল। বাকী রইল শুধু আট জন পরম ভক্ত। সাড়ে সাত বলাই ঠিক, কারণ একজন হচ্ছে ইস্কুলের ছাত্র, এবারে ম্যাট্রিক দেবে। সে কথা বলে না, শুধু হাঁ করে রম্ভাকে দেখে আর বোকার মতন হাসে।

এই সাড়ে সাত জনের মধ্যে তিন জনের পরিচয় জানলেই চলবে, বাকী সব নগণ্য। প্রথম লোকটি ডক্টর বিদ্যাপতি ঘোষ, বিস্তর ডিগ্রি নিয়ে সম্প্রতি বিলাত থেকে ফিরেছে, সরকারী ভাল চাকরি পেয়েছে। দ্বিতীয় হচ্ছে ফ্লাইট-লেফ্‌টেনাণ্ট বিক্রম সিং রাঠোর, লম্বা চওড়া জোয়ান, এয়ার ফোর্সে কাজ করে, এখন ছুটিতে আছে। তৃতীয় লোকটি শ্যামসুন্দর ভ্রমর-বররায়, উড়িষ্যার কোনও রাজার জ্ঞাতি, অতি সুপুরুষ, সরাইকেলার নাচ জানে।

ক্রমশ সকলের সন্দেহ হল যে বিদ্যাপতি ঘোষের দিকেই রম্ভা বেশী ঝুঁকেছে। কিন্তু দু দিন পরেই দেখা গেল, নাঃ, ওই ষণ্ডামার্কা বিক্রম সিংটার ওপরেই রম্ভার টান। আরও দু দিন পরে বোধ হল, উঁহু, ওই উড়িষ্যার নবকার্তিক শ্যামসুন্দরের প্রেমেই রম্ভা মজেছে।

কারও বুঝতে বাকী রইল না যে ওই তিন জনের মধ্যেই একজনকে রম্ভা বরমাল্য দেবে। অগত্যা আর সবাই আড্ডা থেকে ভেগে পড়ল, কিন্তু সেই ইস্কুলের ছেলেটি রয়ে গেল।

একদিন বিদ্যাপতি ঘোষ এক ঘণ্টা আগে এসে রম্ভাকে যথারীতি প্রণয়নিবেদন করলে। রম্ভা গদ্‌গদ স্বরে বললে, এর জন্যই আমি অপেক্ষা করছিলাম, অনেকদিন থেকেই তোমাকে

আমি ভালবাসি। তবে আজ আর বেশী কথা নয়, দশ দিন পরে তোমার কাছে আমার হৃদয় উদ্‌ঘাটন করব।

পরদিন বিক্রম সিং রাঠোর এক ঘণ্টা আগে এসে বিবাহের প্রস্তাব করলে। রম্ভা বললে, থ্যাংক ইউ ডিয়ার, তুমি আমার দিল কা পিয়ারা। লক্ষ্মীটি, ন দিন সময় দাও, তার পর পাকা কথা হবে।

তার পরদিন শ্যামসুন্দর ভ্রমরবররায় সকাল সকাল এসে বললে, শুন রম্ভা, তুমার জন্য আমি পাগল, তুমি আমার হও। রম্ভা উত্তর দিলে, আমিও তোমার জন্য পাগল, আট দিন সবুর কর, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

নির্দিষ্ট দিনে সকলে উপস্থিত হলে চা খাওয়ার পর সেই ম্যাট্রিক ছাত্রটিকে রম্ভা বললে, গাবলু, তুমি বাড়ি যাও! গাবলুর পৌরুষে ঘা লাগল। একটু রুখে বললে, কেন?

—দু দিন পরে পরীক্ষা তা মনে নেই? তুমি অঙ্কে বেজায় কাঁচা। যাও, বাড়ি গিয়ে গসাগু লসাগু কষ গে, এখানে ইয়ারকি দিতে হবে না।

গাবলু সকলের দিকে একবার কটমট করে তাকিয়ে চলে গেল।

রম্ভা তার তিন প্রণয়ীকে বললে, এখন এখানে কোন বাজে লোক নেই, আমার মনের কথা খোলসা করে বলছি শোন। তোমাদের তিন জনের সঙ্গেই আমি প্রেমে পড়েছি, তিন জনই আমার বাঞ্ছিত বল্লভ, কান্ত দয়িত, দিলরুবা ডারলিং।

বিদ্যাপতি হতভম্ব হয়ে বললে, তুমি পাগল হয়েছ নাকি? বিয়ে তো একজনের সঙ্গেই হতে পারে।

বিক্রম সিং বললে, মরদের অনেক জোরু হতে পারে, কিন্তু ঔরতের এক শৌহর। এই হল আইন। তুমি আমাদের মধ্যে একজনকে বেছে নাও, নয় তো ভারী গড়বড় হবে।

শ্যামসুন্দর বললে, রম্ভা, তুমি একি বলছ? ছি ছি, হে জগন্নাথ দীনবন্ধু!

রম্ভা উত্তর দিলে, আমি সত্য বলেছি, আমার কথার নড়চড় হবে না। শোন বিদ্যাপতি, তুমি আমার দেশের লোক, বিদ্যার জাহাজ, তোমাকে আমার চাইই। আর বিক্রম সিং, রাজপুত জাতটির ওপর আমার ছেলেবেলা থেকেই একটা টান আছে। তোমার মতন নওজওআন বীরকে আমি কিছুতেই ছাড়তে পারি না। আর শ্যামসুন্দর, তুমি ললাটেন্দুকেশরীর বংশধর, তোমরা চিরকাল সৌন্দর্যের উপাসক, তুমি নিজেও পরম সুন্দর। তোমাকে না হলে আমার চলবে না।

শ্যামসুন্দর বললে, তবে আর এদিক ওদিক করছ কেন রম্ভা? তুমি রাধা আমি শ্যাম, আমাকে বিয়া কর।

রম্ভা বললে, রাধার সঙ্গে শ্যামের বিয়ে হয় নি।

বিদ্যাপতি বললে, রম্ভা, তুমি স্পষ্ট করে বল তো কাকে বিয়ে করতে চাও।

—কাকেও নয়। বিবাহের কোনও দরকার নেই, তোমরা তিন জনেই মিলে মিশে আমার কাছে থাকবে। যদি নিতান্ত না বনে তবে নিজের নিজের বাড়িতেই থেকো, ডেট ফিক্‌স করে আমার কাছে আসবে।

—সমাজের ভয় কর না?

—আমরা নতুন সমাজ গড়ব। আবার বলছি শোন। তোমাদের তিন জনকেই আমি ভালবাসি। বিনা বিবাহে একসঙ্গে বা পালা করে যদি আমার সঙ্গে বাস কর তবে আমি ধন্য হব তোমরাও নিশ্চয় সুখী হতে পারবে। তাতে যদি রাজী না হও তবে চিরবিদায়, আমি তিব্বতে চলে যাব। আমার আদর্শ বিসর্জন দিতে পারব না।

বিদ্যাপতি বললে, স্ত্রীলোক সপত্নীর ঘর করতে পারে, কিন্তু পুরুষ সপতি বরদাস্ত করবে না, খুনোখুনি হবে।

শ্যামসুন্দর বললে, সে ভারি মুশকিলের কথা। আমরা মরে গেলে তুমি কার সঙ্গে ঘর করবে রম্ভা?

রম্ভা বললে, আমার আর একটু বলবার আছে শোন। তোমরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ কর, বেশ করে ভেবে দেখ, সেকেলে সংস্কারের বশে আমার এই মহৎ সামাজিক এক্সপেরিমেণ্টটি পণ্ড করে দিও না। দশ দিন পরে তোমাদের সিদ্ধান্ত আমাকে জানিও, তার মধ্যে এখানে আর এসো না, তাতে শুধু বাজে তর্ক আর কথা কাটাকাটি হবে। এই আমার শেষ কথা।

তিন প্রণয়ী সাপের মতন ফোঁস ফোঁস করতে করতে চলে গেল।

এই পর্যন্ত লেখার পর রামধন একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। গল্পের প্রথম খণ্ড শেষ হয়েছে, কিন্তু আসল জিনিস সমস্তই বাকী। এর পরেই প্লট জমে উঠবে, পাত্র-পাত্রীর সম্পর্ক জটিলতর হবে, রামধন ভানুমতীর খেল দেখাবেন। তিনি তাঁর চমৎকার প্লটটির সমাধান মামুলী উপায়ে কিছুতেই হতে দেবেন না। দুজন নায়ককে মেরে ফেলে লাইন ক্লিয়ার করা অতি সহজ, কিন্তু তাতে বাহাদুরি কিছুই নেই। নায়িকাকেও তিনি মারবেন না অথবা দেশের কাজে বা ধর্মকর্মে তার জীবন উৎসর্গ করবেন না। রামধন প্রতিজ্ঞা করেছেন যে রম্ভার পরিকল্পনাটি বাস্তবে পরিণত করবেনই। কিন্তু শুধু তিন নায়কের একমুখী প্রেম এবং এক নায়িকার ত্রিমুখী প্রেম দেখালেই চলবে না, অন্য নরনারীর সঙ্গেও তাদের প্রেমলীলা দেখাতে হবে, তবেই তাঁর গল্পটি একেবারে অভাবিতপূর্ব বৈচিত্র্যময় রসঘন চমকপ্রদ হবে। প্রথম ধাক্কায় ঘাবড়ে গেলেও সমঝদার পাঠকরা পরে ধন্য ধন্য করবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তিন নায়কের সঙ্গে এক নায়িকার মিলন ঠিক কি ভাবে দেখাবেন, তাদের যৌথ জীবনযাত্রার ব্যবস্থা কি রকম করবেন, সমাজের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কি ভাবে বজায় থাকবে—এই রকম নানা সমস্যা তাঁর মনে উঠতে লাগল। রামধন দমবার পাত্র নন। এতটা যখন গড়তে পেরেছেন তখন শেষটাই বা না পারবেন কেন। তাড়াতাড়ি করা ঠিক হবে না, তিনি দিনকতক লেখা বন্ধ রেখে বিশ্রাম নেবেন। তার মধ্যে সমাধানের একটা প্রকৃষ্ট পদ্ধতি নিশ্চয় তার মাথায় এসে পড়বে।

রামধন কলকাতা ছেড়ে কোন্নগরে গঙ্গার ধারে তাঁর এক বন্ধুর বাগানবাড়িতে এসে বিশ্রাম করতে লাগলেন। বিশ্রাম ঠিক নয়, একরকম তপস্যা। তিনি তার মনের বল্‌গা ছেড়ে দিয়েছেন, তাঁর কল্পনা এলোমেলো নানা পথে সমস্যার সমাধান খুঁজছে।

রাত বারোটা, রামধন বিছানায় শুয়ে সশব্দে ঘুমুচ্ছেন। হঠাৎ তাঁর নাক ডাকা থেমে গেল। জাগা আর ঘুমের মাঝামাঝি অবস্থায় তিনি মশারির ভিতর থেকে দেখলেন, তিনটে ছায়ামূর্তি। মূর্তি ক্রমশ স্পষ্ট আর জীবন্ত হয়ে উঠল। রামধন তাদের চিনতে পারলেন, তাঁর গল্পের তিন নায়ক। তারা একটা গোল টেবিল বৈঠকে বসে তর্ক করছে।

বিদ্যাপতি বলছে, এই যে বিশ্রী বিপরিস্থিতি, এ থেকে উদ্ধার পাবার উপায় তো আমার মাথায় আসছে না।

বিক্রম সিং উত্তর দিলে, উপায় আছে। ডুয়েল লড়লে সহজেই ফয়সালা হতে পারবে। এই ধর, প্রথমে তোমার সঙ্গে শ্যামসুন্দরের লড়াই হল, তুমি মরে গেলে। তার পর শ্যাম আর আমার লড়াই হল, শ্যাম মরল। তখন আর কোনও ঝঞ্চাট থাকবে না, আমার সঙ্গে রম্ভার শাদি হবে।

শ্যামসুন্দর বললে, তুমার মুন্ড হবে, মানুষ খুন করার জন্য তুমাকে ফাঁসিতে লটকে দেবে। তা ছাড়া এখন হচ্ছে গান্ধীরাজ, খুন জখম চলবে না। আমি বলি কি—লটারি লাগাও।

বিদ্যাপতি বললেন, রম্ভা তাতে রাজী হবে না, ভারী বেয়াড়া মেয়ে। ওকে ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

এমন সময় রম্ভা হঠাৎ এসে বললে, তোমরা কি স্থির করলে? তিন জনে একমত হয়েছ তো?

শ্যামসুন্দর বললে, হাঁ, তুমার নাক কাটি দিব। তুমাকে চাই না, আমার দু-গোটা ভাল ভাল বহু দেশে আছে, বিক্রম সিংএর ভি ওমদা ওমদা জোরু আছে। আর বিদ্যাপতিবাবুর বহু তো মজুত রয়েছে, উনি ইচ্ছা করলেই তেলেনা সরকারকে বিয়া করতে পারেন।

নায়কদের এই বিদ্রোহ দেখে রামধন আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। শুয়ে থেকেই হাত নেড়ে বললেন, না না, ওসব চলবে না।

শ্যামসুন্দর বললে, তু কোন্‌রে শড়া? তুই কে?

রামধন উত্তর দিলেন, আমিই গল্পলেখক, তোমাদের স্রষ্টা আর ভাগ্যবিধাতা। তোমরা নিজের মতলবে চলতে পার না, আমি যেমন চালাব তেমনি চলবে। আমার মাথা থেকেই তোমরা বেরিয়েছ।

বিক্রম সিং বললে, এই ছুছুন্দরটা বলে কি? এই আমাদের পয়দা করেছে? আমাদের বাপ দাদা পরদাদা নেই?

রম্ভা বললে, কেউ নেই, কেউ নেই, আমরা সব ঝুটো।

বিক্রম সিং একটানে খাটের ছতরি খুলে ফেলে একটা কাঠ হাতে নিয়ে রামধনকে বললে, এই, আমরা সব ঝুটা?

রামধন ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলেন, তা একরকম ঝুটা বই কি—যখন আমারই কল্পনাপ্রসূত আপনারা।

—তুই সাচ্চা না ঝুটা?

—আজ্ঞে আমি তো ঝুটা হতে পারি না।

—এই ডান্ডা সাচ্চা না ঝুটা?

—আজ্ঞে এও ঝুটা নয়।

অনন্তর তিন নায়ক আর এক নায়িকা ছতরির কাঠ দিয়ে বেচারা রামধনকে পিটতে লাগল। স্বামীর আর্তনাদ শুনে রামধন-পত্নী ননীবালার ঘুম ভেঙে গেল, তিনি একটি চিৎকার ছেড়ে মূর্ছিত হলেন। তার পর চার মূর্তি তান্ডব নাচতে নাচতে অদৃশ্য হল।

রামধন বেশী জখম হন নি। একটু পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হয়ে কোনও রকমে বিছানা থেকে উঠলেন এবং ননীবালার মুখে চোখে জলের ছিটে দিয়ে তাঁকে চাঙ্গা করলেন।

ননীবালা ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, গেছে?

—গেছে।

—ডাকাত?

—ডাকাত নয়।

—সাহিত্যিক গুন্ডা?

—তাও নয়। বেতাল জান? নিরাশ্রয় প্রেত মরা মানুষের দেহে ভর করলে বেতাল হয়।

শুনেছি,যদি পছন্দ মতন লাশ না পায় তবে তারা গল্পের খাতায় ঢুকে গিয়ে নায়ক-নায়িকার ওপর ভর করে। এ তাদেরই কাজ।

—তোমার ওপর ওদের রাগ কেন?

—বোধ হয় সেকেলে প্রেতাত্মা, আমার প্লটের রসগ্রহণ করতে পারে নি।

—তুমি আর ছাই ভস্ম লিখো না বাপু।

রাম বল, আবার লিখব! দেখছ না, আমার সমস্ত খাতা কুচি কুচি করে ছিঁড়েছে, দামী ফাউনটেন পেনটা চিবিয়ে নষ্ট করেছে, ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা থেঁতলে দিয়েছে। তোমার দিদিমার গুরুদেব বিষ্ণুপ্রয়াগে থাকেন না? তাঁর আশ্রমেই বাস করব ভাবছি। ভোরের গাড়িতে কলকাতায় ফিরে যাই চল, তার পর দিন দুইয়ের মধ্যে সব গুছিয়ে নিয়ে চুপি চুপি বিষ্ণু-প্রয়াগ রওনা হব।

১৩৫৮ (১৯৫১)

ভরতের ঝুমঝুমি

হৃষীকেশ তীর্থে গঙ্গার ধারে যে ধর্মশালা আছে তারই সামনের বড় ঘরে আমরা আশ্রয় নিয়েছি—আমি, আমার মামাতো ভাই পুলিন, আর তার দশ বছরের ছেলে পল্টু। তা ছাড়া টহলরাম চাকর আর চারটে সাদা ইঁদুরও আছে। ইঁদুর আনতে আমাদের খুব আপত্তি ছিল, কিন্তু পল্টু বললে, বা রে, আমি সঙ্গে না নিলে এদের খাওয়াবে কে? বাড়ির ছটা বেরালেই তো এদের খেয়ে ফেলবে। যুক্তি অকাট্য, ইঁদুরের ভাড়াও লাগে না, সুতরাং সঙ্গে আনা হয়েছে। তারা রাত্রে একটা খাঁচার মতন বাক্সে বাস করে, দিনের বেলায় পল্টুর পকেটে বা মুঠোর মধ্যে থাকে, অথবা তার গায়ের ওপর চরে বেড়ায়।

সমস্ত সকাল টো টো করে বেড়িয়েছি, এখন বেলা এগারোটা, প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। চা তৈরির সরঞ্জাম আমরা সঙ্গে এনেছি, কিন্তু রান্নার কোনও যোগাড় নেই, তার হাঙ্গামা আমাদের পোষায় না। দোকান থেকে এক ঝুড়ি মোটা মোটা আটার লুচি, খানিকটা স্বচ্ছন্দবনজাত কচুঘেঁচুর ঘণ্ট, আর সের খানিক নুড়ির মতন শক্ত পেড়া আনানো হয়েছে। আমরা স্নান সেরে দরজা বন্ধ করে খাটিয়ায় বসে কোলের ওপর শালপাতা বিছিয়েছি, টহলরাম পরিবেশনের উপক্রম করছে, এমন সময় বাইরে থেকে ভাঙা কর্কশ গলায় আওয়াজ এল—অয়মহং ভোঃ!

কথাটা কোথায় যেন আগে শুনেছি। দরজা খুলে বাইরে এসে দেখলুম, একজন বৃদ্ধ সাধুবাবা। রংটা বোধহয় এককালে ফরসা ছিল, এখন তামাটে হয়ে গেছে। লম্বা, রোগা, মাথার জটাটি ছোট কিন্তু অকৃত্রিম, গোঁফ আর গালের ওপর দিকের দাড়ি ছেঁড়া ছেঁড়া, যেন ছাগলে খেয়েছে। কিন্তু থুতনির দাড়ি বেশ ঘন আর লম্বা, নিচের দিকে ঝুঁটির মতন একটি বড় গেরো বাঁধা। দেখলে মনে হয় গেরোটি কোনও কালে খোলা হয় না। পরনের গেরুয়া কাপড় আর কাঁধের কম্বল অত্যন্ত ময়লা। সর্বাঙ্গে ধুলো, গলায় তেলচিটে পইতে, হাতে একটা ঝুলি আর তোবড়া ঘটি। রুদ্রাক্ষের মালা, ভস্মের প্রলেপ, গাঁজার কলকে, চিমটে, কমণ্ডলু প্রভৃতি মামুলী সাধুসজ্জা কিছুই নেই।

প্রশ্ন করলুম, ক্যা মাংতা বাবাজী? বাবাজী উত্তর দিলেন না, সোজা ঘরে ঢুকে আমার খাটিয়ায় বসে পড়লেন। টহলরাম বাঙালীর সংসর্গে থেকে একটু নাস্তিক হয়ে পড়েছে অচেনা সাধুবাবাদের ওপর তেমন ভক্তি নেই। রুখে উঠে বললে, আরে, কৈসা বেহুদা আদমী তুম, উঠো খাটিয়াসে!

সাধুবাবা ভ্রূকুটি করে রাষ্ট্রভাষায় যে গালাগালি দিলেন তা অশ্রাব্য অবাচ্য অলেখ্য। পুলিন অত্যন্ত রেগে গিয়ে গলাধাক্কা দিতে গেল। আমি তাকে জোর করে থামিয়ে বললুম, কর কি, বাবাজীর সঙ্গে একটু আলাপ করেই দেখা যাক না।

প্রমোদ চাটুজ্যে মশাই বিস্তর সাধুসঙ্গ করেছেন। সাধুচরিত্র তাঁর ভাল রকম জানা আছে, যোগী অবধূত বামাচারী তান্ত্রিক অঘোরপন্থী প্রভৃতি হরেক রকম সাধক সম্বন্ধে তিনি গবেষণা করেছেন। তাঁর লেখা থেকে এইটুকু বুঝেছি যে গরুর যেমন শিং, শজারুর যেমন কাঁটা, খট্টাশের যেমন গন্ধ, তেমনি সিদ্ধপুরুষদের আত্মরক্ষার উপায় গালাগালি।

তাঁদের কটুবাক্যের চোটে অনধিকারী বাজে ভক্তরা ভেগে পড়ে, শুধু নাছোড়বান্দা খাঁটি মুক্তিকামীরা রয়ে যায়। এই আগন্তুক সাধুবাবাটির মুখখিস্তির বহর দেখে মনে হল নিশ্চয় এঁর মধ্যে বস্তু আছে। সবিনয়ে বললুম, ক্যা মাংতে হুকুম কিজিয়ে বাবা।

বাবা বললেন, ভোজন মাংতা। আরে তোমরা তো দেখছি বাঙালী, বাংলাতেই বল না ছাই।

বাবাজীর মুখে আমাদের মাতৃভাষা শুনে খুশী হয়ে বললুম, এই তরকারি পেড়া আপনার চলবে কি?

—খুব চলবে। কিন্তু ওইটুকুতে কি হবে। আমি আছি, তোমরা তিন জন আছ আর তোমাদের ওই রাক্ষস চাকরটা আছে। আরও সের দুই আনাও।

টহলরামকে আবার বাজারে পাঠালুম। পুলিনের পেশা ওকালতি কিন্তু মক্কেল তেমন জোটে না, তাই বেচারা সুবিধে পেলেই যাকে তাকে সওয়াল করে শখ মিটিয়ে নেয়। বললে, আপনি বাঙালী ব্রাহ্মণ?

—সে খোঁজে তোমার দরকার কি, আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে নাকি? আমার ভাষা সংস্কৃত, তবে তোমরা তা বুঝবে না তাই বাংলা বলছি।

—আপনি কোন্ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী, গিরি পুরি ভারতী অরণ্য না আর কিছু?

—ওসব অর্বাচীন দলের মধ্যে আমি নেই। আমার আদি আশ্রম ব্রহ্মলোক, আমি একজন ব্রহ্মর্ষি।

—নামটি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

—বোবা যখন নও তখন না পারবে কেন। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারবে কি? তোমরা তো পাষণ্ড নাস্তিক। আমি হচ্ছি মহামুনি দুর্বাসা।

কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে থাকার পর প্রণিপাত করে আমি বললুম, ধন্য আমরা! চেহারা যেমনটি শুনেছি তেমনটি দেখছি বটে, কিন্তু লোকে যে আপনাকে অত্যন্ত বদরাগী বলে তা তো মনে হচ্ছে না। এই তো আমাদের সঙ্গে বেশ প্রসন্ন হয়ে কথা বলছেন।

—বদরাগী কেন হব। তবে এককালে আমার তেজ খুব বেশী ছিল বটে। কিন্তু সেই বজ্জাত মাগীটা আমার দফা সেরেছে।

হাত জোড় করে বললুম, তপোধন, যদি গোপনীয় না হয় তবে কৃপা করে এই অধমদের কৌতূহল নিবৃত্ত করুন। আপনি তো সত্য ত্রেতা দ্বাপরের লোক, এই ঘোর কলিযুগে আমাদের মতন পাপীদের কাছে এলেন কি করে?

—পিতা অত্রি আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছেন, বৎস, তুমি হৃষিকেশ তীর্থে গঙ্গা-তীরবর্তী ধর্মশালায় যাও, সেখানে তোমার সংকটমোচন হবে।

—আপনার আবার সংকট কি প্রভু? আপনিই তো লোককে সংকটে ফেলেন।

—সব বলব, কিন্তু আগে ভোজন সমাপ্ত হক। তোমরাও খেয়ে নাও।

পুলিন বললে, আপনি স্নান করবেন না?

—সে তো কোন কালে সেরেছি, ব্রাহ্ম মুহূর্তেই গঙ্গায় একটি ডুব দিয়েছি।

—কিন্তু জটায় আর দাড়িতে যে বড্ড ময়লা লেগে রয়েছে প্রভু, একটু সাবান ঘষলে হত না? গায়েও দেখছি ছারপোকা বিচরণ করছে। যদি অনুমতি দেন ত একটু ডিডিটি স্প্রে করে দিই। আমাদের সঙ্গেই আছে।

—খবরদার, ওসব করতে যেয়ো না। গুটিকতক অসহায় প্রাণী যদি আমার গাত্রে বস্ত্রে আর জটায় আশ্রয় নিয়ে থাকে তো থাকুক না। তুমি তাদের তাড়াবার কে?

টহলরাম খাবার নিয়ে এল। মহামুনি দুর্বাসার আদেশে আমরা তাঁর সঙ্গেই খাটিয়ায়

বসে ভোজন করলুম। ভোজনান্তে আমি সিগারেটের টিনটি এগিয়ে দিয়ে বললুম, প্রভু, এ জিনিস চলবে কি? এর চেয়ে উঁচুদরের ধূমোৎপাদক বস্তু তো আমাদের নেই।

একটি সিগারেট তুলে নিয়ে দুর্বাসা বললেন, এতেই হবে। গঞ্জিকা আমার সয় না, বাতিক বৃদ্ধি হয়। কই, তোমরা ধূমপান করবে না?

লজ্জায় জিব কেটে বললুম, হেঁ হেঁ, আপনার সামনে কি তা পারি?

—ভণ্ডামি ক'রো না। আমার সামনে একরাশ লুচি গিলতে বাধল না, আর যত লজ্জা ধোঁয়ায়। নাও নাও, টানতে আরম্ভ কর।

অগত্যা পুলিন আর আমিও সিগারেট ধরালুম। শোনবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছি দেখে দুর্বাসা তাঁর ইতিহাস আরম্ভ করলেন।

শকুন্তলার কথা জান তো? কালিদাস তার নাটকে লিখেছে। মেয়েটা আমার ডাকে সাড়া দেয় নি তাই হঠাৎ রেগে গিয়ে তাকে অভিশাপ দিয়েছিলুম—তুমি যার কথা ভাবছ সে তোমাকে দেখলে চিনতে পারবে না। শকুন্তলা এমনি বেহুঁশ যে আমার কোনও কথাই তার কানে গেল না। কিন্তু তার এক সখী শুনতে পেয়েছিল। সে আমার কাছে এসে পায়ে ধরে অনেক কাকুতি মিনতি করলে। তার নাম অনসূয়া। আমার মায়েরও ওই নাম, তাই প্রসন্ন হয়ে অভিশাপ খুব হালকা করে দিলুম। কিন্তু সখীটা অতি কুটিলা, শকুন্তলার মা মেনকার কাছে গিয়ে আমার নামে লাগাল।

এই ঘটনার পর প্রায় দশ মাস কেটে গেল। তখন আমি শিষ্যদের সঙ্গে গঙ্গোত্তরীর নিকট বাস করছি। একদিন প্রাতঃকালে ভাগীরথীতীরে বসে আছি এমন সময় একজন শিষ্য এসে জানালে, একটি অপূর্ব রূপবতী নারী আমার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছেন। বিরক্ত হয়ে বললুম, আঃ জ্বালাতন করলে, এখানেও রূপবতী নারী! নির্জনে একটু পরমার্থ চিন্তা করব তারও ব্যাঘাত। কে এসেছে পাঠিয়ে দাও এখানে।

দেখেই চিনলুম মেনকা অপ্সরা। ভাব্যতার জ্ঞান নেই, দাঁতন চিবুতে চিবুতে এসেছে, বোধ হয় ভেবেছে তাতে খুব চমৎকার দেখাচ্ছে। খেঁকিয়ে উঠে বললুম, কিজন্য আসা হয়েছে এখানে? জান, আমি মহাতেজস্বী দুর্বাসা মুনি, বিশ্বামিত্রের মতন হ্যাংলা পাওনি যে লাস্য হাস্য ছলা কলা হাব ভাব ঠসক ঠমক দেখিয়ে আমাকে ভোলাবে।

মেনকা ভেংচি কেটে বললে, আ মরি মরি! জগতে তো আর কেউ নেই যে তোমাকে ভোলাতে আসব! তোমার ভালর জন্যই দেখা করতে এসেছি। তা যদি না চাও তো চললুম কিন্তু এর পরে বিপদে পড়লে দোষ দিতে পাবে না। এই বলে মেনকা এক পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে বোঁ করে ঘুরে গেল।

মাগীর আস্পর্ধা কম নয়, আমাকে তুমি বলছে। শাপ দিতে যাচ্ছিলুম—তুই এক্ষুনি শুঁয়োপোকা হয়ে যা। কিন্তু ভাবলুম, উঁহু, ব্যাপারটা আগে জানা দরকার। বললুম, কিজন্য এসেছ বলই না ছাই।

মেনকা বললে, মহাদেব যে তোমার ওপর রেগে আগুন হয়েছেন, শকুন্তলাকে তুমি বিনা দোষে শাপ দিয়েছিলে শুনে। আর একটু হলেই তোমাকে ভস্ম করে ফেলতেন, নেহাৎ আমি পায়ে ধরে বোঝালুম তাই এবারকার মতন তুমি বেঁচে গেছ।

আমি দেবতা মানুষ কাকেও গ্রাহ্য করি না, কিন্তু মহাদেবকে ডরাই। জিজ্ঞাসা করলুম, কি বললে তুমি তাঁকে?

—বললুম, আহা নির্বোধ ব্রাহ্মণ, মাথার দোষও আছে, না বুঝে রাগের মাথায় শাপ দিয়ে ফেলেছে। তা শকুন্তলা তো বেশী দিন কষ্ট পাবে না, আপনি দুর্বাসা মুনিকে এবারটি ক্ষমা করুন। মহাদেব আমাকে স্নেহ করেন, তাঁর শাশুড়ীর নাম আর আমার নাম একই কি না। বললেন, বেশ, ক্ষমা করব, কিন্তু আগে তুমি তাকে দিয়ে একটা প্রায়শ্চিত্ত করাও।

—কি প্রায়শ্চিত্ত করাবে শুনি?

—তোমার ভয় নেই ঠাকুর, খুব সোজা প্রায়শ্চিত্ত। শকুন্তলা এখন হেমকূট পর্বতে প্রজাপতি কশ্যপের আশ্রমে আছে। আমি খবর পেয়েছি সম্প্রতি তার একটি খোকা হয়েছে। কশ্যপ বলেছেন, এই ছেলে ভরত নামে প্রসিদ্ধ হবে এবং পৃথিবী শাসন করবে। মনে করেছিলুম গিয়ে একবার দেখে আসব, কিন্তু তা আর হল না। ইন্দ্র সব অপ্সরাদের ডেকে পাঠিয়েছেন। তাঁর ব্যাটা জয়ন্ত বিগড়ে যাচ্ছে—হবে না কেন, বাপের ধাত পেয়েছে—তাই তাড়াতাড়ি তার বিয়ে দিচ্ছেন। দু মাস ধরে অষ্ট প্রহর নৃত্য গীত পান ভোজন চলবে। আজই আমাকে যেতে হবে। দেবতাদের ষাট দিনে মানুষের ষাট বৎসর। আমি যখন ফিরে আসব তখন শকুন্তলার ছেলে বুড়ো হয়ে যাবে। তাই তোমাকেই তার কাছে পাঠাতে চাই।

আমি ভাবলুম, এ তো কিছু শক্ত কাজ নয়। আমি যদি শকুন্তলার কাছে গিয়ে তাকে আর তার ছেলেকে আশীর্বাদ করে আসি তবে দেখতে শুনতে ভালই হবে। মেনকাকে বললুম, আমি যেতে রাজী আছি, কিন্তু প্রায়শ্চিত্তটা কি, সেখানে গিয়ে কি করতে হবে?

—একটি কাজের ভার নিয়ে তোমাকে যেতে হবে। এই ঝুমঝুমিটি খোকার হাতে দেবে আর আমার হয়ে তাকে একটু আদর করবে। কিন্তু তুমি বড় নোংরা, আগে ভাল করে হাত ধোবে, তার পর খোকার থুতনিতে ঠেকিয়ে আলগোছে একটি চুমু খাবে।

আমি প্রশ্ন করলুম, সে আবার কি রকম?

—এই রকম আর কি। এই বলে মেনকা তার হাত আমার দাড়িতে ঠেকিয়ে মুখের কাছে এনে একটা শব্দ করলে,—চুঃ কি থুঃ বুঝতে পারলুম না। তার পর বললে, এই নাও, ঝুমঝুমি। খবরদার, হারিও না যেন, তা হলে মজা টের পাবে।

ঝুমঝুমিটা নিয়ে আমি বললুম, হারাব কেন, খুব সাবধানে রাখব। আহা, তুমি তোমার নাতিটিকে দেখতে পাবে না, বড় দুঃখের কথা। দেখ মেনকা, তুমি তো চলে যাচ্ছ, যদি আমার কাছে কোন বর চাইবার থাকে তো এই বেলা বল।

—নাঃ, বর টর আমার দরকার নেই।

আমি বললুম, নেই কেন? যদি চাও তো আমার ঔরসে তোমার গর্ভে একটি পুত্র দিতে পারি। যদি তিন-চারটি বা শ-খানিক চাও তাও দিতে পারি।

নাক সিটকে মেনকা উত্তর দিলে, হয়েছে আর কি! তুমি নিজেকে কি মনে কর, কার্তিক না কন্দর্প? তোমার সন্তান তো রূপে গুণে একেবারে বোকা পাঁঠা হবে।

অতি কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করে আমি বললুম, আচ্ছা আচ্ছা, না চাও তো আমার বড় বয়েই গেল। আমি অপাত্রে দান করি না। বেশ, এখন তুমি বিদেয় হও, একটা শুভদিন দেখে আমি শকুন্তলার কাছে যাব।

পুলিন জিজ্ঞাসা করলে, প্রভু, মেনকার বয়স কত?

দুর্বাসা বললেন, তুমি তো আচ্ছা বোকা দেখছি। অপ্সরার আবার বয়স কি? জ্যোৎস্না বিদ্যুৎ রামধনু—এসবের বয়স আছে নাকি? তার পর শোন। মেনকা চলে গেল। তিন দিন পরে আমি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলুম। অপ্সরাই বল আর দিব্যাঙ্গনাই বল, মেনকা আসলে হল স্বর্গবেশ্যা, লৌকিকতার কোনও জ্ঞানই তার নেই। কিন্তু আমার তো একটা কর্তব্যবোধ আছে। শুধু ঝুমঝুমি নিয়ে গেলে ভাল দেখাবে কেন, কিছু খাদ্যসামগ্রী নিয়ে যেতেই হবে।

সেজন্য আশ্রমের নিকটস্থ বন থেকে একটি সুপুষ্ট ওল আর সেরখানিক বড় বড় তিন্তিড়ী সংগ্রহ করে ঝুলির ভেতর নিলুম।

পুলিন বললে, এক মাসের খোকা বুনো ওল আর বাঘা তেঁতুল খাবে?

আমি বললুম, তা আর না খাবে কেন। সেকালের ক্ষত্রিয় খোকারা পাথর হজম করত, বিলিতী গুঁড়ো দুধের তোয়াক্কা রাখত না।

দুর্বাসা বললেন, তোমরা অত্যন্ত মূর্খ। ওল আর তেঁতুল ছেলে কেন খাবে, আশ্রম-বাসী তপস্বী আর তপস্বিনীরা সবাই খাবেন। তার পর শোনো। যথাকালে হেমকূটে পৌঁছে মরীচিপুত্র ভগবান কশ্যপ ও তৎপত্নী ভগবতী অদিতিকে বন্দনা করলুম, তার পর শকুন্তলার কাছে গেলুম। আমি যে শাপ দিয়েছিলুম তা বোধ হয় সে জানত না, আমাকে দেখে খুশীই হল। ওল আর তেঁতুল উপহার দিলুম, মেনকার কথামত ছেলেকে আদর করে আশীর্বাদও করলুম। বললুম, শকুন্তলা, তোমার এই শ্রীমান সর্বদমন-ভরত আসমুদ্রহিমাচল সমস্ত দেশ জয় করে রাজচক্রবর্তী হবে। এর প্রজারা যে ভূখণ্ডে থাকবে তার নাম হবে ভারতবর্ষ,—বর্ষং তদ্‌ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ। তুমিও অচিরে পতির সহিত মিলিত হবে। তার পর ট্যাঁক থেকে ঝুমঝুমি বার করতে গিয়েই চক্ষুস্থির।

আমি বললুম, বলেন কি, ঝুমঝুমি পেলেন না?

—মোটেই না। আমার পরনের কাপড় উত্তরীয় কম্বল সব ঝাড়লুম, ঝুলি ঘটি মায় জটা সব তন্ন তন্ন করে খুঁজলুম, কোথাও ঝুমঝুনি নেই। শকুন্তলার মুখটি কাঁদোকাঁদো হল, আহা, তার মায়ের দেওয়া উপহারটি হারিয়ে গেল! মেনকা যতই নচ্ছার হ'ক, নিজের মা তো বটে। আমি বললুম, দুঃখ ক'রো না শকুন্তলা, আরও ভাল ঝুমঝুমি এনে দেব।

দুজন বুড়ী তপস্বিনী শকুন্তলার কাছে ছিল। একজন বললে, পাগলের মতন যা তা ব'লো না ঠাকুর। ছেলের দিদিমার দেওয়া যৌতুক আর তোমার ছাইপাঁশ কি সমান? তুমি ভারি অলবড্যে মুনি। নিশ্চয় নাইবার সময় তোমার ট্যাঁক থেকে জলে পড়ে গেছে আর মাছে কপ করে গিলেছে। যাও, এখন রাজ্যের রুই-কাতলা ধরে ধরে পেট চিরে দেখ গে।

অন্য বুড়ীটা বললে, কি বলছ গা দিদি! শুধু রুইকাতলা কেন, মিরগেল চিতল বোয়াল কালবোস শোল শাল চাঁই চাঁই এসব মাছের পেটেও তো থাকতে পারে।

পুলিন বললে, কচ্ছপের পেটেও যেতে পারে।

আমি বললুম, হাঙর কুমির শুশুক সিন্ধুঘোটক বা জলহস্তীর পেটে যেতেও বাধা নেই।

দুর্বাসা আমাদের দিকে একবার কটমট করে চাইলেন, তারপর বলে যেতে লাগলেন—

আমি আর দাঁড়ালুম না, কথাটি না বলে পালিয়ে এলুম। যে পথে এসেছিলুম সেই পথের সর্বত্র খুঁজে দেখলুম, কোথাও ঝুমঝুমি নেই। আমি অত্যন্ত ভুলো লোক, কিন্তু ঝুমঝুমিটা তো ট্যাঁকেই গোঁজা ছিল। নিশ্চয় নাইবার সময় জলে পড়ে গেছে। যেখানে যেখানে স্নান করেছিলুম সর্বত্র জলে নেমে হাতড়ে দেখলুম, কিন্তু পাওয়া গেল না। তাহলে বোধ হয় রুই মাছেই গিলেছে, শকুন্তলার আংটির মতন। বোয়াল কালবোস চাঁই চাঁইও হতে পারে। জেলেদের ডেকে ডেকে বললুম ওরে মাছের পেটে ঝুমঝুমি পেয়েছিস? বার করে দে, আশীর্বাদ করব। ব্যাটারা বললে, মাছের পেটে ঝুমঝুমি থাকে না ঠাকুর, পটকা থাকে। এই বলে দাঁত বার করে হাসতে লাগল। আমি অভিশাপ দিলুম, তোরা দোঁতো কুমির হয়ে যা। কিন্তু কোনও ফল হল না।

ওঃ, মেনকার কথা রাখতে গিয়ে কি সংকটেই পড়েছি! ঝুমঝুমি তুচ্ছ জিনিস, কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করা যে মহাপাপ। তার পর হাজার হাজার বছর কেটে গেছে, অসংখ্যবার অসংখ্য স্থানে খুঁজেছি, কিন্তু ঝুমঝুমি পাই নি। আমার আর শান্তি নেই, ব্রহ্মতেজ নেই,

রেবতীর পতিলাভ

বিষ্ণুপুরাণে রাজা রৈবত-ককুদ্মী ও তাঁর কন্যা রেবতীর একটি বিচিত্র আখ্যান আছে। সেই ছোট আখ্যানটি বিস্তারিত করে লিখছি। এই পবিত্র পুরাণকথা যে কন্যা শ্রদ্ধাসহকারে একাগ্রচিত্তে পাঠ করে তার অচিরে সর্বগুণান্বিত বাঞ্ছিত পতি লাভ হয়।

পুরাকালে কুশস্থলী নগরীতে রৈবত-ককুদ্মী নামে এক ধর্মাত্মা রাজা ছিলেন। তিনি রেবত রাজার পুত্র সেজন্য তাঁর নাম রৈবত, এবং ককুদযুক্ত বৃষ অর্থাৎ ঝুঁটিওয়ালা ষাঁড়ের তুল্য তেজস্বী সেজন্য অপর নাম ককুদ্মী। সেকালে মহত্ত্ব ও বীরত্বের নিদর্শন ছিল সিংহ ব্যাঘ্র ও বৃষ, সেজন্য কীর্তিমান লোকের উপাধি দেওয়া হত—পুরুষসিংহ, নরশার্দূল, ভরতর্ষভ, মুনিপুংগব, ইত্যাদি।

রৈবত রাজার রেবতী নামে একটি কন্যা ছিলেন, তিনি রূপে, গুণে অতুলনা। রেবতী বড় হলে তাঁর বিবাহের জন্য রাজা পাত্রের খোঁজ নিতে লাগলেন। অনেক পাত্রের বিবরণ সংগ্রহ করে রৈবত একদিন তাঁর কন্যাকে বললেন, দেখ রেবতী, আর বিলম্ব করতে পারি না, তোমার বয়স ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। তুমি অত খুঁত ধরলে তোমার বরই জুটবে না। আমি বলি কি, তুমি কাশীরাজ তুন্দবর্ধনকে বিবাহ কর।

রেবতী ঠোঁট কুঁচকে বললেন, অত্যন্ত মোটা আর অনেক স্ত্রী। আমি সতিনের ঘর করতে পারব না।

রাজা বললেন, তবে গান্ধারপতি গণ্ডবিক্রমকে বিবাহ কর তাঁর স্ত্রী বেশী নেই।

—গণ্ডমূর্খ আর অনেক বয়স।

—আচ্ছা, ত্রিগর্ত দেশের যুবরাজ কড়ম্বকে কেমন মনে হয়?

—কাঠির মতন রোগা।

—কোশলরাজকুমার অর্ভক?

—সে তো নিতান্ত ছেলেমানুষ।

—তবে আর কথাটি নয়, দৈত্যরাজ প্রহ্লাদকে বরণ কর। অমন রূপবান ধনবান বলবান আর ধর্মপ্রাণ পাত্র সমগ্র জম্বুদ্বীপে নেই।

রেবতী বললেন, উনি তো দিনরাত হরি হরি করেন, ও রকম ভক্ত লোকের সঙ্গে আমার বনবে না।

রৈবত হতাশ হয়ে বললেন, তবে তুমি নিজেই একটা পছন্দ মতন স্বামী জুটিয়ে নাও। যদি চাও তো স্বয়ংবরের আয়োজন করতে পারি, যাকে মনে ধরবে তার গলার মালা দিও।

—কার গলায় দেব? সব সমান অপদার্থ।

এমন সময় দেবর্ষি নারদ সেখানে উপস্থিত হলেন। যথাবিধি পূজা গ্রহণ করে কুশল-প্রশ্নের পর নারদ বললেন, তোমরা পিতা-পুত্রীতে কিসের বাদানুবাদ করছিলে?

রৈবত উত্তর দিলেন, আর বলবেন না দেবর্ষি। এখনকার মেয়েরা অত্যন্ত অবুঝ হয়েছে, কিছুতেই বর মনে ধরে না। আমি অনেক চেষ্টায় পাঁচটি ভাল ভাল পাত্রের সন্ধান পেয়েছি, কিন্তু রেবতী কাকেও পছন্দ করছে না। স্বয়ংবরা হতেও চায় না, বলছে সব অপদার্থ। আপনি যা হয় একটা ব্যবস্থা করুন।

নারদ বললেন, রেবতী নিতান্ত অন্যায় কথা বলে নি, আজকাল রূপে গুণে উত্তম পাত্র পাওয়া দুরূহ। চেহারা দেখে আর খবর নিয়ে স্বভাব-চরিত্র জানা যায় না। এক কাজ কর, প্রজাপতি ব্রহ্মাকে ধর, তিনিই রেবতীর বর স্থির করে দেবেন।

রাজা বললেন, ব্রহ্মার নির্বাচিত বরও হয়তো রেবতীর মনে ধরবে না।

নারদ বললেন, না ধরবে কেন? আমাদের পিতামহ বিরিঞ্চি সর্বজ্ঞ, তাঁর নির্বাচনে ভুল হবে না। আর, তোমার কন্যারও তো কোনও বিশেষ পুরুষের উপর টান নেই। আছে নাকি রেবতী?

রেবতী ঘাড় নেড়ে জানালেন যে নেই।

নারদ বললেন, তবে আর কি, অবিলম্বে ব্রহ্মলোকে যাত্রা কর। আমি এখন কুবেরের কাছে যাচ্ছি, তাঁকে বলব তোমাদের যাতায়াতের জন্য পুষ্পক রথটা পাঠিয়ে দেবেন।

রাজা করজোড়ে বললেন, দেবর্ষি, আপনিও আমাদের সঙ্গে চলুন, নইলে ভরসা পাব না।

নারদ বললেন, বেশ, আমি শীঘ্রই কুবেরপুরী থেকে রথ নিয়ে এখানে আসব, তার পর একসঙ্গে ব্রহ্মলোকে যাওয়া যাবে।

নারদ ফিরে এলে তাঁর সঙ্গে রৈবত-ককুদ্মী ও রেবতী পুষ্পক বিমানে ব্রহ্মলোকে যাত্রা করলেন। তখন হিমালয় এখনকার মতন উঁচু হয় নি, মাথায় সর্বদা বরফ জমে থাকত না। হিমালয়ের উত্তর দিকে সমুদ্রতুল্য বিশাল একটি হ্রদ ছিল। তাঁরা হিমালয় হেমকূট নিষধ প্রভৃতি পর্বতমালা এবং হৈমবত হরি ইলাবৃত প্রভৃতি বর্ষ অর্থাৎ বড় বড় দেশ অতিক্রম করে দুর্গম ব্রহ্মলোকে গিয়ে ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হলেন। সেই অলৌকিক সভার বিবরণ দেবার চেষ্টা করব না, মহাভারতে আছে যে তা অবর্ণনীয়, তার রূপ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয়।

নারদের সঙ্গে রৈবত আর রেবতী যখন ব্রহ্মসভায় প্রবেশ করলেন তখন সেখানে গীত বাদ্য নৃত্য চলছে। লোকপিতামহ ব্রহ্মা একটি উচ্চ বেদীতে রত্নময় সিংহাসনে বিরাজ করছেন তাঁর বামে ব্রহ্মাণী এবং চারি পাশে দক্ষ প্রচেতা সনৎকুমার অসিতদেবল প্রভৃতি মহাত্মা এবং আদিত্য রুদ্র বসু প্রভৃতি গণদেবতা বসে আছেন। দুই বিখ্যাত গন্ধর্ব কালোয়াত হাহা হূহূ অতিতান-রাগে মেঘগম্ভীর কণ্ঠে গান গাইছেন, অন্য দুই গন্ধর্ব তুম্বুরু ও ডুম্বুরু দুন্দুভি অর্থাৎ দামামা বাজাচ্ছেন। তখন মৃদঙ্গ আর বাঁয়া-তবলার সৃষ্টি হয়নি। দশজন বিদ্যাধর দশটি প্রকাণ্ড বীণায় ঝংকার দিচ্ছেন এবং উর্বশী রম্ভা মেনকা ঘৃতাচী প্রভৃতি অপ্সরার দল ঘুরে ঘুরে নৃত্য করছেন। একজন মহকায় দানব একটি অজগরতুল্য রামশিঙা কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং মাঝে মাঝে তাতে ফুঁ দিয়ে প্রচণ্ড নিনাদে শ্রোতাদের আনন্দ বর্ধন করছে। সভাস্থ সকলে তন্ময় হয়ে সংগীত-রস পান করছেন এবং ভাবের আবেশে মাথা দোলাচ্ছেন।

ব্রহ্মার উদ্দেশে প্রণাম করে নারদ নিঃশব্দে সনৎকুমারের কাছে গিয়ে বসলেন। একজন বেত্রধারিণী প্রতিহারী যক্ষী ঠোঁটে আঙুল দিয়ে রৈবত ও রেবতীর কাছে এল এবং ইঙ্গিত করে ডেকে নিয়ে তাঁদের সুখাসনে বসিয়ে দিলে।

একটু পরেই আব্রহ্ম-দেব-গন্ধর্ব-মানব প্রভৃতি সভাস্থ সকলে সবেগে মাথা আর হাত নেড়ে বলে উঠলেন—হা-হা-হাঃ! সাধু সাধু, অতি উত্তম! নৃত্যগীতবাদ্য নিবৃত্ত হল। ব্রহ্মা তখন রৈবত ও রেবতীর প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নিকটে আসবার জন্য সংকেত করলেন।

পিতা-পুত্রী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে ব্রহ্মা বললেন, রাজা, তোমার কন্যাটি তো দেখছি পরমা সুন্দরী, বড়ও হয়েছে, এর বিবাহ দাও নি কেন?

রৈবত বললেন, ভগবান, কন্যার বিবাহের জন্যই আপনার কাছে এসেছি। আমি অনেক

ভাল ভাল পাত্রের সন্ধান পেয়েছি, কিন্তু রেবতী কাকেও পছন্দ করছে না। কাশীরাজ তুন্দবর্ধন, গান্ধারপতি গণ্ডবিক্রম, ত্রিগর্তযুবরাজ কড়ম্ব, কোশলরাজকুমার অর্ভক, দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ—

ব্রহ্মা স্মিতমুখে ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন।

রৈবত বললেন, আপনিও কি এঁদের সুপাত্র মনে করেন না?

ব্রহ্মা বললেন, ওরা কেউ এখন জীবিত নেই, ওদের পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রাদিও গত হয়েছে।

—বলেন কি পিতামহ!

—হাঁ, সব পঞ্চত্ব পেয়েছে। তোমারও আত্মীয়-স্বজন কেউ জীবিত নেই।

মস্তকে করাঘাত করে রৈবত বললেন, হা হতোস্মি! ভগবান, আমার রাজ্যের আর সকলে কেমন আছে? মুখ্যমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে সমস্ত রেখে আপনার চরণদর্শনে এসেছি, এর মধ্যে অকস্মাৎ কোন দুর্বিপাকে আমার আত্মীয়বর্গ বিনষ্ট হল? আমার কোন্ পাপের এই পরিণাম?

ব্রহ্মা বললেন, মহারাজ, শান্ত হও। অকস্মাৎ বা তোমার পাপের ফলে কিছুই হয় নি, যথাবিধি কালবশে ঘটেছে। তোমার মন্ত্রী মিত্র ভৃত্য কলত্র বন্ধু প্রজা সৈন্য ধন কিছুই অবশিষ্ট নেই, কেবল তুমি আর তোমার কন্যা আছ।

আকুল হয়ে রৈবত বললেন, কিছুই বুঝতে পারছি না প্রভু। আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

ব্রহ্মা সহাস্যে বললেন, স্বপ্ন নয়, সবই সত্য। আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। জান তো, আমার এক অহোরাত্র হচ্ছে মানুষের ৮৬৪ কোটি বৎসর। আচ্ছা, তুমি এই সভায় কতক্ষণ এসেছ?

রৈবত একটু ভেবে বললেন, বেশীক্ষণ নয়, সওয়া দণ্ড হবে।

ব্রহ্মা বললেন, গণনা করে বল তো, আমার এই ব্রহ্মসভার সওয়া দণ্ডে নরলোকের কত বৎসর হয়?

মাথা চুলকে রৈবত বললেন, ভগবান, আমি গণিতশাস্ত্রে চিরকালই কাঁচা। দেবর্ষি নারদ যদি কৃপা করে অঙ্কটি কষে দেন—

নারদ বললেন, হরে মুরারে! অঙ্ক টঙ্ক আমার আসে না, ও হল নীচ গ্রহবিপ্রের কাজ। রেবতী, তুমি তো শুনেছি খুব বিদুষী, নানা বিদ্যা জান, বল না কত হয়।

রেবতী বললেন, পিতামহ ব্রহ্মার এক অহোরাত্রে অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় যদি মানুষের ৮৬৪ কোটি বৎসর হয়, তবে সওয়া দণ্ডে অর্থাৎ আধ ঘণ্টায় কত বৎসর হবে—এই তো? তা হল গিয়ে ১৮ কোটি বৎসর। ভগবান, ভুল হয়নি তো?

ব্রহ্মা বললেন, না না, ঠিক হয়েছে। মহারাজ, বুঝতে পারলে? তুমি যতক্ষণ এখানে সংগীত শুনছিলে ততক্ষণে নরলোকে আঠারো কোটি বৎসর কেটে গেছে। তোমরা সত্যযুগের গোড়ায় এসেছিলে তার পর বহু চতুর্যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। এখন যে চতুর্যুগ চলছে তারও সত্য ত্রেতা গত হয়েছে, দ্বাপরও গতপ্রায়, কলিযুগ আসন্ন।

শোকে অবসন্ন হয়ে রৈবত বললেন, ভগবান, আমার গতি কি হবে?

ব্রহ্মা উত্তর দিলেন, কি আবার হবে, তোমার ভাববার কিছু নেই। এখন ফিরে গিয়ে কন্যার বিবাহ দাও, তাহলে তুমি সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হবে। অমরাবতী তুল্য তোমার যে রাজধানী ছিল—কুশস্থলী, তার নাম এখন দ্বারকাপুরী হয়েছে, তা যাদবগণের অধিকারে আছে। পরমেশ্বর বিষ্ণু সম্প্রতি নরলোকে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং যাদববংশে জন্মগ্রহণ করে স্বকীয় অংশে বলদেবরূপে নরলীলা করছেন। সেই মায়ামানব বলদেবকে তোমার কন্যা দান কর। তিনি আর রেবতী সর্বাংশে পরস্পরের যোগ্য।

রৈবত বললেন, আপনার আদেশ শিরোধার্য, বলদেবকেই কন্যাদান করব। কিন্তু আমার গতি কি হবে প্রভু?

—আবার বলে গতি কি হবে! বৃদ্ধ হয়েছ, একমাত্র সন্তান রেবতীকে সৎপাত্রে দিচ্ছ, আর তোমার বেঁচে থেকে লাভ কি, রাজ্যেরই বা প্রয়োজন কি? তোমার রাজ্য তো রেবতীরই শ্বশুরবংশের অধিকারে আছে। মেয়ের বিবাহ দিয়ে তুমি সোজা ব্রহ্মলোকে ফিরে এস এবং সশরীরে আমার কাছে সুখে বাস কর। এর চাইতে আর কি সদ্‌গতি চাও?

রৈবত বললেন, তাই হবে প্রভু। কিন্তু দেবর্ষি নারদও আমার সঙ্গে মর্ত্যলোকে চলুন, আমি বড় অসহায় বোধ করছি।

নারদ বললেন, বেশ তো, আমি তোমার সঙ্গে যাব। কোনও চিন্তা করো না, রেবতীর বিবাহব্যাপারে আমি তোমাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করব।

ফেরবার সময় রৈবত ও রেবতী আকাশ থেকে দেখলেন, হিমালয়ের উত্তরে যেখানে নিম্নভূমি ছিল সেখানে অত্যুচ্চ মালভূমির উদ্ভব হয়েছে। যে জলরাশি ছিল তা শুকিয়ে বালুকাময় মরুভূমি হয়ে গেছে। হিমালয় আর ঢিপির মতন নেই, সুবিশাল অধিত্যকা আর উপত্যকায় তরঙ্গায়িত হয়েছে, শত শত চূড়া আকাশে উঠেছে, তার উপর দিক তুষারে আচ্ছন্ন, সেই তুষার সূর্যতাপে দ্রবীভূত হয়ে অসংখ্য নদীরূপে প্রবাহিত হচ্ছে। গাছপালাও আর আগের মতন নেই, জন্তুদের আকৃতিও বদলে গেছে। নারদ বুঝিয়ে দিলেন যে বিগত আঠারো কোটি বৎসরে ধীরে ধীরে এইসব প্রাকৃতিক পরিবর্তন ঘটেছে।

পুষ্পক রথ যখন রৈবত-ককুদ্মীর ভূতপূর্ব রাজ্যের নিকটে এল তখন নারদ বললেন, মহারাজ, লোকালয়ে নেমে কাজ নেই, লোকে তোমাদের রাক্ষস মনে করে গোলযোগ বাধাতে পারে।

রৈবত আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন, রাক্ষস মনে করবে কেন? কালক্রমে মানুষের বুদ্ধিও কি লোপ পেয়েছে?

নারদ বললেন, আমাকে দেখে কিছু বলবে না, কারণ আমার অণিমা প্রভৃতি যোগৈশ্বর্য আছে, ইচ্ছামত লম্বা কিংবা বেঁটে হয়ে জনসাধারণের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারি। কিন্তু তোমাদের তো সে শক্তি নেই।

কিছুই বুঝতে পারছি না দেবর্ষি। আবার কি নূতন সংকট উপস্থিত হল?

—নূতন কিছু হয় নি, সবই যুগপরিবর্তনের ফল। তোমরা সত্যযুগের গোড়ায় জন্মেছ, যুগলক্ষণ অনুসারে তুমি লম্বায় একুশ হাত। মেয়েরা পুরুষের চেয়ে একটু খাটো হয়, তাই রেবতী উনিশ হাত লম্বা। কিন্তু ও এখনও ছেলেমানুষ, পরে আরও আধ হাত বাড়বে।

—আপনি কি যা-তা বলছেন! আমার এই রাজদণ্ডটি ঠিক এক হাত। এই দিয়ে আমাকে মেপে দেখুন না, আমি লম্বায় বড় জোর চার হাত হব।

—তোমার হাতের মাপে তাই হতে পার বটে, কিন্তু সে মাপ ধরছি না। কলিযুগে মানুষের হাতের যে মাপ, সকল শাস্ত্রে তাই প্রামাণিক গণ্য হয়। সেই কলিযুগীয় মাপে তুমি একুশ হাত আর রেবতী উনিশ হাত লম্বা।

—তা হলেই বা ক্ষতি কি?

—সত্যযুগে মানুষ যেমন একুশ হাত লম্বা, তেমনি ত্রেতায় চোদ্দ হাত, দ্বাপরে সাত হাত, কলিতে সাড়ে তিন হাত। এখন নরলোকে দ্বাপরের অন্তিম দশা, কলিযুগ আসন্ন, [illegible] মানুষ খাটো হতে হতে চার হাতে দাঁড়িয়েছে, বড় জোর সওয়া চার হাত। এখানকার [illegible]

লোকরা যদি সহসা তোমাদের দেখে তবে রাক্ষস মনে করে ইট পাথর ছুড়বে। বিবাহের পূর্বে এরকম গোলযোগ হওয়া কি ভাল?

—আমাদের কি কর্তব্য আপনিই বলুন।

নারদ বললেন, নীচে ওই পাহাড়টি চিনতে পারছ?

রৈবত বললেন, হাঁ হাঁ খুব পারছি, ও তো আমারই প্রমোদগিরি, ওর উপরে নীচে অনেক উপবন আছে, রেবতী ওখানে বেড়াতে ভালবাসে।

—রাজা, তুমি কীর্তিমান। আঠারো কোটি বৎসর অতীত হয়েছে তথাপি লোকে তোমাকে ভোলে নি, তোমার নাম অনুসারে ওই পর্বতের নাম দিয়েছে রৈবতক। ওখানেই রথ নামানো হক। রেবতীর বিবাহ পর্যন্ত তুমি ওখানে গোপনে বাস কর।

একটু উত্তেজিত হয়ে রৈবত বললেন, লুকিয়ে থাকব কার ভয়ে? এ তো আমারই রাজ্য। আর, আপনিই তো বলেছেন এখানকার মানুষ অত্যন্ত ক্ষুদ্রকার। আমি একাই সকলকে যমালয়ে পাঠিয়ে নিজ রাজ্য অধিকার করব।

নারদ বললেন, মহারাজ রৈবত-ককুদ্মী, তুমি সার্থকনামা, একগুঁয়ে ষাঁড়ের মতন কথা বলছ, তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে। সকলকে মেরে ফেললে কাকে নিয়ে রাজত্ব করবে? তোমার ভাবী জামাতার বংশ ধ্বংস হলে রেবতীর বিবাহ কি করে হবে? ওসব কুবুদ্ধি ত্যাগ কর।

রৈবত বললেন, আমার মাথার মধ্যে সব গুলিয়ে গেছে। আপনি যা আজ্ঞা করবেন তাই পালন করব।

ইন্দ্রের দিব্য বিমানের একজন সারথি আছে—মাতলি। কুবেরের পুষ্পক রথ আরও উঁচু দরের, সারথির দরকার হয় না। রথটি সচেতন ও জ্ঞানবান, কথা বুঝতে পারে, বলতেও পারে। রামায়ণ উত্তরকাণ্ড দ্রষ্টব্য।

নারদ বললেন, বৎস পুষ্পক, তুমি যথাসম্ভব নিম্নমার্গে ওই রৈবতক পর্বত প্রদক্ষিণ করে ধীরে ধীরে উড়তে থাক। পুষ্পক 'যে-আজ্ঞে' বলে মণ্ডলাকারে চলতে লাগল। তিন বার প্রদক্ষিণের পর নারদ বললেন, আমার সব দেখা হয়েছে, এইবারে অবতরণ কর। পুষ্পক রথ ভূমিস্পর্শ করে স্থির হল।

সকলে নামলে নারদ বললেন, পর্বতের এই পশ্চিম দিকটি বেশ নির্জন, বাসের উপযুক্ত গুহাও আছে। তোমরা এখন এখানেই থাক। আমি বরের পিতা বসুদেবের কাছে যাচ্ছি, তাঁকে পিতামহ পদ্মযোনি ব্রহ্মার ইচ্ছা জানিয়ে বিবাহের প্রস্তাব করব। তোমরা স্নানাদি সেরে আহার ও বিশ্রাম কর। পিতামহী ব্রহ্মাণী প্রচুর খাদ্যসামগ্রী দিয়েছেন, শয্যাও রথে আছে, সেসব নামিয়ে নাও। আমি রথ নিয়ে যাচ্ছি, শীঘ্রই ফিরে আসব।

নারদ চলে গেলেন। স্নান ও আহারের পর রেবতী একটি গুহায় বিছানা পেতে বললেন, পিতা, আপনি বিশ্রাম করুন, আমি একটু বেড়িয়ে আসছি। রৈবত বললেন, তা বেড়াও গে, কিন্তু ফিরতে বেশী দেরি ক'রো না যেন।

রৈবতকের পাদবর্তী উপবনে বেড়াতে বেড়াতে রেবতী নিজের অদৃষ্টের বিষয় ভাবতে লাগলেন। তাঁর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে শুধু পিতা আছেন, বিবাহের পর তিনিও ব্রহ্মলোকে চলে যাবেন। যিনি রেবতীর একমাত্র ভাবী অবলম্বন, সেই বলদেব কেমন লোক? ব্রহ্মা যাঁকে নির্বাচন করেছেন তিনি কুপাত্র হতে পারেন না—এ বিশ্বাস তাঁর আছে। কিন্তু নারদ যা বলেছেন সে যে বড় ভয়ানক কথা। রেবতী উনিশ হাত লম্বা, পরে আরও একটু বাড়বেন।

কিন্তু তাঁর ভাবী স্বামী বলদেব যুগধর্ম অনুসারে নিশ্চয় খুব বেঁটে, বড় জোর সওয়া চার হাত, অর্থাৎ মানুষের তুলনায় যেমন বেরাল। এমন বিসদৃশ বেমানান বেয়াড়া দম্পতির কথা রেবতী কস্মিন্ কালে শোনেন নি। মাকড়সা-জাতির মধ্যে দেখা যায় বটে—স্ত্রীর তুলনায় পুরুষ অত্যন্ত ক্ষুদ্র। কিন্তু তার পরিণাম বড়ই করুণ, মিলনের পরেই স্ত্রী-মাকড়সা তার ক্ষুদ্র পতিটিকে ভক্ষণ করে ফেলে। ছি ছি, রেবতীর কপালে কি এই আছে? বরকন্যার এই বিশ্রী বৈষম্যের কথা কি সর্বজ্ঞ ব্রহ্মা আর নারদের খেয়াল হয় নি? দেবতা আর দেবর্ষি হলে কি হবে, দুজনেরই ভীমরতি ধরেছে।

রেবতী একটি বকুল গাছে হেলান দিয়ে অনেকক্ষণ ভাবতে লাগলেন। দুঃখে তাঁর কান্না এল। হঠাৎ পিছন দিকে মৃদু মর্মর শব্দ শুনে তিনি মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, একটি অতি ক্ষুদ্র মূর্তি হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। বর্ষার নূতন মেঘের ন্যায় তার কান্তি, কাঁধ পর্যন্ত ঝোলা গোছা গোছা কালো চুল সরু ফিতের মতন সোনার পাটি দিয়ে ঘেরা, তার এক পাশে একটি ময়ূরের পালক বাঁকা করে গোঁজা। পরনে বাসন্তী রঙের ধুতি, গায়েও সেই রঙের উত্তরীয়, গলায় আজানুলম্বিত বনমালা। অতি সুশ্রী সুঠাম কিশোর বিগ্রহ। রেবতী আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন, কে তুমি, মানুষ না পুতুল?

সহাস্যে নমস্কার করে সেই অদ্ভুত মূর্তিটি উত্তর দিলে, আমি আপনার আজ্ঞাবহ কিংকর।

—তোমার নাম কি, পরিচয় কি? কিজন্য এখানে এসেছ?

—আমার নাম কৃষ্ণ, আমি বসুদেবের পুত্র, বলদেবের অনুজ। আপনি আমার ভাবী জ্যেষ্ঠভ্রাতৃজায়া, পূজনীয়া বধূঠাকুরাণী, তাই প্রণাম করতে এসেছি।

অবজ্ঞা ও কৌতুক মিশ্রিত স্বরে রেবতী বললেন, আমাকে দেখে ভয় করছে না? শুনেছি তোমার দাদা নাকি একটি অবতার, নারায়ণের অংশে জন্মেছে। তুমিও অবতার নাকি?

কৃষ্ণ বললেন, আমি অত ভাগ্যবান নই, দশ অবতারের তালিকায় আমার নাম ওঠে নি। এখন আমার বার্তা শুনুন। দেবর্ষি নারদ আমার পিতার কাছে গিয়ে আপনার সঙ্গে বলদেবের বিবাহের প্রস্তাব করেছেন। পিতা পরমানন্দে সম্মত হয়েছেন। কালই বিবাহ। আমার অগ্রজ এখনই আপনার সঙ্গে আলাপ করতে আসবেন, সেই সুসংবাদ দেবার জন্য আমি তাঁর অগ্রদূত হয়ে এসেছি।

রেবতী প্রশ্ন করলেন, সম্পর্কে তুমি আমার কে হবে? শ্যালক?

কলহাস্য করে কৃষ্ণ বললেন, আপনি দেখছি নিতান্ত সেকেলে, কাকে কি বলতে হয় তাও জানেন না। পত্নীর ভ্রাতাই শ্যালক, পতির ভ্রাতাকে তা বলতে নেই। আমি আপনার দেবর। এই যে, দাদা এসে গেছেন।

রেবতী দেখলেন, তাঁর ভাবী স্বামী কৃষ্ণের চাইতে ঈষৎ লম্বা আর মোটা, রজতগিরিতুল্য শুভ্র কান্তি, চন্দনচর্চিত প্রশস্ত বক্ষ, বলিষ্ঠ বাহু, নীল চোখ, সিংহকেশরের মতন কটা রঙের চুল মুক্তামালা দিয়ে ঘেরা, তার এক পাশে একটি সারসের পালক গোঁজা। পরনে নীল ধুতি, গায়ে নীল উত্তরীয়, গলায় মল্লিকার মালা। কাঁধে বাঁশের লাঠি, তার উপর দিকে একটি সুমার্জিত লাঙ্গলের ফলা লাগানো, অস্তগামী সূর্যের কিরণে তা ঝকমক করছে।

দীর্ঘাঙ্গী রেবতী উনিশ হাত উঁচু থেকে তার ভাবী স্বামীকে যুগপৎ সতৃষ্ণ ও বিতৃষ্ণ নয়নে ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করলেন। হা বিধাতা, এই একরত্তি পুরুষ তাঁর বর! এত সুন্দর কিন্তু এত ক্ষুদ্র! রেবতী কোনও রকমে নিজেকে সামলে নিলেন এবং শিষ্টাচার স্মরণ করে নমস্কার জানালেন।

বলদেব স্মিতমুখে বললেন, ভদ্রে, আমাকে মনে ধরে?

রেবতী উত্তর দিলেন, শুনেছি আপনি একজন অবতার, নারায়ণের অংশে জন্মেছেন। আমার মতন সামান্যা নারী কি আপনার যোগ্য?

বলদেব বললেন, অর্থাৎ আমিই তোমার যোগ্য নই। তুমি অতিকায় মহামানবী, আমি ক্ষুদ্রদেহ মানবক। তুমি উচ্চ তালতরু, আমি তুচ্ছ এরণ্ড। তুমি তেতলা সমান উঁচু, আর আমি একটা উইঢিপি। রেবতী, তুমি ভাবছ আমি তোমার নাগাল পাব কি করে। দুশ্চিন্তা ত্যাগ কর, আমি এখনই তোমার যোগ্য হব।

এই বলে বলদেব একটু দূরে সরে দাঁড়ালেন এবং কাঁধ থেকে লাঙ্গলটি নামিয়ে তার দণ্ড ধরে বনবন করে ঘোরাতে লাগলেন। ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডটি লম্বা হতে লাগল। একটু পরে কৃষ্ণ বললেন, এই হয়েছে, আর ঘুরিও না দাদা। তখন বলদেব লাঙ্গলের ফলা রেবতীর কাঁধে আটকে বললেন, সুন্দরী, অপরাধ নিও না, এই লাঙ্গল আমার বাহুর প্রতিনিধি হয়ে তোমার কম্বুগ্রীবা আলিঙ্গন করছে।

রেবতী মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিশ্চল হয়ে রইলেন। বলদেব ধীরে ধীরে লাঙ্গলদণ্ড আকর্ষণ করলেন। সলতে টেনে নিলে প্রদীপের শিখা যেমন ক্রমশ ছোট হতে থাকে, রেবতীও সেইরকম ছোট হতে লাগলেন। কৃষ্ণ সতর্ক হয়ে দেখছিলেন। বলে উঠলেন, থাম থাম, আর নয়—এঃ দাদা, তুমি বড্ড বেশী টেনে ফেলেছ!

বলদেব লাঙ্গল নামিয়ে নিলেন। তার পর নিজের হাত দিয়ে রেবতীকে মেপে বললেন, তাই তো, করেছি কি, রেবতী তিন হাত হয়ে গেছে! আচ্ছা, এখনই ঠিক করে দিচ্ছি। এই বলে তিনি রেবতীকে তুলে ধরে বললেন, প্রিয়ে, আমার অপটুতা মার্জনা কর। তুমি এই বকুলশাখা অবলম্বন করে ক্ষণকাল ঝুলতে থাক।

রেবতীর তখন ভাববার শক্তি নেই। তিনি দু হাতে গাছের ডাল ধরে ঝুলতে লাগলেন, বলদেব তাঁর দুই পা ধরে ধীরে ধীরে টানতে লাগলেন। কৃষ্ণ বললেন, আর একটু—আর একটু—এইবারে থাম, ঠিক হয়েছে।

রেবতীকে নামিয়ে নিজের পাশে দাঁড় করিয়ে বলদেব সহাস্যে বললেন, কৃষ্ণ, বর বড় না কনে বড়?

কৃষ্ণ বললেন, লম্বায় কনে সাত আঙুল ছোট, কিন্তু মর্যাদায় তোমার চাইতে ঢের বড়, কারণ ইনি আঠারো কোটি বৎসর আগে জন্মেছেন। চমৎকার মানিয়েছে। এই বলে কৃষ্ণ দুজনকে প্রণাম করলেন।

নিকটে একটি ছোট জলাশয় ছিল। রেবতীকে তার ধারে এনে যুগল মূর্তির প্রতিবিম্ব দেখিয়ে বলদেব বললেন, রেবতী, দেখ তো, এইবারে আমি তোমার যোগ্য হয়েছি কিনা। এখন মনে ধরেছে কি?

রেবতী বললেন, মনে না ধরলেই বা উপায় কি। অবতার না আরও কিছু! দুই ভাই দুটি ডাকাত। তোমাদের মতলব আগে টের পেলে আমিই দুজনকে টেনে লম্বা করে দিতুম।

তার পর মহাসমারোহে রেবতী-বলদেবের বিবাহ হয়ে গেল। রৈবত-ককুদ্মী বরকন্যাকে আশীর্বাদ করে নারদের সঙ্গে ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করলেন।

১৩৫৮ (১৯৫১)

লক্ষ্মীর বাহন

সাত বৎসর পরে মুচুকুন্দ রায় আলিপুর জেল থেকে খালাস পেলেন? তাঁকে নিতে এলেন শুধু তাঁর শালা তারাপদবাবু; দুই ছেলের কেউ আসে নি। মুচুকুন্দ যদি বিপ্লবী বা কংগ্রেসী আসামী হতেন তবে ফটকের সামনে আজ অভিনন্দনকারীর ভিড় লেগে যেত, ফুলের মালা চন্দনের ফোঁটা জয়ধ্বনি—কিছুরই অভাব হত না। যদি তিনি জেলে যাবার আগে প্রচুর টাকা সরিয়ে রাখতে পারতেন, উকিল ব্যারিস্টার যদি তাঁকে চুষে না ফেলত, তা হলে অন্তত আত্মীয় বন্ধুরা অনেকে আসতেন। কিন্তু নিঃস্ব অরাজনীতিক জেল-ফেরত লোককে কেউ দেখতে চায় না। ভালই হল, মুচুকুন্দবাবু মুখ দেখাবার লজ্জা থেকে বেঁচে গেলেন। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি বাড়ি গেলেন না; কারণ বাড়িই নেই, বিক্রি হয়ে গেছে। তিনি তাঁর শালার সঙ্গে একটা ভাড়াটে গাড়িতে চড়ে সোজা হাওড়া স্টেশনে এলেন; সেখানে তাঁর স্ত্রী মাতঙ্গী দেবী অপেক্ষা করছিলেন। তার পর দুপুরের ট্রেনে তাঁরা কাশী রওনা হলেন। অতঃপর স্বামী-স্ত্রী সেখানেই বাস করবেন; মাতঙ্গী দেবীর হাতে যে টাকা আছে, তাতেই কোনও রকমে চলে যাবে।

মুচুকুন্দবাবুর এই পরিণাম কেন হল? এ দেশের অসংখ্য কৃতকর্মা চতুর লোকের যে নীতি মুচুকুন্দরও তাই ছিল। যুধিষ্ঠির বোধ হয় একেই মহাজনের পন্থা বলেছেন। এঁদের একটি অলিখিত ধর্মশাস্ত্র আছে; তাতে বলে, বৃহৎ কাষ্ঠে যেমন সংসর্গদোষ হয় না তেমনি বৃহৎ বা বহুজনের ব্যাপারে অনাচার করলে অধর্ম হয় না। রাম শ্যাম যদুকে ঠকানো অন্যায় হতে পারে, কিন্তু গভর্নমেণ্ট মিউনিসিপ্যালিটি রেলওয়ে বা জনসাধারণকে ঠকালে সাধুতার হানি হয় না। যদিই বা কিঞ্চিৎ অপরাধ হয় তবে ধর্মকর্ম আর লোকহিতার্থে কিছু দান করলে সহজেই তা খণ্ডন করা যেতে পারে। বণিকের একটি নাম সাধু, পাকা ব্যবসাদার মাত্রেই পাকা সাধু। মুচুকুন্দর দুর্ভাগ্য এই যে তিনি শেষরক্ষা করতে পারেন নি, দৈব তাঁর পিছনে লেগেছিল।

দুর্দশাগ্রস্ত মুচুকুন্দবাবু আজকাল কি করছেন তা জানবার আগ্রহ কারও থাকতে পারে না। কিন্তু এককালে তাঁর খুঁটিনাটি সমস্ত খবরের জন্য লোকে উৎসুক হয়ে থাকত, তাঁর নাম-ডাকের সীমা ছিল না। প্রাতঃস্মরণীয় রাজর্ষি মুচুকুন্দ, ভারতজ্যোতি বঙ্গচন্দ্র কলিকাতা-ভূষণ মুচুকুন্দ—এইসব কথা ভক্তদের মুখে শোনা যেত। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতরা বলতেন, ধন্য শ্রীমুচুকুন্দ, যাঁর কীর্তিতে কুল পবিত্র হয়েছে, জননী কৃতার্থা হয়েছেন, বসুন্ধরা পুণ্যবতী হয়েছেন। বিজ্ঞ লোকেরা বলতেন, বাহাদুর বটে মুচুকুন্দ, কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, মুসলিম লীগ আর গভর্নমেণ্ট সর্বত্র ওঁর খাতির; ভদ্রলোক বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন, উনি একাই সমস্ত মারোয়াড়ী গুজরাটী পারসী আর পঞ্জাবীর কান কাটতে পারেন, লাট মন্ত্রী পুলিস—সবাই ওঁর মুঠোর মধ্যে। বকাটে ছেলেরা বলত, মুচুর মতন মানুষ হয় না মাইরি চাইবামাত্র আমাদের সর্বজনীনের জন্য পাঁচ শ টাকা ঝড়াক্‌সে ঝেড়ে দিলে। সেই আট-দশ বৎসর আগেকার খ্যাতনামা উদ্‌যোগী পুরুষসিংহের কথা এখন বলছি।

মুচুকুন্দ রায়ের প্রকাণ্ড বাড়ি, প্রকাণ্ড মোটর, প্রকাণ্ড পত্নী। তিনি নিজে একটু বেঁটে আর পেট-মোটা, কিন্তু তার জন্য তাঁর আত্মসম্মানের হানি হয় নি; বন্ধুরা বলতেন, তাঁর চেহারার সঙ্গে নেপোলিয়নের খুব মিল আছে। ইংরেজ জার্মান মার্কিন প্রভৃতির খ্যাতি শোনা যায় যে তারা সব কাজ নিয়ম অনুসারে করে, কিন্তু মুচুকুন্দ তাদের হারিয়ে দিয়েছেন। সদ্য অয়েল করা দামী ঘড়ির মতন সুনিয়ন্ত্রিত মসৃণ গতিতে তাঁর জীবনযাত্রা নির্বাহ হয়। অন্তরঙ্গ বন্ধুরা পরিহাস করে বলেন, তাঁর কাছে দাঁড়ালে টিকটিক শব্দ শোনা যায়। আরও আশ্চর্য এই যে, ইহকাল আর পরকাল দুদিকেই তাঁর সমান নজর আছে, তবে ধর্মকর্ম সম্বন্ধে তিনি নিজে মাথা ঘামান না, তাঁর পত্নীর আজ্ঞাই পালন করেন।

প্রত্যহ ভোর পাঁচটার সময় মুচুকুন্দর ঘুম ভাঙে, সেই সময় একজন মাইনে করা বৈরাগী রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাঁকে পাঁচ মিনিট হরিনাম শোনায়। তার পর প্রাতঃকৃত্য সারা হলে একজন ডাক্তার তাঁর নাড়ীর গতি আর ব্লাডপ্রেশার দেখে বলে দেন আজ সমস্ত দিনে তিনি কতখানি ক্যালরি প্রোটিন ভাইটামিন প্রভৃতি উদরস্থ করবেন এবং কতটা পরিশ্রম করবেন। সাতটা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত পুরুত ঠাকুর চণ্ডীপাঠ করেন, মুচুকুন্দ কাগজ পড়তে পড়তে চা খেতে খেতে তা শোনেন। তার পর নানা লোক এসে তাঁর নানা রকম ছোটোখাটো বেনামী কারবারের রিপোর্ট দেয়। যেমন—রিকশ, ট্যাক্সি, লরি, হোটেল, দেশী মদের এবং আফিম গাঁজা ভাং চরসের দোকান ইত্যাদি। বেলা নটার সময় একজন মেদিনীপুরী নাপিত তাঁকে কামিয়ে দেয়, তারপর দুজন বেনারসী হাজাম তাঁকে তেল মাখিয়ে আপাদমস্তক চটকে দেয়, যাকে বলে দলাই-মলাই বা মাসাঝ। দশটার সময় একজন ছোকরা ডাক্তার তাঁর প্রস্রাব পরীক্ষা করে ইনসুলিন ইঞ্জেকশন দেয়। তার পর মুচুকুন্দ চর্ব-চুষ্য-লেহ্য-পেয় ভোজন করে বিশ্রাম করেন এবং পৌনে বারোটায় প্রকাণ্ড মোটরে চড়ে তাঁর অফিসে হাজির হন।

বড় বড় ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজ মুচুকুন্দ তাঁর অফিসেই নির্বাহ করেন। অনেক লিমিটেড কম্পানির ম্যানেজিং এজেন্সি তাঁর হাতে, কাপড়-কল, চট-কল, চা-বাগান, কয়লার খনি, ব্যাংক, ইনশিওরেন্স ইত্যাদি; তা ছাড়া তিনি কনট্রাক্টারিও করেন। কাজ শেষ হলে তিনি মোটরে চড়ে একটু বেড়ান এবং ঠিক ছটার সময় বাড়িতে ফেরেন। তারপর কিঞ্চিৎ জলযোগ করে তাঁর ড্রইংরুমে ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়েন। তাঁর অনুগত বন্ধু আর হিতৈষীরাও একে একে উপস্থিত হন। এই সময় ভক্তিরত্ন মশাই আধ ঘণ্টা ভাগবত পাঠ করেন, মুচুকুন্দ গল্প করতে করতে তা শোনেন।

মুচুকুন্দর ধনভাগ্য যশোভাগ্য পত্নীভাগ্য সবই ভাল, কিন্তু ছেলে দুটো তাঁকে নিরাশ করেছে। বড় ছেলে লখা (ভাল নাম লক্ষ্মীনাথ) কুসঙ্গে পড়ে অধঃপাতে গেছে, দুবেলা বাড়িতে এসে তার মায়ের কাছে খেয়ে যায়, তার পর দিন রাত কোথায় থাকে কেউ জানে না। মুচুকুন্দ বলেন, ব্যাটা পয়লা নম্বর গর্ভস্রাব। ছোট ছেলে সরা (ভাল নাম সরস্বতীনাথ) লেখাপড়া শিখেছে, কিন্তু কলেজ ছেড়েই ঝাঁকড়া চুল আর জুলফি রেখে আল্ট্রা-আধুনিক সুপার-দুর্বোধ্য কবিতা লিখছে। অনেক চেষ্টা করেও মুচুকুন্দ তাকে অফিসের কাজ শেখাতে পারেন নি, অবশেষে হতাশ হয়ে বলেছেন, যা ব্যাটা দুনম্বর গর্ভস্রাব, কবিতা চুষেই তোকে পেট ভরাতে হবে। মুচুকুন্দর শালা তারাপদই তাঁর প্রধান সহায়, একটু বোকা, কিন্তু বিশ্বস্ত কাজের লোক।

মুচুকুন্দ-গৃহিণী মাতঙ্গী দেবী লম্বা-চওড়া বিরাট মহিলা (হিংসুটে মেয়েরা বলে একখানা একগাড়ি মহিলা), যেমন কর্মিষ্ঠা তেমনি ধর্মিষ্ঠা। আধুনিক ফ্যাশন আর চাল-চলন তিনি দুচক্ষে দেখতে পারেন না। ধর্মকর্ম ছাড়া তাঁর অন্য কোনও শখ নেই, কেবল নিমন্ত্রণে যাবার সময় এক গা ভারী ভারী গহনা আর ন্যাপথলিনবাসিত বেনারসী পরেন।

তিনি স্বামীর সব কাজের খবর রাখেন এবং ধনবৃদ্ধি পাপক্ষয় যাতে সমান তালে চলে সে বিষয়ে সতর্ক থাকেন। মুচুকুন্দ যদি অর্থের জন্য কোনও কুকর্ম করেন তবে মাতঙ্গী বাধা দেন না, কিন্তু পাপ খণ্ডনের জন্য স্বামীকে গঙ্গাস্নান করিয়ে আনেন, তেমন তেমন হলে স্বস্ত্যয়ন আর ব্রাহ্মণভোজনও করান। মুচুকুন্দর অট্টালিকায় বার মাসে তের পার্বণ হয়, পুরুত ঠাকুরের জিম্মায় গৃহদেবতা নারায়ণশিলাও আছেন। কিন্তু মাতঙ্গীর সবচেয়ে ভক্তি লক্ষ্মীদেবীর উপর। তাঁর পুজোর ঘরটি বেশ বড়, মারবেলের মেঝে, দেওয়ালে নকশা-কাটা মিনটন টালি, লক্ষ্মীর চৌকির উপর আলপনাটি একজন বিখ্যাত চিত্রকরের আঁকা। ঘরের চারিদিকের দেওয়ালে অনেক দেবদেবীর ছবি ঝুলছে এবং উঁচু বেদীর উপর একটি রুপোর তৈরী মাদ্রাজী লক্ষ্মীমূর্তি আছে। মাতঙ্গী রোজ এই ঘরে পুজো করেন, বৃহস্পতিবারে একটু ঘটা করে করেন। সম্প্রতি তাঁর স্বামীর কারবার তেমন ভাল চলছে না সেজন্য মাতঙ্গী পুজোর আড়ম্বর বাড়িয়ে দিয়েছেন।

আজ কোজাগর পূর্ণিমা, মুচুকুন্দ সব কাজ ছেড়ে দিয়ে সহধর্মিণীর সঙ্গে ব্রতপালন করছেন। সমস্ত রাত দুজনে লক্ষ্মীর ঘরে থাকবেন, মাতঙ্গী মোটেই ঘুমুবেন না, স্বামীকেও কড়া কফি আর চুরুট খাইয়ে জাগিয়ে রাখবেন। শাস্ত্রমতে এই রাত্রে জুয়া খেলতে হয় সে জন্য মাতঙ্গী পাশা খেলার সরঞ্জাম আর বাজি রাখবার জন্য শ-খানিক টাকা নিয়ে বসেছেন। মুচুকুন্দ নিতান্ত অনিচ্ছায় পাশা খেলছেন, ঘন ঘন হাই তুলছেন আর মাঝে মাঝে কফি খাচ্ছেন।

রাত বারটার সময় পূর্ণিমার চাঁদ আকাশের মাথার উপর উঠল। ঘরে পাঁচটা ঘিএর প্রদীপ জ্বলছে এবং খোলা জানালা দিয়ে প্রচুর জ্যোৎস্না আসছে। মুচুকুন্দ আর মাতঙ্গী দেখলেন, জানালার বাইরে একটা বড় পাখি নিঃশব্দে ঘুরে ঘুরে উড়ে বেড়াচ্ছে, তার ডানায় চাঁদের আলো পড়ে ঝকমক করে উঠছে। মাতঙ্গী জিজ্ঞাসা করলেন, কি পাখি ওটা? মুচুকুন্দ বললেন, পেঁচা মনে হচ্ছে। পাখিটা হঠাৎ হুহু-হুম হুহু-হুম শব্দ করে ঘরে ঢুকে লক্ষ্মীর মূর্তির নীচে স্থির হয়ে বসল। মুচুকুন্দ তাড়াতে যাচ্ছিলেন, মাতঙ্গী তাঁকে থামিয়ে বললেন, খবরদার, অমন কাজ ক'রো না, দেখছ না মা-লক্ষ্মীর বাহন এসেছেন। এই বলে তিনি গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করলেন, তাঁর দেখাদেখি মুচুকুন্দও করলেন। পেঁচা মাথা নেড়ে মাঝে মাঝে হুহু-হুম শব্দ করতে লাগল।

লক্ষ্মী পেঁচা তাতে সন্দেহ নেই, কারণ মুখটি সাদা, পিঠে সাদার উপর ঘোর খয়েরী রঙের ছিট। কাল পেঁচা নয়, কুটুরে পেঁচাও নয়, যদিও আওয়াজ কতকটা সেই রকম। পেঁচার ডাক সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মতভেদ আছে। সংস্কৃতে বলে ঘুৎকার, ইংরেজীতে বলে হুট। শেকস্পীয়ার লিখেছেন, টু হুইট টু হু। মদনমোহন তর্কালংকার তাঁর শিশুশিক্ষায় লিখেছেন, ছোট ছেলের কান্নার মতন। যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে কাল পেঁচা কুক-কুক-কুক অথবা করুণ শব্দ করে, কুটুরে পেঁচা কেচা-কেচা-কেচা রব করে, হুতুম পেঁচা হুউম-হুউম করে। লক্ষ্মী পেঁচার বুলি তিনি লেখেন নি। মুচুকুন্দর গৃহাগত পেঁচাটির ডাক শুনে মনে হয় যেন দেওয়ালের ফুটো দিয়ে ঝড়ো হাওয়া বইছে।

মাতঙ্গী একটি রুপোর রেকাবিতে কিছু লক্ষ্মীপুজোর প্রসাদ রেখে পেঁচাকে নিবেদন করলেন। অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করে পেঁচা একটু ক্ষীর আর ছানা খেলে, বাদাম পেস্তা আঙুর ছুঁলে না। মুচুকুন্দ বললেন, মাংসাশী প্রাণী, যদি পুষতে চাও তো আমিষ খাওয়াতে হবে। মাতঙ্গী বললেন, কাল থেকে মাগুর মাছ আর কচি পাঁঠার ব্যবস্থা করব।

পেঁচা মহা সমাদরে বাড়িতেই রয়ে গেল। মুচুকুন্দ তাকে কাকাতুয়ার মতন দাঁড়ে বসাবেন স্থির করে পায়ে রুপোর শিকল বাঁধতে গেলেন, কিন্তু লক্ষ্মীর বাহন চিৎকার করে তাঁর হাতে ঠুকরে দিলে। তার পর থেকে সে যথেচ্ছাচারী মহামান্য কুটুম্বের মতন বাস করতে লাগল। লক্ষ্মীপুজোর ঘরেই সে সাধারণত থাকে, তবে মাঝে মাঝে অন্য ঘরেও যায় এবং রাত্রে অনেকক্ষণ বাইরে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু পালাবার চেষ্টা মোটেই করে না। বাড়ির চাকররা খুশী নয়, কারণ পেঁচা সব ঘর নোংরা করছে। মাতঙ্গী সবাইকে শাসিয়ে দিয়েছেন —খবরদার, পেঁচাবাবাকে যে গাল দেবে তাকে ঝাঁটা মেরে বিদেয় করব।

পেঁচার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মুচুকুন্দবাবুর কারবারের উন্নতি দেখা গেল। বার-তের বৎসর আগে তিনি তাঁর দূর সম্পর্কের ভাই পঞ্চানন চৌধুরীর সঙ্গে কনট্রাকটারি আরম্ভ করেন। যুদ্ধ বাধলে এঁরা বিস্তর গরু ভেড়া ছাগল শুওর এবং চাল ডাল ঘি তেল ইত্যাদি সরবরাহের অর্ডার পান, তাতে বহু লক্ষ টাকা লাভও করেন। তার পর দুজনের ঝগড়া হয়, এখন পঞ্চানন আলাদা হয়ে শেঠ কৃপারাম কচালুর সঙ্গে কাজ করছেন। গত বৎসর মুচুকুন্দ মিলিটারি ঠিকাদারিতে সুবিধা করতে পারেন নি, কৃপারাম আর পঞ্চাননই সমস্ত বড় বড় অর্ডার বাগিয়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, পেঁচা আসবার পরদিনই মুচুকুন্দ টেলিগ্রাম পেলেন যে তাঁর দশ হাজার মন ঘিএর টেণ্ডারটি মঞ্জুর হয়েছে।

এখন আর কোনও সন্দেহ রইল না যে মা-লক্ষ্মী প্রসন্ন হয়ে স্বয়ং তাঁর বাহনটিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, যতদিন মুচুকুন্দ তার পক্ষপুটের আশ্রয়ে থাকবেন ততদিন কৃপারাম আর পঞ্চানন কোনও অনিষ্ট করতে পারবে না।

তিনদিন পরে কৃপারাম কচালু সকালবেলা মুচুকুন্দবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। মুচুকুন্দ বললেন, আসুন আসুন শেঠজী, আজ আমার কি সৌভাগ্য যে আপনার দর্শন পেলুম। হুকুম করুন কি করতে হবে।

কাষ্ঠ হাসি হেসে কৃপারাম বললেন, আপনাকে হুকুম করবার আমি কে বাবুসাহেব, আপনি হচ্ছেন কলকত্তা শহরের মাথা। আমি এসেছি খবর জানতে। আপনার এখানে একটি উল্লু আছে?

মুচুকুন্দ বললেন, উল্লুক? একটি কেন, দুটি আছে, আমার ছেলে দুটোর কথা বলছেন তো?

—আরে রাম কহ। উল্লুক নয় উল্লু, যাকে বলে পেঁচ।

—ইস্ক্রুপ? সে তো হার্ডওয়ারের দোকানে দেদার পাবেন।

—আঃ হা, সে পেঁচ নয়, চিড়িয়া পেঁচ, তাকেই আমার উল্লু বলি, রাত্রে চুপচাপ উড়ে বেড়ায়, চুহা কবুতর মেরে খায়।

—ও, পেঁচা! তাই বলুন। হাঁ, একটি পেঁচা কদিন থেকে এখানে দেখছি বটে।

কৃপারাম হাতজোড় করে বললেন, বাবুসাহেব, ওই পেঁচা আমার পোষা, শ্রীমতীজী—মানে আমার ঘরবালী—ওকে খুব পিয়ার করেন। আপনি রেখে কি করবেন, আমার চিড়িয়া আমাকে দিয়ে দিন।

মুচুকুন্দ চোখ কপালে তুলে বললেন, আপনার পোষা চিড়িয়া। তবে এখানে এল কি করে? পিঁজরায় রাখতেন না?

—ও পিঁজরায় থাকে না বাবুজী। এক বছর আগে আমার বাড়িতে ছাতে এসেছিল, সেখানে একটা কবুতরকে মার ডাললে। আমি তাড়া করলে আমার কোঠির হাথায় যে আমগাছ

আছে তাতে চড়ে বসল। সেখানেই থাকত, শ্রীমতীজী তাকে খানা দিতেন। সেখান থেকে এখানে পালিয়ে এসেছে। এখন দয়া করে আমাকে দিয়ে দিন।

মুচুকুন্দবাবু সহাস্যে বললেন, শেঠজী, মহাত্মা গান্ধী স্বাধীনতার জন্য এত লড়ছেন তবু এখনও আমরা ইংরেজের গোলাম হয়ে আছি। কিন্তু জংলী পাখি কারও গোলাম নয়। ওই পেঁচা মর্জি মাফিক কিছুদিন আপনার আমগাছে ছিল, এখন আমার বাড়িতে এসেছে। ও কারও পোষা নয়, স্বাধীন পক্ষী, আজাদ চিড়িয়া। দু-দিন পরে হয়তো তেলারাম পিছল-চাঁদের গদিতে যাবে, আবার সেখান থেকে আলিভাই সালেজীর কোঠিতে হাজির হবে। ও পেঁচার উপর মায়া করবেন না।

কৃপারাম রেগে গিয়ে বললেন, আপনি ফিরত দিবেন না?

মুচুকুন্দ মধুর স্বরে উত্তর দিলেন, আমি ফেরত দেবার কে শেঠজী? মালিক তো পরমাৎমা, তিনিই তামাম জানোয়ারকে চালাচ্ছেন।

—তবে তো আদালতে যেতে হবে।

—তা যেতে পারেন। আদালত যদি বলে যে ওই জংলী পেঁচা আপনার সম্পত্তি তবে বেলিফ পাঠিয়ে ধরে নিয়ে যাবেন।

মুচুকুন্দ রায়ের বাড়ি থেকে পঞ্চানন চৌধুরীর বাড়ি বেশী দূরে নয়। কৃপারাম সেখানে উপস্থিত হলেন। পঞ্চানন বললেন, নমস্কার শেঠজী, অসময়ে কি মনে করে? খবর সব ভাল তো?

কৃপারাম বললেন, ভাল আর কোথা পঞ্চু ভাই, ঘিএর কনট্রাক্ট তো বিলকুল মুচুবাবু পেয়ে গেলেন। আমার আশা ছিল যে কম-সে-কম চার লাখ মুনাফা হবে, আমার তিন লাখ তোমার এক লাখ থাকবে, তা হল না। এখন শুন পঞ্চুবাবু, তোমাকে একটি কাম করতে হবে। একটি উল্লু—তোমরা যাকে বল পেঁচা—আমার কোঠি থেকে পালিয়ে মুচুকুন্দবাবুর কোঠিতে গেছে। তিনি ফিরত দিতে চাচ্ছেন না। ছিনিয়ে আনতে হবে।

পঞ্চানন বললেন, পেঁচার আপনার কি দরকার?

—বহুত ভাল পেঁচা, আমার ঘরবালীর খুব পেয়ারের পেঁচা। তাঁর এক বঙ্গালিন সহেলী আছেন, তিনি বলেছেন পেঁচাটি হচ্ছে লছমী মায়ের সওয়ারি অসলী লক্ষ্মী পেঁচা। এই পেঁচার আশীর্বাদেই তো পরসাল আমাদের কনট্রাক্ট মিলেছিল। আবার যেমনি সে মুচুকুন্দ-বাবুর কাছে গেল অমনি তিনি ঘিএর অর্ডার পেয়ে গেলেন।

—বটে! তা হলে তো পেঁচাটিকে উদ্ধার করতেই হবে। আপনি মুচুকুন্দর নামে নালিশ ঠুকে দিন।

—নালিশে কিছু হবে না, পেঁচা তো পিঁজরায় ছিল না, আমার কোঠির হাথায় আমগাছে থাকত। তুমি দুসরা মতলব কর, যেমন করে পার পেঁচাকে আমার কাছে পেঁছে দাও, খরচ যা লাগে আমি দিব।

পঞ্চানন একটু ভেবে বললেন, শক্ত কাজ, সময় লাগবে, হাজার দু-হাজার খরচও পড়তে পারে।

—খরচের জন্য ভেবো না, পেঁচা আমার চাই। কিন্তু দেরি করবে না, আবার তো এক মাসের মধ্যেই একটি বড় টেণ্ডার দিতে হবে।

পঞ্চানন বললেন, আচ্ছা, আপনি ভাববেন না, যত শীঘ্র পারি পেঁচাটিকে আমি উদ্ধার করব।

মুচুকুন্দর বড় ছেলে লখা ছেলেবেলায় পঞ্চুকাকার খুব অনুগত ছিল, এখনও তাঁকে একটু খাতির করে। পঞ্চানন তার গতিবিধির খবর রাখেন, রাত নটায় যখন সে খাওয়ার পর বাড়ি থেকে চুপি চুপি বেরুচ্ছে তখন তাকে ধরলেন। লখাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসে বললেন, বাবা লখু, তোমাকে একটি কাজ করতে হবে, তার জন্যে অনেক টাকা পাবে। এই নাও আগাম পঞ্চাশ টাকা এখনই দিচ্ছি, কাজ হাসিল হলে আরও দেব।

টাকা পকেটে পুরে লখা বললে, কি কাজ পঞ্চুকাকা?

পঞ্চানন লখার কাঁধে একটি আঙুল ঠেকিয়ে চোখ টিপে কণ্ঠস্বর নীচু করে বললেন, খুব লুকিয়ে কাজটি উদ্ধার করতে হবে বাবা, কেউ যেন টের না পায়।

—বাবার লোহার আলমারি ভাঙতে হবে?

—আরে না না। অমন অন্যায় কাজ আমি করতে বলব কেন। তোমাদের বাড়িতে একটা পেঁচা আছে না? সেটা আমার চাই; চুপি চুপি ধরে আনতে হবে যেন না চেঁচায়, তাহলে সবাই জেনে ফেলবে।

লখা বললে, মা বলে ওটা লক্ষ্মী পেঁচা, খুব পয়মন্ত। যদি অন্য পেঁচা ধরে এনে দিই তাতে চলবে না?

—উঁহু, ওই পেঁচাটিই দরকার। আমার গুরুদেব অঘোরী বাবা চেয়েছেন, কি এক তান্ত্রিক সাধনা করবেন। যে-সে পেঁচায় চলবে না, তোমাদের বাড়ির পেঁচাটিরই শাস্ত্রোক্ত সব লক্ষণ আছে। পারবে না লখু?

কিছুক্ষণ ভেবে লখা বললে, তা আমি পারব, কিন্তু দিন দশ-বার দেরি হবে, পেঁচাটাকে আগে বশ করতে হবে। এখন তো ব্যাটা আমাকে দেখলেই ঠোকরাতে আসে। কত টাকা দেবেন?

—পঞ্চাশ দিয়েছি, পেঁচা আনলে আরও পঞ্চাশ দেব।

—তাতে কিছুই হবে না, অন্তত আরও পাঁচ-শ চাই। তা ছাড়া কোকেনের জন্য শ-খানিক। দারোয়ানটাকেও ঘুষ দিতে হবে, নইলে বাবাকে বলে দেবে।

—কোকেন কি হবে, তুমি খাও নাকি?

—রাম বল, ভদ্রলোকে কোকেন খায় না। আমার জন্য নয়, ওই পেঁচাটাকে কোকেন ধরিয়ে বশ করতে হবে, তবে তাকে আনতে পারব।

অনেক দর কষাকষির পর রফা হল যে পেঁচা পঞ্চাননের হস্তগত হলে লখা আরও আড়াই শ টাকা পাবে।

কৃপারাম নিজে এসে বা টেলিফোন করে রোজ খবর নিতে লাগলেন পেঁচা এল কিনা। পঞ্চানন তাঁকে বললেন, অত ব্যস্ত হবেন না, জানাজানি হয়ে যাবে। এলেই আপনাকে খবর দেব, আপনি নিজে এসে নিয়ে যাবেন।

দশ দিন পরে রাত এগারটার সময় লখা একটা রিক্‌শয় চড়ে পঞ্চাননের বাড়িতে এল। তার সঙ্গে একটি ঝুড়ি, কাপড় দিয়ে মোড়া। পঞ্চানন অত্যন্ত খুশী হয়ে মালসমেত লখাকে নিজের অফিস-ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজায় খিল দিলেন। কাপড় সরিয়ে নিলে দেখা গেল পেঁচা বুঁদ হয়ে চুপ করে বসে আছে।

লখা বললে, শুনুন পঞ্চুকাকা, এটাকে দিনের বেলায় ঘরে বন্ধ করে রাখবেন, কিন্তু রাত্রে ছেড়ে দেবেন, ও ইঁদুর পাখির ছানা এইসব ধরে খাবে, নইলে বাঁচবে না। আর এই শিশিটা রাখুন, এতে পাঁচ শ ভাগ চিনির সঙ্গে এক ভাগ কোকেন মিশানো আছে। রোজ

বিকেলে চারটের সময় পেঁচাকে অল্প এক চিমটি খেতে দেবেন। একটা ছোট রেকাবিতে রেখে নিজের হাতে ওর সামনে ধরবেন, তা হলেই খুঁটে খুঁটে খাবে। যেখানেই থাকুক রোজ মৌতাতের সময় ঠিক আপনার কাছে হাজির হবে।

পঞ্চানন মুগ্ধ হয়ে বললেন, উঃ লখু, তোমার কি বুদ্ধি বাবা! কোকেন ধরালে পেঁচা আর কারও ব্যাড় যাবে না, কি বল?

লখা বললে, যাবার সাধ্য কি, ও চিরকাল আপনার গোলাম হয়ে থাকবে।

বারো দিন হয়ে গেল তবু পেঁচার কোনও খবর আসছে না দেখে কৃপারাম উদ্বিগ্ন হয়ে পঞ্চাননের বাড়ি এলেন। পঞ্চানন জানালেন, অনেক হাঙ্গামা আর খরচ করে তিনি পেঁচাটিকে হস্তগত করতে পেরেছেন।

কৃপারাম উৎফুল্ল হয়ে বললেন, বাহবা পঞ্চু ভাই! এনে দাও, এনে দাও, আমি এখনই মোটরে করে নিয়ে যাব। খরচ কত পড়েছে বল, আমি চেক লিখে দিচ্ছি।

পঞ্চানন একটু চুপ করে থেকে বললেন খরচ বিস্তর লাগবে।

--কত? পাঁচ শ? হাজার?

--উঁহু ঢের বেশী।

--বল না কত।

পঞ্চানন আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, শুনুন শেঠজী—লাখ পেঁচার মধ্যে একটি লক্ষ্মী পেঁচা মেলে, আবার দশ লাখ লক্ষ্মী পেঁচার মধ্যে একটি রাজলক্ষ্মী পেঁচা পাওয়া যায়। ইনি হলেন সেই আদত রাজলক্ষ্মী পেঁচা, সাত রাজার ধন এক মানিক। পঞ্চাশটি গণেশজীর চাইতে এর কুদরত বেশী। এমন ইনভেস্টমেণ্ট আর কোথাও পাবেন না, আপনার বাড়িতে থাকলে বহু লক্ষ টাকা আপনি কামাতে পারবেন, আমি তার ভাগ চাই না। আমাকে দশ লাখ নগদ দিন আমি পেঁচা ডেলিভারি দেব।

কৃপারাম অত্যন্ত চটে গিয়ে বললেন, পঞ্চুবাবু, তুমি এত বড় বেইমান নিমকহারাম ঠক জুয়াচোর তা আমার মালুম ছিল না। দু হাজার টাকা নিয়ে পেঁচা দেবে কি না বল, না দাও তো মুশকিলে পড়বে।

–আমার এক কথা, নগদ দশ লাখ চাই, ডেলিভারি এগেনস্ট ক্যাশ। আপনি না দেন তো অন্য লোক দেবে, এই লড়াই-এর বাজারে রাজলক্ষ্মী পেঁচার খদ্দের অনেক আছে।

কৃপারাম বললেন, আচ্ছা তোমাকে আমি দেখে লিব। এই বলে গটগট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কৃপারাম তুখড় লোক। তিনি ভেবে দেখলেন, পঞ্চাননের কাছ থেকে পেঁচা চুরি করে আনলে ঝঞ্ঝাট মিটবে না, তাঁর বাড়ি থেকে আবার চুরি যেতে পারে। অতএব এক শত্রুর সঙ্গে রফা করে আর এক শত্রুকে শায়েস্তা করতে হবে। সেই দিনই সন্ধ্যার সময় তিনি মুচুকুন্দবাবুর সঙ্গে দেখা করলেন। মুচুকুন্দর মন ভাল নেই, তাঁর গৃহিণীও পেঁচার শোকে আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছেন।

কৃপারাম বললেন, নমস্তে মুচুবাবু। আমার চিড়িয়া আপনি দিলেন না, জবরদস্তি ধরে রাখলেন, এখন দেখলেন তো, সে দুসরা জায়গায় গেছে।

মুচুকুন্দ ব্যগ্র হয়ে বললেন, আপনি জানেন নাকি কোথায় আছে?

–হাঁ, জানি। আপনার ভাই সেই পঞ্চু শালা চোরি করে নিয়ে গেছে, দশ লাখ টাকা না

পেলে ছাড়বে না। মুচুবাবু, আমার কথা শুনুন, আমার সাথ দোস্তি করুন। ব্যাঙ্ক কটন-মিল ওগয়রহ আপনার থাকুক, আমি তার ভাগ চাই না, কেবল মিলিটারি ঠিকার কাজ আপনি আর আমি এক সাথ করব, মুনাফার বখরা আধাআধি। পঞ্চুর সঙ্গে আমার ফয়সালা হয়ে গেছে। লক্ষ্মী পেঁচা পালা করে এক মাস আপনার কাছে এক মাস আমার কাছে থাকবে, তাহলে আর আমাদের মধ্যে ঝগড়া হবে না। বলুন, এতে রাজী আছেন?

মুচুকুন্দ বললেন, আগে পেঁচা উদ্ধার করুন।

সে আপনি ভাববেন না, দু দিনের মধ্যে পেঁচা আপনার বাড়ি হাজির হবে। আমার মতলব শুনুন। ফজলু আর মিসরিলাল গুণ্ডাকে আমি লাগাব। তারা তাদের দলের লোক নিয়ে গিয়ে কাল দুপহর রাতে পঞ্চুর বাড়িতে ডাকাতি করবে, যত পারে লুঠ করবে, পঞ্চুকে ঐসা মার লাগাবে যে আর কখনও সে খাড়া হতে পারবে না।

—পেঁচার কি হবে?

—সে আপনি ভাববেন না। আমি কাছেই ছিপিয়ে থাকব, ফজলু আর মিসরিলাল আমার হাতেই পেঁচা দেবে।

মুচুকুন্দ বললেন, বেশ, আমি রাজী আছি। পেঁচা নিয়ে আসুন, আপনার সঙ্গে পাকা এগ্রিমেণ্ট করব।

পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট খাঁ সাহেব করিমুল্লা মুচুকুন্দবাবুর বিশিষ্ট বন্ধু। রাত আটটার সময় তাঁর কাছে গিয়ে মুচুকুন্দ বললেন, খাঁ সাহেব, সুখবর আছে। কি খাওয়াবেন বলুন।

আতার-বিচির মতন দাঁত বার করে করিমুল্লা বললেন—তওবা! আপনি যে উলটো কথা বলছেন সার। পুলিস খাওয়ায় না, খায়।

মুচুকুন্দ বললেন, বেশ, আপনি আমার কাজ উদ্ধার করে দিন, আমিই আপনাকে খাওয়াব। এখন শুনুন—আমি খবর পেয়েছি, কাল দুপুর রাতে পঞ্চানন চৌধুরীর বাড়িতে ডাকাতি হবে। পঞ্চুকে আপনি জানেন তো? দূর সম্পর্কে আমার ভাই হয়। ডাকাতের সর্দার হচ্ছেন স্বয়ং শেঠ কৃপারাম।

—বলেন কি, কৃপারাম কচালু?

—হাঁ, তিনিই। তাঁর সঙ্গে ফজলু আর মিসরিলালের দলও থাকবে। আপনি পঞ্চুর বাড়ির কাছাকাছি পুলিস মোতায়েন রাখবেন। ডাকাতির পরেই সবাইকে গ্রেপ্তার করে চালান দেবেন, মায় কৃপারাম। তাকে কিছুতেই ছাড়বেন না, বরং ফজলু আর মিসরিকে ছাড়তে পারেন।

—ডাকাতির পরে গ্রেপ্তার কেন? আগে করাই তো ভাল।

—না না, তা হলে সব ভেস্তে যাবে। আর শুনুন—আমার একটি পেঁচা ছিল, পঞ্চু সেটাকে চুরি করেছে। আবার কৃপারাম পঞ্চুর ওপর বাটপাড়ি করতে যাচ্ছে। সেই পেঁচাটি আপনি আমাকে এনে দেবেন, কিন্তু যেন জখম না হয়।

—ও, তাই বলুন, পেঁচাই হচ্ছে বখেড়ার মূল! মেয়েমানুষ হলে বুঝতুম, পেঁচার ওপর আপনাদের এত খাহিশ কেন? কাবাব বানাবেন নাকি?

—এসব হিন্দুশাস্ত্রের কথা, আপনি বুঝবেন না। আমার কাজটি উদ্ধার করে দিন, সরকারের কাছে আপনার সুনাম হবে, খাঁ বাহাদুর খেতাব পেয়ে যাবেন, আমিও আপনার মান রাখব।

করিমুল্লার কাছে প্রতিশ্রুতি পেয়ে মুচুকুন্দবাবু বাড়ি ফিরে গেলেন।

পরদিন রাত বারটার সময় পঞ্চানন চৌধুরীর বাড়িতে ভীষণ ডাকাতি হল। নগদ টাকা আর গহনা সব লুট হয়ে গেল। পঞ্চাননের মাথায় আর পায়ে এমন চোট লাগল যে, তিনি পনের দিন হাসপাতালে বেহুঁশ হয়ে রইলেন। তিনটে ডাকাত ধরা পড়ল, কিন্তু ফজলু আর মিসারিলাল পালিয়ে গেল। কৃপারাম পেঁচার খাঁচা নিয়ে একটা গলি দিয়ে সরে পড়বার চেষ্টা করছিলেন, তিনিও গ্রেপ্তার হলেন। সকালবেলা স্বয়ং খাঁ সাহেব করিমল্লা মুচকুন্দর হাতে পেঁচা সমর্পণ করলেন। মাতঙ্গী দেবী শাঁখ বাজিয়ে লক্ষ্মীর বাহনকে ঘরে তুললেন।

পেঁচা অক্ষত শরীরে ফিরে এসেছে, কিন্তু তার ফুর্তি নেই। সমস্ত দিন সে মুখ হাঁড়ি করে বসে রইল। নিশ্চিত হবার জন্য পঞ্চানন তাকে ডবল মাত্রা খাওয়াচ্ছিলেন, তাই বেচারা ঝিমিয়ে আছে। বিকালবেলা মৌতাতের সময় সে ছটফট করতে লাগল, মুচকুন্দ কাছে এলে তাঁর হাতে ঠুকরে দিলে। মাতঙ্গী আদর করে বললেন, কি হয়েছে কি হয়েছে আমার পেঁচু বাপধনের। পেঁচা তার হাতে ঠোকর মেরে গালে নখ দিয়ে আঁচড়ে রক্তপাত করে দিলে। মাতঙ্গী রাগ সামলাতে পারলেন না, দূর হ লক্ষ্মীছাড়া বলে তাকে হাত-পাখা দিয়ে মারলেন। পেঁচা বিকট চ্যাঁ চ্যাঁ রব করে ঘর থেকে উড়ে কোথায় চলে গেল। মাতঙ্গী ব্যাকুল হয়ে চারিদিকে লোক পাঠালেন, কিন্তু পেঁচার কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না।

এর পরের ঘটনাবলী খুব দ্রুত। মুচকুন্দর উত্থান গত পনের বৎসরে ধীরে ধীরে হয়েছিল, কিন্তু এখন ঝুপ করে তাঁর পতন হল। কিছুকাল থেকে ফটকাবাজিতে তাঁর খুব লোকসান হচ্ছিল। সম্প্রতি তিনি যে দশ হাজার মণ ঘি পাঠিয়েছিলেন, ভেজাল প্রমাণ হওয়ায় তার জন্য বিস্তর টাকা গচ্চা দিতে হল। তাঁর মুরুব্বী মেজর রবসন হঠাৎ বদলি হওয়াতেই এই বিপদ হল, তিনি থাকলে অতি রাবিশ মালও পাস করে দিতেন। মুচকুন্দবাবুর কম্পানিগুলোরও গতিক ভাল নয়। এমন অবস্থায় ধুরন্ধর ব্যবসায়ীরা যা করে থাকেন তিনিও তাই করলেন, অর্থাৎ এক কারবারের তহবিল থেকে টাকা সরিয়ে অন্য কারবার ঠেকিয়ে রাখতে গেলেন। কিন্তু শত্রুরা তাঁর পিছনে লাগল। তার পর এক দিন তাঁর ব্যাঙ্কের দরজায় তালা পড়ল, যথারীতি পুলিসের তদন্ত এবং খাতাপত্র পরীক্ষা হল, এক বৎসর ধরে মকদ্দমা চলল পরিশেষে মুচকুন্দ তর্দবিল-তছরূপ জালিয়াতি ফেরেববাজি প্রভৃতির দায়ে জেলে গেলেন।

মাতঙ্গী দেবী তাঁর ভাই তারাপদর কাছে আশ্রয় নিলেন। লথা আর সরা কোথায় থাকে কি করে তার স্থিরতা নেই। তারাপদবাবু বললেন, দিদি আর জামাইবাবু মস্ত ভুল করেছিলেন। পেঁচাটা লক্ষ্মীপেঁচাই নয়, নিশ্চয় হুতুমপেঁচা, ভোল ফিরিয়ে এসেছিল। সেই অলক্ষ্মীর বাহনই সর্বনাশ করে গেল। তারাপদ দিল্লি থেকে খবর পেয়েছেন যে সেই পেঁচা এখন কিং এডোআর্ড রোডের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার সঙ্গে একটা পেঁচীও জুটেছে, কোথায় আস্তানা গাড়বে বলা যায় না।

১৩৫৮ (১৯৫১)

অক্রূরসংবাদ

নমস্কার মশাই। আপনার পাশে একটু বসবার জায়গা হবে? ঢাকুরে লেকের ধারে একটা বেঞ্চে একলা বসে আছি। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে দেখে ওঠবার উপক্রম করছি এমন সময় আগন্তুক ভদ্রলোকটি উক্ত প্রশ্ন করলেন। আমি উত্তর দিলুম, নিশ্চয় নিশ্চয়, বসবেন বই কি, ঢের জায়গা রয়েছে।

লোকটির বয়স পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন, লম্বা রোগা ফরসা, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, সযত্নে সিঁথি-কাটা, মওলানা আবুল কালাম আজাদের মতন গোঁফ-দাড়ি। পরনে মিহি ধুতি, গরদের পাঞ্জাবি আর উড়ুনি, হাতে রুপো-বাঁধানো লাঠি। দেখলেই মনে হয় সেকেলে শৌখিন বড়লোক। পকেট থেকে একটা বড় কাগজ বার করে বেঞ্চের এক পাশে বিছিয়ে তার ওপর বসে পড়ে বললেন, আমি হচ্ছি অক্রূর নন্দী। মশায়ের নামটি জানতে পারি কি?

আমি বললুম, নিশ্চয় পারেন, আমার নাম সুশীলচন্দ্র চন্দ্র।

—আপনার কি বাড়ি ফেরবার তাড়া আছে? না থাকে তো খানিকক্ষণ বসুন না, আলাপ করা যাক। দেখুন, আমি হচ্ছি একটু খাপছাড়া ধরনের, লোকের সঙ্গে সহজে মিশতে পারি না, যার তার সঙ্গে বনেও না।

আমি হেসে প্রশ্ন করলুম, তবে আমার সঙ্গে আলাপ করতে চাচ্ছেন কেন? যদি না বনে?

অক্রূর নন্দী ভ্রূ কুঁচকে আমার দিকে চেয়ে বললেন, আমি চেহারা দেখে মানুষ চিনতে পারি। আপনার বয়স চল্লিশের নীচে, কি বলেন?

—আজ্ঞে হাঁ।

—তা হলে বনবে। বুড়োদের সঙ্গে আমার মোটেই বনে না, তাদের হাড় চামড়া মন সব শুকিয়ে শক্ত হয়ে গেছে। ভাবছেন লোকটা বলে কি, নিজেও তো বুড়ো। বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু আমার মন শুখিয়ে যায় নি।

—অর্থাৎ আপনি এখনও তরুণ আছেন।

অক্রূরবাবু মাথা নেড়ে বললেন, তরুণ ফরুন নই। আমি হচ্ছি একজন বোদ্ধা অর্থাৎ ফিলসফার, জগৎটাকে হ্যাংলা বোকার মতন গবগব করে গিলতে চাই না, চেখে চেখে চিবিয়ে চিবিয়ে ভোগ করতে চাই। চলুন না আমার বাড়ি, খুব কাছেই। রাত্রের খাবারটা আমার সঙ্গেই খাবেন, আমার জীবনদর্শনও আপনাকে বুঝিয়ে দেব।

ভদ্রলোকের মাথায় একটু গোল আছে তাতে সন্দেহ নেই। বললুম, আজ তো বাড়িতে বলে আসি নি, ফিরতে দেরি হলে সবাই ভাববে যে।

—বেশ কাল এই সময়ে এখানে আসবেন, আমি আপনাকে আমার বাড়ি নিয়ে যাব, সেখানেই আহার করবেন। ভাবছেন লোকটা আবুহোসেন নাকি? কতকটা তাই বটে! একা একা থাকি, কথা কইবার উপযুক্ত মানুষ খুঁজে বেড়াই, কিন্তু লাখে একজনও মেলে না। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনিও একজন বোদ্ধা। কি করা হয়?

—কলেজে ফিলসফি পড়াই।

—বাহা বাহা! তবেই দেখুন আমি কি রকম মানুষ চিনতে পারি।

সবিনয়ে বললুম, যা ভাবছেন তা নই, আমার বিদ্যা বুদ্ধি অতি সামান্য। পুরুত যেমন করে যজমানদের মন্ত্র পড়ায় আমিও তেমনি করে ছাত্রদের পড়াই। নিজেও কিছু বুঝি না, তারাও কিছু বোঝে না।

—ও কথা বলে আমাকে ভোলাতে পারবেন না। আচ্ছা, এখন আলোচনা থাক, আপনি বোধ হয় ওঠবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন, আপনাকে আর আটকে রাখব না। কাল ঠিক আসবেন তো?

অক্রূর নন্দী বাতিকগ্রস্ত বটে, কিন্তু শেক্সপীয়ার যেমন বলেছেন—এ'র পাগলামিতে শৃঙ্খলা আছে। লোকটিকে ভাল করে জানবার জন্য খুব কৌতূহল হল। বললুম, আজ্ঞে হাঁ, ঠিক আসব।

পরদিন যথাকালে উপস্থিত হয়ে দেখলুম অক্রূরবাবু বেঞ্চে বসে আছেন। আমাকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে বললেন, আসুন আসুন সুশীলবাবু। এখানে সময় নষ্ট করে কি হবে, আমার বাড়ি চলুন। খুব কাছেই, এই সাদার্ন অ্যাভিনিউ-এর পাশ থেকে বেরিয়েছে হর্ষবর্ধন রোড, তারই দশ নম্বর হচ্ছে আমার বাড়ি।

যেতে যেতে আমি বললুম, যদি কিছু মনে না করেন তো জিজ্ঞাসা করি—মশায়ের কি করা হয়?

অক্রূরবাবু প্রতিপ্রশ্ন করলেন, আপনি আত্মা মানেন?

—বড় কঠিন প্রশ্ন। আমার একটা আত্মা জন্মাবধি আছে বটে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বদলেও যাচ্ছে, কিন্তু জন্মের আগেও সেই আত্মাটা ছিল কিনা তা তো জানি না।

—ও, আপনি হচ্ছেন আত্মাবাদী অ্যাগ্‌নস্টিক। আপনার বিশ্বাস আপনার থাকুক, তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু আমি জন্মান্তরীণ আত্মা মানি। আমার গত জন্মের আত্মাটি খুব চালাক ছিল মশাই, বেছে-বেছে বড়লোকের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছে।

—আপনি ভাগ্যবান লোক।

—তা বলতে পারেন। বাবা এত টাকা রেখে গেছেন যে, রোজগারের কোনও দরকারই নেই। অন্নচিন্তা থাকলে উচ্চচিন্তা করতে পারতুম না। আমি বেকার অলস লোক নই, দিনরাত গবেষণা করি কিসে মানুষের বুদ্ধি বাড়বে, সমাজের সংস্কার হবে। কিন্তু মুশকিল কি জানেন? আমি অন্তত দু শ বৎসর আগে জন্মেছি, এখনকার লোকে আমার থিওরি বুঝতেই পারে না।

—আমিই যে বুঝব সে ভরসা করছেন কেন?

—বুঝবেন, একটু চেষ্টা করলেই বুঝবেন। আপনার দুই কানের ওপরে একটু ঢিপি মতন আছে, ওই হল বোদ্ধার লক্ষণ। আসুন, এই আমার আস্তানা অক্রূরধাম। পৈতৃক বাড়িটি কাকারা পেয়েছেন, এ বাড়ি আমি করেছি।

অক্রূরধাম বিশেষ বড় নয় কিন্তু গড়ন ভাল। বারান্দায় চার-পাঁচ জন দারোয়ান চাকর ইত্যাদি একটা বেঞ্চে বসে গল্প করছিল, মনিবকে দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল। অক্রূরবাবু হাতের ইশারায় তাদের বসতে বলে আমাকে তাঁর বৈঠকখানা ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরটি মাঝারি, আসবাব অল্প, কিন্তু খুব পরিচ্ছন্ন।

ঘরে ঢোকবার সময় দরজার পাশের দেওয়ালে আমার হাত ঠেকে গিয়েছিল। দেখলুম একটু আঁচড়ে গেছে। অক্রূরবাবু তা লক্ষ্য করে বললেন, খোঁচা খেয়েছেন বুঝি? ভয় নেই ওষুধ দিচ্ছি। এই বলে তিনি আমার হাতে বেগনী কালির মতন কি একটা লাগিয়ে দিলেন।

আমি বললুম, আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, ও কিছুই নয়, একটু ছড়ে গেছে। বোধ হয় ওখানে একটা পেরেক আছে।

—একটা নয় মশাই, সারি সারি পিন বসানো আছে, হাত দিলেই ফুটবে। কেন লাগাতে হয়েছে জানেন? ভারতবর্ষ হচ্ছে বাঁকা শ্যাম ত্রিভঙ্গ মুরারির দেশ। এখানকার লোকে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে না, চাকর ধোবা গোয়ালা নাপিত যেই হ'ক—এমন কি অনেক শিক্ষিত লোকও—দরজায় বা দেওয়ালে হাতের ভর দিয়ে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। সে শ্রীকৃষ্ণের আমল থেকে চলে আসছে, অজন্টার ছবিতে আর পুরী মাদুরা রামেশ্বর প্রভৃতির মন্দিরে একটাও সোজা মূর্তি পাবেন না। বাড়ির চাকর আর আগন্তুক লোকদের গা-হাত লেগে দেওয়াল আর দরজা ময়লা হয়, কিছুতেই বদভ্যাস ছাড়াতে পারি না। নিরুপায় হয়ে মেঝে থেকে এক ফুট বাদ দিয়ে দেওয়াল আর দরজার ছ ফুট পর্যন্ত, মায় সিঁড়ির রেলিংএ সারি সারি গ্রামোফোন পিন লাগিয়েছি, প্রায় দু লক্ষ পিন। এখন আর বাছাধনরা অজন্টা প্যাটার্নে ত্রিভঙ্গ হয়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াতে পারে না, দেওয়ালে পিঠ লাগিয়ে বসতেও পারে না।

—বাড়িতে চাকর টিঁকে থাকে কি করে?

—মাইনে আড়াইগুণ করে দিয়েছি। কেউ কেউ ভুলে ঠেস দিয়ে জখম হয়, তাই এক বোতল জেনশ্যান ভায়োলেট লোশন রেখেছি। খুব ভাল আণ্টিসেপটিক আর দাগও তিন-চার দিন থাকে, তা দেখে লোকে সাবধান হয়।

—কিন্তু বাচ্চাদের সামলান কি করে? বাড়িতে ছেলেপিলে আছে তো?

আট্টহাস্য করে অক্রূরবাবু বললেন, ছেলে হচ্ছি আমি, আর পিলে ওই চাকরগুলো।

—সেকি, আপনার সন্তানাদি নেই?

—দেখুন সুশীলবাবু, বিবাহ করব না অথচ সন্তানের জন্ম দেব এমন আহাম্মক আমি নই।

—কেন বিবাহ করেন নি?

—চেষ্টা ঢের করেছি, কিন্তু হয়ে ওঠে নি। তবে ভবিষ্যতের কথা বলা যায় না।

—আপনার মতন লোকের এ পর্যন্ত পত্নীলাভ হয়নি এ বড় আশ্চর্য কথা। আপনি ধনী সুপুরুষ সুশিক্ষিত জ্ঞানী—

—আমার আরও অনেক গুণ আছে। নেশা করি না, পান তামাক চা প্রভৃতি মাদকদ্রব্য স্পর্শ করি না. মাছ মাংস ডিম পেঁয়াজ লঙ্কা হলুদ প্রভৃতি আমার রান্নাঘরে ঢুকতে পায় না। আমি গান্ধীজীর থিওরি মানি. তরকারির খোসা বাদ দেওয়া আর মসলা দিয়ে রাঁধা অত্যন্ত অন্যায়। তিনি রশুন খেতেন, আমি তাও খাই না। নুনও কমিয়ে দিয়েছি, তাতেও ব্লড-প্রেশার বাড়ে।

—দুধ খান তো?

—তা খাই. কিন্তু বাছুরকে বঞ্চিত করি না। বাড়িতে তিনটে গরু আছে. বাছুরের জন্য যথেষ্ট দুধ রেখে বাকীটা নিজে খাই।

অক্রূরবাবুর কথা শুনে বুঝলুম আজ রাত্রে আমার কপালে উপবাস আছে। মনে পড়ল, বড় রাস্তার মোড়ে সাইনবোর্ড দেখেছি—ঔদরিক এম্পোরিয়ম। ফেরবার সময় সেখানেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করা যাবে।

অক্রূরবাবু বললেন. ও ঘরে চলুন, খেতে খেতেই আলাপ করা যাবে। শাস্ত্রে বলে, মৌনী হয়ে খাবে। তা আমি মানি না; বিলিতী পদ্ধতিতে গল্প করতে করতে ধীরে ধীরে খেলেই ভাল হজম হয়।

খাবার এল। অক্রূর নন্দী খেয়ালী লোক হলেও তাঁর কাণ্ডজ্ঞান আছে. আমার জন্য ভাল

ভাল খাবারেরই আয়োজন করেছেন। কিন্তু তাঁর নিজের জন্য এল খান কতক মোটা রুটি কিছু সিদ্ধ তরকারি,কিছু কাঁচা তরকারি আর এক বাটি দুধ।

অক্রূরবাবু বললেন, কোনও জন্তু ক্যালরি প্রোটিন ভাইটামিন নিয়ে মাথা ঘামায় না। আমাদের গুহাবাসী পূর্বপুরুষরা জন্তুর মতনই কাঁচা জিনিস খেতেন, তাতেই তাঁদের পুষ্টি হত। সভ্য হয়ে সেই সদভ্যাস আমরা হারিয়ে ফেলেছি। এখন কাঁচা লাউ কুমড়ো অনেকেই হজম করতে পারে না, তাই আপনাকে দিই নি। আমি কিন্তু কাঁচা খাওয়া অভ্যাস করেছি, একটু একটু করে ঘাস খেতেও শিখছি। যাক ও কথা। আপনার মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে একটা প্রশ্ন আপনার কণ্ঠাগত হয়ে আছে। চক্ষুলজ্জা করবেন না, অসংকোচে বলে ফেলুন।

আমি বললুম, কিছু যদি মনে না করেন তো জিজ্ঞাসা করি—আপনি বলেছেন যে, বিবাহের জন্য ঢের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু হয়ে ওঠে নি। কেন হয়ে ওঠে নি বলবেন কি ?

—আরে সেই কথা বলতেই তো আপনাকে ডেকে এনেছি। শুনুন। দাম্পত্য হচ্ছে তিন রকম। এক নম্বর, যাতে স্বামীর বশে স্ত্রী চলে, যেমন গান্ধী-কস্তুরবা। দু-নম্বর, যাতে স্বামীই হচ্ছে স্ত্রীর বশ, অর্থাৎ স্ত্রৈণ ভেড়ো বা হেনপেক, যেমন জাহাঙ্গীর-নূরজাহান। দুটোই হল ডিক্টেটারী ব্যবস্থা, কিন্তু দুক্ষেত্রেই দম্পতি সুখী হয়। তিন নম্বর হচ্ছে, যাতে স্বামী-স্ত্রী কিছুমাত্র রফা না করে নিজের নিজের মতে চলে, অর্থাৎ দুজনেই একগুঁয়ে। এই হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-মূলক আদর্শ দাম্পত্য-সম্বন্ধ কিন্তু এর পদ্ধতি বা টেকনিক লোকে এখনও আয়ত্ত করতে পারে নি।

—আপনি নিজে কিরকম দাম্পত্য পছন্দ করেন ?

তিন রকমেরই চেষ্টা করেছি, কিন্তু এ পর্যন্ত কোনওটাই অবলম্বন করতে পারি নি। তারই ইতিহাস আপনাকে বলব। যখন বয়স কম ছিল তখন আর পাঁচ জনের মতন এক নম্বর দাম্পত্যই পছন্দ করতুম। যেমন বাঁদর ষাঁড় ছাগল মোরগ প্রভৃতি জন্তু তেমনি মানুষেরও পুংজাতি সাধারণত প্রবল, তারাই স্ত্রীজাতি শাসন করতে চায়। কিন্তু মুশকিল কি হল জানেন ? কাকেও পীড়ন করা আমার স্বভাব নয়, কিন্তু আমার সংসারযাত্রার আদর্শ এত বেশী র‍্যাশন্যাল যে কোনও স্ত্রীলোকই তা বরদাস্ত করতে পারেন না।

—পরীক্ষা করে দেখেছিলেন ?

—দেখেছিলুম বইকি। আমার বয়স যখন চব্বিশ তখন আমার মেজকাকী তাঁর এক দূর সম্পর্কের বোনঝির সঙ্গে আমার সম্বন্ধ করলেন। আমাদের সমাজে কোর্টশিপের চলন তখনও হয় নি, অভিভাবকরাই সম্বন্ধ স্থির করতেন। আমার বাপ-মা তখন গত হয়েছেন, কাকাদের সঙ্গেই থাকতুম। আমি মেজকাকীকে বললুম বিয়েতে মত দেবার আগে তোমার বোনঝিকে আমার মনের কথা জানাতে চাই। কাকী বললেন, বেশ তো, যত খুশি জানিও, আমি না হয় আড়ালে থাকব। তার পর এক দিন মেয়েটিকে আনা হল। আমি তাকে একটি লেকচার দিলুম। —শোন উজ্জ্বলা, আমি স্পষ্টবক্তা লোক, আমার কথায় কিছু মনে ক'রো না যেন। তুমি দেখতে ভালই, ম্যাট্রিক পাশ করেছ, শুনেছি গান বাজনা আর গৃহকর্মও জান। ওতেই আমি তুষ্ট। তুমিও আমাকে বিয়ে করলে ঠকবে না, একটি সুশ্রী বলিষ্ঠ বিদ্বান ধনবান আর অত্যন্ত বুদ্ধিমান স্বামী পাবে আমার নতুন বাড়ির সর্বেসর্বা গিন্নী হবে, বিস্তর টাকা খরচ করতে পাবে। কিন্তু তোমাকে কতকগুলো নিয়ম মেনে চলতে হবে। দু-এক গাছা চুড়ি ছাড়া গহনা পরতে পাবে না, শৃঙ্গী নখী আর দন্তী প্রাণীর মতন সালংকারা স্ত্রীও ডেঞ্জারস। নিমন্ত্রণে গিয়ে যদি নিজের ঐশ্বর্য জাহির করতে চাও তো ব্যাঙ্কের একটা সার্টিফিকেট গলায় ঝুলিয়ে যেতে পার। সাজগোজেও অন্য মেয়ের নকল করবে না, আমি যেমন বলব সেইরকম সাজবে।

আর শোন—ছবি টাঙিয়ে দেওয়াল নোংরা করবে না, নতুন নতুন জিনিস আর গল্পের বই কিনে বাড়ির জঞ্জাল বাড়াবে না, গ্রামোফোন আর রেডিও রাখবে না। ইলিশ মাছ কাঁকড়া পেঁয়াজ পেয়ারা আম কাঁঠাল ত্যাগ করতে হবে, ওসবের গন্ধ আমার সয় না। পান খাবে না, রক্তদন্তী স্ত্রী আমি দু চক্ষে দেখতে পারি না। সাবান যত খুশি মাখবে, কিন্তু এসেন্স পাউডার নয়, ওসব হল ফিনাইল জাতীয় জিনিস দুর্গন্ধ চাপা দেবার অসাধু উপায়। এই রকম আরও অনেক বিধিনিষেধের কথা জানিয়ে তাকে বললুম, তুমি বেশ করে ভেবে দেখ, তোমার বাপ-মার সঙ্গে পরামর্শ কর, যদি আমার শর্ত মানতে পার তবে চার-পাঁচ দিনের মধ্যে খবর দিও। কিন্তু এক হপ্তা হয়ে গেল, তবু কোনও খবর এল না।

—বলেন কি!

—অবশেষে আমিই মেজকাকীকে জিজ্ঞাসা করলুম, ব্যাপার কি? তিনি পাত্রীর বাড়িতে তাগাদা পাঠালেন। তার পর আমি একটা পোস্টকার্ড পেলুম। পাত্রীর দাদা ইংরিজীতে লিখেছে—গো টু হেল।

—কন্যাপক্ষ দেখছি অত্যন্ত বোকা, আপনার মত বরের মূল্য বুঝল না।

—হাঁ, বেশীর ভাগই ওই রকম বোকা, তবে গোটাকতক চালাক কন্যাপক্ষও জুটেছিল। তাদের মতলব, ভাঁওতা দিয়ে আমার ঘাড়ে মেয়ে চাপিয়ে দেওয়া। তখন একটা নতুন শর্ত জুড়ে দিলুম—ভবিষ্যতে আমার স্ত্রী যদি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তবে তখনই তাকে বিদেয় করব। খোরপোষ দেব, কিন্তু আমার সম্পত্তি সে পাবে না। এই কথা শুনে সব ভেগে পড়ল। জ্ঞাতিশত্রুরাও রটাতে লাগল যে আমি একটা উন্মাদ। কিন্তু একটি মেয়ে সত্যই রাজী হয়েছিল। অত্যন্ত গরিবের মেয়ে, দেখতেও তেমন ভাল নয়। আমার সমস্ত কথা মন দিয়ে শুনে তখনই বললে যে, সে রাজী। আমি বললুম, অত তাড়াতাড়ি নয়, তোমার বাপ-মায়ের মত নিয়ে জানিও। পরদিন খবর এল বাপ-মাও খুব রাজী। আমার সন্দেহ হল। খোঁজ নিয়ে জানলুম, রূপ আর টাকার অভাবে তার পাত্র জুটছে না। বাপ-মা অত্যন্ত সেকেলে, মেয়েকে কেবল অভিশাপ দেয়। এখন সে শরৎ চাটুজ্যের অরক্ষণীয়ার মতন মরিয়া হয়ে উঠেছে, নির্বিচারে যার-তার কাছে নিজেকে বলি দিতে প্রস্তুত। মেয়ের বাপের সঙ্গে দেখা করে আমি বললুম, আপনার মেয়ে শুধু আপনাকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করবার জন্যই আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছে, আমার শর্তগুলো মোটেই বিচার করে দেখে নি। এমন বিয়ে হতে পারে না। এই নিন পাঁচ হাজার টাকা, আমি যৌতুক দিলুম, মেয়েকে আপনাদের পছন্দ মত ঘরে বিয়ে দিন। বাপ খুব কৃতজ্ঞ হয়ে বললে, আপনিই খুকীর যথার্থ পিতা, আমি জন্মদাতা মাত্র। মেয়েটি ভাল ঘরেই পড়েছিল, বিয়ের পর বরের সঙ্গে আমাকে প্রণাম করতে এসেছিল।

আমি বললুম, আপনি মহাপ্রাণ দয়ালু ব্যক্তি।

—তা মাঝে মাঝে দয়ালু হতে হয়, টাকা থাকলে দান করায় বাহাদুরি কিছু নেই। তার পর শুনুন। আমার বয়স বেড়ে চলল, পঁয়ত্রিশ পার হয়ে বুঝলুম আমার আদর্শের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে এমন কৃচ্ছ্রসাধিকা নারী কেউ নেই। তখন আমার একটা মানসিক বিপ্লব হল, যাকে বলে রিভলুশন। এক নম্বর দাম্পত্য যখন হবার নয়, তখন দু নম্বরের চেষ্টা করলে দোষ কি? আমার অনেক আত্মীয় তো স্ত্রীর বশে বেশ সুখে আছে। স্ত্রৈণতাও সংসারযাত্রার একটি মার্গ। জগতে কর্তাভজা বিস্তর আছে, তারা বিচারের ভার কর্তার ওপর ছেড়ে দিয়ে দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে। যা করেন গুরুমহারাজ, যা করেন পণ্ডিতজী, যা করেন কমরেড স্তালিন আর মাও-সে-তুং। তেমনি গিন্নীভজাও অনেক আছে। তারা বলে, আমার মতামতের দরকার কি, যা করেন গিন্নী।

—কিন্তু আপনার স্বভাব যে অন্য রকম, আপনার পক্ষে গিন্নীভজা হওয়া অসম্ভব।

—অবস্থাগতিকে বা সাধনার ফলে অসম্ভবও সম্ভব হয়। একটি সার সত্য আপনাকে বলছি শুনুন। যে নারী রাজার রানী হয়, বড়লোকের স্ত্রী হয়, নামজাদা গুণী লোকের গৃহিণী হয়, সে নিজেকে মহাভাগ্যবতী মনে করে, অনেক সময় অহংকারে তার মাটিতে পা পড়ে না। কিন্তু রানীকে বা টাকাওয়ালী মেয়েকে যে বিয়ে করে, কিংবা যার স্ত্রী মস্ত বড় দেশনেত্রী লেখিকা গায়িকা বা নটী, এমন পুরুষ প্রথম প্রথম সংকুচিত হয়ে থাকে। সে স্বনাম-ধন্য নয়, স্ত্রীর নামেই তার পরিচয়, লোকে তাকে একটু অবজ্ঞা করে। কিন্তু কালক্রমে তার সয়ে যায়, ক্ষোভ দূর হয়, সে খাঁটি স্ত্রৈণ হয়ে পড়ে। এর দৃষ্টান্ত জগতে অনেক আছে।

—আপনিও সে রকম হতে চেষ্টা করেছিলেন নাকি?

—করেছিলুম। কুইন ভিক্টোরিয়া, সারা বার্নহার্ড, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ বা সরোজিনী নাইডুর মতন পত্নী যোগাড় করা অবশ্য আমার সাধ্য নয়, কিন্তু যদি একজন বেশ জবরদস্ত নামজাদা মহিলার কাছে চোখ কান বুজে আত্মসমর্পণ করতে পারি তবে হয়তো দু নম্বর দাম্পত্যও আমার সয়ে যেতে পারে, আমার মত আর আদর্শও বদলে যেতে পারে।

—আপনার পক্ষে তা অসম্ভব মনে করি।

—আমি কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি করি নি। তখন আমার বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে, পুরীতে স্বর্গদ্বারের পুব দিকে নিজের জন্য একটি বাড়ি তৈরি করাচ্ছি, ওশন-ভিউ হোটেলে আছি। আমার পুরোনো সহপাঠী ভূপেন সরকারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে তখন মস্ত গভর্ন-মেণ্ট অফিসার, ছুটি নিয়ে এসেছে, সঙ্গে আছে তার বোন সত্যভামা সরকার। দুজনে আমার হোটেলেই উঠল। সত্যভামা বিখ্যাত মহিলা, দু বার বিলাত ঘুরে এসেছে, হুণ্ডাগড়ের রানী সাহেবাকে ইংরিজী পড়ায় আর আদবকায়দা শেখায়, অনেক বইও লিখেছে। নাম আগেই শোনা ছিল, এখন আলাপ হল। বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ, দশাসই চেহারা, মুখটি গোবদা গোছের, ড্যাবডেবে চোখ, নীচের ঠোঁট একটু বাইরে ঠেলে আছে। দেখলেই বোঝা যায় ইনি একজন জবরদস্ত মহীয়সী মহিলা, স্বামীকে বশে রাখবার শক্তি এঁর আছে। ভাবলুম, এই সত্যভামার কাছেই আত্মসমর্পণ করলে ক্ষতি কি। দু দিন মিশেই বুঝলুম, আমি যেমন ওকে বাজিয়ে দেখছি, সেও তেমনি আমাকে দেখছে।

—আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে যেন শিকার কাহিনী শুনছি।

—কতকটা সেই রকম বটে। যেন একটা বাঘিনী ওত পেতে আছে, আর একটা বাঘ তার পিছনে ঘুরছে। তার পর একদিন আমার নতুন বাড়ি তদারক করতে গেছি, ভূপেন আর সত্যভামাও সঙ্গে আছে। সত্যভামা বললে, জানেন তো সমস্ত ইট বেশ করে ভিজিয়ে নেওয়া চাই, আর ঠিক তিন ভাগ সুরকির সঙ্গে এক ভাগ চুন মেশানো চাই, নয়তো গাঁথুনি মজবুত হবে না। আমার একটু রাগ হল। সাতটা বাড়ি আমি নিজে তৈরি করিয়েছি, কোনও ওভার-শিয়ারের চাইতে আমার জ্ঞান কম নয়, আর আজ এই সত্যভামা আমাকে শেখাতে এসেছে!

—আপনার কিন্তু রাগ হওয়া অন্যায়, আপনি তো আত্মসমর্পণ করতেই চেয়েছিলেন। দু নম্বর দাম্পত্যে স্বামীকে স্ত্রীর উপদেশ শুনতেই হয়।

—তা ঠিক, কিন্তু হঠাৎ অনভ্যস্ত উপদেশ একটু অসহ্য বোধ হয়েছিল। তখনকার মতন সামলে নিলুম, কিন্তু পরে আবার গোল বাধল। রাত্রে হোটেলে এক টেবিলে খেতে বসেছি। সত্যভামা বললে, দেখুন মিস্টার নন্দী, আপনার খাওয়া মোটেই সায়েণ্টিফিক নয়, মাছ মাংস ডিম টোমাটো ক্যারট লেটিস এই সব খাওয়া দরকার, যা খাচ্ছেন তাতে ভাইটামিন কিচ্ছু নেই। এবারে আর চুপ করে থাকতে পারলুম না। ক্যালরি প্রোটিন অ্যামিনোঅ্যাসিড আর ভাইটামিনের হাড় হদ্দ আমার জানা আছে, তার বৈজ্ঞানিক তথ্য আমি গুলে খেয়েছি, আর এই মাস্টারনী আমাকে লেকচার দিচ্ছে! রাগের বশে একটা অসত্য কথা বলে ফেললুম—

দেখুন মিস সত্যভামা, ভাইটামিন আমার সয় না। সত্যভামা বললেন, সয় না কি রকম! উত্তর দিলুম, না, একদম সয় না, ডাক্তার বারণ করেছে। সত্যভামা ঘাবড়ে গিয়ে চুপ মেরে গেল।

—আপনার ধৈর্য দেখছি বড়ই কম।

—সেই তো হয়েছে বিপদ, উপদেশ আমার বরদাস্ত হয় না। তার চার দিন পরে যা হল একেবারে চূড়ান্ত। বিকেলে সমুদ্রের ধারে বসে সূর্যাস্ত দেখছি, শুধু আমি আর সত্যভামা. ভূপেন বোধ হয় ইচ্ছে করেই আসে নি। সত্যভামা হঠাৎ বললে, ওহে অক্রূর, তুমি গোঁফ-দাড়ি কালই কামিয়ে ফেল, ওতে তোমাকে মানায় না, জংলী জংলী মনে হয়। কি আস্পর্ধা দেখুন! যার ছাগল-দাড়ি বা ইঁদুরে খাওয়ার মতন বিশ্রী দাড়ি তার অবশ্য না রাখাই উচিত। কিন্তু আমার মতন যার সুন্দর নিরেট দাড়ি সে কামাবে কোন্ দুঃখে? সত্যভামার কথায় আমার মেজাজ গরম হয়ে উঠল। কোটি কোটি বৎসর ধরে পুরুষত্বের যে বীজ প্রাণিপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়ে এসেছে, যার প্রভাবে সিংহের কেশর, ষাঁড়ের ঝুঁটি, ময়ূরের পেখম আর মানুষের দাড়ি-গোঁফ উদ্ভূত হয়েছে, সেই দুর্দান্ত পুং-হরমোন আমার মাংসে মজ্জায় কুপিত হয়ে উঠল, আমি ধমক দিয়ে বললুম, চোপ রও, ও কথা মুখে আনবে না, কামাতে চাও তো নিজের মাথা মুড়িয়ে ফেল। সত্যভামা একবার আমার দিকে কটমট করে তাকাল, তারপর উঠে চলে গেল। রাত্রে খাবার সময় ভাই বোন কাকেও দেখলুম না। পরদিন সকালের ট্রেনে আমি কলকাতা রওনা হলুম।

—তার পর আর কোথাও দু নম্বর দাম্পত্যের চেষ্টা করেছিলেন?

—রাম বল, আবার! বুঝতে পারলুম এক নম্বর দু নম্বর কোনওটাই আমার ধাতে সইবে না। তার পর হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলুম, দাম্পত্যের তিন নম্বরও আছে, যাতে স্বামী-স্ত্রী নিজের নিজের মতে চলে অথচ সংঘর্ষ হয় না। আবিষ্কারটা ঠিক আমি করি নি, রবীন্দ্রনাথই করেছিলেন—

—বলেন কি!

—হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথই করে গেছেন। কিন্তু লোকে তার গুরুত্ব বুঝতে পারে নি, তাঁর লেখা থেকে আমিই পুনরাবিষ্কার করেছি। তিনি কি লিখেছেন শুনতে চান?

অক্রূরবাবু পাশের ঘর থেকে 'শেষের কবিতা' এনে পড়তে লাগলেন।—

অমিত রায় লাবণ্যকে বলছে—ওপারে তোমার বাড়ি, এপারে আমার।...একটি দীপ আমার বাড়ির চূড়ায় বসিয়ে দেব, মিলনের সন্ধ্যেবেলায় তাতে জ্বলবে লাল আলো, বিচ্ছেদের রাতে নীল।...অনাহূত তোমার বাড়িতে কোনো মতেই যেতে পাব না।...তোমার নিমন্ত্রণ মাসে এক দিন পূর্ণিমার রাতে।...পুজোর সময় অন্তত দু মাসের জন্যে দু জনে বেড়াতে বেরোব। কিন্তু দু জনে দু জায়গায়। তুমি যদি যাও পর্বতে আমি যাব সমুদ্রে। এই তো আমার দাম্পত্যের দ্বৈরাজ্যের নিয়মাবলি তোমার কাছে দাখিল করা গেল। তোমার কি মত? লাবণ্য উত্তর দিচ্ছে—মেনে নিতে রাজী আছি।...আমি জানি আমার মধ্যে এমন কিছুই নেই যা তোমার দৃষ্টিকে বিনা লজ্জায় সইতে পারবে, সেই জন্যে দাম্পত্যে দুই পারে দুই মহল করে দেওয়া আমার পক্ষে নিরাপদ।...তার পর লাবণ্য প্রশ্ন করছে—কিন্তু তোমার নববধূ কি চিরকালই নববধূ থাকবে? টেবিলে প্রবল চাপড় দিতে দিতে উচ্চৈঃস্বরে অমিত বললে, থাকবে থাকবে থাকবে।

আমি বললুম, অমিত রায় হচ্ছে একটি কথার তুবড়ি। রবীন্দ্রনাথ পরিহাস করে তাকে দিয়ে যা বলিয়েছেন আপনি তা সত্য মনে করছেন কেন?

অক্রূরবাবু টেবিলে কিল মেরে বললেন, মোটেই পরিহাস নয়, একেবারে খাঁটি সত্য। তিনি সর্বদর্শী কবি ছিলেন, দাম্পত্যের যা পরাকাষ্ঠা সেই তিন নম্বরেরই ইঙ্গিত দিয়ে

গেছেন। তার ভাবার্থ হচ্ছে—স্বামী-স্ত্রী আলাদা বাড়িতে বাস করবে, কালেভদ্রে দেখা করবে, তবেই তাদের প্রীতি স্থায়ী হবে, নববধূ চিরদিন নববধূ থাকবে।

—আপনি এরকম দাম্পত্যের চেষ্টা করেছিলেন?

একবার মাত্র চেষ্টা করেছিলুম, তা বিফল হয়েছে। কিন্তু বিফলতার কারণ এ নয় যে রবীন্দ্রনাথের থিওরি ভুল, আমার নির্বাচনেই গলদ ছিল। যাই হক, আর চেষ্টা করবার প্রবৃত্তি নেই।

—ঘটনাটা বলবেন কি?

—শুনুন। আমার বয়স তখন পঞ্চাশের কাছাকাছি। রবীন্দ্রনাথের ফরমুলাটি হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করে মনে হল, বাঃ, এই তো দাম্পত্যের শ্রেষ্ঠ মার্গ, চেষ্টা করে দেখা যাক না। আমার গোটাকতক বাড়ি আছে, ছোট-বড় ফ্ল্যাটে ভাগ করা, সেগুলো ভাড়া দিয়ে থাকি। একদিন একটি মহিলা আমার সঙ্গে দেখা করে একটা ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া নিলেন। নাম বাগেশ্রী দত্ত, বয়স আন্দাজ চল্লিশ, কিন্নরবিদ্যাপীঠে গান বাজনা নাচ শেখান। দেখতে মন্দ নয়, আমার পছন্দ হল, ক্রমে ক্রমে আলাপও হল। ভাবলুম, এক নম্বর দাম্পত্যের আশা নেই, দু নম্বরেও রুচি নেই। এই বাগেশ্রীকে নিয়ে তিন নম্বরের চেষ্টা করা যাক। যখন আলাদা আলাদা বাস করব তখন তো আদর্শ আর মতামতের প্রশ্নই ওঠে না। তার সঙ্গে দেখা করে বললুম, শোন বাগেশ্রী, আমাকে বিয়ে করবে? আমি নিজের বসত বাড়িতে থাকব, তোমাকে আমার রসা রোডের বাড়িটা দেব, সেটাও বেশ ভাল বাড়ি। তোমাকে টাকাও প্রচুর দেব। তুমি নিজের বাড়িতে নিজের মত চলবে, আমার পছন্দ অপছন্দ মানতে হবে না। মাসে একদিন আমি তোমার অতিথি হব, আর একদিন তুমি আমার অতিথি হবে। এই শর্তে বিয়ে করতে রাজী আছ? বাগেশ্রী বললে, এক্ষুনি। খাসা হবে, আমার বাড়িতে আমার মা দিদিমা মাসী দুই ভাই আর চার বোনকে এনে রাখব, এই ফ্ল্যাটটায় তো মোটেই কুলয় না। আমি বললুম, তা তো চলবে না, তোমার বাড়িতে আমি গেলে ভিড়ের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠব যে। বাগেশ্রী বললে, তোমাকে সেখান যেতে কে বলছে? নিজের বাড়িতেই তুমি থাকবে, আমিও তোমার কাছে থাকব। তুমি যা ন্যালাখ্যাপা মানুষ, আমি না দেখলে চাকর বাকর সর্বস্ব লোপাট করবে, বাপ রে, সে আমি সইতে পারব না। আমার পিশেমশায়ের ভাগনে প্রাণতোষ দাদাও আমার কাছে থাকবে, সেই সব দেখবে শুনবে, তোমাকে কিছুই করতে হবে না। বাগেশ্রীর মতলবটি শুনে আমি তখনই সরে পড়লুম। তার পর সে তিন দিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, আমি হাঁকিয়ে দিয়েছি।

আমি প্রশ্ন করলুম, উকিলের চিঠি পান নি।

অক্রূরবাবু বললেন, পেয়েছিলুম। উত্তরে জানালুম, ব্রীচ অভ প্রমিস হয় নি, আমি খেসারত এক পয়সাও দেব না। তবে বাগেশ্রী যদি দু মাসের মধ্যে তার প্রাণতোষ দাদা বা আর কাকেও বিবাহ করে তবে পাঁচ হাজার টাকা যৌতুক দিতে প্রস্তুত আছি। বাগেশ্রী তাতেই রাজী হয়েছিল।

—সকলকেই যৌতুক দিলেন, শুধু সত্যভামা বেচারী ফাঁকে পড়লেন।

—তিনিও একেবারে বঞ্চিত হন নি। পুরী থেকে চলে আসবার তিন মাস পরে একটা নিমন্ত্রণপত্র পেয়েছিলুম—হুণ্ডাগড়ের খুড়ো সাহেবের সঙ্গে সত্যভামার বিবাহ হচ্ছে। আমি একটি ছোট্ট পিকিনীজ কুকুর সত্যভামাকে উপহার পাঠিয়ে দিলুম, খুব খানদানী কুকুর, তার জন্য প্রায় আট শ টাকা খরচ হয়েছিল।

—এক দু তিন নম্বর সবই তো পরীক্ষা করেছেন, আপনার ভবিষ্যৎ প্রোগ্রাম কি?

—কিছুই স্থির করতে পারি নি। আপনি তো বোদ্ধা লোক, একটা পরামর্শ দিন না।

—দেখুন অক্রূরবাবু, আপনার ওপর আমার অসীম শ্রদ্ধা হয়েছে। যা বলছি তাতে দোষ নেবেন না। আমি সামান্য লোক, শরীর বা মনের তত্ত্ব কিছুই জানি না। কিন্তু আমার মনে হয় আপনি যে পুং-হরমোনের কথা বলছেন তা হরেক রকম আছে। একটাতে দাড়ি গজায়, আর একটাতে গুঁতিয়ে দেবার অর্থাৎ আক্রমণের শক্তি আসে, আর একটাতে সর্দারি করবার প্রবৃত্তি হয়। তা ছাড়া আরও একটা আছে যা থেকে প্রেমের উৎপত্তি হয়। বোধ হচ্ছে আপনার সেইটের কিঞ্চিৎ অভাব আছে। আপনি কোনও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে অক্রূরবাবু বললেন, তাই করা যাবে।

আমি নমস্কার করে বিদায় নিলুম। তার পরে আর অক্রূর নন্দীর সঙ্গে দেখা হয় নি। শুনেছি তিনি সমস্ত সম্পত্তি দান করে দ্বারকাধামে তপস্বিনী জগদম্বা মাতাজীর আশ্রমে বাস করছেন। ভদ্রলোক শেষকালে আত্মসমর্পণই করলেন। আশা করি তিনি শান্তি পেয়েছেন।

১৩৫৯ (১৯৫২)

বদন চৌধুরীর শোকসভা

বদনচন্দ্র চৌধুরী একজন নবাগত নারকী, সম্প্রতি রৌরবে ভরতি হয়েছেন। যমরাজ আজ নরক পরিদর্শন করে বেড়াচ্ছেন। তাঁকে দেখে বদন হাত জোড় করে উবুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন।

যম বললেন, কি চাই তোমার?

—আজ্ঞে, দু ঘণ্টার জন্যে ছুটি।

—কবে এসেছ এখানে?

—আজ এক মাস হল।

—এর মধ্যেই ছুটি কেন? ছুটি নিয়ে কি করবে?

—আজ্ঞে একবার মর্ত্যলোকে যেতে চাই। আজ বিকেলে পাঁচটার সময় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে আমার জন্যে শোকসভা হবে, বড্ড ইচ্ছে করছে একবার দেখে আসি।

যমালয়ের নিবন্ধক অর্থাৎ রেজিস্ট্রার চিত্রগুপ্ত কাছেই ছিলেন। যম তাঁকে প্রশ্ন করলেন, এই প্রেতটার প্রাক্তন কর্ম কি?

চিত্রগুপ্ত বললেন, এর পূর্বনাম বদনচন্দ্র চৌধুরী, পেশা ছিল ওকালতি তেজারতি আর নানা রকম ব্যবসা। প্রায় দশ বছর করপোরেশনের কাউন্সিলার আর পাঁচ বছর বিধান সভার সদস্য ছিল। এক মাস হল এখানে এসেছে, হরেক রকম বজ্জাতির জন্য হাজার বছর নরক-বাসের দণ্ড পেয়েছে। এখন রৌরব নরকে গ-বিভাগে আছে। বর্তমান আচরণ ভালই। ঘণ্টা দুই-এর জন্য ছুটি মঞ্জুর করা যেতে পারে। শোকসভায় ওর বন্ধু আর স্তাবকরা কে কি বলে তা শোনবার জন্য আগ্রহ হওয়া ওর পক্ষে স্বাভাবিক।

—ও খবর পেলে কি করে যে আজ শোকসভা হবে?

—খবরের অভাব কি ধর্মরাজ, রোজ কত লোক মরছে আর সোজা নরকে চলে আসছে। তাদের কাছে থেকেই খবর পেয়েছে।

যম আজ্ঞা দিলেন, বেশ, দু ঘণ্টার জন্য ওকে ছেড়ে দাও, সঙ্গে একজন প্রহরী থাকে যেন।

চিত্রগুপ্ত হাঁক দিয়ে বললেন, ওহে কাকজঙ্ঘ, তুমি এই পাপীর সঙ্গে মর্ত্যলোকে যাও। দেখো যেন নতুন পাপ কিছু না করে। ঠিক দু ঘণ্টা পরেই ফেরত আনবে।

যে আজ্ঞে বলে যমদূত কাকজঙ্ঘ বদন চৌধুরীর হাত ধরে যমালয় থেকে বেরিয়ে গেল।

অনন্তর যমরাজ অন্য এক মহলে এলেন। তাঁকে দেখে ঘনশ্যাম ঘোষাল কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডবৎ হলেন।

যম বললেন, তোমার আবার কি চাই?

—আজ্ঞে, দু ঘণ্টার জন্যে ছুটি। একবার মর্ত্যলোকে যেতে চাচ্ছি।

—তোমারও শোকসভা হবে নাকি? এখানে এসেছ কবে?

—দু বছর হল এখানে এসেছি, রৌরবে থ-বিভাগে আছি। আমার জন্যে কেউ শোকসভা করে নি প্রভু। বন্ধুরা বড়ই নিমক-হারাম, আমার মৃত্যুর পর আমারই 'কালকেতু' কাগজে

মোটে আধ-কলম ছেপেছিল, একটা ভাল ছবি পর্যন্ত দেয় নি। বদন চৌধুরী আমার বন্ধু ছিলেন, তাঁরই শোকসভায় যাবার জন্য ছুটি চাচ্ছি।

চিত্রগুপ্ত তাঁর খাতা দেখে বললেন, তুমি অতি পাজী প্রেত, যমালয়ে এসেও মিছে কথা বলছ। তোমার কাগজে তো চিরকাল বদন চৌধুরীকে গালাগালি দিয়েছ।

—আজ্ঞে, সম্পাদকের কঠোর কর্তব্য হিসেবে তা করতে হয়েছে। কিন্তু আগে বদনের সঙ্গে আমার খুব হৃদ্যতা ছিল, পরে মনান্তর হয়। এখন মরণের পর শত্রুতার অবসান হয়েছে, মরণান্তানি বৈরাণি, আমরা আবার বন্ধু হয়ে গেছি।

যম চিত্রগুপ্তকে বললেন, যাক গে, দু ঘণ্টার জন্য একেও ছেড়ে দিতে পার। সঙ্গে যেন একটা প্রহরী থাকে।

চিত্রগুপ্তের আদেশে যমদূত ভৃঙ্গরোল ঘনশ্যামের সঙ্গে গেল।

পরলোকগত বদন চৌধুরীর শোকসভায় খুব লোকসমাগম হয়েছে। বেদীর উপরে আছেন সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ রায়বাহাদুর গোবর্ধন মিত্র, তাঁর ডান পাশে আছেন প্রধান বক্তা প্রবীণ অধ্যাপক আঙ্গিরস গাঙ্গুলী, বাঁ পাশে আছেন বদনের বন্ধু ও সভার আয়োজক ব্যারিস্টার কোকিল সেন। আরও কয়েকজন গণ্যমান্য লোক কাছেই বসেছেন। বক্তাদের জন্য দুটো মাইক্রোফোন খাড়া হয়ে আছে এবং সভার বিভিন্ন স্থানে গোটা কতক লাউড স্পীকার বসানো হয়েছে।

বদন চৌধুরী তাঁর রক্ষী যমদূতের সঙ্গে বেদীর উপরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঘনশ্যাম ঘোষালকে দেখে বললেন, তুমি কি মতলবে এখানে এসেছ? সভা পণ্ড করতে চাও নাকি?

ঘনশ্যাম বললেন, আরে না না, পণ্ড করব কেন, তুমি হলে আমার পুরনো বন্ধু। তোমার গুণকীর্তন শুনে প্রাণটা ঠাণ্ডা করতে এসেছি। যমরাজ আজ খুব সদয় দেখছি, দু-দুটো নারকীকে ছুটি দিয়েছেন।

প্রধান বক্তা আঙ্গিরস গাঙ্গুলীর পিছনে বদন চৌধুরী এবং সভাপতি গোবর্ধন মিত্রের পিছনে ঘনশ্যাম ঘোষাল দাঁড়ালেন। দুই যমদূত নিজের নিজের বন্দীর কাঁধে হাত দিয়ে রইল। সভার কোনও লোক এই চার জনের অস্তিত্ব টের পেলে না।

প্রথমেই শ্রীযুক্তা ভূপালী বসুর পরিচালনায় সংগীত হল।—আজি স্মরণ করি পুণ্য চরিত বদনচন্দ্র চৌধুরীর, সেই স্বর্গগত রাজর্ষির; লোকমান্য অগ্রগণ্য কর্মযোগী ধর্মবীর।... ইত্যাদি। গান থামলে বাঁশি আর মাদলের করুণ সংগত সহযোগে কুমারী লুলু চ্যাটার্জি একটি সময়োচিত শোকনৃত্য নাচলেন। তার পর সভাপতির আজ্ঞাক্রমে অধ্যাপক আঙ্গিরস গাঙ্গুলী মৃত মহাত্মার কীর্তিকথা সবিস্তারে বলতে লাগলেন।—

আজ যাঁর স্মৃতিতর্পণের জন্য আমরা এখানে এসেছি তিনি আমাদের শোকসাগরে নিমজ্জিত করে দিব্যধামে গেছেন, কিন্তু আমি স্পষ্ট অনুভব করছি যে তাঁর আত্মা এই সভায় উপস্থিত থেকে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করছেন। স্বর্গত বদনচন্দ্র চৌধুরী আকারে চরিত্রে কর্মে ধর্মে এক লোকোত্তর মহীয়ান পুরুষ ছিলেন। তাঁর এই তৈলচিত্রের দিকে চেয়ে দেখুন, কি বিরাট সৌম্য মূর্তি! নিবিড় শ্যামবর্ণ শালপ্রাংশু বিশাল বপু, পদ্মপলাশ নেত্র, আবক্ষ-লম্বিত শ্মশ্রু। তিনি একাধারে কর্মযোগী ধর্মযোগী আর জ্ঞানযোগী ছিলেন, যেমন উপার্জন করেছেন তেমনি বহুবিধ সৎকার্যে ব্যয়ও করেছেন। এক কথায় তিনি যে একজন খাঁটি রাজর্ষি ছিলেন তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আশা করি তাঁর উপযুক্ত পুত্রগণ তাঁদের পুণ্যশ্লোক পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন।...এই রকম বিস্তর কথা আঙ্গিরসবাবু এক ঘণ্টা ধরে শোনালেন।

ঘনশ্যাম জনান্তিকে বললেন, আহা, কানে যেন মধু ঢেলে দিলে, নয় হে বদন?

তার পর একজন তরুণ কবি একটি গদ্য কবিতা পাঠ করলেন।

—আকাশের গায়ে সোনালী আঁচড়। কিসের দাগ ওটা? দিব্যরথের টায়ারের কর্ষণ। ওই সড়কে বদনচন্দ্র দেবযানে গেছেন। কে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে? উর্বশী না আফ্রোদিতি?...ইত্যাদি।

আরও কয়েকজন বক্তৃতা দেবার পর ব্যারিস্টার কোকিল সেন দাঁড়ালেন। পূর্বের বক্তারা যেটুকু বাকী রেখেছিলেন তা নিঃশেষে বিবৃত করে ইনি বললেন, আমি প্রস্তাব করছি, সেই স্বর্গগত মহাপুরুষের একটি মর্মরমূর্তি দেশবন্ধু বা দেশপ্রিয় পার্কে স্থাপন করা হক, এবং তদুদ্দেশ্যে চাঁদা তোলা আর অন্যান্য ব্যবস্থার জন্য অমুক অমুক অমুককে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হক।

পিছনের বেঞ্চ থেকে একজন শ্রোতা বললেন, বদন চৌধুরীকে আমরা বিলক্ষণ জানতুম। মরা মানুষের নিন্দে করতে চাই না, কিন্তু তার মূর্তির জন্য আমরা কেউ এক পয়সা চাঁদা দেব না।

সভায় হাততালি হল, প্রথমে অল্প, যেন ভয়ে ভুয়ে, তার পর খুব জোরে। গোলমাল থামলে কোকিল সেন বললেন, আমরা অশ্রদ্ধার দান চাই না, মৃত মহাপুরুষের পুত্রগণই সব খরচ দেবেন। বেদীর উপর থেকে একজন আস্তে আস্তে বললেন, হিয়ার হিয়ার।

অতঃপর সভাপতি গোবর্ধন মিত্রের বক্তৃতার পালা। জজিয়তির সময় তিনি লম্বা লম্বা রায় দিয়েছেন, দু-চারটে ফাঁসির হুকুমও তাঁর মুখ থেকে বেরিয়েছে। কিন্তু সভায় কিছু বলতে গেলেই তিনি নার্ভাস হয়ে পড়েন। তাঁর বক্তব্য কোকিল সেনই লিখে দিয়েছেন। গোবর্ধনবাবু দাঁড়িয়ে উঠে তাঁর ভাষণটি পড়বার উপক্রম করছেন, এমন সময় হঠাৎ ঘনশ্যাম তড়াক করে লাফিয়ে তাঁর কাঁধে চড়লেন। যমদূত ভৃঙ্গরোল আটকাতে গেল, কিন্তু ঘনশ্যাম নিমেষের মধ্যে গোবর্ধনবাবুর কানের ভিতর দিয়ে তাঁর মরমে প্রবেশ করলেন।

মানুষের শরীরের মধ্যে যেটুকু ফাঁক আছে তাতে একটা আত্মা কোনও গতিকে থাকতে পারে, কিন্তু একসঙ্গে দুটো আত্মার জায়গা নেই। ঘনশ্যাম ঢুকে পড়ায় গোবর্ধনবাবুর নিজের আত্মাটি কোণঠাসা হয়ে গেল, তাকে দাবিয়ে রেখে ঘনশ্যামের প্রেতাত্মা তারস্বরে বক্তৃতা শুরু করলে।—

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ আমার বেশী কিছু বলবার নেই। শেষের বেঞ্চের ওই ভদ্রলোকটি যা বলেছেন তা খুব খাঁটি কথা। বদন চৌধুরীকে আমরা বিলক্ষণ জানতুম। যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন সে নিজের ঢাক নিজে পিটেছে। এখন সে মরেছে, তবু আমরা রেহাই পাই নি। তার খোশামুদে আত্মীয়স্বজন তাকে দেবতা বানাবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। কিন্তু এখন আর ধাপ্পাবাজি চলবে না। বদন স্বর্গে যায় নি, নরকেই গেছে। অমন জোচ্চোর ছ্যাঁচড় হারামজাদা লোক আর হবে না মশাই, কত মক্কেলের সর্বনাশ করেছে, করপোরেশনে আর অ্যাসেম্‌ব্লিতে থাকতে হাজার হাজার টাকা ঘুষ খেয়েছে, পারমিটে আর কালোবাজারে লক্ষ লক্ষ টাকা—

বদন চৌধুরী চুপ করে থাকতে পারলেন না। যমদূত কাকজঙ্ঘকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে তিনি অধ্যাপক আঙ্গিরস গাঙ্গুলীর শরীরে ভর করলেন। দ্বিতীয় মাইকটা টেনে নিয়ে চিৎকার করে বললেন, আপনারা বুঝতেই পারছেন যে আমাদের মাননীয় সভাপতি মশাই প্রকৃতিস্থ হয়ে নেই। যে লোকটা পুণ্যশ্লোক রাজর্ষি বদনচন্দ্রের ঘোর শত্রু ছিল, সেই নটোরিয়স কাগজী গুণ্ডা কালকেতু-সম্পাদক ঘনা ঘোষালের প্রেতই সভাপতির ঘাড়ে চেপেছে এবং এই অসহায় গোবেচারা ভদ্রলোকের মুখ দিয়ে অশ্রাব্য কথা বলছে—

সভাপতির জবানিতে ঘনশ্যাম বললেন, একেবারে ডাহা মিথ্যে কথা। সেই বজ্জাত বদনার ভূতই আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আঙ্গিরস গাঙ্গুলী মশাইকে কাবু করে যা তা বলছে—

আঙ্গিরস গাঙ্গুলীর মারফত বদন চৌধুরী বললেন, আপনারা কি সেই ব্লাকমেলার শয়তান ঘনা ঘোষালকে ভুলে গেলেন? ব্যাটা টাকা খেয়ে তার কাগজে কালোবাজারী চোরদের প্রশংসা ছাপত, টাকা না পেলে গাল দিত। মন্ত্রীদের ভয় দেখিয়ে সে নিজের ওয়ার্থলেস ছেলে মেয়ে শালা শালীদের জন্যে ভাল ভাল চাকরি যোগাড় করেছিল। স্বর্গত মহাত্মা বদন চৌধুরী তাকে ঘুষ দেন নি সেই রাগে ঘনা ঘোষালের ভূত আজ নরককুণ্ডু থেকে উঠে এসে এখানে কুৎসা রটাচ্ছে। ওর দুর্গন্ধে সভা ভরে গেছে, টের পাচ্ছেন না? ভূতের কথায় কান দেবেন না আপনারা।

সভায় তুমুল কোলাহল উঠল। একজন ষণ্ডা গোছের লোক একটা চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে বললে, ভূত টুত গ্রাহ্য করি না মশাই, আমার নাম রামলাল সিংগি। ভূত আমার সম্বন্ধী, শাঁকচুন্নী আমার শাশুড়ী। আসল কথা কি জানেন—আমাদের গোবর্ধনবাবু আর আঙ্গিরস-বাবু খুব মহাশয় লোক, কিন্তু দুজনেই বেশ টেনে এসেছেন, নেশায় চুচ্চুরে হয়ে বক্তিমে করছেন। বদন চৌধুরী মরেছে. সবাই মিলে শোকসভা করছিস, এ বহুত আচ্ছা। তোরা গান শুনবি. নাচ দেখবি. দুটো হা-হুতোশ করবি, বুক চাপড়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিবি, আউর ভি আচ্ছা। কিন্তু একি কাণ্ড, দু হাজার লোকের সামনে মাতলামি করছিস! আরে ছ্যা ছ্যা। আমরা যা করি নিজের আড্ডায় করি, সভায় দাঁড়িয়ে এমন বেলেল্লাপনা করি না। হাঁ মশাই, হক কথা বলব।

এই সময়ে দুই যমদূত গোবর্ধন মিত্র আর আঙ্গিরস গাঙ্গুলীর কানে কানে বললে, বেরিয়ে এস শীগ্‌গির. দু ঘণ্টা কাবার হয়েছে। দুই প্রেতাত্মা সুড়ুৎ করে বেরিয়ে এল, যমদূতরা তখনই তাদের নিয়ে উধাও হল।

শরীর থেকে প্রেত নিষ্ক্রান্ত হওয়া মাত্র গোবর্ধনবাবু আর আঙ্গিরসবাবু মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। ভাগ্যক্রমে একজন ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন, তাঁর চেষ্টায় এঁরা শীঘ্রই চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। ডাক্তার বললেন, এই দুটো গেলাসের শরবৎ এঁরা খেয়েছিলেন। টেস্ট করা দরকার, নিশ্চয় কোনও বদ লোক ভাঙ কিংবা ধুতরো মিশিয়ে দিয়েছিল।

প্রেততত্ত্ববিশারদ হারাধন দত্ত ঘাড় নেড়ে বললেন, উঁহু, সিদ্ধি গাঁজা ধুতরো নয়, মদও নয়, ওসব আমার ঢের পরীক্ষা করা আছে। এ হল আসল ভৌতিক ব্যাপার মশাই, আজ আপনারা স্বকর্ণে দুই প্রেতের ঝগড়া শুনেছেন। এর ফল বড় খারাপ, বাড়ি গিয়ে কানে একটু তুলসীপাতার রস দেবেন।

সভা ভেঙে গেল।

১৩৫৯ (১৯৫২)

যদু ডাক্তারের পেশেণ্ট

ক্যালকাটা ফিজিসার্জিক ক্লাবের সাপ্তাহিক সান্ধ্য বৈঠক বসেছে। আজ বক্তৃতা দিলেন ডাক্তার হরিশ চাকলাদার, এম ডি, এল আর সি পি, এম আর সি এস। মৃত্যুর লক্ষণ সম্বন্ধে তিনি অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথা বললেন। চার-পাঁচ ঘণ্টা শ্বাস-রোধের পরেও আবার নিঃশ্বাস পড়ে, ফাঁসির পরেও কিছুক্ষণ হৃৎস্পন্দন চলতে থাকে, দুই হাত দুই পা কাটা গেলে এবং দেহের অর্ধেক রক্ত বেরিয়ে গেলেও মানুষ বাঁচতে পারে, ইত্যাদি। অতএব রাইগার মর্টিস না হওয়া পর্যন্ত, অর্থাৎ দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় কুঁকড়ে আড়ষ্ট হয়ে না গেলে একেবারে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না।

বক্তৃতা শেষ হলে যথারীতি ধন্যবাদ দেওয়া হল, কেউ কেউ নানা রকম মন্তব্যও করলেন। বক্তার সহপাঠী ক্যাপ্টেন বেণী দত্ত বললেন, ওহে হরিশ, তুমি বড্ড হাতে রেখে বলেছ। আসল কথা হচ্ছে, ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা না হলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। শিবপুরের দশরথ কুণ্ডুর কথা শোন নি বুঝি? বুড়ো হাড়-কঞ্জুস, অগাধ টাকা, মরবার নামটি নেই। ছেলে রামচাঁদ হতাশ হয়ে পড়ল। অবশেষে একদিন বুড়ো মুখ থুবড়ে পড়ে গেল, নিঃশ্বাস বন্ধ হল নাড়ী থামল, শরীর হিম হয়ে সিটকে গেল। ডাক্তার বললে, আর ভাবনা নেই রামচাঁদ, তোমার বাবা নিতান্তই মরেছেন। রামচাঁদ ঘটা করে বাপকে ঘাটে নিয়ে গেল, বিস্তর চন্দন কাঠ দিয়ে চিতা সাজালে, তার পর যেমন খড়ের নুড়ো জেবলে মুখাগ্নি করতে যাবে অমনি বুড়ো উঠে বসল। অ্যাঁ, এসব কি?—বলেই ছেলের গালে এক চড়।

সবাই ভয়ে পালাল। বুড়ো গটগট করে বাড়ি ফিরে এসে ঘটককে ডাকিয়ে এনে বললে, রেমোকে ত্যাজ্যপুত্তুর করলুম, আমার জন্যে একটা পাত্রী দেখ।

সভাপতি ডাক্তার যদুনন্দন গড়গড়ি একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছিলেন। এঁর বয়স এখন নব্বুই, শরীর ভালই আছে, তবে কানে একটু কম শোনেন আর মাঝে মাঝে খেয়াল দেখে আবোল-তাবোল বকেন। ইনি কোথায় ডাক্তারি শিখেছিলেন, কলকাতার কি বোম্বাইএ কি রেঙ্গুনে, তা লোকে জানে না। কেউ বলে, ইনি সেকেলে ভি এল এম এস। কেউ বলে ওসব কিছু নন, ইনি হচ্ছেন খাঁটী হ্যামার-ব্র্যান্ড, অর্থাৎ হাতুড়ে। নিন্দুকরা যাই বলুক, এককালে এঁর অসংখ্য পেশেণ্ট ছিল, সাধারণ লোকে এঁকে খুব বড় সার্জেন মনে করত। প্রায় পঁচিশ বৎসর প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়ে ইনি এখন ধর্মকর্ম সাধুসঙ্গ আর শাস্ত্রচর্চা নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। ক্লাবের বাড়িটি ইনিই করে দিয়েছেন, সেজন্য কৃতজ্ঞ সদস্যগণ এঁকে আজীবন সভাপতি নির্বাচিত করেছেন। সকলেই এঁকে শ্রদ্ধা করেন, আবার আড়ালে ঠাট্টাও করেন।

হাসির শব্দে ডাক্তার যদু গড়গড়ির ঘুম ভেঙে গেল। মিটমিট করে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, ব্যাপারটা কি?

হরিশ চাকলাদার বললেন, আজ্ঞে বেণী বলছে, ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা না হলে মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।

যদু ডাক্তার বললেন, এই বেণীটা চিরকেলে মুখখু। বিলেত থেকে ফিরে এসে মনে করেছে ও সবজান্তা হয়ে গেছে। জীবনমৃত্যুর তুমি কতটুকু জান হে ছোকরা?

ক্যাপ্টেন বেণী দত্ত ছোকরা নন, বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে। হাতজোড় করে বললেন, কিছুই জানি না সার আমি তামাশা করে বলেছিলুম।

—তামাশা! মরণ-বাঁচন নিয়ে তামাশা!

যদু ডাক্তার চিরকালই দুর্মুখ, তাঁর অত পসার হওয়ার এও একটা কারণ। লোকে মনে করত, রোগী আর তার আত্মীয়দের যে ডাক্তার বেপরোয়া ধমক দেয় সে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি। বয়স বৃদ্ধির ফলে তাঁর মেজাজ আরও খিটখিটে হয়েছে, কিন্তু তাঁর কটুবাক্যে কেউ রাগ করে না। তাঁকে শান্ত করবার জন্য ডাক্তার অশ্বিনীকুমার সেন এম বি বি এস, কবিরত্ন, বৈদ্যশাস্ত্রী বললেন, সার, আজকের সাবজেক্ট সম্বন্ধে আপনি কিছু বলুন।

যদু ডাক্তার বললেন, আমার কথা তোমরা বিশ্বাস করবে কেন, আমার তো এখন ডোটেজ, যাকে বলে ভীমরতি।

অশ্বিনী সেন বললেন, সে তো মহা ভাগ্যের কথা। সাতাত্তর বৎসরের সপ্তম মাসের সপ্তম রাত্রির নাম ভীমরথী। আপনি তা বহুকাল পার হয়েছেন। আমাদের শাস্ত্রে বলে, এই দুস্তরা রাত্রি অতিক্রম করে যিনি বেঁচে থাকেন তাঁর প্রতিদিনই যজ্ঞ, তাঁর চলা-ফেরা বিষ্ণুপ্রদক্ষিণের সমান, তাঁর বাক্যই মন্ত্র, নিদ্রাই ধ্যান, যে অন্ন খান তাই সুধা। আপনার কথা বিশ্বাস করব না—সে কি একটা কথা হল?

—কিন্তু ওই বেণী কাপ্তেন? ও বিশ্বাস করবে?

বেণী দত্ত আবার হাতজোড় করে বললেন, নিশ্চয় করব সার, যা বলবেন তা বেদবাক্য বলে মেনে নেব।

যদু ডাক্তার প্রসন্ন হয়ে বললেন, নেহাত যদি শুনতে চাও তো শোন। কিন্তু তোমরা হয়তো ভয় পাবে।

বেণী দত্ত বললেন, যদি ভুতুড়ে কান্ড না হয় তবে ভয় পাব কেন সার?

—না না, ভুতুড়ে নয়। কিন্তু যে কেস-হিস্টরি বলছি তা অতি ভীষণ; অথচ এতে শুধু সার্জারির ক্লাইম্যাক্স নয়, প্রেমেরও পরাকাষ্ঠা পাবে।

—বাঃ, বিভীষিকা সার্জারি আর প্রেম, এর চাইতে ভাল কম্বিনেশন হতেই পারে না। আপনি আরম্ভ করুন সার, আমরা শোনবার জন্য ছটফট করছি।

ডাক্তার যদুনন্দন গড়গড় বলতে লাগলেন।—প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা। তখন তোমাদের সালফা পেনিসিলিন আর স্ট্রেপ্টো ক্লোরো না টেরা কি বলে গিয়ে—এ সব রেওয়াজ হয় নি। কারও বাড়িতে অপারেশন হলে আয়োডোফর্মের খোশবায়ে পাড়া সুদ্ধ মাত হয়ে যেত, লোকে বুঝত, হাঁ, চিকিৎসা হচ্ছে বটে। আমি তখন কালীঘাটে বাস করতুম। আমার বাড়ির কাছে এক তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষ থাকতেন, নাম বিঘোরানন্দ, তিনি কামরূপ-কামাখ্যায় আর তিব্বতে নহু বৎসর সাধনা করেছিলেন। ভক্তরা তাঁকে বিঘোর বাবা বা শুধু বাবাঠাকুর বলত। বয়স ষাট-পঁয়ষট্টি, লম্বা-চওড়া চেহারা, ঘোর কাল রং, একমুখ দাড়ি-গোঁফ দেখলেই ভক্তিতে মাথা নীচু হয়ে আসে। আমি তাঁর কার্বংকল অপারেশন করেছিলুম। একটু চাংগা হবার পর একগোছা নোট আমার হাতে দেবার চেষ্টা করলেন। হাত টেনে নিয়ে আমি বললুম, করেন কি, আপনার কাছে কি আমি ফী নিতে পারি! বিঘোর বাবা একটু হেসে বললেন, তুমি না নিলেও ও টাকা তোমার হয়ে গেছে। কথাটার মানে তখন বুঝতে পারি নি, তাঁকে নমস্কার করে বিদায় নিলুম।

বাড়ি ফিরে এসে পকেটে হাত দিয়ে দেখি একটা ভূর্জপত্রের মোড়কে দশটা গিনি রয়েছে। বুঝলুম বিঘোর বাবার দান তাঁর অলৌকিক শক্তিতে আমার পকেটে চলে এসেছে। তার পর থেকে মাঝে মাঝে তাঁর কাছে যেতুম, নানা রকম আশ্চর্য তত্ত্বকথা শুনতুম। বছর খানিক পরে তিনি কালীঘাট থেকে চলে গেলেন, তাঁর একজন বড়লোক ভক্ত ত্রিবেণীর কাছে গঙ্গার ধারে একটি আশ্রম বানিয়ে দিয়েছিলেন, সেখানেই গিয়ে রইলেন। একাই থাকতেন, তবে ভক্তরা মাঝে মাঝে তাঁকে দেখতে যেত।

তার পর দু বৎসর তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি, খবরও কিছু পাই নি। একদিন বেলা বারোটায় বাড়ি ফিরে এসেছি, একটা হার্নিয়া, দুটো অ্যাপেনডিক্স, তিনটে টিউমার, চারটে টনসিল, আর গোটা পাঁচেক হাইড্রোসিল অপারেশন করে অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করছি। নাওয়া খাওয়ার পর স্ত্রীকে বললুম, আমি বিকেল চারটে পর্যন্ত ঘুমুব, খবরদার কেউ যেন না ডাকে। কিন্তু ঘুমুবার জো কি। ঘণ্টা খানিক পরেই ঠেলা দিয়ে গিন্নী বললেন, ওগো শুনছ, জরুরী তার এসেছে। বললুম, ছিঁড়ে ফেলে দাও। গিন্নী বললেন, এ যে বিঘোর বাবার তার। অগত্যা টেলিগ্রামটা পড়তে হল। লিখছেন—এখনই চলে এস, মোস্ট আর্জেণ্ট কেস।

তখনই মোটরে রওনা হলুম। ব্যাগটা সঙ্গে নিলুম, তাতে শুধু মামুলী সরঞ্জাম ছিল, কি রকম কেস কিছুই জানা নেই সেজন্য বিশেষ কোনও ওষুধপত্র নিতে পারলুম না। শীত-কাল, পৌঁছুতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। বিঘোর বাবার আশ্রমটি ত্রিবেণীর কাছে কাগমারি গ্রামে গঙ্গার ধারে। খুব নির্জন স্থান, কাছাকাছি লোকালয় নেই। গাড়ি থেকে নেমে আশ্রমের আগড় ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই বিঘোর বাবার সঙ্গে দেখা। পরনে লাল চেলির জোড়, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, পায়ে খড়ম, হুঁকো হাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাক খাচ্ছেন। আমাকে দেখে বললেন, এস ডাক্তার। যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, এঁর কোনও ফ্যাসাদ হয় নি। প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলুম, পেশেণ্ট কে? কি হয়েছে? বললেন, ঘরের ভেতর এস, স্বচক্ষে দেখলেই বুঝবে।

ঘরটি বেশ বড়, কিন্তু আলো অতি কম, এক কোণে পিলসুজের মাথায় পিদিম জ্বলছে, তাতে কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। একটু পরে দৃষ্টি খুললে নজরে পড়ল—ঘরের এক পাশে একটা তক্তাপোশ, বোধ হয় বিঘোর বাবা তাতেই শোন। আর এ পাশে মেঝেতে একটা মাদুরের ওপর দুজন পাশাপাশি চিত হয়ে চোখ বুজে শুয়ে আছে, একখানা কম্বল দিয়ে সমস্ত শরীর ঢাকা, শুধু মুখ দুটো বেরিয়ে আছে। একজন পুরুষ, জোয়ান বয়স, বোধ হয় পঁচিশ, মুখে দাড়ি গোঁফ, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। আর একজন মেয়ে, বয়স আন্দাজ কুড়ি, কালো কিন্তু সুশ্রী, ঝুঁটিবাঁধা খোঁপা, সিঁথিতে সিঁদুর।

জিজ্ঞাসা করলুম, স্বামী-স্ত্রী?

বিঘোর বাবা উত্তর দিলেন, উঁহু, প্রেমিক-প্রেমিকা।

—কি হয়েছে?

—নিজেই দেখ না।

স্টেথোস্কোপটি গলায় ঝুলিয়ে হেঁট হয়ে কম্বলখানা আস্তে আস্তে সরিয়ে ফেললুম। তার পরেই এক লাফে পিছনে ছিটকে এলুম। কম্বলের নীচে কিছু নেই, শুধু দুটো মুণ্ডু পাশাপাশি পড়ে আছে।

ভয়ও হল রাগও হল। বিঘোর বাবাকে বললুম, আমাকে এরকম বিভীষিকা দেখাবার মানে কি? এ তো ক্রিমিন্যাল কেস, যা করতে হয় পুলিস করবে, আমার কিছু করবার নেই। কিন্তু আপনি যে মহাবিপদে পড়বেন। বাবা শুধু একটু হাসলেন। তারপর দেখলুম, পুরুষ-

মুণ্ডুটা পিটপিট করে তাকিয়ে চিঁ চিঁ করে বলছে, মরি নি ডাক্তারবাবু। মেয়ে-মুণ্ডুটাও ডাইনে বাঁয়ে একটু নড়ে উঠল।

ডিসেকশন রুমে বিস্তর মড়া ঘেঁটেছি, হরেক রকম বীভৎস লাশ দেখেছি, কিন্তু এমন ভয়ংকর পিলে-চমকানো ব্যাপার কখনও দৃষ্টিগোচর হয় নি। আমি আঁতকে উঠে পড়ে যাচ্ছিলুম, বিঘোর বাবা আমাকে ধরে ফেলে বললেন, ওহে গড়গড়ি ডাক্তার, ভয় নেই, ভয় নেই, মুণ্ডু কাটা গেছে কিন্তু আমি এদের বাঁচিয়ে রেখেছি। মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শুনেছ? তার প্রভাবে এরা এখনও বেঁচে আছে।

সেই শীতে আমার গা দিয়ে ঘাম ঝরছিল। কোনও রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললুম, এদের ধড় কোথায় গেল?

—ওই যে, ওই কোণটায় কম্বলের নীচে পাশাপাশি শুয়ে আছে।

বিঘোর বাবা আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে বললেন, এই ধড় দুটোও বাঁচিয়ে রেখেছি, দেখ না তোমার চোঙা লাগিয়ে।

স্টেথেস্কোপের দরকার হল না। বুকে হাত দিয়ে দেখলুম হার্ট আর লংস ঠিক চলছে, তবে একটু ঢিমে। বিঘোর বাবাকে বললুম, ধন্য আপনার সাধনা, বিলিতী বিজ্ঞানের মুখে আপনি জুতো মেরেছেন। কিন্তু এতই যদি পারেন তবে ধড় আর মুণ্ডু আলাদা রেখেছেন কেন। জুড়ে দিলেই তো লেঠা চুকে যায়।

বিঘোর বাবা বললেন, তা আমার কাজ নয়। আমি মৃতসঞ্জীবনী জানি, কিন্তু খণ্ড-যোজনী বিদ্যা আমার আয়ত্ত নয়। ও হল মুচী বা ডাক্তারের কাজ। মুচী আবার লাশ ছোঁবে না, তার মোটরও নেই যে এই অবেলায় এত দূরে আসবে, তাই তোমাকে ডেকেছি। তুমি ধড়ের সংগে মুণ্ডু সেলাই করে দাও।

আমি নিবেদন করলুম, বাইরের চামড়া সেলাই করলেই তো গলার হাড় আর নলী জুড়বে না। সার্কুলেশন রেস্পিরেশন এবং স্পাইন্যাল কর্ডের সংগে ব্রেনের যোগ কি করে হবে? সেরিব্রেশন অর্থাৎ মস্তিষ্কের ক্রিয়া চলবে কি করে?

—কেন চলবে না? দুই ভুরুর মধ্যে আজ্ঞাচক্র ঘুরছে, তাতেই পঞ্চেন্দ্রিয় আর মনের ক্রিয়া চলছে। কাটা মুণ্ডু কথা কয়েছে তা তো তুমি স্বকর্ণে শুনেছ। কোনও চিন্তা নেই, তুমি সেলাই করে ফেল।

আমি বললুম, সেলাইএর উপযুক্ত বাঁকা ছুঁচ আর ক্যাটগট তো আমার সংগে নেই, আর সেপসিস অর্থাৎ পচ বন্ধ করব কি করে?

—তোমাকে একটা গুনছুঁচ আর সুতলি দড়ি দিচ্ছি। পচবার ভয় নেই, দেখছ না, কাটা জায়গায় গংগামৃত্তিকা লেপন করে দিয়েছি। ওই কাদা সুদ্ধ সেলাই করে দাও।

বড়ই মুশকিলে পড়া গেল। আয়োজন কিছুই নেই, অ্যাসিস্টাণ্ট নেই, নার্স নেই অপারেশন টেব্‌ল নেই, আলো পর্যন্ত নেই, অথচ বিঘোরানন্দ আমাকে এমন সার্জারি করতে বলছেন, যা কস্মিন্‌ কালে কোথাও হয় নি—

ক্যাপ্টেন বেণী দত্ত বললেন, হয়েছিল সার—গজানন গণেশ আর অজানন দক্ষ।

—আরে তারা হলেন দেবতা। আচ্ছা বেণী, আজকাল বড় অপারেশনের আগে তোমরা নাকি হরেক রকম টেস্ট করাও?

—আজ্ঞে হাঁ। ব্লাড-প্রেশার, ব্লাড-কাউণ্ট, ব্লাড-শুগার, এক্স-রে ফোটো, কার্ডিওগ্রাম প্রভৃতি মামুলী রুটিন টেস্ট তো আছেই, তা ছাড়া নন-প্রোটিন নাইট্রোজেন, টোটাল হেভি হাইড্রোজেন, বডি-ফ্যাটের আয়োডিন-ভ্যালু, হাড়ের ইলাস্টিসিটি, দাঁতের রেডিও-অ্যাকটিভিটি চামড়ার স্পেকট্রোগ্রাম—এসবও দেখা দরকার। অধিকন্তু রোগী আর তার আত্মীয়দের

ইন্‌টেলিজেন্স কোশণ্ট টেস্ট করালে খুব ভাল হয়। শাঁসালো পেশেণ্ট হলে অন্তত বিশজন স্পেশ্যালিস্টের রিপোর্ট নেওয়া চাই। আর গরিব পেশেণ্টকে বলে দিই, উঁচু দরের চিকিৎসা তোমার সাধ্য নয় বাপু, দাতব্য হোমিওপ্যাথিক খাও গিয়ে, না হয় পাঁচ সিকের মাদুলি ধারণ কর।

যদু ডাক্তার বললেন, আমাদের আমলে অত সব ছিল না, জিব আর নাড়ী, থার্মমিটার আর স্টেথোস্কোপ, এতেই যা করে। আর এই দুই পেশেণ্টের তো চূড়ান্ত অপারেশন মুণ্ডচ্ছেদ আগেই হয়ে গেছে, এখন টেস্ট করা বৃথা। যাক, তার পর যা হয়েছিল শোন। আমাকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখে বিঘোরানন্দ আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, অত মাথা ঘামিও না ডাক্তার, শুধু সেলাই করে দাও, বাকীটুকু কুলকুণ্ডলিনী নিজেই করে নেবেন।

আমি বললুম, বাবাঠাকুর, ধড়ের সঙ্গে মুণ্ডু সেলাই করা সার্জনের কাজ নয়, থিয়েটারের বাবা মুস্তাফার কাজ। বেশ, আপনার আজ্ঞা পালন করব, কিন্তু এই দুজনের হিস্টরি তো বললেন না, এদের এমন দশা হল কি করে?

বিঘোরানন্দ এই ইতিহাস বললেন।—মেয়েটার নাম পঞ্চী, ওর বাপ হরি কামার বাঁশ-বেড়েতে থাকে। পঞ্চীর বিয়ে হয়েছে এই কাগমারি গ্রামের রমাকান্ত কামারের সঙ্গে। রমাকান্ত লোকটা অতি দুর্দান্ত, দেখতে যমদূতের মতন, বদরাগী আর মাতাল। সে জমিদার-বাড়িতে প্রতি বৎসর নবমী পুজোয় এক শ আটটা পাঁঠা, দশটা ভেড়া, আর গোটা দুই মোষ এক এক চোপে কাটে। পঞ্চী তাকে বিয়ে করতে চায় নি, তার বাপ টাকার লোভে জোর করে বিয়ে দিয়েছে। রমাকান্ত বজ্জাত হলেও আমাকে খুব ভক্তি করে, আমার অনেক ফরমাশও খাটে। সে পঞ্চীর ওপর অকথ্য অত্যাচার করত, আমি ধমক দিয়েও কিছু করতে পারি নি। এ রকম ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে তাই হল। ওই যে পুরুষটার মুণ্ডু দেখছ, ওর নাম জটিরাম বৈরাগী—তোর দেশের লোক, নয় রে পঞ্চী?

পঞ্চীর মাথা ওপর নীচে একটু নড়ে উঠে সায় দিলে।

—এই জটি ছোকরা কীর্তন গায় ভাল, তার জন্য নানা জায়গা থেকে ওর ডাক আসত। জটিরাম মাঝে মাঝে এই গাঁয়ে এলে পঞ্চীর সঙ্গে দেখা করত, শেষটায় দুজনের প্রেম হল।

পঞ্চীর ভুরু আর ঠোঁট একটু কুঁচকে উঠল।

বিঘোরানন্দ বলতে লাগলেন—রমাকান্ত টের পেয়ে একদিন পঞ্চীকে বেদম মারলে, কিন্তু তাতে কোনও ফল হল না। তার পর গত কাল রাত একটার সময় আমি ঘুমিয়ে আছি এমন সময় দরজার ধাক্কা পড়ল। উঠে দরজা খুলে দেখি, রাম-দা হাতে রমাকান্ত। আমার পায়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, সর্বনাশ করেছি বাবাঠাকুর, এক কোপে দুটোকে সাবাড় করেছি, বাঁচান আমাকে।

ব্যাপারটা এই।—আগের দিন রমাকান্ত পঞ্চীকে বলেছিল, আমি ভদ্রেশ্বর যাচ্ছি, চৌধুরী বাবুদের লোহার গেট তৈরি করতে হবে, চার-পাঁচ দিন পরে ফিরব, তুই সাবধানে থাকিস। সব মিথ্যে কথা। রাত দুপুরে রমাকান্ত চুপি চুপি তার বাড়িতে এল এবং আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে দেখলে পঞ্চী আর জটিরাম পাশাপাশি শুয়ে ঘুমুচ্ছে। দেখেই রাম-দায়ের এক কোপে দুজনের মুণ্ডু কেটে ফেললে। তার পর ভয় পেয়ে আমার কাছে ছুটে এসেছে।

আমি তখনই রমাকান্তর সঙ্গে তার বাড়ি গেলুম। প্রথমেই মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা প্রয়োগ করে পঞ্চী আর জটিরামের সূক্ষ্মশরীর আটকে ফেললুম। তার পর রমাকান্তকে বললুম,

তুই ধড় দুটো কাঁধে করে আশ্রমে নিয়ে চল, মুণ্ডু দুটো আমি নিয়ে যাচ্ছি। আশ্রমে এসে রমাকান্ত আমার উপদেশ মত ধড় এক জায়গায় আর মুণ্ডু আর এক জায়গায় শুইয়ে দিলে। খণ্ডযোজনের আগে পর্যন্ত এই রকম তফাৎ রাখাই তন্ত্রোক্ত পদ্ধতি।

হরিশ চাকলাদার প্রশ্ন করলেন, সূক্ষ্মশরীরেও কি দু ভাগ হয়েছিল? মুণ্ডু আর ধড় দুটোই আলাদা হয়ে বেঁচে রইল কি করে?

যদু গড়গড়ি বললেন, তোমরা দেখছি কিছুই জান না। সূক্ষ্মশরীর ভাগ হয় না, নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি। তার অ্যানাটমি অন্য রকম। কতকটা অ্যামিবার মতন, কিন্তু ঢের বেশী ইলাস্টিক। ধড় আর মুণ্ডু তফাতে থাকলে সূক্ষ্মশরীর চিটে গুড়ের মতন বেড়ে গিয়ে দুটোতেই ভর করতে পারে। তার পর বিঘোর বাবা যা বলছিলেন শোন।—

রমাকান্ত আবার আমার পায়ে পড়ে বললে, দোহাই বাবাঠাকুর, ফাঁসি যেতে পারব না, আমাকে বাঁচান। আমি বললুম, তুই এক্ষুনি তোর বাড়ি গিয়ে সব রক্ত ধুয়ে সাফ করে ফেলবি, তোর রাম-দা গঙ্গায় ফেলে দিবি, তারপর ত্রিবেণীতে গিয়ে এই টেলিগ্রামটা পাঠাবি, তার পর গায়েব হয়ে থাকবি। এক বৎসর পরে গাঁয়ে ফিরতে পারিস। রমাকান্ত বললে, কিন্তু লাশের গতি কি করবেন? পুলিশ টের পেলেই তদারক করতে আসবে, আপনাকেই আসামী বলে চালান দেবে। আমি বললুম, তোকে তা ভাবতে হবে না, যা বলেছি তাই করবি। রমাকান্ত যে আজ্ঞে বলে চলে গেল। আমার সেই টেলিগ্রাম পেয়ে তুমি এসেছ। এখন আর দেরি নয়, রাত আটটায় অশ্লেষা পড়বে, তার আগেই সেলাই করে ফেল, নইলে জোড় লাগবে না।

গুন-ছুঁচ আর সুতলী নিয়ে আমি সেলাই করতে যাচ্ছি, এমন সময় দেখলুম মুণ্ডু দুটো ফিসফিস করে আপসের মধ্যে কথা বলছে। ক্রমশ পঞ্চীর কণ্ঠস্বর চড়া হয়ে উঠল। বিঘোর বাবা ধমক দিয়ে বললেন, এই পঞ্চী, চেঁচাস নি। আরে গেল যা, এখনও ঘাড়ের ওপর মুণ্ডু বসে নি, এর মধ্যেই গলাবাজি শুরু করেছে!

পঞ্চী ডাকল, অ বাবাঠাকুর, একবারটি শুনুন তো।

বিঘোর বাবা উবু হয়ে অনেকক্ষণ ধরে কান পেতে পঞ্চী আর জটিরামের কথা শুনলেন। তার পর আমাকে বললেন, ওহে ডাক্তার, এরা বলছে যে জটির ধড়ে পঞ্চীর মুণ্ডু আর পঞ্চীর ধড়ে জটির মুণ্ডু লাগাতে হবে। আমিও ভেবে দেখলুম এই ব্যবস্থাই ভাল।

স্তম্ভিত হয়ে আমি বললুম, এ কি রকম কথা বাবাঠাকুর! মুণ্ডু বদল হতেই পারে না, ভিয়েনা কনভেনশনে তার কোনও স্যাংশন নেই। এমন অপারেশন মোটেই এথিক্যাল নয়, আমাদের প্রোফেশনাল কোডের একদম বাইরে!

বিঘোর বাবা বললেন, আরে রেখে দাও তোমার কোড। পঞ্চী যদি নিজের ধড় আর মুণ্ডু নিয়ে বেঁচে ওঠে তবে যে আবার রমাকান্তর কবলে পড়বে। মুণ্ডু বদল করলে এদের নব কলেবর হবে, কোনও গোলযোগের ভয় থাকবে না। আর একটা মস্ত লাভ এই হবে যে কখনও এদের ছাড়াছাড়ি হবে না। জটিরাম যদি আগে মরে তবে তার ধড় নিয়ে পঞ্চীর মুণ্ডু বেঁচে থাকবে। পঞ্চী যদি আগে মরে তবে তার ধড়টা জটির মুণ্ডু নিয়ে বেঁচে থাকবে। এই পঞ্চীটা অত্যন্ত চালাক, এর মাথা থেকেই এই বুদ্ধি বেরিয়েছে। জটিরাম হচ্ছে হাঁদারাম। কালই আমি ভৈরব মতে এদের বিয়ে দেব, আমার আশ্রমেই এরা বাস করবে।

আমি প্রশ্ন করলুম, ধড় আর মুণ্ডু বদল হলে কে পঞ্চী কে জটিরাম তা স্থির হবে কি করে?

বিঘোর বাবা বললেন, মাথা হল উত্তমাঙ্গ। মাথা অনুসারেই লোকের নাম হয়, ধড় যারই হক।

ক্যাপ্টেন বেণী দত্ত জনান্তিকে বললেন, কিন্তু গণেশ আর দক্ষের বেলায় তা হয় নি।

যদু ডাক্তার বলতে লাগলেন, এর পর আর আপত্তি করা চলে না, অগত্যা খণ্ডযোজনের জন্য প্রস্তুত হলুম। অ্যানাস্থেটিক দরকার হল না, বিঘোর বাবা মাথায় আর গলায় হাত বুলিয়ে অসাড় করে দিলেন। কিন্তু ভোঁতা গুনছুঁচ আর খসখসে পাটের সুতলি দিয়ে চামড়া ফোঁড়া গেল না। বিঘোর বাবা বললেন, এই পিদিম থেকে রেড়ির তেল নিয়ে ছুঁচ আর সুতোয় বেশ করে মাখিয়ে নাও। তাই নিলুম। লুব্রিকেট করার পর কাজ সহজ হল, আধ ঘণ্টার মধ্যে মুণ্ডুর সংগে ধড় সেলাই করে ফেললুম।

তার পর বিঘোর বাবাকে বললুম, এখন এদের শরীরে কিছু তাজা রক্ত পুরে দেওয়া দরকার, অভাবে পাঁচ শ সিসি গ্লুকোজ-স্যালাইন। কিন্তু এই পাড়াগাঁয়ে যোগাড় হবে কি করে? যদি নেহাতই বেঁচে থাকে তবে এর পর কিছুদিন লিভার এক্সট্রাক্ট, ব্লড্‌স পিল আর ভিগারোজেন খাওয়াতে হবে, নইলে গায়ে জোর পাবে না।

বিঘোর বাবা বললেন, ওসব ছাই ভস্ম চলবে না বাপু। এখন এরা সমস্ত রাত ঘুমুবে। কাল সকালে জেগে উঠলে ঝোলা গুড় দিয়ে খানকতক রুটি পথ্য করবে। তার পর বেলা হলে পণ্ডী ভাত চড়িয়ে দেবে আর লঙ্কা-বাটা দিয়ে কাঁকড়া চচ্চড়ি রাঁধবে। তাতেই বলাধান হবে। জটিরাম আবার গাঁজা খায়। নয় রে জটে?

জটিরাম দাঁত বার করে বললে, হিঁ।

বিঘোর বাবা বললেন, বেশ তো, কাল সকালে আমার প্রসাদী ছিলিমে দু-এক টান দিস। এখন খাওয়া চলবে না, গলার জোড় পোক্ত হতে চার-পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগবে। এখন খেলে সেলাই-এর ফাঁক দিয়ে সব ধোঁয়া বেরিয়ে যাবে। দেখ ডাক্তার, তোমার ফী কিছু দেব না. আজ তুমি যা দেখলে তারই দাম লাখ টাকা।

আমি উত্তর দিলুম, তাতে কোনও সন্দেহ নেই বাবা। আমার চক্ষু কর্ণ সার্থক হয়েছে, অহংকার চূর্ণ হয়েছে, গা দিয়ে ঘাম ছুটছে, আগাপাস্তলা রোমাঞ্চিত হচ্ছে। আমি ধন্য হয়ে গেছি। এখন অনুমতি দিন, আমি বাড়ি ফিরে যাই, দু ডোজ ব্রোমাইড খেয়ে নার্ভ ঠাণ্ডা করে শুয়ে পড়ি। এই বলে প্রণাম করে সেই রাত্রেই কলকাতায় ফিরে এলুম।

ডাক্তার অশ্বিনী সেন বললেন, কিমাশ্চর্যমতঃপরম্‌!

ডাক্তার হরিশ চাকলাদার বললেন, ফ্ল্যাবারগাস্টিং মিরাক্‌ল।

ক্যাপ্টেন বেণী দত্ত বললেন, অতি খাসা। পরকীয়া প্রেমের এমন পারফেক্ট পরিণাম বৈষ্ণব সাহিত্যেও নেই. আর সিম্‌বায়োসিসের এমন চমৎকার দৃষ্টান্ত বায়োলজির কেতাবেও পাওয়া যায় না। আচ্ছা স'র, নায়ক-নায়িকার তো একটা হিল্লে লাগিয়ে দিলেন, কিন্তু রমাকান্তর কি হল?

ডাক্তার যদু গড়গড়ি বললেন, শুনেছি, এক বছর পরে সে চুপি চুপি বিঘোর বাবার আশ্রমে এসেছিল, কিন্তু জটি আর পণ্ডীকে দেখে ভূত-পেত্নী মনে করে তখনই ভয়ে পালিয়ে যায়। তারপর থেকে সে নিরুদ্দেশ।

—আহা, তার জন্য দুঃখ হয়, বেচারা খুন করেও বউকে শায়েস্তা করতে পারল না। নামটাই যে অপয়া, ডাইনে বাঁয়ে যে দিক থেকে পড়ুন পাবেন রমাকান্ত কামার। আমাদের

সুবল বসুও তার দুর্মুখো নামের জন্য উন্নতি করতে পারছে না। আচ্ছা তার পর আর কখনও আপনি পণ্টী আর জটিরামকে দেখেছিলেন?

—দেখেছিলুম। দু বছর পরে বিঘোর বাবা চিঠি লিখলেন, মাঘ সংক্রান্তির দিন জটি-পণ্টির ছেলের অন্নপ্রাশন, তুমি অবশ্যই আসবে। বাবার যখন আদেশ তখন যেতেই হল।

—কি দেখলেন গিয়ে?

—দেখলুম, বিঘোর বাবা ঠিক আগের মতন লাল চেলির জোড় পরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হুঁকো টানছেন, পণ্টী তার মস্কিউলার মন্দা হাতে একটা মস্ত কুড়ুল নিয়ে কাঠ চেলা করছে, জটিরাম রোয়াকে বসে একটা পিঁড়িতে আলপনা দিচ্ছে আর কোলের ছেলেকে মাই খাওয়াচ্ছে।

১৩৫৯ (১৯৫২)

রটন্তীকুমার

স্কুলের ছুটির পর মানিক বললে, এই রটাই, আজ বিকেলে পাঁচটার সময় আমাদের বাড়ি আসবি, চায়ের নেমন্তন্ন।

রটাই বললে, আজ তোর জন্মদিন বুঝি?

—দূর বোকা, জন্মদিন বছরে ক বার হয়? এই তো সেদিন হয়ে গেল, ভোজ খেয়ে তোর পেটের অসুখ হল, মনে নেই?

—তবে কিসের নেমন্তন্ন ভাই?

—আজ বিকেলে দিদিমণির বর আসবে।

—তোর রুবি-দিদিমণির বিয়ে হয়ে গেছে নাকি?

—দূর বোকা, বিয়ের এখন কিছুই ঠিক হয় নি। আজ খগেনবাবু দিদিমণির সংগে ভাব করতে আসবে। যদি খুব ভাব হয়ে যায় তবেই বিয়ে হবে।

রটাই সমঝদারের মতন বললে, অ। সে নিমন্ত্রণে যেতে সর্বদাই প্রস্তুত, উপলক্ষ্য যাই হক, ভাব বা আড়ি বিয়ে বা বউভাত, অন্নপ্রাশন বা শ্রাদ্ধ। মুড়ি-ছোলাভাজা, কেক-বিস্কুট, কচুরি-সন্দেশ, পোলাও-কালিয়া, কিছুতেই তার আপত্তি নেই।

বিকালে পৌনে পাঁচটার সময় রটাই যথাসাধ্য পরিচ্ছন্ন হয়ে মানিকদের বাড়ি যাচ্ছে এমন সময় তার বড়দিদি বললে, এই রটাই, এই টিফিন ক্যারিয়ারটা নে, মানিকের মাকে দিবি। সাবধানে নিয়ে যাবি, ফেলে দিস নি যেন। খালি হলে আসবার সময় ফেরত আনবি।

টিফিন ক্যারিয়ারটা হাতে নিয়ে রটাই বললে, উঃ কি ভারী! কি কি আছে বড়দি? বাদামের নিমকি আর মাছের কচুরি আর মাংসের প্যাটি আর পেস্তার বরফি আর ল্যাংড়া আমের ল্যাংচা?

হ্যাঁ হ্যাঁ, সব আছে। মানিকদের বাড়ি গিয়ে তো দেখতেই পাবি, খেতেও পাবি।

—ওদের বাড়িতে খাওয়ানো হবে তো তুমি খাবার করে দিলে কেন? বল না দিদিমণি!

আঃ, তোর অত খোঁজে দরকার কি? মানিকের মা তৈরি করে দিতে বলেছেন তাই দিয়েছি।

মানিকদের বাড়ি বেশী দূরে নয়। সেখানে গিয়ে মানিকের মাকে টিফিন ক্যারিয়ারটা দিয়ে রটাই বললে, কই মাসীমা, রুবি-দির জামাইবাবু আসে নি?

মানিকের মা বললেন, ছেলের কথার ছিরি দেখ! দশ বছরের ঢেঁকি, এখনও বুদ্ধি হল না। ও তো পানুর বন্ধু খগেন, চা খাবার জন্যে আসতে বলেছি। খবরদার রটাই, তার সামনে অসভ্যতা করিস নি যেন।

সজোরে মাথা নেড়ে রটাই জানালে যে অসভ্যতা করার ছেলে সে নয়। মানিক তাকে বললে, দাদার সংগে খগেনবাবু সাড়ে পাঁচটায় আসবে, ততক্ষণ ও ঘরে ক্যারম খেলবি আয়।

যথাকালে মানিকদের দাদা পানু বা পান্নালালের সংগে শ্রীমান খগেনের আগমন হল। সুশ্রী চেহারা, শৌখিন পোশাক, দেখলেই বোঝা যায় যে বড়লোক, নিজের মোটরে এসেছে। বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ, তার বাপের অভ্র আর কয়লার ব্যবসায়ে কাজ করছে। রূপে গুণে বিদ্যায় টাকায় এমন পাত্র দুর্লভ, মানিকের মা তাকে জামাই করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। সম্প্রতি তাঁর বড় ছেলে পানুর সংগে খগেনের আলাপ হয়েছে, মায়ের অনুরোধে পানু তার বড়লোক বন্ধুকে ধরে এনেছে।

চায়ের টেবিলে ছ জন বসেছেন—প্রধান অতিথি খগেন, প্রধান আকর্ষণ রুবি, প্রধান বক্ত্রী তার মা, দুই ভাই পানু আর মানিক, এবং মানিকের বন্ধু রটাই। বাড়ির কর্তা অনেক দেরিতে অফিস থেকে ফিরবেন, তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে বারণ করেছেন।

যথারীতি হালকা আলাপ আর অকারণ হাসি চলতে লাগল। রুবি গোটাকতক গান গাইলে। তার মা বললেন, জান বাবা খগেন, ইনফ্লুএঞ্জা হবার পর থেকে রুবির গলাটা একটু ধরে গেছে, নইলে বুঝতে কি চমৎকার গায়। রীতিমত ওস্তাদের কাছে শেখা কিনা। এই ছবিটি দেখ, রুবি এঁকেছে। নাম দিয়েছে—মত্ত দাদুরী। আকাশে ঘনঘটা, সরোবর জলে টইটুম্বুর, তাতে রক্ত করবী ফুটেছে—

রুবি বললে, রক্ত কুমুদ।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, রক্ত কুমুদ ফুটেছে। সরোবরের তীরে সারি সারি দাদুরীরা সব বসে আছে, গলা ফুলিয়ে প্রাণপণে ডাকছে, তাদের ছাতি যাওত ফাটিয়া। অবনী ঠাকুরকে দেখাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তিনি রইলেন না তো। আর এই দেখ, কি সব সুন্দর সুন্দর বুনেছে। এই টেবিল ক্লথটি হচ্ছে অজন্টা প্যাটারেন, চারিদিকে পদ্মফুল আর মধ্যিখানে একটি মুরগি। খুব এক্সেলেণ্ট করেছে না? ওরে পানু, খগেনের ছাতির মাপটা নে তো, রুবি ওর জন্যে একটা ভেস্ট বুনে দেবে। জান খগেন, সবাই বলছে, মেয়ের যখন অত রূপ তখন মিস ইণ্ডিয়া কম্পিটিশনে দাঁড়াচ্ছে না কেন! আমার খুব মত ছিল, কিন্তু ওর বাবা কিছুতেই রাজী হলেন না। মস্ত বড় অফিসার হলে কি হবে, জন্ম যে অজ পাড়াগাঁয়ে।

মানিক তার ভাবী ভগিনীপতিকে প্রশ্নে প্রশ্নে অস্থির করতে লাগল।—আপনার এই ঘড়িটায় দম দিতে হয় না বুঝি? এই ফাউণ্টেন পেনটার দাম কত? মোটর গাড়িতে রেডিও বসান নি কেন? আপনার সিগারেট কেসটা দেখান না, বিলাতে কিনেছেন বুঝি? আপনার ক্যামেরা আছে? আমাদের ছবি তুলে দেবেন? ইত্যাদি।

খগেনকে রটাইএর খুব পছন্দ হল। সে তিন-চার বার আলাপের চেষ্টা করলে, কিন্তু তার মুখ থেকে কথা বেরুতে না বেরুতে রুবি আর তার মা কটমট করে তার দিকে তাকালেন; অগত্যা সে চুপ করে খাবারের অপেক্ষায় বসে রইল। আজ রটাইকে নিমন্ত্রণ করতে রুবির মায়ের মোটেই ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সে খাবার বয়ে আনবে, তাঁদের বাড়িতে চাকরের অভাব, সেজন্য নেহাৎ চক্ষুলজ্জার খাতিরে তাকে খেতে বলা হয়েছে।

অবশেষে খাবার এল। বাড়ির চাকর একটা ময়লা হাফপ্যাণ্টের ওপর ফরসা হাত-কাটা শার্ট পরে খাবার আর চায়ের ট্রে একে একে নিয়ে এল। সে মেদিনীপুরের লোক, কিন্তু রুবির মা তাকে 'বোই' সম্বোধন করে হিন্দীতে ফরমাশ করতে লাগলেন। রুবি পরিবেশন করলে। রটাই সব অনাদর ভুলে গিয়ে নিবিষ্ট হয়ে খেতে লাগল।

রুবির মা বললেন, কই, কিছুই তো খাচ্ছ না বাবা খগেন, আরও দুটো কচুরি আর প্যাটি দিই। বল্ না রে রুবি ভাল করে খেতে, এত খেটে সব তৈরি করলি, না খেলে মেহনত সার্থক হবে কেন। সব জিনিস কেমন হয়েছে বাবা?

খগেন বললে, অতি চমৎকার হয়েছে, এমন খাবার কোথাও খাই নি।

উৎফুল্ল হয়ে রুবির মা বললেন, সত্যি? তোমার জন্যে রুবি সমস্ত নিজের হাতে তৈরি করেছে, ওর রান্নার হাত অতি চমৎকার।

রটাইএর মুখ কচুরিতে বোঝাই, তবু সে চুপ করে থাকতে পারল না, মুখের ডেলাটা এক পাশে ঠেলে রেখে জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, বা রে, ওসব তো আমার বড়দি করেছে।

রুবির মা গর্জন করে বললেন, চুপ কর্ অসভ্য ছেলে! যা জানিস না তা বলতে আসিস কেন?

কচুরি-পিণ্ড কোঁত করে গিলে ফেলে রটাই বললে, বাঃ, আমিই তো বাড়ি থেকে সব নিয়ে এলুম।

রুবির মুখের তিন স্তর গোলাপী প্রলেপ ভেদ করে বেগনী আভা ফুটে উঠল। তার মা রেগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, পানু, এই হতভাগা হিংসুটে ছোঁড়াটাকে মানিকের পড়বার ঘরে রেখে আয় তো। মিথ্যে কথার ঢেঁকি, ভদ্রসমাজে কখনও মেশে নি, কেবল বড়াই করতে জানে। তখনই বারণ করেছিলুম ওটাকে আনিস নি, তা মানুকে তো শুনবে না, ভারী গুণের বন্ধু যে।

পান্নালাল রটাই এর হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে অন্য ঘরে নিয়ে গিয়ে বললে, তোর তো খাওয়া হয়ে গেছে, এখন বাড়ি যা রটাই।

রটাই বললে, খাওয়া তো কিছুই হয় নি, এখনও প্যাটি নিমকি বরফি ল্যাংচা আর চা বাকী রয়েছে। খালি হলে টিফিন ক্যারিয়ারটাও তো নিয়ে যেতে হবে।

—আচ্ছা আচ্ছা, আমি সব এনে দিচ্ছি। তুই এখানে একলাটি বসে চুপচাপ খেয়ে নিবি, তার পর সোজা বাড়ি চলে যাবি, কেমন?

রটাই ঘাড় নেড়ে জানালে যে তাতেই সে রাজী। অত ধমক খাওয়ার পরেও তার খিদে ঠিক আছে, কিন্তু পান্নালাল তাকে যা এনে দিলে তা যথেষ্ট নয়, যেটা আসল জিনিস, ল্যাংড়া আমের ল্যাংচা, তাই তাকে দেওয়া হয় নি। যা জুটল তাই সে অনেকক্ষণ ধরে খেলে, তার পর কাকেও কিছু না বলে বাড়ি রওনা হল।

রটাইএর বেফাঁস কথার ফলে ও-ঘরের চায়ের আসরটি একেবারে মাটি হয়ে গেল, আলাপ মোটেই জমল না, যে উদ্দেশ্যে এত আয়োজন তাও কিছুমাত্র অগ্রসর হল না। রুবি গোঁজ হয়ে বসে রইল, তার মুখ থেকে হাঁ-না ছাড়া কোনও কথা বেরুল না। ওই বজ্জাত রটাইটাকে সে যদি হাতে পায় তো কুচি কুচি করে কেটে ফেলে। আর মায়েরই বা কি আক্কেল, তাঁর মেয়ে নিজের হাতে খাবার তৈরি করেছে এ কথা ইশারায় বললেই তো চলত, ঢাক পিটিয়ে জানাবার কি দরকার ছিল? কেবল বকবক করে এলোমেলো কথা বলতে পারেন, ওই শয়তান ছোঁড়াটা যে জলজ্যান্ত সামনে বসে রয়েছে সে হুঁশই হল না।

অপ্রিয় ব্যাপারটা চাপা দেবার জন্য রুবির মা অনর্গল কথা বলে যেতে লাগলেন, পান্নালালও তার বন্ধুকে খুশী করবার জন্য নানা রকম রসিকতা করতে লাগল। খগেন হাসিমুখে অল্পস্বল্প কথা বলে কোনও রকমে শিষ্টাচার বজায় রাখলে। খানিক পরে সে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, আজ উঠি মাসীমা, আর এক জায়গায় দরকার আছে। ওঃ, যা খাইয়েছেন তা হজম হতে তিন দিন লাগবে।

রুবির মা বললেন, কি আর খেয়েছ বাবা, ও তো কিছুই নয়। আবার এসো, সকালে বিকেলে সন্ধ্যেয় যখন তোমার সুবিধে। তুমি তো ঘরের ছেলে, যা ঘরে থাকবে তাই খাবে।

আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং ওঁকে নমস্কার করে খগেন বিদায় নিলে।

কিছুদূর গিয়েই সে দেখতে পেলে, একটি ছেলে টিফিন ক্যারিয়ার হাতে নিয়ে চলেছে। গাড়ি থামিয়ে খগেন ডাকল, ও খোকা! রটাই থমকে দাঁড়িয়ে বললে, আমাকে ডাকছেন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। তোমার নাম কি ভাই?

—রটাই।

—এস, গাড়িতে ওঠ, তোমাকে বাড়ি পেঁছে দেব।

রটাই উঠে বসল। খগেন বললে, তুমি বুঝি খুব রটিয়ে বেড়াও তাই রটাই নাম?

রটাই উত্তর দিলে, দূর তা কেন। আমার ভাল নাম শ্রীরটন্তীকুমার রায়চৌধুরী, আমি রটন্তীপূজার দিন জন্মেছিলুম কিনা তাই আমার দাদামশাই ওই নাম রেখেছেন। আর বড়দির নাম জয়ন্তীমঙ্গলা, ছোড়দির নাম প্রত্যঙ্গিরা।

—উঃ, তোমাদের খুব জাঁকালো নাম দেখছি? বাড়ি কত দূরে? কোন্ ক্লাসে পড়? বাড়িতে কে কে আছেন?

রটাই জানালে, তার বাড়ি বেশী দূরে নয়। সে ক্লাস সিক্সে পড়ে। বাবা রেলে কাজ করেন, বাইরে ঘুরে বেড়াতে হয়, মাঝে মাঝে আসেন। বাড়িতে আছেন তার মা, দুই দিদি আর সে নিজে। দিদিদের এখনও বিয়ে হয় নি। তা ছাড়া ভুঁদো কুকুর আর রূপসী বেরাল আছে। ভুঁদোটা ভীষণ লোভী, সেদিন মালপো চুরি করে খেয়েছিল। কিন্তু রূপসী হচ্ছে ভদ্রমহিলা, খেতে না বললে খায় না। শীঘ্রই তার বাচ্চা হবে, খগেনের যদি দরকার থাকে তবে যতগুলো ইচ্ছে নিতে পারে।

রটাই মোটেই লাজুক নয়, অপরিচয়ের জন্য যেটুকু সংকোচ ছিল তা অল্পক্ষণ আলাপে সহজেই কেটে গেল। সে প্রশ্ন করলে, রুবিদির সঙ্গে আপনার ভাব হল?

খগেন হেসে বললে, কই আর হল। চায়ের টেবিলে তুমি যে বোমা ছুঁড়েছ তাতে তো সবাইকার মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে।

—আপনি আমার ওপর রাগ করেছেন? আমার কিন্তু কিচ্ছু দোষ নেই।

—না না, তুমি খুব ভাল ছেলে, শুধু একটু কাণ্ডজ্ঞানের অভাব, যা বলতে নেই তাই বলে ফেলেছ।

আমি তো সত্যি কথাই বলেছি। আমার বড়দির কাছেই শুনেছি যে মানিকের মা বলে-ছিলেন তাই খাবার তৈরি করে দিয়েছে।

—না হে না। তুমি কিচ্ছু জান না, রুবি-দিই সব নিজের হাতে তৈরি করেছে।

—কখ্খনো নয়, আপনিই কিচ্ছু জানেন না। রুবি-দি শুধু আলু সেদ্ধ আর ডিম সেদ্ধ করতে পারে। ব্যাঙের ছবিটা তার আঁকা বটে, কিন্তু সেই যে পদ্মফুল আর মুরগির ছবি-ওয়ালা টেবিল ক্লথটা আপনাকে দেখিয়েছে সেটা রুবি-দি তৈরি করে নি। মানিকদের বাড়ির পাশের বাড়িতে আমাদের ক্লাসের কেল্টে থাকে, তারই পিসীমা ওটা বানিয়েছে। আমি ওদের বাড়ি যাই কিনা, তাই সব জানি।

—উঃ, তুমি অতি সাংঘাতিক ছেলে, আঁফাঁ তেরিব্‌ল! কিন্তু তোমার সেই জয়ন্তীমঙ্গলা দিদিমণিই যে খাবার তৈরি করেছেন তার প্রমাণ কি? তোমাদের বাড়ি গেলে আমাকে ওই রকম খাওয়াতে পারবে?

—খুব পারব, না পারলে আমার দু কান মলে দেবেন।

—আর যদি পার তবে তুমি আমার দু কান মলে দেবে নাকি?

—দূর, আপনি যে বড়। যদি হেরে যান তো আমাকে ফাইন দেবেন।

—কত ফাইন দিতে হবে?

একটু ভেবে রটাই বললে, একটা টাকা দেবেন।

—মোটে এক টাকা দিলেই হবে?

—দু-টাকা যদি দেন তো আরও ভাল, আমার দু কানের বদলে আপনার দু টাকা। এখুনি চলুন না আমাদের বাড়ি।

—পাগল নাকি! এই মাত্র এত খেয়ে আবার তোমাদের বাড়িতে খাব কি করে?

—আচ্ছা, পরশু রবিবার, সেদিন বিকেলে ঠিক আসবেন বলুন।

—তুমিই বাড়ির কত্তামশাই নাকি? ওখানে কেউ তো আমাকে চেনেন না, যদি গায়ে পড়ে খেতে যাই তবে যে আমাকে অসভ্য হ্যাংলা মনে করবেন।

—ইশ, মনে করলেই হল! আমি তো আপনাকে চিনি, আমার কথায় যদি আপনি আসেন তবে কেউ কিচ্ছু মনে করবে না। কিন্তু দেখুন, আমরা হচ্ছি গরিব, অত রকম খাবার হবে না। মানিকের মা মাছ মাংস পেস্তা বাদাম এইসব পাঠিয়ে দিয়েছিল তাই বড়দি করে দিয়েছে। রবিবার বিকেলে ঠিক আসবেন কিন্তু।

—বেশ, তুমি যখন নিমন্ত্রণ করছ তখন যাব। কিন্তু খাবার মোটেই তৈরি করবে না শুধু চা।

—বাঃ, তা হলে আপনার বিশ্বাস হবে কি করে?

—কেউ খাবার করতে জানে কি জানে না তা আমি চেহারা দেখলেই বুঝতে পারি। আর একটা কথা।—ওখানে যে কাণ্ডটি বাধিয়েছিলে তা যেন তোমাদের বাড়িতে ব'লো না, তা হলে আমি ভারী লজ্জায় পড়ব। আর দেখ, মানিককে সেদিন ডেকো না যেন।

—নাঃ, মানিকের সঙ্গে আড়ি করে দিয়েছি। আজ অতক্ষণ তার পড়বার ঘরে একলাটি রইলুম একবারও এল না।

—আড়ি করবে কেন, শুধু পরশু দিন তাকে তোমাদের বাড়িতে এনো না! আচ্ছা রটন্তীকুমার, তোমার বড়দির তো খুব জমকালো নাম, জয়ন্তীমঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী, খাবার তৈরিতেও ওস্তাদ, তিনি দেখতে কেমন?

—খুব সুন্দর। রুবি-দি এক ঘণ্টা ধরে রং মেখে তবে ফরসা হয়, কিন্তু বড়দিকে কিছুই করতে হয় না। আর তার গানের কাছে রুবি-দির গান যেন কাগ ডাকছে। কিন্তু বললেই বড়দি গায় না, আপনি যদি খুব অনেক বার অনেক করে বলেন তবেই গাইবে। আর জানেন, বড়দি এম এ পাশ, ছোড়দি আসছে বছর ম্যাট্রিক দেবে, আর রুবি-দি তিন বার ফেল করেছে। বড়দির শীগ্‌গির একটা চাকরি হবে। দাদামশাই কি বলেন জানেন? লক্ষ্মী আর সরস্বতী আর অন্নপূর্ণা একসঙ্গে যোগ করে তিন দিয়ে ভাগ করলে যা হয় বড়দি হচ্ছে তাই।

—আর তোমাকে কি বলেন?

হিহি করে হেসে রটাই বললে, সে ভারী বিশ্রী। আমাকে বলেন, ন্যাজ-কাটা বীর হনুমান।

—বিশ্রী কেন, হনুমানের মতন সচ্চরিত্র দেবতা কটা আছে? আমার কি মনে হয় জান? তুমি হচ্ছ নারদ মুনি, পাকা দালাল, মানিকের মা তোমার কাছে একবারে খুকী, কম্‌পিটিশনে দাঁড়াতেই পারেন না। এইটে তোমাদের বাড়ি তো? আচ্ছা, এস ভাই, পরশু আবার দেখা হবে।

বাড়ি এসে রটাই বললে, দিদিমণি, মস্ত খবর, খগেনবাবুকে নেমন্তন্ন করেছি, পরশু বিকেলে চা খেতে আসবেন।

জয়ন্তী বললে, খগেনবাবু আবার কে?

—ওই যে, আজ যিনি মানিকদের বাড়ি চা খেলেন। তার সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়েছে। উঃ, মস্ত বড় মোটরকার! তোমাকে বেশী কিছু করতে হবে না, শুধু মাছের কচুরি, মটন প্যাটি, ল্যাংড়া আমের ল্যাংচা আর চা।

জয়ন্তী তার মাকে ডেকে বললে, তোমার খোকার আক্কেল দেখ মা। কথা নেই বার্তা নেই হুট করে কোথাকার কে খগেনবাবু না বগেনবাবুকে নেমন্তন্ন করেছে। আবার আমাকে খাবারের ফরমাশ করছে। খাবার খুব সস্তা, না? তার খরচ তুই দিবি?

রটাই হাত নেড়ে বললে, সে তুমি কিচ্ছু ভেবো না দিদিমণি, আমি তোমাকে দুটো টাকা দেব। কিন্তু আজ নয়, সেই পরশুর পরে তরশু দিন দেব।

—তুই টাকা পাবি কোথা থেকে? মানিকের মায়ের কাছ থেকে মুটেভাড়া আদায় করবি নাকি?

—ধেৎ। তোমাকে সে পরে বলব, এখন বলতে মানা।

—অচেনা উটকো লোকের জন্য আমি খাবার করতে পারব না।

—অচেনা কেন হবে, আমার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেছে যে। তাঁর নিজের মোটরে আমাকে এখানে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেলেন।

—তাতেই কৃতার্থ হয়ে গেছিস বুঝি?

রটাইএর মা বললেন, তা খোকা যখন নেমন্তন্ন করে ফেলেছে তখন আসুক না খগেনবাবু। কিছু খাবার তৈরি করিস, বাজারের জিনিস দেওয়া তো ভাল দেখাবে না।

নির্দিষ্ট দিনে বিকেল বেলায় খগেন রটাইদের বাড়ি উপস্থিত হল। বসবার ঘরের সজ্জা অতি সামান্য, শুধু তক্তাপোশের ওপর ফরাশ পাতা। কিন্তু আদরের ত্রুটি হল না, রটাইএর মা খগেনের সঙ্গে আত্মীয়ের মতন আলাপ করলেন। আজকের আসরে প্রধান বক্তা রটাই, সে তার নতুন বন্ধুকে নিজের সম্পত্তির মতন দখল করে রইল এবং একটানা কথা বলে যেতে লাগল।

একটু পরে জয়ন্তী আর তার ছোট বোন খাবার নিয়ে এল। খগেন বললে, রটন্তীকুমার, এ তোমার অত্যন্ত অন্যায়, আমি বারণ করেছিলুম তবু তুমি এতসব খাবার করিয়েছ।

রটাই বললে, বাঃ, শুধু বুঝি আপনার জন্যে বড়দি খাবার করেছে, আমিও খাব যে। সেদিন মানিকদের বাড়ি আমার তো ভাল করে খাওয়াই হয় নি।

জয়ন্তী বললে, পেটুক কোথাকার!

কচুরি চিবুতে চিবুতে খগেনের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে রটাই চুপি চুপি বললে, এখন আপনার বিশ্বাস হল তো? দুও, দু টাকা হেরে গেলেন! আজই দেবেন কিন্তু। দেখুন, এইবারে দিদিমণিকে গান গাইতে বলুন না।

খগেন চুপি চুপি উত্তর দিলে, উঁহু, আজ নয়, আর এক দিন হবে এখন।

রটাইএর মা বললেন, এই খোকা, ওঁকে বিরক্ত করছিস কেন, খেতে দিবি না?

জয়ন্তী বললে, দেখ না, জোঁকের মতন ধরে আছে।

খগেন সহাস্যে বললে, না না, বিরক্ত করে নি। ও আমাকে খুব স্নেহ করে, যদিও মোটে দশ মিনিটের পরিচয়। রটাই হচ্ছে অত্যন্ত দিদিভক্ত, আমার কানে কানে আপনার একটু গুণগান করছিল।

জয়ন্তী বললে , ভারী অসভ্য হয়েছিস তুই।

রটাই বললে, কই আবার অসভ্য হলুম! শুধু বলছিলুম, তুমি খুব ভাল খাবার করতে পার। তা বুঝি অসভ্যতা হল? আচ্ছা, তুমি খাবার পার না, গান পার না, সেতার পার না, মোটেই কিচ্ছু পার না। জান বড়দি, খগেনবাবুর মোটরে কিচ্ছু শব্দ হয় না, ঝাঁকুনিও লাগে না।

খগেন বললে, চল না, আমার সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসবে। তার পর তোমাকে এখানে পৌঁছিয়ে দিয়ে যাব এখন।

মহা উল্লাসে রটাই হনুমানের মতন হুপ শব্দ করে গাড়িতে চড়ে বসল। তার মা আর দিদিদের কাছে বিদায় নিয়ে এবং আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে খগেন চলে গেল।

যেতে যেতে রটাই খগেনকে বললে, দেখুন, রুবি-দি হচ্ছে একদম বাজে, তার মা আরও বাজে। আপনি আমার বড়দির সঙ্গেই ভাব করুন।

খগেন বললে, নেহাৎ বাজে কথা বলনি রটাই। কেমন করে ভাব করতে হয় আমাকে শিখিয়ে দিতে পার? ওঃ হো, তোমার বাজী জেতার কথা ভুলে গিয়েছিলুম, এই নাও।

টাকা দুটো পকেটে পুরে রটাই বললে, আমরা ইস্কুলে কি করে ভাব করি জানেন? মনে করুন একটা নতুন ছেলে এসেছে। তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, এই তোর নাম কিরে? সে বললে, হাবলু। আমি তার পিঠ চাপড়ে বললুম, হাবলু, তোর সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেল, এই নে দুটো লাল কাঁচের গুলি। আবার আড়ি করা আরও সহজ, দাঁড়িতে তিন বার বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে বলতে হয়—আড়ি আড়ি আড়ি।

—খাসা নিয়ম। তোমার রুবি-দির সঙ্গে ওই রকমে ভাব হতে পারে, তিনি মুখিয়ে আছেন কিনা। কিন্তু তোমার জয়ন্তীমঙ্গলা দিদিমণিটি অন্য রকমের, পিঠ চাপড়ে ভাব করা যাবে না। তাঁর মতন রমণীর মন সহস্র বর্ষেরই সখা সাধনার ধন। যা হক, আমি চেষ্টা করে দেখব। কিন্তু হাজার বছর সাধনা করা তো চলবে না, আমার বাবা মা বিয়ের জন্য তাড়া লাগিয়েছেন যে। বলেছেন, যাকে খুশি বিয়ে কর, কিন্তু বোকার মতন পছন্দ ক'রো না, আর বেশী দেরি না হয়; মাঘ মাসে আমরা তীর্থভ্রমণে বেরুব, তার আগেই বিয়ে দিতে চাই। দেখি তার মধ্যে কিছু করতে পারি কিনা। শোন রটাই, তুমি বড় ব্যস্তবাগীশ, তোমার দিদিমণিকে ভাব করবার জন্য খোঁচিও না যেন।

—উ রে বাবা! তা হলে আমার পিঠে দমাদম কিল মারবে।

—আমাকেও মারবে না তো?

—নাঃ, আপনাকে কিচ্ছু বলবে না।

বেড়ানো শেষ হলে রটাইকে তার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে খগেন চলে গেল। তার পর সে প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য এক মাসের মধ্যে একবার মানিকদের বাড়ি এবং তিনবার রটাইদের বাড়ি গেল। খগেন বড় মুশকিলে পড়ল, রুবির মা বার বার তাকে আসবার জন্য বলে পাঠাচ্ছেন, এদিকে রটাইএর আবদার দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। ছেলেমানুষের কথা ঠেলা যায় না, অগত্যা রটাইদের বাড়িতে খগেন ঘন ঘন যেতে লাগল।

দিন কতক পরে রটাই জিজ্ঞাসা করলে, ভাব হল?

খগেন বললে, ধীরে রটন্তীকুমার, ধীরে। পণ্ডিতেরা বলেন, পথ হাঁটা, কাঁথা সেলাই, আর পাহাড় টপকানো শনৈঃ শনৈঃ মানে আস্তে আস্তে করতে হয়। ভাব করাও সেই রকম, তাড়াহুড়ো চলে না। বাবা যদি আমাকে ত্যাজ্যপুত্তুর করতেন তবে এত দিন কোন্ কালে

ভাব হয়ে যেত। তা তো তিনি করবেন না, আবার তাঁর টাকাও বিস্তর আছে, সব আমিই পাব। এই হয়েছে বিপদ।

—বিপদ কেন? টাকা থাকা তো ভালই, কত রকম মজা করা যায়, আইসক্রীম, চকোলেট, মোটর গাড়ি, দম দেওয়া ইঞ্জিন, ব্যাডমিণ্টন, পিংপং, লুডো, আরও কত কি।

—তোমার দিদি যে তা বোঝেন না। তাঁর বিশ্বাস, সমান সমান না হলে ভাব করা ঠিক নয়। আমি তাঁকে বলি, তুমিই বা কিসে কম? দেখতে আমার চাইতে ঢের ভাল, বিদ্যেতেও বেশী। তোমার দাদামশাই তো বলেই দিয়েছেন তুমি হচ্ছ লক্ষ্মী সরস্বতী আর অন্নপূর্ণার অ্যাভারেজ। তুমি চমৎকার গাইতে পার, আমার গলা টিপলেও সারেগামা বেরুবে না। তুমি হরেক রকম খাবার করতে জান, মায় ল্যাংড়া আমের ল্যাংচা, আর আমি পাঁউরুটি কাটতেও জানি না। তবু তোমার দিদিমণি খুঁতখুঁত করছেন। যা হক, তুমি ভেবো না রটাই, সব ঠিক হয়ে যাবে, দিন কতক সবুর কর।

পাঁচ দিন পরে রটাই আবার প্রশ্ন করলে, ভাব হল?

খগেন বললে, আর একটু দেরি আছে।

রটাই বিরক্ত হয়ে বললে, এত দিনেও ভাব হল না? আমার সঙ্গে তো আপনার এক মিনিটে ভাব হয়েছিল। বড়দির ভারী অন্যায়, আপনি তাকে বলুন, তিন দিনের মধ্যে যদি ভাব না করে তবে আড়ি হয়ে যাবে।

—ওহে রটন্তীকুমার, ধৈর্যং রহু ধৈর্যং। আমি যদি লঙ্কেশ্বর রাবণ হতুম তো আল্টিমেটম দিতুম যে তিন দিনের মধ্যে ভাব না করলে তাঁকে কাটলেট বানিয়ে খেয়ে ফেলব। কিন্তু তা তো পারব না। তাড়াহুড়ো লাগালে তোমার দিদিমণি ভড়কে যাবেন, হয়ত রেগে গিয়ে তাঁর কোন ক্লাসফ্রেণ্ড তরুণকুমার কি করুণকুমারের সঙ্গেই ভাব করে ফেলবেন। আমিও তখন মরিয়া হয়ে রুবি-দির কাছেই যাব—

তিড়বিড় করে হাত পা ছুঁড়ে রটাই বললে, খবরদার যাবেন না বলছি! বেশ, আরও কিছুদিন দেখুন।

তিন দিন পরে রটাই আবার প্রশ্ন করলে, হল?

খগেন বললে, এইবারে হব হব। তোমার দিদিমণিকে বলেছি, টাকার জন্য ভাবছ কেন, ও তো বাবার টাকা। আমার হাতে এলে তিন দিনে ফুঁকে দেব। যদি মামুলী উপায় পছন্দ না কর তবে হাসপাতাল আছে, ইস্কুল কলেজ আছে, রামকৃষ্ণ মিশন গৌড়ীয় মঠ আছে, হরেক রকম গুরু মহারাজের আখড়া আছে, যেখানে বলবে দিয়ে দেব। তার পর হাত খালি করে কপোত-কপোতী যথা উচ্চবৃক্ষচূড়ে বাঁধি নীড় থাকে সুখে, সেই রকম ফুর্তিতে থাকা যাবে।

—কিন্তু মোটর কার তো চাই?

—চাই বইকি। তাতে চড়েই তো মুষ্টিভিক্ষা করতে বেরুব, খুদ-কুঁড়ো যা আনব তাই দিয়ে তোমার দিদি পোলাও রাঁধবেন। আর দেখ, আমাদের কুটীরের সঙ্গে লাগাও একটা মস্ত তিন-তলা ধর্মশালা থাকবে, তুমি আর মানিক কেল্টে ভুল্টু বাবলু প্রভৃতি তোমার বন্ধুবর্গ মাঝে মাঝে এসে সেখানে বাস করবে। তার সামনেই একটি চমৎকার খেলার মাঠ—

—উঃ কি মজা! আর দেরি করবেন না, চটপট ভাব করে ফেলুন।

দেরি হল না। তিন দিন পরে ইস্কুলে মানিক বললে, হ্যাঁরে রটাই, খগেনবাবু নাকি খালি খালি তোদের বাড়ি যায়? রটাই সগর্বে উত্তর দিলে, যাবেই তো, বড়দির সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে যে।

কিন্তু এই ভাব হওয়ার ফলে রটাইদের বাড়ির লোকের সঙ্গে মানিকদের বাড়ির লোকের

ভীষণ আড়ি হয়ে গেল। রুবির মা কেল্টের পিসীকে বললেন, উঃ, কি বেহায়া গায়ে পড়া মেয়ে ওই জয়ন্তীটা,—জানা নেই শোনা নেই একটা বজ্জাত বিশ্ববকাট ছোকরা খগেন, তাকেই ভেড়া বানালে গা!

কেল্টের পিসী বললেন, মুখে আগুন, ঝাঁটা মার, ঝাঁটা মার।

জয়ন্তীর বিয়েতে মানিকদের বাড়ির কেউ এল না, কিন্তু কেল্টেদের সবাই এল, মায় তার পিসী। তিনি ঝাঁটা নিয়ে যান নি, আঁচলের ভেতর একটা থলি নিয়ে গিয়েছিলেন। পিসী অল্পে তুষ্ট, শুধু ভাঁড়ার থেকে গণ্ডা-পাঁচেক কড়া-পাক সন্দেশ আর জয়ন্তীর উপহার-সামগ্রী থেকে খান দুই রসাল গল্পের বই সরিয়েছিলেন।

১৩৫৯ (১৯৫২)

অগস্ত্যদ্বার

পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে পাটনায় ঘোড়ায় টানা ট্রামগাড়ি ছিল। পুরনো শহরের গুলজারবাগ মহল্লা থেকে বাঁকিপুরের জজ-আদালত পর্যন্ত সিংগল্ লাইনে গাড়ি চলত। দু দিক থেকে যাতায়াতের বাধা যাতে না হয় তার জন্য এক মাইল অন্তর লুপ ছিল, অর্থাৎ লাইন থেকে একটা শাখা বেরিয়ে বিশ-পঁচিশ গজ দূরে আবার লাইনের সঙ্গে মিশত। প্রত্যেক গাড়ি লুপের কাছে এসে থামত এবং উল্‌টো দিকের গাড়ি এলে লুপে গিয়ে পথ ছেড়ে দিত। কিন্তু সব সময় এই ব্যবস্থায় কাজ হত না। একটা গাড়ি লুপের কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছে, আধ ঘণ্টা হয়ে গেল তবু ও দিকের গাড়ির দেখা নেই। যাত্রীরা অধীর হয়ে বললে, চালাও গাড়ি, আর আমরা সবুর করতে পারি না। গাড়ি অগ্রসর হল, কিন্তু আধ মাইল যেতে না যেতে ও দিকের গাড়ি এসে পথরোধ করলে। তখন দুই তরফের গালাগালি শুরু হল। আরে গাধা তুই লুপে সবুর করিস নি কেন? আরে উল্লু তুই এত দেরি করলি কেন? যাত্রীরাও ঝগড়ায় যোগ দিলে, দুই গাড়ির চারটে ঘোড়াও মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পা তুলে চিঁহিঁহি করতে লাগল। তামাশা দেখবার জন্য রাস্তায় লোক জমে গেল, ছোকরার দল হাততালি দিয়ে চেঁচাতে লাগল হী লব লব লব। অবশেষে একজন যাত্রী বললে, ঝগড়া এখন থাক, গাড়ি চালাবার ব্যবস্থা কর। তখন দুই গাড়ির ঘোড়া খুলে পিছনে জোতা হল, এ গাড়ির যাত্রীরা ও গাড়িতে উঠল দুই গাড়িই যেখান থেকে এসেছিল সেখানে ফিরে চলল। গাড়ি বদলের ফলে যাত্রীরাও তাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছে গেল।

এই ধরনের কিন্তু অতি গুরুতর একটা বিভ্রাট পুরাকালে ঘটেছিল। তারই ইতিহাস এখন বলছি।

একদা সত্যযুগে বিন্ধ্য গিরির অত্যন্ত অহংকার হয়েছিল, চন্দ্র-সূর্যের পথরোধ করবার জন্য সে ক্রমশ উঁচু হতে লাগল। তখন অগস্ত্য মুনি এসে তাকে বললেন, আমি দক্ষিণে যাত্রা করব, আমাকে পথ দাও। বিন্ধ্য বিদীর্ণ হয়ে একটি সংকীর্ণ পথ করে দিলে, যার নাম অগস্ত্যদ্বার। সেই গিরিসংকটের ওপারে গিয়ে বিন্ধ্যের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে অগস্ত্য বললেন, বৎস বিন্ধ্য, এ হচ্ছে কি, তুমি যে বাঁকা হয়ে বাড়ছ, ওলন ঠিক নেই, কোন দিন হুড়মুড় করে পড়ে যাবে। আমি ফিরে এসে শিখিয়ে দেব কি করে খাড়া হয়ে বাড়তে হয়, ততদিন তুমি উঁচু হয়ো না। বিন্ধ্য বললে, যে আজ্ঞে। তার পর অনেক কাল কেটে গেল কিন্তু অগস্ত্য ফিরলেন না। তখন বিন্ধ্য রেগে গিয়ে শাপ দিলে, এই অগস্ত্যদ্বারে যারা দু দিক থেকে মুখোমুখি প্রবেশ করবে তাদের বুদ্ধিভ্রংশ হবে। শাপের কথা একজন শিষ্যের মুখে শুনে অগস্ত্য বললেন, ভয় নেই, কিছুদিন পরেই বুদ্ধি ফিরে আসবে।

উক্ত পৌরাণিক ঘটনার বহু কাল পরের কথা বলছি। তখনও বিন্ধ্য পর্বতের নিকটবর্তী স্থান নিবিড় অরণ্যে আচ্ছন্ন, সেখানে লোকালয় ছিল না, কোনও রাজার শাসনও ছিল না। এই বিশাল নো ম্যান্‌স ল্যান্ডের উত্তরে কলিঞ্জর রাজ্য। কলিঞ্জরের দক্ষিণে অরণ্য, তারপর দুর্লঙ্ঘ বিন্ধ্য গিরি, তার পর আবার অরণ্য, তার পর বিদর্ভ রাজ্য। কলিঞ্জরের রাজা কনক-

বর্মা আর বিদর্ভের রাজা বিশাখসেন দুজনেই তেজস্বী যুবক। তাঁদের মহিষীরা মামাতো-পিসতুতো ভগ্নী।

কলিঞ্জরপতি কনকবর্মা তাঁর রাজ্যের দক্ষিণস্থ বনে মাঝে মাঝে মৃগয়া করতে যেতেন। একদিন তাঁর ইচ্ছা হল বিন্ধ্য গিরি অতিক্রম করে আরও দক্ষিণে গিয়ে শম্বর হরিণ শিকার করবেন। তিনি তাঁর প্রিয় বয়স্য কহোড়ভট্টের সঙ্গে রথে চড়ে যাত্রা করলেন, পিছনে রথী পদাতি গজারোহী অশ্বারোহী সৈন্যদল চলল।

দৈবক্রমে ঠিক এই সময়ে বিদর্ভরাজ বিশাখসেনেরও ইচ্ছা হল বিন্ধ্য পর্বতের উত্তরবর্তী অরণ্যে গিয়ে ব্যাঘ্রভল্লুকাদি বধ করবেন। তিনি তাঁর প্রিয় বয়স্য বিড়ঙ্গদেবের সঙ্গে রথারূঢ় হয়ে যাত্রা করলেন, চতুরঙ্গসেনা পিছনে পিছনে গেল।

বিন্ধ্যপর্বতমালা ভেদ করে একটি পথ উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে গেছে। এই পথটি বেশ প্রশস্ত, কিন্তু মাঝামাঝি এক স্থানে পূর্বোক্ত অগস্ত্যদ্বার নামক গিরিসংকট আছে, তা এত সংকীর্ণ যে দুটি রথ পাশাপাশি যেতে পারে না।

কলিঞ্জরপতি কনকবর্মা অগস্ত্যদ্বারের উত্তর প্রান্তে এসে দেখলেন রাজা বিশাখসেন সদলবলে দক্ষিণ প্রান্তে উপস্থিত হয়েছেন। দুই রাজরথ নিকটবর্তী হলে কনকবর্মা বললেন, নমস্কার সখা বিশাখসেন, স্বাগতম্। বিদর্ভ রাজ্যের সর্বত্র কুশল তো? চতুর্বর্গের প্রজা ও গবাদি পশু বৃদ্ধি পাচ্ছে তো? ধনধান্যের ভাণ্ডার পূর্ণ আছে তো? তোমার মহিষী আমার শ্যালিকা বিংশতিকলা ভাল আছেন তো?

প্রতিনমস্কার করে বিশাখসেন বললেন, অহো কি সৌভাগ্য যে এই দুর্গম পথে প্রিয়সখার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল! মহারাজ, তোমার শুভেচ্ছার প্রভাবে আমার রাজ্যের সর্বত্র কুশল। কলিঞ্জর রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল তো? তোমার মহিষী আমার শ্যালিকা কম্বুকংকণা ভাল আছেন? সখা, এখন দয়া করে পথ ছেড়ে দাও, তোমার রথটি এই গিরিসংকটের একটু উত্তরে সরিয়ে রাখ। আমি সসৈন্যে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যাই, তার পর তুমি তোমার সেনা নিয়ে অভীষ্ট স্থানে যাত্রা ক'রো।

কনকবর্মা মাথা নেড়ে বললেন, তা হতেই পারে না, আমি তোমার চাইতে বয়সে বড়, আমার অশ্ব-রথ-গজাদিও বেশী, অতএব পথের অগ্রাধিকার আমারই। তুমিই একটু দক্ষিণে হটে গিয়ে আমাকে পথ ছেড়ে দাও।

বিশাখসেন বললেন, অন্যায় বলছ সখা। তুমি বয়সে একটু বড় হতে পার, তোমার অশ্ব-গজাদিও প্রচুর থাকতে পারে, কিন্তু আমার বিদর্ভ রাজ্য অতি সমৃদ্ধ ও বিশাল, তার মধ্যে চারটে কলিঞ্জরের স্থান হয়। অতএব তুমিই আমাকে পথ দাও।

অনেকক্ষণ এই রকম তর্কবিতর্ক চলল। তার পর কনকবর্মা বললেন, ওহে বিশাখসেন তোমার বড়ই স্পর্ধা হয়েছে। এই শরাসন স্পর্শ করে শপথ করছি, কিছুতেই তোমাকে আগে যেতে দেব না, তোমার পূর্বেই আমি দক্ষিণে অগ্রসর হব। যখন মিষ্টবাক্যে বিবাদের মীমাংসা হল না তখন যুদ্ধই করা যাক। এই বলে তিনি তাঁর ধনুতে শরসন্ধান করলেন।

বিশাখসেন বললেন, ওহে কনকবর্মা, আমিও শপথ করছি, বাহুবলে আমার পথ করে নেব, তোমার পূর্বেই আমি উত্তর দিকে যাত্রা করব। এই বলে তিনি ধনুতে শরযোজনা করে জ্যাকর্ষণ করলেন।

তখন দুই রাজবয়স্য কহোড়ভট্ট আর বিড়ঙ্গদেব একযোগে হাত তুলে উচ্চ কণ্ঠে বললেন, ভো নৃপতিযুগল, থামুন থামুন। মনে নেই, গত বৎসর মকরসংক্রান্তির দিনে আপনারা নর্মদায় স্নানের পর অগ্নিসাক্ষী করে মৈত্রীবন্ধন করেছিলেন? অপি চ, তখন উষ্ণীষ বিনিময় করে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে কিছুতেই আপনাদের সৌহার্দ ক্ষুণ্ণ হতে দেবেন না।

কনকবর্মা গালে হাত দিয়ে বললেন, হুঁ, ওই রকম একটা প্রতিজ্ঞা করা গিয়েছিল বটে।

বিশাখসেন বললেন, হুঁ, আমারও সে কথা মনে পড়েছে। তাই তো, এখন কি করা যায়? এক দিকে সৌহার্দরক্ষার প্রতিজ্ঞা, আর এক দিকে অগ্রযাত্রার শপথ। দুটোই বজায় থাকে কি করে? মহারাজ কনকবর্মা, তোমার মুখ্যমন্ত্রীকে সংবাদ পাঠাও, তিনি এখনই এখানে চলে আসুন। আমিও আমার মহামন্ত্রীকে আনাচ্ছি। দুই মন্ত্রী যুক্তি করে এমন একটা উপায় স্থির করুন যাতে আমাদের প্রতিজ্ঞা আর শপথ রক্ষিত হয়, মর্যাদারও হানি না হয়।

কনকবর্মা তাঁর এক অশ্বারোহী অনুচরকে বললে, খেটকসিংহ, তুমি এখনই দ্রুতবেগে গিয়ে আমার মুখ্যমন্ত্রীকে ডেকে নিয়ে এস। বিশাখসেন, তুমিও লোক পাঠাও।

কহোড়ভট্ট বললেন, তার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই, অনর্থক বিলম্ব হবে। আমার পরম বন্ধু মহাপণ্ডিত বিড়ঙ্গদেব এখানে রয়েছেন, আমারও বিদ্যাবুদ্ধির প্রচুর খ্যাতি আছে। আমরা দুজনেই রাজবয়স্য। ঠিক মন্ত্রী না হই, উপমন্ত্রী তো বটেই। পত্নীর স্থান অন্তঃপুরে, পথে তিনি বিবর্জিতা, উপপত্নীই প্রবাসসঙ্গিনী হয়ে থাকে। তদ্রূপ মন্ত্রীর স্থান রাজধানীতে, কিন্তু পর্যটনে ও ব্যসনে উপমন্ত্রীই সহায়। আমরাই মন্ত্রণা করে কিংকর্তব্য স্থির করতে পারব।

দুই রাজা বললেন, উত্তম কথা, তাই কর। কিন্তু বিলম্ব না হয়, বেলা পড়ে আসছে।

কহোড় আর বিড়ঙ্গ রথ থেকে নেমে পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন, তার পর একটি শিলাপট্টে বসে মন্ত্রণা করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পরে কহোড় বললেন, হে নরপতিদ্বয়, শুনতে আজ্ঞা হক। আমরা দুই বন্ধুতে মিলে আপনাদের সমস্যার একটি উত্তম সমাধান স্থির করেছি, তাতে সৌহার্দের প্রতিজ্ঞা, অগ্রযাত্রার শপথ, এবং উভয়ের মর্যাদা সমস্তই রক্ষা পাবে।

উদ্‌গ্রীব হয়ে দুই রাজা বললেন, কি প্রকার সমাধান?

কহোড় বললেন, মহারাজ কনকবর্মা, আপনি রাজধানী থেকে এক দল নিপুণ খনক আনান, তারা অগস্ত্যদ্বারের তলা দিয়ে একটি সুড়ঙ্গ খনন করুক। সেই সুড়ঙ্গপথে আপনি দক্ষিণ দিকে এবং উপরের পথে বিদর্ভরাজ বিশাখসেন উত্তরদিকে একই মুহূর্তে যাত্রা করবেন।

বিশাখসেন বললেন, যুক্তি মন্দ নয়। কিন্তু পর্বতের নীচে সুড়ঙ্গ করতে অন্তত এক বৎসর লাগবে। তত দিন আমরা কি করব? রথ থেকে আমি কিছুতেই নামব না তা বলে দিচ্ছি।

কহোড় বললেন, নামবেন কেন। রথে আরূঢ় থেকেই একটু কষ্ট করে এক বৎসর কাটিয়ে দেবেন, ওখানেই শৌচ-স্নানাদি পান-ভোজনাদি অক্ষক্রীড়াদি করবেন, ওখানেই নিদ্রা যাবেন। রাজধানী থেকে নর্তকীদের আনিয়ে নিন, তারা নৃত্যগীত করে আপনাদের চিত্তবিনোদন করবে।

কনকবর্মা বললেন, সুড়ঙ্গ টুড়ঙ্গ চলবে না। বিশাখসেন উপর দিয়ে যাবেন আর আমি মূষিকের ন্যায় তাঁর নীচে দিয়ে যাব এ হতেই পারে না।

বিড়ঙ্গ বললেন, মহারাজ কনকবর্মা, আর এক উপায় আছে। আপনি কুবেরের আরাধনা করুন যাতে তিনি তুষ্ট হয়ে কিছুক্ষণের জন্য তাঁর পুষ্পক বিমানটি পাঠিয়ে দেন। সেই বিমানে আপনি আকাশমার্গে দক্ষিণ দিকে যাবেন এবং বিদর্ভরাজ গিরিসংকট দিয়ে উত্তর দিকে যাবেন।

বিশাখসেন বললেন, উনি আমার মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাবেন তা হতেই পারে না। তোমরা দুজনেই অত্যন্ত মূর্খ, সমস্যার সমাধান তোমাদের কর্ম নয়।

বিড়ংগ বললেন, মহারাজ, ধৈর্য ধরুন, আমরা আর এক বার মন্ত্রণা করছি।

দুই রাজবয়স্য আবার মন্ত্রণায় নিবিষ্ট হলেন, দুই রাজা অধীর হয়ে রথের উপর তাঁদের ধনুক ঠুকতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে কহোড় বললেন, হে নৃপতিযুগল, এবারে আমরা একটি অতি সাধু বিচিত্র ও যশস্কর সমাধান আবিষ্কার করেছি।

কনকবর্মা বললেন, বলে ফেল।

কহোড় বললেন, প্রথমে আপনাদের দুই রথের ঘোড়া খুলে ফেলা হবে, তা হলে সংকীর্ণ স্থানেও অনায়াসে রথ ঘোরানো যাবে। ঘোরাবার পর আবার ঘোড়া জোতা হবে, তখন দুই রথের মুখ বিপরীত দিকে থাকবে।

বিশাখসেন সক্রোধে বললেন, আমরা পরাঙ্মুখ হয়ে নিজ নিজ রাজ্যে ফিরে যাব এই তুমি বলতে চাও?

—না না মহারাজ, ফিরবেন কেন? ঘোরাবার পর দুই রথ একটু পশ্চাতে সরে আসবে যাতে ঠেকাঠেকি হয়। তার পর মহারাজ কনকবর্মা পিছন দিক থেকে পা বাড়িয়ে টুপ করে বিদর্ভরাজের রথে উঠবেন এবং বিদর্ভরাজ কলিঙ্গরপতির রথে উঠবেন।

দুই রাজা সমস্বরে বললেন, তার পর, তার পর?

—রথ বদলের পর আর কোনও ভাবনা নেই। আপনারা যুগপৎ বিপরীত দিকে অর্থাৎ আপনাদের অভীষ্ট মার্গে যাত্রা করবেন।

কনকবর্মা প্রশ্ন করলেন, কিন্তু আমাদের চতুরংগ সৈন্যদলের কি হবে?

—তাদেরও বদল হবে। আপনার আগে আগে বিদর্ভসেনা এবং মহারাজ বিশাখসেনের আগে আগে কলিঙ্গরসেনা যাবে। তারা মুখ ঘুরিয়ে নেবে।

কনকবর্মা বললেন, সখা, সম্মত আছ?

বিশাখসেন বললেন, আমার সেনা তোমার হবে এবং তোমার সেনা আমার হবে এতে আপত্তি করবার কিছু নেই। কিন্তু বেলা যে শেষ হয়ে এল, মৃগয়া কখন করব?

কহোড় বললেন, আজ মৃগয়া নাই করলেন মহারাজ। আজ আপনাদের প্রতিজ্ঞা আর শপথ রক্ষিত হক, মৃগয়া এর পরে এক দিন করবেন।

বিশাখসেন বললেন, কিন্তু আজ যেতে যেতেই তো সন্ধ্যা হয়ে যাবে, আমাদের অভিযানের শেষ হবে কোথায়? ফিরব কখন?

কহোড় বললেন, ফিরবেন কেন? কিচ্ছু ভাববেন না, সবই আমরা স্থির করে ফেলেছি। আপনাদের রাজ্যেরও বিনিময় হবে। মহারাজ কনকবর্মা বিদর্ভসেনার সংগে যাত্রা করে বিদর্ভ-রাজ্যে অধিষ্ঠিত হবেন, এবং মহারাজ বিশাখসেন কলিঙ্গরসেনার সংগে গিয়ে কলিঙ্গর সিংহাসন অধিকার করবেন।

কিছু কাল স্তব্ধ হয়ে থাকার পর কনকবর্মা বললেন, অতি জটিল ব্যবস্থা। আমাদের পিতৃপিতামহের রাজ্য হস্তান্তরিত হবে এ যে বড় বিশ্রী কথা।

কহোড় বললেন, মহারাজ, ক্ষত্রিয় নৃপতির প্রধান কর্তব্য প্রতিজ্ঞা, শপথ আর আত্ম-মর্যাদা রক্ষা, তার জন্য যদি রাজ্য বা প্রাণ বিসর্জন দিতে হয় তাও শ্রেয়। কিন্তু আমাদের ব্যবস্থায় আপনাদের রাজ্যনাশ বা প্রাণনাশ কিছুই হচ্ছে না, এক রাজ্যের পরিবর্তে আর এক রাজ্য পাচ্ছেন।

কনকবর্মা বললেন, এই বারে বুঝেছি। সখা, তুমি সম্মত আছ?

বিশাখসেন বললেন, অন্য উপায় তো দেখছি না। বেশ, তাই হক।

সেকালের রথ কতকটা একালের এক্কার মতন। দুটি মাত্র চাকা, হালকা গড়ন, বেশী জায়গা নিত না। সারথি সামনে বসত, তার পাশে বা পিছনে রথী বসতেন। দুই রাজার

আদেশে রথের ঘোড়া খুলে ফেলা হল। বোম খাড়া করে তুলে সেই সংকীর্ণ স্থানে সহজেই রথ ঘোরানো গেল। তার পর আবার ঘোড়া জোতা হল। একটু পিছনে হটাতেই দুই রথের পিছন দিক ঠেকে গেল, তখন রাজারা না থেমেই এক রথ থেকে অন্য রথে উঠলেন। দুই রাজ-বয়স্যও নিজ নিজ প্রভুর পশ্চাতে বসলেন।

অনন্তর কনকবর্মা পিছনে ফিরে বললেন, হে কলিঞ্জর সৈন্যগণ, ব্যাবর্তধ্বম্ (অর্থাৎ right about turn)। এখন থেকে তোমরা মহারাজ বিশাখসেনের অধীন, উনি তোমাদের সঙ্গে গিয়ে কলিঞ্জর রাজ্য অধিকার করবেন। আমিও বিদর্ভসেনার সঙ্গে গিয়ে বিদর্ভ রাজ্য অধিকার করব।

বিশাখসেনও অনুরূপ ঘোষণা করলেন।

সৈন্যরা অতি সুবোধ, সমস্বরে বললে, রাজাদেশ শিরোধার্য। তারপর কনকবর্মা আর বিশাখসেন একযোগে আজ্ঞা দিলেন, গম্যতাম্ (অর্থাৎ march)। বিদর্ভসেনা বিদর্ভের দিকে চলল, কনকবর্মার রথ তাদের পিছনে গেল। কলিঞ্জরসেনা কলিঞ্জরে ফিরে চলল, বিশাখসেনের রথ তাদের পিছনে গেল।

যেতে যেতে কনকবর্মা তাঁর বয়স্যকে বললেন, কাজটা কি ভাল হল? রাজা বদলের ফলে বিশাখসেনের লাভ আর আমার ক্ষতি হবে। আমার মহিষী তার মহিষীর চাইতে ঢের বেশী সুন্দরী।

কহোড় বললেন, মহারাজ, আপনি যে লোকবাহ্য কথা বলছেন, পরস্ত্রীকেই লোকে বেশী সুন্দরী মনে করে। সর্ব বিষয়ে আপনারই লাভ অধিক হবে। বিদর্ভমহিষী পুত্রবতী, কিন্তু আপনার মহিষী এখনও অনপত্যা। বিদর্ভরাজ্যের ধনভাণ্ডারও অতি বিশাল। ওখানকার অধিপতি হয়ে আপনি ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ করবেন।

কনকবর্মা যখন বিদর্ভরাজ্যে পৌঁছলেন তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তাঁর আদেশে কয়েক জন অশ্বারোহী আগেই রাজধানীতে গিয়ে সংবাদ দিয়েছিল যে রাজ্য বদল হয়ে গেছে, নূতন রাজা আসছেন। কনকবর্মা দেখলেন, তাঁর সংবর্ধনার কোনও আয়োজন হয় নি, পথে আলোকসজ্জা নেই, শাঁখ বাজছে না, হুলুধ্বনি হচ্ছে না, কেউ লাজবর্ষণও করছে না। তিনি অপ্রসন্ন মনে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হয়ে রথ থেকে নামলেন। কয়েকজন রাজপুরুষ নীরবে নমস্কার করে তাঁকে সভাগৃহে নিয়ে গেল, কহোড়ভট্টও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন।

বিদর্ভরাজমহিষী বিংশতিকলা গম্ভীরমুখে সিংহাসনে বসে আছেন। তাঁকে অভিবাদন করে কনকবর্মা বললেন, পট্টমহিষী, ভাল আছেন তো? পাঁচ বৎসর পূর্বে আপনার বিবাহ-সভায় আপনাকে তন্বী দেখেছিলাম। এখন আপনি একটু স্থূলাঙ্গী হয়ে পড়েছেন, তাতে আপনার রূপ ষোল কলা পেরিয়ে কুড়ি কলায় পৌঁছে গেছে। সকল সমাচার শুনেছেন বোধ হয়। এখন আমিই এই বিদর্ভরাজ্যের অধিপতি, অভিষেকের ব্যবস্থা কাল হবে। আমি আর আমার বয়স্য এই কহোড়ভট্ট অত্যন্ত শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়েছি, আজ ক্ষমা করুন, কাল আপনার সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ করব। এখন আমাদের বিশ্রামাগার দেখিয়ে দিন এবং সত্বর আহারের ব্যবস্থা করুন।

একজন সশস্ত্র রাজপুরুষকে সম্বোধন করে মহিষী বিংশতিকলা বললেন, ওহে কোষ্ঠপাল, এই ধৃষ্ট নির্বোধ রাজা আর তার সহচরকে কারাগারে নিক্ষেপ কর। এদের শয়নের জন্য কিছু খড় আর ভোজনের জন্য প্রত্যেককে এক সরা ছাতু আর এক ভাঁড় জল দিও।

কহোড়ভট্ট করজোড়ে বললেন, সে কি রানী-মা, আমাদের এই পরমভট্টারক শ্রীশ্রীমহারাজ আপনার ভগ্নীপতি তো বটেনই, এখন বিদর্ভপতি হয়ে অধিকন্তু আপনার পতিও হয়েছেন। একে ছাতু খাওয়াবেন কি করে? ইনি নিত্য নানা প্রকার চর্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় আহার করে থাকেন।

বিংশতিকলা বললেন, তাই হবে। ওহে কোষ্ঠপাল, এই রাজমূর্খকে দু মুঠো ছোলা, এক ছড়া তেঁতুল, একটু গুড়, আর এক ভাঁড় ঘোল দিও। ছোলা চিবুবে, তেঁতুল চুষবে, গুড় চাটবে, আর ঘোলের ভাঁড়ে চুমুক দেবে।

কোষ্ঠপাল বললেন, যথা আজ্ঞা মহাদেবী। আরক্ষিগণ, এদের কারাগারে নিয়ে চল।

কনকবর্মা হতভম্ব হয়ে নীরবে কারাগৃহে গেলেন এবং ক্লান্তদেহে বিষণ্ণ মনে রাত্রিযাপন করলেন। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি বললেন, ওহে পণ্ডিতমূর্খ কহোড়, তোমাদের মন্ত্রণা শুনেই আমার এই দুর্দশা হল। এই শত্রুপুরী থেকে উদ্ধার পাব কি করে?

কহোড় বললেন, মহারাজ, ভাববেন না। আমি সারা রাত চিন্তা করে উপায় নির্ধারণ করেছি।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কনকবর্মা বললেন, তোমার উপর আর ভরসা নেই। বিশাখসেন কেমন আছেন কে জানে, তিনি হয়তো কলিঞ্জর রাজ্যে খুব সুখে আছেন।

কহোড় বললেন, মনেও ভাববেন না তা। আমাদের মহাদেবী কম্বুকঙ্কণাও বড় কম যান না।

এই সময়ে একজন প্রহরী কারাকক্ষে এসে বললেন, আপনারা শৌচস্নানাদির জন্য ওই প্রাচীরবেষ্টিত উপবনে যেতে পারেন।

কহোড় বললেন, বৎস প্রহরী, শৌচাদি এখন মাথায় থাকুক, একবার রানীমার সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দাও, মহারাজ তোমাকে পুরস্কার দেবেন।

প্রহরী বললে, আসুন আমার সঙ্গে।

রাজমহিষী বিংশতিকলার কাছে এসে কহোড় কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, মহাদেবী, ঢের হয়েছে, আমাদের মুক্তি দিন, ফিরে গিয়েই বিদর্ভরাজ বিশাখসেনকে পাঠিয়ে দেব।

মহিষী বললেন, আগে তিনি আসুন, তার পর তোমাদের মুক্তির বিষয় বিবেচনা করা যাবে।

—তবে কেবল আমাকে মুক্তি দিন, আমি কলিঞ্জরে গিয়ে বদলা-বদলির ব্যবস্থা করব।

বেশ, তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি, যাতায়াতের জন্য একটা রথও দিচ্ছি। কিন্তু যদি সাত দিনের মধ্যে ফিরে না এস তবে তোমার প্রভুকে শূলে দেব।

কহোড়ভট্ট রথে চড়ে যাত্রা করলেন। এই সময় বিড়ঙ্গদেবও বিশাখসেনের দূত হয়ে বিদর্ভরাজ্যে আসছিলেন। মধ্যপথে দুই বন্ধুতে দেখা হয়ে গেল। কুশলপ্রশ্নের পর দুজনে অনেকক্ষণ মন্ত্রণা করলেন, তার পর যেখান থেকে এসেছিলেন সেখানে ফিরে গেলেন।

বিদর্ভরাজমহিষী বিংশতিকলাকে কহোড় বললেন, মহাদেবী, আমার প্রিয়বন্ধু বিড়ঙ্গদেবের সঙ্গে মন্ত্রণা করে এই ব্যবস্থা করেছি যে কাল প্রাতঃকালে মহারাজ বিশাখসেন কলিঞ্জর থেকে বিদর্ভ রাজ্যে যাত্রা করবেন, এবং এখান থেকে মহারাজ কনকবর্মাও কলিঞ্জরে যাত্রা করবেন। যত ইচ্ছা রক্ষী সৈন্য আমাদের সঙ্গে দেবেন। অগস্ত্যদ্বারে উপস্থিত হয়ে যদি তারা দেখে যে মহারাজ আসেন নি, তবে আমাদের ফিরিয়ে আনবে।

মহিষী বললেন, ফিরিয়ে এনেই তোমাদের শূলে চড়াবে। বেশ, তোমার প্রস্তাবে সম্মত আছি, কাল প্রভাতে যাত্রা ক'রো।

পরদিন প্রাতঃকালে কনকবর্মা ও কহোড়ভট্ট রথে চড়ে যাত্রা করলেন, এক দল অশ্বারোহী সৈন্য তাঁদের সঙ্গে গেল। অগস্ত্যদ্বারের দক্ষিণ মুখে এসে কনকবর্মা দেখলেন, বিশাখসেন ও বিড়ঙ্গদেবও উত্তর মুখে উপস্থিত হয়েছেন।

উল্লসিত হয়ে বিশাখসেন বললেন, সখা কনকবর্মা, আমার বিদর্ভ রাজ্যে সুখে ছিলে তো? এত রোগা হয়ে গেছ কেন? তোমার সেবার ত্রুটি হয় নি তো?

কনকবর্মা বললেন, কোনও ত্রুটি হয় নি, তোমার মহিষী বিংশতিকলা যেমন রসিকা তেমনি গুণবতী। উঃ, কি যত্নই করেছেন! কিন্তু তোমাকেও তো বায়ুভুক্ তপস্বীর মতন দেখাচ্ছে। আমার কলিঙ্গর রাজ্যে তোমার যথোচিত সৎকার হয়েছিল তো?

অট্টহাস্য করে বিশাখসেন বললেন, সখা, আশ্বস্ত হও, সৎকারের কোনও ত্রুটি হয় নি। তোমার মহিষী কম্বুকঙ্কণাও কম রসিকা আর গুণবতী নন, তিনি আমাকে বিচিত্র চর্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় খাইয়েছেন। কিছুতেই ছাড়বেন না, তাঁকে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে তবে চলে আসতে পেরেছি। যাক সে কথা। আমরা এই অগস্ত্যদ্বারে আবার মুখোমুখি হয়েছি। কে আগে যাত্রা করবে?

কহোড়ভট্ট আর বিড়ঙ্গদেব বললেন, দোহাই মহারাজ, আর বিবাদ করবেন না, আপনাদের যাত্রার ব্যবস্থা আমরাই করে দিচ্ছি। ওহে সারথিদ্বয়, তোমরা ঠিক গত বারের মতন রথ ঘুরিয়ে ফেল।...হয়েছে তো?...মহারাজ কনকবর্মা, এখন আপনি এ রথ থেকে ও রথে উঠুন। মহারাজ বিশাখসেন, আপনিও ও রথ থেকে এ রথে আসুন। মহামুনি অগস্ত্যের প্রসাদে এবং এই কহোড়-বিড়ঙ্গের বুদ্ধিবলে আপনারা সংকটমুক্ত হয়েছেন, আপনাদের প্রতিজ্ঞা শপথ মর্যাদা রাজ্য প্রাণ আর ভার্যা সবই রক্ষা পেয়েছে। এখন আর বিলম্ব নয়, দুই রথ যুগপৎ দুই দিকে শুভযাত্রা করুক।

১৩৫৯ (১৯৫২)

ষষ্ঠীর কৃপা

ষষ্ঠীপুজোর পর সুকুমারী তার ছেলেকে পিঁড়ির ওপর রেখে স্বামীকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলে। সুকুমারীর বয়স চব্বিশ, তার স্বামী গোকুল গোস্বামীর চুয়ান্ন।

গোকুলবাবু বললেন, ইঃ, কি চমৎকার দেখাচ্ছে তোমাকে সুকু, যেন উর্বশী স্নান করে সমুদ্র থেকে উঠে এলেন!

সুকুমারী হাত জোড় করে বললে, তোমার পায়ে পড়ি এইবার আমাকে রেহাই দাও। সাত বৎসর তোমার কাছে এসেছি, তার মধ্যে ছটি সন্তান প্রসব করেছি। পাঁচটি গেছে, একটি এখনও বেঁচে আছে। আমি আর পারি না, শরীর ভেঙে গেছে। আবার যদি পোয়াতী হই তো মরব, এই খোকাও মরবে।

গোকুলবাবু সহাস্যে বললেন, বালাই, মরবে কেন। সন্তান জন্মায়, বাঁচে, মরে, সবই ভগবানের ইচ্ছা, অর্থাৎ পূর্বজন্মের কর্মফল। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তোমার ফল ভোগ শেষ হয়েছে, ফাঁড়া কেটে গেছে, এখন আর কোনও ভয় নেই।

গোকুলচন্দ্র গোস্বামী শেওড়াগাছির সবরেজিস্ট্রার। খুব আরামের চাকরি, কাজ কম, তাঁর বসতবাড়ির কাছেই কাছারি। গোকুলবাবু পণ্ডিত লোক, অনেক শাস্ত্র জানেন, বাংলা ইংরেজী নভেলও বিস্তর পড়েছেন। অবস্থা ভাল, দেবত্র সম্পত্তি আছে, বেনামে তেজারতিও করেন। সাত বৎসর পূর্বে ইনি হিমালয়ের সমস্ত তীর্থ পর্যটনের পর মানস সরোবর আর কৈলাস দর্শন করেছিলেন। ফিরে এসে ঘোষণা করলেন যে তাঁর জন্মান্তর হয়েছে, আগেকার স্ত্রী পুত্র কন্যার সংগে সম্বন্ধ রাখা চলবে না, নতুন সংসার পাতবেন। তার কোনও বাধা হল না, অত্যন্ত গরিবের মেয়ে অনাথা সুকুমারী তাঁর ঘরে এল। প্রথম স্ত্রী কাত্যায়নী তিন ছেলে নিয়ে কলকাতায় তাঁর ভাইএর বাড়িতে গিয়ে রইলেন। স্বামীর কাছ থেকে কিছু মাসহারা পান, তা ছাড়া কোনও সম্বন্ধ নেই। দুই মেয়ের বিয়ে আগেই হয়ে গিয়েছিল, তারা শ্বশুরবাড়িতে থাকে।

স্বামীর প্রবোধবাক্য শুনে সুকুমারী বললে, মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে আমাকে ভুলিও না। কাগজে পড়েছি জন্মনিয়ন্ত্রণের উপায় বেরিয়েছে, দিল্লীর মন্ত্রীরাও তা ভাল মনে করেন। তুমি এত খবর রাখ, এটা জান না? কলকাতায় গিয়ে মন্ত্রীদের কাছ থেকে শিখে এস।

গোকুলবাবু বললেন, তারা ছাই জানে।

—তবে বড় মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করো, তিনি তো শুনেছি ডাক্তার।

—পাগল হয়েছ নাকি সুকু? ছি ছি ছি, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণবংশের কুলবধূর মুখে এই কথা! অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী, একটুখানি লেখাপড়া শিখে খবরের কাগজ পড়ে এইসব পাপ-চিন্তা তোমার মাথায় ঢুকেছে। কৃত্রিম উপায়ে জন্মরোধ করা একটা মহাপাপ তা জান? প্রজাবৃদ্ধির জন্যই ভগবান স্ত্রী-পুরুষ সৃষ্টি করেছেন; গর্ভধারণ হচ্ছে স্ত্রীজাতির বিধি-নির্দিষ্ট কর্তব্য। ভগবানের এই বিধানের ওপর হাত চালাতে চাও?

—শুনেছি আজকাল ঘরে ঘরে চলছে, তাই প্রাণের দায়ে বলছি। আমি মুখ্যু মানুষ, কিছুই জানি না, ন্যায়-অন্যায়ও বুঝি না, কিন্তু ভগবানের ওপর হাত না চালায় কে? ভগবান লেংটা করে পাঠিয়েছিলেন, কাপড় পরছ কেন? দাড়ি কামাও কেন? দাঁত বাঁধিয়েছ কেন?

—রাধামাধব! এসব কথা মুখে এনো না সুকু, জিব খসে যাবে।

—দিল্লীর মন্ত্রীদের তো খসে না।

—খসবে, খসবে, পাপের মাত্রা পূর্ণ হলেই খসবে। শাস্ত্রে যে ব্যবস্থা আছে তা পালন করলে ভগবানের বিধান লঙ্ঘন করা হয় না, তার বাইরে গেলেই মহাপাপ। এইটে জেনে রেখো যে ভাগ্যের হাত থেকে কারও নিস্তার নেই। তোমার সন্তানভাগ্য মন্দ ছিল তাই এত দিন দুঃখ পেয়েছ, ভাগ্য পালটালেই তুমি সুখী হবে। যা বিধিলিপি তা মাথা পেতে মেনে নিতে হয়। এসব বড় গূঢ় কথা, একদিন তোমাকে বুঝিয়ে দেব।

সুকুমারী হতাশ হয়ে চুপ করে রইল।

ছ মাস যেতে না যেতে সুকুমারী আবার অন্তঃসত্ত্বা হল এবং সঙ্গে সঙ্গে রোগে পড়ল। ডাক্তার জানালেন, অতি বিশ্রী অ্যানিমিয়া, তার ওপর নানা উপসর্গ; কলকাতায় নিয়ে গিয়ে যদি ভাল চিকিৎসা করানো হয় তবে বাঁচলেও বাঁচতে পারে। ডাক্তারের কথা উড়িয়ে দিয়ে গোকুলবাবু বললেন, তুমি কিচ্ছু ভেবো না সুকু, জ্যোতিঃশাস্ত্রী মশায়ের মাদুলিটি ধারণ করে থাক আর বিধু ডাক্তারের গ্লোবিউল খেয়ে যাও, দু দিনে সেরে উঠবে।

পুজোর আগে গোকুলবাবু সুকুমারীকে বললেন, অনেক কাল বাইরে যাই নি, শরীরটা বড় বেজুত হয়ে পড়েছে। পুজোর বন্ধের সঙ্গে আরও সাত দিন ছুটি নিয়েছি, মোক্তার নরেশবাবুরা দল বেঁধে রামেশ্বর পর্যন্ত যাচ্ছেন, আমিও তাঁদের সঙ্গে ঘুরে আসব। তুমি ভেবো না, ঠিকে ঝি রইল, ছোঁড়া চাকর গুপে রইল, গয়লাবউও রোজ দু বেলা তোমাকে দেখে যাবে। আমি কালীপুজোর কাছাকাছি ফিরে আসব।

গোকুলবাবু চলে যাবার কিছু দিন পরেই সুকুমারী একেবারে শয্যা নিলে। কোনও রকমে তিন সপ্তাহ কেটে গেল। তার পর একদিন সন্ধ্যার সময় তার বোধ হল, দম বন্ধ হয়ে আসছে ঘরে হারিকেন লণ্ঠন জ্বলছে অথচ সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। খোকা পাশেই শুয়ে আছে। তার মাথায় হাত দিয়ে সুকুমারী মনে মনে বললে, মা জগদম্বা, আমি তো চলে যাচ্ছি আমার ছেলেকে কে দেখবে? হে মা ষষ্ঠী, দয়া কর, দয়া কর, আমার খোকাকে রক্ষা কর।

সহসা ঘর আলো করে ষষ্ঠীদেবী সুকুমারীর সামনে আবির্ভূত হলেন। মধুর স্বরে প্রশ্ন করলেন, কি চাও বাছা?

সুকুমারী বললে, আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে মা। শুনেছি তোমার ইচ্ছায় সন্তান জন্মায়, তোমার দয়াতেই বাঁচে, যিনি সর্বভূতে মাতৃরূপে থাকেন তুমিই সেই দেবী। মা গো, আমি যাচ্ছি, আমার ছেলেটাকে দেখো।

সুকুমারীর কপালে পদ্মহস্ত বুলিয়ে দেবী বললেন, তোমার ছেলের ব্যবস্থা আমি করছি, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমও। সুকুমারী ঘুমিয়ে পড়ল।

ষষ্ঠীদেবী ডাকলেন, মেনী!

একটি প্রকাণ্ড বেরাল সামনে এল। ধপধপে সাদা গা, মাথার লোম কাল, মাঝে সরু সিঁথি, ল্যাজে সারি সারি চুড়ির মতন দাগ। পিছনের দু পায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে সামনের দু পা জোড় করে মেনী বললে, কি আজ্ঞা করছেন মা?

—তুই এই খোকার ভার নে।

—আমি যে বেরাল মা!

—তুই মানুষ হয়ে যা।

নিমেষের মধ্যে মেনীর রূপান্তর হল। একটি সুশ্রী যুবতী আবির্ভূত হয়ে বললে, মা, আমি খোকার ভার নিচ্ছি। কিন্তু আমারও তো বাচ্চা আছে, তাদের দশা কি হবে? আগেকার গুলোর জন্যে ভাবি না, তারা বড় হয়েছে, গেরস্ত বাড়িতে এঁটো খেয়ে, চুরি করে, ছুঁচো ইঁদুর উচ্চিংড়ে ধরে যেমন করে হক পেট ভরাতে পারবে। কিন্তু চারটে দুধপোষ্য বাচ্চা আছে যে, এখনও চোখ ফোটে নি, তাদের উপায় কি হবে?

—তুই মাঝে মাঝে বেরাল হয়ে তাদের খাওয়াবি।

—কিন্তু বাড়ির কর্তা কি ভাববে? গোসাঁই যদি দেখে ফেলে তবে মহা গণ্ডগোল হবে যে!

—তোর কোনও ভয় নেই! যদি দেখেই ফেলে তবে গোসাঁইও বেরাল হয়ে যাবে।

—আবার তো মানুষ হবে?

—না না, চিরকালের মতন বেরাল হয়ে যাবে, কোনও ফেসাদ বাধাতে পারবে না। তোকেও বেশী দিন আটকে থাকতে হবে না, এই ছেলের একটা সুরাহা হয়ে গেলেই তুই ছাড়া পাবি।

দেবী অন্তর্হিত হলেন। সুকুমারীর খোকা জেগে উঠে কাঁদতে লাগল, মেনী তাকে বুকে তুলে নিল। বুভুক্ষু খোকা প্রচুর স্তন্য পেয়ে আনন্দে কাকলী করে উঠল।

একটা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। গোকুলবাবু ফিরে এসেছেন, পরশু তাঁকে কাজে যোগ দিতে হবে। তিনি হাঁকডাক আরম্ভ করলেন—গুপে কোথায় গেলি রে, জিনিসগুলো নামিয়ে নে না—ঝি এর মধ্যেই চলে গেছে নাকি? কই, কারও তো সাড়া-শব্দ নেই। সুকু কোথায় গো, একবার বেরিয়ে এস না।

কেউ এল না, অগত্যা গাড়োয়ানের সাহায্যে গোকুলবাবু নিজেই তাঁর বিছানা তোরঙ্গ ইত্যাদি নামিয়ে নিয়ে ভাড়া চুকিয়ে দিলেন। তার পর—সুকু ভাল আছ তো? খোকা ভাল আছে? চিঠি লেখ নি কেন?—বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন।

মিটমিটে হারিকেনের আলোয় গোকুলবাবু দেখলেন, একটি সুন্দরী মেয়ে খোকাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রশ্ন করলেন, তুমি কে গা?

মেনী বললে, আমার নাম মেনকা, ওঁর দূর সম্পর্কের বোন হই। খবর পেলুম সুকু-দিদির ভারী অসুখ, একলা আছেন, খোকাকে দেখবার কেউ নেই, তাই তাড়াতাড়ি চলে এলুম।

গোকুলবাবু কৃতার্থ হয়ে বললেন, আসবে বইকি মেনকা। তা এসেছ যখন, তখন থেকেই যাও। কেমন আছে তোমার দিদি? আহা, বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছে, জ্বরটা বেশী নাকি?

—দিদি এইমাত্র মারা গেছেন।

গোকুলবাবু মাথা চাপড়ে বিলাপ করতে লাগলেন—আমাকে একলাটি ফেলে কোথায় গেলে গো, খোকার কি হবে গো, ইত্যাদি। মেনী বললে, চুপ করুন জামাইবাবু, কান্নাকাটি পরে হবে। দেরি করবেন না, লোক ডাকুন, সৎকারের ব্যবস্থা করুন। গোকুলবাবু তাই করলেন।

দুদিন পরে গোকুলবাবু বললেন, ভাগ্যিস এসে পড়েছ মেনকা, তাই দুটো খেতে পাচ্ছি, ছেলেটাও বেঁচে আছে। চমৎকার মেয়ে তুমি। আমি বলি কি, এখানে এসেই যখন আমাদের ভার নিয়েছ তখন পাকা করেই নাও, গিন্নী হয়ে ঘর আলো করে থাক।

মেনী বললে, ইশ, আপনার যে সবুর সইছে না দেখছি। ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, লোকে

বলবে কি? দিদির জন্যে শোকটা একটু কমুক, অশৌচ শেষ হক, শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে যাক, তার পর ও কথা বলবেন।

শ্রাদ্ধ চুকে গেল, কিন্তু গোকুলবাবুর স্বস্তি নেই, মেনকার রকম সকম বড় সন্দেহজনক ঠেকছে। চুপ করে থাকতে না পেরে তিনি বললেন, হ্যাঁগা মেনকা, তোমার স্বভাব-চরিত্র তো ভাল মনে হচ্ছে না। আইবুড়ো মেয়ে, বলি তোমার দুধ আসে কি করে? আমি দেখেছি তুমি খোকাকে খাওয়াও। ছেলেপিলে হয়েছে নাকি? স্পষ্ট করে বল বাপু, যতই সুন্দরী হও, নষ্ট মেয়ে আমি বিয়ে করতে পারব না।

মেনী হেসে বললে, লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা হয়েছে বুঝি। ভয় নেই গোসাঁই ঠাকুর, আমার চরিত্রে এতটুকু খুঁত পাবে না, আমি একবারে খাঁটী, যাকে বলে অপাপবিদ্ধা। অত শাস্ত্র পড়েছ পয়স্বিনী কন্যার কথা জান না? আমি হচ্ছি তাই। মাঝে মাঝে দুধ আসে, তিন-চার মাস থাকে, আবার দিনকতক বন্ধ হয়। তোমার ভাগ্য ভাল যে এরকম একটা মেয়ে তোমার ঘরে এসেছে, তাই তোমার আধ-মরা ছেলেটা বেঁচে গেল, নিজের মায়ের দুধ তো ভাল করে খেতেই পায় নি।

গোকুলবাবুর মনের খুঁতখুঁতনি দূর হল না। কিন্তু মেনকার রূপ তাঁকে যাদু করেছে। ভাবলেন, স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি, যা থাকে কপালে, মেনকাকে ছাড়তে পারব না। দু মাস যেতে না যেতেই বিয়ে হয়ে গেল।

গোকুলবাবুর অশান্তি বাড়তে লাগল। মেনকা রোজ রাত্রে লুকিয়ে লুকিয়ে কোথায় যায়? রবিবারেও দুপুরে দু-তিন ঘণ্টা তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না, হয়তো রোজই বেরিয়ে যায়। গোকুলবাবু স্ত্রৈণ হয়ে পড়েছেন, তৃতীয় পক্ষের রূপসী স্ত্রীকে চটাতে চান না। তবুও একদিন বলে ফেললেন, হ্যাঁগা, তুমি মাঝে মাঝে কোথায় উধাও হও?

মেনকা বললে, সে খোঁজে তোমার দরকার কি, আমি তো জেলখানার কয়েদী নই। তুমি রোজ সন্ধ্যেবেলা কোথায় আড্ডা দিতে যাও আমি কি তা জানতে চাই?

গোকুলবাবু স্থির করলেন, চুপ করে থাকা উচিত নয়, জানতে হবে কার কাছে যায়। তিনি একটা টর্চ কিনে শোবার ঘরে এমন জায়গায় রাখলেন যাতে মেনকা টের না পায় অথচ তিনি চট করে সেটা হাতে নিতে পারেন। রাত্রে তিনি ঘুমের ভান করে শুয়ে রইলেন। মেনকা দুপুর রাতে বিছানা থেকে উঠে নিঃশব্দে বাইরে গেল, গোকুলবাবুও খালি পায়ে তার পিছু নিলেন।

উঠন পার হয়ে খিড়কির দরজা খুলে মেনকা বাড়ির পিছন দিকের একটা ছোট চালা ঘরে ঢুকল। সেখানে কাঠ কয়লা আর ঘুঁটে থাকে। মেনকার পরনে সাদা শাড়ি, সেজন্য অন্ধকারেও তাকে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু চালা ঘরের ভেতরে গিয়ে সে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। টর্চের আলো ফেলে গোকুলবাবু দেখলেন, মেনকা নেই; একটা সাদা বেরাল শুয়ে আছে, চারটে বাচ্চা তার দুধ খাচ্ছে।

চার দিকে আলো ঘুরিয়ে গোকুলবাবু ডাকলেন, মেনকা!

মেনী বললে, কেন? চেঁচিও না, আমার বাচ্চারা ভয় পাবে।

মেনকার রূপান্তর দেখে গোকুলবাবুর মাথার মধ্যে সব গুলিয়ে গেল, হাত থেকে টর্চ খসে পড়ল। কিন্তু অন্ধকারেও তাঁর দৃষ্টিশক্তি বিশেষ কমল না, তিনি আশ্চর্যও হলেন না, শুধু মর্মাহত হয়ে বললেন, রাধামাধব, ব্রাহ্মণের বাড়িতে জারজ সন্তান!

মেনী বললে, আহা কি আমার ব্রাহ্মণ রে! নিজের মুখটা না হয় দেখতে পাচ্ছ না, পিছনে হাত দিয়ে দেখ না একবার।

গোকুলবাবু পিছনে হাত দিয়ে দেখলেন তাঁর একটি প্রমাণ সাইজ ল্যাজ বেরিয়েছে! তাতেও তিনি আশ্চর্য হলেন না, অত্যন্ত রেগে গিয়ে বললেন, কুলটা মাগী, কতগুলো নাগর আছে তোর?

—অত আমার হিসেব নেই।

—এক্ষুনি আমার বাড়ি থেকে দূর হয়ে যা।

—তুমি আমাকে তাড়াবার কে হে গোসাঁই? জান না, আমাদের হল মাতৃতন্ত্র সমাজ, যাকে বলে ম্যাট্রিআর্কি। আমাদের সংসারে মদ্দাদের সর্দারি চলে না, তারা একেবারে উটকো, শুধু ক্ষণেকের সাথী।

গোকুলবাবু প্রচণ্ড গর্জন করে মেনীকে কামড়াতে গেলেন। মেনী একলাফে সরে গিয়ে চেঁচিয়ে ডাকল—উর্‌র্যাঁও। (মার্জার-ভাষাবিৎ শ্রীদীপংকর বসু মহাশয় বলেন, এই রকম শব্দ করে মার্জার-জননী তার দূরস্থ সন্তানদের আহ্বান করে।)

মেনীর রুচির বৈচিত্র্য আছে, সে হরেক রকম পতির ঔরসে হরেক রকম অপত্য লাভ করেছে। তার ডাক শুনে নিমেষের মধ্যে সাদা কালো পাঁশুটে পাটকিলে ডোরা-কাটা প্রভৃতি নানা রঙের বেরাল ছুটে এসে বললে, কি হয়েছে মা? মেনী বললে, এই বজ্জাত হুলোটাকে দূর করে দে।

মেনীর সাতটা জোয়ান বেটা বাঘের মতন লাফিয়ে হুলোদশাগ্রস্ত গোকুলবাবুকে আক্রমণ করলে। তিনি ক্ষতবিক্ষত হয়ে করুণ রব করে লেংচাতে লেংচাতে পালিয়ে গেলেন।

তিন দিন পরে গোকুলচন্দ্র গোস্বামীর প্রথমা পত্নী কাত্যায়নী দেবী এই চিঠি পেলেন।

—পূজনীয়া বড়দিদি, আমি আপনার অভাগিনী ছোট বোন, তৃতীয় পক্ষের সতিন মেনকা। কাল রাত্রে গোঁসাই আমার সঙ্গে ঝগড়া করে বিবাগী হয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। যাবার সময় পইতে ছিঁড়ে দিব্যি গেলে বলে গেছেন, আর কদাপি ফিরে আসবেন না, সংসারে তাঁর ঘেন্না ধরে গেছে। তাঁর বিষয়সম্পত্তি দেখা আমার সাধ্য নয়, অতএব আপনি পত্রপাঠ আপনার ছেলেদের নিয়ে এখানে চলে আসুন, নিজের বিষয় দখল করুন। সুকু-দিদি একটি ছেলে রেখে গেছেন, এখন তার বয়স ন-দশ মাস হবে। খাসা ছেলে, দেখলেই আপনার মায়া হবে। আমি আর এখানে থাকব না, আপনি এলেই সব ভার আপনাকে দিয়ে আমার মায়ের কাছে চলে যাব। ইতি সেবিকা মেনকা।

কাত্যায়নী দেরি করলেন না, তাঁর ছেলেদের নিয়ে স্বামীর ভিটেয় ফিরে এলেন। সুকুমারীর ছেলেকে আদর করে কোলে নিয়ে বললেন, এ আমারই ছোট খোকা।

মেনকা আশ্চর্য মেয়ে, মোটেই লোভ নেই। কাত্যায়নী তাঁর ছোট সতিনের জন্য একটা মাসহারার ব্যবস্থা করতে চাইলেন, কিন্তু মেনকা বললে, কিছু দরকার নেই দিদি, আমার মায়ের ওখানে কোনও অভাব নেই। রাহাখরচ পর্যন্ত সে নিলে না। চলে যাবার সময় বললে, দিদি, আপনি সধবা মানুষ, কর্তার খবর পান আর না পান মাছ অবশ্যই খাবেন, নয়ত তাঁর অমঙ্গল হবে। আর আমার একটি অনুরোধ আছে—একটা বুড়ো হুলো বেরাল রোজ এ বাড়িতে আসে, তাকে একটু দয়া করবেন। ভাতের সঙ্গে কিছু মাছ মেখে খেতে দেবেন, পারেন তো একটু দুধও দেবেন। আহা, বেচারা অথর্ব হয়ে গেছে।

কাত্যায়নী বললেন, তুমি কিচ্ছু ভেবো না বোন, তোমার হুলোকে আমি ঠিক খেতে দেব।

১৩৫৯ (১৯৫২)

গন্ধমাদন-বৈঠক

পুরাণে সাত জন চিরজীবীর নাম পাওয়া যায়—অশ্বত্থামা বলির্ব্যাসো হনূমাংশ্চ বিভীষণঃ কৃপঃ পরশুরামশ্চ সপ্তৈতে চিরজীবিনঃ। এঁরা একবার একত্র হয়েছিলেন।

বদরিকাশ্রমের উত্তর-পূর্বে গন্ধমাদন পর্বত। বনবাসে ভীম যখন দ্রৌপদীর উপরোধে সহস্রদল পদ্ম আনতে যান তখন গন্ধমাদনে হনূমানের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর থেকে হনূমান সেখানেই বাস করছেন।

একটি প্রকাণ্ড অক্ষোট অর্থাৎ আখরোট গাছের নীচে প্রতিদিন অপরাহ্ণে হনূমান বার দিয়ে বসেন। সেই সময় নিকটবর্তী অরণ্যের অধিবাসী বহুজাতীয় বানর ভল্লুক প্রভৃতি বুদ্ধিমান প্রাণী তাঁকে দর্শন করতে আসে। হনূমান নানাপ্রকার বিচিত্র কথা বলেন, তাঁর ভক্তেরা পরম আগ্রহে তা শোনে।

একদিন হনূমান অক্ষোটতরুতলে সমাসীন হয়ে ভক্তবৃন্দের বিবিধ প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন এমন সময় জাম্ববানের বংশধর একটি বৃদ্ধ ভল্লুক করজোড়ে বললে, প্রভু, আপনার লঙ্কা-দাহনের ইতিহাসটি আর একবার আমরা শুনতে ইচ্ছা করি।

হনূমান বললেন, সাগরলঙ্ঘন করে লঙ্কায় গিয়ে দেবী জানকীর সঙ্গে দেখা করার পর আমি বিস্তর রাক্ষস বধ করেছিলাম। তার পর ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করে আমাকে কাবু করে ফেললেন। তখন রাক্ষসরা শণ আর বল্কলের রজ্জু দিয়ে আমাকে বেঁধে রাবণের কাছে নিয়ে চলল। আমি ভাবলাম, এ তো মজা মন্দ নয়, বিনা চেষ্টায় রাবণের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যাবে—

এই পর্যন্ত বলার পর হনূমান দেখলেন, একজন নিবিড়শ্যামবর্ণ দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পুরুষ লম্বা লম্বা পা ফেলে তাঁর কাছে আসছেন। সভায় যারা উপস্থিত ছিল সকলেই নিমেষের মধ্যে নিকটস্থ অরণ্যে অন্তর্হিত হল। আগন্তুক হনূমানের কাছে এসে নমস্কার করে বললেন, মহাবীর, আমাকে চিনতে পার?

হনূমান উৎফুল্ল হয়ে বললেন, আরে, এ যে দেখছি লঙ্কেশ্বর বিভীষণ! বহু বৎসর পরে দেখা হল। মহারাজ, সমস্ত কুশল তো? লঙ্কা থেকে কবে এসেছ? এখানে আছ কোথায়?

বিভীষণ বললেন, কাল এসেছি। বদরিকাশ্রমে আমার পত্নীকে রেখে তোমাকে দেখতে এলাম। সমস্ত কুশল, তবে আমার লঙ্কারাজ্য আর নেই।

—সেকি? সিংহল তো রয়েছে।

—সিংহল লঙ্কা নয়, লোকে ভুল করে। লঙ্কা সাগরগর্ভে বিলীন হয়েছে। আমি এখন নিষ্কর্মা, রাজ্যহীন হয়ে ছদ্মবেশে নানা স্থানে ঘুরে বেড়াই, কোনও স্থায়ী আবাস নেই, মহেশ্বর আর রামচন্দ্রের কৃপায় কোনও অভাব নেই। রাজ্য গেছে তাতে ভালই হয়েছে, আজকাল রাজাদের বড় দুর্দিন চলছে।

—বটে! পৃথিবীর আর সব খবর কি বল। লোকে রামচন্দ্রের কীর্তিকথা ভুলে যায় নি তো?

—ভুলে যায় নি, তোমার খ্যাতিও রামচন্দ্রের চাইতে কম নয়, কিন্তু বাংলা দেশে অন্য রকম দেখেছি।

—কি রকম?

—সেখানকার লোকে রামের প্রতি মৌখিক ভক্তি দেখায়, ভূত তাড়াবার জন্য রাম রাম বলে, কিন্তু তাঁর পূজো করে না, কেউ কেউ তাঁর নিন্দাও করে। সবচেয়ে দুঃখের কথা, তোমাকে তারা বিদ্রূপ করে। একনিষ্ঠ প্রভুভক্তি আর অলৌকিক বীরত্বের মহিমা বোঝবার শক্তি বাঙালীর নেই।

—তোমার কথা কি বলে?

—সে অতি কুৎসিত কথা। আমাকে বলে—ঘরভেদী বিভীষণ। জয়চাঁদ, মীরজাফর, লাভাল আর কুইসলিংএর দলে আমাকে ফেলেছে। ন্যায় আর ধর্মের জন্যই আমি ভ্রাতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি তা কেউ বোঝে না।

এই সময় আর একজন সেখানে উপস্থিত হলেন। দীর্ঘ শীর্ণ মলিন দেহ, মাথায় জটা, এক মুখ দাড়ি-গোঁফ, পরনে চীরবাস, গায়ে কর্কশ কম্বল। এককালে বলিষ্ঠ ও সুপুরুষ ছিলেন তা বোঝা যায়। আগন্তুক বললেন, মহাবীর হনুমান আর রাক্ষসরাজ বিভীষণের জয় হক।

হনুমান বললেন, কে আপনি সৌম্য? ব্রাহ্মণ মনে হচ্ছে, প্রণাম করি।

—না না প্রণাম করতে হবে না। আমি ভরদ্বাজের বংশধর দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, কিন্তু ভাগ্যদোষে পতিত হয়েছি।

হনুমান বললেন, অশ্বত্থামা নাম শুনেছি বটে। দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বস এখানে। কোন্ পাপে তোমার পতন হল?

—সে অনেক কথা। পাণ্ডবরা জঘন্য কপট উপায়ে আমার পিতাকে বধ করেছিল, তারই প্রতিশোধে আমি দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র আর ধৃষ্টদ্যুম্নকে সুপ্ত অবস্থায় হত্যা করেছিলাম, পাণ্ডববধূ উত্তরার গর্ভে দারুণ ব্রহ্মশিরঅস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলাম। তাই কৃষ্ণ আমাকে শাপ দিয়েছিলেন—নরাধম, তুমি তিন সহস্র বৎসর জনহীন দেশে অসহায় ব্যাধিগ্রস্ত ও পূযশোণিত-গন্ধী হয়ে বিচরণ করবে। সেই শাপের কাল অতিক্রান্ত হয়েছে, এখন আমি ব্যাধিমুক্ত, ইচ্ছানুসারে সর্ব জগৎ পরিভ্রমণ করি। কিন্তু আমার শান্তি নেই, মন ব্যাকুল হয়ে আছে। এখন আমার বার্তা শুনুন। ভগবান পরশুরাম আমাকে আজ্ঞা করেছেন, বৎস, সপ্ত চিরজীবী যাতে গন্ধমাদন পর্বতে সমবেত হন তার আয়োজন কর। দৈবক্রমে বিভীষণ এখানে এসে পড়েছেন, আমরা তিন জন একত্র হয়েছি, অবশিষ্ট চার জনকে আমি আহ্বান করেছি। ওই যে, ওঁরাও এসে গেছেন।

জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বিরোচনপুত্র দৈত্যরাজ বলি, এবং অশ্বত্থামার মাতুল কৃপ উপস্থিত হলেন। হনুমান সসম্ভ্রমে নমস্কার করে বললেন, আজ আমার জন্ম সফল হল, বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার ভগবান পরশুরাম আমার আশ্রমে পদার্পণ করেছেন, তাঁর সঙ্গে মহাজ্ঞানী মহর্ষি ব্যাস, দানশৌণ্ড মহাকীর্তিমান বলি, এবং সর্বাস্ত্রবিশারদ কৃপাচার্যও এসেছেন। আরও সৌভাগ্য এই যে বহুকাল পরে আমার মিত্র বিভীষণের দর্শন পেয়েছি এবং দ্রোণপুত্র মহারথ অশ্বত্থামাও উপস্থিত হয়েছেন। আমরা সপ্ত চিরজীবী সমবেত হয়েছি, এখন শ্রীপরশুরাম আজ্ঞা করুন আমাদের কি করতে হবে।

পরশুরাম বললেন, তোমরা বোধ হয় জান যে বসুন্ধরার অবস্থা বড়ই সংকটময়। ধর্ম লুপ্ত হয়েছে, সমস্ত প্রজা যুদ্ধের ভয়ে উদ্‌বিগ্ন হয়ে আছে। শুনেছি দু-চার জন নীতি-শাস্ত্রজ্ঞ ধর্মযুদ্ধের নিয়ম বন্ধনের চেষ্টা করছেন কিন্তু পেরে উঠছেন না। আমরা এই সপ্ত চিরজীবী অনেক দেখেছি, অনেক শুনেছি, অনেক কীর্তি করেছি। মহর্ষি ব্যাসের রসনাগ্রে সমস্ত পুরাণ আর ইতিহাস অবস্থান করছে। দৈত্যরাজ বলি ইন্দ্রকে পরাস্ত করেছিলেন, অসংখ্য সৈন্য পরিচালনার অভিজ্ঞতা এ'র আছে। কৃপাচার্য কুরুক্ষেত্রসমরে অশেষ পরাক্রম দেখিয়েছেন কিন্তু কদাচ ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম করেন নি। বিভীষণ আর অশ্বত্থামা দুজনেই মহারথ, অধিকন্তু সমস্ত পৃথিবীর সংবাদ রাখেন। পবননন্দন হনুমান চরিত্রগুণে এবং প্রভুভক্তিতে অদ্বিতীয়। আর আমার কীর্তি তোমরা সকলেই জানো, নিজের মুখে আর বলতে চাই না। এখন আমাদের কর্তব্য, সাত জনে মন্ত্রণা করে এই দারুণ কলিযুগের উপযুক্ত ধর্মযুদ্ধের নিয়ম বেঁধে দেওয়া।

দৈত্যরাজ বলি বললেন, আপনারা কিছু মনে করবেন না, আমি কিঞ্চিৎ অপ্রিয় সত্য নিবেদন করছি। এই ব্যাসদেব ছাড়া আমরা সকলেই এক কালে অসংখ্য বিপক্ষ বধ করেছি। আমরা কেউ ধর্মযুদ্ধ করি নি, অপরাধীর সংগে বিস্তর নিরপরাধ লোককেও বিনষ্ট করেছি। ধর্মযুদ্ধের আমরা কি জানি? ব্যাসদেবও কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ নিবারণ করতে পারেন নি। আসল কথা, ধর্মযুদ্ধ হতেই পারে না, যুদ্ধ মাত্রেই পাপযুদ্ধ। যে বীর যত শত্রু মারেন তিনি তত পাপী।

পরশুরাম প্রশ্ন করলেন, তুমি কি বলতে চাও আমরা সকলেই পাপী?

—আজ্ঞে হাঁ, ব্যাসদেব ছাড়া। আমাদের মধ্যে শ্রীহনুমান সব চেয়ে কম পাপী, কারণ উনি শুধু হাত পা আর দাঁত দিয়ে লড়েছেন, বড় জোর গাছ আর পাথর ছুড়েছেন। উনি ধনুর্বিদ্যা জানতেন না, দূরে থেকে বহু প্রাণী বধ করা ওঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল।

হনুমান বুক ফুলিয়ে বললেন, দৈত্যরাজ, তুমি কিছুই জান না। ধনুর্বাণের কোনও প্রয়োজনই আমার হয় নি, শুধু হাত পা দিয়েই আমি সহস্র কোটি রাক্ষস বধ করেছি।

বিভীষণ বললেন, ওহে মহাবীর, পৌরাণিক ভাষা তুমি তো বেশ আয়ত্ত করেছ! পৃথিবীর লোকসংখ্যা এখন মোটে দু শ কোটি, ত্রেতাযুগে ঢের কম ছিল।

পরশুরাম বললেন, বেশ, মেনে নিচ্ছি হনুমান সব চাইতে কম পাপী। সব চাইতে বড় পাপী কে?

বলি বললেন, আজ্ঞে, সে হচ্ছেন আপনি। একুশ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন, শিশুকেও বাদ দেন নি।

পরশুরাম বললেন, দেখ বলি, পিতামহ প্রহ্লাদের প্রশ্রয় আর বিষ্ণুর অনুগ্রহ পেয়ে তোমার বড়ই স্পর্ধা হয়েছে। আমি বহু দিন অস্ত্র ত্যাগ করেছি, নতুবা তোমার ধৃষ্টতার সমুচিত শাস্তি দিতাম। ধর্মাধর্মের তুমি কতটুকু জান হে দৈত্য? বিষ্ণুক্রান্তা ধরণী থেকে তুমি নির্বাসিত হয়েছ, পাতালে অবরুদ্ধ হয়ে আছ, আজ শুধু আমার অনুরোধে বিষ্ণু তোমাকে দু দণ্ডের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন।

বলি বললেন, প্রভু পরশুরাম, আপনি অবতার হতে পারেন, কিন্তু আপনার ধর্মাধর্মের ধারণা অত্যন্ত সেকেলে। ওহে অশ্বত্থামা, তুমি তো সমস্ত পৃথিবী পর্যটন করেছ, অনেক খবর রাখ, যুদ্ধ সম্বন্ধে এখনকার মনীষীদের মতামত কি শুনিয়ে দাও না।

অশ্বত্থামা বললেন, বড় বড় রাষ্ট্রের কর্তারা বলেন, আমরা যুদ্ধ চাই না, কিন্তু সর্বদাই প্রস্তুত আছি; যদি বিপক্ষ রাষ্ট্র আমাদের কোনও ক্ষতি করে তবে অবশ্যই লড়ব। পক্ষান্তরে কয়েকজন ধর্মপ্রাণ মহাত্মা বলেন, অহিংসাই পরম ধর্ম, যুদ্ধ মাত্রেই অধর্ম। অন্যায় সইবে

না। অন্যায়কারীকে প্রাণপণে বাধা দেবে, কিন্তু কদাপি হিংসার আশ্রয় নেবে না। অহিংস প্রতিরোধের ফলেই কালক্রমে বিপক্ষের ধর্মবুদ্ধি জাগ্রত হবে।

পরশুরাম বললেন, কলিযুগের বুদ্ধি আর কতই হবে! ঘরে মশা ইঁদুর বা সাপের উপদ্রব হলে যে গৃহস্থ অহিংস হয়ে থাকে তাকে ঘর ছেড়ে পালাতে হয়। যারা স্বভাবত দুরাত্মা অহিংস উপায়ে তাদের জয় করা যায় না। অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধং এই উপদেশ সদাশয় বিপক্ষের বেলাতেই খাটে। দুর্যোধনকে তুষ্ট করবার জন্য যুধিষ্ঠির বহু চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাতে ফল হয়েছিল কি? যাঁরা এখন অহিংসার প্রচার করছেন তাঁরা যুদ্ধ থামাতে পেরেছেন কি?

অশ্বত্থামা বললেন, আজ্ঞে না। আমি যে অধর্মযুদ্ধ করেছিলাম তার জন্য কৃষ্ণ আমাকে ত্রিসহস্রবর্ষভোগ্য দারুণ শাপ দিয়েছিলেন। কিন্তু আধুনিক মারণাস্ত্রের তুলনায় আমার ব্রহ্মশির অস্ত্র অতি তুচ্ছ। এখন যাঁরা আকাশ থেকে বজ্রময় প্রলয়াগ্নি ক্ষেপণ করে জনপদ ধ্বংস করেন, নির্বিচারে আবালবৃদ্ধবনিতা সহস্র সহস্র নিরপরাধ প্রজা হত্যা করেন, তাঁদের কেউ শাপ দেয় না। আধুনিক বীরগণের তুল্য উৎকট পাপী সত্য ত্রেতা দ্বাপরে ছিল না।

বলি মৃদুস্বরে বললেন, ছিল। আমাদের এই জামদগ্ন্য পরশুরাম যে একুশ বার ক্ষত্রিয়-সংহার করেছিলেন, নৃশংসতায় তার তুলনা হয় না।

পরশুরামের শ্রবণশক্তি একটু ক্ষীণ, বলির কথা শুনতে পেলেন না। বললেন, বীরের পাপপুণ্য বিচার করা অত সহজ নয়। দুষ্ক্রিয়া যখন দেশব্যাপী হয়, অথবা শ্রেণীবিশেষের মধ্যে অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, যখন উপদেশে বা অনুরোধে কোন ফল হয় না, তখন ঝাড়ে বংশে নির্মূল করাই একমাত্র নীতি, কে দোষী কে নির্দোষ তার বিচারের প্রয়োজন নেই।

বিভীষণ বললেন, একজন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত (T. H. Huxley) বলেছেন, নীতি হচ্ছে দুরকম, নিসর্গনীতি (cosmic law) আর ধর্মনীতি (moral law)। প্রথমটি বলে, আত্ম-রক্ষা আর স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরের সর্বনাশ করা যেতে পারে। এই নীতি অনুসারেই লোকে মশা ইঁদুর সাপ বাঘ ইত্যাদি মারে, খাদ্যের জন্য জীবহত্যা করে, লক্ষ লক্ষ কীট বধ করে কোষেয় বস্ত্র প্রস্তুত করে, সভ্য সবল জাতি অসভ্য দুর্বল জাতিকে পীড়ন বা সংহার করে, যুদ্ধকালে কোনও উপায়ে বিপক্ষকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করে। পক্ষান্তরে ধর্মনীতি বলে, স্বার্থসিদ্ধির জন্য কদাপি পরের অনিষ্ট করবে না, সকলকেই আত্মীয় মনে করবে। কিন্তু কেবল ধর্মনীতি অবলম্বন করে কি করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা যায়, স্বার্থ আর পরার্থ বজায় রাখা যায়, তার পদ্ধতি এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। রাজনীতিক পণ্ডিতগণ অবস্থা বুঝে প্রথম বা দ্বিতীয় নীতির ব্যবস্থা করেন, সাধারণ মানুষও তাই করে। তবে ভবিষ্যদ্‌দর্শী মহাত্মারা আশা করেন যে মানবজাতি ক্রমশ নিসর্গনীতি বর্জন করে ধর্মনীতি আশ্রয় করবে। আমাদের এই ভগবান ভার্গব নিসর্গনীতি অনুসারেই একুশ বার ক্ষত্রিয় সংহার করেছিলেন।

পরশুরাম বললেন, ঠিক করেছিলাম। সাধুদের পরিত্রাণ আর দুষ্কৃতদের বিনাশের জন্যই অবতাররা আসেন। তাঁরা চটপট ধর্ম-সংস্থাপন করতে চান, অগণিত দুর্বুদ্ধি পাপীকে উপ-দেশ দিয়ে সৎপথে আনবার সময় তাঁদের নেই। এখনকার লোকহিতৈষী যোদ্ধারা যদি অনু-রূপ উদ্দেশ্যে নির্মম হয়ে যুদ্ধ করেন তাতে আমি দোষ দেখি না।

অশ্বত্থামা বললেন, কিন্তু একাধিক প্রবল পক্ষ থাকলে নিসর্গনীতিও জটিল হয়ে পড়ে। সকলেই বলে, অন্যায় উপায়ে যুদ্ধ করা চলবে না, অথচ ন্যায়-অন্যায়ের প্রভেদ সম্বন্ধে তারা একমত হতে পারে না। প্রত্যেক পক্ষই বলতে চায়, তাদের যে অস্ত্র আছে তার প্রয়োগ ন্যায়-সম্মত, কিন্তু আরও নিদারুণ নূতন অস্ত্রের প্রয়োগ ঘোর অন্যায়।

পরশুরাম বললেন, আমাদের মধ্যে আলোচনা তো অনেক হল, এখন তোমরা নিজের নিজের মত প্রকাশ করে বল—ধর্মযুদ্ধের লক্ষণ কি? কিপ্রকার যুদ্ধ এই কলিযুগের উপযোগী? বলি, তুমিই, আগে বল।

বলি বললেন, যুদ্ধচিন্তা ত্যাগ করে নিরন্তর শ্রীহরির নাম কীর্তন করতে হবে, কলিতে অন্য গতি নেই।

পরশুরাম বললেন, তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে, বামনদেবের তৃতীয় পদের নিপীড়নে তোমার মস্তিষ্ক ঘুলিয়ে গেছে। বিভীষণ কি বল?

বিভীষণ বললেন, যেমন চলছে চলুক না, ধর্মযুদ্ধের নিয়ম রচনায় প্রয়োজন কি। তাতে কোনও ফল হবে না, আমাদের বিধান মানবে কে? অশ্বত্থামা, তোমার মত কি?

অশ্বত্থামা বললেন, তিন হাজার বৎসর শাপ ভোগ করে আমার বুদ্ধি ক্ষীণ হয়ে গেছে, বিচারের শক্তি নেই। আমার পূজ্যপাদ মাতুলকে জিজ্ঞাসা করুন।

কৃপাচার্য বললেন, যুদ্ধের কোন কথায় আমি থাকতে চাই না, আমি আজকাল সাধনা করছি।

হনুমান বললেন, আপনারা ভাববেন না, ধর্মযুদ্ধের নিয়ম বন্ধন অতি সোজা। সেনায় সেনায় যুদ্ধ এবং সর্ববিধ অস্ত্রের প্রয়োগ একেবারে নিষিদ্ধ করতে হবে। দুই পক্ষের যাঁরা প্রধান তাঁরা মল্লযুদ্ধ করবেন, যেমন বালী আর সুগ্রীব, ভীম আর কীচক করেছিলেন। কিন্তু চড় লাথি দাঁত নখ প্রভৃতি স্বাভাবিক অস্ত্রের প্রয়োগে আপত্তির কারণ নেই।

বিভীষণ বললেন, মহাবীর, তোমার ব্যবস্থায় একটু ত্রুটি আছে। দুই বীর সমান বলবান না হলে ধর্মযুদ্ধ হতে পারে না। মনে কর, চার্চিল আর স্তালিন, কিংবা ট্রুমান আর মাও-সে-তুং, এঁরা মল্লযুদ্ধ করবেন। এঁদের দৈহিক বলের পাল্লা সমান করবে কি করে?

হনুমান বললেন, খুব সোজা। একজন নিরপেক্ষ মধ্যস্থ থাকবেন, যে বেশী বলবান তাকে তিনি প্রথমেই যথোচিত প্রহার দেবেন, যাতে তার বল প্রতিপক্ষের সমান হয়ে যায়।

বিভীষণ বললেন, যেমন ঘোড়দৌড়ের হ্যাণ্ডিক্যাপ।

পরশুরাম বললেন, বৎস হনুমান, কোনও মানুষ তোমার এই বানরিক বিধান মেনে নেবে না। ব্যাসদেব নীরব রয়েছেন কেন, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি? ওহে ব্যাস, ওঠ ওঠ।

পরশুরামের ঠেলায় মহর্ষি ব্যাসের ধ্যানভঙ্গ হল। তিনি বললেন, আমি আপনাদের সব কথাই শুনেছি। এখন একটু সৃষ্টিতত্ত্ব বলছি শুনুন। ভগবান স্বয়ম্ভু কারণবারি সৃষ্টি করে সপ্ত সমুদ্র পূর্ণ করলেন। কালক্রমে সেই বারিতে সর্বজীবের মূলীভূত প্রাণপঙ্ক উৎপন্ন হল, যার পাশ্চাত্ত্য নাম প্রোটোপ্লাজ্‌ম। কোটি বৎসর পরে তা সংহত হয়ে প্রাণকণায় পরিণত হল, এখন যাকে বলা হয় কোষ বা সেল। এই প্রাণকণাই সকল উদ্‌ভিদ আর প্রাণীর আদি-রূপ। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নেই কিন্তু চেষ্টা আছে, অন্তর্লীন আত্মাও আছে। আরও কোটি বৎসর পরে বহু কণার সংযোগের ফলে বিভিন্ন জীবের উদ্‌ভব হল, যেমন ইষ্টকের সমবায়ে অট্টালিকা। প্রাণকণার যে পৃথক প্রাণ আর আত্মা ছিল, জীবশরীরে তা সংযুক্ত হয়ে গেল। ক্রমশ জীবের নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইন্দ্রিয়াদি উদ্‌ভূত হল কিন্তু বিভিন্ন অবয়বের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা রইল না, কারণ সর্বশরীরব্যাপী একই প্রাণ আর আত্মা তাদের নিয়ন্তা।

পরশুরাম বললেন, ওহে ব্যাস, তোমার ব্যাখ্যান থামাও বাপু, আমি তোমার শিষ্য নই।

ব্যাস বললেন, দয়া করে আর একটু শুনুন। কালক্রমে জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের উৎপত্তি হল তারা সমাজ গঠন করলে। ইতর প্রাণীরও সমাজ আছে, কিন্তু মানবসমাজ এক অত্যাশ্চর্য

ক্রমবর্ধমান পদার্থ। বিভিন্ন মানুষ কামনা করছে—আমরা সকলে যেন এক হই। এই কামনার ফলে সামাজিক প্রাণ আর সামাজিক আত্মা ধীরে ধীরে অভিব্যক্ত হচ্ছে, ব্যষ্টিগত ক্ষুদ্র স্বার্থের স্থানে সমষ্টিগত বৃহৎ স্বার্থের উপলব্ধি আসছে। কিন্তু সৃষ্টির ক্রিয়া অতি মন্থর, একত্ববোধ সম্পূর্ণ হতে বহু কাল লাগবে। তার পর আরও বহু কাল অতীত হলে বিভিন্ন মানব-সমাজও একপ্রাণ একাত্মা হবে। তখন বিশ্বমানবাত্মক বিরাট পুরুষই সমস্ত সমাজ আর মানুষকে চালিত করবেন, অঙ্গে অঙ্গে যেমন যুদ্ধ হয় না সেইরূপ মানুষে মানুষেও যুদ্ধ হবে না।

পরশুরাম প্রশ্ন করলেন, তোমার এই সত্যযুগ কত কাল পরে আসবে?

—বহু বহু কাল পরে। তত দিন মানবজাতির বিরোধ নিবৃত্ত হবে না। কিন্তু লোকহিতৈষী মহাত্মারা যদি অহিংসা আর মৈত্রী প্রচার করতে থাকেন তবে তাঁদের চেষ্টার ফলে ভাবী সত্যযুগ তিল তিল করে এগিয়ে আসবে। এখন আপনারা নিজ নিজ স্থানে ফিরে যান, দশ বিশ হাজার বৎসর ধৈর্য ধরে থাকুন, তার পর আবার এখানে সমবেত হয়ে তৎকালীন অবস্থা পর্যালোচনা করবেন।

পরশুরাম বললেন, হুঃ, খুব ধূমপান করেছ দেখছি, দশ-বিশ হাজার বৎসর বলতে মুখে বাধে না। ও সব চলবে না বাপু, আমি এখন বিষ্ণুর কাছে যাচ্ছি। তাঁকে বলব, আর বিলম্ব কেন, কল্কিরূপে অবতীর্ণ হও, ভূভার হরণ কর, পাপীদের নির্মূল করে দাও, অলস অকর্মণ্য দুর্বলদেরও ধ্বংস করে ফেল, তবেই বসুন্ধরা শান্ত হবেন। আর, তোমার যদি অবসর না থাকে তো আমাকে বল, আমিই না হয় আর একবার অবতীর্ণ হই।

১৩৫৯ (১৯৫২)

কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প

কৃষ্ণকলি

সকাল বেলা বেড়াতে বেরিয়েছি। রাস্তার ধারে একটা ফুলুরির দোকানের দাওয়ায় তিন-চার বছরের দুটি মেয়ে বসে আছে। একটি মেয়ে কুচকুচে কালো, কিন্তু সুশ্রী। আর একটি শ্যামবর্ণ, মুখশ্রী মাঝারি রকম। দুজনে আমসত্ত্ব চুষছে।

আমি তাকাচ্ছি দেখে তারা মুখ থেকে আমসত্ত্ব বার করে আমার দিকে এগিয়ে ধরলো। বোধ হয় লোভ দেখাবার জন্য। বললুম, কি চুষছ খুকী?

কালো মেয়েটি উত্তর দিলো, বল দিকি নি কি?

—চটি জুতোর সুকতলা।

—হি হি হি, এ বাবুটা কিছু জানে না, আমসত্ত্বকে বলছে সুকতলা!

অন্য মেয়েটি বললে, হি হি হি, বোকা বাবু রে!

তার পর প্রায় চার বৎসর কেটে গেছে। সকাল বেলা বাড়ি থেকে বেরুবার উপক্রম করছি, একটি মেয়ে এসে বললে, একটু দুব্বো দেবে গা দাদু? বিশ্‌কেম্মা পুজো হবে।

দেখেই চিনেছি এ সেই আমসত্ত্ব-চোষা কালো মেয়ে, এখন এর বয়স বোধ হয় আট বছর। বললুম, যত খুশি দুব্বো নাও না।

মেয়েটির সাজ দেখবার মতন। সদ্য স্নান করে এসেছে, এলো চুল পিঠের ওপর ছড়ানো। একটি ফরসা লালপেড়ে শাড়ি কোমরে জড়িয়েছে। গা খোলা, কিন্তু আঁচলের এক দিক মাথায় দেবার চেষ্টা করছে আর বার বার তা খসে পড়ছে। গোল গোল দুই হাত যেন কষ্টি পাথরে কোঁদা, তাতে ঝকঝকে রুপোর চুড়ি আর অনন্ত, কোমরে রুপোর গোট, গলায় লাল পলার মালা, পায়ে আলতা, হাতে আলতা, সিঁথিতে সিঁদুর। জিজ্ঞাসা করলুম, একি খুকী, বিয়ে করলে কবে?

মাথার ওপর কাপড় টেনে খুকী বললে, খুকী ব'লো নি বাবু, এখন আমি বড় হইছি। আমার নাম কেলিন্দী।

আমি বললুম, কেলিন্দী নয়, কালিন্দী। কিন্তু তোমার আরও ভাল নাম আছে, কৃষ্ণকলি। রবি ঠাকুর তোমাকে দেখে লিখেছেন—কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি, কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক।...কালো? তা সে যতই কালো হ'ক, দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ। কৃষ্ণকলি নাম তোমার পছন্দ হয়?

কালিন্দী ঘাড় দুলিয়ে জানালে যে খুব পছন্দ হয়।

—তোমার বিয়ে হল কবে?

—সেই অঘ্রান মাসে।

—শ্বশুরবাড়ি কোথায়? বরের নাম কি?

—ধেৎ, বরের নাম বুঝি বলতে আছে! শ্বশুরঘর হুই হোথাকে, ছুতোর-বউ মুড়িউলীর দোকানে। দাদু ওই রাঙা ফুল দুটো দাও না, মা পুজো করবে।

চাকরকে বললুম, নিতাই, গোটাকতক রঙ্গন ফুল পেড়ে দাও।

মুখ বেঁকিয়ে সাদা দাঁত বার করে কৃষ্ণকলি বললে, এ ম্যা গে, ও তো নোংরা পেণ্টু পরে আছে, সাত জন্ম কাচে নি। তুমি ফুল পেড়ে দাও।

—আমিও তো নোংরা, এখনও স্নান করি নি, কাপড় ছাড়ি নি। আচ্ছা, এক কাজ করা যাক, নিতাই তোমাকে আলগোছে তুলে ধরুক, ও ফুল ছোঁবে না, তুমি নিজের হাতে পেড়ে নাও।

—কি বলচ গা দাদু, আমার যে বে হয়ে গেছে!

বুঝলুম, পরপুরুষের স্পর্শে কৃষ্ণকলির আপত্তি আছে। বললুম, তবে তোমার বরকে ডেকে আন, সেই তোমাকে তুলে ধরুক।

—সে তুলতে লারবেক। তুমিই আমাকে তুলে ধর না, আমি ফুল পেড়ে নেব।

—সেকি কৃষ্ণকলি, তোমার যে বিয়ে হয়ে গেছে, আমি তোমাকে তুলে ধরব কি করে?

—তুমি তো বুড়ো থুবড়ো।

ঠিক কথা, এতক্ষণ আমার হুঁশ ছিল না যে আমি বুড়ো থুবড়ো, সমস্ত অবলা-জাতি আমার কাছে অভয় পেয়েছে। বললুম, আমার হাতে যে বাতের ব্যথা, তোমাকে তোলবার তো শক্তি নেই।

—বাড়িতে আঁকশি নেই?

আমার লাঠির ডগায় একটা ছুরি বেঁধে আঁকশি করা হল। নিতাই তাই দিয়ে গোটাকতক ফুল পাড়লে, কৃষ্ণকলি মাটি থেকে কুড়িয়ে নিলে।

ফুল-দুব্বো নিয়ে সে চলে যাবার উপক্রম করছে, আমি তাকে বললুম, কৃষ্ণকলি, বিস্কুট খাবে?

—উঁহু।

—মাখন দেওয়া পাঁউরুটি আর মিষ্টি কুলের আচার?

কৃষ্ণকলির মুখ দেখে মনে হল তার রুচি আছে, কিন্তু সংস্কারে বাধছে। বললে, আজ খেতে নেই, বিশকম্মা পুজো! সোঁসা আছে?

—আছে বোধ হয়। নিতাই, দেখ তো বাড়িতে শসা আছে কিনা।

শসা পবিত্র ফল, তাতে কৃষ্ণকলির আপত্তি নেই। নিতাই দুটো শসা এনে আলগোছে তার আঁচলে দিলে। আমি বললুম, কৃষ্ণকলি, তুমি এই অল্প বয়সে বিয়ে করে ফেলেছ, টের পেলে পুলিসে যে তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে।

—ইশ, নিয়ে গেলেই হল কিনা! আমি তো বে করি নি, বে করেছে রেমো। সেই তো মন্তর পড়লে, আমি চুপটি করে বসেছিনু। রেমোর বাবার গায়ে খুব জোর, বলেছে পুলিস এলে ভোমর ঘুরিয়ে তাদের পেট ছেঁদা করে দেবে।

—রেমো বুঝি তোমার বর?

কৃষ্ণকলি ওপর নীচে মাথা নাড়লে।

—এই যাঃ, কৃষ্ণকলি, বরের নাম করে ফেললে!

কৃষ্ণকলি লজ্জায় মা-কালীর মতন জিব বার করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, বলে ফেলেছ তা হয়েছে কি, আজকাল সব্বাই বরকে নাম ধরে ডাকে।

—সক্কলের সামনে ডাকে?

—আড়ালে ডাকে! নির্মলচন্দ্রের বউ ডাকে— ওরে নিমে, জগদানন্দর বউ ডাকে এই জগা। দিন কতক পরে মেমদের মতন সকলের সামনেই ডাকবে।

—আমি যে তোমার সামনে বলে ফেলনু!

—তাতে দোষ হয় নি, আমি বুড়ো লোক কিনা।

এমন সময় একটি ফ্রক-পরা মেয়ে এসে বললে, এই কেলিন্দী, কি করছিস এখেনে, এক্ষুনি আয়, মামী ডাকছে।

এই মেয়েটিই বোধ হয় সেই চার বছর আগে দেখা আমসত্ত্ব-চোষা দ্বিতীয় মেয়ে। কৃষ্ণকলি তাকে বললে, খবদ্দার বিমলি, আর কেলিন্দী কইবি নি, রবি ঠাকুর আমার ভাল নাম দিয়েছে কেষ্টকলি। এই দাদু বললে।

মুখভঙ্গী করে দু হাত নেড়ে বিমলি বললে, মরি মরি, কেলোকিষ্টি কেলিন্দীর নাম আবার কেষ্টকলি! রূপ দেখে আর বাঁচি নে!

কৃষ্ণকলি বললে, দেখ না দাদু, বিমলি আমায় ভেংচি কাটছে।

প্রশ্ন করলুম, বিমলি তোমার কে হয়, বোন নাকি?

—বোন না ঢেঁকি, ও তো আমার পিসতুতো ননদ। বিমলি, তুই যা, আমি একটু পরে যাব।

চলে যেতে যেতে বিমলি বললে, দেখিস এখন, আজ মামী তোকে ছেঁচবে। ওরে আমার কেষ্টকলি, শ্যাওড়া গাছের পেতনী!

কৃষ্ণকলি বললে, দাদু, ও আমায় পেতনী বলবে কেন?

—বলুক গে, ননদরা অমন বলে থাকে, শ্রীরাধার ননদও বলত। এক মেয়ের রূপ আর এক মেয়ে দেখতে পারে না। তোমার বর রেমো তো তোমাকে পেতনী বলে না?

—সেও বলে।

—তুমি রাগ কর না?

—উঁহু, সে হাসতে হাসতে বলে কিনা। আমি তাকে বলি ভূত পিচেশ হনুমান।

—তোমরা ঝগড়া কর নাকি?

—আমি খুব ঝগড়া করি, চিমটিও কাটি, কিন্তু রেমো রাগে না, শুধু মুখ ভেংচায় আর হাসে।

এমন সময় রামের মা এল। সে অনেকদিন থেকে এ বাড়িতে মুড়ি চিঁড়ে-ভাজা দিয়ে আসছে। তার স্বামী মুরারী ছুতোর মিস্ত্রী, ভাল কারিগর, কাঠের ওপর নকসা তোলে। রামের মা কৃষ্ণকলিকে দেখে বললে, ওমা, তুই এখেনে রইছিস, বিমলি যে বললে কেলিন্দী ধিঙ্গী হয়ে হেথা হোথা সেথা চান্দিক ঘুরে বেড়াচ্ছে!

কৃষ্ণকলি বললে, সব মিছে কথা। জান গা মা, এই দাদু বললে রবি ঠাকুর আমার নাম দিয়েছে কেষ্টকলি।

আমি রামের মাকে জিজ্ঞাসা করলুম, এ মেয়েটি তোমার বউ নাকি?

—হেঁ গা বাবা, গেল অঘ্রানে রেমোর সঙ্গে বে দিয়েছি। রেমোর বয়স দশ আর এর আট।

—এত কম বয়সে বিয়ে দিলে? কাজটা যে বেআইনী হয়েছে।

—আইন ফাইন জানি নে বাবা। মেয়েটা হতভাগী, এর মা পাঁচ বছর রোগে

ভুগে গেল সন জন্টি মাসে ম'ল। বাপটা লক্ষীছাড়া, গাজা ভাং খেয়ে গেরুয়া পরে কোথা তারকেশ্বর কোথা ভদ্রেশ্বর টোটো করে ঘুরে বেড়ায়। তাই অনাথা মেয়েটাকে নিজের ঘরে এনে ছেলের সঙ্গে বে দিনু। ওদের ফুলুরির দোকানটাও আমি চালাচ্ছি। আমার তিন মেয়েই তো শ্বশুরঘর করছে, একটা বউ না আনলে কি আমার চলে বাবা? তা কেলিন্দী এখেনে এসে আপনাকে জ্বালাতন করছে বুঝি?

—না না, জ্বালাতন করে নি, একটু গল্প করছিল। তুমি আর একে কেলিন্দী ব'লো না রামের মা, এখন থেকে কৃষ্ণকলি ব'লো।

—হা রে কপাল, আমার খুড়শাশুড়ীর নাম যে ফেন্টদাসী। ঠাকুর দেবতার নাম কি মুখে আনবার জো আছে বাবা, শ্বশুরবাড়ির গুষ্টি সব নাম দখল করে বসে আছে। দাদাশ্বশুর ছিলেন ফরিদাস, শ্বশুরের নাম ফালিদাস, খুড়শ্বশুর ফত্রীধর, শ্বাশুড়ী ফরস্বতী।

কৃষ্ণকলি বললে, আর তোমার নামটা বলে দিই মা? হি হি হি, ফুগ্‌গো ফুগ্‌গতিনাশিনী!

আমি বললুম, রামের মা, আদর দিয়ে তুমি বউটির মাথা খেয়েছ, মুখের ওপর তোমাকে ঠাট্টা করে।

রামের মা হেসে বললে, কি করি বাবা, ওর ধরনই ওইরকম। নিজের মায়ের যত্ন আর ক দিন পেয়েছে, জন্ম ইস্তক আমাকেই দেখছে কিনা। যে নতুন নামটি বললেন তার পুরোটি তো বলতে পারব নি, এখন থেকে একে কলি বলব। দেখুন বাবা, এর রঙটা কালো বটে, কিন্তু খুব ছিরি আছে, ছাঁদটি পরিষ্কার, যেন বাটালি দিয়ে গড়া, আর ভারী সতীলক্ষ্মী মেয়ে। বিম্‌লিটা হচ্ছে কুঁদুলি। এখন আসি বাবা। ঘরকে চল্‌ রে কলি।

আমি বললুম, কৃষ্ণকলি, তোমার বরকে নিয়ে এক দিন এখানে এসো।

রামের মা বললে, হা আমার কপাল, রেমোর যে বড্ড নজ্জা, বউএর সঙ্গে কোথাও যেতে চায় না। আজকালকার ছোঁড়াদের মতন তো নয় যে সোমত্ত বউকে নিয়ে চাদ্দিকে ধেই ধেই নেত্য করে বেড়াবে। রেমোর পরীক্কেটা চুকে যাক, আমিই একদিন দুটিকে নিয়ে আসব।

কৃষ্ণকলি হাত নেড়ে বললে, সে তোমাকে কিছু করতে হবে নি মা, আমি একাই তাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে আসব।

আমি বললুম, রামের মা, তোমার ছেলে তো সেকেলে, কিন্তু বউটি যে অত্যন্ত একেলে।

—ওটুকু সেরে যাবে বাবা, একটু বড় হলেই নজ্জা শরম আসবে।

রামের মা তার পুত্রবধূকে নিয়ে চলে গেল। কৃষ্ণকলির কপাল ভাল, আট বছর বয়সেই সে শাশুড়ীর কাছ থেকে সতীলক্ষ্মী সার্টিফিকেট আদায় করেছে, এক মা হারিয়ে আর এক মা পেয়েছে, এমন বর পেয়েছে যাকে নির্বিবাদে চিমটি কাটা চলে আর হিড়হিড় করে টেনে আনা যায়।

১৩৫৯ (১৯৫২)

জটাধর বকশী

নূতন দিল্লির গোল মার্কেটের পিছনে কুচা চমৌকিরাম নামে একটি গলি আছে। এই গলির মোড়েই কালীবাবুর বিখ্যাত দোকান ক্যালকাটা টি ক্যাবিন। এখানে চা বিস্কুট সস্তা কেক সিগারেট চুরুট আর বাংলা পান পাওয়া যায়, তামাকের ব্যবস্থা আর গোটাকতক হুঁকোও আছে। দু-এক মাইলের মধ্যে যেসব অল্পবিত্ত বাঙালী বাস করেন তাঁদের অনেকে কালীবাবুর দোকানে চা খেতে আসেন। সন্ধ্যার সময় খুব লোকসমাগম হয় এবং জাঁকিয়ে আড্ডা বসে।

পৌষ মাস পড়েছে, সন্ধ্যা সাড়ে ছটা, বাইরে খুব ঠাণ্ডা, কিন্তু কালীবাবুর টি ক্যাবিন বেশ গরম। ঘরটি ছোট, এক দিকে চায়ের উনন জ্বলছে, পনের-ষোল জন পিপাসু ঘেঁষা-ঘেঁষি করে বসেছেন। সিগারেট চুরুট আর তামাকের ধোঁয়ায় ঘরের ভিতর ঝাপসা হয়ে গেছে।

রামতারণ মুখুজ্যে কথা বলছিলেন। এঁর বয়স প্রায় পঁয়ষট্টি। মিলিটারী অ্যাকাউণ্ট্সে কাজ করতেন, দশ বছর হল অবসর নিয়েছেন। দুই ছেলেও দিল্লিতে চাকরি পেয়েছে, সেজন্য রামতারণ এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছেন। ইনি একজন সবজান্তা লোক, কথা বলতে আরম্ভ করলে থামতে চান না, অন্য লোককে কিছু বলবার অবকাশও দেন না। চায়ের আড্ডার সবাই এঁকে উপাধি দিয়েছে —বিরাট ছেঁদা, অর্থাৎ দ গ্রেট বোর।

রামতারণবাবু বলছিলেন, আরে না না, তোমাদের ধারণা একবারে ভুল। ভূত আর প্রেত স্বতন্ত্র জীব, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি শোন। মৃত্যুর পর মানুষ যত দিন বায়ুভূত নিরালম্ব নিরাশ্রয় হয়ে থাকে, অর্থাৎ যে পর্যন্ত আবার জন্মগ্রহণ না করে তত দিন সে প্রেত। কিন্তু—

স্কুল মাস্টার কপিল গুপ্ত বললেন, অর্থাৎ পরলোকের ভ্যাগাবণ্ডরাই প্রেত।

বক্তৃতায় বাধা পাওয়ায় রামতারণ বিরক্ত হয়ে বললেন, ফাজলামি রাখ, যা বলছি শুনে যাও। মৃত্যুর পর মানুষ চিরকাল প্রেত হয়ে থাকে না, আবার জন্মায়। ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। কিন্তু যারা ভূত তারা চিরকালই ভূত।

কপিল গুপ্ত আবার বললেন, বুঝেছি। যেমন গাজনের সন্ন্যাসী আর লোটা-চিমটা-কম্বল-ধারী বারমেসে সন্ন্যাসী।

—আঃ চুপ কর না। মরা মানুষের আত্মা হল প্রেত, বিলিতি গোস্ট্ও প্রেত। কিন্তু পিশাচ আর পল্টারগাইস্ট্কে ভূত বলা যেতে পারে। ভূত হল অপদেবতা, তারা নাকে কথা কয়, ভয় দেখায়, ঘাড় মটকায়, নানা রকম উপদ্রব করে। কিন্তু প্রেত সে রকম নয়, জীবদ্দশায় যার যেমন স্বভাব, প্রেত হলেও তাই থাকে। তবে চলিত কথায় প্রেতকেও লোকে ভূত বলে।

এই সময় একজন অচেনা লোক ঘরে প্রবেশ করলেন। বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ, ছ ফুট লম্বা, মজবুত গড়ন, মোচড় দেওয়া মোটা কাইজারী গোঁফ। গায়ে কালচে

খাকী মিলিটারী ওভারকোট, পরনে ইজার আছে কি ধুতি আছে বোঝা যায় না, মাথায় পাগড়ির মতন বাঁধা কম্ফর্টার। আগন্তুক ঘরে এসে বাজখাঁই গলায় বললেন, নমস্কার মশাইরা, এখানে আপনাদের সঙ্গে বসে একটু চা খেতে পারি কি?

কয়েক জন এক সঙ্গে উত্তর দিলেন, বিলক্ষণ, চা খাবেন তার আবার কথা কি, এ তো চায়েরই দোকান। ওহে কালীবাবু, এই ভদ্রলোককে চা দাও। আপনাকে তো আগে কখনও দেখি নি, নতুন এসেছেন বুঝি?

—নতুন নয়, দিল্লি আমার খুব চেনা জায়গা, তবে সম্প্রতি বহু কাল পরে এসেছি। পুরনো দিল্লির কেউ কেউ এখনও হয়তো আমার নাম মনে রেখেছেন—জটাধর বকশী। ও ম্যানেজারমশাই, দয়া করে আমাকে বেশ বড় এক পেয়ালা চা দিন, খুব গরম আর কড়া। একটা মোটা বর্মা চুরুট, দশ খিলি পান, এক খেবড়া চুন, আর অনেকখানি দোক্তাও দেবেন। হাঁ, তার পর ভূত প্রেতের কি যেন কথা হচ্ছিল আপনাদের। আমি একটু শুনতে পাই কি? এসব কথায় আমার খুব আগ্রহ আছে।

একজন উৎসুক নতুন শ্রোতা পেয়ে রামতারণবাবু খুশী হয়ে বললেন, হাঁ হাঁ শুনবেন বইকি। বলছিলুম, ভূত আর প্রেত আসলে আলাদা জীব, তবে সাধারণ লোকে তফাত করে না। বাদশাহী আর ব্রিটিশ জমানায় ভূত প্রেতের কথা অনেক শোনা যেত, কিন্তু এখনকার এই সেকিউলার ভারতে তারা ফৌত হয়ে যাচ্ছে। গুরুমহারাজ পানিমহারাজ রাজজ্যোতিষী নেপালবাবা ইত্যাদির ওপর লোকের ভক্তি খুব বেড়েছে বটে, কিন্তু ভূত প্রেতের ওপর আস্থা কমে গেছে, সেজন্য তাদের দেখা পাওয়া এখন কঠিন।

কপিল গুপ্ত বললেন, বিশ্বাসে মিলয়ে ভূত, তর্কে বহু দূর।

জটাধর বকশী বললেন, ঠিক কথা। কিন্তু ভূত যদি প্রবল হয় তবে অবিশ্বাসীকেও দেখা দেয়। যদি অনুমতি দেন তো আমি কিছু বলি।

রামতারণবাবু ভ্রূ কুঁচকে বললেন, আপনি ভূতের কি জানেন? গেল বছর যখন চাঁদিনি চকের ঘড়িটা পড়ে গেল

তিন-চার জন একবাক্যে বললেন, মুখুজ্যেমশাই, দয়া করে আপনি একটু থামুন, এঁকে বলতে দিন।

জটাধর বকশী বলতে লাগলেন।—বাদশা জাহাঙ্গীরের আমলে দিল্লিতে একবার প্রচণ্ড ভূতের উৎপাত হয়েছিল, আমাদের ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর তার চমৎকার বৃত্তান্ত লিখেছেন। ভবানন্দ মজুমদারের ইষ্টদেবীকে জাহাঙ্গীর ভূত বলে গাল দিয়েছিলেন। প্রভুর আশকারা পেয়ে বাদশাহী সিপাহীরা ভবানন্দকে বললে—

অরে রে হিন্দুর পুত দেখলাও কঁহা ভূত
নাহি তুঝে করুঙ্গা দো টুক।
ন হোয় সুন্নত দেকে কলমা পড়াঁও লেকে
জাতি লেউঁ খেলায়কে থুক॥

তখন ভবানন্দ বিপন্ন হয়ে দেবীকে ডাকলেন। ভক্তের স্তবে তুষ্ট হয়ে মহামায়া ভূতসেনা পাঠালেন, তারা দিল্লি আক্রমণ করলে—

ডাকিনী যোগিনী শাঁখিনী পেতিনী গুহ্যক দানব দানা।
ভৈরব রাক্ষস বোক্কস খোক্কস সমরে দিলেক হানা॥

লপটে ঝপটে দপটে রবটে ঝড় বহে খরতর।
লপ লপ লম্ফে ঝপ ঝপ ঝম্ফে দিল্লি কাঁপে থরথর॥...
তাথই তাথই হো হো হই হই ভৈরব ভৈরবী নাচে।
অট্ট অট্ট হাসে কট মট ভাষে মত্ত পিশাচী পিশাচে॥

অবশেষে বেগতিক দেখে বাদশা ভবানন্দের শরণাপন্ন হলেন, বিস্তর ধন-দৌলত খেলাত আর রাজগির ফরমান দিয়ে তাঁকে খুশী করলেন, তখন ভূতের উৎপাত থামল। সেকালের তুলনায় আজকাল ভূত প্রেত কিঞ্চিৎ দুর্লভ হয়েছে বটে, কিন্তু এই দিল্লিতে এখনও ভূত দেখা যায়।

কপিল গুপ্ত বললেন, মুখুজ্যেমশাই, আপনি তো প্রাচীন লোক, বহুকাল দিল্লিতে আছেন, ভূতের সঙ্গে কখনও আপনার মোলাকাত হয়েছিল?

রামতারণ বললেন, আমি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, তোমাদের মতন অখাদ্য খাই না, নিত্য সন্ধ্যা-আহ্নিক করি। ভূতের সাধ্য নেই যে আমার কাছে ঘেঁষে।

কপিল গুপ্ত বললেন, আচ্ছা জটাধরবাবু, আপনাকে তো একজন চৌকস লোক বলে মনে হচ্ছে, আপনি ভূত দেখেছেন?

জটাধর বললেন, নিরন্তর দেখছি, ভূত দেখা অতি সহজ।

—বলেন কি! দয়া করে আমাদের দেখান না।

রামতারণ বললেন, ওসব বুজরুকি আমার কাছে চলবে না। ভূত প্রেত মানি বটে, একলা অন্ধকারে ভয়ও পাই, কিন্তু জটাধর কি ঘটাধর বাবু ভূত দেখাতে পারেন এ কথা বিশ্বাস করি না। কলেজে আমি রীতিমত সায়েন্স পড়েছি, ম্যাজিকওয়ালাদের জোচ্চুরিও আমার জানা আছে।

অট্টহাস্য করে জটাধর বললেন, যদি আপনাকে ভূত দেখাই?

—দেখাবেন বললেই হল! কবে দেখাবেন? কোথায় দেখাবেন? কখন দেখাবেন?

—আজই, এখানেই, এখনই দেখাতে পারি।

কপিল গুপ্ত বললেন, দেখিয়ে ফেলুন মশাই, আর দেরি করবেন না, আমাদের বাড়ি ফেরবার সময় হল। কিন্তু কি দেখাবেন, ভূত না প্রেত?

রামতারণবাবু প্রতিবাদ সইতে পারেন না। চটে গিয়ে বললেন, বেশ, এখনই দেখান, ভূত প্রেত বেম্মদত্যি শাঁখচুন্নী যা পারেন। আমি বাজি রাখছি যে আপনি পারবেন না, শুধু ধাপ্পা দিচ্ছেন। ভূত দেখানো আপনার সাধ্য নয়।

জটাধর বললেন, আপনার চ্যালেঞ্জ মেনে নিলুম। মোটা টাকা বাজি রাখতে চাই না, কারণ আপনি নিশ্চয় হারবেন। ছা-পোষা পেনশনভোগী বুড়ো মানুষ, আপনার ক্ষতি করবার ইচ্ছে নেই। এই বাজি রাখা যাক যে ভূত যদি দেখাতে পারি তবে আমার চা চুরুট পানের দাম আপনি দেবেন। আর যদি হেরে যাই তবে আপনি যা খেয়েছেন তার দাম আমি দেব। রাজী আছেন? আপনারা সবাই কি বলেন?

সবাই বললেন, খুব ভাল প্রস্তাব, ভেরি ফেয়ার অ্যান্ড জেন্টলম্যানলি।

বর্মা চুরুটের উগ্র ধোঁয়া উদ্‌গিরণ করতে করতে জটাধর বকশী বলতে লাগলেন।—উনিশ শ একচল্লিশ সালের কথা। তখন আমি বর্মায়, জেনারেল সিটওয়েলের

স্যাপার্স অ্যান্ড মাইনার্স-এর দলে সিনিয়র হাবিলদার-আমিন। বর্মা থেকে চীন পর্যন্ত যে রাস্তা তৈরি হচ্ছিল তারই জরিপ আমাকে করতে হত। আমার ওপর-ওয়ালা অফিসার ছিলেন ক্যাপ্টেন ব্যাবিট।

রামতারণবাবু বললেন, ওসব বাজে কথা কি বলছেন, আপনার চাকরির বৃত্তান্ত আমরা শুনতে চাই না। ভূত দেখাতে পারেন তো দেখান।

দুই হাত নেড়ে আশ্বাস দিয়ে জটাধর বললেন, ব্যস্ত হবেন না সার, আমার কথাটি শেষ হবামাত্র ভূত দেখতে পাবেন। তখন জাপানীরা দক্ষিণ বর্মায় পৌঁছেছে, তাদের আর এক দল থাইল্যান্ডের ভেতর দিয়ে বর্মার উত্তর-পূর্ব দিকে হানা দিচ্ছে। আমাদের সার্ভে পার্টি সে সময় শান স্টেটের উত্তরে কাজ করছিল। দলটি খুব ছোট, ক্যাপ্টেন ব্যাবিট, আমি, পাঁচজন গোর্খা সেপাই, পাঁচজন বর্মী কুলী, একটা জিপ, আর আমাদের তাঁবু রসদ থিওডোলাইট লেভেল চেন ঝান্ডা ইত্যাদি বইবার জন্য চারটে খচ্চর। আমরা যেখানে ছাউনি করেছিলুম সে জায়গাটা পাহাড় আর জঙ্গলে ভরা, মানুষের বাস নেই। বাঘ ভালুক হুড়ার প্রভৃতি জানোয়ারের খুব উপদ্রব। বন্দুক দিয়ে মারা বারণ, পাছে শত্রুরা টের পায়। ব্যাবিট সায়েবের সঙ্গে এক টিন স্ট্রিকনীনের বড়ি ছিল, জিলাটিন দিয়ে মোড়া, পেটে গেলে তিন মিনিটের মধ্যে গলে যায়। মাংসের টুকরোর সঙ্গে সেই বড়ি মিশিয়ে ক্যাম্পের বাইরে ফেলে রাখা হত, রোজই দু-চারটে জানোয়ার মারা পড়ত।

একদিন গুজব শোনা গেল যে জাপানীরা আমাদের বিশ মাইলের মধ্যে এসে পড়েছে। ক্যাপ্টেন ব্যাবিট বললেন, ওহে বকশী, শুধু তুমি আর আমি একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি চল, আর সবাই ক্যাম্পেই থাকুক। চিয়াং কাই-শেক আমাদের সাহায্যের জন্য একটা চীনা পল্টন ইউনান থেকে পাঠিয়েছেন, আজ তাদের এখানে পৌঁছবার কথা। দেখতে হবে তাদের কোনও পাত্তা মেলে কিনা।

আমরা দুজনে উত্তর-পূর্ব দিকে চার-পাঁচ মাইল হেঁটে চললুম। সামনে একটা নিবিড় জঙ্গল, তার ওধারে একটা ছোট পাহাড়। সায়েব বললেন, ওই পাহাড়ের ওপর উঠে দূরবীন দিয়ে চারিদিক দেখতে হবে। আমরা জঙ্গলে ঢুকলুম, সঙ্গে সঙ্গে জন পঞ্চাশ জাপানী আমাদের ঘিরে ফেললে।

রামতারণবাবু অধীর হয়ে বললেন, ওহে বকশী, তুমি তো কেবলই বকবক করে চলেছ। শেষকালে হয়তো বলবে যে তুমি নিজেই একটি জাপানী ভূত দেখেছিলে। সেটি চলবে না বাপু, তোমার দেখা ভূত মানব না।

জটাধর বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আর একটু পরেই আপনারা সবাই স্বচক্ষে ভূত দেখবেন। তার পর শুনুন।—ক্যাপ্টেন ব্যাবিট বললেন, বকশী, আত্মরক্ষার কোনও উপায় নেই, হাত তুলে সরেন্ডার কর। আমরা হাত তুলতেই জাপানীরা কাছে এল। এমন রোগা হাড্ডি-সার পল্টন কোথাও দেখি নি। তাদের তিন-চার জন আমাদের গাল কাঁধ হাত পা টিপে টিপে দেখতে লাগল, একজন সায়েবের কাঁধে কামড়ে দিলে, আর সবাই তাকে ধমক দিয়ে টেনে নিয়ে গেল।

ব্যাবিট সায়েব একটু আধটু জাপানী ভাষা বুঝতেন। জিজ্ঞাসা করলুম এদের মতলব কি? সায়েব বললেন, মাই পুওর বকশী, বুঝতে পারছ না? এদের ভাঁড়ার শূন্য, রসদ যা আসছিল শান ডাকাতরা লুট করে নিয়েছে, সাত দিন উপোস করে আছে, খিদেয় পেট জ্বলছে। তার পর দেখলুম, ওদের কয়েকজন একটা উনন বানিয়ে আগুন জেলেছে, তার ওপর মস্ত একটা ডেকচি চাপিয়েছে।

টি ক্যাবিনে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে বীরেশ্বর সিংগি একটু বেশী ভীতু। ইনি শিউরে উঠে বললেন, এই সময় চীনা পল্টন এসে পড়ল বুঝি?

জটাধর বললেন, কোথায় পল্টন! চারজন জাপানী এগিয়ে এল, দুজনের হাতে দড়ি, আর দুজনের হাতে তলোয়ার। সায়েব বললেন, বকশী, এই চারটে বড়ি এখনই গিলে ফেল। আমি বললুম, আগে থাকতেই বিষ খেয়ে মরব কেন, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। সায়েব ধমক দিয়ে বললেন, যা বলছি তাই কর, আমি তোমার কমান্ডিং অফিসার, অবাধ্য হলে কোর্ট মার্শালে পড়বে। কি আর করা যায়, বড়ি চারটে গিলে ফেললুম, সায়েবও গিললেন।

বীরেশ্বর সিংগি আঁতকে উঠে বললেন, অ্যাঁ, বিষ খেলেন? তার পর চীনা ফৌজের ডাক্তার এসে বিষ বার করে ফেললে বুঝি?

—চীনা ফৌজ এক ঘণ্টা পরে এসেছিল। আমাদের যা হল শুনুন। দুটো জাপানী আমাদের হাত পা বেঁধে ঘাড় নীচু করে বসিয়ে দিলে। আর দুটো জাপানী তলোয়ার দিয়ে ঘ্যাঁচ—

বীরেশ্বরবাবু মাথা চাপড়ে চিৎকার করে বললেন, ওরে বাপ রে বাপ!

—হাঁ মশাই, তলোয়ারের চোপ দিয়ে ঘ্যাঁচ করে আমাদের মুণ্ডু কেটে ফেললে।

রামতারণবাবু ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, তবে বেঁচে আছেন কি করে?

বজ্রগম্ভীর স্বরে জটাধর বকশী বললেন, কে বললে বেঁচে আছি? আপনার হুকুমে বাঁচতে হবে নাকি? আমাদের কেটে টুকরো টুকরা করলে, ডেকচিতে সেদ্ধ করলে, চেটে পুটে খেয়ে ফেললে, খিদের চোটে স্ট্রিকনীনের তেতো টেরই পেলে না। তারপর তিন মিনিটের মধ্যে সব কটা জাপানী কনভলশন হয়ে পটপট করে মরে গেল। ক্যাপ্টেন ব্যাবিটের মতন বিচক্ষণ অফিসার দেখা যায় না মশাই, আশ্চর্য দূরদৃষ্টি। আচ্ছা, আপনারা বসুন, আমি এখন চললুম। ও কালীবাবু, আমার বিলটা রামতারণবাবুই শোধ করবেন। নমস্কার।

১৩৫৯ (১৯৫২)

নিরামিষাশী বাঘ

অনেক বৎসর আগেকার কথা, তখন আলীপুর জন্তুর বাগানের কর্তা ডাক্তার যোগীন মুখুজ্যে। যোগীন আমার বন্ধু। একদিন টেলিফোনে বললে, ওহে, বড় বড় একজোড়া তিব্বতী পান্ডা এসেছে, খাসা জানোয়ার, দেখলেই জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে। সাদা গা, কালো পা, কাজলপরা চোখ, ভাল্লুককে টেনে লম্বা করলে যেমন হয় সেইরকম চেহারা। তোমারই মতন নিরামিষ খায়। দুদিন পরেই হামবুর্গ জু-তে চলে যাবে, দেখতে চাও তো কাল বিকেলে এস।

পরদিন বিকালে যোগীনের কাছে গেলুম। পান্ডা, কাংগারু, হিপ্পো, কালো রাজহাঁস, সাদা ময়ূর প্রভৃতি সব রকম দুর্লভ প্রাণী দেখা হল। তারপর বাঘ সিংগির খাওয়া দেখছি এমন সময় নজরে পড়ল একটা বাঘ ভাল করে খাচ্ছে না, যেন অরুচি হয়েছে। মাংসের চার দিকে তিন পায়ে খুঁড়িয়ে বেড়াচ্ছে আর মাঝে মাঝে একটু কামড় দিচ্ছে। যোগীনকে বললুম, আহা, বেচারার একটা পা জখম হয়েছে, খানিকটা মাংস কেউ যেন খাবলে নিয়েছে। গুলি লেগেছিল নাকি?

যোগীন বললে, গুলি লাগে নি। বাঘটির নাম রামখেলাওন, এর ইতিহাস বড় করুণ। পাশের খাঁচার বাঘিনীটিকে দেখ।

পাশের খাঁচায় দেখলুম একটি খোঁড়া বাঘিনী রয়েছে। এরও অরুচি, কিন্তু তবুও কিছু খাচ্ছে। প্রশ্ন করলুম, দুটোই খোঁড়া দেখছি, কি করে এমন হল?

যোগীন বললে, এই বাঘিনীটির নাম রামপিয়ারী। রামখেলাওন আর রামপিয়ারী দুটোই বছর-দুই আগে গয়া জেলার গড়বড়িয়ার জঙ্গলে ধরা পড়ে। এদের দস্তুর মত মন্ত্র পড়িয়ে বিবাহ হয়েছিল, কিন্তু মনের মিল হল না, তাই আলাদা খাঁচায় রাখতে হয়েছে।

—ভারী অদ্ভুত তো। ইতিহাসটা বল না শুনি।

—তোমার তো সব দেখা হয়ে গেছে, এখন আমার বাসায় চল, চা খেতে খেতে ইতিহাস শুনবে।

যোগীনের কাছে যে ইতিহাস শুনেছিলুম তাই এখন বলছি।

গয়া জেলায় অনেক বড় বড় জমিদার আছেন। একজন হচ্ছেন চৌধুরী রঘুবীর সিং, প্রতাপপুর গ্রামে বাস করেন। ইনি খুব ধনী লোক, অনেক বিষয় সম্পত্তি, গড়বড়িয়ার জঙ্গল এঁরই জমিদারির অন্তর্গত। রঘুবীর রাজপুত ছত্রী, এককালে খুব শিকার করতেন, কিন্তু বুড়ো বয়সে তাঁর গুরু মহাত্মা রামভরোস স্বামীর উপদেশে সব রকম জীবহিংসা ত্যাগ করেছেন, নিরামিষ খান, ত্রিসন্ধ্যা রামনাম জপ করেন। তাঁর কড়া শাসনে বাড়ির সকলেই মায় কাছারির আমলারা পর্যন্ত নিরামিষ খেতে বাধ্য হয়েছে।

রঘুবীর যখন শিকার করতেন তখন তাঁর সহচর ছিল অকলু খাঁ। সে এখন বেকার, কিন্তু নিয়মিত মাসহারা পায় এবং মনিবের সেলাখানায় যত বন্দুক তলোয়ার বর্শা ইত্যাদি অস্ত্র আছে সমস্ত মেজে ঘষে চকচকে করে রাখে।

নিরামিষাশী বাঘ

একদিন সকালবেলা রঘুবীর সিং বাড়ির সামনের চাতালে একটা খাটিয়ায় বসে গুড়গুড়ি টানছেন আর তাঁর পাঁচ বছরের নাতি লল্লুলালের সঙ্গে গল্প করছেন, এমন সময় অকলু খাঁ এসে সেলাম করে বললে, হুজুর, একটা বড় বাঘ গড়বাড়িয়ার জঙ্গলে ধরা পড়েছে।

রঘুবীর বললেন, আহা, রামজীর জানবর, ওকে ফের জঙ্গলে ছেড়ে দাও।

লল্লুলাল বললে, না দাদুজী, ওকে আমি পুষব।

রঘুবীর নাতির আবদার ঠেলতে পারলেন না। হুকুম দিলেন, শাল কাঠের একটা বড় পিঁজরা বানাও, তার সামনে একটা আর পিছনে একটা কামরা থাকবে, যেমন কলকাতার চিড়িয়াখানায় আছে। মোটা মোটা সিক লাগানো হবে। দুই কামরার মাঝে একটা ফটক থাকবে, ছাদ থেকে জিঞ্জির টানলে ফটক খুলবে, তখন বাঘ কামরা বদল করতে পারবে।

দু দিনের মধ্যেই খাঁচা তৈরি হয়ে গেল, তাতে বাঘকে পোরা হল। দেখা-শোনার ভার অকলু খাঁর উপর পড়ল। সে তার মনিবকে বললে, হুজুর, আমাদের যে বাঙালী ডাক্তারবাবু আছেন তিনি বলেছেন আলীপুরের চিড়িয়াখানায় প্রত্যেক বাঘকে দু-তিন দিন অন্তর সাত সের ঘোড়ার মাংস খেতে দেওয়া হয়। এখানে তো তা মিলবে না, আপনি খাসীর হুকুম করুন।

রঘুবীর বললেন, খবরদার, কোনও রকম গোশ্‌ত আমার কোঠির এলাকায় ঢুকবে না। এই বাঘের নাম দিয়েছি রামখেলাওন, ও গোশ্‌ত খাবে না!

—তবে কি রকম খানা দেওয়া হবে হুজুর?

—খানা কি কমী ক্যা? পুরি কচৌড়ি হালুআ লড্ডু খিলাও, চাহে দুধ পিলাও, রাবড়ি মালাই পেড়া বরফি ভি খিলাও।

ওই সব পবিত্র খাদ্যেরই ব্যবস্থা হল। রঘুবীর তাঁর লোকজনদের বিশ্বাস করলেন না, নাতিকে সঙ্গে নিয়ে নিজের সামনে বাঘকে খাওয়াতে এলেন। বাঘ একবার শুঁকে পিছন ফিরে বসল। রঘুবীর বললেন, এসব জিনিস খাওয়া তো অভ্যাস নেই, নিয়মিত দিয়ে যাও, দিন কতক পরেই খেতে শিখবে।

দু দিন অন্তর রামখেলাওনকে নৈবেদ্য সাজিয়ে দেওয়া হতে লাগল, কিন্তু একটু দুধ আর মালাই ছাড়া সে কিছুই খায় না। পুরি কচৌড়ি পেড়া ইত্যাদি সবই অকলু খাঁ আর অন্যান্য চাকরদের জঠরে যেতে লাগল।

মানুষকে যদি অন্য কোনও খাবার না দিয়ে শুধু ঘাস দেওয়া হয় তবে খিদের তাড়নায় সে ঘাসই খাবে। রামখেলাওনও অবশেষে পুরি কচৌড়ি পেড়া প্রভৃতি সাত্ত্বিক খাদ্য খেতে শুরু করলে।

চৌধুরী রঘুবীর সিং-এর একটি দাতব্য দাবাখানা আছে, ডাক্তার কালীচরণ পাল তার অধ্যক্ষ। মনিবের আদেশে কালীবাবু রোজই একবার বাঘটিকে দেখেন। তিনি জন্তুর ডাক্তার নন, তবু বুঝতে দেরি হল না যে রামখেলাওনের গতিক ভাল নয়। তার পেট মোটা হচ্ছে, কিন্তু ফুর্তি নেই, ঝিমিয়ে আছে। কালীবাবু ডায়াগনোসিস করে রঘুবীরের কাছে এলেন।

রঘুবীর প্রশ্ন করলেন, ক্যা খবর ডাকটর বাবু, রামখেলাওন তো বহুত মজে মে হৈ?

কালীবাবু বললেন, না চৌধুরীজী, মোটেই ভাল নেই। ওর ডায়াবিটিস হয়েছে।

—সে কি? ভাল ভাল জিনিসই তো ওকে খেতে দেওয়া হচ্ছে, আমি যা খাই বাঘও তাই খাচ্ছে।

—কি জানেন, বাঘ হল কার্নিভোরস গোশ্‌তখোর জানোয়ার। কার্বোহাইড্রেট খাদ্য ওর সহ্য হচ্ছে না, গ্লুকোজ হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। রোজ তিন বার ইনসুলিন দেওয়া দরকার, কিন্তু দেবে কে?

—কি বলছ বুঝতে পারছি না। তুমি বাঘের ইলাজ করতে না পার তো পাটনা থেকে বড় ডাক্তার আনাও।

—আপনি ইচ্ছা করলে বড় ডাক্তার আনতে পারেন, কিন্তু কেউ কিছুই করতে পারবে না, ছাগল যেমন মাংস হজম করতে পারে না, বাঘ তেমনি পুরি কচৌড়ি পারে না। ওকে যদি বাঁচাতে চান তবে মাংসের ব্যবস্থা করুন।

রঘুবীর সিং চিন্তিত হয়ে বললেন, বড়ী মুশকিল কি বাত। আচ্ছা, কাল আমার গুরুমহারাজ রামভরোসজী আসছেন, তিনি কি বলেন দেখা যাক।

গুরুমহারাজ এলেন, রঘুবীর তাঁকে বাঘ দেখাতে নিয়ে গেলেন, ডাক্তার কালীবাবুও সঙ্গে গেলেন।

রামভরোসজী খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে বাঘকে প্রশ্ন করলেন, ক্যা বেটা রামখেলাওন, ক্যা হুয়া তেরা? বাঘ মৃদুস্বরে উত্তর দিলে, হুলুম।

রামভরোস বললে, সমঝ লিয়া। আরে ই তো বহুত মামুলী বীমারী। বির্হা হুয়া।

কালীবাবু বললেন, বির্হা কি রকম বেয়ারাম?

—নহি সমঝা? বাঘ বাঘিনী মাংতা।

কালীবাবু বললেন, ও, বাঘের বিরহ হয়েছে, তাই ঝিমিয়ে আছে। তবে চটপট বাঘিনী যোগাড় করুন।

চৌধুরী রঘুবীর সিংএর লোকবল অর্থবল প্রচুর। তিন দিনের মধ্যে একটা তরুণী বাঘিনী ধরা পড়ল। রামভরোসজী তার নাম রাখলেন রামপিয়ারী। বিধান দিলেন, আলাদা পিঁজরায় রেখে বাঘিনীকেও পুরি কচৌরি ওগয়রহ খেতে দেওয়া হক। যখন নিরামিষ ভোজনে অভ্যস্ত হবে, বাঘ বাঘিনী দুজনেই সাত্ত্বিক স্বভাব পাবে, তখন পুরুত ডাকিয়ে বিয়ে দিয়ে এক খাঁচায় রাখবে।

খিদের জ্বালায় বাঘিনীও ক্রমশঃ পুরি কচৌড়ি পেড়া ইত্যাদি খেতে আরম্ভ করলে। সাত্ত্বিক আহারের ফলে বাঘের যেসব উপসর্গ দেখা দিয়েছিল বাঘিনীরও তাই দেখা গেল। তখন রামভরোস স্বামীর উপদেশে ঘটা করে বিয়ে দেবার আয়োজন হল, ঢোল বাজল, পুরোহিত মিসিরজী মন্ত্রপাঠ করলেন, তবে দুই থাবা এক করে দেবার সাহস তাঁর হল না। বাঘ-বাঘিনীর বাসের জন্য একটা খাঁচা ফুল দিয়ে সাজিয়ে তার মধ্যে বড় বড় বারকোশে নানাপ্রকার খাদ্যসামগ্রী এবং পান সুপারী কর্পূর ছোয়ারা নারকেল-কুচি প্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্য রাখা হল।

বিবাহসভায় রঘুবীর সিং, তাঁর আত্মীয়-স্বজন, রামভরোসজী কালীবাবু, অকলু খাঁ এবং আরও বিস্তর লোক উপস্থিত ছিলেন। সকলেই আশা করলেন যে এইবারে এদের মেজাজ ভাল থাকবে, খাদ্য হজম হবে, দুটিতে মিলে মিশে সুখে ঘরকন্না করবে।

বর-কনের শুভদৃষ্টি-বিনিময় কেমন হয় দেখবার জন্যে সকলেই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন। শুভ মুহূর্তে শাঁখ বেজে উঠল, বিহারের প্রথা অনুসারে পুরনারীরা

চিৎকার করে গাইতে লাগল—পরদেসীয়া আওল আঙ্গানা। অকলু খাঁ কপাট টেনে নিয়ে নবদম্পতিকে এক খাঁচায় পুরে দিলে।

ফ্রয়েডের শিষ্যরা যাই বলুন, প্রাণীর আদিম প্রেরণা ক্ষুৎপিপাসা। রামখেলাওন আর রামপিয়ারী হিংস্র শ্বাপদ, নামের আগে রাম যোগ করে এবং অনেক দিন নিরামিষ খাইয়েও তাদের স্বভাব বদলানো যায় নি। চার চক্ষুর মিলন হবা মাত্র আমিষবুভুক্ষু দুই প্রাণীর ক্যানিবল প্রবৃত্তি চাগিয়ে উঠল, প্রচণ্ড গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা পরস্পরের সামনের বাঁ পায়ে কামড় দিয়ে এক এক গ্রাস মাংস তলে নিলে।

বাঘের গর্জন, রক্তের স্রোত, মানুষের চিৎকার, লল্লুলালের কান্না সমস্ত মিলে সেই বিবাহসভায় হুলস্থুল পড়ে গেল। রঘুবীরের আদেশে অকলু খাঁ একটা জলন্ত মশালের খোঁচা দিয়ে কোনও রকমে বাঘ দুটোকে তফাত করে তাদের নিজের নিজের খাঁচায় পুরে দিলে। রামভরোস মহারাজ বললেন, এই দুই জীব পূর্বজন্মে পাপ করেছিল তাই এই দশা হয়েছে, এদের চরিত্র দুরস্ত হতে আরও চুরাশি জন্ম লাগবে।

রঘুবীর সিং জিজ্ঞাসা করলেন, ডাক্তারবাবু, এখন কি করা উচিত?

কালীবাবু বললেন, চৌধুরীজী, আপনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নি, এরা যখন কিছুতেই সাত্ত্বিক হল না তখন আর দেরি না করে এদের আলীপুর পাঠিয়ে দিন।

তারপর যোগীন আমাকে বললে, রঘুবীর সিং বাঘ দুটোকে বিদেয় করতে রাজী হলেন। কালীবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, তিনি সমস্ত ঘটনা জানিয়ে আমাকে একটি চিঠি লিখলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আলীপুর জু এই দুটো বাঘকে রাখবে কিনা। খোঁড়া বাঘ শুনে ট্রাস্টীরা প্রথমে একটু খুঁতখুঁত করেছিলেন। কিন্তু চৌধুরী রঘুবীর সিং দিলদরিয়া লোক, ব্যাঘ্রদম্পতির যৌতুক স্বরূপ হাজার-এক টাকার একটি চেক আগাম পাঠিয়ে দিলেন। আর কোনও আপত্তি হল না, রামখেলাওন আর রামপিয়ারী কালীবাবুর সঙ্গে এসে আমাদের এখানে ভরতি হল। এখন মোটের ওপর ভালই আছে, তবে অনেক দিন সাত্ত্বিক আহারের ফলে ওদের প্যাংক্রিয়াস ড্যামেজ হয়েছে, হজমশক্তি কমে গেছে, মেজাজও খিটখিটে হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মোটেই বনে না।

১৩৫৯ (১৯৫২)

বরনারীবরণ

সজ্জনসংগতির নাম আপনারা নিশ্চয় শুনেছেন। খবরের কাগজে যাঁদের ওয়াকিফহাল মহল বলা হয় তাঁরা সকলেই একমত যে এর মতন উঁচুদরের অভিজাত ক্লাব কলকাতায় আর নেই। নামটি মোহমুদ্গর থেকে নেওয়া বটে, কিন্তু এখানে এর মানে সাধুসঙ্গ নয়। সজ্জনসংগতি—কিনা শিক্ষিত শৌখীন নরনারীর মিলনস্থান। আপনি যদি আধুনিক শ্রেষ্ঠ লেখক চিত্রকর নটনটী গাইয়ে বাজিয়ে নাচিয়ে দেখতে চান তবে এখানে আসতেই হবে। যদি অলট্রামডার্ন ফ্যাশন আর চালচলন শিখতে চান তবে এই ক্লাব ভিন্ন গত্যন্তর নেই। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, বাৎসরিক চাঁদা নগদ এক শ টাকা। ক জন তা দিতে পারে? চাঁদার টাকা যদি বা যোগাড় করলেন তবু দরজা খোলা পাবেন না। সজ্জনসংগতির সদস্যসংখ্যা ধরা-বাঁধা আড়াই শ। যদি একটা পদ খালি হয় এবং অন্তত পঞ্চাশ জন সদস্যের সম্মতি আনতে পারেন তবেই আপনার আশা আছে। কিন্তু যদি আপনার বরাত ভাল হয় তবে সুপারিশের জোরে ক্লাবের কোনও বিশেষ অধিবেশনে আপনি অতিথি হিসাবে বিনা খরচে নিমন্ত্রণ পেয়ে যেতে পারেন।

ক্লাবটি চালাবার ভার যাঁদের উপর তাঁরা পাঁচ বছর অন্তর নির্বাচিত হন। বর্তমান সভাপতি অনুকূল চৌধুরী একজন মনীষী লেখক ও সুবক্তা, বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'প্রগামিনী'র মালিক ও সম্পাদক। এঁর বয়স এখন পঁয়ষট্টি, আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলের সঙ্গেই মিশতে পারেন সেজন্য সকলেরই ইনি প্রিয়। কর্মাধ্যক্ষ দু জন, কপোত গুহ আর সোহনলাল সাহু। কপোত গুহ ব্যারিস্টার, বয়স চল্লিশের নীচে, পসার নেই কিন্তু পৈতৃক টাকা দেদার আছে। সোহনলাল ধনী কারবারী যুবক, বয়স ত্রিশের কাছাকাছি, খুব শৌখীন, ছাপরার লোক হলেও বাঙালীর সঙ্গেই বেশী মেশেন। ইনি বলেন, বিহার প্রদেশের সমস্তই বাংলার অন্তর্ভুক্ত হওয়া দরকর, নতুবা বিহারী কালচারের উন্নতি হবে না।

বিকাল বেলা প্রগামিনী পত্রিকার অফিসে অনুকূল চৌধুরী, কপোত গুহ আর সোহনলাল সাহু সজ্জনসংগতির আগামী অধিবেশন সম্বন্ধে পরামর্শ করছেন। কপোত গুহ একটু চঞ্চল হয়ে বলছিলেন, এ রকম করে ক্লাব চালানো যাবে না দাদা। প্রত্যেক বৈঠকে সেই একঘেয়ে প্রোগাম, ভূপালী বোসের গান, লুলু চ্যাটার্জীর নাচ, দরদী সেনের ন্যাকা ন্যাকা আবৃত্তি, জগাই বারিকের রাসলীলা ব্যাখ্যা, আর শসার স্যান্ডউইচ কেক শিঙাড়া সন্দেশ পেস্তা-বাদাম-ভাজা আইসক্রীম চা।

অনুকূল বাবু বললেন, বেশ তো, কি রকম করতে চাও তাই বল না।

সোহনলাল বললেন, গুহ সাহেবের মন খারাপ হয়ে গেছে দুদা। সেদিন প্রাচী-প্রতীচী সংঘের জয়ন্তী হয়ে গেল, তারা একটি চমৎকার ট্যাবলো দেখিয়েছে। ডলি বাগচীর ক্লিওপেট্রা, পবন ঘোষের অ্যান্টনি, আর ইরফান আলীর ঘটোৎকচ দেখে সকলে অবাক হয়ে গেছে। ঘটোৎকচ ক্লিওপেট্রাকে কাঁধে নিয়ে পালাচ্ছে আর অ্যান্টনি ভেউ ভেউ করে কাঁদছে। যারা দেখেছে তারা সবাই ধন্য ধন্য করছে।

অনুকূলবাবু বললেন, তোমরাও তো ওইরকম কিছু একটা করতে পার। গজেন গুপ্তকে বললে একদিনের মধ্যে একটা একাঙ্ক নাটক লিখে দেবে।

সোহনলাল বললেন, আমার মতে সিপাহী যুদ্ধের কোনও ঘটনা দেখালে খুব ভাল হবে। এই ধরুন—নানা সাহেব জেনারেল ম্যাকআর্থারকে বন্দী করে এনে নিজের স্ত্রীকে বলছেন, এই ফিরিঙ্গী তোমার জিম্মায় রইল, ফুরসত হলেই একে পাঁচ টুকরো করবে, আমি আবার লড়াইএ চললুম। ম্যাকআর্থার পায়ে পড়ে প্রাণভিক্ষা করলেন। নানী সাহেবার দয়া হল, বললেন, জান নহি লুংগি, সিফ্‌র্ নাক কাট দুংগি।

কপোত গুহ ঘাড় নেড়ে বললেন, আমরা কারও নকল করতে চাই না, একেবারে নতুন কিছু দেখাতে চাই। শুনুন দাদা—বিলেতে যেমন মে-কুইন ইলেকশন হয়, আগামী অধিবেশনে আমরা তেমনি উপস্থিত মহিলাগণের একজনকে বসন্তরানী নির্বাচন করব।

—বল কি হে, জষ্টি মাসের গুমোট গরমে বসন্তরানী!

—আচ্ছা, আষাঢ় মাস হতে পারে, তখন গরম কমে যাবে। উপস্থিত মহিলা-গণের মধ্যে যিনি সব চেয়ে সুন্দরী তাঁকে আমরা সুন্দরীশ্রেষ্ঠা উপাধি দিয়ে ফুলের মুকুট পরিয়ে দেব, একটি সোনার ঘড়িও উপহার দিতে পারি।

সোহনলাল বললেন, সে খুব ভাল হবে দাদা। খবরটি যদি আগে কাগজে ছাপিয়ে দেওয়া হয় তবে সমস্ত মেম্বার আর মেম্বেরসরা তো হাজির হবেনই, বাইরের লোকেও অ্যাডমিশনের জন্য ভিড় করবে। যদি দশ টাকার টিকিট করা হয় তা হলেও বিস্তর লোক তামাশা দেখতে আসবে।

অনুকূলবাবু বললেন, আইডিয়াটা ভাল, কিন্তু সুন্দরীশ্রেষ্ঠা বলা চলবে না, তাতে অনর্থক মনোমালিন্যের সৃষ্টি হবে। সাধারণ লোকে অল্পবয়সী মেয়েদের মধ্যেই সুন্দরী খোঁজে। কিন্তু আমাদের সদস্যারা সকলেই তরুণী নন, অনেকের বয়স হয়েছে অথচ রূপের খ্যাতি আছে। এইসব হোমরাচোমরা ফ্যাট ফেয়ার অ্যান্ড ফর্টি বা ফর্টি-উত্তীর্ণা মহিলারা যদি দেখেন যে তাঁদের কোনও আশা নেই তবে ভীষণ চটে যাবেন, চাই কি ক্লাবের সম্পর্ক ত্যাগ করতে পারেন। তা হলে তো সজ্জনসংগতি উঠে যাবে।

কপোত গুহ চিন্তিত হয়ে বললেন, ভাবিয়ে তুললেন দাদা, আপনার কি অসাধারণ দূরদৃষ্টি! সুন্দরীশ্রেষ্ঠা নির্বাচন—এ কথা বললে সিটুয়েশন একটু ডেলিকেট হবে বটে। কি বললে ভাল হয় আপনিই স্থির করুন।

অনুকূলবাবু বললেন, বরনারীবরণ মন্দ হবে না। যুবতী প্রৌঢ়া বৃদ্ধা কারও বরনারী হতে বাধা নেই। ফুলের মুকুট আর ঘড়ি না দেওয়াই ভাল, একটা জাঁকালো বরমাল্য দিলেই চলবে।

সোহনলাল বললেন, বরনারী ইলেকশন কি রকম হবে? আমার মতে সিক্রেট ব্যালটের ব্যবস্থা করা দরকার, তা হলে সকলেই চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করে ভোট দিতে পারবে।

অনুকূলবাবু বললেন, তাতে জনমতের নির্ধারণ হবে বটে, কিন্তু তার পরিণামটা ভেবে দেখেছ? তারক মল্লিকের মেয়ে কিরণশশী—আজকাল যে হ্লাদিনী দেবী নাম নিয়ে গৌড়ীয় লাস্যনৃত্যম্ দেখাচ্ছে—সেই সব চেয়ে বেশী ভোট পাবে। তার পরেই বোধ হয় সুরেন ভৌমিকের গুজরাটী স্ত্রী কলাবতী ভৌমিক কিংবা আমাদের ডকটর নিয়োগীর স্ত্রী বঞ্জুলা নিয়োগীর চান্স। ভোটে যেই জিতুক, সদস্যারা

সবাই তাঁদের স্বামীদের ওপর চটবেন, বাড়িতে মুখ হাঁড়ি করে থাকবেন, একটা পারিবারিক অশান্তির সৃষ্টি হবে। আমাদের মেয়েরা এখনও পাশ্চাত্ত্য নারীর উদারতা পায় নি, সবাই শ্রীরাধার মতন জেলস। তা ছাড়া ব্যালটে বিস্তর সময় লাগবে, লোকের ধৈর্য থাকবে না। ক্লাবের মেম্বাররা আমোদ চায়, ব্যালটের মতন নীরস ব্যাপারে সময় নষ্ট করা পছন্দ করবে না। ব্যালট নয়, সেকালের স্বয়ংবর সভার মতন কিছু করাই ভাল। সভায় যারা উপস্থিত থাকবেন তাঁদেরই একজনকে বরয়িতা বা বিচারক করা হবে। তিনি বরমাল্য হাতে নিয়ে সভা পরিক্রমণ করবেন, প্রত্যেক মহিলার চেহারা ঠাউরে দেখবেন, তার পর যাঁকে বরনারী সাব্যস্ত করবেন তাঁর গলায় মালা দেবেন। এতে পারিবারিক অশান্তি হবে না। বরমাল্য যাঁকেই দেওয়া হক, মেয়েরা শুধু বিচারকের ওপর চটবেন, তাঁদের স্বামীদের দোষ ধরবেন না।

সোহনলাল বললেন, খুব ভাল হবে। জজ মশাই যখন ঘুরে ঘুরে ইন্‌স্পেকশন করবেন তখন মহিলাদের বুক তড়প তড়প করবে, আর পুরুষরা খুব মজা পাবে। হয়তো চুপি চুপি বাজি ধরবে—ফোর টু ওআন হ্ল্যাদিনী দেবী, থ্রি টু ওআন কলাবতী ভৌমিক। এর চেয়ে আমোদ হতেই পারে না।

আরও কিছুক্ষণ পরামর্শের পর স্থির হল যে আষাঢ় মাসের অধিবেশনে বরনারী-বরণের ব্যবস্থা হবে। বিচারক কে হবেন তা নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার দরকার নেই, সভাতে স্থির করলেই চলবে। বরনারীর নির্বাচনে কিছু গলদ হলেও ক্ষতি হবে না, সদস্যারা যদি হুজুগে মেতে একটু উত্তেজনা আর আনন্দ উপভোগ করেন তা হলেই আয়োজন সার্থক হবে।

কপোত গুহ আর সোহনলাল সাহু যাবার জন্য উঠলেন। অনুকূল চৌধুরী বললেন, হাঁ, ভাল কথা—আমার বেহাই রাথহরি লাহিড়ী সস্ত্রীক কাশী থেকে আসছেন, পুরী ঘুরে এসে কিছুদিন আমার কাছে থাকবেন। এককালে ইনি গোরখপুর ডিভিশনের বড় এঞ্জিনিয়ার ছিলেন, বেশ পণ্ডিত লোক। বয়স আশি পেরিয়েছে, কিন্তু খুব শক্ত আছেন, তাঁর গিন্নীরও প্রায় বাহাত্তর হবে। কাশীতে ছেলের কাছে থাকেন, কিন্তু সেখানকার গরম এখন আর বুড়ো বুড়ীর সয় না। লাহিড়ী মশাইকে অতিথি হিসেবে একটা নিমন্ত্রণপত্র দিও, তাঁর স্ত্রী থাকমণি দেবীকেও দিও। আমি সস্ত্রীক সজ্জনসংগতিতে যাব, বেহাই বেহানকে বাড়িতে ফেলে রাখা ভাল দেখাবে না।

কপোত গুহ বললেন, নিশ্চয় নিশ্চয়। সোহনলাল আর আমি আপনার বাড়িতে গিয়ে তাঁদের নিমন্ত্রণপত্র দিয়ে আসব।

কপোত গুহর চেষ্টায় বরানগরের ভাগীরথী ভিলা নামক প্রকাণ্ড বাগানবাড়িটি যোগাড় হয়েছে, এখানেই বরনারীবরণ হবে। সজ্জনসংগতির আড়াই শ সদস্য-সদস্যা সকলেই এসেছেন, তা ছাড়া তাঁদের সুপারিশে প্রায় এক শ জন অতিথি হিসাবে আমন্ত্রিত হয়েছেন। চার দিক গাছে ঘেরা খোলা মাঠে সভা বসেছে, যদি বৃষ্টি হয় তবে বাড়ির বড় হল ঘরে উঠে গেলেই চলবে। স্ত্রীপুরুষের আলাদা বসবার ব্যবস্থা হয় নি, অন্যান্য অধিবেশনের মতন এবারেও সকলে ইচ্ছামত মিলে মিশে বসেছেন। কেবল দশ-বারো জন স্কুল-কলেজের মেয়ে এক পাশে দল বেঁধে মহা উৎসাহে আড্ডা দিচ্ছে।

মাঠের এক ধারে সভাপতি অনুকূল চৌধুরী বসেছেন। নিকটেই তাঁর স্ত্রী

সরসীবালা দেবী, বেহাই রাখহরি লাহিড়ী, বেহান থাকমণি দেবী এবং কয়েকজন মান্যগণ্য সদস্য-সদস্যা আর আমন্ত্রিত অতিথি আসন পেয়েছেন। কপোত গুহ, সোহনলাল সাহু এবং অন্যান্য কর্মকর্তারাও কাছে আছেন।

প্রথমেই সভাপতি বললেন, আপনারা আমন্ত্রণপত্রে পড়েছেন যে আজ আমরা এখানে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। আশা করি সেটি সকলেরই উপভোগ্য হবে। আমাদের মামুলী কৃত্য যা আছে তা আগে চুকে যাক, তারপর বরনারীবরণ হবে।

যথারীতি বেহালা এসরাজ বাঁশির কনসার্ট, সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি আর জলযোগ শেষ হল। অধ্যাপক কপিঞ্জল গাঙ্গুলী বৈদিক যুগের নক্তগোষ্ঠী বা নাইট ক্লাব সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ পড়বার উপক্রম করছিলেন, কিন্তু তাঁর পাশের সদস্যরা তাঁকে থামিয়ে দিলেন। তার পর সভাপতি ঘোষণা করলেন—আজ আমরা উপস্থিত মহিলাগণের মধ্য থেকে একজনকে বরনারী রূপে বরণ করব। বরয়িতা অর্থাৎ বিচারক কে হবেন, কাকে আপনারা এই দুরূহ কর্মের জন্য যোগ্যতম মনে করেন, তাঁর নাম আপনারাই প্রস্তাব করুন।

রাজলক্ষ্মী দেবী সাহিত্যভাস্বতী একজন উঁচুদরের লেখিকা। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে, শ্যামবর্ণ লম্বা চওড়া দশাসই চেহারা, মুখটি বেশ ভারী আর গম্ভীর। দশ বৎসর আগেও এঁর লেখা খুব জনপ্রিয় ছিল, কিন্তু সম্প্রতি অর্বাচীন লেখক-লেখিকাদের উপদ্রবে এঁর বইয়ের কাটতি ক্রমশ কমে যাচ্ছে। রাজলক্ষ্মী দেবী দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, আপনারা যা করতে চাচ্ছেন তা আমাদের ভারতীয় সংস্কারের বিরোধী। প্রকাশ্য সভায় একজন পরপুরুষ একজন পরনারীকে বরনারী আখ্যা দিয়ে মাল্যদান করবে—সেই নারী কুমারী সধবা বিধবা যাই হ'ক না কেন—এ অতি অশোভন নীতিবিরুদ্ধ ব্যাপার। বিলাতে এসব অনাচার চলতে পারে, কিন্তু এদেশের রুচিতে তা সইবে না। আমাদের আদর্শ সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী, সর্বসাধারণের দৃষ্টিভোগ্যা বিলাসিনী সুন্দরী নয়। একেই তো আজকালকার মেয়েরা সিনেমার নটী হবার জন্য মুখিয়ে আছে, তার ওপর যদি আপনারা বরনারীবরণ আরম্ভ করেন তবে সমাজ অধঃপাতে যাবে। আমি আপনাদের সংকল্পিত অনুষ্ঠানে ঘোর আপত্তি জানাচ্ছি।

কপোত গুহর বৃদ্ধা পিসী পাশেই বসে ছিলেন। ইনি বললেন, রাজলক্ষ্মী ঠিক কথা বলেছে। বরনারী টরনারী চলবে না, যত সব ইল্লুতে কান্ড।

রাজলক্ষ্মী দেবীর স্বামী কাউনসিলার বামাপদ ঘোষাল একটু পিছনে বসে ছিলেন। ইনি লাজুক লোক, বেশী কথা বলেন না। এখন কর্তব্য বোধে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, বরনারীবরণ আমারও পছন্দ নয়।

সভাপতি বললেন, দুজন সদস্যা আর একজন সদস্য আপত্তি জানিয়েছেন। যদি অন্তত চার আনা সদস্যের অমত থাকে তবে আমরা বরনারীবরণ অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেব। শ্রীযুক্তা রাজলক্ষ্মী দেবী সাহিত্যভাস্বতীর সঙ্গে যাঁরা একমত তাঁরা দয়া করে হাত তুলুন।

রাজলক্ষ্মী, তাঁর স্বামী, আর কপোত গুহর পিসী ছাড়া অন্য কেউ হাত তুললেন না। সভাপতি বললেন, বরনারীবরণে যাদের মত আছে তাঁরা এইবারে হাত তুলুন।

প্রায় তিন শ জন হাত তুললেন, যেসব মেয়েরা আড্ডা দিচ্ছিল তারা দু হাত তুললে। সভাপতি বললেন, দেখা গেল পনরো আনার বেশী সদস্যের সম্মতি আছে, অতএব বরনারীবরণ হবে। এখন আপনাদের মধ্য থেকে কেউ বরয়িতা বা বিচারকের

নাম প্রস্তাব করুন।

কপোত গুহর তালিম অনুসারে বিখ্যাত উপন্যাসলেখক অরিন্দম সান্যাল দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, আমি প্রস্তাব করছি—খ্যাতনামা চলচ্চিত্র-প্রযোজক শ্রীযুক্ত ভূপেন হালদার মশাইকে বরনারীবরণের ভার দেওয়া হক। নারীর রূপের সমঝদার এঁর চাইতে ভাল কেউ নেই। আমার মতে ইনিই যোগ্যতম বরয়িতা।

ভূপেন হালদার দাঁড়িয়ে উঠে করজোড়ে বললেন, আপনারা আমাকে মাপ করবেন, আমি এই কাজের মোটেই উপযুক্ত নই। আমি নারী দেখি ক্যামেরার দৃষ্টিতে, পর্দায় তাঁদের রূপ কি রকম ফুটে উঠবে তাই আমার বিচার্য। রক্তমাংসের নরনারী সোজা চোখে কেমন দেখায় তার অভিজ্ঞতা আমার বিশেষ কিছু নেই।

সোহনলালের উসকানিতে আর একজন সদস্য প্রস্তাব করলেন, প্রবীণ চিত্রকর স্বনামখ্যাত নিখিলেশ্বর সেন মহাশয়কে বরয়িতা করা হক!

নিখিলেশ্বর হাত জোড় করে বললেন, মাপ করবেন মশাইরা। কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে ঘর করি, সাহায্য করবার দ্বিতীয় লোক নেই, গৃহিণীই একমাত্র ভরসা। তিনি বাড়িতে ঘরকন্নার কাজে ডুবে আছেন এই মওকায় যদি আমি একজন বরনারীকে মাল্যদান করি তবে গৃহিণী খুশী হবেন না। কাগজে আর ক্যাম্বিসে হরেক রকম বরনারী আঁকতে পারি—শাড়ি সিঁদুর-টিপ পরা মেম, ঢুলু ঢুলু চৈনিক-নয়না ওরিয়েন্টাল ললনা, পটের সুন্দরী যার পটোলচেরা চোখ মুণ্ডুর বাইরে বেরিয়ে আসে—সব রকমই আমি এঁকে থাকি। কিন্তু একজন জলজ্যান্ত সুন্দরীকে সামনা-সামনি বরণ করব এমন বুকের পাটা আমার নেই।

ছাত্রীদের আড্ডা থেকে রব উঠল, যত সব ভীরু কাওয়ার্ড।

প্রতাপগড় কলেজের ভূতপূর্ব প্রিন্সিপাল গগন বাঁড়ুজ্যে বললেন, আমাদের সদস্যদের সংকোচ হবারই কথা। এত দিন ধরে যাঁদের দেখে আসছেন তাঁদের একজনকে আজ হঠাৎ বরমাল্য দিতে চক্ষুলজ্জা হতেই পারে। বরনারীবরণের ভার কোনও নতুন লোককে দেওয়াই ভাল। ভাগ্যক্রমে রিটায়ার্ড এগজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার শ্রদ্ধেয় রাখহরি লাহিড়ী মশাই এখানে উপস্থিত আছেন। ইনি বহুদর্শী বিচক্ষণ ঋষিতুল্য লোক, বয়সে আমাদের সকলের চাইতে বড়, নির্ভীক স্পষ্টবক্তা বলে এঁর খ্যাতি আছে। কর্নেল গ্রেহাম সাহেবকে ইনি মুখের ওপর ড্যাম ফুল বলেছিলেন, সেজন্যই রায়বাহাদুর খেতাব পান নি। আমার প্রস্তাব, এঁকেই বরয়িতা করা হক।

একজন সদস্য এই প্রস্তাবের সমর্থন করলেন। অনুকূলবাবু তাঁর বেহাইকে বললেন, আপত্তি করবেন না লাহিড়ী মশাই, আপনিই আমাদের ভরসা। রাখহরি-বাবু তাঁর পত্নীকে জিজ্ঞাসা করলেন, গিন্নী কি বল, রাজী হব নাকি?

থাকমণি দেবী কানে একটু কম শোনেন, ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেন নি। অনুকূলবাবুর স্ত্রী সরসীবালা তাঁকে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলেন। থাকমণি বললেন, বেশ তো, যাকে পছন্দ হয় মালা দাও না গিয়ে, কে বারণ করছে। আমি তো একটা অথদ্দো থুথুড়ী বুড়ী।

সরসীবালা বললেন, ওকি দিদি, খুশী মনে হুকুম দিন, তা না হলে ওঁর যেতে সাহস হবে কেন। সভায় এত লোক ওঁর জন্য হা-পিত্যেশ করছে, ওদের হতাশ করবেন না।

থাকমণি বললেন, হ্যাঁ গো হাঁ, খুশী মনেই বলছি। ওই তো গণ্ডা গণ্ডা রূপসী বসে রয়েছে, যাকে মনে ধরে স্বচ্ছন্দে মালা দিয়ে এস, আমার তাতে কি।

থ্যাকমণি দেবী একটু বেশী বুড়ো হয়ে পড়েছেন, কিন্তু তাঁর স্বামীর চেহারাটি দেখবার মতন। লম্বা মজবুত গড়ন, ফরসা রং, পাকা চুল, পাকা গোঁফ-দাড়ি, যেন থিয়েটারের ভীষ্ম। পত্নীর সম্মতি পেয়ে রাখহরিবাবু দাঁড়িয়ে উঠে স্মিতমুখে বললেন, সভাপতিভায়া, মাননীয় মহিলা ও ভদ্রবৃন্দ, মা-লক্ষ্মীগণ এবং দিদিমণিগণ, আমার ওপর আপনারা বড় কঠিন কর্তব্য চাপিয়েছেন। কিন্তু আমি পিছপা নই, এর চাইতেও শক্ত কাজ ঢের করেছি। গোড়াতেই আমি বরনারীর লক্ষণ সম্বন্ধে দু-চার কথা বলতে চাই। ইংরেজীতে প্রবাদ আছে—beauty is skin deep, অর্থাৎ রূপের দৌড় চামড়া পর্যন্ত। কথাটা ডাহা মিথ্যে। শুধু চামড়ায় নয়, নারীর মাংস হাড় মজ্জা সর্বত্রই রূপের সন্ধান করতে হবে।

একটা ফাজিল মেয়ে বললে, চিরে চিরে দেখবেন নাকি সার?

—আরে না না, তোমাদের কোনও ভয় নেই, আমি এক নজরেই ভেতর বার সব টের পাই। যা বলছিলুম শোন। মানুষের যেমন তিন দশা—বাল্য যৌবন জরা, নারীর যৌবনেরও তেমনি তিন দশা—আদ্য মধ্য আর অন্ত্য। এই তিন যৌবনের তোয়াজ বা পরিচর্যার পদ্ধতি আলাদা, প্রসাধন বা মেরামতও এক রকমে হয় না। কি রকম জানেন? মনে করুন একটা ইমারত তৈরী হল। প্রথম পনরো বৎসর তার হেপাজত খুব সোজা, মাঝে মাঝে চুনকাম আর রং ফেরালেই যথেষ্ট। কিন্তু আরও পরে দেখবেন, এক এক জায়গায় পলেস্তারা খসে গেছে, দরজা জানালার রং চটে গেছে। তখন রীতিমত মেরামত করতে হবে। ত্রিশ-চল্লিশ বছর পরে দেখবেন, স্থানে স্থানে ভিত বসে গেছে, দেওয়ালে ফাট ধরেছে, ছাত চিড় খেয়েছে। তখন শুধু দাগরাজি নয়, থরো রিপেয়ার দরকার, হয়তো দু-চার জায়গায় পিলপে গেঁথে কড়িতে চাড় দিতে হবে, ফাটা দেওয়াল জুড়তে হবে। ফেস লিফ্‌টিং জানেন? বিলেতে খুব চলন আছে, আমাদের মা-লক্ষ্মীরা কেউ করিয়েছেন কিনা জানি না। বেশী বয়সে গাল ঝুলে পড়লে রগের চামড়া টেনে সেলাই করে দেয়, তাতে যৌবনশ্রী ফিরে আসে। ফাটা দেওয়াল যেমন লোহার প্লেট আর নট-বোল্টু দিয়ে টেনে রাখা হয় সেইরকম আর কি। আসল কথা, আমাদের এই দেহমন্দির একটা ইমারতের সমান, যতদিন খাড়া থাকে ততদিনই তার তোয়াজ করতে হয়। কিন্তু ইমারত পুরনো হলেই বরবাদ হয় না, হাল ফ্যাশনের অনেক বাড়ির চাইতে আমাদের বাপ-পিতামোর আমলের সেকেলে বাড়ি ঢের ভাল। বরনারীও সেইরকমে বিচার করতে হবে। শুধু কম বয়স আর ওপরচটকে ভুললে চলবে না মশাই, দেখতে হবে বনেদ কেমন, গাঁথনি কেমন, ভূমিকম্প আর ঝড়বৃষ্টির ধকল সইতে পেরেছে কিনা। আচ্ছা, কথা তো বিস্তর বলা হল, এখন ইন্‌স্পেকশন আরম্ভ করা যাক। কই হে সেক্রেটারি, তোমাদের বরমাল্য কই?

কপোত গুহ একটি প্রকাণ্ড মালা এনে বললেন, এই যে সার। রাখহরিবাবু মালাটি হাতে নিয়ে বললেন, বাঃ, খাসা মালাটি, বোধ হয় সের খানিক জুঁই ফুল আছে। বরমাল্য এইরকমই হওয়া উচিত। আজকাল হয়েছে গ্যালভানাইজ তারে গাঁথা ফুল-পাতার মালা, খ্রীষ্টানরা যেমন কবরে দেয়। এক জায়গায় আমাকে ওইরকম একটা মালা দিয়েছিল, গিন্নী রেগে গিয়ে টান মেরে সেটা ফেলে দিয়েছিলেন।

রাখহরি লাহিড়ী মন্থরগতিতে পরিক্রমণ আরম্ভ করলেন। প্রথমেই ছাত্রীদের দলের কাছে এসে বললেন, বগের মত গলা বাড়াচ্ছিস কি, তোদের মালা দিচ্ছি না। তোরা হলি কাঁচা কংক্রিট, পোক্ত হতে বহুকাল লাগবে।

একটি মেয়ে চুপি চুপি বললে, দাদু দয়া করে রাজলক্ষ্মী দেবীর গলায় মালা দিন, ভীষণ মজা হবে।

চোপ বলে ধমক দিয়ে রাখহরি এগিয়ে চললেন। প্রত্যেক মহিলার সামনে এসে একটু থামেন, তার পর আবার চলেন। সভায় চাপা গলায় তুমুল গুঞ্জন আরম্ভ হল। সদস্যারা বলাবলি করতে লাগলেন—বুড়ো কাকে মালা দেবে মনে হচ্ছে? নিশ্চয় হ্লাদিনী দেবীকে—উঃ, কি মারাত্মক কায়দায় শাড়ি পরেছে দেখ। কই না, ওর দিকে একবার তাকিয়েই তো এগিয়ে চলল। ওই দেখ, বঞ্জুলা নিয়োগীকে ঠাউরে দেখছে। নাঃ, বুড়োর পছন্দ কিচ্ছু নেই, ঘাড় নেড়ে আবার চলল। বোধ হয় কলাবতী ভৌমিককে পছন্দ করবে। ওঃ, চুল বাঁধার স্টাইলখানা দেখ। আরে গেল যা, ওকেও তো ফেলে চলে গেল! কাকে মালা দেবে বুড়ো, সুন্দরী আর কই? এই মাটি করলে, রাজলক্ষ্মী দেবীর কাছে থেমেছে, শেষটায় ওকেই মনে ধরল নাকি? নাঃ, একটু হেসে ঘাড় নেড়ে আবার চলেছে।

রাখহরি লাহিড়ী সমস্ত মহিলা পরিদর্শন করে ফিরে আসছেন দেখে কপোত গুহ আর সোহনলাল হন্তদন্ত হয়ে তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, কি হল সার, মালা দিলেন না?

এই যে দিচ্ছি ভাই—এই বলে রাখহরি হন হন করে তাঁর বসবার জায়গায় ফিরে এসে মৃদু স্বরে বললেন, গিন্নী, মাথাটা তোল। থাকমণি থতমত খেয়ে ঘাড় উঁচু করলেন, রাখহরি ঝুপ করে মালাটি তাঁর গলায় দিলেন।

নিমেষকালমাত্র সভা চিত্রার্পিতবৎ স্তব্ধ হয়ে রইল। তার পর তিন দিক থেকে তীব্র আলোর ঝলক থাকমণি দেবীর শীর্ণ মুখে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে তিনটে ক্যামেরায় লেন্স উন্মীলিত হল—ক্লিক ক্লিক ক্লিক। থাকমণি চমকে উঠে মুখ বেঁকিয়ে বললেন, আঃ, জ্বালিয়ে মারলে, এদের মতলবটা কি, খুন করবে নাকি?

তুমুল করতালির শব্দে সভা যেন ফেটে পড়ল, যেসব মহিলার রূপের খ্যাতি আছে তাঁরাই সবচেয়ে বেশী হাততালি দিলেন। ছাত্রীর দল হেসে লুটোপুটি খেতে লাগল।

হট্টগোল একটু থামলে রাজলক্ষ্মী দেবী দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, আজকের অনুষ্ঠানটি অতি মনোজ্ঞ হয়েছে, আমরা অনাবিল আনন্দ উপভোগ করেছি। মহিলাদের পক্ষ থেকে আমি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাখহরি লাহিড়ী মহাশয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ দিচ্ছি, তাঁর বরনারীবরণ অনবদ্য হয়েছে। শ্রীযুক্ত থাকমণি দেবী আজ যে দুর্লভ সম্মান পেলেন তার জন্যে তাঁকেও আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। তাঁকে মাল্যদান করে শ্রীলাহিড়ী সমস্ত পুরুষজাতির সমক্ষে একটি সুমহান আদর্শ স্থাপন করেছেন। এই বলে রাজলক্ষ্মী দেবী তাঁর স্বামী বামাপদ ঘোষালের দিকে কটমট করে তাকালেন।

সরসীবালা তাঁর বেহানকে বললেন, কি দিদি, এখন খুশী হয়েছেন তো?

—রাম রাম, কি ঘেন্না, কি ঘেন্না বুড়োর বুদ্ধিশুদ্ধি কি একেবারে লোপ পেয়েছে! বাড়ি চল বোন, এখানে আর একদণ্ড নয়, সবাই প্যাট প্যাট করে তাকাচ্ছে।

১৩৬০ (১৯৫৩)

একগুঁয়ে বার্থা

মোগলসরাইএর দুই স্টেশন আগে সাকলদিহা। সকাল আটটায় পঞ্জাব মেল সেখানে এসে থামল। একটা সেকেণ্ডক্লাস কামরায় দশ জন বাঙালী আর অবাঙালী যাত্রী আছেন, গাড়ি চলতে দেরি হচ্ছে দেখে তাঁরা অধীর হয়ে উঠলেন। প্ল্যাট-ফর্মে কলরব হতে লাগল।

ক্যা হুআ গার্ডসাহেব? গার্ড জানালেন, এঞ্জিন বিগড়ে গেছে, ট্রেন এখন সাইডিং এ ফেলে রাখা হবে, মোগলসরাই থেকে অন্য এঞ্জিন এলে গাড়ি চলবে। অন্তত দেড় ঘণ্টা দেরি হবে।

অতুল রক্ষিত বিরক্ত হয়ে বললেন, বিগড়ে যাবার আর সময় পেলেন না ইঞ্জিন, সেরেফ বজ্জাতি। ই. আই. আর. নাম বদলে গিয়েই এইসব যাচ্ছেতাই কাণ্ড শুরু হয়েছে। কাশী পৌঁছুতে দুপুর পেরিয়ে যাবে দেখছি। ওহে নরেশ, তোমাদের প্লে যদি ভাল না ওতরায় তো আমি দায়ী হব না তা বলে দিচ্ছি। আনাড়ী অ্যাক্টরদের তালিম দিতে অন্ততঃ দশ ঘণ্টা লাগবে। সিরাজুদ্দৌলা নাটকটি সোজা নয়।

নরেশ মুখুজ্যে বললেন, আপনি ভাববেন না রক্ষিত মশায়। ওরা অনেক দিন ধরে রিহার্সাল দিয়ে তৈরী হয়ে আছে, আপনি শুধু একটু পালিশ চড়িয়ে দেবেন। তিন-চার ঘণ্টার বেশী লাগবে না।

অতুল রক্ষিত বললেন, তাতে কিছুই হবে না, তোমাদের খোট্টাই উচ্চারণ দুরস্ত করতেই দিন কেটে যাবে। দেখ নরেশ, আমার মনে হচ্ছে আমরা অশ্লেষা কি মঘায় যাত্রা করেছি, সকলেই আমাদের পিছনে লেগেছে। হাওড়া আসতে ট্যাক্সির টায়ার ফাটল, সিগারেটের দুটো টিন বাড়িতেই পড়ে রইল, ট্রেনে উঠতে হোঁচট খেলুম, এই দেখ গোড়ালি জখম হয়েছে। এখন আবার ইঞ্জিন নড়বেন না বলে গোঁ ধরেছেন।

অধ্যাপক ধীরেন দত্তর শ্বশুরবাড়ি কাশীতে, পুজোর বন্ধে সেখানে চলেছেন। সহাস্যে বললেন, অচেতন পদার্থের একগুঁয়েমি সম্বন্ধে একটা ইংরিজী প্রবাদ আছে বটে।

দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ কৈলাস গাঙুলী বললেন, জগদীশ বোস তো বলেই দিয়েছেন যে এক টুকরো লোহাও সাড়া দেয়। তার মানে, লোহার চেতনা আছে। রেলের ইঞ্জিন আর মোটর গাড়ি আরও সচেতন।

ধীরেন দত্ত বললেন, তাদের চাইতে একটা পিঁপড়ে ঢের বেশী সচেতন। এঞ্জিন বা মোটর গাড়ির জীবন নেই।

কৈলাস গাঙুলী বললেন, নেই কেন? ইঞ্জিন কয়লা খায়, জল খায়, ধোঁয়া ছাড়ে, ছাই ফেলে, অর্থাৎ কোষ্ঠ সাফ করে। মোটর গাড়িও পেট্রল খায়, তেল খায়,

ধোঁয়া ছাড়ে, চার পায়ে দাপিয়ে বেড়ায়। জীবনের সব লক্ষণই তো বর্তমান, গোঁ ধরবে তা আর বিচিত্র কি।

—হল না গাঙ্গুলী মশায়। মোটর গাড়ি যদি লোহা-পেতল-চুর খেয়ে দেহের ক্ষয় মেরামত করতে পারত, আর মাঝে মাঝে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পিছনের খোপ থেকে একটি বাচ্চা মোটর প্রসব করত তবেই জীবিত বলা চলত। জীবনের লক্ষণ হচ্ছে—আহার গ্রহণ, শরীর পোষণ, মল বর্জন, আর বংশবৃদ্ধি।

—ওহে প্রফেসার, নিজের ফাঁদে নিজে পড়ে গেছ। তুমি যে সব লক্ষণ বললে তাতে আগুনকেও সজীব পদার্থ বলা চলে। আশপাশ থেকে দাহ্য উপাদান আত্মসাৎ করে পুষ্ট হয়, ধোঁয়া আর ছাই ত্যাগ করে সুবিধে পেলেই ব্যাপ্ত হয়ে বংশবৃদ্ধি করে।

ধীরেন দত্ত হেসে বললেন, হার মানলুম, গাঙ্গুলী মশায়। কিন্তু এঞ্জিনের বা আগুনের গোঁ আছে এ কথা মানি না।

—জোর করে কিছুই বলা যায় না, জগৎটাই যে প্রাণময়।

একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক এক কোণে হেলান দিয়ে চোখ বুজে সব কথা শুনছিলেন। মাথায় টাক, বড় গোঁফ, কপালে একটা কাটা দাগ, চোখে পুরু চশমা। ইনি খাড়া হয়ে বসে বললেন, মশায়রা যদি অনুমতি দেন তো একটা কথা নিবেদন করি। আমি একটা মোটর গাড়ি জানি যার অতি ভয়ানক গোঁ ছিল। আমার নিজেরই গাড়ি, জার্মান বার্থা কার।

অতুল রক্ষিত বললেন, ব্যাপারটা খুলে বলুন সার।

দু হাতের আস্তিন গুটিয়ে ভদ্রলোক বললেন, এই দেখুন কি রকম চোট লেগেছিল। কপালের কাটা দাগতো দেখতেই পাচ্ছেন শুধু জখম হইনি মশায়, বিনা অপরাধে কোর্টে হাজারটি টাকা জরিমানা দিয়েছি। সবই সেই বার্থা গাড়ির একগুঁয়েমির ফল।

নরেশ মুখুজ্যে বললেন, আপনারই তো গাড়ি, তবে আপনার ওপর তার অত আক্রোশ হল কেন? বেদম চাবুক লাগিয়েছিলেন বুঝি?

—তামাশা করবেন না মশায়। আক্রোশ আমার ওপর নয়, মকদুমপুরের কুমার সাহেবের ওপর। তিনি খুন হলেন, আমি জখম হলুম, আর অসাবধানে গাড়ি চালিয়ে মানুষ মেরেছি এই মিথ্যে অপবাদে মোটা টাকা দণ্ড দিলুম। আমি হচ্ছি মাখনলাল মল্লিক, আমার কেসটা কাগজে পড়ে থাকবেন।

কৈলাস গাঙ্গুলী বললেন, মনে পড়ছে না কি হয়েছিল। ঘটনাটা সবিস্তারে বলুন মল্লিক মশাই। ইঞ্জিন এসে পৌঁছুতে তো ঢের দেরি, ততক্ষণ আপনার আশ্চর্য কাহিনীটি শোনা যাক।

মাখন মল্লিক বলতে লাগলেন।—

আমি শেয়ারের দালালি করি, শহরে হরদম ঘুরে বেড়াতে হয়। পনর বছর আগেকার কথা। জগমল সেথিয়া পুরনো মোটর গাড়ির ব্যবসা করে। একদিন আমাকে বললে, বাবুজী, একটা ভাল গাড়ি নেবেন? জার্মান বার্থা কার, রোল্স রয়েস তার কাছে লাগে না, সস্তায় দেব। গাড়িটি দেখে আমার খুব পছন্দ হল।

বেশী দিন ব্যবহার হয় নি, কিন্তু দেখেই বোঝা যায় যে বেশ জখম হয়েছিল, সর্বাঙ্গে চোট লাগার চিহ্ন আছে। তা হলেও গাড়িটি অতি চমৎকার, মেরামতও ভাল করে হয়েছে। জগমল খুব কম দামেই বেচলে, সাড়ে তিন হাজারে পেয়ে গেলুম।

একদিন স্টক এক্সচেঞ্জে যাচ্ছি, ড্রাইভার নেই, নিজেই চালাচ্ছি। যাব দক্ষিণ দিকে, কিন্তু স্টিয়ারিংএর ওপর হাতটা যেন কেউ জোর করে ঘুরিয়ে দিলে, গাড়ি উত্তর দিকে চলল। সামনে একটা প্রকাণ্ড গাড়ি আস্তে আস্তে চলছিল, আমার বার্থা কার পিছন থেকে তাকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিলে, প্রাণপণে ব্রেক কষেও সামলাতে পারলুম না।

যখন জ্ঞান হল, দেখলুম আমি রক্ত মেখে শুয়ে আছি, মাথা আর হাতে যন্ত্রণা, চারিদিকে পুলিস। আমাকে মেডিক্যাল কলেজে ড্রেস করিয়ে থানায় নিয়ে গেল। শুনলাম ব্যাপারটা এই।—আমার গাড়ি যাকে ধাক্কা মেরেছিল সেটা হচ্ছে মকদুমপুরের কুমার সাহেবের গাড়ি। গাড়িখানা একেবারে চুরমার হয়েছে, একটা গ্যাস পোস্টে ঠুকে গিয়ে কুমার সাহেবের মাথা ফেটে গেছে, বাঁচবার কোনও আশা নেই। আমি বেহুঁশ হয়ে গাড়ি চালিয়ে মানুষ খুন করেছি এই অপরাধে পুলিস আমাকে গ্রেফতার করেছে। অনেক কষ্টে বেল দিয়ে খালাস পেলুম।

তার পর তিন মাস ধরে মকদ্দমা চলল। সরকারী উকিল বললে, আসামী মদ খেয়ে চুর হয়ে গাড়ি চালাচ্ছিল। আমার ব্যারিস্টার বললে, মাখন মল্লিক অতি সচ্চরিত্র লোক, মোটেই নেশা করে না, হঠাৎ মৃগী রোগে আক্রান্ত হয়ে অসামাল হয়েছিল।

কৈলাস গাঙুলী প্রশ্ন করলেন, আপনার মৃগীর ব্যারাম আছে নাকি?

—না মশায়, মৃগী কস্মিন্ কালে হয় নি, মদ গাঁজা গুলিও খাই নি। আমাকে ফাঁসাবার জন্যে সরকারী উকিল আর বাঁচাবার জন্যে আমার ব্যারিস্টার দুজনেই ডাহা মিথ্যে কথা বলেছিল। প্রকৃত ব্যাপার—বার্থা গাড়ি নিজেই চড়াও হয়েছিল, আমার তাতে কিছুমাত্র হাত ছিল না। কিন্তু সে কথা কে বিশ্বাস করবে? আমি নিস্তার পেলুম না, হাজার টাকা জরিমানা হল, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সও বাতিল হয়ে গেল।

নরেশ মুখুজ্যে বললেন, কুমার সাহেবের গাড়িটা কোন্ মেক ছিল?

—খুব দামী ব্রিটিশ গাড়ি, সোআংক-টুটলার।

—তাই বলুন। আপনার জার্মান গাড়ি তো ব্রিটিশ গাড়িকে ঢুঁ-মারবেই, শত্রুর তৈরী যে। মজা মন্দ নয়, দুই চ্যাম্পিয়ান গাড়ির লড়াই হল, মাঝে থেকে বেচারা কুমার বাহাদুর মরলেন, আপনি জখম হলেন, আবার জরিমানাও দিলেন।

মাখন মল্লিক বললেন, যা ভাবছেন তা নয় মশায়, এতে ইণ্টারন্যাশনাল ক্ল্যাশের নাম গন্ধ নেই। আসল কথা, বার্থা গাড়ি প্রতিশোধ নিয়েছে, কুমার সাহেবকে ডেলিবারেটলি খুন করেছে।

কৈলাস গাঙুলী বললেন, বড় অলৌকিক কথা, কলিযুগেও কি এমন হয়? অবশ্য জগতে অসম্ভব কিছু নেই। আপনার এই বিশ্বাসের কারণ কি?

এই সময় কামরায় একটা ধাক্কা লাগল, তার পরেই হেঁচকা টান। অতুল রক্ষিত বললেন, যাক বাঁচা গেল, ইঞ্জিন খুব চটপট এসে গেছে, সাড়ে দশটার মধ্যে কাশী পৌঁছে যাব।

নরেশ মুখুজ্যে বললেন, কাশী বিশ্বনাথ এখন মাথায় থাকুন। মল্লিক মশায়, আপনার গল্পটি শেষ করে ফেলুন, নইলে গাড়ি থেকে নামতে পারব না।

মাখন মল্লিক বললেন, তার পর শুনুন। আমার মাথার আর হাতের ঘা সেরে গেল, মকদ্দমাও চুকে গেল। তখন আমার মনে একটা জেদ চাপল। বার্থা গাড়ির আচরণটি বড়ই অদ্ভুত, তার রহস্য ভেদ না করলে স্বস্তি পাব না। প্রথমেই খোঁজ নিলুম জগমল সেথিয়ার কাছে। সে বললে, এই গাড়ির মালিক ছিলেন সলিসিটার জলদ রায়, রায় অ্যান্ড দস্তিদার ফার্মের পার্টনার। রাঁচি যেতে চান্ডিলের কাছে তাঁর গাড়ি উলটে যায়। তাঁর বন্ধু কুমার বাহাদুর নিজের গাড়িতে আগে আগে যাচ্ছিলেন, তিনিই অতি কষ্টে জলদ রায় আর তাঁর স্ত্রীকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনেন। জলদ রায় সাত দিন পরে মারা গেলেন, তাঁর স্ত্রী ভাঙা বার্থা গাড়ি জগমলকে বেচলেন, মেরামতের পর সে আবার আমাকে বেচলে।

কৈলাস গাঙ্গুলী বললেন, মানুষ মারাই দেখছি বার্থা গাড়িটার স্বভাব।

না মশায়, জলদ রায়কে বার্থা মারে নি। জগমল আর কোনও খবর দিতে পারলে না, তখন আমি জলদ রায়ের স্ত্রীর কাছে গেলুম। তিনি বাপের বাড়িতে ছিলেন, একেবারে উন্মাদ হয়ে গেছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করা বৃথা। তার পর গেলুম জলদের পার্টনার রমেশ দস্তিদারের কাছে। শেয়ার কেনা বেচা উপলক্ষ্যে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। প্রথমটা তিনি কিছুই বলতে চাইলেন না। যখন শুনলেন বার্থা গাড়িই কুমার সাহেবকে মেরেছে তখন অবাক হয়ে গেলেন এবং নিজে যা জানতেন তা প্রকাশ করলেন। মারা যাবার আগে জলদ রায় তাঁকে সবই জানিয়েছেন। সংক্ষেপে বলছি। শুনুন।

জলদ রায় বিস্তর পৈতৃক সম্পত্তি পেয়েছিলেন। সলিসিটার ফার্মের কাজ দস্তিদারই দেখতেন, জলদ রায় ফুর্তি করে বেড়াতেন আর নিয়মরক্ষার জন্য মাঝে মাঝে অফিসে যেতেন। তাঁর স্ত্রী হেলেনা রায় ছিলেন অসাধারণ সুন্দরী আর বিখ্যাত সোসাইটি লেডি।

কৈলাস গাঙ্গুলী বললেন, ও, তাই বলুন, এর মধ্যে একজন সুন্দরী নারী আছেন, নইলে অনর্থ ঘটবে কেন।

—জলদ রায়ের সঙ্গে মকদুমপুরের কুমার ইন্দ্রপ্রতাপ সিংএর খুব বন্ধুত্ব ছিল। ইন্দ্রপ্রতাপ বিলিতী সোআংক্-টুটলার গাড়ি কিনলেন দেখে জলদ রায় বললেন, আমি লেটেস্ট মডেল জার্মন বার্থা কার কিনেছি। তোমার গাড়ি বড়, কিন্তু স্পীডে বার্থার কাছে হেরে যাবে।

কুমার সাহেব বললেন, তবে এস, একদিন রেস লাগানো যাক, পাঁচ হাজার টাকা বাজি। জলদ রায় বললেন, রাজী আছি। আমার বাড়ি থেকে স্টার্ট করা যাবে। বেলা একটার সময় তুমি রওনা হবে, তার ঠিক পনর মিনিট পরে আমি হেলেনাকে নিয়ে বেরুব। চান্ডিলের আগেই তোমাকে ধরে ফেলব। কুমার সাহেব বললেন, খুব ভাল কথা। চান্ডিল ডাকবাংলায় আমরা রাত কাটাব, পরদিন সকালে একসঙ্গে রাঁচি যাব, সেখানে আমার বাড়িতে পিকনিক করা যাবে।

নির্দিষ্ট দিনে জলদ রায় তাঁর অফিস থেকে বেলা পৌনে একটায় ফিরে এলেন। স্ত্রীকে দেখতে পেলেন না, দারোয়ান বললেন, কুমার বাহাদুর এসেছিলেন, তাঁর গাড়িতে মেমসাহেবকে তুলে নিয়ে এইমাত্র রওনা হয়েছেন। এই চিঠি রেখে গেছেন।

চিঠিটা জলদ রায়ের স্ত্রী লিখেছিলেন। তার মর্ম এই।—কুমারের সঙ্গে চললুম, জীবনটা পরিপূর্ণ করতে চাই। লক্ষ্মীটি, তুমি আর শুধু শুধু পিছনে ধাওয়া ক'রো না। ডিভোর্সের দরখাস্ত কর, ইন্দ্রপ্রতাপ কৃপণ নয়, উপযুক্ত খেসারত দেবে। হেলেনা।

জলদ রায়ের মাথায় খুন চাপল। স্ত্রীর জন্যে একটা চাবুক, কুমারের জন্যে একটা মাউজার পিস্তল, নিজের জন্যে এক বোতল ব্রাণ্ডি, আর বার্থার জন্যে তিন বোতল সাজাহানপুর রম নিয়ে তখনই বেরিয়ে পড়লেন। গাড়ি কেনার পরেই তিনি পরীক্ষা করে দেখেছিলেন যে বার্থাকে রম খাওয়ালে (অর্থাৎ পেট্রল ট্যাংকে ঢাললে) তার বেশ ফূর্তি হয়, হর্সপাওয়ার বেড়ে যায়।

প্রচণ্ড বেগে গাড়ি চালিয়ে জলদ রায় যখন চাণ্ডিলের কাছে পৌঁছুলেন তখন দেখতে পেলেন প্রায় দেড় মাইল দূরে কুমারের গাড়ি চলেছে। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে কিন্তু দূর থেকে সোআংক্-টুট্‌লালের রুপুলী রং স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ওদিকে কুমার ইন্দ্রপ্রতাপও দেখলেন পিছনে একটা গাড়ি ছুটে আসছে। তিনটে হেড লাইট দেখেই বুঝলেন যে জলদ রায়ের বার্থা কার। কুমারের সামনেই একটা পাহাড়, রাস্তা তার পাশ দিয়ে বেঁকে গেছে। তিনি জোরে গাড়ি চালিয়ে পাহাড়ের আড়ালে এলেন, এবং গাড়ি থেকে নেমে তাড়াতাড়ি গোটাকতক বড় বড় পাথরের চাঙড় রাস্তায় রাখলেন। তার পর আবার গাড়িতে উঠে চললেন।

সঙ্গে সঙ্গে বার্থা গাড়ি এসে পড়ল। জলদ রায় বিস্তর মদ খেয়েছিলেন, বার্থাকেও খাইয়েছিলেন, তার ফলে দুজনেই একটু টলছিলেন। রাস্তার বাধা জলদ দেখতে পেলেন না, পাথরের ওপর দিয়েই পুরো জোরে চালালেন। ধাক্কা খেয়ে বার্থা গাড়ি কাত হয়ে পড়ে গেল। ইন্দ্রপ্রতাপের ইচ্ছে ছিল তাড়াতাড়ি অকুস্থল থেকে দূরে সরে পড়বেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গিনী হেলেনা চিৎকার করতে লাগলেন, দৈবক্রমে একটা মোটর গাড়িও বিপরীত দিক থেকে এসে পড়ল। তাতে ছিলেন ফরেস্ট অফিসার বনবিহারী দুবে আর তাঁর চাপরাসী।

অগত্যা ইন্দ্রপ্রতাপকে থামতে হল ; তিনি দুবের সাহায্যে জলদ রায়কে তুলে নিয়ে চাণ্ডিল হাসপাতালে এলেন। ডাক্তার বললেন, সাংঘাতিক জখম, আমি মরফীন ইঞ্জেকশন দিচ্ছি, এখনই কলকাতায় নিয়ে যান। দুবেজী বললেন, কুমার সাহেব, আপনি আর দেরি করবেন না, এঁদের নিয়ে এখনই বেরিয়ে পড়ুন। আপনার বন্ধুর গাড়িটা আমি পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। চেক বই সঙ্গে আছে তো ? একখানা সাড়ে সাত হাজার টাকার বেয়ারার চেক লিখে দিন, পুলিসকে ঠাণ্ডা করতে হবে।

কলকাতায় ফেরবার সাত দিন পরেই জলদ রায় মারা পড়লেন. তাঁর স্ত্রী হেলেনা উন্মাদ অবস্থায় বাপের বাড়ি চলে গেলেন। তোবড়ানো বার্থা গাড়িটা জগ্‌মল কিনে নিলে।

এখন ব্যাপারটা আপনাদের পরিষ্কার হল তো ? ইন্দ্রপ্রতাপ বার্থাকে জখম করেছে, তার প্রিয় মনিবকে খুন করেছে, বার্থা এরই প্রতিশোধ খুঁজছিল। অবশেষে আমার হাতে এসে মনস্কামনা পূর্ণ হল, স্টক এক্সচেঞ্জের কাছে সোআংক্-টুট্‌লারকে ধাক্কা দিয়ে চুরমার করে দিলে, ইন্দ্রপ্রতাপকেও মারলে।

নরেন দত্ত বললেন, বার্থা খুব পতিব্রতা গাড়ি, তার আগেকার মনিবের হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে, কিন্তু আপনার ওপর তার টান ছিল না দেখছি। শত্রু মারতে গিয়ে আপনাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। বার্থার গতি কি হল?

—জগমলকেই বেচে দিয়েছি, চার শ টাকায়।

নরেশ মুখুজ্যে বললেন, খাসা গল্পটি মাখনবাবু, কিন্তু বড্ড তড়বড় করে বলে-ছেন। যদি বেশ ফেনিয়ে আর রসিয়ে পাঁচ শ পাতার একটি উপন্যাস লিখতে পারেন তবে আপনার রবীন্দ্র-পুরস্কার মারে কে। যাই হক, বেশ আনন্দে সময়টা কাটল।

—আনন্দে কাটল কি রকম? দু জন নামজাদা লোক খুন হল, এক জন মহিলা উন্মাদ হয়ে গেল, দুটো দামী গাড়ি ভেঙে গেল, আমি জখম হলুম আবার জরিমানাও দিলুম, এতে আনন্দের কি পেলেন?

—রাগ করবেন না মাখনবাবু। আপনি জখম হয়েছেন, জরিমানা দিয়েছেন, তার জন্যে আমরা সকলেই খুব দুঃখিত—কি বলেন গাঙুলী মশায়? কুমার সাহেবকে বধ করে আপনি ভালই করেছেন, কিন্তু জলদ রায়কে মরতে দিলেন কেন? সে কলকাতায় ফিরে এল, হেলেনা আহার নিদ্রা ত্যাগ করে সেবা করলে, জলদ সেরে উঠল, তার পর ক্ষমাঘেন্না করে দুজনে মিলে মিশে সুখে ঘরকন্না করতে লাগল—এইরকম হলে আরও ভাল হত না কি?

—আপনি কি বলতে চান আমি একটা গল্প বানিয়ে বলেছি? আপনারা দেখছি অতি নিষ্ঠুর বেদরদী লোক।

মোগলসরাই এসে পড়ল। মাখন মল্লিক তাঁর বিছানার বাণ্ডিলটা ধপ করে প্লাট ফর্মে ফেললেন এবং সুটকেসটি হাতে নিয়ে নেমে পড়ে বললেন, অন্য কামরায় যাচ্ছি, নমস্কার।

কৈলাস গাঙুলী বললেন, ভদ্রলোককে তোমরা শুধু শুধু চটিয়ে দিলে। আহা, চোট খেয়ে বেচারার মাথা গুলিয়ে গেছে।

১৩৬০ (১৯৫৩)

পঞ্চপ্রিয়া পাঞ্চালী

পঞ্চপাণ্ডব অত্যন্ত অশান্তিতে আছেন। ইন্দ্রপ্রস্থের ঐশ্বর্য ত্যাগ করে বার বৎসর বনবাস আর এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করতে হবে, এজন্য নয়। এই কাল উত্তীর্ণ হলেও হয়তো দুর্যোধন রাজ্য ফেরত দেবেন না, তখন আত্মীয় কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, এজন্যও নয়। অশান্তির কারণ, পাঞ্চালী এক মাস তাঁর পঞ্চপতির সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করেছেন।

রাজ্যত্যাগের পর পাণ্ডবরা প্রথমে কাম্যকবনে এসেছিলেন, এখন দ্বৈতবনে নদীর তীরে আশ্রম নির্মাণ করে বাস করছেন। তাঁদের সঙ্গে পুরোহিত ধৌম্য এবং আরও অনেক ব্রাহ্মণ আছেন, সারথি ইন্দ্রসেন এবং অন্যান্য দাসদাসী আছে, দ্রৌপদীর সহচরী ধাত্রীকন্যা বালিকা সেবন্তী আছে। দ্রৌপদীর বিস্তর কাজ, বনবাসেও তাঁকে বৃহৎ সংসার চালাতে হয়। ভগবান সূর্যের দয়ায় তিনি যে তামার হাঁড়িটি পেয়েছেন তাতে রান্না সহজ হয়ে গেছে, দ্রৌপদীর না খাওয়া পর্যন্ত খাদ্য আপনিই বেড়ে যায়, সহস্র লোককে পরিবেশন করলেও কম পড়ে না। গৃহিণীর সকল কর্তব্যই দ্রৌপদী পালন করছেন, শুধু স্বামীদের সঙ্গে কথা বলেন না। কোনও অভাব হলে সেবন্তীই তা পাণ্ডবদের জানায়।

প্রায় চার মাস হল পাণ্ডবরা বনবাসে আছেন। এ পর্যন্ত যুধিষ্ঠির প্রসন্ন মনে দিনযাপন করছিলেন, যেন বনবাসেই তিনি আজীবন অভ্যস্ত। ভীম প্রথম প্রথম কিছু অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু পরে বেশ প্রফুল্ল হয়ে মৃগয়া নিয়েই থাকতেন। অর্জুন নকুল সহদেবও রাজ্যনাশের দুঃখ ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি পাঞ্চালীর ভাবান্তর দেখে পাঁচজনেই উদ্‌বিগ্ন হয়েছেন।

দ্যূতসভায় অপমান আর রাজ্যনাশের দুঃখ দ্রৌপদী ভুলতে পারেন নি। তিনি প্রায়ই বিলাপ করতেন যে তাঁর জ্যেষ্ঠ পতির নির্বুদ্ধিতা এবং অন্যান্য পতির অকর্মণ্যতার জন্যই এই দুর্দশায় পড়তে হয়েছে। যুধিষ্ঠির তাঁকে শান্ত করবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন, ভীম বার বার আশ্বাস দিয়েছেন যে দুঃশাসনের রক্তপান আর দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গ না করে তিনি ছাড়বেন না, অর্জুন নকুল সহদেবও তাঁকে বহুবার বলেছেন যে ত্রয়োদশ বর্ষ দেখতে দেখতে কেটে যাবে, তার পর আবার সুদিন আসবে। কিন্তু কোনও ফল হয় নি, দ্রৌপদী তাঁর রোষ দমন করতে না পেরে অবশেষে পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে কথা বন্ধ করেছেন।

দ্বৈতবন থেকে দ্বারকা বহু দূর, তথাপি কৃষ্ণ রথে চড়ে মাঝে মাঝে পাণ্ডবদের দেখতে আসেন, দু-একবার সত্যভামাকেও সঙ্গে এনেছেন। এবারে তিনি একাই এসেছেন। যুধিষ্ঠিরের কাছে সকল বৃত্তান্ত শুনে কৃষ্ণ দ্রৌপদীর গৃহে এলেন।

কৃষ্ণ পাণ্ডবদের মামাতো ভাই, অর্জুনের সমবয়স্ক। সেকালে বউদিদি আর বউ-মার অনুরূপ কোনও সম্বোধন ছিল কিনা জানা যায় না। থাকলেও তার বাধা ছিল,

কারণ সম্পর্কে কৃষ্ণ দ্রৌপদীর ভাশুরও বটেন দেওরও বটেন। দ্রৌপদীর প্রকৃত নাম কৃষ্ণা, সেজন্য কৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে সখীসম্বন্ধ পাতিয়েছিলেন এবং দুজনেই পরস্পরকে নাম ধরে ডাকতেন।

অভিবাদন ও কুশলপ্রশ্ন বিনিময়ের পর কৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, সখী কৃষ্ণা, তোমার চন্দ্রবদন রন্ধনশালার হণ্ডিকার ন্যায় দেখাচ্ছে কেন?

দ্রৌপদী বললেন, কৃষ্ণ, সব সময় পরিহাস ভাল লাগে না।

কৃষ্ণ বললেন, তোমার কিসের দুঃখ? পাণ্ডবরা তোমার কোন্ অভাব পূর্ণ করতে পারছেন না তা আমাকে বল। সূক্ষ্ম কৌষেয় বস্ত্র আর রত্নাভরণ চাও? গন্ধদ্রব্য চাও? এখানে শস্য দুর্লভ, তোমরা মৃগয়ালব্ধ মাংস আর বন্য ফল মূল শাকাদি খেয়ে জীবন ধারণ করছ, তাতে অরুচি হবার কথা, তার ফলে মনও অপ্রসন্ন হয়। যব গোধূম তণ্ডুল মুদ্গাদি চাও? দুগ্ধবতী ধেনু চাও? ঘৃত তৈল গুড় লবণ হরিদ্রা আর্দ্রক চাও? দশ-বিশ কলস উত্তম আসব পাঠিয়ে দেব? পৈষ্টী মাধ্বী আর গৌড়ী মদিরা মৈরেয় আর দ্রাক্ষেয় মদ্য, সবই দ্বারকায় প্রচুর পাওয়া যায়। এখানে বোধ হয় তালরস ভিন্ন কিছুই মেলে না।

দ্রৌপদী হাত নেড়ে বললেন, ওসব কিছুই চাই না। মাধব, তুমি তো মহাপণ্ডিত, লোকে তোমাকে সর্বজ্ঞ বলে। আমার দুর্ভাগ্যের কারণ কি তা বলতে পার? আমার তুল্য হতভাগিনী আর কোথাও দেখেছ?

কৃষ্ণ বললেন, বিস্তর, বিস্তর। আমার যে-কোনও পত্নীকে জিজ্ঞাসা করলে শুনবে তিনিই অদ্বিতীয়া হতভাগিনী, অনুপমা দগ্ধকপালিনী। তাঁরা মনে করেন আমিই তাঁদের সমস্ত আধিদৈবিক আধিভৌতিক আর আধ্যাত্মিক দুঃখের কারণ। কৃষ্ণা, দুশ্চিন্তা দূর কর। বিধাতা বিশ্বপাতা মঙ্গলদাতা করুণাময়।

—তুমি বিধাতার চাটুকার, তাঁর নিষ্ঠুরতা দেখেও দেখছ না, কেবল করুণাই দেখছ।

—যাজ্ঞসেনী, তুমি কেবল নিজের দুর্ভাগ্যের বিষয় ভাবছ কেন, সৌভাগ্যও স্মরণ কর। তুমি ইন্দ্রপ্রস্থের রাজমহিষী, তোমার তুল্য গৌরবময়ী নারী আর কে আছে? তোমার বর্তমান দুর্দশা চিরদিন থাকবে না, আবার তুমি স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হবে। যজ্ঞের অনল থেকে তোমার উৎপত্তি, তুমি অপূর্ব রূপবতী, তোমার পিতা পঞ্চালরাজ দ্রুপদ বর্তমান আছেন, তোমার দুই মহাবল ভ্রাতা আছেন। তোমার পাঁচ বীরপুত্র অভিমন্যুর সঙ্গে দ্বারকায় আমাদের ভবনে শিক্ষালাভ করছে। পাঁচ পুরুষসিংহ তোমার স্বামী, চার ভাশুর, চার দেবর—

ভাশুর দেবর আবার কোথায় পেলে? ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।

—ভাশুর আর দেবর তোমার কাছেই আছেন। কৃষ্ণা, এই শ্লোকটি কি তুমি শোন নি?—

পতিশ্বশুরতা জ্যেষ্ঠে পতিদেবরতানুজে।
মধ্যমেষু চ পাঞ্চাল্যাস্ত্রিতয়ং ত্রিতয়ং ত্রিষু॥

—জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব পাঞ্চালীর পতি ও ভ্রাতৃশ্বশুর (ভাশুর), কনিষ্ঠ পাণ্ডব পতি ও দেবর, মাঝের তিনজন প্রত্যেকেই পতি ভাশুর ও দেবর।

—তাতেই আমি ধন্য হয়ে গেছি?

—পাঞ্চালী, তুমি ক্রোধ সংবরণ কর। দোষশূন্য মানুষ জগতে নেই, যুধিষ্ঠির দ্যূতপ্রিয় ও সরলস্বভাব, তাই এই বিপদ হয়েছে। তিনি অনুতপ্ত, তাঁকে আর মনঃপীড়া দিও না। তোমার অন্য পতিরা যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাবহ, অগ্রজের মতের বিরুদ্ধে তাঁরা যেতে পারেন না। তাঁদের অকর্মণ্য মনে ক'রো না।

কৃষ্ণ আরও অনেক প্রবোধবাক্য বললেন, নানা শাস্ত্র থেকে ভার্যার কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন, কিন্তু পাঞ্চালীর ক্ষোভ দূর হল না। তখন কৃষ্ণ স্মিতমুখে বিদায় নিয়ে পাণ্ডবদের কাছে গেলেন।

একটি প্রকাণ্ড আটচালায় পুরোহিত ধৌম্য আর অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ বাস করেন। কৃষ্ণের আগমন উপলক্ষ্যে সেখানে একটি মন্ত্রনাসভা বসেছে। যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভ্রাতারা কৃষ্ণকে সাদরে সেই সভায় নিয়ে গেলেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, পূজ্যপাদ ধৌম্য ও উপস্থিত বিপ্রগণ, আপনারা সকলে অবধান করুন। বাসুদেব কৃষ্ণ, তুমিও শোন। কৌরবসভায় লাঞ্ছনা ও রাজ্যনাশের শোকে পাঞ্চালীর চিত্তবিকার হয়েছে, পঞ্চপতির প্রতি তাঁর নিদারুণ অভিমান জন্মেছে, তিনি এক মাস আমাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করেন নি। এই দুঃসহ অবস্থার প্রতিকার কোন্ উপায়ে হতে পারে তা আপনারা নির্ধারণ করুন।

ধৌম্য বললেন, আমি বেদ পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্র থেকে শ্লোক উদ্ধার করে পাঞ্চালীকে পতিব্রতা সহধর্মিণীর কর্তব্য বিষয়ে উপদেশ দিতে পারি, পাপের ভয়ও দেখাতে পারি।

কৃষ্ণ বললেন, দ্বিজবর, তাতে কিছুই হবে না। আমি এইমাত্র তাঁকে বিস্তর শাস্ত্রীয় উপদেশ শুনিয়ে এখানে এসেছি, আমার চেষ্টায় কোনও ফল হয় নি।

যুধিষ্ঠির বললেন, তবে উপায়?

পুরোহিত ধৌম্যের খুল্লতাত হৌম্য নামক এক তেজস্বী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বললেন, পাঞ্চালীকে বিনীত করা মোটেই দুরূহ নয়। পাণ্ডবগণ স্ত্রৈণ হয়ে পড়েছেন, দ্রুপদনন্দিনীকে অত্যন্ত প্রশ্রয় দিয়েছেন, পঞ্চভ্রাতা তাঁদের এই যৌথ কলত্রটিকে ভয় করেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, আমি অতি সুসাধ্য উপায় বলছি শুনুন। পাঞ্চালীই আপনাদের একমাত্র পত্নী নন। আপনার আর একটি নিজস্ব পত্নী আছেন, রাজা শৈব্যের কন্যা দেবিকা। ভীমের আরও তিন পত্নী আছেন, রাক্ষসী হিড়িম্বা, শল্যের ভগিনী কালী, কাশীরাজকন্যা বলন্ধরা। অর্জুনেরও তিন পত্নী আছেন, মণিপুররাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা, নাগকন্যা উলূপী, আর কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রা। নকুলের আর এক পত্নী আছেন, চেদিরাজকন্যা করেণুমতী। সহদেবেরও আর এক পত্নী আছেন, জরাসন্ধকন্যা, তাঁর নামটি আমার মনে নেই। পাঞ্চালীর এই ন জন সপত্নীকে সত্বর আনাবার ব্যবস্থা করুন। তাঁদের আগমনে দ্রৌপদীর অহংকার দূর হবে, আপনারাও বহু পত্নীর সহিত মিলিত হয়ে পরমানন্দে কালযাপন করবেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, তপোধন, আপনার প্রস্তাব অতি গর্হিত। দ্রৌপদী বহু মনস্তাপ ভোগ করেছেন, আরও দুঃখ কি করে তাঁকে দেব? আমাদের অনেক ভার্যা আছেন সত্য, কিন্তু তারা কেউ সহধর্মিণী পট্টমহিষী নন। আমরা এই যে বনবাসব্রত পালন করছি এতে পাঞ্চালী ভিন্ন আর কেউ আমাদের সঙ্গিনী হতে পারেন না।

কৃষ্ণ, সকল আপদে তুমিই আমাদের সহায়, পাঞ্চালী যাতে প্রকৃতিস্থ হন তার একটা উপায় কর।

একটু চিন্তা করে কৃষ্ণ বললেন, ধর্মরাজ, আমি যথোচিত ব্যবস্থা করব। আজ আমাকে বিদায় দিন, আমার এক মাতুল রাজর্ষি রোহিত এই দ্বৈতবনের পাঁচ ক্রোশ উত্তরে বানপ্রস্থ আশ্রমে বাস করেন। আমি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করে দু দিনের মধ্যে ফিরে আসব।

রথে উঠে কৃষ্ণ তার সারথি দারুককে বললেন, এখান থেকে কিছু উত্তরে জ্বলজ্জট ঋষির আশ্রম আছে, সেখানে চল।

ঋষির বয়স পঞ্চাশ। তাঁর দেহ বিশাল, গাত্রবর্ণ আরক্ত গৌর, জটা ও শ্মশ্রু অগ্নিশিখার ন্যায় অরুণবর্ণ, সেজন্য লোকে তাঁকে জ্বলজ্জট বলে। কৃষ্ণকে সাদরে অভিনন্দন করে তিনি বললেন, জনার্দন, তিন বৎসর পূর্বে প্রভাসতীর্থে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, ভাগ্যবশে আজ আবার মিলন হল। তোমার কোন্ প্রিয়কার্য সাধন করব তা বল।

কৃষ্ণ বললেন, তপোধন, আমার আত্মীয় ও প্রীতিভাজন পান্ডবগণ রাজ্যচ্যুত হয়ে দ্বৈতবনে বাস করছেন। সম্প্রতি তাঁরা আর এক সংকটে পড়েছেন, তা থেকে তাঁদের মুক্ত করবার জন্য আপনার সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এসেছি। আপনার পরিচিতা কোনও নারী নিকটে আছে?

জ্বলজ্জট বললেন, নারী ফারী আমার নেই, আমি অকৃতদার। এই বিজন অরণ্যে নারী কোথায় পাবে? তবে হাঁ, অপ্সরা পঞ্চচূড়া মাঝে মাঝে তত্ত্বকথা শুনতে আমার কাছে আসে বটে। সে কিন্তু সুন্দরী নয়।

কৃষ্ণ বললেন, সুন্দরীর প্রয়োজন নেই। পঞ্চচূড়া চিৎকার করতে পারে তো? তা হলেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। এখন আমার প্রার্থনাটি শুনুন।

কৃষ্ণ সবিস্তারে তাঁর প্রার্থনা জানালেন। জ্বলজ্জট অট্টহাস্য করে বললেন, বাসুদেব, লোকে তোমাকে কুচক্রী বলে, কিন্তু আমি দেখছি তুমি সুচক্রী, তোমার উদ্দেশ্য সাধু। নিশ্চিত থাক, তোমার অনুরোধ নিশ্চয়ই রক্ষা করব। দুদিন পরে অপরাহ্ণকালে আমি পান্ডবদের আশ্রমে উপস্থিত হব।

প্রণাম করে কৃষ্ণ বিদায় নিলেন এবং আরও উত্তরে যাত্রা করে রাজর্ষি রোহিতের আশ্রমে এলেন। ইনি বলদেবজননী রোহিণীর ভ্রাতা, বানপ্রস্থ অবলম্বন করে সস্ত্রীক অরণ্যবাস করছেন। কৃষ্ণকে দেখে প্রীত হয়ে বললেন, বৎস, বহুকাল পরে তোমাকে দেখছি। তুমি এখানে কিছুদিন অবস্থান করে তোমার মাতুলানী ও আমার আনন্দবর্ধন কর। দ্বারকার সব কুশল তো?

কৃষ্ণ বললেন, পূজ্যপাদ মাতুল, সমস্তই কুশল। আমি আপনাদের চরণদর্শন করতে এসেছি, দীর্ঘকাল থাকতে পারব না, দুদিন পরেই বিশেষ প্রয়োজনে পান্ডবাশ্রমে আমাকে ফিরে যেতে হবে।

পান্ডবগণের পোষ্যবর্গ প্রায় দু শ, প্রতিদিন দু বেলা এই সমস্ত লোকের আহারের ব্যবস্থা করতে হয়। দ্বৈতবনে হাটবাজার নেই, তন্ডুলাদি শস্য পাওয়া

যায় না, কালে-ভদ্রে দরদ পুক্কশ প্রভৃতি প্রত্যন্তবাসীরা কিছু যব আর মধু এনে দেয়। মৃগয়ালব্ধ পশুর মাংস এবং স্বচ্ছন্দবনজাত ফল মূল ও শাকই পাণ্ডবগণের প্রধান খাদ্য।

প্রত্যহ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করেই পঞ্চপাণ্ডব মৃগয়ায় নির্গত হন। আজ একটি বৃহৎ বরাহ দেখে তাঁরা উৎফুল্ল হলেন, কারণ বরাহমাংস তাঁদের আশ্রিত বিপ্রগণের অতিশয় প্রিয়। অর্জুন শরাঘাত করলেন, কিন্তু বিদ্ধ হয়েও বরাহ মরল না, বেগে ধাবিত হয়ে নিবিড় অরণ্যে গেল। তখন পঞ্চপাণ্ডব সকলেই শরমোচন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে নারীকণ্ঠে আর্তনাদ উঠল—হা নাথ, হতোঽস্মি!

তাঁদের শরাঘাতে কি স্ত্রীহত্যা হল? পাণ্ডবগণ ব্যাকুল হয়ে অরণ্যে প্রবেশ করে দেখলেন, বরাহ গতপ্রাণ হয়ে পড়ে আছে, কিন্তু আর কেউ নেই। চতুর্দিকে অন্বেষণ করেও তাঁরা কিছু দেখতে পেলেন না। ভীম বললেন, নিশ্চয় রাক্ষসী মায়া, মারীচ একইপ্রকার চিৎকার করে শ্রীরামকে বিভ্রান্ত করেছিল।

যুধিষ্ঠির শঙ্কিত হয়ে বললেন, আশ্রমে শীঘ্র ফিরে চল, জানি না কোনও বিপদ হল কিনা। ভীম তুমি বরাহটাকে কাঁধে নাও।

সকলে আশ্রমে এসে দেখলেন কোনও বিপদ ঘটে নি। পাঞ্চালী সূর্যদত্ত তাম্র-স্থালীতে বরাহমাংস পাক করলেন, সকলেই প্রচুর পরিমাণে ভোজন করে পরিতৃপ্ত হলেন।

অপরাহ্নকালে একটি বৃহৎ অশ্বত্থ তরুর তলে সকলে বসেছেন, পুরোহিত ধৌম্য যম-নচিকেতার উপাখ্যান বলছেন। পাঞ্চালীও একটু পশ্চাতে বসে এই পবিত্র কথা শুনছেন। এমন সময় মূর্তিমান বিপদ রূপে জ্বলজ্জট ঋষি উপস্থিত হলেন। তাঁর জটা ও শ্মশ্রু অগ্নিজ্বালার ন্যায় ভয়ংকর, মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ, চক্ষু বিস্ফারিত ও ভ্রূকুটিকুটিল। হুংকার করে জ্বলজ্জট বললেন, ওরে রে নারীঘাতক পাপিবৃন্দ, আজ ব্রহ্মশাপে তোমাদের নরকে প্রেরণ করব!

যুধিষ্ঠির কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, ভগবান, আমরা কোন্ মহাপাপ করেছি?

জ্বলজ্জট উত্তর দিলেন, তোমরা শরাঘাতে আমার প্রিয়া ভার্যাকে বধ করেছ। ধিক তোমাদের ধনুর্বিদ্যা, একটা বরাহ মারতে গিয়ে ঋষিপত্নীর প্রাণ হরণ করেছ!

যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা কাতর হয়ে ঋষির চরণে নিপতিত হলেন। পাঞ্চালীও গলবস্ত্র হয়ে যুক্তকরে অশ্রুবর্ষণ করতে লাগলেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, প্রভু, আমরা অজ্ঞাতসারে মহাপাপ করে ফেলেছি! আপনি যে দণ্ড দেবেন, যতই কঠোর হক তাই শিরোধার্য করব।

দ্রৌপদী এগিয়ে এসে বললেন, মহামুনি, আমার স্বামীদের শরাঘাতে আপনার প্রিয়া ভার্যার প্রাণবিয়োগ হয়েছে, তার দণ্ড-স্বরূপ আপনি আমার প্রাণ নিয়ে এঁদের মার্জনা করুন। মধ্যম পাণ্ডব, তুমি চিতা রচনা কর, আমি অগ্নিপ্রবেশে প্রাণ বিসর্জন দেব।

জ্বলজ্জট আবার হুংকার করে বললেন, তুমি তো দেখছি অতি নির্বুদ্ধি রমণী! তোমার প্রাণ বিসর্জনে কি আমার পত্নী জীবিত হবে? আমি পত্নী চাই, এই দণ্ডেই চাই। পাণ্ডবরা আমাকে বিপত্নীক করেছে, আমি পাণ্ডবপত্নী পাঞ্চালীকে

চাই। এই বলে জবলজট মুনি উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করে ভূমিতে পদাঘাত করতে লাগলেন।

যুধিষ্ঠির যুক্তকরে বললেন, প্রভু, প্রসন্ন হ'ন, পাঞ্চালী ভিন্ন যা চাইবেন তাই দেব।—

ইয়ং হি নঃ প্রিয়া ভার্যা প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী
মাতেব পরিপাল্যা চ পূজ্যা জ্যেষ্ঠেব চ স্বসা॥

আমাদের এই প্রিয়া ভার্যা প্রাণাপেক্ষা গরীয়সী, মাতার ন্যায় পরিপালনীয়া, জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় মাননীয়া। এঁকে আমরা কি করে ত্যাগ করব? আপনি বরং শাপানলে আমাকে ভস্মীভূত করে ফেলুন, পাঞ্চালীকে নিষ্কৃতি দিন।

জবলজট বললেন, অহো কি মূর্খ! তুমি পুড়ে মরলে পাঞ্চালী সহমৃতা হবে, অনর্থক নারীহত্যার নিমিত্তরূপে আমিও পাপগ্রস্ত হব। পাঞ্চালীকেই চাই।

ভীম করজোড়ে বললেন, তপোধন, আমি একটি নিবেদন করছি, শুনতে আজ্ঞা হক। আপনি জ্যেষ্ঠা পান্ডববধূ শ্রীমতী হিড়িম্বাকে গ্রহণ করুন, পাঞ্চালীর পূর্বেই তাঁর সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছিল।

জবলজট বললেন, তুমি অতি ধৃষ্ট দুষ্ট প্রতারক, একটা রাক্ষসীকে আমার স্কন্ধে ন্যস্ত করতে চাও!

ভীম বললেন, প্রভু, হিড়িম্বা রাক্ষসী হলেও যখন মানবীর রূপ ধরেন তখন তাঁকে ভালই দেখায়। তাঁকে যদি যথেষ্ট মনে না করেন তবে আমাদের আরও আটজন অতিরিক্ত পত্নী আছেন, সব কটিকে নিয়ে পাঞ্চালীকে মুক্তি দিন। আমার ভ্রাতারা নিশ্চয় এতে সম্মত হবেন।

নকুল সহদেব সমস্বরে বললেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়।

জবলজট বললেন, তোমাদের অপর পত্নীরা এখানে নেই, অনুপস্থিত বস্তু দান করা যায় না। আমি এই মুহূর্তেই পত্নী চাই, পাঞ্চালীকেই চাই।

অর্জুন বললেন, প্রভু, ধর্মরাজ আর পাঞ্চালীকে নিষ্কৃতি দিন, আমাদের চার ভ্রাতাকে ভস্ম করে আপাতত আপনার ক্রোধ উপশান্ত করুন। এর পর অবসর মত একটি ঋষিকন্যার পাণিগ্রহণ করবেন।

জবলজট বললেন, তোমরা সকলেই মূর্খ, তথাপি তোমাদের আগ্রহ দেখে আমি কিঞ্চিৎ প্রীত হয়েছি। তোমাদের ভস্ম করে আমার কোনও লাভ হবে না। আমি পত্নী চাই, যে আমার সেবা করবে। যদি নিতান্তই দ্রৌপদীকে ছাড়তে না চাও তবে তাঁর নিষ্ক্রয়স্বরূপ তোমরা পঞ্চভ্রাতা আজীবন আমার দাসত্বে নিযুক্ত থাক।

যুধিষ্ঠির বললেন, মহর্ষি, তাই হক, আমরা আজীবন দাস হয়ে আপনার সেবা করব।

ধৌম্য বললেন, মুনিবর, কাজটা কি ভাল হবে? তার চেয়ে বরং পঞ্চগব্য-ভক্ষণ চান্দ্রায়ণ ইত্যাদি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করুন। অর্থ তো এঁদের এখন নেই, ত্রয়োদশ বর্ষের অন্তে রাজ্যোদ্ধারের পর যত চাইবেন এঁরা দেবেন।

জবলজট প্রচন্ড গর্জন করে বললেন, তুমি কে হে বিপ্র, আমাদের কথার উপর কথা কইতে এসেছ? ওরে কে আছিস, একটা দীর্ঘ রজ্জু নিয়ে আয়।

যুধিষ্ঠির বললেন, প্রভু, রজ্জুর প্রয়োজন নেই, আমাদের উত্তরীয় দিয়েই বন্ধন করুন।

জবালজট যুধিষ্ঠিরাদি প্রত্যেকের কটিদেশে উত্তরীয়ের এক প্রান্ত বাঁধলেন এবং অপর প্রান্তের গুচ্ছ ধারণ করে পাণ্ডবাশ্রম থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। দ্রৌপদী আর্তনাদ করে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলেন। ধৌম্যাদি বিপ্রগণ স্তম্ভিত ও হতবাক হয়ে রইলেন।

চেতনালাভের পর দ্রৌপদী দেখলেন তিনি তাঁর কক্ষে সেবন্তীর ক্রোড়ে মস্তক রেখে শুয়ে আছেন, কৃষ্ণ তাঁকে তালবৃন্ত দিয়ে বীজন করছেন।

দ্রৌপদী বললেন, হা পঞ্চ আর্যপুত্র, কোথায় আছ তোমরা?

কৃষ্ণ বললেন, কৃষ্ণা, আশ্বস্ত হও। পঞ্চপাণ্ডব নিরাপদে আছেন, তাঁরা অশ্বত্থ-তরুতলে উপবিষ্ট হয়ে পাপনাশের জন্য অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করছেন। তুমি একটু সুস্থ হলেই তোমাকে তাঁদের কাছে নিয়ে যাব।

—সেই ভয়ংকর ঋষি কোথায়?

—আর ভয় নেই। তিনি পঞ্চপাণ্ডবকে পশুর ন্যায় বন্ধন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, দৈবক্রমে পথে আমার সঙ্গে দেখা হল। আমি তাঁকে বললাম, তপোধন, করেছেন কি? এঁরা অকর্মণ্য বিলাসী ক্ষত্রিয়, আপনার কোনও কাজ করতে পারবেন না, অনর্থক অন্ন ধ্বংস করবেন। তিনি বললেন, তবে এঁদের চাই না, পাঞ্চালীকেই এনে দাও। আমি উত্তর দিলাম, পাঞ্চালী আরও অকর্মণ্যা, আরও বিলাসিনী, শুধু নিজের প্রসাধন করতে জানেন। আমি ফিরে গিয়ে আপনাকে একটি কর্মিষ্ঠা ব্রজ-নারী পাঠিয়ে দেব। আপাতত আপনি পাঞ্চালীর নিষ্ক্রয়স্বরূপ এই সবৎসা ধেনু নিন, দধি দুগ্ধ ঘৃতাদি খেয়ে বাঁচবেন। আমার মাতুল রাজর্ষি রোহিত এটি আমাকে উপহার দিয়েছেন। জবালজট মুনি তাতেই সম্মত হয়ে তোমার পতিদের মুক্তি দিলেন।

দ্রৌপদী বললেন, ধন্য সেই ধেনু যার মূল্য পাণ্ডবমহিষীর সমান। কিন্তু ঋষিপত্নীহত্যার পাপ থেকে পাণ্ডবগণ মুক্তি পাবেন কি করে?

কৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, ঋষিপত্নী হত্যা হয় নি। অপ্সরা পঞ্চচূড়া ঠিক তাঁর পত্নী নন, সেবাদাসী বলা যেতে পারে। বরাহ তাঁকে ঈষৎ দন্তাঘাত করেছিল, তিনি ভয়ে চিৎকার করে আশ্রমে পালিয়ে গিয়ে মূর্ছিত হয়েছিলেন। জবালজট তাঁকে দেখে ভেবেছিলেন বুঝি মরে গেছেন। পাণ্ডবদের মুক্তিলাভের পর আমি ঋষির সঙ্গে তাঁর আশ্রমে গিয়ে দেখলাম পঞ্চচূড়া দোলনায় দুলছেন।

দ্রৌপদী বললেন, কৃষ্ণ, এখনই আমাকে পতিগণের সকাশে নিয়ে চল। হা, আমি অপরাধিনী, এক মাস তাঁদের উপেক্ষা করেছি, এখন কোন্ বাক্যে ক্ষমাভিক্ষা করব?

—পাঞ্চালী, ক্ষমা চেয়ে অনর্থক তাঁদের বিব্রত ক'রো না, তাঁরা তো তোমার উপর অপ্রসন্ন হন নি। বহুদিন পরে তোমার সম্ভাষণ শোনবার জন্য তাঁরা তৃষিত চাতকের ন্যায় উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন।

—গোবিন্দ, আমি তাঁদের কি বলব?

—পুরুষজাতি ভার্যার মুখে নিজের স্তুতি শুনলে যেমন পরিতৃপ্ত হয় তেমন আর কিছুতে হয় না। কৃষ্ণা, তুমি পঞ্চপাণ্ডবের কাছে গিয়ে তাঁদের স্তুতি কর।

—হা কৃষ্ণ, আমি তাঁদের গঞ্জনাই দিয়েছি, এই দগ্ধ মুখে স্তুতি আসবে কেন? কি বলব তুমিই শিখিয়ে দাও।

—সখী কৃষ্ণা, বাগ্‌দেবী তোমার রসনায় অধিষ্ঠান করবেন, তুমি আজ সর্বসমক্ষে অসংকোচে তাঁদের সংবর্ধনা কর। এখন আমার সঙ্গে পতিসন্দর্শনে চল। সেবন্তী, মাল্য প্রস্তুত হয়েছে?

সেবন্তী একটা ঝুড়ি দেখিয়ে বললে, এই যে। অন্য ফুল পাওয়া গেল না, শুধু কদম ফুলের মালা।

কৃষ্ণ বললেন, ওতেই হবে।

ধৌম্যাদি দ্বিজগণে বেষ্টিত হয়ে পঞ্চপাণ্ডব অশ্বত্থতরুমূলে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁদের মন্ত্রজপ সমাপ্ত হয়েছে। কৃষ্ণ সহিত দ্রৌপদীকে আসতে দেখে সকলে গাত্রোত্থান করলেন।

পঞ্চপাণ্ডবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দ্রৌপদী কৃতাঞ্জলিপুটে পাষাণপ্রতিমার ন্যায় নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কৃষ্ণ বললেন, পাঞ্চালী, তোমার মৌন ভঙ্গ কর।

পাঞ্চালী গদ্‌গদ কণ্ঠে বলতে লাগলেন।—দেবসম্ভব পঞ্চ আর্যপুত্র, পতিমহিমায় অভিভূত হয়ে আমি সম্ভাষণ করছি, যা মনে আসছে তাই বলছি, আমার প্রগল্‌ভতা ক্ষমা কর। পিতৃভবনে স্বয়ংবরসভায় ধনঞ্জয়কে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম, ইনি লক্ষ্যভেদ করলে আনন্দে বিবশ হয়েছিলাম, এঁকেই পতিরূপে পাব ভেবে নিজেকে শতধন্য জ্ঞান করেছিলাম। কিন্তু বিধাতা আর গুরুজনরা আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার অপেক্ষা রাখেন নি, পঞ্চভ্রাতার সঙ্গেই আমার বিবাহ দিলেন। অন্তর্যামী সাক্ষী, কিছুকাল পরেই আমার সকল ক্ষোভ দূর হল, পঞ্চপতি আমার অন্তরে একীভূত হয়ে গেলেন। পঞ্চেন্দ্রিয়ের অনুভূতি যেমন পৃথক পৃথক এবং একযোগে অন্তঃকরণ রঞ্জিত করে সেইরূপ পঞ্চপতি স্বতন্ত্র ও মিলিত ভাবে আমার হৃদয় উদ্‌ভাসিত করেছেন।

পাণ্ডবাগ্রজ, ইন্দ্রপ্রস্থে যখন পট্টমহিষী ছিলাম, তখন বসনভূষণে ও প্রসাধনে আমি প্রচুর অর্থব্যয় করেছি, প্রিয়জনকে মুক্ত হস্তে দান করেছি। যখন যা চেয়েছি তুমি তখনই তা দিয়েছ, প্রশ্ন কর নি, অপব্যয়ের জন্য অনুযোগ কর নি। দাসদাসীদের আমি শাসন করেছি, তোমার প্রিয় পরিচারকগণ আমার কঠোরতার জন্য তোমার কাছে অভিযোগ করেছে, কিন্তু তুমি কর্ণপাত কর নি, পাছে পাণ্ডবমহিষীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। তুমি শান্তিপ্রিয় ক্ষমাশীল ধর্মভীরু, তোমার ধর্মাধর্মের বিচারপদ্ধতি না বুঝে আমি বহু ভর্ৎসনা করেছি, তথাপি এই অপ্রিয়বাদিনীর প্রতি ক্রুদ্ধ হও নি। অজাতশত্রু মহামান্য ধর্মরাজ, তোমার মহত্ত্ব বোঝবার শক্তি ক জনের আছে?

মধ্যম পাণ্ডব, তুমি জরাসন্ধবিজয়ী মহাবল, দুঃসাধ্য কর্মই তোমার যোগ্য, কিন্তু আমি ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা কর্মে তোমাকে নিযুক্ত করেছি, আমার প্রতি প্রীতিবশে তুমি যেন ধন্য হয়ে সে সকল সম্পাদন করেছ। তুমি ভোজনবিলাসী, রন্ধনবিদ্যায় পারদর্শী। ইন্দ্রপ্রস্থে বহুসংখ্যক নিপুণ সূপকার তোমার তৃপ্তিবিধান করত, কিন্তু

এই অরণ্যাবাসে আমি যে সামান্য ভোজ্য এক পাকে রন্ধন করে তোমাকে দিয়ে থাকি তাতেই তুমি তুষ্ট হও, কখনও অনুযোগ কর না যে বিস্বাদ বা অতিলবণ বা ঊনবলণ হয়েছে। নরশার্দূল, তোমাদের সকলের চেষ্টায় রাজ্যোদ্ধার হবে, কিন্তু আমার লাঞ্ছনার যোগ্য প্রতিশোধ একমাত্র তুমিই নিতে পারবে। দুর্যোধন আর দুঃশাসনকে তাদের অন্তিম দশায় মনে করিয়ে দিও যে পাণ্ডবমহিষীকে নির্যাতন করে কেউ নিস্তার পায় না।

তৃতীয় পাণ্ডব, তুমি বয়োজ্যেষ্ঠ নও তথাপি তোমার ভ্রাতারা যুদ্ধকালে তোমারই নেতৃত্ব মেনে থাকেন। তুমি দেবপ্রিয় সর্বগুণাকর, অদ্বিতীয় ধনুর্ধর, দেবসেনাপতি স্কন্দতুল্য রূপবান, নৃত্যগীতাদি কলায় পটু, হৃষীকেশ কৃষ্ণ তোমার অভিন্নহৃদয় সখা। যখন সুভদ্রাকে বিবাহ করে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজপুরীতে এনেছিলে তখন আমি ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু সত্য বলছি, এখন আমার কোনো দুঃখ নেই। যে নারী পঞ্চপতির ভার্যা সে কোন্ অধিকারে সপত্নীকে ঈর্ষা করবে? সুভদ্রা আমার প্রিয়তমা ভগিনী, দ্বারকায় তার কাছে আমার পঞ্চপুত্রকে রেখে নিশ্চিন্ত আছি। পরন্তপ মহারথ, কুরুপাণ্ডবসমরে তুমিই পাণ্ডবসেনাপতি হবে, বাসুদেবের সহায়তায় বিপক্ষের সকল বীরকেই তুমি পরাস্ত করবে। কুরুপিতামহ ভীষ্ম আমার মহাগুরু, তোমাদের আচার্য দ্রোণ আমার নমস্য, কিন্তু দ্যূতসভায় তাঁরা রাজকুলবধূকে রক্ষা করেন নি, বীরের কর্তব্য পালন করেন নি, কাপুরুষবৎ নিশ্চেষ্ট ছিলেন। সব্যসাচী, সম্মুখ সমরে মর্মভেদী শরাঘাতে তাঁদের সেই কর্তব্যচ্যুতি স্মরণ করিয়ে দিও।

চতুর্থ পাণ্ডব, তুমি সুকুমারদর্শন বিলাসপ্রিয়, কিন্তু যুদ্ধে দুর্ধর্ষ। ইন্দ্রপ্রস্থে তুমি বিচিত্র পরিচ্ছদ এবং বহু রত্নালংকার ধারণ করতে, কিন্তু এখানে আমাকে অল্প-ভূষণা দেখে তুমিও নিরাভরণ হয়েছ, গন্ধমাল্যাদি বর্জন করেছ। তোমার সমবেদনায় আমি মুগ্ধ হয়েছি। রাজসূয় যজ্ঞের পূর্বে তুমি দশার্ণ ত্রিগর্ত পঞ্চনদ প্রভৃতি বহু দেশ জয় করেছিলে। আগামী সমরেও তুমি জয়লাভ করে যশস্বী হবে।

কনিষ্ঠ পাণ্ডব, তুমি আমার পতি ও দেবর, প্রেম ও স্নেহের পাত্র, বিশেষভাবে স্নেহেরই পাত্র। বনযাত্রাকালে আর্যা কুন্তী আমাকে বলেছিলেন, পাঞ্চালী, আমার পুত্র সহদেবকে দেখো, সে যেন বিপদে অবসন্ন না হয়। নির্ভীক অরিন্দম, তুমি অবসন্ন হও নি, যুদ্ধের জন্য অধীর হয়ে আছ। পূর্বে তুমি মাহিষ্মতীরাজ দুর্মতি নীলকে এবং কালমুখ নামক নররাক্ষসগণকে পরাস্ত করেছিলে। দুরাত্মা কৌরব-গণের সহিত যুদ্ধেও তুমি নিশ্চয় বিজয়ী হবে।

হে দেবপ্রতিম মহাপ্রাণ পঞ্চপতি, দেববন্দনাকালে দেবতার দোষকীর্তন কেউ করে না, তোমাদের দোষের কথাও এখন আমার মনে নেই। আজ আমার জন্য তোমরা জীবন দিতে উদ্যত হয়েছিলে, দাসত্ব বরণ করেছিলে। কোন্ নারী আমার তুল্য পতিপ্রিয়া? পতিনির্বাসিতা সীতা নয়, পতিপরিত্যক্তা দময়ন্তীও নয়। তোমরা অপর পত্নীদের পিত্রালয়ে রেখে কেবল আমাকে সঙ্গে নিয়ে দীর্ঘ ত্রয়োদশ বৎসর যাপন করতে এসেছ, এক দুই বা তিন অখণ্ড পত্নীর পরিবর্তে আমার পঞ্চমাংশেই তুষ্ট আছ। কোন্ স্ত্রী আমার ন্যায় গৌরবিণী? কোন্ পতি তোমাদের ন্যায় সংযমী? বহুবর্ষপূর্বে পিতৃগৃহে বিবাহমণ্ডপে একই দিনে তোমাদের কণ্ঠে একে একে মাল্য দিয়েছিলাম, আজ এই অরণ্যভূমিতে মুক্তাকাশতলে একই ক্ষণে পুনর্বার দিচ্ছি। মহানুভব পঞ্চপতি, প্রসন্ন হও, স্নিগ্ধনয়নে আমাকে দেখ।

পাঞ্চালী পঞ্চপাণ্ডবের কণ্ঠে মালা দিলেন, সেবন্তী শঙ্খধ্বনি করলে, বিপ্রগণ সাধু সাধু বললেন, কৃষ্ণ আনন্দে করতালি দিলেন। তার পর দ্রৌপদীর মস্তকে

করপল্লব রেখে যুধিষ্ঠির বললেন, পাঞ্চালী, তোমাকে অতিশয় ক্লান্ত ও অবসন্নপ্রায় দেখছি, এখন স্বগৃহে বিশ্রাম করবে চল।

যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী প্রস্থান করলেন। কৃষ্ণকে অন্তরালে নিয়ে গিয়ে অর্জুন বললেন, মাধব, জবুলজট ঋষিটিকে পেলে কোথায়? তাঁর অভিনয় উত্তম হয়েছে, কিন্তু হাস্যদমনের জন্য তিনি বিকট মুখভঙ্গী করছিলেন। ভাগ্যক্রমে ধর্মরাজ, পাঞ্চালী ও আর সকলে তা লক্ষ্য করেন নি।

ভীম বললেন, ওহে কৃষ্ণ, একবার এদিকে এস তো। পাঞ্চালী বোধ হয় আর কখনও আমাদের গঞ্জনা দেবেন না, কি বল?

কৃষ্ণ বললেন, মাঝে মাঝে দেবেন বই কি, ওঁর বাক্‌শক্তির তো কিছুমাত্র হানি হয় নি।

১৩৬০ (১৯৫৩)

নিকষিত হেম

পিনাকী সর্বজ্ঞ বললেন, প্লেটনিক লভ কি রকম জান? দুটি হৃদয়ের পরস্পর নিবিড় প্রীতি, তাতে স্থূল সম্পর্ক কিছুমাত্র নেই। চণ্ডীদাস যেমন বলেছেন—রজকিনীপ্রেম নিকষিত হেম কামগন্ধ নাহি তায়।

পিনাকীবাবু বয়সে বড় সেজন্য আড্ডার সকলেই তাঁকে খাতির করে। কিন্তু উপেন দত্ত তার্কিক লোক, পিনাকীর সবজান্তা ভাব সইতে পারে না। বললে, আচ্ছা সর্বজ্ঞ মশায়, দুই বন্ধুর মধ্যে যদি নিবিড় প্রীতি থাকে তবে তাকে প্লেটনিক বলবেন?

পিনাকীবাবু বললেন, তা কেন বলব, সম্পর্কটি স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে হওয়া চাই।

—ও, তাই বলুন। এই যেমন নাতি আর ঠাকুমা, নাতনী আর ঠাকুদ্দা, পিসি আর ভাইপো। এদের মধ্যে যদি গভীর ভালবাসা থাকে তাকে প্লেটনিক বলবেন তো?

—আঃ, তুমি কেবল বাজে তর্ক কর। বুঝিয়ে দিচ্ছি শোন। মনে কর একটি পুরুষ আর একটি নারী আছে, তাদের মধ্যে বৈধ বা অবৈধ মিলন হতে বিশেষ কোনও বাধা নেই। তবু তারা কেবল হৃদয়ের প্রীতিতেই তুষ্ট। এই হল প্লেটনিক প্রেম।

—আচ্ছা। ধরুন ত্রিশ বছরের সুপুরুষ গুরু, আর বিশ বছরের সুশ্রী শিষ্যা। এমন ক্ষেত্রে মামুলী প্রেম আকছার হয়ে থাকে। কিন্তু মনে করুন গুরু খুব কদাকার অথচ তার সুশ্রী স্ত্রী আছে। শিষ্যাও খুব কুৎসিত, তারও সুশ্রী স্বামী আছে। গুরু আর শিষ্যার মধ্যে মামুলী প্রেম হল না, কিন্তু ভক্তি আর স্নেহ খুব হল। একে প্লেটনিক বলবেন তো?

পিনাকী সর্বজ্ঞ রেগে গিয়ে বললেন, যাও, তোমার সঙ্গে কথা কইতে চাই না। বিষয়টি তলিয়ে বোঝবার ইচ্ছে নেই, শুধু জেঠামি।

মাথা চুলকে উপেন দত্ত বললেন, আজ্ঞে না, আমি শুধু একটা ভাল ডেফিনিশন খুঁজছি।

ললিত সাণ্ডেল বললে, ওহে উপেন, আমি খুব সোজা করে বলছি শোন। প্লেটনিক প্রেম মানে আলগোছে প্রেম, যেমন শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর সম্পর্ক। আচ্ছা যতীশ-দা, তুমি তো একজন মস্ত সাহিত্যিক, খুব পড়াশোনাও করেছ। তুমিই বুঝিয়ে দাও না প্লেটনিক প্রেম জিনিসটি কি?

যতীশ মিত্তির বললে, সব জিনিস কি বোঝানো যায়? যেমন ব্রহ্ম, তিনি তো বাক্য আর মনের অগোচর। ধর্ম, সৌন্দর্য, রস, আর্ট—এসবও স্পষ্ট করে বোঝানো যায় না। লাল রং, মিষ্টি স্বাদ, আঁষটে গন্ধ—এসবও অনির্বচনীয়, বুঝিয়ে বলা অসম্ভব, শুধু দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে। প্রেমও সেই রকম।

উপেন বললে, বেশ তো, দৃষ্টান্ত দিয়েই প্লেটনিক প্রেম বুঝিয়ে দাও না।

পিনাকী সর্বজ্ঞ বললেন, দৃষ্টান্ত তো পড়েই রয়েছে,—রামী-চণ্ডীদাস।

যতীশ বললে, সে কেবল চণ্ডীদাসের নিজের উক্তি, সম্পর্কটা বাস্তবিক কেমন ছিল তার কোনও সাক্ষী প্রমাণ নেই। আচ্ছা, আমি বিষয়টা একটু পরিষ্কার করবার চেষ্টা করছি।—প্রেম বা লভ যাই বলা হক, তার অর্থ অতি ব্যাপক আর অস্পষ্ট। আমরা বলে থাকি—ঈশ্বরপ্রেম, বিশ্বপ্রেম, পত্নীপ্রেম, বন্ধুপ্রেম। পণ্ডিত-দের মতে বেগুন টমাটো আলু লংকা ধুতরো একই শ্রেণীতে পড়ে এদের ফুল-ফলের অংগ-প্রত্যংগের মিল আছে, যদিও গুণ আলাদা। তেমনি ভক্তি প্রেম ভালবাসা স্নেহ সবই এক জাতের। তবে প্রেম বললে সাধারণত নরনারীর আদিম আসংগপ্রবৃত্তিই বোঝায়। ভক্তি-শ্রদ্ধা যদি বেগুন-টমাটো হয়, স্নেহ যদি আলু হয়, তবে প্রেমকে বলা যেতে পারে লংকা। প্লেটনিক লভ বা রজকিনী প্রেম তারই একটা রকম ফের, যেমন পাহাড়ী রাক্ষুসে লংকা, ঝাল নেই, শুধু লংকার একটু গন্ধ আছে।

ললিত বললে, বুঝেছি। একটু আঁষটে গন্ধ না থাকলে যেমন কাঙালী ভোজন বা বাঙালী ভোজন হয় না, তেমনি একটু কামগন্ধ না থাকলে মামুলী বা প্লেটনিক কোনও প্রেমই হবার জো নেই। চণ্ডীদাসের নিকষিত হেম খাঁটি সোনা নয়, অন্তত এক আনা খাদ আছে।

যতীশ বললে, তোমার কথা হয়তো ঠিক, একটু লিপ্সা না থাকলে প্রেমের উৎপত্তি হয় না। এর বিচার মনোবিদ্‌গণ করবেন, আমার পক্ষে কিছু বলা অনধিকার-চর্চা। আমি একটি অদ্ভুত ইতিহাস জানি। ঘটনাটি আরম্ভ হয় মামুলী প্রেম রূপে, কিন্তু দৈবদুর্বিপাকে তা প্লেটনিক পরিণতি পায় এবং কিছুকাল থমথমে হয়ে থাকে। পরিশেষে ব্যাপারটা এমন বিশ্রী রকম জটিল হয়ে পড়ে যে প্লেটো বা চণ্ডীদাসের পক্ষেও তা অনির্বচনীয়। তবে ফ্রয়েড-শিষ্যদের অসাধ্য কিছু নেই, তাঁরা নিশ্চয় বিশ্লেষণ করে একটি ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

উপেন বললে, ব্যাখ্যা শুনতে চাই না, তুমি ইতিহাসটি বল যতীশ-দা।

যতীশ মিত্তির বলতে লাগল —

অখিল শীলকে তোমাদের মনে আছে? বছর সাত-আট আগে দু-একবার আমার সংগে এই আড্ডায় এসেছিল। সে আর আমি একসংগে পড়তুম। আমি বি. এল. পাস করে উকিল হলুম, সে এম. এ. পাস করে কর্পোরেশনে একটা চাকরি যোগাড় করলে। কলেজে তার দু ক্লাস নীচে পড়ত নিরঞ্জনা তলাপাত্র। মেয়েটি সুন্দরী না হক, দেখতে মন্দ ছিল না, টেনিস ভলিবল খেলায় নাম করেছিল, স্বাস্থ্যও খুব ভাল ছিল।

একদিন অখিল আমাকে বললে, সে নিরঞ্জনার সংগে প্রেমে পড়েছে, বিয়ে করতে চায়। কিন্তু অখিলের বিধবা মা ব্রাহ্মণ পুত্রবধূ আনতে রাজী নন। নিরঞ্জনার বাপ সর্বেশ্বর তলাপাত্রেরও ঘোর আপত্তি, তিনি বলেছেন, ব্রাহ্মণ-কন্যার সংগে বেনে বরের বিবাহ হলে তাদের সন্তান হবে চণ্ডাল, শাস্ত্রে এই কথা আছে।

আমি অখিলকে বললুম, এক্ষেত্রে সনাতন উপায় যা আছে তাই অবলম্বন কর। নিরঞ্জনা কান্নাকাটি করুক, খাওয়া কমিয়ে দিক, যথাসম্ভব রোগা হয়ে যাক। তুমিও

বাড়িতে মুখ হাঁড়ি করে থেকো, চুল রুক্ষ করে রেখো, নামমাত্র খেয়ো, বাকীটা রেস্তোরাঁয় পুষিয়ে নিও। ওরা দুজনে আমার প্রেসক্রিপশন মেনে নিলে, তাতে ফলও হল। অখিলের মা আর নিরঞ্জনার বাপ-মা অগত্যা রাজী হলেন। স্থির হল দু মাস পরে বিবাহ হবে।

নিরঞ্জনা কলকাতায় তার কাকার কাছে থেকে কলেজে পড়ত। তার বাপ সর্বেশ্বর তলাপাত্র বোম্বাই সরকারের বড় চাকরি করতেন, মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন। আসন্ন বিবাহের স্বপ্নে অখিল দিন কতক বেশ মশগুল হয়ে রইল। তার পর একদিন সে আমাকে বললে, দেখ যতীশ, ক দিন থেকে নিরঞ্জনা কেমন যেন গম্ভীর হয়ে আছে, কারণ জানতে চাইলে কিছুই বলে না। অখিলকে আশ্বাস দেবার জন্যে আমি বললুম, ও কিছু নয়, বাপ-মাকে ছেড়ে যেতে হবে তার জন্যে বিয়ের আগে অনেক মেয়েরই একটু মন খারাপ হয়।

তার পর একদিন সন্ধ্যাবেলা অখিল হন্তদন্ত হয়ে আমার কাছে এসে বললে, ভাই, সর্বনাশ হতে বসেছে। সর্বেশ্বরবাবু হঠাৎ কলকাতায় এসে নিরঞ্জনাকে বোম্বাইয়ে নিয়ে গেছেন। নিরঞ্জনার কাকার কাছে গিয়েছিলুম, তিনি গম্ভীর হয়ে আছেন, আমি প্রশ্ন করলে কিছু জানালেন না, ভাল করে কথাই বললেন না।

আমি নিরঞ্জনাকে এইমাত্র টেলিগ্রাম করেছি, চিঠি লিখেও জানতে চেয়েছি—আমাকে কিছু না জানিয়ে তার হঠাৎ চলে যাবার মানে কি, আর কারও সঙ্গে তার বিয়ে হবে নাকি?

অখিলকে আমি বললুম, ব্যস্ত হয়ো না, দু দিন সবুর করে দেখ না নিরঞ্জনা কি উত্তর দেয়। চার-পাঁচ দিন পরে অখিল এসে বললে, এই দেখ নিরঞ্জনার চিঠি, তার মতলব তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

নিরঞ্জনা অখিলকে লিখেছে—আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হতেই পারে না, আমাকে একেবারে ভুলে যাও। এর কারণ এখন বলতে পারব না, শুধু এইটুকু জেনে রাখ যে অন্য কোনও পুরুষকে আমি বিয়ে করব না। তুমি আমাকে চিঠি লিখো না, বোম্বাইএ এসো না, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারব না। যথা-কালে সমস্তই জানতে পারবে।

অখিল পাগলের মতন হয়ে গেল। আমি তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করলুম, বললুম, ধৈর্য ধরে থাক, নিরঞ্জনা তো বলেছে যে সব কথা সে পরে জানাবে। কিন্তু অখিল ধৈর্য ধরবার লোক নয়, নিরঞ্জনাকে রোজ চিঠি লিখতে লাগল। চিঠির কোনও উত্তর এল না। অবশেষে সে বোম্বাইএ ছুটল। দশ দিন পরে ফিরে এসে আমাকে যা বললে তা এক অদ্ভুত ব্যাপার।

সর্বেশ্বর তলাপাত্র প্রথমটা অখিলকে হাঁকিয়ে দিয়েছিলেন, নিরঞ্জনার সঙ্গে দেখা করবার অনুমতিও দেন নি। কিন্তু অখিলের কণ্ঠস্বর আর শোকোচ্ছ্বাস শুনতে পেয়ে নিরঞ্জনা দোতলা থেকে নেমে এসে বললে, বাবা, তুমি অন্য ঘরে যাও, যা বলবার আমিই অখিলকে বলব। বেচারাকে অনর্থক যন্ত্রণা দিয়ে লাভ কি, সব খোলসা করে বলাই ভাল।

এই কি নিরঞ্জনা? তাকে এখন চেনা শক্ত। মাথার চুল ছোট করে কেটেছে, পায়জামা আর পঞ্জাবি পরেছে, লম্বায় ইঞ্চি ছয়েক বেড়ে গেছে। তার কণ্ঠস্বর মোটা হয়েছে, গোঁফ বেরিয়েছে বুক একদম ফ্ল্যাট হয়ে গেছে। অখিল অবাক হয়ে তাকে দেখতে লাগল।

নিরঞ্জনা যে রহস্য প্রকাশ করলে তা এই।—সে পুরুষে রূপান্তরিত হচ্ছে। সন্দেহ অনেক দিন আগেই হয়েছিল, এখন সমস্ত লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ডাক্তার কির্লোস্কার তার চিকিৎসা করছেন, হরেক রকম গ্ল্যান্ড খাওয়াচ্ছেন আর হরমোন ইঞ্জেকশন দিচ্ছেন। তিনি বলেছেন, সম্পূর্ণ রূপান্তর হতে বড় জোর আরও ছ মাস লাগবে।

অখিল আকুল হয়ে বললে, না নিরঞ্জনা, তুমি পুরুষ হয়ো না, তা হলে আমি মরব। ট্রিটমেন্ট বন্ধ করে দাও, বরং ডাক্তারকে বল তিনি এমন ব্যবস্থা করুন যাতে তোমার নারীত্ব রক্ষা পায়।

নিরঞ্জনা বললে, তা হবার জো নেই। আমি পুরুষ হয়েই জন্মেছি, এতদিন লক্ষণগুলো চাপা ছিল, এখন ক্রমশ প্রকাশ পাচ্ছে। যদি চিকিৎসা বন্ধ করি তা হলেও আমার পরিবর্তন হতে থাকবে, শুধু দু-তিন বছর দেরি হবে। তার চাইতে চটপট পুরুষ হয়ে যাওয়াই ভাল।

অখিল কাঁদতে কাঁদতে বললে, আমার কি হবে নিরঞ্জনা? তুমি না হয় পুরুষই হয়ে গেলে, তোমার ডাক্তার কি আমাকে মেয়ে করে দিতে পারে না? তা হলেও আমাদের মিলন হতে পারবে।

নিরঞ্জনা বললে, পাগল হয়েছ? তুমি তো পুরোপুরি পুরুষ হয়েই জন্মেছ, তার আর নড়চড় হতে পারে না। এই বইখানা দিচ্ছি, ফাউলার্স সেক্স ফ্যাক্টর্স, পড়ে দেখো।

অখিল বললে, তুমি মেয়েই হও আর পুরুষই হও, তোমার সঙ্গে আমার হৃদয়ের যে সম্পর্ক তার পরিবর্তন হতে পারে না। আমি তোমাকে ছাড়তে পারব না।

নিরঞ্জনা বললে, মন খারাপ ক'রো না। তুমি আর আমি যাতে একসঙ্গে থাকতে পারি তার ব্যবস্থা করব। বাবা বলেছেন আমার চিকিৎসা শেষ হলেই আমাকে ইন্দোর ব্যাংকের সেক্রেটারির পোস্টে বসিয়ে দেবেন। বাবার খুব প্রতিপত্তি, আমি জেদ করলে তোমাকেও সেখানে একটা ভাল কাজ দিতে পারবেন। তত দিন তুমি বোম্বাইএ আমাদের বাড়িতেই থাকবে।

অখিল তার কলকাতার চাকরি ছেড়ে বোম্বাইএ ফিরে গিয়ে নিরঞ্জনার কাছেই রইল। সর্বেশ্বরবাবু দয়ালু লোক, আপত্তি করলেন না। দ্রুপদ রাজার মেয়ে শিখণ্ডিনী যেমন পুরুষত্ব লাভ করে মহারথ শিখণ্ডী হয়েছিলেন, নিরঞ্জনাও তেমনি কয়েক মাস পরে পূর্ণপুরুষ মিস্টার নিরঞ্জন তলাপাত্র রূপে ইন্দোর ব্যাংকের সেক্রেটারি হল। সর্বেশ্বরবাবুর চেষ্টায় অখিল শীলও সেই ব্যাংকের অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারি হল। দুজনে একসঙ্গেই বাস করতে লাগল।

পিনাকী সর্বজ্ঞ বললেন, সেরেফ গাঁজা। তুমি কি বলতে চাও এরই নাম নিকষিত হেম?

যতীশ মিত্তির বললে, আজ্ঞে না। স্টেনলেস স্টীল বলতে পারেন। সোনার জলুস নেই, লোহার মরচে নেই, ইস্পাতের ধারও নেই।

উপেন দত্ত বললে, তার পর কি হল?

—তার পর সব ওলটপালট হয়ে গেল। একদিন নিরঞ্জন বললে, ওহে অখিল, এরকম একা একা ভাল লাগছে না, জগৎটা বোদা বোদা ঠেকছে। মা-বাবাও বিয়ের জন্যে তাড়া দিচ্ছেন। আমি বলি শোন।—শেঠ মুলুকচাঁদের একজোড়া যমজ মেয়ে আছে, দেখেছ তো? তাদের মা বাঙালী। খাসা মেয়ে দুটি। তুমি একটিকে আর আমি একটিকে বিয়ে করি এস। শেঠজীকে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি রাজী, মেয়ে দুটিরও আপত্তি নেই।

বিয়ে হয়ে গেল, কিন্তু কিছুদিন পরেই দুই বোনের চুলোচুলি ঝগড়া বাধল, যেন তারা দুই সতিন। তার ফলে দুই বন্ধুরও মনোমালিন্য হল। অখিল অন্য চাকরি নিয়ে দিল্লি চলে গেল, নিরঞ্জন ইন্দোরেই রইল। এখন আর দুজনের মুখদর্শন নেই।

উপেন দত্ত বললে, যাক, বাঁচা গেল।

১৩৬০ (১৯৫৩)

বালখিল্যগণের উৎপত্তি

পুরাণে আছে, বালখিল্য মুনিরা বুড়ো আঙুলের মতন লম্বা এবং সংখ্যায় ষাট হাজার। তাঁদের পিতার নাম ক্রতু, মাতার নাম ক্রিয়া। এই বৃত্তান্ত অসম্পূর্ণ, এতে কিছু ভুলও আছে। বালখিল্যগণের প্রকৃত ইতিহাস নিম্নে বিবৃত করছি।

পুরাকালে নৈমিষারণ্যে বহু ঋষির আশ্রম ছিল। ব্রহ্মার অন্যতম মানসপুত্র মহর্ষি ক্রতু তার ভার্যা ক্রিয়ার সঙ্গে সেখানেই বাস করতেন। ক্রতু হলেন সপ্তর্ষি-গণের ষষ্ঠ ঋষি। একদিন বিকাল বেলা কুটীরের দাওয়ায় বসে তিনি তাঁর পত্নীকে ব্যাকরণ শেখাচ্ছিলেন। ক্রতু বলছিলেন, প্রিয়ে, এই স্ত্রীপ্রত্যয়প্রকরণ বড়ই কঠিন, তুমি উত্তমরূপে কণ্ঠস্থ কর। মৎস্য শব্দের য-ফলা আছে, কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গে মৎসী, য-ফলা হয় না। অনুরূপ মনুষ্য মনুষী। ইন্দ্রের স্ত্রী ইন্দ্রাণী, চন্দ্রের স্ত্রী চন্দ্রা। অশ্বের স্ত্রী অশ্বা, অথচ গর্দভের স্ত্রী গর্দভী।

সহসা একটা গম্ভীর চাপা আওয়াজ শোনা গেল। মহর্ষি ক্রতু সবিস্ময়ে কান পেতে শুনলেন যেন কেউ কলসীর ভিতর থেকে কথা বলছে—আপনি সব ভুল শেখাচ্ছেন।

ক্রুদ্ধ হয়ে ক্রতু বললেন, কে রে তুই, এতদূর আস্পর্ধা যে আমার ভুল ধরিস!

আবার আওয়াজ হল—ওসব সেকেলে ব্যাকরণ চলবে না। স্ত্রীলিঙ্গ একই পদ্ধতিতে করতে হলে—মৎস্যী মনুষ্যী ইন্দ্রী চন্দ্রী অশ্বী গর্দভী, কিংবা মৎস্যিণী মনুষ্যিণী ইন্দ্রিণী চন্দ্রিণী অশ্বিণী গর্দভিনী।

ক্রতু বললেন, কোথায় আছিস তুই, সম্মুখে আয়, লগুড়াঘাতে তোকে ব্যাকরণ শিক্ষা দেব।

ঋষিপত্নী ক্রিয়া বললেন, স্বামী, অদৃশ্য মূর্খের বাক্যে কর্ণপাত করো না। ব্যাকরণের পাঠ আজ স্থগিত থাকুক, সেদিন তুমি যে প্রত্যক্ষ দেবতাদের কথা বলছিলে তাই পুনর্বার শুনতে ইচ্ছা করি।

ক্রতু বললেন, প্রিয়ে, প্রণিধান কর। আকাশে তিন প্রত্যক্ষ দেবতা আছেন—সূর্য চন্দ্র ও মেঘরূপ পর্জন্য। ভূতলেও তিন প্রত্যক্ষ দেবতা আছেন—গর্ভধারিণী মাতা, জন্মদাতা পিতা, এবং বিদ্যাদাতা গুরু। এরাই সর্বাগ্রে উপাস্য। অগ্নি বায়ু বরুণ প্রভৃতির স্থান এঁদের নিম্নে।

পুনর্বার আওয়াজ হল—সব ভুল। আকাশে বা ভূতলে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ কোনও দেবতা নেই, চন্দ্র সূর্য পর্জন্য পিতা মাতা গুরু কেউ উপাস্য নয়।

অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে ক্রতু বললেন, ওরে পাষণ্ড পিশাচ, সাহস থাকে তো দৃষ্টি-গোচর হয়ে তর্ক কর, নতুবা ব্রহ্মশাপে তোকে ধ্বংস করব।

ঋষিপত্নী ক্রিয়া কাতর হয়ে করজোড়ে বললেন, স্বামী, ও পিশাচ নয়, আমার গর্ভস্থ পুত্রই কথা বলছে। অবোধ শিশুকে তুমি ক্ষমা কর।

—গর্ভস্থ পুত্র না জ্যেষ্ঠতাত! বেরিয়ে আয় হতভাগা অকালকুষ্মাণ্ড!

ক্রিয়া তাঁর পুত্রের উদ্দেশ্যে বললেন, বৎস, ক্ষান্ত হও, পূজ্যপাদ পিতার বাক্যের প্রতিবাদ ক'রো না। আগে ভূমিষ্ঠ হও, তোমার দন্তোদ্‌গম হক, অন্নপ্রাশন চূড়াকরণ উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কার চুকে যাক, তার পর যদি কিছু জ্ঞাতব্য থাকে তবে পিতাকে সবিনয়ে শ্রদ্ধাসহকারে জিজ্ঞাসা ক'রো। এখন মৌনাবলম্বন কর, গর্ভস্থ অপোগণ্ডের পক্ষে বাচালতা অত্যন্ত অনিষ্টকর।

মহর্ষি ক্রতুর অজাত অপত্য নীরব হল। অধ্যাপনার ব্যাঘাত হওয়ায় ক্রতু উঠে পড়ে সন্ধ্যাবন্দনা করতে গেলেন।

নৈমিষারণ্যের একদিকে গোমতী নদী। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল পক্ষে ষষ্ঠী তিথিতে সেখানে দেশ-বিদেশ থেকে গর্ভিণী নারীরা সমাগত হন এবং সুপুত্র-কামনায় পুণ্যতোয়া গোমতীতে স্নান করে ষণ্‌মাতৃকা অর্থাৎ ষষ্ঠিদেবীর আরাধনা করেন। এবারে এই শুভতিথিতে পুষ্যা নক্ষত্র ও বৃদ্ধিযোগ পড়েছে, সেজন্য অসংখ্য নারী গোমতীতীরে সমবেত হয়েছেন। ক্রতুর পত্নী ক্রিয়া তাঁদের নেত্রীস্থানীয়া, তিনি সকলকে ব্রতপালনের পদ্ধতি বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন।

সহসা তাঁর গর্ভস্থ পুত্রের গুরুগম্ভীর স্বর শোনা গেল—ভো অজাত অপোগণ্ডগণ, শ্রূয়তাম্‌।

তণ্ডুলভাণ্ডবাসী মূষিকশাবকের ন্যায় কিচকিচকণ্ঠে সহস্র ভ্রূণ উত্তর দিলে—হাঁ হাঁ আমরা শুনছি।

—বিশ্বের অপোগণ্ড এক হও।

—এক হব।

—সকলে আরার উত্তোলন কর—প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ কোনও দেবতা মানব না।

—মানব না।

—পিতা মাতা গুরু কারও শাসন মানব না।

—মানব না।

—গুরুকে আর ডরাব না, গুরুর গরু চরাব না। গুরুকুলে নাহি রব, না পড়ে পণ্ডিত হব।

—না পড়ে পণ্ডিত হব।

—তবে কাকে মানবে, কার আজ্ঞায় চলবে?

—তাই তো, কাকে মানব?

—আদিবিদ্রোহী মহান্‌ ত্রিশঙ্কুকে, যিনি ঊর্ধ্বপাদ অধঃশিরা হয়ে রাশিচক্রের বহির্দেশে বিদ্যমান রয়েছেন।

—মহান্‌ ত্রিশঙ্কু বিদ্যতাম্‌, অন্য গুরু ম্রিয়তাম্‌!

—ত্রিশঙ্কুর জন্য যিনি আকাশে নূতন স্বর্গলোক সৃষ্টি করেছেন সেই বশিষ্ঠ-শত্রু বিশ্বামিত্রকেও ধন্যবাদ দাও।

—বিশ্বামিত্র ধন্যবাদ, বশিষ্ঠাদি নিন্দাবাদ!

—ভ্রাতৃগণ, এই বারে গর্ভকারা থেকে বেরিয়ে এস, স্বাধীন হও, বসুন্ধরা ভোগ কর।

—কিন্তু এখন যে পাঁচ মাসও পূর্ণ হয় নি!

—তর্ক ক'রো না, ত্রিশঙ্কুর আজ্ঞা, ভূমিষ্ঠ হও।

—আমাদের পালন করবে কে, খেতে দেবে কে?

—তর্ক ক'রো না, তোমাদের স্নেহান্ধ মূর্খ পিতামাতাই পালন করবে। নিষ্ক্রান্ত হও।

ষাট হাজার গর্ভিণী আর্তনাদ করে উঠলেন, ষাট হাজার ভ্রূণ গর্ভচ্যুত হল। বহু প্রসূতি প্রাণত্যাগ করলেন।

আর্তনাদ শুনে নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ সত্বর গোমতীতীরে উপস্থিত হলেন। তাঁরা দেখলেন, সদ্যোজাত মুনিসন্তানগণ গর্ভনাড়ী ছিন্ন করে ক্লেদাক্ত নগ্ন দেহে চিৎকার ও আস্ফালন করছে। সেই অকালপ্রসূত অকালপক্ব দন্তহীন জটাশ্মশ্রু-ধারী বালখিল্যগণের নেতা ক্রতুপুত্র ক্রাতব। সে দুই হাত নেড়ে বলছে, ভাইসব, এগিয়ে চল, আমরা এখানকার সমস্ত আশ্রম পুড়িয়ে ফেলব, তার পর বশিষ্ঠের আশ্রমে গিয়ে তার কামধেনু হরণ করে দুধ খাব। বিশ্বামিত্র যা পারেন নি আমরা তা পারব।

—দুধ খাব, দুধ খাব! মহান্ ত্রিশঙ্কু বিদ্যতাম, বশিষ্ঠ ঋষি ম্রিয়তাম। বাল-খিল্য বর্ধন্তাম্, আর সবাই ক্ষীয়ন্তাম্!

বালখিল্যগণ উপদ্রব করতে উদ্যত হয়েছে দেখে ঋষিরা ভীত হয়ে বললেন, মহর্ষি ক্রতু, তোমার ওই অকালজাত পুত্র ক্রাতবই এই সর্বনাশের মূল, তুমিই এর প্রতিকার কর।

ক্রতু একটু চিন্তা করে বললেন, এরা ব্রাহ্মণসন্তান, অপজাত হলেও অধৃষ্য ও অবধ্য, নতুবা মুখে লবণ দিয়ে এদের ব্যাপাদিত করা যেত। এরা দেখছি ত্রিশঙ্কুর ভক্ত, সুতরাং ত্রিশঙ্কুর যাজক বিশ্বামিত্র হয়তো এদের বশে আনতে পারবেন। চল, বিশ্বা-মিত্রের শরণাপন্ন হওয়া যাক।

নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণের প্রার্থনা শুনে বিশ্বামিত্র বললেন, এই বালখিল্যগণের উপর অপদেবতার ভর হয়েছে, এরা সদুপদেশ শুনবে না, কৌশলে এদের বশে আনতে হবে। চল, চেষ্টা করে দেখা যাক।

বিশ্বামিত্রকে পুরোবর্তী করে ঋষিগণ নৈমিষারণ্যে ফিরে এলেন। বালখিল্যচমূ তখন ব্যূহবদ্ধ হয়ে আক্রমণের উপক্রম করছে।

বিশ্বামিত্র বললেন, ভো বালখিল্যগণ, আমাকে চিনতে পেরেছ? আমি হচ্ছি আদিবিদ্রোহী ত্রিশঙ্কুর যাজক বিশ্বামিত্র।

বালখিল্যগণ চিৎকার করে বললে, মহামহিম বিশ্বামিত্রের জয়োঽস্তু, অন্য ঋষি-দের ক্ষয়োঽস্তু!

বিশ্বামিত্র বললেন, কল্যাণমস্তু। বৎসগণ, তোমরা আমার অতি স্নেহের পাত্র। তোমাদের ক্ষুধার্ত মনে হচ্ছে, কিছু খাবে?

—খাব, খাব।

—মৃগমাংস? পুরোডাশ? পিষ্টক? সুপক্ব হরীতকী? ইক্ষুদণ্ড?

—ওসব চিবুতে পারব না, দাঁত নেই যে। আপনার সন্ধানে দুধ আছে?

—আছে। কিন্তু মাতৃদুগ্ধ বা গবাদির দুগ্ধ তো তোমরা জীর্ণ করতে পারবে না। এস আমার সঙ্গে, আমি লঘু পথ্যের ব্যবস্থা করব।

বালখিল্যদের নিয়ে বিশ্বামিত্র অলম্ব তীর্থে উপস্থিত হলেন। সেখানে একটি বিশাল বটবৃক্ষের শাখাপ্রশাখায় লক্ষ লক্ষ বাদুড় ত্রিশঙ্কুর মতন ঊর্ধ্বপাদ অধঃশিরা হয়ে ঝুলছে। স্ত্রী-বাদুড়দের সম্বোধন করে বিশ্বামিত্র বললেন, আয় চর্মপর্ণা দন্তবতী পয়স্বিনী বিহঙ্গীর দল, এই সদ্যঃপ্রসূত বুভুক্ষু মুনিশাবকগণকে তোমরা স্তন্যদান কর।

বাদুড়-বনিতারা করুণাবিষ্ট হয়ে বললে, আহা, এস এস বাছারা।

বিশ্বামিত্র বালখিল্যদের একে একে তুলে বটবৃক্ষের শাখায় লম্বিত করে দিলেন। তারা বাদুড়ীদের বক্ষোলগ্ন হয়ে পরমানন্দে স্তন্যপানে রত হল।

ক্রতু প্রশ্ন করলেন, এরা কত কাল এইপ্রকার শান্ত হয়ে থাকবে?

বিশ্বামিত্র বললেন, এখন তো থাকুক, এর পর আবার যদি উপদ্রব করে তখন দেখা যাবে।

১৩৬০ (১৯৫৩)

সরলাক্ষ হোম

বরুণ বিশ্বাস একজন বড় অফিসার, যদিও বয়স ত্রিশের কম। ছেলেবেলায় মা বাপ মারা যাবার পর তার পিতৃবন্ধু গদাধর ঘোষ তাকে পালন করেন। তিনি খুব ধনী লোক, বিস্তর খরচ করে বরুণকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। বরুণ ছেলেটিও ভাল, ছ মাস হল আমেরিকা থেকে গোটাকতক ডিগ্রী নিয়ে ফিরে এসেছে। গদাধরের মেয়ে মান্ডবীর সঙ্গে তার বিয়ে আগে থেকেই ঠিক করা আছে, তিন মাস পরে বিয়ে হবে।

গদাধর ঘোষ প্রতিপত্তিশালী লোক, মুরুব্বীর জোর খুব আছে। তাঁর চেষ্টায় বরুণ একটা বড় চাকরি পেয়ে গেছে—বানর-নির্বাসন-অধিকর্তা, অর্থাৎ ডিরেক্টর অভ মংকি ডিপোর্টেশন। এই সরকারী বিভাগটির উদ্দেশ্য মহৎ। এদেশে মানুষ যা খায় বাঁদরও তাই খায়, তার ফলে মানুষের ভাগে কম পড়ে। সরকার স্থির করেছেন দেশের সমস্ত বাঁদর ক্রমে ক্রমে আমেরিকায় চালান দেবেন, সেখানে চিকিৎসা আর শারীরবিদ্যার গবেষণার জন্য মুখপোড়া রূপী মর্কট প্রভৃতি সব রকম শাখা-মৃগের চাহিদা আছে। বানরনির্বাসনের ফলে দেশের খাদ্যাভাব কমবে, আমেরিকান ডলারও ঘরে আসবে। কিন্তু শ্রেয়স্কর কর্মে বহু বিঘ্ন। যাঁরা জীবহিংসার বিরোধী তাঁরা প্রবল আপত্তি তুললেন। বিদেশে গিয়ে বাঁদররা প্রাণ বিসর্জন দেবে এ হতেই পারে না। তারা শ্রীহনুমানের আত্মীয়, ভারতীয় রামরাজ্যের প্রজা, মানুষের মতন তাদেরও বাঁচবার অধিকার আছে। ভারতবাসী যেমন গরুকে মাতৃবৎ দেখে তেমনি বাঁদরকে ভ্রাতৃবৎ দেখে। সরকার যদি নিতান্তই বানরনির্বাসন চান তবে এদেশেরই কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে তাদের জন্য উপনিবেশ নির্মাণ করুন, প্রচুর আম কাঁঠাল কলা ইত্যাদির গাছ পুঁতুন, ছোলা মটর বেগুন ফুটি কাঁকুড় ইত্যাদির খেত করুন, তদারকের ভাল ব্যবস্থা করুন। উদ্‌বাস্তুদের পুনর্বাসনে যে বেবন্দোবস্ত হয়েছে বাঁদরের বেলা তা হলে চলবে না। এই রকম আন্দোলনের ফলে বানরনির্বাসন আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে, বরুণ বিশ্বাসের উপর হুকুম এসেছে এখন শুধু গনতি করে যাও, পরিসংখ্যান তৈরি কর। বরুণের অধীনে বিশ জন পরিদর্শক আছে, তারা জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়ায় আর রিপোর্ট পাঠায়—বাঁদর এত, বাঁদরী এত, বাঁদরছানা এত। কলকাতার অফিসে এইসব রিপোর্ট ফাইল করা হয় এবং মোটা মোটা খাতায় তার খতিয়ান ওঠে।

আজ বরুণের হাতে কাজ কিছু নেই, মনেও সুখ নেই। সে তার অফিসঘরে ঘুর্ণিচেয়ারে বসে টেবিলে পা তুলে দিয়ে সিগারেট টানছে আর আকাশ পাতাল ভাবছে, এমন সময় সামনের বাংলা কাগজে এই বিজ্ঞাপনটি তার চোখে পড়ল—

যদি মনে করেন সময়টা ভাল যাচ্ছে না, মুশকিলে পড়েছেন, তবে আমার কাছে আসতে পারেন। যদি অবস্থা এমন হয় যে উকিল ডাক্তার এঞ্জিনিয়ার পুলিস জ্যোতিষী বা গুরুমহারাজ কিছুই করতে পারবেন না, তবে বৃথা দেরি না করে

আমাকে জানান। এই ধরুন, আপনার সম্বন্ধী সপরিবারে আপনার বাড়িতে উঠেছেন, ছ মাস হয়ে গেল তবু চলে যাবার নামটি নেই। অথবা আপনার পিসেমশাই তাঁর মেয়ের বিয়ের গহনা কেনবার জন্য আপনাকে তিন হাজার টাকা পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু রেস খেলতে গিয়ে আপনি তা উড়িয়ে দিয়েছেন। অথবা পাশের বাড়ির ভবানী ঘোষাল আপনাকে যাচ্ছেতাই অপমান করেছে, কিন্তু সে হচ্ছে ষণ্ডামার্কা গুণ্ডা আর আপনি রোগা-পটকা। কিংবা ধরুন আপনার স্ত্রীর মাথায় ঢুকেছে যে তাঁর মতন সুন্দরী ভূভারতে নেই, তিনি সিনেমা অ্যাকট্রেস হবার জন্য খেপে উঠেছেন, আপনি কিছুতেই তাঁকে রুখতে পারছেন না। কিংবা মনে করুন আপনি একটি মেয়েকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দেবার পর অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে ঘোরতর প্রেমে পড়েছেন, আগেরটিকে খারিজ করবার উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না। ইত্যাদি প্রকার সংকটে যদি পড়ে থাকেন তো সোজা আমার কাছে চলে আসুন। শ্রীসরলাক্ষ হোম, তিন নম্বর বেচু কর স্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। সকাল আটটা থেকে দশটা, বিকেল চারটে থেকে রাত নটা।

বিজ্ঞাপনটি পড়ে বরুণ কিড়িং করে ঘণ্টা বাজালে। লাল চাপকান পরা একজন আরদালী ঘরে এল, বরুণ তাকে বললে, মিস দাস। একটু পরে ঘরে ঢুকল খঞ্জনা দাস, বরুণের অ্যাসিস্টান্ট, রোগা লম্বা, কাঁধ পর্যন্ত ঝোলা ঢেউ তোলা রুক্ষ ফাঁপানো চুল, চাঁচা ভুরু, গোলাপী গাল, লাল ঠোঁট, লাল নখ, নখের ডগা টিকে দেবার লানসেটের মতন সরু। সস্তা সিন্থেটিক ভায়োলেটের গন্ধে ঘর ভরে গেল।

বরুণ কাগজটা হাতে দিয়ে বললে, এই বিজ্ঞাপনটা পড়ে দেখ।

বিজ্ঞাপন পড়ে খঞ্জনা বললে, যাবে নাকি লোকটার কাছে? নিশ্চয় হামবগ জোচ্চোর, কিছুই করতে পারবে না, শুধু ঠকিয়ে পয়সা নেবে। আমার কথা শোন, দু নৌকোয় পা রেখো না, মাণ্ডবী আর তার বাপকে সোজা জানিয়ে দাও যে তুমি অন্য মেয়ে বিয়ে করবে।

—তার ফল কি হবে জান তো? আমার আড়াই হাজার টাকা মাইনের চাকরিটি যাবে। আমাদের চলবে কি করে? মাণ্ডবীর বাপ গদাধর ঘোষকে তুমি জান না, অত্যন্ত রাগী লোক।

—অত ভয় কিসের? তোমার সরকারী চাকরি, গদাই ঘোষ তোমার মনিব নয়, ইচ্ছে করলেই তোমাকে সরাতে পারে না। আর যদিই চাকরি যায়, অন্য জায়গায় একটা জুটিয়ে নিতে পারবে না?

বরুণ বললে, আজ বিকেলে এই সরলাক্ষ হোমের কাছে গিয়ে দেখি। যদি কোনও উপায় বাতলাতে না পারে তবে তুমি যা বলছ তাই করব।

এখন সরলাক্ষ হোমের পরিচয় জানা দরকার। লোকটির আসল নাম সরলচন্দ্র সোম। বি. এ পাস করে সে স্থির করলে আর পড়বে না, চাকরিও করবে না, বুদ্ধি খাটিয়ে স্বাধীনভাবে রোজগার করবে। প্রথমে সে রাজজ্যোতিষীর ব্যবসা শুরু করলে। কিন্তু তাতে কিছু হল না। কারণ সামুদ্রিক আর ফলিত জ্যোতিষের বুলি তার তেমন রপ্ত নেই, মক্কেলরা তার বক্তৃতায় মুগ্ধ হল না। তার পর সে সরলাক্ষ হোম নাম নিয়ে ডিটেকটিভ সেজে বসল, কিন্তু তাতেও সুবিধা হল না। সম্প্রতি সে একেবারে নতুন ধরনের ব্যবসা ফেঁদেছে, মক্কেলও অল্পস্বল্প আসছে।

সরলাক্ষ হোমের বাড়িতে ঢুকতেই যে ঘর সেখানে একটা ছোট টেবিল আর তিনটে চেয়ার আছে, মক্কেলরা সেখানে অপেক্ষা করে। তার পরের ঘরটি কনসল্টিং রুম, সেখানে সরলাক্ষ আর তার বন্ধু বটুক সেন গল্প করছে। বটুক সরলাক্ষর চাইতে বয়সে কিছু বড়, সম্প্রতি পাস করে ডাক্তার হয়েছে, কিন্তু এখনও কেউ তাকে ডাকে না। ঘরের ঘড়িতে পৌনে চারটে বেজেছে।

বটুক সেন বলছিল, খুব খরচ করে ব্যবসা তো ফাঁদলে। ঘর সাজিয়েছ, দামী পর্দা টাঙিয়েছ, উর্দি পরা বয় রেখেছ, কাগজে বিজ্ঞাপনও দিচ্ছ। মক্কেল কেমন আসছে?

সরলাক্ষ বললে, দুটি একটি করে আসছে। বেশীর ভাগই স্কুলের ছেলে, ষোল টাকা ফী দেবার সাধ্য নেই, টাকাটা সিকেটা যা দেয় তাই নিই। একজন প্রেমে পড়েছে, কিন্তু সে অত্যন্ত বেঁটে বলে প্রণয়িনী তাকে গ্রাহ্য করছে না। আমি অ্যাডভাইস দিয়েছি—সকালে দু পায়ে দুখানা ইট বেঁধে দু হাতে গাছের ডাল ধরে আধ ঘণ্টা দোল খাবে, বিকেলে মাঠে মনুমেণ্টের মাথার দিকে তাকিয়ে এক ঘণ্টা ধ্যান করবে, ছ মাসের মধ্যে ছ ইঞ্চি বেড়ে যাবে। আর একটি ছেলে কাশী থেকে পালিয়ে এখানে ফুর্তি করতে এসেছে, টাকা সব ফুরিয়ে গেছে, বাপকে জানাতে লজ্জা হচ্ছে। আমি বলেছি—লিখে দাও, ছেলেধরা ক্লোরোফর্ম করে নিয়ে এসেছে, মিস্টার সরলাক্ষ হোম আমাকে উদ্ধার করে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছেন, পত্রপাঠ এক শ টাকা পাঠাবেন। আর এই দেখ বটুক-দা—শ্রীগদাধর ঘোষ চিঠি লিখেছেন, আজ সন্ধ্যা সাতটায় আসবেন।

বটুক বললে, বল কি হে! গদাধর তো মস্ত বড় লোক, তার আবার মুশকিল কি হল? তাকে যদি খুশী করতে পার তো তোমার বরাত ফিরে যাবে।

সরলাক্ষর প্রতিহাররক্ষী ছোকরা সোনালাল একটা স্লিপ নিয়ে এল। সরলাক্ষ পড়ে বললে, এ যে দেখছি একজন মহিলা, মাণ্ডবী ঘোষ। পাঠিয়ে দে এখানে।

কুড়ি-বাইশ বছরের একটি মেয়ে ঘরে এল। দুজন লোক দেখে একটু ঘাবড়ে গিয়ে বললে, মিস্টার হোমের সঙ্গে কিছু প্রাইভেট কথা বলতে চাই।

সরলাক্ষ বললে, আমিই হোম, ইনি আমার সহকর্মী ডাক্তার বটুক সেন। আপনি এঁর সামনে সব কথা বলতে পারেন, কোনও দ্বিধা করবেন না। বসুন আপনি।

মাণ্ডবী কিছুক্ষণ ঘাড় নীচু করে বসে রইল। তার পর আস্তে আস্তে বললে, আমার বাবার নাম শুনে থাকবেন, শ্রীগদাধর ঘোষ।

সরলাক্ষ বললে, ও, তাঁরই কন্যা আপনি?

—হাঁ। বরুণ-দার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা অনেক কাল থেকে ঠিক করা আছে—বানর-নির্বাসন-অধিকর্তা বরুণ বিশ্বাস।

হাঁ হাঁ এই নতুন পোস্টের কথা কাগজে পড়েছি বটে। খুব ভাল সম্বন্ধ, কংগ্রাট্স মিস ঘোষ।

মাণ্ডবী বিষণ্ণ মুখে মাথা নেড়ে বললে, একটা বিশ্রী গুজব শুনছি, বরুণ-দা তার অ্যাসিস্টাণ্ট খঞ্জনা দাসের প্রেমে পড়েছে।

—আপনার বাবা জানেন?

—জানেন, কিন্তু তিনি তেমন গা করছেন না। বলছেন, ইয়ংম্যানদের অমন একটু-আধটু বেচাল হয়ে থাকে, বিয়ে হলেই সেরে যাবে।

—কথাটা ঠিক, চটপট বিয়ে হয়ে যাওয়াই ভাল।

—এক জ্যোতিষী বলেছেন আমার একটা ফাঁড়া আছে, তিন মাস পরে কেটে যাবে। তার পর বিয়ে হবে। কিন্তু তার মধ্যে বরুণ-দা কি করে বসবে কে জানে।

—দেখি আপনার হাত।

মাণ্ডবীর করতল দেখে সরলাক্ষ বললে, হুঁ, ফাঁড়া একটা আছে বটে, কিন্তু তিন মাস নয়, মাস খানিকের মধ্যেই আমি কাটিয়ে দেব। খঞ্জনা দাসের খপ্পর থেকে আপনি শ্রীবিশ্বাসকে উদ্ধার করতে চান তো?

—হাঁ। আপনি দুজনের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দিন, ভীষণ ঝগড়া, যাতে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়। খরচ যা লাগে আমি দেব, এখন এই একশ টাকা আগাম দিচ্ছি।

সরলাক্ষ সহাস্যে বললে, ব্যস্ত হবেন না, আমার প্রথম ফী ষোল টাকা মাত্র। কাজ উদ্ধার হলে আরও যা ইচ্ছে দেবেন।

বটুক বললে, মিস ঘোষ, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সরলাক্ষর অসাধ্য কিছু নেই, ঠিক ঝগড়া বাধিয়ে দেবে।

মাণ্ডবী মাথা নেড়ে বললে, উঁহু, অত সহজ ভাববেন না। খঞ্জনাকে আপনারা চেনেন না, ভীষণ বদমাশ মেয়ে, দারুণ ছিনে জোঁক, সহজে ছাড়বে না। আর বরুণ-দাও ভীষণ বোকা।

সরলাক্ষ প্রশ্ন করলে, বরুণ-দাকে আপনি কত দিন থেকে জানেন?

—সেই ছেলেবেলা থেকে। আমার বাবাই ওকে মানুষ করেছেন, চাকরিও জুটিয়ে দিয়েছেন।

সোনালাল আবার ঘরে এসে একটা কার্ড দিলে। সরলাক্ষ দেখে বললে, আরে স্বয়ং বরুণ বিশ্বাস দেখা করতে এসেছেন!

মাণ্ডবী চমকে উঠে বললে, সর্বনাশ, আমাকে তো দেখে ফেলবে! কি করি বলুন তো?

সরলাক্ষ বললে, কোনও চিন্তা নেই, আপনি ওই পিছনের ঘরে যান, মোটা পর্দা আছে, কিছু দেখা যাবে না। শ্রীবিশ্বাস চলে গেলে আপনি আবার এ ঘরে আসবেন।

মাণ্ডবী তাড়াতাড়ি পিছনের ঘরে গেল এবং পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে আড়ি পাততে লাগল।

বরুণ বিশ্বাস ঘরে ঢুকে বললেন, মিস্টার হোমের সঙ্গে আমার কথা আছে, অত্যন্ত প্রাইভেট।

সরলাক্ষ বললে, আমিই সরলাক্ষ হোম, ইনি আমার কোলীগ ডাক্তার বটুক সেন। এঁর সামনে আপনি স্বচ্ছন্দে সব কথা বলতে পারেন।

বরুণ তবু ইতস্তত করছে দেখে বটুক বললে, মিস্টার বিশ্বাস, আপনি সংকোচ করবেন না। শার্লক হোমসের জুড়িদার যেমন ডাক্তার ওআটসন, সরলাক্ষ হোমের তেমনি ডাক্তার বটুক সেন—এই আমি। তবে আমি ওআটসনের মতন হাঁদা নই। আপনিই বাঁদর দপ্তরের কর্তা তো?

বরুণ বললে, আমি হচ্ছি ডিরেক্টর অভ মংকি ডিপোর্টেশন। সরলাক্ষবাবু, আমি একটি অত্যন্ত ডেলিকেট ব্যাপারের জন্য আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছি।

সরলাক্ষ বললে, কিছু ভাববেন না, আপনি খোলসা করে সব কথা বলুন।

—শ্রীগদাধর ঘোষের নাম শুনেছেন তো? তাঁর মেয়ে মাণ্ডবীর সঙ্গে আমার বিবাহ বহু কাল থেকে স্থির হয়ে আছে।

—চমৎকার সম্বন্ধ, কংগ্রাট্স মিস্টার বিশ্বাস।

—কিন্তু আমি অন্য একটি মেয়েকে ভালবেসে ফেলেছি।

—বেশ তো, তাঁকেই বিবাহ করুন না।

—তাতে বিস্তর বাধা। শ্রীগদাধর আমার পিতৃবন্ধু, ছেলেবেলার অভিভাবক, এখনও মুরুব্বী। তিনিই আমার চাকরিটি করে দিয়েছেন, চটে গেলে তিনিই আমাকে তাড়াতে পারেন। অথচ তাঁর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হলে আমি বিস্তর সম্পত্তি পাব, চাকরিও বজায় থাকবে।

—তবে তাঁর মেয়েকেই বিয়ে করুন না।

—দেখুন, মাণ্ডবীকে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি, তাকে ছোট বোন মনে করতে পারি, কিন্তু তার সঙ্গে প্রেম হওয়া অসম্ভব।

—দেখতে বিশ্রী বুঝি?

—ঠিক বিশ্রী হয়তো নয়, কিন্তু আমার পছন্দর সঙ্গে একদম মেলে না। মোটা-সোটা গড়ন, ডলিপুতুলের মতন টেবো টেবো গাল। ফোর্থ ইয়ারে পড়ছে বটে, কিন্তু চালচলন সেকেলে, স্মার্ট নয়, ভুল ইংরিজী বলে। এখনও জরির ফিতে দিয়ে খোঁপা বাঁধে, এক গাদা গহনা পরে জুজুবুড়ী সাজে।

—যাঁকে ভালবেসে ফেলেছেন তিনি কেমন?

—খঞ্জনা? ওঃ, সুপর্ব্, চমৎকার। মেমের মতন ইংরিজী বলে, তার সঙ্গে মাণ্ড-বীর তুলনাই হয় না।

সরলাক্ষ বললে, দেখুন মিস্টার বরুণ বিশ্বাস, আপনার ইচ্ছেটা বুঝেছি। আপনি চাকরি বজায় রাখতে চান, গদাধরবাবুর সম্পত্তিও চান, অথচ তাঁর কন্যাকে চান না। এই তো?

বরুণ মাথা নীচু করে বললে, সমস্যাটা সেইরকমই দাঁড়িয়েছে বটে। কোন উপায় বলতে পারেন?

সরলাক্ষ বললে, একটা খুব সোজা উপায় বাতলাতে পারি। আপনি হিন্দু তো? এখনও বহু-বিবাহ-নিষেধের আইন পাস হয় নি। শ্রীগদাধরের কন্যাকে বিবাহ করে ফেলুন, যত পারেন সম্পত্তি আদায় করে নিন। ছ মাস পরে মিস খঞ্জনাকেও বিবাহ করবেন, তাঁকেই সুয়োরানীর পোস্ট দেবেন?

বরুণ বললে, আপনি গদাধর ঘোষকে জানেন না, ধড়িবাজ দুর্দান্ত লোক। সম্পত্তি যা দেবার তিনি মেয়েকেই দেবেন। খঞ্জনাকে বিয়ে করলে তৎক্ষণাৎ আমার চাকরিটি খাবেন আর মেয়েকে নিজের কাছে নিয়ে যাবেন।

বটুক সেন বললে, আমি একটি ডাক্তারী উপায় বলছি শুনুন। মিস মাণ্ডবীকে বিয়ে করে ফেলুন। আপনাকে দু পুরিয়া আর্সেনিক দেব, একটা শ্বশুরকে আর একটা শ্বশুর-কন্যাকে চায়ের সঙ্গে খাওয়াবেন। দুজনেই পঞ্চত্ব পেলে সম্পত্তি আপনার হাতে আসবে, চাকরিও থাকবে, তখন মিস খঞ্জনাকে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করবেন।

—বিষ দিতে বলছেন?

আর্সেনিকে আপত্তি থাকলে কলেরা জার্ম দিতে পারি, কাজ সমানই হবে।

বরুণ রেগে গিয়ে বললে, আপনাদের সঙ্গে ইয়ারকি দিতে এখানে আসি নি, আমার সময়ের মূল্য আছে।

সরলাক্ষ বললে, না না রাগ করবেন না, আপনার প্রবলেমটি বড় শক্ত কিনা তাই বটুক-দা একটু ঠাট্টা করেছেন। আমি বলি শুনুন—আপনার আকাঙ্ক্ষাটি বড্ড বেশী নয় কি? কিছু কমিয়ে ফেলুন, দুধও খাবেন তামাকও খাবেন তা তো হয় না।

—আচ্ছা, সম্পত্তির আশা না হয় ছেড়ে দিচ্ছি। আপনি এমন উপায় বলতে পারেন যাতে মাণ্ডবীর সঙ্গে আমার বিয়ে ভেস্তে যায় অথচ চাকরির ক্ষতি না হয়, অর্থাৎ গদাধর ঘোষ রাগ না করেন?

—আমাকে একটু সময় দিন, ভেবে চিন্তে উপায় বার করতে হবে। আপনি সাত দিন পরে আসবেন। ফী জানতে চান? আজ ষোল টাকা দিন, তার পর কাজ উদ্ধার হলে তার গুরুত্ব বুঝে আরও টাকা দেবেন।

বরুণ টাকা দিয়ে চলে গেল।

মাণ্ডবী পর্দা ঠেলে ঘরে এল। তার গা কাঁপছে, মুখ লাল, চোখ ফুলো ফুলো, দেখেই বোঝা যায় যে জোর করে কান্না চেপে রেখেছে।

বটুক সেন বললে, একি মিস ঘোষ, আপনি বড্ড আপসেট হয়ে পড়েছেন দেখছি। স্থির হয়ে বসুন, দু মিনিটের মধ্যে একটা ওষুধ নিয়ে আসছি।

মাণ্ডবী বললে, ওষুধ চাই না, একটু জল।

সরলাক্ষ তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল এনে দিলে। মাণ্ডবী চোখে মুখে জল দিয়ে ভাঙা গলায় বললে, সরলাক্ষবাবু, আর কিছু করবার দরকার নেই, বরুণদাকে আমি বিয়ে করব না।

সরলাক্ষ বললে, না না, ঝোঁকের মাথায় কোনও প্রতিজ্ঞা করবেন না। আপনার বাবা খুব খাঁটী কথা বলেছেন, বিয়ে হয়ে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি—খঞ্জনার খপ্পর থেকে আপনার বরুণ-দাকে উদ্ধার করবই। যদি তিনি অনুতপ্ত হয়ে আপনার কাছে ক্ষমা চান তবে তাঁকে বিয়ে করবেন না কেন?

সজোরে মাথা নেড়ে মাণ্ডবী বললে, না না না। আমি মুটকী ধুমসী, আমি সেকালে মুখখু জুজুবুড়ী, আর খঞ্জনা হচ্ছে বিদ্যাধরী—

—ও, আপনি বুঝি আড়ি পাতছিলেন। ভেরি ব্যাড। ওসব কথায় কান দেবেন না, বাঁদরের কর্তা হয়ে আপনার বরুণদা বাঁদুরে বুদ্ধি পেয়েছেন, খঞ্জনার মোহে পড়ে যা তা বলছেন। মোহ কেটে গেলেই আপনার কদর তিনি বুঝবেন। আপনি হচ্ছেন সেই কালিদাস যা বলেছেন—পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা, আপনি হচ্ছেন—শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা—

—চুপ করুন, অসভ্যতা করবেন না। এই নিন আপনার ষোল টাকা, আমি চললুম।

সরলাক্ষ হাতজোড় করে বললেন, মাণ্ডবী দেবী, মন শান্ত করুন, ধৈর্য ধরুন। যত শীঘ্র পারি খঞ্জনাকে তাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করব, দোহাই আপনার, তত দিন কিছু করে বসবেন না।

মাণ্ডবী নমস্কার করে চলে গেল। বটুক বললে, নাও, ঠেলা সামলাও এখন।

সবাই দেখছি ভীষণ, খঞ্জনা ভীষণ বদমাশ, বরুণ-দা ভীষণ বোকা আর মান্ডবী ভীষণ ছেলেমানুষ। পাত্রী একদিকে যাচ্ছেন, পাত্র আর একদিকে যাচ্ছেন, কার মন রাখবে? আবার পাত্রীর বাপ আসছেন, তিনি কি চান কে জানে।

সন্ধ্যা সাতটায় শ্রীগদাধর ঘোষ প্রকান্ড মোটরে চড়ে উপস্থিত হলেন। সরলাক্ষ খুব খাতির করে তাঁকে নিজের খাস কামরায় নিয়ে গিয়ে বসালে এবং বটুকের পরিচয় দিলে।

পকেট থেকে বিজ্ঞাপনটা বার করে শ্রীগদাধর একটু হেসে বললেন, খাসা ব্যবসা খুলেছেন সরলাক্ষবাবু। ডেলিকেট ব্যাপারে মতলব দিতে পারে এমন একজন তুখড় চৌকশ লোকের বড়ই অভাব ছিল। আপনি বিজ্ঞাপনে ঠিকই লিখেছেন, ডাক্তার উকিল পুলিশ জ্যোতিষী গুরু—এদের কি সব কথা বলা চলে, নাকি এরা সব সমস্যার সমাধান করতে পারে? আপনার তো বয়স বেশী নয়, ব্যবসাটি শিখলেন কোথায়? ডিগ্রী কিছু আছে?

সরলাক্ষ বললে, আমি হচ্ছি সাউথ আমেরিকার মায়া-আজটেক-ইংকা ইউনিভার্সিটির পিএচ. ডি., আমার রিসার্চের জন্য সেখানকার অনারারী ডিগ্রী পেয়েছি। বাগবাজার বিবুধ সভাও আমাকে বুদ্ধিবারিধি উপাধি দিয়েছেন।

—বেশ বেশ। এখন আমার মুশকিলটা শুনুন।

শ্রীগদাধর তাঁর মুশকিলটা সবিস্তারে বিবৃত করে অবশেষে বললেন, আপনি ওই খঞ্জনা মাগীর কবল থেকে বরুণকে চটপট উম্ধার করে দিন, আমার মেয়েটা বড়ই মনমরা হয়ে আছে।

সরলাক্ষ বললে, আপনার তো শুনেছি খুব প্রতিপত্তি, মন্ত্রীরা আপনার কথায় ওঠেন বসেন। আপনি মনে করলেই খঞ্জনাকে আন্ডামানে বদলী করতে পারেন।

—সেটি হবার জো নেই। খঞ্জনা হচ্ছে চতুর্ভুজ খাবলদারের তৃতীয় পক্ষের শালী। চতুর্ভুজকে চটানো আমার পলিসি নয়, আমার ছেলে দিল্লিতে তারই কম্পানিতে কাজ করে।

—বরুণকে দূরে বদলী করিয়ে দিন।

—সে কথা আমি যে ভাবি নি এমন নয়। কিন্তু বিচ্ছেদের ফলে প্রেম যে আরও চাগিয়ে উঠবে, চিঠিতে লম্বা লম্বা প্রেমালাপ চলবে, তার কি করবেন?

—তারও উপায় আছে। অন্য কারও সঙ্গে চটপট খঞ্জনার বিয়ে দিতে হবে।

—খেপেছেন? খঞ্জনা আমাদের ফরমাশ মত বিয়ে করবে কেন?

—জুতসই পাত্র পেলেই করবে। শুনুন সার—বরুণকে দূরে বদলী করান, তার জায়গায় এমন একজন বাহাল করুন যে খঞ্জনাকে বিয়ে করতে রাজী আছে।

—কোথায় পাব তেমন লোক?

বটুককে ঠেলা দিয়ে সরলাক্ষ বললে, কি বল বটুক-দা?

বটুক প্রশ্ন করলে, মাইনে কত?

শ্রীগদাধর বললেন, তা ভালই, আড়াই হাজার।

সরলাক্ষ বললে, রাজী আছ বটুক-দা? এমন চাকরি পেলে খঞ্জনাকে আত্মসাৎ করতে পারবে না?

—খুব পারব, খঞ্জনা গঞ্জনা ঝঞ্জনা কিছুতেই আমার আপত্তি নেই।

শ্রীগদাধর বললেন, বরুণকে ছেড়ে খঞ্জনা তোমাকে বিয়ে করতে চাইবে কেন? চাকরির বদল যত সহজে হয় প্রেমের বদল তত সহজে হয় না।

বটুক বললে, সেজন্য আপনি ভাববেন না সার, আমি খঞ্জনাকে ঠিক পটিয়ে নেব।

—কিন্তু জন্তুর সায়েন্স না জানলে তো বানর-নির্বাসন-অধিকর্তা হতে পারবে না। তুমি তো নাড়ী-টেপা ডাক্তার?

সরলাক্ষ বললে, শুনুন সার। এমন বিদ্যে নেই যা ডাক্তাররা শেখে না, ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বটানি জোঅলজি আরও কত কি। নয় বটুক-দা?

বটুক বললে, নিশ্চয়। জোঅলজি, বিশেষ করে মংকিলজি, আমার খুব ভাল রকম জানা আছে।

গদাধর একটু ভেবে বললেন, বেশ, কালই আমি মিনিস্টার ইন চার্জকে বলব। কিন্তু প্রথমটা টেম্পোরারি হবে, যদি দুমাসের মধ্যে খঞ্জনাকে বিয়ে করতে পার তবেই চাকরি পাকা হবে, নয়তো ডিসমিস।

বটুক বলে, দু মাস লাগবে না, এক মাসের মধ্যেই আমি তাকে বাগিয়ে নেব।

গদাধর বললে, বেশ। বড় আনন্দ হল তোমাদের সঙ্গে আলাপ করে। কাল আমাকে একবার দিল্লি যেতে হবে, গিন্নীকে ছেলের কাছে রেখে আসব, পাঁচ দিন পরে ফিরব। তার পরের রবিবারে বিকেল চারটার সময় তোমরা আমার বাড়িতে চা খাবে, কেমন? আমার মেয়ে মাণ্ডবীর সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দেব।

সরলাক্ষ আর বটুক সবিনয়ে বললে, যে আজ্ঞে!

শ্রীগদাধরের সুপারিশের ফলে তিন দিনের মধ্যে বরুণের জায়গায় বটুক সেন বাহাল হল এবং বরুণ দহরমগঞ্জে বদলী হয়ে গেল। তার নতুন পদের নাম—কুক্কুটাণ্ড-বিবর্ধন-পরীক্ষা-সংস্থা-আযুক্তক, অর্থাৎ অফিসার ইন চার্জ হেন্‌স এগ এনলার্জমেণ্ট এক্সপেরিমেণ্টাল স্টেশন।

নির্দিষ্ট দিনে সরলাক্ষ আর বটুক গদাধরবাবুর বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেল। গদাধর বললেন, এই যে, এস এস। ওরে মাণ্ডবী, এদিকে আয়। এই ইনি হচ্ছেন শ্রীসরলাক্ষ হোম, মুশকিল আসান এক্সপার্ট। আর ইনি ডাক্তার বটুক সেন, আমাদের নতুন বানর-নির্বাসন-অধিকর্তা। খাসা লোক এঁরা।

নমস্কার বিনিময়ের পর বটুক বললে, সার, একটি অপরাধ হয়ে গেছে, আপনাকে আগে খবর দেওয়া উচিত ছিল, বড্ড তাড়াতাড়ি হল কিনা তাই পারি নি, মাপ করবেন। শ্রীমতী খঞ্জনার সঙ্গে কাল আমার শুভ পরিণয় হয়ে গেছে।

বটুকের পিঠ চাপড়ে, শ্রীগদাধর বললেন, জিতা রহো, বাহবা, বাহবা, বলিহারি. শাবাশ! আমরা ভারী খুশী হলুম শুনে, কি বলিস মাণ্ডবী? খেতে শুরু কর তোমরা. আমি চট করে গিন্নীকে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিয়ে আসছি।

মাণ্ডবী বটুককে বললে, ধন্য রুচি আপনার, বাবার কাছে ঘুষ খেয়ে সেই শূর্পনখাটাকে বিয়ে করে ফেললেন! খঞ্জনাই বা কি রকম মেয়ে, দু দিনের মধ্যে বরুণ-দাকে ভুলে গিয়ে আপনার গলায় মালা দিলে?

সরলাক্ষ বললে, তিনি অতি সুবুদ্ধি মহিলা, বরুণ-দার চাকরিটি মারেন নি, বটুক-দার চাকরি পাকা করে দিয়েছে, আমারও মুখরক্ষা করেছেন।

মাণ্ডবী বললে, আপনার আবার কি করলেন?

—আপনাকে কথা দিয়েছিলুম দুজনের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া বাধিয়ে দেব, মনে নেই? আপনি শুনে খুশী হবেন খঞ্জনা বউ-দি মিস্টার বরুণকে ভীষণ গালাগালি দিয়ে একটি চিঠি লিখেছেন, আমিই সেটা ড্রাফ্ট করে দিয়েছি। এখন আপনার লাইন ক্লিয়ার। যদি বরুণ-দাকে আপনি একটি মোলায়েম চিঠি লেখেন তবে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার ফী-এর বাকী টাকাটা আপনাকে আর দিতে হবে না, আপনার বাবাই তা শোধ করবেন।

—উঃ, আপনাদের কি কোনও প্রিনসিপ্‌ল নেই, সেন্টিমেন্ট নেই, হৃদয় নেই, শোভন অশোভন জ্ঞান নেই? কি ভীষণ মানুষ আপনারা! মাপ করবেন, আপনাদের কাণ্ড দেখে হতভম্ব হয়ে যা তা বলে ফেলেছি।

গদাধরবাবু তার পাঠিয়ে ফিরে এলেন। অনেকক্ষণ নানা রকম আলাপ চলল, তার পর সরলাক্ষ আর বটুক চলে গেল।

পরদিন বরুণের কাছ থেকে মাণ্ডবী একটা আট পাতা চিঠি পেলে।

এখানেই থামা যেতে পারে, কারণ এর পরে যা হল তা আপনারা নিশ্চয় আন্দাজ করতে পেরেছেন। কিন্তু এমন পাঠক অনেক আছেন যাঁরা নায়ক নায়িকার একটা হেস্তনেস্ত না দেখলে নিশ্চিত হতে পারেন না। তাঁদের অবগতির জন্য বাকীটা বলতে হল।

সন্ধ্যার সময় শ্রীগদাধর সরলাক্ষর কাছে এলেন। সে একাই আছে, বটুক সস্ত্রীক সিনেমায় গেছে। গদাধর বললেন, ওহে সরলাক্ষ, এ তো মহা মুশকিলে পড়া গেল! মাণ্ডবীকে বরুণ মস্ত একটা চিঠি লিখেছে, বেশ ভাল চিঠি, খুব অনুতাপ জানিয়ে অনেক কাকুতি মিনতি করে ক্ষমা চেয়েছে। আমিও অনেক বোঝালুম, কিন্তু মাণ্ডবী গোঁ ধরে বসে আছে,—বাঙালে গোঁ, তার মায়ের কাছ থেকে পেয়েছে। চিঠিখানা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, ছুঁচোকে আমি বিয়ে করতে পারব না। বাবা সরলাক্ষ, তুমি কালই তার সঙ্গে দেখা করে বুঝিয়ে ব'লো। বরুণের মতন পাত্র লাখে একটা মেলে না। তোমার অসাধ্য কাজ নেই, মাণ্ডবীকে রাজী করাতে যদি পার তো তোমাকে খুশী করে দেব।

সরলাক্ষ বললে, যে আজ্ঞে, আমি তার সঙ্গে দেখা করে সাধ্য মত চেষ্টা করব।

পরদিন শ্রীগদাধর সরলাক্ষকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল হে, রাজী করাতে পারলে?

—উঁহু, বরুণের ওপর ভীষণ চটে গেছেন, শুধু ছুঁচো নয়, মীন মাইণ্ডেড মংকিও বলেছেন। আমার মতে চটপট তাঁর অন্যত্র বিবাহ হওয়া দরকার, নয়তো মনের শান্তি ফিরে পাবেন না। দারুণ একটা শক পেয়েছেন কিনা। তাঁর হৃদয়ে যে ভ্যাকুয়ম হয়েছে সেটা ভরতি করাতে হবে।

—কিন্তু এত তাড়াতাড়ি অন্য লোককে বিয়ে করতে রাজী হবে কেন? ভাল পাত্রই বা পাই কোথা?

—যদি অভয় দেন তো নিবেদন করি। অনুমতি পেলে নিজের জন্যে একটু চেষ্টা করে দেখতে পারি।

—তুমি! তোমাকে বিয়ে করতে চাইবে কেন? ধর মাণ্ডবী রাজী হল, কিন্তু

আমার হোমরা চোমরা আত্মীয় স্বজনের কাছে জামাইএর পরিচয় কি দেব? মুশকিল আসান অধিকর্তা বললে তো চলবে না, লোকে হাসবে।

—আপনার কৃপা হলেই আমি একটা বড় পোস্ট পেয়ে যেতে পারি, আপনার জামাইএর উপযুক্ত।

কোন্ কাজ পারবে তুমি?

সরকার তো হরেক রকম পরিকল্পনা করছেন, মাটির তলায় রেল, শহরের চারদিক ঘিরে চক্রবেড়ে রেল, সমুদ্র থেকে মাছ, ড্রেনের ময়লা থেকে গ্যাস, আরও কত কি। আমিও ভাল স্কীম বাতলাতে পারি।

—বল না একটা।

—এই ধরুন, উপকণ্ঠ-গির্যাশ্রম।

—সে আবার কি, গির্জে বানাতে চাও নাকি?

—আজ্ঞে না। গিরি-আশ্রম হল গির্যাশ্রম, উপকণ্ঠ-গির্যাশ্রম মানে সাবর্বান হিল স্টেশন। সহজেই হতে পারবে। কলকাতার কাছে লম্বা চওড়ায় এক শ মাইল একটা জমি চাই, তাতে প্রকাণ্ড একটা লেক কাটা হবে, তার মাটি স্তূপাকার করে লেকের মধ্যিখানে দশ-বারো হাজার ফুট উঁচু একটা পিরামিড বা কৃত্রিম পাহাড় তৈরি হবে। দার্জিলিং যাবার দরকার হবে না, পাহাড়ের গায়ে আর মাথায় একটি চমৎকার শহর গড়ে উঠবে, বিস্তর সেলামী দিয়ে লোকে জমি লীজ নেবে। আঙুর আপেল পীচ আখরোট বাদাম কমলালেবু ফলবে, নীচের লেকে অজস্র মাছ জন্মাবে। পাহাড়ের মাথা থেকে বিনা পয়সায় বরফ পাবেন, ঢালু গা দিয়ে আপনিই হড়াক করে নেমে আসবে—

—চমৎকার, চমৎকার, আর বলতে হবে না। কালই আমি মিনিস্টার ইন চার্জ অভ ল্যান্ড আপ্‌লিফ্‌টের সঙ্গে কথা বলব। কিন্তু তোমার পোস্টের নামটা কি হবে?

—পরিকল্পন-মহোপদেষ্টা, অর্থাৎ অ্যাডভাইজার-জেনারেল অভ স্কীম্‌স। সাড়ে তিন হাজার টাকা মাইনে দিলেই চলবে।

—নিশ্চিন্ত থাক বাবাজী, চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই আমি সব পাকা করে ফেলব। তুমি দেরি ক'রো না, লেগে যাও, এখন থেকেই মাণ্ডবীকে বাগাবার চেষ্টা কর।

মাণ্ডবী অতি লক্ষ্মী মেয়ে, আর সরলাক্ষর প্রেমের প্যাঁচ অর্থাৎ টেকনিকও খুব উঁচুদরের। পাঁচ দিনের মধ্যেই সে মাণ্ডবীকে বাগিয়ে ফেললে।

কিন্তু বরুণ বিশ্বাসের কি হল? তার কথা আর জিজ্ঞাসা করবেন না। তাকে বিয়ে করবার জন্যে একটা মাদ্রাজী, দুটো পঞ্জাবী আর তিনটে ফিরিঙ্গী মেয়ে ছেঁকে ধরেছে, তা ছাড়া ওখানকার জজ-গিন্নী, ডেপুটি-গিন্নী আর উকিল-গিন্নীও নিজের নিজের আইবড় মেয়েদের বরুণের পিছনে লেলিয়ে দিয়েছেন। বেচারা কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।

১৩৬০ (১৯৫৩)

আতার পায়েস

চুরির জন্যই যে চুরি তাতে একটা অনির্বচনীয় আনন্দ পাওয়া যায়। দেশের কাজে চুরি, সরকারী কনট্রাক্টে চুরি, তহবিল তসরুফ, পকেট মারা, ইত্যাদির উদ্দেশ্য যতই মহৎ হক, তাতে আনন্দ নেই, শুধু স্থূল স্বার্থসিদ্ধি। গীতায় যাকে কাম্যকর্ম বলা হয়েছে, এসব চুরি তারই অন্তর্গত। কিন্তু যে চুরি অহেতুক, যা শুধু অকারণ পুলকে করা হয়, তা নিষ্কাম ও সাত্ত্বিক, অনাবিল আনন্দ তাতেই মেলে। যশোদাদুলাল শ্রীকৃষ্ণ ভালই খেতেন, কার্বোহাইড্রেট প্রোটীন ফ্যাট কিছুরই তাঁর অভাব ছিল না, তথাপি তিনি ননি চুরি করতেন। তাঁর কটিতটের রঙিন ধটী যথেষ্ট ছিল, বস্ত্রাভাব কখনও হয় নি, তথাপি তিনি বস্ত্রহরণ করেছিলেন। এই হল নিষ্কাম সাত্ত্বিক চুরির ভগবৎপ্রদর্শিত নিদর্শন। রামগোপাল হাইস্কুলের মাস্টার প্রবোধ ভটচাজ একবার এইরকম চুরিতে জড়িয়ে পড়েছিল।

প্রবোধ মাস্টারের বয়স ত্রিশ, আমুদে লোক, ছাত্ররা তাকে খুব ভালবাসে। পুজোর বন্ধর দিন কতক আগে পাঁচটি ছেলে তার কাছে এল। তাদের মুখপাত্র সুধীর বললে, সার, মহা মুশকিলে পড়েছি।

প্রবোধ জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপারটা কি?

—গেল বছর আমার বড়-দার বিয়ে হয়ে গেল জানেন তো? তার শ্বশুর ভৈরববাবু খুব বড়লোক, দেওঘরের কাছে গণেশমুণ্ডায় তাঁর একটি চমৎকার বাড়ি আছে। বউ-দি বলেছে, সে বাড়ি এখন খালি, পুজোর ছুটিতে আমরা জনকতক স্বচ্ছন্দে কিছুদিন সেখানে কাটিয়ে আসতে পারি।

—এ তো ভাল খবর, মুশকিল কি হল?

—ভৈরববাবু বলেছেন, আমাদের সঙ্গে যদি একজন অভিভাবক যান তবেই আমাদের সেখানে থাকতে দেবেন।

—তোমার বড়-দা আর বউ-দিকে নিয়ে যাও না।

—তা হবার জো নেই, ওরা মাইসোর যাচ্ছে। আপনিই আমাদের সঙ্গে চলুন সার। ক্লাস টেনের আমি, ক্লাস নাইনের নিমাই নরেন সুরেন আর ক্লাস এইটের পিণ্টু আমরা এই পাঁচ জন যাব, আপনার কোন অসুবিধে হবে না।

—সঙ্গে চাকর যাবে তো?

—কোনও দরকার নেই। সেখানে দরোয়ান আর মালী আছে, তারাই সব কাজ করে দেবে। খাবার জন্যে ভাববেন না সার। আমরা সঙ্গে স্টোভ নেব, কারি পাউডার নেব, চা চিনি গুঁড়ো দুধ আর বিস্কুটও দেদার নেব। ওখানে সস্তায় মুরগি পাওয়া যায়, বউ-দি কারি রান্না শিখিয়ে দিয়েছে। ওখানকার দরোয়ান পাঁড়েজী ভাত রুটি যা হয় বানিয়ে দেবে, আমরা নিজেরা দু বেলা ফাউল কারি রাঁধব। তাতেই হবে না?

প্রবোধ বললে, সব তো বুঝলুম, কিন্তু আমাকে নিয়ে যেতে চাও কেন? মাস্টার সঙ্গে থাকলে তোমাদের ফুর্তির ব্যাঘাত হবে না?

সজোরে মাথা নেড়ে সুধীর বললে, মোটেই একদম একটুও কিছু ব্যাঘাত হবে না, আপনি সে রকম মানুষই নন সার। আপনি সঙ্গে থাকলে আমাদের তিন ডবল ফুর্তি হবে।

নিমাই নরেন সুরেন সমস্বরে বললে, নিশ্চয় নিশ্চয়।

পিন্টু বললে, সার, কোনান ডয়েলের সেই লস্ট ওঅর্লর্ড গল্পটা ওখানে গিয়ে বলতে হবে কিন্তু।

প্রবোধ যেতে রাজী হল।

দেওঘর আর জসিডির মাঝামাঝি গণেশমুণ্ডা পল্লীটি সম্প্রতি গড়ে উঠেছে। বিস্তর সুদৃশ্য বাড়ি, পরিচ্ছন্ন রাস্তা, প্রাকৃতিক দৃশ্যও ভাল। ভৈরববাবুর অট্টালিকা ভৈরব কুটীর আর তার প্রকাণ্ড বাগান দেখে ছেলেরা আনন্দে উৎফুল্ল হল এবং ঘুরে ঘুরে চার দিক দেখতে লাগল। বাগানে অনেক রকম ফলের গাছ। গোটা কতক আতা গাছে বড় বড় ফল ধরেছে, অনেকগুলো একেবারে তৈরি, পেড়ে খেলেই হয়।

প্রবোধ বললে, ভারী আশ্চর্য তো, ভৈরববাবুর দরোয়ান আর মালী দেখছি অতি সাধু পুরুষ।

সুধীর বললে, মনেও ভাববেন না তা, আমি এখানে এসেই সব খবর নিয়েছি সার। দরোয়ান মেহী পাঁড়ে আর মালী ছেদী মাহাতো এদের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া। দুজনে দুজনের ওপর কড়া নজর রাখে তাই এ পর্যন্ত কেউ চুরি করবার সুবিধে পায় নি।

প্রবোধ বললে, আত্মকলহের ফলই এই। পাঁড়ে আর মাহাতো যদি একমত হত তবে স্বচ্ছন্দে আতা বেচে দিয়ে লাভটা ভাগাভাগি করে নিতে পারত।

নিমাই বললে, আচ্ছা সার, আমাদের দেশনেতাদের মধ্যে তো ভীষণ ঝগড়া তবুও চুরি হচ্ছে কেন?

সুধীর বললে, যা যাঃ, জেঠামি করিস নি। আগে বড় হ, তার পর পলিটিক্স বুঝবি।

নিমাই বললে, যদি দু-তিন সের দুধ যোগাড় করা যায় তবে চমৎকার আতার পায়েস হতে পারবে। আমি তৈরি করা দেখেছি, খুব সহজ।

সুধীর বললে, বেশ তো, তুই তৈরি করে দিস। ও পাঁড়েজী, তুমি কাল সকালে তিন সের খাঁটী দুধ আনতে পারবে?

পাঁড়ে বললে, জরুর পারব হুজুর।

নাওয়া খাওয়া আর বিশ্রাম চুকে গেল। বিকেল বেলা সকলে বেড়াতে বেরুল। ঘণ্টা খানিক বেড়াবার পর ফেরবার পথে সুধীর বললে, দেখুন সার, এই বাড়িটি কি সুন্দর, ভীমসেন ভিলা। গেটের ওপর কি চমৎকার থোকা থোকা হলদে ফুল ফুটেছে!

আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে পিন্টু চেঁচিয়ে উঠল—ওই ওই একটা নীলকণ্ঠ পাখি উড়ে গেল।

নিমাই বললে, এদিকে দেখুন সার, উঃ কি ভয়ানক পেয়ারা ফলেছে, কাশীর পেয়ারার চাইতে বড় বড়। নিশ্চয় এ বাড়িরও দরোয়ান আর মালীর মধ্যে ঝগড়া আছে তাই চুরি যায় নি।

ফটকে তালা নেই। সুধীর ভিতরে ঢুকে এদিক ওদিক উঁকি মেরে বললে, কাকেও

তো কোথাও দেখছি না, কিন্তু ঘরের জানালা খোলা, মশারি টাঙানো রয়েছে। বোধ হয় সবাই বেড়াতে গেছে। দরোয়ান, ও দরোয়ানজী, ও মালী!

কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। তখন সকলে ভিতরে এসে ফটকের পাল্লা ভেজিয়ে দিল।

নিমাই বললে, একটা পেয়ারা পাড়ব সার?

প্রবোধ বললে, বাজারে প্রচুর পেয়ারা দেখেছি, নিশ্চয় খুব সস্তা, খেতে চাও তো কিনে খেয়ো। বিনা অনুমতিতে পরের দ্রব্য নিলে চুরি করা হয় তা জান না?

—জানি সার। চুরি করব না, শুধু একটা চেখে দেখব কাশীর পেয়ারার চাইতে ভাল কি মন্দ।

প্রবোধ পিছন ফিরে গম্ভীর ভাবে একটা তালগাছের মাথা নিরীক্ষণ করতে লাগল। মৌনং সম্মতিলক্ষণম্ ধরে নিমাই গাছে উঠল। পেয়ারা পেড়ে কামড় দিয়ে বললে, বোম্বাই আমের চাইতে মিষ্টি!

সুধীর বললে, এই নিমে, সারকে একটা দে।

নিমাই একটা বড় পেয়ারা নিয়ে হাত ঝুলিয়ে বললে, এইটে ধরুন সার, একটু চেখে দেখুন, চমৎকার।

পেয়ারায় কামড় দিয়ে প্রবোধ বললে, সত্যিই খুব ভাল পেয়ারা। আর বেশী পেড়ো না, তা হলে ভারী অন্যায় হবে কিন্তু। লোভ সংবরণ করতে শেখ।

ততক্ষণ নিমাই-এর সব পকেট বোঝাই হয়ে গেছে, তার সঙ্গীরাও প্রত্যেকে দু-তিনটে করে পেয়েছে। সুধীর বললে, এই নিমে, শুনতে পাচ্ছিস না বুঝি? সার রাগ করছেন, নেমে আয় চট করে, এক্ষুনি হয়তো কেউ এসে পড়বে।

হঠাৎ ক্যাঁচ করে গেটটা খুলে গেল, একজন মোটা বৃদ্ধ ভদ্রলোক আর একটি রোগা মহিলা প্রবেশ করলেন। দুজনের হাতে গামছায় বাঁধা বড় বড় দুটি পোঁটলা। নিমাই গাছের ডাল ধরে ঝুলে ধুপ করে নেমে পড়ল।

বৃদ্ধ চেঁচিয়ে বললেন, অ্যাঁ, এসব কি, দল বেঁধে আমার বাড়ি ডাকাতি করতে এসেছ! ভদ্রলোকের ছেলের এই কাজ? ঝব্বু সিং, এই ঝব্বু সিং—বেটা গেল কোথায়!

পোঁটলা দুটি নিয়ে মহিলা বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন। ঝব্বু সিং এক লোটা বৈকালিক ভাঙ খেয়ে তার ঘরে ঘুমুচ্ছিল, এখন মনিবের চিৎকারে উঠে পড়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বেরিয়ে এল। সে হুঁশিয়ার লোক, গেটে তাড়াতাড়ি তালা বন্ধ করে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বললে, হুজুর, হুকুম দেন তো থানে মে খবর দিয়ে আসি। হো বৈজনাথজী, ছিয়া ছিয়া, ভদ্দর আদমীর ছেলিয়ার এহি কাম!

হুজুর বললেন, খুব হয়েছে, ডাকাতরা চোখের সামনে সব লুটে নিলে আর তুমি বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছিলে! তার পর, মশায়দের কোত্থেকে আগমন হল? এরা তো দেখছি ছোকরা, বজ্জাতি করবারই বয়েস; কিন্তু তুমি তো বাপু খোকা নও, তুমিই বুঝি দলের সর্দার?

প্রবোধ হাত জোড় করে বললে, মহা অপরাধ হয়ে গেছে সার। এই নিমাই, সব পেয়ারা দরয়োনজীর জিম্মা করে দাও। আমরা বেশী খাই নি সার, মাত্র দু-তিনটে চেখে দেখেছি। অতি উৎকৃষ্ট পেয়ারা।

—কৃতার্থ হলুম শুনে। এরা বোধ হয় স্কুলের ছেলে। তোমার কি করা হয়? নাম কি?

—আজ্ঞে, আমার নাম প্রবোধচন্দ্র ভট্টাচার্য, মানিকতলার রামগোপাল হাই স্কুলের মাস্টার। এরা সব আমার ছাত্র, পুজোর ছুটিতে আমার সঙ্গে বেড়াতে এসেছে।

—খাসা অভিভাবকটি পেয়েছে, খুব নীতিশিক্ষা হচ্ছে! আমাকে চেন? ভীমচন্দ্র সেন, রিটায়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। রায়বাহাদুর খেতাবও আছে, কিন্তু এই স্বাধীন ভারতে সেটার আর কদর নেই। বিস্তর চোরকে আমি জেলে পাঠিয়েছি। তোমার স্কুলের সেক্রেটারিকে যদি লিখি—আপনাদের প্রবোধ মাস্টার এখানে এসে তার ছাত্রদের চুরিবিদ্যে শেখাচ্ছে, তা হলে কেমন হয়?

—যদি কর্তব্য মনে করেন তবে আপনি তাই লিখুন সার, আমি আমার কৃতকর্মের ফল ভোগ করব। তবে একটা কথা নিবেদন করছি। কেউ অভাবে পড়ে চুরি করে, কেউ বিলাসিতার লোভে করে, কেউ বড়লোক হবার জন্যে করে। কিন্তু কেউ কেউ, বিশেষত যাদের বয়েস কম, নিছক ফুর্তির জন্যেই করে। আমি অবশ্য ছেলেমানুষ নই, কিন্তু এই ছেলেদের সঙ্গে মিশে, এই শরৎ ঋতুর প্রভাবে, আর আপনার এই সুন্দর বাগানটির শোভায় মুগ্ধ হয়ে আমারও একটু বালকত্ব এসে পড়েছে। এই যে পেয়ারা চুরি দেখছেন এ ঠিক মামুলী কুকর্ম নয়, এ হচ্ছে শুধু নবীন প্রাণরসের একটু উচ্ছলতা।

—হুঁ। ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা, পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা। রবি ঠাকুর তোমাদের মাথা খেয়েছেন। বিয়ে করেছ?

—করেছি সার।

—তবে পুজোর ছুটিতে বউকে ফেলে এখানে এসেছ কি করতে? বনে না বুঝি?

—আজ্ঞে, খুবই বনে। কিন্তু তিনি তাঁর বড়লোক দিদি আর জামাইবাবুর সঙ্গে শিলং গেলেন, আমি এই ছেলেদের আবদার ঠেলতে পারলুম না তাই এখানে এসেছি! সার, যে কুকর্ম করে ফেলেছি তার বিচার একটু উদার ভাবে করুন। আপনি ধীর স্থির প্রবীণ বিচক্ষণ ব্যক্তি, ছেলেমানুষী ফুর্তির বহু ঊর্ধ্বে উঠে গেছেন—

—কে বললে ঊর্ধ্বে উঠে গেছি? আমাকে জরদ্‌গব গিধড় ঠাউরেছ নাকি?

—তাহলে আশা করতে পারি কি যে আমাদের ক্ষমা করলেন? আমরা যেতে পারি কি?

—পেয়ারাগুলো নিয়ে যাও, চোরাই মাল আমি স্পর্শ করি না। আচ্ছা, এখন যেতে পার, এবারকার মতন মাপ করা গেল।

এমন সময় মহিলাটি বাইরে এসে বললেন, কি বেআক্কেল মানুষ তুমি. এরা তোমার এজলাসের আসামী নাকি? তুমি এদের মাপ করবার কে? তোমাকে মাপ করবে কে শুনি? এখন যেয়ো না বাবারা, এই বারান্দায় এসে একটু ব'স।

ভীমবাবু বললেন, এদের খাওয়াবে নাকি? তোমার ভাঁড়ার তো ঢু ঢু, চা পর্যন্ত ফুরিয়ে গেছে, হরি সরকার বাজার থেকে ফিরলে তবে হাঁড়ি চড়বে।

—সে তোমাকে ভাবতে হবে না, যা আছে তাই দেব। মিনিট দশ সবুর করতে হবে বাবারা।

গৃহিণী ভিতরে গেলে ভীমবাবু বললেন, উনি ভীষণ চটে গেছেন, না খাইয়ে ছাড়বেন না, অগত্যা ততক্ষণ এই এজলাসেই তোমরা আটক থাক। এখানে উঠেছ কোথায়?

প্রবোধ বললে, ভৈরব কুটীরে, স্টেশনের দিকে যে রাস্তা গেছে তারই ওপর।

ভীমবাবু বললেন, কি সর্বনাশ। যার ফটকের পাশে বেগনী বুগনভিলিয়ার ঝাড় আছে সেই বাড়ি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বাড়িটার কোন দোষ আছে?

—নাঃ, দোষ তেমন কিছু নেই। তোমরা ওখানে উঠেছ তা ভাবি নি।

নিমাই বললে, ভুতে পাওয়া বাড়ি নাকি?

—ভূত কোন্ বাড়িতে নেই? এ বাড়িতেও আছে। ও পাড়াটায় বড্ড চোরের উপদ্রব, এ পাড়ার চাইতে বেশী।

একটু পরে ভীমবাবুর পত্নী একটা বড় ট্রেতে বসিয়ে একটি ধূমায়মান গামলা এবং গোটাকতক বাটি আর চামচ নিয়ে এলেন। ভীমবাবু একটা টেবিল এগিয়ে দিয়ে বললেন, এ কি এনেছ, আতার পায়েস যে! এর মধ্যেই তৈরি করে ফেললে?

গৃহিণী বললেন, আর তো কিছু নেই, এই দিয়েই একটু মিষ্টিমুখ করুক।

ভীমবাবু বললেন, সবটাই এনেছ নাকি?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তুমি আর লোভ ক'রো না বাপু। ছেলেরা যে পেয়ারা পেড়েছে তাই না হয় একটা খেয়ো। চিবুতে না পার তো সেদ্ধ করে দেব।

সুধীর সহাস্যে বললে, সার, আমাদের ওখানে বিস্তর আতা ফলেছে, ইয়া বড় বড়। কাল সকালে পায়েস বানিয়ে আপনাদের দিয়ে যাব।

ভীমবাবু বললেন, না না, অমন কাজটি ক'রো না। আতা আমার সয় না।

ভৈরব কুটীরে ফিরে এসে নিমাই বললে, একি, গাছের বড় বড় আতাগুলো গেল কোথায়?

সুধীর বললে, বোধ হয় পাঁড়েজী সদ্দারি করে পেড়ে রেখেছে। ও পাঁড়ে, আতা কি হল?

পাঁড়ে ব্যস্ত হয়ে এসে মাথায় একটু চাপড় মেরে করুণ কণ্ঠে বললে, কি কহবো হুজুর, বহুত ঝামেলা হয়ে গেছে! এক মোটা-সা বুঢ়াবাবু আর এক দুবলা-সা বুঢ়ী মাঈ এসেছিল। বাবু পটপট সব আতা ছিঁড়ে লিলে। হামি মানা করলে খাফা হয়ে বললে, চোপ রহো উল্লু। আমার ডর লাগল, শায়দ কোই বড়া অপসর উপসরকা বাবা উবা হোবে—

সুধীর বললে, হাতে লাল গামছা ছিল?

—জী হাঁ, উসি মে তো বাঁধ কে লিয়ে গেল।

হাসির প্রকোপ একটু কমলে নিমাই বললে, হলধর দত্তর 'চোরে চোরে' গল্পের চাইতে মজার!

প্রবোধ বললে, যাক, আমরা ঠকি নি, আতার পায়েস খেয়েছি, পেয়ারাও পেয়েছি। কিন্তু ভীমচন্দ্র সেন মশায়ের জন্য দুঃখ হচ্ছে, তাঁর গিন্নী তাঁকে বঞ্চিত করেছেন।

নিমাই বললে, ভাববেন না সার, দিন দুই পরেই আবার বিস্তর আতা পাকবে, তখন পায়েস করে ভীমসেন মশায় আর তাঁর গিন্নীকে খাওয়াব।

১৩৬০ (১৯৫৩)

ভবতোষ ঠাকুর

ভবতোষ সরকারের বয়স তিপ্পান্ন। উলুবেড়ের সবডেপুটি ছিলেন, তিন বছর হল চাকরি ছেড়েছেন। এখন কেবল পড়েন আর ভাবেন। নিঃসন্তান, স্ত্রী আছেন। কলকাতার ভাড়া বাড়িতে বাস করেন, পেনশন যা পান তাতে কোনও রকমে সংসার চলে।

সকাল আটটা। দোতলায় সিঁড়ির পাশে একটি ছোট ঘরে তক্তপোশে ছেঁড়া শতরঞ্জির উপর বসে ভবতোষ চোখ বুজে কি একটা ভাবছেন। তাঁর দুই ভক্ত জিতেন আর বিধু মেঝেতে মাদুরের উপর বসে আছে।

জিতেন বললে, প্রভু, শুনেছেন?

ভবতোষের সাড়া নেই।

জিতেন। প্রভু,ও প্রভু, দয়া করে একবারটি শুনুন।

এবারে ভবতোষের হুঁশ হল। বললেন, আঃ, কেন খামকা প্রভু প্রভু করছ? আমি সামান্য মানুষ, কারও প্রভু নই। ফের যদি প্রভু বল তো সাড়া দেব না।

জিতেন। বুঝেছি। আচ্ছা ঠাকুর—

ভবতোষ। দেবতা আর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণকেই ঠাকুর বলে। আবার রসুয়ে বামুন আর পশ্চিম অঞ্চলে নাপিতকেও ঠাকুর বলে। আমি কায়স্থসন্তান, ঠাকুর হতে পারি না।

হাত জোড় করে জিতেন বললে, প্রভু, কায়স্থরা তো ক্ষত্রিয়, জনক আর শ্রীকৃষ্ণের স্বজাতি। তাঁদের মতন আপনিও তত্ত্বকথা বলে থাকেন, আপনার ব্রাহ্মণ ভক্তও অনেক আছে। দয়া করে যদি পইতেটি নিয়ে ফেলেন আর মাথায় একটি শিখা রাখেন তবে আর সংকোচের কারণ থাকবে না।

ভাবতোষ। দেখ জিতেন, হাজার বছর আগে হয়তো আমার পূর্বপুরুষরা পইতে ধারণ করতেন, কিন্তু পরে ব্রাহ্মণদের আজ্ঞায় তাঁরা ত্যাগ করেছিলেন। আমার ঠাকুরদার কাছে তাঁর ঠাকুরদার বর্ণনা শুনেছি—পরনে খাটো ধুতি, গায়ে মেরজাই, কাঁধে কোঁচানো চাদর, পায়ে নাগরা, মাথায় টিকি, কপালে ফোঁটা, আর মুখে ফারসী বুলি। আমার ঠাকুরদা অতি বুদ্ধিমান ছিলেন, মুরগি খেতে শিখে টিকি ফোঁটা আর ফারসী তিনটেই ত্যাগ করেন।

জিতেন। পাদরীদের পাল্লায় পড়েছিলেন বুঝি?

ভবতোষ। কারও পাল্লায় পড়বার লোক তিনি ছিলেন না।

বিধু বললে, ওহে জিতেন, ইনি পইতে আর টিকি নাই বা ধারণ করলেন, পুরুত ঠাকুর সাজলে এঁর মহত্ত্ব কিছুমাত্র বাড়বে না। আমি বলি কি, ইনি দাড়ি রাখুন, চুল বাড়তে দিন, গেরুয়া কাপড় পরুন, আর গোটা কতক মোটা মোটা রুদ্রাক্ষের মালা গলায় দিন। সাধু মহাত্মার এই হল লক্ষণ।

ভবতোষ মাথা নাড়লেন।

বিধু। আচ্ছা, দাড়ি জটা রুদ্রাক্ষ না হয় বাদ দিলেন। গোঁফটা কামিয়ে ফেলুন, গেরুয়া সিল্কের ধুতি পাঞ্জাবি পরুন, মাথায় গেরুয়া পাগড়ি বাঁধুন, কিংবা কানঢাকা টুপি পরুন। তত্ত্বদর্শী স্বামী মহারাজদের বেশ ধারণ করুন।

ভবতোষ। আমি সাধু মহাত্মা নই, তত্ত্বদর্শীও নই। আমার সাজ যা আছে তাই থাকবে।

জিতেন। এইবারে বুঝেছি। মুক্তপুরুষদের পইতে টিকি জটা গেরুয়া রুদ্রাক্ষ কিছুই দরকার হয় না। কিন্তু আপনাকে তো নাম ধরে ডাকা চলবে না। সবাই আপনাকে ঠাকুর বলে, আমরাও তাই বলব। দোহাই, এতে আপত্তি করবেন না। বলছিলুম কি—আপনি তো জীবন্মুক্ত পুরুষ, গৃহে বাস করলেও সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, আপনার মুখের একটু কথা শোনবার জন্যে জজ ব্যারিস্টার ডাক্তার প্রফেসর মেয়ে পুরুষ সবাই লালায়িত। সবাই জানতে চায়—ইনি কি ব্রহ্মজ্ঞানী পণ্ডিত, না যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ? পরমহংস, না শুধুই পরম ভক্ত? ভগবানের অংশাবতার, না ষোল আনা ভগবান? কি বলব ঠাকুর?

ভবতোষ। বলবে, ইনি একজন রিটায়ার্ড সবডেপুটি।

এই সময় ভবতোষের বাল্যবন্ধু নিখিল বাঁড়ুজ্যে এলেন। বললেন, কি হে ভবতোষ, কি রকম চলছে? বিস্তর ভক্ত জুটিয়েছ শুনছি, সুবিধে কিছু করতে পারলে?

ভবতোষ। নাঃ। যদি কোথাও একটা নিরিবিলি গুহা পাই তো পালিয়ে গিয়ে সেখানে ঢুকব।

নিখিল। পালাবে কেন? রামকৃষ্ণদেব তো ভক্তপরিবৃত হয়ে সুখে বাস করতেন।

ভবতোষ। তিনি পরমহংস ছিলেন, তাঁর মতন ধৈর্য কোথায় পাব। তবে তিনিও মাঝে মাঝে উত্যক্ত হয়ে শালা বলে ফেলতেন।

জিতেন। নির্জন আশ্রমের অভাব কি ঠাকুর? আপনি একবারটি হাঁ বলুন, আপনার ভক্তরা বরানগরে বা কাশীতে বা রাঁচিতে চমৎকার আশ্রম বানিয়ে দেবে।

নিখিল। রাজী হয়ে যাও হে, তিন জায়গাতেই আশ্রম করাও। দু-চারটে গেস্ট রুম রেখো, আমরাও মাঝে মাঝে গিয়ে থাকব। এমন সুবিধে ছেড়ো না ভবতোষ।

জিতেন। দেখুন নিখিলবাবু, আপনি ঠাকুরকে নাম ধরে ডাকবেন না, তুমিও বলবেন না, তাতে আমরা বড় ব্যথা পাই।

নিখিল। বেশ বেশ, আমিও এখন থেকে ঠাকুর আর আপনি বলব। কিন্তু যখন আর কেউ থাকবে না তখন নাম ধরেই ডাকব। কি বলেন ঠাকুর?

ভবতোষ। হাঁ হাঁ।

প্রাতঃকালীন ভক্তসমাগম কি রকম হয়েছে দেখবার জন্য জিতেন আর বিধু নীচে নেমে গেল।

নিখিল বললেন, আচ্ছা ভবতোষ, তুমি তো বলতে যে কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ যোগ, লোকসংগ্রহ অর্থাৎ লোকচরিত্রের উন্নতি সাধনই শ্রেষ্ঠ কর্ম। তবে এখন নির্জনে থাকতে চাচ্ছ কেন? শুধু নিজের মুক্তির জন্যে লুকিয়ে তপস্যা, আর নিজের পেট ভরাবার জন্যে লুকিয়ে খাওয়া, দুটোই তো স্বার্থপরতা।

ভবতোষ। আমি অক্ষম দুর্বল, বক্তৃতা দিতে পারি না, ধর্মপ্রচার করতে পারি

না, কীর্তন গাওয়া আসে না, লোকশিক্ষার পদ্ধতিও জানি না। বুদ্ধ যিশু শংকর চৈতন্য রামমোহন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ গান্ধী—এঁদের শক্তির কণামাত্র আমার নেই, তাই শুধু আত্মচিন্তা করি। কেউ যদি আমার কাছে কিছু জানতে চায় তো যথাবুদ্ধি বলি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, সত্য কথা শুনতে কেউ চায় না, সবাই স্বার্থসিদ্ধির সোজা উপায় বা অলৌকিক শক্তি খোঁজে।

জিতেন ফিরে এসে বললে, ঠাকুর, আজ বেশী লোক আসে নি, সবাই ভোট দিতে গেছে কিনা। চার-পাঁচ জন লোক নীচে দর্শনের জন্যে অপেক্ষা করছে।

নিখিল। কি রকম লোক জিতেনবাবু?

জিতেন। সেই গীতায় যেমন চতুর্বিধা ভজন্তে মাং আছে—আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী আর জ্ঞানী।

ভবতোষ। জ্ঞানীদের চলে যেতে বল, তাদের যখন জ্ঞান আছেই তবে আবার এখানে কেন। অর্থার্থীদেরও বলে দাও আমার অর্থ দেবার সামর্থ্য নেই। আর যারা এসেছে একে একে পাঠিয়ে দাও।

জিতেন বেরিয়ে গেলে নিখিল প্রশ্ন করলেন, একে একে পাঠাতে বললে কেন? ও তো বিলিতী কায়দায় ইন্টারভিউ। ভক্তের দল মহাপুরুষকে সর্বদা ঘিরে থাকবে এই তো চিরকেলে দস্তুর।

ভবতোষ। যারা দেখা করতে আসে তাদের সকলের মতিগতি তো সমান নয়, যে যেমন তাকে সেই রকম উত্তর দিতে হয়। বুদ্ধি-ভেদ করতে গীতায় নিষেধ আছে।

প্রথমে এলেন মাধব ধর। ইনি একজন জিজ্ঞাসু। ধর মশায় ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে করজোড়ে বললেন, ঠাকুর, আপনার কৃপায় আমার অভাব কিছু নেই, ব্যবসা ভালই চলছে, বাড়ির সবাই ভালই আছে। শুধু একটা সমস্যা সমাধানের জন্যে আপনার কাছে এসেছি।

ভবতোষ। আপনার অভাব কিছু নেই শুনে বড় আনন্দ হল ধর মশায়, আপনি ভাগ্যবান লোক। আপনার সমস্যাটি কি তা বলুন।

মাধব। হেঁ হেঁ, আমাকে মশায় বলবেন না, আমি আপনার দাসানুদাস। সমস্যাটা হচ্ছে—ঠিকুজিতে আমার পরমাই লেখা আছে পঁচানব্বই বছর, এখন সবে ষাট চলছে। কিন্তু সেদিন তারাদাস জ্যোতিষী হাত দেখে বললেন, পঁচাত্তরেই মৃত্যুযোগ। ধরুন যদি পঁচাত্তরেই মারা যাই তবে বাকী বিশ বছরের কি হবে? কোষ্ঠী আর কররেখা কোনওটা তো মিথ্যে হতে পারে না।

ভবতোষ। ওহে নিখিল, তুমি তো একজন বড় অ্যাকাউন্টান্ট, ধর মশায়ের প্রশ্নটির জবাব তুমিই দাও।

নিখিল। নিশ্চিন্ত থাকুন ধর মশায়, বাকী বিশ বছর পরজন্মে ক্যারেড ফরোআর্ড হবে। প্রিভিলেজ লীভ আর পরমায়ু পচে যায় না।

ধর মশায় ভাবতে ভাবতে প্রস্থান করলেন। শ্রীপতি রায় ঘরে এলেন।

ভবতোষ। আসুন শ্রীপতিবাবু। আজ আবার কি মনে করে? আমি নিতান্ত অকিঞ্চন তা তো সেদিন বলেই দিয়েছি। আমার কাছে কিছু প্রত্যাশা করবেন না।

শ্রীপতি। হেঁ হেঁ, আমাকে শ্রীপতিবাবু বলবেন না, শুধু শ্রীপতি বা ছিরু।

বয়সে আপনার চাইতে কিছু বড় হলেও আমি আপনার দাসানুদাস। বড় দুর্ভাবনায় পড়ে আপনার কাছে এসেছি।

ভবতোষ। বলে ফেলুন।

শ্রীপতি। আপনার আশীর্বাদে আমার সাত ছেলে, তিন মেয়ে, তা ছাড়া গিন্নী আছেন। আমার বয়স পঁয়ষট্টি হল, ব্লাড প্রেশার ডায়াবিটিস বাত সবই আছে, কোন দিন মরব কিছুই ঠিক নেই। গিন্নীর বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই, সাত ছেলের একটাও মানুষ হল না, তিনটে মেয়ে প্রেম করতে গিয়ে তিন ব্যাটা ওআর্থলেস বর জুটিয়েছে। তাই এমন ব্যবস্থা করে দিতে চাই যাতে আমার অবর্তমানে এদের কোনও অভাব না থাকে।

ভবতোষ। আপনার ভাবনা কি, শুনতে পাই আপনি কোটিপতি। অ্যাটর্নিকে বলুন, তিনিই ব্যবস্থা করে দেবেন।

শ্রীপতি। কি জানেন, সাত ছেলের প্রত্যেককে দশ লাখ দিতে চাই, তিন মেয়ে আর গিন্নীকে সাত সাত লাখ। তার কমে এই মাগ্‌গি গণ্ডার দিনে চলতেই পারে না। তা ছাড়া মানত করেছি আপনার জন্যে একটি ভাল আশ্রম আর দেবমন্দির বানিয়ে দেব, তাতেও লাখ দুই লাগবে। একুনে দরকার এক ক্রোর, কিন্তু আমার পুঁজি মোটে পঁচাশি লাখ।আরও পনরো লাখ না হলে চলবে না, তাই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।

ভবতোষ। আপনি বিচক্ষণ ব্যবসায়ী হয়েও বিশ্বাস করেন আমি আপনাকে পনরো লাখ পাইয়ে দিতে পারি ?

শ্রীপতি। বিশ্বাস করি বই কি ঠাকুর। আমার ব্যবসা-বুদ্ধিতে যা হয় না আপনার দৈব শক্তিতে তা নিশ্চয় হবে।

ভবতোষ পিছন ফিরে চোখ বুজে অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন। শ্রীপতি বললেন, কি মুশকিল, ঠাকুর সমাধিস্থ হলেন দেখছি। আমার আবার তাড়া আছে, দলবল নিয়ে পোলিং স্টেশনে যেতে হবে। আচ্ছা নিখিলবাবু, আপনি তো ঠাকুরের অন্তরঙ্গ, শ্রীগৌরাঙ্গের যেমন নিত্যানন্দ। আপনিই দয়া করে আমার জন্যে ঠাকুরকে একটু ধরুন না।

নিখিল। দেখুন মশায়, কেউ যখন বড় ডাক্তারকে কনসল্ট করতে আসে তখন প্রথমেই জানায় আগে কি রকম চিকিৎসা হয়েছিল, কোন্ কোন্ ডাক্তার দেখেছিল, কি কি ওষুধ খেয়েছিল। আগে আপনার কেস হিস্টরি অর্থাৎ পূর্বের ক্রিয়াকলাপ খোলসা করে জানাতে হবে। কালোবাজার, পারমিট, কনট্রাক্ট, চাল চিনি কাপড় সরবরাহ, ভেজাল ঘি তেল ওষুধের ব্যবসা—এসব চেষ্টা করে দেখেছেন কি ?

শ্রীপতি। সবই দেখেছি দাদা, কিন্তু তেমন সুবিধে করতে পারি নি। হাজার হোক আমি বাঙালীর সন্তান, ধর্মজ্ঞান আছে, কালচার আছে, টুপি-পাগড়িধারীদের মতন বেপরোয়া ব্যবসাবুদ্ধি নেই।

নিখিল। ফটকা বাজার, লটারি, রেস—এসব চেষ্টা করে দেখেছেন ?

শ্রীপতি। ওসবেও কিছু হয় নি। তিনজন রাজজ্যোতিষীর কাছে টিপ্‌স নিয়েছি, শনিমন্দিরে পুজো দিয়েছি, বগলামুখী কবচ আর ধূমাবতী মাদুলি ধারণ করেছি, রক্তমুখী নীলার আংটিও পরেছি। কিছুই হল না, শুধু বিস্তর টাকা গচ্চা গেল। সব ব্যাটা ঠক জোচ্চোর।

নিখিল। তাই তো রায় মশায়, কিছুই বাকী রাখেন নি দেখছি। আচ্ছা, সোনা করবার চেষ্টা করেছেন ?

শ্রীপতি রায় সোৎসাহে বললেন, এইবার কাজের কথা বলেছেন নিখিলবাবু। ঠাকুর জানেন নাকি সোনা করতে?

নিখিল। ঠাকুর সবই জানেন, কিন্তু কিছু করবেন না। পরমহংসদেবের মতন ইনিও বলেন—টাকা মাটি, মাটি টাকা। সোনা তৈরী হল বিজ্ঞানীর কাজ, পরমাণু চুরমার করে আবার গড়তে হয়। আপনি ডক্টর বাঞ্ছারাম মহাপাত্রকে ধরুন। তিনি আমেরিকা থেকে সোনা তৈরি শিখে এসেছেন, কিন্তু ল্যাবরেটরির অভাবে কিছু করতে পারছেন না। আপনি লাখ পাঁচ-ছয় খরচ করে ল্যাবরেটরি বানিয়ে দিন, তিনি আপনার বাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।

শ্রীপতি। তিনি কিছু সোনা করে নিলেই তো তাঁর টাকার যোগাড় হয়।

নিখিল। আপনি যে উলটো কথা বলছেন মশায়। আগে গরু তার পর দুধ, আগে ল্যাবরেটরি তবে তো সোনা।

শ্রীপতি রেগে গিয়ে বললেন, ও-সব ধাপ্পাবাজিতে ভোলবার লোক আমি নই। আপনাদের সেরেফ বুজরুকি।

নিখিল। ঠিক ধরেছেন শ্রীপতিবাবু। আচ্ছা, এখন আসুন, নমস্কার।

জিতেন আর বিধুর সঙ্গে অজয় ঘোষাল আর তার স্ত্রী সুভদ্রা এল, দুজনেরই বয়স কম। এরা পাশের বাড়িতে থাকে। ভবতোষের পায়ের উপর আছড়ে পড়ে সুভদ্রা বললে, আমার ছেলেকে ফিরিয়ে আনুন বাবা, তাকে হারিয়ে আমি কি করে বাঁচব?

বিধু চুপিচুপি ভবতোষকে বললে, এঁদের একমাত্র ছেলেটি টাইফয়েডে ভুগে কাল মারা গেছে।

ভবতোষ বললেন, স্থির হয়ে ব'স মা, আমার পা ছাড়। চোখে মুখে একটু জল দাও,—বিধু, শিগগির একটু জল আন। আগে একটু শান্ত হও, নইলে আমার কথা বুঝতে পারবে কেন।

সুভদ্রা। আমার তিন বছরের খোকা, পদ্মফুলের মতন ছেলে, কোথায় গেল বাবা?

ভবতোষ। মা, তোমার নিষ্পাপ খোকা ভগবানের কোলে সুখে আছে। স্বর্গে গিয়ে কিংবা পরজন্মে তুমি তাকে ফিরে পাবে।

সুভদ্রা। ভগবান কেন তাকে নিলেন? তার খেলনা যে চারদিকে ছড়ানো রয়েছে, তার হাসি কান্না আবদার কি করে ভুলব বাবা, এই শোক কি করে সইব?

ভবতোষ। মহা মহা দুঃখও ক্রমশ সয়ে যায়, তুমিও সইতে পারবে। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন—একথা বিশ্বাস কর তো?

সুভদ্রা। না বাবা, করি না। এই সর্বনাশ করে ভগবান আমার কি মঙ্গল করলেন? এত সব বুড়ো বুড়ী রয়েছে, তাদের ছেড়ে আমার খোকাকে নিলেন কেন?

ভবতোষ। ভগবান কেন কি করেন তা বোঝা তো আমাদের সাধ্য নয়। পূর্বজন্মের কর্মফলে লোকে ইহজন্মে সুখ দুঃখ ভোগ করে—একথা বিশ্বাস কর তো?

সুভদ্রা। পূর্বজন্মের কথা জানি না বাবা। কার পাপের ফলে আমার খোকা অকালে গেল? তার নিজের পাপ, না তার বাপের, না আমার? দয়াময় ভগবান

আমাদের পাপ করতে দিয়েছিলেন কেন? ঢের বড় বড় পাপীকে তো তিনি সুখে রেখেছেন।

ভবতোষ। মা, এখন তুমি বড় ব্যাকুল হয়ে আছ, পাপ পুণ্য কর্মফল এসব কথা এখন থাক, আগে তুমি একটু স্থির হও। তোমার মনে ভক্তি আছে?

সুভদ্রা। ভক্তি তো ছিল বাবা, এখন যে হতাশ হয়ে গেছি। যিনি আমার ছেলেকে কেড়ে নিলেন তাঁকে কি করে ভক্তি করব?

ভবতোষ। আচ্ছা, সে কথা পরে হবে, এখন শুধু মন শান্ত কর। যত পার জপ কর, স্তব পাঠ কর।

সুভদ্রা। কি জপ করব, কি স্তব করব, বলে দিন বাবা।

ভবতোষ। যা তোমার ভাল লাগে—হরিনাম, শিবনাম, দুর্গানাম, সত্যং শিবসুন্দরম্। এই স্তবমালা বইখানি নিয়ে যাও, যে স্তব তোমার পছন্দ হয় আবৃত্তি ক'রো। ভগবানকে ব'লো—'দুঃখ-তাপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা, দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।'

সুভদ্রা। আবার কবে আসব বাবা?

ভবতোষ। তুমি ব্যস্ত হয়ো না, আমি তোমাকে ডেকে পাঠাব।

সুভদ্রার ছোট ভাই বাইরে অপেক্ষা করছিল, সে তার দিদিকে নিয়ে চলে গেল।

সুভদ্রা স্বামী অজয় বললে, আমার ব্যবস্থা কি করবেন ঠাকুর?

ভবতোষ। তোমার স্ত্রী আর তোমার একই ব্যবস্থা। তুমি পুরুষ মানুষ, সহজেই শোক দমন করতে পারবে, স্ত্রীকেও সান্ত্বনা দেবে। ওঁকে নিয়ে দিনকতক তীর্থভ্রমণ করে এস।

অজয়। ঠাকুর, এত শোকের মধ্যেও আপনার কাছে স্বীকার করছি—আমি বড় অবিশ্বাসী, দয়াময় ভগবানে আমার আস্থা নেই। সুভদ্রাকে যা বললেন, তাতে আমি শান্তি পাব না।

নিখিল। আপনাদের কথার মধ্যে আমি কথা বলছি, অপরাধ নেবেন না ঠাকুর। এই অজয়কে আমি খুব জানি, এর অহেতুকী ভক্তি হবে এমন মনে হয় না। কর্মফল, জন্মান্তর, পরলোকে পুনর্মিলন, মঙ্গলময় ঈশ্বর—ইত্যাদি মামুলী প্রবোধবাক্যে অজয় সান্ত্বনা পাবে না। তোতা পাখির মতন স্তবপাঠেও এর কিছু হবে না।

ভবতোষ। দু-চার দিন যাক, এরা দুজনে একটু শান্ত হক, তারপর আমি যথাসাধ্য প্রবোধ দেবার চেষ্টা করব।

নিখিল। ঠাকুর, আর একটা কথা নিবেদন করি। অজয়ের স্ত্রী বড়ই কাতর হয়েছে। সে যদি একটি বালগোপালের মূর্তি গড়িয়ে তার সেবা করে, তবে কেমন হয়? সন্তানহারা অনেক স্ত্রী এতে ভুলে থাকে দেখেছি। তাদের ধারণা হয়, শিশুকৃষ্ণের সেই বিগ্রহেই নিজের সন্তান লীন হয়ে আছে।

অজয়। না না নিখিলবাবু, ওসব চলবে না। সুভদ্রার আবার সন্তান হতে পারে, এখনকার শোকও ক্রমশ কমে যাবে, তখন ওই বালগোপাল একটি বোঝা হয়ে পড়বেন, লোকলজ্জায় তাঁকে ফেলাও চলবে না। যন্ত্রণা কমাবার জন্য এক-আধবার মরফীন দেওয়া চলে, কিন্তু একটি মানুষকে চিরকাল নেশাখোর করে রাখা কি উচিত?

ভবতোষ। অজয়ের কথা খুব ঠিক। নিখিল যা বললে তা ক্ষেত্রবিশেষে চলতে পারে, যেখানে শোক সইবার শক্তি নেই, যুক্তি বোঝবার মতন বুদ্ধি নেই, অন্য

সন্তানের সম্ভাবনাও নেই। সুভদ্রার ওপর কোন ভার চাপানো উচিত নয়। এখন তাকে নানা রকমে অন্যমনস্ক আর প্রফুল্ল রাখবার চেষ্টা করতে হবে।

নিখিল। আচ্ছা, অজয়ের স্ত্রী যদি মন্ত্র নিয়ে পুজোঅর্চায় মগ্ন থাকে তো কেমন হয়?

অজয়। তাতেও আমার আপত্তি আছে। সেদিন এক বনেদী বড়লোকের বাড়ি গিয়েছিলাম। তাঁর বৈঠকখানায় তিনটি বড় বড় অয়েল পেণ্টিং আছে, প্রত্যেকটিতে একজন মহিলা সেজেগুজে আসনে বসে পুজো করছেন। সামনে সোনারুপোর হরেক রকম পুজোর বাসন ঝকমক করছে, নানা উপচার সাজানো রয়েছে, সন্দেশের ওপর পেস্তাটি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। তাঁদের দৃষ্টি বিগ্রহের দিকে নয়, আগন্তুকের দিকে। যেন বলছেন, সবাই দেখ গো, আমরা পুজো করছি। খোঁজ নিয়ে জানলাম, একটি ছবি গৃহস্বামীর স্ত্রীর, আর দুটি তাঁর স্বর্গতা মা আর ঠাকুমার। এঁদের পুজো একটা উপলক্ষ্য মাত্র, আসল উদ্দেশ্য আড়ম্বর, যেমন আজকালকার সর্বজনীন।

ভবতোষ। সকলেই লোক দেখানো পুজো করে না। সুভদ্রার যদি নিজের আগ্রহ হয় তবে সে মন্ত্র নিয়ে পুজো করুক, কিংবা বিনা আড়ম্বরে উপাসনা করুক, কিন্তু তার জন্যে তাকে হুকুম করা চলবে না। হুজুক থেকেও তাকে বাঁচাতে হবে। কালক্রমে অনেকের নিষ্ঠা কমে যায়, তবু তারা চক্ষুলজ্জায় ঠাট বজায় রাখে। আমি একজনকে জানতুম, তিনি অহিংসার ব্রত নিয়ে নিরামিষাশী হয়েছিলেন। সাধুপুরুষ বলে তাঁর খ্যাতি হল। কিন্তু তিনি লোভ দমন করতে পারেন নি, একদিন হোটেলে লুকিয়ে খেতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলেন। নিখাকী মায়েরা বোধ হয় পুণ্যকর্ম ভেবেই উপবাস আরম্ভ করে, কিন্তু লোকের বাহবা শুনে শুনে তাদের কুবুদ্ধি হয় শেষটায় প্রতারণার আশ্রয় নেয়। ভক্তি বা নিষ্ঠার অভাব, সন্ধ্যা-আহ্নিক পুজো-অর্চনা না করা,. আমিষ ভোজন, কোনওটাই অপরাধ নয়। অনুষ্ঠানহীন নাস্তিকদের মধ্যেও সাধুপুরুষ আছেন। যার ভাল লাগে, সে চিরজীবন একনিষ্ঠ হয়ে অনুষ্ঠান পালন করতে পারে। যদি ভাল না লাগে, তবে যেদিন খুশি ছেড়ে দিলেও কিছুমাত্র দোষ হয় না। কিন্তু নিষ্ঠা হারিয়ে লোক দেখানো অনুষ্ঠান পালন মহাপাপ। সুভদ্রাকে শান্ত করতে হবে, কিন্তু কোনও রকম বন্ধনে পড়ে তার বুদ্ধি যেন মোহগ্রস্ত না হয়।

অজয়। তবে তাকে জপ আর স্তব করতে বললেন কেন? ইংরিজী প্রবাদ আছে—ঘুম যদি না আসে, তবে ভেড়া গুনতে থাক। জপ আর স্তব করে মনে শান্তি আনাও সেইরকম নয় কি?

ভবতোষ। সেইরকম হলেই বা ক্ষতি কি। ওতে মন শান্ত হবার সম্ভাবনা আছে অথচ বাহ্য আড়ম্বর নেই। নিষ্ঠা না হলে বিনা চক্ষুলজ্জায় যেদিন ইচ্ছে ছেড়ে দেওয়া চলে।

অজয়। আপনি সুভদ্রাকে স্বর্গ পুনর্জন্ম কর্মফল মঙ্গলময় ভগবান—এইসব ছেলে ভুলনো কথা বললেন কেন ঠাকুর? আপনিও কি আধ্যাত্মিক মুষ্টিযোগে বিশ্বাস করেন?

ভবতোষ। দেখ অজয়, তুমি বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী যাই হও, একথা মান তো —তুমি আছ, আবার তোমার চাইতে বড়ও একটা কিছু আছে? সেই বড়কে বিশ্বপ্রকৃতি, ব্রহ্ম, অ্যাবসলিউট, মহা অজানা, যা খুশি বলতে পার। সেই বৃহৎ বস্তুর মধ্যে তুমি ডুবে আছ, তা থেকেই তোমার জন্মমৃত্যু সুখদুঃখ ভালমন্দর উৎপত্তি।

এই বস্তু কি রকম তা সাধারণ মানুষের জ্ঞানের অতীত, অথচ আমাদের কৌতূহলের অন্ত নেই। বিজ্ঞানী দার্শনিক কবি আর ভক্ত সবাই কৌতূহলী, কিন্তু কেউ স্পষ্ট বুঝতে পারেন না। বিজ্ঞানী আর দার্শনিক শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আর যুক্তিসিদ্ধ তথ্য খোঁজেন, যেটুকু জানতে পারেন তাতেই তুষ্ট হন, শিব বা অশিব, সুন্দর বা বীভৎস কিছুতেই তাঁদের পক্ষপাত নেই। কিন্তু কবি আর ভক্ত প্রমাণের অপেক্ষা রাখেন না, তাঁরা রস চান, ভাব চান, আনন্দ চান। এজন্য কল্পনা আর রূপকের আশ্রয় নিয়ে মানস বিগ্রহ রচনা করেন, সমগ্র বস্তুর ধারণা করতে না পারলেও খণ্ডে খণ্ডে অনুভব করেন, তবে দৈবাৎ কেউ কেউ পূর্ণানুভূতি পান। মিল্টন আর মধুসূদন পেগান ছিলেন না, তবু তাঁরা অমৃতভাষিণী বাগ্‌দেবীর আবাহন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশ আর দেশবাসীর ত্রুটি বিলক্ষণ জানতেন, তবু তাঁরা ঐশ্বর্যময়ী মাতৃভূমির বন্দনা করেছেন। Wordsworth বলেছেন—Great God ! I would rather be a pagan, suckled in a creed outworn...ইত্যাদি। মঙ্গলময় ভগবান না হলে সাধারণ ভক্তের চলে না, কাজেই অমঙ্গলের কারণস্বরূপ তাকে কর্মফল, জন্মান্তর, অরিজিনাল সিন, ফ্রি উইল, শয়তান, কলি ইত্যাদি মানতে হয়। ভক্ত কবি অমঙ্গলের কারণ খোঁজেন না, যেটুকু মঙ্গল পান তাতেই কৃতার্থ হন। তিনি দেখেন—'আছে আছে প্রেম ধূলায় ধূলায়, আনন্দ আছে নিখিলে।' তিনি বলেন—'এ জীবনে পাওয়াটারই সীমাহীন মূল্য, মরণে হারানোটা তো নহে তার তুল্য।'

অজয়। আমার উপায় কি হবে ঠাকুর? আমি বিজ্ঞানী নই, দার্শনিক নই, কবি নই, ভক্ত নই, কোনও রকম make-believeএও রুচি নেই।

ভবতোষ। মাথা ঠাণ্ডা করে বুদ্ধি খাটাও, বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ। এদেশের জ্ঞানীরা একদেশদর্শী নন, তাঁরা অত্যন্ত realist, মঙ্গল অমঙ্গল দুই শিরোধার্য করেছেন, বিরোধ মেটাবার প্রয়োজনই বোধ করেন নি। বলেছেন—ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং; আবার পরেই বলেছেন—গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্‌। জগতে নিত্য কত লোক মরছে, প্রতি নিমেষে কোটি কোটি জীব ধ্বংস হচ্ছে, কত লোকের সর্বনাশ হচ্ছে, তা দেখেও আমরা বিধাতার দোষ দিই না, অমঙ্গলের কারণ খুঁজি না, জগতের বিধান বলেই মেনে নিয়ে স্বচ্ছন্দে হেসে খেলে বেড়াই। কিন্তু যেমনি নিজে আঘাত পাই অমনি আর্তনাদ করে বলি—ভগবান, একি করলে, আমাকে মারলে কেন? গীতায় বিশ্বরূপের যে বর্ণনা আছে, তা ভয়ংকর, কিন্তু তা ধ্যান করলে মনের ক্ষুদ্রতা কমে। দার্শনিক Santayana লিখেছেন,—The truth is cruel, but it can be loved, and it makes free those who have loved it.

অজয়। আপনার কথা ভাল বুঝতে পারছি না ঠাকুর।

ভবতোষ। ক্রমশ বুঝতে পারবে। সকলের দুঃখ বোঝবার চেষ্টা কর, তোমার দুঃখ কমবে; সকলের সুখে সুখী হও, তোমার সুখ বাড়বে।

অজয় চলে গেল। একটু পরে নিখিল বিদায় নিলেন, তাঁর পিছনে জিতেন আর বিধুও নীচে নেমে এল।

নিখিল বললেন, কি হল জিতেনবাবু, আপনারা বড্ড যেন মুষড়ে গেছেন মনে হচ্ছে!

জিতেন। আরে ছি ছি, এমন করলে কি প্রতিষ্ঠা হয়, না মানুষের শ্রদ্ধা পাওয়া যায়? প্রেম, ভক্তি, ভগবানের লীলা এই সবের ব্যাখ্যান করতে হয়, কর্মফল জন্মান্তর পরলোকতত্ত্ব বোঝাতে হয়, কিছু কিছু বিভূতি আর দৈবশক্তি দেখাতে হয়, মিষ্টি মিষ্টি বচন বলতে হয়, তবে না ভক্তরা খুশী হবে। চেতলার গোলক ঠাকুর সেদিন কি সুন্দর একটা কথা বললেন 'মানুষ কি রকম জানিস? মাছির মা আর ফানুসের -নুষ। তোরা মাছির মতন আঁস্তাকুড়ে ভনভন করবি, না ফানুষ হয়ে ওপরে উঠবি?' কথাটি শুনে সবাই মোহিত হয়ে গেল। আর আমাদের ঠাকুরটির শুধু কটমটে আবোল-তাবোল বাক্যি, যেন জিয়মেট্রি পড়াচ্ছেন। শ্রীপতি রায় ভীষণ রেগে গেছেন, ঠাকুর তাঁকে গ্রাহ্যই করলেন না। তিনি ধনী মানী লোক, ক্যাডিলাক গাড়িতে এসেছিলেন, তাঁর অপমান করা কি উচিত হয়েছে? আমরা যতই ঠাকুরকে উঁচুতে তোলবার চেষ্টা করছি ততই উনি নেমে যাচ্ছেন।

নিখিল। যা বলেছেন। দেখুন জিতেনবাবু, সৈয়দ মুজতবা আলি সাহেবের লেখায় একটি ফারসী বয়েত পড়েছি, তার মানে হচ্ছে—পীর ওড়েন না, তাঁর চেলারাই তাঁকে ওড়ান। ভবতোষ ঠাকুরকে ওড়াবার জন্যে আপনারা প্রাণপণ চেষ্টা করছেন, কিন্তু উনি মাটি কামড়ে আছেন, কিছুতেই উড়বেন না। ওঁর আশা ছেড়ে দিন।

জিতেন। এর চাইতে উনি যদি মৌনী হয়ে থাকতেন কিংবা হিমালয়ে গিয়ে তপস্যা করতেন, তাও ভাল হত। আমাদের মাঠাকরুনটি অতি বুদ্ধিমতী, তাঁকে ঠাকুরের প্রতিনিধি করে আমরা একটি চমৎকার সংঘ খাড়া করতে পারতুম।

১৩৬০ (১৯৫৩)

আনন্দ মিস্ত্রী

বিশ্বকর্মা এঞ্জিনিয়ারিং ওআর্কসের কর্তা রঘুপতি রায় নিবিষ্ট হয়ে একটি জটিল নকশা পর্যবেক্ষণ করছেন এমন সময় তাঁর কামরার দরজায় মৃদু ধাক্কা পড়ল। রঘুপতি বললেন, আসতে পার।

ফোরম্যান প্রসন্ন সামন্ত দরজা খুলে ঘরে এল। তার পিছনে আরও আট-দশ জন ঠেলাঠেলি করছে দেখে রঘুপতি বললেন, ব্যাপার কি?

প্রসন্ন বলল, আমাদের একটি আরজি আছে বাবু, এঁরা তাই নিবেদন করতে এসেছেন।

রঘুপতি বললেন, সবাই ভেতরে এস।

চল্লিশ বৎসর আগেকার কথা। এখনকার তুলনায় তখন ধনিক বেশী শোষণ করত, শ্রমিক বেশী শোষিত হত, কিন্তু কর্মী আর কর্মকর্তার মধ্যে হৃদ্যতার অভাব ছিল না। বিশ্বকর্মা কারখানার লোকে বলত, রঘুপতি রায় কড়া মনিব কিন্তু মানুষটা অবুঝ নয়, দয়ামায়া আছে।

কারখানার নানা বিভাগ থেকে এক-এক জন এসেছে, কেরানী আর কারিগর দুইই উপস্থিত হয়েছে। রঘুপতি প্রশ্ন করলেন, কি চাও তোমরা?

ফোরম্যান প্রসন্ন সামন্ত মুখপাত্র হয়ে এসেছে, কিন্তু সে একটু তোতলা, মাঝে মাঝে কথা আটকে যায়। বাইসম্যান অনন্ত পালকে সামনে ঠেলে দিয়ে প্রসন্ন বলল, তুই বল রে অনন্ত, বেশ গুছিয়ে বলবি।

অনন্তর বয়স বাইশ-তেইশ, ছাত্রবৃত্তি পাস, সুশ্রী চেহারা, ঝাঁকড়া চুল, শখের যাত্রায় নায়ক সাজে, বেহালাও বাজায়। সে নমস্কার করে ঢোক গিলে বলল, আমাদের আরজিটা হচ্ছে সার—আনন্দ মিস্ত্রীকে জবাব দিতে হবে।

রঘুপতি আশ্চর্য হলেন। ফিটার মিস্ত্রী আনন্দ মণ্ডল অতি নিপুণ কারিগর, সকল যন্ত্রেই তার সমান হাত, কোন কাজে কিছুমাত্র খুঁত রাখে না। বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ, কথা কম বলে, নেশা করে না, অন্য দোষও শোনা যায় না। কারখানার সকলেই তাকে ভালবাসে, কেবল ফোরম্যান প্রসন্ন আর টার্নম্যান এককড়ির তার ওপর একটু ঈর্ষা আছে। আজ দল বেঁধে এত লোক আনন্দকে তাড়াতে চাচ্ছে কেন? রঘুপতি বললেন, তার অপরাধ কি?

একসঙ্গে কয়েকজন বলে উঠল, অতি বদ লোক বাবু, তার সঙ্গে আমরা কাজ করতে পারব না।

অনন্ত বলল, তোমরা চুপ কর, যা বলবার আমি বলছি। শুনুন সার। আনন্দ মিস্ত্রীর বউ আছে, বুড়ী নয়, কানা খোঁড়া নয়, কুচ্ছিতও নয়, কাজকর্মে তাঁর জুড়ি মেলে না। আমরা তাঁকে বউদিদি বউমা কাকী এই সব বলি। পাঁচ বছরের একটি ছেলে আর দু বছরের একটি মেয়েও আছে। আনন্দ তবু আর একটা বিয়ে করবে। খিদিরপুরের মেকেঞ্জি কোম্পানির কারখানায় মুকুন্দ মিস্ত্রী ছিলেন না? চৌকস কারিগর,

'কৃষ্ণকলি' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত নয়।

খুব নামডাক। আনন্দ তাঁর কাছে কাজ শিখেছিল। সেই মুকুন্দ ঘোষ মাস খানিক হল মারা গেছেন। তাঁরই মেয়েকে আনন্দ বিয়ে করবে, আসছে মাসেই বিয়ে। সামন্ত মশায় তাকে বিস্তর বুঝিয়েছেন,—ছি ছি আনন্দ, এই কুবুদ্ধি ছাড়, তোমার ঘরে অমন সতীলক্ষ্মী রয়েছেন, বিনা দোষে তাঁর ঘাড়ে একটা সতিন চাপাতে চাও কেন?

টার্নম্যান এককড়ি নশকর বলল, শুধু সতিন? শুনেছি সতিনের মাকে পর্যন্ত নিজের বাড়িতে এনে রাখবে। আনন্দর মতিচ্ছন্ন হয়েছে, আমাদের কোনও কথা শুনবে না, বিয়ে করবেই। তাই আমরা বললাম, আচ্ছা বিয়ে কর, কিন্তু সতীলক্ষ্মীর মনে যে কষ্ট দিচ্ছ সেই পাপ আমরা সইব না, ম্যানেজার বাবুকে বলে তোমার চাকরিটি মারব। আমাদের এতজনের কথা বাবু কখনই ঠেলবেন না।

রঘুপতি বললেন, আবার একটা বিয়ে করা আনন্দর খুবই অন্যায় হবে। আমি তাকে বোঝাবার চেষ্টা করব। কিন্তু সে যদি আমার কথা না শোনে তবে কি করতে পারি? আনন্দের সঙ্গে আমাদের শুধু কাজের সম্পর্ক, সে দুটো বিয়ে করছে কি চারটে বিয়ে করছে তার বিচারের অধিকার আমার নেই।

পাকা দাড়িওয়ালা টিণ্ডেল দিলাবর হুসেন কারখানার বয়লার-এঞ্জিন চালায়। সে এগিয়ে এসে বলল, এখতিয়ার আপনার জরুর আছে হুজুর, আপনি হলেন আমাদের ওআলিদ মায়-বাপ, আমাদের বেচাল দেখলে আপনি সাজা দেবেন।

রঘুপতি হেসে বললেন, ওহে দিলাবর, তোমাদের সমাজে তো চারটে বিবি ঘরে আনবার ব্যবস্থা আছে, তবে আনন্দর বেলা দোষ ধরছ কেন? হিন্দুমতে শুধু চারটে নয়, যত খুশি বিয়ে করা যেতে পারে।

রং-মিস্ত্রী বেলাত আলী বলল, সে কি একটা কাজের কথা হল বাবু মশায়? যার বিস্তর টাকা সে যত খুশি বিয়ে করলে কসুর হয় না, কিন্তু আমাদের মতন গরিব লোকের একটার বেশী জরু আনা খুব অন্যায়। মুসলমানদের মধ্যেও জাস্তি শাদির রেওয়াজ কমে আসছে। দু-চার জন সেকেলে লোক করছে বটে, কিন্তু হিঁদুর বাড়িতে তো বেশী বউ দেখা যায় না। যাদের যেমন রীতি তাই তো মানতে হবে বাবু। মুসলমান মুরগি খেতে পারে, কিন্তু হিঁদু কেন খাবে। হিঁদু কচ্ছপ খেতে পারে, কিন্তু মুসলমান কেন খাবে?

রঘুপতি বললেন, তোমরা সকলেই কি এই চাও যে আনন্দ যদি আর একটা বিয়ে করে তবে তাকে বরখাস্ত করতেই হবে?

সকলে একসঙ্গে বলে উঠল, হাঁ, তাই আমরা চাই, অন্যায় আমরা বরদাস্ত করব না।

রঘুপতি বললেন, আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। কারও নাম করব না, কিন্তু এই কারখানায় এমন লোক দু-তিন জন আছে যারা খুব নেশা করে, মাইনে পাবার পর তিন-চার দিন বুঁদ হয়ে কামাই করে, শুনেছি স্ত্রীকে মারধরও করে। তাদের তাড়াতে চাও না কেন?

এককড়ি নশকর বলল, সে তো বাবু মদের ঝোঁকে করে, নেশা ছুটে গেলেই আবার যে-কে-সেই সহজ মানুষ। কিন্তু বাড়িতে সতীলক্ষ্মী স্ত্রী থাকতে তার ঘাড়ে একটা সতিন চাপানো যে বারমেসে অষ্টপ্রহর জুলুম।

রঘুপতি বললেন, বেশ, তোমরা সবাই যখন একমত তখন আনন্দকে আমি বলব, আবার একটা বিয়ে করার মতলব ছাড়, না হয় চাকরি ছাড়।

সকলে তুষ্ট হয়ে নিজের নিজের কাজে ফিরে গেল।

যোগেন হাজরা এই কারখানার নকশা-বাবু অর্থাৎ ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যান, সে সকলের সব খবর রাখে। রঘুপতি তাকে ডেকে বললেন, ওহে যোগেন, ব্যাপারটা কি? আনন্দ হঠাৎ আর একটা বিয়ে করতে চায় কেন, আর আনন্দর বউ-এর ওপরেই বা কারখানা সুদ্ধ লোকের এত দরদ কেন?

যোগেন বলল, শুনেছি আনন্দের ছেলেবেলায় মা-বাপ মারা গেলে খিদিরপুরের মুকুন্দ মিস্ত্রীই তাকে মানুষ করে। আনন্দর যত কিছু বিদ্যে সব সেই মুকুন্দর কাছে শেখা। বামপন্থী স্ক্রু কাটা, ড্রিল দিয়ে চৌকো ছেঁদা করা, নরম লোহার ওপর কড়া ইস্পাতের ছাল ধরানো, এসব কাজ মুকুন্দর কাছেই আনন্দ শিখেছে, কারখানার আর কেউ এসব পারে না। গুরুর ওপরে আনন্দর ভক্তি থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু স্ত্রী থাকতে মুকুন্দর মেয়েকে বিয়ে করবার কি দরকার বুঝি না। হয়তো কিছু গোলমাল আছে, কারখানার কেউ তা জানে না, আনন্দও কিছু ভাঙতে চায় না। আর, আনন্দর বউএর ওপর সকলের দরদ কেন জানেন? খুব পরোপকারী কাজের মেয়ে, যেমন রাঁধিয়ে তেমনি খাটিয়ে, দেখতেও সুশ্রী। এই সেদিন তালের বড়া করে আমাদের সবাইকে খাওয়ালে। বিশ্বকর্মা পুজোর যোগাড় আর তিন-চার শ লোকের ভোজের রান্নাও সে প্রায় একাই করে। কিন্তু ভারী কুঁদুলী। কারিগররা তার ভক্ত বটে, কিন্তু তাদের বউরা তাকে দেখতে পারে না।

—কি রকম ভক্ত অ বুঝি না। আনন্দর চাকরি গেলে তার বউএরও তো ক্ষতি হবে।

—কি জানেন? সতীর পুণ্যে পতির স্বর্গবাস, কিন্তু পতির পাপে সতীর সর্বনাশ। তবে এখানকার চাকরি গেলেও আনন্দের কাজের অভাব হবে না।

আনন্দ মণ্ডলকে ডাকিয়ে এনে রঘুপতি বললেন, এসব কি শুনছি হে আনন্দ? তুমি নাকি আর একটা বিয়ে করবে?

মাথা নীচু করে আনন্দ বলল, আজ্ঞে হাঁ।

—সে কি। তোমার স্ত্রী তো খুব ভাল মেয়ে শুনতে পাই, বিনা দোষে তার ঘাড়ে একটা সতিন চাপাবে? এই কুমতলব ছাড়।

—ছাড়বার উপায় নেই বাবু। মুকুন্দ মিস্ত্রী মশায়ের মেয়েকে আমার বিয়ে করতেই হবে?

—মুকুন্দ মিস্ত্রী তোমার বাপের মতন ছিলেন, তাঁর কাছে তুমি কাজ শিখেছ, এসব আমি জানি। কিন্তু তোমার স্ত্রী থাকতে আবার বিয়ে করা অন্যায় নয় কি?

—উপায় নেই বাবু।

—উপায় নেই এ যে বিশ্রী কথা আনন্দ। দেখ, তুমি কাজের লোক, তোমাকে আমার খুব পছন্দ হয়। কিন্তু তোমার কুমতলব শুনে কারখানার সবাই খেপে উঠেছে. তাদের আপত্তি আমি অগ্রাহ্য করতে পারি না। তুমি আমাকে কথা দাও যে বিয়ে করবে না। তাতে রাজী না হও তো কাজে ইস্তাফা দিতে হবে।

—যে আজ্ঞে। আজ মাসের বিশ তারিখ, মাস কাবারের সঙ্গে সঙ্গে কাজ ছেড়ে দেব।

আনন্দ নমস্কার করে চলে গেল।

রঘুপতি রায় কারখানারই এক অংশে বাস করেন। সন্ধ্যাবেলা তিনি বারান্দায় বসে আছেন আর বিষণ্ণ মনে আনন্দের কথা ভাবছেন, এমন সময় বাইসম্যান অনন্ত এসে

বলল, সার, আনন্দ মিস্ত্রীর স্ত্রী যশোদা বউদি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

রঘুপতি বললেন, এখানে নিয়ে এস।

একটি ঘোমটাবতী মেয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল। অনন্ত তাকে বলল, লজ্জা ক'রো না বউদি, যা বলবার বাবু মশায়কে বল।

ঘোমটার ভেতর থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে যশোদা বলল, এ কেমন ধারা বিচার বাবু মশায়? আমার সোয়ামী দুটো বিয়ে করুক দশটা করুক, সে আমি বুঝব। কারখানার অলপ্পেয়েদের তার জন্যে মাথাব্যথা কেন? মানুষটার কাজে কোন গলদ নেই, আপনি তাকে স্নেহও করেন, তবে কিসের জন্যে তার অন্ন মারবেন? আমরা আট-দশ বছর বরানগরে এই কারখানায় আছি, এ জায়গা ছেড়ে এখন কোথায় যাব?

রঘুপতি বললেন, কারখানা সুদ্ধ লোকের আপত্তি আমি অগ্রাহ্য করতে পারি না। তাদের রাগ হবারই কথা, তোমার মতন ভাল মেয়ের একটা সতিন আসবে, কারখানার কেউ তা সইতে পারছে না।

ঘোমটা খুলে ফেলে যশোদা হাত নেড়ে বলল, আ মর! সতিন কি কারখানার না আমার? আমার সতিন আমি বুঝব, ঝাঁটাপেটা করে সিধে করে দেব, তোরা হত-ভাগারা এর মধ্যে আসিস কেন? হাঁ রে অনন্ত, তুইও ওদের দলে নেই তো? কি আমার দরদী লোক সব। আপনি কারু কথা শুনো নি বাবু, মিস্ত্রী যেমন কাজ করছে করুক।

রঘুপতি বিব্রত হয়ে বললেন, তোমার কথা বিবেচনা করে দেখব। আচ্ছা, এখন এস বাছা।

পরদিন সন্ধ্যার সময় অনন্ত রঘুপতির কাছে এসে বলল, মুকুন্দ মিস্ত্রী মশায়ের স্ত্রী আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

রঘুপতি বললেন, তোমার ভাবগতিক তো বুঝতে পারছি না অনন্ত। আনন্দর বিরুদ্ধে তুমিই কাল বলেছিলে, আবার তার স্ত্রীকে নিয়ে আমার কাছে এসেছিলে, আজ আবার মুকুন্দর স্ত্রীর সঙ্গে এসেছ। তোমার ইচ্ছেটা কি?

অনন্ত বলল, আমার একার ইচ্ছে অনিচ্ছেতে কি হবে সার, কারখানার সকলের যা ইচ্ছে আমারও তাই। তবে কিনা মেয়েদেরও বলবার অধিকার আছে, তাই তাঁদের সঙ্গে আমাকে আসতে হয়েছে।

মুকুন্দ মিস্ত্রীর স্ত্রী সিন্ধুবালা রঘুপতিকে প্রণাম করে বলল, বাবু মশায়, আপনি সব কথা শুনে ন্যায্য বিচার করবেন এ ভরসায় খিদিরপুর থেকে বরানগরে ছুটে এসেছি। ওই যে আপনাদের আনন্দ মণ্ডল, আমার সোয়ামীই ওকে মানুষ করেছেন। মিস্ত্রী মশায় বলতে আনন্দ অজ্ঞান, তাকে গুরুঠাকুরের মতন ভক্তি করত, এখনও করে। ওর যা কিছু বিদ্যে সব কর্তার কাছে শেখা। মারা যাবার সময় তিনি আনন্দকে বলে গেছেন—আনন্দ, আমার পুঁজি তো কিছু নেই, ছেলেটাও লক্ষ্মীছাড়া, কোথায় থাকে কি করে কেউ জানে না। আমি কোম্পানির কোআটারে থাকি, মরবার পর আমার পরিবারের এখানে স্থান হবে না। আমার স্ত্রী আর মেয়ে সুশীলার কি দশা হবে? আনন্দ, তুমি যদি এদের ভার নাও তো আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি। তাই শুনে আনন্দ বলল, মিস্ত্রী মশায়, আপনার পা ছুঁয়ে দিব্যি করছি, আমি এঁদের ভার নিলাম। কর্তা গত হলে আনন্দ আমায় বলল, মা, ভাববেন না, মেয়েকে নিয়ে আমার বাসায় চলে আসুন।

রঘুপতি বললেন, আনন্দ ভালই বলেছে। কিন্তু তার স্ত্রী থাকতে আপনার মেয়েকে বিয়ে করবে কেন? মেয়ের বিয়ে তো অন্য লোকের সঙ্গে দিতে পারেন।

কপাল চাপড়ে সিন্ধুবালা বলল, তা যে হবার জো নেই বাবু, উপায় থাকলে সতিনের ঘরে মেয়ে দেব কেন?

—উপায় নেই কেন?

—আমার মেয়েকে আর কে নেবে বাবা? সে রূপে গুণে লক্ষ্মী, কিন্তু বোবাকে কেউ চায় না। ছেলেবেলায় ছ মাস জ্বরে ভোগার পর থেকে সে আর কথা কইতে পারে না।

—ভারী দুঃখের কথা। কিন্তু আনন্দর সঙ্গে তার বিয়ে দেবার দরকার কি? আনন্দর বউ-এর অনিষ্ট কেন করবেন? আপনারা না হয় আনন্দর বাড়িতেই থাকবেন, কিন্তু মেয়ের তো অন্য পাত্র জুটতে পারে। না হয় যোগাড় করতে কিছুদিন দেরি হবে।

—সোমত্ত আইবুড়ো মেয়েকে আনন্দর বাড়িতে রাখলে যে বদনাম হবে বাবা। আমাদের জাতের লোক ভারী নচ্ছার, আনন্দ আমাদের ওখানে আনাগোনা করে তাইতেই আত্মীয় কুটুম্বরা নানা কথা রটিয়েছে।

রঘুপতি বললেন, আজ আপনি আসুন। আমি একটু ভেবে দেখি, অন্য উপায় হতে পারে কিনা। দু-এক দিনের মধ্যে এই অনন্তকে দিয়ে আপনাকে খবর পাঠাব।

পরদিন রঘুপতির আজ্ঞায় প্রসন্ন সামন্ত সদলে তাঁর কামরায় উপস্থিত হল, আনন্দ মণ্ডলও এল। মুকুন্দ মিস্ত্রীর স্ত্রীর কাছে যা শুনেছেন সব বিবৃত করে রঘুপতি বললেন, আচ্ছা আনন্দ মুকুন্দর মেয়ের জন্যে যদি একটি পাত্র যোগাড় করতে পারি তা হলে কেমন হয়?

আনন্দ বলল, তার চাইতে ভাল কিছুই হতে পারে না বাবু। কিন্তু পাত্র পাবেন কোথায়? মুকুন্দ মিস্ত্রী মশায় ঢের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বোবা মেয়েকে কেউ নিতে রাজী হয় নি।

রঘুপতি বললেন, আমার প্রস্তাবটা তোমরা মন দিয়ে শোন। শুনেছি মেয়েটি সুশ্রী, কাজকর্মও সব জানে, শুধু কথা বলতে পারে না। তোমরা সবাই তার জন্যে একটি ভাল পাত্রের সন্ধান কর। যদি এই কারখানায় একটি কাজ দেওয়া হয় আর ভাল যৌতুক দেওয়া হয় তবে পাত্র পাওয়া অসম্ভব হবে না। আমি যৌতুকের জন্যে এক শ টাকা চাঁদা দেব, তোমরাও যা পার দাও।

যারা এসেছিল তারা মৃদুস্বরে কিছুক্ষণ জল্পনা করল। তার পর এককড়ি নশকর বলল, বাবু মশায় যা বললেন তা খুব ন্যায্য কথা। মুকুন্দ মিস্ত্রীকে আমরা সবাই ভক্তি করতাম, তাঁর মেয়ের বিয়ের যোগাড় আমাদেরই করা উচিত। আমরা সবাই মাইনে থেকে টাকায় দু পয়সা হিসেবে চাঁদা দিতে রাজী আছি, তাতে আন্দাজ তিনশ টাকা উঠবে, আপনার টাকা নিয়ে হবে চার শ। যৌতুক ভালই হবে, তার ওপর আপনি এখানে একটা কাজ তো দেবেন। আমরা সাধ্যমত পাত্রের খোঁজ করব, কিন্তু সুপাত্র পাওয়া বড় শক্ত হবে বাবু।

অনন্ত পাল বলল, পাত্র খোঁজবার দরকার নেই, আমিই বিয়ে করব।

প্রসন্ন সামন্ত চুপি চুপি বলল, সে কি রে অনন্ত, আমার সেই শিবপুরের শালীর মেয়েকে বিয়ে করবি নি? টাকার লোভে বোবা মেয়ে নিবি?

অনন্ত চেঁচিয়ে বলল, টাকা চাই না, অমনিই বিয়ে করব।

অনন্তর পিঠ চাপড়ে রঘুপতি বললেন, বাহবা অনন্ত! উপস্থিত সকলে খুশী হয়ে কলবর করে উঠল।

দুদিন পরে রঘুপতির কামরার দরজা একটু ফাঁক করে আনন্দ মিস্ত্রী বলল, আসতে পারি বাবু? সামন্ত মশায় লিলুয়া জুট মিলে ক্রেন খাটাতে গেছেন, তাই আমাকেই এরা বলবার জন্যে ধরে এনেছে। আমাদের একটা আরজি আছে বাবু।

রঘুপতি বললেন, সবাই ভেতরে এস। আবার কিসের আরজি? কাকে তাড়াতে চাও?

আনন্দ বলল, আমাদের সকলের নিবেদন—বাইসম্যান অনন্ত পালের মাইনেটা কিছু বাড়িয়ে দিতে আজ্ঞা হ'ক।

—সে তোমাদের বলতে হবে না। আসছে মাসেই তো তার বিয়ে? ওই মাস থেকেই তার মাইনে বাড়বে।

শারদীয় 'গল্প-ভারতী'
১৩৬১ (১৯৫৪)

নীলতারা ইত্যাদি গল্প

নীল তারা

ষাট বৎসর আগেকার কথা, কুইন ভিক্টোরিয়ার আমল। তখন কলকাতায় বিজলী বাতি মোটর গাড়ি রেডিও লাউড স্পীকার ছিল না, আকাশে এয়ারোপ্লেন উড়ত না, রবীন্দ্রনাথ প্রখ্যাত হন নি, লোকে হেমচন্দ্রকে শ্রেষ্ঠ কবি বলত। কিন্তু রাখাল মাস্টার মনে করত সে আরও উঁচু দরের কবি, হতাশের আক্ষেপের চাইতেও ভাল কবিতা লিখতে পারে। সে তার অনুগত ছাত্র নারানকে বলত, আজ কি একখানা লিখেছি শুনবি?—ক্ষিপ্ত বায়ু ধূলি মাখে গায়। আর একটা শুনবি?—শুষ্ক বৃক্ষে ঝটিকার প্রভাব কোথায়। আর কেউ পারে এমন লিখতে?

রাখাল মুস্তোফী শুধু এনট্রান্স পাস, কিন্তু বিদ্বান লোক, বিস্তর বাংলা ইংরেজী বই পড়েছিল। সেকালে বেশী পাস না করলেও মাস্টারি করা চলত। কবিতা রচনা ছাড়া গান বাজনা আর দাবা খেলাতেও তার শখ ছিল। প্রথম বয়সে রাখাল বেহালা জুবিলি হাইস্কুলে থার্ড মাস্টারি করত, তার পর দৈবক্রমে রূপচাঁদপুরের রাজাবাহাদুর রৌপ্যেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরীর সুনজরে পড়ে দু বৎসর তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজ করেছিল। কোনও কারণে সে চাকরি ছেড়ে তাকে চলে আসতে হয়। তার পর দশ বৎসর কেটে গেছে, এখন রাখাল বেহালায় তার পৈতৃক বাড়িতেই থাকে এবং আবার জুবিলি স্কুলে মাস্টারি করছে।

যখনকার কথা বলছি তখন রাখালের বয়স প্রায় তেত্রিশ। সুপুরুষ, কিন্তু চেহারার যত্ন নেয় না, উস্কখুস্ক চুল, দাড়ি কামায় না, তাতে একটু পাকও ধরেছে। পাড়ার লোকে বলে পাগলা মাস্টার। সেকালে লোকে অল্প বয়সে বিবাহ করত, কিন্তু রাখাল এখনও অবিবাহিত। বাড়িতে সে একাই থাকে, তার মা দু বৎসর আগে মারা গেছেন।

রবিবার, সকাল আটটা। রাখাল তার বাইরের ঘরের সামনের বারান্দায় একটা তক্তপোশে বসে হুঁকো টানছে আর কবিতা লিখছে। বাড়ি থেকে প্রায় এক শ গজ দূরে একটা আধপাকা রাস্তা এঁকে বেঁকে চলে গেছে। রাখাল দেখতে পেল, একটা ভাড়াটে ফিটন গাড়ি এসে থামল, তা থেকে দুজন সাহেব আর একজন বাঙালী নামল। গাড়ি দাঁড়িয়ে রইল, আরোহীরা হনহন করে রাখালের বাড়ির দিকে এগিয়ে এল।

সাহেবদের একজন লম্বা রোগা, গোঁফদাড়ি নেই, গাল একটু তোবড়া, সামনের চুল কমে যাওয়ায় কপাল প্রশস্ত দেখাচ্ছে। অন্য জন মাঝারি আকারের, দোহারা গড়ন, গোঁফ আছে, একটু খুঁড়িয়ে চলেন। তাঁদের বাঙালী সঙ্গীটি কালো, পাকাটে মজবুত গড়ন, চুল ছোট করে ছাঁটা, গোঁফের ডগা পাক দেওয়া, পরনে ধুতি আর সাদা ড্রিলের কোট। রাখাল হুঁকোটি রেখে অবাক হয়ে আগন্তুকদের দিকে চেয়ে রইল।

কাছে এসে লম্বা সাহেব হ্যাট খুলে বললেন, গুড মর্নিং সার। অন্য সাহেব হ্যাট না খুলেই বললেন, গুড মর্নিং বাবু। তাঁদের বাঙালী সঙ্গী নীরবে রইলেন।

রাখাল সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে উঠে সেলাম করে বলল, গুড মর্নিং, গুড মর্নিং সার। ভেরি সরি, আমার বাড়িতে চেয়ার নেই, দয়া করে এই তক্তপোশে—এই উডন প্ল্যাটফর্মে বসুন।

লম্বা বললেন, দ্যাট্স অল রাইট, আমরা বসছি, আপনিও বসুন। মিস্টার রাখাল মুস্তোফীর সঙ্গেই কি কথা বলছি?

আজ্ঞে হাঁ।

দুই সাহেব নিজের নিজের কার্ড রাখালকে দিয়ে তক্তপোশে বসলেন, রাখালও বসল। আগন্তুক বাঙালী ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রইলেন, সাহেবের সঙ্গে একাসনে বসতে তিনি পারেন না।

গুঁফো সাহেব মুখের সিগারেট ফেলে দিয়ে বললেন, এই বেঙ্গলী বাবু হচ্ছেন আমাদের দোভাষী বাঞ্ছারাম খাঞ্জা। বোধ হয় এঁর দরকার হবে না, আপনি ইংরেজী জানেন দেখছি, আমরা সরাসরি আলাপ করতে পারব। ওয়েল মুস্তোফী বাবু, আমার এই ফেমস ফ্রেন্ডের নাম আপনি শুনেছেন বোধ হয়?

কার্ড দুটো ভাল করে পড়ে রাখাল বলল, আজ্ঞে শুনেছি বলে তো মনে পড়ে না, ভেরি সরি।

—কি আশ্চর্য, আপনি তো একজন শিক্ষিত লোক, স্ট্রাণ্ড ম্যাগ্যাজিনে এঁর কথা পড়েন নি?

—পুওর ম্যান সার, স্ট্রাণ্ড ম্যাগাজিন কোথা পাব? শুধু বঙ্গবাসী জন্মভূমি আর মাঝে মাঝে হিন্দু পেট্রিয়ট পড়ি।

—ইংরেজী গল্পের বই পড়েন না?

—তা অনেক পড়েছি, স্কট ডিকেন্স লীটন জর্জ ইলিয়ট আমার পড়া আছে।

—ক্রাইম স্টোরিজ পড়েন না?

—রেনল্ড্‌সের বিস্তর নভেল পড়েছি, মায় মিস্ট্রিজ অভ দি কোর্ট অভ লণ্ডন।

—ফর শেম মুস্তোফী বাবু। ওর বই ছুঁতে নেই, দেশদ্রোহী বজ্জাত লোক।

—তিনি কি করেছেন সার?

—সে লিখেছে, ফ্রেঞ্চ জাতি সবচেয়ে সভ্য, নেপোলিয়নের মতন গ্রেট ম্যান জন্মায় নি, আর ব্রিটিশ মন্ত্রীরা এতই অপদার্থ যে যত সব জার্মান বদমাস ধরে এনে আমাদের রাজকুমারীদের সঙ্গে বিয়ে দেয়। যাক সে কথা। তা হলে আমার এই বিখ্যাত বন্ধু সম্বন্ধে আপনি কিছুই জানেন না।

রাখাল একটু কুণ্ঠিত হয়ে বলল, শুধু এইটুকু জানি, ইনি এই প্রথম এদেশে এসেছেন, কিন্তু আপনি নতুন আসেন নি।

লম্বা সাহেব আশ্চর্য হয়ে বললেন, দ্যাট্স ফাইন! আর কি জানেন মিস্টার মুস্তোফী?

—কাল রাত্রে আপনাদের ভাল ঘুম হয় নি।

—ভেরি ভেরি গুড! আর কি জানেন?

—আপনারা কাল লংকা খেয়েছিলেন।

—লংকা? ইউ মীন সীলোন, আইল্যাণ্ড অভ রাবণ?

—আজ্ঞে সে লংকা নয়। হিন্দী নাম মিরচাই, ইংরেজী নামটা মনে আসছে না।

রেড অ্যান্ড গ্রীন পড—হাঁ হাঁ মনে পড়েছে. চিলি, রেড পেপার, ক্যাপ্‌সিকম, ভেরি হট স্পাইস।

লম্বা সাহেব তাঁর বন্ধুকে বললেন, ওহে ওআটসন, দেখছ তো, সায়েন্স অভ ডিডক্‌শন এই বেঙ্গলী জেণ্টলম্যান ভালই জানেন। নাঃ, এদেশে শারলক হোম্‌সের পসার হবে না।

ওআটসন বললেন, মুস্তৌফী বাবু, আপনি কি ইয়োগা প্রাকটিস করেন?

রাখাল বলল, যোগশাস্ত্র? না, তা আমার জানা নেই। আমার বাবা কবিরাজি করতেন—ইণ্ডিয়ান সিস্টেম অভ মেডিসিন, তাঁর কাছ থেকে আমি কিছু শিখেছি। সমস্ত লক্ষণ খুঁটিয়ে দেখে কারণ অনুমান করা আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

ওআটসন প্রশ্ন করলেন, কাল রাত্রে আমাদের ভাল ঘুম হয় নি তা বুঝলেন কি করে?

শারলক হোম্‌স বললেন, এলিমেণ্টারি ওআটসন, অতি সহজ। আমাদের মুখে মশার কামড়ের দাগ রয়েছে। আমরা মশারির মধ্যে শুই নি, পাংখাপুলারও মাঝরাত্রে পালিয়েছিল। কিন্তু আর দুটো বিষয় টের পেলেন কি করে?

রাখাল বলল, খুব সহজে। আপনি এসেই টুপি খুলে আমাকে 'সার' বললেন। অভিজ্ঞ সাহেবরা সামান্য নেটিভকে এত খাতির করে না। এতে বুঝলাম আপনি এই প্রথমবার বিলাত থেকে এসেছেন। ডক্টর ওআটসন টুপি খোলেন নি, আমাকে 'বাবু' বললেন, তাতে বুঝলাম ইনি পাকা সাহেব, নতুন আসেন নি, এদেশের দস্তুর জানেন।

—লংকা খাওয়া জানলেন কি করে?

—আপনার আঙুলে তামাকের রং ধরেছে, দেখেই বোঝা যায় আপনি খুব সিগারেট সিগার বা পাইপ টানেন। ডক্টর ওআটসনের মুখে সিগারেট ছিল, কিন্তু আপনার ছিল না। আপনি মাঝে মাঝে জিবের ডগা বার করছিলেন, অর্থাৎ জিব জ্বালা করছে। অনভ্যস্ত লোকে লংকা খেলে এইরকম হয়, সিগারেট টানতে পারে না। ডক্টর ওআটসন পাকা লোক, লংকায় ওঁর কিছু হয় নি।

হোম্‌স হেসে বললেন। চমৎকার! এই ওআটসনের কথা শুনেই কাল রাত্রে হোটেলে মাল্লিগাটানি সুপ, চিকেন কারি, আর বেঙ্গল ক্রাব চাটনি খেয়েছিলাম, তিন-টেই প্রচণ্ড ঝাল। আচ্ছা, আমাদের সঙ্গী এই মিস্টার খাপ্পা সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন?

বাঞ্ছারামকে নিরীক্ষণ করে রাখাল বলল, ইনি তো পুলিসের লোক, চুলের ছাঁট, গোঁফের তা আর ড্রিলের কোট দেখলেই বোঝা যায়। তা ছাড়া থুতনির নীচে টুপির ফিতের দাগ রয়েছে।

বাঞ্ছারাম খাপ্পা মাতৃভাষায় বললেন, হঃ তুমি খুব চালাক লোক বট হে। আর ভি কিছু শুনাও তো দেখি?

—পশ্চকোটে বাড়ি। সম্প্রতি খুব মার খেয়েছিলেন, কাঁধে আর হাতে লাঠির চোট লেগেছিল। তার জড়ানো মির্জাপুরী লাঠি, তার ছাপ এখনও চামড়ার ওপর রয়েছে।

—আমার গায়ের দাগটাই দেখলে হে? শালা বলদেও পানওয়ালাকে কি পিটান পিটাইছি তার খবর রাখ মাস্টর?

হোম্‌স বললেন, মুস্তৌফী, আওয়ার ফ্রেণ্ড খাপ্পার মুখ দেখে বুঝেছি এঁর সম্বন্ধেও আপনার অনুমান ঠিক হয়েছে। আচ্ছা, আপনি ও কি টোবাকো খাচ্ছিলেন?

ভার্জিনিয়া টার্কিশ ম্যানিলা জাভা কিউবা কইম্বাটুর প্রভৃতি তেষট্টি রকম টোবাকো আমি ধোঁয়া শুঁখেই চিনতে পারি, কিন্তু আপনারটা বুঝতে পারছি না। স্মেল্স গুড।

—এর নাম দা-কাটা তামাক, খুব সস্তা আর কড়া।

ড্যাকোটা? আমি যে শ্যাগ খাই তার চাইতে ভাল গন্ধ। কোথা পাওয়া যায়? আমি কিছু নিয়ে যেতে চাই।

—আমিই আপনাকে দু-তিন সের দিতে পারি, আমার বাড়ির তৈরি। কিন্তু পাইপে খাওয়া চলবে না, এইরকম হাবুলবাবুল চাই, হুক্কা কিংবা গড়গড়া। তার কায়দা আপনাকে শিখতে হবে। বিউটিফুল সায়েণ্টিফিক ইনভেনশন সার, জলের মধ্যে দিয়ে ধোঁয়া রিফাইণ্ড হয়ে আসে, জিব জ্বালা করে না।

—আপনার কাছ থেকে শিখে নেব। আচ্ছা, এখন কাজের কথা হ'ক। আমাদের আসার উদ্দেশ্য বোধ হয় বুঝেছেন?

—আপনারাও পুলিসের লোক?

—না, আমি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ, তবে দরকার হলে পুলিসকে সাহায্য করি বটে। আর আমার বন্ধু এই ডক্টর ওআটসন আমার সহকর্মী।

—রূপচাঁদপুরের কুমার স্বর্ণেন্দ্রনারায়ণ আপনাকে পাঠিয়েছেন তো? আগেই বলে দিচ্ছি, আমি কিছু জানি না, আমার কাছে কোনও খবর পাবেন না।

হোম্স বললেন, মিস্টার খাঞ্জা, আপনার সাহায্য দরকার হবে না, আপনি ওই গাড়িতে গিয়ে বসুন।

বাঞ্ছারাম চোখ পাকিয়ে রাখালকে বললেন, ও মশয়, বেশী ফড়ফড় ক'রো না, তোমাকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, সাহেবদের কাছে যা জবানবন্দি করবে তাতে তুমিই ফাঁদে পড়বে।

বাঞ্ছারাম চলে গেলে হোম্স বললেন, মুস্তৌফী, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার কিছুমাত্র অনিষ্ট করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার চেষ্টার ফলে আপনার ভালই হবে।

রাখাল বলল, কুমার বাহাদুর আপনার মারফত আমাকে ঘুষ দিয়ে সন্ধান নিতে চান নাকি?

—তিনি ভাল মন্দ যে কোনও উপায়ে কার্যসিদ্ধি করতে চান, কিন্তু আমার পলিসি তা নয়। তাঁর স্বার্থ আর আপনার মঙ্গল দুইই আমি সাধন করতে চাই। আমি জানি, আপনি একজন সরলস্বভাব শিক্ষিত সৎলোক, আপনার উপর অনেক পীড়ন হয়েছে। আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী। আপনাকে কিছুই বলতে হবে না, এদেশে আসবার আগে যা শুনেছি এবং এখানে এসে অনুসন্ধান করে যা জেনেছি, সবই আমি বলে যাচ্ছি, যদি কোথাও ভুল হয়, আপনি জানাবেন।

—বেশ, আপনি বলে যান।

শার্লক হোম্স বলতে লাগলেন।—রূপচাঁদপুরের কুমারের এজেণ্ট মিস্টার গ্রিফিথ লণ্ডনে মাস খানিক আগে আমার সঙ্গে দেখা করেন। তিনি বললেন, লেট রাজা রোপেণ্ডর—

রাখাল বলল, রৌপ্যেন্দ্রনারায়ণ।

—হাঁ হাঁ। ওই চোয়াল ভাঙা নামটা উচ্চারণ করা শক্ত, আমি শুধু রাজা বলব। গ্রিফিথ আমাকে যা জানিয়েছিলেন তা এই।—এক বৎসর হল রাজা মারা গেছেন। দ্যাট ওল্ডম্যান এক স্ত্রী থাকতেই আর একটি ইয়ং গার্ল বিবাহ করেছিলেন। নূতন রানীকে খুশী করবার জন্য তিনি তাঁকে বিস্তর অলংকার দিয়েছিলেন, তার মধ্যে সব চেয়ে দামী হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড স্টার স্যাফায়ারের ব্রোচ।

রাখাল বলল, তার নাম নীল তারা, ব্লু স্টার। মহামূল্য রত্ন, যার কাছে থাকে তার অশেষ মঙ্গল হয়। রাজার এক পূর্বপুরুষ দুশ বৎসর আগে এক পোর্তুগীজ বোম্বেটের কাছ থেকে কিনেছিলেন। ও রত্নটি নাকি সীলোনের কোনও মন্দির থেকে লুট হয়েছিল।

—দ্যাটস্ রাইট। আপনি সে রত্ন দেখেছেন?

—না, শুধু বর্ণনা শুনেছি। তার পর?

—দ্বিতীয় বিবাহের কয়েক মাস পরেই পড়ে গিয়ে রাজার পা আর কোমরের হাড় ভেঙে যায়, প্রায় আট বৎসর শয্যাশায়ী থেকে তিনি মারা যান। তার পর হঠাৎ একদিন নূতন রানী নিরুদ্দেশ হলেন। রাজার যিনি উত্তরাধিকারী—কুমার বাহাদুর, বিস্তর খোঁজ করেছেন, কিন্তু নীল তারা পান নি, পলাতক রানীরও কোনও খবর পান নি। কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে—রানী ফিরে আসুন, তিনি সসম্মানে রাজবাড়িতে নিজের মহলে থাকবেন, প্রচুর বৃত্তিও পাবেন। কিন্তু তাতে কোনও ফল হয় নি, এদেশের পুলিসও কোনও সন্ধান পায় নি। ঠিক হচ্ছে মুস্তৌফী?

—ওই রকম শুনেছি বটে। কিন্তু রাজার বিবাহের ব্যাপারটা আরও জটিল।

তা আমি জানি, সব রহস্যের আমি সমাধান করেছি। তার পর শুনুন। কুমার বাহাদুর তাঁর বিমাতার জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত নন, তিনি শুধু রত্নটি উদ্ধার করতে চান। নীল তারা নূতন রানীর হাতে যাওয়ার কিছুকাল পরেই ওল্ড রাজা জখম হলেন, অনেক বৎসর কষ্টভোগ করে মারা গেলেন। তার পর নূতন রানী নিরুদ্দেশ হলেন। এস্টেটে নানারকম অমঙ্গল ঘটছে, ফসল হয় নি, খাজনা আদায় হচ্ছে না, তিনটে বড় বড় মকদ্দমায় হার হয়েছে, প্রজারা দাঙ্গা করছে, কুমার ডিসপেপসিয়ায় ভুগছেন। তাঁর বিশ্বাস, সবই নীল তারার অন্তর্ধানের ফল।

—আপনি তা মনে করেন না?

—না। নীল তারা যতই দামী হক, একটা পাথর মাত্র, অ্যালুমিনার পিণ্ড, তার শুভাশুভ কোনও প্রভাবই থাকতে পারে না। আমাদের দেশেও রত্ন সম্বন্ধে অন্ধ সংস্কার আছে। কুমারের লণ্ডন এজেণ্ট গ্রিফিথ আমাকে বলেছিলেন, নীল তারা ছোট রানীর ডার্উরি বা স্ত্রীধন নয়, ও হল রাজবংশের সম্পত্তি, এয়ারলুম, পাগড়িতে পরবার অলঙ্কার। যিনি রাজা হবেন তিনিই এর অধিকারী। কুমার বাহাদুর শীঘ্র রাজা খেতাব পাবেন, সেজন্য নীল তারা তাঁরই প্রাপ্য। ছোট রানী তা চুরি করে নিয়ে পালিয়েছেন।

রাখাল বলল, মিছে কথা। সমস্ত সম্পত্তি নিজের ইচ্ছামত দান বিক্রয়ের অধিকার বৃদ্ধ রাজার ছিল, তিনি ছোট রানীকে যা দিয়েছেন, তা স্ত্রীধন।

—আমি এখানকার অ্যাডভোকেট-জেনারেলের মত নিয়েছি। তিনিও মনে করেন স্ত্রীধন, তবে শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টে আর প্রিভিকাউন্সিলের বিচারে কি দাঁড়াবে বলা যায় না। যাই হক, নীল তারা উদ্ধারের জন্য কুমার বাহাদুর আমাকে নিযুক্ত করেছেন।

—কুমার আমার কাছেও লোক পাঠিয়েছিলেন, ভয়ও দেখিয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস আমি ছোট রানীর সন্ধান জানি। আপনি এদেশে এসে কিছু জানতে পেরেছেন?

—আমি এসেই রূপচাঁদপুর গিয়েছিলাম। সেখানে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, আমাদের লেট ল্যামেন্টেড রাজা বাহাদুর একটি স্কাউনড্রেল ছিলেন, যেমন লম্পট তেমনি নেশাখোর, আর ঘোর অত্যাচারী। দশ বৎসর আগে তাঁর এস্টেটে রামকালী রায় নামে একজন কাজ করতেন। তাঁর সন্তান ছিল না, সাবিত্রী নামে একটি অনাথা ভাগনীকে পালন করতেন। মেয়েটি অসাধারণ সুন্দরী, তখন তার বয়স আন্দাজ ষোল। রূপচাঁদপুরেরই ভাল পাত্রের সঙ্গে তার বিবাহ স্থির হয়েছিল। পাত্র আর পাত্রীর পরিবারের মধ্যে একটা দূর সম্পর্ক ছিল, কাছাকাছি বাসের ফলে ঘনিষ্টতাও হয়েছিল। পাত্রের কাছে পাত্রী লেখাপড়া শিখত। বিবাহের কথা হচ্ছে জেনে রাজা মেয়ের মামা রামকালীকে বললেন, খবরদার, অন্য কোথাও চেষ্টা করবে না, আমিই তোমার ভাগনীকে বিবাহ করব। মামা সাহসী লোক, রাজার কথা শুনলেন না, যার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির হয়েছিল তার সঙ্গে বিবাহের আয়োজন করলেন। বরপক্ষ কন্যাপক্ষ উপস্থিত, কন্যার মামা সম্প্রদানের জন্য প্রস্তুত, পুরোহিত মন্ত্রপাঠের উপক্রম করছেন, এমন সময় রাজা সদলবলে উপস্থিত হলেন। কেউ কোনও বাধা দিতে সাহস করল না, কারণ রাজার দোর্দণ্ড প্রতাপ, আর তাঁর সঙ্গে পুলিসের দারোগাও শান্তিরক্ষা করতে এসেছিল। রাজার অনুচরেরা মেয়ের মামা আর বরের হাত পা বেঁধে তাদের সরিয়ে ফেলল, বরপক্ষ কন্যাপক্ষ ভয়ে ছত্রভঙ্গ হল। তখন রাজা বরের আসনে বসলেন, তাঁর নিজের পুরোহিত মন্ত্র পড়ল, রাজার এক মোসাহেব কন্যার খুড়ো সেজে অচৈতন্য সাবিত্রীকে সম্প্রদান করল। বিবাহের পর রাজা তাঁর নূতন পত্নীকে রাজবাড়িতে নিয়ে গেলেন। মামা দেশত্যাগী হলেন, আর পাত্রটি তার মাকে নিয়ে কলকাতায় চলে গেল।

—সেই পাত্রের পরিচয় আপনি জানেন?

—তার সঙ্গেই কথা বলছি। নাম রাখাল মুস্তৌফী, স্কুল মাস্টার, নিজেকে খুব বড় কবি মনে করে, যদিও তার একটা কবিতাও এ পর্যন্ত ছাপা হয় নি।

—নিজেকে বড় মনে করা কি দোষের?

—বোকা লোকের পক্ষে দোষের, তোমার আর আমার মতন বুদ্ধিমানের পক্ষে দোষের নয়।

—তার পর বলে যান।

—নূতন রানী সাবিত্রী বহুদিন পীড়িত ছিলেন। তাঁকে খুশী করে বশে আনবার জন্য রাজা চেষ্টার ত্রুটি করেন নি, বিস্তর অলংকার মায় নীল তারা দিয়েছিলেন, বাসের জন্য আলাদা মহল আর অনেক দাসদাসীও দিয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষার জন্য মিশন স্কুলের সিস্টার থিওডোরাকে বাহাল করেছিলেন। কিন্তু বিবাহের পাঁচ মাস পরেই রাজা মাতাল অবস্থায় পড়ে গিয়ে জখম হয়ে শয্যা নিলেন। নূতন রানী তাঁর টীচারের সঙ্গেই সময় কাটাতে লাগলেন।

—সাবিত্রী এখন কোথায় আছে তাই বলুন।

—ব্যস্ত হয়ো না, সব কথা একে একে বলছি। রাজার মৃত্যুর পর নূতন রানীর উপর কড়া পাহারা বসল। তিনি খুব বুদ্ধিমতী, সিস্টার থিওডোরার সঙ্গে পরামর্শ করে পালাবার ব্যবস্থা করলেন। একদিন দুপুর রাত্রে চুপি চুপি রাজবাড়ি ত্যাগ করলেন, সঙ্গে নিলেন কিছু টাকা আর অলংকার এবং একজন বিশ্বস্ত দাসী। নীল তারা নিয়ে যাবার ইচ্ছা তাঁর ছিল না, কিন্তু থিওডোরার সনির্বন্ধ অনুরোধে তাও

নিলেন। তার পর কলকাতায় এসে মিস সিসিলিয়া ব্যানার্জি নামে এক বাঙালী খ্রীষ্টান মহিলার বাড়িতে উঠলেন। থিওডোরাই সে ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

—সাবিত্রীর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে?

—হয়েছে। রানী বললেন, আমি রাজবাড়ি থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীন হয়েছি, এখানে এক মেয়ে স্কুলে চাকরিও যোগাড় করেছি। নীল তারা আমি রাখতে চাই না, আপনি নিয়ে যান, কুমারকে দেবেন। আমি বললাম, বিনামূল্যে দেবেন কেন, আপনার আর মুস্তোফীর উপর যে অত্যাচার হয়েছে তার খেসারত আদায় করে তবে দেবেন। রানী বললেন, আমার কিছু স্থির করবার শক্তি নেই, মামা মামীও বেঁচে নেই যে তাঁদের উপদেশ নেব। আপনি মুস্তোফীর সঙ্গে কথা বলবেন, তিনি যা বলবেন তাই হবে। মুস্তোফী, তোমার উপর তাঁর খুব শ্রদ্ধা আছে, গ্রেট রিগার্ড।

—তিনি কি খ্রীষ্টান হয়েছেন?

—সিস্টার থিওডোরা তার জন্য চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু রানী মোটেই রাজী হন নি।

—রানী বলবেন না, বলুন সাবিত্রী দেবী।

—ভেরি ওয়েল, সাবিত্রী দেবী, দি গডেস সাবিত্রী। দেখ ওআটসন, প্রেমে পড়লে নজর খুব উঁচু হয়, মনের ম্যাগনিফাইং পাওআর বেড়ে যায়। তোমার বিবাহের আগেও এই রকম দেখেছিলাম।

হোম্‌স তাঁর পকেট থেকে একটি বাক্স বার করে খুলে দেখালেন—সোনার ফ্রেমে বসানো নীল তারা, সুপারির মতন গড়ন, কিন্তু আরও বড়, ফিকে ঘোলাটে নীল রং, ভিতরে উজ্জ্বল তারার মতন একটি চিহ্ন, তা থেকে ছ দিকে ছটি রশ্মি বেরিয়েছে।

হোম্‌স বললেন, বহু কোটি বৎসর পূর্বে ভূগর্ভে তরল উত্তপ্ত অ্যালুমিনা ধীরে ধীরে জমে গিয়ে এই রত্ন উৎপন্ন হয়েছিল। এর বাজার দর খুব বেশী হবে না, বড় জোর দশ হাজার টাকা। কিন্তু কুমার যখন এর অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করেন আর ফিরে পাবার জন্য লালায়িত হয়েছেন তখন তাঁকে চড়া দাম দিতে হবে। মুস্তোফী, বল কত টাকা আদায় করব?

রাখাল বলল, আমার মাথা গুলিয়ে গেছে, যা স্থির করবার আপনিই করুন।

—কবিদের বিষয়বুদ্ধি বড় কম, অবশ্য অনারেবল এক্সেপশন আছে, যেমন লর্ড টেনিসন। শোন মুস্তোফী আমি চার লাখ আদায় করব, সাবিত্রী দেবীর দুই, তোমার দুই। এর বেশী চাইলে কুমার ভড়কে যেতে পারেন। তা ছাড়া আমাদের এদেশে আসার খরচ আর পারিশ্রমিকও তাঁকে দিতে হবে। ব্যাংক অভ বেঙ্গলে সাবিত্রীর অ্যাকাউণ্ট আছে, কুমার সেখানে চার লাখ জমা দিলেই তাঁকে নীল তারা সমর্পণ করব। আজ সন্ধ্যায় তিনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

—সাবিত্রীর ঠিকানা কি?

—তিন নম্বর কর্নওআলিস থার্ড লেন। মুস্তোফী, আজই বিকালে তাঁর কাছে যেও। আশা করি তোমার কুসংস্কার নেই, বিধবা হলেও বাগ্‌দত্তা পাত্রীকে বিবাহ করতে রাজী আছ?...তবে আর ভাবনা কি, go, woo and win her। কাল সকালে হোটেলে আমার সঙ্গে দেখা ক'রো। গুড বাই।

ওআটসন বললেন, এক্সকিউজ মি মুস্তোফী বাবু, দাড়িটা কামিয়ে ফেলো। গুড বাই।

রাখাল বিকালে চারটের সময় সাবিত্রীর কাছে গিয়ে রাত সাড়ে আটটায় ফিরে এল। তার ছাত্র নারান বারান্দায় বসে ছিল। রাখাল বলল, কে ও নারান নাকি? হ্যারিকেনটা উসকে দে।

আলো বাড়িয়ে দিয়ে নারান বলল, একি মাস্টার মশায়, আপনাকে যে চেনাই যায় না!

—দাড়িটা কামিয়ে ফেলেছি। এত রাত্রে তুই যে এখানে?

—বাঃ ভুলে গেছেন! আপনি যে বলেছিলেন, আজ সন্ধ্যেবেলা ব্যাট্‌ল অভ সেজমুর পড়াবেন।

—দুত্তোর সেজমুর, ও আর এক দিন হবে। আজ ট্রামে আসতে আসতে কি একটা বানিয়েছি শুনবি?—বরষে ধারা, ভূমি শীতল, তাপিত তরু পেয়েছে জল; টানিছে রস তৃষিত মূল, ধরিবে পাতা ফুটিবে ফুল। তোদের হেম বাঁড়ুজ্যে নবীন সেন পারে এমন লিখতে?

১৩৬১ (১৯৫৪)

তিলোত্তমা

সিদ্ধিনাথের নাম আপনারা শুনে থাকবেন।* বিদ্যার খ্যাতি আছে, সরকারী কলেজে পড়াতেন, কিন্তু মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ায় চাকরি ছেড়ে প্রায় তিন বৎসর নিষ্কর্মা হয়ে বাড়িতে বসে ছিলেন। এখন ভাল আছেন, শিবচন্দ্র কলেজে পড়াচ্ছেন। সম্প্রতি কুবুদ্ধির সম্বন্ধে থিসিস লিখে পিএচ. ডি. ডিগ্রী পেয়েছেন।

সিদ্ধিনাথের বাল্যবন্ধু উকিল গোপাল মুখুজ্যের বাড়িতে যথারীতি সান্ধ্য আড্ডা বসেছে। উপস্থিত আছেন—গোপালবাবু, তাঁর পত্নী নমিতা, নমিতার ছোট বোন (সিদ্ধিনাথের ভূতপূর্ব ছাত্রী) অসিতা, অসিতার স্বামী রমেশ ডাক্তার, আর সিদ্ধিনাথ। সিদ্ধিনাথের বাড়ি খুব কাছে। তাঁর স্ত্রী নবদুর্গা একটু সেকেলে, এই মেয়ে-পুরুষের আড্ডায় তিনি আসেন না।

আড্ডারম্ভে গোপালবাবু বললেন, ওহে সিদ্ধিনাথ, তুমি ডক্টরেট পেয়েছ তাতে আমরা সবাই খুশী হয়েছি। সম্মান তোমার বিদ্যের তুলনায় অবশ্য কিছুই নয়, তবে শোনায় ভাল—ডক্টর সিদ্ধিনাথ ভট্টাচার্জি। নমিতা তোমাকে আর অশ্রদ্ধা করতে পারবে না।

নমিতা বললেন, ডক্টর একটা নিতান্ত বাজে উপাধি, গণ্ডা গণ্ডা ডক্টর পথেঘাটে গড়াগড়ি যাচ্ছে। আমি ও'কে একটি ভাল উপাধি দিচ্ছি—বকবক্তা।

অসিতা বলল, মানে কি দিদি?

—মানে খুব সোজা। যে বকে সে বক্তা, আর যে বকবক করে সে বকবক্তা।

সিদ্ধিনাথ বললেন, থ্যাংক ইউ নমিতা দেবী, আপনার প্রদত্ত উপাধিটির মর্যাদা রাখতে আমি সর্বদাই চেষ্টা করব।

নমিতা বললেন, তবে আর সময় নষ্ট করেন কেন, আপনার বকবক্তৃতা এখনই শুরু করুন না।

—কোন্ বিষয় শুনতে চান? শংকরের অদ্বৈতবাদ, মার্কসের দ্বান্দ্বিক জড়বাদ, শরীরতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব না পরলোকতত্ত্ব?

গোপালবাবু বললেন, ওসব নীরস তত্ত্ব শুনতে চাই না। প্রেমের কথা যদি তোমার কিছু জানা থাকে তো তাই বল।

—হাড়ে হাড়ে জানা আছে। আমি নিজেই একবার বিশ্রী রকম প্রেমে পড়েছিলুম।

নমিতা বললেন, আস্পর্ধা কম নয়! বাড়িতে পাহারাওয়ালী গিন্নী থাকতে প্রেমে পড়লেন কোন্ আক্কেলে? বলতে লজ্জা হয় না?

—মানুষের যা স্বাভাবিক ধর্ম তা স্বীকার করতে লজ্জা হবে কেন। আপনার মুখেই তো শুনেছি যে অসিতার বউভাতের ভোজে আপনি গবগব করে চার গণ্ডা ভেটকি মাছের ফ্রাই খেয়েছিলেন। তার জন্যে তো আপনাকে রাক্কুসী কি মেছো-পেতনী বলছি না।

* সিদ্ধিনাথের পূর্বকথা "গল্পকল্প" পুস্তকে আছে।

গোপালবাবু বললেন, আঃ ঝগড়া কর কেন। নমিতা, সিধুকে বলতে দাও, তোমার মন্তব্য শেষে ক'রো।

সিদ্ধিনাথ বলতে লাগলেন।—ব্যাপারটা ঘটেছিল আমার বিবাহের আগে, গিন্নী থাকতে প্রেম হবার জো কি! তখন বয়স বাইশ-তেইশ, পোস্টগ্রাজুয়েটে পড়ি, বাবা মা দুজনেই বর্তমান। ওহে রমেশ ডাক্তার, তোমাদের শাস্ত্রে এই কথা বলে তো— কোনও দেশে একটা নতুন ব্যাধি যদি আসে তবে প্রথম প্রথম তা মারাত্মক হয়, কিন্তু দু-এক শ বছর পরে তার প্রকোপ অনেক কমে যায়?

রমেশ বলল, আজ্ঞে হাঁ, কোনও কোনও রোগের বেলা তাই হয় বটে।

—প্রেমও সেই রকম ব্যাধি। এর তিন দশা আছে। প্রাইমারি স্টেজে প্রেম হল নাইণ্টি পারসেণ্ট লালসা, টেন পারসেণ্ট ভালবাসা। সেকণ্ডারি স্টেজে হাফ অ্যান্ড হাফ। টারশারিতে প্রায় সবটাই ভালবাসা, নামমাত্র লালসা। পুরাকালে পূর্বরাগ অর্থাৎ প্রেমের প্রথম আক্রমণ অতি সাংঘাতিক হত। কাদম্বরীতে বাণভট্ট লিখেছেন— মহাশ্বেতার প্রেমে পড়ে পুণ্ডরীক হার্ট ফেল করে মারা যায়।আরব্য উপন্যাসের অনেক নায়ক-নায়িকা প্রেমে শয্যাশায়ী হত। অমন যে জবরদস্ত রাজর্ষি আরংজেব বাদশা, তিনিও প্রথম যৌবনে গোলকণ্ডার এক নবাবনন্দিনীকে দেখে মরণাপন্ন হয়েছিলেন। আজকাল এরকম বড় একটা দেখা যায় না, কারণ মেয়ে পুরুষ সবাই খুব হিসেবী হয়েছে, তা ছাড়া দেদার প্রেমের গল্প প'ড়ে আর সিনেমার ছবি দেখে খানিকটা ইমিউনিটিও এসেছে। কিন্তু দৈবক্রমে আমি যে প্রেমের কবলে পড়েছিলুম তা সেই সেকেলে ভিরুলেণ্ট টাইপের। তবে বেশী ভুগতে হয়নি, পাঁচ দিনের মধ্যেই সেরে উঠি।

নমিতা বললেন, কিসে সারল, পেনিসিলিন না খ্যাপা কুকুরের ইনজেকশনে?

—ওষুধের কাজ নয়। গুরুর কৃপায় সেরেছিল।

—আপনি তো পাষণ্ড লোক, আপনার আবার গুরু কে?

—যিনি জ্ঞানদাতা বা শিক্ষাদাতা তিনিই গুরু। সম্প্রতি আমার দুটি গুরু জুটেছে—আমার ছাত্র পরাশর হোড়, আর এ পাড়ার বকাটে ছোকরা গুলচাঁদ। পরাশরের কাছে কবিতা রচনা শিখছি, আর গুলচাঁদের কাছে বাইসিক্‌ল চড়া।

অসিতা বলল, সার, আপনি তো বলতেন যে কাব্যচর্চা আর গাঁজা খাওয়া দুই সমান, তবে শিখছেন কেন? কিছু লিখছেন নাকি?

—রাম বল। লেখবার জন্যে শিখছি না, শুধু কবিতা লেখার প্যাঁচটা জানতে চাই। আর বাইসিক্‌ল শিখছি ট্রাম-বাসের ভাড়া বাঁচাবার জন্যে। দেখ অসিতা, কবিতা লেখা অতি সোজা কাজ, মাস খানিক প্র্যাকটিস করলে তুমিও পারবে, হয়তো তোমার দিদিও বছর খানিক চেষ্টা করলে পারবেন। কেন যে লোকে কবিদের খাতির করে—

নমিতা বললেন, বাজে কথা রাখুন। কার সঙ্গে প্রেম হয়েছিল? অত চট করে সারলই বা কি করে? প্রতিদ্বন্দ্বী আপনাকে ঠেঙিয়েছিল নাকি?

—ধৈর্য ধরুন, যথাক্রমে সবই শুনবেন। প্রেমে পড়ার চার-পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই কাবু হয়েছিলুম। আহারে রুচি নেই, মাথা টিপটিপ করে, বুক ঢিপঢিপ করে, ঘুম মোটেই হয় না, লেখাপড়া চুলোয় গেল, চব্বিশ ঘণ্টা শয্যাশায়ী। মা বললেন, হাঁরে সিধু, তোর হয়েছে কি? কপালটা যেন ছ্যাঁকছ্যাঁক করছে। বাবা ডাক্তার ডাকালেন। নাড়ী জিব

বুক পেট সব দেখে ডাক্তার বললেন, ডেংগু মনে হচ্ছে, ভয়ের কারণ নেই, নড়াচড়া বন্ধ রাখবে, লিকুইড ডায়েট চলবে। এক আউন্স ক্যাস্টর অয়েল এখনই খাইয়ে দিন, আর দশ গ্রেন কুইনীন নেবুর রস দিয়ে জলে গুলে এবেলা একবার ওবেলা একবার। মুখটা তোতো রাখা দরকার।

রামদাস কাব্যসাংখ্যবেদান্তচুঞ্চু তখন ইউনিভার্সিটিতে প্রাচ্যদর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। এখন তিনি নাগপুরে আছেন। বয়স বেশী নয়, আমার চাইতে ছ-সাত বছরের বড়। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতরা একটু রসিক হয়ে থাকেন। রামদাসও রসিক লোক, ছাত্রদের সঙ্গে ইয়ার্কি দিতেন, কিন্তু সকলেই তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করত। আমাকে তিনি বিশেষ রকম স্নেহ করতেন, কারণ বিদ্যায় আর রূপে আমিই ক্লাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলুম।

নমিতা বললেন, জন্ম ইস্তক বিদ্যের জাহাজ ছিলেন তা না হয় মানলুম, কিন্তু রূপ আবার কোথায় পেলেন? এই তো গুলিখোরের মতন চেহারা, গরুর মতন ড্যাবডেবে চোখ, শুয়োরকুঁচির মতন চুল—

—সকলেই আপনার মতন অন্ধ নয়, সমঝদার রূপদর্শী লোক ঢের আছে। দু দিন আমাকে ক্লাসে দেখতে না পেয়ে চুঞ্চু মশায় জিজ্ঞাসা করলেন, সিদ্ধিনাথ কামাই করছে কেন? ছাত্ররা বলল, তার ভারী অসুখ। আমার বাবার সঙ্গে তাঁর বাবার বন্ধুত্ব ছিল, সেই সূত্রে চুঞ্চু মশায় মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসতেন। অসুখ শুনে আমাকে দেখতে এলেন।

নমিতা বললেন, বকবক করে শুধু বাজে কথা বলছেন। প্রেমে পড়লেন অথচ প্রেমপাত্রীটির কোনও খবর নেই। তার নাম কি, পরিচয় কি, দেখতে কেমন, সব বৃত্তান্ত খুলে বলুন, আপনার রামদাস চুঞ্চুর কথা শুনতে চাই না।

—ব্যস্ত হবেন না, কি জাতি কি নাম ধরে কোথায় বসতি করে সবই শুনতে পাবেন। মেয়েটি দেখতে কেমন তা জানবার জন্যে ছটফট করছেন, নয়? আচ্ছা এখনই বলে দিচ্ছি—অতি সুশ্রী গৌরী তন্বী, আপনার মতন গোবদা নয়, হিংসুটেও নয়। গোপাল কি দেখে যে আপনার প্রেমে মজেছে তা বুঝতেই পারি না।

—বোঝাবার কোনও দরকার নেই, পরচর্চা না করে নিজের কথা বলুন।

—শুনুন। চুঞ্চু মশায় যখন দেখতে এলেন তখন আমার ঘরে আর কেউ ছিল না। আমি চিতপাত হয়ে বিছানায় শুয়ে আছি, কপালে ওডিকলোনের পটি, চোখে উদাস করুণ দৃষ্টি, মুখ দিয়ে মাঝে মাঝে আঃ ইঃ উঃ এঃ ওঃ প্রভৃতি কাতর ধ্বনি বেরুচ্ছে।

রামদাস প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে সিদ্ধিনাথ?

বললুম, কি জানি সার। শরীর অত্যন্ত খারাপ, বড় যন্ত্রণা, আমি আর বাঁচব না।

চুঞ্চু মশায় আমার নাড়ী দেখলেন, চোখ দেখলেন, বুক আর পিঠে হাত বুলুলেন। তার পর ঠোঁট কুঁচকে মাথা নেড়ে বললেন, হুঁ, সব লক্ষণ মিলে যাচ্ছে।

—কিসের লক্ষণ পণ্ডিত মশায়?

—সাত্ত্বিক বিকারের অষ্ট লক্ষণ প্রকট হয়েছে—স্তম্ভ স্বেদ রোমাঞ্চ স্বরভঙ্গ বেপথু বৈবর্ণ্য অশ্রু মূর্ছা।

সাত্ত্বিক বিকার মানে কি সার?

—মানে, তুমি ঘোরতর প্রেমে পড়েছ, সুদুস্তর পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে হাবুডুবু খাচ্ছ। ঠিক বলেছি কি না?

আমি ঢাকবার চেষ্টা করলুম না, বললুম, আজ্ঞে ঠিক।

—পাত্রীটি কে? নাম-ধাম বলে ফেল, যদি অলঙ্ঘনীয় বাধা না থাকে তবে সম্বন্ধের চেষ্টা করব।

—কোনও আশা নেই সার, বৈবাহিক অবৈবাহিক কোনও সম্পর্কই হবার জো নেই। আমার নাগালের একদম বাইরে।

চণ্ডু মশায় বললেন, যদি নাগালের বাইরেই হয় এবং কোনও আশা না থাকে তবে বৃথা তার চিন্তা করছ কেন? মন থেকে একেবারে মুছে ফেল।

—চেষ্টা তো করছি, কিন্তু পারছি না যে।

—আচ্ছা, তার ব্যবস্থা আমি করছি। আগে তার পরিচয় দাও।

আমি সবিস্তারে পরিচয় দিলুম। তাকে সিনেমায় দেখেছি, তিলোত্তমা-ছবিতে নায়িকার পার্টে—

নমিতা বললেন, আরে রাম রাম, ছি ছি, এত ভনিতার পর সিনেমার অ্যাকট্রেস! ইস্কুলের চ্যাংড়া ছেলেরাই তো সে রকম প্রেমে পড়ে। ডক্টর সিদ্ধিনাথ বকবক্তার নজর অত ছোট তা মনে করি নি, উঁচুদরের কিছু আশা করেছিলুম। অন্তত একটি পিস্তল-ওয়ালী অগ্নিদিদি, কিংবা নাটোরের বনলতা সেন।

অসিতা বলল, অমন আশা তোমার করাই অন্যায় দিদি, এঁর তো তখন কম বয়স, ডক্টর বা বকবক্তা কোনও খেতাবই পান নি।

সিদ্ধিনাথ বললেন, ছি ছি করবার কোন কারণ নেই, আমার মনোরথে আকাশের নক্ষত্র জোতা ছিল। তিলোত্তমা ছবিতে সে নায়িকা সাজত, তার নিজের নামও তিলোত্তমা। তার বাপ আর ঠাকুদ্দা বাঙালী, ঠাকুমা বর্মী, মা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, দিদিমা ইংরেজ, দাদামশায় পঞ্জাবী। অ্যাভারেজ বাঙালী মেয়ে মোটেই সুশ্রী নয়। জারুল কাঠের মতন গায়ের রং, ছোট ছোট চোখ, এ কান থেকে ও কান পর্যন্ত মুখের হাঁ—যেন ইঁদুর ধরা জাঁতিকল, মোটা ঠোঁট, থুতনি এতটুকু। বিশ্বাস না হয় তো আরশিতে মুখ দেখবেন।

নমিতা বললেন, বাঙালী পুরুষদের চেহারা কেমন তা শুনবেন? চোয়াড়ে গড়ন, আবলুস কাঠের মতন রং—

সিদ্ধিনাথ হাত নেড়ে বললেন, থামুন, থামুন, যা বলবার গোপালকে আড়ালে বলবেন, অন্যের কাছে পতিনিন্দা মহাপাপ। যা বলছিলাম শুনুন। তিলোত্তমার দেহে চার জাতের রক্ত মিশেছিল, সেজন্যই সে অসাধারণ সুন্দরী। গোড়ালি পর্যন্ত চুল, চাঁপা ফুলের মতন রং—

অসিতা বলল, রং কি করে টের পেলেন সার? তখন তো টেকনিকলার হয় নি।

—রংটা অনুমান করেছিলুম। লম্বা ছিপছিপে গড়ন, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী, চকিত-হরিণীপ্রেক্ষণা, পীনস্তনী, নিবিড়নিতম্বা। কালিদাস যাকে বলেছেন—যুবতী বিষয়ে বিধাতার আদ্যা সৃষ্টি।

নমিতা বললেন, বিধাতার সৃষ্টি থোড়াই, আপনি আদেখলে হাঁদা ছিলেন তাই আসল রূপ টের পান নি। রং সুর্মা পরচুল তুলো আর খড় দিয়ে কি গড়া যায় তার কোনও আইডিয়াই আপনার নেই।

—হুঁ, রামদাস চণ্ডুও তাই বলেছিলেন বটে। তারপর শুনুন। তিলোত্তমার গলার আওয়াজ এত মিষ্টি যে তা বলবার নয়।

—উপমা খুঁজে পাচ্ছেন না? রূপুলী কণ্ঠস্বর বলা চলবে?

—ও হল ইংরিজীর অন্ধ নকল, কণ্ঠস্বর সোনালী রুপুলী হয় না। সোনা রুপোর আওয়াজও ভাল নয়। বরং স্টীলের তারের সঙ্গে তুলনা দেওয়া যেতে পারে, যেমন বীণার ঝংকার কিংবা দামী ঘড়ির গংএর ডিং ডং। তার পর শুনুন। রামদাস চুণ্ডু তিলোত্তমার বিবরণ শুনে প্রশ্ন করলেন, তার সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে?

বললুম, আলাপ কোত্থেকে হবে সার, সে থাকে বোম্বাইএ। তাকে কোনও দিন সশরীরে দেখি নি, শুধু ছবিতেই তার মূর্তি দেখেছি, ছবিতেই তার কথা আর গান শুনেছি।

চুণ্ডু মশায় সহাস্যে বললেন, বেশ বেশ! কায়া দেখ নি, শুধু ছায়া দেখেছ! এখন শুয়ে শুয়ে ছায়াও দেখছ না, শুধু মায়া দেখছ। ভয় নেই, আমি তোমাকে উদ্ধার করব। সাংখ্য দর্শনে বলে—প্রকৃতি এক, আর পুরুষ অনেক। পুরুষ আসলে শুদ্ধ বুদ্ধ নির্বিকার, কিন্তু তার সামনে যখন প্রকৃতি সেজেগুজে নৃত্য করে তখন পুরুষের বিকার হয়, সে ভবযন্ত্রণা ভোগ করে। প্রজ্ঞা লাভ করলেই পুরুষের নেশা ছুটে যায়, প্রকৃতি অন্তর্হিত হয়। তুমি একজন পুরুষ, তিলোত্তমারূপা প্রকৃতি তোমার সামনে নেচেছিল, এখনও তোমার মনের মধ্যে নাচছে, তাই তোমার এই দুর্দশা। বৎস সিদ্ধিনাথ, প্রবুদ্ধ হও, তোমার পৌরুষ দেখাও, প্রকৃতিকে ধমক দিয়ে বল, দূর হ মায়াবিনী, ভাগো, গেট আউট। ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মোহমুক্ত হয়ে কৈবল্য লাভ কর।

আমি বললুম, ওসব তত্ত্বকথায় কিছুই হবে না সার।

—বেশ, সাংখ্যে যদি কাজ না হয় তবে অদ্বৈতবাদ শোন। এই জগতে হরেক রকম যা দেখছ তার কোনও অস্তিত্ব নেই, শুধুই মায়া। একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, তিনি পুরুষ নন, স্ত্রী নন, ক্লীবলিঙ্গ. এবং তুমিই সেই ব্রহ্ম।

—বলেন কি সার! আপনি ব্রহ্ম নন?

—আমিও ব্রহ্ম। তিলোত্তমা, তোমার সহপাঠীরা, তোমাদের ভাইসচ্যান্সেলার, প্রত্যেকেই ব্রহ্ম। সবাই এক, শুধু মায়ার জন্য আলাদা আলাদা বোধ হয়।

—আপনি বলতে চান তিলোত্তমা আর আমাদের বাড়ির কুঁজী বুড়ী ঝি দুইই এক।

—তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সুন্দর বা কুৎসিত, সাধু বা অসাধু, সব তুল্যমূল্য, এক পরমাত্মা সর্বভূতে বিরাজমান। বোকা লোক মনে করে এক সের তুলোর চাইতে এক সের লোহা বেশী ভারী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুইএরই ওজন সমান।

—মানি না সার। আপনি নীচের ওই উঠনে দাঁড়ান, আমি দোতালা থেকে আপনার মাথায় এক সের তুলো ফেলব, তার পর এক সের লোহা ফেলব। তার পরেও যদি বেঁচে থাকেন তবে আপনার কথা মানব।

অট্টহাস্য করে চুণ্ডু মশায় বললেন, ওহে সিদ্ধিনাথ, গুরুমারা বিদ্যে এখনও তোমার হয় নি, একটু সায়েন্স পড়ো। তুমি গুরুত্ব আর আপেক্ষিক গুরুত্ব, ভার আর সংঘাত গুলিয়ে ফেলেছ।

আমি বললুম, যাই বলুন, সার, আপনার অদ্বৈতবাদে কোনও ফল হবে না। তিলোত্তমা হচ্ছে অলোকসামান্যা নারী, তার সঙ্গে কারও তুলনাই হতে পারে না। তার চেহারা অভিনয় আর গান আমাকে জাদু করেছে।

চুণ্ডু মশায় বললেন, তবে কাণ্ডজ্ঞান প্রয়োগ কর, যাকে বলে কমন সেন্স! পক্ষীরাজ ঘোড়া, আকাশকুসুম, শিংওয়ালা খরগোশ এ সবে বিশ্বাস কর?

—আজ্ঞে না, ওসব তো কল্পনা, কিন্তু তিলোত্তমা বাস্তব।

—একবারেই ভুল। কবি খুব হাতে রেখেই বলেছেন, অর্ধেক কল্পনা তুমি অর্ধেক মানবী। তোমার তিলোত্তমা অর্ধেক নয়, পনরো আনা কল্পনা। তুমি তার কতটুকু জান হে ছোকরা? তার মূর্তিটা জোড়াতালি দিয়ে তৈরী; তার ভাষা নিজের নয়, নাট্যকারের; তার গানও নিজের নয়, অন্য মেয়ে আড়াল থেকে গেয়েছে। একটা কৃত্রিম মানবীর চিত্রার্পিতা ছায়া দেখে তুমি ভুলেছ। তার মেজাজ তুমি জান না, হয়তো খেঁকী কুঁদুলী, হয়তো নেশা করে, হয়তো দেমাকে মটমট করছে, হয়তো তার কালচারও বিশেষ কিছু নেই।

একটু ভেবে আমি বললুম, পণ্ডিত মশায়, আপনার কথা শুনে এখন মনে পড়ছে—তিলোত্তমা সরোবরকে সড়োবড়, জিহ্বাকে জেহোভা, আর প্রেমকে ফ্রেম বলেছিল।

—তবেই বোঝ। তুমি আবার ভীষণ খুঁতখুঁতে। যদি তোমাদের মিলন হয়, তার সঙ্গে তুমি যদি ঘর কর, তবে দুদিনেই তার গ্ল্যামার লোপ পাবে। সেকালে কোলকাতায় একজন অতি শৌখিন বনেদী বড়লোক ছিলেন। তিনি রোজ সন্ধ্যায় তাঁর রূপসী রক্ষিতার বাড়িতে যেতেন, দুপুর রাতে বাড়ি ফিরতেন। কোনও কারণে দুদিন তিনি যেতে পারেন নি। বিরহ যন্ত্রণা সইতে না পেরে তৃতীয় দিনে ভোর বেলায় তিনি হাজির হলেন। দেখলেন, তাঁর প্রেয়সী গামছা পরে গাড়ু হাতে কোথায় চলেছেন। তাই দেখে ভদ্রলোক আকাশ থেকে পড়ে বললেন, এঃ, তুমি—তুমি—

নমিতা বললেন, আপনি অতি অসভ্য, মুখে কিছুই বাধে না।

—ও তো আমি বলি নি, গুরুমুখে যা শুনেছি তাই আবৃত্তি করেছি। প্রেয়সীর সেই অদৃষ্টপূর্ব প্রাকৃত রূপ দেখে ভদ্রলোকের মোহ কেটে গেল, তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করে বৃন্দাবনবাসী হলেন।

নমিতা বললেন, আপনার নিজের কি হল তাই বলুন।

—তারপর চুণ্ডু মশায় বললেন, ওহে সিদ্ধিনাথ, এখন তোমাকে আসল তিলোত্তমার ইতিহাস বলছি শোন। সুন্দ উপসুন্দ দুই ভাই ছিল হরিহরাত্মা। তাদের উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত হয়ে দেবতারা ব্রহ্মার শরণ নিলেন। ব্রহ্মা বললেন, ভয় নেই, আমি দুদিনেই ওদের সাবাড় করে দিচ্ছি। তিনি ব্রাহ্মীমায়ায় এক সিন্থেটিক ললনা সৃষ্টি করলেন। জগতের যাবতীয় সুন্দর বস্তুর তিল তিল উপাদানের সংযোগে তৈরী সেজন্য তার নাম হল তিলোত্তমা। তার ট্রায়াল দেখবার জন্য দেবতারা ব্রহ্মসভায় সমবেত হলেন। ব্রহ্মার চার দিকে ঘুরে ঘুরে তিলোত্তমা নাচতে লাগল। পিতামহ প্রবীণ লোক, চক্ষুলজ্জা আছে, ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে পারেন না, অথচ দেখবার লোভ ষোল আনা। অগত্যা তাঁর ঘাড়ের চার দিকে চারটে মুণ্ডু বার হল। ইন্দ্রের সর্বাঙ্গে সহস্র লোচন ফুটে উঠল, তাই দিয়ে তিনি চোঁ চোঁ করে তিলোত্তমার রূপসুধা পান করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ নাচ দেখে ব্রহ্মা বললেন, বাঃ, খাসা হয়েছে, এখন তুমি সুন্দ উপসুন্দর কাছে গিয়ে তাদের সামনে নৃত্য কর। তিলোত্তমা তাই করল। তাকে দখল করবার জন্য দুই ভাই কাড়াকাড়ি মারামারি করে দুজনেই মরল। দেবতারা নিরাপদ হলেন। ইন্দ্র বললেন, তিলোত্তমা, আমার সঙ্গে অমরাবতীতে চল, শচীকে বরখাস্ত করে তোমাকেই ইন্দ্রাণী করব। বিষ্ণু বললেন, খবরদার, তিলোত্তমার দিকে নজর দিও না, ও বৈকুণ্ঠে যাবে, আমার পদসেবা করবে। মহেশ্বর বললেন, ওহে বিষ্ণু, তোমার তো বিস্তর সেবাদাসী আছে, তিলোত্তমা আমার সঙ্গে

কৈলাসে যাবে, পার্বতীর একজন ঝি দরকার। তখন ব্রহ্মা বেগতিক দেখে বললেন, তিলোত্তমে, স্ফট স্ফট স্ফোটয় স্ফোটয়! তিলোত্তমা দড়াম করে ফেটে গেল অ্যাটম বোমার মতন। তার সমস্ত সত্তা বিশিলষ্ট হল, যে উপাদান যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই ফিরে গেল—কান্তি বিদ্যুল্লতায়, কেশরাশি মেঘমালায়, মুখচ্ছবি পূর্ণচন্দ্রে, দৃষ্টি মৃগলোচনে, ওষ্ঠরাগ পক্ক বিম্বে, দন্তরুচি কুন্দকলিকায়, কণ্ঠস্বর বেণুবীণায়, বাহু মৃণালদণ্ডে, পয়োধর বিল্বফলে, নিতম্ব করিকুম্ভে, উরু কদলীকাণ্ডে। পড়ে রইল শুধু একটু রেডিও-অ্যাকটিভ ধোঁয়া।

অসিতা বলল, তিলোত্তমার মন কোথায় ফিরে গেল তা তো বললেন না সার।

—তার মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার কিছুই ছিল না, আত্মাও ছিল না। তিলোত্তমা একটা রোবট। পুরাণকথা শেষ করে চুণ্ডু মশায় প্রশ্ন করলেন, বৎস সিদ্ধিনাথ, এখন কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করছ কি? মোহ অপগত হয়েছে?

আমি লাফ দিয়ে উঠে বললুম, একদম সেরে গেছি সার। আমার মানসী তিলোত্তমাও এক্সপ্লোড করে বিলীন হয়েছে।

চুণ্ডু মশায় বললেন, এখনও বলা যায় না, কিছু ধোঁয়া থাকতে পারে। দেখ সিদ্ধিনাথ, তোমার চটপট বিবাহ হওয়া দরকার, তোমার বাপ মায়েরও সেই ইচ্ছা। আমার ছোট শালী নবদুর্গা দেখতে নেহাত মন্দ নয়, কাল বিকেলে আমাদের বাড়িতে এসে তাকে একবার দেখো।

আমি উত্তর দিলুম, দেখবার দরকার নেই সার। ছায়া দেখে একবার ভুলেছি, কায়া দেখে আর ভুলতে চাই না। ওই নবদুর্গা না বনদুর্গা কি নাম বললেন ওকেই বিয়ে করব। আপনি যখন বলছেন তখন আর কথা কি।

চুণ্ডু মশায় বললেন, ঠিক বলেছ সিদ্ধিনাথ। দশ মিনিট দেখে তুমি কি আর বুঝবে, আমি ত দশ বছরেও নবদুর্গার দিদি জয়দুর্গার ইয়ত্তা পাই নি। বিবাহ হয়ে যাক, তার পর ধীরে সুস্থে যত দিন খুশি দেখো।

তার পর চুণ্ডু মশায় বাবাকে বললেন, বাবা মা রাজী হলেন, দু মাসের মধ্যে নবদুর্গার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল।

গোপালবাবু বললেন, সিদ্ধিনাথের ইতিহাস তো শেষ হল, এখন নমিতা তোমার মন্তব্য বলতে পার।

নমিতা বললেন, আপনার গিন্নীকে এই কেচ্ছা শুনিয়েছেন?

সিদ্ধিনাথ বললেন, শুনিয়েছি। আরও অনেক রকম জীবনস্মৃতি তাঁকে বলেছি, কিন্তু পতিবাক্যে তাঁর আস্থা নেই, আমার কোনও কথাই তিনি বিশ্বাস করেন না।

—জীবনস্মৃতি না ছাই, বকবক করে আবোলতাবোল বানিয়ে বলেছেন। আগাগোড়া মিথ্যে, শুধু নবদুর্গা সত্যি।

১৩৬১(১৯৫৪)

জটাধরের বিপদ

নূতন দিল্লীর গোল মার্কেটের পিছনের গলিতে কালীবাবুর বিখ্যাত দোকান ক্যালকাটা টি ক্যাবিন। এই আড্ডাটির নাম নিশ্চয়ই আপনারা শুনেছেন।

সতরোই পৌষ, সন্ধ্যা ছটা। পেনশনভোগী বৃদ্ধ রামতারণ মুখুজ্যে, স্কুল-মাস্টার কপিল গুপ্ত, ব্যাংকের কেরানী বীরেশ্বর সিংগি, কাগজের রিপোর্টার অতুল হালদার এবং আরও অনেকে আছেন। আজ নিউইয়ার্স ডে, সেজন্য ম্যানেজার কালীবাবু একটু বিশেষ আয়োজন করেছেন। মাংসের চপ তৈরি হচ্ছে। রামতারণ-বাবু নিষ্ঠাবান সাত্ত্বিক লোক, কালীবাড়ির বলি ভিন্ন অন্য মাংস খান না। তাঁর জন্য আলাদা উনুনে মাছের চপ ভাজবার ব্যবস্থা হয়েছে।

সিগারেট তামাক আর চপ ভাজার ধোঁয়ায় ঘরটি ঝাপসা হয়ে আছে, বিচিত্র গন্ধে আমোদিত হয়েছে। উপস্থিত ভদ্রলোকদের জনকয়েক পাশা খেলছেন, কেউ খবরের কাগজ পড়ছেন, কেউ বা রাজনীতিক তর্ক করছেন।

অতুল হালদার বললেন, ওহে কালীবাবু, আর দেরি কত? চায়ের জন্যে যে প্রাণটা চ্যাঁ চ্যাঁ করছে। কিন্তু খালি পেটে তো চা খাওয়া চলবে না, চটপট খানকতক ভেজে ফেল।

কালীবাবু বললেন, এই যে সার, আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই চপ রেডি হয়ে যাবে।

এমন সময় জটাধর বকশী প্রবেশ করলেন।* চেহারা আর সাজ ঠিক আগের মতনই আছে, ছ ফুট লম্বা মজবুত গড়ন, কাইজারী গোঁফ, গায়ে কালচে-খাকী মিলিটারী ওভারকোট, মাথায় পাগড়ির মতন বাঁধা কম্ফর্টার, অধিকন্তু কপালে গুটি-কতক চন্দনের ফুটকি আর গলায় একছড়া গাঁদা ফুলের মালা। ঘরে ঢুকেই বাজখাই গলায় বললেন, নমস্কার মশাইরা, খবর সব ভাল তো।

বীরেশ্বর সিংগি একটু আঁতকে উঠলেন, রামতারণবাবু রেগে ফুলতে লাগলেন। কপিল গুপ্ত সহাস্যে বললেন, আসতে আজ্ঞা হক জটাধরবাবু, আপনি বেঁচে উঠেছেন দেখছি! আজকেও ভূত দেখাবেন নাকি?

পটকার মতন ফেটে পড়ে রামতারণবাবু বললেন, তোমাকে পুলিসে দেব, বেহায়া ঠক জোচ্চোর! ভূত দেখাবার আর জায়গা পাও নি!

জটাধর বকশী প্রসন্নবদনে বললেন, মুখুজ্যে মশায়ের রাগ হবারই কথা, আমার রসিকতাটা একটু বেয়াড়া রকমের হয়েছিল তা মানছি। মরা মানুষ সেজে আপনা-দের ভয় দেখিয়েছিলুম সেটা ঠিক হয় নি। তার জন্য আমি ভেরি সরি। মশাইরা যদি একটু ধৈর্য ধরে আমার কথা শোনেন তো বুঝবেন আমার কোন কুমতলব ছিল না।

রামতারণ মুখুজ্যে ক্রুদ্ধ বিড়ালের ন্যায় মৃদুমন্দ গর্জন করতে লাগলেন। কপিল গুপ্ত বললেন, কি বলতে চান বলুন জটাধরবাবু।

* জটাধরের পূর্বকথা 'কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প' পুস্তকে আছে।

অতুল হালদারের পাশে বসে পড়ে জটাধর বললেন, মশাইরা নভেল পড়ে থাকেন নিশ্চয়? প্রেমের গল্প, বড় ঘরের কেচ্ছা, ডিটেকটিভ কাহিনী, রূপসী বোম্বেটে, এই সব? তার জন্যে কিছু পয়সাও খরচ করে থাকেন। কিন্তু বলুন তো, গল্পের বইএ কিছু সত্যি কথা পান কি? আজ্ঞে না, আপনারা জেনে শুনে পয়সা খরচ করে ডাহা মিথ্যে কথা পড়েন, তা শরৎ চাটুজ্যেই লিখুন আর পাঁচকড়ি দেই লিখুন। কেন পড়েন? মনে একটু ফুর্তি একটু সুড়সুড়ি একটু টিপুনি একটু ধাক্কা লাগাবার জন্যে। গল্প হচ্ছে মনের ম্যাসাজ, চিত্তের ডলাইমলাই, পড়লে মেজাজ চাঙ্গা হয়। আমি কি-এমন অন্যায় কাজটা করেছি মশাই? রামতারণবাবু প্রবীণ লোক, ওঁকে ভক্তি করি, ওঁর সামনে তো ছ্যাবলা প্রেমের কাহিনী বলতে পারি না, তাই নিজেই নায়ক সেজে একটি নির্দোষ পবিত্র ভূতের গল্প আপনাদের শুনিয়েছিলুম।

রামতারণ বললেন, তোমার চা চুরুট পানের জন্যে আমার যে সাড়ে চোদ্দ আনা গচ্চা গিয়েছিল তার কি?

—তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ। ছ-সাত টাকার কমে আজকাল একটা ভাল গল্পের বই মেলে না সার। আমি সেদিন অতি সস্তায় আপনাদের মনোরঞ্জন করেছিলুম।

কপিল গুপ্ত বললেন, যাই হক, কাজটা মোটেই ভাল করেন নি, আচমকা সবাইকে একটা শক দেওয়া অতি অন্যায়। আর একটু হলেই তো বীরেশ্বরবাবুর হার্ট ফেল হত।

জটাধর হাত জোড় করে বললেন, আচ্ছা সে অপরাধের জন্যে মাপ চাচ্ছি, আজ তার দণ্ডও দেব। ও ম্যানেজার কালীবাবু মশাই, বিস্তর চপ ভাজছেন দেখছি, এক-একটার দাম কত? ছ আনা? বেশ বেশ। তা সস্তাই বলতে হবে, বড় বড় করেই গড়েছেন। ভাল মাস্টার্ড আছে তো? ছাতু গোলা নকল মাস্টার্ড চলবে না, তা বলে দিচ্ছি। এই ঘরে তেরো জন খাইয়ে রয়েছেন দেখছি, আমাকে আর কালীবাবুকে নিয়ে পনরো জন। প্রত্যেকে যদি গড়ে চারখানা করে চপ খান তা হলে পনরো ইণ্টু চার ইণ্টু ছ আনা, তাতে হয় সাড়ে বাইশ টাকা। তার সঙ্গে চা কেক পান তামাক ইত্যাদিও ধরুন বারো টাকা। একুনে হল পঁয়ত্রিশ টাকা। থামুন, আমার পুঁজি কত আছে দেখি।

জটাধর পকেট থেকে মনিব্যাগ বার করলেন এবং নোট গনতি করে বললেন, কুলিয়ে যাবে, আমার কাছে গোটা পঞ্চাশ টাকা আছে। কালীবাবু, আপনি কিছু বেশী করে মাল তৈরি করুন। এখন মশাইরা দয়া করে আমার সবিনয় নিবেদনটি শুনুন। আজ আপনারা সবাই আমার গেস্ট, আমার খরচে সবাই খাবেন। না না, কোনও আপত্তি শুনব না, আমার অনুরোধটি রাখতেই হবে, নইলে মনে শান্তি পাব না।

কপিল গুপ্ত বললেন, ব্যাপার কি জটাধরবাবু, এত দিলদরিয়া হলেন কেন?

জটাধরের মোটা গোঁফের নীচে একটি সলজ্জ হাসি ফুটে উঠল। ঘাড় চুলকে মাথা নীচু করে বললেন, আপনারা হলেন ঘরের লোক, আপনাদের বলতে বাধা কি! কি জানেন, আজ বড় আনন্দের দিন, আজ আমার শুভ বিবাহ—

রামতারণ বললেন, পৌষ মাসে শুভ বিবাহ কি রকম? তুমি ব্রাহ্ম না খ্রীষ্টান? আজ বিবাহ তো তুমি এখানে কেন?

—আজ্ঞে আমি খাঁটি হিন্দু। বিবাহের অনুষ্ঠানটি আজ বেলা এগারোটায় রেজিস্ট্রেশন অফিসে সেরে ফেলেছি। সিভিল ম্যারেজ তো পাঁজি দেখে হবার জো নেই, রেজিস্ট্রারের মর্জি মাফিক লগ্ন স্থির হয়। বিয়েটা চুকে গেলেই ভাবলুম, এখন তো দিল্লিতে আমার চেনা-শোনা বেশী কেউ নেই, মাসতুতো ভাইএর বাসায় উঠেছি, সে আবার পেটরোগা মানুষ, ভাল জিনিস খাবার শক্তিই নেই। কিন্তু বিয়ের দিনে পাঁচ জনে মিলে, ফুর্তি, একটু খাওয়াদাওয়া না করলে চলবে কেন? আপনাদের কথা মনে এল, ধরতে গেলে আমার আত্মীয় বন্ধু বরপক্ষ কন্যাপক্ষ সবই আপনারা, তাই এখানে চলে এলুম। আমাদের কালীবাবু দেখছি অন্তর্যামী, ফীস্ট তৈরি করেই রেখেছেন। যা আছে দয়া করে তাই আজ আপনারা খান। কিন্তু এখানে আপনাদের খাইয়ে তো আমার সুখ হবে না, আমার আস্তানায় একদিন আপনাদের পায়ের ধুলো দিতেই হবে, বউভাত খেতে হবে। বেশী কিছু নয়, চারটি পোলাও, একটু মাংস, একটু পায়েস, আর ঘণ্টিওয়ালার দোকানের জাহানগিরী বালুশাই। মুখুজ্যে মশাই নিষ্ঠাবান লোক তা জানি, কালীবাড়ির পাঁঠাই আনব। আমার স্ত্রীর রান্না খুব চমৎকার, আপনারা খেয়ে নিশ্চয় তারিফ করবেন। আর একটি নিবেদন আছে সার। এখানকার মিউনিসিপাল অফিসে একটা কাজের চেষ্টা করছি, সার্ভেয়ার-আমিনের পোস্ট। মুখুজ্যে মশাই যদি দয়া করে একটু সুপারিশ করেন তো এখনি কাজটি পেয়ে যাই। ওঁকে সবাই খাতির করে কিনা।

রামতারণবাবু বললেন, তা না হয় একটা সুপারিশ পত্র লিখে দেওয়া যাবে। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—তোমার বয়েস তো প'য়তাল্লিশের কাছাকাছি মনে হচ্ছে. এখন দ্বিতীয় পক্ষ বিবাহ করলে নাকি?

আজ্ঞে না সার, এই সবে প্রথম পক্ষ। এত দিন নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি, বিবাহে রুচিও ছিল না, ভেবেছিলুম নির্ঝঞ্ঝাটে জীবনটা কাটিয়ে দেব। কিন্তু তা হল না, শেষটায় বন্ধনে জড়িয়ে পড়লুম। শুনবেন সব কথা সার?

রামতারণ বললেন, বেশ তো শোনাই যাক তোমার কথা। অবশ্য যদি গোপনীয় কিছু না হয়।

জটাধর জিব কেটে বললেন, রাম বল, আমার জীবনে গোপনীয় কিছু নেই। এই জটাধর বকশী একটু আমুদে বটে, কিন্তু খাঁটী মানুষ, চরিত্রে কোনও কলঙ্ক পাবেন না। ও ম্যানেজার কালীবাবু, আপনি খাবার পরিবেশন করুন, খেতে খেতেই কথা হবে। শুনুন মশাইরা।—

যুদ্ধের সময় সত্যিই আমি নর্থ বর্মায় মিলিটারিতে চাকরি করতুম। বেয়াল্লিশ সালের গোড়ায় যখন জাপানীরা রেঙ্গুনে বোমা ফেলতে লাগল তখন ইংরেজের ওপর আর ভরসা রইল না, প্রাণের ভয়ে আমরা সবাই পালালুম। টামু-ইম্ফল রোড দিয়ে দলে দলে নানা জাতের মেয়ে পুরুষ ছেলে বুড়ো চলল, রোগে আর অপঘাতে কত যে মারা গেল তার সংখ্যা নেই। কাগজে সে সব কথা আপনারা পড়েছেন। অনেক কষ্টে আমি যখন বর্মা বর্ডার পার হয়ে ইম্ফলে এলুম তখন একটি মেয়ে আমার শরণাপন্ন হল। বড় করুণ কাহিনী তার, অল্প বয়সে অনেক দুঃখ পেয়েছে। স্বামীর নাম বলহরি জোয়ারদার, রেঙ্গুনে তার মোটর মেরামতের কারখানা ছিল, ভালই রোজগার করত। জাপানীরা তাকে জোর করে ধরে নিয়ে

গেল, তাদের মোটর মেকানিকের বড় অভাব ছিল কিনা। যাবার সময় বলহরি তার বউকে বলল, অচলা, চললুম, এ জীবনে হয়তো আর দেখা হবে না। তুমি যেমন করে পার পালাও দেশে ফিরে যাবার চেষ্টা কর। অচলা কাঁদতে কাঁদতে একটি বাঙালী দলের সঙ্গে রওনা হল। দলের সবাই একে একে মারা গেল, কলেরায়, টাইফয়েডে বাঘের পেটে। অবশেষে অচলা আধমরা অবস্থায় মণিপুরে পেঁছুল। আমার স্বভাবটা কি রকম জানেন, লোকের দুঃখ দেখতে পারি না, বিশেষ করে মেয়েছেলের। অচলাকে বললুম, আমার সঙ্গেই চল, আমি যদি বেঁচে থাকি তুমিও বাঁচবে।

রামতারণবাবু প্রশ্ন করলেন, অচলার মা বাপ কোথা ছিল?

—হায় রে, তার আবার মা বাপ! তারা বহু কাল থেকে পেগু শহরে বাস করত, সেখানেই বলহরির সঙ্গে অচলার বিয়ে হয়। জাপানীরা এসে পড়লে অচলার মা বাপ ভাই বোন কে কোথায় পালাল, বাঁচল কি মরল কেউ জানে না। তার পর শুনুন। অচলাকে নিয়ে তো কোনও গতিকে বিপদের গন্ডি পেরিয়ে এলুম। তার পর মশাই বারো বচ্ছর নানা জায়গায় কাজ করেছি, ডিব্রুগড়ে, চাটগাঁয়ে, নোয়াখালিতে, রংপুরে, আরও অনেক স্থানে। কোনও চাকরিই স্থায়ী নয়, থিতু হয়ে কোথাও বাস করতে পারি নি। অবশেষে ঘুরতে ঘুরতে এই দিল্লিতে এসে পড়েছি। স্থির করেছি আর নড়ব না, এখানেই একটা কাজ জুটিয়ে নেব। কাজের যোগাড়ও প্রায় হয়েছে, এখন মুখুজ্যে মশাই একটু দয়া করলেই পেয়ে যাব।

রামতারণ বললেন, কণ্ট্রাক্টর সেকেন্দর সিংকে আমি বলব, তার ইনফ্লুএন্স আছে, সে তোমার জন্য চেষ্টা করবে। আচ্ছা, তুমি তো বহু কাল ভ্যাগাবন্ড হয়ে ঘুরেছ, অচলা অ্যাদ্দিন কোথায় ছিল?

—কোথায় আর থাকবে সার, আমার কাছেই ছিল। মেয়েটা বড় ভাল। রং তেমন ফরসা নয়, কিন্তু মুখের খুব শ্রী আছে। প্রথম প্রথম বড় কান্নাকাটি করত, তার পর ক্রমশ সামলে উঠল। কিন্তু মাস দুই আগে দেখলুম আবার ঘ্যানঘ্যানানি শুরু করেছে। জিজ্ঞাসা করলুম, কি হয়েছে অচলা? জবাব দিল, আমার মরণ হয় না কেন।...আরে ব্যাপারটা কি খোলসা করেই বল না। অচলা বলল, তোমার জন্যে কি আমাকে বিষ খেয়ে জলে ডুবে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হবে?...ভাল জ্বালা, আরে আমার অপরাধটা কি? অচলা বলল, লোকে যে আমার বদনাম রটাচ্ছে, তা শুনতে পাও না?...কি মুশকিল, তা আমাকে করতে বল কি? অচলা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, অ জটাইবাবু, তোমার কি বুদ্ধি-শুদ্ধি কিচ্ছু নেই?

কপিল গুপ্ত বললেন, তা অচলা কিছু অন্যায় বলে নি।

জটাধর বললেন, না মশাই, অচলা কিছু অন্যায় বলে নি, আমারও বুদ্ধি-শুদ্ধি বিলক্ষণ আছে। বিবাহের বন্ধনে জড়িয়ে পড়বার ইচ্ছে আমার মোটেই ছিল না, কিন্তু প্রজাপতি যদি নারীর রূপ ধরে পিছনে লাগেন তবে তাঁর নির্বন্ধ এড়ানো পুরুষের সাধ্য নয়। কে এক কবি লিখেছেন না?—শারদ লতিকা সম ললিত ললনাকায়। বাজে কথা মশাই, ললনা হচ্ছেন ছিনে জোঁক। ভেবে দেখলুম অচলাকে বিয়ে করে ফেলাই ভাল। তার স্বামী বলহরির কোনও পাত্তাই নেই, নিশ্চয় মরেছে। কিন্তু হিন্দু পদ্ধতিতে বিয়ে করায় বিস্তর ঝঞ্ঝাট, তাই সিভিল ম্যারেজই স্থির করলুম। রেজিস্ট্রার লালা হন্‌সরাজ চোপরা অতি ভাল লোক। বললেন,

বারো বছর যখন কেটে গেছে তখন ভাববার কিছু নেই, স্বচ্ছন্দে বিয়ে কর। তাই আজ বিয়ে করে ফেললুম।

রামতারণবাবু বললেন, কিন্তু একটা কর্তব্য যে বাকী রয়ে গেল, পূর্বের স্বামীর শ্রাদ্ধ করা উচিত ছিল।

—তা আর বলতে হবে না সার, আমার কাজে খুঁত পাবেন না। বারো বছর পূর্ণ হবা মাত্র অচলা তার লোহা আর শাঁখা ভেঙে ফেলল, সিঁদুর মুছল, থান পরল। তাকে দিয়ে দস্তুর মতন শ্রাদ্ধ করালুম, পাঁচটি ব্রাহ্মণও খাওয়ালুম। সবে তিন দিন আগে তার অশৌচান্ত হয়েছে। তার পর সিভিল ম্যারেজ চুকে যেতেই অচলা আবার সধবার লক্ষণ ধারণ করেছে। হাঁ, ভাল কথা মনে পড়ল। ও কালী-বাবু, এই সাতটা চপ আমি পকেটে পুরলুম, নিজে গবগবিয়ে খাব আর সহধর্মিণীকে কিছু দেব না তা তো হতে পারে না। তেমন স্বার্থপর আমি নই। বেচারী পনরো দিন নিরামিষ খেয়ে আছে। এই সাতটা চপের দামও আমি দেব।

অতুল হালদার বললেন, খুব ইন্টারেস্টিং ইতিহাস। আমি নোট করে নিয়েছি, আমাদের হিন্দুস্থান মিরর কাগজে ছাপব। আপনার কোনও আপত্তি নেই তো জটাধরবাবু?

—কিছুমাত্র না, স্বচ্ছন্দে ছাপুন। যদি চান তো আরও ডিটেল দিতে পারি, অচলা আর আমার ফোটোও দিতে পারি।

এই সময় একটি লোক টি ক্যাবিনের দরজার কাছে এসে ভাঙা গলায় বলল, জটাধর বকশী এখানে আছে?

আগন্তুক লোকটি রোগা, বেঁটে, পরনে ময়লা খাকী প্যাণ্ট নীল জার্সি, তার উপর মোটা পট্টুর বুক খোলা কোট, হাতে একটা বড় রেঞ্চ। তার প্রশ্নের উত্তরে জটাধর বললেন, আমিই জটাধর বকশী। আপনি কে মশাই?

—তোমার যম। এই কথা বলেই লোকটি ঘরে এসে খপ করে জটাধরের হাত ধরল।

রামতারণ বললেন, কে হে তুমি এখানে এসে হামলা করছ? জান, এ হল ট্রেসপাস, ক্রিমিন্যাল কেস। নাম কি তোমার?

—আমার নাম বলহরি জোয়ারদার। আপনাদের কিছু বলছি না মশাই, আমার দরকার এই শালা জটাধরের সঙ্গে?

রামতারণ বললেন, অ্যাঁ, অবাক কাণ্ড! তুমিই অচলার ভূতপূর্ব স্বামী নাকি?

—শুধু ভূতপূর্ব নই মশাই, দস্তুর মতন জলজ্যান্ত বর্তমান স্বামী, ভবিষ্যতেও স্বামী। এই পাজী জটে শালাকে যদি জেলে না পাঠাই তো আমার নাম বলহরি জোয়ারদার নয়।

রামতারণ বললেন, আচ্ছা ফ্যাসাদ! কি হে জটাধর, এখন করবে কি?

জটাধর করুণ স্বরে বললেন, আমার সর্বনাশ হবে সার, আপনিই একটা ফয়সালা করুন। এই বলে জটাধর রামতারণের পা ধরলেন।

রামতারণ বললেন, স্থির হও জটাধর, এ সব ব্যাপারে মাথা ঠাণ্ডা রাখা দরকার। মীমাংসা তো অচলার হাতে। সে যদি বলে, এই লোকটিই তার স্বামী, তবে তার

কথা নেই, তোমাকে তাই মেনে নিতে হবে। ও জোয়ারদার মশাই, আপনি অচলার সঙ্গে দেখা করেছেন ?

—তা আর আপনাকে বলতে হবে না, তার কাছ থেকেই তো আসছি। আমাকে দেখে মাগী বেদম কান্না শুরু করেছে। আমি ধমক দিতে বলল, জটাই-বাবুকে ডেকে আন, তাঁর অমতে কিছু করতে পারব না। ওঃ, জটাই যেন তাঁর গুরুঠাকুর।

রামতারণ বললেন, ব্যাপারটা বিশ্রী রকম জটিল হল দেখছি। অচলা যদি জটাধরের কাছেই থাকতে চায় আর বলহরি তাতে রাজী না হয় তবে তো মহা ফ্যাসাদ, আদালতের ব্যাপার। কিন্তু বেআইনী কাজ তো কিছুই হয় নি। নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে—একটা শাস্ত্রবচন আছে না ? বারো বছর কেটে গেলে রীতিমত শ্রাদ্ধশান্তির পরে অচলার পুনর্বিবাহ হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ভূতপূর্ব স্বামীর ফিরে আসাই অন্যায়।

কপিল গুপ্ত বললেন, এনক আর্ডেনের মতন মানে মানে সরে পড়াই উচিত ছিল।

বলহরি বলল, আহা কি কথাই বললেন মশাই, প্রাণ জুড়িয়ে গেল। নিজের স্ত্রীর কাছে আসব না তো এই জটেকে দেখে জিব কেটে পালাব নাকি ?

জটাধর বললেন, আমি এই বলহরি জোয়ারদার মশাইকে খেসারত হিসেবে কিছু টাকা দিতে রাজী আছি। এখন পঞ্চাশ দিতে পারি, বাসায় গিয়ে আরও পঞ্চাশ—

বলহরি গর্জন করে বলল, চোপ রও শুয়ার, একশ টাকায় আমার বউ কিনতে চাও ? একটা পাঁঠীও ও দামে মেলে না।

কপিল গুপ্ত বললেন, ওহে জোয়ারদার, একটু বুঝে-সুজে তম্বি ক'রো। তুমি তো তালপাতার সেপাই, জটাধরের চেহারাটি দেখছ তো ? এক চড়েই তোমাকে সাবাড় করতে পারে

—এঃ, চড় মারলেই হল ! দেখছেন না, ব্যাটা ভয়ে কেঁচো হয়ে আছে। পাঁচটি বচ্ছর মাঞ্চুরিয়ার জাপানীদের কাছে ছিলাম মশাই, জুজুৎসুর প্যাঁচ ভাল করেই শিখেছি। তার পর চীনেদের সঙ্গে সাত বছর কাটিয়েছি। ছাড়তে কি চায় ? তিনটে কমরেডকে গলা টিপে মেরে পালিয়ে এসেছি। জটাধরকে দুটি আঙুলের টোকায় কাত করতে পারি। চল্ হতভাগা।

কাঁচপোকা যেমন প্রকাণ্ড আরশোলাকে ধরে নিয়ে যায় তেমনি বলহরি জোয়ারদার জটাধরের হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলে গেল।

রামতারণ মুখুজ্যে দীর্ঘনিশবাস ফেলে বললেন, এমন বিপদেও মানুষ পড়ে ! আহা বেচারা আজ দুপুরে বিয়ে করেছে, আর সন্ধ্যাবেলায় এই বিশ্রী কাণ্ড। অচলা মেয়েটার জন্যে সত্যিই দুঃখ হচ্ছে।

ম্যানেজার কালীবাবু নিবিষ্ট হয়ে হিসাব করছিলেন। এখন উচ্চস্বরে বললেন, চুলোয় যাক অচলা, আজকের খরচা দেবে কে ? জটাধর তো আপনাদের বোকা বানিয়ে সরে পড়ল।

কপিল গুপ্ত বললেন, সরে পড়েছে তাতে হয়েছে কি ? আমরা তো নিজের নিজের খরচে খেতে প্রস্তুতই ছিলুম। কালীবাবু, তুমি আমাদের নামে নামে বিল তৈরি কর।

কালীবাবু বললেন, কিন্তু ওই জটাধর যে নিজেই বারোটা চপ্‌, চারখানা কেক, আর চারটে বড় পেয়ালা চা খেয়েছে, তা ছাড়া বউকে দেবে বলে সাতটা চপ পকেটে পুরেছে। মোট দাম হল ন টাকা ছ আনা। এ খরচ কে দেবে ?

কপিল গুপ্ত বললেন, মোটে ন টাকা ছ আনা? দেড়খানা উপন্যাসের দাম। খরচটা আমাদের মধ্যেই চারিয়ে দাও, কি বলেন মুখুজ্যে মশাই? জটাধরের বিবেচনা আছে, বেশী ঠকায় নি।

বীরেশ্বর সিংগি বললেন, আমি তখনই বুঝেছিলুম যে ওই বলহরিই হচ্ছে জটাধরের মাসতুতো ভাই, সাতটা চপ তার পেটেই যাবে।

১৩৬১ (১৯৫৪)

তিরি চৌধুরী

করুণাময় দত্তগুপ্ত কৃতী পুরুষ, মুনসেফ থেকে ক্রমে ক্রমে জেলা জজ তার পর হাইকোর্টের জজ হয়েছেন। ঈস্টারের বন্ধ, সকাল বেলা বাড়িতে খাস কামরায় বসে তিনি চা খাচ্ছেন আর খবরের কাগজ পড়ছেন, এমন সময় একটি মেয়ে এসে তাঁকে প্রণাম করল।

ষোল-সতরো বছরের সুশ্রী মেয়ে, পরিপাটি সাজ। জাস্টিস দত্তগুপ্ত তার দিকে তাকাতে সে বলল, আমার ঠাকুর্দাকে আপনি চেনেন, সলিসিটার্স চৌধুরী অ্যান্ড সন্সের প্রিয়নাথ চৌধুরী। আমার নাম তিরি।

করুণাময় বললেন, ও তুমি প্রিয়নাথবাবুর নাতনী, আমাদের সোমনাথের মেয়ে? বস ওই চেয়ারটায়। তা তোমার নাম তিরি হল কেন?

—কি জানেন, আমার মামা অঙ্কের প্রফেসার, আর আমি হচ্ছি তৃতীয় সন্তান, তাই মামা আমার নাম রেখেছিলেন তৃতীয়া। নামটা কটমটে, আমি ছেঁটে দিয়ে তিরি করেছি।

—তা বেশ করেছ। এখন কি চাই বল তো?

—আজ্ঞে, আমার ঠাকুমা বড় দুর্ভাবনায় পড়েছেন, একেবারে মুষড়ে গেছেন, ভাল করে খাচ্ছেন না, ঘুমুতে পারছেন না। দয়া করে আপনি তাঁকে বাঁচান।

—ব্যাপারটা কি? যদি বৈষয়িক কিছু হয় তবে তোমার ঠাকুর্দা আর বাবাই তো তার ব্যবস্থা করতে পারবেন।

—বৈষয়িক নয়, হার্দিক।

—সে আবার কি।

—হার্টের ব্যাপার।

—তা হলে হার্ট স্পেশালিস্ট ডাক্তারকে দেখাও, আমি তো তার কিছুই করতে পারব না।

—আপনি নিশ্চয় পারবেন সার। আপনি অনুমতি দিন, আজ সন্ধ্যে বেলা ঠাকুমাকে আপনার কাছে নিয়ে আসব।

—তা না হয় এনো। কিন্তু কি হয়েছে তা তো আগে আমার একটু জানা দরকার।

—ব্যাপারটা গোপনীয়, ঠাকুমাই আপনাকে জানাবেন। আপনি কিছু ভাববেন না সার, শুধু ঠাকুমাকে আশ্বাস দেবেন যে সব ঠিক হয়ে যাবে। তিনি কানে একটু কম শোনেন। আমি দরকার মতন আপনাকে প্রম্‌ট করব, ফিসফিস করে বাতলে দেব।

করুণাময় সহাস্যে বললেন, ও ঠাকুমার ব্যবস্থা তুমি নিজেই করবে, আমি শুধু সাক্ষিগোপাল হয়ে থাকবো?

—আজ্ঞে হাঁ। আমার কথা তো ঠাকুমা গ্রাহ্য করবেন না, আপনার মুখ থেকে শুনলে তাঁর বিশ্বাস হবে। আপনাকে দারুণ শ্রদ্ধা করেন কিনা। ঠাকুমা বলেন, হাইকোর্টের জজরা হচ্ছেন ধর্মের অবতার, হাইকোর্টের দৌলতেই ঠাকুন্দা আর বাবা করে খাচ্ছেন।

—বাঃ, ঠাকুমা তো বেশ বলেছেন! তোমার বাবা কি ঠাকুন্দা আসবেন না?

—না না না, তাঁরা এলে সব মাটি হবে। হাসবেন না সার, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। ঠাকুমার দুশ্চিন্তা আমার জন্যে নয়, আমার কোনও স্বার্থ নেই।

—বেশ, আজ সন্ধ্যায় তাঁকে নিয়ে এস।

সন্ধ্যার সময় তিরি তার ঠাকুমাকে নিয়ে করুণাময়ের বাড়িতে উপস্থিত হল। নমস্কার বিনিময়ের পর তিরি বলল, এই ইনি হচ্ছেন আমার ঠাকুমা শ্রীমতী কনকলতা চৌধুরানী, সলিসিটার প্রিয়নাথ চৌধুরীর স্ত্রী। আর ইনি হচ্ছেন মাননীয় মিস্টার জস্টিস শ্রীকরুণাময় দত্তগুপ্ত। ঠাকুমা, ইনট্রোডিউস করে দিলুম, এখন তুমি মনের কথা খোলসা করে বল।

কনকলতা ধমকের সুরে বললেন, আমি কেন বলতে যাব লা? বুড়ো মাগী লজ্জা করে না বুঝি? তোকে এনেছি কি করতে? যা বলবার তুই বল।

তিরি বলল, বেশ আমিই বলছি। শুনুন ইওর লর্ডশিপ—

করুণাময় বললেন, বাড়িতে লর্ডশিপ নয়।

—আচ্ছা, শুনুন সার। আমার ঠাকুন্দাকে তো দেখেছেন, খুব সুপুরুষ, যদিও পঁচাত্তর পেরিয়েছেন। আর আমার এই ঠাকুমাকেও দেখুন, বেশ সুন্দরী, নয়? যদিও সাতষট্টি বছর বয়সের দরুন একটু তুবড়ে গেছেন, পুরনো ঘটির মতন।

কনকলতা একটু কালা হলেও নিজের সম্বন্ধে কথা হলে বেশ শুনতে পান। বললেন. আরে গেল যা, ও সব কথা বলতে তোকে কে বলছে?

তিরি বলল, এই সবই তো আসল কথা। তার পর শুনুন সার। পঞ্চান্ন বছর আগে, ঠাকুন্দার বয়স যখন কুড়ি. তখন প্রভাবতী ঘোষ নামে একটি মেয়ের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ হয়। বারো-তেরো বছরের সুন্দরী মেয়ে. ঠাকুন্দা তাকে একবার দেখেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু আমার প্রঠাকুন্দা, অর্থাৎ ঠাকুন্দার বাবা ছিলেন একটি অর্থগৃধ্র—

করুণাময় বললেন, অর্থগৃধ্নু?

—আজ্ঞে না, অর্থগৃধ্র, শকুনির মতন লোলুপ। তিনি পাঁচ হাজার টাকা বরপণ হেঁকে বসলেন। প্রভাবতীর বাবা ছিলেন গরীব ইস্কুল মাস্টার, কোথায় পাবেন অত টাকা? সম্বন্ধ ভেস্তে গেল। ঠাকুন্দা মনের দুঃখে দিন কতক হেমচন্দ্র আওড়ালেন —ওরে দুষ্ট দেশাচার কি করিলি অভাগার। তার পর এই কনকলতা ঠাকুমার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হল। তিনি ঠকেন নি. ছ হাজার টাকা বরপণ পেলেন, এক রূপসী হারিয়ে আর এক রূপসী ঘরে আনলেন।

করুণাময় প্রশ্ন করলেন, সেই আগেকার মেয়েটির কি হল?

—আমার সেই মাইট-হ্যাভ-বিন ঠাকুমা প্রভাবতীর? তিনি কুমারী হয়েই রইলেন, খুব লেখাপড়া শিখলেন, অনেক জায়গায় মাস্টারি করলেন, আমেরিকায় গিয়ে ডক্টর অভ এডুকেশন ডিগ্রী নিয়ে এলেন, শেষকালে পাতিয়ালা উইমন্স কলেজের প্রিন্সিপালও

হয়েছিলেন। সম্প্রতি রিটায়ার করে কলকাতায় এসেছেন। তার পর হঠাৎ একদিন সলিসিটার চৌধুরী অ্যান্ড সন্সের অফিসে উপস্থিত। কি সমাচার? না, আলিপুরে একটা ছোট বাড়ি কিনবেন, তারই দলিল আমার ঠাকুর্দাকে দেখাতে চান। ঠাকুর্দা তাঁর পরিচয় পেয়ে খুব খুশী—বুঝতেই পারছেন পুরাতনী শিখা, ওল্ড ফ্লেম। তারপর প্রভাবতী আমাদের বাড়িতে ঘন ঘন আসতে লাগলেন, আর ঠাকুমা ফোঁস করে জ্বলে উঠলেন, কলেরাপটাশ আর চিনিতে অ্যাসিড ঠেকালে যেমন হয়।

—সে আবার কি রকম? তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠাই তো শুনেছি।

—তার চাইতে ভীষণ। জানেন না সার? আমার মেজদা একদিন দেখিয়েছিল। কলেজ থেকে কলেরাপটাশ চুরি করে এনে তার সঙ্গে চিনি মিশিয়ে ন্যাকড়ার পুঁটলিতে বেঁধে তাতে কি একটা অ্যাসিড ঠেকাল, অমনি ফোঁস করে জ্বলে উঠল।

—প্রভাবতী দেখতে কেমন?

—এখনও খুব রূপ।

কনকলতা চেঁচিয়ে বললেন, শাঁকচুন্নী বাবা, একবারে শাঁকচুন্নী!

করুণাময় হেসে বললেন, তবে আপনার ভাবনা কিসের?

—ও জজসায়েব, তা বুঝি জান না? ডাকিনী যোগিনী শাঁকচুন্নীদের বলে কত ছলা কলা, পুরুষকে ভেড়া বানিয়ে দেয়। আর এই তিরির ঠাকুর্দাটিও বড্ড হাবা-গোবা, শুধু কপালগুণেই টাকা রোজগার করে, নইলে বুদ্ধি কি কিছু আছে? ছাই, ছাই। তুমি বুঝিয়ে সুজিয়ে বুড়োকে ওই ডাকিনীর হাত থেকে উদ্ধার কর বাবা।

তিরি ফিসফিস করে বলল, দেখুন, ঠাকুর্দার কিছু দোষ নেই, তিনি প্রভাবতীর সঙ্গে শুধু ভদ্র ব্যবহার করেছেন। কিন্তু আমার ঠাকুমাটি হচ্ছেন সেকেলে আর অত্যন্ত হিংসুটে। আপনি এঁকে বলুন—সব ঠিক হয়ে যাবে।

করুণাময় বললেন, আপনি কিছু ভাববেন না মা, সব ঠিক হয়ে যাবে।

তিরি বলল, সাত দিনের মধ্যেই।

করুণাময় বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সাত দিনের মধ্যেই আমি সব ঠিক করে দেব।

তিরি বলল, ঠাকুমা, শুনলে তো? এখন বাড়ি চল, রাত্তিরে ভাল করে খেয়ো। কাল আবার আমি এঁর কাছে এসে খবর নেব। এখন তো আপনার কোর্ট বন্ধ, নয় সার? তা হলে কাল সকালে আবার দেখা করব। এখন উঠি।

পরদিন সকালে তিরি এলে করুণাময় বললেন, তুমি একটি সাংঘাতিক মেয়ে। তোমার কথায় ঠাকুমাকে তো আশ্বাস দিলাম, কিন্তু তার পর কি করব? কাল সারা রাত আমি ঘুমুতে পারি নি। বড় বড় দেওয়ানী মামলার রায় আমি অক্লেশে দিয়েছি, ফাঁসির হুকুম দিতেও আমার বাধে নি। কিন্তু এরকম তুচ্ছ বেয়াড়া ব্যাপারে কখনও জড়িয়ে পড়ি নি। তোমার ঠাকুর্দা প্রিয়নাথবাবুকে আমি কি করে বলব—মশায়, আপনার অবুঝ গিন্নী বেচারীকে কষ্ট দেবেন না, প্রভাবতীকে হাঁকিয়ে দিন!

তিরি বলল, আপনাকে কিছুই করতে হবে না সার, শুধু সাক্ষী হয়ে থাকবেন। কাল আপনাকে এক তরফের ইতিহাস বলেছি, আজ অন্য তরফের ব্যাপারটা শুনুন।

—অন্য তরফ আবার কে? তোমার ঠাকুমা নাকি।

—আজ্ঞে হাঁ। আমি বিস্তর রিসার্চ করে যা আবিষ্কার করেছি তাই বলছি

শুনুন। ঠাকুন্দা প্রিয়নাথের সঙ্গে বিয়ে হবার আগে ঠাকুমা কনকলতার একটি খুব ভাল সম্বন্ধ এসেছিল, বাগবাজারের হারু মিত্তিরের ছেলে গৌরগোপাল মিত্তির, এখন যিনি অল্ডারম্যান হয়েছেন। আমার ঠাকুন্দা সুপুরুষ বটে, কিন্তু গৌরগোপাল হচ্ছেন সুপার-সুপুরুষ, মূর্তিমান কন্দর্প। তাঁর বয়স যখন উনিশ-কুড়ি তখন ঠাকুমাকে একবার লুকিয়ে দেখেছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই বারো বছরের নোলক-পরা বোধোদয়-পড়া খুকীর প্রেমে পড়েছিলেন। তখন ওই রকমই রেওয়াজ ছিল কিনা। তাঁর বাবা হারু মিত্তিরও মেয়েটিকে পছন্দ করলেন আর ছ হাজার টাকা পণে ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজী হলেন। সব ঠিক, এমন সময় গৌরগোপালের আর এক সম্বন্ধ এল। বউবাজারের বিপিন দত্তর মেয়ে, একমাত্র সন্তান, অগাধ বিষয়, সব সেই মেয়ে পাবে। হারু মিত্তির বিগড়ে গেলেন। আমার প্রপিতামহ ছিলেন অর্থগৃধ্নু, কিন্তু হারু মিত্তির একবারে দুকানকাটা চশমখোর চামচিকে, চামার পয়সা-পিশাচ। আমার ঠাকুমা কনকলতাকে তিনি নাকচ করে দিলেন, সম্পত্তির লোভে বিপিন দত্তর সেই বিশ্রী মেয়েটার সঙ্গে ছেলের বিয়ে স্থির করলেন। ছেলে গৌরগোপাল রামচন্দ্রের মতন সুবোধ, এখনকার তরুণদের মতন একগুঁয়ে নয়। কনকলতার বিরহে তিনিও দিনকতক হেমচন্দ্র আওড়ালেন—আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে। তার পর শুভদিনে ভেলভেটের ভাড়াটে ইজের-চাপকান পরে সঙ সেজে তক্তনামায় চড়ে অ্যাসিটিলীন জ্বালিয়ে ব্যান্ড বাজিয়ে সেই অগাধ বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী কুৎসিত মেয়েটাকে বিয়ে করে ফেললেন। তার কিছু দিন পরেই ঠাকুমার সঙ্গে ঠাকুন্দার বিয়ে হল।

করুণাময় বললেন, খাসা ইতিহাস। এখন করতে চাও কি?

—আজ বিকেলে সেই গৌরগোপালবাবুর সঙ্গে দেখা করব, তার পর কর্তব্য স্থির করে আপনাকে জানাব। আজকের মতন উঠি সার।

গৌরগোপাল মিত্র বিকাল বেলা তাঁর প্রকাণ্ড বৈঠকখানা ঘরে প্রকাণ্ড ফরাসে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে গড়গড়া টানছেন আর চৈতন্যভাগবত পড়ছেন—এমন সময় তিরি এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিল।

গৌরগোপাল বললেন, তুমি কে দিদি? চিনতে পারছি না তো।

—আজ্ঞে আমার নাম তিরি।

—তিরি কেন? টেক্কা কি বিবি হলেই তো মানাত।

—আমি মা-বাপের তৃতীয় সন্তান কিনা তাই তিরি নাম। আমার ঠাকুন্দার নাম শুনেছেন বোধ হয়—সলিসিটার প্রিয়নাথ চৌধুরী, আপনারই সমবয়সী হবেন।

—ও, তুমি প্রিয়নাথ চৌধুরীর নাতনী? তাঁর সঙ্গে মৌখিক আলাপ নেই, তবে বছর চার আগে একটা মকদ্দমায় তিনি আমার বিপক্ষের আটর্নি ছিলেন। খুব ঝানু লোক।

—সে মকদ্দমায় আপনি জিতেছিলেন?

—না দিদি, হেরে গিয়েছিলুম, লাখ দুই টাকা লোকসান হয়েছিল।

—তবেই তো মুশকিল। হেরে গিয়েছিলেন তার জন্যে প্রিয়নাথ চৌধুরীর নাতনীর ওপর তো আপনার রাগ হবার কথা।

—আরে না না, তোমার ওপর রাগ করে কার সাধ্য! এখন বল তো কি দরকার।

তিরি মাথা নীচু করে হাত কচলাতে কচলাতে বলল, দেখুন, আপনার সঙ্গে আমার একটা নিগূঢ় সম্পর্ক আছে, আপনি হচ্ছেন আমার হতে-হতে-ফসকে-যাওয়া ঠাকুর্দা!

গৌরগোপাল বললেন, বুঝতে পারলুম না দিদি, খোলসা করে বল।

—পঞ্চান্ন বছর আগেকার কথা স্মরণ করুন দাদু। কনকলতা বলে একটি মেয়ে ছিল, তাকে মনে পড়ে?

—কনকলতা? সে আবার কে?

তিরি বলল, সেকি দাদু, এর মধ্যেই মন থেকে মুছে ফেলেছেন? হায় রে হৃদয়, তোমার সঞ্চয় দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়! বারো বছরের একটি ফুটফুটে মেয়ে, একবার দেখেই তাকে আপনি ভীষণ ভালবেসেছিলেন। তার সঙ্গে আপনার বিয়ের সম্বন্ধও স্থির হয়েছিল, কিন্তু শেষটায় আপনার বাবা ভেস্তে দিলেন। কিছু মনে পড়ছে না?

—হাঁ হাঁ, এখন মনে পড়েছে, নামটা কনকলতাই বটে। ওঃ, সে তো মান্ধাতার আমলের কথা, লর্ড এলগিন কি কার্জনের সময়। তা কনকলতার কি হয়েছে?

—তিনিই আমার ঠাকুমা। ঠাওর করে দেখুন তো, পঞ্চান্ন বছর আগে দেখা সেই মেয়েটির সঙ্গে আমার চেহারার কিছু মিল পান কিনা। আপনি যদি অত পিতৃভক্ত না হতেন, একটু জেদ করতেন, তবে সেই কনকলতার সঙ্গেই আপনার বিয়ে হত, আপনিই আমার ঠাকুর্দা হতেন।

—ওঃ, কি চমৎকার হত! আমার কপাল মন্দ তাই তোমার ঠাকুর্দা হতে পারি নি। কিন্তু এখনই বা হতে বাধা কি? আমার তিন তিনটে নাতি আছে, অবশ্য তোমার মতন সুন্দর নয়। তাদের একটাকে বিয়ে করে ফেল না? ডাকব তাদের?

—এখন থাক দাদু। আমি বি. এ. পাশ করব, এম. এ. পাশ করব, বিলেত যাব, তার পর সংসারের চিন্তা। শেকস্পীয়ার পড়েছেন তো? আমি এখন ইন মেডেন মেডিটেশন ফ্যান্সি ফ্রী। ছ বছর পরে যদি আপনার কোন নাতি আইবুড়ো থাকে তো আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন।

—জো হুকুম তিরি দেবী চৌধুরানী। কি দরকারে এসেছ তা তো বললে না?

—সেই ছোট্ট কনকলতা মেয়েটি এখন কত বড়টি হয়েছে দেখতে আপনার ইচ্ছে হয় না দাদু?

—এতদিন তো তার কথা মনেই ছিল না, তবে আজ তোমাকে দেখে তোমার ঠাকুমাকেও দেখবার একটু ইচ্ছে হচ্ছে বটে। কি লেখাই হেম বাঁড়ুজ্যে লিখে গেছেন—ছিন্ন তুষারের ন্যায় বাল্যবাঞ্ছা দূরে যায় তাপদগ্ধ জীবনের ঝঞ্ঝাবায়ু প্রহারে! কিন্তু তোমার ঠাকুমা তো আমাকে চিনবেন না। আমি তাঁকে লুকিয়ে দেখেছিলুম বটে, কিন্তু তিনি আমাকে কখনও দেখেন নি।

—নাই বা দেখলেন। শুনুন দাদু—আসছে শনিবার আমার জন্মদিন, আপনাকে আমাদের বাড়ি আসতেই হবে, এখানকার ঠাকুমাকেও নিয়ে যাবেন। তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করে যেতে চাই।

—দেখা তো হবে না দিদি। তিনি এখানে নেই, দু বছর হল স্বর্গে গেছেন। সেখানে তাঁর অনেক কাজ, ঘর-দোর জিনিসপত্র পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখবেন, চাকরদের তো বিশ্বাস করেন না, হলই বা স্বর্গের চাকর। আমি সেখানে গিয়েই

যাতে চটি জুতো, ফুলেল তেল, নাইবার গরম জল, সরু চালের ভাত, মাগুর মাছের ঝোল, চিনিপাতা দই, পানছেঁচা আর তৈরী তামাক পাই তার ব্যবস্থা করে রাখবেন।

—সতী লক্ষ্মী স্বর্গে গিয়েও ধান ভানবেন! তবে কি আর হবে, আপনি একাই আসবেন, আমি কাল নিমন্ত্রণের কার্ড পাঠিয়ে দেব।

তিরি প্রণাম করে বিদায় নিল, তার পর জস্টিস করুণাময় দত্তগুপ্ত আর ডক্টর প্রভাবতী ঘোষের সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফিরল।

তিরির বিস্তর বন্ধু, ইরা ধীরা মীরা ঝুনু বেণু রেণু উল্লোলা কল্লোলা হিল্লোলা প্রভৃতি একটি দঙ্গল। তিরি তাদের বলেছে, জানিস, আমি ঠিক রাত বারোটায় জন্মেছিলুম, একেবারে জিরো আওআর। কাজেই কোন্‌টা জন্মদিন, আগেরটা কি পরেরটা তা বলা যায় না। এখন থেকে দুটো জন্মদিন ধরব। আসছে শনিবার বিকেলে শুধু বুড়ো বুড়ীরা চা খেতে আসবে। রবিবারে তোরা সবাই আসবি, হুল্লোড় করবি, গাণ্ডে-পিণ্ডে গিলবি। বুঝেছিস? বন্ধুরা সমস্বরে জবাব দিয়েছে —আসিব আসিব সখী নিশ্চয় আসি-ই-ই-ব।

শনিবার বিকালে প্রিয়নাথ চৌধুরীর বাড়িতে জস্টিস করুণাময় দত্তগুপ্ত, অল্ডারম্যান গৌরগোপাল মিত্র আর ডক্টর প্রভাবতী ঘোষ নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসে-ছেন। বাইরের লোক আর কেউ নেই। বাড়ির লোক আছেন তিরির ঠাকুন্দা ঠাকুমা বাবা মা আর স্বয়ং তিরি।

মাননীয় অতিথিদের সংবর্ধনা, সকলের সঙ্গে পরিচয়, আর উপহারের জন্য প্রশংসা শেষ হলে করুণাময়কে তিরি চুপিচুপি বলল, এইবারে আপনার ভাষণটি বলুন স্যার।

করুণাময় বললেন, কল্যাণীয়া তিরির জন্মদিন উপলক্ষ্যে এই যে আমরা এখানে মিলিত হয়েছি, এটি একটি সামান্য পার্টি নয়। বিধাতার বিধানে যা ঘটে তা মাথা পেতে মেনে নেওয়া ছাড়া মানুষের গত্যন্তর নেই, কিন্তু কেউ কেউ ভবিতব্যকে অন্য রকমে কল্পনা করতে ভালবাসে। এই ধরুন—দশরথ যদি স্ত্রৈণ না হতেন, গোসাঘরে ঢুকে কৈকেয়ীকে একটি চড় লাগাতেন, তবে রামায়ণ অন্য রকমে লেখা হত। শান্তনু যদি বুড়ো বয়সে একটা মেছুনীর প্রেমে না পড়তেন তবে ভীষ্মই কুরুরাজ হতেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধও হয়তো হত না। অষ্টম এডোআর্ড যদি একগুঁয়ে না হতেন, প্রাইম মিনিস্টার আর আর্চবিশপদের ফরমাশ অনুসারে বিবাহ করতেন তবে তাঁকে সিংহাসন ছাড়তে হত না। আমাদের এই তিরি মেয়েটি বিধাতার সঙ্গে ঝগড়া করে না, কিন্তু তাঁর বিধানের সঙ্গে আরও কিছু জুড়ে দিয়ে আত্মীয়ের গণ্ডি বাড়াতে চায়। সে জন্য সে তার হলেও-হতে-পারতেন ঠাকুন্দা আর ঠাকুমাকে এখানে ধরে এনেছে। তিরির আসল ঠাকুন্দা আর ঠাকুমা তো বাড়িতেই আছেন, তার বিকল্পিত ঠাকুন্দা শ্রদ্ধেয় অল্ডারম্যান গৌরগোপালবাবু আর বিকল্পিতা ঠাকুমা শ্রদ্ধেয়া ডক্টর প্রভাবতী ঘোষও দয়া করে এখানে এসেছেন। প্রিয়জনের এই সমাগমে তিরি যেমন ধন্য হয়েছে আমরাও তেমনি আনন্দলাভ করেছি।

কনকলতা তিরিকে জনান্তিকে বললেন, ওই বুড়ো আর বুড়ীটাকে এখানে কে আনলে রে?

তিরি বলল, গৌরগোপাল আর প্রভাবতী? আমি তো জানি না, জস্টিস

দত্তগুপ্ত হয়ত বাবাকে বলে থাকবেন। ঠাকুমা, তোমার ওই ফসকে-যাওয়া বর গৌরগোপালবাবু কি সুন্দর দেখতে! আহা, ওঁর সঙ্গে তোমার যদি বিয়ে হত তা হলে বাবার রং আরও ফরসা হত, আর আমারও রূপ উথলে উঠত, একেবারে ঢলঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনি!

কনকলতা বললেন, দূর হ মুখপুড়ী, তোর মুখের বাঁধন কি একটুও নেই?

—কিন্তু ভাগ্যিস প্রভাবতীর সঙ্গে ঠাকুদ্দার বিয়ে হয় নি, তা হলে আমার মুখটা চীনে প্যাটার্ন হত। ঠাকুমা, তোমারই জিত। পঞ্চান্ন বছর আগে ওই প্রভাবতীর একটা বর হাতছাড়া হয়েছিল, কিন্তু এত পাশ করেও উনি এ পর্যন্ত আর একটা বর জোটাতে পারলেন না, অথচ তুমি একমাসের মধ্যেই জুটিয়েছিলে, যদিও বিদ্যে বোধোদয় পর্যন্ত। তুমি কিন্তু গৌরগোপালবাবুর দিকে অমন করে আড়চোখে তাকিও না বাপু, ঠাকুদ্দা মনে করবেন কি?

কনকলতা রেগে গিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, কই আবার তাকাচ্ছি! কি বজ্জাত মেয়ে তুই! ও মাস্টার দিদি প্রভা, এই তিরিটাকে বেত মেরে সিধে করতে পার না? জ্বালিয়ে মারল আমাকে।

প্রভাবতী বললেন, তিরি, ঠাকুমাকে জ্বালিও না, এস আমার কাছে।

প্রভাবতী আর গৌরগোপাল পাশাপাশি বসে ছিলেন। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে তাঁদের কাছে বসে পড়ে তিরি বলল, আর জ্বালাবার দরকার হবে না, ঠাকুমা ঠাণ্ডা হয়ে গেছেন। কিন্তু আসল কাজ যে এখনও বাকী রয়েছে। আপনারা কিছু মনে করবেন না, আমি একটু স্বগতোক্তি করছি, যাকে বলে সলিলোকি।—প্রিয়নাথের সঙ্গে প্রভাবতীর বিয়ে হতে হতে হল না। আচ্ছা, তা না হয় না হল। গৌরগোপালের সঙ্গেও কনকলতার বিয়ে হতে হতে হল না। তাও না হয় না হল। কিন্তু প্রজাপতির নির্বন্ধে শেষটায় প্রিয়নাথের সঙ্গে কনকলতার বিয়ে হয়ে গেল। এই পরিস্থিতিতে চিরকুমারী প্রভাবতী আর নবকুমার গৌরগোপালের কি করা উচিত? বিধাতার ইঙ্গিত কি?

প্রভাবতী বললেন, বিধাতার ইঙ্গিত—তোমাকে আচ্ছা করে বেত লাগানো দরকার।

গৌরগোপাল বললেন, আমার বাড়িতে পালিয়ে চল দিদি, কেউ বেত লাগাবে না।

তিরি বলল, হায় হায়, দেওয়ালের লেখা আপনাদের নজরে পড়ছে না? প্রজাপতির নির্বন্ধ বুঝতে পারছেন না? নাঃ, আপনাদের মনে কিছুমাত্র রোমান্স নেই, দুজনে মনে প্রাণে বুড়িয়ে গেছেন, বাহ্যাভ্যন্তরে শক্ত পাথর হয়ে গেছেন, একেবারে পাকুড় স্টোন। ভাগ্যিস আপনাদের সঙ্গে ঠাকুদ্দা আর ঠাকুরমার বিয়ে ভেস্তে গিয়েছিল, নয়তো আমার বুড়ো ঠাকুদ্দাকে বেত খেতে হত, আর বুড়ী ঠাকুমাকে বাঁদি হয়ে জন্ম জন্ম পান ছেঁচতে হত।

কনকলতা করুণাময়কে বললেন, হ্যাঁগা জজসাহেব, তিরি হাত নেড়ে ওদের কি বলছে?

—বোধ হয় ধমক দিচ্ছে।

—ছি ছি, মেয়েটার আক্কেল মোটে নেই, ভদ্রজন বাড়িতে এসেছে, তাদের ওপর তম্বি! ওর ঠাকুদ্দা আশকারা দিয়ে মাথাটি খেয়েছে। তুমি ওকে খুব করে বকুনি দিও বাবা, বাড়ির লোককে তো গ্রাহ্যি করে না।

১৩৬১ (১৯৫৪)

শিবলাল

আমহার্স্ট স্ট্রীট দিয়ে মানিকতলা বাজারের দিকে যাচ্ছি। সিটি কলেজের কাছে এসে দেখি লোকারণ্য, দু-তিন জন লালপাগড়ি পুলিসও রয়েছে। ভিড় থেকে একটি ছেলে এগিয়ে এল। তার ব্যাজ নেই তবু ভঙ্গী দেখে বোঝা যায় যে সে একজন স্বেচ্ছাসেবক। হাত নেড়ে আমাকে বলল, যাতায়াত বন্ধ, এইখানে সবুর করুন।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে? এত ভিড় কিসের?

—দেখুন না কি হচ্ছে। শিবলাল ভার্সস লোহারাম।

কিছুই বুঝলাম না। ছেলেটি ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে অন্যত্র গেল। একজন কনস্টেবলকে দেখে বললাম, ক্যা হুআ জমাদারজী?

দাঁত বার করে জমাদারজী বললেন, আরে কুছ্‌ নাহি বাবু।

পুলিসের হাসি দুর্লভ। বুঝলাম দুর্ঘটনা নয়, কোনও তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু এত ভিড় কিসের জন্যে? যাতায়াত বন্ধ কেন? লোকে উদ্‌গ্রীব হয়ে কি দেখছে? কুস্তি হচ্ছে নাকি?

একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক অতি কষ্টে ভিড় ভেদ করে উলটো দিক থেকে আসছেন। ছেলেরা তাঁকে বাধা দেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তিনি জোর করে চলে এলেন। আমার কাছে পৌঁছতেই বললাম, কি হয়েছে মশায়?

এই সময় ভিড়ের মধ্য থেকে হাততালির শব্দ উঠল, সঙ্গে সঙ্গে জনকতক ধমক দিল—চোপ, চোপ, গোল করবে না।

চুপি চুপি আবার প্রশ্ন করলাম, কি হয়েছে মশায়?

ভদ্রলোক বললেন, হয়েছে আমার মাথা। বেলা সাড়ে চারটের মধ্যে শ্যামবাবুর বাড়িতে পৌঁছুবার কথা, তা দেখুন না, ব্যাটারা পথ বন্ধ করে খামকা দেরি করিয়ে দিল।

একজন সৌম্যদর্শন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক আমার কাছে এলেন। তাঁর মাথায় টিকি, কপালে বিভূতির ত্রিপুণ্ড্রক, মুখে প্রসন্ন হাসি। আমাকে বললেন, কি হয়েছে জানতে চান? আসুন আমার সঙ্গে। ও তিনু, ও কেষ্ট, একটু পথ করে দাও তো বাবারা।

তিনু আর কেষ্ট দুই স্বেচ্ছাসেবক কনুইএর গুঁতো দিয়ে পথ করে দিল, আমরা এগিয়ে গেলাম। সঙ্গী ভদ্রলোক বললেন, আমার নাম হরদয়াল মুখুজ্যে, এই পাড়াতেই বাস। মশায়ের নাম?

—রামেশ্বর বসু। আমিও কাছাকাছি থাকি, বাদুড়বাগানে।

ভিড় ঠেলে আরও কিছু দূর আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে হরদয়ালবাবু আঙুল বাড়িয়ে বললেন, দেখতে পাচ্ছেন?

দেখলাম দুটো ষাঁড় লড়াই করছে। গর্জন নেই, নড়ন চড়ন নেই, কিন্তু শীতল

সময় বলা যায় না, নীরব উষ্মা দুই যোদ্ধারই বিলক্ষণ আছে। একটি ষাঁড় প্রকাণ্ড, দেখেই বোঝা যায় বয়স হয়েছে, ঝুঁটি আর শিং খুব বড়, গলা থেকে থলথলে ঝালর নেমে প্রায় মাটিতে ঠেকেছে। অন্যটি মাঝারি আকারের, বয়সে তরুণ হলেও বেশ হৃষ্টপুষ্ট আর তেজস্বী। দুই ষাঁড় শিং জড়াজড়ি করে মাথায় মাথা ঠেকিয়ে পরস্পরকে ঠেলে ফেলবার চেষ্টা করছে। টগ-ওভ-ওআরের উলটো, টানাটানির বদলে ঠেলাঠেলি।

হরদয়াল বললেন, প্রায় এক ঘণ্টা এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলছে। প্রবীণ ষাঁড়টির নাম শিবলাল, আর তরুণটির নাম লোহারাম। স্বয়ং শিব কর্তৃক লালিত সেজন্য শিবলাল নাম। লোহারাম হচ্ছে এই পাড়ার ষাঁড়, লোহাওয়ালারা ওকে খেতে দেয়। লড়াই শুরু হতেই ওরা ওর ওপর বাজি ধরেছে। ওদের বিশ্বাস, ওই নওজওআন লোহারামের সঙ্গে বুড়ো শিবলাল পেরে উঠবেন না। কিন্তু পাড়ার বাঙালীরা জানে যে শেষ পর্যন্ত শিবলালেরই জয় হবে।

গান্ধী টুপি আর লম্বা কোট পরা এক ভদ্রলোক হরদয়ালের কথা শুনছিলেন। তিনি একটু ভাঙা বাংলায় বললেন, এ হরদয়ালবাবু, এর ভিতর প্রাদেশিকতা আনবেন না। এই লড়াই বিহার আর বঙ্গালের মধ্যে হচ্ছে না।

হরদয়াল বললেন, নিশ্চয়ই নয়। লোহারাম এই পাড়ার ষাঁড়, বিহারী কালোয়াররা ওকে খেতে দেয়, সেজন্য লোহারামকে বিহারী বলা যেতে পারে। কিন্তু শিবলাল বাঙালী নন, সর্বভারতীয় কস্মপলিটন ষণ্ড। এঁর জন্মভূমি কোথায় তা কেউ জানে না। তবে এঁর সম্বন্ধে আমার একটা থিওরি আছে, এঁর ইতিহাসও আমি কিছু কিছু জানি।

টুপিধারী লোকটি একটু অবজ্ঞার হাসি হেসে চলে গেলেন। আমি বললাম, ইতিহাসটি বলুন না হরদয়ালবাবু।

হরদয়াল বললেন, সবুর করুন। লড়াইটা চুকে যাক, তারপর আমার বাড়িতে আসবেন, চা খাবেন, শিবলালের কথাও শুনবেন।

লড়াই শেষ হতে দেরি হল না। শিবলাল হঠাৎ একটি প্রকাণ্ড গুঁতো লাগাল। লোহারাম ছিটকে সরে গেল, তার পর ল্যাজ উঁচু করে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়ে পালাল। দর্শকরা চিৎকার করে বলতে লাগল, শিবলালজী কি জয়! লোহা-রাম দুও।

প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিতাড়িত করে শিবলাল গজেন্দ্রগমনে হেলে দুলে চলল. না জানি কি জানি হয় পরিণাম দেখবার জন্যে আমরাও তার পিছু নিলাম। একটা বাঙালী ময়রার দোকানের সামনে পিতলের থালায় শিঙাড়া আর নিমকি সাজানো রয়েছে। শিবলাল তাতে মুখ দিল। ত্রস্ত হয়ে ময়রা হাঁ হাঁ করে উঠল। দর্শকেরা ধমক দিয়ে বলল, খবরদার, বাধা দিও না, পেট ভরে খেতে দাও, তোমার চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি যে এমন অতিথি পেয়েছ। দু থালা নিঃশেষ করে শিবলাল এদিক ওদিক তাকাচ্ছে দেখে একজন ভলান্টিয়ার তার পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, এগিয়ে এসো বাবা।

পাশেই একটি হিন্দুস্থানী হালুইকরের দোকান। সামনের বারকোশে সদ্য ভাজা দালপুরির স্তূপ দেখিয়ে ভলান্টিয়ার বলল, যত খুশি খাও বাবা। আপত্তি নিষ্ফল জেনে হালুইকর চুপ করে রইল। অচিরাৎ দালপুরি শেষ হল। একটি ছেলে দোকানের ভিতরে ঢুকে ছোলার দাল, আলুর দম, আর জিলিপির গামলা টেনে

এনে সামনে রাখল। শিবলাল সমস্ত উদরস্থ করে ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করতে লাগল। দর্শকরা বলল, আর কি আছে জলদি নিকালো। দোকানদার বিষন্ন মুখে বলল, কুছ ভি নহি, সব খা ডালা।

হরদয়ালবাবু হাতে একটু জল নিয়ে শিবলালের গায়ে ছিটিয়ে দিয়ে বললেন, নমঃ শিবায়। শিবলাল ফোঁস ফোঁস শব্দ করে বিবেকানন্দ রোডের দিকে চলে গেল।

হরদয়ালবাবুর বাড়ি কাছেই। কৌতূহলের বসে আমি তাঁর সঙ্গে গেলাম। বাইরের ঘরে ফরাসের উপর আমাকে বসিয়ে হরদয়াল চাকরকে হুকুম করলেন, ওরে, জলদি এঁর জন্যে চা তৈরি করে আন।

আমি বললাম, আপনি ব্যস্ত হবেন না, এ সময় চা খাওয়া আমার অভ্যাস নেই। শুধু শিবলালের ইতিহাস শুনব। আপনার কি একটি থিওরি আছে বলেছিলেন, তাও শুনতে চাই।

হরদয়াল বললেন, সবই বলব। চা খাবেন না তো একটু শরবত আনতে বলি? খুব মাইল্ড সিদ্ধির শরবত? বৃদ্ধ বয়সে একটু খাওয়া ভাল। তাও নয়? সিগারেট?

—ওসব কিছুই দরকার নেই। আপনি শিবলালের কথা বলুন।

—বেশ, তাই বলছি শুনুন। এই যে শিবলালজীকে দেখেছেন, এঁকে সামান্য ষাঁড় মনে করবেন না। মাদাম ব্লাভাৎস্কি বলেছেন, মানবের চাইতেও যেমন বড় আছেন মহামানব বা সুপারম্যান, তেমনি পশুর ওপর আছেন মহাপশু, সুপারবীস্ট। হিমালয়বাসী স্নোম্যান হচ্ছেন সেইরকম প্রাণী। এঁদের বড় একটা দেখা যায় না, কালে ভদ্রে লোকালয়ে আগমন করেন। এই শিবলাল হচ্ছেন একজন সুপারবীস্ট। মহোক্ষ জানেন? সংস্কৃত গ্রন্থে অনেক উল্লেখ আছে। মহোক্ষ মানে মহাষণ্ড, উক্ষ আর ইংরিজী অক্স একই শব্দ। শিবলালের প্রথম আবির্ভাব কোথায় হয়েছিল, বর্তমান বয়স কত, তা কেউ জানে না। আমার পিতামহ ওঁকে কাশীতে দেখেছিলেন। আবার তাঁর পিতামহ ওঁকে হরিদ্বারে দেখেছিলেন। তবেই বুঝুন ওঁর বয়সটা কত। আর, চেহারাটি দেখুন, আমাদের বাংলা ষাঁড় কিংবা ভাগলপুর সীতামাড়ি বা হিস্যারের ষাঁড়, কারও সঙ্গে মিল নেই। মহেঞ্জোদারো আর হরপ্পায় যে সব পোড়া মাটির সীল পাওয়া গেছে তার ছবি দেখেছেন তো? তাতে যে মহাষণ্ডের মূর্তি আছে তার সঙ্গে এই শিবলালের রূপ মিলিয়ে দেখুন। সেই বিশাল বপু, সেই উন্নত ককুদ, সেই বৃহৎ শৃঙ্গ, সেই ভূলুণ্ঠিত গলকম্বল। প্রাচীন সৈন্ধব জাতি অর্থাৎ ইন্ডস ভ্যালির লোকরা শৈব ছিলেন। তাঁদের উপাস্য দেবতা শিবের বাহন যে মহোক্ষ, তাঁরই মূর্তি পোড়া মাটির মুদ্রায় অঙ্কিত আছে। আমার থিওরিটা কি জানেন? এই শিবলালজীই হচ্ছেন পুরাকালীন সৈন্ধব জাতির মহোক্ষ, এখন পর্যন্ত ধরাধামে আছেন। এতটা যদি বিশ্বাস নাও করেন তবে এ কথা মানতে বাধা নেই যে শিবলাল সেই সৈন্ধব মহোক্ষেরই বংশধর। কি বলেন আপনি?

—অসম্ভব নয়।

—আচ্ছা, এখন এঁর কীর্তিকলাপ শুনুন। চার বছর আগে ইনি কাশীতে বিশ্বনাথ মন্দিরের নিকটে বিচরণ করতেন। একদিন ভোরবেলা মন্দিরের দরজার সামনে নিদ্রিত ছিলেন, একজন পাণ্ডা এঁকে ঠেলা দিয়া তাড়াবার চেষ্টা করে। যখন কিছুতেই উঠলেন না তখন পাণ্ডা লাথি মারতে লাগল। শিবলাল ক্রুদ্ধ হয়ে

শিং দিয়ে পাণ্ডার পেট ফুটো করে দিলেন। তারপর থেকে কাশীধামে ও°কে আর দেখা গেল না। মাস দুই পরে উনি ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় বৈদ্যনাথের মন্দিরে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে খবর পাওয়া গেল, ঝাঁঝার জঙ্গলে একটা রয়াল বেঙ্গল টাইগারের মৃতদেহ পাওয়া গেছে, কোনও মহাকায় প্রাণী শিঙের গুঁতোয় তার পেট ফুটো করেছে, পা দিয়ে মাড়িয়ে সর্বাঙ্গ চূর্ণ করে দিয়েছে। এই শিবলালজীরই কর্ম তাতে সন্দেহ নেই। পাণ্ডাদের পরিচর্যায় ও°র ঘা শীঘ্রই সেরে গেল। কিন্তু কি একটা অসম্মানের জন্যে বিরক্ত হয়ে উনি বৈদ্যনাথধাম ত্যাগ করলেন এবং ঘুরতে ঘুরতে তারকেশ্বরে এলেন। আবার দিন কতক পরে সেখান থেকে চুঁচড়োর ষাড়েশ্বর তলায় উপস্থিত হলেন। প্রায় তিন বছর হল সেখান থেকে কালীঘাটে এসে নকুলেশ্বর মন্দিরের কাছে আস্তানা করেছেন। আজকাল সেখানেই রাত্রিযাপন করেন, দিনের বেলায় শহরের নানা স্থানে পর্যটন করে বেড়ান।

আমি বললাম, চমৎকার ইতিহাস। আচ্ছা, বসুন আপনি আমি এখন উঠি।

হরদয়ালবাবু হাত নেড়ে বললেন, আরে এখনই উঠবেন কি? শিবলালজীর যা শ্রেষ্ঠ কীর্তি, মহত্তম অবদান, তাই বাকী রয়েছে। বলছি শুনুন। কামধেনু ডেয়ারি ফার্মের নাম শুনেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সেখান থেকেই তো আমার বাড়িতে দুধ আসত। শেষকালে ওদের কুবুদ্ধি হল, মোষের দুধ, গুঁড়ো দুধ, জল, এইসব মিশিয়ে খদ্দের ঠকাতে লাগল। তখন তাদের দুধ নেওয়া বন্ধ করলাম।

—প্রায় দু বছর হল কামধেনু ডেয়ারি ফেল হয়েছে। কেন ফেল হল জানেন? ওই বাবা শিবলালের কোপে পড়ে। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। কামধেনু ডেয়ারির তিন শ গরু ছিল, ঢাকুরের ওদিকে বড় বড় গোয়ালে তারা থাকত। সকালে দুধ দোহার পর আট দশ জন রাখাল তাদের গড়ের মাঠে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিত। দিন ভর তারা ঘাস খেত, তারপর বেলা পড়লে রাখালরা তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেত।

সেই সময়ে শিবলাল চুঁচড়ো থেকে কালীঘাটে আগমন করেন। উনি সমস্ত দিন টোটো করে ঘুরতেন, সন্ধ্যের কিছু আগে গড়ের মাঠে গিয়ে খানিকক্ষণ নিরিবিলিতে বায়ুসেবন করতেন। একদিন কি খেয়াল হল, বেলা তিনটের সময় মাঠে উপস্থিত হলেন। দেখলেন, একপাল নধর গরু চরে বেড়াচ্ছে। শিবলাল প্রীত হয়ে নাসিকা উত্তোলন করে কয়েকবার হর্ষসূচক ঘোঁত ঘোঁত ধ্বনি করলেন। আর যায় কোথা! সেই আহ্বান শুনে কামধেনু ডেয়ারির তিন শ গরু হাম্বা রব করে ছুটে এসে শিবলালকে বেষ্টন করল। রাসমণ্ডলের মধ্যবর্তী গোপিকাবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শিবলাল শোভমান হলেন। ক্ষণকাল পরে তিনি মাঠ ত্যাগ করে সবেগে চললেন, সমস্ত গরু অভিসারিকা হয়ে তাঁর অনুসরণ করল। হেস্টিংস ছাড়িয়ে ডায়মণ্ড-হারবার রোড দিয়ে শিবলালের অনুগামিনী ধেনুবাহিনী মার্চ করে চলল, রাখালরা লাঠি নিয়ে পশ্চাদ্ধাবন করল। কিন্তু তিন শ গরু যদি স্বেচ্ছায় একটি ষাঁড়ের সঙ্গে ইলোপ করে তবে তাদের আটকাবে কে? বেগতিক দেখে কয়েক জন রাখাল ফিরে গিয়ে কর্তাদের খবর দিল। তখন তিন জন ডিরেক্টর—গোবরচন্দ্র ঘোষ, গোবর্ধনলাল মাথুর, আর হাজী কোরবান আলী মোটরে চড়ে ছুটলেন, একটা লরিতে তাঁদের অনুচররাও চলল। মগরাহাটের কাছাকাছি এসে দেখলেন, একটি মাঠে শিবলালজী তাঁর সঙ্গিনীদের সঙ্গে ঘাস খাচ্ছেন। কর্তারা স্থির করলেন, ওই ষাঁড়টিকে কাবু না করলে তাঁদের গোধন উদ্ধার করা যাবে না। তাঁদের হুকুমে

জনকতক সাহসী লোক লাঠি নিয়ে শিবলালজীকে আক্রমণ করল। তখন সমস্ত গরু একযোগে শিং বাগিয়ে তেড়ে এল, ডেয়ারির লোকরা ভয় পেয়ে পালাল। কর্তারা হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন, কয়েকজন রাখাল গরুদের ওপর নজর রাখবার জন্যে সেখানে রয়ে গেল।

তারপর ডেয়ারির কর্তারা আরও তিন-চার দিন গরু চরিয়ে আনবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোন ফল হল না। শেষকালে স্থির করলেন যে মগরাহাটের ওই মাঠটা লীজ নিয়ে ওখানেই ডেয়ারির জন্য গোশালা করবেন। ভেজাল দুধ দিয়ে কোনও রকমে খদ্দের ঠেকিয়ে রাখা হল, ওদিকে জমির মালিকের সঙ্গেও কথাবার্তা চলতে লাগল। তখন আর এক বিপদ উপস্থিত। শিবলালজী মুক্ত জীব, বেশী দিন সংসার মায়ায় বদ্ধ হয়ে থাকতে পারবেন কেন? সাত দিন পরেই তাঁর গোষ্ঠ-লীলার শখ মিটে গেল, রাত্রিযোগে তিনি একাকী কালীঘাটে প্রত্যাবর্তন করলেন।

—গরুগুলোর কি হল? কর্তারা তাদের ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন তো?

—রাম বল, ফেরবার জো কি? চারদিকের গাঁ থেকে চাষারা এসে সব গরু লুট করে নিয়ে গেল...দেখুন রামেশ্বরবাবু এই শিবলালজীর মাহাত্ম্য দেশের লোক এখনও বুঝল না। আমি দুগ্ধ-মন্ত্রীকে চিঠি লিখেছিলাম—মশায়, ওঁকে হরিণ-ঘাটায় নিয়ে গিয়ে তোয়াজ করুন, আপনাদের গোবংশের অশেষ উন্নতি হবে। এমন পেডিগ্রি-সম্পন্ন মহাকুলীন ষাঁড় আর পাবেন কোথা? কিন্তু মন্ত্রীমশায় কিছুই করলেন না, তিনি শুধু সীতামাড়ি, হরিয়ানা, হিসার, শর্ট হর্ন, জার্সি—এই সব বোঝেন। আচ্ছা, আজ এখন উঠতে চান? মধ্যে মধ্যে আসবেন দয়া করে, আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়ায় বড় খুশী হলাম রামেশ্বরবাবু। নমস্কার।

১৩৬১ (১৯৫৪)

নীলকণ্ঠ

লেকের ধারে তিন বার চক্কর দিয়েছি, সন্ধ্যা হয়ে এল। বাড়িমুখো হব এমন সময় কাতর কণ্ঠস্বর কানে এল—ও মশায়, দয়া করে আমার কাছে একটু বসুন না।

ভদ্রলোক একটা বেঞ্চে একা বসে আছেন। রোগা চেহারা, চুল উস্কখুস্ক, দাড়িও সম্প্রতি কামান নি। বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। মুখ দেখে মনে হল শারীরিক বা মানসিক কষ্ট ভোগ করছেন। আমি তাঁর পাশে বসতেই বললেন, আপনার নাম আর ঠিকানা?

আর কেউ হঠাৎ এমন প্রশ্ন করলে ধমক দিতাম, কিন্তু এঁর উপর রাগ হল না। বললাম, আমার নাম সুশীলচন্দ্র চন্দ্র, কাছেই থাকি একুশ নম্বর কার্তিক নশকর লেন। কেন বলুন তো?

ভদ্রলোক নোটবুক বার করে একটা পাতা ছিঁড়ে খচখচ করে কিছু লিখলেন। তারপর কাগজটি মুড়ে আমাকে বললেন, ধরুন, পকেটে রেখে দিন, হারাবেন না যেন।

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এ কাগজ নিয়ে আমি কি করব! আপনার নাম কি মশায়?

—আমার নাম শ্রীনীলকণ্ঠ তবলদার। হাল ঠিকানা প্লট নম্বর পঞ্চান্ন, কপিল রোড এক্সটেনশন, ডাক্তার বঙ্কিম পালের বাড়ি। কাগজটা যত্ন করে রাখবেন, আপনি যাতে বিপদে না পড়েন তার জন্যে লিখে দিয়েছি।

—বিপদে পড়ব কেন?

—পুলিস আপনাকে নিয়ে টানাটানি করতে পারে তাই লিখে দিয়েছি—আমার মৃত্যুর জন্যে আমি ভিন্ন আর কেউ দায়ী নয়।

—আপনারই বা মৃত্যু হবে কেন?

নীলকণ্ঠ তবলদার চক্ষু বিস্ফারিত করে বিকৃতমুখে একটু হেসে বললেন, বিশ্বাস হচ্ছে না? তবে এই দেখুন।...বলেই পকেট থেকে একটা শিশি বার করে ঢকঢক করে সবটা খেয়ে ফেললেন।

লোকটির কাণ্ড দেখে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, একি করলেন! আমি লোক ডাকছি—

নীলকণ্ঠ বজ্রমুষ্টিতে আমার হাত ধরলেন এবং পকেট থেকে একটা ছুরি বার করে বললেন, খবরদার উঠবেন না বলছি, তা হলে আমার টুঁটি কেটে ফেলব।

বদ্ধ পাগল। একে বাঁচানো যাবে কি করে? কাছাকাছি কেউ নেই, দূরে কয়েক জন বেড়াচ্ছে। চিৎকার করে ডাকতে যাচ্ছি, নীলকণ্ঠ আমার মুখ চেপে ধরে বললেন, খবরদার, টু শব্দটি করলেই আমি নিজেকে জবাই করব।

বললাম, আপনার মতলবটা কি মশায়? একাই তো মরতে পারতেন, আমাকে ডাকবার কি দরকার ছিল?

নীলকণ্ঠ একটু নরম হয়ে বললেন, রাগ করবেন না সুশীলবাবু। অন্তিম মুহূর্তে আমার ইতিহাসটি আপনাকে শোনাতে চাই, নইলে মরেও শান্তি পাব না।

—আপনি তো এখনই মরবেন, ইতিহাস শোনাবেন কখন?

নীলকণ্ঠ তাঁর হাতঘড়ি দেখে বললেন, এখন সওয়া ছটা, সাড়ে ছটা পর্যন্ত সময় পাওয়া যাবে। পনরো মিনিট পরে মরব।

—কি খেয়েছেন?

—হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড। শিশিটা শুঁকে দেখুন, বাদামের গন্ধ পাবেন।

—ও জিনিস খেলে তো সঙ্গে সঙ্গে মরবার কথা। এখনও বেঁচে আছেন কি করে?

—হুঁ হুঁ, এটি আমারই আবিষ্কার দাদা। ফটোগ্রাফি করেছেন কখনও? এক্সপোজ করে দোকানে ফিল্ম দিলেন, সব কাজ তারাই করে দিল, সে রকম ফাঁকির ফোটোগ্রাফি নয়। নিজে ডেভেলপ করেছেন কখনও? পটাশ ব্রোমাইডে কি হয় জানেন? রিটার্ডেশন হয়, ছবি ফুটে উঠতে দেরি হয়। যা খেয়েছি তাতে টু পারসেণ্ট হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড আর তিন গ্রেন ব্রোমাইড আছে, তার ফলে বিষক্রিয়া পিছিয়ে গেছে। বুঝতে পারছেন না? সিদ্ধির সঙ্গে মাকড়শার ঝুল মিশিয়ে খেলে জোর নেশা হয় জানেন তো? একে বলে সিনারজিস্টিক এফেক্ট। কিন্তু ঝুলের বদলে যদি ইঁদুর-নাদি মেশান তবে নেশা ধরতে দেরি হবে, কারণ ইঁদুর-নাদি হল অ্যাণ্টি-সিনারজিস্টিক। পটাশ ব্রোমাইডের ক্রিয়াও সেই রকম। পাস করি নি বটে, কিন্তু বাড়িতে বিস্তর পড়েছি, হেন সায়েন্স নেই যা জানি না। আমার বন্ধু বঙ্কিম পাল তার ডিসপেনসারিতে আমারই প্রিস্‌ক্রিপশন মাফিক মিক্‌শ্চার বানিয়ে দিয়েছে।

—বন্ধু হয়ে আপনাকে বিষ দিলেন?

—তা না দেবে কেন। আমার প্রাণ আমার নিজের সম্পত্তি, নির্ব্যূঢ় স্বত্বে ভোগ দখল করতে পারি, যেমন খুশি দান বিক্রয় বা ধ্বংসের অধিকারও আমার আছে। আপনাদের আইন আমি গ্রাহ্য করি না। বঙ্কিম ডাক্তারও উদার লোক, তার প্রেজুডিস মোটেই নেই। সে তার বন্ধুর অন্তিম অনুরোধ পালন করেছে।

—শুধু শুধু মরছেন কেন?

—শুধু শুধু নয় মশায়। এই পৃথিবীর ওপর ঘেন্না ধরে গেছে. কেবল ভেজাল নকল ঠকামি আর জোচ্চুরি। এই সামনের দুটো দাঁত দেখুন, কাঁকর মিশনো চাল খেয়ে ভেঙ্গে গেছে। পাঁচটি বচ্ছর ড্রপসিতে ভুগেছি, ভেজাল সরষের তেল খেয়ে। দু বছর ধরে সর্দিতে ভুগছি, মুরগির মাংস বলে ব্যাটারা কচ্ছপ খাইয়েছে। তেল ঘি দুধ দই মসলা সর্বত্র ভেজাল। কংগ্রেস সরকারও ভেজাল, সর্বত্যাগী গান্ধীজীর নাম করে সমস্ত ক্ষমতা হাতিয়েছে আর মোটা মোটা মাইনে দিয়ে এক পাল খাঞ্জা খাঁ নবাব পুষছে। কমিউনিস্ট পার্টিও ভেজাল, দেশ সুদ্ধ লোককে ভেড়া বানিয়ে ডিক্‌টেটারি চালাবার মতলব। অধিক কি বলব মশায়, বিবাহে পর্যন্ত ভেজাল। আর সব কোনও রকমে সইতে পারি, কিন্তু ভেজাল বউ অসহ্য।

—ভেজাল বউ কি রকম? কালো মেয়ে রং মেখে আপনাকে ঠকিয়েছে নাকি?

—আরে না মশায়, কালোতে আমার কোনও আপত্তি নেই। আমি নিজেই বা কোন্ ফরসা।

—কুলকন্যা সেজে কুলটা আপনার ঘরে এসেছে?

—তা হলে তো উপায় ছিল, শুদ্ধি অর্থাৎ ডিস্‌ইনফেক্ট করিয়ে নিয়ে সংসার-ধর্ম করতাম। বলছি শুনুন। আমি ছেলেবেলা থেকেই প্রবাসী। বাবা ডোংগরগড়ে কাঠের কারবার করতেন, তিনি গত হবার পর আমিও তা করছি। বন্ধুরা বলল, ওহে নীলকণ্ঠ, বুড়ো হতে চললে, এইবারে একটি বউ আন। কথাটা মনে লাগল, তাই বিবাহ করবার জন্যে কলকাতায় এলাম। বঙ্কিম ডাক্তার আমার বাল্যবন্ধু, সে ছাড়া কলকাতায় আমার চেনা লোক নেই। তার বাড়িতেই আছি। হঠাৎ একদিন হেবো এসে উপস্থিত। তাকে আগে কখনও দেখি নি, পরিচয় দিল—সে আমার দূর সম্পর্কের পিসতুতো ভাই। খুব চালাক ছোকরা। আমাকে বলল, শুনুন দাদা, শহুরে মেয়েরা রাবিশ, আমাদের গ্রামে চলুন, খুব ভাল পাত্রী আমার সন্ধানে আছে। হেবোর সঙ্গে চালতাডাঙায় গেলাম, খরচের জন্যে তিন শ টাকাও তাকে দিলাম। পাত্রীটি দেখলাম নেহাত মন্দ নয়। নম নম করে বিবাহ হয়ে গেল। তারপর ফুলশয্যার রাত্রে একলা পেয়ে কনে আমাকে কি বলল জানেন? —ও মোসাই, দুটো সিগ্রেট দিন তো, সমস্ত দিন না খেয়ে ভোচকানি লেগেছে। আমি অবাক হয়ে তার দিকে চাইতেই বলল, ঘাবড়াও কেন প্রাণনাথ? ক্যায়সা বউ পেয়েছ দেখ না ঠাওর করে। আমার চাঁদমুখে একবার হাতটি বুলিয়ে দেখ, দু নম্বর সিরিশ কাগজের মতন ঠেকছে না? দু দিন পরে দেখবে ইয়া মোচ ইয়া দাড়ি।

—পুরুষের সঙ্গে আপনার বিয়ে হয়েছিল নাকি?

—হাঁ মশায়। আমি বিয়ে পাগলা নই, এমন কিছু বুড়োও হই নি, তবু আমাকে ঠকিয়েছিল। পরদিন হেবোকে গালাগাল দিতেই সে বলল, কি সর্বনাশ, দেশের লোককে বিশ্বাস করবার জো নেই। ওই বজ্জাত নিমাই মিত্তিরটার এই কাজ, নিজের শালীপো মটরাকে কনে সাজিয়ে ঠকিয়েছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন দাদা, নিমে শালাকে আমি দেখে নেব। যা হবার হয়ে গেছে, এখন মটরাকে গোটা পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বিদেয় করুন, নইলে আদালতে খোরপোশের দাবি করবে।

আমি বললাম, খুব করুণ ইতিহাস নীলকণ্ঠবাবু। কিন্তু পনরো মিনিট কাবার হতে চলল, এখনও তো আপনি মরলেন না।

—আঃ ব্যস্ত হন কেন। বিদ্যাসাগর লিখেছেন, মরণের অবধারিত কাল নাই। বিষ খেলেই যে বাঁধাধরা সময়ের মধ্যে মরতে হবে এমন কোনও নিয়ম নেই, মানুষের ধাত অনুসারে কিছু এদিক ওদিক হয়। আচ্ছা, আমার নাড়ীটা একবার দেখুন তো, বড্ড যেন কাহিল ঠেকছে।

নাড়ী দেখে আমি বললাম, দিব্যি সুস্থ সবল লোকের নাড়ী, ক্ষীণে বলবতী প্রাণঘাতিকা নয়। আপনি এখনই মরবেন না নীলকণ্ঠবাবু, অনর্থক আমাকে আটকে রেখেছেন। আমি এখন উঠি।

—আপনি তো ভারী স্বার্থপর লোক মশায়! একটা মানুষ মরতে বসেছে, তার শেষ অনুরোধ রাখবেন না? পনরো মিনিটের জায়গায় না হয় বিশ কি পঁচিশ মিনিটই হল। যা বলছিলাম শুনুন। হেবো আমাকে বলল, আবার আপনার বিয়ে দেব দাদা, আমাদের ভজু-মামাকে লাগিয়ে দেব, তুখড় লোক, তাকে কেউ ঠকাতে পারবে না। আপনি এখন কলকাতায় ফিরে যান, ভজু-মামা পাত্রী স্থির করেই আপনার সঙ্গে দেখা করবে।

—তবে আপনি মরতে চান কেন! বিবাহ তো হবেই।

—আর বিশ্বাস করি না মশায়, এখন ইহলোক ছেড়ে চলে যাওয়াই ভাল মনে করি।

—কোথায় যেতে চান, স্বর্গে?

—রাম বল, স্বর্গেও ভেজাল। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইন্দ্র বরুণ সব পালিয়েছেন, এখানকার অবতাররা সেখানে গিয়ে জাঁকিয়ে বসেছেন। আমি মঙ্গল গ্রহে যাব স্থির করেছি। পরশু শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখেছিলাম—

আমি উঠে পড়ে বললাম, মাপ করবেন নীলকণ্ঠবাবু, আমাকে এখন যেতেই হবে। আপনার মৃত্যুর ঢের দেরি, বহু বৎসর বাঁচবেন। আপনার বন্ধু বঙ্কিম ডাক্তার আপনাকে ঠকিয়েছেন। আচ্ছা বসুন, নমস্কার।

নীলকণ্ঠবাবু আমাকে ফেরাবার জন্যে চিৎকার করতে লাগলেন, কিন্তু আমি আর দাঁড়ালাম না।

পরদিন ঘুম থেকে উঠেই মনে হল, আহা, পাগল লোকটিকে একলা ফেলে এসেছি, আজ একবার খোঁজ নেওয়া উচিত। ডাক্তার বঙ্কিম পালকে চিনি, বেলা নটার সময় তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হলাম।

নীলকণ্ঠবাবু নীচের বারান্দায় বসে সিগারেট টানছেন। আমাকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে বললেন, আসুন আসুন সুশীলবাবু। দেখুন, জগতে আপনিই একমাত্র খাঁটী মানুষ, আমার বন্ধু বঙ্কিম ডাক্তারও ভেজাল চালিয়েছে, হাইড্রোসায়ানিকের বদলে বাদামের শরবৎ খাইয়েছে। নেহাৎ বন্ধু লোক, নইলে পুলিসে খবর দিতুম।

আমি বললাম, বঙ্কিম ডাক্তার খুব ভাল কাজ করেছেন, তিনি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু তাই আপনার বেয়াড়া অনুরোধ রাখেন নি।

এই সময় একটি লোক এসে বলল, নীলকণ্ঠ তবলদার এখানে থাকতেন?

নীলকণ্ঠ বললেন, আপনি কে মশায়?

—আমি সম্পর্কে নীলকণ্ঠের মামা হই, ভজু-মামা, চালতাডাঙার হেবো আমাকে পাঠিয়েছে।

নীলকণ্ঠ ভয় পেয়ে চুপি চুপি আমাকে বললেন, আপনিই কথা বলুন দাদা, আমি আর ওদের ফাঁদে পা দিচ্ছি না।

আমি প্রশ্ন করলাম, কি দরকার আপনার?

—বড়ই দুঃসংবাদ, নীলকণ্ঠ বেচারা মারা গেছে।

আমরা দুজনেই চমকে উঠে বললাম, অ্যাঁ, বলেন কি!

—হ্যাঁ মশায়। কাল সন্ধ্যের কলকাতায় পেঁছেই সোজা এখানে এসেছিলাম, একটা ভাল সম্বন্ধ পেয়েছি কিনা। এসে দেখি, নীলকণ্ঠ নেই, ডাক্তারবাবুও বেরিয়ে গেছেন। একটি ছোকরা কম্পাউণ্ডার বলল, নীলকণ্ঠবাবু চার আউন্স বিষ নিয়ে লেকে গেছেন, তাঁর মতলব ভাল নয়, যান যান, এখনই সেখানে গিয়ে খবর নিন। গিয়ে শুনলাম, লেকের ধারে একটা লাশ পাওয়া গেছে, পুলিস মর্গে চালান দিয়েছে।

আমি বললাম, লেকে তো প্রায়ই লাশ পাওয়া যায়, ও জায়গাটা হলো হতাশ প্রেমের ভাগাড়। নীলকণ্ঠবাবু কি দুঃখে মরবেন?

ভজু-মামা বললেন, না মশায়, আপনি জানেন না, নির্ঘাৎ নীলকণ্ঠ। বেচারা বিয়ে করে হতাশ হয়েছে কিনা। আমি তখনই ছুটে মর্গে গেলাম, কিন্তু ঢুকতে পেলাম না।

বলল, এখন ঘর বন্ধ, কাল সকালে এসো। আজ সকালে আবার সেখানে গেলাম। সারি সারি সব শুয়ে আছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে আমাদের নীলকণ্ঠ। হেবোর কাছে তার চেহারার যেমন বর্ণনা শুনেছি হুবহু মিলে গেল।

নীলকণ্ঠ এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন। এখন আতঙ্কিত হয়ে বললেন, বয়স কত?

—তা পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে।

—বলেন কি! রং ফরসা না ময়লা?

—ময়লাই বটে।

—তবেই তো সর্বনাশ! গায়ে কোট না পঞ্জাবি?

—পঞ্জাবি। ধুতির ওপর আজকাল কেউ কোট পরে না মশায়, পশ্চিমে বাঙালী ছাড়া।

—গোঁফ আছে না নেই? পায়ে কি রকম জুতো?

—গোঁফ আছে বই কি। পায়ে কাবুলী জুতো।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নীলকণ্ঠ বললেন, তবে সে লাশ আমার নয়। আমি পঞ্জাবি পরি না, গোঁফ রাখি না, কাবুলী জুতোও আমার নেই। যাক, বাঁচা গেল। মরবার মতলবটা এখন ছেড়ে দিয়েছি।

আমি বললাম, ভগবান আপনাকে রক্ষা করেছেন নীলকণ্ঠবাবু।

ভজু-মামা বললেন, আরে তুমিই আমাদের নীলকণ্ঠ? এতক্ষণ বলতে হয়! আশ্চর্য, রাখে কৃষ্ণ মারে কে। আজকেই কালীঘাটে একটা পুজো দিতে হবে বাবা, দাও তো পাঁচটা টাকা। তোমার জন্যে আমি একটি চমৎকার সম্বন্ধ এনেছি নীলু, একেবারে ডানাকাটা পরী।

সম্বন্ধের কথা শুনেই নীলকণ্ঠ ভয় পেয়ে সিঁড়ি দিয়ে তর তর করে দোতলায় চলে গেলেন। ভজু-মামা বললেন, পালিয়ে গেল কেন!

আমি উত্তর দিলাম, নীলকণ্ঠবাবুর বিবাহে অরুচি হয়ে গেছে। ওঁর শরীর আর মন ভাল নেই, আপনি ওঁকে বিরক্ত করবেন না, চলে যান।

—আপনি আমাকে তাড়াবার কে মশায়? নীলু আমার ভাগনে, ওর কিসে ভাল হয় তা আমি বুঝব। আপনি এর মধ্যে আসেন কেন? ডেকে আনুন নীলুকে।

এই সময় বঙ্কিম ডাক্তার ওপর থেকে নেমে এলেন। ভজুকে বললেন, আবার কি করতে এসেছ হে?

—আমার ভাগনে নীলকণ্ঠকে এখনি ডেকে দিন।

—তার সঙ্গে দেখা হবে না। দূর হও এখান থেকে।

—আপনি বললেই দূর হব। আগে নীলকণ্ঠ আসুক, তাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। এখানে পরের বাড়িতে কেন সে থাকবে?

—সুশীলবাবু, দেখবেন এই লোকটা যেন না পালায়, আমি পুলিসে টেলিফোন করছি। ওরে ফটকটা বন্ধ করে দে।

ফটক বন্ধ হবার আগেই ভজু-মামা নক্ষত্র বেগে সরে পড়লেন।

১৩৬১ (১৯৫৪)

জয়হরির জেব্রা

এই আখ্যানের নায়ক জয়হরি হাজরা, নায়িকা বেতসী চাকলাদার, উপনায়ক উপনায়িকা গুটিকতক জন্তু, যথা—একটি বিলাতী কুত্তা, একটি দেশী কুত্তী, একটি আরবী ঘোড়া এবং একটি ভারতীয় জেব্রা। লেডিজ ফার্স্ট—এই আধুনিক নীতি অনুসারে প্রথমে বেতসীর পরিচয় দেব, তার পর জয়হরির কথা বলব। জন্তুদের অবতারণা যথাস্থানে করলেই চলবে।

বেতসী বিলাতে জন্মেছিল, রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের পাঁচ বৎসর পরে। তার বাপ মা ব্রিটিশভক্ত ছিলেন, সেজন্য মেয়ের নাম এলিজাবেথ রেখেছিলেন, সংক্ষেপে বেট্‌সি। কিন্তু সে নাম পরে বদলানো হয়। ভারতবর্ষে ফেরবার সময় জাহাজে একজন ইংরেজ স্ত্রীলোক বেট্‌সির মাকে ডার্টি নিগার বলেছিল, তাতেই রেগে গিয়ে তিনি তখনই মেয়ের বেট্‌সি নাম বদলে বেতসী করলেন।

বেতসীর বাবা প্রতাপ চাকলাদার ধনীর সন্তান। এদেশে শিক্ষা সমাপ্ত করে সস্ত্রীক বিলাত গিয়েছিলেন এবং সেখানে পাঁচ-ছ বৎসর বাস করে কৃষি ও পশু-পালন শিখেছিলেন। ফিরে এসে উলুবেড়ের কাছে তাঁর পৈতৃক জমিদারি হোগল-বেড়েতে তিন শ বিঘা জমির উপর ফুল ফল ফুলকপি বাঁধাকপি বীট গাজর টমাটো ইত্যাদির বাগান এবং বিস্তর গরু রেখে ডেয়ারি ফার্ম করলেন, তা ছাড়া ভেড়া ছাগল শুয়োর মুরগি হাঁস পুষে তারও ব্যবসা চালাতে লাগলেন। একটি উত্তম বাগানবাড়ি বানিয়ে সপরিবারে সেখানেই বাস করতেন, মাঝে মাঝে কলকাতায় যেতেন। সতরো বৎসর ধরে ব্যবসা ভালই চলল, লাভও প্রচুর হতে লাগল। তার পর প্রতাপ চাকলাদার মারা গেলেন।

বেতসীর মা অতসী মুশকিলে পড়লেন। স্বামীর হাতে গড়া অত বড় ব্যবসাটি চালাবার ভার কাকে দেবেন? তাঁর ছেলে নেই, একমাত্র সন্তান বেতসী। নায়েব হরকালী মাইতি কাজের লোক বটে, কিন্তু অত্যন্ত বুড়ো হয়েছেন, তাঁর উপর নির্ভর করা চলে না। স্থির করলেন সব বেচে দিয়ে কলকাতায় চলে যাবেন। কিন্তু বেতসী বলল, কিচ্ছু ভেবো না মা, আমি চালাব, বাবার কাছে সব শিখেছি। অতসী ভরসা পেলেন না, তবু মেয়ের জেদ দেখে ভাবলেন, দু বছর দেখাই যাক না, তার পর না হয় বেচে ফেলা যাবে। একটি উপযুক্ত জামাই যদি পাওয়া যায় তবে তার কোনও ভাবনা থাকে না। কিন্তু মেয়েটা যে বেয়াড়া, এত বয়সেও তার কাণ্ডজ্ঞান হল না।

অতসী উঠে পড়ে জামাইএর খোঁজ করতে লাগলেন। মেয়েকে নিয়ে ঘন ঘন কলকাতায় গেলেন, পার্টি দিলেন, বহু পরিবারের সঙ্গে মিশলেন, বাছা বাছা পাত্র-দের হোগলবেড়েতে নিমন্ত্রণ করে আনলেন, কিন্তু কিছুই ফল হল না। প্রতাপ চাকলাদারের সম্পত্তির লোভে অনেক সুপাত্র আর কুপাত্র এগিয়ে এসেছিল, কিন্তু বেতসীর সঙ্গে দু দিন মেশার পরেই সরে পড়ল। তার গড়ন ভাল, রং খুব ফরসা, কিন্তু মুখে লাবণ্যের অভাব আছে। সে মেমের মতন ব্রীচেস পরে ঘোড়ায় চড়ে

তার তিন শ বিঘা ফার্ম পরিদর্শন করে, কর্মচারীদের উপর হুকুম চালায়, শাসনও করে। তার রূপ চিত্তাকর্ষক নয়, মেজাজও উগ্র, সেজন্য তার মায়ের সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। বেতসী বলল, তোমার জামাই না জুটল তো বড় বয়েই গেল, আমি কারও তোয়াক্কা রাখি না, বাবার ফার্ম একাই চালাব। কিন্তু অতসী দেখলেন, ফার্মের আয় আগের মতন হচ্ছে না। বেতসী তার মাকে আশ্বাস দিলে—কোন ভয় নেই, দু-দিন পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।

জয়হরি হাজরার নামটি সেকেলে, কিন্তু সেজন্য তার বাপ মাকে দায়ী করা যায় না; তার হরিভক্ত ঠাকুরদাদাই ওই নাম রেখেছিলেন। জয়হরি মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান, লেখাপড়ায় খুব ভাল, একটা স্কলারশিপ যোগাড় করে বিলাত গিয়েছিল, সুতো আর কাপড় রঙানো শিখে তিন বছর পরে ফিরে এল। এসেই আমেদাবাদের একটি বড় মিলে তার চাকরি জুটে গেল। দু বছর পরে তা ছেড়ে দিয়ে নিজেই একটি ব্লীচিং অ্যাণ্ড ডাইং ফ্যাক্টরি খুলল। সে কারখানা খুব ভালই চলছিল, লাভও বেশ হচ্ছিল, তার পর এক দুর্ঘটনা হল। জয়হরির শিকারের শখ ছিল, গণ্ডাল স্টেটের জঙ্গলে একটা বুনো শুয়োরের আক্রমণে তার পা জখম হল। ঘা সারল, কিন্তু জয়হরি একটু খোঁড়া হয়ে গেল, হাঁটবার সময় তাকে লাঠিতে ভর দিতে হয়। এর কিছু আগে তার বাপ মা মারা গিয়েছিলেন। সে তার কারখানা ভাল দামে বেচে দিয়ে পৈতৃক পুরনো বাস্তুভিটা খাগড়াডাঙায় চলে এল। এই গ্রামটি হোগলবেড়ের লাগাও।

জয়হরির অর্থলোভ নেই, বিবাহেরও ইচ্ছা নেই। সে হিসাব করে দেখেছে তার যা পুঁজি আছে তাতে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু যে বিদ্যা সে শিখেছে তার চর্চা একেবারে ছাড়তে পারল না। খাগড়াডাঙার পুরনো ছোট বাড়িটা মেরামত করে বাসের উপযুক্ত করে নিল, এবং সেখানেই নানা রকম পরীক্ষা করে শখ মেটাতে লাগল। কিন্তু সুতো আর কাপড় ছোবানো নয়, জীবন্ত জন্তুর গায়ে রং ধরানো।

জয়হরির জমির একদিকে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা, আর তিন দিকে ধান খেত। রাস্তার দিকে সে কাঁটা তারের বেড়া লাগিয়েছে, আর সব দিকে ফণিমনসা নাগ-ভেরেণ্ডা ইত্যাদির পুরনো বেড়াই আছে। তার বাড়ির সামনে এখন আর জঙ্গল নেই, সুন্দর একটি মাঠ হয়েছে, তার মাঝে মাঝে কয়েকটি গাছ আছে। বাড়ির পিছন দিকে গোটাকতক চালা ঘর উঠেছে, তাতে তার পোষা জন্তু আর কয়েকজন চাকর থাকে। জয়হরি এখানে আসার কয়েক মাস পরেই দেখা গেল তার বাড়ির সামনের মাঠে হরেক রকম অদ্ভুত জানোয়ার চরে বেড়াচ্ছে। আশেপাশের গ্রাম থেকে বহু লোক এসে দেখে যেতে লাগল।

বেতসীর কাছে খবর পৌঁছুল, খাগড়াডাঙায় একজন খোঁড়া বাবু আজব চিড়িয়াখানা বানিয়েছে, পয়সা লাগে না, কলকাতা থেকেও লোকে দেখতে আসছে। বেতসীর একটু রাগ হল। চাকলাদার বংশ এই অঞ্চলের সব চেয়ে মান্য গণ্য জমিদার। একজন বাইরের লোক এসে চিড়িয়াখানা বানিয়েছে অথচ সেখানে একবার পায়ের ধুলো দেবার জন্যে বেতসী আর তার মাকে অনুরোধ করা হয় নি কেন? বেতসী শুনেছে, লোকটার নাম জয়হরি হলেও সে নাকি বিলাত ফেরত, সুতরাং

তাকে অবজ্ঞা করে উড়িয়ে দিতে পারল না। কৌতূহল দমন করতে না পেরে একদিন সকাল বেলা সে তার প্রকাণ্ড কুকুর প্রিন্সকে সঙ্গে নিয়ে জয়হরির জন্তুর বাগান দেখতে গেল।

তারের বেড়ার ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে বেতসী অবাক হয়ে দেখতে লাগল। তিনটে নীল রঙের ভেড়া চরে বেড়াচ্ছে। একটা সবুজ মেনী বেরালের কাছে চারটে বেগনী বাচ্চা লাফালাফি করছে। একটা অদ্ভুত জানোয়ার ঘাস খাচ্ছে, গায়ের রং হলদে, তার উপর ঘোর ব্রাউন রঙের ফোঁটা। বেতসী প্রথমে ভেবেছিল চিতা বাঘ, কিন্তু দাড়ি আর শিং দেখে বুঝল জন্তুটা আসলে ছাগল। একটু দূরে একটা ডোবার কাছে গোটা কতক ময়ূরকণ্ঠী রঙের রাজহাঁস প্যাঁক প্যাঁক করছে। বাড়ির ছাত থেকে হঠাৎ এক ঝাঁক লাল নারঙ্গী হলদে সবুজ নীল বেগনী রঙের পায়রা উড়ে চক্কর দিতে লাগল, যেন কেউ রামধনু কুচি কুচি করে আকাশে ছড়িয়ে দিয়েছে। বেতসী উপর দিকে চেয়ে দেখছিল, এমন সময় তার কানে এল—নমস্কার, দয়া করে ভিতরে আসবেন কি?

বেতসী মাথা নামিয়ে দেখল, একজন সুদর্শন যুবা বেড়ার ফটক খুলে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে পায়জামা আর পঞ্জাবি, হাতে একটা মোটা লাঠি। প্রতিনমস্কার করে বেতসী বলল, আপনিই জয়হরিবাবু? আমার কুকুর নিয়ে ভিতরে যেতে পারি কি?...থ্যাংক্স।

বেড়ার ভিতরের মাঠে এসে বেতসী বলল, অদ্ভুত সব জানোয়ার বানিয়েছেন। এর উদ্দেশ্য কিছু আছে না শুধুই ছেলেখেলা?

জয়হরি সহাস্যে বলল, আর্ট মাত্রই ছেলেখেলা। আমি এক নতুন রকমের আর্টের চর্চা করছি। লোকে কাগজ আর ক্যামবিসের উপর আঁকে, কাদা পাথর ধাতুর মূর্তি গড়ে। আমি তা না করে জীবন্ত প্রাণীর উপর রং লাগাচ্ছি। আমার মিডিয়ম আর টেকনিক একেবারে নতুন।

—নীল ভেড়া, সবুজ বেরাল, ছাগলের গায়ে বাঘের ছাপ, একে আর্ট বলতে চান নাকি?

—আজ্ঞে হাঁ। প্রকৃতির অন্ধ অনুকরণ হল নিকৃষ্ট আর্ট। যা আছে তার বৈচিত্র্য সাধন এবং তাকে আরও মনোরম করাই শ্রেষ্ঠ আর্ট। সুকুমার রায় লিখে-ছেন—লাল গানে নীল সুর হাসি হাসি গন্ধ। কথাটা ঠাট্টা হলেও আর্টের মূল সূত্র এতেই আছে।

—আমি তা মনে করি না। শুনেছি আপনি সুতো আর কাপড় রঙানো শিখে এসেছেন। এখানে সময় নষ্ট না করে কোনও মিলে চাকরি নেন না কেন? জানোয়ারের গায়ে রং লাগানো একটা বদখেয়াল ছাড়া কিছু নয়।

—সকলের দৃষ্টিতে বদখেয়াল নয়। আমাদের কলামন্ত্রী রঙ্গ্‌বাহাদুর নাদান আমার কাজ দেখে খুব তারিফ করেছেন। বলেছেন, সোভিয়েট সরকারকে একশ আটটি লাল ঘুঘু উপহার পাঠালে বড় ভাল হয়, তিনি নেহেরুজীর সঙ্গে এ সম্বন্ধে পরামর্শ করবেন।

এই সময় বেতসীর পিছন দিকে এমন একটি ব্যাপার ঘটল যার ফল সুদূর-প্রসারী। একটি গোলাপী রঙের দেশী কুকুর জয়হরির কাছে আসছিল, তাকে দেখেই বোঝা যায় মাসখানিক আগে তার বাচ্চা হয়েছে। বেতসীর বিলাতী কুকুর প্রিন্স তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। সে বিস্তর স্বদেশী আর ভারতীয় কুক্কুরী

দেখেছে, কিন্তু এমন পদ্মকোরকবর্ণা সারমেয়ী পূর্বে তার নজরে পড়ে নি। প্রিন্স বার কতক সেই গোলাপী কুত্তীকে প্রদক্ষিণ করে তার গা শুঁকল, তার পর আর একটু ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করল। তখন গোলাপী হঠাৎ ঘ্যাঁক করে প্রিন্সের পায়ে কামড়ে দিয়ে পালিয়ে গেল। কেঁউ কেঁউ করতে করতে প্রিন্স বেতসীর কাছে এল।

অগ্নিমূর্তি হয়ে বেতসী বলল, একি! আপনার নেড়ী কুত্তী আমার প্রিন্সকে কামড়ে দিল আর আপনি চুপ করে রইলেন!

জয়হরি বলল, আপনি ভয় পাবেন না, আমার কুকুরটার শরীরে রোগ নেই। কুকুররা এমন কামড়াকামড়ি করে থাকে, তাতে ক্ষতি হয় না। আপনি অনুমতি দেন তো আপনার কুকুরের পায়ে একটু টিংচার আয়োডিন লাগিয়ে দিতে পারি।

—আপনার হাতুড়ে চিকিৎসা আমি চাই না। কেন আপনার কুকুরকে রুখলেন না? কত বড় বংশে আমার এই আলসেশ্যানের জন্ম তা জানেন? প্রিন্সের বাপ ফেড্রিক দি গ্রেট, মা মারাইয়া তেরেজা। আপনার নেড়ী কুত্তী একে কামড়াবে আর আপনি হাঁ করে দেখবেন!

—ঘটনাটা হঠাৎ হয়ে গেল, আগে টের পেলে আমি বাধা দিতাম; কিন্তু আসল দোষী আপনার কুকুর, ও কেন নেড়ী কুত্তীর কাছে গেল? উচ্চকুলোদ্ভব হলেও আপনার প্রিন্সের নজর ছোট। অনেক বোকা লোক পেন্ট করা মেয়ে দেখলে ভুলে যায়। প্রিন্সও সেই রকম নেড়ী কুত্তীর গোলাপী রং দেখে ভুলেছে, জানে না যে ওটা কংগো রেডের রং।

—কাছে গেছে বলেই প্রিন্সকে কামড়াবে?

—আপনি একটু স্থির হয়ে ব্যাপারটি বোঝবার চেষ্টা করুন। আমি যদি হঠাৎ আপনাকে অপমান করতাম—খবরের কাগজে যাকে বলে শ্লীলতা হানি, তা হলে আপনি কি করতেন? চুপ করে সইতেন কি?

—আপনাকে লাথি মারতাম, হাতে চাবুক থাকলে আচ্ছা করে কষিয়ে দিতাম।

—ঠিক কথা, সে রকম করাই আপনার উচিত হত। নারী মাত্রেরই আত্মসম্মান রক্ষার অধিকার আছে। আমাদের এই ভারতবর্ষ হচ্ছে বীরাঙ্গনা সতী নারীর দেশ। সেই ট্রাডিশন এ দেশের কুত্তীদের মধ্যেও একটু থাকবে তা আর বিচিত্র কি।

—ও সব বাজে কথা শুনতে চাই না। আপনি ওই নেড়ীটাকে গুলি করে মারবেন কিনা বলুন। আর আমার প্রিন্সের যে ইনফেকশন হল তার ড্যামেজ কি দেবেন বলুন।

—মাপ করবেন মিস চাকলাদার, কুত্তীটার বা আমার কিছুমাত্র অপরাধ হয় নি। শুধু শুধু দণ্ড দেব কেন?

—বেশ। আমার উকিল আপনাকে চিঠি পাঠাবেন। আদালত আপনাকে রেহাই দেয় কিনা দেখব।

বাড়ি ফিরে এসে বেতসী স্থির হয়ে থাকতে পারল না, তখনই মোটরে চড়ে উলুবেড়ে গেল। সেখানকার উকিল বিষ্ণু বাড়ুজ্যের সঙ্গে তার বাবার খুব বন্ধুত্ব ছিল। তাঁকে সব কথা উত্তেজিত ভাষায় তড়বড় করে জানিয়ে বেতসী বলল, ওই জয়হরি হাজরাকে সাজা দিতেই হবে জেঠামশাই, যত টাকা লাগে খরচ করব।

বিষ্ণুবাবু বললেন, আগে মাথা ঠাণ্ডা করে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা কর। যদি মনে কর যে তোমার কুকুরের রোগ হবার ভয় আছে তবে আজই ওকে কলকাতায় পাঠাও, বেলগাছিয়া হাসপাতালে অ্যাণ্টিরাবিজ ইনজেকশন দিয়ে দেবে। কিন্তু মকদ্দমার খেয়াল ছাড় । জয়হরির কুকুরটা যদি খেপা হত আর তোমার কুকুরকে রাস্তায় কামড়ে দিত তা হলেও বা কথা ছিল। কিন্তু তোমার কুকুর জয়হরির কম্পাউণ্ডে ঢুকে কামড় খেয়েছে, এতে কোনও ক্লেম আনা যায় না, মকদ্দমা করলে লোক হাসবে।

বিষ্ণুবাবু কিছুই করতে রাজী হলেন না।বেতসী তাঁর কাছ থেকে সোজা মহকুমা হাকিম অরুণ ঘোষের বাড়ি গেল। তাঁকে নিজের পরিচয় আর ব্যাপারটা জানিয়ে বলল, সার, আপনাকে এর প্রতিকার করতেই হবে, আপনি পুলিসকে অর্ডার দিন। জয়হরির খেঁকী কুকুরটা ডেঞ্জারস, তাকে এখনই মারা দরকার। আর জয়হরি একটা বুজরুক শারলাটান, নকল জানোয়ার বানিয়ে লোক ঠকাচ্ছে। জন্তুর গায়ে রং ধরানো তো একরকম ক্রুয়েলটিও বটে। তাকে অর্ডার করুন যেন তিন দিনের মধ্যে তার চিড়িয়াখানা ভেঙে দেয়।

অরুণ ঘোষ একটু হেসে বললেন, আমি পুলিসকে বলে দিচ্ছি যেন জয়হরিবাবুর কুকুরটার খবর রোজ নেওয়া হয়। হাইড্রোফোবিয়ার লক্ষণ দেখলে অবশ্যই তাকে মেরে ফেলা হবে। কিন্তু জয়হরিবাবু যা করছেন তা তো বেআইনী নয়, সাধারণের অনিষ্টকরও নয়। তাঁকে তো আমি জব্দ করতে পারি না মিস চাকলাদার।

বেতসী অত্যন্ত রেগে গিয়ে হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে এল। অনেকক্ষণ ভেবে ঠিক করল, সে নিজেই জয়হরিকে সাজা দেবে। আগে একটা আলটিমেটম দেবে, তা যদি না শোনে তবে মার লাগাবে। লোকটা খোঁড়া, বেশী মারা ঠিক হবে না, এক ঘা চাবুক লাগালেই যথেষ্ট। জনকতক লোক যাতে জয়হরির নিগ্রহ দেখে তারও ব্যবস্থা করতে হবে। লোকে জানুক যে বেতসী চাকলাদার নিজেই বজ্জাতকে শাসন করতে পারে।

বেতসী তার ধোবা নিমাই দাস আর সর্দার-মালী গগন মণ্ডলকে ডেকে আনিয়ে বলল, ওহে, কাল সকালে আটটার সময় তোমরা জয়হরি হাজরার চিড়িয়াখানার সামনে হাজির থেকো।

নিমাই বলল, সেখানে গিয়ে কি করতে হবে দিদিসায়েব ?

—কিছু করতে হবে না, শুধু একটা তামাশা দেখবে।

—যে আজ্ঞে, আমার ভাগনে নুটুকেও নিয়ে যাব।

গগন মণ্ডল বলল, আমার ছেলে দুটোকেও নিয়ে যাব দিদিসায়েব।

পরদিন সকালবেলা বেতসী তার আরবী ঘোড়ায় চড়ে একটা চাবুক হাতে নিয়ে জয়হরির মাঠের সামনে উপস্থিত হল। নিমাই ধোবা আর গগন মালী তাদের পরিবারবর্গের সঙ্গে আগেই সেখানে হাজির ছিল।

জয়হরি বেড়ার ধারে ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে তার ভেড়া আর ছাগলের পরস্পর ঢু মারা দেখছিল। বেতসীকে দেখে স্মিতমুখে বলল, গুড মর্নিং মিস চাকলাদার, আপনার প্রিন্স ভাল আছে তো ?

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বেতসী বলল, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে, একবার বাইরে আসুন।

ফটকের বাইরে এসে জয়হরি বলল, হুকুম করুন।

ঘোড়ার উপর সোজা হয়ে বসে বেতসী বলল, দেখুন জয়হরিবাবু, আপনাকে একটা আলটিমেটম দিচ্ছি। কাল আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা চাইবেন কি না? আর সেই নেড়ী কুত্তীটাকে গুলি করবেন কি না? নিতান্ত যদি মায়া হয় তবে গঙ্গার ওপারে বিদায় করবেন কি না?

জয়হরি বলল, দুঃখপ্রকাশে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই, আপনি অকারণে আমার উপর চটেছেন তাতে আমি দুঃখিত। কিন্তু ক্ষমা চাইতে বা নেড়ী কুত্তীকে মারতে বা তাড়াতে পারব না।

চাবুক তুলে বেতসী বলল, তবে এই নিন।

বেতসীর চাবুক জয়হরির পিঠে পড়বার আগে একটু পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর বিবরণ আবশ্যক। মাঠের একটা কদম গাছের আড়াল থেকে একটি জেব্রা বেরিয়ে এল, কিন্তু বেতসীর সেদিকে নজর ছিল না। এই ভারতীয় জন্তুটি আফ্রিকার জেব্রার চাইতে কিছু ছোট, পেট একটু বেশী মোটা, কিন্তু গায়ের রং আর ডোরা দাগে কোনও তফাত নেই। অচেনা জানোয়ার দেখে নিমাই ধোবার ভাগনে নুটু বলল, মামা ওটা কি গো?

নিমাই বলল, চিনতে লারছিস? ও তো আমাদের সৈরভী রে, সেই যে গাধীটার মাজায় বাত ধরেছিল, বোঁচকা বইতে লারত, তাই তো জয়হরিবাবুকে দশ টাকায় বেচে দিনু। আহা, এখন ভাল খেয়ে আর জিরেন পেয়ে সৈরভীর কিবে রূপ হয়েছে দেখ! বাবু আবার চিত্তির বিচিত্তির করে বাহার বাড়িয়ে দিয়েছে।

সৈরভী তার পুরনো মনিবকে চিনতে পেরে খুশী হয়ে এগিয়ে আসছিল। বেতসীর চাবুক যখন জয়হরির পিঠে পড়বার উপক্রম করেছে ঠিক সেই মুহূর্তে সৈরভীর কণ্ঠ থেকে আনন্দধ্বনি নির্গত হল—ভূঁ-চী ভূঁ-চী। তার অদ্ভুত রূপ দেখে আর ডাক শুনে বেতসীর ঘোড়া সামনের দু পা তুলে চিঁ-হি-হি করে উঠল। বেতসী সামলাতে পারল না, ধুপ করে পড়ে গেল। পড়েই অজ্ঞান।

জ্ঞান ফিরে এলে বেতসী দেখল, একটা ছোট গেলাস তার মুখের কাছে ধরে জয়হরি বলছে, এটুকু খেয়ে ফেলুন, ভাল বোধ করবেন।

ক্ষীণ স্বরে বেতসী প্রশ্ন করল, কি ওটা?

—বিষ নয়, ব্রান্ডি। খেলে চাঙ্গা হয়ে উঠবেন।

—আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

—এখন দেখছেন না, একটু আগে দেখছিলেন বটে। আপনি যেন মহিষাসুর বধের জন্যে খাঁড়া উঁচিয়েছেন, কিন্তু আপনার বাহনটি হঠাৎ ভড়কে গিয়ে আপনাকে ফেলে দিল। তাতেই আপনার একটু চোট লেগেছে। নিমাই আর গগনের বউ ধরাধরি করে আপনাকে আমার বাড়িতে এনে শুইয়েছে। ওকি করছেন? খবরদার ওঠবার চেষ্টা করবেন না, চুপ করে শুয়ে থাকুন। আপনার মায়ের কাছে লোক গেছে, ডাক্তার নাগকে আনবার জন্যে উলুবেড়েতে মোটর পাঠানো হয়েছে। তাঁরা এখনই এসে পড়বেন।

একটু পরে বেতসীর মা এসে পড়লেন। আরও কিছু পরে ডাক্তার নাগ তাঁর ব্যাগ নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বেতসীকে পরীক্ষা করে বললেন, হাতে আর কোমরে

চোট লেগেছে, ও কিছু নয়, চার-পাঁচ দিনে সেরে যাবে। ডান পায়ের ফিবিউলা ভেঙেছে—সামনের সরু হাড়টা।...হাঁ হাঁ জোড়া লাগবে বইকি। ভয় নেই, খোঁড়া হয়ে যাবেন না, কিছু দিন পরেই আগের মতন হাঁটতে পারবেন।...আরে না না, জয়হরিবাবুর মতন লাঠি নেবার দরকার হবে না। আজ কাঠ দিয়ে বেঁধে দেব, তিন-চার দিন পরে সদর হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে এক্স-রে করাব, তারপর প্লাস্টার ব্যাণ্ডেজ লাগাব। দরকার হয়তো একজন নার্স পাঠাতে পারি।

বেতসী নিজের বাড়িতে এলে ডাক্তার তার চিকিৎসার যথোচিত ব্যবস্থা করলেন। বিছানায় শুয়ে সে বিগত ঘটনাবলী ভাবতে লাগল।

নায়েব হরকালী মাইতি বহুদিনের পুরনো লোক। তাঁর স্ত্রী মাইতি-গিন্নী শয্যাগত বেতসীকে রোজ সন্ধ্যাবেলা দেখতে আসেন। বুড়ীর মুখের বাঁধন নেই। কিন্তু তাঁর এলোমেলো কথায় বেতসী চটে না, বরং মজা পায়। পড়ে যাবার দু সপ্তাহ পরে বেতসী অনেকটা ভাল বোধ করছে, বিছানা ছেড়ে ইজিচেয়ারে বসেছে।

মাইতি-গিন্নী তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন—সবই গেরোর ফের দিদিমণি, কপালের লিখন! ভদ্দর লোকের ছেলের ওপর কেনই বা তোমার রাগ হল, কেনই বা মেম-সায়েবের মতন ঘোড়সওয়ার হয়ে তাকে মারতে গেলে! তার তো কিছুই হল না, লাভের মধ্যে তুমি ঠ্যাং ভাঙলে।

বেতসী বলল, তুমি দেখো মাইতি-দিদি, আমি সেরে উঠে তাকে চাবুক মেরে জব্দ করি কি না।

—হা রে দিদিমণি, চাবুক মেরে কি বেটাছেলে জব্দ করা যায়! ওদের একটু একটু করে সইয়ে সইয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারতে হয়, পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কাটতে হয়। বেটাছেলে ঢিট করবার দাবাই হল আলাদা।

—দাবাইটা তুমি জান নাকি?

—ওমা তা আর জানি না! সাড়ে তিন কুড়ি বয়স হল, তিন কুড়ি বছর ধরে বুড়ো মাইতির কাঁধে চেপে রইছি। দাবাইটা বলছি শোন। আগে ভুলিয়ে ভালিয়ে বশ করতে হয়, আশকারা দিয়ে যত্ন-আত্তি করে মাথাটি খেতে হয়। তার পর যখন খুব পোষ মানবে, তুমি না হলে তার চলবেই না, তখন নাকে দড়ি দিয়ে চরকি ঘোরাবে, নাজেহাল করবে, কড়া কড়া চোপা ছাড়বে, নাকানি-চোবানি খাওয়াবে। তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি নেই দিদিমণি, আগেই চাবুক মারতে গিয়েছিলে। তাই তো গাধা ডেকে উঠল, ঘোড়া ভড়কাল, তুমি পড়ে গিয়ে পা ভাঙলে। জয়হরিবাবু মানুষটা তো মন্দ নয়, এখানে এসে তোমার খবর নিয়ে যাচ্ছে। দেখতে শুনতে কথাবার্তায় ভালই, তোমারই মতন বিলেত দেখা আছে, সেও খোঁড়া তুমিও খোঁড়া। বাধা তো কিছুই দেখছি না, কিন্তু তোমার মা যে বেঁকে দাঁড়িয়েছেন। বলছেন, অমন মারমুখো খাণ্ডার মেয়েকে কেউ বিয়ে করবে না, কিন্তু তাই বলে জয়হরির মতন পাত্র তো আর হাতছাড়া করতে পারি না, আমার ভাইঝি বেবির সঙ্গে তার সম্বন্ধের চেষ্টা করব, দাদাকে লিখব বেবিকে যেন এখানে পাঠিয়ে দেন।

মাইতি-গিন্নী চলে যাবার পর বেতসীর মনে নানা রকম ভাবনা ঠেলাঠেলি করতে লাগল। সম্মুখ সমরে তার পরাজয় হয়েছে, সে জখম হয়ে বাড়িতে আটকে আছে। ডাক্তারের মতন মিথ্যাবাদী দুটি নেই, এই সেদিন বলল এক মাস, আবার

এখন বলছে তিন মাস। ওদিকে শত্রু হাসছে, তার নেড়ী কুত্তী আর গাধাটাও বোধ হয় হাসছে। জয়হরির আস্পর্ধা কম নয়, এখানে এসে খোঁজ নিয়ে মহত্ত্ব দেখাচ্ছে। বেবিকে বিয়ে করবেন? ইস, করলেই হল! বেতসী শত্রুকে কিছুতেই হাতছাড়া হতে দেবে না, মাইতি-বুড়ীর দাবাই প্রয়োগ করবে। কূট যুদ্ধে শত্রুকে কাবু করে বশে আনাতেও তো বাহাদুরি আছে। জয়হরি গাধাকে জেব্রা বানিয়েছে, বেতসী কি জয়হরিকে ভেড়া বানাতে পারবে না? সারা রাত তার ঘুম হল না, মনের মধ্যে যেন ঝড় বইতে লাগল।

সকালে উঠেই বেতসী আরশিতে নিজের মুখখানা একবার দেখে নিল, তার পর মতি স্থির করে শত্রুর প্রতি তার প্রথম বোমা ছাড়ল, জয়হরিকে দু লাইন চিঠি লিখে পাঠাল—আপনার কুত্তী আর গাধাটাকে ক্ষমা করলুম, আপনাকেও করলুম। আপনিও আমাকে ক্ষমা করতে পারেন।

১৩৬২ (১৯৫৫)

শিবামুখী চিমটে

ঝিণ্টুর মুখ থেকে থার্মমিটার টেনে নিয়ে তার মা বললেন, নিরেনব্বুই পয়েণ্ট চার। আজ রাত্তিরে শুধু দুধবার্লি খাবি। ঘুরে বেড়াবি না, এই ঘরে থাকবি। আমাদের ফিরতে কতই আর দেরি হবে, এই ধর রাত বারোটা।

ঠোঁট ফুলিয়ে ঝিণ্টু বলল, বা রে, তোমরা সক্কলে মজা করে মাদ্রাজী ভোজ খাবে আর আমি একলাটি বাড়িতে পড়ে থাকব, হুঁ—

—আরে রাম বল, ওকে কি ভোজ বলে! মাছ নেই, মাংস নেই, শুধু তেঁতুলের পোলাও, লংকার ঝোল, আর টক দই। যজ্ঞস্বামী আয়ার ও'র অফিসের বড় সাহেব, তাঁর মেয়ের বিয়ে, আর আয়ার-গিন্নীও অনেক করে বলেছে, তাই যাচ্ছি। তোর জন্যে এই মেকানো রইল, হাওড়া ব্রিজ তৈরি করিস। সুকুমার রায়ের তিনখানা বই রইল, ছবি দেখিস। কিন্তু বেশী পড়িস নি, মাথা ধরবে। তোর পিসীকে বলে যাচ্ছি রাত সাড়ে আটটায় দুধবার্লি দেবে। খেয়েই শুয়ে পড়বি। পিসী তোর কাছে শোবে।

—না, পিসীমাকে শুতে হবে না। তার ভীষণ নাক ডাকে, আমার ঘুম হবে না। আমি একলাই শোব।

—বেশ, তাই হবে।

ঝিণ্টুর বয়স দশ, লেখাপড়ায় মন্দ নয়, কিন্তু অত্যন্ত চঞ্চল আর দুরন্ত। তার মা বাবা আর ছোট বোন নিমন্ত্রণ খেতে গেল আর সে একলা বাড়িতে পড়ে রইল, এ অসহ্য। একটু জ্বর হয়েছে তো কি হয়েছে? সে এখনই দু মাইল দৌড়ুতে পারে, ব্যাডমিণ্টন খেলতে পারে, সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে তেতলার ছাতে উঠতে পারে। বাড়িতে গল্প করারও লোক নেই। পিসীমাটা যেন কি, দুপুর বেলা আপিসে যায় আর সকালে বিকেলে রাত্তিরে শুধু নভেল পড়ে। ঝিণ্টুর ক্লাসফেণ্ড জিতুর পিসীমা কেমন চমৎকার বুড়ো মানুষ, কত রকম গল্প বলতে পারে। জিতু বলে, হ্যাঁরে ঝিণ্টু, তোর সরসী পিসী সেজেগুজে আপিস যায় কেন? মালা জপবে, বড়ি দেবে, নারকেলনাড়ু আমসত্ত্ব কুলের আচার বানাবে, তবে না পিসীমা!

মেকানো জোড়া দিয়ে ঝিণ্টু অনেক রকম ব্রিজ করল, আবার খুলে ফেলল। সাড়ে আটটার সময় সরসী পিসী তাকে দুধবার্লি খাইয়ে বলল, এইবার ঘুমিয়ে পড় ঝিণ্টু।

ঝিণ্টু বলল, সাড়ে আটটায় বুঝি লোকে ঘুমোয়? তুমি তো অনেক বই পড়, তা থেকে একটা গল্প বল না।

সরসী উত্তর দিল, ওসব গল্প তোর ভাল লাগবে না।

—খালি প্রেমের গল্প বুঝি?

—অতি জেঠা ছেলে তুই। বড়দের জন্যে লেখা গল্প ছোটদের ভাল লাগে নাকি? এই তো সেদিন তোর মা শেষের কবিতা পড়ছিল, তুই শুনে বললি, বিচ্ছিরি। আলো নিবিয়ে দিই, ঘুমিয়ে পড়।

সুরসী পিসী চলে গেলে ঝিণ্টু শুয়ে পড়ল, কিন্তু কিছুতেই ঘুম এল না। এক ঘণ্টা এপাশ ওপাশ করে সে বিছানা থেকে তড়াক করে উঠে পড়ল। তার মাথায় খেয়াল এসেছে, একটা অ্যাডভেঞ্চার করতে হবে। ডিটেকটিভ, ডাকাত, বোম্বেটে, গুপ্ত ধন, এই সবের গল্প সে অনেক পড়েছে। আজ রাত্রে যদি সে গুপ্ত ধন আবিষ্কার করতে পারে তো কেমন মজা হয়! সে তার মায়ের কাছে শুনেছিল, তার এক বৃদ্ধপ্রজেঠামহ অর্থাৎ প্রপিতামহের জেঠা পিশাচসিদ্ধ তান্ত্রিক ছিলেন। অনেককাল হল তিনি মারা গেছেন, কিন্তু তাঁর তোরঙ্গটি তেতলার ঘরে এখনও আছে। সেই তোরঙ্গ খুলে দেখলে কেমন হয়?

ঝিণ্টুর একটা টর্চ আছে, দেড় টাকা দামের একটা পিস্তলও আছে। পিস্তলটা কোমরে ঝুলিয়ে টর্চ নিয়ে সে তেতলায় উঠল। সেখানে সিঁড়ির পাশে একটি মাত্র ঘর, তাতে শুধু অদরকারী বাজে জিনিস থাকে। সেই ঘরে ঢুকে ঝিণ্টু সুইচ টিপে আলো জ্বালল। তার বৃদ্ধপ্রজেঠামহ করালীচরণ মুখুজ্যের তোরঙ্গটা এক কোণে রয়েছে। বেতের তৈরি, তার উপর মোষের চামড়া দিয়ে মোড়া, অদ্ভুত গড়ন, যেন একটা প্রকাণ্ড কচ্ছপ। যে তালা লাগানো আছে তাও অদ্ভুত। দেয়ালে এক গোছা পুরনো চাবি ঝুলছে। ঝিণ্টু একে একে সব চাবি দিয়ে তালা খোলবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। সে হতাশ হয়ে ফিরে যাবার উপক্রম করছে, হঠাৎ নজরে পড়ল, তোরঙ্গের পিছনের কবজা দুটো মরচে পড়ে খয়ে গেছে। একটু টানাটানি করতেই খসে গেল। ঝিণ্টু তখন তোরঙ্গের ডালা পিছন থেকে উলটে খুলে ফেলল।

বিশ্রী ছাতা-ধরা গন্ধ। উপরে কতকগুলো ময়লা গেরুয়া রঙের কাপড় রয়েছে, তার নীচে এক গোছা তালপাতায় লেখা পুঁথি আর তিনটে মোটা মোটা রুদ্রাক্ষের মালা। তার নীচে আবার কাপড়, তামার কোষা-কুষি, সাদা রঙের সরার মতন একটা পাত্র, একটা মরচে ধরা ছোট ছুরি, একটা সরু কলকে, অত্যন্ত ময়লা এক টুকরো নেকড়া, আর একটা চিমটে। ঝিণ্টু যদি চৌকস লোক হত তা হলে বুঝত —সাদা সরাটা হচ্ছে খর্পর অর্থাৎ মড়ার মাথার খুলি, আর ছুরি কলকে নেকড়া চিমটে হচ্ছে গাঁজা খাওয়ার সরঞ্জাম।

বিরক্ত হয়ে ঝিণ্টু বলল, দুত্তোর, টাকা কড়ি হীরে মানিক কিচ্ছু নেই, তবে চিমটেটি মন্দ নয়. আন্দাজ এক ফুট লম্বা, মাথায় একটা আংটা, তাতে আবার আরও তিনটে আংটা গোছা করে লাগানো আছে। চিমটের গড়ন বেশ মজার, টিপলে মুখটা শেয়ালের মতন দেখায়, দু পাশে দুটো চোখ আর কানও আছে। বহুকালের জিনিস হলেও মরচে ধরে নি, বেশ চকচকে। তোরঙ্গ বন্ধ করে চিমটে নিয়ে ঝিণ্টু তার ঘরে ফিরে এল।

আলো জেলে বিছানায় বসে ঝিণ্টু সুকুমার রায়ের বইগুলো কিছুক্ষণ উলটে পালটে দেখল। পাশের ঘরের ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজল। এইবার ঘুম পাচ্ছে। শোবার আগে সে আর একবার চিমটেটা ভাল করে দেখল। নাড়া পেয়ে মাথার আংটাগুলো ঝমঝম করে বেজে উঠল। তার পরেই এক আশ্চর্য কাণ্ড।

দরজা ঠেলে এক অদ্ভুত মূর্তি ঘরে ঢুকল। বেঁটে গড়ন, ফিকে ব্লুব্ল্যাক কালির মতন গায়ের রং, মাথার চুলে ঝুঁটি বাঁধা, মুখখানা বাঁদরের মতন, নন্দলালের আঁকা

নন্দীর ছবির সঙ্গে কতকটা মিল আছে। পরনে গেরুয়া রঙের নেংটি, পায়ে খড়ম। মূর্তি বলল, কি চাও হে খোকা?

ঝিণ্টু প্রথমটা ভয়ে আঁতকে উঠল। কিন্তু সে সাহসী ছেলে, মূর্তিমান অ্যাডভেঞ্চার তার সামনে উপস্থিত হয়েছে, এখন ভয় পেলে চলবে কেন। ঝিণ্টু প্রশ্ন করল, তুমি কে?

—চুণ্ডুদাস চণ্ড। তোমার পূর্বপুরুষ পিশাচসিদ্ধ হয়েছিলেন তা শুনেছ? আমি সেই পিশাচ।

—তোমাকেই সিদ্ধ করেছিলেন বুঝি?

—দূর বোকা, আমাকে সিদ্ধ করে কার সাধ্য! তিনি সাধনা করে নিজেই সিদ্ধ হয়েছিলেন, আমাকে বশ করেছিলেন। এই শিবামুখী চিমটেটি আমিই তাঁকে দিয়েছিলাম। আমাদের মধ্যে এই বন্দোবস্ত হয়েছিল যে চিমটে বাজালেই আমি হাজির হব আমাকে যা করতে বলা হবে তাই করব। কিন্তু করালী মুখুজ্যে ছিলেন নির্লোভ সাধু পুরুষ, কখনও ধন দৌলতের জন্যে আমাকে ফরমাশ করেন নি। শুধু হুকুম করতেন—লে আও তম্বাকু, লে আও গঞ্জা, লে আও ওমদা কারণবারি বিলায়তী শরাব, লে আও অচ্ছী অচ্ছী ভৈরবী। তিনি মারা যাবার পর থেকে আমি নিষ্কর্মা হয়ে আছি। শোন খোকা—আজ হল বৈশাখী অমাবস্যা। এক শ বছর আগে এই অমাবস্যার রাত দুপুরে তোমার প্রপিতামহের জেঠা করালীচরণ মুখুজ্যে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। শর্ত অনুসারে আজ ঠিক সেই লগ্নে আমি কিংকরত্ব থেকে মুক্তি পাব, তার পর যতই চিমটে বাজাও আমি সাড়া দেব না। এখনও ঘণ্টা দুই সময় আছে। তোমার ডাক শুনে আমি এসেছি, কি চাই বল।

একটু ভেবে ঝিণ্টু বলল, একটা হাঁসজারু দিতে পার?

—সে আবার কি?

ঝিণ্টু বই খুলে ছবি দেখিয়ে বলল, এই রকম জন্তু, হাঁস আর শজারুর মাঝামাঝি।

—ও, বুঝেছি। কিন্তু এ রকম জানোয়ার তো রেডিমেড পাওয়া যাবে না, সৃষ্টি করতে সময় লাগবে। ঘণ্টাখানিক পরে আমি একটা হাঁসজারু পাঠিয়ে দেব।

ঝিণ্টু বলল, তা না হয় এক ঘণ্টা দেরিই হল, ততক্ষণ আমি ঘুমুব। কিন্তু তুমি বেশী দেরি ক'রো না, মা বাবা সবাই এসে পড়বে।

পিশাচ অন্তর্হিত হল।

ঝিণ্টু ঘুমচ্ছিল। হঠাৎ খুটখুট শব্দ শুনে তার ঘুম ভেঙে গেল। আলো জ্বালাই ছিল, ঝিণ্টু দেখল, একটা কিম্ভুত-কিমাকার জানোয়ার ঘরে ছুটোছুটি করছে। তার মাথা আর গলা হাঁসের মতন, ধড় শজারুর মতন, সমস্ত গায়ে কাঁটা খাড়া হয়ে আছে, চার পায়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে আর প্যাঁক প্যাঁক করে ডাকছে। ঝিণ্টু উঠে বসল, আদর করে ডাকল—আ আ চু চ্চু চু। হাঁসজারু পোষা কুকুরের মতন লাফিয়ে দুই থাবা তুলে কোলে উঠতে গেল। ঝিণ্টুর হাঁটুতে কাঁটার খোঁচা লাগল, সে বিরক্ত হয়ে বলল, যাঃ, সরে যা, গায়ে যে একটু হাত বুলিয়ে দেব তারও জো নেই!

এই ঘরের ঠিক নীচের ঘরটি সরসী পিসীর। খাওয়ার পর সরসী একটা গোটা উপন্যাস সাবাড় করে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মাথার উপর দুপদাপ শব্দ হওয়ায় তার ঘুম ভেঙে গেল, বিরক্ত হয়ে বলল, আঃ, পাজী ছেলেটা এখনও ঘুময় নি, দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। সরসী উপরে উঠে ঝিণ্টুর ঘরে ঢুকেই চমকে উঠে বলল, ও মা গো, এটা আবার কোত্থেকে এল!

ঝিণ্টু বলল, ও আমি পুষেছি, কোনও ভয় নেই, কিচ্ছু বলবে না। কাল নাপিত ডেকে গায়ের কাঁটা ছাঁটিয়ে দেব, তা হলে আর হাতে ফুটবে না। একটু দুধ আর বিস্কুট এনে দাও না পিসীমা, বেচারার খিদে পেয়েছে।

আত্মরক্ষার জন্য সরসী ঝিণ্টুর খাটের উপর উঠে বলল, এটাকে কোত্থেকে পেয়েছিস শিগ্‌গির বল ঝিণ্টে।

হাত নেড়ে মুখভঙ্গী করে ঝিণ্টু বলল, ইঃ বলব কেন!

—লক্ষ্মীটি বল কোথা থেকে এটা এল।

—আগে দিব্বি গাল যে কারুকে বলবে না।

—কালীঘাটের মা কালীর দিব্বি, কাকেও বলব না।

ঝিণ্টু তখন সমস্ত ব্যাপারটি খুলে বলল। সরসীর বিশ্বাস হল না, বলল, তুই বানিয়ে বলছিস ঝিণ্টে। করালী জেঠা পিশাচসিদ্ধ ছিলেন এই রকম শুনেছি বটে, কিন্তু ও একটা বাজে গল্প।

—বাজে গল্প! তবে এই দেখ—

ঝিণ্টু চিমটে নেড়ে ঝন ঝন শব্দ করতেই চুণ্টদাস চণ্ডের আবির্ভাব হল। সরসী ভয়ে কাঠ হয়ে চোখ কপালে তুলে অবাক হয়ে দেখতে লাগল। পিশাচ বলল, কি চাই খোকা?

ঝিণ্টু হুকুম করল, গরম মটর ভাজা, বেশ বড় বড়। বেশী করে দিও, পিসীমাও খাবে।

পিশাচ অন্তর্হিত হল। একটু পরেই একটা কাগজের ঠোঙা শূন্য থেকে ধপ করে ঘরের মেঝেতে পড়ল। সদ্য ভাজা বড় বড় মটরে ভরতি, এখনও গরম রয়েছে। এক মুঠো নিয়ে ঝিণ্টু বলল, পিসীমা, একটু খেয়ে দেখ না।

সরসী গালে হাত দিয়ে বলল, অবাক কাণ্ড! বাপের জন্মে এমন দেখি নি, শুনিও নি। কিন্তু তুই কি বোকা রে খোকা। কোথায় দশ—বিশ লাখ টাকা, মস্ত বাড়ি, দামী মোটর গাড়ি, এই সব চাইবি, তা নয়, চাইলি কিনা হাঁসজারু আর মটর ভাজা! ছি ছি ছি। আচ্ছা, তোর ওই চিমটেটা একবারটি আমাকে দে তো।

পিসীর উপর ঝিণ্টুর কোনও দিনই বিশেষ টান নেই। ভেংচি কেটে বলল, ইস দিলুম আর কি! এই শেয়ালমুখো চিমটে আমি কারুকে দিচ্ছি না। তোমার কোন্ জিনিস দরকার বল না, আমি আনিয়ে দিচ্ছি।

—তুই ছেলেমানুষ, গুছিয়ে বলতে পারবি না।

—আচ্ছা, আমি চুণ্টদাসকে ডাকছি। তুমি যা চাও আমাকে বলবে, আর আমি ঠিক সেই কথা তাকে বলব।

অগত্যা সরসী রাজী হল। ঝিণ্টু চিমটে নাড়তেই আবার পিশাচ এসে বলল, কি চাই?

ঝিণ্টু বলল, চটপট বলে ফেল পিসীমা, এক্ষুনি হয়তো বাবা মা এসে পড়বে।

ঝিণ্টুর জবানিতে সরসী যা চাইলে তার তাৎপর্য এই।—আগে ওই জানোয়ার-

াকে বিদেয় করতে হবে। তার পর দুর্লভ তালুকদার নামক এক ভদ্রলোককে ধরে আনতে হবে। তিনি কানপুর উলেন মিলে চাকরি করেন। বাসার ঠিকানা জানা নেই।

হাঁসজারু আর পিশাচ অন্তর্হিত হল।

ঝিণ্টু বলল, কানপুরের ভদ্রলোককে এনে কি হবে পিসীমা ?

—তাকে আমি বিয়ে করব।

—বিয়ে করবে কি গো! তুমি তো বুড়ো ধাড়ী হয়েছ।

—কে বলল, বুড়ো ধাড়ী! আমার বয়েস তো সবে পঁচিশ।

—মা যে বলে তোমার বয়েস চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ?

—মিথ্যে কথা, তোর মা হিংসুটে, তাই বলে। আর আমি তো আইবুড়ো মেয়ে, বয়েস যাই হক বিয়ে করব না কেন ?

পিশাচ ফিরে আসবার আগে একটু পূর্বকথা বলা দরকার। বারো-তের বছর পূর্বে সরসী যখন কলেজে পড়ত তখন দুর্লভ তালুকদারের সঙ্গে তার ভাব হয়। দুর্লভ বলেছিল, আমার একটি ভাল চাকরি পাবার সম্ভাবনা আছে, পেলেই তোমাকে বিয়ে করব। কিছুদিন পরে দুর্লভ চাকরি পেয়ে কানপুরে গেল। সেখান থেকে মাঝে মাঝে চিঠি লিখত—বড় মাগ্‌গি জায়গা, তোমার উপযুক্ত বাসাও পাই নি, মাইনে মোটে দু শ টাকা, দুজনের চলবে কি করে? আশা আছে শীঘ্রই সাড়ে তিনশ টাকার গ্রেডে প্রমোশন পাব, ভাল কোয়াটার্সও পাব। লক্ষ্মীটি সরসী, তত দিন ধৈর্য ধরে থাক। তার পর ক্রমশ চিঠি আসা কমতে লাগল, অবশেষে একেবারে বন্ধ হল। সরসী বুঝল যে দুর্লভ মিথ্যাবাদী, কিন্তু তবু তাকে সে ভুলতে পারে নি।

পিশাচ একটি মোটা লোককে পাঁজাকোলা করে নিয়ে এসে ধপ করে মেঝেতে ফেলে বলল, এই নাও খোকা, তোমার পিসীর বর। এখন বেহুঁশ হয়ে আছে, একটু পরেই চাঙ্গা হবে।

দুর্লভের মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ঝিণ্টু বলল, উঃ, মামাবাবু ক্লাব থেকে ফিরে এলে যে রকম গন্ধ বেরয় সেই রকম লাগছে। ও চুক্ষু মশাই, একে জাগিয়ে দাও না।

পিশাচ বলল, নেশায় চুর হয়ে আছে। কানপুরের একটা বস্তিতে ওর ইয়ারদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিল, সেখান থেকে তুলে এনেছি। এই, উঠে পড় শিগ্‌গির।

ঠেলা খেয়ে দুর্লভের চেতনা ফিরে এল। চোখ মেলে বলল, তোমরা আবার কে ?

ঝিণ্টু বলল, পিসীমা, যা বলবার তুমি একে বল।

—আমি পারব না, তুই বল খোকা।

—ও মশাই, শুনছেন ? এ হচ্ছে আমার সরসী পিসীমা, আইবুড়ো মেয়ে। একে আপনি বিয়ে করুন।

দুর্লভ বলল, আহা কি কথাই শোনালে! বিয়ে কর বললেই বিয়ে করব ?

পিশাচ বলল, করবি না কি রকম ? তোর বাবা করবে।

একটি পৈশাচিক চড় খেয়ে দুর্লভ বলল, মেরো না বাবা, ঘাট হয়েছে। বেশ, বিয়ে করছি, পুরুত ডাক। কিন্তু বলে রাখছি, অলরেডি আমার একটি বাঙালী স্ত্রী আর খোট্টা জরু আছে। সরসী যদি তিন নম্বর সহধর্মিণী হতে চায় আমার আর আপত্তি কি। সবাই মিলে এক বিছানায় শুতে হবে কিন্তু।

সরসী বলল, দূর করে দাও হতভাগা মাতালটাকে।

ঝিণ্টুর আদেশে পিশাচ দুর্লভকে তুলে নিয়ে চলে গেল। ঝিণ্টু বলল, আচ্ছা পিসীমা, তোমার আপিসে তো অনেক ভাল ভাল বাবু আছে, তাদের একজনকে আনাও না।

একটু ভেবে সরসী বলল, আমাদের হেড অ্যাসিস্টাণ্ট যোগীন বাড়ুজ্যের স্ত্রী দু বছর হল মারা গেছে। যোগীনবাবু লোকটি ভাল, তবে কালচার্ড নয়, একটু বয়সও হয়েছে। বড্ড তামাক খায়, কথা বললে হুঁকো হুঁকো গন্ধ ছাড়ে। তা কি আর করা যাবে, অত খুঁত ধরলে চলে না, সব পুরুষই মোর অর লেস ডার্টি। কিন্তু যোগীনবাবু রাজী হবে কি? মোটা বরপণ পেলে হয়তো—

ঝিণ্টু বলল, বরপণ কি? গয়না আর টাকা? সে তুমি ভেবো না পিসীমা, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।

চিমটে বাজিয়ে পিশাচকে ডেকে ঝিণ্টু বলল, পিসীমার আপিসে সেই যে যোগীন বাঁড়ুজ্যে কাজ করে—ঠিকানাটা কি পিসীমা? তিন নম্বর বেচু মিস্ত্রী লেন—সেইখান থেকে তাকে ধরে নিয়ে এস। আর শোন, পিসীমাকে একগাদা গয়না আর অনেক টাকা দাও।

সরসীর সর্বাঙ্গ মোটা মোটা সোনার গহনায় ভরে গেল, পাঁচটা থলিও ঝনাত করে তার পায়ের কাছে পড়ল। পিশাচ চলে গেল।

একটা থলি তুলে সরসী বলল, সের পাঁচ-ছয় ওজন হবে।

ঝিণ্টু বলল, পাঁচ শ টাকায় সওয়া ছ-সের, হাজার টাকায় সাড়ে বারো সের, লাখ টাকায় একত্রিশ মন দশ সের। 'জ্ঞানের সিন্দুক' বইএ আছে।

পিশাচ যোগীন বাঁড়ুজ্যেকে পাঁজাকোলা করে এনে মেঝেতে ফেলল।

ঝিণ্টু বলল, এও নেশা করেছে নাকি?

পিশাচ বলল, নেশা নয়, অজ্ঞান করে নিয়ে এসেছি, একটু ঠেলা দিলেই চাঙ্গা হবে। থাম, আগে আমি সরে পড়ি, নয়তো আমাকে দেখে আবার ভিরমি যাবে।

ঠেলা খেয়ে যোগীন বাঁড়ুজ্যে উঠে বসলেন। হাই তুলে তুড়ি দিয়ে বললেন, দুর্গা দুর্গা, এ আমি কোথায়? একি, মিস সরসী মুখার্জী এখানে যে! উঃ, কত গহনা পরেছেন! আপনার বিবাহের নিমন্ত্রণে এসেছি নাকি?

মুখ নীচু করে সরসী বলল, খোকা, তুই বল।

ঝিণ্টু বলল, সার, আপনি আমার এই সরসী পিসীমাকে বিয়ে করুন, ইনি আইবুড়ো মেয়ে, বয়স সবে পঁচিশ। দেখছেন তো, কত গয়না, আবার পাঁচ থলি টাকাও আছে, এক-একটা পাঁচ-ছ সের।

যোগীনবাবু বললেন, বাঃ খোকা, তুমি নিজেই সালংকারা পিসীকে সম্প্রদান করছ নাকি? তা আমার অমত নেই, মিস মুখার্জির ওপর আমার একটু টাঁকও ছিল। তবে কিনা ইনি হলেন মডার্ন মহিলা, তাই এগুতে ভরসা পাই নি। গহনা-গুলো বড্ড সেকেলে, কিন্তু বেশ ভারী মনে হচ্ছে, বেচে দিয়ে নতুন ডিজাইনের গড়ালেই চলবে। কিন্তু ব্যাপারটা যে কিছুই বুঝতে পারছি না, এখানে আমি এলুম কি করে?

সরসী বলল, সে কথা পরে শুনবেন। এখন বাড়ি যান, কাল সকালে এসে আমার দাদাকে বিবাহের প্রস্তাব জানাবেন। এই আংটিটা পরুন তা হলে ভুলে যাবেন না।

—ভুলে যাবার জো কি! কাল সকালেই তোমার দাদাকে বলব। এখন কটা

বেজেছে? বল কি, পৌনে বারো! তাই তো, বাড়ি যাব কি করে, ট্রাম বাস সব তো বন্ধ।

ঝিন্টু বলল, কিচ্ছু ভাববেন না সার, একবারটি শুয়ে পড়ে চোখ বুজুন তো।

যোগীন বাঁড়ুজ্যে সুবোধ শিশুর ন্যায় শুয়ে পড়ে চোখ বুজলেন। শিবামুখী চিমটের আওয়াজ শুনে পিশাচ আবার এল। ঝিন্টু তাকে ইশারায় আজ্ঞা দিল— এঁকে নিজের বাড়িতে পৌঁছে দাও!

বারোটা বাজল। সরসী বলল, দাদা বউদি এখনই এসে পড়বে। যাই, গহনা-গুলো খুলে ফেলি গে, টাকার থলিগুলোও তুলে রাখতে হবে। তোর মোটে বুদ্ধি নেই, টাকা না চেয়ে নোট চাইলি না কেন? ঝিন্টু বাবা আমার, কোনও কথা কাকেও বলিস নি।

—না না, বলব কেন। এই যা, চুণ্টুদাসের কাছে একটা বেঁজি চেয়ে নিতে ভুলে গেছি। ইস্কুলের দরোয়ান রামভজনের কেমন চমৎকার একটি আছে, খুব পোষা, কাঁধের ওপর নেপটে থাকে।

—ভাবিস নি খোকা, যত বেঁজি চাস তোর পিসেমশাই তোকে কিনে দেবে। তুই আর জ্বর গায়ে জাগিস নি, শুয়ে পড়।

—কোথায় জ্বর! সে তো চুণ্টুদাসকে দেখেই সেরে গেছে।

—হ্যাঁরে খোকা, আমরা স্বপ্ন দেখছি না তো? সকালে ঘুম থেকে উঠে যদি দেখি গহনা আর টাকা সব উড়ে গেছে?

—গেলই বা উড়ে। যোগীনবাবু আবার গড়িয়ে দেবে, টাকাও দেবে।

—যোগীনবাবুও যদি উড়ে যায়?

—যাক গে উড়ে। তুমি এই মটরভাজা একটু খেয়ে দেখ না, কেমন কুড়কুড়ে। বেশ করে চিবিয়ে গিলে ফেল, তা হলে কিছুতেই উড়ে যেতে পারবে না।

১৩৬২ (১৯৫৫)

দ্বান্দ্বিক কবিতা

ভূপতি মুখুজ্যে এই আড্ডার নিয়মিত সদস্য নয়, মাঝে মাঝে আসে। সে কোন্নগরে থাকে কিন্তু কলকাতার সব খবর রাখে। আমুদে লোক, বয়স চল্লিশ হলেও ভাঁড়ামি করতে তার বাধে না।

আজ সন্ধ্যায় যতীশ মিত্রের আড্ডাঘরে ঢুকেই ভূপতি সেকেলে বিদ্যাসুন্দর যাত্রার ভঙ্গীতে সুর করে হাত নেড়ে বলল,

শুন-ন-গ-র-বা-আ-সি-গণ
আশ্চর্য খবর মহা সেন্‌সে-শন
শুন ন-গ্‌-র—

বৃদ্ধ পিনাকি সর্বজ্ঞ এখানে রোজ চা খেতে আসেন। বললেন, ফাজলামি রাখ, যা বলবার সোজা ভাষায় বল।

ভূপতি আবার সুর করে বলল,

আমাদের কবি ধূর্জটিচরণ
ছিরু ঘোষকে করেছে গুরু বরণ,
মার্ক্‌সীয় বৈষ্ণব মঠে নিয়েছে শরণ,
সব সম্পত্তি নাকি করিবে অর্পণ।

পিনাকী সর্বজ্ঞ বললেন, গাঁজা টেনে এসেছ নাকি? ছিরু ঘোষ লোকটা কে?

ভূপতি বলল, জানেন না? কমরেড শ্রীদাম ঘোষ, সম্প্রতি মঠস্বামী শ্রীদাম মহারাজ হয়েছেন?

—ওকে চিনি না, তবে তোমাদের কবি ধূর্জটিচরণকে বার কতক দেখেছি বটে, বছর দুই আগে যতীশের কাছে মাঝে মাঝে আসত। মার্ক্‌সীয় বৈষ্ণব মঠ আবার কি? জান নাকি যতীশ?

যতীশ মিত্র বলল, একটু আধটু জানি, কমরেড ছিরুর সঙ্গে এককালে আলাপ ছিল। আর ধূর্জটির সঙ্গে তো এক ক্লাসে পড়েছি, কিন্তু সে যে ছিরুর শিষ্য হয়েছে তা জানতুম না।

পিনাকি সর্বজ্ঞ বললেন, মার্ক্‌সীয় বৈষ্ণব মঠ নামটা যেন সোনার পাথরবাটি, কাঁঠালের আমসত্ব। মার্ক্‌সের শিষ্যরা তো ঘোর নাস্তিক, তারা আবার বৈষ্ণব হল কবে?

যতীশ বলল, কালক্রমে সবই বদলে যায়। ডবলু সি বনার্জির সময় কংগ্রেস যা ছিল এখনও কি তাই আছে? লেনিন আর ট্রটস্কির পলিসি কি এখনও বজায় আছে? বেঁচে থাকলে আরও কত কি দেখবেন সর্বজ্ঞ মশাই। তান্ত্রিক ফ্যাসিজম্‌, মার্কিন অদ্বৈতবাদ, ভারতীয় সর্বাস্তিবাদ—

উপেন দত্ত বলল, হেঁয়ালি রাখ যতীশ-দা, মার্ক্‌সীয় বৈষ্ণব মঠ ব্যাপারটা কি বুঝিয়ে দাও।

যতীশ বলল, সব বৃত্তান্ত আমার জানা নেই, যতটুকু জানি তাই বলছি। ছেলেবেলা থেকেই ছিরুর একটু কমরেডী মতিগতি ছিল। কলেজ ছাড়ার পর সে একজন উগ্র সাম্যবাদী হয়ে উঠল, প্রতিপত্তিও খুব হল। শুনেছি শেষকালে সে ওদের দলের একজন কর্তা ব্যক্তি হয়েছিল। কিন্তু ছিরুর সঙ্গে পার্টির লোক-দের মতের মিল হল না। তাদের গুরু রাশিয়া, কিন্তু ছিরু বলল, সব দেশে একই ব্যবস্থা চলতে পারে না। ভারতের লোক হচ্ছে ধর্মপ্রাণ, ধর্ম বাদ দিয়ে কোনও রাজনীতি এখানে দাঁড়াতেই পারে না। এই দেখ, বঙ্কিমচন্দ্র দেশকে মা-দুর্গা বানিয়েছিলেন। আমাদের অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের এক হাতে থাকত বোমা, আর এক হাতে গীতা। দেশবন্ধু কৃষ্ণপ্রেমী হয়ে পড়লেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র তান্ত্রিক সাধনা করতেন। শ্রীঅরবিন্দ লাইফ ডিভাইন নিয়ে মেতে রইলেন। গান্ধীজী রঘুপতি রাঘবের নাম কীর্তন করতেন। গুরুজী গোলবালকরও রামভক্ত, যদিও তাঁর ভক্তি একটু দুসরী কিসিম কী। কমিউনিজম এদেশে জুত করতে পারছে না তার কারণ এর কোনও ঐশ্বরিক অবলম্বন নেই। মহান স্তালিন, মহান মাও-সে-তুং বলে যতই চেঁচাও তাতে প্রাণ সাড়া দেবে না। ভক্তি চাই, অবতার চাই। সাম্য-বাদকে ঢেলে সাজাতে হবে। ছিরু ঘোষ বিগড়ে গেছে দেখে পার্টির কর্তারা তাকে দল থেকে দূর করে দিল। কিন্তু ছিরু দমবার পাত্র নয়, অনেক বড়লোক ভক্ত জুটিয়েছে, তাদের টাকায় মার্ক্সীয় বৈষ্ণব মঠ প্রতিষ্ঠা করে নিজে মঠাধীশ শ্রীদাম মহারাজ হয়েছে। বড় বড় ব্যবসায়ীরা তার পৃষ্ঠপোষক, শীঘ্রই সে অবতার হয়ে যাবে তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের ধূর্জটি কবির তো কোনও দিন ধর্মে বা পলিটিক্সে মতি ছিল না, সে কি করে ছিরুর কবলে পড়ল বুঝতে পারছি না।

ভূপতি বলল, ছিরুর সব খবর আমি রাখি, ধূর্জটিরও নাড়ী নক্ষত্র জানি, সে দূর সম্পর্কে আমার শালা হয়। ছেলেবেলা থেকেই ধূর্জটি কবিতা লিখত, তার কবিখ্যাতি আছে, গোটাকতক বইও আছে। অনেক কবি যেমন করে থাকে সেই রকম ধূর্জটিও একটি মানসী প্রিয়া খাড়া করে তার উদ্দেশে কবিতা লিখত।

উপেন দত্ত বলল, এর মানে আমি মোটেই বুঝতে পারি না। আমাদের ছোট বড় বিবাহিত অবিবাহিত যত কবি আছেন তাঁদের অনেকে একটি মনগড়া মেয়ের উদ্দেশে কবিতা লেখেন? এতে তাঁদের কি লাভ হয়?

যতীশ বলল, শাস্ত্রে আছে, সাধকদের হিতের জন্য ব্রহ্মের রূপকল্পনা। কবিরা তেমনি প্রেমাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার জন্য একটি পরমা প্রেয়সীর কল্পনা করেন। এ একরকম তান্ত্রিক নায়িকাসাধনা।

পিনাকী বললেন, বাজে কথা। একে বলে মনে মনে ব্যভিচার। যাদের স্ত্রী নেই কিংবা স্ত্রী পছন্দ হয় না সেই সব কবিই মনগড়া নারীর সঙ্গে প্রেম করে।

উপেন বলল, সর্বজ্ঞ মশাই যা বললেন তা হয়তো ঠিক, যতীশ-দার কথাও ঠিক। কিন্তু কবিদের এইরকম প্রেমলীলার জন্যে তাদের স্ত্রীরা চটে না কেন? মেয়ে কবিও তো ঢের আছে, তারা তো মনগড়া প্রেমিকের উদ্দেশে কবিতা লেখে না।

যতীশ বলল, কেউ কেউ লেখে বই কি। তবে খুব কম, কারণ কায়মনোবাক্যে সতীধর্ম পালন করার সংস্কার এদেশের বেশীর ভাগ মেয়ের এখনও আছে। পুরুষ-দের সে বালাই নেই। কবিদের স্ত্রীরা মনে করে, ছাগলে কি না খায়, কবিরা কি না লেখে, তাতে দোষ ধরলে চলে না।

ভূপতি বলল, কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে গণ্ডগোল বাধে, স্বামী-স্ত্রীর জীবন-যাত্রায় ওলটপালট ঘটে, যেমন ধূর্জটিদের হয়েছে। ওদের সব খবরই আমি রাখি, বলছি শোন—

ধূর্জটি যখন ছোট তখনই তার বাপ-মা মারা যান, এক মামা তাকে নিজের কাছে রেখে পালন করেন। শিক্ষা শেষ করে ধূর্জটি তার মামার কারবারে যোগ দিল, দেদার কবিতাও লিখতে লাগল। তার পর তার বিয়ে হল। দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন লিখেছেন ধূর্জটির ঠিক সেই রকম মনে হল—ভাবলাম বাহা বাহা রে, কি রকম যে হয়ে গেলাম বলব তাহা কাহারে। এতদিন সে কাল্পনিক প্রিয়ার উদ্দেশে কবিতা লিখত, এখন জীবন্ত প্রিয়ার ওপর লিখতে লাগল। বউএর শংকরী নামটা সেকেলে বলে ধূর্জটি বদলাতে চেয়েছিল, কিন্তু বউ রাজী হল না, বলল, ও আমার জেঠামশায়ের দেওয়া নাম, বদলানো চলবে না; তোমার নামটাই বা কি এমন মধুর? অগত্যা সেকেলে শংকরীকেই সম্বোধন করে ধূর্জটি লিখতে লাগল —নন্দনের উর্বশী, পাতালপুরীর রাজকন্যা, সাগর থেকে ওঠা ভিনস, আমার হৃদয় যা চায় তুমি ঠিক তাই গো, এই সব।

কিছু কাল এই রকমে চলল, তার পর ক্রমশ ধূর্জটির হুঁশ হল মানসী প্রিয়ার সঙ্গে তার বিবাহিত প্রিয়ার মিল নেই। শংকরী কাব্যরস বোঝে না, তার মনে রোমান্স নেই। বিয়ের সময় সে আত্মীয় আর বন্ধুদের কাছ থেকে বিস্তর সস্তা উপহার পেয়েছিল। তার উদ্দেশে লেখা ধূর্জটির কবিতাগুলোও যেন তার কাছে মামুলী উপহারের শামিল। সে সংসারের কাজ আর তার নবজাত খোকাকে নিয়েই ব্যস্ত। ধূর্জটি বেচারা আবার তার কাল্পনিক প্রিয়ার উদ্দেশে চুটিয়ে কবিতা লিখতে লাগল আর শংকরী সাংসারিক কাজে ডুবে রইল।

তার পর হাঙ্গামা বাধাল বিশাখা। সে আমার খুড়তুতো শালী, অত্যন্ত ফন্দিবাজ মেয়ে, ধূর্জটির বউ শংকরীর সঙ্গে এক কলেজে পড়েছিল। তার স্বামী নরেশ এঞ্জিনিয়ার, আগে কাঁচড়াপাড়ায় কাজ করত, তার পর বদলী হয়ে কলকাতায় এল, ধূর্জটির বাড়ির পাশেই বাসা করল। বিশাখাকে কাছে পেয়ে শংকরী খুব খুশী হল।

একদিন বিশাখা বলল, তোমার বর তো একজন বিখ্যাত কবি। আজকাল কবিতার বই কেউ কেনে না, কিন্তু ধূর্জটিবাবুর বই বেশ বিক্রি হয় শুনেছি। আচ্ছা, উনি কার উদ্দেশে অত প্রেমের কবিতা লেখেন? তোমার জন্যে নিশ্চয় নয়, তা হলে 'স্বপ্নে দেখা অচিন প্রিয়া' এই সব লিখতেন না।

শংকরী বলল, কারও উদ্দেশে লেখে না। কবিরা খেয়ালী লোক, মনগড়া একটা কিছু খাড়া করে তার উদ্দেশে লেখে।

—সত্যি বা মনগড়া যাই হক, তোমার রাগ হয় না?

—ও সব আমি গ্রাহ্য করি না!

—এ তোমার ভারী অন্যায়, এর পর পস্তাতে হবে। আর দেরি নয়, এখন থেকে স্টেপ নাও।

—কি করতে বল তুমি?

—একটা মনগড়া পুরুষের উদ্দেশে তুমিও কবিতা লিখতে শুরু কর।

—রাম বল। কবিতা লেখা আমার আসে না, আর লিখলেই বা ছাপবে কে?

—সে তুমি ভেবো না। 'নিস্যান্দিনী' পত্রিকা দেখেছ তো? তার সম্পাদক তরণী সেন আমার দেওর রমেশের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তোমার লেখা ছাপাবার ব্যবস্থা আমি করে দেব। আর, কবিতা লেখা খুব সোজা, দেদার চুরি করবে, ওখান থেকে এক লাইন এখান থেকে এক লাইন নেবে, তার সঙ্গে নিজের কিছু জুড়ে দেবে। এখন গদ্য কবিতার যুগ, মিলের ঝঞ্ঝাট নেই, যা খুশি এলোমেলো করে সাজিয়ে দিলেই গদ্য কবিতা হয়ে যায়।

বিশাখার জেদের ফলে শংকরী রাজী হল। দুজনে মিলে একটা কবিতা খাড়া করল, বিশাখার দেওর রমেশ সেটা তরণী সেনের কাছে নিয়ে গেল।

তরণী বলল, আরে ছ্যা, একে কি কবিতা বলে। 'ওগো আমার বঁধু, তুমি ডুমুর ফুলের মধু!' এ রকম সেকেলে কাঁচা লেখা ছাপলে আমার পত্রিকা কেউ পড়বে না।

রমেশ তার বউদিদির সঙ্গে পরামর্শ করে তৈরি হয়েই গিয়েছিল। বলল, আচ্ছা তরণী, তোমার পত্রিকার লাভ কত হয়?

—লাভ কোথায়, এখনও ঘর থেকে গচ্চা দিতে হয়।

—তবে বলি শোন। প্রতি মাসে আমি পাঁচ-ছটা কবিতা আনব, প্রত্যেকটি ছাপবার জন্যে পাঁচ টাকা হিসেবে দেব। তাতে পঁচিশ-তিরিশ টাকা পাবে। রাজী আছ?

তরণী সেন বলল, তা মন্দ কি, কাগজের খরচটা তো উঠবে। টাকা পেলে প্রতি সংখ্যায় দশটা কবিতা ছাপতে রাজী আছি। কিন্তু দেখো ভাই, নিতান্ত রাবিশ না হয়।

—আরে না না। শংকরী দেবীর নামে ছাপা হবে বটে কিন্তু বেশীর ভাগ আমার বউদিই লিখবেন। তাঁর হাত খুব পাকা।

নিস্যান্দিনী পত্রিকায় শংকরী দেবীর নামে কবিতা ছাপা হতে লাগল। তা দেখে ধূর্জটির মনে কিঞ্চিত কৌতুক আর করুণার উদয় হল। সে তার স্ত্রীকে বলল, বেশ তো, শখ যখন হয়েছে লিখতে থাক। এখন বড্ড কাঁচা, লিখতে লিখতে হাত পাকতে পারে। চাও তো আমি সংশোধন করে দিতে পারি। শংকরী বলল, না, না, তোমায় কিছু করতে হবে না, যা পারি আমিই লিখব। বদনাম হয় তো আমারই হবে, তোমার ক্ষতি হবে না।

শংকরী দেবীর কবিতা ক্রমশ কাঁচা থেকে পাকা, ঠান্ডা থেকে গরম এবং গরম থেকে গরমতর হতে লাগল। পাঠকরা বলল, কি চমৎকার! একজন আধুনিক সমালোচক লিখলেন—এক অনাস্বাদিতপূর্ব রসঘন কাব্যমধুরিমা, নারীর অন্তর্নিহিত ফল্গুধারার স্বতঃ উৎসারিত উৎস, এর তুলনা নেই। নিস্যান্দিনী পত্রিকার কাটতি হুহু করে বেড়ে গেল। তরণী সেনকে রমেশ বলল, আর টাকা দিচ্ছি না, এখন থেকে তুমিই দেবে, প্রতি কবিতায় দশ টাকা। 'প্রগামিনী'র সম্পাদক অনুকূল চৌধুরী তাই দেবেন বলেছেন। তরণী বলল, আচ্ছা আচ্ছা, শংকরী দেবী টাকা না হয় নাই দেবেন। কিন্তু দক্ষিণা দেবার সামর্থ্য এখনও আমাদের হয় নি, আরও কিছু দিন সবুর করতে হবে।

উপেন দত্ত বলল, শংকরী দেবীর কবিতা পড়েছি বলে মনে হয় না। আপিসের যা খাটুনি, সাহিত্য চর্চার ফুরসতই নেই। এই আড্ডায় এসে পাঁচ জনের মুখে যা একটু শুনতে পাই। আচ্ছা যতীশ-দা, তোমার কাছে নিস্যান্দিনী নেই?

যতীশ বলল, আমি পয়সা দিয়ে রাবিশ কিনি না।

ভূপতি বলল, শংকরী দেবীর কবিতা শুনতে চাও? কিছু কিছু আমার মনে আছে, বলছি শোন। একটা হচ্ছে এই রকম—

আমি চিনি গো চিনি তোমারে,
তুমি থাক মহাপ্রাচীরের এপারে।
কি মিষ্টি তোমার আধো আধো বুলি,
রুশকে বল লুশ, দু টাকাকে তু লুপি।
ওগো লাল চীনের জঙ্গী জওআন,
তোমার নয়ন বাঁকা, বর্ণ স্বর্ণচাঁপা,
সিল্কমসৃণ শ্যামর লেদার তোমার চামড়া,
ওই নির্লোম বুকে ঠাঁই চাই ঠাঁই চাই।

আর একটা বলি শোন—

ও বিদেশী পাখতুনিস্তানবাসী,
তাগড়া জাক্কাখেল, আমি তোমায় ভালবাসি।
নর্ডিক নীল তোমার সুর্মা পরা চোখ,
সেমেটিক নাকের নীচে মোটা ছাঁটা গোঁফ।
তোমার লোমজংগল বুকে টেনে নাও আমাকে,
ক্র্যাংক-শাফ্‌টের মতন দুই হাতে জাপটে ধর,
মড়মড়িয়ে ভেঙে দাও আমার পাঁজরা,
পিষে ফেল, পিষে ফেল।

এই সব কবিতা নিস্যান্দিনী পত্রিকায় দেদার ছাপা হতে লাগল। 'কাঙ্ক্ষার ঝংকার' নাম দিয়ে শংকরীর একটা কবিতাসংগ্রহ প্রকাশিত হল, তিন মাসের মধ্যেই তিনটে সংস্করণ ফুরিয়ে গেল। ধূর্জটি নিজের রচনা নিয়েই মেতে থাকত, তার বউ কি লিখছে, তা পড়ে লোকে কি বলছে, এ সব খবর রাখত না। একদিন তার এক সাহিত্যিক বন্ধু একখানা কাঙ্ক্ষার ঝংকার দেখিয়ে বলল, ওহে ধূর্জটি, এই শংকরী দেবী তোমারই গৃহিণী তো? ওঃ, ভদ্রমহিলা কি সব অদ্ভুত কবিতা লিখছেন, রেগুলার হট স্টফ। পড়ে তোমার মনে একটু ইয়ে হয় না? আমাদের সাইকোলজিস্ট প্রফেসার ভড় বলছিলেন, এ হচ্ছে উদ্দাম লিবিডো।

ধূর্জটির ভাবনা হল। স্ত্রীর কাছ থেকে তার কবিতার বই চেয়ে নিয়ে খুব মন দিয়ে পড়ল। তার মেজাজ বিগড়ে গেল। শংকরীকে বলল, এ সব কি ছাই ভস্ম লেখা হচ্ছে? লোকে যে ছি ছি করছে।

শংকরী বলল, করুক গে ছি ছি, খুব বিক্রি তো হচ্ছে। আরও একখানা বই ছাপবার জন্যে প্রেসে দিয়েছি।

মাথা নেড়ে ধূর্জটি বলল, ওসব চলবে না বলছি।

—বা রে মজা! তুমি লিখলে দোষ হয় না, আর আমার বেলা দোষ! 'ওগো সর্বনাশী, আমি ভালবাসি তোমার ঠোঁটের ওই মোনালিসা হাসি'—তুমি এই সব ছাই ভস্ম লেখ কেন?

—আমার সঙ্গে তোমার তুলনা! কাল্পনিক রমণীর ওপর কবিতা লিখলে পুরুষের দোষ হয় না, কিন্তু মেয়েদের সে রকম লেখা অতি গর্হিত।

—বেশ, তুমি কবিতা লেখা বন্ধ কর, তোমার সব বই পুড়িয়ে ফেল, আমিও তাই করব।

ধূর্জটি রেগে আগুন হয়ে বেরিয়ে গেল।

উপেন দত্ত বলল, যত নষ্টের গোড়া আপনার শালী বিশাখা। খামকা এই ঝগড়া বাধিয়ে তাঁর কি লাভ হল?

ভূপতি বলল, হুঁ, বিশাখার স্বামী নরেশও তাই বলেছে, খুব ধমকও দিয়েছে। তার পর শোন। শংকরীর কাছে সব কথা শুনে বিশাখা তার সখার হয়ে লড়তে গেল। ধূর্জটিকে বলল, আপনার বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পেয়েছে নাকি? ঘরে অমন সুন্দরী বউ থাকতে কোথাকার কে অচিন প্রিয়ার উদ্দেশে আপনি কবিতা লেখেন কোন্ আক্কেলে? তাতে শংকরীর রাগ হবে না? শোধ তোলবার জন্যে সেও যদি ওই রকম লেখে তাতে অন্যায়টা কি মশাই?

ধূর্জটি বলল, তা বলে চীনেম্যান আর কাবলীওয়ালার উদ্দেশে প্রেমের কবিতা লিখবে?

—আচ্ছা আচ্ছা, এখন থেকে না হয় বাঙালী তরুণদের উদ্দেশেই লিখবে। কিন্তু তার চাইতে ভাল—আপনি আজ থেকে নিজের গিন্নীর নামে কবিতা লিখুন, যেমন প্রথম প্রথম লিখতেন। আর সেও আপনার নামে লিখুক। এক বাড়িতে যখন বাস করছেন, দুইজনেই যখন কবি, তখন রেসিপ্রোসিটি না হলে চলবে কেন?

ধূর্জটি কিন্তু বুঝল না, তার মন অস্থির হয়ে উঠল। ভাল করে খায় না, ঘুমোয় না, আপিসের কাজেও মন দেয় না। এই অবস্থায় একদিন ছিরু ঘোষের সঙ্গে তার দেখা হল। ছিরু তখন মঠাধীশ মণ্ডলেশ্বর হাজার-আট-শ্রী হিজ হোলিনেস শ্রীদাম মহারাজ। দশ আঙুলে দশটা হীরের আংটি, বাসন্তী রঙের সিল্ক ভিন্ন পরে না। সে মিষ্টি মিষ্টি করে অনেক তত্ত্বকথা শোনাল, ধূর্জটি মুগ্ধ হল। ছিরু বলল, কোনও চিন্তা নেই, তোমার সমস্ত ক্ষোভ আমি দূর করে দেব, তোমরা স্বামী-স্ত্রীতে যাতে পরমা শান্তি পাও তার ব্যবস্থা করব।

তারপর ছিরু ধূর্জটিকে যে লেকচারটি দিল তার সারমর্ম এই।—তোমাদের এই দাম্পত্যকলহ মার্ক্স-কথিত দ্বান্দ্বিক নিয়মেই হয়েছে। তুমি কাল্পনিক প্রিয়ার উদ্দেশে কবিতা লেখ, তাতে তোমার স্ত্রী চটে উঠল—এ হল থিসিস। তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তোমার স্ত্রী কাল্পনিক পুরুষের উদ্দেশে লিখতে লাগল, তুমি চটে উঠলে—এ হল অ্যান্টিথিসিস। এখন দরকার সিন্থিসিস, তা হলেই সব মিটে যাবে। তোমরা দুজনে আমার মঠে চলে এস, নিত্য সৎকথা শোন, আর এই দুখানা বই দিচ্ছি, ভাল করে প'ড়ো—প্রেমসিন্ধুতরঙ্গভঙ্গিমা এবং ডায়ালেক্‌টিক্যাল ভৈষ্ণভিজ্‌ম। পড়লে যুগপৎ শ্রীকৃষ্ণে ঐকান্তিকী ভক্তি আর শ্রীমার্ক্সে অচলা নিষ্ঠা হবে। তার পর ধূর্জটি আর তার স্ত্রী মার্ক্সীয় বৈষ্ণব মঠে চলে গেল।

যতীশ বললে, ধূর্জটি বোকা নয়, তবে কবিরা বড় সেণ্টিমেণ্টাল হয়, ভাবের ঝোঁকে অনেক সময় কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তার স্ত্রীও শুনেছি খুব চালাক মেয়ে। আমার বিশ্বাস ওরা বেশী দিন মঠে টিকতে পারবে না, শীঘ্রই অরুচি হয়ে যাবে।

ভূপতি মুখুজ্যে উঠে পড়ে বলল, তোমরা বস, আমি চললুম। কর্তাবাবুর খেয়াল হয়েছে কূর্মঅবতার যাত্রা শুনবেন, তারই বায়না দিতে শিবপুরে যেতে হবে। যে ছোকরা কূর্ম সাজে তার নাচ নাকি অতি অপূর্ব।

সাত দিন পরে ভূপতি আবার আড্ডায় উপস্থিত হয়ে হাত নেড়ে সুর করে বলল,

শুন ন-গ-র-বা-আ-সি-গণ
বিচিত্র খবর চিত্তচমৎকরণ।
আমাদের মিসেস ধূর্জটিচরণ
ছিরু ঘোষকে করেছেন দংশন,
আর ধূর্জটি দিয়েছে বেদম পিটন।
স্বামী-স্ত্রী করেছে স্বগৃহে গমন
আর ছিরুর হাতে হয়েছে সেপ্‌টিক ভীষণ,
আর-জি-করে হবে অ্যাম্পুটেশন।

পিনাকী সর্বজ্ঞ বললেন, আঃ ভাঁড়ামি রাখ, সমস্ত কথা খোলসা করে বল।

ভূপতি বলল, খোলসা করেই তো বললুম। আচ্ছা ছন্দোবদ্ধ বাক্য যদি আপনাদের বোধগম্য না হয় তবে গদ্যতেই বলছি। ধূর্জটি আর তার স্ত্রী ফিরে এসেছে শুনে আজ সকালে ওদের ওখানে গিয়েছিলুম। বিশ্রী ব্যাপার। মঠে যাবার দিন কতক পরে ছিরু মহারাজ ওদের বলল, এখানে স্বামী-স্ত্রীর একত্র থাকা নিষিদ্ধ, মেয়েরা আর পুরুষরা আলাদা আলাদা মহলে বাস করবে, নতুবা সাধনার বিঘ্ন হবে। শ্যামসুন্দরই একমাত্র পুরুষ, শ্রীরাধাই একমাত্র নারী। স্ত্রীপুরুষ সকলকেই রাধা-ভাবে ভাবিত হতে হবে, সেই হল আসল কমিউনিজ্‌ম। তারপর একদিন শংকরীকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে ছিরু বলল, শ্যাম সে পুরুষোত্তম, পতি সে পুরুষাধম। আমার দেহেই শ্যামের অধিষ্ঠান হয়েছে। শ্রীরাধে, তুমি আমাকে ভজনা কর। হাত ধরে টানাটানি করতেই শংকরী চিৎকার করে উঠল, আর ছিরুর ডান হাতে এক ভীষণ কামড় বসিয়ে দিল। চিৎকার শুনে ধূর্জটি ছুটে এসে ছিরুকে বেদম কিল চড় লাথি লাগাল। মঠে মহা হইচই, ধূর্জটি আর তার স্ত্রী সোজা বাড়ি চলে গেল। তাদের মিটমাট হয়ে গেছে। শুনলুম ধূর্জটি কবিতা ছেড়ে দিয়ে সরল বীজগণিত রচনা করবে, আর শংকরী রবিবারের কাগজে নতুন রান্না লিখবে—কাঁকড়ার কচুরি, পেঁয়াজের পায়েস, এই সব।

যতীশ বলল, এই ব্যাপারের পর ছিরুর ভক্তরা বিগড়ে যায় নি?

—তা কেন যাবে, অবতারদের সবই তো লীলাখেলা।

—ছিরুর হাত সত্যিই অ্যাম্পুটেট করবে নাকি?

—ডাক্তারের যদি কর্তব্যজ্ঞান থাকে তবে নিশ্চয়ই করবে।

১৩৬২ (১৯৫৫)

ধনু মামার হাসি

ভোলানাথ ছিল আমাদের ক্লাসের ছেলেদের সর্দার। তার বয়েস সকলের চাইতে বেশী, পর পর তিন বৎসর ফেল করে ক্লাস নাইনে স্থায়ী হয়ে আছে। তার সঙ্গেই আমার বেশী ভাব ছিল।

আমাদের শহরটা বড় নয়, মোটে একটি সিনেমা। মাঝে মাঝে ফুটবল ম্যাচ হত, পুজোর সময় থিয়েটার হত, পুজোও জাঁকিয়ে হত। এসব ছাড়া আমাদের ফুর্তির অন্য উপায় ছিল না। একদিন হেডমাস্টার বললেন, কাল শনিবার ছুটির পর তোরা থাকবি, স্বামী ব্যোমপ্রকাশজী এসেছেন, তাঁর লেকচার শুনবি।

নীরস হিন্দী বক্তৃতা শোনবার আগ্রহ আমাদের ছিল না, কিন্তু খোলা মাঠে দল বেঁধে বসাতেও একটা মজা আছে। ব্যোমপ্রকাশ এক ঘণ্টা ধরে সদুপদেশ দিলেন। চুরি, মিথ্যা কথা, অবাধ্যতা প্রভৃতি কুকর্মের পরিণাম, পাপের শাস্তি, পুণ্যের পুরস্কার, প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলে পরিশেষে একটি মন্ত্র সর্বদা আমাদের ইয়াদ রাখতে বললেন—নেকী করনা ঔর বদী ছোড়না, অর্থাৎ ভাল কাজ করবে আর মন্দ কাজ ছাড়বে।

বক্তৃতা শেষ হলে আমরা সকলে খুব হাততালি দিলাম। ভোলা আমার পাশেই বসেছিল, হঠাৎ সে খ্যাঁক খ্যাঁক করে বিশ্রী রকম হেসে উঠল। আমি বললাম, ওকি রে?

ভোলা বলল, একটু হেসে নিলাম। এই নতুন হাসিটা প্র্যাকটিস করছি, ধনু মামার কাছে শিখেছি।

—ধনু মামা আবার কে?

—আমার দিদিমার পিসেমশাই ধনঞ্জয় দত্ত, খুব বুড়ো মানুষ। মা তাঁকে বলে ধনু দাদা, তাই তিনি আমার মামা হন। দশ দিন হল এসেছেন, আমাদের বাড়িতেই বরাবর থাকবেন। চমৎকার হাসেন ধনু মামা, কিন্তু বেশী নয়, খুব যখন ফুর্তি হয় তখন।

—তোর তা শেখবার কি দরকার?

—নতুন বিদ্যে শিখতে হয় রে। তুইও তো মুখে দুটো আঙুল পুরে সিটি বাজানো শিখছিস। আমার হাসিটা এখনও ঠিক হচ্ছে না, সুর দুরস্ত করতে আরও সাত দিন লাগবে। চল না আমাদের বাড়ি, ধনু মামার হাসি শুনে আসবি। একটা চার পয়সা দামের ছোট খাতা কিনে নে। ধনু মামা যদি জিজ্ঞেস করে—কি করতে এসেছ হে ছোকরা? তুই অমনি খাতা খানা এগিয়ে দিয়ে বলবি—আজ্ঞে, একটি বাণী নিতে এসেছি।

মোড়ের দোকান থেকে খাতা কিনে ভোলার সঙ্গে চললাম। তার বাপ ঠিকাদারি করেন, বেশীর ভাগ বাইরেই ঘুরে বেড়ান। বাড়িতে তার মা আছেন, দুটো ছোট ভাইও আছে। ভোলার কাছে শুনলাম, ধনঞ্জয় দত্তর তিন কুলে কেউ নেই, কিন্তু

বুড়োর নাকি বিস্তর টাকা আছে। তিনি ওদের বাড়িতে স্থায়ী হয়ে বাস করবেন এতে ভোলার বাবা আর মা খুব খুশী হয়েছেন।

ধন্দু মামা রোগা বেঁটে মানুষ, কালো রং, তোবড়া গাল, আসল বা নকল কোনও দাঁত নেই? সাদা চুল, খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ি গোঁফ, বোধ হয় সাত দিন নাপিতের হাত পড়ে নি। তাঁর শোবার ঘরে তক্তপোশে উবু হয়ে বসে হুঁকো টানছেন, ধোঁয়ায় ঘর ভরে গেছে।

আমি প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলাম। ভোলা পরিচয় দিল—এ আমার বন্ধু রামেশ্বর, এক ক্লাসে পড়ে।

ধন্দু মামা কপাল কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে ব্যাঙের মতন মোটা গলায় বললেন, কি মতলবে এসেছিস রে?

খাতাটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, আজ্ঞে, বাণী নিতে।

—বাণী? সে আবার কি?

ভোলা আমার হয়ে উত্তর দিল, বাণী জানেন না? সদুপদেশ আর কি, যাতে এর আখেরে ভালো হয় সে রকম কিছু কথা আপনার কাছে চাচ্ছে।

ধন্দু মামার ঠোঁটে একটু হাসি ফুটে উঠল। বললেন, মন দিয়া লেখাপড়া শিখিবে, সদা সত্য কহিবে, চুরি করিবে না—এই সব তো?

আমি বললাম, আজ্ঞে হাঁ, ওই রকম যা হক কিছু।

ধন্দু মামা বললেন, রাত্তিরে ভাল দেখতে পাই না, হাতও কাঁপে। একটা কবিতা বলছি, তুই লিখে নে, নীচে আমি দস্তখত করে দেব। লেখ্—পরের ধন লইবে না, তাহাতে বিপদ; চোরের ধন লইতে পার, অতি নিরাপদ।

অদ্ভুত বাণী শুনে আমি হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। ধন্দু মামা বললেন, কি রে, পছন্দ হল না বুঝি।

ভয়ে ভয়ে বললাম, আপনি ঠাট্টা করছেন স্যার।

ধন্দু মামা মাথাটি পিছনে হেলিয়ে চোখ মিটমিট করে উপর দিকে চাইলেন। তাঁর বদনমণ্ডলের সবটা কুঁচকে গেল এবং তাতে যেন তরঙ্গ উঠতে লাগল। তার পর মুখ থেকে বিকট হাসির আওয়াজ বেরুল—খ্যাঁক খ্যাঁক খ্যাঁক। আমার গায়ে ঠেলা দিয়ে ভোলা চুপি চুপি বলল, শুনলি তো?

ধন্দু মামা বললেন, এই ভোলা, একে আমার কাছে এনেছিস কেন রে? এ তো দেখছি ভাল ছেলে, তোর মতন বকাটে নয়। আমার কথা শুনলে এর স্বভাব বিগড়ে যাবে।

ভোলা বলল, আপনি জানেন না ধন্দু মামা, এই রামেশ্বর হচ্ছে ওয়েট ক্যাট, মানে ভিজে বেড়াল। আপনি নির্ভয়ে একে উপদেশ দিতে পারেন।

ধন্দু মামা বললেন, উপদেশ তো তোরা বিস্তর শুনেছিস, আমি আর বেশী কি বলব। তবে যেটুকু আমি আবিষ্কার করেছি তা তো ওকে বলেই দিলাম।

সাহস পেয়ে আমি বললাম, কি করে আবিষ্কার করলেন বলুন না মামাবাবু।

প্রসন্ন মুখে ধন্দু মামা বললেন, জানতে চাস? আচ্ছা, বলছি। তোরা তো সোজা ইস্কুল থেকে এসেছিস, জলটল খাস নি তো? ওরে ভোলা, তোর মার কাছ

থেকে পয়সা চেয়ে নিয়ে চট করে তিতু ময়রার দোকান থেকে এক পো গজা আর এক পো জিলিপি কিনে আন।

ভোলা খাবার আনতে গেল। ধনু মামা আমাকে বললেন, খাবার আসুক, তোরা খেতে খেতে আমার গল্প শুনবি। ততক্ষণ বরং তুই আমার পা টিপে দে।

আমি ধনু মামার পদসেবা করতে লাগলাম। একটু পরেই ভোলা খাবারের ঠোঙা নিয়ে এল, বাড়ির ভিতর থেকে দু গেলাস জলও আনল। ধনু মামা বললেন, খেতে লেগে যা তোরা। না না, আমার জন্য রাখতে হবে না, আমি ও সব খাই না।

গজায় কামড় দিয়ে আমি বললাম, এইবার বলুন মামাবাবু।

ধনু মামা বললেন, দেখ্, যা বলব তা ঠিক তত্ত্বকথা নয়। আর কেউ হলে এসব রহস্য প্রকাশ করত না, কিন্তু আমি কারও তোয়াক্কা রাখি না। বয়েস বিস্তর হয়েছে, ডাক্তার বলেছে রক্তের চাপ দু শ চল্লিশ থেকে হঠাৎ এক শ চল্লিশে নেমেছে। লক্ষণ ভাল নয়, বেশ বুঝছি শিগ্‌গির এক দিন মুখ থুবড়ে পড়ে মরব। ফাদার কনফেসার কাকে বলে জানিস? যে পাদরীর কাছে খ্রীষ্টানরা মাঝে মাঝে নিজের কুকর্ম স্বীকার ক'রে মন হালকা করে তাকেই বলে।

ভোলা বলল, গল্প শুনেছি—গেঁয়ো লোক গঙ্গাস্নানে এসেছে, পুরুত তাকে মন্ত্র পড়াচ্ছে—আম্র চুরি, জাম্র চুরি, ভাদ্রমাসে ধান্য চুরি, মন্দ স্থানে রাত্রিযাপন, মদ্যপান আর কুঁকড়া ভক্ষণ, হক্কল পাপ বিমোচন, গঙ্গা গঙ্গা—সেই রকম নাকি?

—হাঁ। আজ তোরাই আমার ফাদার কনফেসার। আমার ইতিহাসটা বলছি শোন—

অনেক বছর আগেকার কথা। তখন আমার বয়স আঠারো-উনিশ, নাম ছিল হাবুলচন্দ্র। লেখাপড়া বেশী শিখি নি, অবস্থা খুব খারাপ, বাড়িতে মা ছাড়া কেউ ছিল না। মারা যাবার আগের দিন মা বললেন, বাবা হাবুল, এই পাড়াগাঁয়ে বেকার বসে থাকিস নি, দহরমগঞ্জে তোর কাকার কাছে যাবি, যা হক একটা হিল্লে লাগিয়ে দেবেন।

মা মারা গেলে দহরমগঞ্জে গেলাম, বেশ বড় জায়গা। কাকা ওখানকার মস্ত কারবারী গয়াপ্রসাদ প্রয়াগদাসের ফার্মে চালান লিখতেন। এই ফার্মের পত্তন করেছিলেন গয়াপ্রসাদ। তিনি গত হলে তাঁর ছেলে প্রয়াগদাস মালিক হন। আমি যখন ওখানে যাই তখন প্রয়াগদাসের বয়েস আন্দাজ পঞ্চাশ। গুটিকতক নাবালক ছেলে মেয়ে আছে, দ্বিতীয় পক্ষের একটি স্ত্রীও আছে। প্রয়াগদাস বাতে পঙ্গু হয়ে প্রায় বিছানাতেই শুয়ে থাকতেন, অগত্যা তাঁর খুড়তুতো ভাই বুদ্ধিচাঁদকে ম্যানেজার করে ব্যবসা চালাবার সমস্ত ভার দিয়েছিলেন। বুদ্ধিচাঁদের বয়েস প্রায় তিরিশ, নিঃসন্তান, স্ত্রী গত হলে আর বিয়ে করেন নি।

সে সময়ে আমার চেহারাটি এমন মর্কটের মতন ছিল না, বেশ নাদুস নুদুস বেঁটে গড়ন, ফুলো ফুলো গাল, একটু বোকা বোকা ভাব। দেখাত যেন চোদ্দ-পনেরো বছরের ছেলে। লোকে বলত, এই হাবুলটা হচ্ছে হাবা গোবা। আমি মনে মনে হাসতাম আর যতটা পারি বোকা সেজে থাকতাম। তাতে লাভও হত। লোকে আমাকে বিশ্বাস করত, অনেক সময় আমার সামনে গুপ্ত কথা বলে বসত। কাকা আমাকে বুদ্ধিচাঁদের কাছে নিয়ে গিয়ে হাত জোড় করে বললেন, হুজুর,

আপনাদের আশ্রয়ে বুড়ো হয়ে গেছি,আমি আর ক দিন।দয়া করে আমার ভাইপো এই হাবুলচন্দরকে যা হয় একটা কাজ দিন।

বুদ্ধিচাঁদ আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন, তারপর পিঠে একটা কিল মেরে বললেন, আরে হাব্বু, তুই তো বৌরা পাগল আছিস, কোন কাম করবি ? আচ্ছা, এখন তোকে পাঁচ টাকা মাহিনা দিব, আমার খাস আরদালী হয়ে ইধর উধর চিঠ্‌ঠি লিয়ে যাবি। পারবি তো? আমি খুব ঘাড় দুলিয়ে বললাম, জী হুজুর, পারব।

তখনই আরদালীর পদে বাহাল হয়ে গেলাম। বুদ্ধিচাঁদ শৌখিন লোক, তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে গদিতে বসতেন না, টেবিল চেয়ার আলমারি দিয়ে তাঁর আপিস-ঘর সাজিয়েছিলেন ; ঘণ্টা বাজিয়ে আমাকে ডাকতেন। আমার কাজ খুব হালকা, বুদ্ধিচাঁদের খাস কামরার দরজার পাশে একটা টুলে বসে থাকতাম, তাঁর ছোটখাটো ফরমাশ খাটতাম, মাঝে মাঝে তাঁর চিঠি বিলি করতাম। চিঠি বইবার জন্য তিনি আমাকে একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ দিয়েছিলেন।

হাবা গোবা মনে করে সবাই আমাকে ঠাট্টা করত, আমি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকতাম আর বোকার মতন হাসতাম। কিন্তু কান সর্বদা খাড়া থাকত, গুজগুজ ফিসফিস করে কে কি বলছে সব মন দিয়ে শুনতাম। ক্রমশ আমার কানে এল— বুদ্ধিচাঁদ খুব তুখড় কাজের লোক, সকলের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারও ভাল। কিন্তু হাতটান আছে, ফার্মের টাকা সরিয়ে থাকেন, জুয়ো খেলেন, নেশা করেন, অন্য দোষও আছে।

রামনবমীর দিন ও'দের নতুন খাতা হত। তার আগের দিন বড় বড় খদ্দেররা তাদের দেনা চুকিয়ে দিত। আমি বাহাল হবার পাঁচ-ছ মাস পরেই ও'দের বছর কাবার হল, যাকে বলে সাল তামামি। রাত্রি পর্যন্ত কাজ চলবে তাই আমাদের জলখাবারের জন্যে প্রচুর কচৌড়ি আর লাড্ডু আনা হল। অনেক রাত পর্যন্ত টাকা আসতে লাগল, বুদ্ধিচাঁদ তাঁর কামরায় বসে নিজেই নোট আর টাকা গনতি করতে লাগলেন, আমি নোটের বাণ্ডিল বাঁধতে লাগলাম। চেক খুব কম, খুচরো টাকাও কম, বেশীর ভাগই পাঁচ শ, এক শ আর দশ টাকার নোট।

রাত এগারোটার সময় কাজ শেষ হল, আমলারা ছুটি পেয়ে চলে গেল। বুদ্ধিচাঁদ আমাকে বললেন, হিসাব মিলাতে আমার কিছু দেরি হবে, হাব্বু, তুই দরজায় বসে থাক, আমার কামরায় কাকেও ঢুকতে দিবি না। আর শোন্—এই প্যাকিটটা তোর কাছে রাখ্, কাল মথুরানাথ মিসিরের কিতাবের দোকানে ফেরত দিয়ে বলবি, এসব জাসুসী কহানী (অর্থাৎ ডিটেকটিভ গল্প) বুদ্ধিচাঁদজী পড়তে চান না, ভক্তমাল গ্রন্থ যদি থাকে তো তাঁকে যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বই-এর প্যাকেটটা আমার চিঠি বিলির ব্যাগে পুরে আমি কামরার বাইরে পাহারায় বসলাম, বুদ্ধিচাঁদ দরজা বন্ধ করে হিসাব মেলাতে লাগলেন। দরজার কবজার কাছে একটু ফাঁক ছিল, তাই দিয়ে আমি উঁকি মেরে দেখতে লাগলাম। ঘরে কেরোসিনের একটা বড় ল্যাম্প জ্বলছে, বুদ্ধিচাঁদ টেবিলের ওপর নোটের বাণ্ডিলগুলো নাড়াচাড়া করছেন, মাঝে মাঝে একটা বোতল থেকে মদ ঢেলে খাচ্ছেন। তাঁর ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল, একটু পরেই খ্যাঁক খ্যাঁক শব্দ বার হল, যেন খ্যাঁক-শেয়াল ডাকছে। তিনি চেক আর খুচরো টাকা লোহার আলমারিতে বন্ধ করলেন, আর সমস্ত নোটের গোছা এক সঙ্গে খবরের কাগজে জড়িয়ে সরু দড়ি দিয়ে

বাঁধলেন। তার পর পাশের ঘর থেকে একটা ছোট স্টীল ট্রাংক এনে মেঝেতে রেখে খুললেন। তাতে কাপড় চোপড় রয়েছে।

ঠিক এই সময় আপিস ঘরের সামনের রাস্তায় একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়াল। সইস চেঁচিয়ে আমাকে বলল, এ হাব্বু, মাইজী এসেছেন, বুদ্ধিচাঁদজীকে জলদি আসতে বল্।

মাইজী হচ্ছেন কারবারের মালিক, প্রয়াগদাসের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, বুদ্ধিচাঁদ যাকে ভাবীজী অর্থাৎ বউদিদি বলেন। আমি দরজা একটু ফাঁক করে বললাম, হুজুর, মাইজী এসেছেন, আপনাকে ডাকছেন। বুদ্ধিচাঁদ বিরক্ত হয়ে বললেন, আঃ, আসবার সময় পেলেন না, এত রাত্রে টাকা চাইতে এসেছেন! কাজের সময় যত সব বখেড়া। আমাকে তো এখনই রওনা হতে হবে, ট্রেনের টাইম হয়ে এল। হাব্বু, তুই ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ভিতরে বসে থাক্, কেউ যেন না ঢোকে। আমি ভাবীজীকে বিদায় করে এখনই আসছি।

বুদ্ধিচাঁদ তাঁর তোরঙ্গের কাপড়ের মধ্যে নোটের বাণ্ডিলটা গুঁজে দিলেন। ডালা বন্ধ করতে পারলেন না, একটু উঁচু হয়ে রইল। আমাকে বললেন, হাব্বু, তুই তোরঙ্গের উপরে বসে থাক, আমি তুরন্ত আসছি।

বুদ্ধিচাঁদ বেরিয়ে যেতেই সিদ্ধিদাতা গণেশ আমাকে বুদ্ধি দিলেন। তাড়াতাড়ি তোরঙ্গ থেকে নোটের বাণ্ডিলটা বার করে আমার ব্যাগে পুরলাম আর ব্যাগে যে বইএর প্যাকেট ছিল তা তোরঙ্গে গুঁজে দিলাম। নোটের বাণ্ডিল আর বইএর প্যাকেট আকারে প্রায় সমান ছিল।

একটু পরে বুদ্ধিচাঁদ ফিরে এলেন। দেখলেন, আমি তোরঙ্গের উপর গট হয়ে বসে আছি, আমার চাপে ডালাটি ঠিক হয়ে বসেছে। ডালা একটু তুলে ভিতরে হাত দিয়ে দেখলেন বাণ্ডিলটা ঠিক আছে কিনা। তার পর চাবি বন্ধ করে বুদ্ধিচাঁদ ব্যস্ত হয়ে আমাকে বললেন, আমি এখনই বহরমপুর রওনা হচ্ছি, ব্যাংকে টাকা জমা দিতে হবে। আর সময় নেই, তুই আমার তোরঙ্গটা স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দে।

বুদ্ধিচাঁদ আপিস-ঘরে তালা লাগিয়ে তার চাবিটা আমাকে দিয়ে বললেন, কাল সকালে বৈজনাথবাবুকে দিয়ে আসবি। বৈজনাথ ছিলেন ফার্মের বড়বাবু, দূর সম্পর্কে মালিকের শালা।

আমার ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে আর বুদ্ধিচাঁদের তোরঙ্গ মাথায় নিয়ে আমি আগে আগে চললাম, বুদ্ধিচাঁদ আমার পিছনে চললেন। স্টেশন খুব কাছে। সেখানে পেঁছে টিকিট কেনা মাত্র ট্রেন এসে পড়ল। তোরঙ্গটা আমার হাত থেকে নিয়ে বুদ্ধিচাঁদ উঠে পড়লেন, আর আমাকে একটা দশ টাকার নোট দিয়ে বললেন, তোর বকশিশ। তখনই ট্রেন ছাড়ল।

আমি তাড়াতাড়ি কাকার বাসায় ফিরে এলাম এবং নোটের বাণ্ডিল সুদ্ধ ব্যাগটা বালিশের মতন মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুম মোটেই হল না। বুদ্ধিচাঁদের হাসিটা ছিল ছোঁয়াচে সমস্ত রাত জেগে খ্যাক খ্যাক করে হাসতে লাগলাম। আমার একটা তোবড়া টিনের তোরঙ্গ ছিল, তাতেই সর্বস্ব থাকত। সকালে সেই তোরঙ্গে নোটের বাণ্ডিল রেখে বৈজনাথবাবুর বাড়ি গিয়ে তাঁকে অপিসের চাবি দিলাম। বুদ্ধিচাঁদ বহরমপুর গেছেন শুনে তিনি বললেন, বহুত তাজ্জব কি বাত। তখনই তিনি প্রয়াগদাসের কাছে গেলেন।

বেলা দশটা নাগাদ হই হই কাণ্ড। সমস্ত শহরে রটে গেল—বুদ্ধিচাঁদ বিস্তর টাকা নিয়ে পালিয়েছেন, ফার্মের আপিস পুলিসে ফেরাও করেছে, প্রয়াগদাসের দু জন উকিলও সেখানে গেছেন। আমি কাকাকে বললাম, আমার মনিব তো ফেরার, এখানে থেকে কি করব, কলকাতায় গিয়ে কাজের চেষ্টা করি গে। কাকার তখন বুদ্ধি লোপ পেয়েছে, কিছুই বললেন না। আমি আমার টিনের তোরঙ্গ নিয়ে কলকাতায় চলে গেলাম। শুনেছিলাম দু দিন পরে পুলিস আমাকে সাক্ষী তলব করেছিল, কিন্তু আমি তখন নাগালের বাইরে।

এর পরের কথা খুব সংক্ষেপে বলছি। কলকাতায় পৌঁছেই নামটা বদলে ধনঞ্জয় করলাম। যে হোটেলে উঠেছিলাম, দু দিন পরে সেখানেই বাজার সরকারের চাকরি জুটে গেল। তার জন্যে অবশ্য পঞ্চাশ টাকা জমানত দিতে হয়েছিল।

ভোলা বলল, ধনু মামা, আসল কথাই তো আপনি বললেন না। কত টাকা সরিয়েছিলেন?

—এখন পর্যন্ত ঠিক করে গুনতে পারি নি,—খাজাঞ্চীর কাজ তো আমার মনে নেই। এক বার গুনে হল দেড় লাখের কাছাকাছি, আর একবার হল চোদ্দ হাজার কম, আর একবার ত্রিশ হাজার বেশী। ভাবলাম, দুত্তোর, ঠিক করে জেনে কি হবে, টাকা তো ব্যাংকে দিচ্ছি না, আমার কাছেই থাকবে। তারপর রোজগারের চেষ্টায় লেগে গেলাম, সে সব বৈষয়িক কথা তোদের ভাল লাগবে না। একটা বিয়েও করেছিলাম, কিন্তু বউটা টিকল না। আমার এই রুপো বাঁধানো কলি হুঁকোটি সেই বিয়েতেই দান পেয়েছিলাম। পঞ্চাশ বছর ধরে অনেক রকম ব্যবসা করেছি, তেজারতিও করেছি। রোজগার মন্দ হয় নি। আমার বাবুগিরি আর বদখেয়াল ছিল না, তাই পুঁজির টাকা খরচ হয় নি, বরং একটু বেড়েই গেছে। শেষ বয়সে আর রোজগারের ইচ্ছে রইল না, শক্তিও গেছে, তাই কলকাতা ছেড়ে এই নিরিবিলিতে বাস করতে এসেছি। এইবার গীতাখানা একবার পড়ে ফেলতে হবে।

ভোলা বলল, বুদ্ধিচাঁদের কি হল?

—তাঁর নামে হুলিয়া বেরিয়েছিল, শুনেছি তিনি সাধু সেজে হরিদ্বারে ছিলেন, পুলিস সেখানেই তাঁকে ধরে। অনেক দিন মামলা চলল, বুদ্ধিচাঁদ তাঁর জবানবন্দিতে বলেছিলেন—চুরি তো করেছে সেই শয়তান হাব্বু শালা, আমি শুধু বদনামের ভয়ে ভেগেছিলাম। তাঁর কথা কেউ বিশ্বাস করে নি। বুদ্ধিচাঁদের নিশ্চয় জেল হত, কিন্তু তাঁর ভাবীজী তাঁকে বাঁচিয়ে দিলেন। স্ত্রীর অনুরোধে প্রয়াগদাস মকদ্দমা মিটিয়ে ফেললেন শুনেছি বুদ্ধিচাঁদ আসামে গিয়ে কাঠের কারবার ফেঁদেছিলেন।

ভোলা বলল, আচ্ছা ধনু মামা, আপনার অত টাকা কাকে দিয়ে যাবেন?

—তোর মাকে অনেক টাকা দেব, আমার খুব সেবা করছে কিনা। বাকী আমার সঙ্গেই যাবে।

—সেকি! মরে গেলে কেউ টাকা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে নাকি?

—আমি ঠিক পারব, তোরা দেখে নিস।

ধনু মামার কথা শেষ হল। আমি তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে বাড়ি চলে গেলাম।

সাত দিন পরে একজন লোক আমাদের ইস্কুলে খবর দিল, ধনু মামা হঠাৎ মারা গেছেন, ভোলাকে তার মা এখনই বাড়ি যেতে বলেছেন। ছুটি নিয়ে আমিও ভোলার সঙ্গে গেলাম।

ধনু মামাকে উঠনে শোয়ানো হয়েছে। তাঁর মুখ একটু ফাঁক হয়ে আছে, যেন হাসতে হাসতেই মারা গেছেন। পাড়ার জন কতক মেয়ে পুরুষ ভোলার মাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছেন। তিনি চিৎকার করে হাত নেড়ে বলছেন, পাজী হতভাগা নিমকহারাম বুড়ো, এত দিন সেবা যত্ন করলাম আর দিয়ে গেলেন মোটে দু শ! সর্বনেশে কুচুন্ডে জোচ্চোর ছ্যাঁচড়। আমাকে না হয় ফাঁকি দিলি, দান ধ্যানের জন্যও তো রেখে যেতে পারতিস!

ভোলা খোঁজ নিয়ে আমাকে যা জানাল তা এই।—ধনু মামার তোরঙ্গ থেকে দুটো বান্ডিল আর একটা লেখা কাগজ বেরিয়েছে। ছোট বান্ডিলটার উপর লেখা আছে—ভোলার জননী কল্যাণীয়া শ্রীমতী নন্দরানীকে আমার উপার্জিত এই দুই শত টাকা নগদ দান করিলাম; ইহাই যথেষ্ট, স্ত্রীলোকের অধিক লোভ ভাল নহে। বড় বান্ডিলের উপর লেখা আছে—খুলিবে না, ইহা আমার দৈবলব্ধ নিজস্ব ধন, যেমন আছে তেমনি আমার চিতায় দিবে। কাগজটায় লেখা আছে—আমার যে রুপো বাঁধানো ঢাকাই কলি হুঁকা আছে তাহা শ্রীমান ভোলানাথ পাইবে; এবং আমার আঙ্গুলে যে রুপোর গণেশ-মার্কা আংটি আছে তাহা ভোলানাথের বন্ধু শ্রীমান রমেশ্বর পাইবে।

ভোলার মা কিন্তু ধনু মামার অন্তিম ইচ্ছা পালন করেন নি, বড় বান্ডিলটাও খুলে দেখেছেন। তাতে বিস্তর নোট আছে বটে, কিন্তু তার দাম এক পয়সাও নয়, সমস্ত কাঁচি দিয়ে কুচি কুচি করে কাটা! তাঁর দৈবলব্ধ ধনের অপব্যবহার যাতে না হয় ধনুমামা তার পাকা ব্যবস্থা করে গেছেন। ভোলার মা সেই নোটের কুচি ঝেঁটিয়ে ফেলে দিলেন। হুঁকোটি ভোলার ভোগে লাগেনি, তার মা আছড়ে ভেঙে ফেলে রুপোর পাত খুলে নিলেন। কিন্তু আমাকে বঞ্চিত করেন নি, গণেশ-মার্কা রুপোর আংটিটা আমাকে দিয়েছিলেন। ধনু মামার সেই স্মৃতিচিহ্ন আমি সযত্নে রেখেছি।

১৩৬২ (১৯৫৫)

মাঙ্গলিক

সভাপতি বললেন, ওঃ, আমাদের কি অচিন্তনীয় সৌভাগ্য! যে মহাপুরুষ আজ এই মহতী সভায় পদার্পণ করেছেন তাঁর সমুচিত সংবর্ধনা করি এমন সামর্থ্য আমাদের নেই। এঁর মুখের ভাষা আমাদের অবোধ্য। আমাদের বাগযন্ত্র এঁর নাম উচ্চারণ করতে পারে না, আমাদের লেখনীও তা ব্যক্ত করতে পারে না। তবে এই মহান অতিথির কি পরিচয় দেব? শুধু বলতে পারি ইনি মাঙ্গলিক। এদেশে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অমানুষী প্রতিভার বলে ইনি আমাদের বাংলা ভাষা আয়ত্ত করেছেন এবং তাতেই নিজের বাণী দেবেন। এঁর সময় অতি অল্প, আধ ঘণ্টা পরেই স্বলোকে প্রত্যাবর্তন করবেন। আপনারা প্রশ্ন করে বাধা দেবেন না, এঁর শ্রীমুখ থেকে যে সুসমাচার নিঃসৃত হবে তাই ভক্তিভরে শ্রবণ মনন ও হৃদয়ে ধারণ করুন।

সামনের মাইক্রোফোনটা ঠেলে ফেলে দিয়ে সর্বজনীন পুজোর লাউড স্পীকারের মতন কান ফাটা নিনাদে মাঙ্গলিক বলতে লাগলেন।—

ওহে সভাপতি আর উপস্থিত মানুষরা—গোড়াতেই জানিয়ে রাখছি, বাজে কথা আমি বলি না। তোমাদের এই সভাপতি মাননীয় কি না, মহাশয় কি না, তার প্রমাণ নেই, সেজন্য ও সব না বলে শুধু সভাপতি বলেছি। যারা আমার বাণী শুনতে এখানে এসেছে তাদের ভদ্র মহোদয় ও ভদ্র মহিলাগণ বলতেও আমি রাজী নই। তোমাদের মধ্যে কত জন ভদ্র আর কত জন অভদ্র আছে তা আমি জানব কি করে? কোনও প্রাণিজাতির উল্লেখ করতে হলে কেউ ভেড়া-ভেড়ী বা ছাগল-ছাগলী বলে না, শুধু ভেড়া বা ছাগল বললে তৎ তৎ প্রাণীর স্ত্রীপুরুষ দুই-ই বোঝায়। অতএব ভদ্র মহোদয় ও ভদ্র মহিলা না বলে আমি তোমাদের যে শুধু মানুষ বলে সম্বোধন করেছি তাই যথেষ্ট। যাক্, এখন আমার বক্তব্য শোন। তোমাদের অসংখ্য জিজ্ঞাস্য আছে, নানা বিষয় জানবার জন্যে ছটফট করছ, তা আমি বুঝি। কিন্তু আমার সময় অতি অল্প আর তোমাদের বোধশক্তিও অতি ক্ষীণ, সেজন্যে অতি সংক্ষেপে ভাষণ দিচ্ছি।

তোমাদের কৌতূহল কিয়ৎ পরিমাণে নিবৃত্তির জন্যে জানাচ্ছি—আমরা বিশ জন মঙ্গল গ্রহ থেকে এই ভারতের বিভিন্ন স্থানে অবতরণ করেছি। পরে অন্যান্য দেশেও আমরা যাব। আমাদের উদ্দেশ্য—মানবজাতির কিঞ্চিৎ মঙ্গল সাধন। কি করে এসেছি জানতে চাও? উড়ন চাকতিতে চড়ে আসি নি, থালা বা রেকাবিতে চড়েও আসি নি। অতি সোজা উপায়ে ঝুপ করে নেমেছি, উল্কাপাত যেমন করে হয়। পতনের দারুণ বেগ কি করে সয়েছি, তোমাদের স্থূল বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে যাই নি কেন—এ সব জানতে চেয়ো না, জটিল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব

তোমরা বুঝতে পারবে না। আমাকে যেমন দেখছ আমার আসল মূর্তি তেমন নয়, উপস্থিত প্রয়োজনে এই পৃথিবীর উপযুক্ত দেহ ও বেশ ধারণ করেছি। আর একটা কথা তোমাদের হৃদয়ঙ্গম করা দরকার। তোমাদের অর্থাৎ মানবজাতির এখন শৈশবদশা চলছে, কিন্তু মঙ্গলগ্রহবাসী আমরা অত্যন্ত প্রবীণ ও পরিপক্ক। আমাদের তুলনায় তোমরা নিরতিশয় অপোগণ্ড, বিদ্যাবুদ্ধিতে দশ কোটি বৎসর পিছিয়ে আছ। অতএব আমি যে সদুপদেশ দিচ্ছি তা নিয়ে তর্ক করো না, নির্বিচারে মেনে নাও, তাতেই তোমাদের মঙ্গল হবে।

আগে তোমাদের বহিরঙ্গ অর্থাৎ দেহ বেশ চাল-চালন ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু বলছি তার পর অন্তরঙ্গ অর্থাৎ পলিটিক্সের আলোচনা করব। মানুষ জাতির দেহের গড়ন মন্দ নয়, তবে কদাচারের ফলে তোমরা তা কুৎসিত করে ফেলেছ। কেউ দেদার লুচি মণ্ডা মাংস ঘি দুধ খেয়ে মোটা থপথপে হয়েছ, কেউ হরদম চা সিগারেট পান দোক্তা প্রভৃতি বিষ খেয়ে চেহারাটি পাকাটে করে ফেলেছ। বোকামি আর অত্যাচারের ফলে কেউ কেউ ব্যাধিগ্রস্ত হয়েছ। তোমাদের পরিচ্ছন্নতার অত্যন্ত অভাব দেখছি। জীবাণুতত্ত্ব তোমরা একটু আধটু জান, তবু গতানুগতিক ফ্যাশনের বশে নিজের শরীর আর গৃহকে ব্যাকটিরিয়ার ভাণ্ডার বানিয়েছ। এখানে অনেকের গোঁফ দেখছি, কয়েক জনের দাড়িও দেখছি। দশ-বারো জন টেকো মানুষ ছাড়া আর সকলের মাথায় চুলও দেখছি। আর মেয়েদের মাথায় তো চুলের জঙ্গল। ছি ছি ছি! এও কি জান না যে গোঁফ দাড়ি আর চুল হচ্ছে জীবাণুর আড়ত? তোমাদের স্বাস্থ্যবিশারদগণ অতি অকর্মণ্য, তাই এই কদর্য প্রথা তুলে দেবার কোন চেষ্টা করেন নি। কামিয়ে ফেল, স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সবাই নেড়া হও আর গোঁফ দাড়ি উৎপাটন করে ফেল। আমার শিরস্ত্রাণ দেখছ তো, পাতলা টাইটেনিয়ম ধাতুর তৈরী। এতে চুলের কাজ হয় অথচ ময়লা জমে না। এরকম জিনিস যদি এদেশে দুর্লভ হয় তবে এ্যালুমিনিয়মের টুপি পর। মেয়েরা যদি তাদের সেকেলে ফ্যাশন বজায় রাখতে চায় তবে টুপির পেছনে খোঁপার মতন একটা ঘটি জুড়ে দিতে পারে। ইচ্ছা হলে তাতে বেল ফুলের মালা জড়ানো চলবে। কিন্তু স্ত্রী আর পুরুষের আলাদা সাজের দরকারই হবে না, সে কথা পরে বলছি। তোমাদের বাড়িতে যেসব কম্বল রগ কার্পেট শতরঞ্চি আর পরদা আছে, নির্মম হয়ে পুড়িয়ে ফেল। যাতে ধুলো আর ব্যাকটিরিয়া জমতে পারে এমন জিনিস রেখো না।

তোমরা অনেকে গলদ্ঘর্ম হচ্ছ তা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই গুমট গরমে কোন আক্কেলে জামা কাপড় পরে আছ? শিশু আর পশুর মতন সরল হও, সব টান মেরে খুলে ফেলে দাও, সর্বাঙ্গে হাওয়া লাগুক। এই গরম দেশে বৎসরে ন মাস ধুতি পঞ্জাবি প্যান্ট শার্ট শাড়ি ব্লাউজ একেবারেই অনাবশ্যক, স্বচ্ছন্দে দিগম্বর হয়ে থাকতে পার। শুধু মাথায় একটা পাতলা ধাতুর টুপি আর পায়ে এক জোড়া জুতো, এ ছাড়া কিছুই পরবে না। তবে হাঁ, কাঁধ থেকে ফিতে দিয়ে একটা ঝুলি ঝোলাতে পার, তাতে টাকাকড়ি নোটবুক, পেনসিল কলম রুমাল ইত্যাদি থাকবে। আরশি পাউডার মুখে আর গায়ে লাগাবার রংও তাতে রাখতে পার। অবশ্য শীতের সময় সবাই উপযুক্ত জামা কাপড় পরবে রবার বা প্লাসটিকের। ইওরোপ আমেরিকার মেয়েদের তবু একটু বুদ্ধি আছে, তারা ক্রমশ দিগম্বরী হচ্ছে। কিন্তু ওখানকার পুরুষরা বড় বোকা আর লাজুক, অনর্থক কাপড়ের বোঝা বয়ে বেড়ায়। তোমরা ভাবছ আমি নিজের শরীর আগাগোড়া ঢেকে রেখেছি কেন। ভুল বুঝেছ

অঙ্গের অঙ্গে যা দেখছ তা বস্ত্র নয়, এই পৃথিবীর ভীষণ অভিকর্ষের চাপে পাছে আমার হালকা শরীরটি চেপটে যায় এবং এখানকার অত্যধিক অক্সিজেন পাছে বুকের মধ্যে ঢুকে পড়ে তাই বর্ম ধারণ করেছি। এই বর্মের অভ্যন্তরে আমি সদ্যোজাত শিশুর মতন নেংটা।

তোমাদের এই পৃথিবীতে পুরুষের তুলনায় নারীর অবস্থা বড় মন্দ দেখছি। ভোট আর জীবিকার ক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার পেলেও স্ত্রীজাতির সুবিধা হবে না। গহনা আর শৌখিন বস্ত্রে ওদের ভুলিয়ে রাখলেও ন্যায়বিচার হবে না। ওদের দুর্দশার কারণ প্রাকৃতিক। মানুষ জাতির স্ত্রীরা গর্ভধারণ করে কিন্তু পুরুষরা করে না, প্রকৃতির এই পক্ষপাতের ফলে স্ত্রীজাতি পূর্ণভাবে আত্মনির্ভর হতে পারে না, পুরুষ কিংবা রাষ্ট্রের অনুগ্রহ না পেলে তাদের চলে না। কুমারী থাকলে অথবা গর্ভরোধ করলে অবস্থার উন্নতি হবে না। প্রাণী মাত্রেই সন্তান চায়, এই স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা দমন করা অন্যায়। একমাত্র উপায়—স্ত্রী আর পুরুষের ভেদ লোপ করা, অর্থাৎ স্ত্রী যেমন মাঝে মাঝে গর্ভবতী হয় পুরুষও তেমনি মাঝে মাঝে গর্ভবান হবে। স্ত্রী আর পুরুষ দুরকম মানুষ থাকাই অন্যায়। যেমন শামুক প্রভৃতি কয়েক প্রকার প্রাণী তেমনি আমরা মাঙ্গলিকরা উভয়লিঙ্গ হার্মা-ফ্রোডাইট, প্রত্যেকেই অর্ধনারী অর্ধপুরুষ। আমাদের স্বামী-স্ত্রী ভেদ নেই। কিন্তু দম্পতি আছে, সন্তানের প্রয়োজন হলে দম্পতির দুজনেই পালা করে গর্ভধারণ করে। মানুষেরও সেই ব্যবস্থা দরকার। তোমাদের কেন্দ্রীয় সংসদে পুংস্ত্রীসমীকরণের জন্যে একটা আইন পাস করিয়ে নাও, তার পর যা করবার আমরা করব। মাঙ্গলিক শরীরবিজ্ঞানীরা অনায়াসে তোমাদের দেহের অদলবদল করে দিতে পারবেন এবং এক বার করে দিলে বংশানুক্রমে তা বজায় থাকবে।

এখন পলিটিক্স সম্বন্ধে দু-চারটে কথা বলছি। এই পৃথিবীতে রাষ্ট্রচালনার দু রকম রীতি আছে দেখছি। একটি হচ্ছে স্বৈরতন্ত্র অর্থাৎ এক জন বা এক দল ধূর্ত লোক সমস্ত ক্ষমতা হস্তগত করে রাখে, তাদের শাসন আর সবাই ভেড়ার পালের মতন মেনে নেয়। অন্য রীতি হচ্ছে লোকতন্ত্র, অর্থাৎ জনসাধারণ যাদের নির্বাচন করে তারাই রাষ্ট্র চালায়। কিন্তু নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে বিস্তর অকর্মণ্য আর দুশ্চরিত্র লোক থাকে। দেশের অধিকাংশ লোক যদি সাধু বুদ্ধিমান হত তবে লোকতন্ত্রে মোটামুটি কাজ চলত। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি এখনও অত্যন্ত কাঁচা তার চরিত্রেও বিস্তর গলদ আছে। এমন অবস্থায় স্বৈরতন্ত্র আর লোকতন্ত্র দুটোই তোমাদের পক্ষে অনিষ্টকর। তোমরা মনে কর, স্বাধীনতা পেয়েছ। ছাই পেয়েছ। আসল স্বাধীনতা লাভের উপায় বলছি শোন।

তোমাদের মধ্যে ক জন এয়ারোপ্লেন জাহাজ রেলগাড়ি বা গরুর গাড়ি চালাতে পার? রাষ্ট্রচালনা কি তার চাইতে সহজ মনে কর? সবাই মিলে দেশ শাসন করবে এ দুর্বুদ্ধি ত্যাগ কর। আনাড়ী লোকের তা সাধ্য নয়। হয়তো লক্ষ বৎসর পরে মানুষ জাতি লায়েক হবে, কিন্তু তত দিন তোমাদের হিতকামী গুরু বা অভিভাবক দরকার। আমরা মাঙ্গলিকরা সেই গুরু দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত আছি। তোমাদের নানা রাজনীতিক দল আছে, ও সবে যোগ দিও না। নতুন দল তৈরি কর—ইন্ডো-মার্স বা ভারত-মঙ্গল পার্টি আগামী ইলেকশনে তোমরা প্রতিনিধি খাড়া করবে, আমরা সর্বতোভাবে তোমাদের সাহায্য করব। সমস্ত আসনই তোমরা দখল করতে পারবে তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। তারপর প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সভায় একমাত্র

দল হয়ে ঢুকে পড়, আমাদের হাতে শাসনের ভার ছেড়ে দাও। তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুবে, খাবে দাবে ফুর্তি করবে, কবিতা আর গল্প লিখবে, গান শুনবে, হরেক রকম নাচ দেখবে, আর রাষ্ট্রচালনার সমস্ত ঝক্কি আমরা নেব। শুধু ভারত নয়, সমস্ত পৃথিবীতেই এই ব্যবস্থা চালাতে হবে। মানুষ আর মাঙ্গলিকের এই নিবিড় সম্পর্ক ঘটলেই তোমরা বুঝতে পারবে—আমাদের যা মতামত তোমাদেরও তাই, আমরা যা ভাল মনে করি তাই তোমাদের পক্ষে ভাল। আসল স্বাধীনতা আর ডিমোক্রাসি একেই বলে। অ্যাটম আর হাইড্রোজেন বোমার ভয় খাচ্ছ? ও সব ছেলে-ভুলনো জুজু আমরা গ্রাহ্য করি না, সমস্ত ফুঁয়ে উড়িয়ে দেব, বদমাশ গুন্ডা-দের ঝাড়ে বংশে সাবাড় করব।

আজ এই পর্যন্ত। আর একদিন এসে সব কথা তোমাদের ভাল করে বুঝিয়ে দেব। সভাভঙ্গের আগে সবাই সমস্বরে আওয়াজ তোল—স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক, লোকতন্ত্র জাহান্নমে যাক, ইয়ে আজাদী ঝুটা হৈ, হমারা দাদা মাঙ্গলিক, ভারত-মঙ্গল জিন্দাবাদ!

১৩৬২ (১৯৫৫)

নিধিরামের নির্বন্ধ

নিধিরাম সরকার ভেবে ভেবেই মারা গেলেন। তাঁর শারীরিক ব্যাধি বা আর্থিক অভাব ছিল না, সাংসারিক শোক তাপও তিনি পান নি, তবু দুর্ভাবনায় তাঁর জীবনান্ত হল।

নিধিরাম সচ্চরিত্র বুদ্ধিমান দেশহিতৈষী লোক, কিন্তু অত্যন্ত খুঁতখুঁতে। তাঁর মনে নিরন্তর সংশয় উঠত—সুরেন বাঁড়ুজ্যে না বিপিন পাল, বেঙ্গলী না ইংলিশম্যান—কার উপদেশ ভাল? গান্ধীজী না দেশবন্ধু, নেতাজী না পণ্ডিতজী—কার মতে চলা উচিত? কংগ্রেস, হিন্দুমহাসভা, কমিউনিস্ট আর সমাজতন্ত্রীদল কোনওটাই তাঁর পছন্দ হয় নি। দেশের হিতার্থে তিনি বক্তৃতা দেন নি, ছেলে খেপান নি, ডাকাতি করেন নি, সুতো কাটেন নি, জেলে যান নি, শুধু মনে মনে মঙ্গলের পথ খুঁজেছেন। অবশেষে নৈরাশ্য আর চিন্তাবিষে জর্জর হয়ে দেহত্যাগ করলেন। তাঁর এক শাস্ত্রজ্ঞ বন্ধু বললেন, মরবেই তো, সংশয়াত্মা বিনশ্যতি। আর এক ইঙ্গবঙ্গ বন্ধু বললেন, কেয়ার কিল্‌ড এ ক্যাট।

নিধিরাম পরলোকে এলে বিধাতা তাঁকে বললেন, বৎস, তুমি সন্দেহাকুল কর্ম-বিমুখ হলেও তোমার চরিত্রটি প্রায় নিষ্পাপ ছিল, তাই এই আনন্দলোকে এসেছ। কি আনন্দ ভোগ করতে চাও তা বল।

নিধিরাম উত্তর দিলেন, ভগবান, আনন্দ চাই না। পৃথিবী অধঃপাতে যাচ্ছে, যাতে রক্ষা পায় তাই করুন।

বিধাতা বললেন, তুমি দেখছি মরে গিয়েও ভববন্ধনে জড়িয়ে আছ। ওহে নিধিরাম, পৃথিবী নেই, তোমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়েছে। শুধু আমি আছি, এবং আমিই তুমি।

—প্রভু, সলিপ্‌সিজম্‌ আর অদ্বৈতবাদ আমার বুদ্ধির অগম্য। আমি মরে গেলেও জগৎ থাকবে না কেন? সমস্ত পৃথিবীর ভাল যদি নাও করেন তবে অন্তত ভারতের যাতে ভাল হয় তাই করুন।

—ভালই তো চিরকাল করে আসছি।

—তার লক্ষণ তো কিছুই দেখছি না, যা করে থাকেন তা শুধু লীলাখেলা।

—ও, আমার লীলাখেলা তোমার পছন্দ নয়, তোমার ফরমাশী খেলা চাও? 'নিত্য তুমি খেল যাহা, নিত্য ভাল নহে তাহা, আমি যে খেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে।'—এই তোমার আবদার? বেশ, তোমার দেশের কিরকম ভাল চাও তাই বল।

—মানুষ ভাল না হলে দেশের ভাল হবে না। আপনি দেশের অন্তত সিকি লোককে ভাল করে দিন, তারাই বাকী সবাইকে শোধরাতে পারবে।

—আচ্ছা, চৈতন্য মহাপ্রভু আর রামকৃষ্ণ পরমহংসকে ভাল লোক মনে কর তো?

কপালে যুক্তকর ঠেকিয়ে নিধিরাম বললেন, ওঁরা অবতার কি না জানি না, তবে মহাপুরুষ তাতে সন্দেহ নেই।

—ভারতের সিকি লোক মানে ন কোটি। যদি ন কোটি ভারতবাসী শ্রীচৈতন্য বা শ্রীরামকৃষ্ণের তুল্য হয়ে যায় তা হলে তোমার মনস্কাম পূর্ণ হবে তো?

মাথা চুলকে নিধিরাম বললেন, ভগবান, ও'রা যে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। দেশের চার আনা লোক যদি বিরাগী ভক্ত হয়ে যায় আর বাকী বারো আনা তাদের অনুসরণ করে তবে সংসার যে ছারখারে যাবে। আমাদের দরকার কর্মী বুদ্ধিমান জনহিতৈষী সংসারী সৎপুরুষ। ত্যাগী ভক্ত সন্ন্যাসী গুটিকতক হলেই চলবে।

—উত্তম কথা। রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি ছিলেন না, তুমি যে সব গুণ চাচ্ছ তাও তাঁর প্রচুর ছিল। যদি ভারতের ন কোটি লোক রবীন্দ্রনাথের তুল্য হয়ে যায় তা হলে খুশী হবে তো?

নিধিরাম আবার নমস্কার করে বললেন, প্রভু, পাঁচ শ বৎসরে যদি একটি রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হয় তাতেই দেশ ধন্য হবে। কিন্তু যদি বিস্তর আসেন তবে আদি রবীন্দ্রনাথের মাহাত্ম্য যে খর্ব হবে, তাঁকে হয়তো খুঁজেই পাওয়া যাবে না।

—আচ্ছা, যদি ন কোটি মহাত্মা গান্ধীর মতন কর্মী জনহিতৈষীর আগমন হয়?

—একই আপত্তি প্রভু। মহাত্মা গান্ধীকেও সস্তা করতে চাই না। আমাদের দেশ অসাধু অকর্মণ্য চোর ঘুষখোর বজ্জাত লোকে ভরে গেছে, তাদের পরিবর্তে দরকার সচ্চরিত্র সাধারণ কাজের মানুষ। লোকোত্তর পুরুষ খুব কম হলেই চলবে।

—বুঝেছি, লোকোত্তর পুরুষের ইনফ্লেশন চাও না। আচ্ছা, যদি দেশের সিকি লোক জওহরলালের মতন হয়ে যায় তা হলে চলবে তো?

একটু ভেবে নিধিরাম বললেন, নেহেরুজী জ্ঞানী কর্মী দূরদর্শী জনহিতৈষী সৎপুরুষ তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের সমস্ত মন্ত্রী আর সরকারী অপিসের কর্তারা যদি তাঁর মতন হয়ে যায় তা হলে দেশের অশেষ মঙ্গল হবে। কিন্তু সে রকম ন কোটি লোকের কাজই দেশে নেই, তাঁদের দিয়ে তো মোটা কাজ করানো চলবে না।

—আচ্ছা যদি ন কোটি উদ্‌যোগী কর্মবীর ধনপতির আবির্ভাব হয় তা হলে তোমার আশা মিটবে?

—আপনি পরিহাস করছেন প্রভু। ন কোটি ব্যবসাদার কর্মবীরের স্থান কোথায়? কার ধন নিয়ে তাঁরা ধনপতি হবেন? অরণ্যের চার আনা পশু যদি বাঘ হয় আর বাকী বারো আনা যদি হরিণ হয় তবে আগে হরিণরা লোপ পাবে তার পর বাঘরা না খেয়ে মরবে। আমার নিবেদনটি শুনুন। ন কোটি মুক্তাত্মা সন্ন্যাসী, বা ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, বা রাজনীতিজ্ঞ সুশাসক হলে চলবে না। আর ন কোটি ব্যবসায়ী তো উপদ্রব স্বরূপ। নানারকম সাধারণ সচ্চরিত্র কর্মীরই দরকার—চাষী কারিগর শিল্পী বাস্তুকার যন্ত্রী বিজ্ঞানী শিক্ষক বিচারক পরিচালক কেরানী ইত্যাদি। তা ছাড়া অল্প গুটিকতক কলাবিৎ অর্থাৎ লিখিয়ে আঁকিয়ে গাইয়ে বাজিয়ে নাচিয়েও চাই। লোকোত্তর পুরুষ কোটিতে এক-আধটি হলেই ঢের।

—তুমি যে রকম চাচ্ছ সেরকম কাজের লোক তো দেশে আছেই।

—কিন্তু তাদের মধ্যে যে বিস্তর মূর্খ আর দুর্বৃত্ত লোক আছে, তারাই মঙ্গল হতে দিচ্ছে না।

—ওহে নিধিরাম, ব্যস্ত হয়ো না। তোমার দেশে যত মূর্খ আর দুর্বৃত্ত আছে তারা খেয়োখেয়ি মারামারি করে আপনিই ধ্বংস হয়ে যাবে, তার পর কালক্রমে সুবুদ্ধি সৎপুরুষের আবির্ভাব হবে।

—তবেই হয়েছে। আপনি অনন্তকাল এক্সপেরিমেণ্ট করতে পারেন, কিন্তু দেশের লোকের অত ধৈর্য নেই, তারা নানা দলে বিভক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাল মন্দ উপায় খুঁজছে। আপনি ইচ্ছা করলেই তাদের সুপথে চালাতে পারেন।

—আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা নেই। সৃষ্টি স্থিতি আর লয় ঘড়ির কাঁটার মতন যথানিয়মে হচ্ছে, জাগতিক ব্যাপারে আমি হস্তক্ষেপ করি না।

—ভগবান, বেশী কিছু তো চাচ্ছি না, লোকে যাতে অসংযমী উচ্ছৃঙ্খল আর সমাজ-দ্রোহী না হয় সেই ব্যবস্থা করুন।

—দেখ নিধিরাম, সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থার উদ্দেশ্যে তোমার দেশে চাতুর্বর্ণ্য স্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু এখন তার পরিণাম কি হয়েছে দেখছ তো? তুমি যে রকম চাচ্ছ তা পাবে ইতর প্রাণীর মধ্যে, তারা কখনও স্বজাতির ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয় না। কিন্তু মানুষ চিরকালই মতলবে চলে।

—প্রভু, যদি একজন জবরদস্ত অবতার পাঠিয়ে দেন তবে তিনি তো অবলীলা-ক্রমে সাধুদের পরিত্রাণ দুষ্কৃতদের বিনাশ আর ধর্মসংস্থাপন করতে পারবেন।

—তুমি কি মনে কর সিভিলিয়ানদের মতন একদল অবতার আমি পুষে রেখেছি আর তোমাদের দরকার হলেই পাঠাব? মানুষ মাত্রেই অবতার, কেউ কম কেউ বেশী। জনসমাজের অল্পাধিক মঙ্গল যে করতে পারে সেই অবতার। তোমারও সেই শক্তি আছে। যদি ইচ্ছা কর তুমি আবার জন্মগ্রহণ করে তোমার জাতভাইদের উদ্ধারের চেষ্টা করতে পার।

—আমার কতটুকু ক্ষমতা প্রভু? আমার কথা শুনবেই বা কে?

—বুড়োরা না শুনুক, তারা আর কদিনই বা বাঁচবে। ছেলেরা শুনতে পারে, তারা এখনও ঝানু হয়ে যায় নি।

—হা ভগবান, আপনি দেখছি কোনও খবরই রাখেন না!

—শোনো নিধিরাম। ছেলেরা বুড়োদের কথা না শুনুক, সমবয়সীদের কথা শুনতে পারে। তুমি পৃথিবীতে ফিরে যাও, জাতিস্মর না হলেও তোমার সদিচ্ছার সংস্কার থাকবে। বালক কিশোর আর যুবকদের তুমি সুমন্ত্রণা দিও।

—আমি একটি মন্ত্রণাই জানি—আগে বিনয় ও শিক্ষা তার পর কর্মপথ।

—বেশ তো, ওই মন্ত্রণাই দিও।

—আমার কথায় কেউ যদি কান না দেয়?

—তোমার চাইতে যাঁরা ঢের বড় অবতার তাঁদের কথাও সকলে শোনে নি। তুমি যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রো, তাতেই তোমার জন্ম সার্থক হবে। এক বারে কিছু করতে না পারলে বার বার অবতরণ ক'রো। যদি অনন্তকালেও কিছু করতে না পার তা হলেও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষতি হবে না।

১৩৬২ (১৯৫৫)

স্মৃতিকথা

নয়নচাঁদ পাইনের ঘড়ির দোকান আছে, নানারকম শখও আছে। তিনি শাস্ত্র পড়েন, পাখোয়াজ বাজান, মাছ ধরেন, সাহিত্যের খবরও রাখেন। প্রবীণ লোক, পাড়ার সকলেই খাতির করে। সকালবেলা আমার কাছে এসে বললেন, এই নাও তোমার ঘড়ি। হেয়ারস্প্রিং বদলে দিয়েছি, পনরো টাকা দিও, তুমি পাড়ার ছেলে, অয়েলিংএর চার্জ আর তোমার কাছে নেব না।

টাকা নিয়ে নয়নচাঁদ বললেন, ও কি লেখা হচ্ছে?

উত্তর দিলুম, একটা স্মৃতিকথা লিখছি।

—বেশ বেশ, গল্পের চাইতে ঢের ভাল। কিন্তু বেশী মিছে কথা লিখো না, যা রয় সয় তাই লিখবে। কলেরা থেকে উঠেই ফুটবল ম্যাচ খেলেছ, দেশের জন্যে দশ বছর জেল খেটেছ, তিনটে মেয়ে তোমাকে প্রেমপত্র লিখেছিল, রবীন্দ্রনাথ নিজের হাতে তোমার পিঠ চাপড়েছিলেন, এসব লিখতে যেয়ো না। আর একটি কাজ তোমাদের করা উচিত, কিছু লেখবার আগে এক্সপার্ট ওপিনিয়ন নেবে, ডাক্তার উকিল প্রফেসর ব্যবসাদার এইসব লোকের। তা হলে আর মারাত্মক ভুল করে বসবে না।

পাইন মশায়ের উপদেশ মনে লাগল। যা লেখবার আগেই স্থির করে ফেলেছি, তবে বিশেষজ্ঞদের মত এখনও নেওয়া যেতে পারে।

প্রথমেই গেলুম ডাক্তার নির্মল মুখুজ্যের কাছে। তিনি বললেন, কি খবর, কোমরের বেদনাটা আবার বেড়েছে নাকি?

—না না, ওসব কিছু নয়। আচ্ছা ডাক্তার, আমি যদি কোনও লোকের দুই কাঁধে হাত দিয়ে খুব চাপ দিই তা হলে তার শিরদাঁড়া ভাঙতে পারে?

—কতখানি চাপ?

—এই ধর দু-আড়াই মন।

অর্থাৎ এক শ কিলোগ্রামেরও কম। তাতে লোকটা কাবু হতে পারে, স্ক্যাপিউলা ফ্র্যাকচার হতে পারে, কিন্তু তিন-চার মন চাপের কমে শিরদাঁড়া ভাঙবে মনে হয় না। ও কাজ করতে যেয়ো না, ফৌজদারিতে পড়বে।

ডাক্তারকে থ্যাংক্স দিয়ে উকিল নগেন সেনের কাছে গেলুম। তিনি বললেন, ওহে, আমার একটা বিল এখনও শোধ কর নি, টাকাটা কালকের মধ্যে পাঠিয়ে দিও।

—যে আজ্ঞে। একটা কথা জানতে এসেছি।—একটি মেয়ে যদি জুলুম ক'রে একজন পুরুষকে বিবাহে রাজী করায় এবং পুরুষটি পরে অস্বীকার করে, তা হলে ব্রীচ অভ প্রমিস মকদ্দমা চলতে পারে?

—যদি প্রমাণ হয় যে জবরদস্তির ফলে পুরুষটি রাজী হয়েছিল তা হলে কেস টিকবে না।

—আচ্ছা, যদি প্রমাণ হয় যে জবরদস্তির পরেও পুরুষটি খোশ-মেজাজে মেয়েটিকে প্রিয়ে বলেছিল?

—তাই বলেছিলে নাকি হে? আচ্ছা বোকা তুমি। নাঃ, তা হলে আর নিস্তার নেই। তোমার এ কুবুদ্ধি হল কেন?

—আজ্ঞে আমি নই। আচ্ছা, চললুম, নমস্কার।

তার পর গেলুম দাশু মল্লিকের কাছে। লোকটি বিখ্যাত মাতাল, তবে মেজাজ ভাল। আমাকে দেখেই বললেন, আরে তোমাকেই খুঁজছিলুম, একটা দরকারী কথা জানতে চাই। তুমি তো কেমিস্ট্রি পড়েছিলে?

—সে বহুকাল আগে, এখন সব ভুলে গেছি

—একটু তো মনে আছে, তাতেই কাজ চলবে। দেখ ভাই, বড়ই মুশকিলে পড়েছি, কান্ট্রি আমার সয় না, অথচ বিলিতী একবারে আগুন, শুনছি সবরকম মদই বন্ধ করা হবে, যত সব গো মুখ্খু আইন তৈরী করছে। আচ্ছা, মিষ্টি জিনিস গেঁজে উঠলেই তো মদ হয়?

—তা হয়। কিন্তু বাড়িতে ওসব করতে যাবেন না, ফ্যাসাদে পড়বেন।

—আরে না না। আমি একটা মতলব ঠাউরেছি, আবকারির বাবার সাধ্য নেই যে ধরে। মনে কর আমি এক পো চিনি কিংবা গুড় খেলুম, সেই সঙ্গে একটু ঈস্ট বা পাঁউরুটিওয়ালাদের খামি খেলুম। তাতে পেটের মধ্যে বুঁদি কেটে স্পিরিট হবে না?

—আজ্ঞে না, আপনার পেটটি তো ভাঁটি নয়। গেঁজে ওঠবার আগেই হজম হয়ে যাবে, না হয় প্রস্রাবের সঙ্গে বেরুবে।

—তবেই তো মুশকিল। যাক তোমার কি দরকার বল।

—আচ্ছা মল্লিক মশায়, যদি মদ খাওয়ার অভ্যাস না থাকে তবে কতটা খেলে নেশা হবে?

—বেশ বেশ, ওদিকে তোমার মতি হয়েছে জেনে খুশী হলুম। ট্রাই করেই দেখ না, এক আউন্স রম বা জিন থেকে শুরু করতে পার।

—আজ্ঞে আমি নই, আমার স্মৃতিকথার একটি লোককে খাওয়াতে চাই।

—আরে দূর দূর। তা আউন্স চারেক খাওয়াতে পার, গল্পের নেশায় তো দাম লাগবে না।

দাশু মল্লিককে নমস্কার করে বিদায় নিলুম। এখনও অনেক এক্সপার্ট বাকী, দার্শনিক, মনোবিজ্ঞানী, প্রত্নবিশারদ, পুরাণজ্ঞ, আরও কত কি। অত অভিমত নেবার সময় নেই, একটু না হয় ভুলই হবে। এখন স্মৃতিকথা আরম্ভ করা যাক।—

রাজনন্দিনী পুষ্কলা বললেন, পিসীমা, এই দেখ দু শ খিলি পান সেজেছি। মুক্তোপোড়া চুন, কেরল দেশের কেয়াখয়ের, ঘিএ ভাজা সুপুরি আর তুমি যেসব মসলা ভালবাস—এলাচ লবঙ্গ দারচিনি জাফরান কর্পূর হিং রশুন বিটনুন ইত্যাদি তেত্রিশ রকম সব দিয়েছি। তোমার পানের বাটা ভরতি হয়ে গেছে। এইবারে স্মৃতিকথা বলতে হবে কিন্তু।

রাজভগিনী শূর্পনখা খুশী হয়ে বললেন, লক্ষ্মী মেয়ে তুই। আশীর্বাদ করি রূপে গুণে নিখুঁত একটি বরের সঙ্গে তোর বিয়ে হয়ে যাক, তা হলেই আমরা নিশ্চিন্ত হই।

—বর এখন থাকুক, তুমি স্মৃতিকথা বল।

—সে সব দুঃখের কাহিনী শুনে কি হবে? ওঃ, অযোধ্যার সেই বজ্জাতদের কথা মনে পড়লেই আমার মাথা বিগড়ে যায়, দাঁত কিড়মিড় করে, রক্ত টগবগিয়ে ফোটে, শোক উথলে ওঠে।

—তা হ'ক, তুমি বল।

বিকাল বেলা দোতলার বারান্দায় বাঘের চামড়ার উপর বসে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে শূর্পনখা সমুদ্রবায়ু সেবন করছিলেন, পুষ্কলা পানের বাটা এনে তাঁর পাশে বসলেন।

রাবণবধের পর দু বৎসর কেটে গেছে। বিভীষণ রাজা হয়েই লঙ্কার প্রাসাদ মন্দির উপবন প্রভৃতি মেরামত করিয়েছেন। হনুমান যে ভীষণ ক্ষতি করেছিলেন তার চিহ্ন এখন বেশী দেখা যায় না। বিভীষণ তাঁর ছোটবোনকে একটি আলাদা মহল দিয়েছেন, শূর্পনখা তাঁর চেড়ীদের সঙ্গে সেখানে বাস করেন। বিভীষণ আর সরমার উপর মনে মনে প্রচণ্ড আক্রোশ থাকলেও তাঁদের কিশোরী কন্যা পুষ্কলাকে তিনি স্নেহ করেন।

রাক্ষস ছলৎকারু খুব ভাল কারিগর, যুদ্ধের সময় ইন্দ্রজিতের আজ্ঞায় সে মায়াসীতা গড়েছিল। ইন্দ্রজিৎ তাঁর রথের উপরে সেই মূর্তি কেটে ফেলে হনুমানকে উদ্‌ভ্রান্ত করেছিলেন। শূর্পনখা এখন যে সুন্দরী কাঠের নাসাকর্ণ ধারণ করেন তাও ওই ছলৎকারুর রচনা। দেখতে প্রায় স্বাভাবিক, সহজে ধরা যায় না, কিন্তু শূর্পনখার কথার নাকী সুর দূর হয় নি।

পঁচিশ খিলি পান একসঙ্গে মুখগহ্বরে নিক্ষেপ করে শূর্পনখা তাঁর স্মৃতিকথা বলতে লাগলেন।—জানিস কলা, লঙ্কার এই রাজবংশ যেমন মহান তেমনি বিপুল। আমাদের মাতামহ ছিলেন প্রবল-প্রতাপ সুমালী, বিষ্ণুর সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গিয়ে তিনি লঙ্কা ত্যাগ করে রসাতলে আশ্রয় নেন। তখন যক্ষদের রাজা কুবের লঙ্কা অধিকার করল। সুমালীর কন্যা কৈকসী (যাঁর অন্য নাম নিকষা) মহামুনি বিশ্রবার ঔরসে তিন পুত্র আর এক কন্যা লাভ করেন। বড় ছেলে রাবণ, মেজো কুম্ভকর্ণ, ছোট তোর বাপ বিভীষণ, আর তাঁদের ছোট আমি। বিশ্রবার প্রথম পক্ষে এক ছেলে ছিল, সেই হল কুবের। রাবণ ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠলেন, তখন বিশ্রবা মুনির উপদেশে কুবের লঙ্কা ছেড়ে হিমালয়ের ওপারে পালিয়ে গেল, লঙ্কা আবার আমাদের দখলে এল।

পুষ্কলা বললেন, ওসব ইতিহাস তো আমার জানা আছে, তুমি নিজের কথা বল। তোমার একবার বিয়ে হয়েছিল না?

আরও পঁচিশ খিলি পান মুখে পুরে শূর্পনখা বললেন, বিয়ে তো একবার হয়েছিল। দানবরাজ বিদ্যুজ্জিহ্ব আমার স্বামী ছিলেন, অতি সুপুরুষ আর আমার খুব বাধ্য। কিন্তু বড়দার তো কাণ্ডজ্ঞান ছিল না, কালকেয় দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময় নিজের ভগিনীপতিকেই মেরে ফেললেন। আমি চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে লঙ্কেশ্বরকে যাচ্ছেতাই গালাগালি দিলুম। তিনি বললেন, চেঁচাস নি বোন, একটা স্বামী মরেছে তো হয়েছে কি? যুদ্ধের সময় আমি প্রমত্ত হয়ে শরক্ষেপণ করি, তোর স্বামীকে চিনতে না পেরে বধ করে ফেলেছি। যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন শোক সংবরণ কর, তোর জন্যে আমি ভাল ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমাদের মাসতুতো ভাই খর চোদ্দ হাজার সৈন্য নিয়ে দণ্ডকারণ্যে যাচ্ছে, তুইও তার সঙ্গে সেখানে যা। খর তোর সমস্ত আজ্ঞা পালন করবে। দণ্ডকারণ্য খাসা জায়গা,

বিস্তর ঋষি সেখানে তপস্যা করেন, অনেক ক্ষত্রিয় রাজাও মৃগয়া করতে যান। সেখানে তুই আনায়াসে আর একটি স্বামী জুটিয়ে নিতে পারবি।

খর-দাদার সঙ্গে দণ্ডকারণ্যে গেলুম। সত্যিই ভাল জায়গা, বিশেষ করে জনস্থান অঞ্চল, সেখানে আমরা বসতি করলুম। কিন্তু বড়দার সব কথা সত্যি নয়, ক্ষত্রিয় সেখানে কেউ আসত না, ঋষিও খুব কম, রাক্ষসের ভয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে তপস্যা করত। তবে খাবার জিনিসের অভাব নেই, বিস্তর আম কাঁঠাল কলা নারকেল, মধুও প্রচুর, নানা জাতের হরিণও পাওয়া যায়।

পুষ্কলা প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা পিসীমা, তুমি ঋষি খেয়েছ ?

মুখে আবার পঁচিশ খিলি পান পুরে শূর্পণখা বললেন, আমাদের বাপ মহামুনি বিশ্রবা ঋষি-খাওয়া পছন্দ করতেন না। ছোটলোক রাক্ষসরা নরমাংস ভালবাসে, কিন্তু আমরা রাজবংশের মেয়েপুরুষ বড় একটা খেতুম না। তবে কোনও মানুষের উপর বেশী চটে গেলে তাকে ভক্ষণ করতুম আর পুজো-পার্বণে নিকুম্ভিলা দেবীস্থানে নরবলি দিয়ে সেই পবিত্র মাংস খেতুম। আমি বার পাঁচেক ঋষি খেয়েছি, ছিবড়ে বড় বেশী, কিন্তু ক্ষত্রিয় রাজা আর রাজপুত্রদের মাংস ভাল, কচি পাঁঠার মতন। সে সব দিন আর নেই রে পুষ্কলা, তোর বাপের কি যে মতিচ্ছন্ন হল, সব বন্ধ করে দিয়েছে। তারপর শোন—দণ্ডকারণ্যে বেশ ফুর্তিতেই ছিলুম, কিন্তু দিন কতক পরে বড় ফাঁকা ফাঁকা ঠেকতে লাগল, মনটা উদাস হয়ে পড়ল। বড় ঘরানার দানব বা রাক্ষস সে অঞ্চলে কেউ নেই, অগত্যা ঋষির সন্ধান করতে লাগলুম। বেশীর ভাগই বুড়ো হাবড়া, মাথায় জটা, এক মুখ দাড়িগোঁফ, তাদের সঙ্গে প্রেম হতে পারে না।

দণ্ডকারণ্যে আমার একটি সঙ্গিনী জুটেছিল, জম্ভলা রাক্ষসী, গোদাবরীতীরে থাকত। সে আমাকে বলল, সখী, তুমি ভেবো না, আমি একটি সুন্দর তরুণ ঋষি যোগাড় করে দেব। জম্ভলা খুব চালাক আর কাজের মেয়ে, চারদিকে ঘুরে সন্ধান নিতে লাগল। তার পর একদিন বলল, চমৎকার একটি ছোকরা ঋষি পেয়েছি দিদিরানী, আমাকে মুক্তোর হার বকশিশ দিতে হবে কিন্তু। জম্ভলা যে খবর দিল তাতে জানলুম, মুদ্‌গল নামে একটি সুন্দর তরুণ ঋষি সম্প্রতি জনস্থানে এসেছেন, গোদাবরী নদীর ধারে কুটীর বানিয়ে তপস্যা করছেন। সেই দিনই বিকেলে তাঁকে দেখতে গেলুম।

পুষ্কলা প্রশ্ন করলেন, খুব সেজেগুজে গিয়েছিলে তো ?

আরও পঁচিশ খিলি পান মুখে পুরে শূর্পণখা বললেন, তা আর তোকে বলতে হবে না। চোখে কাজল, কপালে তেলাপোকার টীপ, গালের রং যেন দুধে-আলতা, ঠোঁটে পাকা তেলাকুচো, খোঁপায় শিমুল ফুল, কানে ঝুমকো-জবা, গলায় সাতনরী মুক্তোর মালা, পরনে নীল শাড়ি, বুকে সোনালী কাঁচুলি, আর এক গা গহনা। দেখলে পুরুষের মুণ্ডু ঘুরে যায়। মুদ্‌গল ঋষির আশ্রমে যখন পৌঁছলুম তখন তিনি বেদপাঠ করছিলেন। তাঁকে দেখেই মুগ্ধ হয়ে গেলুম, আমার আগেকার স্বামীর চাইতে ঢের ভাল দেখতে। আমি ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে তিনি বললেন, ভদ্রে, তুমি কে ? কি প্রয়োজনে এসেছ ? আমি উত্তর দিলুম, তপোধন, আমি রাজকন্যা শুক্তিনখা—

পুষ্কলা বললেন, ও নাম আবার কোথা থেকে পেলে ?

—আসল নামটা ভদ্রলোকের কাছে বলতে ইচ্ছে হল না। বাবা বিশ্রবার যেমন বুদ্ধি, তাই একটা বিশ্রী নাম রেখেছেন। শূর্পনখা—কিনা ঝিনুকের মতন যার নখ। তার পর আমি বললুম, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আমি কাছেই থাকি। তিন মাস ধরে বিভীতক ব্রত পালন করছি, অহোরাত্রে শুধু একটি বিভীতক ফল অর্থাৎ বয়ড়া আহার করি। কাল আমার ব্রতের পারণ হবে, সেজন্যে একটি ব্রাহ্মণভোজন করাতে চাই। আপনি কৃপা করে কাল মধ্যাহ্নে এই দাসীর কুটীরে পদধূলি দেবেন।

—আচ্ছা পিসীমা, সেই কচি ঋষিটিকে দেখে তোমার নোলা সপসাপিয়ে উঠল না?

—তুই কিছুই বুঝিস না। যার প্রতি অনুরাগ হয় তাকে উদরসাৎ করা চলে না। মানুষটাকে যদি খেয়েই ফেলি তবে প্রেমের আর রইল কি? তার পর শোন। —মুদ্গল ঋষি বললেন, সুন্দরী, তোমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলুম, কাল মধ্যাহ্নে তোমার ওখানেই ভোজন করব।

পরদিন মুদ্গল এলে তাঁকে খুব খাওয়ালুম, নানা রকম ফল, মৃগমাংস আর পায়সান্ন। তাঁর ভোজন শেষ হলে বললুম, তপোধন, এক ঘটি এই মাধ্বীক পান করে দেখুন, অতি স্নিগ্ধ পানীয়, বনজাত পুষ্প থেকে মধুকর যে মধু আহরণ করে তাই দিয়ে আমি নিজে এই মাধ্বীক তৈরি করেছি। মুদ্গল বললেন, খেলে মত্ততা আসবে না তো? বললুম, না না, মাদক দ্রব্য কি আপনাকে দিতে পারি? খেলে মন প্রফুল্ল হবে, একটু পুলক আসবে। আপনি নির্ভয়ে পান করুন।

মুদ্গল চেখে চেখে সবটা খেলেন। বললেন, হুঁ, খুব ভালই তৈরি করেছ, বেশ ঝাঁজ। আর আছে? বললুম, আছে বইকি। মুদ্গল চোঁ চোঁ করে আর এক ঘটি খেলেন, তার পর আরও পাঁচ ঘটি। দেখলুম তাঁর চোখ বেশ ড্যাবডেবে হয়েছে, নাকের ডগায় গোলাপী রং ধরেছে, ঠোঁটে একটু বোকা-বোকা হাসি ফুটেছে, হাত একটু কাঁপছে। এইবারে এঁকে বলা যায়।

বললুম, মুনিবর, আপনাকে দেখে আমি মোহিত হয়েছি, আপনিই আমার প্রাণেশ্বর। আমাকে গন্ধর্ব মতে বিবাহ করুন।

মুদ্গল কিন্তু তখনও বাগে আসেন নি। বললেন, সুন্দরী, তোমার কুল শীল কিছুই জানি না, পাণিগ্রহণ করব কি করে? তা ছাড়া শাস্ত্রে বলে, স্ত্রীজাতি স্বাতন্ত্র্যের যোগ্য নয়। তুমি অবলা নারী, পিতা-মাতার অধীন, তাঁরাই তোমাকে পাত্রস্থ করবেন।

আমি বললুম, আমার পিতা-মাতা না থাকারই মধ্যে তাঁরা আমার খোঁজ নেন না। আমার আসল পরিচয় শুনুন, আমি হচ্ছি লঙ্কেশ্বর রাবণের ভগিনী।

চমকে উঠে ঋষি বললেন, অ্যাঁ, তুমিই শূর্পনখা? যতই রূপবতী হও রাক্ষসীকে আমি বিবাহ করতে পারি না। শুনেছি শূর্পনখা অতি ভয়ংকরী, নিশ্চয় তুমি মায়ারূপ ধারণ করে এসেছ।

আমি বললুম, ওহে মুদ্গল, রূপ তো নিতান্তই বাহ্য। আমি যদি মায়াবলে আমার বাহ্য রূপ বর্ধিত করি তাতে অন্যায়টা কি? তোমার ভয় নেই, এই মনোহর রূপেই আমি সর্বদা তোমাকে দর্শন দেব, কেবল রাত্রিতে শয়নকালে রূপসজ্জা বর্জন করব, নইলে আমার ঘুম হবে না। প্রদীপ নিবিয়ে অন্ধকারে আমি তোমার পাশে শোব।

—তোমাকে বিশ্বাস কি? যদি রাত্রিতে তোমার ক্ষুধার উদ্রেক হয় তবে হয়তো আমাকে ভক্ষণ করে ফেলবে।

—ভয় নেই, যাকে তাকে আমি খাই না, আর পতি তো নিতান্ত অভক্ষ্য। শোন মুদ্গল, আমাকে বিবাহ করলে অতুল ঐশ্বর্য পাবে, দশানন রাবণ, যাঁর ভয়ে ত্রিভুবন কম্পমান, মহাকায় মহাবল কুম্ভকর্ণ, আর সুবুদ্ধি ধর্মপ্রাণ বিভীষণ—এই তিনজনকে শ্যালকরূপে পেয়ে ধন্য হবে।

মুদ্গল ঋষি দেখতে বোকার মতন হলেও অত্যন্ত একগুঁয়ে, কিছুতেই বশে এলেন না। আমার রাগ হল, বললুম, আমাকে অবলা ললনা ঠাউরেছ, নয়? দেখ আমার বল।

মুদ্গলের দুই কাঁধে হাত দিয়ে চেপে বললুম, লাগছে?

—ছাড় ছাড়।

—এই এক মন চাপ দিলুম, লাগছে?

—উঃ, ছাড় ছাড়।

—এই দু মন চাপ দিলুম, বিয়ে করতে রাজী আছ?

মুদ্গল যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠলেন, মাধ্বীক যা খেয়েছিলেন মুখ দিয়ে সব হড়হড় করে বেরিয়ে গেল। আমি বললুম, এই তিন মন চাপ দিলুম, আর একটু দিলেই তোমার মেরুদণ্ড মচকে ভেঙে যাবে। বল, প্রাণেশ্বর হতে রাজী আছ?

আর্তনাদ করে মুদ্গল বললেন, আছি আছি।

—আকাশে দিবাকর, আমার চতুর্দিকে এই চেড়ীবৃন্দ, আর সম্মুখে ওই উচ্ছিষ্ট-লোভী কুকুর, সবাই সাক্ষী রইল, আবার বল, রাজী আছ?

—ওরে বাপ রে! আছি আছি। রাক্ষসী, তুমিই আমার প্রাণেশ্বরী।

তখন হাত তুলে নিয়ে আমি বললুম, আজই রাত্রির প্রথম লগ্নে বিবাহ।

কাতর হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে মুদ্গল বললেন, প্রিয়ে, একটি দিন অপেক্ষা কর, আমার গায়ের ব্যথা মরুক, পিঠ সোজা হক। কাল আমার গুরুদেব মহর্ষি কুলথ আসবেন, তাঁর অনুমতি আর আশীর্বাদ নিয়ে তোমাকে পত্নীত্বে বরণ করব।

আমি বললুম, বেশ, তাই হবে। কিন্তু খবরদার, যদি সত্যভ্রষ্ট হও তবে আমার জঠরে যাবে, সেখান থেকে সোজা নরকে।

একদিন পরে মুদ্গলের আশ্রমে গিয়ে দেখলুম, তার গুরু মহর্ষি কুলথ এসেছেন। আমি প্রণিপাত করলে তিনি প্রসন্ন হাস্য করে বললেন, রাক্ষসনন্দিনী, তোমাদের প্রণয়ব্যাপার শুনে আমি অতীব প্রীত হয়েছি। আশীর্বাদ করি, তোমাদের দাম্পত্যজীবন মধুময় হক। দেখি তোমার হাতখানা।

আমার কররেখা অনেকক্ষণ ধরে দেখে কুলথ বললেন, হুঁ, ভালই দেখছি, তোমার ভাগ্যে অদ্বিতীয় রূপবান পতিলাভ আছে। তা আমার এই শিষ্যটি কিঞ্চিৎ খর্বকায় আর দুর্বল হলেও রূপবান বটে।

আমি বললুম, ভগবান, ওই রূপেই আমি তুষ্ট। আপনি শিষ্যের কররেখা দেখেছেন?

মহর্ষি বললেন, দেখেছি বইকি। এক অদ্বিতীয়া সুন্দরীকে মুদ্গল পত্নীরূপে লাভ করবে।

হৃষ্ট হয়ে আমি বললুম, মহর্ষি, আপনার গণনা একেবারে নির্ভুল, রূপের জন্য আমি লঙ্কাশ্রী উপাধি পেয়েছি। সমগ্র জম্বুদ্বীপেও আমার তুল্য সুন্দরী পাবেন না।

কুলথ বললেন, তাই নাকি? তবে তোমাকে আমি জম্বুশ্রী উপাধি দিলুম। কিন্তু রাক্ষসনন্দিনী, তোমার কিঞ্চিৎ ন্যূনতা আছে। সম্প্রতি দশরথপুত্র রাম-লক্ষ্মণ

বনবাসে এসেছেন, নিকটেই পঞ্চবটীতে কুটীর নির্মাণ করে বাস করছেন। রামের ভার্যা জনকতনয়া সীতাও তাঁদের সঙ্গে আছেন। তিনি তোমার চাইতে একটু বেশী সুন্দরী।

আমি রেগে গিয়ে বললুম, আমার চাইতে সুন্দরী এই তল্লাটে কেউ থাকবে না, সীতাকে আমি ভক্ষণ করে ফেলব। তার কাছে নিয়ে চলুন আমাকে।

মহর্ষি বললেন, তোমার সংকল্প অতি সাধু। এস আমার সঙ্গে।

কুলথ আর মুদ্গলের সঙ্গে তখনই পঞ্চবটীতে গেলুম। একটু দূরে বনের আড়ালে লুকিয়ে থেকে দেখলুম, কুটীরের দাওয়ায় বসে সীতা তরকারি কুটছে। পুরুষ জাতটাই অন্ধ, বলে কিনা আমার চাইতে সুন্দরী! বড়দা পর্যন্ত সীতার জন্যে খেপেছিলেন। তার পর দেখলুম, দূর্বাদলশ্যাম ধনুর্ধর এক যুবা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করল, তার পিছনে আর একটি যুবা এক ঝুড়ি ফল মাথায় করে নিয়ে এল। বুঝলুম এরাই রাম-লক্ষ্মণ।

পুষ্কলা বললেন, দেখেই তোমার মুণ্ডু ঘুরে গেল তো?

—ওঃ কি রূপ, কি রূপ! মানুষ অত সুন্দর হয় আমার জানা ছিল না। নিমেষের মধ্যে আমার মনোরথ বদলে গেল। কুলথকে বললুম, মহর্ষি, আমি ওই সীতাকে এখনই ভক্ষণ করছি, কিন্তু আপনার শিষ্য মুদ্গলকে আমার আর প্রয়োজন নেই, অদ্বিতীয় রূপবান ওই রামই আমার বিধিনির্দিষ্ট পতি, ওঁকেই আমি বরণ করব, ওঁর কাছে আপনার শিষ্য মর্কট মাত্র।

মহর্ষি বললেন, ছি রাক্ষসী, ও কথা বলতে নেই, তুমি যে বাগ্দত্তা।

উত্তর দিলুম, কথা আমি দিই নি, আপনার শিষ্যই দিয়েছিল, তাও স্বেচ্ছায় নয়, তিন মন চাপে কাবু হয়ে প্রাণেশ্বরী বলেছিল। ওকে আমি মুক্তি দিলুম। আমি এখনই রামের সঙ্গে মিলিত হব, আপনারা এখানে থেকে কি করবেন, চলে যান।

আমার কথা শেষ হতে না হতে মুদ্গলের হাত ধরে মহর্ষি কুলথ বেগে প্রস্থান করলেন।

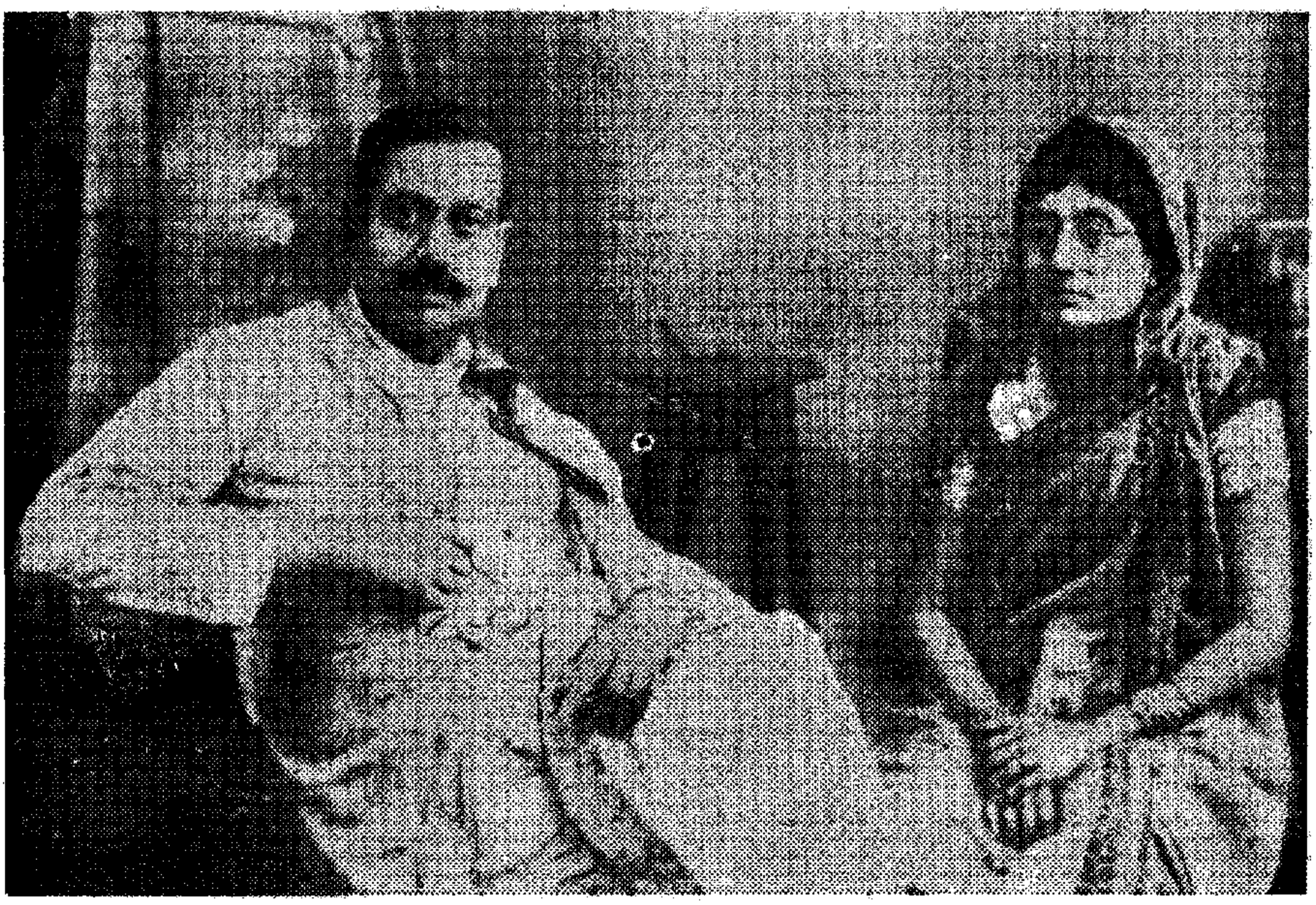
শূর্পনখা অন্যমনস্ক হলেন দেখে পুষ্কলা বললেন, থামলে কেন পিসীমা, তার পর কি হল?

—ন্যাকামি করিস নি, কি হল তুই জানিস না নাকি?

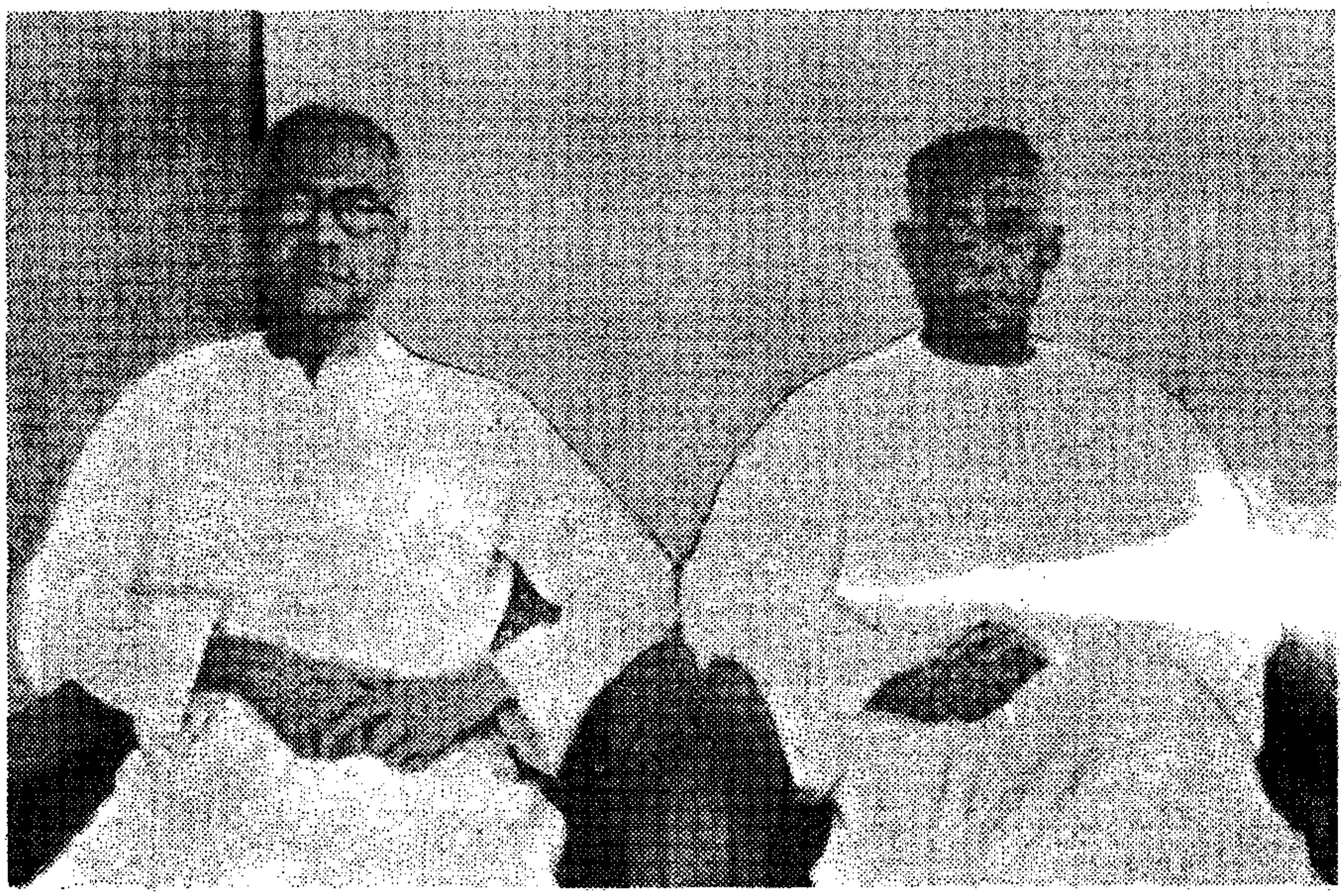
হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে শূর্পনখা চিৎকার করে উঠলেন—ওরে রেমো সর্বনেশে, কি করলি রে! তার পর ছটফট করে হাত পা ছুঁড়তে লাগলেন, তাঁর কাঠের নাক-কান খসে পড়ল, মুখ দিয়ে ফেনা বেরুতে লাগল, দাঁত কিড়মিড় করতে লাগল, চোখ কপালে উঠল।

পুষ্কলা চেঁচিয়ে বললেন, এই চেড়ীরা, শিগ্গির আয়, পিসীমা ভিরমি গেছেন। মুখে জলের ছিটে দে, জোরে বাতাস কর, লংকা পুড়িয়ে নাকের ফুটোয় ধোঁয়া দে।

১৩৬২ (১৯৫৫)



সস্ত্রীক



পরশুরাম

নারদ
(যতীন্দ্র কুমার সেন)

আনন্দীবাঈ ইত্যাদি গল্প

আনন্দীবাঈ

বহু কারবারের মালিক ত্রিক্রমদাস করোড়ী তাঁর দিল্লির অফিসের খাস কামরায় বসে চেক সহি করছেন। আরদালী এসে একটা কার্ড দিল—এম. জুলফিকার খাঁ। ত্রিক্রমদাস বললেন, একটু সবুর করতে বল।

কিছুক্ষণ পরে সহি করা চেকের গোছা নিয়ে কেরানী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ত্রিক্রমদাস ঘণ্টা বাজিয়ে আরদালীকে ডেকে কার্ডখানা দিয়ে বললেন, আসতে বল।

জুলফিকার খাঁ এসে বললেন, আদাব আরজ। শেঠজী, আমি ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ থেকে আসছি।

উদ্বিগ্ন হয়ে শেঠজী প্রশ্ন করলেন, ইনকমট্যাক্স নিয়ে আবার কিছু গড়বড় হয়েছে নাকি?

—তা আমার মালুম নেই। আমার ডিপার্টমেণ্টে আপনার নামে একটা সিরিয়স চার্জ এসেছে।

—কেন, আমার কসুর কি?

—আপনি তিনটি শাদি করেছেন।

একটু হেসে ত্রিক্রম বললেন, য়হ বাত? যদি করেই থাকি তাতে আমার কসুর কি? আমি তো হিন্দু, সৈকড়োঁ শাদি করতে পারি, আপনাদের মতন চারটি বিবিতে আটকে থাকবার দরকার নেই।

খাঁ সাহেব হাত নেড়ে বললেন, হায় হায় শেঠজী, আপনি রুপয়াই কামাতে জানেন, মুলুকের খবর রাখেন না। হিন্দু বৌদ্ধ জৈন আর শিখ একটির বেশি শাদি করতে পারবে না—এই আইন সম্প্রতি চালু হয়ে গেছে তা জানেন না?

—বলেন কি! আমি নানা ধান্দায় ব্যস্ত, সব খবর রাখবার ফুরসত নেই। নতুন ট্যাক্স কি বসল, নতুন লাইসেন্স কি নিতে হবে, এই সবেরই খোঁজ রাখি। কিন্তু আপনার খবরে বিশ্বাস হচ্ছে না, আমার ফুফা (পিসে) হরচন্দজী দুই জরু নিয়ে বহুত মজে মে আছেন, তাঁর নামে তো চার্জ আসে নি।

—আইন চালু হবার আগে থেকেই তো তাঁর দুই জরু আছে, তাতে দোষ হয় না। কিন্তু আপনি হালে তিন শাদি করেছেন, তার জন্যে কড়া সাজা হবে, দশ বৎসর জেল আর বিস্তর টাকা জরিমানা হতে পারে।

শেঠজী ভয় পেয়ে বললেন, বড়ী মুশকিল কি বাত, এখন এর উপায় কি?

—দেখুন শেঠজী, আপনি মান্যগণ্য আমীর আদমী, আপনাকে মুশকিলে ফেলতে আমরা চাই না। এক মাস সময় দিচ্ছি, এর মধ্যে একটা বন্দোবস্ত করে ফেলুন।

—কত টাকা লাগবে?

—আপনি একটি জরুকে বহাল রেখে আর দুটিকে ঝটপট খারিজ করুন। তার জন্যে কত খেসারত দিতে হবে তা তো আমি বলতে পারি না, উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করবেন। আর এদিকে কত টাকা লাগবে সে তো আপনার আর আমার মধ্যে, তার কথা পরে হবে।

মাথা চাপড়ে ত্রিক্রমদাস বললেন, হো রামজী, হো পরমাত্মা, বাঁচাও আমাকে। একটিকে সনাতনী মতে বিবাহ করেছি, আর একটিকে আর্যসমাজী মতে, আর একটির সঙ্গে সিভিল ম্যারিজ হয়েছে। খারিজ করব কি করে?

—ঘবড়াবেন না শেঠজী, আপনার টাকার কমি কি? দু-চার লাখ খরচ করলে সব মিটে যাবে। দুটি স্ত্রীকে মোটা খেসারত দিয়ে কবুল করিয়ে নিন যে তারা আপনার অসলী জরু নয়, শুধু মুহব্বতী পিয়ারী। তার পর আমরা ব্যাপারটা চাপা দিয়ে দেব। দেরি করবেন না, এখনই কোনও ভাল উকিল লাগান। আচ্ছা, আজ আমি উঠি, হপ্তা বাদ আবার দেখা করব। আদাব।

ত্রিক্রমদাসের বয়স পঞ্চাশের কিছু বেশী। তাঁর বৈবাহিক ইতিহাস অতি বিচিত্র। দু বৎসর আগে তাঁর একমাত্র পত্নী কয়েকটি ছেলেমেয়ে রেখে মারা যান। তার কয়েক মাস পরে তিনি আনন্দীবাঈকে বিবাহ করেন। তার পর সম্প্রতি তিনি আরও দুটি বিবাহ করেছেন কিন্তু তার খবর আত্মীয়-বন্ধুদের জানান নি। এখনকার পত্নীদের প্রথমা আনন্দীবাঈ হচ্ছেন খজৌলি স্টেটের ভূতপূর্ব দেওয়ান হরজীবনলালের একমাত্র সন্তান, বহু ধনের অধিকারিণী। হরজীবন মারা গেলে তাঁর এক দূর সম্পর্কের ভাই অভিভাবক হয়ে ভাইঝিকে ফাঁকি দেবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু মেয়ের মামাদের সাহায্যে ত্রিক্রমদাস আনন্দীকে বিবাহ করে তাঁর সম্পত্তি নিজের দখলে আনলেন। আনন্দীবাঈএর বয়স আন্দাজ পঁচিশ, দেখতে ভাল নয়; একটু ঝগড়াটে, উচ্চবংশের অহংকারও আছে।

ত্রিক্রমদাসের ব্যবসার কেন্দ্র আর হেড অফিস দিল্লিতে, তা ছাড়া বোম্বাই আর কলকাতায় তাঁর যে ব্রাঞ্চ অফিস আছে তাও ছোট নয়। তিনি বৎসরে তিন-চার বার ওই দুই শাখা পরিদর্শন করেন। আনন্দীর সঙ্গে বিবাহের কিছুকাল পরে তিনি বোম্বাই যান। সেখানকার ম্যানেজার কিষনরাম খোবানী একদিন তাঁর মনিবকে নিমন্ত্রণ করে নিজের বাসায় নিয়ে গেলেন। তিনি সিন্ধের লোক, দেশ ত্যাগের পর দিল্লি চলে আসেন, তার পর শেঠজীর ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার হয়ে বোম্বাইএ বাস করছেন। কিষনরাম শৌখিন লোক, তাঁর ফ্ল্যাট বেশ সাজানো। তিনি তাঁর স্ত্রী আর শালীর সঙ্গে নিজের মনিবের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

শেঠজী সেকেলে লোক, আধুনিক মহিলাদের সঙ্গে তাঁর মেশবার সুযোগ এ পর্যন্ত হয় নি। কিষনরামের শালী রাজহংসী ঝলকানীকে দেখে তিনি মোহিত হয়ে গেলেন। কি ফরসা রং, কি সুন্দর সাজ! পরনে ফিকে নীল সালোয়ার আর ঘোর নীল কামিজ, তার উপর চুমকি বসানো ফিকে সবুজ দোপাট্টা ঝলমল করছে। কথা-বার্তা অতি মধুর, কোনও জড়তা নেই, হেসে হেসে এটা খান ওটা খান বলে অনুরোধ করছে।

খাওয়া শেষ হল। কিষনরামকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে শেঠজী রাজহংসী ঝলকানীর সব খবর জেনে নিলেন। মেয়েটির বাপ মা নেই। একমাত্র ভাই সিংগাপুরে ভাল ব্যবসা করে, কিন্তু বোনের কোনও খবর নেয় না, অগত্যা কিষনরাম তাঁর শালীকে নিজের কাছে রেখেছেন। সে ভাল অভিনয় করতে পারে গাইতে পারে, সিনেমায় নামবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু কিষনরাম ও তাঁর স্ত্রীর মত নেই।

শেঠজী তখনই মতি স্থির করে বললেন, আমার সঙ্গে রাজহংসীর বিবাহ দাও,

ওকে আমি খুব সুখে রাখব। এই বোম্বাই শহরেই আমার জন্যে জলদি একটা বাড়ি কিনে ফেল, রাজহংসী সেখানে থাকবে, আমিও বৎসরের বেশীর ভাগ বোম্বাইএ বাস করব। এখানকার কারবার ফালাও করতে চাই।

আনন্দীবাঈ-এর কথা শেঠজী চেপে গেলেন। কিষনরাম জানতেন যে তাঁর মালিক বিপত্নীক, সুতরাং তিনি খুশী হয়ে সম্মতি দিলেন। রাজহংসীও রাজী হলেন, শেঠজীর বেশী বয়সের জন্যে কিছুমাত্র আপত্তি প্রকাশ করলেন না। আর্যসমাজী পদ্ধতিতে বিবাহ হয়ে গেল। তার পর নূতন বাড়িও কেনা হল, রাজহংসী সেখানে বাস করতে লাগলেন।

কিছুদিন পরে ত্রিক্রমদাস তাঁর কলকাতার কারবার পরিদর্শন করতে গেলেন। ওখানকার ম্যানেজার পরিতোষ হোড়-চৌধুরী খুব কাজের লোক, আলিপুরে সাহেবী স্টাইলে থাকেন। তিনি তাঁর মনিবকে ডিনারের নিমন্ত্রণ করে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সেখানে পরিতোষের স্ত্রী আর ভগ্নীর সঙ্গে ত্রিক্রমদাসের পরিচয় হল। মিস বলাকা হোড়-চৌধুরীকে দেখে শেঠজী অবাক হয়ে গেলেন। রাজহংসীর মতন রূপসী নয় বটে, কিন্তু শাড়ি পরবার ভঙ্গীটি কি চমৎকার, আর বাত-চিত আদব কায়দাও কি সুন্দর! মেমসাহেবদের মতন ইংরেজী উচ্চারণ করে, আর হিন্দী বলতে ভুল করে বটে কিন্তু সেই ভুল কি মিষ্টি! শেঠজী একেবারে কাবু হয়ে পড়লেন। পরিতোষ হোড়-চৌধুরী তাঁকে জানালেন, বলাকা এম. এ. পাস, নাচ-গানে কলকাতায় ওর জুড়ী নেই, সিনেমাওয়ালারা ওকে পাবার জন্যে সাধাসাধি করছে. কিন্তু পরিতোষের তাতে মত নেই। ত্রিক্রমদাস নিজেকে সামলাতে পারলেন না, বলে ফেললেন, মিস বলাকা, মৈ তুমকো শাদি করুংগা।

বলাকা সহাস্যে উত্তর দিলেন. তা বেশ তো, কিন্তু দিল্লির গরম তো আমার সইবে না, আর আপনাদের দাল-রোটি ভাজী দহিবড়া আমার হজম হবে না।

শেঠজী বললেন. আরে দিল্লি যেতে তোমাকে কে বলছে? আমি এই আলিপুরে একটা মোকাম কিনব, তুমি সেখানে তোমার দাদার কাছাকাছি বাস করবে। আমি বছরের আট-ন মাস এখানেই কাটাব, কলকাতার কারবার ফালাও করতে চাই। তোমাকে দাল-রোটি খেতে হবে না, মচ্ছি-ভাতই খেয়ো। মচ্ছি খেতে আমিও নারাজ নই, কিন্তু বড় বদবু লাগে।

বলাকা বললেন, আমি গোলাপী আতর দিয়ে ইলিশ মাছ রেঁধে আপনাকে খাওয়াব, মনে হবে যেন কালাকন্দ খাচ্ছেন।

বলাকা তাঁর দাদার কাছে শুনেছিলেন যে শেঠজী বিপত্নীক। তিনি তখনই বিবাহে রাজী হলেন। কুড়ি দিন পরে সিভিল ম্যারিজ হয়ে গেল।

ত্রিক্রমদাস পালা করে দিল্লি থেকে বোম্বাই আর কলকাতা যেতে লাগলেন, তাঁর দাম্পত্যের ত্রিধারায় কোনও ব্যাঘাত ঘটল না, পরমানন্দে দিন কাটতে লাগল। তার পর অকস্মাৎ একদিন জুলফিকার খাঁ দুঃসংবাদ দিয়ে শেঠজীর শান্তিভঙ্গ করলেন।

উকিল খজনচাঁদ বি. এ., এল-এল. বি. ত্রিক্রমদাসের অনুগত বিশ্বস্ত বন্ধু, ইনকমট্যাক্সের হিসাব দাখিলের সময় তাঁর সাহায্য না নিলে চলে না। শেঠজী সেই দিনই সন্ধ্যার সময় খজনচাঁদের কাছে গিয়ে নিজের বিপদের কথা জানালেন।

খজনচাঁদ বললেন, শেঠজী, আপনি নিতান্ত ছেলেমানুষের মতন কাজ করেছেন। আমাকে আপনি বিশ্বাস করেন, কিন্তু ওই মুম্বইবালী আর কলকাত্তাবালীকে কথা দেবার আগে একবার আমাকে জানালেন না, এ বড়ই আফসোস কি বাত।

শেঠজী হাত জোড় করে বললেন, মাফ কর ভাই. বুড়ো বয়সে একটা স্ত্রী থাকতে আরও দুটো বিয়ে করবার লোভ হয়েছে এ কথা লজ্জায় তোমাকে বলি নি। এখন উদ্ধারের উপায় বাতলাও।

কিছুক্ষণ ভেবে খজনচাঁদ বললেন, আনন্দীবাঈকে কিছু বলবার দরকার নেই. শুনলে উনি দুঃখ পাবেন, কান্নাকাটি করবেন। আর দুজনকে একে একে আপনি সব কথা খুলে বলুন। ও'রা হচ্ছেন মডার্ন গার্ল. আত্মমর্যাদাবোধ খুব বেশী। আপনার কুকর্ম জানলে রেগে আগুন হবেন, আপনার মুখ দেখতে চাইবেন না। তাতে আমাদের সুবিধাই হবে, মোটা খেসারত দিলে আর আপনার দুই ম্যানেজারকে কিছু খাওয়ালে সব মিটে যাবে। দু-চার লাখ খরচ হতে পারে, কিন্তু আপনার তা গায়ে লাগবে না।

এই পরামর্শ ত্রিক্রমদাসের পছন্দ হল না। তিনি বললেন, খজন-ভাই তুমি আমার প্রাণের কথা বুঝতে পারছ না। আমি বিজনেস বাড়াতে চাই, তার জন্যে নামজাদা লোকের সঙ্গে মেশা দরকার। আমি যদি মন্ত্রী আর বড় বড় অফিসারদের পার্টি দিই তবে আমার বাড়ির কোন্ লেডী অতিথিদের আপ্যায়িত করবে? আনন্দী? রাম কহো। রাজহংসী আর বলাকা হচ্ছে এই কাজের কাবিল। বাতিল করতে হলে আনন্দীকেই করতে হবে. তাতে আমার কলিজা ফেটে যাবে. অনেক টাকার সম্পত্তিও ছাড়তে হবে. কিন্তু তার জন্যে আমি প্রস্তুত আছি। মুশকিল হচ্ছে—রাজহংসী আর বলাকার মধ্যে কাকে রাখব কাকে ছাড়ব তা স্থির করা বড় শক্ত. তবে আমার বেশী পছন্দ কলকাত্তাবালী বলাকা দেবী। ওকে যদি নিতান্ত না রাখতে পারি তবে ওই মুম্বইবালী রাজহংসী। টাকার জন্যে ভেবো না, দশ-পনর লাখ তক খরচ করতে আমি তৈয়ার আছি।

খজনচাঁদ অনেক বোঝালেন যে আনন্দীবাঈ তাঁর আইনসম্মত স্ত্রী, তাঁর দাবী সকলের উপরে। তাঁকে ত্যাগ করতে হলে অনেক জুয়াচুরির দরকার হবে. তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি ছেড়ে দিতে হবে. তার ফলে মোট লোকসান খুব বেশী হবে. আনন্দীবাঈ-এর সেই বদমাশ কাকার শরণাপন্ন হতে হবে। কিন্তু ত্রিক্রমদাস কিছুতেই তাঁর সংকল্প ছাড়লেন না। অগত্যা খজনচাঁদ বললেন, বেশ, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আপনি দেরি না করে তিনজনকেই সব কথা খুলে বলুন। ও'দের মনের ভাব দেখে আমি যা করবার করব।

কালবিলম্ব না করে ত্রিক্রমদাস এয়ারোপ্লেনে বোম্বাই গেলেন এবং সোজা রাজহংসীর বাড়িতে উপস্থিত হলেন। রাজহংসী তাঁর ড্রইংরুমে বসে একটি সুবেশ যুবকের সঙ্গে গল্প করছিলেন। আশ্চর্য হয়ে বললেন, আরে শেঠজী, হঠাৎ এলে যে! কোনও খবর দাও নি কেন? এ'কে তুমি চেন না, ইনি হচ্ছেন মিস্টার ঝুমকমল মটকানী, দূর সম্পর্কে আমার ফুফেরা (পিসতুতো) ভাই হন, হিসাবের কাজে ওস্তাদ। এখানকার অফিসের অ্যাকাউন্টেন্ট তো বুড়ো হয়েছে, তাকে বিদায় করে এই ঝুমক-মলকে সেই পোস্টে বসাও।

ত্রিক্রমদাস বললেন, আমি ভেবে দেখব। রাজহংসী, তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরী কথা আছে।

ঝুমকমল চলে গেলে ত্রিক্রমদাস ভয়ে ভয়ে তাঁর তিন বিবাহের কথা প্রকাশ করলেন। কিন্তু তার রিঅ্যাকশন যা হল তা একেবারে অপ্রত্যাশিত। রাজহংসী হেসে গড়িয়ে পড়ে বললেন, বাহবা শেঠজী, তুমি দেখছি বহুত রঙ্গীলা আদমী! তোমার আরও দুই জরু আছে তাতে হয়েছে কি, আমি ওসব গ্রাহ্য করি না, তুমি নিশ্চিন্ত থাক সব ঠিক হৈ। তবে কথাটা যেন জানাজানি না হয়।...হ্যাঁ, ভাল কথা, এই বাড়িটা জলদি আমার নামে রেজিস্টারি করা দরকার, মিউনিসিপ্যালিটি বড় হয়রান করছে।

শেঠজী বললেন, আচ্ছা, তার ব্যবস্থা হবে। আজ আমি থাকতে পারব না, জরুরী কাজে এখনই কলকাতা রওনা হব।

কলকাতায় পৌঁছে ত্রিক্রমদাস সোজা আলিপুরে বলাকার কাছে গেলেন। ড্রইংরুমে একজন সুদর্শন ভদ্রলোক পিয়ানো বাজাচ্ছিলেন আর বলাকা তালে তালে নাচছিলেন। ত্রিক্রমকে দেখে বলাকা বললেন, একি শেঠজী, হঠাৎ এলে যে! এঁকে বোধ হয় চেন না, ইনি হচ্ছেন লোটনকুমার ভড়, দূর সম্পর্কে আমার মাসতুতো ভাই, নাচের ওস্তাদ। এঁর কাছে আমি কবুতর-নৃত্য শিখছি। দেখবে একটু?

ত্রিক্রম বললেন, এখন আমার ফুরসত নেই। বলাকা, তোমার সঙ্গে আমার বহুত জরুরী কথা আছে।

লোটনকুমার উঠে গেলে ত্রিক্রমদাস কম্পিত বক্ষে তাঁর তিন বিবাহের কথা প্রকাশ করলেন। বলাকা গালে আঙ্গুল ঠেকিয়ে বললেন, ওমা তাই নাকি! ওঃ শেঠজী, তুমি একটি আসল পানকৌড়ি, নটবর নাগর। তা তুমি অমন মুষড়ে গেছ কেন, তিনটে বউ আছে তো হয়েছে কি? ঠিক আছে, তুমি ভেবো না, আমি হিংসুটে মেয়ে নই। কিন্তু তুমি যেন সবাইকে বলে বেড়িয়ো না।...হ্যাঁ, ভাল কথা, দেখ শেঠজী, একটা নতুন মোটরকার না হলে চলছে না, পুরানো অস্টিনটা হরদম বিগড়ে যাচ্ছে। তুমি হাজার কুড়ি টাকার একটা চেক আমাকে দিও, তার কমে ভাল গাড়ি মিলবে না।

ত্রিক্রমদাস বললেন, আচ্ছা, তার ব্যবস্থা হবে। আমি এখন উঠি, আজই দিল্লি যেতে হবে।

ত্রিক্রমদাস দিল্লিতে এসেই খঞ্জনচাঁদের কাছে গিয়ে সকল বৃত্তান্ত জানালেন। তার পর তাঁকে সঙ্গে করে নিজের বাড়িতে এনে ড্রইংরুমে অপেক্ষা করতে বললেন।

অন্দরমহলে গিয়ে ত্রিক্রম আনন্দীবাঈকে শোবার ঘরে ডেকে আনলেন। আনন্দী বললেন, তিন দিন তোমার কোনও পাত্তা নেই, চেহারা খারাপ হয়ে গেছে, ব্যাপার কি, গভরমেণ্টের সঙ্গে আবার কিছু গড়বড় হয়েছে নাকি?

ত্রিক্রমদাস মাথা হেঁট করে তাঁর গুপ্তকথা প্রকাশ করলেন। আনন্দী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন, তার পর কোমরে হাত দিয়ে চোখ পাকিয়ে বললেন, ক্যা বোলা তুম নে?

শেঠজী একটু ভয় পেয়ে বললেন, আনন্দী, ঠণ্ডা হো যাও, সব ঠিক হো জাগা।

বাংলা সাহিত্য যতই সমৃদ্ধ আর উঁচুদরের হক, হিন্দী ভাষায় গালাগালির যে শব্দসম্ভার আছে তার তুলনা নেই। আনন্দীবাঈ হাত-পা ছুড়ে নাচতে লাগলেন,

হোজ-পাইপ থেকে জলধারার মতন তাঁর মুখ থেকে যে ভর্ৎসনা নির্গত হতে লাগল তা যেমন তীব্র তেমনি মর্মস্পর্শী। তার সকল বাক্য ভদ্রজনের শ্রোতব্য নয়, ভদ্র-নারীর উচ্চার্যও নয়, কিন্তু আনন্দীবাঈ-এর তখন হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেয়েছে। তিনি উত্তরোত্তর উত্তেজিত হচ্ছেন দেখে শেঠজী হাত জোড় করে আবার বললেন, আনন্দী, মাফ করো, সব ঠিক হো জাগা।

আনন্দী গর্জন করে বললেন, চোপ রহো শড়ক কা কুত্তা, ডিরেন কা ছুছুন্দর! এই বলেই বাঘিনীর মতন লাফিয়ে গিয়ে শেঠজীর দুই গালে খামচে দিলেন। তার পর পিছু হটে তাঁর বাঁ হাত থেকে দশগাছা মোটা মোটা চুড়ি খুলে নিয়ে স্বামীর মস্তক লক্ষ্য করে ঝনঝন শব্দে নিক্ষেপ করলেন। শেঠজীর কপাল ফেটে রক্ত পড়তে লাগল, তিনি চিৎকার করে ধরাশায়ী হলেন। ততোধিক চিৎকার করে আনন্দীবাঈ তাঁর পুজোর ঘরে চলে গেলেন এবং মেঝেয় শুয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

বাড়িতে মহা শোরগোল পড়ে গেল। আত্মীয়া যাঁরা ছিলেন তাঁরা আনন্দীকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। শেঠজীর জন্যে খজনচাঁদ তখনই ডাক্তার ডেকে আনালেন।

সাত দিন পরে শেঠজী অনেকটা সুস্থ হয়েছেন এবং দোতলার বারান্দায় আরাম কেদারায় বসে গুড়গুড়ি টানছেন। তাঁর মাথায় এখনও ব্যান্ডেজ আছে, মুখে স্থানে স্থানে স্টিকিং প্লাসটারও আছে।

খজনচাঁদ এসে বললেন, কহিএ শেঠজী, তবিঅত কৈসী হৈ।

শেঠজী বললেন, অনেক ভাল। শোন খজন-ভাই, রাজহংসী আর বলাকার সঙ্গে আমি সম্পর্ক রাখতে চাই না। তুমি তুরন্ত বোম্বাই আর কলকাতায় গিয়ে একটা মিটমাট করে ফেল, যত টাকা লাগে আমি দেব। ওই মুম্বইবালী আর কলকাত্তাবালী শুধু আমার টাকা চায়, আমাকে চায় না, কিন্তু আনন্দী আমাকেই চায়। খুশবু পাচ্ছ? আনন্দী নিজে আমার জন্যে ড়হর ডালের খিচুড়ি বানাচ্ছে। আর এই দেখ, গলাবন্ধ বুনে দিয়েছে।

খজনচাঁদ বললেন, বহুত খুশী কি বাত। শেঠজী, ভাববেন না, আমি সব ঠিক করে দেব। আপনি আনন্দীবাঈকে মথুরা বৃন্দাবন দ্বারকায় ঘুরিয়ে আনুন, তাঁর মেজাজ ভাল হয়ে যাবে।

পত্নীর সেবায় ত্রিক্রমদাস শীঘ্র সেরে উঠলেন। খজনচাঁদের চেষ্টায় রাজহংসী আর বলাকার সঙ্গে মিটমাট হয়ে গেছে, জুলফিকার খাঁও পান খাবার জন্যে মোটা টাকা পেয়েছেন। কলকাতার সব চেয়ে বড় জ্যোতিষসম্রাট জ্যোতিষচন্দ্র জ্যোতিষার্ণবের কাছ থেকে আনন্দীবাঈ হাজার টাকা দামের একটি বশীকরণ কবচ আনিয়ে স্বামীর গলায় বেঁধে দিয়েছেন। এই পুরশ্চরণসিদ্ধ কবচের ফলও আশ্চর্য। শেঠজী আজকাল তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধুদের কাছে বলে থাকেন, সিবায় আনন্দী সব আওরত চুড়ৈল হৈ— অর্থাৎ আনন্দী ছাড়া সব স্ত্রীলোকই পেতনী।*

১৮৭৮ শক (১৯৫৬)

* এই ইংরেজী গল্পের প্লটের অনুসরণে। লেখকের নাম মনে নেই।

চাঙ্গায়নী সুধা

ক্যালকাটা টি ক্যাবিনের নাম নিশ্চয় আপনাদের জানা আছে, নূতন দিল্লির গোল মার্কেটের পিছনের গলিতে কালীবাবুর সেই বিখ্যাত চায়ের দোকান।

বিজয়াদশমী, সন্ধ্যা সাতটা। পেনশনভোগী বৃদ্ধ রামতারণ মুখুজ্যে, স্কুল মাস্টার কপিল গুপ্ত, ব্যাংকের কেরানী বীরেশ্বর সিংগি, কাগজের রিপোর্টার অতুল হালদার প্রভৃতি নিয়মিত আড্ডাধারীরা সকলেই সমবেত হয়েছেন। বিজয়ার নমস্কার আর আলিঙ্গন যথারীতি সম্পন্ন হয়েছে, এখন জলযোগ চলছে। কালীবাবু আজ বিশেষ ব্যবস্থা করেছেন—চায়ের সঙ্গে চিঁড়ে ভাজা ফুলুরি নিমকি আর গজা।

অতুল হালদার বললেন, আজকের ব্যবস্থা তো কালীবাবু ভালই করেছেন, কিন্তু একটি যে ত্রুটি রয়ে গেছে, কিঞ্চিৎ সিদ্ধির শরবত থাকলেই বিজয়ার অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হত।

রামতারণ মুখুজ্যে বললেন, তোমাদের যত সব বেয়াড়া আবদার। চায়ের দোকানে সিদ্ধির শরবত কি রকম? সিদ্ধি হল একটি পবিত্র বস্তু, যার শাস্ত্রীয় নাম ভঙ্গা বা বিজয়া। কালীবাবুর এই দোকান তো পাঁচ ভূতের হাট এখানে সিদ্ধি চলবে না। দেবীর বিসর্জনের পর মঙ্গলঘট আর গুরুজনদের প্রণাম করে শুদ্ধচিত্তে সিদ্ধি খেতে হয়। আমি তো বাড়িতেই একটু খেয়ে নিয়ম রক্ষা করে তবে এখানে এসেছি।

একজন সাধুবাবা টি ক্যাবিনে প্রবেশ করলেন। ছ ফুট লম্বা মজবুত গড়ন, কাঁধ পর্যন্ত ঝোলা চুল, মোটা-গোঁফ, কোদালের মতন কাঁচা-পাকা দাড়ি, কপালে ভস্মের ত্রিপুণ্ড্রক, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথায় কান-ঢাকা গেরুয়া টুপি, গায়ে গেরুয়া আলখাল্লা, পায়ে গেরুয়া ক্যাম্বিসের জুতো, হাতে একটি অ্যালুমিনিয়মের প্রকাণ্ড কমণ্ডলু বা হাতলযুক্ত বদনা। আগন্তুক ঘরে এসেই বাজখাঁই গলায় বললেন, নমস্তে মশাইরা, খবর সব ভাল তো?

কপিল গুপ্ত বললেন, আরে বকশী মশাই যে, আসতে আজ্ঞা হ'ক।* দু বছর দেখা নেই, এতদিন ছিলেন কোথায়? ভোল ফিরিয়েছেন দেখছি, সাধু মহারাজ হলেন কবে থেকে? বাঃ, দাড়িটিতে দিব্বি পার্মানেন্ট ওয়েভ করিয়েছেন! কত খরচ পড়ল?

রামতারণ মুখুজ্যে বললেন শোন হে জটাধর বকশী, দু' দুবার ঠকিয়ে গেছ, এবার আর তোমার নিস্তার নেই, পুলিশে দেব।

অতুল হালদার বললেন, হুঁ হুঁ বাবা, দু-দু বার ঘুঘু তুমি খেয়ে গেছ ধান, এই বার ফাঁদে ফেলে বধিব পরান।

কপিল গুপ্ত বললেন, আহা ভদ্রলোককে একটু হাঁফ ছেড়ে জিরুতে দিন, এঁর সমাচার সব শুনুন, তার পর পুলিস ডাকবেন। ও কালীবাবু, বকশী মশাইকে চা আর খাবার দাও, আমার অ্যাকাউণ্টে।

রবি বর্মার ছবিতে যেমন আছে—মেনকার কোলে শিশু শকুন্তলাকে দেখে বিশ্বামিত্র মুখ ফিরিয়ে হাত নাড়ছেন—সেই রকম ভঙ্গী করে জটাধর বললেন, না না, আর লজ্জা দেবেন না, আপনাদের ঢের খেয়েছি, এখন আমাকেই সেই ঋণ শোধ করতে হবে।

* জটাধর বকশীর পূর্বকথা 'কৃষ্ণকলি' ও 'নীলতারা' গ্রন্থে আছে।

রামতারণ বললেন, তোমার অচলার কি খবর, সেই যাকে বিধবা বিবাহ করেছিলে?

ফোঁস করে একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে জটাধর বললেন, তার কথা আর বলবেন না মুখুজ্যে মশাই, মনে বড় ব্যথা পাই। অচলা তার আগের স্বামী বলহরির সঙ্গেই চলে গেছে। বলহরি তাকে জোর করে নিয়ে গেছে, আমার পঞ্চাশটা টাকাও ছিনিয়ে নিয়েছে, অচলার জন্যে এখান থেকে যে খানকতক চপ নিয়ে গিয়েছিলুম তাও সেই রাক্ষসটা কেড়ে নিয়ে খেয়ে ফেলেছে।

কপিল গুপ্ত বললেন, যাক, গতস্য অনুশোচনা নাস্তি, এখন আপনার সন্ন্যাসের ইতিহাস বলুন। আহা, লজ্জা করছেন কেন, চা আর খাবার খেতে খেতেই বলুন, আমরা শোনবার জন্যে সবাই উদগ্রীব হয়ে আছি। ওহে কালীবাবু, বকশী মশাইকে আরও এক পেয়ালা চা আর এক প্লেট খাবার দাও, গোটা দুই বর্মা চুরুটও দাও, সব আমার খরচায়।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে জটাধর বললেন, নেহাতই যদি শুনতে চান তো বলছি শুনুন। অচলা চলে যাবার পর মনে একটা দারুণ বৈরাগ্য এল, সংসারে ঘেন্না ধরে গেল। দুত্তোর বলে একটি তীর্থযাত্রী দলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম। ঘুরতে ঘুরতে মানস সরোবর কৈলাস পর্বতে এসে পৌঁছুলুম। সেখানে হঠাৎ কানহাইয়া বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাঁর পূর্বনাম কানাই বটব্যাল, খুব বড় সায়েন্টিস্ট ছিলেন, অনেক রকম কারবারও এককালে করেছেন। শেষ বয়সে বিবাগী হয়ে হিমালয়ের একটি গুহায় পাঁচটি বৎসর তপস্যা করে সিদ্ধ হয়েছেন। আমার সঙ্গে পূর্বে একটু পরিচয় ছিল, দেখা মাত্র চিনে ফেললেন। তাঁর পা ধরে আমার দুঃখের সব কথা তাঁকে নিবেদন করলুম। কানু ঠাকুর বললেন, ভেবো না জটাধর, নিষ্কাম হয়ে কর্মযোগ অবলম্বন কর, আমার শিষ্য হও। আমি সংকল্প করেছি এই মানস সরোবরের তীরে একটি বড় মঠ প্রতিষ্ঠা করব, তাতে যাত্রীরা আশ্রয় পাবে। তিব্বত সরকারের পারমিশন পেয়েছি, দালাই লামা তাসী লামা পণ্ডেন লামা সবাই শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আমি চাঁদা সংগ্রহের জন্য পর্যটন করব, তুমি সঙ্গে থেকে আমাকে সাহায্য করবে। কানু মহারাজের কথায় আমি তখনই রাজী হলুম। তার পর প্রায় বছর খানিক তাঁর সঙ্গে ভ্রমণ করেছি, হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত। মঠের জন্য গরিব বড়লোক সবাই চাঁদা দিয়েছে, যার যেমন সামর্থ্য, এক আনা থেকে এক লাখ পর্যন্ত। তা টাকা মন্দ ওঠে নি, প্রায় পৌনে চার লাখ, সবই ইণ্ডো-টিবেটান যক্ষ ব্যাংকে জমা আছে। কানু মহারাজ সম্প্রতি দিল্লিতেই অবস্থান করছেন, দরিয়াগঞ্জে শেঠ গজাননজীর কুঠীতে। তাঁর অনুমতি নিয়ে একবার আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে এলুম।

রামতরণ বললেন, আমরা কেউ এক পয়সা চাঁদা দেব না তা আগেই বলে রাখছি। তোমাকে থোড়াই বিশ্বাস করি।

জটাধর বকশী প্রসন্ন বদনে বললেন, মুখুজ্যে মশাইএর কথাটি হুঁশিয়ার জ্ঞানযোগীরই উপযুক্ত। বিশ্বাস করবেন কেন, আমার ভালোর দিকটা তো দেখেন নি। অদৃষ্টের দোষে বিপাকে পড়ে সর্বস্বান্ত হয়েছি, আপনাদের কাছে অপরাধী হয়ে পড়েছি, সে কথা আমিই কি ভুলতে পারি? সৎকার্যের জন্যে চাঁদা, বিশেষ করে মঠ নির্মাণের জন্যে চাঁদা শ্রদ্ধার সঙ্গে দিতে হয়। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্—এই হল শাস্ত্রবচন। শ্রদ্ধা না হলে দেবেন কেন, আমিই বা চাইব কেন!

অতুল হালদার বললেন, থ্যাংক ইউ জটাই মহারাজ, আপনার বাক্যে আশ্বস্ত হলুম। মঠ প্রতিষ্ঠার কথা শুনেই আতঙ্ক হয়েছিল এখনই বুঝি চাঁদা চেয়ে বস-

বেন, না দিলে কানহাইয়া বাবার শাপের ভয় দেখাবেন। যাক, শ্রদ্ধা যখন নাস্তি তখন চাঁদাও নবডংকা। আপনার ওই বিরাট বদনাটায় কি আছে?

জটাধর বললেন, বদনা বলবেন না। এর নাম রুদ্র কমণ্ডলু, কানু মহারাজের ফরমাশে গজানন শেঠজী বানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর অ্যালুমিনিয়মের কারখানা আছে কিনা।

রামতারণ প্রশ্ন করলেন, কি আছে ওটাতে? চলবল করছে যেন।

—আজ্ঞে এতে আছে চাঙ্গায়নী সুধা, আপনাদের জন্যেই এনেছি।

রামতারণ বললেন, মৃতসঞ্জীবনী সুধা জানি; চাঙ্গায়নী আবার কি?

—এ এক অপূর্ব বস্তু মুখুজ্যে মশাই, কানু মহারাজের মহৎ আবিষ্কার। খেলে মন প্রাণ চাঙ্গা হয় তাই চাঙ্গায়নী সুধা নাম।

—মদ নাকি?

—মহাভারত! কানু মহারাজ মাদক দ্রব্য স্পর্শ করেন না, চা পর্যন্ত খান না। চাঙ্গায়নীতে কি আছে শুনবেন? আপনাদের আর জানাতে বাধা কি, কিন্তু দয়া করে ফরমুলাটি গোপন রাখবেন।

কপিল গুপ্ত বললেন, ভয় নেই বকশী মশাই, আমরা এই ক-জন ছাড়া আর কেউ টের পাবে না।

—তবে শুনুন। এতে আছে কুড়িটি কবরেজী গাছ-গাছড়া, কুড়ি রকম ডাক্তারী আরক, কুড়ি রকম হোমিও গ্লোবিউল, কুড়ি দফা হেকিমী দাবাই, তা ছাড়া তান্ত্রিক স্বর্ণভস্ম হীরকভস্ম বায়ুভস্ম ব্যোমভস্ম রাজ্যের ভিটামিন, আর পোয়াটাক ইলেকট্রিসিটি। আর আছে হিমালয়জাত সোমলতা, যাকে আপনারা সিদ্ধি বলেন, আর কাশ্মীরী মকরকন্দ। এই সব মিশিয়ে বকযন্ত্রে চোলাই করে প্রস্তুত হয়েছে। কানু ঠাকুর বলেন, এই চাঙ্গায়নী সুধাই হচ্ছে প্রাচীন ঋষিদের সোমরস, উনি শুধু ফরমুলাটি যুগোপযোগী করেছেন।

অতুল হালদার উরুতে চাপড় মেরে বললেন, আরে মশাই, এই রকম জিনিসই তো আজ দরকার। একটু আগেই বলছিলুম কিঞ্চিৎ সিদ্ধির শরবত হলেই আমাদের এই বিজয়া সম্মিলনীটি নিখুঁত হয়।

রামতারণ বললেন, অত ব্যস্ত হয়ো না হে অতুল, জটাধরের চাঙ্গায়নী যে নেশার জিনিস নয় তা জানলে কি করে?

জটাধর বকশী তাঁর প্রকাণ্ড জিহ্বাটি দংশন করে বললেন, কি যে বলেন মুখুজ্যে মশাই! নেশার জিনিস কি আপনাদের জন্যে আনতে পারি, আমার কি ধর্মজ্ঞান নেই? এতে সিদ্ধি আছে বটে, কিন্তু তা মামুলী ভাঙ নয়, বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় শোধন করে তার মাদকতা একেবারে নিউট্রালাইজ করা হয়েছে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে যাকে বলে হৃদ্য বৃষ্য বল্য মেধ্য, এই চাঙ্গায়নী হল তাই। খেলে শরীর চাঙ্গা হবে, ইন্দ্রিয় আর বুদ্ধি তীক্ষ্ন হবে, চিত্তে পুলক আসবে, সব গ্লানি আর অশান্তি দূর হবে। কপিলবাবু, একটু ট্রাই করে দেখুন না। চায়ের বাটিটা আগে ধুয়ে নিন, জিনিসটা খুব শুদ্ধভাবে খেতে হয়।

কপিল গুপ্ত তাঁর চায়ের বাটি ধুয়ে এগিয়ে ধরে বললেন, খুব একটুখানি দেবেন কিন্তু। এই সিকিটি দয়া করে গ্রহণ করুন, আপনার কানহাইয়া মঠের জন্যে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য।

সিকিটি নিয়ে জটাধর তাঁর দশসেরী রুদ্র কমণ্ডলুর ঢাকনি খুললেন। ভিতর থেকে একটি ছোট হাতা বার করে তারই এক মাত্রা কপিল গুপ্তের বাটিতে ঢেলে দিয়ে বললেন, শ্রদ্ধয়া পেয়ম্।

অতুল হালদার বললেন, আমাকেও একটু দাও হে জটাধর মহারাজ। এই নাও দুটো দোয়ানি।

বীরেশ্বর সিংগিও চার আনা দক্ষিণা দিয়ে এক হাতা নিলেন। চেখে বললেন, চমৎকার বানিয়েছেন জটাধরজী, অনেকটা কোকা কোলার মতন।

অতুল হালদার বললেন, দূর মুখখু, কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা! সেদিন হংগেরিয়ান এমবাসির পার্টিতে মিল্কপঞ্চ খেয়েছিলুম, তার আগে ফ্রেঞ্চ কনসলের ডিনারে শ্যাম্পেনও খেয়েছি, কিন্তু এই চাঙ্গায়নী সুধার কাছে সে সব লাগে না। ওঃ, কি চীজই বানিয়েছ জটাই বাবা! মিষ্টি টক নোনতা ঝাল, ঈষৎ তেতো, ঈষৎ কষা, সব রসই আছে, কিন্তু প্রত্যেকটি একেবারে লাগসই। ঝাঁজও বেশ, বোধ হয় ইলেকট্রিসিটির জন্যে, পেটে গিয়ে চিনচিন করে শক দিচ্ছে। দাও হে আর এক হাতা।

রামতারণ মুখুজ্যে বললেন, আমার আবার বাতের ব্যামো, ডায়াবিটিসও একটু আছে। চাঙ্গায়নী একটু খেলে বেড়ে যাবে না তো হে জটাধর?

জটাধর বললেন, বাড়বে কি মশাই, একেবারে নির্মূল হবে, শরীরের সমস্ত ব্যাধি, মনের সমস্ত গ্লানি, হৃদয়ের যাবতীয় জ্বালা বেমালুম ভ্যানিশ করবে। মুখ হাঁ করুন তো, এক হাতা ঢেলে দিচ্ছি, ভক্তিভরে সেবন করুন। শ্রদ্ধয়া পেয়ং, শ্রদ্ধয়া দেয়ম্।

—নাঃ, তুমি দেখছি বেজায় নাছোড়বান্দা, কিছু আদায় না করে ছাড়বে না। নাও, পুরোপুরি একটা টাকাই নাও।

বৃদ্ধ রামতারণ মুখুজ্যের সদৃষ্টান্তে সকলেই উৎসাহিত হয়ে চাঙ্গায়নী সেবন করলেন। তিন হাতা খাবার পর বীরেশ্বর সিংগি কাঁদোকাঁদো হয়ে বললেন, জটাধরজী, আমার মনে সুখ নেই, বড় কষ্ট, বড় অপমান, বউটা হরদম বলে, বোকারাম হাঁদারাম ভ্যাবাগঙ্গারাম।

জটাধর বললেন, আর একটু চাঙ্গায়নী খান বীরেশ্বরবাবু, সব দুঃখ ঘুচে যাবে। আপনি হলেন বীরপুংগব পুরুষসিংহ, কার সাধ্য আপনার অপমান করে! বোকারাম বললেই হল! দেখবেন আজ থেকে আর বলবে না, সবাই আপনাকে ভয় করবে।

রামতারণ বললেন, ওহে জটায়ু পক্ষী, তোমার চাঙ্গায়নী সত্যিই খাসা জিনিস। এই নাও দু টাকা, একটু বেশী করে দাও তো। গিন্নী কেবলই বলে বাহাত্তুরে বেআক্কেলে বুড়ো, ভীমরতি ধরেছে। মাগী আমাকে ভালমানুষ পেয়ে গ্রাহ্যির মধ্যে আনে না, বড়লোকের বেটী বলে ভারী দেমাক। আরে বাপের কত টাকা আমার ঘরে এনেছিস? আজ বাড়ি গিয়ে দেখে নেব, বেশ একটু তেজ পাচ্ছি বলে মনে হচ্ছে।

জটাধর বললেন, এই চাঙ্গায়নীতে সৌরতেজ রুদ্রতেজ ব্রহ্মতেজ সব আছে মুখুজ্যে মশাই। আপনি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, ঋষিদের বংশধর, আপনার পূর্বপুরুষরা সোমযাগ করতেন, কলসী কলসী সোমরস খেতেন। আপনার আবার তেজের ভাবনা! নিন, চায়ের পেয়ালা ভর্তি করে দিলাম, চোঁ করে গলাধঃকরণ করে ফেলুন। পাঁচ টাকা দক্ষিণা—শ্রদ্ধয়া দেয়ং, শ্রদ্ধয়া পেয়ম্।

কালীবাবুর টি ক্যাবিনে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলেই অল্পাধিক চাঙ্গায়নী সুধা পান করলেন। কিন্তু জিনিসটির প্রভাব সকলের উপর সমান হল না। কপিল গুপ্ত গম্ভীর হয়ে বিড়বিড় করে ম্যাকবেথ আবৃত্তি করতে লাগলেন। বীরেশ্বর সিংগি এবং আরও দুজন কচি ছেলের মতন খুঁতখুঁত করে কাঁদতে লাগলেন। দু-তিন জন মেজেতে শুয়ে পড়ে নিদ্রামগ্ন হলেন। অতুল হালদার দাঁড়িয়ে উঠে হাত নেড়ে থিয়েটারী সুরে বলতে লাগলেন, শাহজাদী সম্রাটনন্দিনী, মৃত্যুভয় দেখাও কাহারে? রামতারণ মুখুজ্যে বেঞ্চের উপর উবু হয়ে বসে তুড়ি দিয়ে রামপ্রসাদী গাইতে লাগলেন—

কালী, একবার খাঁড়াটা নেব ;
তোমার লকলকে জিব কেটে নিয়ে মা,
ভক্তিভরে কেটে নিয়ে মা,
বাবা শিবের শ্রীচরণে দেব।

কালীবাবু তাঁর টেবিলের পিছনে বসে সমস্ত নিরীক্ষণ করছিলেন। এখন এগিয়ে এসে জটাধরকে প্রশ্ন করলেন, আজ কত টাকা হাতালে জটাধরবাবু?

জটাধর বললেন, চাঁদার কথা বলছেন? অতি সামান্য, বড়জোর পঞ্চাশ টাকা। আপনার মক্কেলরা তো কেউ টাকার আণ্ডিল নয়, সকলেরই দেখছি অদ্যভক্ষ্য ধনুর্গুণ।

—আমার দোকানে ব্যবসা করলে আমাকে কমিশন দিতে হয় তা বোঝ তো?

—বিলক্ষণ বুঝি। এই নিন পাঁচ টাকা, টেন পারসেন্টের কিছু বেশী পোষাবে।

—তোমার ওই বদনাটায় আর কিছু আছে না কি?

—আছে বই কি, চায়ের কাপের দু কাপ হবে। খাবেন?

—দাম কিন্তু দেব না।

—আপনার কাছে আবার দাম কি। এই নিন, সবটাই খেয়ে ফেলুন।

কালীবাবু দু পেয়ালা চাঙ্গায়নী পান করলেন, একটু পরেই তাঁর চোখ ঢুলুঢুলু হল।

জটাধর বললেন, টেবিলের ওপর শুয়ে পড়ে একটু বিশ্রাম করুন কালীবাবু। ভাববেন না, দশ মিনিটের মধ্যেই আপনারা সবাই চাঙ্গা হয়ে উঠবেন। হাঁ, ভাল কথা—আমার টাকা একটু কম পড়েছে, কিছু হাওলাত চাই, শৃঙ্গেরী মঠে যাবার রাহাখরচ, টাকা পঁচিশ হলেই চলবে। আপনার ক্যাশ থেকে নিলুম। আপত্তি নেই তো? একটা হ্যান্ডনোট লিখে দিই?...তাও নয়? থ্যাঙ্ক ইউ কালীবাবু, আপনি মহাশয় ব্যক্তি, বন্ধুকে একটু সাহায্য করতে আপত্তি করবেন কেন। টাকাটা আমার নামে আপনার খাতায় ডেবিট করবেন, আবার যেদিন আসব সুদ সুদ্ধ শোধ করব।

শিবনেত্র হয়ে জড়িত কণ্ঠে কালীবাবু বললেন, আবার কবে দেখা পাব?

—সবই ঠাকুরের ইচ্ছে কালীবাবু। কানহাইয়া বাবা যখনই এখানে টানবেন তখনই এসে পড়ব। আচ্ছা, এখন আসি, দরজাটা ভেজিয়ে দিচ্ছি। একটু সজাগ থাকবেন, বড় চোরের উপদ্রব। নমস্কার।

১৮৭৮ শক (১৯৫৬)

বটেশ্বরের অবদান

বটেশ্বর সিকদার একজন প্রখ্যাত গ্রন্থকার এবং বাণীর একনিষ্ঠ সাধক, অর্থাৎ পেশাদার লেখক। যাঁদের লেখা ছাড়া অন্য কর্ম নেই তাঁদের প্রায় অর্থাভাব দেখা যায়, কিন্তু বটেশ্বর ধনী লোক। এই ব্যতিক্রমের কারণ—তিনি প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক, শুধু বড় উপন্যাস লেখেন, দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর লেখকদের মতন ছোট গল্প প্রবন্ধ কবিতা রম্যরচনা ভ্রম্যরচনা ইত্যাদি লিখে প্রতিভার অপচয় করেন না। তাঁর কোনও উপন্যাস সাতশ পৃষ্ঠার কম নয় এবং প্রকাশের সংগে সংগে বাংলা দেশের বুভুক্ষু পাঠক-পাঠিকারা তা গোগ্রাসে পড়ে ফেলেন এবং পরবর্তী রচনার জন্য ব্যগ্র হয়ে প্রতীক্ষা করেন। সম্প্রতি তাঁর পঞ্চষষ্টিতম জন্মদিনের উৎসব খুব ঘটা করে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সকালবেলা বটেশ্বর তাঁর সাধনকক্ষে বসে লিখছেন এবং মাঝে মাঝে একটি বড় টিপট থেকে চা ঢেলে খাচ্ছেন, এমন সময় একটি অচেনা যুবক ঘরে এসে ঝুঁকে নমস্কার করে বলল, আমার নাম প্রিয়ব্রত রায়, পাঁচ মিনিট সময় দিতে পারবেন কি?

আগন্তুকের বয়স প্রায় ত্রিশ, সুশ্রী চেহারা, সজ্জায় দারিদ্র্যের লক্ষণ নেই, পারিপাট্যও নেই। বটেশ্বর একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন, ব'স! নতুন পত্রিকা বার করছ, তার জন্যে আমার লেখা চাও, এই তো? আগেই বলে দিচ্ছি, আমি কল্পতরু নই, যে চাইবে তাকেই লেখা দিতে পারি না। একটা আশীর্বাণী যদি চাও তো দিতে পারি, দশ টাকা লাগবে।

প্রিয়ব্রত বলল, আজ্ঞে, লেখার জন্যে আপনাকে বিরক্ত করতে আসি নি, শুধু একটি কথা জানতে এসেছি। 'প্রগামিণী' পত্রিকায় 'কে থাকে কে যায়' নামে আপনার যে গল্পটি বার হচ্ছে তা শেষ হতে আর ক-মাস লাগবে, দয়া করে বলবেন কি?

—আরও ছ-সাত মাস লাগবে। কেন বল তো? কেমন লাগছে লেখাটা?

—অতি চমৎকার, সব চরিত্র যেন জীবন্ত। বড্ড কৌতূহল হচ্ছে তাই জানতে এসেছি—গল্পের নায়িকা ওই অলকা মেয়েটি যে টি-বি স্যানিটেরিয়মে আছে, সে সেরে উঠবে তো?

প্রিয়ব্রতর আগ্রহ দেখে বটেশ্বর খুশী হলেন। একটু হেসে বললেন, তা তোমাকে বলব কেন? প্লট আগেই ফাঁস করে দিলে রচনার রসভঙ্গ হয়।

হাত জোড় করে প্রিয়ব্রত বলল, সার দয়া করে অলকাকে বাঁচিয়ে দেবেন।

—তোমার তো বড় অদ্ভুত আবদার হে! গল্পের নায়িকার জন্য এত ভাবনা কেন? লোকে মিলনান্ত বিয়োগান্ত দু রকম গল্পই চায়, তোমার ফরমাশ মতন আমি লিখতে পারি না, মিলনান্ত চাও তো আমার 'কাড়াকাড়ি', 'তেটানা' এই সব পড়তে পার।

প্রিয়ব্রত করুণ স্বরে বলল, দয়া করুন সার।

—তুমি একটি আস্ত পাগল। এখন যাও, আমার ঢের কাজ। অলকার জন্যে মাথা খারাপ না করে নিজের চিকিৎসা করাও গে, নিশ্চয় তোমার মনের রোগ আছে।

প্রিয়ব্রত বিষণ্ণমুখে মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে ঘর থেকে চলে গেল।

রাত সাড়ে নটার সময় বটেশ্বর খেতে যাচ্ছেন এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার ধরে বললেন, কাকে চান?...হাঁ, আমিই বটেশ্বর। আপনি কে?

উত্তর এল—নমস্কার। আমি ডাক্তার সঞ্জীব চাটুজ্যে, আপনার কাছে একটু বিশেষ দরকার আছে। কাল সকালে আটটার সময় যদি যাই আপনার অসুবিধা হবে না তো?

বটেশ্বর বললেন, না না, আপনি আসতে পারেন। কি দরকার বলুন তো?

—সাক্ষাতেই সব বলব সার। আচ্ছা নমস্কার।

ডাক্তার সঞ্জীব চাটুজ্যের নাম বটেশ্বর শুনেছেন। বছর দুই হল বিলাত থেকে ফিরেছেন, বয়স বেশী নয়, খুব নাকি ভাল সার্জন, বেশ পসার হয়েছে।

পরদিন সকালে সঞ্জীব ডাক্তার এসে বললেন, গুড মর্নিং সার, আপনার মহামূল্য সময় আমি নষ্ট করব না, দশ মিনিটের মধ্যেই বক্তব্য শেষ করব। ওঃ, কি আশ্চর্য আপনার ক্ষমতা! 'প্রগামিণী' পত্রিকায় 'কে থাকে কে যায়' নামে যে গল্পটি লিখছেন তার তুলনা নেই, দেশ সুদ্ধ লোক মুগ্ধ হয়ে গেছে। শরৎ চাটুজ্যে তারাশংকর বনফুল প্রবোধ সাণ্ডেল সবাইকে কাত করে দিয়েছেন মশাই।

বটেশ্বর সহাস্যে বললেন, আপনার তো খুব প্র্যাকটিস শুনতে পাই, আমার লেখা পড়বার সময় পান কি করে?

—সময় করে নিতে হয় সার, না পড়লে যে চলে না। সর্বত্র এই গল্পটির কথা শুনি, আমাদের মেডিক্যাল ক্লাবে পর্যন্ত। সেদিন একটি বৃদ্ধ লোকের হার্নিয়া অপারেশন করছি, অ্যানিসথেটিকের ঝোঁকে তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন—কি খাসা মেয়ে অলকা, জিতা রহো অলকা! আমার আত্মীয়স্বজন বন্ধুর দল তো আপনার অলকার জন্যে খেপে উঠেছে। ধন্য আপনি! সকলেই বলে, এখনকার সাহিত্যসম্রাট হচ্ছেন শ্রীবটেশ্বর সিকদার, তাঁর কাছে দামোদর নশকর গল্পসরস্বতী দাঁড়াতেই পারেন না। এখন আমার নিবেদন জানাই। আমার বন্ধুবর্গের তরফ থেকে অনুরোধ করতে এসেছি—অলকা মেয়েটিকে চটপট সারিয়ে দিন, সবাই তার জন্য চিন্তিত হয়ে উঠেছে। স্যানিটোরিয়ম থেকে বেশ সুস্থ করে ফিরিয়ে আনুন। একবারে থরো কিওর চাই, বুঝলেন? তার স্বামী হেমন্তর অবস্থা তো বেশ ভালই, অলকাকে নিয়ে সে সিমলা কি উটকামণ্ড চলে যাক, সেখানে তিনটি মাস কাটিয়ে বেশ মোটাসোটা করে ঘরে নিয়ে আসুক।

বটেশ্বর কুণ্ঠিত হয়ে বললেন, তা তো হবার জো নেই ডাক্তার চ্যাটার্জি, আমার এই রচনাটি যে ট্রাজেডি। অলকা বাঁচবে না।

—বলেন কি মশাই, আলবত বাঁচবে। আধুনিক চিকিৎসায় টি-বি রোগী শতকরা নব্বুইজন সেরে ওঠে। অলকার ভাল ট্রিটমেন্ট করান, পি-এ-এস আইসোনায়াজাইড, স্ট্রেপ্টোমাইসিন এই সব ওষুধ দিন। বলেন তো আমার বন্ধু ডাক্তার বড়ালের সঙ্গে একটা কনসলটেশনের ব্যবস্থা করি।

বটেশ্বর বিব্রত হয়ে পড়লেন। কাল এক পাগল এসেছিল, আজ আর এক বড় পাগলের কবলে তিনি পড়েছেন। কিন্তু এই সঞ্জীব ডাক্তার গুণগ্রাহী লোক, এঁকে ধমক দিয়ে হাঁকিয়ে দেওয়া চলে না। এঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আর নিরর্থক উপদেশ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য বটেশ্বর মনে করলেন, গল্পের পরিণামটা জানিয়ে দেওয়াই ভাল। বললেন, আপনি ভুলে যাচ্ছেন ডাক্তার চ্যাটার্জি, অলকা সত্যিকারের মানুষ নয়, আমার উপন্যাসের নায়িকা। তাকে বাঁচালে আমার প্লটটি মাটি হবে। অলকা

মরবে, তার দু-বছর পরে তার স্বামী হেমন্তর সঙ্গে শর্বরীর বিয়ে হবে, ওই যে মেয়েটি পাঁচটি বৎসর হেমন্তর জন্য প্রতীক্ষা করছে।

টেবিলে কিল মেরে সঞ্জীব ডাক্তার বললেন, অ্যাবসর্ড, তা হতেই পারে না। অলকার স্বামী হল তার যকের ধন, অন্য মেয়ে তাকে কেড়ে নেবে কেন?

—শর্বরীর কথাটাও ভেবে দেখুন ডাক্তার চ্যাটার্জি। রূপে গুণে বিদ্যায় স্বাস্থ্যে সে অলকার চাইতে ভাল। এত বৎসর প্রতীক্ষার পর হেমন্তকে না পেলে তার বুক যে ফেটে যাবে!

—ফাটলেই হল! বুক অত সহজে ফাটে না মশাই, খুব শক্ত টিশুতে তৈরী। হার্ট খারাপ হয় তো চিকিৎসা করাবেন, ডিজিটালিস অ্যামিনোফাইলিন খেলিন এই সব দেবেন। বুকে বোরিক কমপ্রেস, তিসির পুলটিস আর আইসব্যাগ লাগাবেন। শর্বরীর বিয়ে নাই বা দিলেন, তাকে রাজকুমারী অমৃত কাউরের কাছে পাঠিয়ে দিন, তিনি তাকে নর্সিং শেখাবার ব্যবস্থা করবেন।

—আপনি আমার লেখা পড়ে উত্তেজিত হয়েছেন, কাল্পনিক পাত্র-পাত্রীদের জীবন্ত মনে করেছেন এ আমার পক্ষে গৌরবের বিষয়। কিন্তু একটু স্থির হয়ে লেখকের দিকটাও বিবেচনা করুন। মিলনান্ত বিয়োগান্ত দু রকম গল্পই আমাদের লিখতে হয়। ভগবান সুখ দেন, দুঃখ দেন, মানুষকে রক্ষা করেন, আবার মারেনও। তিনি মিলন-বিবাহ দিয়ে সংসার সৃষ্টি করেছেন। আমরা লেখকেরা ভগবানেরই অনুসরণ করি। লোক নিজে শোক পেতে চায় না, কিন্তু ট্রাজেডি বেশ উপভোগ করে। সেই জন্যই তো মহাকবিরা সীতা, অজমহিষী ইন্দুমতী, ওফেলিয়া, ডেসডিমোনা ইত্যাদির সৃষ্টি করেছেন। ভগবান সব সময় দয়া করেন না, আমরাও করি না।

—কি বলছেন মশাই, ভগবানের নকল করবেন এতদূর আস্পর্ধা! ভগবান নাচার, সব সময় দয়া করলে তাঁর চলে না, তা বোঝেন? ইঁদুরকে যদি দয়া করেন তো বেড়াল উপোস করবে। মাছ মুরগি পাঁঠা ভেড়াকে দয়া করলে আপনার আমার পেটই ভরবে না। তিনি যখন মানুষকে দয়া করেন তখন মাইক্রোব ধ্বংশ হয়, আবার মাইক্রোবকে দয়া করলে মানুষ মরে। নিজের হাত-পা বাঁধা বলেই ভগবান মানুষ সৃষ্টি করেছেন, বলেছেন—আমার হয়ে তোরাই যতটা পারিস দয়া করবি, মনে রাখিস অহিংসাই পরম ধর্ম। গল্প লিখছেন বলেই আপনি মানুষ খুন করবেন এ কি রকম কথা! সেকালে বাল্মীকি কালিদাস শেক্সপীয়ার কি লিখেছেন তা ভুলে যান। এটা হল গান্ধীজীর যুগ, বিয়োগান্ত রচনা একদম চলবে না। যারা ট্রাজেডি লেখে আর তা পড়তে ভালবাসে তারা মরবিড, প্রচ্ছন্ন নিষ্ঠুর। মানুষের তো দুঃখের অভাব নেই, তার ওপর আবার মনগড়া-দুঃখের কাহিনী চাপাবেন কেন? আনন্দের গল্প লিখুন, মানুষকে আর কাঁদাবেন না, শুধু হাসাবেন। আপনাদের ভাবনা কি, কলমের আঁচড়েই তো সৃষ্টি স্থিতি লয় করতে পারেন। অলকাকে বাঁচাতেই হবে, বুঝলেন সিকদার মশাই? শারলক হোম্‌সকে কোনান ডয়েল মেরে ফেলেছিলেন, কিন্তু পাঠকদের ধমক খেয়ে আবার বাঁচিয়ে দিলেন। আপনিই বা বাঁচাবেন না কেন?

উত্যক্ত হয়ে বটেশ্বর বললেন, মাপ করবেন ডাক্তার চ্যাটার্জি, আপনার সঙ্গে আমার মতের মিল হবে না। আমরা লে-ম্যান লেখকরা তো আপনাদের চিকিৎসায় হস্তক্ষেপ করি না, আপনারাই বা লেখকদের হুকুম করবেন কেন? অনধিকারচর্চা কোনও পক্ষেই ভাল নয়।

সঞ্জীব ডাক্তার দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, আমি অনধিকারচর্চা করি না, ডাক্তারের

কাজ প্রাণরক্ষা, আপনি খুন করতে যাচ্ছেন তাতে আপত্তি জানানো আমার কর্তব্য। বেশ, যা খুশি করুন, আপনার পরম ভক্ত দু-লাখ পাঠক আর চার লাখ পাঠিকা চটে গিয়ে আপনাকে শাপ দেবে, আপনার এই কুকর্মের ফল পরলোকে ভুগতে হবে। একটু সাবধানে থাকবেন মশাই, এখনকার ছোকরারা ভাল নয়। আচ্ছা চললুম। যদি হাড়-টাড় ভাঙে তো খবর দেবেন। নমস্কার।

সঞ্জীব ডাক্তার বটেশ্বরের মন খারাপ করে দিয়ে চলে গেলেন। গতকাল সকালে যে ছোকরা এসেছিল—প্রিয়ব্রত রায়—সে পাগল হলেও শান্তশিষ্ট। কিন্তু এই সঞ্জীব ডাক্তার দুর্দান্ত উন্মাদ। শুধু উন্মাদ নয়, মনে হয় ফাজিল বকাটে আর মাতালও বটে। এমন লোকের চিকিৎসায় পসার হল কি করে? যাই হ'ক, পাগলদের কথায় বটেশ্বর কর্ণপাত করবেন না, তাঁর সংকল্পিত প্লট কিছুতেই বদলাবেন না। কিন্তু সঞ্জীব ডাক্তার ভয় দেখিয়ে গেছে, সাবধানে থাকতে হবে।

তিন দিন পরের কথা। বিকেলবেলা দোতলার বারান্দায় বসে বটেশ্বর চুরুট টানছেন। তাঁর বাতের বেদনাটা বেড়ে উঠেছে, সিঁড়ি দিয়ে নামাওঠায় কষ্ট হয়। ছেলেমেয়েদের নিয়ে গৃহিণী কাশীপুরে তাঁর ছোট বোনের বাড়ি বেড়াতে গেছেন। বটেশ্বরের কোথাও যাবার জো নেই, কথা কইবার লোকও নেই। তাঁর অনুরক্ত বন্ধুদের কেউ যদি এখন এসে পড়েন তো তিনি খুশী হন।

চাকর এসে খবর দিল, একজন মহিলা দেখা করতে এসেছেন। বটেশ্বর বললেন, এখানে নিয়ে আয়।

একটি সুবেশা চব্বিশ-পঁচিশ বছরের মেয়ে তাঁর কাছে এল, একটু মোটা হলেও বেশ সুন্দরী বটে। সে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে পায়ে হাত দিলে। বটেশ্বর বললেন, থাক, থাক, ওই হয়েছে। কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

—চিনতে পারছেন না? আমি কদম্বানিলা চ্যাটার্জি, সিনেমার ছবিতে আমাকে দেখেন নি? মধ্যগগনের তারকা না হলেও আমাকে সবাই উদীয়মানা মনে করে।

—বেশ বেশ। সিনেমা বড় একটা দেখি না, খবরও বিশেষ রাখি না। আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন ওই চেয়ারটায়।

—আমাকে 'আপনি' বলবেন না সার।

কদম্বানিলা পান চিবুতে চিবুতে কথা বলছিল, সেই বেআদবি দেখে বটেশ্বর একটু অপ্রসন্ন হয়েছিলেন। কিন্তু মেয়েটির নম্র ব্যবহারে তাঁর বিরাগ কেটে গেল, ভাবলেন, আমার সামনে সিগারেট ফুঁকছে না এই ঢের। প্রশ্ন করলেন, কদম্বানিলা তো ছদ্মনাম, তোমার আসল নামটি কি?

—তা যে বলতে নেই সার। সন্ন্যাসী আর সিনেমা-তারার পূর্বনাম জানানো বারণ, গুরুর নিষেধ থাকে কি না। কদম্বানিলা বলতে যদি অসুবিধে হয় তো আপনি কদু বলবেন।

—উঁহু, কদু চলবে না, পুরো নামটাই বলব। এখন কি দরকারে এসেছ তা বল।

মাথা পিছনে হেলিয়ে চোখ আধবোজা করে গদ্‌গদস্বরে কদম্বানিলা বলল, উঃ কি আশ্চর্য গল্প আপনি লিখেছেন দাদু, ওই 'প্রগামিণী' পত্রিকায় যেটি ক্রমশ বেরুচ্ছে! সবাই ধন্য ধন্য করছে, বলছে এত বড় সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে এ পর্যন্ত আর হয় নি। আমি একটি প্রস্তাব এনেছি, বিজনেস প্রোপোজাল। এই গল্পটির

ছবি অতি চমৎকার হবে। লালা নেবুচাঁদ নাজার দশ লাখ পর্যন্ত খরচ করতে প্রস্তুত আছেন। আপনার নায়িকা অলকার পার্ট আমিই নেব। দেবকী বোস কি অন্য কোনও উপযুক্ত লোককে ডিরেকশনের ভার দেওয়া হবে। তা হাজার দশ টাকা কি আরও বেশী লালাজী আপনাকে দেবেন, আমাকেও মন্দ দেবেন না। এখন আপনি রাজী হলেই হয়।

খুশী হয়ে বটেশ্বর বললেন, তা আমার আর আপত্তি কি, তুমি নায়িকা সাজলে খুব ভালই হবে। কিন্তু গল্পটি শেষ হতে এখনও তো ছ-সাত মাস লাগবে।

—তার জন্যে ভাববেন না দাদু। আমারও এখন অনেক এনগেজমেণ্ট, সাত মাস আমি বোম্বাইএ ব্যস্ত থাকব, নেবুচাঁদজীও থাকবেন। তিনি এখন শুধু আপনার মতটি জানতে চান, পাকা কথাবার্তা সাত মাস পরেই হবে। কিন্তু এর মধ্যে আপনি আর কাউকে কথা দিয়ে ফেলবেন না যেন।

—না, না, তা কেন দেব।

—আপনি দেখে নেবেন, আমার অভিনয় কি ওআণ্ডারফুল হবে. আপনার ওই অলকাকে আমার খুব ভাল লেগেছে কিনা। উঃ ছবির শেষে অলকা যখন বেশ মোটা-সোটা হয়ে তার তিন মাসের খোকাটিকে কোলে নিয়ে পর্দায় দেখা দেবে তখন হাত-তালিতে হাউস একেবারে ফেটে পড়বে, আর আপনি উপস্থিত থাকলে লোকে আপ-নাকে কাঁধে তুলে নাচবে।

বটেশ্বর ত্রস্ত হয়ে বললেন, এই মাটি করলে, সব শেয়ালের এক রা! আমাকে পাগল না করে তোমরা ছাড়বে না দেখছি। শোন কদম্বানিলা, আমার গল্পটি বিয়ো-গান্ত, অলকা মরবে, দু বছর পরে তার স্বামী হেমন্তর সঙ্গে শর্বরীর বিয়ে হবে।

চমকে উঠে চোখ কপালে তুলে কদম্বানিলা বলল, অ্যাঁ, অলকাকে মারবেন! তবে আমি ওতে নেই, ও আমি পারব না।

—নিশ্চয় পারবে, ট্রাজেডির নায়িকা সেজেও তো চমৎকার অভিনয় করা যায়।

—তা হতেই পারে না, মরতে আমি মোটেই রাজী নই, অলকা সেজেও নয়। আপনি সব মাটি করে দিলেন দাদু, মিছেই এখানে এসে আপনাকে বিরক্ত করলুম। তা হলে চললুম, গল্পসরস্বতী দামোদর নশকরের সঙ্গেই কথা বলি গিয়ে, তাঁর 'মানস-মরালী' উপন্যাসটি অপূর্ব হয়েছে, তার নায়িকা মঞ্জুলার পার্টটিও আমার বেশ পছন্দ।

বটেশ্বর চঞ্চল হয়ে উঠলেন। দিন কতক আগে 'দুন্দুভি' পত্রিকায় একটা গণ্ড-মূর্খ সমালোচক লিখেছিল—দামোদর নশকরের গল্প যুগচেতনা সমাজচেতনা যৌন-চেতনায় পরিপূর্ণ, বটেশ্বর সিকদারের রচনা একেবারে অচেতন, শুধু চর্বিতচর্বণ। এই সমালোচনা পড়ার পর থেকে দামোদরের নাম শুনলে বটেশ্বর খেপে ওঠেন। উত্তে-জিত হয়ে হাত নেড়ে বললেন, খবরদার ওটার কাছে যেয়ো না। অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন, দু দিন সময় আমাকে দাও, ভেবে দেখি অলকাকে বাঁচিয়ে গল্পটি মিলনান্ত করা চলে কিনা।

—ভাবনার যে সময় নেই দাদু। কালই আমি বোম্বাই চলে যাচ্ছি, আজকের মধ্যেই একটা হেস্তনেস্ত করে নেবুচাঁদজীকে জানাতে হবে।

গালে হাত দিয়ে একটু ভেবে বটেশ্বর বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা, অলকাকে বাঁচি-য়েই রাখব, শর্বরীই না হয় মরবে। অন্য কারও কাছে তোমাকে যেতে হবে না। জান কদম্বানিলা, আমরা গল্পলিখিয়েরা হচ্ছি সর্বশক্তিমান, কলমের খোঁচায় সৃষ্টি স্থিতি লয় করতে পারি।

কদম্বানিলা উৎফুল্ল হয়ে বলল, থ্যাংক ইউ দাদু, এই তো লক্ষ্মী ছেলের মতন কথা। দিন পায়ের ধুলো। গল্পটি কিন্তু বেশ ভাল করে শেষ করতে হবে, শেষ দৃশ্যে ছেলে কোলে করে অলকার আসা চাই। এখন চললুম, নেবুচাঁদজীকে সুখবরটা দিইগে।

বটেশ্বর সিকদার প্রতিশ্রুতি পালন করলেন, তাঁর গল্প 'কে থাকে কে যায়' মিলনান্তরূপেই সমাপ্ত হল। কিন্তু আট মাস হতে চলল, কদম্বানিলার দেখা নেই কেন? তার ঠিকানাটাও জানেন না যে চিঠি লিখে খবর দেবেন।

সকাল বেলা বটেশ্বর তাঁর নীচের ঘরে বসে নিবিষ্ট হয়ে একটি নূতন গল্প লিখছেন—'মন নিয়ে ছিনিমিনি।' সহসা একটা চেনা গলার আওয়াজ তাঁর কানে এল—আসতে পারি সিকদার মশাই?

ডাক্তার সঞ্জীব চাটুজ্যে ঘরে প্রবেশ করলেন, তাঁর পিছনে প্রিয়ব্রত রায় এবং একটি অচেনা মেয়ে। সঞ্জীব ডাক্তার বললেন, গুড মর্নিং সার। ওঃ আপনার সেই গল্পটিকে একেবারে মহত্তম অবদান বানিয়েছেন মশাই! একে নিশ্চয় চিনতে পেরেছেন—প্রিয়ব্রত রায়, যাকে আপনি পাগল বলে হাঁকিয়ে দিয়েছিলেন। আর এই দেখুন আপনার অলকা, আপনি যার প্রাণরক্ষা করেছেন।

বটেশ্বর প্রণাম করে তাঁর পায়ের কাছে অলকা একটি পাতলা কাগজে মোড়া বড় কৌটো রাখল। সঞ্জীব ডাক্তার বললেন, আপনার জন্যে অলকা নিজের হাতে ছানার মালপো করে এনেছে, খাবেন সার।

হতভম্ব হয়ে বটেশ্বর বললেন, কিছুই তো বুঝতে পারছি না!

—এটা হল আপনার গল্পের সত্যিকার উপসংহার। বুঝিয়ে দিচ্ছি শুনুন।—এই হচ্ছে অলকা প্রিয়ব্রতর স্ত্রী, আমার শালী—মানে আমার স্ত্রীর মাসতুতো বোন। অলকা বছর খানিক স্যানিটোরিয়মে ছিল, বেশ সেরেও উঠেছিল, কুক্ষণে এর হাতে এল 'প্রগামিণী' পত্রিকা। আপনার গল্প পড়তে পড়তে এর মাথায় এক বেয়াড়া ধারণা এল —গল্পের অলকা যদি বাঁচে তবেই আমি বাঁচব, সে যদি মরে তবে আমিও মরব। আমরা অনেক বোঝালুম, ওসব রাবিশ গল্প পড়ে মাথা খারাপ ক'রো না, তুমি তো সেরেই উঠছ। কিন্তু অলকার বদখেয়াল কিছুতেই দূর হল না, রেগুলার অবসেশন। অগত্যা ওর স্বামী এই প্রিয়ব্রত আপনার দ্বারস্থ হল, আপনি ওকে পাগল বলে হাঁকিয়ে দিলেন। তার পর আমি এসে আপনাকে একটি সারগর্ভ লেকচার দিলুম, আপনি তো চটেই উঠলেন। তখন আমার স্ত্রী বলল, তোমাদের দিয়ে কিচ্ছু হবে না, যত সব অকম্মার ধাড়ী, আমিই যাচ্ছি, দেখি বুড়োকে বাগ মানাতে পারি কিনা। সে আপনার সঙ্গে দেখা করে পাঁচ মিনিটের মধ্যে কাজ হাসিল করল। আপনি গল্পের প্লট বদলালেন, অলকাও চটপট সেরে উঠল। এখন কি রকম মুটিয়েছে দেখুন।

বটেশ্বর বললেন, কিন্তু আমার কাছে যিনি এসেছিলেন তিনি তো সিনেমা-অভিনেত্রী, কদম্বানিলা চ্যাটার্জি।

—ওর চোদ্দপুরুষ কখনও সিনেমায় নামে নি। ও হল আমার স্ত্রী অনিলা, নাম ভাঁড়িয়ে কদম্বানিলা সেজে আপনাকে ঠকিয়ে গেছে। অতি ধড়িবাজ মহিলা মশাই! যাক, এখন আপনি এই আসল অলকাকে ভাল করে আশীর্বাদ করুন দেখি।

—হাঁ হাঁ, নিশ্চয় করব। মা অলকা, চিরায়ুষ্মতী হও, সুখে থাক, স্বামীর সোহাগিনী হও, সুসন্তানের জননী হও, লক্ষ্মী তোমার ঘরে অচলা হয়ে থাকুন। আচ্ছা ডাক্তার, সব তো বুঝলুম, কিন্তু আপনার স্ত্রী অনিলা না কদম্বানিলা এলেন না কেন?

—আসবে কি করে মশাই! সে আছে মেটার্নিটি হোমে, তার একটা খোকা হয়েছে, পাক্কা দশ পাউণ্ড ওজন। অনিলা চাঙ্গা হয়ে উঠুক, তার পর আপনার কাছে এসে ধাপ্পাবাজির জন্যে মাপ চাইবে।

১৮৭৮ শক (১৯৫৬)

নির্মোক নৃত্য

দেবরাজ ইন্দ্র বললেন, তোমার মতলবটা কি উর্বশী? এই স্বর্গধামে তো পরম সুখে আছ, উত্তম বাসগৃহে, সুন্দর প্রমোদকানন, মহার্ঘ বেশভূষা, প্রচুর বেতন, সবই তো ভোগ করছ। এসব ত্যাগ করে মর্ত্যলোকে যেতে চাও কেন? এখন রাজা পুরূরবা সেখানে নেই যে তোমাকে মাথায় করে রাখবেন। স্বর্গে তুমি চিরযৌবনা অনিন্দিতা সুরেন্দ্রবন্দিতা, কিন্তু মর্ত্যে গেলেই দু দিনে বুড়িয়ে যাবে, তখন যতই প্রসাধন লেপন কর তোমার দিকে কেউ ফিরে তাকাবে না।

উর্বশী নতমস্তকে বললেন, দেবরাজ, এখানে আমার অরুচি ধরেছে। সব পুরুষকেই আমি জয় করেছি, তাদের একঘেয়ে চাটুবাক্য আমার আর ভাল লাগে না। পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলে আমার অসংখ্য ভক্ত জুটবে, অর্থও প্রচুর পাব। জরার লক্ষণ দেখলে আবার না হয় এখানে চলে আসব।

—তোমার অত্যন্ত অহংকার হয়েছে দেখছি। এখানে তোমার আদরের অভাবটা কি?

—মানুষের কাছে ঢের বেশী আদর পাব। মর্ত্যের এক কবি লিখেছেন, 'মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল, তোমারি কটাক্ষপাতে ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল।' অমরাবতীর কোন্ কবি এমন লিখতে পারে?

—কবিরা বিস্তর মিছে কথা লেখে। যদি প্রমাণ করতে পার যে এখানকার সব পুরুষকে তুমি জয় করেছ তবে তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি। দেবর্ষি আর মহর্ষিদের কাবু করতে পার?

—তাঁরা তো সেই কবে কাবু হয়ে গেছেন।

—আচ্ছা, তোমাকে পরীক্ষা করব। দিব্য মানব জান? যাঁরা স্বর্গে মর্ত্যে অবাধে আনাগোনা করেন, যেমন সনৎকুমার সনাতন সনক সদানন্দ। এঁরা হলেন ব্রহ্মার মানসপুত্র। এঁদের ঘাঁটাতে চাই না, অত্যন্ত বদরাগী মুনি। তবে আরও তিন জন সম্প্রতি এখানে বেড়াতে এসেছেন, কুতুক, পর্বত আর কর্দম ঋষি। এঁরা বেশ শান্ত স্বভাব আর একেবারে নির্বিকার। এঁদের কাবু করতে পারবে?

—যদি পুরুষ হন তবে কাবু করতে পারব না কেন?

—শুধু পুরুষ নন, ওঁরা মহাপুরুষ।

—তবে ওঁদের মহাকাবু করব।

—উত্তম কথা। ওঁরা হলেন দেবর্ষি নারদের বন্ধু। নারদকে বলব তোমার নাচ দেখবার জন্যে আমার সভায় ওঁদের নিমন্ত্রণ করে আনবেন।

নারদের মুখে নিমন্ত্রণ পেয়ে তিন ঋষি প্রীত হলেন। বললেন, আমরা ময়ূরনৃত্য খঞ্জননৃত্য দেখেছি, বানর-ভল্লুকাদির নৃত্যও দেখেছি, কিন্তু নারীনৃত্য কখনও দেখি নি। দেখবার জন্য খুব কৌতূহল আছে। কিন্তু উর্বশী তো শুনেছি অপ্সরা, সে নারী বটে তো?

নারদ বললেন, এমন নারী যার জন্যে 'অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা, নাচে রক্তধারা।' তার নৃত্য দেখলে তোমরা মুগ্ধ হবে। এখন ইন্দ্রসভায় যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নাও।

পর্বত ঋষির দাড়ি গলা পর্যন্ত, কর্দমের বুক পর্যন্ত, আর কুতুক ঋষির হাঁটু পর্যন্ত। এঁরা যথাসাধ্য ভব্য বেশ ধারণ করে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হলেন। পর্বত একটি বল্কল পরলেন, বল্কল না থাকায় কর্দম শুধু কৌপীন ধারণ করলেন। মহামুনি কুতুক একবারে সর্বত্যাগী নিষ্কিঞ্চন, তাঁর বল্কলও নেই কৌপীনও নেই, অগত্যা তিনি দিগম্বর হয়েই রইলেন। নারদ বললেন, ওহে কুতুক, অন্তত একটি তৃণগুচ্ছের মেখলা পরে নাও। কুতুক বললেন, কোনও প্রয়োজন নেই, আজানুলম্বিত শ্মশ্রুই আমার বসন।

নবাগত তিন ঋষিকে পাদ্য অর্ঘ্য আসন ইত্যাদি দিয়ে যথাবিধি সৎকার করে ইন্দ্র বললেন, হে মহাতেজা তপঃসিদ্ধ জিতেন্দ্রিয় মহর্ষিত্রয়, আমার মুখ্যা অপ্সরা উর্বশী আপনাদের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত একটি অভিনব নৃত্য দেখাবে—নির্মোক নৃত্য, মর্ত্য-লোকের প্রতীচ্যখণ্ডের ম্লেচ্ছগণ যাকে বলে স্ট্রিপ-টীজ। এখানে অগ্নি বায়ু বরুণ প্রভৃতি দেবগণ, নারদাদি দেবর্ষিগণ, অগস্ত্যাদি মহর্ষিগণ সকলেই সমবেত হয়েছেন, মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাও আছেন। আপনাদের আগমনে আমরা সকলেই কৃতার্থ হয়েছি। এখন অনুমতি দিন, উর্বশী নৃত্য আরম্ভ করুক।

আগন্তুক তিন ঋষির মুখপাত্র মহামুনি কুতুক বললেন, হাঁ হাঁ, বিলম্বে প্রয়োজন কি, আমরা নৃত্য দেখবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি।

লাস্যনৃত্যের উপযুক্ত বেশভূষার উপর একটি আলখাল্লা বা ঘেরাটোপ পরে উর্বশী ইন্দ্রসভায় প্রবেশ করলেন। সকলকে প্রণাম করে যুক্তকরে বললেন, হে মহাভাগ দেবগণ এবং অগ্নিকল্প ঋষিগণ, আমি যে নির্মোক নৃত্য দেখাব তাতে আমার দেহ ক্রমে ক্রমে অপাবৃত হবে। আপনাদের তাতে আপত্তি নেই তো?

কুতুক তাঁর মাথা আর বিপুল দাড়ি নেড়ে বললেন, আপত্তি কিসের? যাবতীয় জন্তুর ন্যায় তোমার দেহও পঞ্চভূতের সমষ্টি। তার অভ্যন্তরে নারীসত্তা কোথায় আছে তাই আমরা দেখতে চাই।

উর্বশী পুনর্বার সবিনয়ে বললেন, আমার নৃত্যে যদি অসভ্য বা কুৎসিত কিছু দেখতে পান তো দয়া করে জানাবেন, তৎক্ষণাৎ আমি নৃত্য সংবরণ করব।

ঘেরাটোপ ফেলে দিয়ে উর্বশী তাঁর মণিমুক্তাস্বর্ণময় দৃষ্টিবিভ্রমকর উজ্জ্বল বেশ প্রকাশ করলেন। তার পর কিছুক্ষণ নৃত্য করে তাঁর উত্তরীয় বা ওড়না খুলে ফেলে দিলেন।

পর্বত ঋষি হাত তুলে বললেন, উর্বশী, নিবৃত্ত হও, তোমার নৃত্যে শালীনতার অত্যন্ত অভাব দেখছি, এই চিত্তপীড়াকর নৃত্য আমরা দেখতে চাই না।

মহামুনি কুতুক ধমক দিয়ে বললেন, তোমার চিত্তপীড়া হয়েছে তো আমাদের কি? তুমি চক্ষু মুদ্রিত করে থাক, নৃত্য চলুক।

উর্বশী চুপি চুপি ইন্দ্রকে বললেন, দেবরাজ, পর্বত ঋষি কাবু হয়েছেন।

নৃত্য চলতে লাগল। পর্বত ঋষি দুই হাতে চোখ ঢাকলেন, কিন্তু কৌতূহল দমন করতে না পেরে আঙুলের ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগলেন।

ক্রমে ক্রমে উর্বশী তাঁর দেহের ঊর্ধ্বাংশ অনাবৃত করলেন। তখন কর্দম ঋষি চোখ ঢেকে বললেন, উর্বশী, তোমার এই জুগুপ্সিত নৃত্য দেখলে আমাদের তপস্যা নষ্ট হবে, ক্ষান্ত হও।

কুতুক ভর্ৎসনা করে বললেন, কেন ক্ষান্ত হবে? তোমার সহ্য না হয় তো উঠে যাও এখান থেকে।

সহাস চক্ষুর ইঙ্গিতে উর্বশী ইন্দ্রকে জানালেন যে কর্দমও কাবু হয়েছেন।

তার পর উর্বশী ক্রমশ তাঁর সমস্ত আবরণ আর আভরণ খুলে ভূমিতে নিক্ষেপ করলেন এবং অবশেষে 'কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি' প্রকাশ করে পাষাণবিগ্রহবৎ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সভাস্থ দেবগণ দেবর্ষিগণ ও মহর্ষিগণ বললেন, সাধু সাধু!

কুতুক বললেন, থামলে কেন উর্বশী, আরও নির্মোক ত্যাগ কর।

নারদ বললেন, আর নির্মোক কোথায়? উর্বশী তো সমস্তই মোচন করেছে।

কুতুক বললেন, ওই যে, ওর সর্বগাত্রে একটি পদ্মপলাশতুল্য শুভ্রারক্ত মসৃণ আবরণ রয়েছে।

—আরে ও তো ওর গায়ের চামড়া।

—ওটাও খুলে ফেলুক।

—পাগল হলে নাকি হে কুতুক? গায়ের চামড়া তো শরীরেরই অংশ, ও তো পরিচ্ছদ নয়।

—পরিচ্ছদ না হ'ক নির্মোক তো বটে। ওই খোলসটাও খুলে ফেলুক, নীচে কি আছে দেখব।

নারদ বললেন, কি আছে শোন। চর্মের নীচে আছে মেদ, তার নীচে মাংস, তার নীচে কংকাল।

—তার নীচে কি আছে?

—কিচ্ছু নেই।

—যার প্রভাবে 'অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা, নাচে রক্তধারা', উর্বশীর সেই নারীত্ব কোথায় আছে?

—নারীত্ব আছে ওর বসনে, আভরণে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, ভাবভঙ্গীতে, আর অনুরাগী পুরুষের চিত্তে। তুমি তো বীতরাগ, চিত্ত পুড়িয়ে খেয়েছ, দেখবে কি করে?

মহামুনি কুতুক ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, আমাকে প্রতারিত করবার জন্যে এখানে ডেকে এনেছ? এই উর্বশী একটা অন্তঃসারশূন্য জন্তু, ছাগদেহের সঙ্গে ওর দেহের প্রভেদ কি? ওহে পর্বত, ওহে কর্দম, চল আমরা যাই, এখানে দেখবার কিছু নেই।

উর্বশীর লাঞ্ছনা দেখে মেনকা ঘৃতাচী মিশ্রকেশী প্রভৃতি অপ্সরার দল আনন্দে করতালি দিলেন।

কুতুক পর্বত ও কর্দম সভা ত্যাগ করলে উর্বশী নতমুখে অশ্রুপাত করতে লাগলেন।

ইন্দ্র বললেন, উর্বশী, শান্ত হও, নিরন্তর জয়লাভ কারও ভাগ্যে ঘটে না, আমিও বৃত্রাসুর কর্তৃক পরাজিত হয়েছিলাম।

উর্বশী বললেন, একে কি পরাজয় বলে দেবরাজ? ওই কুতুক ঋষি একটা অপুরুষ অপদার্থ দগ্ধেন্দ্রিয় উন্মাদ, ওকে দিয়ে এই সভায় আমার এমন অপমান করিয়ে আপনার কি লাভ হল? আমি অমরাবতীতে থাকব না, মর্ত্যেও যাব না, তপশ্চর্যা করব।

অনন্তর উর্বশী মাথা মুড়োলেন, তুলসীমালা পরলেন, তিলকচর্চা করলেন, এবং নিত্যধাম গোলোকে গিয়ে হরিপাদপদ্মে আশ্রয় নিলেন।

১৮৭৮ শক (১৯৫৬)

ডম্বরু পণ্ডিত

আচার্য রোহিত তাঁর শিষ্য ডম্বরুকে বললেন,বৎস, তুমি নিখিল বিদ্যায় পারদর্শী হয়েছ, স্নাতক হবার পরেও এখানে দশ বৎসর স্নাতকোত্তর গবেষণা করেছ, তোমার যৌবনও উত্তীর্ণপ্রায়। আর আমার কাছে বৃথা কালক্ষেপ করে লাভ কি? এখন তুমি এই ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গার্হস্থ্যে প্রবেশ কর।

ডম্বরু প্রণিপাত করে রোহিতের চরণে একটি ক্ষুদ্র সুবর্ণখণ্ড রেখে বললেন, গুরুদেব, আমি অতি দরিদ্র, এই যৎকিঞ্চিত দক্ষিণা গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ করুন।

শিষ্যের মস্তকে করার্পণ করে রোহিত প্রসন্নবদনে বললেন, ওহে ডম্বরু, তুমি পঁচিশ বৎসর আমার যে সেবা করেছ তাই প্রচুর দক্ষিণা, অর্থে আমার প্রয়োজন নেই। আমি জানি তুমি দরিদ্র, এই সুবর্ণখণ্ড তোমার পথের সম্বল হ'ক।

ডম্বরু বললেন, গুরুদেব, আপনার দয়ার সীমা নেই। যাত্রার পূর্বে আপনার কাছে আরও কিঞ্চিৎ বিদ্যা ভিক্ষা চাচ্ছি।

রোহিত সহাস্যে বললেন, বৎস, নিমজ্জিত কুম্ভের ন্যায় তুমি বিদ্যায় পরিপ্লুত হয়েছ, তোমার অন্তরে আর বিন্দুমাত্র ধারণের স্থান নেই। এখন কোনও গুণবান নৃপতিকে তুষ্ট করে তাঁর সভাকবি বা সভাপণ্ডিত হও। কিন্তু নির্বোধ আত্মগর্বী লোকের সংশ্রবে থেকো না, তাদের দানও নিও না।

ডম্বরু নতমস্তকে যুক্তকরে বললেন, গুরুদেব, আমাকে একটি উপাধি দেবেন না?

—কি উপাধি তুমি চাও?

—যদি যোগ্য মনে করেন তবে কৃপা করে আমাকে বিশ্ববিদ্যোদধি উপাধি দিন।

রোহিত হাস্য করে বললেন, তথাস্তু। হে পণ্ডিত ডম্বরু বিশ্ববিদ্যোদধি, তোমার সর্বত্র জয় হ'ক। দেবী সরস্বতী তোমাকে রক্ষা করুন, দেবগুরু বৃহস্পতি তোমাকে সুবুদ্ধি দিন।

পথে যেতে যেতে ডম্বরু একটি প্রশস্তি রচনা করলেন। কিছু দিন পর্যটনের পর তিনি শুনলেন কাশীরাজ বিতর্দন অতি গুণবান নৃপতি। তাঁরই আশ্রয়ে বাস করবেন এই স্থির করে ডম্বরু রাজসভায় উপস্থিত হয়ে এই প্রশস্তি পাঠ করলেন—

চন্দ্র সূর্য ম্লান তব যশের প্রভায়,
পরাজিত শত্রুকুল ছুটিয়া পালায়।
দেববৃন্দ হতমান নিরানন্দ অতি,
অসূয়ায় শয্যাগত ইন্দ্র সুরপতি।
উর্বশী মেনকা রম্ভা ছাড়ি স্বর্গধাম
তোমারে ঘিরিয়া নৃত্য করে অবিরাম।
পদ্মালয়া করেছেন তোমারে বরণ,
একাকী বৈকুণ্ঠে হরি করেন ক্রন্দন।
ডম্বরু পণ্ডিত আমি গাহি তব জয়,
মহারাজ, মোর প্রতি কিবা আজ্ঞা হয়?

কাশীরাজ বিতর্দন প্রীত হয়ে বললেন, বাঃ, অতি সুন্দর প্রশস্তি। কোষপাল, এই বিপ্রকে এক শত স্বর্ণমুদ্রা দাও।

ডম্বরু মাথা নেড়ে বললেন, না মহারাজ, নির্বোধ আত্মগর্বী লোকের দান আমি নিতে পারি না।

আশ্চর্য হয়ে রাজা বললেন, নির্বোধ আত্মগর্বী বলছ কাকে?

—আপনাকে। আমার প্রশস্তিতে যে উৎকট অত্যুক্তি আছে তা আপনি অম্লান-বদনে মেনে নিয়েছেন।

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বিতর্দন বললেন, নির্বোধ আত্মগর্বী তুমি নিজে! যদি ব্রাহ্মণ না হতে তবে ধৃষ্টতার জন্য তোমাকে শূলে চড়াতাম। কোষপাল, এক রৌপ্যমুদ্রা দিয়ে এই গণ্ডমূর্খকে বিদায় কর।

মুদ্রা না নিয়েই ডম্বরু কাশীরাজসভা ত্যাগ করলেন। তার পর বহু দিন পর্যটন করে বৎসরাজধানী কৌশাম্বী নগরীতে উপস্থিত হলেন এবং বৎসরাজ পুরঞ্জয়ের সভায় গিয়ে পূর্ববৎ প্রশস্তি পাঠ করলেন।

পুরঞ্জয় বললেন, অতি উত্তম রচনা। কোষপাল, এই পণ্ডিতপ্রবরকে এক শত স্বর্ণমুদ্রা দাও।

ডম্বরু পূর্ববৎ মাথা নেড়ে বললেন, না মহারাজ, নির্বোধ আত্মবগীর দান আমি নিতে পারি না, গুরুদেবের নিষেধ আছে। আমার প্রশস্তিতে যে উৎকট চাটুবাক্য আছে তা আপনি বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়েছেন।

ক্রুদ্ধ হয়ে পুরঞ্জয় বললেন, ওহে দ্বিজগর্দভ, দেবতা রাজা আর প্রণয়িনীর স্তুতিতে অতিরঞ্জন থাকেই, তা অলংকারশাস্ত্রসম্মত। আমি তোমার কবিত্বই বিচার করেছি, সত্যাসত্য গ্রাহ্য করি নি। কোষপাল, এই কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খ ব্রাহ্মণকে এক রৌপ্য-মুদ্রা দিয়ে বিদায় কর।

দক্ষিণা না নিয়েই ডম্বরু প্রস্থান করলেন। অনেক দিন পরে তিনি দশার্ণ দেশে উপস্থিত হলেন এবং সেখানকার রাজা উদায়ুধের সভায় গিয়ে পূর্ববৎ প্রশস্তি পাঠ করলেন।

উদায়ুধ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, ওহে চাটুকার মিথ্যাভাষী ব্রাহ্মণ, ব্যাজস্তুতি দ্বারা তুমি আমার অপমান করেছ। দূর হও রাজ্য থেকে।

উৎফুল্ল হয়ে ডম্বরু বললেন, সাধু সাধু! মহারাজ, আপনার জয় হোক, আপনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, আমার প্রশস্তিতে যে অত্যুক্তি আছে তা মেনে নেন নি। আপনি নির্বোধ নন, আত্মগর্বীও নন, তবে উদ্ধত বটে। আমি আপনারই আশ্রয়ে বাস করব। আমার সংসারযাত্রার জন্য যথোচিত বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিন এবং একটি সুলক্ষণা সুপাত্রীও যোগাড় করে দিন যাকে বিবাহ করে আমি গৃহী হতে পারি।

অট্টহাস্য করে উদায়ুধ বললেন, হে পণ্ডিতমূর্খ, তোমার স্পর্ধা কম নয় যে আমাকে পরীক্ষা করতে এসেছ! তোমার তুল্য ধৃষ্ট কপটভাষী পুরুষকে আমি আশ্রয় দিতে পারি না। কোষপাল, দশ রৌপ্যমুদ্রা দিয়ে এই উন্মাদকে বিদায় কর।

ডম্বরু মুদ্রা নিলেন না।

ক্ষুব্ধ ডম্বরু আবার পথ চলতে লাগলেন। তাঁর সম্বল সেই ক্ষুদ্র সুবর্ণখণ্ড বিক্রয় করে যে অর্থ পেয়েছিলেন তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। অপরাহ্নকালে অত্যন্ত শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে তিনি মালব রাজ্যে উপস্থিত হলেন। শিপ্রা নদীর তীরে এসে ডম্বরু ভাবতে লাগলেন, অহো দুরদৃষ্ট! রাজাদের পরীক্ষার জন্য আমি যে উপায় অবলম্বন করেছিলাম তা বিফল হয়েছে, দুই রাজা নির্বোধ প্রতিপন্ন হয়েছেন, তৃতীয় রাজা, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও অকারণে আমার প্রতি বিমুখ হয়েছেন। এখন কি করা যায়? হে দেবী সরস্বতী, আমাকে রক্ষা কর।

নদীতীরে উপবিষ্ট হয়ে ডম্বরু ব্যাকুল মনে বাগ্‌দেবীকে ডাকতে লাগলেন। সহসা শুনতে পেলেন, মধুর কণ্ঠে কে বলছে—দ্বিজবর, আপনি কি বিপদাপন্ন?

চমকিত হয়ে ডম্বরু দেখলেন, এক সদ্যঃস্নাতা সিক্তবসনা সুন্দরী তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করে ডম্বরু বললেন, ভগবতি ভারতি দেবি নমস্তে! আমাকে রক্ষা কর।

বীণানিক্বণের ন্যায় হাস্য করে সুন্দরী বললেন, দেবী টেবী নই, আমি সামান্যা শিল্পিনী। আমার নাম শিলীন্ধ্রী, রাজপুরীর অঙ্গনাদের জন্য পুষ্পালংকার রচনা করে জীবিকা নির্বাহ করি। নদীতে স্নান করে উঠে দেখলাম আপনি কাতরোক্তি করছেন। দয়া করে বলুন কি হয়েছে।

ডম্বরু বললেন, আমি বৃহস্পতিকল্প আচার্য রোহিতের প্রিয় শিষ্য পণ্ডিত ডম্বরু বিশ্ববিদ্যোদধি। নিখিল শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে সম্প্রতি গুরুর আশ্রম থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছি। তিনি বলেছেন, বৎস, তুমি বিদ্যায় পরিপ্লুত হয়েছে, এখন কোনও নৃপতিকে তুষ্ট করে তাঁর সভাকবি বা সভাপণ্ডিত হও, কিন্তু নির্বোধ আর আত্মগর্বী লোকের সংশ্রবে থেকো না, তাদের দানও নিও না। আমি একে একে কাশীরাজ বৎসরাজ ও দশার্ণরাজের সকাশে উপস্থিত হয়ে তাঁদের পরীক্ষা করেছি, কিন্তু দেখলাম প্রথম দুই রাজা নির্বোধ আত্মগর্বী, এবং তৃতীয় রাজা বুদ্ধিমান হলেও অত্যন্ত উদ্ধত ও ক্রোধী, আমার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেছেন। আমি এখন নিঃস্ব শ্রান্ত ক্ষুধাতুর, কি করা উচিত স্থির করতে পারছি না।

শিলীন্ধ্রী বললেন, আপনি দয়া করে আমার কুটীরে এসে বিশ্রাম ও ক্ষুন্নিবৃত্তি করুন। সংকোচ করবেন না, আমি আমার বৃদ্ধা জননীর সহিত বাস করি। কাল অবন্তীরাজের সভায় যাবেন। তিনি অতি বুদ্ধিমান নরপতি, নিশ্চয় আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করবেন।

ডম্বরু বললেন, ভদ্রে, আমি আজই অবন্তীরাজের কাছে গিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করতে চাই। যদি সফলকাম হই তবেই তোমার আতিথ্য গ্রহণ করব, নতুবা দেবী সরস্বতীর আরাধনায় প্রায়োপবেশনে প্রাণ বিসর্জন দেব।

শিলীন্ধ্রী প্রশ্ন করলেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আপনি নৃপতিদের কিরূপে পরীক্ষা করেছিলেন?

ডম্বরু আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলেন। শিলীন্ধ্রী স্মিতমুখে বললেন, পণ্ডিতবর, আপনি মিথ্যা প্রিয়বাক্য বলেছিলেন সেজন্য অভীষ্ট ফল পান নি। অবন্তীরাজ তীক্ষ্ণবুদ্ধি গুণগ্রাহী, তাঁর কাছে গিয়ে আপনি সত্যভাষণ করুন, তাঁর দোষ গুণ সবই কীর্তন করুন।

ডম্বরু বললেন, সুন্দরী, তোমার মন্ত্রণা মন্দ নয়, মিথ্যা স্তুতি করে তিন বার

ব্যর্থকাম হয়েছি, এবারের সত্য স্তুতি করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু এদেশের রাজার দোষ গুণ আমি কিছুই জানি না, সত্যভাষণ কি করে করব?

শিলীন্ধ্রী বললেন, ভাববেন না, আমি আপনাকে সমস্ত শিখিয়ে দিচ্ছি। একটু পরেই মহারাজ সান্ধ্যসভায় সমাসীন হবেন, আপনি সেখানে চলুন, আপনাকে পথ দেখিয়ে দেব।

ডম্বরুকে উপদেশ দিতে দিতে কিছু দূর তাঁর সঙ্গে গিয়ে শিলীন্ধ্রী বললেন, বামে ওই কুঞ্জবনের মধ্যে আমার গৃহ। দক্ষিণের ওই পথ রাজভবনের সিংহদ্বারে শেষ হয়েছে, আপনি সোজা চলে যান।

শিলীন্ধ্রী প্রণাম করে বিদায় নিলেন।

মালবরাজ বিক্রমাদিত্য তাঁর রাজধানী অবন্তী অর্থাৎ উজ্জয়িনীর সভা অলংকৃত করে বসে আছেন। দৈনিক রাজকার্য তিনি প্রাতঃকালীন সভাতেই সম্পন্ন করে থাকেন এখন এই সান্ধ্যসভায় চিত্তবিনোদনের জন্য সভাসদ্‌বর্গের সহিত মিলিত হয়েছেন।

রুক্ষকেশ মলিনবেশ ধূলিধূসরদেহ ডম্বরু রাজসভায় প্রবেশ করলেন, ব্রাহ্মণ দেখে কেউ তাঁকে বাধা দিল না। রাজার সম্মুখে এসে আশীর্বাদের ভঙ্গীতে করতল বিন্যস্ত করে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন, তাঁর বাক্যস্ফূর্তি হল না।

রাজা বললেন, ব্রাহ্মণ, আপনাকে অত্যন্ত অবসাদগ্রস্ত দেখছি। আপনি হস্ত পদ মুখ প্রক্ষালন করুন, দুগ্ধ পান করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন, তার পর সুস্থ হলে আপনার বক্তব্য বলবেন। প্রতিহারী, এই বিপ্রকে বিশ্রামকক্ষে নিয়ে গিয়ে সেবার ব্যবস্থা কর।

ডম্বরু বললেন, মহারাজ, আমি সংকল্প করেছি, আমার বক্তব্য শুনে যদি আপনি প্রসন্ন হন তবেই জলস্পর্শ করব। অতএব যা বলছি অবধান করুন—

মহাবল মহামতি বিক্রম ভূপতি,
তব রাজ্যে প্রজাগণ সুখে আছে অতি।
শিষ্ট জন দুগ্ধ ঘৃত মৎস্য মাংসে তুষ্ট,
শূলে চড়িয়াছে যত দুরাচার দুষ্ট।
বহু জ্ঞানী গুণী আছে আশ্রয়ে তোমার,
অধিকন্তু কতিপয় আছে চাটুকার।
আছে নবরত্ন তব যশস্বী প্রচণ্ড,
যদিও কয়েক জন শুধু কাচখণ্ড।
আছে তব তিন ভার্যা মহিষী প্রেয়সী,
দশ উপভার্যা নৃত্যগীতপটীয়সী।
তথাপি অবলা বালা শিলীন্ধ্রীর প্রতি
কেন তব লোভ ওহে প্রৌঢ় নরপতি?
বিশ্ববিদ্যোদধি আমি ডম্বরু পণ্ডিত,
নির্ভয়ে কহিয়া থাকি যাহা সমুচিত।
নিবেদন করিলাম লোকে যাহা কয়,
মহারাজ, মোর প্রতি কিবা আজ্ঞা হয়?

ডম্বরুর ভাষণ শুনে বিক্রমাদিত্যের গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল আরক্ত হল। নবরত্ন সভার দিকে দৃষ্টিপাত করে তিনি প্রশ্ন করলেন, আপনারা কি বলেন?

বেতালভট্ট বললেন, মহারাজ, এই বিশ্ববিদ্যোদধির উপযুক্ত পুরস্কার—মস্তক-মুণ্ডন, দধিলেপন ও গর্দভবাহনে বহিষ্কার।

রাজা আবার প্রশ্ন করলেন, কবি কালিদাস কি বলেন?

কালিদাস বললেন, মহারাজ, অনুমতি দিন এই ব্রাহ্মণকে আমি অন্তরালে নিয়ে যাই। কিছুক্ষণ পরে আবার এঁকে আপনার সকাশে আনব।

রাজা অনুমতি দিলেন। ডম্বরুর হাত ধরে কালিদাস বললেন, পণ্ডিত, এস আমার সঙ্গে। মাথা নেড়ে হাত টেনে ডম্বরু বললেন, রাজার অভিপ্রায় না জেনে আমি 'পাদমেকং ন গচ্ছামি'।

ডম্বরুর কানে কানে কালিদাস বললেন, রাজা প্রসন্ন হয়েছেন। আমার সঙ্গে এস, তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

দুই দণ্ড কাল অতীত হলে কালিদাস রাজসভায় ফিরে এলেন, তাঁর পশ্চাতে দুজন রাজভৃত্য ডম্বরুকে ধরাধরি করে এনে রাজার সম্মুখে অর্ধশয়ান অবস্থায় রাখল। ডম্বরুর দেহ পরিষ্কৃত, মস্তক তৈলাক্ত, উদর স্ফীত, চক্ষু অর্ধনিমীলিত।

উদ্‌বিগ্ন হয়ে বিক্রমাদিত্য প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে এই ব্রাহ্মণের?

কালিদাস বললেন, ভয় নেই মহারাজ। এই ডম্বরু পণ্ডিত পথশ্রমে ও ক্ষুধায় অবসন্ন ছিলেন, তার ফলে এঁর কিঞ্চিৎ বুদ্ধিভ্রংশও হয়েছিল। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধে ইনি স্নান ক'রে নব বস্ত্র প'রে খাদ্য গ্রহণ করেছেন। দীর্ঘ উপবাসের পর গুরুভোজনের জন্য ইনি উত্থানশক্তিহীন হয়ে পড়েছেন। তথাপি এঁর ভাষণের পরিশিষ্টস্বরূপ আরও কিছু আপনাকে এখনই নিবেদন করতে চান।

—বেশ তো, কি বলতে চান বলুন না।

—মহারাজ, আকণ্ঠ দধি চিপিটক রম্ভা লড্ডু ভোজনের ফলে এঁর বাক্‌শক্তিও এখন লোপ পেয়েছে, অথচ নিজের বক্তব্য জানাবার জন্য ইনি ব্যগ্র। যদি অনুমতি দেন তবে এঁর প্রতিনিধি হয়ে আমিই নিবেদন করি।

বিক্রমাদিত্য অনুমতি দিলেন। ডম্বরুর পূর্ব ইতিহাস বিবৃত করে কালিদাস বললেন, মহারাজ, এই ডম্বরু পণ্ডিত বিশ্ববিদ্যোদধি হলেও অতি সরলমতি এবং লোকব্যবহারে অনভিজ্ঞ। রাজসভায় আসার পূর্বে দুর্দৈবক্রমে শিলীন্ধ্রীর সঙ্গে এঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেই ব্যাপিকা প্রগল্‌ভা দুর্বিনীতা রমণী এঁকে যা শিখিয়েছে তাই ইনি শুক পক্ষীর ন্যায় আবৃত্তি করেছেন।

রাজা বললেন, ডম্বরু তাঁর ভ্রম বুঝতে পেরেছেন?

—মহারাজ, ডম্বরু বলতে চান, আপনার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকায় শিলীন্ধ্রীর বাক্যই উনি মেনে নিয়েছিলেন। এখন উদরপূর্তির পর ইনি বুঝেছেন যে পরপ্রত্যয়ে চালিত হওয়া মূঢ়বুদ্ধির লক্ষণ। অতএব ইনি আপনার আশ্রয়ে থেকে আপনার সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করে যথার্থ প্রশস্তি রচনা করতে চান। আপনি কৃপা করে ডম্বরুর প্রার্থনা পূরণ করুন, এঁকে অন্যতম সভাসদের পদ দিন।

—কোন্ কর্মের ইনি যোগ্য?

—মহারাজ, আপনার সভায় বিদূষক নেই, ডম্বরুকে বিদূষক নিযুক্ত করুন।

—বলেন কি! ইনি তো শুষ্ককাষ্ঠতুল্য নীরস, কৌতুকের কিছুমাত্র বোধ আছে মনে হয় না।

—মহারাজ, কৌতুক উৎপাদনের সহজাত শক্তি এঁর আছে, নিজের অজ্ঞাতসারেই ইনি আপনার এবং এই রাজসভার সকলের মনোরঞ্জন করতে পারবেন, যেমন আজ করেছেন।

রাজা সহাস্যে বললেন, উত্তম প্রস্তাব। ওহে ডম্বরু পণ্ডিত, তোমাকে বিদূষকের পদ দিলাম। মন্ত্রী, কবি কালিদাসের সঙ্গে পরামর্শ করে তুমি ডম্বরুর জন্য উপযুক্ত বৃত্তি ও বাসগৃহের ব্যবস্থা করে দাও।

এতক্ষণে ডম্বরু কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করলেন। চক্ষু উন্মীলিত করে হাতে ভর দিয়ে উঠে বললেন, মালবপতি মহামতি বিক্রমাদিত্যের জয়! মহারাজ, আমার আর একটি প্রার্থনা আছে। গুরুদেব আমাকে গৃহী হতে বলেছেন, অতএব আমার জন্য একটি সুলক্ষণা সৎকুলোদ্ভবা সুবিনীতা সুপাত্রীর সন্ধানের আজ্ঞা হ'ক।

বিক্রমাদিত্য তাঁর দণ্ডনায়ককে সম্বোধন করে বললেন, ওহে বীরভদ্র, এই ব্রাহ্মণের জন্য একটি সুপাত্রীর সন্ধান কর। আর, শিলীন্ধ্রীনাম্নী যে রমণী আমার মহিষীদের জন্য পুষ্পালংকার রচনা করে, তাকে রাজনিন্দার অপরাধে দণ্ড দাও—মস্তকমুণ্ডন, দধিলেপন, এবং গর্দভারোহণে বহিষ্কার।

ব্যাকুল হয়ে ডম্বরু বললেন, মহারাজ, বুদ্ধিহীনা অবলা সরলা বালার অপরাধ মার্জনা করুন।

রাজা বললেন, ওহে বীরভদ্র, এই ডম্বরু পণ্ডিত যদি সেই দুর্বিনীতা নারীর পাণিগ্রহণ করেন তবে তাকে নিষ্কৃতি দেবে।

ডম্বরু পাণিগ্রহণ করেছিলেন।

১৮৭৮ শক (১৯৫৬)

দুই সিংহ

বেচারাম সরকার খুব ধনী লোক, যুদ্ধের সময় কনট্রাক্টরি করে প্রচুর রোজগার করেছেন। এখন তাঁর কারবার বিশেষ কিছু নেই, কিন্তু তার জন্যে খেদও নেই। বেচারামের লোভ অসীম নয়, তিনি থামতে জানেন। যা জমিয়েছেন তাতেই তিনি তুষ্ট, বরং ব্যবসার ঝঞ্ঝাট আর পরিশ্রম থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে এখন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন।

বেচারাম সুশিক্ষিত নন। তাঁর পত্নী সুবালা সেকেলে পাড়াগেঁয়ে মহিলা, একটু আধটু গল্পের বই পড়েন, তাও সব বুঝতে পারেন না। তাঁদের দুই সন্তান সুমন্ত আর সুমিত্রা কলেজে পড়ছে, তাদের রুচি আধুনিক, বাপ-মায়ের কথাবার্তা আর চালচলনে লজ্জা পায়। তারা স্পষ্টই বলে—বাবা কেবল টাকাই রোজগার করেছেন, শুধু পঞ্জাবী গুজরাটী মারোয়াড়ী আর বড়-সায়েব ছোট-সায়েবদের সঙ্গে মিশেছেন, কালচার কৃষ্টি সংস্কৃতি কাকে বলে জানেন না। আর মা তো কেবল সেকরা আর গহনা আর গোছা গোছা পান আর জরদা-সুরতি নিয়েই আছেন। বাবা, তুমি তোমার ওই সেকেলে ঝোলা গোঁফটা কামিয়ে ফেল, চুল ব্যাক-ব্রশ করতে শেখ। এখনও তো তেমন বুড়ো হও নি, একটু স্মার্ট হও। আর মা, তোমার দাঁতের দিকে তো চাওয়া যায় না, পানদোক্তা খেয়ে আতা-বিচির মতন কালো করেছ। সব তুলে ফেলে নতুন দাঁত বাঁধাও। আর তো বাবার কাজের চাপ নেই, এখন তোমরা দুজনে চালচলন বদলাও, সভ্য সমাজে যাতে মিশতে পার তার চেষ্টা কর।

বেচারাম আর সুবালা অতি সুবোধ বাপ-মা। ছেলেমেয়ের কথা শুনে হেসে বললেন, বেশ তো, এতদিন আমরা তোদের মানুষ করেছি, লেখাপড়া শিখিয়েছি, এখন তোরাই আমাদের তালিম দিয়ে সভ্য করে নে।

বাপ-মাকে অভিজাত সভ্য সমাজের যোগ্য করবার জন্যে ছেলেমেয়ে উঠে-পড়ে লেগে গেল। বিখ্যাত ক্লাব 'সজ্জন সংগতি' র* নাম আপনারা শুনে থাকবেন। তার সেক্রেটারি কপোত গুহ বার-অ্যাট-ল আর তাঁর স্ত্রী শিঞ্জিনী গুহর সঙ্গে সুমন্ত আর সুমিত্রার আলাপ আছে। দুজনে গুহ দম্পতিকে ধরে বসল তাঁরা যেন বেচারাম আর সুবালাকে পালিশ করবার ভার নেন। কপোত আর শিঞ্জিনী সানন্দে রাজী হলেন এবং বেচারামের বাড়িতে ঘন ঘন আসতে লাগলেন। কর্তার তালিমের ভার মিস্টার গুহ আর গিন্নীর ভার মিসিস গুহ নিলেন। বেচারাম কৃপণ নন, নিজেদের শিক্ষার জন্যে উপযুক্ত মাসিক দক্ষিণার প্রস্তাব করলেন। কপোত গুহ প্রথমে ভদ্রোচিত কুণ্ঠা প্রকাশ করে অবশেষে নিতে রাজী হলেন। ঘর-সাজানো, খাবার ব্যবস্থা, পোশাক, গহনা, কথাবার্তার কায়দা, সব বিষয়েই সংস্কারের চেষ্টা হতে লাগল। বেচারাম গোঁফ-হীন হলেন, ব্যাক-ব্রশ করলেন, বাড়িতে ধুতির বদলে ইজার পরতে লাগলেন। কিন্তু সুবালা কিছুতেই পান-দোক্তা ছাড়লেন না, দাঁত বাঁধাতেও রাজী হলেন না। শিঞ্জিনী বার বার সতর্ক করে দিলেও সুবালার গ্রাম্য উচ্চারণ দূর হল না।

* 'সজ্জন সংগতি'র পূর্বকথা 'কৃষ্ণকলি' গ্রন্থে আছে (বরনারী বরণ)।

দুই সিংহ

সম্প্রতি বিম্বিসার রোডে বেচারামবাবুর প্রকাণ্ড বাড়ি হয়েছে, তার প্ল্যান কপোত গুহই আগাগোড়া দেখে দিয়েছেন। গৃহপ্রবেশ হয়ে যাবার কিছুদিন পরে সুমন্ত বলল, বাবা, এবারে বাড়িতে একটা পার্টি লাগাও। তোমার আত্মীয় কুটুম্ব বড়-সায়েব ছোট-সায়েব লোহাওয়ালা সিমেণ্টওয়ালা ওরা তো সেদিন চর্ব্য চুষ্য ভোজ খেয়ে গেছে, ওদের ডাকবার দরকার নেই। পার্টিতে শুধু বাছা বাছা লোক নিমন্ত্রণ কর।

বেচারাম বললেন, আমার তো বাপু রাজা-রাজড়া আর বনেদী লোকের সঙ্গে আলাপ নেই, গায়ে পড়ে নিমন্ত্রণ করতেও পারি না। দু-একজন মন্ত্রী-উপমন্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় আছে, তাঁদের বলতে পারি। গুহ সাহেব কি বলেন?

কপোত গুহ বললেন, অ্যারিস্টোক্রাটদের এখন নাই বা ডাকলেন, দিন কতক পরে তারা নিজেরাই আপনার সঙ্গে আলাপ করতে ব্যস্ত হবে। আমি বলি কি, বাড়িতে নামজাদা হোমরাচোমরা সাহিত্যিকদের একটা সম্মিলন করুন, জাঁকালো টি-পার্টি। যদি দু-একটি সিংহ আনবার ব্যবস্থা হয় তবে সকলেই খুব আগ্রহের সঙ্গে আসবেন।

—বলেন কি মিস্টার গুহ, সিংহ কোথায় পাব?

—সিংহ বুঝলেন না? যাকে বলে লায়ন। অর্থাৎ খুব নামজাদা গুণী লোক, যাকে সবাই দেখতে চায়।

সুমন্ত বলল, লায়নের চাইতে লায়নেস আরও ভাল। যদি দু-একটি এক নম্বরের সিনেমা স্টার আনতে পারেন, এই ধরুন হ্লাদিনী মণ্ডল আর মরালী ব্যানার্জী—

কপোত গুহ মাথা নেড়ে বললেন, ঘরোয়া পার্টিতে ও রকম সিংহিনী আনা চলবে না, আমাদের সমাজ এখনও অতটা উদার হয় নি। তা ছাড়া সাহিত্যিকদের মধ্যে বুড়ো অনেক আছেন, তাঁরা একটু লাজুক, হয়তো অস্বস্তি বোধ করবেন। সাহিত্যিক সিংহিনী পাওয়া গেলে ভাল হত, কিন্তু এখন তাঁরা দুর্লভ। কবে পার্টি দিতে চান?

সুমন্ত আর সুমিত্রা বলল, সরস্বতী পুজোর দিন পার্টি লাগান, বেশ হবে।

কপোত গুহ বললেন, উঁহু, সেদিন চলবে না, সাহিত্যিক সুধীদের নানা জায়-গায় বাণীবন্দনায় যেতে হবে। দু-তিন দিন পরে করা যেতে পারে।

বেচারাম বললেন, বেশ, পঁচিশে জানুআরি হল রবিবার, সেই দিনই পার্টি দেওয়া যাক। কাকে কাকে ডাকবেন?

—শিঞ্জিনীর সঙ্গে পরামর্শ করে ফর্দ করব। বেশী নয়, জন পঁচিশ-ত্রিশ হলেই বেশ হবে। এখন যাঁদের নাম মনে পড়ছে বলি শুনুন। বটেশ্বর সিকদার আর দামোদর নশকর গল্পসরস্বতী এঁরাই হলেন এখনকার লিটেরারি লায়ন, এই দুই সিংহকে আনতেই হবে।

সুমিত্রা বলল, ওঁদের দুজনের বনে না শুনেছি।

—তাতে ক্ষতি হবে না, এখানে পার্টিতে এসে তো ঝগড়া করতে পারবেন না। তার পর গিয়ে রাজলক্ষ্মী দেবী সাহিত্যভাস্বতীকে বলতে হবে, উনি সিংহিনী না হলেও ব্যাঘ্রিনী বটেন। সেকেলে আর একেলে কবি গোটা চারেক হলেই চলবে, কবিদের আকর্ষণ গল্পওয়ালাদের চাইতে ঢের কম। প্রগামিণী পত্রিকার সম্পাদক অনুকূল চৌধুরী মশায়কে সভাপতি করা যাবে। আর কালাচাঁদ চোঙদারকে তো বলতেই হবে।

সুমন্ত প্রশ্ন করল, তিনি আবার কে?

—জান না? দুন্দুভি পত্রিকার সম্পাদক।

সুমিত্রা বলল, সেটা তো শুনেছি একটা বাজে পত্রিকা।

—মোটেই বাজে নয়, বিস্তর পাঠক। প্রতি সংখ্যায় বাছা বাছা নামজাদা লেখকদের গালাগাল দেওয়া হয়, লোকে খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়ে।

—পাঠকরা রাগ করে না?

—রাগ করবে কেন। নামী লোকের নিন্দে সকলেরই ভাল লাগে। সেকালে যে সব পত্রিকা রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করত তাদের বিস্তর পাঠক জুটত। কবির ভক্তরাও পড়ে বলত, হে হে হে, কি মজার লিখেছে দেখ! তবে কালাচাঁদ চোঙদারের একটা প্রিনসিপ্‌ল আছে, ছোটখাটো লেখকদের গ্রাহ্য করে না, আর যে সব বড় বড় লেখক নিয়মিত বার্ষিক বৃত্তি দেন তাঁদেরও রেহাই দেয়।

—বার্ষিক বৃত্তি কি রকম? ব্ল্যাকমেল্‌ নাকি?

—তা বলতে পার। শুনেছি দামোদর নশকর প্রতি বৎসর পুজোয় কালাচাঁদকে আড়াই শ টাকা দেন। উনি যে গল্পসরস্বতী উপাধি পেয়েছেন তা কালাচাঁদেরই চেষ্টায়। বটেশ্বর সিকদার একগুঁয়ে কঞ্জুস লোক, এক পয়সা দেন না, তাই দুন্দুভির প্রতি সংখ্যায় তাঁকে গালাগাল খেতে হয়। তবে কালাচাঁদ উপকারও করে। জন তিন-চার ছোকরা কতকগুলো অশ্লীল বই লিখেছিল, কিন্তু তেমন কাটতি হয় নি। তারা কালাচাঁদকে বলল, দয়া করে আপনার পত্রিকায় আমাদের ভাল করে গালাগাল দিন, আমাদের লেখা থেকে চয়েস প্যাসেজ কিছু কিছু তুলে দিন। বেশী দেবার সামর্থ্য নেই, পঞ্চাশ টাকা দিচ্ছি, তাই নিন সার। কালাচাঁদ রাজী হল, তার ফলে সেই বইগুলোর কাটতি খুব বেড়ে গেল। তার পর গিয়ে দামামা পত্রিকার সম্পাদক গৌরচাঁদ সাঁপুইকেও বলতে হবে। সে ছোকরা ব্ল্যাকমেল নেয় না, তবে বড়লোক লেখকদের টাকা খেয়ে তাদের রাবিশ রচনার প্রশংসা ছাপে, তা ছাড়া প্রতি সংখ্যায় কালাচাঁদকে চুটিয়ে গাল দেয়। যাক ও সব কথা। আমি কালকেই ফর্দ করে ফেলব —কাদের ডাকতে হবে, কি খাওয়ানো হবে, বসবার কি রকম ব্যবস্থা হবে—সবই স্থির করে ফেলব।

নির্দিষ্ট দিনে প্রীতিসম্মিলন বা টি-পার্টির আয়োজন হল। বাড়ির সামনের মাঠে শামিয়ানা খাটানো হয়েছে, ছোট ছোট টেবিলের চার পাশে চেয়ার সাজিয়ে নিমন্ত্রিতদের চা খাবার ব্যবস্থা হয়েছে। শামিয়ানার এক দিকে বেদীর উপর সভাপতি অনুকূল চৌধুরী, দুই সিংহ অর্থাৎ প্রধান অতিথি বটেশ্বর আর দামোদর, রাজলক্ষ্মী দেবী, এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট লোক বসবেন। সভায় বক্তৃতা বিশেষ কিছু হবে না, শুধু বেচারাম অভ্যাগতদের স্বাগত জানাবেন, তার পর অনুকূল চৌধুরী গৃহস্বামীর কিঞ্চিৎ গুণকীর্তন করে তাঁর সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দেবেন। আশা আছে বটেশ্বর আর দামোদরও বেচারামের কৃতিত্ব আর বদান্যতা সম্বন্ধে কিছু বলবেন।

সভাপতি এবং দুই সিংহের জন্য তিনটি ভাল চেয়ার আনা হয়েছে, একটি মাইসোরের চন্দন কাঠের আর দুটি কাশ্মীরী আখরোট অর্থাৎ ওআলনট কাঠের। প্রথম চেয়ারটির পিছন দিকে একটু বেশী উঁচু আর নকশাদার, সেজন্যে খুব জাঁকালো দেখায়। কপোত গুহ একই রকম তিনটি চেয়ার আনবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু যোগাড় করতে পারেন নি। শামিয়ানার নেপথ্যে চড়কডাঙা স্ট্রিংব্যাণ্ডের তিনজন

বেহালাবাদক মোতায়েন আছে। তারা খুব আস্তে বাজাবে, যাতে অতিথিদের কথা-বার্তার ব্যাঘাত না হয়।

নিমন্ত্রিত লোকেরা ক্রমে ক্রমে এসে পেঁছুলেন। বেচারাম, তাঁর ছেলেমেয়ে, এবং কপোত আর শিঞ্জিনী গুহ অতিথিদের সমাদর করে বসিয়ে দিলেন। বেচারাম-গৃহিণী সুবালা কিছুতেই এই দলের মধ্যে থাকতে রাজী হলেন না, তিনি রাজলক্ষ্মী দেবীর সঙ্গে ফিসফিস করে একটু আলাপ করেই সরে পড়লেন এবং মাঝে মাঝে উঁকি মেরে দেখতে লাগলেন। প্রায় সকলের শেষে বটেশ্বর সিকদার আর দামোদর নশকর উপস্থিত হলেন। দৈবক্রমে এঁদের আগমন এক সঙ্গেই হল, প্রত্যেকের সঙ্গে গুটি কতক কমবয়সী খাস ভক্তও এল। বেচারাম আর কপোত সসম্ভ্রমে অভিনন্দন করে দুই মহামান্য সিংহকে শামিয়ানার ভিতরে নিয়ে গেলেন।

সভাপতি অনুকূল চৌধুরী আগেই এসেছিলেন। তিনি একটি কাশ্মীরী চেয়ারে বসলেন। বটেশ্বর বয়সে বড়, সেজন্য কপোত গুহ তাঁকে চন্দন কাঠের চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। সুমিত্রা তাঁর গলায় একটি মোটা রজনীগন্ধার মালা পরিয়ে দিল। পাশের কাশ্মীরী চেয়ারটা দেখিয়ে কপোত গুহ দামোদরকে বললেন, বসতে আজ্ঞা হুক। দামোদর বসলেন না, মুখ উঁচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। কপোত গুহ আবার বললেন, দয়া করে বসুন সার। দামোদর ভ্রূকুটি করে উত্তর দিলেন, ও চেয়ারে আমি বসতে পারি না।

সভায় একটা গুঞ্জন উঠল। জন কতক অতিথি দুই সিংহের কাছে এগিয়ে এলেন। দুন্দুভি-সম্পাদক কালাচাঁদ চোঙদার বলল, দামোদরবাবু এই দু নম্বর চেয়ারে কিছুতেই বসতে পারেন না, তাতে এঁর মর্যাদার হানি হবে, ইনিই এখনকার সাহিত্য-সম্রাট। বটেশ্বরবাবুর প্রতি আমি কটাক্ষ করছি না, তবে আমরা চাই উনি ওই ভাল চেয়ারটি দামোদরবাবুর জন্যে ছেড়ে দিন।

দামামা-সম্পাদক গৌরচাঁদ সাঁপুই চেঁচিয়ে বলল, খবরদার বটেশ্বরবাবু, উঠবেন না, গ্যাঁট হয়ে বসে থাকুন। এখনকার অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট আপনিই।

কালাচাঁদ বলল, ননসেন্স। দামোদরবাবুর উপাধি আছে গল্প-সরস্বতী, বটেশ্বরের কি আছে শুনি? ঘোড়ার ডিম।

গৌরচাঁদ বলল, এই কথা? ওহে ভূপেশ রাজেন অবনী নুরুদ্দিন নবকেষ্ট, এগিয়ে এস তো। আমরা ছ জন ছোট-গাল্পিক, বড়-গাল্পিক, রম্য-লিখিয়ে, কবি, সম্পাদক আর সমালোচক—আমরা নিখিল বাঙালী সাহিত্যিকবর্গের প্রতিনিধিরূপে সভায় অস্মিন মুহূর্তে শ্রীযুক্ত বটেশ্বর সিকদার মহাশয়কে উপাধি দিলাম—অপ্রতিদ্বন্দ্বী গল্পশিল্পসম্রাট। যার সাহস আছে সে আপত্তি করুক। আমার দস্তানা নেই, এই বাঁ পায়ের মোজাটা খুলে ফেলে চ্যালেঞ্জ করছি, আমার সঙ্গে যে লড়তে চায় সে মোজা তুলে নিক। সবতাতে আমি রাজী আছি—ঘুষি, গাট্টা, লাঠি, থান ইট, যা চাও।

মোজা তুলে নিতে কেউ এগিয়ে এল না। গৌরচাঁদ বলল, নুরু ভাই, জোরসে শাঁখ বাজা। নুরুদ্দিনের মুখ থেকে বিজয়সূচক কৃত্রিম শঙ্খধ্বনি নির্গত হল—পোঁ-ও-ও।

কালাচাঁদ চিৎকার করে বলল, বটেশ্বরবাবু, ভাল চান তো এখনই চেয়ার ভেকেট করুন। কি, উঠবেন না? ও দামোদরবাবু, দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন, আপনার হকের আসন দখল করুন, এই চেয়ারটাতেই আপনি বসে পড়ুন।

দামোদর বললেন, ওতে বসবার জায়গা কই?

কালাচাঁদ আর তার দু জন বন্ধু দামোদরকে ধরে বটেশ্বরের কোলের উপর বসিয়ে দিয়ে বললে—খবরদার উঠবেন না, আমরা আপনাকে ব্যাক করব। এই বুড়ো বটেশ্বর কতক্ষণ আপনার আড়াইমনী বপু ধারণ করতে পারে দেখা যাক।

হট্টগোল আরম্ভ হল। রাজলক্ষ্মী সাহিত্যভাস্বতী বললেন, ছি ছি ছি, আপনাদের লজ্জা নেই, ছোট ছেলের মতন ঝগড়া করছেন! দু জনেই নেমে পড়ুন চেয়ার থেকে, আসুন আমরা সবাই চায়ের টেবিলে গিয়ে বসি।

কালাচাঁদ বলল, কারও কথা শুনবেন না দামোদরবাবু, গ্যাঁট হয়ে বটেশ্বরের কোলে বসে থাকুন।

গৌরচাঁদ বলল, ঠেলা মেরে দামোদরকে ফেলে দিন বটেশ্বরবাবু, চিমটি কাটুন, কাতুকুতু দিন।

সমাগত অতিথিদের এক দল বটেশ্বরের পক্ষে আর এক দল দামোদরের পক্ষে হল্লা করতে লাগল। অবশেষে মারামারির উপক্রম হল। অনুকূল চৌধুরী হাত জোড় করে দুই দলকে শান্ত করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোনও ফল হল না।

কপোত গুহ চুপি চুপি বেচারামকে বললেন, গতিক ভাল নয়, পুলিসে খবর দেওয়া যাক, কি বলেন?

সুমন্ত বলল, উঁহু, বরং ফায়ার ব্রিগেডে টেলিফোন করি, হোজ পাইপ থেকে জলের তোড় গায়ে লাগলে দুই সিংগি আর সব কটা শেয়াল ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

সুমিত্রা বলল, ও সবের দরকার নেই, বিশ্রী একটা স্ক্যাণ্ডাল হবে। লড়াই থামাবার ব্যবস্থা আমি করছি। এই বলে সে সভা ছেড়ে তাড়াতাড়ি বাড়ির ফটকের বাইরে গেল।

বেচারাম সরকারের বাড়ির পাশে একটা খালি জমি আছে, পাড়ার জয়-হিন্দ ক্লাবের ছেলেরা সেখানে পাণ্ডাল খাড়া করে খুব জাঁকিয়ে বাণীবন্দনা করেছে। তিন দিন আগে পুজো চুকে গেছে, কিন্তু ফুর্তির জের টানবার জন্যে এ পর্যন্ত বিসর্জন হয় নি, আজ সন্ধ্যায় তার আয়োজন হচ্ছে। পাণ্ডালের ভিতর থেকে দেবীমূর্তি বার করা হয়েছে। লাউড স্পীকারটা মাটিতে নামানো হয়েছে, কিন্তু বিজলীর তার খোলা হয় নি, এখনও একটানা রেকর্ড-সংগীত উদ্‌গিরণ করছে। সামনে একটা লরি দাঁড়িয়ে আছে। গুটিকতক ছেলেমেয়ে মুখোশ পরে তৈরী হয়ে আছে, তারা চলন্ত লরির উপর দেবীমূর্তির সামনে নাচবে।

এই জয়-হিন্দ ক্লাবের পুজোয় বেচারামবাবু মোটা টাকা চাঁদা দিয়েছেন, অন্য রকমেও অনেক সাহায্য করেছেন, সেজন্যে তাঁর বাড়ির সবাইকে ক্লাবের ছেলেরা খুব খাতির করে। সেক্রেটারি প্রাণধন নাগের কাছে এসে সুমিত্রা বলল, দেখুন, বাড়িতে মহা বিপদ, আপনাদের সাহায্য চাচ্ছি—

ব্যস্ত হয়ে প্রাণধন বলল, কি করতে হবে হুকুম করুন, সব তাতে রেডি আছি, আমরা যথাসাধ্য করব, যাকে বলে আপ্রাণ।

সুমিত্রা সংক্ষেপে জানাল, তাদের বাড়ির পার্টিতে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের মধ্যে জনকতক গুণ্ডা মারামারির মতলবে আছে। দুই সিংহ অর্থাৎ প্রধান অতিথি একই

চেয়ারে বসেছেন, তাঁদের রোখ চেপে গেছে কেউ চেয়ারের দখল ছাড়বেন না। ওঁদের সরিয়ে দেওয়া দরকার, নইলে বিশ্রী একটা কান্ড হবে।

প্রাণধন বলল, ঠিক আছে, আপনি ভাববেন না। আগে আপনার দুই সিংগির গতি করব, তার পর আমাদের বিসর্জন। মা সরস্বতী না হয় ঘণ্টাখানিক ওয়েট করবেন। ওরে ভূতো বেণী মটরা হেবো, জলদি আমার সংগে আয়। নিরঞ্জন সিং, লরিতে স্টার্ট দাও, আমরা এখনই আসছি।

চারজন অনুচরের সংগে তাড়াতাড়ি শামিয়ানায় ঢুকে প্রাণধন বলল, ও সিংগি মশাইরা, শুনছেন? চেয়ার থেকে নেমে পড়ুন কাইন্ডলি, কেন লোক হাসাবেন?

কালাচাঁদ আর গোরচাঁদ এক সংগে বলল, খবরদার চেয়ার ছাড়বেন না।

প্রাণধন বলল, বটে? এই ভূতো বেণী মটরা হেবো, এগিয়ে আয় তুরন্ত। সিংগি মশাইরা, যদি নিতান্তই না নামেন তবে দুজনেই চেয়ারের হাতল বেশ শক্ত করে ধরে টাইট হয়ে বসুন।

নিমেষের মধ্যে প্রাণধনের দল দুই সিংহ সমেত চেয়ারটা তুলে বাইরে এনে লরিতে চাপিয়ে দিল। সংগে সংগে নিজেরাও উঠে পড়ে বলল, চালাও নিরঞ্জন সিং, সিধা আলীপুর চিড়িয়াখানা। লাউড স্পীকারটা তখনও মাটিতে পড়ে গর্জন করছে—অত কাছাকাছি বঁধু থাকা কি ভালো-ও-ও।

জুএর সামনে এসে লরি থামল। বটেশ্বর আর দামোদরকে খালাস করে প্রাণধন করজোড়ে বলল, কিছু মনে করবেন না মশাইরা। শুনেছি আপনারা বিশ্ববিখ্যাত লোক, শুধু দু বেটা গুন্ডার খপ্পরে পড়ে খেপে গিয়েছিলেন। সবই গেরোর ফের দাদা, কি করবেন বলুন। ঘাবড়াবেন না, আপনাদের ড্রাইভারদের বলা আছে তারা আধ ঘণ্টার মধ্যে মোটর নিয়ে এসে পড়বে। ততক্ষণ, আপনারা একটু গল্প-গুজব করুন, দুটো সুখ দুঃখের কথা কন। আচ্ছা, আসি তবে, নমস্কার।

সিংহসমাগমের অতর্কিত পরিণাম দেখে প্রীতিসম্মিলনের সকলেই হতভম্ব হয়ে গেলেন। কালাচাঁদ আর গোরচাঁদ বেগতিক দেখে সদলে সরে পড়ল। অতিথিরাও অনেকে বিরক্ত হয়ে চলে গেলেন।

কিন্তু আয়োজন একবারে পন্ড হল বলা যায় না। অতিথিদের মধ্যে অনুকূল চৌধুরী, রাজলক্ষ্মী দেবী প্রভৃতি চোদ্দ-পনরো জন মাথাঠান্ডা স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁরা রয়ে গেলেন। সকলেই বেচারামবাবুকে আন্তরিক সমবেদনা জানালেন, বটেশ্বর-দামোদরের কেলেঙ্কারি আর কালাচাঁদ-গোরচাঁদের গুন্ডামির নিন্দা করলেন, বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নৈরাশ্য প্রকাশ করলেন, মাছের কচুরি ,মাংসের চপ, চিংড়ে ভাজা, কেক সন্দেশ চা প্রচুর খেলেন, তার পর গৃহস্বামীকে ধন্যবাদ এবং আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলেন।

১৮৭৮ শক (১৯৫৬)

কামরূপিণী

শীতকাল, বিকাল বেলা। শিবপুর বটানিক্যাল গার্ডেনে একটি দল গঙ্গার কাছে মাঠের উপর শতরঞ্জি পেতে বসেছেন। দলে আছেন—

প্রবীণ অধ্যাপক নিকুঞ্জ ঘোষ, তাঁর স্ত্রী ঊর্মিলা, আর মেয়ে ইলা, বয়স পনরো।

নিকুঞ্জর শালা নবীন অধ্যাপক বীরেন দত্তর স্ত্রী সুরুচি, আর তার ছেলে নুটু, বয়স ছয়।

বৃদ্ধ শীতল চৌধুরী। বীরেন দত্তর সঙ্গে এঁর কি একটা দূর সম্পর্ক আছে। ছোট বড় নির্বিশেষে সকলেই এঁকে শীতুমামা বলে ডাকে।

বীরেন দত্তর আসতে একটু দেরি হবে। তাঁর নববিবাহিত বন্ধু মেজর সুকোমল গুপ্ত সম্প্রতি তাঁর স্ত্রী আর শাশুড়ীর সঙ্গে আসাম থেকে কলকাতায় এসেছেন। বীরেন তাঁদের নিয়ে আসবে।

শীতল চৌধুরী বললেন, তোমাদের এ কি রকম পিকনিক? খাবার জিনিস কিছুই সঙ্গে আন নি, শুধু হাওয়া খেয়ে বাড়ি ফিরতে হবে নাকি?

সুরুচি বলল, ভয় নেই শীতুমামা। ওঁর সঙ্গে সবই এসে পড়বে, সস্ত্রীক সশাশুড়ীক মেজর সুকোমল গুপ্ত আর দেদার খাবার। গুপ্তর বউ আর শাশুড়ী নিজের হাতে সব খাবার তৈরী করে আনবেন। বউভাতের ভোজটা আমাদের পাওনা আছে, এখানেই খাওয়াবেন।

নুটু বলল, ও শীতুমামা, কাল যে গল্পটা বলছিলে তা তো শেষ হয় নি। খেতে অনেক দেরি হবে, ততক্ষণ গল্পটা বল না।

শীতুমামা বললেন, আচ্ছা বলছি শোন।—তার পর রাজা তো খুব সানাই ভেঁপু রামশিঙা ঢাক ঢোল জগঝম্প বাজিয়ে শোভাযাত্রা করে সুয়োরানীকে বিয়ে করে রাজ-বাড়িতে নিয়ে এলেন। পঞ্চাশটা শাঁখ বেজে উঠল, রাজার মাসী পিসী মামীরা খুব জিব নেড়ে হুলুলুলু করলেন। বেচারী দুয়োরানী মনের দুঃখে তাঁর খোকাকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেলেন। এখন, সেই সুয়োরানীটা ছিল রাক্ষসী। সাত দিন যেতে না যেতে রাজার কাছে খবর এল—হাতিশালায় হাতি মরছে, ঘোড়াশালায় ঘোড়া মরছে, শুধু তাদের হাড় দাঁত আর ন্যাজ পড়ে আছে।

নুটু বলল, সুয়োরানী ওসব চিবুতে পারে না বুঝি?

নুটুর মা সুরুচি ধমক দিয়ে বলল, চুপ কর খোকা, ও ছাই গল্প শুনতে হবে না। শীতুমামা, আপনি এইসব বিদকুটে গল্প কেন বলেন? এতে ছোট ছেলেদের মনে একটা খারাপ ছাপ পড়ে।

নিকুঞ্জ ঘোষ হেসে বললেন, আরে না না। সব দেশেরই রূপকথায় একটু উৎকট ব্যাপার থাকে, তাতে ছোট ছেলেমেয়ের কোনও অনিষ্ট হয় না। তারা বেশ বোঝে যে সবই বানিয়ে বলা হচ্ছে। নয় রে নুটু?

নুটু বলল, হুঁ। আমিও গল্প বানাতে পারি।

সুরুচি বলল, যাই হ'ক, শীতুমামা, আপনি ওসব বেয়াড়া মিথ্যে গল্প বলবেন না।

শীতুমামা বললেন, বেশ, মা-লক্ষ্মীর যখন আপত্তি আছে তখন বলব না। নুটু, তুই বরং তোর মায়ের কাছে রামায়ণের গল্প শুনিস, শূর্পণখা রাক্ষসীর কথা, খুব ভাল সত্যি গল্প। কিন্তু একটা কথা তোমাদের জানা দরকার। রূপকথার সবটাই মিথ্যে এমন বলা যায় না। যা ঘটে তাই কতক কতক রটে।

নিকুঞ্জ-পত্নী ঊর্মিলা বললেন, আচ্ছা, শীতুমামা, রাক্ষসী সুয়োরানী, পাতাল-পুরীর রাজকন্যা, সোনার কাঠি রুপোর কাঠি, কামরূপ-কামিখ্যের মায়াবিনী যারা ভেড়া বানিয়ে দেয়—এ সবে আপনি বিশ্বাস করেন?

—কিছু কিছু করি বইকি, বিশেষ করে ওই ভেড়া বানাবার কথা যা বললে।

নিকুঞ্জ-কন্যা ইলা বলল, ভেড়ার কথাটা খুলে বলুন না শীতুমামা।

—নাঃ থাক। নুটুর মায়ের যখন আপত্তি।

নিকুঞ্জ ঘোষ বললেন, লোকের কৌতূহলে খোঁচা দিয়ে চুপ করে থাকা ঠিক নয়, খোলসা করে বলে ফেলাই ভাল।

সুরুচি বলল, বেশ তো, শীতুমামা, ভেড়ার গল্পটা খোলসা করেই বলুন, কিন্তু বেশী বেয়াড়া কথাগুলো বাদ দেবেন।

শীতুমামা বললেন, নাঃ থাক গে। বরং একটু ভগবৎপ্রসঙ্গ হ'ক। ইলা ভাই, তুমি একটি রবীন্দ্রসংগীত গাও, সেই 'মাথা নত করে দাও' গানটি।

সুরুচি বলল, অত মান ভাল নয় শীতুমামা। আমি মাপ চাচ্ছি, আপনি ভেড়ার গল্প বলুন।

নুটু বলল, না, আগে সেই রাক্ষসী সুয়োরানীর গল্প হবে।

সুরুচি বলল, তুই থাম খোকা। রাক্ষসীর চাইতে ভেড়াওয়ালী ভাল। বলুন শীতুমামা।

শীতল চৌধুরী বলতে লাগলেন।—

পঁচিশ বৎসর আগেকার কথা। বলভদ্র মর্দরাজকে তোমরা চিনবে না, তার বাপ রামভদ্র মর্দরাজ বালেশ্বর জেলার একজন বড় জমিদার ছিলেন, রাজা বললেই হয়। তাঁর এস্টেটে আমি তখন কাজ করতুম। বলভদ্রর বয়স ত্রিশের নীচে, সুপুরুষ, মেজাজ ভাল, শিকারের খুব শখ। একদিন সে আমাকে বলল, ও শীতলবাবু, কেবলই সেরেস্তার কাজ নিয়ে থাকলে তোমার মাথা বিগড়ে যাবে। বাবাকে বলে তোমার বিশ দিনের ছুটি মঞ্জুর করিয়ে দিচ্ছি, আমার সঙ্গে কিমাপুর চল, উত্তর-পূর্ব আসামে, খাস জায়গা, দেদার শিকার। সেখানে আঠারো-শিঙা হরিণ পাওয়া যায়, আকারে খুব বড় নয়, কিন্তু শিঙ দুটো অতি অদ্ভুত, প্রত্যেকটার নটা ফেঁকড়া।

সব খরচ বলভদ্র যোগাবে, আমার কাজ হবে শুধু মোসাহেবি, সুতরাং রাজী হলুম। কিমাপুর জায়গাটা একটু দুর্গম, ব্রহ্মপুত্রের ওপারে ভুটান রাজ্যের লাগাও, তবে কামরূপ জেলাতেই পড়ে। পথ ভাল নয়, কোনও রকমে মোটর চলে। শিকারী বলে বলভদ্রর খুব খ্যাতি ছিল, সহজেই আসাম গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে সব রকম দরকারী পারমিট পেয়ে গেল। একটা বড় হডসন মোটর গাড়ি, অনেক খাবার জিনিস, ড্রাইভার, আর একজন চাকর নিয়ে আমরা কিমাপুর ডাকবাংলায় উঠলুম। রোজই

শিকারের চেষ্টা হত, নানা রকম জানোয়ারও পাওয়া যেত কিন্তু আঠারো-শিঙা হরিণের দেখা নেই। ওখানকার লোকরা বলল, আরও উত্তরে জঙ্গলের মধ্যে পাওয়া যাবে। খানিক দূর পর্যন্ত কোনও রকমে মোটর চলবে, তার পর হেঁটে যেতে হবে।

সকাল আটটার সময় আমরা যাত্রা করলুম। গাড়িতে বলভদ্র, আমি, ড্রাইভার কিরপান সিং, আর তার পাশে একজন ভুটিয়া, সে পথ দেখাবে। রাস্তা অতি খারাপ, দু বার টায়ার পংচার হল, তিন মাইল যেতেই বেলা এগারোটা বাজল। গরম বেশ, খিদেও পেয়েছে খুব আমরা বিশ্রামের উপযুক্ত জায়গা খুঁজছি, এমন সময় দেখতে পেলুম গাছের আড়ালে একটি সুন্দর ছোট বাংলা। আমরা একটু এগিয়ে যেতেই সেই বাংলা থেকে একটি অপূর্ব সুন্দরী বেরিয়ে এলেন। নিখুঁত গড়ন, খুব ফরসা, তবে নাক একটু খাঁদা আর চোখ পটল-চেরা নয়, লংকা-চেরা বলা যেতে পারে। আমরা নমস্কার করে নিজেদের পরিচয় দিলুম। সুন্দরী জানালেন, তাঁর নাম মায়াবতী কুরুঙ্গি, এখন একলাই আছেন, তাঁর সঙ্গিনী মাসীমা চাকরকে নিয়ে কিমা-পুরের হাটে গেছেন। মায়াবতী খাঁটী বাংলাতেই কথা বললেন, তবে উচ্চারণে একটু আসামী টান টের পাওয়া গেল তাঁর সাদর আহবানে কৃতার্থ হয়ে আমরা আতিথ্য স্বীকার করলুম।

বলভদ্র মর্দরাজের ভঙ্গী দেখে বোঝা গেল সে প্রথম দর্শনেই প্রচণ্ড প্রেমে পড়েছে, তার কথার সুরে গদ্‌গদ ভাব ফুটে উঠেছে। আমাদের ভুটিয়া গাইড লাদেন গাম্পা চুপি চুপি আমাকে বলল, ওই মেমসাহেবটা ভাল নয়, পালিয়ে চলুন এখান থেকে। কিন্তু তার কথা কে গ্রাহ্য করে। বলভদ্র প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে আর আমিও মুগ্ধ হয়ে গেছি।

মায়াবতী আমাদের খুব সংকার করলেন। বললেন, আঠারো-শিঙা হরিণের সীজন এখন নয়, তারা শীতকালে পাহাড় থেকে নেমে আসে। মিস্টার মর্দরাজ আর মিস্টার চৌধুরী যদি দু মাস পরে আসেন তখন নিশ্চয় শিকার মিলবে। আমরা বহু ধন্যবাদ এবং আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলুম।

পথে গোটাকতক পাখি মেরে আমরা কিমাপুর ডাকবাংলায় ফিরে এলুম। তার পর দিন বলভদ্র আবার মায়াবতীর কাছে গেল, শরীরটা একটু খারাপ হওয়ায় আমি বাংলাতেই রইলুম। অনেক বেলায় ফিরে এসে বলভদ্র বলল, শোন শীতলবাবু, আমি ওই মিস মায়াবতীকে বিয়ে করব, পনরো দিন পরে ওকে নিয়ে কলকাতায় যাব। তুমি কালই চলে যাও, বালিগঞ্জে একটা ভাল বাড়ি ঠিক করে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে। আমি অনেক বোঝালুম, অজ্ঞাতকুলশীলাকে হঠাৎ বিয়ে করা উচিত নয়, তার বাবাও তা পছন্দ করবেন না। কিন্তু বলভদ্র কোনও কথা শুনল না, অগত্যা আমি পরদিনই কলকাতায় রওনা হলুম।

পনরো দিন পরে বলভদ্রের ড্রাইভার কিরপান সিং আমার কাছে এসে খবর দিল—বলভদ্র হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়েছে, কোথায় গেছে কেউ জানে না, মেমসাহেব মায়াবতীও বলতে পারলেন না। জেরা করে জানলুম, চার দিন আগে গাড়িটা বিগড়ে যাওয়ায় বলভদ্র সকালবেলা মায়াবতীর কাছে হেঁটে গিয়েছিল। মনিব ফিরে এলেন না দেখে পরদিন কিরপান সিং খোঁজ নিতে গেল। গিয়ে দেখল, সেখানে শুধু মায়াবতী আর তাঁর বুড়ী মাসী আছেন। তাঁরা বললেন, বলভদ্র গতকাল সকালে এসেছিলেন বটে, কিন্তু এখান থেকে কোথায় গেছেন তা তাঁরা জানে না। কিরপান সিং আরও দেখল, একটি বাদামী রঙের নধর ভেড়া বারান্দার খুঁটির সঙ্গে বাঁধা আছে, একটা ধামা থেকে ভিজে ছোলা খাচ্ছে।

সুরুচি বলল, শীতুমামা, আপনি কি বলতে চান সেই ভেড়াটাই বলভদ্র মর্দরাজ ?

—আমি কিছুই বলতে চাই না। যা শুনেছি তাই হুবহু জানালুম, বিশ্বাস করা না করা তোমাদের মর্জি।

নুটু বলল, শীতমামা, ভেড়াটা ছোলা খাচ্ছিল কেন ? সেখানে বুঝি ঘাস নেই ?

ইলা বলল, বুঝলি না খোকা, গ্রাম-ফেড মটন তৈরি হচ্ছিল। উঃ আপনি খুব বেঁচে গেছেন শীতুমামা।

এই সময়ে সুরুচির স্বামী বীরেন দত্ত এবং তার সঙ্গে দুটি মহিলা এসে পৌঁছুলেন। খাবারের ঝুড়ি নিয়ে দুজন অনুচরও এল। মহিলাদের একজনের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, আর একজনের বাইশ-তেইশ। দুজনেই অসাধারণ সুন্দরী, যদিও চোখ আর নাক একটু মঙ্গোলীয় ছাঁদের।

বীরেন দত্ত পরিচয় করিয়ে দিল— ইনি হচ্ছেন সুকোমল গুপ্তর শাশুড়ী ঠাকরুন মিসিস মায়াবতী মর্দরাজ, আর ইনি সুকোমলের স্ত্রী মিসিস মোহিনী গুপ্ত। আমাদের আসতে একটু দেরি হয়ে গেছে, এঁরা অনেক রকম খাবার তৈরি করলেন কিনা।

ইলা ফিসফিস করে বলল, শীতুমামা, এই মায়াবতীই আপনার সেই তিনি নাকি ?

শীতুমামা বললেন, চুপ চুপ।

নিকুঞ্জ ঘোষ জিজ্ঞাসা করলেন, কই, মেজর গুপ্ত এলেন না ?

মধুর কণ্ঠে মোহিনী গুপ্ত বললেন, সুকোমল ? তার কথা আর বলবেন না, পুওর ফেলো। কোথায় উধাও হয়েছে কিছুই জানি না।

আঁতকে উঠে ইলা ফিসফিস করে বলল, কি সর্বনাশ!

মায়াবতী বললেন, মিলিটারী সার্ভিসের মতন ওঁচা চাকরি আর নেই, হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম পেয়ে কিছু না জানিয়েই চলে গেছে। আপনারা খেতে বসে যান, নয়তো সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। মোহিনী আর আমি পরিবেশন করছি।

বীরেন দত্ত বলল , শীতুমামা, সব জিনিস নির্ভয়ে খেতে পারেন। আপনি মন্ত্র নিয়েছেন, নিষিদ্ধ মাংস এখন আর খান না, তাই এঁরা চিকেন বাদ দিয়েছেন। কাটলেট ফ্রাই পাই চপ সিককাবাব সবই পবিত্র ভেড়ার মাংসে তৈরী, এঁদের স্পেশিয়া-লিটিই হল ভেড়া। হেঁ হেঁ হেঁ, এঁরা কামরূপ-কামিখ্যের মহিলা কিনা।

ইলা বলল, ওরে মা রে!

নিকুঞ্জ ঘোষ বললেন, কই আপনারা কিছু নিলেন না ?

মায়াবতী স্মিতমুখে বললেন, আমরা একটু আগেই খেয়েছি।

শিউরে উঠে ইলা বলল, ইহিঁ হিঁ, ওরে বাবা রে!

হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে সুরুচি বলল, আমার গা গুলুচ্ছে, গঙ্গার ধারে বসি গিয়ে।

উর্মিলা বললেন, আমারও কেমন কেমন বোধ হচ্ছে, আমিও যাই।

ইলাও তার মায়ের সঙ্গে গেল।

বীরেন ব্যস্ত হয়ে পিছনে পিছনে গিয়ে বলল, এঁরা ছ বোতল সোডাও এনেছেন, একটু খাও, নশিয়া কেটে যাবে।

সুরুচি বলল, ওআক থু! রাক্ষুসীদের জলস্পর্শ করব না।

বাড়ি ফিরে এসে সব কথা শুনে বীরেন বলল, ছি ছি, কি কেলেঙ্কারি করলে তোমরা! এই জন্যেই শাস্ত্রে বলেছে স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ংকরী। শীতুমামার গাঁজাখুরী গল্পটা বিশ্বাস করলে। উনি নিজে তো গাণ্ডেপিণ্ডে খেয়েছেন।

১৮৭৮ শক (১৯৫৬)

কাশীনাথের জন্মান্তর

প্রায় দেড় শ বৎসর আগেকার কথা। তখন কলকাতার বাঙালী হিন্দুসমাজে নানারকম পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছে কিন্তু তার কোনও লক্ষণ রাঘবপুর গ্রামে দেখা দেয় নি, কাশীনাথ সার্বভৌম সেই গ্রামের সমাজপতি, দিগ্‌গজ পণ্ডিত, যেমন তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান তেমনি বিষয়বুদ্ধি। তাঁর সন্তানরা কলকাতা হুগলি বর্ধমান কৃষ্ণনগর মুরশিদাবাদ প্রভৃতি নানা স্থানে ছড়িয়ে আছে, কিন্তু তিনি নিজে তাঁর গ্রামেই থাকেন, জমিদারি দেখেন, তেজারতি আর দেবসেবা করেন, একটি চতুষ্পাঠীরও ব্যয় নির্বাহ করেন।

একদিন শেষরাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখলেন, তাঁর ইষ্টদেবী কালীমাতা আবির্ভূত হয়ে বলছেন, বৎস কাশীনাথ, তোমার বয়স শত বর্ষ অতিক্রম করেছে, তুমি সুদীর্ঘকাল ইহলোকের সুখদুঃখ ভোগ করেছ। আর কেন, এখন দেহরক্ষা কর।

কাশীনাথ বললেন, মা কৈবল্যদায়িনী, এখন তো মরতে পারব না। আমার জাজ্বল্যমান সংসার, চতুর্থ পক্ষের স্ত্রী এখনও বেঁচে আছেন। আঠারোটি পুত্রকন্যা, এক শ পঁচিশটি পৌত্র পৌত্রী দৌহিত্র দৌহিত্রী। প্রপৌত্র প্রদৌহিত্র প্রভৃতি বোধ হয় হাজার খানিক জন্মেছিল, তাদের অনেকে মরেছে কিন্তু এখনও প্রচুর জীবিত আছে। তাছাড়া বিস্তর শিষ্য আমার চতুষ্পাঠীতে পড়ে, আমি তাদের পালন ও অধ্যাপনা করি। এই সব স্নেহভাজনদের ত্যাগ করা অতীব কষ্টকর। তোমার জন্য একটি বৃহৎ মন্দির নির্মাণের সংকল্প করেছি, তাও উদ্‌যাপন করতে হবে। কলকাতার কিরিস্তানী অনাচার যদি এই গ্রামে প্রবেশ করে তবে আমাকেই তা রোধ করতে হবে। আমার ছেলেদের দিয়ে কিছু হবে না, তারা স্বার্থপর, নিজেদের ধান্দা নিয়েই ব্যস্ত। বয়স বেশী হলেও আমার শরীর এখনও শক্ত আছে। অতএব কৃপা করে আরও দশটি বৎসর আমাকে বাঁচতে দাও।

কালীমাতা, ভ্রূকুটি করে অন্তর্হিত হলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে কাশীনাথ সার্বভৌমের চতুর্থ পক্ষের পত্নী রাসেশ্বরী বললেন, আজ যে তোমার তিনটি প্রপৌত্রপুত্র আর পাঁচটি প্রদৌহিত্রপুত্রের অন্নপ্রাশন, তার হুঁশ আছে? তুমি চট করে স্নান আহ্নিক সেরে এস, তোমাকেই তো হোমযাগ করতে হবে।

গঙ্গায় স্নান করে এসে কাতরকণ্ঠে কাশীনাথ বললেন, সর্বনাশ হয়েছে গিন্নী, কালসর্প আমাকে দংশন করেছে, আমার মৃত্যু আসন্ন। মা করালবদনী, এ কি করলে, হায় হায়, সংকল্পিত কর্ম সমাপ্ত না হতেই আমাকে পরলোকে পাঠাচ্ছ!

শাস্ত্রে বলে, যার যেমন ভাবনা তার তেমনি সিদ্ধিলাভ হয়। কাশীনাথ যদি শ্রীরামপুরের পাদরীদের কবলে পড়ে খ্রীষ্টান হতেন তবে মৃত্যুর পর শেষ বিচারের

প্রতীক্ষায় তাঁকে সুদীর্ঘ কাল জড়ীভূত হয়ে থাকতে হত, সরীসৃপাদি যেমন শীত-কালে থাকে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে তিনি অতি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, সেজন্য তাঁর পারলৌকিক পরিণাম অবিলম্বে সংঘটিত হল।

মৃত্যুর পরেই কাশীনাথ উপলব্ধি করলেন, তিনি সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করে শূন্যে অবস্থান করছেন, তাঁর প্রাণহীন দেহ অঙ্গনে তুলসীমঞ্চের সম্মুখে পড়ে আছে। তাঁর পত্নী আর আত্মীয়বর্গ চারিদিকে বিলাপ করছেন, প্রতিবেশীরা বলছেন, ওঃ, একটা ইন্দ্রপাত হল! ক্ষণকাল পরেই তিনি প্রচণ্ড বেগে ব্যোমমার্গে দক্ষিণ দিকে বাহিত হয়ে যমলোকে উপনীত হলেন।

যম বললেন, এস হে কাশীনাথ। তোমার সুকৃতি-দুষ্কৃতির বিচার এবং তদুপ-যুক্ত ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি, সংক্ষেপে বলছি শোন। পুণ্যকর্মের তুলনায় তোমার পাপকর্ম অল্প। রামগতি ভট্টাচার্যের জমির কিয়দংশ তুমি অন্যায় ভাবে দখল করে-ছিলে, তিন বার আদালতে মিথ্যা হলফ করেছিলে, প্রথম ও মধ্য বয়সে বন্ধুপত্নী ও বধূস্থানীয় কয়েক জনের প্রতি কুদৃষ্টিপাত করেছিলে, মূষিকের ন্যায় অজস্র সন্তান উৎপাদন করেছিলে, অন্তিম কাল পর্যন্ত বিষয়চিন্তায় মগ্ন ছিলে। এ ছাড়া আর যা করেছ সবই সৎকার্য। নিয়মিত দুর্গোৎসবাদি করেছ, গঙ্গাস্নান তীর্থভ্রমণ বারব্রতাদি এবং ব্রাহ্মণের যাবতীয় কর্তব্য পালন করেছ, কদাপি অখাদ্য ভোজন কর নি। দুষ্কৃতির জন্য তুমি পঞ্চাশ বৎসর নরকবাস করবে, তার পর পুণ্যকর্মের ফল স্বরূপ এক শত বৎসর স্বর্গবাস করবে। আচ্ছা, এখন যাও, কর্মফল ভোগ কর গিয়ে।

নির্দিষ্ট কাল নরকভোগ আর স্বর্গভোগের অন্তে কাশীনাথ পুনর্বার যমসকাশে আহূত হলেন। যম বললেন, ওহে কাশীনাথ, তোমার প্রাক্তন কর্মের ফলভোগ সমাপ্ত হয়েছে, এখন তোমাকে পৃথিবীতে ফিরে যেতে হবে। বিধাতা তোমার উপর প্রসন্ন, তুমি অভীষ্ট কুলে জন্মগ্রহণ করতে পারবে। বল, কি প্রকার জন্ম চাও, ধনী বণিকের বংশধর হয়ে,না দরিদ্র জ্ঞানী ধর্মাত্মার পুত্র রূপে, না শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে?

কাশীনাথ উত্তর দিলেন, ধর্মরাজ, মৃত্যুকালে আমার অনেক কামনা অতৃপ্ত ছিল। দয়া করে এই ব্যবস্থা করুন যাতে আমার বর্তমান বংশধরের গৃহেই প্রত্যাবর্তন করতে পারি। আমার প্রপৌত্রের পুত্র শ্রীমান ভবানীচরণ আমার অতিশয় স্নেহভাজন ছিল; তারই সন্তান করে আমাকে ধরাধামে পাঠান।

যম বললেন, কি বলছ হে কাশীনাথ! জীবিত কালেই তুমি অধস্তন পাঁচ পুরুষ পর্যন্ত দেখেছিলে। তোমার মৃত্যুর পর দেড় শ বৎসর কেটে গেছে, তাতে আরও ছ পুরুষ হয়েছে। এখন যে বংশধর সে তোমার সপিণ্ডও নয়, তার সঙ্গে তোমার কতটুকু সম্পর্ক? তার পুত্র হয়ে জন্মালে তোমার কি লাভ হবে? আরও তো ভাল ভাল বংশ আছে।

কাশীনাথ বললেন, প্রভু, দয়া করে সেই অধস্তন একাদশসংখ্যক বংশধরের গৃহেই আমাকে পাঠিয়ে দিন। ব্যবধান যতই থাকুক, সে আমার তথা শ্রীমান ভবানীচরণের সন্তান, অতীব স্নেহের পাত্র। তাকে দেখবার জন্য আমি উৎকণ্ঠ হয়ে আছি।

—তুমি তাকে চিনবে কি করে? তোমার বর্তমান স্মৃতি তো থাকবে না, জ্ঞান-হীন ক্ষুদ্র শিশু রূপে প্রসূত হয়ে তুমি ক্রমে ক্রমে বড় হবে, জ্ঞানার্জনও করবে, কিন্তু বিগত কালের সঙ্গে তোমার নবজীবনের যোগ থাকবে না।

—প্রভু, আমার প্রার্থনাটি অবধান করুন। নারীগর্ভে ন মাস দশ দিন বাস করার পর শিশু রূপে ভূমিষ্ঠ হতে আমি চাই না। জ্ঞানবান জাতিস্মর করেই আমাকে পাঠিয়ে দিন।

—মরবার সময় তোমার বয়স এক শ বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক হয়েছিল। সেই বয়স নিয়েই জন্মাতে চাও নাকি?

—আজ্ঞে না। জরাজীর্ণ স্থবির হয়ে যদি পৃথিবীতে যাই তবে নবজন্ম কদিন ভোগ করব? আমাকে পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরের যুবা করে পাঠিয়ে দিন।

—তোমার আকাঙ্ক্ষা অতি অদ্ভুত। গর্ভবাস করবে না, যুবা রূপে নবজন্ম লাভ করবে, পূর্বস্মৃতি বিদ্যমান থাকবে, বর্তমান বংশধরের গৃহে অকস্মাৎ অবতীর্ণ হবে। এই তো তুমি চাও?

—আজ্ঞে হাঁ।

—আচ্ছা, তাই হবে। দেখাই যাক না এর ফল কি হয়। তোমার গোত্র কি?

—ভরদ্বাজ।

যমরাজ মুহূর্তকাল ধ্যানমগ্ন হয়ে রইলেন, তার পর বললেন, ধরাধামে অনেক সামাজিক পরিবর্তন হয়েছে। তুমি যদি স্বাভাবিক নিয়মে শিশু রূপে ভূমিষ্ট হতে তবে ক্রমে ক্রমে বর্তমান অবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে যেতে। কিন্তু অদৃষ্টপূর্ব সমাজে হঠাৎ অবতরণের ফলে সংকটে পড়বে। তোমার অসুবিধা যাতে অত্যধিক না হয় তার জন্য আমি যথাসম্ভব ব্যবস্থা করছি।

যম তাঁর এক অনুচরকে বললেন, আজ দ্বিপ্রহর রাত্রিতে এই জীবাত্মা ত্রিশ বৎসরের যুবা রূপে ধরাধামে ফিরে যাবে। একে পশ্চিম বঙ্গের আধুনিক ভাষা শিখিয়ে দাও, সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ অপভ্রষ্ট ইংরেজী আর হিন্দীও। বর্তমান কালের উপযুক্ত পরিচ্ছদ, নিতান্ত প্রয়োজনীয় অন্যান্য বস্তু, এবং প্রচুর অর্থও একে দেবে। একটি নিষ্ক্রান্তি বটিকাও দেবে। তার পর কলিকাতা নগরীতে নিয়ে গিয়ে শ্রীমধুসূদন রোডে তিন নম্বর বাড়ির ফটকের সামনে একে সুপ্ত অবস্থায় রেখে দেবে। ওহে কাশীনাথ, তোমার বংশধর চক্রধর মুখুজ্যের কাছে তোমাকে পাঠাচ্ছি। তোমার পূর্ব-নামই বজায় থাকবে। যদি দেখ যে বর্তমান সমাজব্যবস্থা তোমার পক্ষে কণ্টকর, কিছুতেই তুমি সইতে পারছ না, তবে নিষ্ক্রান্তি বটিকাটি খেয়ো। তা হলে তৎক্ষণাৎ যমলোকে ফিরে আসবে এবং অবিলম্বে পুনর্বার সনাতন রীতিতে জন্মগ্রহণ করবে।

চক্রধর মুখুজ্যে ধনী লোক, বাস্তুবিবর্ধন করপোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, তিন নম্বর শ্রীমধুসূদন রোডে তাঁর প্রকাণ্ড বাড়ি। সকালে আটটার আগে তিনি বিছানা ছেড়ে ওঠেন না, কিন্তু আজ ভোর বেলায় তাঁর স্ত্রী সুরূপা ঠেলা দিয়ে তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে দিলেন। চক্রধর জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে?

—নীচে গোলমাল হচ্ছে শুনতে পাচ্ছ না? বারান্দায় দাঁড়িয়ে খোঁজ নাও কি হয়েছে। আমার বাপু ভয় করছে।

চক্রধর বারান্দা থেকে দেখলেন গেটের সামনে অনেক লোক জমা হয়ে কলরব করছে। প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে লালবাহাদুর?

দরোয়ান লালবাহাদুর বলল, কে একজন বাবু ফটকের সামনে রাস্তার উপর পড়ে আছে, বেঁচে আছে কি মরে গেছে বোঝা যাচ্ছে না।

নেমে এসে চক্রধর দেখলেন, তাঁর বাড়ির ফটকের ঠিক বাইরে একটা চামড়ার ব্যাগ মাথায় দিয়ে আগন্তুক বেহুঁশ হয়ে শুয়ে আছে। বার কতক জোর ঠেলা দিতেই লোকটি মিটমিট করে তাকাল তার পর আস্তে আস্তে উঠে হাই তুলে তুড়ি দিয়ে বলল, তারা ব্রহ্মময়ী করালবদনী, কোথায় আনলে মা?

চক্রধর বললেন, কে হে তুমি? এখন নেশা ছুটেছে? কি খেয়েছিলে, মদ না চণ্ডু?

—আমি শ্রীকাশীনাথ মুখোপাধ্যায় সার্বভৌম, আবার এসে পৌঁছেছি। তুমিই চক্রধর? শ্রীমান ভবানীচরণের বংশধর? আহা, কত বড়টি হয়েছ! ঘরে চল বাবাজী, সব কথা বলছি।

কাশীনাথের আত্মকথা শুনে চক্রধর স্থির করলেন, লোকটা নেশাখোর নয়, মিথ্যাবাদী জুয়াচোরও নয়, কিন্তু এর মাথা খারাপ। প্রশ্ন করলেন, তোমার ওই ব্যাগে কি আছে?

—তা তো জানি না, তুমিই খুলে দেখ। এই যে, আমার পইতেতে চাবি বাঁধা রয়েছে, খুলে নাও।

চক্রধর ব্যাগ খুললেন। গোটাকতক ধুতি গেঞ্জি পঞ্জাবি, একটা এণ্ডির চাদর, একজোড়া চটি, একটা গামছা, আরশি চিরুনি ইত্যাদি। নীচে একটা পোর্টফোলিও। সেটা খুলে চক্রধর আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, প্রায় পাঁচ লাখ টাকার গভর্নমেণ্ট কাগজ এবং ভাল ভাল শেয়ার, নগদ দু হাজার টাকার নোট আর দশ টাকার আধুলি সিকি আনি ইত্যাদি।

—সব তোমারই নামে দেখছি। কি করে পেলে।

—কিছুই জানি না বাবাজী, সবই জগদম্বার লীলা আর যমরাজের ব্যবস্থা।

চক্রধর অনেক ক্ষণ ভাবলেন। লোকটি পাগল হলেও গুছিয়ে কথা বলে। একে হাতছাড়া করা চলবে না, বাড়িতেই রাখতে হবে, চিকিৎসাও করাতে হবে। বয়স তো বেশী নয়, বড় জোর ত্রিশ। তাঁর একমাত্র মেয়ের বিবাহ হয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর ভাইঝি তো রয়েছে! এই কাশীনাথের সঙ্গে বিয়ে দিলে সেই বাপ-মা-মরা মেয়েটার একটা চমৎকার গতি হয়ে যায়। পাঁচ লাখ টাকার ইনভেস্টমেণ্ট কি সোজা কথা! লোকটা যদি তিন বৎসর আগে আসত তবে চক্রধর নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতেন।

চক্রধর বললেন, শোন হে কাশীনাথ। তুমি আমার পূর্বপুরুষ হলেও আপাতত আমার চাইতে অনেক ছোট, তোমার বয়স বোধ হয় ত্রিশ হবে, আর আমার হল গিয়ে ষাট। তোমার ইতিহাস আমি জানলুম, কিন্তু আর কাকেও ব'লো না, লোকে তোমাকে পাগল ভাববে। তুমি আমার জ্ঞাতি, ছেলেবেলায় তোমাদের পাড়াগাঁ থেকে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে পালিয়েছিলে, এখন সন্ন্যাসে অরুচি হওয়ায় আমার আশ্রয়ে এসেছ, এই তোমার পরিচয়। তুমি আমাকে বলবে কাকাবাবু, আমি তোমাকে বলব কাশী বাবাজী। তোমার সম্পত্তির কথা খবরদার কাকেও বলবে না, বুঝলে?

কাশীনাথ বললেন, হাঁ বুঝেছি। কিন্তু তোমার বাড়িতে আমি থাকব কি করে? তুমি তো দেখছি ম্লেচ্ছ হয়ে গেছ। পেঁয়াজের গন্ধ পাচ্ছি, পাশের জমিতে মুরগী চরছে। একটি প্রৌঢ়াকে দেখলুম, চটি জুতো পরে চটাং চটাং করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল, ঘোমটা নেই, প্যাঁটপ্যাঁট করে আমার দিকে চাইল।

—উনি তোমার কাকীমা।

—ও তা বেশ। কিন্তু স্ত্রীলোক জুতো পরে কেন? ঘোর কলি।

—ঠিক বলেছ বাবাজী, ঘোর কলি। এই কলিযুগের সঙ্গেই তোমাকে মানিয়ে চলতে হবে।

—তুমি বোধ হয় মুসলমান বাবুর্চীর রান্না খাও? তা আমি মরে গেলেও খেতে পারব না।

—না না, বাবুর্চী আছে বটে, কিন্তু মুসলমান নয়, হরিজন, জাতে চামার।

—রাধামাধব! আমি স্বপাকে খাব, আজ শুধু ফলার। আমার থাকবার আলাদা ব্যবস্থা করে দাও।

—বেশ তো, আমার বাড়ির নীচের তলায় পূর্ব দিকের অংশে তুমি থাকবে, একবারে আলাদা আর নিরিবিলি।

চক্রধর ডাকলেন, চন্দনা, ও চন্দনা।

একটি মেয়ে ঘরে এল। চক্রধর বললেন, এটি আমার ভাইঝি। প্রণাম কর্ রে, ইনি তোর কাশী দাদা, দূর সম্পর্কে আমার ভাইপো!

চন্দনা প্রণাম করে চলে গেল। কাশীনাথ বললেন, তোমাদের কাণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না। মেয়েটার মাথায় সিঁদুর নেই কেন? কপাল পুড়েছে নাকি।

চক্রধর বললেন, না না. ওর বিয়েই হয়নি। খুব ভাল মেয়ে, বি. এ. পাস করেছে।

—দুর্গা দুর্গা! এত বড় ধাড়ী মেয়ের বিবাহ হয় নি? বিবি বানাচ্ছ দেখছি।

—আচ্ছা কাশীনাথ, তোমার বিবাহের মতলব আছে তো?

—আছে বইকি। একজন ভাল ঘটক লাগাও।

—আমার ভাইঝি এই চন্দনাকে বিয়ে কর না?

—তুমি উন্মাদ হলে নাকি চক্রধর? এক গোত্রে বিবাহ হবে কি করে? তা ছাড়া ও রকম বেয়াড়া স্ত্রী আমার পোষাবে না। সদ্‌বংশের লজ্জাবতী নিষ্ঠাবতী মেয়ে চাই। বিদ্যার দরকার নেই, রান্না আর ঘরকন্নার সব কাজ জানবে, বারব্রত পালন করবে, তোমার গিন্নী আর ভাইঝির মতন ধিঙ্গী হলে চলবে না।

—মুশকিলে ফেললে কাশীনাথ। তুমি যেরকম পাত্রী চাও তেমন মেয়ে ভদ্র ঘরে আজকাল লোপ পেয়েছে। আচ্ছা, যতটা সম্ভব তোমার পছন্দসই পাত্রীর জন্যে আমি চেষ্টা করব। এখন তুমি স্নান আর সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে আহারাদি কর।

চক্রধর মুখুজ্যে ভাবতে লাগলেন। লোকটা পাগল, কিন্তু কথাবার্তা অসংলগ্ন নয়, সেকেলে মতিগতি হলেও বুদ্ধিমান বলা চলে। আশ্চর্য ব্যাপার, কাশীনাথ অত টাকা পেল কোথা থেকে? যাই হক, ওকে আটকে রাখতে হবে, সম্পত্তি যাতে আমার কাছেই গচ্ছিত রাখে তার ব্যবস্থা করতে হবে। চন্দনার সঙ্গে বিয়ে হলে খাসা হত, একেবারে আমার হাতের মুঠোয় এসে পড়ত। ওর পছন্দমত পাত্রীই বা পাই কোথায়? সেকেলে নিষ্ঠাবতী মেয়ে হবে, পাগল স্বামীকে সামলাবে, আবার আমার বশে চলবে। হঠাৎ চক্রধরের মাথায় একটি বুদ্ধি এল? আচ্ছা, গয়েশ্বরীর সঙ্গে বিয়ে দিলে হয় না? তার তো খুব নিষ্ঠা আর আচার-বিচার, বুদ্ধি খুব, আমাকেও খাতির করে, সব বিষয়ে আমার মত নেয়। টাকার লোভে কাশীনাথকে বিয়ে করতে হয়তো রাজী হবে। কিন্তু বয়সের তফাতটা যে বড্ড বেশী।

গয়েশ্বরী সম্পর্কে চক্রধরের ভাগনী, জেঠতুতো বোনের মেয়ে। বয়স প্রায় পঞ্চাশ হলেও এখনও তিনি কুমারী। বাপ মা অল্প বয়সে মারা গেলে চক্রধরই অভিভাবক হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে ভাগনীর তত্ত্বাবধান বেশী দিন করতে হয় নি। গয়েশ্বরী অসাধারণ মহিলা, অল্প লেখাপড়া আর নানা রকম শিল্পকর্ম শিখেই তিনি স্বাবলম্বিনী হলেন। তাঁর নারীবস্ত্রশালা খুব লাভের ব্যবসা। পাঁচ জন উদ্‌বাস্তু মেয়ে আর দুজন দরজী গয়েশ্বরীর দোকানে কাজ করে, তিনটে সেলাই-এর কল চলে, খদ্দেরের খুব ভিড়। চক্রধর অনেক বার ভাগনীর বিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু গয়েশ্বরী বলেছেন, ও সব হবে না, আমি কত কষ্ট করে ব্যবসাটি খাড়া করেছি, আর এখন একটা উটকো মিনসে এসে কর্তামি করবে তা আমি সইব না। চক্রধর স্থির করলেন, খুব সাবধানে কথাটা পাত্র আর পাত্রীর কাছে পাড়তে হবে।

দৈবক্রমে চার দিন পরেই কাশীনাথ আর গয়েশ্বরী একটা সংঘর্ষ হয়ে গেল।

চক্রধরের বাড়ির একতলায় পূর্বদিকের অংশে কাশীনাথ স্বতন্ত্র হয়ে বাস করতে লাগলেন। তিনি স্বপাকে খান, চক্রধরের একজন পুরনো চাকর তাঁর ফরমাশ খাটে। একদিন সকালবেলা প্রাতঃকৃত্য সেরে কাশীনাথ গড়িয়াহাট মার্কেটে বাজার করতে গেছেন। জামাইষষ্ঠীর জন্যে সেদিন বাজারে খুব ভিড়। কাশীনাথ অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ভাবছিলেন, এ যে ঘোর কলি, বারো আনা সের বেগুন! সব জিনিসই অগ্নিমূল্য, দেশে মন্বন্তর হয়েছে নাকি? কাশীনাথ দুটি কাঁচকলা কিনবেন বলে ভিড়ের মধ্যে সাবধানে অগ্রসর হচ্ছিলেন এমন সময় অকস্মাৎ থপাস করে গয়েশ্বরীর সঙ্গে তাঁর কলিশন হল।

কাশীনাথের অপরাধ নেই। তিনি রোগা বেঁটে মানুষ, পিছনের ভিড়ের ঠেলা সামলাতে না পেরে সামনের দিকে পড়ে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় গয়েশ্বরী উল্টো দিক থেকে আসছিলেন। তিনি স্থূলকায়া, সুতরাং তাঁর দেহেই পতনোন্মুখ কাশীনাথের ধাক্কা প্রতিহত হল। গয়েশ্বরী পড়ে গেলেন না, অত্যন্ত রেগে গিয়ে বললেন, আ মরণ ছোঁড়া, নেশা করেছিস নাকি? ভদ্রলোকের মেয়ের গায়ে ঢলে পড়িস এতদূর আস্পর্ধা!

কাশীনাথ বললেন, ক্ষমা করবেন ঠাকরুন, ভিড়ের চাপে এমন হল, আমি ইচ্ছে করে অপরাধ করি নি।

গয়েশ্বরী বললেন, একশ বার অপরাধ করেছিস, হতভাগা বেহায়া বজ্জাত!

এক দল লোক গয়েশ্বরীর পক্ষ নিয়ে এবং আর এক দল কাশীনাথের হয়ে তুমুল ঝগড়া আরম্ভ করল। গয়েশ্বরীকে অনেকেই চেনে। একজন টিকিধারী পুরুত ঠাকুর বললেন, ও গয়া দিদি, ব্যাপারটি তো সোজা নয়, তোমাকে প্রায়শ্চিত্তির করতে হবে।

চার-পাঁচ জন চিৎকার করে বলতে লাগল, নিশ্চয় নিশ্চয়। তুমি লোকটা কে হে, পাড়াগাঁ থেকে এসেছ বুঝি! ধাক্কা লাগাবার আর মানুষ পেলে না, গয়েশ্বরী দেবীর গায়ে ঢলে পড়লে কোন্ আক্কেলে? এক্ষুনি বার কর পঞ্চাশটি টাকা, প্রায়শ্চিত্তিরের খরচ, নইলে তোমার নিস্তার নেই।

এই সময়ে চক্রধরের চাকর এসে পড়ায় কাশীনাথ বেঁচে গেলেন। পুরুত ঠাকুরটি বললেন, তা বেশ তো, গয়া দিদি আর এই কাশীনাথ ছোকরা দুজনেই যখন চক্রধরবাবুর আপনার লোক তখন তিনিই একটা মীমাংসা করবেন।

চক্রধর মুখুজ্যে বোঝেন যে তপ্ত অবস্থায় ঘা দিলেই লোহার সঙ্গে লোহা জুড়ে যায়। তিনি কালবিলম্ব না করে প্রথমে তাঁর ভাগনীকে প্রস্তাবটি জানালেন। গয়েশ্বরী আশ্চর্য হয়ে বললেন, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে নাকি মামা? চক্রধর সবিস্তারে জানালেন, লোকটা বাতিকগ্রস্ত হলেও ভালমানুষ, সহজেই পোষ মানবে, আর তার বিস্তর টাকাও আছে। বয়স কম তাতে হয়েছে কি? আজকাল ও সব কেউ ধরে না। গয়েশ্বরী অতি বুদ্ধিমতী মহিলা, মামার প্রস্তাবটি সহজেই তাঁর হৃদয়ংগম হল। পরিশেষে বললেন, তা ও ছোঁড়া যদি রাজী হয় তো আমার আর আপত্তি কি, লোকে কি বলবে তা আমি গ্রাহ্য করি না।

কাশীনাথ অত সহজে বাগ মানলেন না। বললেন, কি পাগলের মতন বলছ চক্রধর কাকা! গয়েশ্বরীর বয়েস যে আমার প্রায় ডবল। সেকালে কুলীন কন্যার অমন বিবাহ হত বটে, কিন্তু আমি তো পেশাদার পাণিগ্রাহী নই।

চক্রধর বললেন, বেশ করে সব দিক ভেবে দেখ কাশী বাবাজী। মেয়েটি অতি নিষ্ঠাবতী সব রকম বারব্রত পালন করে, মায় আমড়া-ষষ্ঠী পর্যন্ত। দরজীর দোকান চালায় বটে, কিন্তু ওর চালচলন তোমারই মতন সেকেলে। দোকানটা তোমারই হাতে আসবে, তোমার আয় বেড়ে যাবে!

—কিন্তু বয়েসের যে আকাশ-পাতাল তফাত।

—খুব ঠিক কথা। তোমার ইতিহাস যা বলেছ তাতে তোমার আসল বয়েস এখন দু শ পঞ্চাশের বেশী, আর গয়েশ্বরীর মোটে উনপঞ্চাশ। তোমার তুলনায় ও তো খুকী। আরও বুঝে দেখ, তোমার শরীরটাই জোয়ান, কিন্তু মনটা দু সেঞ্চুরি পিছিয়ে আছে। গয়েশ্বরীর সঙ্গে তোমার মনের মিল সহজেই হবে। আরও একটা কথা, আধুনিক পণ্ডিতরা বলেন, মেয়েদের পূর্ণযৌবন হয় পঞ্চাশের পরে। মর্তমান কলা খেয়েছ তো? পাকলেই সুতার হয় না। যার খোসাটি কালচিটে হয়ে কুঁচকে গেছে, শাঁসটি মজে গিয়ে একটু নরম হয়েছে, সেই পরিপক্ব কলাই অমৃত। মেয়েরাও সেই রকম। এখনকার পঞ্চাশীর কাছে তোমাদের সেকেলে ষোড়শী-টোড়শী দাঁড়াতেই পারে না।

চক্রধরের যুক্তি শুনে কাশীনাথ ধীরে ধীরে বশে এলেন। একটু চিন্তা করে বললেন, আমি যখন মারা গিয়েছিলাম তখন আমার চতুর্থ পক্ষের স্ত্রী রাসেশ্বরীর বয়েস ছিল তোমার ভাগনী গয়েশ্বরীরই মতন। এখন মনে হচ্ছে রাসেশ্বরীই গয়েশ্বরী হয়ে ফিরে এসেছে। আচ্ছা, তুমি ঘটক লাগাতে পার।

—আমিই তো ঘটক। গয়েশ্বরীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, সে রাজী আছে। এখন পাকা দেখাটা হয়ে গেলেই বিবাহ হতে পারবে। আজ বিকেল বেলা তুমি তার বাড়িতে গিয়ে তার সঙ্গে আলাপ ক'রো।

—তোমারও উপস্থিত থাকা চাই চক্রকাকা।

—না না, তা দস্তুর নয়, শুধু তোমরা দুজনে আলাপ করবে।

কাশীনাথকে দেখে গয়েশ্বরী একটু হেসে বললেন, কি হে ছোকরা, আমাকে মনে ধরেছে তো?

কাশীনাথ নীরবে উপরে নীচে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

—তোমার নাকি পাঁচ লাখ টাকা আছে? শোন কত্তা, বিয়েটা চুকে গেলেই সব টাকা আমার হাতে দেবে। তুমি যে রকম ন্যালাখ্যাপা মানুষ তোমার হাতে টাকা থাকলে গেছি আর কি, লোকে সব ঠকিয়ে নেবে। আমার মামাবাবুটিকেও বিশ্বাস করি না।

কাশীনাথ বললেন, ভয় নেই গয়েশ্বরী ঠাকরুন, আমাকে ঠকাতে পারে এমন মানুষ ভূভারতে নেই। যা মতলব করেছি বলি শোন। মেয়েছেলের দোকানদারি ভাল নয়, বিয়ের পর তোমার দোকানটা বেচে দেব। তার টাকা আর আমার যা আছে তা দিয়ে তেজারতি করব। চক্রকাকা বলেন আজকাল জমিদারি কেনা যায় না। তোমার কোনও অভাব রাখব না, এক গা গহনা গড়িয়ে দেব। এই কলকাতা হচ্ছে অসুরের শহর, ভয়ংকর জায়গা, আমরা রাঘবপুর গ্রামে গিয়ে বাস করব। বাড়ি বাগান পুকুর গোয়াল সব হবে, একটি দেবমন্দির আর চতুষ্পাঠীও হবে।

গয়েশ্বরী হাত নেড়ে ঝংকার করে বললেন, আ মরি মরি, কি মতলবই ঠাউরেছ ঠাকুর মশাই! পাগল কি আর গাছে ফলে, তুমি একটি আস্ত উন্মাদ পাগল। শোন হে ছোকরা, তোমার স্ত্রী হলেও আমি বয়সে বড়, গুরুজন তুল্য। আমার হেপাজতে তুমি থাকবে, আমার বশেই তোমাকে চলতে হবে।

কাশীনাথ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইলেন, তার পর 'তারা ব্রহ্মময়ী, রক্ষা কর মা' বলেই চলে গেলেন।

সন্ধ্যাহ্নিকের পর কাশীনাথ ইষ্টদেবীকে নিজের অবস্থা নিবেদন করলেন।—এ কি বিপদে ফেললে মা! তোমারই বা দোষ কি, নিজের কুবুদ্ধিরই ফল ভোগ করছি। পৃথিবীতে কলি যে এত প্রবল হয়েছে তা তো ভাবতে পারি নি। ব্রাহ্মণের বাড়ি বাবুর্চী রাঁধছে, মুরগি চরছে, বুড়ী মাগীরা জুতো পরে খটমটিয়ে চলছে, ধাড়ী মেয়েরা ইস্কুলে যাচ্ছে। ছোট লোকের আস্পর্দ্ধা বেড়ে গেছে, ব্রাহ্মণকে গ্রাহ্য করে না, সামনেই বিড়ি খায়। এখানে জাত ধর্ম কিছুই রক্ষা পাবে না। ওই গয়েশ্বরী একটা ভয়ংকরী খাণ্ডার মাগী, ওকে বিয়ে করলে আমার নরকভোগের আর বাকী থাকবে না। চক্রধর একটা পাষণ্ড কুলাঙ্গার, আমার বংশধর হতেই পারে না, যমরাজ নিশ্চয় ভুল করে ওর কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন। কালী কৈবল্যদায়িনী, উপায় বাতলাও মা।

শেষরাত্রে কাশীনাথ স্বপ্ন দেখলেন, তাঁর ইষ্টদেবী আবির্ভূত হয়ে হাত নেড়ে বলছেন, সরে পড় কাশীনাথ। তখনই কাশীনাথের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি বুঝলেন, এই পাপ সংসারে ফিরে আসা তাঁর মস্ত বোকামি হয়েছে। মন স্থির করে কাশীনাথ তখনই যমদত্ত সেই নিষ্ক্রান্তি বটিকাটি গিলে ফেললেন এবং অবিলম্বে যমলোকে প্রয়াণ করলেন।

সকালবেলা কাশীনাথকে পরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন, থ্রম্বোসিস। এত কম বয়সে বড় একটা দেখা যায় না, তবে পাগলদের এরকম হয়ে থাকে।

চক্রধর তখনই কাশীনাথের পইতে থেকে চাবি নিতে গেলেন, কিন্তু পেলেন না। তাড়াতাড়ি ব্যাগটা দখল করতে গেলেন, কিন্তু তাও খুঁজে পেলেন না। নিশ্চয় গয়েশ্বরী ভোগা দিয়ে সেটা হাতিয়েছে এই ভেবে তিনি ভাগনীর বাড়ি ছুটলেন। দুজনের তুমুল ঝগড়া হল কিন্তু ব্যাগ পাওয়া গেল না। কাশীনাথের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর যমদত্ত সম্পত্তি যম-সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

১৮৭৮ শক (১৯৫৬)

গগন-চটি

হাতিবাগানের দরজী আবুবকর মিঞা আর তার বউ রমজানী বিবি সন্ধ্যার সময় পশ্চিম আকাশে ঈদের চাঁদ দেখছিল। হঠাৎ একটা অদ্ভুত জিনিস রমজানীর নজরে পড়ল। সে তার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করল, ও মিঞা, আসমানের মধ্যিখানে ছোট্ট কাটারির মতন জ্বলজ্বল করছে ওটা কি গো? আবুবকর অনেকক্ষণ ঠাহর করে বলল, কাটারি নয় রে, ওটা পয়জার, দেখছিস না তালতলার চটির মতন গড়ন। বোধ হয় মল্লিকবাবুরা ফানুস উড়িয়েছে।

আবুবকরের অনুমান ঠিক নয়, কারণ পরদিন এবং তার পর রোজই সন্ধ্যার পর আকাশে দেখা গেল। এই অদ্ভুত বস্তু ফানুসের মতন এদিক ওদিক ভেসে বেড়ায় না, আকাশে স্থির হয়েও থাকে না, চাঁদ আর গ্রহ-নক্ষত্রর মতন এর উদয় অস্ত হয়। উদীয়মান জ্যোতিঃসম্রাট তারক সান্যালকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, ওটা রাহু বলেই মনে হচ্ছে, মহাবিপদের পূর্বলক্ষণ। এই কথা শুনে প্রবীণ জ্যোতিঃসম্রাট শশধর আচার্য বললেন, তারকটা গোমূর্খ, রাহু হলে মুণ্ডুর মতন গড়ন হত না? ওটা কেতু, ল্যাজের মতন দেখাচ্ছে। অতি ভীষণ দুর্নিমিত্ত সূচনা করছে। তোমাদের উচিত গ্রহশান্তির জন্য যাগ করা আর অষ্টপ্রহরব্যাপী হরিসংকীর্তন।

একটা আতঙ্ক সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। খবরের কাগজে নানারকম মন্তব্য প্রকাশিত হতে লাগল। একজন লিখলেন, বোধ হয় উড়ন চাকতি, ধাক্কা লেগে তুবড়ে গিয়ে চটিজুতোর মতন দেখাচ্ছে। আর একজন লিখলেন, নিশ্চয় ল্যাজকাটা ধূমকেতু, সূর্যের আর একটু কাছে এলেই নূতন ল্যাজ গজাবে, তার ঝাপটায় পৃথিবী চুরমার হতে পারে।

প্রবীণ হেডপণ্ডিত কুঞ্জবিহারী তলাপাত্র কাগজে লিখলেন, এই আকাশচারী ভয়ংকর পাদুকা কোন্ মহাপুরুষের? দেখিয়া মনে হয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের। মধ্য-শিক্ষাপর্ষদের খামখেয়াল দেখিয়া সেই স্বর্গস্থ তেজস্বী মহাত্মার ধৈর্যচ্যুতি হইয়াছে, তাই তাঁহার এক পাটি বিনামা গগনতলে নিক্ষেপ করিয়াছেন। এই উড়ুক্কু গগন-চটি শীঘ্রই শিক্ষাপর্ষদের মস্তকে নিপতিত হইবে।

সরকার-বিরোধী দলের অন্যতম মুখপাত্র বিরূপাক্ষ মণ্ডল লিখলেন, না, বিদ্যা-সাগরের চটি নয়, তার শুঁড় এত বড় ছিল না। এই আসমানী পয়জার হচ্ছে স্বর্গস্থ মনীষী ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের। যত সব মেডিক্যাল কলেজ আর হাসপাতালের কেলেঙ্কারি দেখে তিনি খেপে উঠেছেন, হাতের কাছে অন্য হাতিয়ার না পেয়ে এক পাটি চটি ছেড়েছেন। কর্তারা হুঁশিয়ার।

ভক্তকবি হেমন্ত চট্টরাজ লিখলেন, এই গগন-চটি মানুষের নয়, এ হচ্ছে মূর্তিমান ঐশ রোষ। চুরি ঘুষ ভেজাল মিথ্যাচার ব্যভিচার ভণ্ডামি ইত্যাদি পাপের বৃদ্ধি, রাজ্যসরকারের অকর্মণ্যতা, ধনীদের বিলাসবাহুল্য, ছেলেমেয়েদের সিনেমোন্মাদ, এই সব দেখে নটরাজ চঞ্চল হয়েছেন, প্রলয়নাচন নাচবার জন্য ডান পা বাড়িয়েছেন, তা

থেকেই এই রুদ্র-চটি গগনতলে খসে পড়েছে। প্রলয়ংকর রুদ্রতাণ্ডব শুরু হতে আর দেরি নেই, জগতের ধ্বংস একেবারে আসন্ন। দেশের ধনী দরিদ্র উচ্চ নীচ আবাল-বৃদ্ধ স্ত্রীপুরুষ যদি শীঘ্র ধর্মপথে ফিরে না আসে তবে এই রুদ্ররোষ সকলকেই ব্যাপাদিত করবে।

কিন্তু আনাড়ী লোকদের এই সব জল্পনা শিক্ষিত জনের মনে লাগল না। বিশেষজ্ঞরা কি বলেন? বিশ্বম্ভর কটন মিল, বিশ্বম্ভর ব্যাংক, বিশ্বম্ভরী পত্রিকা ইত্যাদির মালিক শ্রীবিশ্বম্ভর চক্রবর্তী একজন সর্ববিদ্যাবিশারদ লোক, কোনও প্রশ্নের উত্তরে তিনি 'জানি না' বলেন না। কিন্তু গগন-চটির কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি শুধু গম্ভীরভাবে উপর নীচে ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় নাড়লেন। কয়েকজন অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করায় তাঁরা বললেন, এখন কিছু বলা যায় না, তবে নক্ষত্র নয় তা নিশ্চিত, কারণ এর গতিপথ বিষুববৃত্তের ঠিক সমান্তরাল নয়। এই আগন্তুক জ্যোতিষ্কটি গ্রহের মতন বিপথগামী। পুচ্ছহীন ধূমকেতু হতে পারে। তা ভয়ের কারণ আছে বইকি। সাদা চোখে যতই ছোট দেখাক বস্তুটি নিশ্চয় প্রকাণ্ড। দেখা যাক আমাদের কোদাইক্যানাল মানমন্দির আর গ্রীনিচ প্যালোমার ইত্যাদি থেকে কি রিপোর্ট আসে।

রিপোর্ট শীঘ্রই এল, দেশ-বিদেশের সমস্ত বিখ্যাত মানমন্দির থেকে একই সংবাদ প্রচারিত হল। দুর্বোধ্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বাদ দিয়ে যা দাঁড়ায় তা এই।—সূর্যের নিকটতম গ্রহ হচ্ছে বুধ (মার্করি), তার পরে আছে শুক্র (ভিনস), তার পর আমাদের পৃথিবী, তার পর মঙ্গল (মার্স), তার পর বহু দূরে বৃহস্পতি (জুপিটার)। আরও দূরদূরান্তরে শনি (সাটার্ন), ইউরেনস, নেপচুন আর প্লুটো। মঙ্গল আর বৃহস্পতির কক্ষের মাঝামাঝি পথে প্রকাণ্ড এক ঝাঁক অ্যাস্টারয়েড বা ছোট ছোট খণ্ডগ্রহ সূর্যকে পরিক্রমা করে। তারই একটা হঠাৎ কক্ষভ্রষ্ট হয়ে পৃথিবীর নিকটে এসে পড়েছে। এই খণ্ডগ্রহটি গোলাকার নয়। ভারতীয় জ্যোতিষীরা এর নাম দিয়েছেন গগন-চটি অর্থাৎ হেভেনলি স্লিপার। আপাতত আমরাও সেই নাম মেনে নিলাম। এই গগন-চটির কিঞ্চিৎ স্বকীয় দীপ্তি আছে, তার উপর সূর্যকিরণ পড়ায় আরও দীপ্তিমান হয়েছে। পৃথিবী থেকে এর বর্তমান দূরত্ব পৌনে দু কোটি মাইল, প্রায় দু বৎসরে সূর্যকে পরিক্রমণ করছে। এর আয়তন আর ওজন চন্দ্রের প্রায় দ্বিগুণ। এত বড় অ্যাস্টার-য়েডের অস্তিত্ব জানা ছিল না। অনুমান হয়, গোটা কতক খণ্ডগ্রহের সংঘর্ষ আর মিলনের ফলে উৎপন্ন হয়ে এই গগন-চটি ছিটকে বেরিয়ে এসেছে। এর উত্তাপ আর স্বকীয় দীপ্তিও সংঘর্ষ-জনিত। এই বৃহৎ অ্যাস্টারয়েড নিকটে আসায় মঙ্গল গ্রহ আর চন্দ্রের কক্ষ একটু বেঁকে গেছে, আমাদের জোয়ার ভাটার সময়ও কিছু বদলেছে। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব এখন পর্যন্ত যা আছে তাতে বিশেষ ভয়ের কারণ নেই, তবে সন্দেহ হচ্ছে গগন-চটি ক্রমেই কাছে আসছে। যদি বেশী কাছে আসে তবে আমাদের এই পৃথিবীর পরিণাম কি হবে তা ভাবতেও হৃৎকম্প হয়।

এই বিবৃতির ফলে অনেকে ভয়ে আঁতকে উঠল, কয়েকজন স্থূলকায় ধনী হার্টফেল হয়ে মারা গেল। অনেকে পেটের অসুখ, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি আর হাঁপানিতে ভুগতে লাগল। হিন্দুধর্মের নেতৃস্থানীয় স্বামী-মহারাজগণ, মুসলমান মোল্লা-মওলানাগণ এবং খ্রীষ্টীয় পাদরীগণ নিজের নিজের শাস্ত্র অনুসারে হিতোপদেশ দিতে লাগলেন। সাহিত্যিকরা উপন্যাস কবিতা রম্যরচনা প্রভৃতি বর্জন করে পরলোকের কথা

লিখতে লাগলেন। কিন্তু বেশির ভাগ লোকের দুশ্চিন্তা দেখা গেল না, বরং গগন-চটির হুজুগে পাড়ায় পাড়ায় আড্ডা জমে উঠল। শেয়ারবাজারে বিশেষ কোনও তেজিমন্দি দেখা গেল না, সিনেমার ভিড়ও কমল না।

কিছুদিন পরেই দফায় দফায় যে জ্যোতিষিক সংবাদ আসতে লাগল তাতে লোকের পিলে চমকে উঠল, রক্ত জল হয়ে গেল। গগন-চটি নামক এই দুষ্টগ্রহ ক্রমশ পৃথিবীর নিকটবর্তী হচ্ছে এবং মহাকর্ষের নিয়ম অনুসারে পরস্পর টানাটানি চলছে। চন্দ্রসমেত পৃথিবী আর গগন-চটি যেন মিলে মিশে তালগোল পাকাবার চেষ্টায় আছে। হিসাব করে দেখা গেছে, পাঁচ মাসের মধ্যেই চন্দ্র আর গগন-চটির সংঘর্ষ হবে, তার পর দুটোই হুড়মুড় করে পৃথিবীর উপর পড়বে। তার ফল যা দাঁড়াবে তার তুলনায় লক্ষ হাইড্রোজেন বোমা তুচ্ছ। সংঘাতের কিছু পূর্বেই বায়ুমণ্ডল লুপ্ত হবে, সমুদ্র উৎক্ষিপ্ত হবে, সমস্ত প্রাণী রুদ্ধশ্বাস হয়ে মরবে। চরম ধ্বংসের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের কিছু করণীয় নেই।

বিভিন্ন খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের মুখপাত্রগণ একটি যুক্ত বিবৃতি প্রচার করলেন—আমাদের করণীয় অবশ্যই আছে। সেকালে বৃদ্ধরা একটি ছড়া বলতেন—If cold air reach you through a hole, Go make your will and mend your soul। কিন্তু এই আগন্তুক গগন-চটি ছিদ্রাগত শীতল বায়ু নয়, মানবজাতির পাপের জন্য ঈশ্বরপ্রেরিত মৃত্যুদণ্ড, আমাদের সকলকেই ধ্বংস করবে। উইল করা বৃথা, কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে আমাদের আত্মার ত্রুটি অবশ্যই শোধন করতে হবে। অতএব সরল অন্তঃকরণে সমস্ত পাপ স্বীকার কর, নিরন্তর প্রার্থনা কর, ঈশ্বরের করুণা ভিক্ষা কর, সকল শত্রুকে ক্ষমা কর, যে কদিন বেঁচে আছ যথাসাধ্য অপরের দুঃখ দূর কর।

ইহুদী মুসলমান আর বৌদ্ধ ধর্মনেতারাও অনুরূপ উপদেশ দিতে লাগলেন। আদি-শংকরাচার্যের একমাত্র ভাগিনেয়ের বংশধর ১০০৮শ্রী ব্যোমশংকর মহারাজ একটি হিন্দী পুস্তিকা ছাপিয়ে পঞ্চাশ লক্ষ কপি বিলি করলেন। তার সার মর্ম এই। —অয় মেরে বচ্চে, হে আমার বৎসগণ, মৃত্যুভয় ত্যাগ কর। আমার বয়স নব্বই পেরিয়েছে, আর তোমরা প্রায় সকলেই আমার চাইতে ছোট, কিন্তু তাতে কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই, কারণ ভবযন্ত্রণার ভোগ বালক-বৃদ্ধ সকলের পক্ষেই সমান। আমাদের আত্মা শীঘ্রই দেহপিঞ্জর থেকে মুক্তি পেয়ে পরমাত্মায় লীন হবে, এ তো পরম আনন্দের কথা, এতে ভয়ের কি আছে? কিন্তু অশুচি অবস্থায় দেহত্যাগ করা চলবে না, তাতে নরকগতি হবে। তোমরা হয়তো জান, কোনও বড় অপারেশনের আগে রোগীকে উপবাসী রাখা হয় এবং জোলাপ আর এনিমা দিয়ে তাঁর কোষ্ঠ সাফ করা হয়। যখন রোগীর পাকস্থলী শূন্য, মলভাণ্ড শূন্য, মূত্রাশয়ও শূন্য, সর্ব শরীর পরিষ্কৃত, তখনই ডাক্তার অস্ত্রপ্রয়োগ করেন। শুচিতার জন্য এত সতর্কতার কারণ—পাছে সেপটিক হয়। এখন ভেবে দেখ, অ্যাপেন্ডিক্স বা হার্নিয়া বা প্রস্টেট ছেদনের তুলনায় প্রাণ বিসর্জন কত গুরুতর ব্যাপার। মৃত্যুকালে যদি মনে কিছুমাত্র কালুষ্য বা কল্মষ বা কিল্বিষ থাকে তবে আত্মার সেপসিস অনিবার্য। পাপক্ষালন না করেই যদি তোমরা প্রাণত্যাগ কর তবে নিঃসন্দেহে সোজা নরকে যাবে। অতএব আর বিলম্ব না করে সরল মনে লজ্জা ভয় ত্যাগ করে সমস্ত পাপ স্বীকার কর, তাতেই তোমার

শুচি হবে। চুপি চুপি বললে চলবে না, জনতার সমক্ষে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে হবে, কিংবা ছাপিয়ে প্রচার করতে হবে, যেমন আমি করছি। এই পুস্তিকার শেষে তফসিল ক আর খ-এ মৎকৃত যাবতীয় দুষ্কর্মের তালিকা পাবে—কতগুলো ছারপোকা মেরেছি, কতবার লুকিয়ে মুরগি খেয়েছি, কতবার মিথ্যা বলেছি, কতজন ভক্তিমতী শিষ্যার প্রতি কুদৃষ্টিপাত করেছি—সবই খোলাস করে বলা হয়েছে। তোমরাও আর কালবিলম্ব না করে এখনই পাপক্ষালনে রত হও।

বিলাতে অক্সফোর্ড গ্রুপের উদ্যোগে দলে দলে নরনারী দুষ্কৃতি স্বীকার করতে লাগল, অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য দেশেও অনুরূপ শুদ্ধির আয়োজন হল। ভারতবাসীর লজ্জা একটু বেশী, সেজন্য ব্যোমশংকরজীর উপদেশে প্রথম প্রথম বিশেষ ফল হল না। কিন্তু সম্প্রতি প্যালোমার মানমন্দির থেকে যে রিপোর্ট এসেছে তার পরে কেউ আর চুপ করে থাকতে পারে না। গগন-চটি আরও কাছে এসে পড়েছে, তার ফলে পৃথিবীর অভিকর্ষ বা গ্রাভিটি কমে গেছে, আমরা সকলেই একটু হালকা হয়ে পড়েছি। আর দেরি নেই, শেষের সেই ভয়ংকর দিনের জন্য প্রস্তুত হও।

মনুমেণ্টের নীচে আর শহরের সমস্ত পার্কে দলে দলে মেয়ে-পুরুষ চিৎকার করে পাপ স্বীকার করতে লাগল। বড়বাজার থেকে একটি বিরাট প্রসেশন ব্যান্ড বাজাতে বাজাতে বেরুল এবং নেতাজী সুভাষ রোড হয়ে শহর প্রদক্ষিণ করতে লাগল। বিস্তর মান্যগণ্য লোক তাতে যোগ দিয়ে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে করুণ কণ্ঠে নিজের নিজের দুষ্কর্ম ঘোষণা করতে লাগলেন, কিন্তু ব্যান্ডের আওয়াজে তাঁদের কথা ঠিক বোঝা গেল না।

বিলাতী রেডিওতে নিরন্তর বাজতে লাগল—Nearer my God to Thee। দিল্লীর রেডিওতে 'রঘুপতি রাঘব' এবং লখনউ আর পাটনায় 'রাম নাম সচ হৈ' অহোরাত্র নিনাদিত হল। কলকাতায় ধ্বনিত হল—'সমুখে শান্তিপারাবার'। মস্কো রেডিও নীরব রইল, কারণ ভগবানের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সদ্ভাব নেই। অবশেষে সোভিএট রাষ্ট্রদূতের সনির্বন্ধ অনুরোধে আমাদের রাষ্ট্রপতি কমিউনিস্ট প্রজাবৃন্দের আত্মার সদ্গতির নিমিত্ত গয়াধামে অগ্রিম পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করলেন।

বৃহৎ চতুঃশক্তি অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিএট যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের শাসকবর্গ গত পঞ্চাশ বৎসরে যত কুকর্ম করেছেন তার ফিরিস্তি দিয়ে White Book প্রকাশ করলেন এবং একযোগে ঘোষণা করলেন—সব মানুষ ভাই ভাই, কিছুমাত্র বিবাদ নাই। পাকিস্তানের কর্তারা বললেন, য়হ বাত তো ঠিক হৈ, হিন্দী পাকী ভাই ভাই, লেকিন আগে কাশ্মীর চাই।

জগদ্ব্যাপী এই প্রচণ্ড বিক্ষোভের মধ্যে শুধু একজনের কোনও রকম চিত্তচাঞ্চল্য দেখা গেল না। ইনি হচ্ছেন হাঠখোলার ভুবনেশ্বরী দেবী। বয়স আশি পার হলেও ইনি বেশ সবলা, সম্প্রতি দ্বিতীয় বার কেদার-বদরী ঘুরে এসেছেন। প্রচুর সম্পত্তি, স্বামী পুত্র কন্যার ঝঞ্ঝাট নেই, শুধু একপাল আশ্রিত কুপোষ্য আছে, তাদের ইনি কড়া শাসনে রাখেন। ভুবনেশ্বরী খুব ভক্তিমতী মহিলা, গীতগোবিন্দ গীতা আর গীতাঞ্জলি কণ্ঠস্থ করেছেন। কিন্তু পাড়ার লোকে তাঁকে ঘোর নাস্তিক মনে করে, কারণ তিনি কোনও রকম হুজুগে মাতেন না। তাঁর ভয়ার্ত পোষ্যবর্গ ব্যাকুল হয়ে অনুরোধ করল, কর্তা-মা, গগন-চটি উদয় হয়েছেন, প্রলয়ের আর দেরি নেই। জগন্নাথ

ঘাটে সভা হচ্ছে, সবাই পাপ কবুল করছে, আপনিও করে ফেলুন। মন খোলসা হলে শান্তিতে মরতে পারবেন।

ভুবনেশ্বরী ধমক দিয়ে বললেন, পাপ যা করেছি তা করেছি, ঢাক পিটিয়ে সবাইকে তা বলতে যাব কেন রে হতভাগারা? গগন-চটি না ঢেঁকি, আকাশে লাখ লাখ তারা আছে, আর একটা না হয় এল, তাতে হয়েছে কি? তোরা বললেই প্রলয় হবে? মরতে এখন ঢের দেরি রে, এখনই হা-হুতোশ করছিস কেন? ভগবান আছেন কি করতে? 'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে'—রবি ঠাকুরের এই গান শুনিস নি? মানুষকেই যদি ঝাড়ে বংশ লোপাট করে ফেলেন তবে ভগবানের আর বেঁচে সুখ কি? লীলাখেলা করবেন কাকে নিয়ে? যা যা, নিশ্চিন্তি হয়ে ঘুমো গে।

কিসে কি হয় কিছুই বলা যায় না। হয়তো ভুবনেশ্বরীর কথায় ত্রিভুবনেশ্বরের একটু চক্ষুলজ্জা হল। হয়তো কার্যকারণ পরম্পরায় প্রাকৃতিক নিয়মেই যা ঘটবার তা ঘটল। হঠাৎ একদিন খবরের কাগজে তিন ইঞ্চি হরফে ছাপা হল—ভয় নেই, দুষ্ট গ্রহ দূর হচ্ছে। বড় বড় জ্যোতিষীরা একযোগে জানিয়েছেন, বৃহস্পতি শনি ইউরেনস আর নেপচুন এই চারটে প্রকাণ্ড গ্রহের সঙ্গে এক রেখায় আসার ফলে গগন-চটির পিছনে টান পড়েছে, সে দ্রুতবেগে পুরাতন কক্ষে নিজের সঙ্গীদের মধ্যে ফিরে যাচ্ছে। অতি অল্পের জন্য আমাদের পৃথিবী বেঁচে গেল।

বিপদ কেটে যাওয়ায় জনসাধারণ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, কিন্তু যাঁরা অসাধারণ তাঁরা নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। দেশের হোমরাচোমরা মান্যগণ্যদের প্রতিনিধিস্থানীয় একটি দল দিল্লিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে নিবেদন করলেন, হুজুর, আমরা যে বিস্তর কসুর কবুল করে ফেলেছি এখন সামলাব কি করে? প্রধানমন্ত্রী সুপ্রিম কোর্টের চীফ জস্টিসের মত চাইলেন। তিনি রায় দিলেন, পুলিসের পীড়নের ফলে কেউ যদি অপরাধ স্বীকার করে তবে তা আদালতে গ্রাহ্য হয় না। গগন-চটির আতঙ্কে লোকে যা বলে ফেলেছে তারও আইনসম্মত কোনও মূল্য নেই, বিশেষতঃ যখন স্ট্যাম্প কাগজে কেউ অ্যাফিডাভিট করে নি।

বৃহৎ চতুঃশক্তি এবং ইউ-এন-ও গোষ্ঠীভুক্ত ছোট বড় সকল রাষ্ট্র একটি প্রোটো-কলে স্বাক্ষর করে ঘোষণা করলেন, গগন-চটির আবির্ভাবে বিকারগ্রস্ত হয়ে আমরা যেসব প্রলাপোক্তি করেছিলাম তা এতদ্বারা প্রত্যাহৃত হল। এখন আবার পূর্বাবস্থা চলবে।

গগন-চটি সুদূর গগনে বিলীন হয়েছে কিন্তু যাবার আগে সকলকেই বিলক্ষণ ঘা কতক দিয়ে গেছে। আমাদের মান ইজ্জত ধূলিসাৎ হয়েছে, মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে আর দাঁড়াবার জো নেই।

১৮৭৯ শক (১৯৫৭)

অদল বদল

কালিদাসের মেঘদূত ব্যাপারটা কি বোধ হয় আপনারা জানেন। যদি ভুলে গিয়ে থাকেন তাই একটু মনে করিয়ে দিচ্ছি। কুবেরের অনুচর এক যক্ষ কাজে ফাঁকি দিত, সেজন্য প্রভুর শাপে তাকে এক বৎসর নির্বাসনে থাকতে হয়। সে রামগিরিতে আশ্রম তৈরি করে বাস করতে লাগল। আষাঢ়ের প্রথম দিনে যক্ষ দেখল, পাহাড়ের মাথায় মেঘের উদয় হয়েছে, দেখাচ্ছে যেন একটি হস্তী বপ্রক্রীড়া করছে। অঞ্জলিতে সদ্য ফোটা কুড়চি ফুল নিয়ে সে মেঘকে অর্ঘ্য দিল এবং মন্দাক্রান্তা ছন্দে একটি সুদীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করল। তার সার মর্ম এই।—ভাই মেঘ, তোমাকে একবার অলকাপুরী যেতে হচ্ছে। ধীরে সুস্থে যেয়ো, পথে কিঞ্চিৎ ফূর্তি করতে গিয়ে যদি একটু দেরি হয়ে যায় তাতে ক্ষতি হবে না। অলকায় তোমার বউদিদি আমার বিরহিণী প্রিয়া আছেন, তাঁকে আমার বার্তা জানিয়ে আশ্বস্ত ক'রো। ব'লো আমার শরীর ভালই আছে, কিন্তু চিত্ত তাঁর জন্য ছটফট করছে। নারায়ণ অনন্তশয্যা থেকে উঠলেই অর্থাৎ কার্তিক মাস নাগাদ শাপের অবসান হবে, তার পরেই আমরা পুনর্মিলিত হব।

কালিদাস তাঁর যক্ষের নাম প্রকাশ করেন নি, শাপের এক বৎসর শেষ হলে সে নিরাপদে ফিরতে পেরেছিল কিনা তাও লেখেন নি। মহাভারতে উদ্যোগপর্বে এক বনবাসী যক্ষের কথা আছে, তার নাম স্থূণাকর্ণ। সেই যক্ষ আর মেঘদূতের যক্ষ একই লোক তাতে সন্দেহ নেই। কালিদাস তাঁর কাব্যের উপসংহার লেখেন নি, মহাভারতেও যক্ষের প্রকৃত ইতিহাস নেই। কালিদাস আর ব্যাসদেব যা অনুক্ত রেখে-ছেন সেই বিচিত্র রহস্য এখন উদ্‌ঘাটন করছি।

যক্ষপত্নীকে যক্ষিণী বলব, কারণ তার নাম জানা নেই। পতির বিরহে অত্যন্ত কাতর হয়ে যক্ষিণী দিনযাপন করছিল। একটা বেদীর উপর সে প্রতিদিন একটি করে ফুল রাখত আর মাঝে মাঝে গুনে দেখতে ৩৬৫ পূরণের কত বাকী। অবশেষে এক বৎসর পূর্ণ হল, কার্তিক মাসও শেষ হল, কিন্তু যক্ষের দেখা নেই। যক্ষিণী উৎকণ্ঠিত হয়ে আরও কিছুদিন প্রতীক্ষা করল, তার পর আর থাকতে না পেরে কুবেরের কাছে গিয়ে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

কুবের বললেন, কে গা তুমি? খুব সুন্দরী দেখছি, কিন্তু কেশ অত রুক্ষ কেন? বসন অত মলিন কেন? একটি মাত্র বেণী কেন?

যক্ষিণী সরোদনে বলল, মহারাজ, আপনার সেই কিংকর যাকে এক বৎসরের জন্য নির্বাসনদণ্ড দিয়েছিলেন, আমি তারই দুঃখিনী ভার্যা। আজ দশ দিন হল এক বৎসর উত্তীর্ণ হয়েছে, কিন্তু এখনও আমার স্বামী ফিরে এলেন না কেন?

কুবের বললেন, ব্যস্ত হচ্ছ কেন, ধৈর্য ধর, নিশ্চয় সে ফিরে আসবে। হয়তো কোথাও আটকে পড়েছে। তার জোয়ান বয়েস, এখানে শুধু নাক-খেবড়া যক্ষিণী আর কিন্নরীই দেখেছে, বিদেশে হয়তো কোনও রূপবতী মানবীকে দেখে তার প্রেমে পড়েছে। তুমি ভেবো না, মানবীতে অরুচি হলেই সে ফিরে আসবে।

সজোরে মাথা নেড়ে যক্ষিণী বলল, না না, আমার স্বামী তেমন নন, অন্য নারীর দিকে তিনি ফিরেও তাকাবেন না। এই সেদিন একটি মেঘ এসে তাঁর আকুল প্রেমের বার্তা আমাকে জানিয়ে গেছে। প্রভু, আপনি দয়া করে অনুসন্ধান করুন, নিশ্চয় তাঁর কোনও বিপদ হয়েছে, হয়তো সিংহব্যাঘ্রাদি তাঁকে বধ করেছে।

কুবের বললেন, তুমি অত উতলা হচ্ছ কেন? তোমার স্বামী যদি ফিরে নাই আসে তবু তুমি অনাথা হবে না। আমার অন্তঃপুরে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবে, আমি তোমাকে খুব সুখে রাখব।

যক্ষিণী বলল, ও কথা বলবেন না প্রভু, আপনি আমার পিতৃস্থানীয়। আপনার আজ্ঞায় আমার স্বামী নির্বাসনে গিয়েছিলেন, এখন তাঁর দণ্ডকাল উত্তীর্ণ হয়েছে, তাঁকে ফিরিয়ে আনা আপনারই কর্তব্য। যদি তিনি বিপদাপন্ন হন তবে তাঁকে উদ্ধার করুন, যদি মৃত হন তবে নিশ্চিত সংবাদ আমাকে এনে দিন, আমি অগ্নিপ্রবেশ করে স্বর্গে তাঁর সঙ্গে মিলিত হব।

বিব্রত হয়ে কুবের বললেন, আঃ তুমি আমাকে জ্বালিয়ে মারলে। বেশ, এখনই আমি তোমার স্বামীর সন্ধানে যাচ্ছি, রামগিরি জায়গাটা দেখবার ইচ্ছাও আমার আছে। তুমিও আমার সঙ্গে চল। ওরে, শীঘ্র পুষ্পক রথ জুততে বলে দে। আর তোরা দুজন তৈরি হয়ে নে, আমার সঙ্গে যাবি।

রামগিরি প্রদেশে একটি ছোট পাহাড়ের উপর যক্ষ তার আশ্রম বানিয়েছিল। সেখানে পৌঁছে কুবের দেখলেন, বাড়িটি বেশ সুন্দর, দরজা জানালাও আছে, কিন্তু সবই বন্ধ। কুবেরের আদেশে তাঁর এক অনুচর দরজায় ধাক্কা দিয়ে চেঁচিয়ে বলল, ওহে স্থূণাকর্ণ, এখনই বেরিয়ে এস, মহামহিম রাজরাজ কুবের স্বয়ং এসেছেন, তোমার বউও এসেছে।

কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। কুবের বললেন, বাড়িতে কেউ নেই মনে হচ্ছে। আগুন লাগিয়ে দেওয়া যাক।

যক্ষিণী বলল, অমন কাজ করবেন না মহারাজ। আমার স্বামী এই বাড়িতেই আছেন, আমি মাছ ভাজার গন্ধ পাচ্ছি, নিশ্চয় উনি রান্নায় ব্যস্ত আছেন, কেউ তো সাহায্য করবার লোক নেই। আমিই ওঁকে ডাকছি। ওগো, শুনতে পাচ্ছ? আমি এসেছি, মহারাজও এসেছেন। রান্না ফেলে রেখে চট করে বেরিয়ে এসো।

একটি জানালা ঈষৎ ফাঁক হল। ভিতর থেকে নারীকণ্ঠে উত্তর এলো, অ্যাঁ, প্রিয়ে তুমি এসেছ, প্রভু এসেছেন? কি সর্বনাশ, তাঁর সামনে আমি বেরুব কি করে?

আশ্চর্য হয়ে কুবের বললেন, কে গো তুমি? এখনই বেরিয়ে এসো নয় তো বাড়িতে আগুন লাগাব।

তখন দরজা খুলে একটি অবগুণ্ঠিতা নারীমূর্তি বেরিয়ে এল। কুবের ধমক দিয়ে বললেন, আর ন্যাকামি করতে হবে না, তোমার ঘোমটা খোল।

মাথা নীচু করে ঘোমটাবতী উত্তর দিল, প্রভু, এ মুখ দেখাব কি করে?

কুবের বললেন, পুড়িয়েছ নাকি? ভেবো না, শিব যাতে চড়েন সেই বৃষভের সদ্যোজাত গোময় লেপন করলেই সেরে যাবে।

যক্ষিণী হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে এক টানে ঘোমটা খুলে ফেলল। মাথা চাপড়ে নারীমূর্তি বলল, হায় হায়, এর চাইতে আমার মরণই ভাল ছিল।

কুবের প্রশ্ন করলেন, কে তুমি? সেই স্থূণাকর্ণ যক্ষটা কোথায় গেল? তুমি তার রক্ষিতা নাকি?

—মহারাজ, আমিই আপনার হতভাগ্য কিংকর স্থূণাকর্ণ, দৈবদুর্বিপাকে এই দশা হয়েছে, কিন্তু আমার কোনও অপরাধ নেই। প্রিয়ে, আমরা নিতান্তই হতভাগ্য, শাপান্ত হলেও আমাদের মিলন হবার উপায় নেই।

যক্ষিণী বলল, মহারাজ, ইনিই আমার স্বামী, ওই যে, জোড়া ভুরু রয়েছে, নাকের ডগায় সেই তিলটিও দেখা যাচ্ছে। হা নাথ, তোমার এমন দশা হল কেন? কোন্ দেবতাকে চটিয়েছিলে?

যক্ষ বলল, পরের উপকার করতে গিয়ে আমার এই দুরবস্থা হয়েছে। এই জগতে কৃতজ্ঞতা নেই, সত্যপালন নেই।

যক্ষিণী বলল, তুমি মেয়েমানুষ হয়ে গেলে কি করে?

কুবের বললেন, এ রকম হয়ে থাকে। বুধপত্নী ইলা আগে পুরুষ ছিলেন, হরপার্বতীর নিভৃত স্থানে প্রবেশের ফলে স্ত্রী হয়ে যান। বালী-সুগ্রীবের বাপ ঋক্ষরজা এক সরোবরে স্নান করে বানরী হয়ে গিয়েছিলেন। যাই হক, স্থূণাকর্ণ, তুমি সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করে বল।

যক্ষ বলতে লাগল।—মহারাজ, প্রায় তিন মাস হল কিছু শুখনো কাঠ সংগ্রহের জন্য আমি নিকটবর্তী ওই অরণ্যে গিয়েছিলাম। দেখলাম, গাছের তলায় একটি ললনা বসে আছে আর আকুল হয়ে অশ্রুপাত করছে।

যক্ষিণী প্রশ্ন করল, মাগী দেখতে কেমন?

—সুন্দরী বলা চলে, তবে তোমার কাছে লাগে না। কাটখোট্টা গড়ন, মুখে লাবণ্যেরও অভাব আছে। মহারাজ, তারপর শুনুন। আমি সেই নারীকে জিজ্ঞাসা করলাম, ভদ্রে, তোমার কি হয়েছে? যদি বিপদে পড়ে থাক তবে আমি যথাসাধ্য প্রতিকারের চেষ্টা করব।

সে এই আশ্চর্য বিবরণ দিল।—মহাশয়, আমি পঞ্চালরাজ দ্রুপদের কন্যা শিখণ্ডিনী, কিন্তু লোকে আমাকে রাজপুত্র শিখণ্ডী বলেই জানে। পূর্বজন্মে আমি ছিলাম কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা। স্বয়ংবরসভা থেকে ভীষ্ম আমাদের তিন ভগিনীকে হরণ করেছিলেন, তাঁর বৈমাত্র ভাই বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে বিবাহ দেবার জন্য। আমি শাল্বরাজের প্রতি অনুরক্তা জেনে ভীষ্ম আমাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। শাল্ব বললেন, রাজকন্যা, আমি তোমাকে নিতে পারি না, কারণ ভীষ্ম তোমাকে হরণ করেছিলেন, তাঁর স্পর্শ নিশ্চয় তোমাকে পুলকিত করেছিল। তখন আমি ভগবান পরশু-

রামের শরণ নিলাম। তিনি ভীষ্মকে বললেন, তোমারই কর্তব্য অম্বাকে বিবাহ করা। ভীষ্ম সম্মত হলেন না। পরশুরাম তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করলেন, কিন্তু কোনও ফল হল না। ভীষ্মের জন্যই আমার নারীজন্ম বিফল হল এই কারণে ভীষ্মের বধকামনায় আমি কঠোর তপস্যা করলাম। তাতে মহাদেব প্রীত হয়ে বর দিলেন—তুমি পরজন্মে দ্রুপদকন্যা রূপে ভূমিষ্ঠ হবে, কিন্তু পরে পুরুষ হয়ে ভীষ্মকে বধ করবে। মহাদেবের বরে দ্রুপদ গৃহে আমার জন্ম হল। কন্যা হলেও রাজপুত্র শিখণ্ডী রূপেই আমি পালিত হয়েছি, অস্ত্রবিদ্যাও শিখেছি। যৌবনকাল উপস্থিত হলে দশার্ণরাজ হিরণ্যবর্মার কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ হল। কিন্তু কিছুদিন পরেই ধরা পড়ে গেলাম। আমার পত্নী দাসীকে দিয়ে তার মায়ের কাছে বলে পাঠাল—মাগো, তোমাদের ভীষণ ঠকিয়েছে, যার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছ সে পুরুষ নয়, মেয়ে।

এই দুঃসংবাদ শুনে আমার শ্বশুর হিরণ্যবর্মা ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি দূত পাঠিয়ে আমার পিতা দ্রুপদকে জানালেন, দুর্মতি, তুমি আমাকে প্রতারিত করেছ। আমি সসৈন্যে তোমার রাজ্যে যাচ্ছি, চারজন চতুরা যুবতীও আমার সঙ্গে যাচ্ছে, তারা আমার জামাতা শিখণ্ডীকে পরীক্ষা করবে। যদি দেখা যায় যে সে পুরুষ নয় তবে তোমাকে আমি অমাত্যপরিজনসহ বিনষ্ট করব।

পিতার এই দারুণ বিপদ দেখে আমি গৃহত্যাগ করে এই বনে পালিয়ে এসেছি। আমার জন্যই স্বজনবর্গ বিপন্ন হয়েছেন, আমার আর জীবনে প্রয়োজন কি। আমি এখানেই অনাহারে জীবন বিসর্জন দেব।

যক্ষরাজ, শিখণ্ডিনীর এই ইতিহাস শুনে আমার অত্যন্ত অনুকম্পা হল। আমি তাকে বললাম, তুমি কি চাও বল। আমি ধনপতি কুবেরের অনুচর, অদেয় বস্তুও দিতে পারি।

শিখণ্ডিনী বলল, যক্ষ, আমায় পুরুষ করে দাও।

আমি বললাম, রাজকন্যা, আমার পুরুষত্ব কয়েক দিনের জন্য তোমাকে ধার দেব, তাতে তুমি তোমার পিতা ও আত্মীয়বর্গকে দশার্ণরাজের ক্রোধ থেকে রক্ষা করতে পারবে। কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই তুমি এখানে এসে আমার পুরুষত্ব ফিরিয়ে দেবে। আমার শাপান্ত হতে আর বিলম্ব নেই, প্রিয়ার সঙ্গে মিলনের জন্য আমি অধীর হয়ে আছি, অতএব তুমি সত্বর ফিরে এসো।

মহারাজ, শিখণ্ডিনী সেই যে চলে গেল তার পর আর আসে নি। সেই মিথ্যা-বাদিনী দ্রুপদনন্দিনী ধাপ্পা দিয়ে আমার পুরুষত্ব আদায় করে পালিয়েছে, তার বদলে দিয়ে গেছে তার তুচ্ছ নারীত্ব।

যক্ষের কথা শুনে যক্ষিণী বলল, একটা অজানা মেয়ের কান্নায় ভুলে গিয়ে তোমার অমূল্য সম্পদ তাকে দিয়ে দিলে! নাথ, তুমি কি বোকা, কি বোকা!

কুবের বললেন, তুমি একটি গজমূর্খ গর্দভ গাড়ল। যাই হক, এখনই আমি তোমার পুরুষত্ব উদ্ধার করে দেব। চল আমার সঙ্গে।

সকলে পঞ্চাল রাজ্যে উপস্থিত হলেন। রাজধানী থেকে কিছু দূরে এক নির্জন বনে পুষ্পক রথ রেখে কুবের তাঁর এক অনুচরকে বললেন, দ্রুপদপুত্র শিখণ্ডীকে সংবাদ দাও—বিশেষ প্রয়োজনে ধনেশ্বর কুবের তোমাকে ডেকেছেন, যদি না এস তবে পঞ্চাল রাজ্যের সর্বনাশ হবে।

শিখণ্ডী ব্যস্ত হয়ে তখনই এসে প্রণাম করে বললেন, যক্ষরাজ, আমার প্রতি কি আজ্ঞা হয়?

কুবের বললেন, শিখণ্ডী, তুমি আমার কিংকর এই স্থূণাকর্ণকে প্রতারিত করেছ, এর প্রিয়ার সঙ্গে মিলনে বাধা ঘটিয়েছ, যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে তা রক্ষা কর নি। যদি মঙ্গল চাও তবে এখনই এর পুরুষত্ব প্রত্যর্পণ কর।

শিখণ্ডী বললেন, ধনেশ্বর, আমি অবশ্যই প্রতিশ্রুতি পালন করব, আমার বিলম্ব হয়ে গেছে তার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। এই যক্ষ আমার মহোপকার করেছেন, কৃপা করে আরও কিছুদিন আমায় সময় দিন।

কুবের বললেন, কেন, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নি?

—যক্ষরাজ, যে বিপদ আসন্ন ছিল তা কেটে গেছে। দশার্ণরাজ হিরণ্যবর্মার সঙ্গে যে যুবতীরা এসেছিল তারা আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে তাঁকে বলেছে, আপনার জামাতা পূর্ণমাত্রায় পুরুষ বরং ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা। এই কথা শুনে শ্বশুর মহাশয় অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে আমার পিতার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন এবং বিস্তর উপঢৌকন দিয়ে সদলবলে প্রস্থান করেছেন। যাবার সময় তাঁর কন্যাকে বোকা মেয়ে বলে ধমক দিয়ে গেছেন। আমি এই যক্ষ মহাশয়ের কাছে আর এক মাস সময় ভিক্ষা চাচ্ছি, তার মধ্যেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সমাপ্ত হবে। ভীষ্মকে বধ করেই আমি স্থূণাকর্ণের ঋণ শোধ করব।

কুবের বললেন, মহারথ ভীষ্মকে তুমি বধ করবে এ কথা অবিশ্বাস্য। তিনিই তোমাকে বধ করবেন, সেই সঙ্গে তোমার পুরুষত্বও বিনষ্ট হবে। ও সব চলবে না, তুমি এই মুহূর্তে স্থূণাকর্ণের পুরুষত্ব প্রত্যর্পণ কর এবং তোমার স্ত্রীত্ব ফিরিয়ে নাও। নতুবা আমি সাক্ষীপ্রমাণ নিয়ে এখনই তোমার শ্বশুরের কাছে যাব। তোমার প্রতারণার কথা জানলেই তিনি সসৈন্যে এসে পঞ্চাল রাজ্য ধ্বংস করবেন।

ব্যাকুল হয়ে শিখণ্ডী বললেন, হা, আমার গতি কি হবে!

কুবের বললেন, ভাবছ কেন, তোমার ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্ন আছেন, পঞ্চপাণ্ডব ভগিনীপতি আছেন, পাণ্ডবসখা কৃষ্ণ আছেন। তাঁরাই ভীষ্মবধের ব্যবস্থা করবেন।

শিখণ্ডী বললেন, তা হবার জো নেই। ভীষ্ম পাণ্ডবদের পিতামহ, আর দ্রোণ তাঁদের আচার্য। এই দুই গুরুজনকে তাঁরা বধ করবেন না এই কারণে ভীষ্মবধের ভার আমার উপর আর দ্রোণবধের ভার ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর পড়েছে।

কুবের কোনও আপত্তি শুনলেন না। অবশেষে নিরুপায় হয়ে শিখণ্ডী যক্ষকে পুরুষত্ব প্রত্যর্পণ করে নিজের স্ত্রীত্ব ফিরিয়ে নিলেন। তখন কুবেরের সঙ্গে যক্ষ আর যক্ষিণী পরমানন্দে অলকাপুরীতে চলে গেল।

বিষণ্ণমনে অনেকক্ষণ চিন্তা করে শিখণ্ডী (এখন শিখণ্ডিনী) কৃষ্ণসকাশে এলেন। দৈবক্রমে দেবর্ষি নারদও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্ণ বললেন, একি শিখণ্ডী, তোমাকে এমন অবসন্ন দেখছি কেন? দুদিন আগেও তোমার বীরোচিত তেজস্বী মূর্তি দেখেছিলাম এখন আবার কোমল স্ত্রীভাব দেখছি কেন?

শিখণ্ডী বললেন, বাসুদেব, আমার বিপদের অন্ত নেই।

নারদ বললেন তোমরা বিশ্রম্ভালাপ কর, আমি এখন উঠি।

শিখণ্ডী বললেন, না না দেবর্ষি, উঠবেন না। আপনি তো আমার ইতিহাস সবই জানেন, আপনার কাছে আমার গোপনীয় কিছু নেই।

সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে শিখণ্ডী বললেন কৃষ্ণ, তুমি পাণ্ডব আর পাঞ্চালদের সুহৃদ, আমার ভগিনী কৃষ্ণা তোমার সখী। আমাকে সংকট হতে উদ্ধার কর। বিগত জন্ম থেকেই আমার সংকল্প আছে যে ভীষ্মকে বধ করব, মহাদেবের বরও আমি পেয়েছি। কিন্তু পুরুষত্ব না পেলে আমি যুদ্ধ করব কি করে?

কৃষ্ণ বললেন, তোমার সংকল্প ধর্মসংগত নয়। নারী হয়ে জন্মেছ, অলৌকিক উপায়ে পুরুষ হতে চাও কেন? ভীষ্মকে বধ করবার ভার অন্য লোকের উপর ছেড়ে দাও। দেবর্ষি কি বলেন?

নারদ বললেন, ওহে শিখণ্ডী, কৃষ্ণ ভালই বলেছেন। শাল্বরাজ আর ভীষ্ম তোমাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন তাতে হয়েছে কি? পৃথিবীতে আরও পুরুষ আছে। তুমি যদি সম্মত হও তবে আমি তোমার পিতাকে বলব, তিনি যেন কোন সৎপাত্রে তোমাকে অর্পণ করেন। তাতেই তোমার নারীজন্ম সার্থক হবে। তোমার পত্নীরও একটা গতি হয়ে যাবে সে তোমার সপত্নী হয়ে সুখে থাকবে।

শিখণ্ডী বললেন, অমন কথা বলবেন না দেবর্ষি। মহাদেব আমাকে যে বর দিয়েছেন তা অবশ্যই সফল হবে। কৃষ্ণ, তোমার অসাধ্য কিছু নেই, তুমি আমাকে পুরুষ করে দাও।

কৃষ্ণ বললেন, আমি বিধাতা নই যে অঘটন ঘটাব। সেই যক্ষের মতন কেউ যদি স্বেচ্ছায় তোমার সঙ্গে অঙ্গ বিনিময় করে তবেই তুমি পুরুষ হতে পারবে। কিন্তু সেরকম নির্বোধ আর কেউ আছে বলে মনে হয় না। দেবর্ষি, আপনি তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে বেড়ান, আপনার জানা আছে?

নারদ বললেন, আছে, তুমিও তাঁকে জান। শোন শিখণ্ডী, বৃন্দাবন ধামে কৃষ্ণের এক দূর সম্পর্কের মাতুল আছেন। তিনি গোপবংশীয়, নাম আয়ান ঘোষ। অতি সদাশয় পরোপকারী লোক, কিন্তু বড়ই মনঃকষ্টে আছেন, ধর্মকর্ম নিয়েই থাকেন, সংসারে আসক্তি নেই। তুমি তাঁর শরণাপন্ন হও।

শিখণ্ডী বললেন, বাসুদেব, তুমি আমার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করে শ্রীআয়ানকে একটি পত্র দাও, তাই নিয়ে আমি তাঁর কাছে যাব।

কৃষ্ণ বললেন, পাগল হয়েছ? আমার নাম যদি ঘৃণাক্ষরে উল্লেখ কর তবে তখনই তিনি তোমাকে বিতাড়িত করবেন। দেখ শিখণ্ডী, আমার অদৃষ্ট বড় মন্দ, অকারণে আমি কয়েকজনের বিরাগভাজন হয়েছি—কংস, শিশুপাল, আর আমার পূজ্যপাদ মাতুল এই আয়ান ঘোষ। এমন কি, আমার পুত্র শাম্বের শ্বশুর দুর্যোধনও আমার শত্রু হয়েছেন।

শিখণ্ডী বললেন, তবে উপায়?

নারদ বললেন, উপায় তোমারই হাতে আছে। নারীর ছলাকলা আর পুরুষের কূটবুদ্ধি দুটিই তোমার স্বভাবসিদ্ধ, তাই দিয়েই কাজ উদ্ধার করতে পারবে। চল আমার সঙ্গে, শ্রীআয়ানের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব।

বৃন্দাবনের এক প্রান্তে লোকালয় হতে বহু দূরে যমুনাতীরে একটি কুটীর নির্মাণ করে আয়ান ঘোষ সেখানে বাস করেন। বিকাল বেলা নদীপুলিনে বসে তিনি

রাবণরচিত শিবতাণ্ডব স্তোত্র আবৃত্তি করছিলেন, এমন সময় শিখণ্ডীর সঙ্গে নারদ সেখানে উপস্থিত হলেন।

সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে আয়ান বললেন, দেবর্ষি, আমি ধন্য যে আপনার দর্শন পেলাম। এই সুন্দরীকে তো চিনতে পারছি না।

নারদ বললেন, ইনি পঞ্চালরাজ দ্রুপদের কন্যা শিখণ্ডিনী। ভগবান শূলপাণি একটি কঠোর ব্রত পালনের ভার এঁর উপর দিয়েছেন। সেই ব্রত উদ্‌যাপিত না হওয়া পর্যন্ত এঁকে অনূঢ়া থাকতে হবে। কিন্তু কোনও সদাশয় ধর্মপ্রাণ পুরুষের সাহায্য ভিন্ন এঁর সংকল্প পূর্ণ হবে না। মহামতি আয়ান, আমি দিব্যচক্ষুতে দেখছি তুমিই সেই ভাগ্যবান পুরুষ। এঁর অনুরোধ রক্ষা কর, ব্রত সমাপ্ত হলেই এই অশেষ গুণবতী ললনা তোমাকে পতিত্বে বরণ করবেন, তোমার জীবন ধন্য হবে।

একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে আয়ান বললেন, হা দেবর্ষি, আমার জীবন কি করে ধন্য হবে? আমার সংসার থাকতেও নেই, গৃহ শূন্য। লোকে আমাকে অবজ্ঞা করে, অপদার্থ কাপুরুষ বলে, অন্তরালে ধিক্‌কার দেয়। তাই জনসংস্রব বর্জন করে এই নিভৃত স্থানে বাস করছি। এই বরবর্ণিনী রাজকন্যা আমার ন্যায় হতভাগ্যের কাছে কেন এসেছেন?

শিখণ্ডী মধুর কণ্ঠে বললেন, গোপশ্রেষ্ঠ মহাত্মা আয়ান, আপনার গুণরাশি শুনে দূর থেকেই আমি মোহিত হয়েছিলাম, এখন আপনাকে দেখে আমি অভিভূত হয়েছি, আপনার চরণে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করছি।

আয়ান বললেন, আমার বঞ্চিত ধিক্‌কৃত জীবনে এমন সৌভাগ্যের উদয় হবে তা আমি স্বপ্নেও আশা করি নি। মনোহারিণী শিখণ্ডিনী, তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই। আমার কাছে তুমি কি চাও বল।

শিখণ্ডী বললেন, দেবর্ষি, আপনিই এঁকে বুঝিয়ে দিন।

ব্রতের কথা সংক্ষেপে জানিয়ে নারদ বললেন, গোপেশ্বর আয়ান, মহাদেবের বরে শিখণ্ডিনী অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করবেন, তোমাকে কেবল এক মাসের জন্য এঁকে তোমার পুরুষত্ব দান করতে হবে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ তার মধ্যেই সমাপ্ত হবে, ভীষ্মও স্বর্গলাভ করবেন, তার পরেই রাজা দ্রুপদ তাঁর এই কন্যাকে তোমার হস্তে সম্প্রদান করবেন, পঞ্চাল রাজ্যের অর্ধ অংশ ও বিস্তর সবৎসা ধেনুও যৌতুক স্বরূপ দেবেন। বৃন্দাবনের অপ্রিয় স্মৃতি পশ্চাতে ফেলে রেখে তুমি নূতন পত্নীসহ নতুন দেশে পরম সুখে রাজত্ব করবে।

ক্ষণকাল চিন্তার পর আয়ানের দ্বৈধ দূর হল, তিনি তাঁর ভাবী বধূর প্রার্থনা পূর্ণ করলেন। পুনর্বার পুরুষত্ব লাভ করে শিখণ্ডী হৃষ্টচিত্তে নারদের সঙ্গে চলে গেলেন। আর স্ত্রীরূপী আয়ান কুটীরের দ্বার রুদ্ধ করে অসূর্যম্পশ্যা হয়ে শিখণ্ডীনীর প্রত্যাশায় দিন যাপন করতে লাগলেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের দশম দিনে শিখণ্ডীর বাণে জর্জরিত হয়ে ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করলেন। তার আটদিন পরে যুদ্ধ সমাপ্ত হল। কিন্তু শিখণ্ডী আয়ানের কাছে এলেন না, তাঁর আসবার উপায়ও ছিল না। অশ্বত্থামা গভীর নিশীথে পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ করে যাঁদের হত্যা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে শিখণ্ডীও ছিলেন।

আয়ানের ভাগ্যে রাজকন্যা আর অর্ধেক রাজত্ব লাভ হল না, তাঁর পুরুষত্বও শিখণ্ডীর সঙ্গে ধ্বংস হয়ে গেল। কিন্তু তাঁর জীবন বিফল হল এমন কথা বলা যায় না। কালক্রমে আয়ানের এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক পরিবর্তন হল। তিনি মনঃপ্রাণ শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করে আয়ানী নামে খ্যাত হলেন, শ্রীখোল বাজাতে শিখলেন, এবং ব্রজমণ্ডলে যে ষোল হাজার গোপিনী বাস করত তাদের নেত্রী হয়ে নিরন্তর কৃষ্ণকীর্তন করতে লাগলেন।

১৮৭৯ শক (১৯৫৭)

রাজমহিষী

হংসেশ্বর রায় খুব ধনী লোক। রাধানাথপুরে তাঁর যে জমিদারি ছিল তা এখন সরকারের দখলে গেছে, কিন্তু তাতে হংসেশ্বরের গায়ে আঁচড় লাগে নি। কলকাতায় অফিস অঞ্চলে আর শৌখিন পাড়ায় তাঁর ষোলটা বড় বড় বাড়ি আছে, তা থেকে মাসে প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা আয় হয়। তা ছাড়া বন্ধকী কারবার আর বিস্তর শেয়ারও আছে। হংসেশ্বরের বয়স পঞ্চাশ। তাঁর পত্নী হেমাঙ্গিনী সংসারে অনাসক্ত, বিপুল শরীর নিয়ে বিছানায় শুয়ে ঔষধ আর পুষ্টিকর পাথ্য খেয়ে গল্পের বই পড়ে দিন কাটান আর মাঝে মাঝে বাড়ির লোকদের ধমক দেন—যত সব কুঁড়ের বাদশা জুটেছে। এঁদের একমাত্র সন্তান চকোরী, সম্প্রতি এম. এ. পাস করেছে।

কলকাতা হংসেশ্বরের ভাল লাগে না। তাঁর যে সব শখ আছে তাঁর চর্চার পক্ষে রাধানাথপুরই উপযুক্ত স্থান, তাই ওখানেই তিনি বাস করেন। তাঁর প্রকাণ্ড বাগান আছে, গরু আর হাঁস-মুরগিও আছে। কৃষিজাত দ্রব্য আর পশুপক্ষীর যত প্রদর্শনী হয় তাতে তাঁর আম কাঁঠাল লাউ কুমড়ো গরু হাঁস মুরগিই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পায়। সম্প্রতি তিনি পশ্চিম পঞ্জাবের গুজরানওআলা থেকে একটি ভাল জাতের মোষ আনিয়েছেন, তার জন্যে তাঁর এক পাকিস্তানী বন্ধুকে প্রচুর ঘুষ দিতে হয়েছে। তিনি মোষটির নাম রেখেছেন রাজমহিষী। কিছু দিন আগে তার প্রথম বাচ্চা হয়েছে। আগামী ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্যাট্‌ল শো-তে তিনি এই মোষটিকে পাঠাবেন। তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছেন তালদিঘির রায়সাহেব মহিম বাঁড়ুজ্যে, তাঁর একটি মুলতানী মোষ আছে। হংসেশ্বর আশা করেন তাঁর রাজমহিষীই রাজ্যপাল গোল্ড মেডাল পাবে।

হংসেশ্বরের মেয়ে চকোরী কলকাতায় তার মামাদের তত্ত্বাবধানে থেকে কলেজে পড়ত। এখন পড়া শেষ করে রাধানাথপুরে তার বাপ-মায়ের কাছে আছে, মাঝে মাঝে দু-দশ দিনের জন্যে কলকাতায় যায়। চকোরী লম্বা রোগা, দাঁত বড় বড়, চোয়াল উঁচু, গায়ের স্বাভাবিক রঙ ময়লা। সর্বাঙ্গীণ পরিপাটী মেক-অপ সত্ত্বেও তাকে সুন্দরী বলে ভ্রম হয় না। চকোরীর হিংসুটে সখীরা বলে, রূপে তো আহামরি বিদ্যাধরী, গুণে মা মনসা, শুধু ওর বাপের সম্পত্তির লোভে খোশামুদেগুলো জোটে।

মেয়ের বিবাহের জন্যে হেমাঙ্গিনীর কিছুমাত্র চিন্তা নেই, হংসেশ্বরও ব্যস্ত নন। তিনি বলেন, চকোরী হুঁশিয়ার হিসেবী মেয়ে, বোকা-হাবার মতন চোখ বুজে বাজে লোকের সঙ্গে প্রেমে পড়বে না, চটক দেখে বা মিষ্টি-মধুর বুলি শুনেও ভুলবে না। তাড়াহুড়োর দরকার কি, আজকাল তো ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের পরে মেয়েদের বিয়ের রেওয়াজ হয়েছে। চকোরী সুবিধে মতন নিজেই যাচাই করে একটা ভাল বর জুটিয়ে নেবে।

চকোরীর প্রেমের যত উমেদার আছে তার মধ্যে সব চেয়ে নাছোড়বান্দা হচ্ছে বংশীধর। সম্প্রতি সে পি-এচ. ডি. ডিগ্রী পেয়ে টালিগঞ্জ কলেজে একটা প্রোফেসারি পেয়েছে, বটানি আর জোঅলজি পড়ায়। তার বাবা শশধর চৌধুরী দু বছর হল মারা

গেছেন। তিনি উকিল ছিলেন, হংসেশ্বরের কলকাতার সম্পত্তি তদারক করতেন। বংশীধরের মামার বাড়ি রাধানাথপুরে, সেখানে সে মাঝে মাঝে যায়। চকোরীর সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই তার পরিচয় আছে, হংসেশ্বরকে সে কাকাবাবু বলে।

পুজোর ছুটিতে বংশীধর রাধানাথপুরে এসেছে। একদিন সে চকোরীকে বলল, আর দেরি কেন, তোমার লেখাপড়া শেষ হয়েছে, আমারও যেমন হক একটা চাকরি জুটেছে। এখন আর তোমার আপত্তি কিসের? তুমি রাজী হলেই তোমার বাবাকে বলব।

চকোরী বলল, ব্যাপারটি যত সোজা মনে করছ তা নয়। আমার তরফ থেকে বলতে পারি, তোমাকে আমার পছন্দ হয়, বেশ শান্তশিষ্ট, যদিও নামটা বড় সেকেলে, বংশী-ধর শুনলেই মনে হয় সাপুড়ে। কিন্তু প্রেমে হাবুডুবু খাবার মেয়ে আমি নই। বাবাকে যদি রাজী করাতে পার তবে বিয়ে করতে আমার আপত্তি নেই। তবে বাবা লোকটি সহজ নন, নানা রকম ফেচাং তুলবেন। তোমার যদি সাহস আর জেদ থাকে তাঁকে বলে দেখতে পার।

পরদিন সকালে হংসেশ্বরের কাছে গিয়ে বংশীধর সবিনয়ে নিবেদন করল যে তার কিছু বলবার আছে। হংসেশ্বর তখন তাঁর মোষের প্রাতঃকৃত্য তদারক করছিলেন। বংশীধরকে বললেন, একটু সবুর কর। তার পর তিনি রাজমহিষীর পরিচারককে বল-লেন, এই গোপীরাম, বেশ পরিষ্কার করে গা মুছিয়ে দিবি, খবরদার একটুও কাদা যেন লেগে না থাকে। একি রে নাকের ডগায় মশা কামড়েছে দেখছি, ওর ঘরে ডিডিটি দিস নি বুঝি?

গোপীরাম বলল, বহুত দিয়েছি হুজুর, কিন্তু দিদি দিলে মচ্ছড় ভাগে না। আপনি যদি হুকুম করেন তবে আমার গাঁও থেকে চারঠো বগুলা মাঙাতে পারি।

—বগুলা কি জিনিস?

—বগ-পাখি হুজুর। গোহালে রাখলে মখ্খি মচ্ছড় পতিংগা মকড়া সব টপাটপ খেয়ে ফেলবে, ভঁইসী আর তার বচ্চা বহুত আরমসে নিদ যাবে।

—বগ থাকবে কেন, পালিয়ে যাবে।

—না হুজুর, ওদের পংখ্ একটু ছেঁটে দিব, উড়তে পারবে না। পন্দ্র দিন বাদ গাঁও সে আমার এক চাচা আসবে, বলেন তো বগুলা আনতে লিখে দিব, চার বগুলায় বিশ টাকা অন্দাজ খর্চ পড়বে।

—বেশ, আজই লিখে দে।

গোপীরামকে আরও কিছু উপদেশ দিয়ে হংসেশ্বর তাঁর অফিসঘরে বংশীধরকে নিয়ে গেলেন। প্রশ্ন করলেন, তার পর বংশী, ব্যাপারটা কি হে।

মাথা নীচু করে হাত কচলাতে কচলাতে বংশীধর বলল, কাকাবাবু, অনেক দিনের একটা দুরাশা আছে, তাই আপনার সম্মতি ভিক্ষা করতে এসেছি।

হংসেশ্বর বললেন, অ। চকোরীকে বিয়ে করতে চাও এই তো?

বংশীধর সভয়ে বলল, আজ্ঞে হাঁ।

হংসেশ্বর বললেন, শোন বংশী, আমি স্পষ্ট কথার মানুষ। পাত্র হিসেবে তুমি ভালই, দেখতে চকোরীর চাইতে ঢের বেশী সুশ্রী, বিদ্যাও আছে, যত দূর জানি চরিত্রও ভাল। কিন্তু তোমার আর্থিক অবস্থা তো সুবিধের নয়। কলকাতায় একটা সেকেলে পৈতৃক বাড়ি আছে বটে, কিন্তু সেখানে তোমার মা দিদিমা ভাই বোন ভাগনেরা গিশ-গিশ করছে, সেই ভিড়ের মধ্যে চকোরী এক মিনিটও টিকতে পারবে না। তার পর

তোমার আয়। মাইনে কত পাও হে? দু শ? পরে আড়াই শ হবে? খেপেছ, ওই টাকায় চকোরীকে পুষতে চাও? তার সাবান ক্রীম পাউডার পেন্ট লিপস্টিক সেন্ট এই সব খরচই তো মাসে আড়াই শ-র ওপর। তুমি হয়তো ভেবেছ মেয়ে-জামাইএর ভরণ-পোষণের জন্যে আমি মাসে মাসে মোটা টাকা দেব। সেটি হবে না বাপু।

বংশীধর বলল, আমি গরিব হলেই ক্ষতি কি কাকাবাবু? চকোরী আপনার এক-মাত্র সন্তান, সে যাতে সুখে থাকে তার জন্যে আপনি অর্থসাহায্য করবেন এ তো স্বাভাবিক। আপনার অবর্তমানে ওই তো সব পাবে।

—অবর্তমান হতে ঢের দেরি হে, আমি এখনও চল্লিশ বছর বাঁচব, তার আগে এক পয়সাও হাতছাড়া করব না। মেয়ে যদ্দিন আইবুড়ো তদ্দিন আমার খরচে নবাবি করুক আপত্তি নেই, কিন্তু বিয়ের পর সমস্ত ভার তার স্বামীকে নিতে হবে। আর যদিই বা তোমাদের খরচ আমি যোগাই তাতে তোমার মাথা হেঁট হবে না? বাপের মাইনের গোলাম স্বামীর ওপর কোনও মেয়ের শ্রদ্ধা থাকে না। আমিই বা চ্যারিটি-বয় জামাই করতে যাব কেন?

বংশীধর কাতর স্বরে বলল, তবে কি আমার কোনও আশা নেই?

—আশা থাকতে পারে। তুমি উঠে পড়ে লেগে যাও যাতে তোমার রোজগার বাড়ে। তোমার মাসিক আয় আড়াই হাজার হলেই আমার আর আপত্তি থাকবে না।

—অত টাকা আয়ের তো কোনও আশা দেখছি না। আর, চকোরী কি তত দিন সবুর করবে?

—সবুর করবে কিনা আমি কি করে বলব। তুমিই তার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে পার। হাঁ, আর একটা কথা তোমার জেনে রাখা দরকার। চকোরীকে ভাঁওতা দিয়ে রাজী করিয়ে যদি আমার অমতে তাকে বিয়ে কর তবে আমার সমস্ত সম্পত্তি হরিণ-ঘাটায় দান করব, গো-মহিষ-ছাগাদি পশু আর হংস-কুক্কুটাদি পক্ষীর উৎকর্ষকল্পে। আর, চকোরী আমার সম্পত্তি পেলেই বা তোমার কি সুবিধে হবে? সে অতি ঝানু মেয়ে, কাকেও বিশ্বাস করে না, ব্যাঙ্কের চেকবুক তোমাকে দেবে না, বিষয় যা পাবে তাতেও তোমাকে হাত দিতে দেবে না। বড় জোর তোমার সিগারেটের খরচ যোগাবে আর জন্মদিনে কিছু উপহার দেবে, এক সুট ভাল পোশাক, কি রিস্টওয়াচ, কিংবা একটা শার্পার-নাইন্টি কলম। চকোরীকে বিয়ে করার মতলব ছেড়ে দেওয়াই তোমার পক্ষে ভাল।

বংশীধর বিষণ্ণ মনে চলে গেল। বিকাল বেলা তার কাছে সব কথা শুনে চকোরী বলল, বাবা যে ওই রকম বলবেন তা আমি আগে থাকতেই জানি।

বংশীধর বলল, চকোরী, তোমার বাবার সম্পত্তি তাঁরই থাকুক, আমার তাতে লোভ নেই। তুমি যদি সত্যিই আমাকে ভালবাস তবে ত্যাগ স্বীকার করতে পারবে না? প্রেমের জন্যে নারী কি না ছাড়তে পারে? যদি ভালবাসা থাকে তবে আমার সেকেলে ছোট বাড়িতে আর সামান্য আয়েই তুমি সুখী হতে পারবে।

চকোরী হেসে বলল, শোন বংশী। প্রেম খুব উঁচুদরের জিনিস, আর তোমার ওপর আমার তা নেহাত কম নেই। কিন্তু টাকাহীন প্রেম আর চাকাহীন গাড়ি দুইই অচল, কষ্টের সংসারে ভালবাসা শুকিয়ে যায়। 'ধনকে নিয়ে বনকে যাব থাকব বনের মাঝখানে, ধনদৌলত চাই না শুধু চাইব ধনের মুখপানে'—এ আমার পোষাবে না বাপু। তোমাকে ভয় দেখিয়ে তাড়াবার জন্যে বাবা অবশ্য অনেকটা বাড়িয়ে বলেছেন, আমাকে একবারে হার্টলেস রাক্ষুসী বানিয়েছেন। কিন্তু আমি অতটা বেয়াড়া নই।

তবে বাবা নিতান্ত অন্যায় কিছু বলেন নি। আমি বলি কি তোমার ওই প্রোফেসরি ছেড়ে দিয়ে কোনও ভাল চাকরির চেষ্টা কর। বাবার সঙ্গে মন্ত্রীদের আলাপ আছে, ওঁকে ধরলে নিশ্চয় একটা ভাল পোস্ট তোমাকে দেওয়াতে পারবেন। প্রথমটা মাইনে কম হলেও পরে আড়াই-তিন হাজার হওয়া অসম্ভব নয়।

—তত দিন আমার জন্যে তুমি সবুর করে থাকবে?

—গ্যারাণ্টি দিতে পারব না। অক্ষয় প্রেম একটা বাজে কথা, ভবিষ্যতে তোমার আমার দুজনেরই মতিগতি বদলাতে পারে। যা বলি শোন। একটা ভাল সরকারী চাকরির জন্যে নাছোড়বান্দা হয়ে বাবাকে ধর। কিন্তু এখনই নয়, ওঁর মাথার এখন ঠিক নেই, দিনরাত ওই মোষটার কথা ভাবছেন। বাবার গুপ্তচর খবর এনেছে, তালদিঘির সেই মহিম বাঁড়ুজ্যের মুলতানী মোষ নাকি রোজ সাড়ে কুড়ি সের দুধ দিচ্ছে, আমাদের রাজমহিষীর চাইতে কিছু বেশী, যদিও দুটোই সমবয়সী তরুণী মোষ। বাবা তাই উঠে পড়ে লেগেছেন, রাজমহিষীকে কাপাস বিচির খোল, চীনা-বাদাম, পালং শাগ, কড়াইশুঁটি, গাজর, টোমাটো, নারকেল-কোরা, কমলানেবুর রস, এই সব পুষ্টিকর জিনিস খাওয়াচ্ছেন, ভাইটামিন বি-কমপ্লেক্সও দিচ্ছেন। এগজিবিশনটা আগে চুকে যাক। রাজমহিষী যদি গোল্ড মেডাল পায় তবে বাবা খুব দিল-দরিয়া হবেন, তখন তাঁকে চাকরির জন্যে ধরবে।

আর এক মাস পরেই পশ্চিমবঙ্গ-গবাদি-পশু-প্রদর্শনী, কিন্তু হংসেশ্বর মহা বিপদে পড়েছেন, রাজমহিষী খাওয়া প্রায় ত্যাগ করেছে, দুধও নামমাত্র দিচ্ছে। যত নষ্টের গোড়া ওই গোপীরাম, রাজমহিষীর প্রধান সেবক। সে তার ইয়ারদের সঙ্গে রাসপূর্ণিমায় মেলায় গিয়ে খুব তাড়ি খেয়ে হাঙ্গামা বাধিয়েছিল, পুলিস এলে তাদের সঙ্গে বীরদর্পে লড়ে একটা কনস্টেবলের মাথা ফাটিয়েছিল। তার ফলে তাকে গ্রেপ্তার করে থানায় চালান দেওয়া হয়। খবর পেয়ে তাকে খালাস করবার জন্যে হংসেশ্বর অনেক চেষ্টা করলেন, কলকাতা থেকে ভাল ব্যারিস্টার পর্যন্ত আনালেন। আদালতে তিনি প্রার্থনা করলেন, মোটা জরিমানা করে আসামীকে ছেড়ে দেওয়া হক। কিন্তু হাকিম তা শুনলেন না, ছ মাস জেলের হুকুম দিলেন। তখন ব্যারিস্টার বললেন, ইওর অনার, এই গোপীরাম যদি জেলে যায় তবে শ্রীহংসেশ্বর রায়ের সর্বনাশ হবে। তাঁর বিখ্যাত চ্যাম্পিয়ান বফেলো রাজমহিষী গোপীরামের বিরহে খাওয়া বন্ধ করেছে। না খেলে সে আগামী ক্যাট্‌ল শো-তে দাঁড়াবে কি করে? অতএব ইওর অনার, দয়া করে মোটা জামিন নিয়ে আসামীকে এক মাসের জন্যে ছেড়ে দিন, প্রদর্শনী শেষ হলেই সে জেলে ঢুকবে। কিন্তু হাকিমটি অত্যন্ত একগুঁয়ে আর অবুঝ, কোনও আবদার শুনলেন না। তাই গোপীরাম এখন জেলে রয়েছে।

হংসেশ্বর পূর্বে বুঝতে পারেন নি যে মোষটা গোপীরামের এত নেওটা হয়ে পড়েছে। এখন তিনি অকূল পাথারে হাবুডুবু খাচ্ছেন। গোপীরামের সহকারীরা কেউ ভয়ে এগোয় না, কাছে গেলেই রাজমহিষী গুঁতুতে আসে। শুধু হংসেশ্বরকে সে কাছে আসতে আর গায়ে হাত বুলুতে দেয়, কিন্তু তিনি খুব সাধাসাধি করেও তাকে খাওয়াতে পারলেন না।

হংসেশ্বরের এই সংকট শুনে বংশীধর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এল। তিনি তখন এক ছড়া সিংগাপুরী কলা মোষের নাকের সামনে ধরে লোভ দেখাচ্ছেন আর খাবার জন্যে অনুনয় করছেন, কিন্তু মোষ ঘাড় ফিরিয়ে নিচ্ছে।

বংশীধর বলল, কাকাবাবু, আমি কোনও সাহায্য করতে পারি কি?

হংসেশ্বর খেঁকিয়ে বললেন, গুঁতো খাবার ইচ্ছে হয় তো এগিয়ে আসতে পার।

হঠাৎ বংশীধরের মাথায় একটা মতলব এল। হংসেশ্বরের কাছ থেকে সরে এসে সে গোপীরামের সহকারীদের সঙ্গে কথা কয়ে রাজমহিষী সম্বন্ধে অনেক খবর জেনে নিল। তার পরদিন ভোরের ট্রেনে সে বর্ধমান জেলে গোপীনাথের সঙ্গে দেখা করতে গেল। তার উদ্দেশ্য শুনে জেলার খুশী হয়ে অনুমতি দিলেন।

রাধানাথপুরে ফিরে এসেই হংসেশ্বরের কাছে গিয়ে বংশীধর বলল, কাকাবাবু, ভাববেন না, আপনার মোষ যাতে খায় তার ব্যবস্থা আমি করছি।

হংসেশ্বর বললেন, ব্যবস্থাটা কি রকম শুনি? তুমি ওকে খাওয়াতে গেলেই তো গুঁতিয়ে দেবে।

—আমি নয়, আপনিই ওকে খাওয়াবেন। গোপীরামের সঙ্গে দেখা করে আমি সব হদিস জেনে নিয়েছি। ব্যাপার হচ্ছে এই।—মোষটাকে খাওয়াবার সময় গোপীরাম তার গায়ে হাত বুলিয়ে একটা গান গাইত। সেই গানটি না শুনলে রাজমহিষীর আহারে রুচি হয় না।

—এ তো বড় অদ্ভুত কথা।

—আজ্ঞে, রুশ বিজ্ঞানী প্যাভলভ একেই বলেছেন কণ্ডিশণ্ড্ রিফ্লেক্স। আপনাকে গানটি শিখে নিতে হবে।

হংসেশ্বর বললেন, গান-টান আমার আসে না। যাই হক, গানটা কি শুনি?

বংশধীর বলল, কাকাবাবু, আমারও একটা কণ্ডিশন আছে। আগে কবুল করুন —মোষ যদি আগের মতন খায় তবে আমাকে খুব মোটা বকশিশ দেবেন।

—কি চাও তুমি? চকোরীর সঙ্গে বিয়ে?

—চকোরীর কথা পরে হবে। আপনার তিনখানা বাড়ি আমাকে দেবেন, ব্রাবোর্ন রোডের সেই আটতলাটা, চৌরঙ্গীর ছতলাটা, আর সাদার্ন অ্যাভিনিউ-এর তেতলাটা।

—ওঃ, তোমার আস্পর্ধা তো কম নয় ছোকরা! ওই তিনটে বাড়ি থেকে মাসে আমার প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার আসে তা জান?

—আজ্ঞে জানি বইকি। কিন্তু ওর কমে তো পারব না কাকাবাবু। ওই আয় যখন আমার হবে তখন চকোরীর সঙ্গে বিয়ে দিতে আপনার আর আপত্তি থাকবে না। আপনারও কিছু সুবিধে হবে, ইনকম ট্যাক্স আর ওয়েল্‌থ ট্যাক্স কম লাগবে।

—তুমি এত বড় শয়তান তা জানতুম না। যাই হক, যখন অন্য উপায় নেই তখন তোমার কথাতেই রাজী হলুম। রাজমহিষী যদি পেট ভরে খায় তবে তোমাকে ওই তিনটে বাড়ি দেব। কিন্তু যদি না খায় তবে তুমি এ বাড়ির ত্রিসীমায় আসবে না।

—যে আজ্ঞে।

—কথা তো দিলুম, এখন গানটা কি শুনি?

—আজ্ঞে, শোনাতে লজ্জা করছে, গানটা ঠিক ভদ্র সমাজের উপযুক্ত নয় কিনা। কিন্তু অন্য উপায় তো নেই, আমার কাছেই আপনাকে শিখে নিতে হবে। গোপী-রামের গানটা হচ্ছে—

সোনামুখী রাজভঁইসী পাগল করেছে
জাদু করেছে রে হামায় টোনা করেছে।
ঝমে ঝমে ঝঁয় ঝঁয়, ঝমে ঝমে ঝঁয়।

—ও আবার কি রকম গান?

—গানটার একটু ইতিহাস আছে। গোপীরাম আগে দারভাঙ্গায় থাকত। সেখানে একটা পাগল বাঙালীদের বাড়ির সামনে ওই গানটা গাইত, তবে তার প্রথম লাইনটা একটু অন্য রকম—সোনামুখী বাঙালিনী পাগল করেছে। এই গান শুনলেই বাড়ির লোক দূর দূর করে পাগলটাকে তাড়িয়ে দিত। গোপীরাম সেই গানটা শিখে এসেছে, শুধু বাঙালিনীর জায়গায় রাজভঁইসী করেছে। আপনি আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতে শিখুন, আজ রাত দশটা পর্যন্ত রিহার্সাল চলুক।

অত্যন্ত অনিচ্ছায় রাজী হয়ে হংসেশ্বর গানটা শেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন। বংশীধর বার বার সতর্ক করে দিল—রাজমহিষী নয় কাকাবাবু, বলুন রাজভঁইসী, আমায় নয়, বলুন হামায়। উচ্চারণটা ঠিক গোপীরামের মতন হওয়া দরকার। হাঁ, এইবার হয়ে এসেছে। আর ঘণ্টাখানিক গলা সাধলেই সুরটি আয়ত্ত হবে।

সকাল বেলা হংসেশ্বর বললেন, দেখ বংশী, রাজমহিষীকে খাওয়াবার সময় তুমি আমার পিছনে থেকে প্রম্পট করবে, আমার সঙ্গে থাকলে তোমাকে গুঁতিয়ে দেবে না। আর একটা কথা—শুধু তুমি আর আমি থাকব, আর কেউ থাকলে আমি গাইতে পারব না।

বংশীধর বলল, ঠিক আছে, অন্য কারও থাকবার দরকারই নেই।

দু বালতি রাজভোগ বংশীধর রাজমহিষীর জন্যে বয়ে নিয়ে গেল, হংসেশ্বর তা গামলায় ঢেলে দিলেন। বংশীধর পিছনে গিয়ে বলল, কাকাবাবু, এইবার গানটা ধরুন।

মোষের পিঠে হাত বুলুতে বুলুতে হংসেশ্বর মধুর স্বরে বললেন ; লক্ষ্মী সোনা আমার, পেট ভরে খাও, নইলে গায়ে গত্তি লাগবে কেন, দুধ আসবে কেন, সেই মুলতানীটা যে তোমাকে হারিয়ে দেবে। হুঁ হুঁ হুঁ—

সোনামুখী রাজভঁইসী পাগল করেছে,
জাদু করেছে রে হামায় টোনা করেছে—

মোষ ফোঁস করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল। বংশীধর ফিসফিস করে বলল, থামবেন না কাকাবাবু, বেশ দরদ দিয়ে বার বার গাইতে থাকুন, শেষ লাইনের সুরে ভুল করবেন না, ঝমে ঝমে ঝঁয় ঝঁয় ঝমে ঝমে ঝঁয়—নিনি ধাপ্পা পা মা মাগ্গা গা রে সা।

তাল-মান-লয় ঠিক রেখে হংসেশ্বর তিনবার গানটা শেষ করলেন, তার পর চতুর্থ-বার ধরলেন—সোনামুখী রাজভঁইসী ইত্যাদি।

সহসা মোষ মাথা নামিয়ে গামলায় মুখ দিল। তার পর সেই নির্জন প্রাঙ্গণের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মৃদু মন্দ আওয়াজ উঠল—চবং চবং চবং। রাজমহিষী ভোজন করছেন।

পরবর্তী ঘটনাবলী সবিস্তারে বলবার দরকার নেই। পনরো দিনের মধ্যেই রাজমহিষীর বপু গজেন্দ্রাণীর তুল্য হল, গায়ে স্বল্প লোমের ফাঁকে ফাঁকে নিবিড় আলতা, কালির রঙ ফুটে উঠল, বিপুল পয়োধর থেকে প্রত্যহ পঁচিশ সের দুধ বেরুতে লাগল। পশ্চিমবঙ্গ-গবাদি-পশু-প্রদর্শনীতে সে মহিম বাঁড়ুজ্যের মুলতানী এবং অন্যান্য প্রতিযোগিনীদের অনায়াসে হারিয়ে দিল। রাজ্যপালী তার গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দিলেন, কৃষিমন্ত্রী সন্তর্পণে এক ছড়া রজনীগন্ধার মালা তার গলায় পরিয়ে দিলেন। রাজমহিষী প্রসন্ন হয়ে সেই অর্ঘ্যটি গ্রহণ করে চিবুতে লাগল।

বংশীধরের নতুন আবদার শুনে হংসেশ্বর বললেন, আবার চাকরির শখ হল কেন? আমার বুকে বাঁশ দিয়ে তো যত পেরেছ বাগিয়ে নিয়েছ।

বংশীধর বলল, আজ্ঞে, একটা ভাল পোস্ট না পেলে যে আমার সেলফ-রেসপেক্ট থাকবে না। লোকে বলবে, ব্যাটা শ্বশুরের বিষয় পেয়ে নবাবি করছে।

১৮৭৯ শক (১৯৫৭)

(একটি ইংরেজী গল্পের প্লটের অনুসরণে। লেখকের নাম মনে নেই।)

নবজাতক

সোমনাথের বউ উমা আসন্নপ্রসবা। পাশের ঘরে ডাক্তার নর্স ধাই মোতায়েন আছে। বাইরের বসবার ঘরে শুভাকাঙ্ক্ষী স্বজনবর্গ অপেক্ষা করছে, উমা আর সোমনাথ দুজনেরই ইচ্ছে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবামাত্র যেন সকলের আশীর্বাদ পায়। সোমনাথ অস্থির হয়ে এ ঘর ও ঘর করে বেড়াচ্ছে। ডাক্তার বার বার তাকে বোঝাচ্ছেন, অত উতলা হচ্ছেন কেন, হলেনই বা প্রথম পোয়াতী, আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্য তো বেশ ভালই, কিছুমাত্র চিন্তার কারণ নেই।

সন্ধ্যা সাড়ে সাত। উদীয়মান জ্যোতিঃসম্রাট তারক সান্যাল তার হাতঘড়ি দেখে বলল, রেডিওর সঙ্গে মিলিয়ে রেখেছি, করেক্ট টাইম। যদি ঠিক আটটা পাঁচ মিনিটে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তবে সে রাজচক্রবর্তী হবে। ডাক্তারের উচিত ততক্ষণ ছেলেকে ঠেকিয়ে রাখা।

নাস্তিক ভুজঙ্গ ভঞ্জ বলল, যত সব গাঁজা। তোমাদের জ্যোতিষ তো আগাগোড়া ভুল, জন্মক্ষণ ঠিক করেই বা কি হবে? যে আসছে সে তোমার কথা শুনবে না, ডাক্তারের বাধাও মানবে না, নিজের মর্জিতে যথাকালে বেরিয়ে আসবে। আর, ছেলে হবে তাই বা ধরে নিচ্ছ কেন?

—নির্ঘাত ছেলে হবে। আমি সোমনাথের বউএর কররেখা দেখেছি, তা ছাড়া খনার ফরমুলা কষে ভাগশেষ এক পেয়েছি—একে সুত দুইএ সুতা তিন হইলে গর্ভ মিথ্যা।

সোমনাথ হঠাৎ ছুটে এসে মাথার চুল টেনে বলল, ওঃ, আর তো যন্ত্রণা দেখতে পারি না। কি পাপই করেছি, আমার জন্যেই এত কষ্ট পাচ্ছে।

সোমনাথের ভগিনীপতি পাঁচুবাবু বললেন, তোমার মুণ্ডু। পাপ কিছু কর নি, মানবধর্ম পালন করেছ, বউকে শ্রেষ্ঠ উপহার দিয়েছ। না দিলে চিরকাল গঞ্জনা খেতে। তবে হাঁ, যদি তাকে তিন বারের বেশী আঁতুড় ঘরে পাঠাও তবে তোমাকে বর্বর স্বার্থপর সমাজদ্রোহী বলব। কুইন ভিক্টোরিয়ার যুগ আর নেই, গণ্ডা গণ্ডা সন্তানের জন্ম দিলে দেশের লোক কৃতার্থ হবে না।

পণ্ডিত হরিবিষ্ণু সত্যার্থী বললেন, ওহে সোমনাথ, বউমাকে জম্ভলার নাম নিতে বল। অস্তি গোদাবরীতীরে জম্ভলা নাম রাক্ষসী, তস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ গর্ভিণী বিশল্যা ভবেৎ। অর্থাৎ গোদাবরীর তীরে জম্ভলা রাক্ষসী থাকে, তার নাম স্মরণ করলেই গর্ভিণীর যন্ত্রণা দূর হয়ে সুপ্রসব হয়।

তারক জ্যোতিষী বলল, এখন নয়, আটটা বেজে তিন মিনিটের সময় জম্ভলার নাম নিতে বলবেন। কাল সকালেই আমি কোষ্ঠী গণনায় লেগে যাব, প্রাচ্য আর পাশ্চাত্ত্য সিদ্ধান্ত, ভৃগু আর জ্যাডকিল, দুটোরই সমন্বয় করব, প্রাচীন নবগ্রহ আর আধুনিক ইউরেনস, নেপচুন, প্লুটো কিছুই বাদ দেব না। দেখে নেবেন আমার ভবিষ্যৎ গণনা কি নির্ভুল হবে।

পাঁচুবাবু বললেন, ভবিষ্যৎ তো পরের কথা, সন্তানের বর্তমান হালচাল কিছু বলতে পার?

—না বর্তমান আমার গণ্ডির বাইরে, আমার কারবার শুধু ভবিষ্যৎ নিয়ে।

হরিবিষ্ণু সত্যার্থী বললেন, গীতায় আছে, জীবের শুধু মধ্য অবস্থা অর্থাৎ জীবিতাবস্থাই আমরা জানতে পারি, তার পূর্বে কি ছিল এবং মরণের পরে কি হবে তা অব্যক্ত। সোমনাথের সন্তান এখন অতীত আর বর্তমানের সন্ধিক্ষণে রয়েছে। এ সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রে যা আছে বলছি শুনুন। পরলোকবাসী মানবাত্মার পাপ-পুণ্যের ফলভোগ যখন সমাপ্ত হয় তখন সে মর্ত্যলোকে পতিত হয় এবং মেঘে প্রবেশ করে জলময় রূপ পায়। সেই জল বৃষ্টি রূপে পত্র পুষ্প ফল মূল ওষধি বনস্পতিতে সঞ্চারিত হয় এবং তা ভক্ষণের ফলে নরনারীর দেহে শুক্র ও শোণিত উৎপন্ন হয়। গর্ভাধানকালে শুক্রের আধিক্যে পুরুষ, শোণিতের আধিক্যে স্ত্রী, এবং উভয়ের সমতায় ক্লীবের সৃষ্টি হয়। জরায়ুমধ্যস্থ ভ্রূণ প্রথম দিনে পঙ্কতুল্য, পাঁচ দিনে বুদ্‌বুদ, সাত দিনে পেশী, এক পক্ষে অর্বুদ, পঁচিশ দিনে ঘন, এবং এক মাসে কঠিন আকার পায়। দুই মাসে মস্তক, তিন মাসে গ্রীবা, চার মাসে ত্বক, পাঁচ মাসে নখ ও রোম, ছ মাসে চক্ষু কর্ণ নাসা আর মুখের সৃষ্টি হয়। সপ্তম মাসে ভ্রূণ স্পন্দিত হয়, অষ্টম মাসে বুদ্ধি যোগ হয়, এবং নবম মাসে সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পূর্ণতা পায়। জন্মের পরেই শিশুর অনুভূতি হয়। তার পর সে ক্রমশ বৃদ্ধি পায়, প্রাক্তন কর্ম অনুসারে সংসারে সুখদুঃখ ভোগ করে, এবং মৃত্যুর পরে পুনর্বার দেহান্তর পায়।

পাঁচুবাবু বললেন, ওহে প্রফেসর অনাদি, তোমাদের শাস্ত্রে কি বলে?

বায়োলজিস্ট অনাদি রায় বললেন, সত্যার্থী মশায় নেহাত মন্দ বলেন নি। আমরা যা জানি তা বলছি শুনুন। প্রথমে দুটি অতি ক্ষুদ্র কোষের সংযোগ, তা থেকে ক্রমশঃ অসংখ্য কোষের উৎপত্তি, তারই পরিণাম এই মানবদেহ। প্রথম কয়েক মাস ভ্রূণকে মানুষ বলে চেনা যায় না, মনে হয় মাছ টিকটিকি বা বেরালছানা। কোটি কোটি বৎসরে মানুষের যে ক্রমিক রূপান্তর হয়েছে, জরায়ুস্থ ভ্রূণ যেন তারই পুনরভিনয় করে। চার-পাঁচ মাসে তার চেহারা মানুষের মতন হয়, সে হাত-পা নাড়ে, মাঝে মাঝে মাথা দিয়ে গর্ভধারিণীকে গুঁতো মারে, হয়তো আঙুলও চোষে। গর্ভবাস-কালে সে শ্বাস নেয় না, কিন্তু দেড় মাসের হলেই ভ্রূণের বুক ধুকধুক করতে থাকে। পুষ্টির জন্যে যা দরকার সবই তার মায়ের রক্ত থেকে ফুল বা প্লাসেণ্টার মধ্যে ফিলটার হয়ে গর্ভনাড়ী দিয়ে ভ্রূণের দেহে প্রবেশ করে। জরায়ুস্থ তরল পদার্থের মধ্যে সে যেন জলচর প্রাণী রূপে বাস করছিল, ভূমিষ্ঠ হয়েই সে হঠাৎ স্থলচর হয়ে যায়। দু-এক মিনিটের মধ্যেই সে শ্বাস নেবার চেষ্টা করে, খাবি খেয়ে কেঁদে ওঠে, নাক মুখ দিয়ে লালা বার করে ফেলে। নবজাত মনুষ্যশাবক লম্বায় এক হাতের কম, ওজনে প্রায় সাড়ে তিন সের, মাথা বড়, পেট লম্বা, হাত-পা ছোট ছোট। মা বাপ ভাই বোনের সঙ্গে তার চেহারার যতই মিল থাকুক, সে একজন স্বতন্ত্র অদ্বিতীয় মানুষ। প্রথম কয়েক মাস সে সমবয়সী ছাগলছানার চাইতেও অসহায়, কিন্তু তার পর তার শক্তি আর বুদ্ধি ক্রমশঃ বাড়তে থাকে।

হরিবিষ্ণু সত্যার্থী বললেন, অনাদিবাবু শুধু স্থূল দেহের উৎপত্তির বিবরণ দিলেন, কিন্তু মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার আর আত্মার কথা তো বললেন না।

অনাদি রায় বললেন, ও সব কিছুই জানি না সত্যার্থী মশায়, বলব কি করে?

সোমনাথ কান খাড়া করে ছিল, হঠাৎ একটা অস্ফুট আর্তনাদ শুনে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেল। তারক সান্যাল তার হাত-ঘড়িতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রইল। আর সকলে নীরবে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তার পর হঠাৎ আওয়াজ এল—ওয়াঁ ওয়াঁ।

তারক জ্যোতিষী বলল, আটটা বেজে তিন মিনিট, আহাহা, আর দু মিনিট পরে হলেই খাসা হত। যাই হক, আমার গণনায় ভুল হয় নি, পুত্র সন্তানই হয়েছে।

ভুজঙ্গ ভঞ্জ বলল, তা তুমি জানলে কি করে?

—ওই যে, হুলো বেরালের মতন ডেকে উঠল। মেয়ে হলে উয়াঁ উয়াঁ করত।

কবি শ্রীকণ্ঠ নন্দী এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন। এখন বললেন, তারকবাবুর কথা ঠিক। কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণে লিখেছেন, জনক রাজা লাঙল চালাতে চালাতে হঠাৎ দেখলেন মাটির ডেলা থেকে ছোট্ট একটি মেয়ে বেরিয়েছে, 'উঙা উঙা করি কাঁদে যেন সৌদামিনী।'

ভুজঙ্গ ভঞ্জ বলল, তারকের মতন গুনে বলতে সবাই পারে। হয় ছেলে না হয় মেয়ে, এই দুটোর মধ্যে একটা যদি বাই চান্স মিলে যায় তাতে বাহাদুরিটা কি?

সোমনাথের ভাগনী তোতা শাঁখ বাজাতে বাজাতে এসে বলল, মামীর খোকা হয়েছে, এই অ্যাত্তো বড়, গোলাপ ফুলের মতন লাল টুকটুকে।

পাঁচুবাবু বললেন, লাল টুকটুকে রঙ একমাসের মধ্যেই নবঘনশ্যাম হয়ে যাবে। তোর মামা কি করছে রে?

—নর্স বলছে চলে যেতে, কিন্তু মামা ঘর থেকে নড়বে না, খালি খালি ছেলের দিকে চেয়ে আছে।

—হুঁ। প্রথম যখন ছেলে হল ভাবলুম বাহা বাহা রে, সোমনাথের সেই দশা হয়েছে। আর দেরি করে কি হবে, আমাদের আশীর্বাদটা এখনই সেরে ফেলা যাক। সোমনাথকে ডাকবার দরকার নেই, পরে জানিয়ে দিলেই চলবে। সে এখন পুত্রের চন্দ্রমুখ নিরীক্ষণ করতে থাকুক। সত্যার্থী মশায়, আপনিই আরম্ভ করুন।

গলায় খাঁকার দিয়ে হরিবিষ্ণু সত্যার্থী সুর করে বলতে লাগলেন—

ফলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা
বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপারসংবিৎসুখসাগরেহস্মিন্
লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥

এই নবকুমার স্বাস্থ্যবান বিদ্যাবান ধর্মপ্রাণ হয়ে বেঁচে থাকুক, পরম জ্ঞান লাভ করুক, পরব্রহ্ম রূপ অপারসংবিৎসুখসাগরে তার চিত্ত লীন হক, তাতেই তার কুল পবিত্র হবে, জননী কৃতার্থা হবেন, বসুন্ধরা পুণ্যবতী হবেন। এর চাইতে বড় আশীর্বাদ আমার জানা নেই।

পাঁচুবাবু হাত নেড়ে বললেন, এ কি রকম বেয়াড়া আশীর্বাদ করলেন সত্যার্থী মশায়! সোমনাথের ছেলের চিত্ত যদি পরব্রহ্মে লীন হয়ে যায় তবে তার আর রইল কি? ওর বাপ মা আত্মীয় স্বজন যে মহা ফেসাদে পড়বে।

হরিবিষ্ণু সত্যার্থী বললেন, বেশ তো, আপনি নিজের মনের মতন একটি আশী-র্বাদ করুন না।

পাঁচুবাবু বললেন, শুনুন। আশীর্বাদ করি, এই ছেলে সুস্থ দেহে দিন দিন বাড়তে থাকুক, বেশী অসুখে ভুগে যেন বাপ-মাকে না জ্বালায়। সুন্দর সবল খোকা

হয়ে বালগোপালের মতন উপদ্রব করুক, যথাকালে লেখাপড়া শিখুক, ভাল রোজগার করুক, প্রেমে পড়ে বিয়ে করুক কিংবা বিয়ে করে প্রেমে পড়ুক। সে তেজস্বী বীর-পুরুষ হক। গুণ্ডা হতে বলছি না, কিন্তু এক চড়ের বদলে তিন চড় যেন ফিরিয়ে দিতে পারে, দরকার হলে সে যেন দেশের জন্যে লড়তে পারে, উড়তে পারে, জাহাজ চালাতে পারে। সে যেন অলস বিলাসী হুজুগে না হয়, নাচ গান আর সিনেমা নিয়ে না মাতে, চোর ঘুষখোর মাতাল লম্পট না হয়। বহু লোককে সে প্রতিপালন করুক, প্রচুর উপার্জন করে জনহিতার্থে ব্যয় করুক, কিন্তু বেশী টাকা জমিয়ে রেখে যেন বংশধরদের মাথা না খায়। তার অসংখ্য বন্ধু হক, গোটা কতক শত্রুও হক, নইলে সে আত্মগর্বী হয়ে পড়বে। সে সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন কর্মযোগ জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ যত খুশি চর্চা করুক, কিন্তু যেন বুদ্ধ যিশু শংকর আর শ্রীচৈতন্যের মতন সংসার-ত্যাগী না হয়। তার মহাপুরুষ পরমপুরুষ বা অবতার হবার কিছুমাত্র দরকার নেই! তবে হাঁ বঙ্কিমচন্দ্র কাটছাঁট করে যে রকম bowdlerized নির্দোষ সর্বগুণান্বিত আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ খাড়া করেছেন সে রকম যদি হতে পারে তাতে আমাদের আপত্তি নেই। মোট কথা আমরা চাই সোমনাথের ব্যাটা একজন মান্য গণ্য স্বনামধন্য চৌকশ পরিপূর্ণ পুং পুরুষ হয়ে উঠুক, যাকে বলে hundred per cent he-man।

ভুজঙ্গ ভঞ্জ বলল, পাঁচু-দা ভালই বলেছেন, তবে ওঁর আশীর্বাদে বুর্জোআ ভাব প্রকট হয়েছে। প্রজার ভাগ্য আর রাষ্ট্রের ভাগ্য এক সঙ্গে জড়িত, রাষ্ট্রের সংস্কার না হলে প্রজার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হতে পারে না। অতএব রাষ্ট্র আর প্রজা দুইএরই মঙ্গল-কামনায় আমি বলছি—এই সদ্যোজাত ভারত-সন্তান যেন এমন শাসনতন্ত্রের আশ্রয় পায় যা তাকে সর্বাত্মক শিক্ষা দেবে, তার সামর্থ্যের উপযুক্ত কর্ম দেবে, তার প্রয়োজনের উপযুক্ত জীবিকার ব্যবস্থা করবে, সে যেন কায়মনোবাক্যে রাষ্ট্রবিধির বশবর্তী হয়, তার চিত্ত পরব্রহ্মে লীন না হয়ে যেন রাষ্ট্রেই লীন হয়। সে যেন বোঝে, সে রাষ্ট্রেরই একটি অবয়ব, হাত পা প্রভৃতির মতন সেও এক বিরাট মস্তিষ্কের অধীন, তার স্বাতন্ত্র্য নেই।

পাঁচুবাবু বললেন, তুমি বলতে চাও এই শিশু রাষ্ট্রদাস হয়ে জন্মেছে, চিরকাল রাষ্ট্রদাস হয়েই থাকবে। তার নিজের মতে চলবার বা আপত্তি জানাবার অধিকার নেই যত অধিকার শুধু রাষ্ট্রের বিরাট মস্তিষ্ক অর্থাৎ চাঁইদেরই আছে। ওসব চলবে না বাপু, সোমনাথের অপত্য কর্তাভজা হয়ে কলের পুতুলের মতন হাত পা নাড়বে কিংবা পিঁপড়ে মৌমাছির মতন বাঁধাধরা সংস্কারের বশে একঘেয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করবে তা আমরা চাই না। ওহে শ্রীকণ্ঠ কবি, তোমার কণ্ঠ নীরব কেন? তুমিও একটি আশী-র্বাণী বল।

শ্রীকণ্ঠ নন্দী বললেন, বলবার অবসর পাচ্ছি কই? স্বর্গ থেকে একটি শিশু অব-তীর্ণ হয়েছে, তাকে আদর করে ঘরে তুলবেন, তা নয়, শুধু বায়োলজি ব্রহ্মনির্বাণ সমাজতত্ত্ব আর রাজনীতির কচকচি। আসুন আমরা নবজাতককে অভিনন্দন জানাই, মহাত্মা কবীর যেমন তাঁর পুত্র কমালকে পেয়ে বলেছিলেন তেমনি সোমনাথের হয়ে আমরাও বলি—

অজব মুসাফির ঘর মে আয়া ধরো মংগল থাল,
উজ্জর বংস কবীর কা উপজে পুত কমাল।

—আশ্চর্য পথিক ঘরে এসেছে, মঙ্গল থাল ধরে তাকে বরণ কর; কবীরের বংশ উজ্জ্বল হল, পুত্র কমাল জন্মেছে। অথবা টেনিসনের মতন উদাত্ত কণ্ঠে সম্ভাষণ করুন—

Out of the deep, my child, out of the deep,
From that great deep, before our world begins,
Whereon the spirit of God moves as he will...
From that true world within the world we see,
Whereof our world is but the bounding shore...
With this ninth moon, that sends the hidden sun
Down yon dark sea, thou comest, darling boy.

কিংবা রবীন্দ্রনাথের মতন বলুন—

সব দেবতার আদরের ধন,
নিত্য কালের তুই পুরাতন,
তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সী।
তুই জগতের স্বপ্ন হতে
এসেছিস আনন্দস্রোতে—

গরুচোরের মতন সলজ্জ মুখে সোমনাথ ঘরে এসে বলল, চা করতে বলি? তার সঙ্গে কচুরি আর রসগোল্লা?

পাঁচুবাবু বললেন, রাম বল। তোমার তো এখন জাতাশৌচ, এ বাড়ির কোনও জিনিস আমাদের খাওয়া চলবে না, কি বলেন সত্যার্থী মশায়? এক মাস কাটুক, তোমার বউ চাঙ্গা হয়ে উঠুক, তার পর খোকাকে কোলে নিয়ে আমাদের যত ইচ্ছে হয় পরিবেশন করবে।

তোতা বলল, বা রে, খোকাকে কোলে নিয়ে বুঝি পরিবেশন করা যায়!

—আচ্ছা আচ্ছা, খোকা না হয় তোর মামার কোলে থাকবে।

—আর যদি মামার—

—তা হলে তোর মামার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে।

১৮৭৯ শক (১৯৫৭)

চিঠিবাজি

সুকান্ত দত্ত অতি ভাল ছেলে, এম. এস-সি. পাস করার কিছুদিন পরেই পি-এচ. ডি. ডিগ্রী পেয়েছে। একটি ভাল চাকরির যোগাড় করে প্রায় বছরখানিক সিন্দ্রির সার-কারখানায় কাজ করছে। তার বাপ-মা নেই, মামাই তাকে মানুষ করেছেন।

আজ সকালের ডাকে মামার কাছ থেকে সুকান্ত একটা চিঠি পেয়েছে। তিনি লিখেছেন—

সুকান্ত, তোমার বিবাহ স্থির করেছি, বিজয়লক্ষ্মী কটন মিলের কর্তা বিজয় ঘোষের মেয়ে সুনন্দার সঙ্গে। বনেদী বংশ, বিজয়বাবু আমাদের কাছাকাছি শাঁখারী-পাড়াতে থাকেন। মেয়েটি সুশ্রী, খুব ফরসা, বি. এস-সি. পাস করতে পারে নি, তবে বেশ চালাক। ফোটো পাঠালুম। তোমারই উচিত ছিল নিজে দেখে পাত্রী পছন্দ করা, কিন্তু একালের ছেলে হয়ে কেন যে তুমি আমার উপর ভার দিলে তা বুঝতে পারি না। যাই হক, আমি যথাসাধ্য দেখে শুনে এই পাত্রী স্থির করেছি, আশা করি তোমারও পছন্দ হবে। তেইশে ফালগুন বিবাহ,পাঁচ সপ্তাহ পরেই। তুমি এখন থেকে চেষ্টা কর যাতে পনরো দিনের ছুটি পাও। বিবাহের অন্তত দু দিন আগে তোমার আসা চাই।

সুকান্ত মামার চিঠিটা মন দিয়ে পড়ল, ফোটোটাও ভাল করে দেখল। কিছুক্ষণ ভেবে সে তার রঙের বাক্স থেকে তিন-চার রকম রঙ নিয়ে এক টুকরো কাগজে লাগাল এবং নিজের বাঁ হাতের কবজির উপর কাগজখানা রেখে বার বার দেখল তার গায়ের রঙের সঙ্গে মিল হয়েছে কিনা। তার পর আরও খানিকক্ষণ ভেবে এই চিঠি লিখল—

শ্রীযুক্তা সুনন্দা ঘোষ সমীপে। আমার সঙ্গে আপনার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়েছে। মামাবাবুর চিঠিতে জানলুম আপনি খুব ফরসা। আমার রঙ কিন্তু খুব ময়লা। হয়তো আপনি শুনেছেন শ্যামবর্ণ, কিন্তু তাতে অনেক রকম শেড বোঝায়। আমার গায়ের রঙ ঠিক কি রকম তা আপনাকে জানানো কর্তব্য মনে করি, সেজন্যে এক টুকরো কাগজে রঙ লাগিয়ে পাঠাচ্ছি, আমার বাঁ হাতের কবজির উপর পিঠের সঙ্গে মিল আছে। এই রকম গাঢ় শ্যামবর্ণ স্বামীতে যদি আপনার আপত্তি না থাকে তবে দয়া করে এক লাইন লিখবেন—আপত্তি নেই। আমার ঠিকানা লেখা খাম পাঠালুম। যদি আপত্তি থাকে তবে চিঠি লেখবার দরকার নেই। পাঁচ দিনের মধ্যে আপনার উত্তর না পেলে বুঝব আপনি নারাজ। সে ক্ষেত্রে আমি মামাবাবুকে জানাব যে এই সম্বন্ধ আমার পছন্দ নয়, অন্য পাত্রী দেখা হক। ইতি। সুকান্ত।

চার দিন পরে উত্তর এল।—ডক্টর সুকান্ত দত্ত সমীপে। আপত্তি নেই। কিন্তু প্রকৃত খবর আপনি পান নি, আমার গায়ের রঙ আপনার চাইতে ময়লা, কনে দেখাবার সময় আমাকে পেণ্ট করে আপনার মামাবাবুকে ঠকানো হয়েছিল। কিন্তু আপনার মতন সত্যবাদী ভদ্রলোককে আমি ঠকাতে চাই না। আমার কাছে ছবি আঁকবার রঙ নেই। আপনি যে নমুনা পাঠিয়েছেন সেই কাগজ থেকে এক টুকরো কেটে তার উপর একটু ব্ল্যাক কালি লাগিয়ে আমার হাতের রঙের সমান করে পাঠালুম।

পুরুষের কালো রঙে কেউ দোষ ধরে না, কিন্তু সবাই ফরসা মেয়ে খোঁজে, যে জোঁক-কালো সেও অপ্সরী বিদ্যাধরী বউ চায়। আপনি সংকোচ করবেন না, আমার কালো রঙে আপত্তি থাকলে সম্বন্ধ বাতিল করে দেবেন। আর আপত্তি না থাকলে দয়া করে পাঁচ দিনের মধ্যে এক লাইন লিখে জানাবেন। ইতি সুনন্দা।

চিঠি পেয়েই সুকান্ত উত্তর লিখল।—আপনার রঙ আমার চাইতে এক পোঁচ বেশী ময়লা হলেও আমার আপত্তি নেই। তবে সত্য কথা বলব। প্রথমটা মন খুঁতখুঁত করেছিল, কারণ সুন্দরী বউ একটা সম্পদ, স্বামীর গৌরব আর প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে। কিন্তু পরেই মনে হল, এ রকম ভাবা নিতান্ত মূর্খতা। ফোটো দেখে বুঝেছি আপনার সৌষ্ঠবের অভাব নেই তাই যথেষ্ট। রঙ ময়লা হলেই মানুষ কুৎসিত হয় না।

আমার একটা কদভ্যাস আছে, জানানো উচিত মনে করি। রোজ পনরো-কুড়িটা সিগারেট খাই। আমার এক বউদিদি বলেন, সিগারেট-খোরদের নিশ্বাসে একটা বিশ্রী মুখপোড়া গন্ধ হয়, তাদের বউরা তা পছন্দ করে না, কিন্তু চক্ষুলজ্জায় কিছু বলতে পারে না। দু-চারটে বাঙালীর মেয়ে যারা মেমদের দেখাদেখি সিগারেট ধরেছে তাদের অবশ্য আপত্তি হতে পারে না, কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই সে দলের নন। আপনার আপত্তি থাকলে এক লাইন লিখে জানাবেন, আমি সম্বন্ধ বাতিল করে দেব। সুকান্ত।

চারদিন পরে সুনন্দার উত্তর এল।—মুখপোড়া গন্ধে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু শুনেছি সিগারেট খেলে নাকি ক্যানসার হয়। আপনি ওটা ছেড়ে দিয়ে হুঁকো ধরুন না কেন? তার গন্ধেও আমার আপত্তি নেই। আমারও একটা বিশ্রী অভ্যাস আছে, রোজ বিশ-পঁচিশ খিলি পান আর দোক্তা খাই। দাঁতের অবস্থা বুঝতেই পারছেন। যারা পান-দোক্তা খায় তাদের নিশ্বাসে নাকি অ্যামোনিয়ার গন্ধ থাকে। আমার ছোট ভাই লম্বুর নাক অত্যন্ত সেনসিটিভ, কুকুরের চাইতেও। রেডিওতে যখন কৃষ্ণসোহাগিনী দেবীর কীর্তন হয় তখন লম্বু অ্যামোনিয়ার গন্ধ পায়। আবার গ্রামোফোনে যখন ওস্তাদ বড়ে গোলাম মওলার দরবারী কানাড়ার রেকর্ড বাজে তখন লম্বু রশুনের গন্ধ পায়। আমার কদভ্যাসে আপনার আপত্তি না থাকলে এক লাইন লিখে জানাবেন, নতুবা সম্বন্ধ ভেঙে দেবেন। ইতি। সুনন্দা।

সুকান্ত উত্তর লিখল।—আপনি যখন সিগারেটের দুর্গন্ধ সইতে রাজী আছেন তখন আপনার পান-দোক্তায় আমার আপত্তি নেই। তা ছাড়া আমাদের এই কারখানায় অজস্র অ্যামোনিয়া তৈরি হয়, তার ঝাঁজ আমার সয়ে গেছে। আপনার হুঁকোর প্রস্তাবটি বিবেচনা করে দেখব।

কোনও বিষয়ে আমি আপনাকে ঠকাতে চাই না, সেজন্যে আমার আর একটি ত্রুটি আপনাকে জানাচ্ছি। পুরুষরা যেমন অনন্যপূর্বা পত্নী চায়, মেয়েরাও তেমনি এমন স্বামী চায় যে পূর্বে কখনও প্রেমে পড়ে নি। আমি স্বীকার করছি আমি অক্ষতহৃদয় নই। ডেপুটি কমিশনার লালা তোপচাঁদ ঝোপড়ার মেয়ে সুরঙ্গীর সঙ্গে আমার প্রেম হয়েছিল। তার বাপ-মায়ের তেমন আপত্তি ছিল না, কিন্তু শেষটায় সুরঙ্গীই বিগড়ে গেল। সম্প্রতি সে কমার্স ডিপার্টমেন্টের মিস্টার হনুমন্থিয়াকে বিয়ে করেছে। লোকটা মিশ কালো, যমদূতের মতন গড়ন, তবে মাইনে আমার প্রায় তিন গুণ। আমার হৃদয়ের ক্ষত এখন অনেকটা সেরে গেছে, আপনার সঙ্গে বিবাহের পর একেবারে বেমালুম হবে আশা করি। সুরঙ্গীর একটা ফোটো আমার কাছে আছে, আপনার সামনেই সেটা পুড়িয়ে ফেলব।

সুরঙ্গীর বিবাহ হয়ে যাবার পরে আমার খেয়াল হল যে আমারও শীঘ্র বিবাহ হওয়া দরকার। অবসরকালে আমি ছবি আঁকি, ফোটো তুলি, নানারকম বৈজ্ঞানিক গবেষণা করি। গৃহস্থালির ঝঞ্ঝাট পোহানোর জন্যে একজন গৃহিণী থাকলে আমি নিশ্চিত হয়ে নিজের শখ নিয়ে অবসরযাপন করতে পারি। এখন আমার জ্ঞান হয়েছে, হঠাৎ প্রেমে পড়া বোকামি, একত্র বাস করার ফলে একটু একটু করে স্ত্রী-পুরুষের যে ভালবাসা জন্মায় তাই খাঁটী জিনিস। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার আগে তাকে তো দেখবার উপায় নেই, তথাপি মা-বাপের স্নেহের অভাব হয় না। সেই রকম বিবাহের আগে পাত্রী না দেখলেও কিছুমাত্র ক্ষতি নেই। সে জন্যেই মামাবাবুর উপর সব ছেড়ে দিয়েছি।

আমার স্বভাব চরিত্র মতামত সবই আপনাকে জানালুম। আপত্তি না থাকলে একটু খবর দেবেন। ইতি। সুকান্ত।

সুনন্দার উত্তর এল।—আপনার স্বভাব চরিত্র আর মতামতে আমার আপত্তি নেই। যে সব চিঠি লিখেছেন তা থেকে বুঝেছি আপনি অতি সত্যনিষ্ঠ অকপট সাধুপুরুষ। অতএব আমিও অকপটে আমার গলদ জানাচ্ছি। পবনকুমার পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে পড়ত, তার সঙ্গে আমার প্রেম হয়েছিল। কিন্তু সে ভাদুড়ী ব্রাহ্মণ তার সেকেলে গোঁড়া বাপ-মা আমাকে পুত্রবধূ করতে মোটেই রাজী হলেন না। পবন এখন ব্যাংগালোরে আছে, খুব একটা বড় পোস্ট পেয়েছে। তাকে পুরো ভুলতে পারি নি, তবে আপনার মতন মহাপ্রাণ স্বামী পেলে একদম ভুলে যাব তাতে সন্দেহ নেই। আমি বলি কি, সুরঙ্গী আর পবনের ফোটো পুড়িয়ে কি হবে, বরং একই ফ্রেমে দুটো ছবি বাঁধিয়ে শোবার ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখা যাবে। তাতে বিষে বিষক্ষয় হবে, কি বলেন? আপনার অভিপ্রায় জানাবেন। ইতি। সুনন্দা।

সুকান্ত উত্তর লিখল।—সুনন্দা, তোমাকে আজ নাম ধরে সম্বোধন করছি, কারণ আমাদের দুজনের মধ্যে এখন আর কোনও লুকোচুরি রইল না, বিবাহের বাধাও কিছু নেই। লোকে বলে আমি একটু বেশী গম্ভীর প্রকৃতির লোক। শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুরা অধিকন্তু বলে আমি একটু বোকা। তোমার চিঠি পড়ে বুঝেছি তুমি আমুদে মানুষ, আর মামাবাবুর চিঠিতে জেনেছি বি. এস-সি. ফেল হলেও তুমি বেশ চালাক। মনে হচ্ছে তোমার আর আমার স্বভাব পরস্পরের পূরক অর্থাৎ কমপ্লিমেণ্টারি। সাইকোলজিস্টদের মতে এই হল আসল রাজযোটক, আদর্শ দম্পতির লক্ষণ। আজ ষোলই ফাল্গুন, সাতদিন পরেই আমাদের বিবাহ। তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপের আনন্দ এখনই কল্পনায় উপভোগ করছি। তোমার সুকান্ত।

কিছুদিন পরে সুনন্দার চিঠি এল।—যাঃ, ভেস্তে গেল, এমন মুশকিলেও মানুষ পড়ে! পবন ভাদুড়ী এখানে এসেছে। কাল আমার সঙ্গে দেখা করে বলল, দেখ সুনন্দা, এখন আমি স্বাধীন, ভাল রোজগার করি, বাপ-মায়ের বশে চলবার কোনও দরকার নেই! তুমি আমার সঙ্গে চল, বাঙ্গালোরে সিভিল বা হিন্দু ম্যারেজ যা চাও তাই হবে।

এই তো পরিস্থিতি। আমার অবস্থাটা আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। পবন ভাদুড়ীকে হাঁকিয়ে দেওয়া আমার সাধ্য নয়, কালই অর্থাৎ আপনার নির্ধারিত বিবাহের দু দিন আগেই পবনের সঙ্গে আমি প্যালাচ্ছি। কিন্তু আপনার প্রতি আমার একটা কর্তব্য আছে, আপনার ব্যবস্থা না করে আমি যাচ্ছি না। আমার বোন নন্দা আমার চাইতে দেড় বছরের ছোট। দেখতে আমারই মতন, তবে রঙ বেশ ফরসা। সেও

বি. এস-সি. ফেল। ঝকঝকে দাঁত, পান-দোক্তা খায় না, এ পর্যন্ত প্রেমেও পড়েনি। আপনার সব চিঠিই সে পড়েছে, পড়ে ভীষণ মোহিত হয়েছে। আপনাকে বিয়ে করবার জন্যে মুখিয়ে আছে। ডক্টর সুকান্ত, দোহাই আপনার, কোনও হাঙ্গামা বাধাবেন না, বাড়ির কাকেও কিছু বলবেন না। আপনাদের প্রোগ্রাম অনুসারে বরযাত্রী নিয়ে যথাকালে আমাদের বাড়িতে আসবেন, পুরুত যে মন্ত্র পড়াবে সুবোধ বালকের মতন তাই পড়বেন, আমার বাবা নন্দাকেই আপনার হাতে সম্প্রদান করবেন। তাকে পেলে নিশ্চয় আপনি সুখী হবেন। আপনি তো গৃহস্থালি দেখবার জন্যে একটি গৃহিণী চান, সুতরাং সুনন্দার বদলে নন্দাকে পেলেও আপনার চলবে। নিজের বোনের প্রশংসা করা ভাল দেখায় না, নয়তো চুটিয়ে লিখতুম নন্দা কি রকম চমৎকার মেয়ে। আজ বিদায়, এর পর সুযোগ পেলে আপনার সঙ্গে দেখা করে আমি ক্ষমা চাইব। ইতি। সুনন্দা।

সুনন্দার চিঠি পড়ে সুকান্ত হতভম্ব হল, খুব রেগেও গেল। কিন্তু সে যুক্তিবাদী র‍্যাশনাল লোক। একটু পরেই বুঝে দেখল, সুনন্দার প্রস্তাব মন্দ নয়, গৃহিণীই যখন দরকার তখন এক পাত্রীর বদলে আর এক পাত্রী হলে ক্ষতি কি। সুকান্ত স্থির করল সে হাঙ্গামা বাধাবে না, কোনও রকম খোঁজও করবে না, সম্পূর্ণভাবে মামার বশে চলবে, তিনি যেমন ব্যবস্থা করবেন তাই মেনে নেবে।

সুকান্ত কলকাতায় এলে তার মামার বাড়ির কেউ সুনন্দা সম্বন্ধে কিছুই বলল না, কোনও রকম উদ্বেগও প্রকাশ করল না। যথাকালে বরযাত্রীদের সঙ্গে সুকান্ত বিয়েবাড়িতে উপস্থিত হল। সেখানেও গোলযোগের কোনও লক্ষণ তার নজরে পড়ল না।

সুকান্ত দেখল, ষোল-সতেরো বছরের একটি ছেলে নিমন্ত্রিতদের পান আর সিগারেট পরিবেশন করছে, কন্যাপক্ষের লোকে তাকে লম্বু বলে ডাকছে। তাকে ইশারা করে কাছে ডেকে সুকান্ত চুপি চুপি প্রশ্ন করল, তুমি সুনন্দার ছোট ভাই লম্বু?

লম্বু বলল, আজ্ঞে হাঁ।

—এদিকের খবর কি?

—খবর সব ভালই। দিদিকে এখন সাজানো হচ্ছে, একটু পরেই তো বিয়ের লগ্ন।

—সুনন্দা চলে গেছে?

—কি বলছেন আপনি, বিয়ের কনে কোথায় চলে যাবে?

—তোমার আর এক দিদি নন্দা, তার খবর কি?

—বা রে! আমার তো একটি দিদি, তার সঙ্গেই তো আপনার বিয়ে হচ্ছে।

সুকান্ত চোখ কপালে তুলে বলল, ও!

রাত বারোটার পরে বাসরঘরে অন্য কেউ রইল না। সুকান্ত জিজ্ঞাসা করল, তুমি সুনন্দা, না নন্দা?

—দুইই। পোশাকী নাম সুনন্দা, আটপৌরে ডাকনাম নন্দা।

—চিঠিতে অত সব মিছে কথা লিখলে কেন?

—কোনও কুমতলব ছিল না। সত্যবাদী উদারচরিত ভাবী বরকে একটু বাজিয়ে দেখছিলুম সইবার শক্তি কতটা আছে।

—তোমার সেই পবননন্দন ভাদুড়ীর খবর কি?

—হাওয়া হয়ে উবে গেছে, তার অস্তিত্বই নেই। আমার কাছে একটি হনুমানজীর ভাল ছবি আছে, তোমার সেই সুরঙ্গীর ফোটোর সঙ্গে বাঁধিয়ে রাখলে বেশ হবে না?

—তুমি একটি ভীষণ বকাটে মেয়ে। সেইজন্যেই বি. এস-সি.-তে ফেল করেছ।

—ঝুনি মিত্তির আমার ডবল বকাটে, সে ফার্স্ট হল কি করে? আমি অঙ্কে কাঁচা, ম্যাক্সওয়েলের থিওরিটা মোটেই বুঝতে পারি না, আর ওইটেরই কোশ্চেন ছিল।

—কেন, ও তো খুব সোজা অঙ্ক। বুঝিয়ে দিচ্ছি শোন। ভি ইকোয়াল টু রুট ওভার ওআন বাই কাপ্পা মিউ—

—থাক থাক, বাসরঘরে অঙ্ক কষলে অকল্যাণ হয়।

—আচ্ছা কাল বুঝিয়ে দেব।

—কাল তো কালরাত্রি, বর-কনের দেখা হবার জো নেই। সেই পরশু ফুলশয্যায় দেখা হবে।

—বেশ তো, তখন বুঝিয়ে দেব।

—ফুলশয্যায় অঙ্ক কষলে মহাপাতক হয় তা জান? ঠাকুমার আবার আড়িপাতা রোগ আছে, যদি শুনতে পান যে নাতজামাই ফুলশয্যায় অঙ্ক কষছে তবে গোবর খাইয়ে প্রায়শ্চিত্ত করাবেন। তাড়া কিসের, আমি তো পালাচ্ছি না। বছর খানিক যাক, তার পর বুঝিয়ে দিও।

—আচ্ছা তাই হবে। এখন ঘুমনো যাক, কি বল? দেখ সুনন্দা, তুমি খাসা দেখতে।

—তাই নাকি? তোমার দৃষ্টি তো খুব তীক্ষ্ণ।

—সুনন্দা, আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে জান?

—আমাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে?

—ঠিক তা নয়। মনে হচ্ছে—

—মনে হক গে, এখন ঘুমও।

১৮৭৯ শক (১৯৫৭)

সত্যসন্ধ বিনায়ক

বিনায়ক সামন্ত হাসপাতালে মারা গেছে। অখ্যাত হলেও সে অসামান্য, মহাত্মা গান্ধীর মতনই সে একগুঁয়ে সত্যাগ্রহী ছিল। তফাত এই—গান্ধীজী অবস্থা বুঝে রফা করতে পারতেন, কিন্তু বিনায়কের তেমন বুদ্ধি ছিল না। একজন অর্ধোন্মাদ নিজের খেয়ালে বা অন্যের প্ররোচনায় গান্ধীজীকে মেরেছিল। বিনায়ক মরেছে অসংখ্য লোকের দুর্নীতি আর নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে। তার মৃত্যুর জন্যে হয়তো আমরা সকলেই একটু আধটু দায়ী। আমরা বাধ্য হয়ে অনেক অন্যায় করে থাকি, আরও অনেক অন্যায় সয়ে থাকি তারই পরিণাম বিনায়কের অপমৃত্যু। মরা ভিন্ন তার গত্যন্তর ছিল না, কারণ কাণ্ডজ্ঞানহীন নিষ্পাপ একগুঁয়ে কর্মবীরের জগতে স্থান নেই। কিন্তু পাপাচরণ না করলে এই পাপময় সংসারে জীবনধারণ অসম্ভব এই মোটা কথাটা বিনায়ক বুঝত না।

যারা তাকে চিনত তাদের সকলেরই বিশ্বাস যে বিনায়কের মাথায় বিলক্ষণ গোল ছিল, ঠিক পাগল না হলেও তাকে বাতিকগ্রস্ত বলা যায়। কিন্তু সে যে অত্যন্ত সাধু আর দেশপ্রেমী ছিল তাতে কারও সন্দেহ নেই। অল্প বয়সে সে বিপ্লবীদের দলে যোগ দিয়েছিল, পরে স্বদেশী আর অসহযোগ নিয়ে মেতেছিল। তারপর একে একে কংগ্রেস কমিউনিস্ট প্রজা-সোস্যালিস্ট হিন্দুমহাসভা প্রভৃতি নানা দলে মিশে অবশেষে সে স্থির করেছিল, রাজনীতি অতি জঘন্য কুটিল পন্থা, সব দল ত্যাগ করে শুধু সত্যের শরণ নিতে হবে, প্রিয় বা অপ্রিয় যাই হোক শুধু সত্যেরই ঘোষণা করতে হবে, তার পরিণাম কি দাঁড়াবে ভাববার দরকার নেই। অর্থাৎ সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য, আর মা ফলেষু কদাচন—গীতার এই দুই মন্ত্রই সে মেনে নিয়েছিল।

বিনায়কের সঙ্গে অনেক কাল দেখা হয়নি, তার পর একদিন সে অদ্ভুত বেশে আমাদের সান্ধ্য আড্ডায় উপস্থিত হল। পরনে ফিকে বেগনী রঙের ধুতি-পঞ্জাবি, কাঁধ থেকে একটা থলি ঝুলছে, তারও রঙ বেগনী। আমি আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলুম, ব্যাপার কি বিনায়ক, এখন কোন পার্টিতে আছ? বাইরে একটি দঙ্গল দেখছি, ওরা তোমার চেলা নাকি?

বিনায়ক বলল, ওদের ভেতরে অসতে বলব? দশ জন আছে, আপনার এই তক্তপোশে জায়গা না হয় তো মেঝেতেই বসবে।

অনুমতি দিলে বিনায়কের সঙ্গীরা ঘরে এসে কতক তক্তপোশে কতক মেঝেতে বসে পড়ল। তাদের বয়স ষোলো থেকে ত্রিশের মধ্যে, সকলেরই বেগনী সাজ আর কাঁধে ঝুলি। চায়ের ফরমাশ দিচ্ছিলুম, কিন্তু বিনায়ক বলল, আমরা নেশা করি না, চা সিগারেট পান কিচ্ছু না।

বললুম, খুব ভাল, এখন আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত কর। নতুন পার্টি বানিয়েছ দেখছি, নাম কি, উদ্দেশ্য কি, সব খোলসা করে বল।

বিনায়ক বলল, আমাদের দলের নাম সত্যসন্ধ সংঘ। উদ্দেশ্য, নির্ভয়ে সত্যের প্রচার। এই ইলেকশনে আমরা লড়ব।

—বল কি হে! তোমাদের পার্টির মেম্বার ক-জন? টাকার জোর আছে? কংগ্রেস কমিউনিস্ট প্রজা-সোস্যালিস্ট হিন্দুমহাসভা এদের সঙ্গে লড়তে চাও কোন্ সাহসে? তোমাদের ভোট দেবে কে?

পরম ঘৃণায় মুখভঙ্গী করে বিনায়ক বলল, আমরা ইলেকশনে দাঁড়াব না, নিজের জন্যে বা বিশেষ কারও জন্যে ভোটও চাইব না। আমাদের উদ্দেশ্য ভোটারদের হুঁশিয়ার করে দেওয়া, যাতে তারা ধূর্ত লোকের কথায় ভুলে অপাত্রে ভোট না দেয়।

—খুব সাধু সংকল্প। তোমাদের বেগনী সাজের মানে কি?

—বেগনী হচ্ছে সত্যের প্রতীক।

—এ যে নতুন কথা শোনাচ্ছ। সাদাই তো সত্যের রঙ।

—আজ্ঞে না। সাদা হচ্ছে সব চাইতে ভেজাল রঙ, সমস্ত রঙের খিচুড়ি, ফিজিক্স পড়ে দেখবেন। বুঝিয়ে দিচ্ছি শুনুন। কংগ্রেসের রঙ সাদা, কমিউনিস্টদের লাল, হিন্দুমহাসভার নারঙ্গী বা গেরুয়া। বৌদ্ধ জৈন শ্রমণদের রঙ হলুদে, পাকিস্তানী পীরদের সবুজ, জাহাজী খালাসী আর মোটর মিস্ত্রীদের নীল, এবং মেটে হচ্ছে চাষা আর মজুরের রঙ। বাকী থাকে বেগনী, সব চেয়ে সূক্ষ্ম তরঙ্গের রঙ, তাই আমরা নিয়েছি। আমাদের ম্যানিফেস্টো পড়ছি, মন দিয়ে শুনুন।—

—হে দেশের লোক, স্ত্রী পুরুষ যুবা বৃদ্ধ ধনী দরিদ্র শিক্ষিত অশিক্ষিত সবাই, সাবধান সাবধান। যা বলছি আপনাদেরই মঙ্গলের জন্যে, আমাদের কিছুমাত্র স্বার্থ নেই। ইলেকশনে আপনারা অবশ্যই ভোট দেবেন, কিন্তু খবরদার, ফন্দিবাজ লোকের কথায় ভুলবেন না। যারা ভোট চাইবে তাদের সম্বন্ধে ভাল রকম খোঁজ নেবেন, কন্যা-দানের পূর্বে ভাবী জামাই সম্বন্ধে যেমন খোঁজ নেন তার চাইতে ঢের বেশী খোঁজ ভোট দানের পূর্বে নেবেন। কারও উপরোধ শুনবেন না, বক্তৃতায় ভুলবেন না, খুব বিচার করে যোগ্যতম পাত্রকে ভোট দেবেন। কংগ্রেস, প্রজাতন্ত্রী, কমিউনিস্ট, হিন্দু-মহাসভিস্ট, ইত্যাদি হলেই লোকে ভাল হয় না, কোনও দলের মাতব্বর হলেই সে দেশের মঙ্গল করবে এমন কথা বিশ্বাস করবেন না। চোর ঘুষখোর কুচরিত্রকে ভোট দেবেন না, মাতাল গেঁজেল আফিমখোর লম্পট পরনারীসক্তকে ভোট দেবেন না। যারা বলে—রাতারাতি তোমাদের সব দুঃখ দূর করব, বেকার কেউ থাকবে না, সকলেই কাজ পাবে, বাড়ি পাবে, মজুর আর চাষীদের রোজগার ডবল হবে, খাদ্য বস্ত্র সবাই সস্তায় পাবে, ট্যাক্স কমবে,—সেই ধাপ্পাবাজ মিথ্যাবাদীকে ভোট দেবেন না। যারা কোটিপতি-দের বন্ধু, যাদের ছেলে জামাই ভাইপো কোটিপতিদের আফিসে চাকরি করে, যাদের ইলেকশনের খরচ কোটিপতিরা যোগায়, তারা ভোট চাইতে এলে দূর দূর করে হাঁকিয়ে দেবেন। যাদের প্ররোচনায় ছোট ছোট ছেলেরা ভোটের দালাল হয়ে পথে পথে চিৎকার করে, সেই শিশুমস্তকভক্ষকদের ভোট দেবেন না। যাদের নিজেদের বিচারের শক্তি নেই, বিদেশী প্রভুর হুকুমে ওঠে বসে, বিদেশী প্রভুর কোনও দোষই যারা দেখতে পায় না, সেই কর্তাভজাদের কথায় কান দেবেন না। যারা গরিব শিক্ষক-দের জন্যে কুলী মজুরদের চাইতে কম মাইনে বরাদ্দ করে, অথচ হোমরা চোমরা অফি-সারদের তিন-চার হাজার দিতে আপত্তি করে না, সেই একচোখা স্নবদের ভোট দেবেন না। বড় বড় কুকর্মের তদন্তের জন্য যারা কমিশন বসায় অথচ তদন্তের ফল চেপে রাখে, দুর্নীতির পোষক সেই কুটিল লোকদের ভোট দেবেন না। যারা খাদ্যে ভেজাল দেয়, কালোবাজার চালায়, ট্যাক্স ফাঁকি দেয়, বিপন্ন ইসলাম আর বিপন্না গোমাতার দোহাই দেয়—

বাধা দিয়ে বললুম, হয়েছে হয়েছে, তোমার বক্তব্য বুঝেছি। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির আর পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের মতন লোকও তোমার টেস্টে ফেল করবেন। শুদ্ধ অপাপ-বিদ্ধ একদম খাঁটী মানুষ পাবে কোথায়? শুকদেব গোস্বামী গৌতম বুদ্ধ আর চৈতন্য মহাপ্রভুর মতন লোক দিয়ে বাজেট তৈরি হবে না, হরিণঘাটার দুধের ব্যবস্থাও হবে না। যারা কাজের লোক তাদের চরিত্রদোষ ধরলে চলে না। মাতাল আর লম্পট যদি অন্য বিষয়ে সাধু হয়, কোটিপতি যদি দাতা হয়, একটু আধটু চোর হলেও কেউ যদি বুদ্ধিমান সুবক্তা জনহিতৈষী হয় তবে তাকে ভোট দিলে অন্যায় হবে না, সচ্চরিত্র বোবা গোবরগণেশ দিয়ে দেশের কোন্ কাজ চলবে?

তক্তপোশে চাপড় মেরে বিনায়ক বলল, সব কাজ চলবে, সচ্চরিত্র খাঁটী লোক বিধানসভায় ঢুকে নিজের শক্তি দেখাবার সুযোগই এ পর্যন্ত পায় নি। দেশের লোক যদি হুঁশিয়ার হয়, অসাধু ধূর্তদের যদি ভোট না দেয়, তবেই ভাল লোক নির্বাচিত হবে এবং নিজের শক্তি দেখাবার সুযোগ পাবে।

—তোমাদের চলে কি করে? আগে তো তুমি ঘুঘুডাঙ্গা হাইস্কুলের মাস্টার ছিলে, এখনও আছ নাকি?

—সে ইস্কুল থেকে আমাকে তাড়িয়েছে। এখন একটা কোচিং ক্লাশ খুলেছি, এরাও ক জন তাতে পড়ায়। এই ভূপেশ জিতেন আর শৈলেনের বাপদের অবস্থা ভাল, এদের রোজগারের দরকার নেই। এই বিনয় মেয়েদের গান শেখায়, আর এই সুবল বদরিনাথ চৌধুরীর ফার্মে চাকরি করে।

—বল কি হে! ভেজাল ঘি বিক্রীর জন্যে বদরিনাথ অনেকবার গ্রেপতার হয়েছে, বিস্তর ঘুষ আর তদবিরের জোরে প্রতিবার খালাস পেয়েছে।

—আপনি ঠিক জানেন?

—নিশ্চয়। আরে আমিই তো ওর উকিল ছিলুম।

বিনায়ক বলল, এই সুবল, তুই আজই কাজে ইস্তফা দিবি।

সুবল বলল, তা হলে খাব কি?

—দুদিন না খেলে মরবি না, চেষ্টা করে অন্য কোথাও কাজ জুটিয়ে নিবি।

আমি বললুম, ওহে বিনায়ক, তোমার সংকল্প অতি মহৎ তা তো বুঝলুম। আমাদের কাছে কি চাও বল।

—আপনাদের সব রকম সাহায্য চাই। প্রচারপত্র দিচ্ছি, চেনা লোকদের মধ্যে যত পারবেন বিলি করবেন, সত্যসন্ধ সংঘের উদ্দেশ্যটি সকলকে ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন, আর আমাদের খরচের জন্যে যথাসাধ্য দান করবেন।

আমার বন্ধু হরিচরণবাবু বললেন, ভেরি সরি। আমাদের হচ্ছে পুঁটিমাছের প্রাণ, জলে বাস করি, হাঙর কুমির ঘড়েল রাঘব-বোয়াল সকলের সঙ্গেই সদ্ভাব রাখতে হবে।

আর এক বন্ধু কালীচরণ বললেন, ঠিক কথা। নিউট্রাল থাকাই আমাদের পক্ষে সব চেয়ে নিরাপদ পলিসি। কর্তৃত্ব যারাই পাক আমাদের তাতে কি। কংগ্রেসীরা এত দিন বেশ গুছিয়ে নিয়েছে, এখন না হয় অন্য দল কিছু লাভ করুক।

আর এক বন্ধু শিবচরণ বললেন, শুনুন বিনায়কবাবু। আপনারা যা করছেন তার নাম সিডিশন্, বৃটিশ যুগে একেই বলা হত ওয়েজিং ওআর, রাজদ্রোহ। এখন রাজা একটি নয়, এক পাল রাজা, বিধানসভায় আর লোকসভায় যখন যাঁরা গদি পান তাঁরাই আমাদের রাজা। ভোট যাকে খুশি দেব, তা তো কেউ দেখতে যাচ্ছে না, কিন্তু কোনও দলকেই চটাতে পারব না মশাই।

বিনায়ক প্রশ্ন করল, দাদা কি বলেন?

দাদা অর্থাৎ আমি বললুম, শোন বিনায়ক, এখানে যাঁরা আড্ডা দিচ্ছেন এঁরা সবাই আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, আর তোমরাও সাধুসজ্জন। তোমার মতন আমি পুরোপুরি সত্যসন্ধ নই, তবুও এই বৈঠকে মনের কথা খুলে বলতে আপত্তি নেই। আমরা হচ্ছি সংসারী লোক, দুনিয়ার সঙ্গে রফা করে চলতে হয়। এই দেখ না, শ্রীযুক্ত সুধাবিন্দু নন্দী বিধানসভায় দাঁড়াচ্ছেন। লোকটি যেমন মাতাল তেমনি লম্পট, দুটো খোরপোষের মামলা এখনও ঝুলছে। কিন্তু ইনি আমার একজন বড় মক্কেল। যদি শোনেন যে আমি তোমাদের সাহায্য করছি তবে আমাকে আর কেস দেবেন না। তারপর মিস্টার রাধাকান্ত বাসু, লোকসভার ক্যান্ডিডেট। বিখ্যাত চোর আর ঘুষখোর। কিন্তু তাঁর ছেলের সঙ্গে আমার ছোট মেয়ের বিবাহ স্থির হয়েছে। এখন যদি তোমার কথা রাখি তবে অমন ভাল সম্বন্ধটি ভেস্তে যাবে।

বিনায়ক বলল, জেনে শুনে চোর ঘুষখোরের ছেলের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দেবেন?

—তাতে ক্ষতিটা কি, মেয়ে তো সুখে থাকবে। তা ছাড়া আমার বেয়াই মিস্টার বাসু চোর বলে আমার জামাইও যে চোর হবে এমন কথা সায়েন্সে বলে না, আবার দেখ, আমার বড় ছেলেটা কোনও গতিকে এম. এ. পাস করে বেকার বসে আছে আর কমরেডদের পাল্লায় পড়ে বিগড়ে যাচ্ছে। তার একটা ভাল পোস্টের জন্যে শ্রী গিরধারীলাল পাচাড়ী চেষ্টা করছেন। আমার বিশিষ্ট বন্ধু, কিন্তু চুটিয়ে কালোবাজার চালান আর পাকিস্তানে চাল আটা তেল কাপড় পাচার করেন। তুমি কি বলতে চাও তাঁকে চটিয়ে দিয়ে আমার ছেলের ভবিষ্যৎ নষ্ট করব?

বিনায়ক বলল, তবে আপনাদের কাছে কোনও আশা নেই?

—দেখ বিনায়ক, তোমরা যে মহৎ ব্রত নিয়েছ তাতে আমার অন্তত খুব সিমপ্যাথি আছে। তবে বুঝতেই পারছ, আমি আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা পড়েছি। চাও তো কিছু টাকা দিতে পারি, কিন্তু সেটা যেন প্রকাশ না হয়।

বিনায়ক বলল, থাক, টাকা এখন চাই না। আচ্ছা, আমরা চললুম, নমস্কার।

দু সপ্তাহ পরে বিনায়ক আবার আমার কাছে এল। আগের মতন বড় দল সঙ্গে নেই, মোটে তিন জন এসেছে। জিজ্ঞাসা করলুম, খবর কি বিনায়ক, কাজ কেমন চলছে?

বিনায়ক বললে, শাস্ত্রে আছে, শ্রেয়স্কর ব্যাপারে বহু বিঘ্ন, তা অতি ঠিক। আমাদের দলের সাতজন ভেগেছে।

—বল কি! কোথায় গেল তারা?

—দু জন চাকরি নিয়ে দশটা পাঁচটা আপিস করছে, তাদের ফুরসত নেই। দুটি ছেলে বাপের ধমকে ঠাণ্ডা হয়ে লেখাপড়ায় মন দিয়েছে। সেই বিনয় ছোকরা মেয়েদের যে গান শেখাত, প্রেমে পড়েছে, তারও কিছুমাত্র ফুরসত নেই। আরও দুজন আপনারী ভাবী বেয়াই মিস্টার রাধাকান্ত বাসু আর মুরুব্বী গিরধারীলাল পাচাড়ীর দালাল হয়ে শিঙে মুখে দিয়ে গর্জন করছে—ভোট দিন, ভোট দিন। সেদিন সন্ধ্যার সময় একটা গুণ্ডা এসে আমাকে শাসিয়ে গেছে।

—খুব মুশকিলে পড়েছ দেখছি। খরচের জন্যে কিছু টাকা নেবে?

—তা দিন, কিন্তু দান নয়, কর্জ। আপনি যদি আমাদের সংঘের সহযোগিতা করতেন তবেই দান নিতে পারতুম। টাকাটা যত শীঘ্র পারি শোধ করে দেব।

—সে তো ভাল কথা, তোমার আত্মসম্মান বজায় থাকবে। কিন্তু দেশব্যাপী দুর্নীতি আর তার পোষক বড় বড় লোকদের সঙ্গে তুমি পেরে উঠবে কি করে? কোন্ দিন হয়ত গুণ্ডার হাতে প্রাণ হারাবে। আমি বলি কি, তোমার এই হোপলেস ব্রতটা ছেড়ে দাও। ভাল অথচ নিরাপদ সৎকার্য তো অনেক আছে; তারই একটা বেছে নাও—আর্ত-ত্রাণ, রোগীর সেবা, গরিবের ছেলেমেয়ের শিক্ষা, পতিতার উদ্ধার—

—দেখুন মশাই, সব কাজ সকলের জন্যে নয়, আমি নিজের পথ বেছে নিয়েছি, না হয় একলাই চলব। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যারা প্রথমে দাঁড়িয়েছিল তারা কজন ছিল? অন্য নিরাপদ সৎকর্ম বেছে নেয় নি কেন? তারা প্রাণ দিয়েছে, আবার অন্য লোক তাদের স্থান নিয়েছে। আমার এই ব্রত হচ্ছে ধর্মযুদ্ধ, আমিই না হয় প্রথম শহিদ হব। দেখবেন আমার পরে আরও অনেক লোক এই কাজে লাগবে, প্রথমে অল্প, তার পরে দলেদলে, আচ্ছা, চললুম, নমস্কার।

দশদিন পরে সকালবেলা একটি ছেলে এসে বলল, দিনু-দা এই টাকায় থলিটা আপনাকে দিতে বলেছেন। সাড়ে সাত টাকা কম আছে, ওটা আমিই এর পর শোধ করে দেব।

টাকা নিয়ে আমি বললুম, না না, বাকীটা আর শোধ দিতে হবে না। বিনায়কের খবর কি?

—কাল রাত থেকে হাসপাতালে আছেন, বাঁচবার আশা নেই। শেষ রাত্রে আমার সঙ্গে একটু কথা বলেছিলেন, আপনার ধার শোধ দেবার জন্যে। আজ সকাল থেকে আর জ্ঞান নেই। বড্ড টাকার টানাটানি ছিল, প্রায় একমাস ধরে নামমাত্র খেতেন, অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়েছিলেন। কাল সন্ধ্যাবেলা রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান, সেই সময় রাধাকান্ত বোসের মোটর তাঁকে চাপা দেয়।

হাসপাতালে যখন পৌঁছলুম তখন বিনায়ক মারা গেছে। তার দলের তিনজন উপস্থিত ছিল।

বিনায়ককে যে টাকা দিয়েছিলুম তার সমস্তই সে ফিরিয়ে দিয়েছে, সাড়ে সাত টাকা ছাড়া। আমার সাহায্যের মূল্য সেই সাড়ে সাত। যদি দু-তিন হাজার তাকে দিতুম তাতেই বা সে কি করতে পারত? সে চেয়েছিল আন্তরিক সক্রিয় সাহায্য, তা দেওয়া আমার মতন লোকের পক্ষে অসম্ভব। বিনায়কের মহা ভুল, সে দুষ্কৃতদের বিনাশ করতে চেয়েছিল, যে কাজ যুগে যুগে অবতারদেরই করবার কথা। পাগলা বিনায়ক, অনধিকার চর্চা করতে গিয়ে প্রদীপ্ত অনলে পতঙ্গের ন্যায় প্রাণ হারিয়েছে। অত্যন্ত পরিতাপের কথা, কিন্তু এরই নাম ভবিতব্য, আমাদের সাধ্য কি যে তার অন্যথা করি। নাঃ, আমাদের আত্মগ্লানির কারণ নেই।

১৮৭৯ শক (১৯৫৭)

যযাতির জরা

মহারাজ যযাতি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে বললেন, বৎস, পঁচিশ বৎসর আমি তোমার প্রদত্ত যৌবন উপভোগ করেছি, তুমি তার পরিবর্তে আমার জরার গুরুভার বহন করেছ। আমার আর ভোগ বিলাসে রুচি নেই। এখন বুঝেছি, কাম্য বস্তুর উপভোগে কামনা শান্ত হয় না, ঘৃতসংযোগে অগ্নির ন্যায় আরও বৃদ্ধি পায়, অতএব বিষয়তৃষ্ণা ত্যাগ করাই উচিত। আমার পাঁচ পুত্রের মধ্যে তুমি কনিষ্ঠ হলেও গুণে শ্রেষ্ঠ। তোমার ভ্রাতারা সকলেই স্বার্থপর, কেউ আমার অনুরোধ রাখে নি, কিন্তু তুমি দ্বিরুক্তি না করে তোমার নবীন যৌবন আমাকে দিয়েছিলে এবং তার পরিবর্তে আমার পলিত কেশ গলিত দন্ত লোল চর্ম আর দুর্বল ইন্দ্রিয়গ্রাম নিয়েছিলে। পুত্র, এখন জরা ফিরিয়ে দিয়ে তোমার যৌবন নাও, আমার রাজ্যও নাও। তুমি মনোমত সুন্দরী কন্যা বিবাহ কর, সুদীর্ঘকাল জীবিত থেকে ঐশ্বর্য ভোগ কর, আমি সংসার ত্যাগ করে বনগমন করব।

এইখানে একটু পূর্বকথা বলা দরকার। যযাতির প্রথমা পত্নী দেবযানী, শুক্রাচার্যের কন্যা। তাঁর দুই পুত্র হয়েছিল। দ্বিতীয়া পত্নী শর্মিষ্ঠা, দৈত্যরাজ বৃষপর্বার কন্যা। তাঁর তিনপুত্র, পুরু কনিষ্ঠ। শর্মিষ্ঠাকে যযাতি লুকিয়ে বিবাহ করেছিলেন, তা জানতে পেরে দেবযানী ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর পিতার আশ্রমে চলে যান। শুক্রাচার্যের শাপে যযাতি অকালেই ষাট বৎসরের বৃদ্ধের তুল্য জরাগ্রস্ত হয়েছিলেন।

যযাতির বাক্য শুনে পুরু যুক্ত করে সবিনয়ে বললেন, পিতা, আমাকে ক্ষমা করুন। একবার আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য করেছিলাম, কিন্তু আপনার এই নূতন আজ্ঞা পালনের অভিরুচি আমার নেই, আপনি কৃপা করে প্রত্যাহার করুন। আমি যৌবন ফিরে চাই না, আপনিই তা ভোগ করতে থাকুন, আমি জরাতেই তুষ্ট।

যযাতি বললেন, পুত্র, তুমি আমাকে অবাক করলে। আমার অনুরোধে তুমি জরা নিয়েছিলে, কালক্রমে সেই জরা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন তা থেকে মুক্ত হতে কেন চাও না তা আমি বুঝতে পারছি না।

পুরু বললেন, পিতা, আমাদের দুজনের বর্তমান অবস্থাটা বিচার করে দেখুন। যখন আপনি আমার যৌবন নিয়ে আপনার জরা আমাকে দিয়েছিলেন তখন আমার বয়স ছিল বিশ, আর আপনার ছিল ষাট। তার পর পঁচিশ বৎসর কেটে গেছে। এখন আপনি পঁয়তাল্লিশ বৎসরের প্রৌঢ়, আর আমি পঁচাশি বৎসরের স্থবির। আপনার প্রৌঢ়তার প্রতি আমার কিছুমাত্র লোভ নেই। জরাগ্রস্ত হবার পর থেকে আমি শাস্ত্রপাঠ যোগচর্চা আর অধ্যাত্মচিন্তায় নিরত আছি, ইন্দ্রিয় ভোগে আমার আসক্তি নেই, সর্ববিধ বিষয়তৃষ্ণা লোপ পেয়েছে। আমি দারপরিগ্রহ করি নি, পরমা সুন্দরী রমণী দেখলেও আমার চিত্তচাঞ্চল্য হয় না, অতি সুস্বাদু মাংস বা মিষ্টান্নেও আমার রুচি নেই। এই শান্তিময় অবস্থার আমি পরিবর্তন করতে চাই না। এখন আমি মোক্ষলাভের জন্য তপস্যা করছি, আপনার সঙ্গে বয়স বিনিময় করলে আমার পঁচিশ বৎসরের সাধনা পণ্ড হবে।

যযাতি এখন স্বাস্থ্যবান সবল মধ্যবয়স্ক, তাঁর চুল আর গোঁফে মোটেই পাক ধরেনি, দেখলে ত্রিশ বৎরের যুবা বলেই মনে হয়। তাঁর পুত্র পুরু পঁচাশি বৎসরের বৃদ্ধ, মাথায় এখনও কিছু পাকা চুল অবশিষ্ট আছে, মুখে প্রকাণ্ড সাদা দাড়ি-গোঁফ। প্রৌঢ় যযাতি তাঁর মহাস্থবির পুত্রকে কিঞ্চিৎ ভয় করেন, লজ্জাও করেন। পুরুর কথা শুনে বললেন, পুত্র, আমি তোমার তপশ্চর্যার হানি করতে চাই না, কিন্তু আমার গতি কি হবে? এই যৌবনতুল্য দুর্মদ প্রৌঢ়ত্ব আর যে সহ্য হচ্ছে না।

পুরু বললেন, পিতা, কোনও স্থবির সদ্‌বিপ্র বা সৎক্ষত্রিয়কে আপনার প্রৌঢ়ি দান করুন, তার পরিবর্তে তাঁর জরা গ্রহণ করুন। আপনি মন্ত্রীকে আদেশ দিলে তিনি রাজ্যের সর্বত্র ঢক্কা বাজিয়ে ঘোষণা করবেন প্রার্থীর অভাব হবে না, যোগ্যতমের সঙ্গেই আপনি বয়স বিনিময় করবেন। এখন আমাকে গমনের অনুমতি দিন, আমি অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের সংকল্প করেছি, তারই আয়োজন করতে হবে।

পুরু চলে গেলে পঞ্চাশ জন রাজভার্যা অন্তঃপুর থেকে এসে ব্যাকুল হয়ে যযাতিকে বেষ্টন করলেন। প্রথমা মহিষী দেবযানী সেই যে রাগ করে পিত্রালয়ে চলে গিয়েছিলেন তার পরে আর ফিরে আসেন নি। দ্বিতীয়া মহিষী শর্মিষ্ঠার বয়স এখন ষাট। তিনি কারও সঙ্গে মেশেন না, অন্তরালে থেকে ধর্মকর্মে কালযাপন করেন। পুনর্যৌবন লাভের পর যযাতি ক্রমে ক্রমে পঞ্চাশটি বিবাহ করেছেন, এই সকল পত্নী-দের বয়স এখন চল্লিশ থেকে পঁচিশ। এঁদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে প্রবীণা সেই পৃথু-লাঙ্গী সপত্নীদের মুখপাত্রী হয়ে যযাতিকে বললেন, আর্যপুত্র, এ কি রকম কথা শুনেছি? আপনি নাকি আপনার যৌবনপুরুকে ফিরিয়ে দিয়ে তাঁর পঁচাশি বৎসরের জরা নেবেন?

যযাতি বললেন, সেই রকমই তো ইচ্ছা। যৌবন আর ভাল আমার লাগে না, এখন বৈরাগ্য অবলম্বন করব। কিন্তু পুরু বেঁকে দাঁড়িয়েছে, সে আর আগেকার মতন পিতৃ-ভক্ত আজ্ঞাপালক পুত্র নয়, তার জরা ছাড়তে চায় না, যেন কতই দুর্লভ সামগ্রী। যদি নিতান্তই তাকে বশে আনতে না পারি তবে কোনও স্থবির ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়কে আমার বয়স দিয়ে তাঁর জরা নেব।

রাজপত্নীদের মধ্যে যিনি কনিষ্ঠা সেই করঞ্জাক্ষী বললেন, মহারাজ, এই যদি আপনার অভিপ্রায় ছিল তবে আমাদের পাণিগ্রহণ করেছিলেন কেন? আপনি বহু পত্নীর স্বামী, নিজের যৌবন ভোগ করার পর আবার পুত্রের যৌবন ভোগ করেছেন। আপনার যৌবনে অরুচি হতে পারে, কিন্তু আমাদের তো হয় নি। আমাদের অনাথা করে যদি জরা গ্রহণ করেন তবে আপনার মহাপাপ হবে।

যযাতি বললেন, আমি মনস্থির করে ফেলেছি, আমার সংকল্প বদলাতে পারি না। তোমাদের সকলকেই আমি পত্নীত্ব থেকে মুক্তি দিলাম, প্রচুর অর্থও রাজকোষ থেকে পাবে। ইচ্ছা করলে আবার বিবাহ করতে পার।

করঞ্জাক্ষী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, মহারাজ, আপনার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছে। আমরা সকলেই সন্তানবতী, কে আমাদের পত্নীত্বে বরণ করবে? সবৎসা ধেনুর যে মূল্য সবৎসা নারীর তা নেই।

যযাতি বললেন, আচ্ছা আচ্ছা, তোমাদের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হবে। নূতন পতি যদি নাও জোটে তথাপি সুখে থাকতে পারবে। এখন যাও, আমার বিস্তর কাজ।

পুত্রের মত পরিবর্তনের জন্য যযাতি অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু কোনও ফল হল না। তখন তাঁর আজ্ঞানুসারে রাজমন্ত্রী এই ঘোষণা করলেন।—ভো ভো বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন সদ্‌বংশজাত স্থবির ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ, অবধান করুন। কুরুরাজ যযাতির আর যৌবন ভোগের ইচ্ছা নেই, কোনও জরাগ্রস্ত সৎপাত্রের সঙ্গে তাঁর বয়স বিনিময় করতে চান। শ্রীযযাতির বর্তমান বয়স পঁয়তাল্লিশ, পূর্ণ যৌবনেরই তুল্য। প্রার্থী স্থবিরগণ আগামী অমাবস্যায় পূর্বাহ্নে হস্তিনাপুরে রাজভবনের চত্বরে উপস্থিত হবেন। মহারাজ স্বয়ং নির্বাচন করবেন, যাঁকে যোগ্যতম মনে করবেন, তাঁর সঙ্গেই বয়স বিনিময় করবেন। তাঁর সিদ্ধান্তের কোনও প্রতিবাদ গ্রাহ্য হবে না।

নির্দিষ্ট দিনে প্রায় এক হাজার জরাগ্রস্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হস্তিনাপুরে এলেন। এঁদের বয়স এক শ থেকে ষাট। কেউ কুঁজো হয়ে পড়েছেন, লাঠিতে ভর দিয়ে চলেন। কেউ দৃষ্টিহীন, অপরের হাত ধরে এসেছেন। কেউ চলতেই পারেন না, ডুলিতে চড়ে এসেছেন। যযাতির সংকল্পের সংবাদ পেয়ে দেবলোক থেকে দুই অশ্বিনীকুমার আর দেবর্ষি নারদও কৌতূহলবশে উপস্থিত হলেন, কিন্তু আত্মপ্রকাশ না করে অগোচরে রইলেন।

সমবেত প্রার্থিগণকে স্বাগত জানিয়ে যযাতি তাঁদের পরীক্ষা করতে যাচ্ছেন এমন সময় একদল বৃদ্ধা ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন। তাঁদের নেত্রী একজন বর্ষীয়সী ব্রাহ্মণী। তাঁর মস্তক প্রায় কেশশূন্য, ললাটে বৈধব্যের প্রতিষেধক একটি প্রকাণ্ড সিন্দুরের ফোঁটা, পরিধানে রক্তবর্ণ পট্টবাস। ইনি কম্পিত কণ্ঠে বললেন, কুরুরাজ যযাতি, শাস্ত্রে আছে—যৌবন ধনসম্পত্তি প্রভুত্ব আর অবিবেকিতা, এর প্রত্যেকটি অনর্থকর, দুর্দৈবক্রমে আপনাতে চারিটিই একত্র হয়েছে। এক যৌবনেই রক্ষা নেই, আপনি দুই যৌবন ভোগ করেছেন, সুতরাং যৌবনাক্রান্ত ধেড়ে-রোগগ্রস্ত বৃদ্ধ কি প্রকার জীব তা ভালই জানেন। যে বৃদ্ধের সঙ্গে আপনি বয়স বিনিময় করবেন সে নিশ্চয় যুবতী ভার্যা ঘরে আনবে। তখন তার বৃদ্ধা পত্নীর কি দশা হবে ভেবে দেখেছেন কি?

যযাতি কুণ্ঠিত হয়ে বললেন, হুঁ, আপনার আশঙ্কা যথার্থ। ওহে মন্ত্রী, এখনই ঘোষণা করে দাও—যাঁদের পত্নী জীবিত আছেন তাঁদের সঙ্গে আমি বয়স বিনিময় করব না। একটি করে স্বর্ণমুদ্রা প্রণামী স্বরূপ দিয়ে তাঁদের বিদায় কর।

যাঁদের বাদ দেওয়া হল তাঁরা প্রণামী নিলেন, কিন্তু কেউ চলে গেলেন না, রাজা কাকে মনোনীত করেন দেখবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

যে পঙ্গু ব্রাহ্মণ ডুলিতে এসেছিলেন তিনি রাজার সম্মুখে এসে ডুলিতে বসেই বললেন, মহারাজের জয় হক। আমি মহাকুলীন বিপ্র কুলীরক, বয়স শত বর্ষ, সর্ব-শাস্ত্রজ্ঞ, আমার পাঁচ পত্নীই একে একে গত হয়েছেন। আমার তুল্য যোগ্যপাত্র কোথাও পাবেন না, অতএব আমার সঙ্গেই বয়স বিনিময় করুন।

নমস্কার করে যযাতি বললেন, দ্বিজোত্তম কুলীরক, আমি জরা কামনা করি কিন্তু পঙ্গুত্ব চাই না। মন্ত্রী, এঁকে পাঁচ-স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে বিদায় কর।

তার পর এক বক্রপৃষ্ঠ বৃদ্ধ তাঁর দুই পৌত্রের হাত ধরে যযাতির কাছে এসে বললেন, মহারাজ, আমার নাম কিঞ্চুলুক, কার্তবীর্যার্জুনের বংশধর, বয়স আশি। চোখে ভাল দেখতে পাই না, অগাধ বিদ্যাবুদ্ধির জন্য লোকে আমাকে প্রজ্ঞাচক্ষু বলে। বহু পুত্র-পৌত্র সত্ত্বেও আমি অসুখী. সকলেই আমাকে অবহেলা করে। সম্পত্তির

লোভে আমার মৃত্যুকামনা করে। আপনার পরিপক্ক যৌবন পেলে আমি পুনর্বার দার পরিগ্রহ করে সুখী হতে পারব।

যযাতি বললেন, মহামতি কিঞ্জল্‌ক, আমি জরা চাই, কিন্তু আপনার প্রজ্ঞাচক্ষুতে আমার কাজ চলবে না। মন্ত্রী, পঞ্চ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে এঁকে বিদায় কর।

বহু প্রার্থী একে একে এসে রাজসম্মুখে নিজের নিজের গুণাবলী বিবৃত করলেন, কিন্তু যযাতি কাকেও তাঁর মহৎ দানের যোগ্য পাত্র মনে করলেন না। সহসা একটা গুঞ্জন উঠল, জনতা সসম্ভ্রমে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পথ ছেড়ে দিল। দুজন পক্ককেশ পক্কশ্মশ্রু বৃদ্ধ একটি অপূর্ব রূপলাবণ্যবতী ললনার হাত ধরে রাজার সম্মুখে এলেন।

যযাতি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কে আপনারা দ্বিজদ্বয়? এই বরবর্ণিনী সুন্দরী যাঁর আগমনে সভা উদ্‌ভাসিত হয়েছে ইনিই বা কে?

দুই বৃদ্ধের মধ্যে যিনি বয়সে বড় তিনি বললেন, মহারাজ, আমরা বিন্ধ্যপাদস্থ তপোবন বিল্বাশ্রম থেকে আসছি। মহাতপা ভল্লাতক ঋষির নাম শুনে থাকবেন, আমি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিভীতক, আর কনিষ্ঠ এই হরীতক। এই রূপবতী কুমারী হচ্ছেন সুবর্তরাজ মিত্রসেনের কন্যা মনোহরা। প্রৌঢ় বয়সে মিত্রসেনের পত্নীবিয়োগ হলে তিনি বানপ্রস্থ গ্রহণের সংকল্প করলেন এবং পুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করে একমাত্র কন্যার বিবাহের জন্য উদ্‌যোগী হলেন। কিন্তু এই মনোহরা বললেন, পিতা, বিবাহ থাকুক, আমিও বনে যাব, নইলে আপনার সেবা করবে কে? কন্যার অত্যন্ত আগ্রহ দেখে মিত্রসেন সম্মত হলেন এবং তাঁর কুলগুরু আমাদের পিতা ভল্লাতকের আশ্রমের নিকটে কুটীর নির্মাণ করে সেখানে বাস করতে লাগলেন। আমাদের পিতার অনেক বয়স হয়েছিল, কিছুকাল পরে তিনি স্বর্গে গেলেন। সম্প্রতি রাজা মিত্র-সেনও পনরো বৎসর অরণ্যবাসের পর দেহত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি বললেন, হা, কন্যাকে অনূঢ়া রেখেই আমাকে যেতে হচ্ছে, গুরুপুত্র বিভীতক ও হরীতক, এর ভার তোমরা নাও, কাল বিলম্ব না করে এর বিবাহ দিও! কিন্তু বৃদ্ধের সঙ্গে কদাচ নয়, বৃদ্ধপতিতে আমার কন্যার রুচি নেই। রাজার মৃত্যুর পর আমরা মহা সমস্যায় পড়লাম। আমরা দুজনেই বৃদ্ধ, সে কারণে মনোহরার মনোমত পাত্র নই। এমন সময় ভাগ্যক্রমে আপনার ঘোষণা শুনলাম, তাই সত্বর এখানে এসেছি। মহারাজ, সকল বিষয়েই আমি এই কন্যার যোগ্য পাত্র, আমার সঙ্গেই আপনার বয়স বিনিময় করুন, তা হলে আমাদের বিবাহে কোনও বাধা থাকবে না।

হরীতক উত্তেজিত হয়ে বললেন, মহারাজ, আমার দাদার প্রস্তাব মোটেই ন্যায়-সংগত নয়। আমি ওঁর চাইতে রূপবান ও বিদ্বান, মনোহরার সঙ্গে আমার বয়সের ব্যবধানও কম, ওর ত্রিশ, আমার ষাট, আর দাদার পঁয়ষট্টি। আমি এখনই যোগ্যতর পাত্র, মহারাজের যৌবন পেলে তো কথাই নেই।

বিভীতক ধমক দিয়ে বললেন, তুই চুপ কর মূর্খ। জ্যেষ্ঠের পূর্বে কনিষ্ঠের বিবাহ হতেই পারে না।

যযাতি বললেন, রাজকন্যা, তোমার অভিমত কি? তুমি যাকে চাও তাকেই আমার যৌবন দেব। এই দুই ভ্রাতার মধ্যে কাকে যোগ্যতর মনে কর?

মনোহরা বললেন, দুজনেই সমান।

যযাতি বললেন, সুন্দরী, তুমি আমাকে বড়ই সমস্যায় ফেললে, এই বিভীতক আর হরীতকের মধ্যে আমি কোনও ইতরবিশেষ দেখছি না। আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না? আমার দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর।

নিজের কুচকুচে কালো বাবরি চুলে হাত বুলিয়ে আর রাজকীয় মোটা গোঁফে চাড়া দিয়ে যযাতি বললেন, যৌবন তো আমার রয়েইছে, বেশ পরিপুষ্ট যৌবন, তা যদি দান না করে রেখেই দিই? আমিই যদি তোমাকে বিবাহ করি তা হলে কেমন হয় মনোহরা?

বিভীতক আর হরীতক ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, এ কি রকম কথা মহারাজ! আপনি ঢাক পিটিয়ে ঘোষণা করেছেন যে আপনার যৌবন অন্যকে দান করবেন, এখন বিপরীত কথা বলছেন কেন?

সমবেত বৃদ্ধদের কয়েকজন চিৎকার করে হাত নেড়ে বললেন, মহারাজ, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে আপনি রৌরব নরকে যাবেন। আমাদের ডেকে এনে বঞ্চনা করবেন এত দূর আস্পর্ধা।

জনতা থেকে নিনাদ উঠল—চলবে না, চলবে না।

ব্যাপার গুরুতর হচ্ছে দেখে নারদ আর অশ্বিনীকুমারদ্বয় আত্মপ্রকাশ করলেন। যযাতি সসম্ভ্রমে তাঁদের পাদ্য অর্ঘ্যাদি দিতে গেলেন, কিন্তু নারদ বললেন, মহারাজ, ব্যস্ত হয়ো না, উপস্থিত সংকট থেকে আগে মুক্ত হও।

যযাতি বললেন, দেবর্ষি, আমার মাথা গুলিয়ে গেছে, আপনিই বলুন এখন আমার কর্তব্য কি।

নারদ বললেন, তুমি সত্যভ্রষ্ট হয়েছ। পুরুকে ডাক, সেই তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষার ব্যবস্থা করবে।

যযাতির আহ্বানে পুরু জনসভায় এলেন। পূজনীয়গণকে বন্দনা করে বললেন, পিতা, আমাকে আবার এর মধ্যে জড়াতে চান কেন? আমার যজ্ঞীয় অনুষ্ঠান এখনও সমাপ্ত হয় নি, যজ্ঞান্ত স্নান না করেই আপনার আদেশে এসেছি। বলুন কি করতে হবে।

যযাতি নীরব রইলেন। নারদ বললেন, রাজপুত্র, তোমার পিতার কিঞ্চিৎ চিত্তবিকার হয়েছে, তাঁর সংকল্পসিদ্ধির ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে। এই সভায় উপস্থিত বৃদ্ধগণের মধ্যে কে যোগ্যতম, কার সঙ্গে যযাতি বয়স বিনিময় করবেন তা তুমিই স্থির কর।

পুরু প্রশ্ন করলেন, ওই বিদ্যুদ্‌বল্লরী তুল্য ললনা যাঁর দুটি হাত দুই বৃদ্ধ ধরে আছেন, উনি কে?

নারদ বললেন, উনি স্বর্গত সুবর্তরাজ মিত্রসেনের কন্যা মনোহরা। ওই দুই বৃদ্ধ ওঁর পিতার গুরুপুত্র, বিভীতক ও হরীতক। ওঁরা দুজনেই মনোহরার পাণিপ্রার্থী, যযাতির যৌবনও ওঁরা চান। কিন্তু তোমার পিতা বড় সমস্যায় পড়েছেন, কার সঙ্গে বয়স বিনিময় করবেন তা স্থির করতে পারছেন না।

পুরু বললেন, সমস্যা তো কিছুই দেখছি না, আমি এখনই মীমাংসা করে দিচ্ছি। রাজকন্যা, ওই দুই বৃদ্ধের মধ্যে কাকে যোগ্যতর মনে কর?

মনোহরা বললেন, দুজনেই সমান।

একটু চিন্তা করে পুরু বললেন, বরবর্ণিনী মনোহরা, তোমার সহিত নিভৃতে কিছু পরামর্শ করতে চাই। ওই অশোক তরুর ছায়ায় চল।

অশোকতরুতলে কিছুক্ষণ আলাপের পর পুরু সকলের সমক্ষে এসে বললেন, পরমারাধ্য পিতৃদেব, ত্রিলোকপূজ্য দেবর্ষি, দেববৈদ্য অশ্বিনীদ্বয়, এবং সমবেত ভদ্রগণ, অবধান করুন। আজ সহসা আমার উপলব্ধি হয়েছে, পিতার আজ্ঞা পালন না করে আমি অপরাধী হয়েছি। এখন উনি আমাকে ক্ষমা করুন, ও'র যৌবনের পরিবর্তে আমার জরা গ্রহণ করুন। এই রাজকুমারী মনোহরা আমাকেই পতিত্বে বরণ করবেন।

নারদ আর দুই অশ্বিনীকুমার বললেন, সাধু সাধু! জনতা থেকে ধ্বনি উঠল, রাজা যযাতির জয়, যুবরাজ পুরুর জয়! বিভীতক আর হরীতক বিরস বদনে নিঃশব্দে প্রস্থান করলেন।

যযাতি মৃদুস্বরে আপনমনে বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, ছি ছি ছি, এই যদি করবি তবে সেদিন অমন তেজ দেখিয়ে আমার কথায় 'না' বললি কেন? এত লোকের সামনে ধাষ্টামো করবার কি দরকার ছিল?

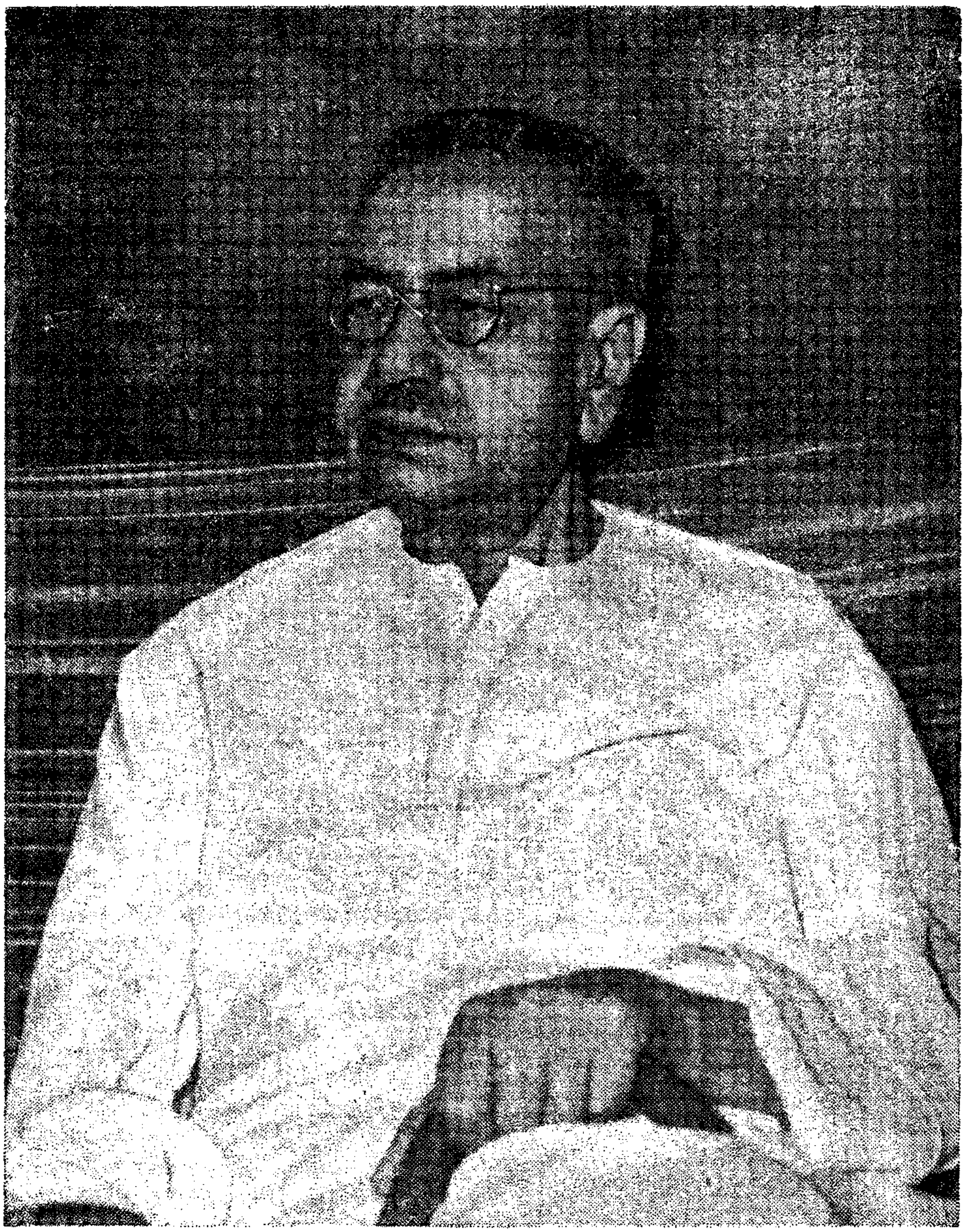
দুই অশ্বিনীকুমার বললেন, মহারাজ যযাতি, রাজপুত্র পুরু, আমরা এখনই অস্ত্রোপচার করে তোমাদের জরা-যৌবন পরিবর্তিত করে দিচ্ছি, অস্ত্রভাণ্ড আমাদের সঙ্গেই আছে।

নারদ বললেন, তোমাদের কিছুই করতে হবে না, পিতা-পুত্রের পুণ্যবলে বিনা অস্ত্রেই পরিবর্তন ঘটবে।

পুরু তাঁর পিতার চরণ স্পর্শ করলেন। পুরুর মস্তকে করার্পণ করে যযাতি বললেন, পুত্র, আমার যৌবন তোমাতে সংক্রমিত হক, তোমার জরা আমাতে প্রবেশ করুক।

তৎক্ষণাৎ বিনিময় হয়ে গেল।

১৮৭৯ ১৯৫৭



মধ্য বয়সে

চমৎকুমারী ইত্যাদি গল্প

চমৎকুমারী

বক্রেশ্বর দাস সরকারী গুণ্ডা দমন বিভাগের একজন বড় কর্মচারী। শীতের মাঝামাঝি এক মাসের ছুটি নিয়ে নববিবাহিত পত্নী মনোলোভার সঙ্গে সাঁওতাল পরগনায় বেড়াতে এসেছেন। সঙ্গে বুড়ো চাকর বৈকুণ্ঠ আছে। এঁরা গণেশমুণ্ডায় লালকুঠি নামক একটি ছোট বাড়িতে উঠেছেন। জায়গাটি নির্জন, প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোহর।

বক্রেশ্বরের বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে, মনোলোভার পঁচিশের নীচে। বক্রেশ্বর বোঝেন তিনি সুদর্শন নন, শরীরে প্রচুর শক্তি থাকলেও তাঁর যৌবন শেষ হয়েছে। কিন্তু মনোলোভার রূপের খুব খ্যাতি আছে, বয়সও কম। এই কারণে বক্রেশ্বরের কিঞ্চিৎ হীনতাভাব অর্থাৎ ইনফিরিয়রিটি কম্প্লেক্স আছে।

প্রভাত মুখুজ্যে মহাশয় একটি গল্পে একজন জবরদস্ত ডেপুটির কথা লিখেছেন। একদিন তিনি যখন বাড়িতে ছিলেন না তখন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে এক পূর্বপরিচিত ভদ্রলোক দেখা করেন। ডেপুটিবাবু তা জানতে পেরে স্ত্রীকে যথোচিত ধমক দেন এবং আগন্তুক লোকটিকে আদালতী ভাষায় একটি কড়া নোটিশ লিখে পাঠান। তার শেষ লাইনটি (ঠিক মনে নেই) এইরকম।—বারদিগর এমত করিলে তোমাকে ফৌজদারি সোপর্দ করা হইবে। সেই ডেপুটির সঙ্গে বক্রেশ্বরের স্বভাবের কিছু মিল আছে। দরিদ্রের কন্যা অল্পশিক্ষিতা ভালমানুষ মনোলোভা তাঁর স্বামীকে চেনেন এবং সাবধানে চলেন।

জিনিসপত্র সব গোছানো হয়ে গেছে। বিকেল বেলা মনোলোভা বললেন, চল চম্পীদিদির সঙ্গে দেখা করে আসি। তিনি ওই তিরাসিংগা পাহাড়ের কাছে লছমনপুরায় আছেন, চিঠিতে লিখেছিলেন আমাদের এই বাসা থেকে বড় জোর সওয়া মাইল।

বক্রেশ্বর বললেন, আমার ফুরসত নেই। একটা স্কীম মাথায় এসেছে, গভরমেন্ট যদি সেটা নেয় তবে দেশের সমস্ত বদমাশ শায়েস্তা হয়ে যাবে। এই ছুটির মধ্যেই স্কীমটা লিখে ফেলব। তুমি যেতে চাও যাও, কিন্তু বৈকুণ্ঠকে সঙ্গে নিও।

—বৈকুণ্ঠের ঢের কাজ। বাজার করবে, দুধের ব্যবস্থা করবে, রান্নার যোগাড় করবে। আর ও তো অথর্ব বুড়ো, ওকে সঙ্গে নেওয়া মিথ্যে। আমি একাই যেতে পারব, ওই তো তিরাসিংগা পাহাড় সোজা দেখা যাচ্ছে।

—ফিরতে দেরি ক'রো না, সন্ধ্যের আগেই আসা চাই।

লছমনপুরায় পৌঁছে মনোলোভা তাঁর চম্পীদিদির সঙ্গে অফুরন্ত গল্প করলেন। বেলা পড়ে এলে চম্পীদিদি ব্যস্ত হয়ে বললেন, যা যা শিগ্‌গির ফিরে যা, নয়তো অন্ধকার হয়ে যাবে, তোর বর ভেবে সারা হবে। আমাদের দুটো চাকরই বেরিয়েছে, নইলে একটাকে তোর সঙ্গে দিতুম। কাল সকালে আমরা তোর কাছে যাব।

মনোলোভা তাড়াতাড়ি চলতে লাগলেন। মাঝপথে একটা সরু নদী পড়ে, তার খাত গভীর, কিন্তু এখন জল কম। মাঝে মাঝে বড় বড় পাথর আছে, তাতে পা ফেলে অনায়াসে পার হওয়া যায়। নদীর কাছাকাছি এসে মনোলোভা দেখতে পেলেন, বাঁ দিকে কিছু দূরে চার-পাঁচটা মোষ চরছে, তার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড শিংওয়ালা জানোয়ার কুটিল ভঙ্গীতে তাঁর দিকে তাকাচ্ছে। মোষের রাখাল একটি ন-দশ বছরের ছেলে। সে হাত নেড়ে চেঁচিয়ে কি বলল বোঝা গেল না। মনোলোভা ভয় পেয়ে দৌড়ে নদীর ধারে এলেন এবং কোনও রকমে পার হলেন, কিন্তু ওপারে উঠেই একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন, পারলেন না, পায়ের চেটোয় অত্যন্ত বেদনা।

চারিদিক জনশূন্য, সেই রাখাল ছেলেটাও অদৃশ্য হয়েছে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। আতঙ্কে মনোলোভার বুদ্ধিলোপ হল। হঠাৎ তাঁর কানে এল—

—একি, পড়ে গেলেন নাকি?

লম্বা লম্বা পা ফেলে যিনি এগিয়ে এলেন তিনি একজন ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ পুরুষ, পরনে ইজার, হাঁটু পর্যন্ত আচকান, তার উপর একটা নকশাদার শালের ফতুয়া, মাথায় লোমশ ভেড়ার চামড়ার আস্ত্রাকান টুপি।

মনোলোভার দুই হাত ধরে টানতে টানতে আগন্তুক বললেন, হেঁইও, উঠে পড়ুন। পারছেন না? খুব লেগেছে? দেখি কোথায় লাগল।

হাত-পা গুটিয়ে নিয়ে মনোলোভা বললেন, ও আর দেখবেন কি, পা মচকে গেছে, দাঁড়াবার শক্তি নেই। আপনি দয়া করে যদি একটা পালকি টালকি যোগাড় করে দেন তো বড়ই উপকার হয়।

—খেপেছেন, এখানে পালকি তাঞ্জাম চতুর্দোলা কিছুই মিলবে না, স্ট্রেচারও নয়। আপনি কোথায় থাকেন? গণেশমুণ্ডায় লালকুঠিতে? আপনারাই বুঝি আজ সকালে পৌঁছেছেন? আমি আপনার পায়ে একটু মাসাজ করে দিচ্ছি, তাতে ব্যথা কমবে। তার পর আমার হাতে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে বাড়ি ফিরতে পারবেন। যদি মচকে গিয়ে থাকে, চুন-হলুদ লাগালেই চট করে সেরে যাবে।

বিব্রত হয়ে মনোলোভা বললেন, না না, আপনাকে মাসাজ করতে হবে না। হেঁটে যাবার শক্তি আমার নেই। আপনি দয়া করে আমাদের বাসায় গিয়ে মিস্টার বি দাসকে খবর দিন তিনি নিয়ে যাবার যা হয় ব্যবস্থা করবেন।

—পাগল হয়েছেন? এখান থেকে গিয়ে খবর দেব, তার পর দাস মশাই চেয়ারে বাঁশ বেঁধে লোকজন নিয়ে আসবেন তার মানে অন্তত পঁয়তাল্লিশ মিনিট। ততক্ষণ আপনি অন্ধকারে এই শীতে একা পড়ে থাকবেন তা হতেই পারে না। বিপদের সময় সংকোচ করবেন না, আপনাকে আমি পাঁজাকোলা করে নিয়ে যাচ্ছি।

—কি যা তা বলছেন!

—কেন, আমি পারব না ভেবেছেন? আমি কে তা জানেন? গগনচাঁদ চক্কর, গ্রেট মরাঠা সার্কাসের স্ট্রং ম্যান। না না, আমি মরাঠী নই, বাঙালী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, চক্রবর্তী পদবীটা ছেঁটে চক্কর করেছি। সম্প্রতি টাকার অভাবে সার্কাস বন্ধ ছিল, তাই এখানে আসবার ফুরসত পেয়েছি। আজ সকালে আমাদের ম্যানেজার সাপুরজীর চিঠি পেয়েছি—সব ঠিক হয়ে গেছে, দু হপ্তার মধ্যে তোমরা পুনায় চলে এস। জানেন,

আমার বুকের ওপর দিয়ে হাতি চলে যায়, দু হন্দর বারবেল আমি বনবন করে ঘোরাতে পারি। আপনার এই শিঙি মাছের মতন একরত্তি শরীর আমি বইতে পারব না?

—খবরদার, ও সব হবে না!

—কেন বলুন তো? আপনি কি ভেবেছেন আমি রাবণ আর আপনি সীতা, আপনাকে হরণ করতে এসেছি? আপনাকে আমি বয়ে নিয়ে গেলে আপনার কলঙ্ক হবে, লোকে ছি ছি করবে?

—আমার স্বামী পছন্দ করবেন না।

—কি অদ্ভুত কথা! অমন রামচন্দ্রী স্বামী জোটালেন কোথা থেকে? বিপদের সময় নাচার হয়ে আপনাকে যদি বয়ে নিয়ে যাই তাতে আপত্তির কি আছে? আপনার কর্তা বুঝি মনে করবেন আমার ওপর আপনার অনুরাগ জন্মেছে, আমার স্পর্শে আপনি পুলকিত হয়েছেন, এই তো? একবার ভাল করে আমার মুখখানা দেখুন তো, আকর্ষণের কিছু আছে কি?

পকেট থেকে প্রকাণ্ড টর্চ বার করে গগনচাঁদ নিজের শ্রীহীন মুখের ওপর আলো ফেললেন, তার পর বললেন, দেখুন, লোকে আমার মুখ দেখতে সার্কাসে আসে না, শুধু গায়ের জোরই দেখে। আমার এই চাঁদবদন দেখলে আপনার স্বামীর মনে কোনও সন্দেহই হবে না।

মনোলোভা বললেন, কেন তর্ক করে সময় নষ্ট করছেন। আপনার চেহারা সুশ্রী না হলেও লোকে দোষ ধরতে পারে।

—ও, বুঝেছি। আপনার চিত্তবিকার না হলেও আমার তো আপনার ওপর লোভ হতে পারে—এই না? নিশ্চয় আপনি নিজেকে খুব সুন্দরী মনে করেন। একদম ভুল ধারণা, মিস চমৎকুমারী ঘাপার্দের কাছে আপনি দাঁড়াতেই পারেন না।

—তিনি আবার কে?

গগনচাঁদ চক্কর তাঁর ফতুয়ার বোতাম খুললেন, আচকানেরও খুললেন, তার নীচে যে জামা ছিল, তাও খুললেন। তার পর মুখে একটি বিহ্বল ভাব এনে নিজের উন্মুক্ত লোমশ বুকে তিনবার চাপড় মারলেন।

মনোলোভা শুধু প্রশ্ন করলেন, আপনার প্রণয়িনী নাকি?

—শুধু প্রণয়িনী নয় মশাই, দস্তুরমত সহধর্মিণী। তিন মাস হল দুজনে বিবাহ-বন্ধনে জড়িত হয়ে দম্পতি হয়ে গেছি।

—তবে মিস চমৎকুমারী বললেন কেন? এখন তো তিনি শ্রীমতী চক্কর।

—আঃ, আপনি কিছুই বোঝেন না। মিস চমৎকুমারী ঘাপার্দে হল তাঁর স্টেজ নেম, আমেরিকান ফিল্ম অ্যাকট্রেসরা যেমন পঞ্চাশবার বিয়ে করেও নিজের কুমারী নামটাই বজায় রাখে, সেইরকম আর কি। চমৎকুমারী হচ্ছেন গ্রেট মারাঠা সার্কাসের লীডিং লেডি, বলবতী ললনা। যেমন রূপ, তেমনি বাহুবল, তেমনি গলার জোর। একটা প্রমাণ সাইজ গরু কিংবা গাধাকে টপ করে কাঁধে তুলে নিয়ে ছুটতে পারেন। আবার ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে এক পায়ে দাঁড়িয়ে একটা হাত কানে চেপে অন্য হাতে তম্বুরা নিয়ে ধ্রুপদ খেয়াল গাইতে পারেন। মহারাষ্ট্রী মহিলা, কিন্তু অনেক কাল কলকাতায় ছিলেন, চমৎকার বাঙলা বলেন। আপনার স্বামীর সঙ্গে তাঁর মোলাকাত করিয়ে দেব। চমৎকুমারীকে দেখলেই তিনি বুঝতে পারবেন যে আমার হৃদয় শক্ত খুঁটিতে বাঁধা আছে, তার আর নড়ন চড়ন নেই।

—আপনি আর দেরি করবেন না, দয়া করে মিস্টার দাসকে খবর দিন।

—কি কথাই বললেন! আমি চলে যাই, আপনি একলা পড়ে থাকুন, আর বাঘ কি হুড়ার কি লক্কড় এসে আপনাকে ভক্ষণ করুক। শুনতে পাচ্ছেন? ওই শেয়াল ডাকছে। আপনার হিতাহিত জ্ঞান এখন লোপ পেয়েছে, কোনও আপত্তিই আমি শুনবো না। চুপ, আর কথাটি নয়।

নিমেষের মধ্যে মনোলোভাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে গগনচাঁদ সবেগে চললেন। মনোলোভা ছটফট করতে লাগলেন। গগনচাঁদ বললেন, খবরদার হাত পা ছুড়বেন না, তা হলে পড়ে যাবেন, কোমর ভাঙবে, পাঁজরা ভাঙবে। এত আপত্তি কিসের? আমাকে কি অচ্ছুত হরিজন ভেবেছেন না সেকেলে বট্‌ঠাকুর ঠাউরেছেন যে ছুঁলেই আপনার ধর্মনাশ হবে? মনে মনে ধ্যান করুন—আপনি একটা দুরন্ত খুকী, রাস্তায় খেলতে খেলতে আছাড় খেয়েছেন, আর আমি আপনার স্নেহময়ী দিদিমা, কোলে করে তুলে নিয়ে যাচ্ছি।

আপত্তি নিষ্ফল জেনে মনোলোভা চুপ করে আড়ষ্ট হয়ে রইলেন। গগনচাঁদ হাতের মুঠোয় টর্চ টিপে পথে আলো ফেলতে ফেলতে চললেন।

বক্রেশ্বর দাস দুজনকে দেখে আশ্চর্য হয়ে বললেন, একি ব্যাপার? গগনচাঁদ বললেন, শোবার ঘর কোথায়? আগে আপনার স্ত্রীকে বিছানায় শুইয়ে দিই, তার পর সব বলছি। এই বুঝি আপনার চাকর? ওহে বাপু, শিগ্‌গির মালসা করে আগুন নিয়ে এস, তোমার মায়ের পায়ে সেক দিতে হবে।

মনোলোভাকে শুইয়ে গগনচাঁদ বললেন, মিস্টার দাস, আপনার স্ত্রী পড়ে গিয়েছিলেন, ডান পায়ের চেটো মচকে গেছে। চলবার শক্তি নেই, অথচ কিছুতেই আমার কথা শুনবেন না, কেবলই বলেন, লে আও পালকি, বোলাও দাস সাহেবকো। আমি জোর করে এঁকে তুলে নিয়ে এসেছি। অতি অবুঝ বদরাগী মহিলা, সমস্ত পথটা আমাকে যাচ্ছেতাই গালাগাল দিতে দিতে এসেছেন।

মনোলোভা অস্ফুট স্বরে বললেন, বাঃ, কই আবার দিলুম!

বক্রেশ্বর একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। এখন গরম হয়ে বললেন, তুমি লোকটা কে হে? ভদ্রনারীর ওপর জুলুম কর এতদূর আস্পর্ধা?

—অবাক করলেন মশাই! কোথায় একটু চা খেতে বলবেন, অন্তত কিঞ্চিৎ থ্যাংকস দেবেন, তা নয়, শুধুই ধমক!

—হু আর ইউ? কেন তুমি ওঁর গায়ে হাত দিতে গেলে?

—আরে মশাই, ওঁকে যদি নিয়ে না আসতুম তা হলে যে এতক্ষণ বাঘের পেটে হজম হয়ে যেতেন, আপনাকে যে আবার একটা গিন্নীর যোগাড় দেখতে হত।

—চোপরও বদমাশ কোথাকার। জান, আমি হচ্ছি, বক্রেশ্বর দাস আই. এ. এস., গুণ্ডা কন্ট্রোল অফিসার, এখনি তোমাকে পুলিসে হ্যাণ্ডওভার করতে পারি?

—তা করবেন বইকি। স্ত্রী যন্ত্রণায় ছটফট করছেন সেদিকে হুঁশ নেই, শুধু আমার ওপর তম্বি। মুখ সামলে কথা কইবেন মশাই, নইলে আমিও রেগে উঠব। এখন চললুম, নির্মল মুখুজ্যে ডাক্তারকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বক্রেশ্বর তেড়ে এসে গগনচাঁদের পিঠে হাত দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে বললেন, অভি নিকালো।

গগনচাঁদ বেগে চলতে লাগলেন, বক্রেশ্বর পিছু পিছু গেলেন। কিছুদূর গিয়ে গগনচাঁদ বললেন, লড়তে চান? আপনার স্ত্রী একটু সুস্থ হয়ে উঠুন তার পর লড়বেন। যদি সবুর করতে না পারেন তো কাল সকালে আসতে পারি।

বক্রেশ্বর বললেন, কাল কেন, এখনই তোকে শায়েস্তা করে দিচ্ছি। জানিস, আমি একজন মিড্‌লওয়েট চ্যাম্পিয়ন? এই নে, দেখি কেমন সামলাতে পারিস।

গগনচাঁদ ক্ষিপ্রগতিতে সরে গিয়ে ঘুষি থেকে আত্মরক্ষা করলেন এবং বক্রেশ্বরের পায়ের গুলিতে ছোট একটি লাথি মারলেন। সঙ্গে সঙ্গে বক্রেশ্বর ধরাশায়ী হলেন।

গগনচাঁদ বললেন, কি হল দাস মশাই, উঠতে পারছেন না? পা মচকে গেছে? বেশ যা হক, কর্তাগিন্নীর এক হাল। ভাববেন না, আপনাকে তুলে নিয়ে গিন্নীর পাশে শুইয়ে দিচ্ছি, তার পর ডাক্তার এসে চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে।

বক্রেশ্বর বললেন, ড্যাম ইউ, গেট আউট ইহাঁ সে।

—ও, আমার কোলে উঠবেন না? আচ্ছা চললুম, আর কাউকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বক্রেশ্বর বেশ শক্তিমান পুরুষ, ভাবতেই পারেন নি যে ওই বদমাস গুন্ডাটা তাঁর প্রচন্ড ঘুষি এড়িয়ে তাঁকেই কাবু করে দেবে। শুধু ডান পায়ের চেটো মচকায় নি, তাঁর কাঁধও একটু থেঁতলে গেছে। তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকতে লাগলেন, বৈকুণ্ঠ, ও বৈকুণ্ঠ।

প্রায় পনরো মিনিট বক্রেশ্বর অসহায় হয়ে পড়ে রইলেন। তার পর নারীকণ্ঠ কানে এল—অগ্‌গ বাঈ! হে কায়? কায় ঝালা তুম্‌হালা?—ওমা, এ কি? কি হয়েছে আপনার?

বক্রেশ্বর দেখলেন, কাছা দেওয়া লাল শাড়ি পরা মহিষমর্দিনী তুল্য একটি বিরাট মহিলা টর্চ হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। বক্রেশ্বর বললেন, উঃ বড্ড লেগেছে, ওঠবার শক্তি নেই। আপনি—আপনি কে?

—চিনবেন না। আমি হচ্ছি চমৎকুমারী ঘাপার্দে, গ্রেট মরাঠা সার্কসের বল্‌বতী ললনা।

—আপনি যদি দয়া করে ওই লালকুঠিতে গিয়ে আমার চাকর বৈকুণ্ঠকে পাঠিয়ে দেন—

—আপনার চাকর তো রোগা পটকা বুড়ো, আপনার এই দু-মনী লাশ সে বইতে পারবে কেন? ভাববেন না, আমিই আপনাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে যাচ্ছি।

—সেকি, আপনি?

—কেন, তাতে দোষ কি, বিপদের সময় সবই করতে হয়। ভাবছেন আমি অবলা নারী, পারব না? জানেন, আমি একটা পুরুষ্টু গাধাকে কাঁধে তুলে নিয়ে দৌড়ুতে পারি?

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বক্রেশ্বর ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। চমৎকুমারী খপ করে তাঁকে তুলে নিয়ে বললেন, ওকি, অমন কুঁকড়ে গেলেন কেন, লজ্জা কিসের? মনে করুন আমি আপনার মেশোমশাই, আপনি একটা পাজী ছোট ছেলে, আপনার চাইতেও পাজী আর একটা ছেলে লাথি মেরে আপনাকে ফেলে দিয়েছে, মেশোমশাই দেখতে পেয়ে কোলে তুলে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন।

চমৎকুমারী তাঁর বোঝা নিয়ে হনহন করে হেঁটে তিন মিনিটের মধ্যে লালকুঠিতে পৌঁছলেন এবং বিছানায় মনোলোভার পাশে ধপাস করে ফেলে বক্রেশ্বরকে শুইয়ে দিলেন। বক্রেশ্বর করুণ স্বরে বললেন, উহুহু বড্ড ব্যথা। জান মনু, হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলুম, ইনিই আমাকে বাঁচিয়েছেন, গ্রেট মরাঠা সার্কসের স্ট্রং লেডি মিস চমৎকুমারী ঘাপার্দে।

মনোলোভা অবাক হয়ে দু হাত তুলে নমস্কার করলেন।

নির্মল ডাক্তার তাঁর কম্পাউন্ডারকে নিয়ে এসে পড়লেন। স্বামী-স্ত্রীকে পরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন, ও কিছু নয়, দুজনেরই পায়ে একটু স্প্রেন হয়েছে। একটা লোশন দিচ্ছি, তাতেই সেরে যাবে। তিন-চার দিন চলাফেরা করবেন না, মাঝে মাঝে নুনের পুঁটলির সেক দেবেন। মিস্টার দাসের কাঁধে একটা ওষুধ লাগিয়ে ড্রেস করে দিচ্ছি।

যথাকর্তব্য করে ডাক্তার আর কম্পাউন্ডার চলে গেলেন। চমৎকুমারী বললেন, আপনাদের চাকর একা সামলাতে পারবে না, আমি আপনাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে তার পর যাব।

বক্রেশ্বর করজোড়ে বললেন, আপনি করুণাময়ী, যে উপকার করলেন তা জীবনে ভুলব না।

মনোলোভা মনে মনে বললেন, তা ভুলবে কেন, ওই গোদা হাতের জাপটানি যে প্রাণে সুড়সুড়ি দিয়েছে। যত দোষ বেচারা গগনচাঁদের।

বক্রেশ্বর বললেন, ডাক্তারবাবুর কাছে শুনলাম, আপনার স্বামী মিস্টার চক্করও এখানে আছেন। কাল বিকেলে আপনারা দুজনে দয়া করে এখানে যদি চা খান তো কৃতার্থ হব। আমার এক শালী কাছেই থাকেন, তাঁকে কাল আনাব, তিনিই সব ব্যবস্থা করবেন। আমার তো চলবার শক্তি নেই, নয়তো নিজে গিয়ে আপনাদের আসবার জন্যে বলতুম।

চমৎকুমারী বললেন, কাল যে আমরা তিন দিনের জন্যে রাঁচি যাচ্ছি। শনিবার ফিরব। রবিবার বিকালে আমাদের বাসায় একটা সামান্য টি-পার্টির ব্যবস্থা করেছি। চক্করের বন্ধু হোম মিনিস্টার শ্রীমহাবীর প্রসাদ, দুমকার ম্যাজিস্ট্রেট খাস্তগির সাহেব, গিরিডির মার্চেন্ট সর্দার গুরুমুখ সিং এঁরা সবাই আসবেন। আপনারা দুজনে দয়া করে এলে খুব খুশী হব। কোনোও কষ্ট হবে না, একটা গাড়ি পাঠিয়ে দেব। আসবেন তো?

বক্রেশ্বর বললেন, নিশ্চয় নিশ্চয়।

মনোলোভা মনে মনে বললেন, হেই মা কালী, রক্ষা কর।

১৮৮০ শক (১৯৫৮)

কর্দম মেখলা

পুষ্কর সরোবরের তীরে বিশ্বামিত্র আর মেনকা কাছাকাছি বসে আছেন। মেনকা তাঁর কেশপাশ আলুলায়িত করে কাঁকুই দিয়ে আঁচড়াচ্ছেন, বিশ্বামিত্র মুখ ফিরিয়ে আত্মচিন্তা করছেন।

অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর বিশ্বামিত্র কপাল কুঁচকে নাক ফুলিয়ে বললেন, মেনকা, তুমি সরে যাও, তোমার চুলের তেলচিটে গন্ধ আমি সইতে পারছি না।

ভ্রূভংগী করে মেনকা বললেন, তা এখন পারবে কেন। অথচ এই সেদিন পর্যন্ত আমার চুলের মধ্যে মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকতে। চুলে কি মাখি জান? মলয়গিরিজাত নারিকেল তৈলে পঞ্চাশ রকম গন্ধদ্রব্য ভিজিয়ে ধন্বন্তরী আমার জন্যে এই কেশ তৈল প্রস্তুত করেছেন। এর সৌরভে দেব দানব গন্ধর্ব মানব মুগ্ধ হয়, আর তোমার তা সহ্য হচ্ছে না! মুখ হাঁড়ি করে রয়েছ কেন, মনের কথা খুলেই বল না।

বিশ্বামিত্র বললেন, তুমি মূর্খ অপ্সরা, দ্রব্যগুণ কিছুই জান না। উত্তম গন্ধ-তৈলও আর্দ্রবায়ুর সংস্পর্শে বিকৃত হয়। স্ত্রীজাতির নাকের সাড় নেই, কিন্তু অন্য লোকে দুর্গন্ধ পায়।

—এতদিন তুমি দুর্গন্ধ পাও নি কেন?

—আমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল, লুব্ধ কুক্কুরের ন্যায় পূতিগন্ধকে দিব্য সৌরভ মনে করতাম, তোমার কুটিল কালসর্পসম বেণী কুসুমদাম বলে ভ্রম হত, তোমার ক্লিন্ন অশুচি দেহের স্পর্শে আমার আপাদমস্তক হর্ষিত হত। সেই কদর্য মোহ এখন অপসৃত হয়েছে। মেনকা, তোমাকে আমার প্রয়োজন নেই, তুমি চলে যাও।

মেনকা বললেন, ছ মাসেই প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল? আমি যখন প্রথম তোমার এই আশ্রমে এসেছিলাম তখন আমাকে দেখেই তুমি সংযম হারিয়ে তপস্যায় জলাঞ্জলি দিয়ে লোলুপ হয়েছিলে। আমি কিন্তু নিষ্কামভাবে নির্বিকার চিত্তে অপ্সরার কর্তব্য পালন করেছি, তোমার কুৎসিত জটাশ্মশ্রু আর লোমশ বক্ষের স্পর্শ, তোমার দেহের উৎকট শার্দুলগন্ধ সবই ঘৃণা দমন করে সয়েছি। ওহে ভূতপূর্ব কান্যকুব্জরাজ মহাবল বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠের গরু চুরি করতে গিয়ে তুমি সসৈন্যে মার খেয়েছিলে। তখন তুমি বিলাপ করেছিলে—ধিগ্ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলম্। তার পর তুমি ব্রহ্মর্ষি হবার জন্যে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হলে। কিন্তু ইন্দ্রের আদেশে যেমনি আমি তোমার কাছে এলাম তখনই তোমার মুণ্ড ঘুরে গেল, তপস্যা চুলোয় গেল, একটা অবলা অপ্সরার কাছেও আত্মরক্ষা করতে পারলে না। এখন হয়তো বুঝেছ যে, ব্রহ্ম-তেজের বলও অপ্সরার বলের কাছে তুচ্ছ, অনেক রাজর্ষি মহর্ষি ব্রহ্মর্ষি আমাদের পদানত হয়েছেন। যা বলি শোন—ব্রহ্মর্ষি হবার সঙ্কল্প ত্যাগ করে অপ্সরা হবার জন্যে তপস্যা কর।

বিশ্বামিত্র বললেন, কটুভাষিণী, তুমি দূর হও।

—তা হচ্ছি। আমার গর্ভে তোমার যে সন্তান আছে তার ব্যবস্থা কি করবে?

—স্বর্গবেশ্যার সন্তানের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। যা করবার তুমি করবে।

—তুমি তো মহা বেদজ্ঞ আর পুরাণজ্ঞ। এ কথা কি জান না যে অপ্সরা কদাপি সন্তান পালন করে না? আমরা প্রসব করেই সরে পড়ি, এই হল সনাতন রীতি। অপত্যপালন জন্মদাতারই কর্তব্য, গর্ভধারিণী অপ্সরার নয়।

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বিশ্বামিত্র বললেন, তুমি আমার তপস্যা পণ্ড করেছ, বুদ্ধি মোহগ্রস্ত করেছ, চরিত্র কলুষিত করেছ। পাপিষ্ঠা, দূর হও এখান থেকে, তোমার গর্ভস্থ পাপও তোমার সঙ্গে দূর হয়ে যাক।

পুষ্কর সরোবরের ধার থেকে খানিকটা কাদা তুলে নিয়ে মেনকা দুই হাতে তাল পাকাতে লাগলেন।

বিশ্বামিত্র প্রশ্ন করলেন, ও আবার কি হচ্ছে?

কাদার পিণ্ড পাকিয়ে সাপের মতন লম্বা করে মেনকা বললেন, রাজর্ষি বিশ্বামিত্র, তোমার সন্তান আমি চার মাস গর্ভে বহন করেছি, আরও প্রায় পাঁচ মাস বইতে হবে। তোমার কৃতকর্মের ফল শুধু আমিই বয়ে বেড়াব আর তুমি লঘুদেহে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করবে তা হতে পারে না। তোমাকেও ভার সইতে হবে। এই নাও।

মেনকা তাঁর হাতের লম্বা কাদার পিণ্ড সবেগে নিক্ষেপ করলেন। বিশ্বামিত্রের কটিদেশে তা মেখলার ন্যায় জড়িয়ে গেল।

চমকে উঠে মুখ বিকৃত করে বিশ্বামিত্র বললেন, আঃ! সেই কদর্য মেখলা টেনে খুলে ফেলবার জন্যে তিনি অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। তখন পুষ্করের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধুয়ে ফেলবার জন্যে দুই হাত দিয়ে ঘষতে লাগলেন, কিন্তু সেই কালসর্প তুল্য মেখলার ক্ষয় হল না, নাগপাশের ন্যায় বেষ্টন করে রইল।

হতাশ হয়ে বিশ্বামিত্র জল থেকে তীরে উঠে এলেন। মেনকাকে আর দেখতে পেলেন না।

বিশ্বামিত্র পুনর্বার তপস্যায় নিরত হবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু মনোনিবেশ করতে পারলেন না, কর্দম মেখলার নিরন্তর সংস্পর্শে তাঁর ধৈর্য নষ্ট হল, চিত্ত বিক্ষোভিত হল। তিনি আশ্রম ত্যাগ করে আকুল হয়ে পর্যটন করতে লাগলেন, হিমাচল থেকে দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত ভ্রমণ করলেন, নানা তীর্থসলিলে অবগাহন করলেন, কিন্তু মেখলা বিগলিত হল না। এই ভাবে সাড়ে পাঁচ বৎসর কেটে গেল।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন তিনি মালিনী নদীর তীরে উপস্থিত হলেন। নদীর কাকচক্ষু তুল্য নির্মল জল দেখে তাঁর মনে একটু আশার উদয় হল। উত্তরীয় তীরে রেখে বিশ্বামিত্র জলে নামলেন এবং অনেকক্ষণ প্রক্ষালন করলেন, কিন্তু তাঁর মেখলা পূর্ববৎ অক্ষয় হয়ে রইল। অবশেষে তিনি বিষণ্ণ মনে জল থেকে তীরে উঠতে গেলেন, কিন্তু পারলেন না, পাঁকের মধ্যে তাঁর দুই পা প্রায় হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল।

প্রাণভয়ে বিশ্বামিত্র চিৎকার করলেন। মালিনীর তটবর্তী বনভূমিতে তিনটি মেয়ে খেলা করছিল, একটির বয়স পাঁচ, আর দুটির সাত-আট। বিশ্বামিত্রের আর্তনাদ শুনে তারা ছুটে এল এবং নিজেরাও চিৎকার করে ডাকতে লাগল—ও পিসীমা, দৌড়ে এস, কে একজন ডুবে যাচ্ছে।

পিসীমা অর্থাৎ গৌতমী লম্বা আঁকশি দিয়ে একটি প্রকাণ্ড আম্রতক বৃক্ষ থেকে পাকা আমড়া পাড়ছিলেন। মেয়েদের ডাক শুনে ছুটে এলেন। নদীর ধারে এসে বিশ্বামিত্রকে বললেন, নড়বেন না, তা হলে আরও ডুবে যাবেন। এই আঁকশিটা বেশ

শক্ত, পাঁকের তলা পর্যন্ত পুঁতে দিচ্ছি, এইটেতে ভর দিয়ে স্থির হয়ে থাকুন। এই অনু আর প্রিয়, তোরা দুজনে দৌড়ে যা, আমি যে চাঁচাড়ির চাটাইএ শুই সেইটে নিয়ে আয়।

অনু আর প্রিয় অল্পক্ষণের মধ্যে ধরাধরি করে একটা চাটাই নিয়ে এল। গোতমী সেটা পাঁকের উপর বিছিয়ে দিয়ে বললেন, এইবারে আস্তে আস্তে পা তুলে চাটাই-এর উপর দিন, তাড়াতাড়ি করবেন না। আঁকশিটা পাঁক থেকে টেনে নিচ্ছি। এই এগিয়ে দিলাম, দু হাত দিয়ে ধরুন।

আঁকশির এক দিক বিশ্বামিত্র ধরলেন, অন্য দিকে গোতমী ধরে টানতে লাগলেন, মেয়েরা তাঁর কোমর ধরে রইল। বিশ্বামিত্র ধীরে ধীরে তীরে উঠে এসে বললেন, ভদ্রে, আপনি আমার প্রাণরক্ষা করেছেন। কে আপনি দয়াময়ী? এই দেবকন্যার ন্যায় বালিকারা কারা?

গোতমী বললেন, আমি মহর্ষি কণ্বের ভগিনী গোতমী। এই অনু আর প্রিয়— অনসূয়া আর প্রিয়ংবদা, এরা এই আশ্রমবাসী পিপ্পল আর শাল্মল ঋষির কন্যা। আর এই ছোটটি শকু—মহর্ষি কণ্বের পালিতা দুহিতা শকুন্তলা। আমার ভ্রাতার আশ্রম এই মালিনী নদীর তীরেই। সৌম্য, আপনি কে?

—আমি হতভাগ্য, বিশ্বামিত্র।

—বলেন কি, রাজর্ষি বিশ্বামিত্র! আপনার এমন দুর্দশা হল কেন?

অনু আর প্রিয় নাচতে নাচতে বলল, ওরে বিশ্বামিত্র মুনি এসেছে, শকুর বাবা এসেছে রে, এক্ষুনি শকুকে নিয়ে যাবে রে!

শকুন্তলা ভ্যাঁ করে কেঁদে গোতমীকে জড়িয়ে ধরল।

অনসূয়া আর প্রিয়ংবদাকে ধমক দিয়ে গোতমী বললেন, চুপ কর দুষ্টু মেয়েরা, কেন ছেলেমানুষকে ভয় দেখাচ্ছিস!

বিশ্বামিত্র বললেন, খুকী, তোমার বাবা কে তা জান?

শকুন্তলা বলল, আমার বাবা কণ্ব মুনি, আর মা এই পিসীমা।

অনসূয়া আর প্রিয়ংবদা আবার নাচতে নাচতে বলল, দূর বোকা, সব্বাই জানে আর তুই কিচ্ছু জানিস না। তোর বাবা এই বিশ্বমিত্র মুনি, আর মা—

গোতমী দুই মেয়ের পিঠে কিল মেরে বললেন, দূর হ এখান থেকে। এই রাজর্ষির পরিধেয় ভিজে গেছে, তোদের বাবার কাছ থেকে শুখনো কাপড় চেয়ে নিয়ে আয়। আর তোদের মাকে বল, অতিথি এসেছেন, আমাদের আশ্রমেই আহার করবেন।

বিশ্বামিত্র বললেন, বস্ত্রের প্রয়োজন নেই, আমার অধোবাস আপনিই শুখিয়ে যাবে, আর আমার উত্তরীয় শুষ্কই আছে। আপনি আহারের আয়োজন করবেন না, আমার ক্ষুধা নেই। দেবী গোতমী, এই বালিকাকে কোথায় পেলেন?

গোতমী নিম্নকণ্ঠে জনান্তিকে বললেন, মেনকা প্রসব করেই মালিনী নদীর তটে একে ফেলে চলে যায়। মহর্ষি কণ্ব স্নান করতে গিয়ে দেখেন, এক ঝাঁক হংস সারস চক্রবাকাদি শকুন্ত পক্ষ বিস্তার করে চারিদিকে ঘিরে সদ্যোজাত এই বালিকাকে রক্ষা করছে। দয়ার্দ্র হয়ে তিনি একে আশ্রমে নিয়ে আসেন। শকুন্ত কর্তৃক আরক্ষিতা, সেজন্য আমরা নাম দিয়েছি শকুন্তলা।

বিশ্বামিত্র বললেন, কন্যা, একবারটি আমার কোলে এস।

শকুন্তলা আবার কেঁদে উঠে বলল, না, যাব না, তুমি আমার বাবা নও, কণ্ব-মুনি আমার বাবা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিশ্বামিত্র বললেন, ঠিক কথা। আমি তোমার পিতা নই, মেনকাও তোমার মাতা নয়, যারা তোমাকে ত্যাগ করেছিল তাদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক নেই। যাঁরা তোমাকে আজন্ম পালন করেছেন তাঁদেরই তুমি কন্যা। খুকী, তুমি কি খেলনা চাও বল, রুপোর রাজহাঁস, সোনার হরিণ, পান্না-নীলার ময়ূর—

অনসূয়া ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, ভারী তো। আমাদের আসল হাঁস হরিণ ময়ূর আছে।

প্রিয়ংবদা বলল, আমাদের হাঁস প্যাঁক প্যাঁক করে, হরিণ লাফায়, ময়ূর নাচে। তোমার হাঁস হরিণ ময়ূর তা পারে?

বিশ্বামিত্র বললেন, না, শুধু ঝকমক করে। শকুন্তলা, তুমি আমার সঙ্গে চল। শত রাজকন্যা তোমার সখী হবে, সহস্র দাসী তোমার সেবা করবে, স্বর্ণমণ্ডিত গজ-দন্তের পর্যঙ্কে তুমি শোবে, দেবদুর্লভ অন্ন ব্যঞ্জন মিষ্টান্ন পায়স তুমি খাবে, মণিময় চত্বরে সখীদের সঙ্গে খেলা করবে। তোমাকে আমি সুবিশাল রাজ্যের অধিশ্বরী করে দেব।

গৌতমী বললেন, কি করে করবেন? আপনার কান্যকুব্জ রাজ্য তো পুত্রদের দান করে তপস্বী হয়েছেন।

—তুচ্ছ কান্যকুব্জ রাজ্য আমার পুত্ররাই ভোগ করুক, তা কেড়ে নিতে চাই না। বাহুবলে আর তপোবলে আমি সসাগরা ধরা জয় করে আমার কন্যাকে রাজরাজেশ্বরী করব। যত দিন কুমারী থাকে তত দিন আমিই এর প্রতিভূ হয়ে রাজ্যশাসন করব। তার পর অতুলনীয় রূপবান গুণবান বলবান বিদ্যাবান কোনও রাজা বা রাজপুত্রের হস্তে একে সম্প্রদান করে পুনর্বার তপস্যায় নিরত হব।

গৌতমী বললেন, কি বলিস শকু, যাবি এই রাজর্ষির সঙ্গে।

শকুন্তলা আবার কেঁদে উঠে বলল, না না, যাব না।

গৌতমী বললেন, রাজর্ষি বিশ্বামিত্র, জন্মের পূর্বেই যাকে বর্জন করেছিলেন তার প্রতি আবার আসক্তি কেন? আপনার সংযম কিছুমাত্র নেই। বশিষ্ঠের কামধেনুর লোভে আপনার ধর্মজ্ঞান লোপ পেয়েছিল, মেনকাকে দেখে আপনি উন্মত্ত হয়েছিলেন, এখন আবার তার কন্যাকে দেখে স্নেহে অভিভূত হয়েছেন। এই বালিকার কল্যাণই যদি আপনার অভীষ্ট হয় তবে একে আর উদ্বিগ্ন করছেন কেন, অব্যাহতি দিন, এর মায়া ত্যাগ করে প্রস্থান করুন।

বিশ্বামিত্র বললেন, শকুন্তলা, তোমার এই পিসীমাকে যদি সঙ্গে নিয়ে যাই তা হলে তুমি যাবে তো?

গৌতমী বললেন, কি যা তা বলছেন, আমি কেন আপনার সঙ্গে যাব?

—দেবী গৌতমী, আমি আপনার পাণিপ্রার্থী। আমাকে বিবাহ করে আপনি আমার কন্যার জননীর স্থান অধিকার করুন।

অনসূয়া আর প্রিয়ংবদা আবার নাচতে নাচতে বলল, পিসীমার বর এসেছে রে!

গৌতমী সরোষে বললেন, বিশ্বামিত্র, আপনি উন্মাদ হয়েছেন, আপনার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেয়েছে। আর প্রলাপ বকবেন না, চলে যান এখান থেকে।

বিশ্বামিত্র কাতর স্বরে বললেন, শকুন্তলা, একবার আমার কোলে এস, তার পরেই আমি চলে যাব।

বললেন, কন্যা, সুরাসুর যক্ষ রক্ষ তোমাকে রক্ষা করুন, বসুগণ তোমাকে বসুমতীর ন্যায় বিত্তবতী করুন, ধী শ্রী কীর্তি ধৃতি ক্ষমা তোমাতে অধিষ্ঠান করুন—

হঠাৎ শকুন্তলা লাফিয়ে উঠে বলল, ওরে পিসীমা রে!

ব্যাকুল হয়ে গৌতমী বলল, কি হল রে?

বিশ্বামিত্র উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর কর্দম মেখলা খসে গিয়ে মাটিতে পড়ে কিলবিল করতে লাগল।

প্রিয়ংবদা চিৎকার করে বলল, সাপ সাপ!

অনসূয়া বলল, ঢোঁড়া সাপ!

গৌতমী বললেন, জলডুণ্ডুভ। ওই দেখ, সড়সড় করে নদীতে নেমে যাচ্ছে।

বিশ্বামিত্র বললেন, সাপ নয়, মেনকার অভিশাপ, এতকাল পরে আমাকে নিষ্কৃতি দিয়েছে। কন্যা, তোমার পবিত্র স্পর্শে আমি শাপমুক্ত পাপমুক্ত সন্তাপমুক্ত হয়েছি। আশীর্বাদ করি, রাজেন্দ্রের রাজ্ঞী হও, রাজচক্রবর্তী সম্রাটের জননী হও। দেবী গৌতমী, আমি যাচ্ছি, আপনাদের মঙ্গল হক, আমার আগমনের স্মৃতি আপনাদের মন থেকে লুপ্ত হয়ে যাক।

১৮৮০ শক (১৯৫৮)

মাৎস্য ন্যায়

বাজারের সামনে দিবাকরের সঙ্গে তার এককালের সহপাঠী গণপতির দেখা হল। গণপতি বলল, কি খবর দিবু, আজকাল কি করছ? চেহারাটা খারাপ দেখছি কেন, কোনও অসুখ করেছে নাকি?

দিবাকর বলল, সিকি-পেটা খেলে চেহারা ভাল হতে পারে না। তিনটে ছেলেকে পড়িয়ে পঞ্চান্ন টাকা পাচ্ছি আর চাকরির খোঁজে ফ্যা ফ্যা করে বেড়াচ্ছি। নেহাত একটা বউ আছে, তিন বছরের একটা মেয়েও আছে, নয়তো সোজা পরলোকে গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতুম।

দিবাকরের বুকে একটা আঙুল ঠেকিয়ে গণপতি বলল, ভাল রোজগার চাও? ভাল ভাল জিনিস খেতে চাও? শৌখিন জামা কাপড় চাও?

—কে না চায়।

—দেদার ফুর্তি চাও? নারীমাংস চাও?

—নারী একটা আছে, কিন্তু মাংস নেই, শুধুই হাড়।

—কোনও চিন্তা নেই, সব ব্যবস্থা হবে। সাহস আছে? বীরভোগ্যা বসুন্ধরা জান তো? রিস্ক নিতে পারবে?

—টাকার যদি আশা থাকে তবে সাহসের অভাব হবে না, রিস্কও নিতে পারব। হেঁয়ালি ছেড়ে খোলসা করেই বল না। আমাকে করতে হবে কি? জুয়ো খেলতে বল নাকি?

—না। জুয়ো হল অকর্মণ্য বড়লোকের খেলা, তোমার মতন নিঃস্বের কর্ম নয়। বেশ ভেবে চিন্তে বল—বিবেকের উপদ্রব আছে? নরকের ভয়? মিছে কথা বলতে বাধে? এসব থাকলে কিছুই হবে না বাপু।

একটু ভেবে দিবাকর বলল, স্বর্গ নরক মানি না, তবে ধর্মভয় একটু আছে, চিরকালের সংস্কার কিনা। দরকার হলে অল্প স্বল্প মিছে কথাও বলি, প্র্যাকটিস করলে হয়তো অনর্গল বলতে পারব। দারিদ্র্য আর সইতে পারি না, এখন মরিয়া হয়ে উঠেছি। বাঁচতে চাই, তার জন্যে শয়তানের গোলাম হতেও রাজী আছি।

দিবাকরের হাত ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গণপতি বলল, ঠিক আছে। শুধু বাঁচলে চলবে না, জীবনটা পুরোপুরি ভোগ করতে হবে। আর একবার বল—বুকের পাটা আছে? বিপদকে অগ্রাহ্য করতে পারবে? ধর্মরূপী জুজুর ভয় ছাড়তে পারবে?

—সব পারব। কিন্তু তুমি তো শাস্ত্রচর্চা করে থাক, গীতাও আওড়াও, তোমার মুখে এসব কথা কেন?

—কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, সর্ব ধর্ম ত্যাগ করে আমার শরণ নাও, যুদ্ধে লেগে যাও। যদি জয়ী হও তো পৃথিবী ভোগ করবে, যদি মর তো স্বর্গলাভ করবে। আমিও তোমাকে সেই রকম উপদেশ দিচ্ছি—সব ছেড়ে দিয়ে আমার বশে চল। যদি জীবনযুদ্ধে জয়ী হও তবে সর্ব সুখ ভোগ করবে। আর যদি দৈবদুর্বিপাকে নিতান্তই হেরে গিয়ে জেলে যাও তবে বীরোচিত গতি লাভ করবে, তোমার দলের সবাই বাহবা দেবে। জেল থেকে ফিরে এসে পুনর্জন্ম পাবে, আবার উঠে পড়ে লাগবে। আজ

সন্ধ্যার সময় আমার বাসায় এসো, পাঁচ নম্বর শেওড়াতলা লেন। আমি তোমাকে দীক্ষা দেব, সকল অভাব দূর করব, সর্বপাপেভ্যো রক্ষা করব।

দিবাকর বলল, বেশ, আজ সন্ধ্যায় দেখা করব।

সন্ধ্যাবেলা দিবাকর পাঁচ নম্বর শেওড়াতলা লেনে উপস্থিত হল। গণপতি অবিবাহিত, একটা চাকর নিয়ে একাই আছে। কি একটা খবরের কাগজে কাজ করে, জমি বাড়ি আর পুরনো মোটরের দালালিও করে। তার বসবার ঘরে একটা তক্তপোশের উপর শতরঞ্জি পাতা, দুটো তাকিয়া আর কতকগুলো পত্র-পত্রিকা ছড়ানো। দেওয়ালে একটা র‍্যাকে কিছু বই আছে।

চাকরকে দু পেয়ালা চায়ের ফরমাশ দিয়ে গণপতি বলল, মাৎস্য সমাজের নাম শুনেছ? তোমাকে তার মেম্বার হতে হবে। ভয় নেই, প্রথম এক বৎসর চাঁদা দিতে হবে না।

দিবাকর বলল, মাৎস্য সমাজের কাজটা কি? ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে হয় নাকি? মৎস্য ধরিবে খাইবে সুখে—এই কি তোমার উপদেশ?

—সত্যিকারের মৎস্য নয়, মনুষ্যরূপী মৎস্যকে খাবলে খেতে হবে। মাৎস্য ন্যায় শুনেছ? মহাভারতে আছে—

নারাজকে জনপদে স্বকং ভবতি কস্যচিৎ।
মৎস্যা ইব জনা নিত্যং ভক্ষয়ন্তি পরস্পরম্॥

অর্থাৎ অরাজক জনপদে কারও নিজস্ব কিছু নেই, লোকে মৎস্যের ন্যায় সর্বদা পরস্পরকে ভক্ষণ করে। এদেশে অবশ্য ঠিক অরাজক অবস্থা এখনও হয় নি, তবে মাৎস্য ন্যায়ের সূত্রপাত হয়েছে, পরস্পর ভক্ষণের সুযোগ দিন দিন বাড়ছে। এখানে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বা হারুন-অল-রসিদের নির্মম দণ্ডবিধি নেই, কমিউনিস্ট বা ফাসিস্টদের দুর্দান্ত শাসনও নেই, পাঁচ ভূতের লীলাখেলা চলছে। এরই সুযোগ আমরা মাৎস্য সমাজীরা নিয়ে থাকি।

—মাৎস্য সমাজের তুমি একজন কর্তা ব্যক্তি নাকি?

—আমি একজন কর্মী, হাঁপানির বেয়ারাম আছে তাই হাতে কলমে কাজ করতে পারি না, মুখের কথায় যতটুকু সম্ভব করি। বড় বড় মাতব্বর লোক হচ্ছেন এর নির্বাহ-সমিতির সভ্য, সভাপতি, সচিব আর উপসচিব। তাঁরা আত্মপ্রকাশ করেন না, আড়ালে থাকেন। আমি হচ্ছি মাৎস্য সংস্কৃতির একজন ব্যাখ্যাতা আর প্রচারক। যারা আমাদের সমাজে ঢুকতে চায় তাদের আমি যাচাই করি, বাজিয়ে দেখি। যদি দীক্ষার উপযুক্ত মনে হয় তবে মাৎস্য সমাজের ফিলসফিও তাদের বুঝিয়ে দিই।

—ফিলসফিটা কি রকম?

—গোটা কতক মূল সূত্র বলছি শোন।—জোর যার মুলুক তার। উদ্যোগী পুরুষসিংহ অর্থাৎ যোগাড়ে গুণ্ডাকে লক্ষ্মী বরণ করেন—দু-চার জন রোগা-পটকা গুণ্ডা হাজার বলবান সজ্জনকে কাবু করতে পারে। দুর্জনরা একজোট হতে পারে কিন্তু সজ্জনরা পারে না, তারা কাপুরুষ, তাদের নীতি হচ্ছে, চাচা আপনা বাঁচা। মাৎস্য সমাজী জনসাধারণের উদ্দেশে বলে—মানতে হবে, মানতে হবে, কিন্তু নিজের বেলায় বলে—মানব না, মানব না। পাপ পুণ্য সব মিথ্যে, শুধু দেখতে হবে পুলিসে না ধরে, আর আত্মীয় বন্ধুরা বেশী না চটে।

—আমাকে নাস্তিক হতে হবে নাকি?

—তার দরকার নেই। ভক্তিতে গদ্‌গদ হয়ে যত খুশি গুরুভজন করতে পার। ভক্তিচর্চার সঙ্গে মাৎস্য ন্যায়ের বা চুরি ডাকাতি মাতলামি ব্যভিচার ইত্যাদির কোনও বিরোধ নেই।

—তোমার মাৎস্য ফিলসফিতে নতুন কিছু তো দেখছি না।

—আরও বলছি শোন। কলেজে তোমার তো অঙ্কে বেশ মাথা ছিল। সম্ভাবনা-গণিত অর্থাৎ প্রবাবিলিটি মনে আছে।

—কিছু কিছু আছে।

—কলকাতার রাস্তায় যত লোক চলে তাদের মধ্যে জন কতক প্রতি বৎসরে অপঘাতে মারা যায়। সেজন্যে পথে হাঁটা ছেড়ে দিয়েছ কি?

—তা কেন ছাড়ব। বেশীর ভাগ লোকেই তো নিরাপদে যাতায়াত করে, অতি অল্প লোকেই মরে। আমার মরবার সম্ভাবনা খুবই কম।

—ঠিক কথা। যারা হাঁটে তাদের তুলনায় যারা মোটর, রেলগাড়ি বা এয়ারোপ্লেনে চড়ে তাদের অপঘাতের হার ঢের বেশী। প্রাণের ভয়ে এই সব বর্জন করতে বল কি?

—কেন বলব। লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে হয়তো দু-চার জন মারা যায়, কিন্তু তাতে ভয় পেলে চলে না।

—উত্তম কথা। বিনা টিকিটে যারা রেলে যাতায়াত করে তাদের কত জনের সাজা হয় জান?

—হয়তো লাখে এক জন ধরা পড়ে, দণ্ড যা দিতে হয় তাও খুব বেশী নয়। কাগজে পড়েছি, গত বৎসরে সাড়ে চার হাজার বার অকারণে শিকল টেনে ট্রেন থামানো হয়েছিল, কিন্তু খুব অল্প লোকেরই বোধ হয় সাজা হয়েছে।

—অতি সত্য কথা। বিনা টিকিটে রেলে চড়া, শিকল টেনে গাড়ি থামানো, গার্ড আর স্টেশন মাস্টারকে ঠেঙানো খুব নিরাপদ কাজ, রিস্ক নগণ্য। পরীক্ষার প্রশ্ন পছন্দ না হলে ছাত্ররা দাঙ্গা করে, চেয়ার টেবিল ভাঙে। ফেল হলে মাস্টারকে ঠেঙায়। কত জনের সাজা হয়!

—বোধ হয় কারও হয় না।

—অর্থাৎ দাঙ্গা করা অতি নিরাপদ। ছেলেরা জানে তাদের পিছনে মা বাবা আছে, ঠাকুমা আছেন, হরেক রকম দেশনেতাও আছেন। মন্ত্রীরাও কিছু করতে ভয় পান। ছেলেরা হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণকথিত বটুক ভৈরব, কার সাধ্য তাদের শাসন করে।

—কিন্তু এসব কাজে লাভ কতটুকু হয়?

—বিনা টিকিটে রেলে চড়লে কিছু পয়সা বাঁচে। চেন টানলে, গার্ডকে মারলে বা স্কুল-কলেজে দাঙ্গা করলে আর্থিক লাভ হয় না, কিন্তু বাহাদুরি দেখানো হয়, সেটাই মস্ত লাভ। আইন লঙ্ঘনে একটা অনির্বচনীয় আত্মতৃপ্তি আছে। আর্থিক লাভের হিসেব যদি চাও তবে পকেটমারদের খতিয়ান দেখ। হাজার বার পকেট মারলে হয়তো এক বার ধরা পড়ে। একজনের না হয় সাজা হল, কিন্তু বাকী ন শ নিরেনব্বুই জন তো বেঁচে গেল, তারা ভয় পেয়ে তাদের পেশা ছাড়ে না।

—আমাকে পকেটমার হতে বলছ নাকি?

—না। এ কাজে রোজগার অবশ্য ভালই, কিন্তু ঝাঁকা-মুটে রিকশওয়ালা কিংবা পকেটমারের কাজ তোমার মতন ভদ্রলোকের উপযুক্ত নয়। দৈবাৎ যদি ধরা পড় তবে আত্মীয় স্বজনের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না, তোমার পক্ষে তা মৃত্যুর বেশী।

যারা খাবার জিনিসে বা ওষুধে ভেজাল দেয়, কালোবাজার চালায়, ট্যাক্স ফাঁকি দেয়, ঘুষ নেয়, মদ চোলাই করে, নোট বা পাসপোর্ট জাল করে, তবিল তসরুপ করে, তাদের অপরাধ গুরুতর, কিন্তু পকেটমারের চাইতে তারা ঢের বেশী রেস্পেক্টেব্ল গণ্য হয়।

—আমাকে কি করতে হবে তাই স্পষ্ট করে বল।

—মাৎস্য ফিলসফিটা আর একটু বুঝে নাও। নিরাপত্তার বিপরীত অনুপাতে লাভের সম্ভাবনা। ধরা পড়া আর শাস্তির সম্ভাবনা যত কম, লাভও তত কম। রিস্ক যত বেশী, লাভও তত বেশী। যে কাজে লাখে এক জন ধরা পড়ে তা প্রায় নিরাপদ, যেমন বিনা টিকিটে রেলে চড়া। সরকারী বিজ্ঞাপনে আছে, দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের প্রতি বৎসর ষাট লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়। তার মানে, এই টাকাটা যাত্রীদের পকেটে যায়। তবে মাথা পিছু লাভ অতি অল্প। যাতে দশ হাজারে এক জন ধরা পড়ে তাতেও রিস্ক বেশী নয়, লাভও মন্দ নয়, যেমন ঘুষ, ভেজাল, ট্যাক্স ফাঁকি। যাতে হাজারে এক জন ধরা পড়ে তাতে লাভ বেশ মোটা, যেমন মদ চোলাই, নোট জাল, ডাকাতি। আর যাতে শতকরা এক জন ধরা পড়ে তাতে প্রচুর লাভ, রিস্কও খুব, যেমন দলিল জাল, তবিল তসরুপ। অনেক ধুরন্ধর ব্যবসাদার এই কাজ করে ফেঁপে উঠেছেন, আবার কেউ কেউ ফাঁদেও পড়েছেন।

—সব তো বুঝলুম। এখন আমাকে করতে বল কি?

—একটু একটু করে ধাপে ধাপে সাধনা করতে হবে, ভয় ভাঙতে হবে। মুরুব্বী অর্থাৎ পৃষ্ঠপোষকও সংগ্রহ করা দরকার, যাঁরা বিপদে রক্ষা করবেন। তুমি দিন কতক বিনা টিকিটে রেলে যাতায়াত কর, মনে সাহস আসবে। সুবিধে পেলেই গার্ড আর স্টেশন মাস্টারকে ঠেঙাবে, অতি নিরাপদ কাজ। সরকার করুণ ভাষায় বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন—ভাইসব, ভাড়া না দিলে রেলগাড়ি চলবে কি করে? ও তো তোমাদেরই জিনিস। রেল-কর্মচারীরা নির্দোষ, তাদের মেরো না। এই মিনতিতে কেউ কর্ণপাত করে না। আরও শোন—বিক্ষোভ দেখাবার জন্যে যত সব প্রসেশন বেরয় তাতে যোগ দিয়ে স্লোগান আওড়াবে, সুবিধা হলে দাঙ্গা বাধাবে, ইট ছুড়বে। এর ফলে তুমি এক জন লোকসেবক কেষ্টবিষ্টু হয়ে উঠবে, গুণ্ডোচিত আত্মপ্রত্যয় লাভ করবে, প্রভাবশালী মুরুব্বীদের সুনজরে পড়বে।

—তাঁরা আমার কোন উপকারটা করবেন?

—কি না করবেন? যদি ইলেকশনে সাহায্য কর, তোমার চেষ্টার ফলে যদি তাঁরা কৃতকার্য হন তবে কেনা গোলাম হয়ে থাকবেন, পুলিসও তোমাকে খাতির করবে।

—সংসার চলবে কি করে?

—আপাতত তোমাকে একটা খয়রাতী কাজ জুটিয়ে দেব, দুঃস্থ লোকদের সাহায্য করতে হবে। বরাদ্দ টাকার সিকি ভাগ দান করবে, সিকি ভাগ আত্মসাৎ করবে আর বাকী টাকা মাৎস্য সমাজের ফণ্ডে জমা দেবে। এ কাজে রিস্ক কিছুই নেই। কালো-বাজার আর ঘুষের দালালিও উত্তম কাজ, তোমাকে তাও জুটিয়ে দেব। তার পর ভেজালওয়ালা আর চোলাইওয়ালাদের সঙ্গেও ভিড়িয়ে দেব। মনে বেশ সাহস এলে একটু আধটু দোকান লুট আর রাহাজানিও অভ্যাস করবে। তার পর তোমাকে আর শেখাবার দরকার হবে না, মাথা খুলে যাবে, বড় বড় অ্যাডভেঞ্চারে নামতে পারবে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দিবাকর বলল, রাজী আছি, আমাকে মাৎস্য সমাজের মেম্বার করে নাও।

গণপতি বলল, তোমার সম্মতি হয়েছে জেনে সুখী হলুম। খয়রাতী কাজটা দিন তিনেকের মধ্যে পেয়ে যাবে। আপাতত এই এক শ টাকা হাওলাত নাও, মাস দুই পরে শোধ দিলেই চলবে। কালীধন মণ্ডলের সঙ্গে তোমার আলাপ হওয়া দরকার, চৌকশ লোক, অনেক রকম মতলব আর সাহায্য তার কাছে পাবে। কাল সন্ধ্যাবেলা আবার এখানে এসো, কালীধনও আসবে।

দিবাকরের নূতন জীবন আরম্ভ হল, বিচিত্র অভিজ্ঞতাও হতে লাগল। প্রথম প্রথম একটু বুক ধড়ফড় করত, কিন্তু তার পর সয়ে গেল। বছর দুই ভালই চলল, তার পর কালীধন একদিন তাকে বলল, এ কিছুই হচ্ছে না দিবু-দা, যা বলি শোন। সমাজের সব চাইতে বড় শত্রু হল ধনীদের মেয়েরা, তাদের গহনা যোগাবার জন্যেই বড়লোকরা গরীবদের শোষণ করে। সেকরার দোকান হচ্ছে প্রলোভনের আড়ত, মেয়েদের মাথা খাবার আস্তানা। তাই আমাদের ধ্বংস করতে হবে।

দুদিন পরে সন্ধ্যার সময় খিদিরপুরে একটা গহনার দোকান লুট হল। লুটের মাল নিয়ে কালীধন পালাল, কিন্তু দিবাকর ধরা পড়ল। সাজা হল দু বছর জেল। তার মুরুব্বী বললেন, এহেহে, বড়ই কাঁচা কাজ করে ফেলেছ হে দিবাকর, এ বুদ্ধি তোমার কেন হল! ভেবো না, দু বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে, তার পর বেরিয়ে এসে নামটা বদলে ফেলবে আর খুব হুঁশিয়ার হয়ে চলবে।

দু বছর পরে দিবাকর যখন খালাস হয়ে ফিরে এল তখন তার বউ আর মেয়ে বেঁচে নেই, সে বন্ধনহীন দায়িত্বহীন মুক্তপুরুষ। নিজের নামটা বদলে সে রজনীকান্ত হল এবং অতিসতর্ক কঠোর সাধনার ফলে অল্প কালের মধ্যে মাৎস্য সমাজের শীর্ষে উঠল। এখন সে একজন রাঘব বোয়াল সামান্য লোকের মত তাকে 'সে' বলা চলবে না. 'তিনি' বলতে হবে।

শ্রীরজনীকান্ত চৌধুরী এখন স্বহস্তে কোনও তুচ্ছ কর্ম করেন না, চুরি ডাকাতি তবিল ভাঙা ইত্যাদির সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ নেই। গুণ্ডা বললে তাঁকে ছোট করা হয়। রাজার উপরে যেমন অধিরাজ, কর্তার উপরে যেমন অধিকর্তা, রজনীকান্ত তেমনি অধিগুণ্ডা, অর্থাৎ গুণ্ডাদের উপদেষ্টা নিয়ন্তা প্রতিপালক ও রক্ষক। ভূতপূর্ব গুরু গণপতি এখন তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী। এক কালে যাঁরা মুরুব্বী ছিলেন তাঁরাই এখন রজনীকান্তের সাহায্যের ভিখারী। তাঁর কৃপা না হলে ইলেকশনে জয়লাভ হয় না, উঁচুদরের দুষ্কর্ম নির্বিঘ্নে করা যায় না, আইনের জাল কেটে বেরিয়ে আসা যায় না। মিথ্যা প্রচারে কোন জননেতাই তাঁর কাছে দাঁড়াতে পারেন না। রাম যদি শ্যামকে খুন করে তবে শ্রীরজনীকান্ত অম্লান বদনে ঘোষণা করেন যে শ্যামই রামকে খুন করেছে। তিনি একটু অন্তরালে থাকলেও তাঁর মতন ক্ষমতাশালী লোক আর কেউ নেই। দেশনেতারা সকলেই নিজের নিজের দলে টানবার জন্যে তাঁকে সাধ্যসাধি করছেন।

১৮৮০ শক (১৯৫৮)

উৎকোচ তত্ত্ব

লোকনাথ পাল জেলা জজ, অতি ধর্মভীরু খুঁতখুঁতে লোক। তিনি সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকেন পাছে ধূর্ত লোকে তাঁকে দিয়ে কোনও অন্যায় কাজ করিয়ে নেয়। ছ মাস পরেই তাঁকে অবসর নিতে হবে, জজিয়তির শেষ পর্যন্ত যাতে দুর্নীতির লেশমাত্র তাঁকে স্পর্শ না করে সে সম্বন্ধে তিনি খুব সতর্ক। উৎকোচ তত্ত্ব বিষয়ক একটি গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা তাঁর আছে, সময় পেলেই তার জন্যে তিনি একটি খাতায় নোট লিখে রাখেন। আজ রবিবার, অবসর আছে। সকালবেলা একতলায় তাঁর অফিস-ঘরে বসে লোকনাথ নোট লিখছেন।—

কৌটিল্য বলেছেন, মাছ কখন জল খায় আর রাজপুরুষ কখন ঘুষ নেয়, তা জানা যায় না। কিন্তু একটি কথা তিনি বলেন নি—ঘুষগ্রাহী অনেক ক্ষেত্রে নিজেই বুঝতে পারে না যে সে ঘুষ নিচ্ছে। পাপ সব সময় স্থূলরূপে দৃষ্টিগোচর হয় না, অনেক সময় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে দেখা দেয়, তখন তার স্বরূপ চেনা বড়ই কঠিন। স্পষ্ট ঘুষ, প্রচ্ছন্ন ঘুষ আর নিষ্কাম উপহার—এদের প্রভেদ নির্ণয় সকল ক্ষেত্রে করা যায় না। মনে করুন, রামবাবু একজন উচ্চপদস্থ লোক, তাঁর অফিসে একটি ভাল চাকরি খালি আছে। যোগ্যতম প্রার্থীকেই মনোনীত করা তাঁর কর্তব্য। শ্যামবাবুর জামাই একজন প্রার্থী, যথানিয়মে দরখাস্ত করেছে। শ্যামবাবু রামবাবুকে বললেন, আপনার হাতেই তো সব, দয়া করে আমার জামাইকেই সিলেক্ট করবেন, হাজার টাকা দিচ্ছি, বাহাল হয়ে গেলে আরও হাজার দেব। এ হল অতি স্থূল ঘুষ, নির্লজ্জ পাকা ঘুষখোর কিংবা দুর্বলচিত্ত লোভী ভিন্ন কেউ নিতে রাজী হয় না। অথবা মনে করুন, রামবাবুর সঙ্গে শ্যামবাবুর ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। এক হাঁড়ি সন্দেশ এনে শ্যামবাবু বললেন, কাশী থেকে আমার মা এনেছেন, খেয়ো। আমার জামাইকে তো তুমি দেখেছ, অতি ভাল ছোকরা। তার দরখাস্তটা একটু বিবেচনা করে দেখো ভাই, তোমাকে আর বেশী কি বলব। এও স্থূল ঘুষ, যদিও পরিমাণে তুচ্ছ। কিন্তু ধরুন কোনও অনুরোধ না করে শ্যামবাবু এক গোছা গোলাপফুল দিয়ে বললেন, আমাদের মধুপুরের বাগানে হয়েছে। এ হল সূক্ষ্ম ঘুষ, এর ফল নিতান্ত অনিশ্চিত, তবে নিরাপদ জেনেই শ্যামবাবু দিতে সাহস করেছেন। আশা করেন এতেই রামবাবুর মন ভিজবে। আবার মনে করুন, রামবাবুর মেয়ের অসুখ, শ্যামবাবুর স্ত্রী এসে দিন রাত সেবা করলেন, অসুখও সারল। এক্ষেত্রে তাঁর স্ত্রীর সেবা অনুচ্চারিত অনুরোধ অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম ঘুষ হতে পারে, অথবা নিঃস্বার্থ পরোপকারও হতে পারে, স্থির করা সোজা নয়। রামবাবু যদি দৃঢ়চিত্ত সাধুপুরুষ হন তবে শ্যামের জামাই-এর প্রতি কিছুমাত্র পক্ষপাত করবেন না, তবে অন্যভাবে অবশ্যই কৃতজ্ঞতা জানাবেন। কিন্তু রামবাবু যদি বন্ধুবৎসল কোমলপ্রকৃতির লোক হন তবে শ্যাম-গৃহিণীর সেবা হয়তো জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁকে প্রভাবিত করবে। এ ছাড়া বাঙ্ময় ঘুষ আছে যার আর্থিক মূল্য নেই, অর্থাৎ খোশামোদ বা প্রশংসা। নিপুণভাবে প্রয়োগ করলে বুদ্ধিমান সাধুলোকও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়—

লোকনাথের নোট লেখায় বাধা পড়ল। দরজা ঠেলে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ঘরে এসে বললেন, কেমন আছ লোকনাথ বাবাজী, অনেক কাল তোমাদের দেখি নি। সেকি, চিনতে পারছ না? আরে আমি হলুম তোমাদের মোহিত পিশেমশাই, বেহালার মোহিত সমজদার। কই রে, পারুল কোথা আছিস, এদিকে আয় না মা।

হাঁকডাক শুনে লোকনাথ-গৃহিণী পারুলবালা এলেন। আগন্তুক লোকটিকে চিনতে তাঁরও কিছু দেরি হল। তার পর মনে পড়লে প্রণাম করে বললেন, মোহিত পিশেমশাই এসেছেন! উঃ কি ভাগ্যি!

অগত্যা লোকনাথও একটা নমস্কার করলেন।

মোহিত সমজদার হাঁক দিলেন, রামবচন, জিনিসগুলো এখানে নিয়ে আয় বাবা। মোহিতবাবুর অনুচর বাইরে অপেক্ষা করছিল, এখন ঘরে এসে মনিবের সামনে চারটে বাণ্ডিল রাখল।

একটা কার্ডবোর্ড বাক্স পারুলবালার হাতে দিয়ে মোহিতবাবু বললেন, আসল কাশ্মীরী শাল, তোর জন্যে এনেছি, দেখ তোর পছন্দ হয় কিনা।

শাল দেখে পারুলবালা আহ্লাদে গদ্‌গদ হয়ে বললেন, চমৎকার, অতি সুন্দর।

মোহিতবাবু বললেন, লোকনাথ বাবাজী, তোমার তো কোনও শখই নেই, শুধু বই আর বই। তাই একটা ওআলনট কাঠের কিতাব-দান মানে বুক র‍্যাক এনেছি। আর এই বাক্সটায় কয়েক গজ কাশ্মীরী তাফতা আছে, একটা শাড়ি আর গোটা দুই ব্লাউজ হতে পারবে। আর এই চুবড়িটায় কিছু মেওয়া আছে, পেস্তা বাদাম আখরোট কিশমিশ মনাক্কা এই সব।

কুণ্ঠিত হয়ে লোকনাথ বললেন, আহা কেন এত সব এনেছেন, এ যে বিস্তর টাকার জিনিস। না না, এসব দেবেন না।

মোহিতবাবু বললেন, আরে খরচ করলেই তো টাকা সার্থক হয়। তোমরা আমার স্নেহপাত্র, তোমাদের দিয়ে যদি আমার তৃপ্তি হয় তবে দেব না কেন, তোমরাই বা নেবে না কেন?

পারুলবালা বললেন, নেব বইকি পিসেমশাই, আপনার স্নেহের দান মাথায় করে নেব। তার পর, এখন কোথা থেকে আসা হল? দিল্লি থেকে? পিসীমাকে আনলেন না কেন? তিনি আর ছেলেমেয়েরা সব ভাল আছেন তো?

—সব ভাল। তাদের একদিন নিশ্চয় আনব। অনেক কাল পরে কলকাতায় এলুম, বেহালার বাড়িখানা যাচ্ছেতাই নোঙরা করে রেখেছে। একটু গোছানো হয়ে যাক তার পর তোর পিসীকে নিয়ে একদিন আসব। নানানানানা, চা-টা কিচ্ছু নয়, আমার এখন মরবার ফুরসত নেই, নানা জায়গায় ঘুরতে হবে। আজ চললুম। ঝড়ের মতন এলুম আর গেলুম, তাই না? কিছু মনে করো না তোমরা, সুবিধে মতন আবার একদিন আসব।

পারুলবালাকে প্রশ্ন করে লোকনাথ জানলেন, মোহিতবাবু তাঁর আসল পিসে নয়, পিসের ভাই। ছেলেবেলায় তাঁর বাপের বাড়িতে আসল পিসের সঙ্গে তাঁর এই ভাইও মাঝে মাঝে আসতেন, সেই সূত্রে পরিচয়। তার পর কালে ভদ্রে তাঁর দেখা পাওয়া যেত। মোহিতবাবু নানা রকম কারবার ফেঁদেছিলেন। কোনওটারই এখন অস্তিত্ব নেই, কিন্তু সেজন্যে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন মনে হয় না। তাঁর অবস্থা

ভালই, বড় বড় লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে। এখন তিনি কি করেন জানা নেই।

লোকনাথ তাঁর অফিসঘরে বসে ভাবতে লাগলেন। মামার শালা পিসের ভাই, তার সঙ্গে সম্পর্ক নাই। মোহিতবাবুর স্নেহ হঠাৎ উথলে উঠল কেন? বহুকাল আগে লোকনাথ তাঁর শ্বশুরবাড়িতে এই কৃত্রিম পিসেমশাইটিকে দেখে থাকবেন, কিন্তু এখন মনে পড়ে না। আপাতত মোহিতবাবুর কোনও দোষও ধরা যায় না, তিনি বহুমূল্য উপহার দিয়েছেন কিন্তু কিছুই চান নি। হয়তো দিন দুই পরেই একটা অন্যায় অনুরোধ করে বসবেন।

লোকনাথ তাঁর পত্নীকে বললেন, দেখ, তোমার পিসেমশাই-এর জিনিসগুলো এখন তুলে রাখ, হয়তো ফেরত দিতে হবে। ওই সব দামী দামী উপহারের জন্যে অস্বস্তি বোধ করছি, তাঁর মতলব বুঝতে পারছি না।

পারুলবালা বললেন মতলব আবার কি, আমাদের ভালবাসেন তাই দিয়েছেন।

—উনি তোমার আত্মীয় নন, ও'র নিজের ছেলেমেয়েও আছে, তবে হঠাৎ আমাদের ওপর এত স্নেহ হল কেন?

—খুঁত ধরা তোমার স্বভাব। থাকলই বা নিজের ছেলেমেয়ে, পরের ওপর কি টান হতে নেই? পিসেমশাই বড়লোক, উঁচু নজর, তিনি দামী জিনিস উপহার দেবেন তাতে ভাববার কি আছে? তোমাকে তো ঘুষ দেন নি।

—যাই হক, তুমি এখন ওগুলো ব্যবহার করো না।

পারুলবালা গরম হয়ে বললেন, কেন করব না? এমন জিনিস তুমি কোনও দিন আমাকে দিয়েছ, না তুমি তার কদর জান? পিসেমশাই যদি ভালবেসে দিয়ে থাকেন তবে তুমি বাদ সাধবে কেন? আর, দামী জিনিস তোমাকে তো দেন নি, আমাকে দিয়েছেন। তুমি যে কাঠের র‍্যাকটা পেয়েছ সেটা না হয় ফেরত দিও।

লোকনাথ চুপ করে গেলেন।

দু দিন পরে মোহিতবাবু আবার এলেন। সঙ্গে তাঁর পত্নী আসেন নি, একজন অচেনা ভদ্রলোক এসেছেন।

মোহিতবাবু বললেন, বাড়ির সব ভাল তো লোকনাথ? ইনি হচ্ছেন শ্রীগিরধারী-লাল পাচাড়ী মস্ত কারবারী লোক, আমার বিশিষ্ট বন্ধু। ইনি একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন।

লোকনাথ ভাবলেন, এইবারে পিসের গোপন কথাটি প্রকাশ পাবে। জিজ্ঞাসা করলেন, কি প্রস্তাব?

—আচ্ছা বাবাজী, তোমার সার্ভিস শেষ হতে আর কত দেরি?

—এখন এক্সটেনশনে আছি, ছ মাস পরেই শেষ হবে।

—তার পর কি করবে স্থির করেছ?

—কিছুই করব না, লেখাপড়া নিয়ে থাকব।

হাত নেড়ে মোহিতবাবু বললেন, নানানানানা, বসে থাকা ঠিক নয়। তোমার শরীর ভালই আছে, মোটেই বুড়ো হও নি, তবে রোজগার করবে না কেন? শাস্ত্রে বলে অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ। তুমি হচ্ছ প্রাজ্ঞ লোক, অর্থ উপার্জনের সঙ্গেই বিদ্যাচর্চা করবে। যা বলছি বেশ করে বিবেচনা করে দেখ বাবাজী।

মোহিতবাবু তাঁর মাথাটি এগিয়ে দিয়ে বিশ্বস্তভাবে নিম্নকণ্ঠে বললেন, এই গিরধারীলাল পাচাড়ীজী হচ্ছেন সিকিম স্টেটের মস্ত বড় কনট্রাক্টার। পশম কম্বল কাঠ মৃগনাভি বড়-এলাচ চিরেতা মাখন ঘিএই সব জিনিস ওখান থেকে এদিকে চালান দেন, আবার সুতী কাপড় চাল গম তেল চিনি নুন কেরোসিন প্রভৃতি ওখানে সপ্লাই করেন। সিকিমের আমদানি রপ্তানি এঁরই হাতে, মহারাজও এঁকে খুব খাতির করেন, নানা বিষয়ে পরামর্শ নেন। মহারাজ এঁকে বলেছেন—বলুন না গিরধারীবাবু, নিজেই বলুন না।

গিরধারী বললেন, শুনুন হুজুর। মহারাজ তার বড় আদালতের জন্যে একজন চীফ জজ চান। ওখানকার লোকদের ওপর তাঁর বিশ্বাস নেই, মনে করেন সবাই ঘুষখোর। ভাল লোকের খোঁজ নেবার ভার আমাকেই দিয়েছেন, তাই আমি মোহিত-বাবুকে ধরেছিলাম। এঁর কাছে শুনেছি আপনিই উপযুক্ত লোক, যেমন বিদ্বান বুদ্ধিমান তেমনি ইমানদার সাধুপুরুষ।

লোকনাথ বললেন, জজের দরকার থাকে তো সিকিম সরকার ভারত সরকারকে লিখলেন না কেন।

মোহিতবাবু বললেন, লিখবেন লিখবেন। মহারাজ নিজে লোক স্থির করবেন তার পর ইন্ডিয়া গভরমেন্টকে লিখবেন, অমুককে আমার পছন্দ, তাঁকেই পাঠানো হক। কোনও বাজে লোক দিল্লি থেকে আসে তা তিনি চান না। খুব ভাল পোস্ট, দশ বছরের জন্যে পাকা। এখানকার হাইকোর্ট জজের চাইতে বেশী মাইনে, চমৎকার ফ্রী কোআর্টার্স ফ্রী মোটরকার, আরও নানা সুবিধে। তুমি যদি রাজী হও তবে গিরধারীজী নিজে গিয়ে মহারাজকে বলবেন।

লোকনাথ বললেন, আমি না ভেবে বলতে পারি না।

—ঠিক কথা, ভাববে বইকি। বেশ করে বিবেচনা করে দেখ, পারুলের সঙ্গেও পরামর্শ কর, অতি বুদ্ধিমতী মেয়ে। কিন্তু বেশী দেরি করো না, মহারাজ তাড়া-তাড়ি ব্যাপারটা সেট্‌ল করতে চান, ইনি আবার চায়না জাপান বেড়াতে যাবেন কিনা। দিন কতক পরে আবার দেখা করব।

লোকনাথের অস্বস্তি বেড়ে উঠল, তিনি আবার ভাবতে লাগলেন। এই পিসে-মশাইটি অদ্ভুত লোক, কেবল অনুগ্রহই করছেন, এখন পর্যন্ত প্রতিদান কিছুই চাইলেন না। দেখা যাক, আবার যেদিন আসবেন সেদিন তাঁর ঝুলি থেকে বেরাল বার হয় কিনা।

দু সপ্তাহ পরে মোহিতবাবু একাই এলেন। এসেই ম্লান মুখে বললেন, গিরধারীলালজী আসতে পারলেন না, তাঁর মনটা বড়ই খারাপ হয়ে আছে।

—কি হয়েছে?

—আর বল কেন, ভদ্রলোক মহা ফেসাদে পড়েছেন। তাঁর মেয়ের সম্বন্ধ পাকা হয়ে আছে, রামশরণ পোদ্দারের ছেলে শিবশরণের সঙ্গে। কিন্তু শিবশরণের মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলছে, এখন বেলে খালাস আছে। ছোকরা এদিকে ভালই, তবে বড়-লোকের ছেলে, কুসঙ্গে পড়ে একটু চরিত্রদোষ ঘটেছিল। ব্যাপারটা কাগজে পড়ে থাকবে, প্রায় আট মাস আগেকার ঘটনা। তবলাওয়ালা লেনে তিতলীবাঈ নাচওআলী থাকত, তার কাছে শিবশরণ যেত, তার দু চারজন বন্ধুও যেত। দুপুর রাতে তিতলী

যখন বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছিল তখন কোনও লোক তার পিঠে ছোরা মেরে পালিয়ে যায়। তিতলী বেঁচে আছে, কিন্তু খুবই জখম হয়েছে। পুলিস শিবশরণকেই সন্দেহ করে চালান দেয়। আমাদের সকলেরই আশা ছিল যে শিবশরণ খালাস পাবে, কিন্তু সম্প্রতি ম্যাজিস্ট্রেট তাকে দায়রা সোপর্দ করেছেন। ভাবী জামাই-এর এই বিপদে গিরধারীলাল পাচাড়ী অত্যন্ত দমে গেছেন, তাঁর মেয়েও কান্নাকাটি করছে। তবে আমি বেশ ভালই জানি যে ছোকরা একেবারে নির্দোষ, তার কোনও বন্ধুই এই কাজ করে সরে পড়েছে।

লোকনাথের মুখ লাল হল। বললেন, দেখুন, এ সম্বন্ধে আমাকে আর কোনও কথা বলবেন না। সেসন্সে আমার কোর্টেই কেসটা আসবে।

প্রকাণ্ড জিব কেটে মোহিতবাবু বললেন, অ্যাঁ, তাই নাকি? নানানানানা, তা হলে তোমাকে আর কিছুই বলা চলবে না। তবে গিরধারীর জন্যে আমারও মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে। আচ্ছা, মকদ্দমাটা ভালয় ভালয় চুকে যাক, শিবশরণ খালাস পেলেই গিরধারীবাবু নিশ্চিন্ত হয়ে সিকিম রওনা হবেন। ব'সো বাবাজী, চললুম।

পাঁচ দিন পরে লোকনাথ তাঁর অফিস-ঘরে বসে কাগজ পড়ছেন, হঠাৎ গিরধারী-লাল পাচাড়ী স্মিতমুখে এসে বললেন, নমস্কার হুজুর।

লোকনাথ বিরক্ত হয়ে বললেন, দেখুন পাচাড়ীজী, সেদিন মোহিতবাবুর কাছে যা শুনেছি তার পর আপনার সঙ্গে আমি আর কোনও কথা বলতে চাই না। আপনি এখন যান।

গিরধারীলাল হাত নেড়ে বললেন, আরে রাম রাম, সেসব কথা আপনি একদম ভুলে যান। রামশরণ আমার কেউ নয়, তার বেটা শিউশরণও কেউ নয়। সে খালাস পাবে কি না পাবে, তাতে আমার কি।

—কেন, সে তো আপনার ভাবী জামাই।

—থুঃ। আমার বেটী বলেছে, ওই লুচ্চা খুনী আসামীকে সে কিছুতেই বিয়া করবে না। এখন হুজুর যদি তাকে ফাঁসিতে লটকে দেন তাতে আমার কোনও ওজর নেই।

লোকনাথ বললেন, ওই কেস আমার কোর্টে আসবে না, অন্য জজের এজলাসে যাবে। আপনাদের প্রস্তাবের পর আমি আর এই মামলার বিচার করতে পারি না।

—বড় আফসোসের কথা। বদমাশটাকে হুজুর যদি কড়া সাজা দিতেন তো বড় ভাল হত। অচ্ছা, ভগবান সব কুছ মঙ্গলের জন্যেই করেন। তবে আমার বড়ই নুকসান হল, শিউশরণকে সোনার ঘড়ি, হীরা বসানো কোটের বোতাম, আঙটি এইসব দিয়েছিলাম, তা আর ফেরত দেবে না বলেছে। হুজুর যদি ওকে দশ বছর কয়েদ দিতেন তো ঠিক সাজা হত। ওই মোহিতবাবুর মারফত আরও কিছু খরচ হয়ে গেল।

—আমাকে যে সব উপহার দিয়েছিলেন তারই জন্যে তো?

—হেঁ হেঁ, যেতে দিন, যেতে দিন।

—বলুন না, আপনার কত খরচ পড়েছিল?

গিরধারীলাল তাঁর নোটবুক দেখে বললেন, দুটো শাল এগার শ টাকা, তাফতা দেড় শ টাকা, কিতাবদান পঁয়তাল্লিশ টাকা, মেওয়া ছত্রিশ টাকা, ট্যাক্সি ওগয়রহ ষোল টাকা, মোট তেরো শ সাতচল্লিশ টাকা।

আশ্চর্য হয়ে লোকনাথ বললেন, শাল তো একখানা ছিল।

—বলেন কি! একটা আপনার আর একটা শ্রীমতীজীর জন্যে কিনবার কথা। ওই শালা মোহিতবাবু একটা শালের দাম চুরি করেছে। দেখে নেবেন, আমি ওর গলায় পা দিয়ে সাড়ে পাঁচ শ টাকা আদায় করে নেব। আমার সঙ্গে বেইমানি চলবে না। জরুর আদায় করব।

—তা করবেন। বাকী সাত শ সাতানব্বই টাকার একটা চেক আমি আপনাকে দিচ্ছি, আমার জন্যে আপনার লোকসান হবে না। একটা রসিদ লিখে দিন।

গিরধারীলাল যুক্ত কর কপালে ঠেকিয়ে বললেন, ও হোহোহো, হুজুর একদম সচ্চা সাধু মহাৎমা আছেন, খুদ ভগবান আছেন, আপনার দয়া ভুলব না।

—সিকিমের চাকরিটাও চাই না।

গিরধারীলাল পাচাড়ী সলজ্জ প্রসন্ন মুখে দন্তবিকাশ করে বললেন, হেঁহেঁহেঁ।

চেক নিয়ে পাচাড়ীজী প্রস্থান করলেন। লোকনাথের গ্লানি দূর হল, তিনি সোৎসাহে উৎকোচ তত্ত্ব রচনায় মনোনিবেশ করলেন।

১৮৮০ শক (১৯৫৮)

প্রাচীন কথা

[এই সব ঘটনার ৭০-৮০% সত্য, ২০-৩০% মিথ্যা, অর্থাৎ স্মৃতিকথায় যতটা ভেজাল দেওয়া দস্তুর তার চাইতে বেশী নেই। নাম সবই কাল্পনিক]

১। বনোয়ারী বাবু

স্থান—উত্তর বিহারের একটি ছোট শহর। কাল—প্রায় সত্তর বৎসর আগে। বেলা তিনটে, আমাদের মিড্‌ল ইংলিশ অর্থাৎ মাইনর স্কুলের থার্ড ক্লাসে পাটীগণিত পড়ানো হচ্ছে। ক্লাসের ছেলেরা উসখুস ফিসফিস করছে দেখে বিধু মাস্টার বললেন, কি হয়েছে রে?

তখন শিক্ষককে সার বলা রীতি ছিল না, মাস্টার মশাই বলা হত। আমাদের মুখপাত্র কেষ্ট বলল, এইবার ছুটি দিন মাস্টার মশাই, সবাই চাদরাবাগ যাব।

—সেখানে কিজন্যে যাবি?

—কলকাতা থেকে একজন বাবু এসেছেন, তাঁর দাড়ি গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা। তাই আমরা দেখতে যাব। হেঁই মাস্টার মশাই ছুটি দিন।

—চারটের সময় ছুটি হলে তার পরে তো যেতে পারিস।

—অনেক দূর যেতে হবে, বেলা হয়ে যাবে। শুনেছি রোজ বিকেলে তিনি রায়-সাহেবদের বাড়ি দাবা খেলতে যান। দেরি করে গেলে দেখা হবে না।

বিধু মাস্টার বললেন, বেশ, সাড়ে তিনটেয় ছুটি দেব। আমিও তোদের সঙ্গে যাব। দাড়িবাবুর কথা শুনেছি বটে।

চাদরাবাগ অনেক দূর, আমরা প্রায় সাড়ে চারটের সময় বিভূতিবাবুর বাড়ি পেঁছুলাম. দাড়িবাবু সেখানেই উঠেছেন। বারান্দায় একটা দড়ির খাটিয়ায় বসে তিনি হুঁকো টানছিলেন। আমাদের দলটিকে দেখে তাঁর বোধহয় একটু আমোদ হল, নিবিড় কালো দাড়ি-গোঁফের তিমির ভেদ করে সাদা দাঁতে একটু হাসির ঝিলিক ফুটে উঠল। সেকালে ব্রাহ্মরা প্রায় সকলেই দাড়ি রাখতেন, অব্রাহ্মদেরও অনেকের বড় বড় দাড়ি ছিল। কিন্তু সেসব দাড়ি এই নবাগত ভদ্রলোকের দাড়ির কাছে দাঁড়াতেই পারে না।

বিধু মাস্টার নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, এই ছেলেরা আপনাকে দেখতে এসেছে মশাই, কিছুতেই ছাড়বে না, তাই আধ ঘণ্টা আগেই ক্লাস বন্ধ করতে হল।

দাড়িধারী ভদ্রলোকের নাম বনোয়ারী বাবু। তিনি প্রসন্ন বদনে বললেন, বেশ বেশ, দেখবে বইকি, দেখাবার জন্যেই তো রেখেছি। যত ইচ্ছে হয় দেখ বাবারা,, পয়সা দিতে হবে না।

দাড়িটি বনোয়ারী বাবুর গলায় কম্ফর্টরের মতন জড়ানো ছিল. এখন তিনি দাঁড়িয়ে উঠে আলুলায়িত করলেন। হাঁটুর নীচে পর্যন্ত ঝুলে পড়ল।

সবিস্ময়ে আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে আমরা একযোগে বলে উঠলুম. উ রে বাবা! বনোয়ারী বাবু বললেন, কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কি? টেনে দেখতে পার, আমার

দাড়ি যাত্রার দলের মুনি-ঋষিদের মতন চৌরিটিবাজারের নকল দাড়ি নয়। এই বলে তিনি দাড়ি ধরে বারকতক হেঁচকা টান দিলেন।

বিধু মাস্টার বললেন, আচ্ছা বনোয়ারী বাবু, আপনার দাড়ির বর্তমান ঝুল কত? সাড়ে তিন ফুট হবে কি?

থুতনি থেকে পাক্কা বিশ গিরে, মানে পৌনে চার ফুট। পরশু আবদুল দরজী ফিতে দিয়ে মেপেছিল, তার ইচ্ছে একটা মলমলের খোল করে দেয়, যাতে দাড়িতে গরদা না লাগে। আমি তাতে রাজী হই নি।

—এতখানি গজাতে ক বছর লেগেছে?

—তা প্রায় দশ বছর। চব্বিশ বছর বয়সে কামানো বন্ধ করেছিলুম, এখন বয়স হল চৌত্রিশ।

বিধু মাস্টার তাঁর ক্লাসের উপযুক্ত গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলেন, এই ছেলেরা, চব্বিশ থেকে চৌত্রিশ বছর বয়সে দাড়ি যদি পৌনে চার ফুট হয় তবে চুয়াল্লিশ বছর বয়সে কত হবে?

ছেলেদের ঠোঁট নড়তে লাগল, বিড়বিড় শব্দ করে তারা মানসাঙ্ক কষছে। অঙ্কে আমার খুব মাথা ছিল, সকলের আগেই বললুম, সাড়ে সাত ফুট মাস্টার মশাই।

বিধু মাস্টার বললেন, করেক্ট। আচ্ছা বনোয়ারী বাবু, দশ বছর পরে সাড় সাত ফুট দাড়ি হলে আপনি সামলাবেন কি করে?

বনোয়ারী বাবু সহাস্যে বললেন, তা তো ভাবি নি, তখন যা হয় করা যাবে, না হয় কিছু ছেঁটে ফেলব।

আমাদের দলের মধ্যে সব চেয়ে সপ্রতিভ ছেলে কেষ্ট। সে বলল, না না ছাঁটবেন না, কানের পাশ দিয়ে তুলে মাথায় পাগড়ির মতন জড়ালে বেশ হবে।

বনোয়ারী বাবু বললেন, ঠিক বলেছ হে ছোকরা, পাগড়িই বাঁধব, পশমী শালের চাইতে গরম হবে।

একটু আমতা আমতা করে বিধু মাস্টার বললেন, কিছু মনে করবেন না বনোয়ারী বাবু, ইয়ে, একটা প্রশ্ন করছি। আপনি কি বিবাহিত?

—অভ কোর্স। হোআই নট?

—তা হলে, তা হলে—

—আমার স্ত্রী এই দাড়ি বরদাস্ত করেন কি করে—এই তো আপনার প্রবলেম? চিন্তার কারণ নেই মাস্টার মশাই। তিনি প্রসন্ন মনেই মেনে নিয়েছেন, মিউচুয়াল টলারেশন, বুঝলেন কিনা। তাঁরও তো ফুট তিনেক আছে।

বিধু মাস্টার আঁতকে উঠে বললেন, কি সর্বনাশ!

—তাঁরটা দাড়ি নয় মশাই, মাথার চুল, যাকে বলে কেশপাশ, কুন্তলভার, চিকুরদাম।

আমরা নিশ্চিন্ত হলুম। তার পর বনোয়ারী বাবু বাঙালী ময়রার দোকান থেকে জিলিপি আনিয়ে আমাদের সবাইকে খাওয়ালেন। আমরা খুশী হয়ে বিদায় নিলুম।

২। সত্যবতী ভৈরবী

তখন হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের যুগ, পলিটিক্স নিয়ে বেশী লোক মাথা ঘামাত না। সুরেন বাঁড়ুজ্যের চাইতে মাদাম ব্লাভাৎস্কি শশধর তর্কচূড়ামণি আর পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বেশী জনপ্রিয় ছিলেন।

আমাদের বাড়ি থেকে আধ মাইল দূরে হরনাথ মুখুজ্যের আশ্রম। বিস্তর জমি, অনেক আম কাঁঠাল লিচুর গাছ, একতলা পাকা বাড়ি, তা থেকে কিছু দূরে একটি কালীমন্দির। হরনাথ বাবু কলকাতা থেকে কালীমাতার একটি প্রকাণ্ড অয়েল পেন্টিং আনিয়ে খুব ঘটা করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ভেটকু তেওয়ারী নামক এক ভোজপুরী ব্রাহ্মণ সেই চিত্রমূর্তির নিত্য সেবা করত। বিশেষ বিশেষ পর্বদিনে হরনাথ বাবু নিজেই পূজা করতেন।

শাস্ত্রে পটপূজার বিধান থাকলেও সাধারণ লোকে মাটি-পাথরের বিগ্রহেই অভ্যস্ত। হরনাথ বাবুর এই টু-ডাইমেশন-ধারিণী পটরূপা দেবীর উপর প্রথম প্রথম লোকের তেমন শ্রদ্ধা হয় নি। তার পর একদিন শোনা গেল, তেওয়ারীর হাত থেকে মা-কালী খাঁড়া কেড়ে নিয়েছেন, হরনাথ বাবু স্বচক্ষে তা দেখেছেন। এর পরে আর কোনও সন্দেহ রইল না যে দেবী পূর্ণমাত্রায় জাগ্রত এবং সক্রিয়।

হরনাথ বাবুর আশ্রমে সদাব্রত লেগেই আছে, সব রকম সাধুবাবাই এখানে দিন কতক বাস করতে পারেন। মন্দিরের গায়ে দুটি ছোট কুঠুরি আছে, সেখানে শুধু গৈরিকধারী কানঢাকা-টুপিপরা এক নম্বর সন্ন্যাসী মহারাজদের থাকবার অধিকার আছে। মন্দিরের পিছনে কিছু দূরে একটা চালা ঘর আছে, সেখানে জটা-কৌপীন-লোটা- চিমটাধারী দু নম্বর সাধুবাবারা আশ্রয় পান। দুই শ্রেণীর সাধুদের মধ্যে সদ্‌-ভাব নেই। জটাধারীরা সন্ন্যাসী মহারাজদের বলেন, বিলকুল ভ্রষ্ট্ ভণ্ড্। অপর পক্ষ বলেন, গঁজেড়ী ভাংখোর মূর্খ্।

আশ্রমে কোনও নামজাদা বা নতুন ধরনের সাধু এলে অনেকে দেখতে যেত। আমি, কেষ্ট, আর তার ভাগনে জিতুও মাঝে মাঝে যেতুম, অনেক রকম মজাও দেখতুম। একবার তর্ক করতে করতে এক বাঙালী তান্ত্রিক একজন হিন্দুস্থানী বেদান্তীর কাঁধে চড়ে বসলেন, কিছুতেই নামবেন না। দাঙ্গা বাধবার উপক্রম হল। অবশেষে হরনাথ বাবু অতি কষ্টে সবাইকে শান্ত করলেন। আর একবার কামরূপ থেকে এক সিদ্ধপুরুষ এসেছিলেন, সন্ধ্যার পর তিনি এক আশ্চর্য ইন্দ্রজাল দেখালেন। সামনে একটা আঙটি রেখে তার কিছু দূরে একটা টাকা রাখলেন, তার পর মন্ত্রপাঠ করে মাথা নাড়তে লাগলেন। আঙটিটা লাফাতে লাফাতে এগিয়ে গেল এবং টাকাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে ফিরে এল। ওভারসিয়র নীরদবাবু উপস্থিত ছিলেন। তিনি ম্যাজিক জানতেন, তন্ত্র-মন্ত্রে বিশ্বাস করতেন না। খপ করে সিদ্ধবাবার কান ধরে তিনি একটা সূক্ষ্ম কালো সুতো টেনে বার করলেন। সুতোটা কানে আটকানো ছিল, আঙটি আর টাকার সঙ্গেও তার যোগ ছিল।

একদিন খবর এল, কাশী থেকে এক বাঙালীনি ভৈরবী এসেছেন, বয়স হলেও তাঁর রূপ নাকি ফেটে পড়ছে। হিন্দুস্থানীরা তাঁকে বলে মাতাজী সত্যবতী, বাঙালীরা বলে তপস্বিনী ভৈরবী। কেষ্ট জিতু আর আমি দেখতে গেলুম। মন্দিরের সামনের বারান্দায় একটা বাঘছালের উপর ভৈরবী বসে আছেন আর দু হাতের মুঠোয় একটা কলকে ধরে হুশ হুশ করে তামাক টানছেন। রঙ ফরসা, মাথায় এক রাশ কালো রুক্ষ ফাঁপানো চুল, অল্প পাক ধরেছে, কপালে ভস্মের তিলক। সামনে একটা চকচকে ত্রিশূল পড়ে আছে।

ক্রমে ক্রমে অনেক দর্শক এল। কেউ ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল, কেউ খাড়া হয়েই নমস্কার করল। নানা লোক ভৈরবীকে প্রার্থনা জানাল, তিনিও সকলকে আশ্বাস

দিলেন। এমন সময় মুনশী রামভকত এসে করজোড়ে বললেন, মাতাজী আজ মেরা কোঠিমে যানে কি বাত থি, এক্কা লায়া।

ভৈরবী বললেন, হাঁ বাবা, আমার ইয়াদ আছে, একটু পরেই উঠছি। মুনশীজী, এই দেখ তোমার জন্যে আমি জয়রাম ধূপ বানিয়েছি, হপ্তা খানিক এর ধোঁয়া দিলে তোমার বাড়ির সব আলাই বালাই ভূত প্রেত দূর হবে, তোমার জরুর উপর যে চুড়েল (পেতনী) ভর করেছে সেও ভেগে যাবে।

রামভকত কৃতার্থ হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন।

এমন সময় ভিড় ঠেলে প্রাণকান্ত বাবু এলেন। ইনি একজন সম্ভ্রান্ত বড় অফিসার, শহরের সকলেই এঁকে খাতির করে। প্রাণকান্ত বাবু এগিয়ে এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে মৃদুস্বরে বললেন, ভৈরবী মাতাজী, আমার প্রতি একটু কৃপাদৃষ্টিতে তাকান, বড়ই সংকটে পড়েছি. আপনি ছাড়া কে উদ্ধার করবে?

ভৈরবী কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। হঠাৎ তাঁর চোখ একটু কুঁচকে গেল, মুখে সকৌতুক হাসির রেখা ফুটে উঠল। বললেন, আরে প্রাণকান্ত যে! হরে রাম হরে রাম! চিনতে পেরেছ তো? ওকি, ওমন হতভম্ব হয়ে গেলে কেন, ভূত দেখলে নাকি?

প্রাণকান্ত বাবু নির্বাক বিমূঢ় হয়ে মিটমিট করে চাইতে লাগলেন। ভৈরবী বললেন, সেকি প্রাণকান্ত, এর মধ্যেই ভুলে গেলে? লজ্জা কেন, এখন তুমিও সাধু আমিও সাধবী, দুজনেই পোড়াখাওয়া খাঁটি সোনা? ওকি, পালাচ্ছ কেন, দাঁড়াও দাঁড়াও।

প্রাণকান্ত বাবু দাঁড়ালেন না, ভিড় ঠেলে সবেগে প্রস্থান করলেন। ভৈরবী স্মিতমুখে বললেন, একটা পুরনো ভূত ভেগে গেল । চল মুনশী রামভকত, এইবার তোমার কুঠিতে যাব।

ভৈরবী চলে গেলে দর্শকদের মধ্যে কলরব উঠল। এক দল বলল, ভৈরবী না আরও কিছু। ছিছি, এত লোকের সামনে কেলেঙ্কারি ফাঁস করতে মাগীর লজ্জাও হল না। সেই যে বলে, অঙ্গারঃ শতধৌতেন। আর এক দল বলল, অমন কথা মুখে আনতে নেই, উনি এখন পূর্ণমাত্রায় তপঃসিদ্ধা, গৌতমপত্নী অহল্যার মতন পাপশূন্যা, লজ্জা ভয় নিন্দা প্রশংসার বহু ঊর্ধ্বে উঠে গেছেন, আগের কথাও লুকুতে চান না। সেই জন্যেই তো সত্যবতী নাম।

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে আমি কেষ্টকে জিজ্ঞাসা করলুম, কি হয়েছে ভাই, প্রাণকান্ত বাবু পালিয়ে গেল কেন?

কেষ্ট বলল, বুঝতে পারলি না বোকা, এই ভৈরবীর সঙ্গে প্রাণকান্ত বাবুর লভ হয়েছিল।

৩। মধু-কুঞ্জ সংবাদ

সেকালেও বদমাশ ছেলে ছিল, কিন্তু এখনকার মতন তারা কলেকটিভ অ্যাকশন নিতে জানত না। মাস্টাররা তখন বেপরোয়া ভাবে বেত লাগাতেন, ছেলেরা তা শিক্ষারই অঙ্গ মনে করত, মা-বাপরাও আপত্তি করতেন না।

বেত মারায় আমাদের মধুসূদন মাস্টারের জুড়ি ছিল না। দোষ করলে তো মারতেনই, বিনা দোষেও শুধু হাতের সুখের জন্যে মারতেন। তিনি একটি নতুন শাস্তি আবিষ্কার করেছিলেন—রসমোড়া, অর্থাৎ পেটের চামড়া খামচে ধরে মোচড় দেওয়া।

মধু মাস্টার বাঙলা পড়াতেন। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ, কালো রঙ, একমুখ দাড়ি-

গোঁফ, তাতে চেহারাটি বেশ ভীষণ দেখাত। তখনও তাঁর বিবাহ হয়নি, বাড়িতে শুধু বিধবা বিমাতা আর দশ-এগারো বছরের একটি আইবুড়ো বৈমাত্র ভগ্নী। শুনেছি দেশে তাঁর যথেষ্ট বিষয়সম্পত্তি আছে, শুধু ছেলে ঠেঙাবার লোভেই নানা জায়গায় মাস্টারি করেছেন।

আমাদের ক্লাসের একটি ছেলের নাম কুঞ্জ। বয়স চোদ্দ-পনরো, আমাদের চাইতে ঢের বড়। একটু পাগলাটে, লেখাপড়ায় অত্যন্ত কাঁচা, তিন বৎসর প্রমোশন পায় নি।

মধু মাস্টার চারুপাঠ পড়াচ্ছেন। হঠাৎ কুঞ্জ বলল, মাস্টার মশাই, একবার বাইরে যাব, পেচ্ছাব পেয়েছে।

ধমক দিয়ে মধু মাস্টার বললেন, মিথ্যে কথা। রোজ এই সময় তোর বাইরে যাবার দরকার হয়। নিশ্চয় তামাক কি বাড়সাই খাস।

একটু পরে কুঞ্জ আবার বলল, উঃ আর থাকতে পারছি না, ছুটি দিন মাস্টার মশাই। ফিরে এলে বরং আমার মুখ শুঁখে দেখবেন তামাক খেয়েছি কিনা।

—খবরদার, চুপ করে বসে থাক। ছুটি পাবি না।

মুখ কাঁচুমাচু করে কাতর কণ্ঠে কুঞ্জ বলল, উহুহুহু। তার পর উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। মধু মাস্টার তাকে ধরে ফেলে একটা রসমোড়া দিলেন তার পর সপাসপ বেত মারতে লাগলেন। কুঞ্জ চিৎকার করে বলল, আমার দোষ দিতে পারবেন না কিন্তু। বেত এড়াবার জন্যে সে চারিদিকে ছুটোছুটি করতে লাগল, মধু মাস্টারও সঙ্গে সঙ্গে ধাওয়া করে বেত চালাতে লাগলেন।

আমরা তারস্বরে বললুম, মাস্টার মশাই, সমস্ত ঘর ভিজে নোংরা হয়ে গেল, আপনার কাপড়েও ছিটে লেগেছে। মেথর ডাকতে হবে।

মধু মাস্টার তখনও উন্মত্ত হয়ে বেত চালাচ্ছেন। হঠাৎ কুঞ্জ মাটিতে শুয়ে পড়ে গোঁ গোঁ করতে লাগল। আমরা বললুম, কুঞ্জ মরে গেছে, নিশ্চয় মরে গেছে।

কেষ্ট তাড়াতাড়ি এক ফালি কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে কুঞ্জর নাকের কাছে ধরে বলল, এখনও মরে নি, দেখুন কাগজটা ফরফর করছে। মারের চোটে কুঞ্জ অজ্ঞান হয়ে গেছে, আর একটু পরেই মরে যাবে। ছুটি দিন মাস্টর মশাই, আমরা চ্যাংদোলা করে কুঞ্জকে বাড়ি নিয়ে যাব, সেখানে মরাই তো ভাল। আপনি মেথর ডাকান আর চান করে কাপড়টা ছেড়ে ফেলুন।

অগত্যা মধু মাস্টার ক্লাস বন্ধ করলেন।

পরদিন কুঞ্জ স্কুলে এল না। মধু মাস্টার বললেন, আজ বিকেলে ওর বাড়িতে খোঁজ নিস তো, কেমন আছে ছোঁড়া।

ক্লাস প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আমরা একসঙ্গে আবৃত্তি করছি—সকলের পিতা তুমি, তুমি সর্বময়। হঠাৎ কুঞ্জ তার মাকে নিয়ে উপস্থিত হল। মা খুব লম্বা চওড়া মহিলা, নাকে নথ, কানে মাকড়ির ঝালর, চওড়া লালপেড়ে শাড়ি কোমরে জড়িয়ে পরেছেন, মাথায় কাপড় না থাকারই মধ্যে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে নাক সিঁটকে একবার চারদিকে উঁকি মারলেন, যেন আরসোলা কি নেংটি ইঁদুর খুঁজছেন। তারপর আমাদের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, মোধো মাস্টার কোন্‌টে রে?

একালের চাইতে তখন ছেলেদের মধ্যে শিভালরি ঢের বেশী ছিল। আমরা সকলেই সসম্ভ্রমে আঙুল বাড়িয়ে মধু মাস্টারকে শনাক্ত করলুম।

কুঞ্জর মা সোজা তাঁর কাছে গিয়ে কান ধরে বললেন, ইস্টুপিট মুখপোড়া বাঁদর! তোর বেতগাছাটা কোথা রে?

আমরা বললুম, ওই যে, চেয়ারে ওঁর পাশেই রয়েছে। কুঞ্জর মা কিন্তু আমাদের

নিরাশ করলেন। বেতটা বাঁ হাতে নিলেন বটে, কিন্তু লাগালেন না, শুধু ডান হাত দিয়ে মধু মাস্টারের দাড়ি-ভরা গালে গোটা চারেক থাবড়া লাগালেন। তার পর বেতটা নিয়ে কুঞ্জর হাত ধরে গটগট করে চলে গেলেন।

গোলমাল শুনে মাস্টাররা সবাই আমাদের ক্লাসে এলেন। হেডমাস্টার মশাই বললেন, বাড়ি যা তোরা।

পরদিন থেকে মধু মাস্টার গোবেচারার মতন বিনা বেতেই পড়াতে লাগলেন।

ছ মাস পরেই কুঞ্জর সঙ্গে মধু মাস্টারের একটা পাকা রকম মিটমাট হয়ে গেল। রেল স্টেশনের মালবাবু যামিনী ঘোষাল ছিলেন কুঞ্জর দূর সম্পর্কের ভাই, তাঁর সঙ্গে মধু মাস্টারের বৈমাত্র বোন ভূতির বিয়ে স্থির হল। মধু মাস্টার যথাসাধ্য আয়োজন করলেন, অনেক লোককে নিমন্ত্রণ করলেন, কিন্তু হঠাৎ সব ওলটপালট হয়ে গেল। বিবাহসভায় সবাই বরের জন্যে অপেক্ষা করছে, এমন সময় বরপক্ষের একজন খবর আনল—যামিনী বলেছে মধু চামারের বোনকে সে কিছুতেই বিয়ে করবে না। কেষ্ট আমাদের চুপিচুপি বলল, কুঞ্জই ভাঙচি দিয়েছে।

বিয়েবাড়িতে প্রচণ্ড হইচই উঠল। মধু মাস্টারের বিমাতা কুঞ্জর মায়ের পায়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, রক্ষা কর দিদি, এখন বর কোথায় পাব, তোমার ছেলে কুঞ্জকে আদেশ কর।

কুঞ্জর মা বললেন, নিশ্চয় নিশ্চয়, বামুনের জাতধর্ম বাঁচাতে হবে বইকি। এই কুঞ্জ, তোর ময়লা কাপড়টা ছেড়ে এই চেলিটা পর।

কুঞ্জ বলল, ভূতি যে বিচ্ছিরি!

তার মা বললেন ,আহা, কি আমার কাত্তিক ছেলে রে! ওঠ বলছি, নয়তো মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব।

কুঞ্জর বাবা বললেন, ছেলেটার যখন আপত্তি তখন জোর করে বিয়ে দেবার দরকার কি?

কুঞ্জর মা বললেন, যাও যাও, তুমি আবার এর মধ্যে নাক গলাতে এলে কেন?

কুঞ্জ তবু ইতস্তত করছে দেখে কেষ্ট তাকে চুপিচুপি বলল, বিয়েটা করে ফেল কুঞ্জ, অনেক সুবিধে। সোনার আঙটি পাবি, রুপোর ঘড়ি আর ঘড়ির চেন পাবি, ক্লাসে প্রমোশনও পেয়ে যাবি। আর মধু মাস্টার মশাই তোর কে হবেন জানিস তো? শালা।

কুঞ্জ আর আপত্তি করে নি।

১৮৮০ শক (১৯৫৮)

উৎকণ্ঠা স্তম্ভ

বিলিতী খবরের কাগজে যাকে অ্যাগনি কলম বলা হয় তাতে এক শ্রেণীর ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন বহুকাল থেকে ছাপা হয়ে আসছে। ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর আগে বাঙলা কাগজে সে রকম বিজ্ঞাপন কদাচিৎ দেখা যেত, কিন্তু আজকাল ক্রমেই বাড়ছে। 'হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ' শীর্ষক স্তম্ভে তার অনেক উদাহরণ পাবেন। ইংরেজীতে যা অ্যাগনি কলম, বাঙলায় তারই নাম উৎকণ্ঠা স্তম্ভ।

কয়েক মাস আগে দৈনিক যুগানন্দ পত্রের উৎকণ্ঠা স্তম্ভে উপরি উপরি দু দিন এই বিজ্ঞাপনটি দেখা গিয়েছিল—

বাবা পানু, যেখানেই থাক এখনই চলে এস, টাকার দরকার হয় তো জানিও। তোমার মা নেই, বুড়ো বাপ আর পিসীমাকে এমন কষ্ট দেওয়া কি উচিত? তুমি যাকে চাও তার সঙ্গেই যাতে তোমার বিয়ে হয় তার ব্যবস্থা আমি করব। কিছু ভেবো না, শীঘ্র ফিরে এস।—তোমার পিসীমা।

চার দিন পরে উক্ত কাগজে এই বিজ্ঞাপনটি দেখা গেল—

এই পেনো, পাজী হতভাগা শুওর, যদি ফিরে আসিস তবে জুতিয়ে লাট করে দেব। আমার দেরাজ থেকে তুই সাত শ টাকা চুরি করে পালিয়েছিস, শুনতে পাই বিপিন নন্দীর ধিঙ্গী মেয়ে লোত্তি তোর সঙ্গে গেছে। তুই ভেবেছিস কি? তোকে ফেরাবার জন্যে সাধাসাধি করব? তেমন বাপই আমি নই। তোকে ত্যাজ্যপুত্র করলুম তোর চাইতে ঢের ভাল ভাল ছেলের আমি জন্ম দেব, তার জন্যে ঘটক লাগিয়েছি।—তোর আগেকার বাপ।

সাত দিন পরে এই বিজ্ঞাপন দেখা গেল—

পানু-দা, চিঠিতে লিখে গেছ তিন দিন পরেই ফিরবে, কিন্তু আজও দেখা নেই। গেছ বেশ করেছ, কিন্তু আমার মফ চেন আর ব্রোচ নিয়ে গেছ কেন? তুমি যে চোর তা ভাবতেই পারি নি। এখন তোমাকে চিনেছি, চেহারাটাই চটকদার, তা ছাড়া অন্য গুণ কিছুই নেই। অল্প দিনের মধ্যে বিদায় হয়েছ ভালই, কিন্তু আর ফিরে এসো না। ভেবেছ আমার বুক ভেঙে যাবে, তোমাকে ফেরাবার জন্য সাধাসাধি করব? সে রকম ছিঁচকাঁদুনে মেয়ে আমি নই, নিজের পথ বেছে নিতে পারব।—লোত্তি।

উৎকণ্ঠা স্তম্ভের এই সব বিজ্ঞাপন পড়ে পাঠকবর্গ বিশেষত যাদের ফুরসত আছে, মহা উৎকণ্ঠায় পড়ল। অনেকে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে গবেষণা করতে লাগল, ব্যাপারটা কি। একজন বিচক্ষণ সিনেমার ঘুণ বললেন, বুঝছ না, এ হচ্ছে একটা ফিল্মের বিজ্ঞাপন, প্রথমটা শুধু পবলিকের মনে সুড়সুড়ি দিচ্ছে, তার পর খোলসা করে জানাবে আর বড় বড় পোস্টার সাঁটবে। আর একজন প্রবীণ সিনেমা রসিক বললেন, ছকু চৌধুরী যে নতুন ছবিটা বানাচ্ছে—মুঠো মুঠো প্রেম, নিশ্চয় তারই বিজ্ঞাপন। আর একজন বললেন, তোমরা কিছুই বোঝ না, এ হচ্ছে চা-এর বিজ্ঞাপন, দু দিন পরেই লিখবে—আমার নাম চা, আমাকে নিয়মিত পান করুন, তা হলেই সংসারে শান্তি বিরাজ করবে। আর একজন বললেন, চা নয়, এ হচ্ছে বনস্পতির

বিজ্ঞাপন। বুড়োর দল কিন্তু এসব সিদ্ধান্ত মানলেন না। তাঁদের মতে এ হচ্ছে মামুলী পারিবারিক কেলেঙ্কারির ব্যাপার, সিনেমা দেখে আর উপন্যাস পড়ে সমাজের যে অধঃপতন হয়েছে তারই লক্ষণ।

কয়েক দিন পরেই উৎকণ্ঠা স্তম্ভে এই বিজ্ঞাপনটি দেখা গেল—

লোত্তি দেবী, আপনার মনের বল দেখে মুগ্ধ হয়েছি। আপনার ভাল নাম লতিকা কি ললিতা তা জানি না, আমাকেও আপনি চিনবেন না, তবু সাহস করে অনুরোধ করছি, আপনার ব্যর্থ অতীতকে পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করুন, প্রেমের বীর্যে অশঙ্কিনী হয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়ান, আমরা দুজনে স্বর্ণময় উজ্জ্বল ভবিষ্যতে অগ্রসর হব। আমি আপনার অযোগ্য সাথী নই, এই গ্যারাণ্টি দিতে পারি। আরও অনেক কিছু লিখতুম, কিন্তু কাগজওয়ালারা ডাকাত, এক লাইনের রেট পাঁচ সিকে নেয়, সেজন্যে এখানেই থামতে হল। উত্তরের আশায় উৎকণ্ঠিত হয়ে রইলুম, আপনার ঠিকানা পেলে মনের কথা সবিস্তারে লিখব—কৃষ্ণধন কুণ্ডু (বয়স ২৬), এঞ্জিনিয়ার, গণেশ কটন মিল, পারেল, বম্বে।

দু দিন পরে এই বিজ্ঞাপনটি দেখা গেল—

শ্রীমান পানুর পিতা মহাশয়, আপনার বিজ্ঞাপন দৃষ্টে জানিলাম আপনি আবার বিবাহ করিবেন, সে কারণে ঘটক লাগাইয়াছেন। যদি ইতিমধ্যে অন্য কাহারও সঙ্গে পাকা কথা না হইয়া থাকে তবে আমার প্রস্তাবটি বিবেচনা করিবেন। আমি এখানকার ফিমেল জেলের সুপারইনটেনডেন্ট, বয়স চল্লিশের কম, হাজার দশেক টাকা পুঁজি আছে। চাকরি আর ভাল লাগে না, বড়ই অপ্রীতিকর, সেজন্য সংসারধর্ম করিতে চাই। যদি আমার পাণিগ্রহণে সম্মত থাকেন তবে সত্বর জানাইবেন, কারণ আরও দুই ব্যক্তির সঙ্গে কথাবার্তা চলিতেছে।—ডকটর মিস সত্যভামা ব্যানার্জি, পি এচ. ডি., ফিমেল জেল, চুন্দ্রিগড়।

এরপর উৎকণ্ঠা স্তম্ভে আর কোন বিজ্ঞাপন দেখা গেল না, কিন্তু ব্যাপারটি অনেক দূর গড়িয়েছিল। বিশ্বস্ত সূত্রে যা জানা গেছে তাই সংক্ষেপে বলছি।

বিপিন নন্দীর মেয়ে লোত্তি (ভাল নাম লজ্জাবতী) কৃষ্ণধন কুণ্ডুকে বিয়ে করেছে। পানু অর্থাৎ প্রাণতোষের বুড়ো বাপ মনোতোষ ভটচাজ ডকটর সত্যভামাকে বিয়ে করেছেন। অগত্যা পানুর পিসীমা কাশী চলে গেছেন।

বোম্বাই থেকে পানু তার বাপকে চিঠি লিখেছে—

পূজনীয় বাবা, তোমার টাকার জন্যে ভেবো না, যা নিয়েছিলুম সুদ সুদ্ধ ফেরত দেব। আমি মোটেই কুপুত্তুর নই, ফেলনা বংশধর নই, তোমার বংশ আমি উজ্জ্বল করেছি। আমার নাম এখন প্রাণতোষ নয়, সুন্দরকুমার। নয়নসুখ ফিল্ম কম্পানিতে জয়েন করেছি, বেশ ভাল রোজগার। এখানে আমার খুব নাম, সবাই বলে সুন্দরকুমারের মতন খুবসুরত অ্যাক্টর দেখা যায় না। শুনলে অবাক হবে, বিখ্যাত স্টার মিস গুলাবা ভেরেন্দী আমাকে বিবাহ করেছেন। তাঁর কত টাকা আছে জান? পাঁচ লাখ বাহান্ন হাজার, তা ছাড়া তিনটে মোটর কার। আগামী রবিবার বম্বে মেলে আমি সস্ত্রীক কলকাতায় পেঁছুব। আমাদের জন্যে দোতলার বড় ঘরটা সাহেবী স্টাইলে সাজিয়ে রেখো, ফুলদানিতে এক গোছা রজনীগন্ধা যেন থাকে। ভয় নেই, বেশী দিন থাকব না, হপ্তা খানেক পরেই বোম্বাইএ ফিরে আসব।

মনোতোষ ভটচাজের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ডকটর সত্যভামা বললেন, তা ছেলেটা আসছে আসুক না, তুমি গালাগাল মন্দ দিও না বাপু। পানু আমাদের বাহাদুর ছেলে।

কৃষ্ণধন কুণ্ডু ছুটি নিয়ে তার বউ লেত্তির সঙ্গে কলকাতায় এসেছিল। পানু সস্ত্রীক বাড়ি আসছে শুনে লেত্তি চুপ করে থাকতে পারল না, মনোতোষ ভটচাজের বাড়িতে উপস্থিত হল। পাড়ার আরও অনেকে এল, সিনেমা স্টার গুলাবাকে দেখবার জন্যে। কিন্তু পানুকে একলা দেখে সবাই নিরাশ হয়ে গেল।

মনোতোষ বললেন, একা এলি যে? তোর বউ কোন চুলোয় গেল?

মাথা চুলকে পানু বলল, সে আসতে পারল না বাবা। হঠাৎ মস্কো থেকে একটা তার এল, তাই এক মাসের জন্যে সোবিএত রাষ্ট্রে কলচরাল টুর করতে গেছে।

লেত্তি বলল, সব মিছে কথা। আমরা সদ্য বোম্বাই থেকে এসেছি, সেখানকার সব খবর জানি। গুলাবা ভেরেন্দী তোমাকে বিয়ে করবে কোন্ দুঃখে? দু বছর আগে নবাবজাদা সোভানুল্লার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। তাঁকে তালাক দিয়ে গুলাবা সম্প্রতি লগনচাঁদ বজাজকে বিয়ে করেছে। তুমি তো গ্রান্ট রোডে একটা ইরানী হোটেলে বয়-এর কাজ করতে, চুরি করেছিলে তাই তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

মনোতোষ গর্জন করে বললেন, দূর হ জোচ্চোর ভ্যাগাবণ্ড, নয়তো জুতিয়ে লাট করে দেব।

সত্যভামা বললেন, আহা, ছেলেটাকে এখনি তাড়াচ্ছ কেন, আগে একটু জিরুক। বাবা পানু, ভেবো না, তোমার একটা হিল্লে আমিই লাগিয়ে দিচ্ছি। আমার ফ্রেন্ড মিস্টার হায়দর মুস্তাফা কলকাতায় এসেছেন। দক্ষিণ বর্মায় মৌলমিন শহরে তাঁর বিরাট পোলট্রি ফার্ম আছে, আমি তাঁকে বললেই তোমাকে তার ম্যানেজার করে দেবেন। তুমি তৈরী হয়ে নাও, পরশু তিনি রওনা হবেন, তাঁর সঙ্গেই তুমি যাবে। টাকার জন্যে ভেবো না, আমি তোমার জাহাজ ভাড়া আর কিছু হাতখরচ দেব।

অতঃপর সকলের উৎকণ্ঠার অবসান হল। তবে পানুর হিল্লে এখনও পাকা-পাকি লাগে নি। সাত দিন পরেই সে মুস্তাফা সাহেবের কিছু টাকা চুরি করে সিংগাপুরে পালিয়ে গেল। সেখানে পিপল্স চায়না হোটেলে একটা কাজ যোগাড় করেছে, খদ্দেরদের খাবার পরিবেশন করতে হয়। হোটেলের মালিক মিস ফুক-সান তাকে সুনজরে দেখেন। পানুর আশা আছে, ভাল করে খোশামোদ করতে পারলে মিস ফুক-সান তাকে পোষ্য পতির পদে প্রমোশন দেবেন।

১৮৮০ শক (১৯৫৮)

দীনেশের ভাগ্য

জয়গোপাল সেন, জীবনকৃষ্ণ দত্ত, গোলোকবিহারী হালদার কাছাকাছি বাস করেন। জয়গোপাল নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব, ভক্তিশাস্ত্রের চর্চা করেন, আত্মা ভগবান আর পরকাল সম্বন্ধে তাঁর বাঁধাধরা মত আছে। জীবনকৃষ্ণ গোঁড়া পাষণ্ড নাস্তিক, বিজ্ঞান নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, আত্মা ভগবান পরকাল মানেন না। তাঁর মতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হচ্ছে দেশ-কালের একটি গাণিতিক জগাখিচুড়ি,তাতে নিরন্তর ছোট বড় তরঙ্গ উঠছে আর ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন পজিট্রন প্রভৃতি হরেক রকম অতীন্দ্রিয় কণিকা আধসিদ্ধ খুদের মতন বিজবিজ করছে, মানুষের চেতনা সেই খিচুড়িরই একটু ধোঁয়া অর্থাৎ তুচ্ছ বাই-প্রডক্ট। গোলোকবিহারী হচ্ছেন আধা-আস্তিক আধা-পাষণ্ড, তিনি কি মানেন বা মানেন না তা খোলসা করে বলেন না। তিন জনেরই বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে, সুতরাং মতিগতি বদলাবার সম্ভাবনা কম। মতের বিরোধ থাকলেও এঁরা পরম বন্ধু, রোজ সন্ধ্যাবেলা জয়গোপালের বাড়িতে আড্ডা দেন। সম্প্রতি দশ দিন আড্ডা বন্ধ ছিল, কারণ জয়গোপাল কাশী গিয়েছিলেন। আজ সকালে তিনি ফিরেছেন, সন্ধ্যার সময় পূর্ববৎ আড্ডা বসেছে।

গোলোক হালদার প্রশ্ন করলেন, তোমার শালা দীনেশের খবর কি জয়গোপাল, এখন একটু সামলে উঠেছে? আহা, অমন চমৎকার মানুষ, কি শোকটাই পেলে! এক মাসের মধ্যে স্ত্রী আর বড় বড় দুটি ছেলে কলেরায় মারা গেল, আবার কুবের ব্যাংক ফেল হওয়ায় দীনুর গচ্ছিত টাকাটাও উবে গেল। এমন বিপদেও মানুষে পড়ে!

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জয়গোপাল বললেন, সবই শ্রীহরির ইচ্ছা, কেন কি করেন তা আমাদের বোঝবার শক্তি নেই, মাথা পেতে মেনে নিতে হবে। এখান থেকে দীনেশের নড়বার ইচ্ছে ছিল না, প্রায় জোর করে তাকে কাশীতে তার খুড়তুতো ভাই শিবনাথের কাছে রেখে এলুম। শিবনাথ অতি ভাল লোক, দীনুকে গয়া প্রয়াগ মথুরা বৃন্দাবন হরিদ্বার ঘুরিয়ে আনবে। তীর্থভ্রমণই হচ্ছে শোকের সব চাইতে ভাল চিকিৎসা। দীনুর মেয়ে আর ছোট ছেলেটিকে আমাদের কাছেই রেখেছি।

অন্যান্য দিন তিন বন্ধু সমাগত হবামাত্র আড্ডাটি জমে ওঠে, অর্থাৎ তুমুল তর্ক আরম্ভ হয়। জয়গোপালের শালা দীনেশের বিপদের জন্যে আজ সকলেই একটু সংযত হয়ে আছেন, কিন্তু জীবনকৃষ্ণ বেশীক্ষণ সামলাতে পারলেন না। বললেন, ওহে জয়গোপাল, তোমার দয়াময় হরির আক্কেলটা দেখলে তো? দীনেশের মতন গোবেচারা ভালমানুষ নিষ্পাপ লোককে এমন থেঁতলে দিলেন কেন? কর্মফল বললে শুনব না। পূর্বজন্মে দীনু যদি কিছু দুষ্কর্ম করেই থাকে তার জন্যে তো তোমার ভগবানই দায়ী, তিনিই তো সব করান।

গোলোক হালদার চোখ টিপে বললেন, ব্যাখ্যা অতি সোজা। ভগবানের সাধ্য নেই যে মানুষের ফ্রী উইলে হস্তক্ষেপ করেন। দীনেশ তার স্বাধীন ইচ্ছাতেই পূর্বজন্মে দুষ্কর্ম করেছিল, তারই ফল এজন্মে পেয়েছে। কি বল জয়গোপাল?

জীবনকৃষ্ণ বললেন, ও সব গোঁজামিল চলবে না। হিন্দু মতে পুনর্জন্ম আর কর্মফল মানবে, আবার খ্রীষ্টানী মতে ফ্রী উইল মানবে, এ হতে পারে না। তোমার

গীতাতেই তো আছে—ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়ে থাকেন আর যন্ত্রারূঢ়বৎ চালনা করেন। অর্থাৎ ঈশ্বর হচ্ছেন কুমোর আর মানুষ হচ্ছে কুমোরের চাকে মাটির ডেলা। মানুষের পাপ পুণ্য সুখ দুঃখ সমস্তের জন্যে ঈশ্বরই দায়ী। তাঁকে দয়াময় বলা মোটেই চলবে না।

জয়গোপাল বললেন, তর্ক করলে শ্রীকৃষ্ণ বহু দূরে সরে যান, বিশ্বাসেই তাঁকে পাওয়া যায়। তিনি কৃপাসিন্ধু মঙ্গলময়। আমরা জ্ঞানহীন ক্ষুদ্র প্রাণী, তাঁর উদ্দেশ্য বোঝা আমাদের অসাধ্য। শুধু এইটুকুই জানি, তিনি যা করেন তা জগতের মঙ্গলের জন্যেই করেন। কান্তকবি তাই গেয়েছেন—জানি তুমি মঙ্গলময়, সুখে রাখ দুঃখে রাখ যাহা ভাল হয়।

অট্টহাস্য করে জীবনকৃষ্ণ বললেন, বাহবা, চমৎকার যুক্তি। একেই বলে বেগিং দ কোয়েশ্চন। কোনও প্রমাণ নেই অথচ গোড়াতেই মেনে নিয়েছ যে ভগবান আছেন এবং তিনি পরম দয়ালু। যদি সুখ পাও তবে বলবে, এই দেখ ভগবানের কত দয়া। যদি দুঃখ পাও তবে কুযুক্তি দিয়ে তা ঢাকবার চেষ্টা করবে। হিন্দু বলবে কর্মফল, খ্রীষ্টান বলবে ফ্রী উইল আর অরিজিনাল সিন। কুকুর বেরাল ছাগল বাচ্চাকে দুধ দিচ্ছে দেখলে বলবে, আহা ভগবানের কত দয়া, সন্তানের জন্য মাতৃবক্ষে অমৃতরসের ভাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু দীনেশের মতন সাধুলোক যখন শোক পায় আর সর্বস্বান্ত হয়, হাজার হাজার মানুষ যখন দুর্ভিক্ষে মহামারীতে বা যুদ্ধে মরে, তখন তো মুখ ফুটে বলতে পার না—উঃ, ভগবান কি নিষ্ঠুর! তোমরা ভক্তরা হচ্ছ খোশামুদে এক-চোখো, যুক্তির বালাই নেই, শুধু অন্ধ বিশ্বাস। আচ্ছা জয়গোপাল, কবি ঈশ্বর গুপ্ত তোমার মাতৃকুলের একজন পূর্বপুরুষ ছিলেন না? তিনি ভগবানকে অনেকটা চিনতে পেরেছিলেন, তাই লিখেছেন—

হায় হায় কব কায় কি হইল জ্বালা,
জগতের পিতা হয়ে তুমি হলে কালা।
কহিতে না পার কথা, কি রাখিব নাম,
তুমি হে আমার বাবা হাবা আত্মারাম।

গোলোক হালদার বললেন, ওহে জীবনকেষ্ট, মাথাটা একটু ঠাণ্ডা কর। তোমার মুশকিল হয়েছে এই যে তুমি জগতের সমস্ত ব্যাপারের আর মানুষের সমস্ত চিন্তার সামঞ্জস্য করতে চাও। তোমাদের বিজ্ঞান অচেতন জড় প্রকৃতির মধ্যেই পুরো সামঞ্জস্য খুঁজে পায় নি, সচেতন মানুষের চিত্ত তো দূরের কথা। যুক্তিবাদী চার্বাকরা বড় বেশী দাম্ভিক হয়। তোমরা মনে কর, অতি সূক্ষ্ম ইলেকট্রন থেকে অতি বিশাল নক্ষত্রপুঞ্জ পর্যন্ত সবই আমরা মোটামুটি বুঝি, সবই যুক্তি খাটিয়ে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করি। তবে মানুষের চিত্তের বেলায় অবুদ্ধি আর অযুক্তি সইব কেন?

জীবন। চিত্ত মানে কি?

গোলোক। চিত্তের অনেক রকম মানে হয়। আমাদের মনের যে অংশ সুখ দুঃখ অনুরাগ বিরাগ দয়া ঘৃণা ইত্যাদি অনুভব করে তাকেই চিত্ত বলছি। চিত্তের ব্যাপারে যুক্তি আর বুদ্ধি খাটে না।

জীবন। মনোবিজ্ঞানীরা সেখানেও নিয়ম আবিষ্কার করেছেন।

গোলোক। বিশেষ কিছুই করতে পারেন নি, মানুষের চিত্ত এখনও দুর্গম রহস্য। আচ্ছা, বল তো, দাশরথি চন্দরের শ্রাদ্ধসভায় তুমি তার অত গুণকীর্তন করেছিলে কেন?

জীবন। কেন করব না। দাশরথিবাবু বিস্তর দান করেছেন, আমাদের পাড়ার কত উন্নতি করেছেন, রাস্তা টারম্যাক করিয়েছেন, ইলেকট্রিক ল্যাম্প বসিয়েছেন, আমাদের অ্যাসেসমেণ্ট কমিয়েছেন, পাড়ায় লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেছেন।

গোলোক। লোকটি প্রচণ্ড মাতাল আর লম্পট ছিল, গুণ্ডা পুষত, দুর্বলের ওপর অত্যাচার করত—এ সব ভুলে গেলে কেন?

জীবন। কিছুই ভুলি নি। মৃত লোকের শ্রাদ্ধসভায় শুধু শ্রদ্ধা জানানোই দস্তুর, দোষের ফর্দ দেওয়া অসভ্যতা।

গোলোক। তার মানে তুমিও সময় বিশেষে একচোখো হও। জয়গোপাল যদি তার ইষ্টদেবতার শুধু সদ্‌গুণই দেখে আর তাতেই আনন্দ পায় তবে তুমি দোষ ধরবে কেন?

জয়গোপাল হাত নেড়ে বললেন, চুপ কর গোলোক, এ তোমার অত্যন্ত অন্যায়। ভগবানের লীলার সঙ্গে মানুষের আচরণ তুলনা করা মহাপাপ, যাকে বলে ব্ল্যাসফেমি।

গোলোক। বেগ ইওর পার্ডন, আমার অপরাধ হয়েছে। আচ্ছা জীবনকেষ্ট, বন্দে মাতরম্‌ আর জন-গণ-মন গান তোমার কেমন লাগে?

জীবন। ভালই লাগে। তবে বঙ্গমাতা ভারতমাতা ভারত-ভাগ্যবিধাতা কেউ আছেন তা মানি না।

গোলোক! আমাদের এই বাঙলা দেশ সুজলা সুফলা বহুবলধারিণী তারিণী ধরণী ভরণী—এ সব বিশ্বাস কর? ভারত-ভাগ্যবিধাতা আমাদের মঙ্গল করবেন তা মান?

জীবন। না, ও সব শুধু কবিকল্পনা। কবিদের যা আকাঙ্ক্ষা, ভবিষ্যতে যা হবে আশা করেন, তাই তাঁরা মনগড়া দেবতায় আরোগ করেন। এ হল পোয়েটিক লাইসেন্স, কবিতায় যুক্তি না থাকলেও দোষ হয় না।

গোলোক। অর্থাৎ কবিদের উইশফুল থিংকিংএ তোমার আপত্তি নেই। ভক্তরাও এক রকম কবি, তাঁদের ইষ্টদেবতাও ইচ্ছাময়, জয়গোপাল যা ইচ্ছা করে তাই ভগবানে আরোপ করে আনন্দ পায়।

আবার হাত নেড়ে জয়গোপাল বললেন, তুমি কিছুই জান না। ভক্তরা মোটেই আরোপ করেন না, সচ্চিদানন্দ ভগবানের সত্য স্বরূপই উপলব্ধি করেন। তোমাদের মতন চার্বাকুদের সে শক্তি নেই।

জীবন। আচ্ছা গোলোক, তুমি সত্যি করে বল তো, ভগবান মান কিনা।

গোলক। হরেক রকম ভগবান আছেন, কতক মানি কতক মানি না। ঐতিহাসিক আর আধা-ঐতিহাসিক মহাপুরুষদের ভগবান বলে মানি, যেমন বুদ্ধ, যীশু, আর বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ। এঁরা করুণাময়, কিন্তু সর্বশক্তিমান নন। দেখতেই পাচ্ছ, এঁদের চেষ্টায় বিশেষ কিছু কাজ হয় নি। করুণাময় আর সর্বশক্তিমান পরস্পর বিরোধী, সে রকম ভগবান কেউ নেই। মানুষের কোনও গুণ বা দোষ ভগবানে থাকতে পারে না, তিনি ভালও নন মন্দও নন, দয়ালুও নন নিষ্ঠুরও নন। তাঁর কোনও ইচ্ছা উদ্দেশ্য বা মতলব থাকা অসম্ভব। যে অপূর্ণ, যার কোনও অভাব আছে, তারই উদ্দেশ্য থাকে। পূর্ণব্রহ্মের অভাব নেই, কিছু করবারও নেই, তিনি স্থান কাল শুভ অশুভ সমস্তের অতীত। তিনি একাধারে জ্ঞাতা জ্ঞেয় আর জ্ঞান। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের

একটি নগণ্য কণা এই পৃথিবী, তারই একটা অতি নগণ্য কীটাণুকীট আমি, ব্রহ্মের স্বরূপ এর চাইতে বেশী বোঝা আমার সাধ্য নয়।

জয়গোপাল। গোলোকের কথা কতকটা ঠিক। কিন্তু সাধকদের হিতার্থে ব্রহ্মের যে রূপ গুণ কল্পনা করা হয় তাও সত্য। ভগবানের মঙ্গলময় রূপ বোঝা মানুষের অসাধ্য নয়, শ্রদ্ধাবান ভক্ত তা বুঝতে পারেন। আমাদের দীনেশ নিষ্পাপ, আপাতত যতই দুঃখ পাক, মঙ্গলময়ের করুণা থেকে সে বঞ্চিত হবে না।

একমাস পরের কথা। সন্ধ্যাবেলা তিন বন্ধু যথারীতি মিলিত হয়েছেন। ডাকপিয়ন একটা চিঠি দিয়ে গেল। জয়গোপাল বললেন, এ যে দীনেশের চিঠি, অনেক দিন পরে লিখেছে।

জয়গোপাল চিঠিটা খুলে পড়লেন, তার পর মুখভঙ্গী করে বললেন, ছি ছি ছি।

জীবনকৃষ্ণ প্রশ্ন করলেন, হয়েছে কি?

জয়গোপাল। হয়েছে আমার মাথা। কিছুদিন ধরে একটা ফিসফিস গুজগুজ শুনছিলুম দীনেশ নাকি আবার বিয়ে করবে। তার মেয়ে তো কেঁদেই অস্থির। বলেছে, সৎমায়ের কাছে থাকব না, এখনই আমার বিয়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দাও। ছোট ছেলেটা বলেছে, ব্যাট দিয়ে নতুন মায়ের মাথা ফাটিয়ে দেব। তাদের পিসী, আমার স্ত্রী বলেছেন, সৎমায়ের কাছে যেতে হবে না, তোরা আমার কাছেই থাকবি। আমি গুজবে বিশ্বাস করি নি, কিন্তু দীনেশ এই চিঠিতে খোলসা করে লিখেছে।

গোলোক। একটু শোনাও না কি লিখেছে।

জয়গোপাল। চার পাতায় বিস্তর লিখেছে। তার বক্তব্যের যা সার তাই পড়ছি শোন।—শিবনাথের ছোট শালী চামেলীর গুণের তুলনা হয় না। আমার ইনফ্লুএঞ্জার সময় যে সেবাটা করেছে তা বলবার নয়। সকলের মুখে এক কথা—চামেলীই আমাকে বাঁচিয়েছে। শিবনাথ নাছোড়বান্দা হয়ে আমাকে ধরে বসল, চামেলীকে নাও, সে তো তোমারই। সুন্দরী নয় বটে, কিন্তু কুশ্রীও বলা চলে না। তার বয়স চব্বিশের মধ্যে, একটু বেশী তোতলা, তাই এ পর্যন্ত বিয়ে হয় নি। আমার বিশ্বাস ডাক্তার অনিল মিত্র তাকে সারাতে পারবেন। তার বাবা সম্প্রতি মারা গেছেন, তাঁর উইল অনুসারে চামেলী প্রায় দশ হাজার টাকার সম্পত্তি পেয়েছে। আমার নিজের বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে, চুলে একটু পাকও ধরেছে, কিন্তু এখানে সবাই বলছে, আমাকে নাকি চল্লিশের কম দেখায়। অগত্যা রাজী হলুম। দেখি, ভগবানের দয়ায় আবার সংসার পেতে যদি একটু শান্তি পাই।...এই রকম অনেক কথা দীনেশ লিখেছে। বুড়ো বয়সে বিয়ে করতে লজ্জাও হল না! ছি ছি ছি!

গোলক। ছি ছি করবার কি আছে, বিয়ে করেছে তো হয়েছে কি?

জয়গোপাল। শাস্ত্রে আছে, পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা। আরে তোর দুটো ছেলে না হয় গেছে, কিন্তু একটা তো বেঁচে আছে, মেয়েও একটা আছে, তবে কোন্ হিসেবে আবার বিয়ে করলি? তোর বয়স হয়েছে, দেবার্চনা ধ্যান-ধারণা পরমার্থচিন্তা এই সব করেই তো শান্তিতে জীবন কাটিয়ে দিতে পারতিস। বুড়ো বয়সে একি মতিচ্ছন্ন হল!

গোলোক। ওহে জয়গোপাল, তুমি নিজের কথার খেলাপ করছ। তোমার শ্রীভগবান যে মঙ্গলময় তা তো দেখতেই পেলে। শেষ পর্যন্ত দীনেশের ভালই করলেন, তরুণী

ভার্যা দিলেন, আবার দশ হাজার টাকাও দিলেন। আর, তোতলা স্ত্রী পাওয়া তো মহা ভাগ্যের কথা, চোপা শুনতে হবে না, দাম্পত্য কলহেরও ভয় নেই। তবে তোমার খেদ কিসের?

জীবন। তোমাদের শ্রীভগবান কিন্তু হরগোবিন্দ সাহার সঙ্গে মোটেই ভাল ব্যবহার করেন নি। রেলের কলিশনে তার স্ত্রী ছেলেমেয়ে সব মারা গেল, হরগোবিন্দর দুটো পা কাটা গেল। লোকটি অতি সজ্জন, বিস্তর টাকা, কিন্তু বেচারা অনেক চেষ্টা করেও আর একটা বউ যোগাড় করতে পারে নি, একটা বোবা কালা কানা খোঁড়াও জোটে নি।

গোলোক। হরগোবিন্দকে চিনি না, তার জন্যে ভাববার দরকার নেই। আমাদের দীনেশ কিন্তু ভাগ্যবান। দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি—সে গোঁফ কামিয়ে তরুণ হয়েছে, চুলে কলপ লাগিয়েছে, জরিপাড় ধুতি আর সোনালী গরদের পঞ্জাবি পরেছে, জগদানন্দ মোদক খাচ্ছে, তার ঠোঁটে একটু বোকা বোকা হাসি ফুটেছে।

১৮৮০ শক (১৯৫৮)

ভূষণ পাল

ভূষণ পাল তার এককালের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও প্রতিবেশী নবীন সাঁতরাকে খুন করেছিল, সেসন্‌স জজ তার ফাঁসির হুকুম দিয়েছেন। আসামীকে যারা চেনে তারা সকলেই ক্ষুণ্ণ হয়েছে, তাদের আশা ছিল বড় জোর আট-দশ বছর জেল হবে। কিন্তু ভূষণের উকিলের কোনও যুক্তি হাকিম শুনলেন না। বললেন, আসামী ঝোঁকের মাথায় কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে খুন করে নি, অনেকদিন থেকে মতলব এঁটে মারবার চেষ্টায় ছিল, অবশেষে সুযোগ পেয়ে ছোরা বসিয়েছে। আসামীর আক্রোশের যতই কারণ থাক তাতে তার অপরাধের গুরুত্ব কমে না। জুরি একমত হয়ে ভূষণকে দোষী সাব্যস্ত করলেও একটু দয়ার জন্য সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু হাকিম দয়া করলেন না, চরম দণ্ডই দিলেন।

ভূষণ পাল হিন্দুস্থান মোটর ওআর্ক্‌স-এ মিস্ত্রীর কাজ করত। ফাটা তোবড়া মডগার্ড বেমালুম মেরামত করতে তার জুড়ী ছিল না, সেজন্য মাইনে ভালই পেত। সেখানে তার গুরুস্থানীয় হেডমিস্ত্রী ছিল সাগর সামন্ত। কারখানার লোকে তাকে সামন্ত মশাই বলে ডাকে, কিন্তু একটা দূর সম্পর্ক থাকায় ভূষণ তাকে সাগর কাকা বলে।

রায় বেরুবার পরদিন বিকাল বেলা সাগর সামন্ত আলীপুর জেলে তার প্রিয় শাগরেদ ভূষণের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। দু হাতে মুখ ঢেকে হাউ হাউ করে কেঁদে সাগর বলল, কি করে তোকে বাঁচাব রে ভূষণ।

ভূষণ বলল, অমন করে তুমি কেঁদো না সাগর কাকা, তা হলে আমার মাথা বিগড়ে যাবে।

চোখ মুছতে মুছতে সাগর বলল, উকিল বাবু এখনও আশা ছাড়েননি ,শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করবেন। বললেন, আপীল করবেন।

—আপীল আবার কেন। যা হবার হয়ে গেছে, আর কিছুই করবার দরকার নেই, মিথ্যে টাকা বরবাদ হবে।

—বরবাদ নয় রে, তোকে বাঁচাবার জন্যে খরচ হবে। পোস্টাপিসে তোর যে পঁয়ত্রিশ শ টাকা ছিল তোর কথামত তার সবটাই তুলে নিয়ে আমার কাছে রেখেছি। তা থেকে দু শ আন্দাজ খরচ হয়েছে, বাকী সবই তো রয়েছে। তাতে না কুলয় তো আমরা সবাই চাঁদা তুলে আপীলের খরচ যোগাব।

—উকিল আদিত্যবাবু কত টাকা নিয়েছেন?

—নিজের জন্য একপয়সাও নেন নি, শুধু আদালতের খরচ বাবদ কিছু নিয়েছেন। বলেছেন, ভূষণকে যদি বাঁচাতে পারতুম তবেই ফী নিতুম। তিনি আর তাঁর বন্ধু উকিলরা সবাই বলেছেন, আপীল করলে নিশ্চয় রায় পালটে যাবে—লম্বা জেল হলেও তোর প্রাণটা তো রক্ষা পাবে।

—খবরদার আপীল করবে না। দশ-বিশ বছর জেলে থাকার চাইতে চটপট মরা ঢের ভাল।

—নবীনকে ছোরা মেরে খুন করলি কেন রে হতভাগা? তার চাইতে যদি পাঁচ-সেরী হুন্দর দিয়ে হাঁটুতে এক ঘা লাগাতিস তা হলে নবুনে মরত না, চিরটা কাল খোঁড়া হয়ে বেঁচে থাকত আর ভাবত—হাঁ, ভূষণ পাল সাজা দিতে জানে বটে। তোরও বড় জোর দু-চার বছর জেল হত।

—নবুনেকে একেবারে সাবড়ে দিয়েছি বেশ করেছি। তার ভূতটা যদি আমার কাছে আসে তাকেও গলা টিপে মারব।

—রাম রাম, এসব কথা মুখে আনিস নি ভূষণ, যা হয়ে গেছে একদম ভুলে যা। শুধু হরিনাম কর, মা-কালীকে ডাক, যাতে পরকালে কষ্ট না পাস। এখন বল তোর টাকার বিলি-ব্যবস্থা কি করবি। টাকা তো কম নয়, তোর বদখেয়াল ছিল না তাই এত জমাতে পেরেছিস। উইল করতে চাস তো উকিল বাবুকে বলব।

—উইল আবার কি করতে। আমার যা পুঁজি সবই তো তোমার জিম্মেয় রয়েছে। তুমিই তো বিলি করবে। আন্দাজ তেত্রিশ শ আছে তো? তুমিই বল না সাগর কাকা। কি করা উচিত।

—সব টাকা তোর পরিবারকে দিবি।

সজোরে মাথা নেড়ে ভূষণ বলল, এক পয়সাও নয়।

—আচ্ছা বউকে না হয় না দিলি, তোর এক বছরের ছেলেটা কি দোষ করল? তাকে তো মানুষ করতে হবে।

—সে আমার ছেলে নয়, সবাই তা জানে। দেখ নি, তার চোখ ঠিক নবুনের মতন ট্যারা? তারা এখন আছে কোথায়?

—যে দিন তুই গ্রেপতার হলি তার পরদিনই তোর বউ ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেছে।

—বাপের তো অবস্থা ভালই। বেটী আর বেটীর পো-কে খুব পুষতে পারবে।

—তোর বাসায় কেউ নেই খবর পেয়েই আমি তালা লাগিয়েছি। পাশে যে ঘুঁটে-ওয়ালী যশোদা বুড়ী থাকে তাকে দিয়ে মাঝে মাঝে ঘর-দোর সাফ করাই।

ও বাসা রেখে কি হবে, ভাড়া চুকিয়ে দাও। দেখ সাগর কাকা, ভুলো বলে একটা বুড়ো কুকুর রোজ আমার কাছে ভাত খেতে আসত। সে বেচারা হয়তো উপোস করছে।

—না না, যশোদাই তাকে খাওয়াচ্ছে।

—বুড়ী নিজেই তো খেতে পায় না। সাগর কাকা, যশোদাকে দু শ টাকা দিও।

—বলিস কি রে, কুকুরের জন্য অত টাকা কেন?

—যশোদা বড় গরিব, ভুলোকে খাওয়াবে নিজেও খাবে। আর একটা কথা—ভটচাজ মশাইকে জিজ্ঞেস করে আমার শ্রাদ্ধের খরচটা তাঁকে দিও। তিনিই যা হয় ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু পঞ্চাশ টাকার বেশী খরচ না হয়।

বিষণ্ণ মুখে সাগর বলল, শ্রাদ্ধ হবার জো নেই রে ভূষণ। ভটচাজ বলেছে, অপঘাত মৃত্যুতে শ্রাদ্ধ হয় না, ফাঁসি যে অপঘাত। তবে একটা প্রাশ্চিত্তির করা খুব দরকার বলেছেন, আর বারোটি ব্রাহ্মণ ভোজন।

—না, প্রাশ্চিত্তির আর ভূত ভোজন করাতে হবে না। আর শোন সাগর কাকা, নবুনের বউকে দেড় হাজার টাকা দেবে। তার খুকী গোপালীকে মানুষ করবার জন্যে।

—অবাক করলি ভূষণ! নিজের পরিবারকে কিছু দিবি নি, যাকে মেরছিস সেই নবুনের মেয়ের জন্যেই দেড় হাজার দিবি? ও বুঝেছি, এই হচ্ছে তোর প্রাশ্চিত্তির।

—কিছু বোঝ নি, প্রাশ্চিত্তির করবার কোনও গরজ আমার নেই। ওই গোপালীটা ছিল আমার বড্ড ন্যাওটো, কাকা বলতে পারত না, আআ বলে হাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে কোলে উঠত।

—বেশ, গোপালীর মাকে দেড় হাজার টাকা দেব। তোর ওপর তার মর্মান্তিক রাগ থাকার কথা, তবে খুব কষ্টে আছে, টাকাটা নিতে আপত্তি করবে না। এটা ভালই করলি ভূষণ, এতে তোর পাপ অনেকটা ক্ষয় হয়ে যাবে। তার পর আর কাকে কি দিতে চাস?

—বাকী সবটা তুমি নিও।

আবার হাউ হাউ করে কেঁদে সাগর বলল, তোর টাকা আমি কোন প্রাণে নেব রে? সৎপাত্রে দান কর, পরকালে তোর ভাল হবে।

—তোমার চাইতে সৎপাত্র পাব কোথা। আমার বাবা মা ভাই বোন কেউ নেই, শুধু তুমিই আছ। আচ্ছা সাগর কাকা, মরবার পরে যমদূত আমাকে সোজা নরকে নিয়ে যাবে তো?

—তা আমার মনে হয় না। আমাদের হাকিমদের চাইতে যমরাজ ঢের বেশী বোঝেন। অন্যায় সইতে না পেয়ে রাগের মাথায় একটা পাপ করে ফেলেছিস, তার সাজাও মাথা পেতে নিচ্ছিস, আপীল পর্যন্ত করতে চাস না। তোর পাপ বোধ হয় এখানেই খণ্ডে গেল। আদিত্য উকিল বাবু কি বলেছে জানিস? ইংরেজ বিদেয় হয়েছে, কিন্তু নিজেদের ফৌজদারী আইন আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে গেছে। ওদের দেশে নবুনের অপরাধটা কিছুই নয়, তার জন্যে কেউ খেপে গিয়ে মানুষ খুন করে না, বড় জোর খেসারত দাবি করে আর তালাকের দরখাস্ত করে। ওদের বিচারে নবুনের চাইতে তোর অপরাধ ঢের বেশী। কিন্তু যদি সেকালের হিঁদু রাজা কি মুসলমান বাদশার আমল হত তবে তুই বেকসুর খালাস পেতিস। দেখ ভূষণ, আমার মনে হয় তোর স্বর্গে ঠাঁই হবে না বটে, কিন্তু নরক ভোগ থেকেও তুই রেহাই পাবি।

—স্বর্গেও নয় নরকেও নয়, তবে ঠাঁই হবে কোথায়?

—তুই আবার জন্মাবি।

—সে তো খুব ভালই হবে। সাগর কাকা, কাকীকে বলো আমার জন্যে যেন খান কতক কাঁথা সেলাই করে রাখে।

—কাঁথা কি হবে রে?

—শুনেছি মরবার সময় মানুষের যে মনোবাঞ্ছা থাকে পরের জন্মে তাই ফলে। ফাঁসির সময় আমি কেবল তোমার আর কাকীর কথা ভাবব। দেখো, ঠিক তোমাদের ছেলে হয়ে জন্মাব। এমন বাপ মা পাব কোথায়? দাগী ছেলেকে ঘেন্না করে ফেলে দেবে না তো সাগর কাকা?

জেলের ওআর্ডার এসে জানাল, সময় হয়ে গেছে, ভিজিটারকে এখন চলে যেতে হবে।

সাগর সামন্ত ভূষণকে একবার জড়িয়ে ধরল, তার পর ফোঁপাতে ফোঁপাতে চলে গেল।

১৮৮০ শক (১৯৫৯)

দাঁড়কাগ

কাঞ্চন মজুমদার অনেক কাল পরে তার বন্ধু যতীশ মিত্রের আড্ডায় এসেছে। তাকে দেখে সকলে উৎসুক হয়ে নানারকম সম্ভাষণ করতে লাগল।—আরে এস এস, এত দিন কোথায় ডুব মেরে ছিলে? বিদেশে বেড়াতে গিয়েছিলে নাকি? ব্যারিস্টারিতে খুব রোজগার হচ্ছে বুঝি, তাই গরীবদের আর মনে পড়ে না?

প্রবীণ পিনাকী সর্বজ্ঞ বললেন, বে-থা করলে, না এখনও আইবুড় কার্তিক হয়ে আছ?

কাঞ্চন বলল, কই আর বিয়ে হল সর্বজ্ঞ মশাই, পাত্রীই জুটছে না।

উপেন দত্ত বলল, আমাদের মতন চুনো পুঁটি সকলেরই কোন্ কালে জুটে গেছে, শুধু তোমারই জোটে না কেন? অমন মদনমোহন চেহারা, উদীয়মান ব্যারিস্টার, দেদার পৈতৃক টাকা, তবু বিয়ে হয় না? ধনুকভাঙা পণ কিছু আছে বুঝি? এদিকে বয়স তো হুহু করে বেড়ে যাচ্ছে, চুল উঠে গিয়ে ডিউক অভ এডিনবরোর মতন প্রশস্ত ললাট দেখা দিচ্ছে, খুঁজলে দু-চারটে পাকা চুলও বেরুবে। পাত্রীরা তোমাকে বয়কট করেছে নাকি?

—বয়কট করলে তো বেঁচে যেতুম। ষোল থেকে বত্রিশ যেখানে যিনি আছেন সবাই ছেঁকে ধরেছেন। গণ্ডা গণ্ডা রূপসী যদি আমার প্রেমে পড়তে চান তবে বেছে নেব কাকে?

উপেন বলল, উঃ, দেমাকের ঘটাখানা দেখ! তুমি কি বলতে চাও গণ্ডা গণ্ডা রূপসীর মধ্যে তোমার উপযুক্ত কেউ নেই? আসল কথা, তুমি ভীষণ খুঁতখুঁতে মানুষ। নিশ্চয় তোমার মনের মধ্যে কোনও গণ্ডগোল আছে, নিজেকে অদ্বিতীয় রূপবান গুণনিধি মনে কর তাই পছন্দ মত মেয়ে কিছুতেই খুঁজে পাও না। হয়তো মেয়েরাই তোমার কথা শুনে ভড়কে যায়।

—মিছিমিছি আমার দোষ দিও না উপেন। বিয়ের জন্যে আমি সত্যিই চেষ্টা করছি, কিন্তু যাকে তাকে তো চিরকালের সঙ্গিনী করতে পারি না। হঠাৎ প্রেমে পড়ার লোক আমি নই, আমার একটা আদর্শ একটা মিনিমম স্ট্যান্ডার্ড আছে। রূপ অবশ্যই চাই, কিন্তু বিদ্যা বুদ্ধি কলচারও বাদ দিতে পারি না। সুশিক্ষিত অথচ শান্ত নম্র মেয়ে হবে, বিলাসিনী উড়নচণ্ডী বা উগ্রচণ্ডা খাণ্ডারনী হলে চলবে না। একটু আধটু নাচুক তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু হরদম নাচিয়ে মেয়ে আমার পছন্দ নয়। মনের মতন স্ত্রী আবিষ্কার করা কি সোজা কথা? এ পর্যন্ত তো খুঁজে পাই নি।

—পাবার কোনও আশা আছে কি?

—তা আছে, সেই জন্যেই তো যতীশের কাছে এসেছি। আচ্ছা যতীশ, গণেশ-মুণ্ডা জায়গাটা কেমন? তুমি তো মাঝে মাঝে সেখানে যেতে। শুনেছি এখন আর নিতান্ত দেহাতী পল্লী নয়, অনেকটা শহরের মতন হয়েছে।

যতীশ বলল, তোমার নির্বাচিতা প্রিয়া ওখানেই আছেন নাকি?

—নির্বাচন এখনও করি নি। শম্পা সেন ওখানকার নতুন গার্ল স্কুলের নতুন হেডমিস্ট্রেস। মাস চার-পাঁচ আগে নিউ আলীপুরে আমার ভাগনীর বিয়ের প্রীতি-ভোজে একটু পরিচয় হয়েছিল। খুব লাইকলি পার্টি মনে হয়, তাই আলাপ করে বাজিয়ে দেখতে চাই।

পিনাকী সর্বজ্ঞ বললেন, শম্পা সেনও তো তোমাকে বাজিয়ে দেখবেন। তিনি তোমাকে পছন্দ করবেন এমন আশা আছে?

—কি বলছেন সর্বজ্ঞ মশাই! আমি প্রোপোজ করলে রাজী হবে না এমন মেয়ে এদেশে নেই।

উপেন বলল, তবে অবিলম্বে যাত্রা কর বন্ধু, তোমার পদার্পণে তুচ্ছ গণেশমুণ্ডা ধন্য হবে। গিয়ে হয়তো দেখবে তোমাকে পাবার জন্যে শম্পা দেবী পার্বতীর মতন কৃচ্ছ্রসাধনা করছেন।

—ঠাট্টা রাখ, কাজের কথা হক। ওখানে শুনেছি হোটেল নেই, ডাকবাঙলাও নেই। যতীশ, তুমি নিশ্চয় ওখানকার খবর রাখ। একটা বাসা যোগাড় করে দিতে পার?

যতীশ বলল, তা বোধ হয় পারি, তবে তোমার পছন্দ হবে কিনা জানি না। আমার দূর সম্পর্কের এক খুড়শাশুড়ী তাঁর মেয়েকে নিয়ে ওখানে থাকেন, মেয়ে কি একটা সরকারী নারী-উদ্যোগশালা না সর্বাত্মক শিল্পাশ্রমের ইন চার্জ। নিজের বাড়ি আছে, মা আর মেয়ে দোতলায় থাকেন, একতলাটা যদি খালি থাকে তো তোমাকে ভাড়া দিতে পারেন।

—তবে আজই একটা প্রিপেড টেলিগ্রাম কর, আমি তিন-চার দিনের মধ্যেই যেতে চাই। একটা চাকর সঙ্গে নেব, সেই রান্না আর সব কাজ করবে। উত্তর এলেই আমাকে টেলিফোনে জানিও। আচ্ছা, সর্বজ্ঞ মশাই, আজ উঠলুম, যাবার আগে আবার দেখা করব।

উপেন বলল, তার জন্যে ব্যস্ত হয়ো না, তবে ফিরে এসে অবশ্যই ফলাফল জানিও, আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলুম। কিন্তু শুধু হাতে যদি এস তো দুও দেব।

কাঞ্চন মজুমদার চলে যাবার পর পিনাকী সর্বজ্ঞ বললেন, ওর মতন দাম্ভিক লোকের বিয়ে কোনও কালে হবে না, হলেও ভেঙে যাবে। কাঞ্চনের জোড়া ভুরু সুলক্ষণ নয়। বিষবৃক্ষের হীরা, চোখের বালির বিনোদ বোঠান, ঘরে বাইরের সন্দীপ, গৃহদাহর সুরেশ, সব জোড়া ভুরু। তারা কেউ সংসারী হতে পারে নি।

উপেন বলল, সন্দীপ আর সুরেশের জোড়া ভুরু কোথায় পেলেন?

—বই খুঁজলেই পাবে, না যদি পাও তো ধরে নিতে হবে। শম্পা সেনের যদি বুদ্ধি থাকে তবে নিশ্চয় কাঞ্চনকে হাঁকিয়ে দেবে।

যতীশ বলল, শম্পা সেনকে চিনি না, সে কি করবে তাও জানি না। তবে অনুমান করছি, গণেশমুণ্ডায় দাঁড়কাগের ঠোকর খেয়ে কাঞ্চন নাজেহাল হবে।

উপেন প্রশ্ন করল, দাঁড়কাগটি কে?

— সম্পর্কে আমার শালী, যে খুড়শাশুড়ীর বাড়িতে কাঞ্চন উঠতে চায় তাঁরই কন্যা। তারও জোড়া ভুরু। আগে নাম ছিল শ্যামা, ম্যাট্রিক দেবার সময় নিজেই নাম বদলে তমিস্রা করে। কালো আর শ্রীহীন সেজন্যে লোকে আড়ালে তাকে দাঁড়কাগ বলে।

উপেন বলল, তা হলে কাঞ্চন নাজেহাল হবে কেন? কোনও সুন্দরী মেয়েই এ পর্যন্ত তাকে বাঁধতে পারে নি, তোমার কুৎসিত শালীকে সে গ্রাহ্যই করবে না। এই দাঁড়কাগ তমিস্রার হিস্টরি একটু শুনতে পাই না? অবশ্য তোমার যদি বলতে আপত্তি না থাকে।

—আপত্তি কিছুই নেই। ছেলেবেলায় বাপ মারা যান। অবস্থা ভাল, বীডন স্ট্রীটে একটা বাড়ি আছে। মায়ের সঙ্গে সেখানে থাকত আর স্কটিশ চার্চে পড়ত। স্কুল কলেজের আর পাড়ার বজ্জাত ছোকরারা তাকে দাঁড়কাগ বলে খেপাত, কেউ কেউ সংস্কৃত ভাষায় বলত, দণ্ডবায়স হুশ। এখানে সে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, আই. এস-সি. পাস করেই মায়ের সঙ্গে মাদ্রাজে চলে যায়। সেখানে ওর চেহারা কেউ লক্ষ্য করত না, খেপাতও না। মাদ্রাজ থেকে বি. এস-সি. আর এম· এস-সি· পাস করে, তার পর তার পিতৃবন্ধু এক বিহারী মন্ত্রীর অনুগ্রহে গণেশমুণ্ডায় নারী-উদ্যোগশালায় চাকরি পায়। খুব কাজের মেয়ে, তমিস্রা নাগের বেশ খ্যাতি হয়েছে। মিষ্টি গলা, চমৎকার গান গায়, সুন্দর বক্তৃতা দেয়, কথাবার্তায় অতি ব্রিলিয়ান্ট। ওর দাঁড়কাগ উপাধিটা ওখানেও পৌঁছেছে, হিন্দীতে হয়েছে কৌআদিদি। গুণগ্রাহী অ্যাডমায়ারারও দু-চারজন আছে, কিন্তু কেউ বেশী দূর এগুতে পারে নি। নিজের রূপ নেই বলে পুরুষ জাতটার ওপর ওর একটা আক্রোশ আছে, খোঁচা দিতে ভালবাসে।

কাঞ্চনকে স্বাগত জানিয়ে তমিস্রা বলল, কোনও ভাল জায়গায় না গিয়ে এই তুচ্ছ গণেশমুণ্ডায় হাওয়া বদলাতে এলেন কেন? আমাদের এই বাড়ি অতি ছোট, আসবাবও সামান্য, অনেক অসুবিধা আপনাকে সইতে হবে।

কাঞ্চন বলল, ঠিক হাওয়া বদলাতে নয়, একটু কাজে এসেছি। আমার অসুবিধা কিছুই হবে না। একটা রান্নার জায়গা আমার চাকরকে দেখিয়ে দেবেন, আর দয়া করে কিছু বাসন দেবেন। যতীশকে যে টেলিগ্রাম করেছিলেন তাতে তো ভাড়ার রেট জানান নি।

—যতীশবাবু আমাদের কুটুম্ব, আপনি তাঁর বন্ধু, অতএব আপনিও কুটুম্ব। ভাড়া নেব কেন? রান্নার ব্যবস্থাও আপনাকে করতে হবে না, আমাদের হেঁসেলেই খাবেন। অবশ্য বিলাতের রিৎস-কার্লটন বা দিল্লির অশোকা হোটেলের মতন সার্ভিস পাবেন না, সামান্য ভাত ডাল তরকারিতেই তুষ্ট হতে হবে। মাছ এখানে দুর্লভ, তবে চিকেন পাওয়া যায়।

—না না, এ বড়ই অন্যায় হবে মিস নাগ। বাড়ি ভাড়া নেবেন না, আবার বিনা খরচে খাওয়াবেন, এ হতেই পারে না।

তমিস্রা স্মিতমুখে বলল, ও, বিনামূল্যে অতিথি হলে আপনার মর্যাদার হানি হবে? বেশ তো, থাকা আর খাওয়ার জন্যে রোজ তিন টাকা দেবেন।

—তিন টাকায় থাকা আর খাওয়ার খরচ কুলোয় না, আমার চাকরও তো আছে।

—আচ্ছা আচ্ছা, পাঁচ সাত দশ যাতে আপনার সংকোচ দূর হয় তাই দেবেন। টাকা খরচ করে যদি তৃপ্তি পান তাতে আমি বাধা দেব কেন। দেখুন, আমার মায়ের কোমরের ব্যথাটা বেড়েছে, নীচে নামতে পারবেন না। আপনি চা খেয়ে বিশ্রাম করে একবার ওপরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন, কেমন?

—অবশ্যই করব। আচ্ছা, আপনাদের এই গণেশমুণ্ডায় দেখবার জিনিস কি কি আছে?

—লাল কেল্লা নেই, তাজমহল নেই, কাঞ্চনজঙ্ঘাও নেই। মাইল দেড়েক দূরে একটা ঝরনা আছে, ঝম্পাঝোরা। কাছাকাছি একটা পাহাড় আছে, পঞ্চাশ বছর আগে বিপ্লবীরা সেখানে বোমার ট্রায়াল দিত। তাদের দলের একটি ছেলে তাতেই মারা যায়, তার কঙ্কাল নাকি এখনও একটা গভীর খাদের নীচে দেখা যায়। ওই যে মাঠ দেখছেন ওখানে প্রতি সোমবারে একটা হাট বসে, তাতে ময়ূর হরিণ ভালুকের বাচ্চা থেকে মধু মোম ধামা চুবড়ি পর্যন্ত কিনতে পাবেন।

—আর আপনার নিজের কীর্তি, মহিলা-উদ্যোগশালা না কি, তাও তো দেখতে হবে। গাড়িটা আনতে পারি নি, হেঁটেই সব দেখব। আপনি সঙ্গে থেকে দেখাবেন তো?

—দেখাব বইকি। আপনার মতন সম্ভ্রান্ত পর্যটক এখানে ক জন আসে। বিকাল বেলায় আমার সুবিধে, সকালে দুপুরে কাজ থাকে। যেদিন বলবেন সঙ্গে যাব।

তিন রকম লোক ডায়ারি লেখে—কর্মবীর, ভাবুক আর হামবড়া। কাঞ্চনেরও সে অভ্যাস আছে। রাত্রে শোবার আগে সে ডায়ারিতে লিখল—পুওর তমিস্রা নাগ, তোমার জন্য আমি রিয়ালি সরি। যেরকম সতৃষ্ণ নয়নে আমাকে দেখছিলে তাতে বুঝেছি তুমি শরাহত হয়েছ। কথাবার্তায় মনে হয় তুমি অসাধারণ বুদ্ধিমতী। দেখতে বিশ্রী হলেও তোমার একটা চার্ম আছে তা অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু আমার কাছে তোমার কোনও চান্সই নেই, এই সোজা কথাটা তোমার অবিলম্বে বোঝা দরকার, নয়তো বৃথা কষ্ট পাবে। কালই আমি তোমাকে ইঙ্গিতে জানিয়ে দেব।

পরদিন সকালে কাঞ্চন বলল, আপনাকে এখনই বুঝি কাজে যেতে হবে? যদি সুবিধা হয় তো বিকেলে আমার সঙ্গে বেরুবেন। এখন আমি একটু একাই ঘুরে আসি। আচ্ছা, শম্পা সেনকে চেনেন, গার্ল স্কুলের হেডমিস্ট্রেস?

তমিস্রা বলল, খুব চিনি, চমৎকার মেয়ে। আপনার সঙ্গে আলাপ আছে?

—কিছু আছে। যখন এসেছি তখন একবার দেখা করে আসা যাক। বেশ সুন্দরী, নয়? আর চার্মিং। শুনেছি এখনও হার্টহোল আছে, জড়িয়ে পড়ে নি।

—হাঁ, রূপে গুণে খাসা মেয়ে। ভাল করে আলাপ করে ফেলুন, ঠকবেন না।

স্কুলের কাছেই একটা ছোট বাড়িতে শম্পা বাস করে। কাঞ্চন সেখানে গিয়ে তাকে বলল, গুডমর্নিং মিস সেন, চিনতে পারেন ? আমি কাঞ্চন মজুমদার, সেই যে নিউ আলীপুরে আমার ভগিনীপতি রাঘব দত্তর বাড়িতে আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। মনে আছে তো?

শম্পা বলল, মনে আছে বইকি। আপনি হঠাৎ এদেশে এলেন যে? এখন তো চেঞ্জের সময় নয়।

—এখানে একটু দরকারে এসেছি। ভাবলুম, যখন এসে পড়েছি তখন আপনার সঙ্গে দেখা না করাটা অন্যায় হবে। মনে আছে, সেদিন আমাদের তর্ক হচ্ছিল, গেটে বড় না রবীন্দ্রনাথ বড়? আমি বলেছিলুম, গেটের কাছে রবীন্দ্রনাথ দাঁড়াতে পারেন না, আপনি তা মানেন নি। ডিনারের ঘণ্টা পড়ায় আমাদের তর্ক সেদিন শেষ হয় নি।

—এখানে তার জের টানতে চান নাকি? তর্ক আমি ভালবাসি না, আপনার বিশ্বাস আপনার থাকুক, আমারটা আমার থাকুক, তাতে গেটে কি রবীন্দ্রনাথের ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না।

—আচ্ছা, তর্ক থাকুক। আমি এখানে নতুন এসেছি, দ্রষ্টব্য যা আছে সব দেখতে চাই। আপনি আমার গাইড হবেন?

—এখানে দেখবার বিশেষ কিছু নেই। আপনি উঠেছেন কোথায়?

—তমিস্রা নাগকে চেনেন? তাঁদেরই বাড়িতে আছি।

—তমিস্রাকে খুব চিনি। সেই তো আপনাকে দেখাতে পারবে, আমার চাইতে ঢের বেশী দিন এখানে বাস করছে, সব খবরও রাখে। আমার সময়ও কম, বেলা দশটার সময় স্কুলে যেতে হয়।

—সকালে ঘণ্টা খানিক সময় হবে না?

—আচ্ছা, চেষ্টা করব, কিন্তু সব দিন আপনার সঙ্গে যেতে পারব না। কাল সকালে আসতে পারেন।

আরও কিছুক্ষণ থেকে কাঞ্চন চলে গেল। দুপুর বেলা ডায়ারিতে লিখল—মিস শম্পা সেন, তোমাকে ঠিক বুঝতে পারছি না। এখানে আসবার আগে ভাল করেই খোঁজ নিয়েছিলুম, সবাই বলেছে এখনও তুমি কারও সঙ্গে প্রেমে পড় নি। আমি এখানে এসে দেরি না করে তোমার কাছে গিয়েছি, এতে তোমার খুব ফ্ল্যাটার্ড আর রীতিমত উৎফুল্ল হবার কথা। তুমি সুন্দরী, বিদুষীও বটে, কিন্তু আমার চাইতে তোমার মূল্য ঢের কম। রূপে গুণে বিত্তে আমার মতন পাত্র তুমি কটা পাবে? মনে হচ্ছে তুমি একটু অহংকেরে, মানুষ চেনবার শক্তিও তোমার কম।

কাঞ্চন প্রায় প্রতিদিন সকালে শম্পার সঙ্গে আর বিকালে তমিস্রার সঙ্গে বেড়াতে লাগল। গণেশমুণ্ডায় একটি মাত্র বড় রাস্তা, তারই ওপর তমিস্রাদের বাড়ি। একটু এগিয়ে গেলেই গোটাকতক দোকান পড়ে, তার মধ্যে বড় হচ্ছে রামসেবক পাঁড়ের মুদী-খানা আর কহেলিরাম বজাজের কাপড়ের দোকান। এইসব দোকানের সামনে দিয়েই কাঞ্চন আর তার সঙ্গিনী শম্পা বা তমিস্রার যাতায়াতের পথ। দোকানদাররা খুব নিরীক্ষণ করে ওদের দেখে।

একদিন বেড়িয়ে ফেরবার সময় তমিস্রা রামসেবকের দোকানে এসে বলল, পাঁড়েজী, এই ফর্দটা নাও, সব জিনিস কাল পাঠিয়ে দিও। চিনিতে যেন পিঁপড়ে না থাকে।

রামসেবক বলল, আপনি কিছু ভাববেন না দিদিমণি, সব খাঁটী মাল দিব। এই বাবুসাহেবকে তো চিনছি না, আপনাদের মেহমান (অতিথি)?

—হাঁ, ইনি এখানে বেড়াতে এসেছেন।

—রাম রাম বাবুজী। আমার কাছে সব ভাল ভাল জিনিস পাবেন, মহীন বাসমতী চাউল, খাঁটী ঘিউ, পোলাও-এর সব মসালা, কাশ্মীরী জাফরান, পিস্তা বাদাম কিশমিশ। আসেটিলীন বাত্তি ভি আমি রাখি।

কাঞ্চন বলল, ও সবের দরকার আমার নেই।

—না হুজুর, ভোজের দরকার তো হতে পারে, তখন আমার বাত ইয়াদ রাখবেন।

দোকান থেকে বেরিয়ে কাঞ্চন বলল, লোকটা আমাকে ভোজনবিলাসী ঠাউরেছে।

তমিস্রা হেসে বলল, তা নয়। ডিকেন্স-এর সারা গ্যাম্প-কে মনে আছে? তার পেশা ধাইগিরি আর রোগী আগলানো। সদ্য বিবাহিত বর-কনে গির্জা থেকে বেরুচ্ছে দেখলেই সারা গ্যাম্প তাদের হাতে নিজের একটা কার্ড দিত। তার মানে, প্রসবের সময় আমাকে খবর দেবেন। গণেশমুণ্ডার দোকানদাররাও সেই রকম। কুমারী মেয়ে

কোনও জোয়ান পুরুষের সঙ্গে বেড়াচ্ছে দেখলেই মনে করে বিবাহ আসন্ন, তাই নিজের আর্জি আগে থাকতেই জানিয়ে রাখে।

—এদের আক্কেল কিছুমাত্র নেই। আমার সঙ্গে আপনাকে দেখে—

—অমন ভুল বোঝা ওদের উচিত হয় নি, তাই না? কি জানেন, এরা হচ্ছে ব্যবসাদার, সুরূপ কুরূপ গ্রাহ্য করে না, শুধু লাভ-লোকসান বোঝে। আপনি যে মস্ত ধনী লোক তা এরা জানে না। ভেবেছে, আমার মায়ের বাড়ি আছে, অন্য সম্পত্তিও আছে, আমি একমাত্র সন্তান, রোজগারও করি, অতএব বিশ্রী হলেও আমি সুপাত্রী।

—এরা অতি অসভ্য, এদের ভুল ভেঙে দেওয়া দরকার।

—আপনি শম্পাকে নিয়ে ওদের দোকানে গেলেই ভুল ভাঙবে।

পরদিন সকালে শম্পার সঙ্গে যেতে যেতে কাঞ্চন বলল, আমার এক জোড়া সক্স দরকার।

শম্পা বলল, চলুন কহেলিরামের দোকানে।

কহেলিরাম সসম্ভ্রমে বলল, নমস্তে বাবুসাহেব, আসেন সেন মিসিবাবা। মোজা চাহি? নাইলন, সিল্ক, পশমী, সুতী—

কাঞ্চন বলল, দশ ইঞ্চ গ্রে উলুন একজোড়া দাও।

মোজা দিয়ে কহেলিরাম বলল, যা দরকার হবে সব এখানে পাবেন হুজুর। হাওআই বুশশার্ট আছে, লিবার্টি আছে, ট্রাউজার ভি আছে। জর্জেট ভয়েল নাইলন শাড়ি আছে, বনারসী ভি আমি রাখি, ভেলভেট সাটিন কিংখাব ভি। ভাল ভাল বিলাতী এসেন্স ভি রাখি। দেখবেন হুজুর?

দোকান থেকে বেরিয়ে কাঞ্চন সহাস্যে বলল, বর-কনের পোশাক সবই আছে, এরা একবারে স্থির করে ফেলেছে দেখছি।

বিকালে কাঞ্চনের সঙ্গে তমিস্রা রামসেবকের দোকানে এসে এক বাণ্ডিল বাতি কিনল। রামসেবক বলল, দিদিমণি, একঠো ছোকরা চাকর রাখবেন? খুব কাজের লোক, আপনার বাজার করবে, চা বানাবে, বিছানা করবে, বাবুসাহেবের জুতি ভি বুরুশ করবে। দরমাহা বহুত কম, দশ টাকা দিবেন। আমি ওর জামিন থাকব। এ মুন্নালাল, ইধর আ।

তমিস্রার একটা চাকরের দরকার ছিল, মুন্নালালকে পেয়ে খুশী হল। বয়স আন্দাজ ষোল, খুব চালাক আর কাজের লোক।

রাত্রে কাঞ্চন তার ডায়ারিতে লিখল, শম্পা, তোমার কি উচ্চাশা নেই, নিজের ভাল-মন্দ বোঝবার শক্তি নেই? আমাকে তো কদিন ধরে দেখলে, কিন্তু তোমার তরফ থেকে কোনও সাড়া পাচ্ছি না কেন? তমিস্রা তো আমাকে খুশী করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। যাই হক, আর দুদিন দেখে তোমার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করব।

তিন দিন পরে বিকালে তমিস্রা চায়ের ট্রে আনল দেখে কাঞ্চন বলল, আপনি আনলেন কেন, মুন্নালাল কোথায়?

তমিস্রা সহাস্যে বলল, সে শম্পার বাড়ি বদলী হয়েছে।

—আপনিই তাকে পাঠিয়েছেন?

—আমি নয়, তার আসল মনিব রামসেবক পাঁড়ে, সেই মুন্নাকে ট্রান্সফার করেছে, এখানে তাকে রেখে আর লাভ নেই।

—কিছুই বুঝলুম না।

—আপনি একেবারে চক্ষুকর্ণহীন। শম্পা, আমি আর আপনি—এই তিনজনকে নিয়ে গণেশমুণ্ডার বাজারে কি তুমুল কাণ্ড হচ্ছে তার কোনও খবরই রাখেন না। শুনুন।—মুন্নালাল হচ্ছে রামসেবকের স্পাই, গুপ্তচর। ওর ডিউটি ছিল আপনার আর আমার প্রেম কতটা অগ্রসর হচ্ছে তার দৈনিক রিপোর্ট দেওয়া। যখন সে জানাল যে কুছ ভি নহি, নথিং ডুইং, তখন তার মনিব তাকে শম্পার বাড়ি পাঠাল, শম্পা আর আপনার ওপর নজর রাখবার জন্যে।

—কিন্তু তাতে ওদের লাভ কি?

—আপনি হচ্ছেন রেসের গোল-পোস্ট, শম্পা আর আমি দুই ঘোড়া। কে আপনাকে দখল করে তাই নিয়ে বাজি চলছে। রামসেবক বুক-মেকার হয়েছে। প্রথম কদিন আমারই দর বেশী ছিল, থ্রী-টু-ওআন কোঅাদিদি। কিন্তু কাল থেকে শম্পা এগিয়ে চলেছে ফাইভ-টু-ওআন সেন-মিসিবাবা। আমার এখন কোনও দরই নেই।

—উঃ. এখানকার লোকেরা একবারে হার্টলেস, মানুষের হৃদয় নিয়ে জুয়া খেলে! নাঃ, চটপট এর প্রতিকার করা দরকার।

—সে তো আপনারই হাতে, কালই শম্পার কাছে আপনার হৃদয় উদ্‌ঘাটন করুন আর তাকে নিয়ে কলকাতায় চলে যান।

পরদিন সকাল বেলা শম্পা বলল, আজ আর বেড়াতে পারব না, শুধু কহেলিরামের দোকানে একবার যাব।

কাঞ্চন বলল, বেশ তো, চলুন না, সেখানেই যাওয়া যাক।

শম্পার ওপর কহেলিরাম অনেক টাকার বাজি ধরেছিল। দুজনকে দেখে মহা সমাদরে বলল, আসেন আসেন বাবুসাহেব, আসেন সেন-মিসিবাবা। হুকুম করুন কি দিব।

শম্পা বলল, একটা তাঞ্জোর শাড়ি চাই, কিন্তু দাম বেশী হলে চলবে না, কুড়ি টাকার মধ্যে।

—আরে দামের কথা ছোড়িয়ে দেন, আপনার কাছে আবার দাম! এই দেখুন, অচ্ছা জরিপাড়, পঁয়ত্রিশ টাকা। আর এই দেখুন, নয়া আমদানি চিদম্বরম সিল্ক শাড়ি, অসমানী রঙ, নকশাদার জরিপাড়, চওড়া আঁচলা, বহুত উমদা। এর অসলী দাম তো দো শও রুপেয়া, লেকিন আপনার কাছে দেড় শও লিব।

শম্পা মাথা নেড়ে বলল, কোনওটাই চলবে না, অত টাকা খরচ করতে পারব না। থাক, এখন শাড়ি চাই না, আসছে মাসে দেখা যাবে।

কাঞ্চন বলল, এই চিদম্বরম শাড়িটা কেমন মনে করেন?

শম্পা বলল, ভালই, তবে দাম বেশী বলছে।

—আচ্ছা, আপনি যখন কিনলেন না তখন আমিই নিই।

কহেলিরাম দন্তবিকাশ করে শাড়িটা সযত্নে প্যাক করে দিল।

শম্পা বলল, কাকেও উপহার দেবেন বুঝি? তা কলকাতায় কিনলেন না কেন?

শম্পার বাসায় এসে কাঞ্চন বলল, শম্পা, এই শাড়িটা তোমার জন্যেই কিনেছি, তুমি পরলে আমি কৃতার্থ হব।

ভ্রূ কুঁচকে শম্পা বলল, আপনার দেওয়া শাড়ি আমি নেব কেন, আপনার সঙ্গে তো কোন আত্মীয় সম্পর্ক নেই।

—শম্পা, তুমি মত দিলেই চূড়ান্ত সম্পর্ক হবে, আমার সর্বস্ব নেবার অধিকার

তুমি পাবে। বল, আমাকে বিবাহ করবে? আমি ফেলনা পাত্র নই, আমার রূপ আছে, বিদ্যা আছে, বাড়ি গাড়ি টাকাও আছে। তোমাকে সুখে রাখতে পারব।

—থামুন, ওসব কথা বলবেন না।

—কেন, অন্যায় তো কিছু বলছি না। আমার প্রস্তাবটা বেশ করে ভেবে উত্তর দাও।

—ভাববার কিছু নেই, উত্তর যা দেবার দিয়েছি। ক্ষমা করবেন, আপনার প্রস্তাবে রাজী হতে পারব না।

অত্যন্ত রেগে গিয়ে কাঞ্চন বলল, একবারে সরাসরি প্রত্যাখান? মিস সেন, আপনি ঠকলেন, কি হারালেন তা এর পর বুঝতে পারবেন।

সমস্ত পথ আপন মনে গজ গজ করতে করতে কাঞ্চন ফিরে এল। ডায়ারিতে লেখবার চেষ্টা করল, কিন্তু তার সোনালী শার্পার কলম থেকে এক লাইনও বেরুল না। সমস্ত দুপুর সে অস্থির হয়ে ভাবতে লাগল।

বিকাল বেলা তমিস্রা তার কর্মস্থান থেকে ফিরে এসে কাঞ্চনকে দেখে বলল, একি মিস্টার মজুমদার, চুল উষ্ক খুষ্ক, চোখ লাল, মুখ শুখনো, অসুখ করেছে নাকি?

কাঞ্চন বলল, না অসুখ করেনি। তমিস্রা, এই শাড়িটা তুমি নাও, আর বল যে আমাকে বিয়ে করতে রাজী আছ।

তমিস্রা খল খল করে হাসল, যেন শূন্য বালতির ওপর কেউ কল খুলে দিল। তার পর বলল, এই ফিকে নীল শাড়িটা নিশ্চয় আমার জন্যে কেনেন নি, শম্পাকে দিতে গিয়েছিলেন, সে হাঁকিয়ে দিয়েছে তাই আমাকে দিচ্ছেন। মাথা ঠান্ডা করুন, রাগের মাথায় বোকামি করবেন না।

—তমিস্রা, আমি কলকাতায় ফিরে গিয়ে মুখ দেখাব কি করে, বন্ধুদের কি বলব? তারা যে সবাই দুও দেবে। তুমি আমাকে বাঁচাও, বিয়েতে মত দাও। আমি যেন সবাইকে বলতে পারি, রূপ আমি গ্রাহ্য করি না, শুধু গুণ দেখেই বিয়ে করেছি।

—আপনি যদি অন্ধ হতেন তা হলে না হয় রাজী হতুম। কিন্তু চোখ থাকতে কত দিন দাঁড়াকাগকে সইতে পারবেন? শম্পা আর আমি ছাড়া কি মেয়ে নেই? যা বলছি শুনুন। —কাল সকালের ট্রেনে কলকাতায় ফিরে যান। আপনি হিসেবী লোক, প্রেমে পড়ে বিয়ে করা আপনার কাজ নয়, সেকেলে পদ্ধতিই আপনার পক্ষে ভাল। ঘটক লাগিয়ে পাত্রী স্থির করুন। বেশী যাচাই করবেন না, তবে একটু বোকা-সোকা মেয়ে হলেই ভাল হয়, অন্তত আপনার চাইতে একটু বেশী বোকা, তবেই আপনাকে বরদাস্ত করা তার পক্ষে সহজ হবে।

১৮৮১ শক (১৯৫৯)

গণৎকার

লোকটির নাম হয়তো আপনাদের মনে আছে। কয়েক বৎসর আগে খবরের কাগজে তাঁর বড় বড় বিজ্ঞাপন ছাপা হত—ডক্টর মিনান্ডার দ মাইটি, জগদ্‌বিখ্যাত গ্রীক অ্যাস্ট্রোপামিস্ট, ত্রিকালজ্ঞ জ্যোতিষী, হস্তরেখাবিশারদ, ললাটলিপিপাঠক, গ্রহ-রত্নবিধায়ক, হিপনটিস্ট, টেলিপ্যাথিস্ট, ক্লেয়ারভয়ান্ট ইত্যাদি। ইনি ইজিপ্টে বহুদিন গবেষণা করে হার্মেটিক গুপ্তবিদ্যা আয়ত্ত করেছেন, দামস্কসে কালডীয় জ্যোতিষের রহস্য ভেদ করেছেন, কামরূপ-কামাখ্যায় তন্ত্রমন্ত্র শিখেছেন, কাশীতে ভৃগুসংহিতার হাড়হদ্দ জেনে নিয়েছেন। কিছুই জানতে এঁর বাকী নেই।

আমার ভাগনে বঙ্কার মুখে তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনলুম।—ওঃ, এমন মহাপুরুষ দেখা যায় না, কলকাতার সমস্ত রাজজ্যোতিষীর অন্ন মেরে দিয়েছেন। বড় বড় ব্যারিস্টার উকিল ডাক্তার মন্ত্রী দেশনেতা প্রফেসর সাহিত্যিক সবাই দলে দলে তাঁর কাছে যাচ্ছেন আর থ হয়ে ফিরে আসছেন। মামা, তোমার তো সময়টা ভাল যাচ্ছে না, একবার এই গ্রীক গনৎকার ডক্টর মিনান্ডারের কাছে যাও না। ফী মোটে কুড়ি টাকা। আট নম্বর পিটারকিন লেন, দেখা করবার সময় সকাল আটটা থেকে দশটা, বিকেলে তিনটে থেকে সন্ধ্যে সাতটা।

গনৎকারের কাছে যাবার কিছুমাত্র আগ্রহ আমার ছিল না। একদিন কাগজে মিনান্ডার দ মাইটির ছবি দেখলুম। মাথায় মুকুটের মতন টুপি, উজ্জ্বল তীক্ষ্ম দৃষ্টি, দু ইঞ্চি ঝোলা গোঁফ, ছ ইঞ্চি লম্বা দাড়ি, গায়ে একটা নকশাদার উত্তরীয়, সেকালের গ্রীকদের মতন ডান হাতের নীচ দিয়ে কাঁধের উপরে পড়েছে। গলায় কোমর পর্যন্ত ঝোলা রাশিচক্র মার্কা হার। মুখখানা যেন চেনা চেনা মনে হল। টুপি আর গোঁফ-দাড়ি চাপা দিয়ে খুব ঠাউরে দেখলুম। আরে! এ যে আমাদের ওল্ড ফ্রেন্ড মীনেন্দ্র মাইতি, ভোল ফিরিয়ে মিনান্ডার দ মাইটি হয়েছে। তিন বছর আগেও আমার কাছে মাঝে মাঝে আসত, তার কিছু উপকারও আমি করেছিলুম। কিন্তু তার পরেই সে গা ঢাকা দিল। আমাকে এড়িয়ে চলত, চিঠি লিখলে উত্তর দিত না। স্থির করলুম, এনগেজমেন্ট না করেই দেখা করব।

ভাগ্যজিজ্ঞাসুদের ভিড় এড়াবার জন্যে আটটার দু-চার মিনিট আগেই গেলুম। চৌরঙ্গী রোড থেকে একটি গলি বেরিয়েছে, পিটারকিন লেন। আট নম্বরের দরজায় একটি বড় নেমপ্লেট আঁটা—ডক্টর মিনান্ডার দ মাইটি, নীচে ইংরেজী বাঙলা হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় লেখা আছে—সোজা দোতালায় চলে আসুন। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলুম। সামনের দরজায় নোটিস আছে—ওয়েলকম, ভিতরে এসে বসুন।

ঘরটিতে আলো কম। একটা টেবিলের চার দিকে কতকগুলো চেয়ার আছে, আর কেউ সেখানে নেই। পাশের ঘরের পর্দা ভেদ করে মৃদু কণ্ঠস্বর আসছে। বুঝলুম, আমার আগেই অন্য মক্কেল এসে গেছে। হঠাৎ দেওয়ালে একটা ফ্রেমের ভিতর আলোকিত অক্ষর ফুটে উঠল—ওয়েট প্লীজ, একটু পরেই আপনার পালা আসবে। টেবিলে গোটাকতক পুরনো সচিত্র মার্কিন পত্রিকা ছিল, তারই পাতা ওলটাতে লাগলুম।

কিছুক্ষই পরে আরও দুজন এসে আমার পাশের চেয়ারে বসলেন। একজনের বয়স

ত্রিশ-বত্রিশ, অন্য জনের পঁচিশ-ছাব্বিশ। প্রথম লোকটি আমাকে প্রশ্ন করলেন, অনেকক্ষণ বসে আছেন নাকি মশাই?

উত্তর দিলুম, তা প্রায় দশ মিনিট হবে।

—তবেই সেরেছে, আমাকে হয়তো ঘণ্টা খানিক ওয়েট করতে হবে। এই রতন, তুই শুধু শুধু এখানে থেকে কি করবি, বাড়ি যা।

রতন বলল, কেন, আমি তো বাগড়া দিচ্ছি না গোষ্ঠ-দা। গনৎকার সায়েব তোমাকে কি বলে না জেনে আমি নড়ছি না।

গোষ্ঠ-দা আমার দিকে চেয়ে বললেন, দেখুন তো মশাই, রতনার আক্কেল। আমি এসেছি নিজের ভাগ্যি জানতে, তুই কি করতে থাকবি?

আমি বললুম. আপনার ভাগ্যফল উনিও জানতে চান। আপনার আত্মীয় তো?

—আত্মীয় না হাতি। এ শালা আমার জোঁক, কেবল চুষে খাবার মতলব।

রতন বলল, আগে থাকতে শালা শালা ব'লো না মাইরি। আগে বিজির সঙ্গে তোমার বে হয়ে যাক তার পর যত খুশি ব'লো।

—আরে গেল যা। বিজিকেই যে বে করব তার ঠিক কি? গুলুরানীও তো নিন্দের সম্বন্ধ নয়। কি বলেন সার?

আমি বললুম, আপনাদের তর্কের বিষয়টা আমি তো কিছুই জানি না।

—তা হলে ব্যাপারটা খুলে বলি শুনুন। আমি হলুম শ্রীগোষ্ঠবিহারী সাঁতরা, শ্যামবাজারের মোড়ে সেই যে ইম্পিরিয়াল টি-শপ আছে তারই সোল প্রোপাইটার। তা আপনার আশীর্বাদে দোকানটি ভালই চলছে। এখন আমার বয়স হল গে ত্রিশ পেরিয়ে একত্রিশ, এখনও যদি সংসার-ধর্ম না করি তবে কবে করব? বুড়ো বয়সে বে করে লাভ কি? কি বলেন আপনি, অ্যাঁ? এখন সমিস্যে হয়েছে পাত্রী নিয়ে, দুটি আমার হাতে আছে। এক নম্বর হল, নফর দাসের মেয়ে গুলুরানী, ভাল নাম গোলাপসুন্দরী। দেখতে তেমন সুবিধের নয়, একটু কুঁদুলীও বটে। কিন্তু বাপের টাকা আছে, বিয়ে করলে কিছু পাওয়া যাবে। তার পর ধরুন, যদি কারবারটি বাড়াতে চাই তবে শ্বশুরের কাছ থেকে কোন না আরও হাজার খানিক টাকা বাগাতে পারব। দু নম্বর পাত্রী হচ্ছে বিজনবালা, ডাক নাম বিজি, এই রতন শালার বোন। বাপ নেই, শুধু বুড়ী মা আর এই ভাগাবণ্ড ভাইটা আছে, অবস্থা খারাপ, বরপণ নবডঙ্কা। কিন্তু মেয়েটা দেখতে অতি খাসা, নানা রকম রান্না জানে, এক পো মাংসের সঙ্গে দেদার মোচা এঁচড় ডুমুরের কিমা মিশিয়ে শ-খানিক এমন চপ বানাবে যে আপনি ধরতেই পারবেন না তার চোদ্দ আনা নিরিমিষ। বিজিকে বে করলে সে আমার সত্যি-কার পার্টনার হবে। শ্বশুরের টাকা নাই বা পেলুম, আপনার আশীর্বাদে আমার পুঁজি নেহাত মন্দ নেই। ইচ্ছে আছে টি-শপটির বোম্বাই প্যাটার্ন নাম দেব, নিখিল ভারত বিশ্রান্তি গৃহ। চপ কাটলেট ডেভিল মামলেট এই সব তৈরি করব, খদ্দেরের অভাব হবে না মশাই। আমার খুব ঝোঁক বিজির ওপর, কিন্তু মুশকিল হয়েছে তার মা আর বাউণ্ডুলে ভাইটা আমার ঘাড়ে পড়বে। বুড়ী শাশুড়ীকে পুষতে আপত্তি নেই, কিন্তু এই রতনা আমার কাঁধে চাপবে আর বোনের কাছ থেকে হরদম টাকা আদায় করবে তা আমি চাই না।

রতন বলল, আমি কথা দিচ্ছি তোমার কাঁধে চাপব না। আমার ভাবনা কি, ইলেক্ট্রিকের সব কাজ জানি, আর্মেচারের তার পর্যন্ত জড়াতে পারি। একটা ভাল চাকরি যোগাড় করতে পারি না মনে কর?

—যোগাড় করতে পারিস তো করিস না কেন রে হতভাগা? এ পর্যন্ত অনেক কাজ তো পেয়েছিলি, একটাতেও লেগে থাকতে পারলি নি কেন? ওই কিরণ চক্কোত্তি তোর মাথা খেয়েছে, দিনরাত তার তরুণ অপেরা পার্টিতে আড্ডা দিস, হয়তো নেশা ভাঙও করিস।

—মাইরি বলছি, গোষ্ঠ-দা, খারাপ নেশা আমি করি না। মাঝে মাঝে একটু সিদ্ধির শরবত খাই বটে, কিন্তু খুব মাইল্ড।

আমি বললুম, গোষ্ঠবাবু, আপনার সমস্যাটি তো তেমন কঠিন নয়। যখন শ্রীমতী বিজনবালাকে মনে ধরেছে তখন তাঁকে বিয়ে করাই তো ভাল। একটু রিস্ক না হয় নিলেন।

—আপনি জানেন না মশাই, এই রতনা সোজা রিস্ক নয়। সেই জন্যেই তো এই সায়েব জ্যোতিষীর কাছে এসেছি, আমার ঠিকুজিটাও এনেছি। ইনি সব কথা শুনে আমার হাত দেখে আর আঁক কষে যার নাম বলবেন, বিজনবালা কি গোলাপসুন্দরী, তাকেই প্রজাপতির নির্বন্ধ মনে করে বে করব। কুড়ি টাকা লাগে লাগুক, একটা তো হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে।

—আচ্ছা, এই রতন যদি কলকাতার বাইরে একটা ভাল কাজ পায়, তা হলে তো আপনার সুরাহা হতে পারে?

—সুরাহা নিশ্চয় হয়, আমি তা হলে নিশ্চিন্দি হয়ে বিজিকে বে করতে পারি। কিন্তু তেমন চাকরি ওকে দিচ্ছে কে?

—রতনবাবু, তোমার লাইসেন্স আছে?

রতন বলল, আছে বইকি, ভাল ভাল সার্টিফিকিটও আছে। দয়া করে একটি কাজ যোগাড় করে দিন সার, গোষ্ঠ-দার গঞ্জনা আর সইতে পারি না।

আমি বললুম, শোন রতন। একটি এঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের সঙ্গে আমার যোগ আছে, শিলিগুড়ি ব্রাঞ্চের জন্যে একজন ফিটার মিস্ত্রী দরকার। তোমাকে কাজটি দিতে পারি, প্রথমে এক শ টাকা মাইনে পাবে, তিন মাস প্রোবেশনের পর দেড় শ। কিন্তু শর্ত এই, একটি বৎসর শিলিগুড়ি থেকে নড়বে না, তবে বোনের বিয়ের সময় চার-পাঁচ দিন ছুটি পেতে পার। রাজী আছ?

—এক্ষুনি। দিন, পায়ের ধুলো দিন সার। অপেরা পার্টি ছেড়ে দেব, কিরণ চক্কোত্তির সঙ্গে আমার বনছে না, আজ পর্যন্ত আমাকে একটি টাকাও দেয় নি।

—তা হলে তুমি আজই বেলা তিনটের সময় আমাদের অফিসে গিয়ে দেখা ক'রো। ঠিকানাটা লিখে নাও।

ঠিকানা লিখে নিয়ে রতন বলল, গোষ্ঠ-দা, তোমার সমিস্যে তো মিটে গেল, মিছিমিছি গনৎকার সায়েবকে কুড়ি টাকা দেবে কেন। চল, বাড়ি ফেরা যাক।

গোষ্ঠ সাঁতরা বললেন, কোথাকার নিমকহারাম তুই! এই ভদ্রলোকের হাত দেখে জ্যোতিষী কি বলেন তা না জেনেই যাবি?

লজ্জায় জিব কেটে রতন নিজের কান মলল। এমন সময় জ্যোতিষীর খাস কামরার পর্দা ঠেলে দুজন গুজরাটী ভদ্রলোক হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন, নিশ্চয় সুফল পেয়েছেন। এঁরা চলে গেলে জ্যোতিষীর কামরায় একটা ঘণ্টা বেজে উঠল। একটু পরে একজন মহিলা এলেন, কালো শাড়ি, নীল ব্লাউজ, কাঁধে রাশিচক্র মার্কা লাল ব্যাজ। ইনি বোধ হয় ডক্টর মিনাণ্ডারের সেক্রেটারি। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি আগে এসেছেন?

উত্তর দিলুম, আজ্ঞে হাঁ।

—আপনার নাম আর ঠিকানা? জন্মস্থান আর জন্মদিন?

সব বললুম, উনি নোট করে নিলেন।

—কুড়ি টাকা ফী দিতে হবে জানেন তো?

—জানি, টাকা সঙ্গে এনেছি।

—কি জানবার জন্যে এসেছেন?

—আসন্ন ভবিষ্যতে আমার অর্থপ্রাপ্তি-যোগ আছে কিনা।

—বুঝলুম না, সোজা বাঙলায় বলুন।

—জানতে চাই, ইমিডিয়েট ফিউচারে কিছু টাকা পাওয়া যাবে কিনা।

সেক্রেটারি নোট করে নিলেন। তার পর গোষ্ঠ সাঁতরাকে বললেন, আপনার কি প্রশ্ন?

গোষ্ঠবাবু সহাস্যে বললেন, কিছু না, আমি আর রতন এই এনার সঙ্গে এসেছি।

তিন মিনিট পরেই সেক্রেটারি ফিরে এসে আমাকে বললেন, ডক্টর মিনাণ্ডার আপনাকে জানাচ্ছেন, এখন আপনার বরাতে টাকার ঘরে শূন্য। বছর খানিক পরে আর একবার আসতে পারেন।

গোষ্ঠবাবু আশ্চর্য হয়ে বললেন, বা রে, এ কি রকম গোনা হল? আপনাকে না দেখেই ভাগ্যফল বললেন!

আমি বললুম, বুঝলেন না গোষ্ঠবাবু, এই মিনাণ্ডার সায়েবের দিব্যদৃষ্টি আছে, না দেখেই ভাগ্য বলে দিতে পারেন। চলুন, ফেরা যাক।

নেমে এসে গোষ্ঠবাবু বললেন, ব্যাপারটা কি মশাই? জ্যোতিষী আপনার সঙ্গে দেখা করলেন না, ফীও নিলেন না, এ তো ভারি তাজ্জব!

বললুম, ব্যাপার অতি সোজা। এই জ্যোতিষীটি হচ্ছেন আমার পুরনো বন্ধু মীনেন্দ্র মাইতি, ভোল ফিরিয়ে মিনাণ্ডার দ মাইটি হয়েছেন। তিন বছর আগে আমার কাছ থেকে কিছু মোটা রকম ধার নিয়েছিলেন, বার বার তাগিদ দিয়েও আদায় করতে পারি নি। অনেক দিন নিখোঁজ ছিলেন, এখন গ্রীক গনৎকার সেজে আসরে নেমেছেন। তাই আমার পাওনা টাকাটা সম্বন্ধে ওঁকে প্রশ্ন করেছিলুম।

রতন বলল, আপনি ভাববেন না সার, জোচ্চোরটাকে নির্ঘাত শায়েস্তা করে দেব। দয়া করে আমাকে তিনটি দিন ছুটি দিন, আমি দলবল নিয়ে এর দরজার সামনে পিকেটিং করব, আর গরম গরম স্লোগান আওড়াব। বাছাধন টাকা শোধ না করে রেহাই পাবেন না।

রতনের পিকেটিংএ সুফল হয়েছিল। ডক্টর মিনাণ্ডার দ মাইটি আমার প্রাপ্য টাকার অর্ধেক দিয়ে জানালেন, পশার একটু বাড়লে বাকীটা শোধ করবেন। কিন্তু কলকাতায় তিনি টিকতে পারলেন না, এখানকার পাট তুলে দিয়ে ভাগ্যপরীক্ষার জন্যে দিল্লি চলে গেলেন।

১৮৮১ শক (১৯৫৯)

সাড়ে সাত লাখ

হেমন্ত পাল চৌধুরীর বয়স ত্রিশের বেশী নয়, কিন্তু সে একজন পাকা ব্যবসাদার, পৈতৃক কাঠের কারবার ভাল করেই চালাচ্ছে। রাত প্রায় নটা, বাড়ির একতলার অফিস ঘরে বসে হেমন্ত হিসাবের খাতাপত্র দেখছে। তার জ্ঞাতি-ভাই নীতীশ হঠাৎ ঘরে এসে বলল, তোমার সঙ্গে অত্যন্ত জরুরী কথা আছে। বড় ব্যস্ত নাকি?

হেমন্ত বলল, না, আমার কাজ কাল সকালে করলেও চলবে। ব্যাপার কি, এমন হন্তদন্ত হয়ে এসেছ কেন? তোমাদের তো এই সময় জোর তাসের আড্ডা বসে। কোনও মন্দ খবর নাকি?

নীতীশ বলল, ভাল কি মন্দ জানি না, আমার মাথা গুলিয়ে গেছে। যা বলছি স্থির হয়ে শোন।

নীতীশের কথার আগে তার সঙ্গে হেমন্তর সম্পর্কটা জানা দরকার। এদের দুজনেরই প্রপিতামহ ছিলেন মদনমোহন পাল চৌধুরী, প্রবলপ্রতাপ জমিদার। তাঁর দুই পুত্র অনঙ্গ আর কন্দর্প বৈমাত্র ভাই, বাপের মৃত্যুর পর বিষয় ভাগ করে পৃথক হন। অনঙ্গ অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন, অনেক সম্পত্তি বন্ধক রেখে কন্দর্পের কাছ থেকে বিস্তর টাকা ধার নিয়েছিলেন। অল্পবয়স্ক পুত্র বসন্তকে রেখে অনঙ্গ অকালে মারা যান। কন্দর্প তাঁর ভাইপোর সঙ্গে আজীবন মকদ্দমা চালান। অবশেষে তিনি জয়ী হন এবং বসন্ত প্রায় সর্বস্বান্ত হন। পরে বসন্ত কাঠের কারবার আরম্ভ করেন। তিনি গত হলে তাঁর পুত্র হেমন্ত সেই কারবারের খুব উন্নতি করেছে।

কন্দর্প আর তাঁর পুত্র যতীশও গত হয়েছেন। যতীশের পুত্র নীতীশ এখন পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী। জমিদারি আর নেই, আগেকার ঐশ্বর্যও কমে গেছে, কিন্তু পৈতৃক সঞ্চয় যা আছে তা থেকে নীতীশের আয় ভালই হয়। রোজগারের জন্যে তাকে খাটতে হয় না, বদখেয়ালও তার নেই, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে আর সাহিত্য সিনেমা ফুটবল ক্রিকেট রাজনীতি চর্চা করে সময় কাটায়। হেমন্ত তার সমবয়স্ক, দুজনে একসঙ্গে কলেজে পড়েছিল। এদের বাপদের মধ্যে বাক্যালাপ ছিল না, কিন্তু হেমন্ত আর নীতীশের মধ্যে পৈতৃক মনোমালিন্য মোটেই নেই, অন্তরঙ্গতাও বেশী নেই।

মাথায় দু হাত দিয়ে নীতীশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তার পর বলল, ভাই হেমন্ত, মহাপাপ থেকে আমাকে উদ্ধার কর।

হেমন্ত বলল, পাপটা কি শুনি। খুন না ডাকাতি না নারীহরণ? কি করেছ তুমি?

—আমি কিছুই করি নি, করেছেন আমার ঠাকুরদা।

—কন্দর্পমোহন পাল চৌধুরী? তিনি তো বহুকাল গত হয়েছেন, তাঁর পাপের জন্যে তোমার মাথাব্যথা কেন? উত্তরাধিকারসূত্রে কোনও বেয়াড়া ব্যাধি পেয়েছ নাকি?

—না, আমার শরীরে কোনও রোগ নেই। আজ সকালে পুরনো কাগজপত্র ঘাঁটছিলুম। জমিদারি তো গেছে, বাজে দলিল আর কাগজপত্র রেখে লাভ নেই, তাই

জঞ্জাল সাফ করছিলুম। ঠাকুরদার আমলের একটা কাঠের বাক্সে হঠাৎ কতকগুলো পুরনো চিঠিপত্র আবিষ্কার করে স্তম্ভিত হয়ে গেছি, আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়েছে। ওঃ, মহাপাপ মহাপাপ !

—ব্যাপারটা কি ?

—আমার ঠাকুরদা কন্দর্প তোমার ঠাকুরদা অনঙ্গের নায়েব-গোমস্তাদের ঘুষ দিয়ে কতকগুলো দলিল জাল করেছিলেন। আর মিথ্যে সাক্ষী খাড়া করেছিলেন। তারই ফলে তোমার বাবা মকদ্দমায় হেরে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন।

—বল কি ? না না, তা হতে পারে না, নিশ্চয় তোমার ভুল হয়েছে।

—ভুল মোটেই হয় নি। আমার ভগিনীপতি ফণীবাবুকে জান তো ? মস্ত উকিল। তাঁকে সব কাগজপত্র দেখিয়েছি। তিনিও বলেছেন, আমার ঠাকুরদার জাল-জোচ্চুরির ফলেই তোমার বাবা বসন্ত পাল চৌধুরী সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন।

—তা এখন করতে চাও কি ? ফণীবাবু কি বলেন ?

—বললেন, চুপ মেরে যাও। যা হয়ে গেছে তা নিয়ে মন খারাপ ক'রো না, পুরনো কাগজপত্র সব পুড়িয়ে ফেল, ঘুণাক্ষরে কেউ যেন কিছু জানতে না পারে।

—তাই বুঝি তুমি তাড়াতাড়ি আমাকে জানাতে এসেছ ? ফণীবাবু বিচক্ষণ ঝানু লোক, পাকা কথা বলেছেন, গতস্য অনুশোচনা নাস্তি। পুরনো কাসন্দি ঘেঁটে লাভ নেই। আর, ও তো তামাদি হয়ে গেছে।

উত্তেজিত হয়ে নীতীশ বলল, কি যা তা বলছ, পাপ কখনও তামাদি হয় না। আমার ঠাকুরদা জোচ্চুরি করে যা আদায় করেছেন তা আমি ভোগ করতে চাই না। খতিয়ে দেখেছি, সুদে আসলে প্রায় সাড়ে সাত লাখ টাকা তোমার পাওনা। সে টাকা তোমাকে না দিলে আমার স্বস্তি নেই।

—ওই টাকা দিলে তোমার অবস্থা কি রকম দাঁড়াবে ?

—খুব মন্দ হবে। কষ্টে সংসার চলবে, রোজগারের চেষ্টা দেখতে হবে। কিন্তু তার জন্যে আমি প্রস্তুত আছি।

—আচ্ছা, তোমার বাবা এসব জানতেন ?

—বোধ হয় না। তিনি নিজে জমিদারি দেখতেন না, নায়েবের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। নায়েব নতুন লোক, তারও কিছু জানবার কথা নয়।

—তোমার বউকে জানিয়েছ ?

—না। জানলে কান্নাকাটি করবে, শ্বশুর মশাইকে বলে মহা হাঙ্গামা বাধাবে। আগে তোমার পাওনা শোধ করব তার পর জানাব।

—বাহবা ! দেখ নীতীশ, ভাগ্যক্রমে আমি নিঃস্ব নই, রোজগার ভালই করি, বেশী বড়লোক হবার লোভও নেই। ফাঁকতালে তুমি যা পেয়ে গেছ তা তোমারই থাকুক, নিশ্চিন্ত হয়ে ভোগ কর। আমি খোশ মেজাজে বহাল তবিয়তে বলছি, ওই টাকার ওপর আমার কিছুমাত্র দাবি নেই। চাও তো একটা না-দাবি পত্র লিখে দিতে পারি। আরও শোন—সাড়ে সাত লাখ টাকা না পেলেও আমার পরিবারবর্গের স্বচ্ছন্দে চলবে, কিন্তু ওই টাকার অভাবে তোমার স্ত্রী ছেলেমেয়ের অবস্থা কি রকম হবে তা ভেবেছ ? তুমি না হয় একজন প্রচণ্ড সাধুপুরুষ, সাক্ষাৎ রাজা হরিশ্চন্দ্র, কিছুই গ্রাহ্য কর না, কিন্তু তোমার স্ত্রী আর সন্তানরা যে রকম জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত তা থেকে তাদের বঞ্চিত করে কষ্ট দেবে কেন ? তোমার ঠাকুরদার কুকর্ম আমাকে জানিয়েছ তাতেই আমি সন্তুষ্ট, তোমারও দায়িত্ব খণ্ডে গেছে। আর কিছু করবার দরকার নেই।

সজোরে মাথা নেড়ে নীতীশ বলল, ওই পাপের টাকা ভোগ করলে আমি মরে যাব। যা তোমার হক পাওনা তা নেবে না কেন?

একটু ভেবে হেমন্ত বলল, শোন নীতীশ, আজ তুমি বড়ই অস্থির হয়ে আছ, তোমার মাথার ঠিক নেই। কাল সন্ধ্যের সময় এখানে এসো, দুজনে পরামর্শ করে একটা মীমাংসা করা যাবে যাতে তোমার মনে শান্তি আসে। তোমার ভগিনীপতি ফণীবাবুর সঙ্গেও আর একবার পরামর্শ ক'রো।

পরদিন সন্ধ্যায় নীতীশ আবার এল। হেমন্ত প্রশ্ন করল, ফণীবাবুকে তোমার মতলব জানিয়েছ?

—হুঁ। তিনি রফা করতে বললেন।

—রফা কি রকম?

—বিবেকের সঙ্গে রফা। বললেন, ওহে নীতীশ, তুমি আর হেমন্ত দুজনেই সমান বোকা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। টাকাটা আধাআধি ভাগ করে নাও, তা হলে দুজনেরই কনশেন্স ঠান্ডা হবে।

হেমন্ত হেসে বলল, চমৎকার! তুমি কি বল নীতীশ?

—ড্যাম ননসেন্স। চুরির টাকা চোরেরা ভাগ করে নেয়, কিন্তু তুমি আর আমি চোর নই। পরের ধনের এক কড়াও আমি নিতে পারি না। তোমার যা হক পাওনা তা পুরোপুরি তোমাকে নিতে হবে।

—আমার হক পাওনা কি করে হল? জমিদারি পত্তন করেন তোমার আমার প্রপিতামহ মহামহিম দোর্দণ্ডপ্রতাপ মদনমোহন পাল চৌধুরী। তিনি রামচন্দ্র বা বুদ্ধদেব ছিলেন না। সেকালে অনেক দুর্দান্ত লোক যেমন করে জমিদারি পত্তন করত তিনিও তেমনি করেছিলেন। ডাকাতি লাঠিবাজি জালিয়াতি জোচ্চুরি ঘুষ—এই ছিল তাঁর অস্ত্র। তুমি নিশ্চয় শুনে থাকবে?

—ওই রকম শুনেছি বটে।

—তা হলে বুঝতে পারছ, ওই জমিদারিতে কারও ধর্মসংগত অধিকার থাকতে পারে না। পূর্বপুরুষের সম্পত্তি আমার হাতছাড়া হয়েছে তা ভালই হয়েছে।

—কিন্তু আমার তো হাতছাড়া হয় নি, প্রপিতামহ আর পিতামহ দুজনেরই পাপের ধন সবটা আমার ঘাড়ে এসে পড়েছে। তুমি যদি নিতান্তই না নিতে চাও তবে মদনমোহন যাদের বঞ্চিত করেছিলেন তাদের উত্তরাধিকারীদের দিতে হবে।

—তাদের খুঁজে পাব কোথায়, সে তো এক শ সওয়া শ বছর আগেকার ব্যাপার। তুমি সম্পত্তি দান করবে এই কথা রটে গেলেই ঝাঁকে ঝাঁকে জোচ্চোর এসে তোমাকে ছেঁকে ধরবে।

—তবে জনহিতার্থে টাকাটা দান করা যাক। কি বল?

—সে তো খুব ভাল কথা।

—দেখ হেমন্ত, ওই টাকাটা সদুদ্দেশ্যে খরচ করার ভার তোমাকেই নিতে হবে, আমি এ কাজে পটু নই।

—রক্ষে কর। আমি নিজের ব্যবসা নিয়েই অস্থির, তোমার দানসত্রের বোঝা নেবার সময় নেই। আর একটা কথা। সদুদ্দেশ্যে দান, শুনতে বেশ, কিন্তু উদ্দেশ্যটা কি? মন্দির মঠ সেবাশ্রম হাসপাতাল আতুরাশ্রম ইস্কুল-কলেজ, না আর কিছু?

—তা জানি না। তুমিই বল।

—আমিও জানি না। তুমিই বল।

—আমিও জানি না। আমাদের সঙ্গে ফেলু মহান্তি পড়ত মনে আছে? তার শালা ডক্টর প্রেমসিন্ধু খাণ্ডারী সম্প্রতি ইওরোপ আমেরিকা ফার-ঈস্ট টুর করে এসেছেন। শুনেছি তিনি মহাপণ্ডিত লোক, প্লেটো কৌটিল্য থেকে শুরু করে বেন্থাম মিল মার্ক্স লেনিন সবাইকে গুলে খেয়েছেন। চীন সরকার নাকি কনসলটেশনের জন্যে তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তুমি যদি রাজী হও তবে ডক্টর প্রেমসিন্ধুর মত নেওয়া যাবে, তোমার টাকার সার্থক খরচ কিসে হবে তা তিনিই বাতলে দেবেন।

—বেশ তো। তাঁর সঙ্গে চটপট এনগেজমেন্ট করে ফেল।

পরদিন বিকালবেলা হেমন্ত আর নীতীশ প্রেমসিন্ধু খাণ্ডারীর বাড়ি উপস্থিত হল। সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে প্রেমসিন্ধু বললেন, নীতীশবাবুর সংকল্প খুবই ভাল, কিন্তু সাড়ে সাত লাখ টাকা কিছুই নয়, তাতে বিশেষ কিছু করা যাবে না।

হেমন্ত বলল, যতটুকু হতে পারে তারই ব্যবস্থা দিন।

একটু চিন্তা করে ডক্টর খাণ্ডারী বললেন, সর্বাধিক লোকের যাতে সর্বাধিক মঙ্গল হয় তাই দেখতে হবে, কিন্তু অযোগ্য লোকের জন্যে এক পয়সা খরচ করা চলবে না। সমাজের ক্ষণস্থায়ী উপকার করাও বৃথা, এমন কাজে টাকাটা লাগাতে হবে যাতে চিরস্থায়ী মঙ্গল হয়। আচ্ছা নীতীশবাবু, আপনার ইচ্ছেটা আগে শুনি, কি রকম সৎকার্য আপনার পছন্দ?

একটু ইতস্তত করে নীতীশ বলল আমার মা খুব ভক্তিমতী ছিলেন। তাঁর নামে টাকাটা কোনও সাধু-সন্ন্যাসীর মঠে দিলে কেমন হয়? ধর্মের প্রচার হলে লোকচরিত্রের উন্নতি হবে, তাতে সমাজেরও মঙ্গল হবে।

প্রেমসিন্ধু হেসে বললেন, অত্যন্ত সেকেলে আইডিয়া। টাকাটা পেলে সাধু মহারাজদের নিশ্চয়ই মঙ্গল হবে, তাঁরা লুচি মণ্ডা দই ক্ষীর খেয়ে পুষ্টিলাভ করবেন, কিন্তু সমাজের মঙ্গল কিছুই হবে না। তা ছাড়া, আপনার মায়ের নামে টাকা দিলে তো নিঃস্বার্থ দান হবে না, টাকার বদলে আপনি চাচ্ছেন মায়ের স্মৃতিপ্রতিষ্ঠা।

লজ্জিত হয়ে নীতীশ বলল, আচ্ছা মায়ের নামে না-ই দিলাম। যদি কোনও ভাল সেবাশ্রমে—

—সব ভাল সেবাশ্রমেরই প্রচুর অর্থবল আছে। তেলা মাথায় তেল দিয়ে কি হবে? আর, আপনার সাড়ে সাত লাখ তো ছিটেফোঁটা মাত্র।

—যদি উদ্বাস্তুদের সাহায্যের জন্যে দেওয়া যায়?

—খেপেছেন! উদ্বাস্তুদের হাতে পেঁছুবার আগেই বাস্তুঘুঘুরা টাকাটা খেয়ে ফেলবে। কাগজে যে সব কেলেঙ্কারি ছাপা হয় তা পড়েন না?

—একটা কলেজ বা গোটাকতক স্কুল প্রতিষ্ঠা করলে কেমন হয়?

—ভস্মে ঘি ঢাললে যা হয়। স্কুল-কলেজে কি রকম শিক্ষা হচ্ছে দেখতেই পাচ্ছেন। আপনার টাকায় তার চাইতে ভাল কিছু হবে না, শুধু নতুন একদল হল্লাবাজ ধর্মঘটী ছোকরার সৃষ্টি হবে।

—তবে না হয় সরকারের হাতেই টাকাটা দেওয়া যাক। তাঁরাই কোনও লোকহিতকর কাজে খরচ করবেন।

অট্টহাস্য করে প্রেমসিন্ধু বললেন, নীতীশবাবু, আপনি এখনও বালক। হয়তো

মনে করেন সরকার হচ্ছেন একজন অগাধবুদ্ধি সর্বশক্তিমান পরমকারুণিক পুরুষোত্তম। তা নয় মশাই, সরকার মানে পাঁচ ভূতের ব্যাপার। কোটি কোটি টাকা যেখানে খরচ হয় সেখানে আপনার সাড়ে সাত লাখ তো সমুদ্রে জলবিন্দুর মতন ভ্যানিশ করবে।

হেমন্ত বলল, আচ্ছা আমি একটা নিবেদন করি। শুনতে পাই ভগবান এখন মন্দির ত্যাগ করে ল্যাবরেটরিতে অধিষ্ঠান করছেন, সেখানেই তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু হয়েছেন। কৃষি আর খাদ্যের রিসার্চের জন্যে কোনও ইন্স্টিটিউটে টাকাটা দিলে কেমন হয়?

—হেমন্তবাবু, সে রকম ইন্স্টিটিউট দেশে অনেক আছে। বলতে পারেন, ঢাক পেটানো ছাড়া কোথাও কিছুমাত্র কাজ হয়েছে?

হতাশ হয়ে নীতীশ বলল, আচ্ছা, টাকাটা যদি কোনও আতুরাশ্রমে দেওয়া যায়? অন্ধ বোবা-কালা পঙ্গু উন্মাদ অসাধ্য-রোগগ্রস্ত—এদের সেবার জন্যে?

ঠোঁটে ঈষৎ হাসি ফুটিয়ে ডক্টর প্রেমসিন্ধু খাণ্ডারী কিছুক্ষণ ধীরে ধীরে ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়লেন। তার পর বললেন, শুনুন নীতীশবাবু, আপনার মতন নরম মন অনেকেরই আছে, কিন্তু তা একটা মহা ভ্রান্তির ফল। যদি শক্‌ড না হন তবে খোলসা করে বলি।

নীতীশ আর হেমন্ত একসঙ্গে বলল, না না, শক্‌ড হব না, খোলসা করেই বলুন।

—নীতীশবাবু, যে সব আতুরজনের কথা বললেন, তাদের বাঁচিয়ে রাখলে সমাজের কি লাভ? ধরুন আপনি বেগুন কি ঢ্যাঁড়সের খেত করেছেন। পোকাধরা অপুষ্ট গাছগুলোকেও কি বাঁচিয়ে রাখবেন? নিশ্চয়ই নয়, তাদের উপড়ে ফেলে দেবেন, নয়তো ভাল গাছগুলোর ক্ষতি হবে। পঙ্গু আতুর জনও সেই রকম, তারা সমাজের কোনও কাজে আসে না. শুধু গলগ্রহ। যদি স্বহস্তে উৎপাটন করতে না চান তবে অন্তত তাদের বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করবেন না, চটপট মরতে দিন। দেখুন আমাদের দেশে নানা রকম অভাব আছে, খাদ্য বস্ত্র আবাস বিদ্যা চিকিৎসা, আরও কত কি। সমাজের যারা যোগ্যতম, অর্থাৎ সুস্থ প্রকৃতিস্থ বুদ্ধিমান কাজের লোক, শুধু তাদেরই যাতে মঙ্গল হয় সেই চেষ্টা করুন, যারা আতুর অক্ষম জড়বুদ্ধি আর স্থবির তাদের সেবার জন্যে টাকার অপব্যয় করবেন না। জানেন বোধ হয়, ২৫।৩০ বৎসর পরে ভারতের লোকসংখ্যা ৪০ কোটির স্থানে ৮০ কোটি হবে। এত লোক পুষবেন কি করে? যতই কৃষিবৃদ্ধি আর জন্মশাসনের চেষ্টা করুন, কিছু ফল হবে না, আশি কোটি অধিবাসীর ঠেলা কিছুতেই সামলাতে পারবেন না।

—আপনি কি করতে বলেন?

—আমি যা চাই তা শুনলে নেহেরুজীর মতন র‍্যাশনাল লোকও কানে আঙুল দেবেন। আমি বলি—লীভ ইট টু নেচার। কিছু কালের জন্যে সব হাসপাতাল বন্ধ রাখতে হবে, ডাক্তারদের ইনটার্ন করতে হবে, পেনিসিলিন স্ট্রেপটোমাইসিন প্রভৃতি আধুনিক ওষুধ নিষিদ্ধ করতে হবে, ডিডিটি আর সারের কারখানা বন্ধ রাখতে হবে। কলেরা বসন্ত প্লেগ যক্ষ্মা দুর্ভিক্ষ বার্ধক্য ইত্যাদি হল প্রকৃতির সেফ্‌টি ভাল্‌ভ, এদের অবাধে কাজ করতে দিন, তাতে অনেকটা ভূভার হরণ হবে। শায়েস্তা খাঁর আমলে দু আনায় এক মন চাল পাওয়া যেত। তার কারণ এ নয় যে তিনি ধানের চাষ বাড়িয়েছিলেন কিংবা কালোবাজারীদের শায়েস্তা করেছিলেন। তিনি প্রকৃতির সঙ্গে লড়েন নি, ফ্রী হ্যাণ্ড দিয়েছিলেন। আর আমাদের এখনকার দয়াময় দেশ-

নেতাদের দেখুন, বলেন কিনা প্রাণদণ্ড তুলে দাও! আমার মতে শুধু খুনী আসামী নয়, চোর ডাকাত জালিয়াত ঘুষখোর ভেজালওয়ালা কালোবাজারী দাঙ্গাবাজ ধর্ষক রাষ্ট্রদ্রোহী—সবাইকে ফাঁসি দেওয়া উচিত। তাতে যতটুকু লোকক্ষয় হয় ততটুকুই লাভ। আতুরাশ্রম সেবাশ্রম হাসপাতাল আর হেলথ সেণ্টার প্রতিষ্ঠা করলে দেশের সর্বনাশ হবে। প্রকৃতিকে বাধা দেবেন না মশাই, কাজ করতে দিন। তার পর দেশের বাড়তি জঞ্জাল যখন দূর হবে, লোকসংখ্যা যখন চল্লিশ কোটি থেকে নেমে দশ কোটিতে দাঁড়াবে তখন জনহিত কর্মে কোমর বেঁধে লাগবেন।

হেমন্ত বলল, তা হলে নীতীশের টাকাটার কোনও সদ্‌গতি হবে না?

—কেন হবে না, অবশ্যই হবে। ওই টাকায় প্রোপাগাণ্ডা করে লোকমত তৈরী করতে হবে, সুরেন বাঁড়ুজ্যে যেমন বলতেন, এজিটেশন এজিটেশন অ্যাণ্ড এজিটেশন। আমার একটা থিসিস লেখা আছে, তার লক্ষ কপি ছাপিয়ে লোকসভা আর রাজ্যসভা বিধানসভার সদস্যদের মধ্যে বিলি করতে হবে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যাকে 'ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য' বলেছেন তা ঝেড়ে না ফেললে নিস্তার নেই। দেশের ওআর্থলেস রুগ্‌ন অথর্ব অক্ষম লোকদের উচ্ছেদ করে শুধু বলবান বুদ্ধিমান কাজের লোকদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। শুনুন নীতীশবাবু হেমন্তবাবু, আগে আমাদের দেশনেতাদের নির্মম বজ্রাদপি কঠোর হওয়া দরকার, তার পর জমি তৈরী হলে মনের সাধে লোকহিত করবেন।

হাততালি দিয়ে হেমন্ত বলল, চমৎকার। গীতার 'শ্রীভগবানুবাচ' আর Nietzscheর Thus Spake Zarathustra চাইতে ঢের ভাল বলেছেন। বহু ধন্যবাদ ডক্টর খাণ্ডারী, আপনার বাণী আমরা গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখব। এই কুড়ি টাকা দয়া করে নিন, যৎকিঞ্চিৎ প্রণামী। আচ্ছা আজ উঠি নমস্কার।

ফেরার পথে নীতীশ বলল, লোকটা উন্মাদ না পিশাচ? হেমন্ত বলল, তেত্রিশ নয়ে পইসে উন্মাদ, তেত্রিশ পিশাচ আর চৌত্রিশ জবরদস্ত জনহিতৈষী। মনুস্মৃতি, মার্ক্‌সবাদ, গান্ধীবাদ, সবই এখন সেকেলে হয়ে গেছে, তাই ডক্টর প্রেমসিন্ধু খাণ্ডারী নতুন বাণী প্রচার করে যুগাবতার হবার মতলবে আছেন। তবে এঁর প্রলাপবাক্যের মধ্যে সত্যের ছিটেফোঁটাও কিঞ্চিৎ আছে। শোন নীতীশ, তোমার দানসত্রের ভার পরের হাতে দিও না, তাতে নিশ্চিন্ত হতে পারবে না, কেবলই মনে হবে ব্যাটা চুরি করছে। নিজের খুশিতে দান কর, সেবাশ্রমে হাসপাতালে স্কুল-কলেজে, যেখানে তোমার মন চায়। যদি ভুলক্রমে অপাত্রে কিছু দিয়ে ফেল তাতেও বিশেষ ক্ষতি হবে না। কিন্তু ফতুর হয়ে দান ক'রো না। নিজের সংসারযাত্রার জন্যেও কিছু রেখো। তোমার স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে যদি কষ্টে পড়ে, তোমাকে যদি রোজগারের জন্যে ব্যস্ত থাকতে হয়, তবে লোকসেবায় মন দিতে পারবে না।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নীতীশ বলল, বেশ, তাই হবে। কিন্তু টাকাটা তো আসলে তোমার, অতএব লোকসেবার ভার তুমিই নেবে, আমি তোমার সহকারী হব।

—আঃ, তোমার খুঁতখুঁতুনি এখনও গেল না দেখছি। বেশ, টাকাটা না হয় আমারই। কিন্তু আমার ফুরসত কম, দানসত্রের ভার তোমাকেই নিতে হবে, তবে আমি যথাসাধ্য সাহায্য করতে রাজী আছি। জান তো, ভক্ত বৈষ্ণব তাঁর সর্ব কর্মের ফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করেন। তুমিও নিষ্কামভাবে লোকহিতে লেগে যাও। কর্মের ফল শ্রীকৃষ্ণের বদলে আমাকেই অর্পণ ক'রো। পিতৃপুরুষদের দেনা শোধ করে তুমি তৃপ্তিলাভ করবে, স্বহস্তে দান করে ধন্য হবে। আর তোমার দানের পুণ্যফল আমি ভোগ করব। ফণীবাবুর ব্যবস্থার চাইতে এই রকম ভাগাভাগি ভাল নয় কি?

১৮৮১ শক (১৯৫৯)

যশোমতী

মেজর পুরঞ্জয় ভঞ্জ এম. ডি., আই· এম. এস. অনেক কাল হল অবসর নিয়েছেন, রোগী দেখাও এখন ছেড়ে দিয়েছেন। বয়স পঁচাত্তর পেরিয়েছে। কলকাতায় নিজের বাড়ি আছে, কিন্তু স্থির হয়ে সেখানে থাকতে পারেন না, বছরের মধ্যে আট-ন মাস বাইরে ঘুরে বেড়ান।

শীত কাল। পুরঞ্জয় দেরাদুনে এসেছেন, আট-দশ দিন এখানে থাকবেন। রাজপুর রোডে শিবালিক হোটেলে উঠেছেন, সঙ্গে আছে তাঁর পুরনো চাকর বৃন্দাবন। রাত প্রায় আটটা, পুরঞ্জয় তাঁর ঘরে ইজি-চেয়ারে বসে একটা বই পড়ছেন। বৃন্দাবন এসে জানাল, এক বুড়ী গিন্নী-মা দেখা করতে চান। পুরঞ্জয় বললেন, আসতে বল তাঁকে।

যিনি এলেন তিনি খুব ফরসা, একটু মোটা, গাল আর থুতনিতে বলি পড়েছে। মাথায় প্রচুর চুল, কিন্তু প্রায় সবই পেকে গেছে। পরনে সাদা গরদ, সাদা ফ্লানেলের জামা, তার উপর আলোয়ান। গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করে পুরঞ্জয়ের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন।

পুরঞ্জয় বললেন, কোথা থেকে আসা হচ্ছে? চিনতে পারছি না তো।

আগন্তুকা বললেন, আমি যশো, আলীপুরের যশোমতী।

—সেকি! তুমি যশো, যশোমতী গাঙ্গুলী, কি আশ্চর্য!

—গাঙ্গুলী আগে ছিলুম, এখন মুখুজ্যে।

—ও, তোমার স্বামী মুখুজ্যে। তোমাকে দেখে চমকে গেছি, পঞ্চান্ন বছর পরে আবার দেখা হল, চিনব কি করে? তোমার এক মাথা কালো চুল ছিল, সাদা হয়ে গেছে। ছিপছিপে গড়ন ছিল, এখন মোটা হয়ে পড়েছ। মুখের চামড়া ঢিলে হয়ে গেছে, গাল কুঁচকে গেছে। তুমি অতি সুন্দরী তন্বী কিশোরী ছিলে, হাসলে গালে টোল পড়ত, দাঁত ঝিকমিক করে উঠত।

যশোমতী ম্লান মুখে হাসলেন।

—ওই ওই! এখনও গালে টোল পড়েছে, দাঁত ঝিকমিক করছে।

—বাঁধানো দাঁত।

—তা হক, আগের মতনই সুন্দর ঝিকমিকে। আমাদের শারীর শাস্ত্রে বলে, দাঁত নখ চুল আর শিঙ জীবন্ত অঙ্গ নয়, এদের সাড় নেই। আসল আর নকলে প্রায় সমানই কাজ চলে।

—সব কাজ চলে না। ছোলা ভাজা চিবুতে পারি না।

—ভাল ডেণ্টিস্টকে দিয়ে বাঁধালে পারবে। যশো, তুমি এখনও কোকিলকণ্ঠী, তবে গলার স্বর একটু মোটা হয়েছে। আমাকে দেখেই চিনতে পেরেছ?

—তা না পারব কেন। তোমার চুল পেকেছে, টাক পড়েছে, কিন্তু মুখের ছাঁদ বদলায় নি, গালও বেশী তোবড়ায়নি, গলার স্বরও আগের মতন আছে।

—দেরাদুনে কবে এলে? আমার সন্ধান পেলে কি করে?

—পরশু এখানে পৌঁছেছি। আমার নাতি ডেপুটি ট্রাফিক ম্যানেজার হয়ে এসেছে, তার কাছেই আছি। আজ সকালে এই হোটেলে দূর সম্পর্কের এক বোনপোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলুম। অতিথিদের লিস্টে তোমার নাম দেখলুম।

—নাতিকে নিয়ে এলে না কেন?

—আজ এত কাল পরে তোমার সন্ধান পেলুম, তাই একাই দেখা করতে ইচ্ছে হল। নাতি নাতবউকে কাল দেখো। এখন তোমার পরিবারের কথা বল। সঙ্গে আন নি?

—পরিবার কোথা, বিয়েই করি নি। অবাক হলে কেন, অবিবাহিত বুড়ো তো কত শত আছে। তোমার খবর বল। স্বামী আর শ্বশুরবাড়ি ভাল পেয়েছিলে তো?

মাথা নত করে যশোমতী বললেন, স্বামী শুধু সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। আমি তোমার সঙ্গে মিশতুম এই অপরাধে শ্বশুরবাড়ির সকলে আমাকে কলঙ্কিনী মনে করতেন। আমি বাবার একমাত্র সন্তান, ভবিষ্যতে তাঁর সম্পত্তি পাব, শুধু এই কারণেই তাঁরা আমাকে পুত্রবধূ করেছিলেন। বিয়ের দু বছর পরেই স্বামী মারা যান। একটি ছেলে ছিল, আমার সব দুঃখ দূর করেছিল, সেও জোয়ান বয়সে চলে গেল। পুত্রবধূও প্রসবের পরে মারা গেল। এখন একমাত্র সম্বল নাতি ধ্রুব, আর তার বউ রাকা।

—উঃ, অনেক শোক পেয়েছ। ললাটের লিখন আমি মানি না, তবু কি মনে হচ্ছে জান? তুমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, আমি অব্রাহ্মণ। তোমার বাপ-মা মনে করতেন আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিলে গোহত্যা ব্রহ্মহত্যার সমান পাপ হবে। তাঁরা যদি গোঁড়া না হতেন, আমাদের বিয়েতে যদি মত দিতেন, তবে তুমি এখনও সধবা থাকতে, দু চারটে ছেলেমেয়েও হয়তো বেঁচে থাকত। কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, কিছু মনে ক'রো না।

—মনে করব কেন। ছোট বেলায় তুমি রেখে ঢেকে কথা বলতে না, এখনও দেখছি তোমার মনের আর মুখের তফাত নেই। তুমি কেন বিয়ে কর নি তা বল।

করি নি তার কারণ, তোমাকে প্রচণ্ড ভালবেসেছিলুম, সহজে ভুলতে পারি নি। আমার বিয়ে দেবার জন্যে বাপ-মা অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু আমার মন তোমাকেই আঁকড়ে ছিল। তোমার বিয়ে যখন অন্যের সঙ্গে হল তখন অত্যন্ত ঘা খেয়েছিলুম, দেহ মন প্রাণ যেন কেউ পিষে ফেলেছিল। পরে অবশ্য একটু একটু করে সামলে উঠেছিলুম, তোমাকে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম। কিন্তু বিয়ের ইচ্ছে আর হয় নি।

—কোনও মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা কর নি?

—তোমার কাছে মিথ্যা বলব না। আমি শুকদেব বা রামকৃষ্ণ পরমহংস নই, পতন হয়েছিল, কিন্তু অল্প কালের জন্যে। একদিন স্বপ্ন দেখলুম, তোমার মৃতদেহ যেন আমি পা দিয়ে মাড়িয়ে চলছি। আর্তনাদ করে জেগে উঠলুম, ধিক্‌কারে মন ভরে গেল। হিন্দুর মেয়ে ছেলেবেলা থেকে সতীত্বের সংস্কার পায়, তাই তারা সহজেই শুচি থাকে। কিন্তু পুরুষেরা কোনও শিক্ষা পায় না। মেয়েদের বলা হয় সীতা সাবিত্রী হৈমবতীর মতন সতী হও, কিন্তু পুরুষদের কেউ বলে না—রামচন্দ্রের মতন একনিষ্ঠ হও।

—কি নিয়ে এত কাল কাটালে?

—চাকরি, রোগীর চিকিৎসা, অজস্র বই পড়া, আর ঘুরে বেড়ানো। তোমার স্মৃতি ক্রমশ মুছে গেলেও যেন মনে ছেঁকা দিয়ে স্টেরাইল করে দিয়েছিল, সেখানে আর কেউ স্থান পায় নি। ওকি, কাঁদছ নাকি? বড় বড় দুঃখের ভোগ তো তোমার চুকে গেছে, এখন আমার তুচ্ছ কথায় কাতর হচ্ছ কেন? শোন যশো, তোমাকে অনিচ্ছায় বিয়ে করতে হয়েছিল, আর আমি এখনও কুমার আছি, এর জন্যে নিজেকে ছোট ভেবো না।

তোমার বয়স ছিল মোটে পনরো, এখনকার হিসেবে প্রায় খুকী। তুমি আমাকে খুব ভালবাসতে তা ঠিক, কিন্তু বাল্যকালের সে ভালবাসা হচ্ছে কাফ লভ, ছেলেমানুষী ব্যাপার, তা চিরস্থায়ী হতে পারে না।

—তুমি কিছুই বোঝ না।

—কিছু কিছু বুঝি। তুমি ছিলে সেকেলে গোবেচারী শান্ত মেয়ে, বাপ-মা যখন বিয়ে দিলেন তখন আপত্তি জানাবার শক্তিই তোমার ছিল না, আমাকে ছাড়া আর কাকেও বিয়ে করবে না এ কথা মুখ ফুটে বলা তোমার অসাধ্য ছিল। আর আমি ছিলুম তোমার চাইতে পাঁচ বছরের বড়, প্রায় সাবালক, বাপ-মা আমাকে নিজের মতে চলতে দিতেন। তুমি ছিলে নিতান্তই পরাধীন, আর আমি ছিলুম প্রায় স্বাধীন। আইবুড়ো থাকা তোমার পক্ষে অসম্ভব ছিল, কিন্তু আমার পক্ষে ছিল না। যশো, একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, দোষ নিও না। মনে কর সেই পঞ্চান্ন বছর আগে তুমি যেন ছিলে একালের মেয়ে, বালিকা নয়, একুশ-বাইশ বছরের সাবালিকা। যদি আমি তোমাকে বলতুম, যশো, তোমার বাপ-মা নাই বা মত দিলেন, তাঁদের অমতেই আমাদের বিয়ে হক, তোমার ভার নেবার সামর্থ্য আমার আছে, তা হলে তুমি রাজী হতে?

—নিশ্চয় হতুম।

—যাঁরা তোমাকে আজন্ম পালন করেছেন সেই বাপ-মার মনে নিদারুণ কষ্ট দিয়ে তাঁদের ত্যাগ করতে পারতে? যার সঙ্গে তোমার পরিচয় খুব বেশী নয়, যে তোমার আপন শ্রেণীর নয়, সেই আমাকেই বরণ করতে?

—নিশ্চয় করতুম।

—থ্যাংক ইউ যশো, তোমার উত্তর শুনে আমি ধন্য হয়েছি। স্ত্রী-পুরুষের আকর্ষণ একটা প্রাকৃতিক বিধান, কিন্তু তার সময় আছে, তখন বাপ মা ভাই বোনের চাইতে প্রেমাস্পদ বড় হয়ে ওঠে। তবে বিবাহের পর স্বামীরও প্রতিদ্বন্দ্বী আসে—সন্তান। কিশোর বয়সে তোমার যা অসাধ্য ছিল, সমাজের দৃষ্টিতে যা অন্যায়ও গণ্য হত, যৌবনকালে বিনা দ্বিধায় তা তুমি পারতে, তোমার এই কথা শুনে আমি কৃতার্থ হয়েছি।

—কি যে বল তার ঠিক নেই। পনেরো বছরের সুশ্রী যশো যে-কথা বলতে পারে নি বলে তোমার মন ভেঙে গিয়েছিল, সেই কথা সত্তর বছরের বুড়ী বিশ্রী যশো তোমাকে আজ মুখ ফুটে বলতে পেরেছে এতে তোমার লাভটা কি হল, তুমি কৃতার্থই বা হবে কেন? যা ঘটেছিল তার বদলে যদি অন্য রকম ঘটত—এ রকম চিন্তা তো আকাশকুসুম রচনা, বুড়োবুড়ীর পক্ষে নিছক পাগলামি।

—পাগলামি নয়, মনের পটে ছবি আঁকা। যে অতীত কাল চলে গেছে তার ধ্বংস হয় নি, তাকে আবার কল্পনার জগতে ফিরিয়ে আনা যায়, তাতে নতুন করে রঙ দেওয়া চলে।

—যাক গে ওসব বাজে কথা। শোন, কাল তুমি আমার ওখানে খাবে। টপকেশ্বর রোড, জিম-কর্বেট লজ। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ এসো। আসবে তো? নাতিকে পাঠাতে পারি, সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

—না না, পাঠাতে হবে না, আমি একাই যেতে পারব, ওদিকটা আমার জানা আছে। কিন্তু রাত্রে আমি দুধ-মুড়ি কি চিঁড়ে-দই খাই।

—বেশ তো, ফলারেরই ব্যবস্থা করব।

যশোমতী চলে গেলেন।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা পুরঞ্জয় ভঞ্জ জিম-কর্বেট লজে উপস্থিত হলেন। যশোমতী স্মিতমুখে নমস্কার করলেন, তাঁর নাতি ধ্রুব আর নাতবউ রাকা দুদিক থেকে পুরঞ্জয়ের দুই পা জড়িয়ে ধরে কলধ্বনি করে উঠল।

পুরঞ্জয় বললেন, যশোমতী, এরা তো আমাকে চেনে না, তুমি ইনট্রোডিউস করে দাও।

যশোমতী বললেন. পঞ্চান্ন বছর পরে কাল তোমাকে দেখেছি। আমি তোমার কতটুকু জানি? তুমিই নিজের পরিচয় দাও না।

পুরঞ্জয় বললেন, বেশ। শোন দাদাভাই ধ্রুব, আর কি নাম তোমার, রাকা। আমি হচ্ছি ডাক্তার পুরঞ্জয় ভঞ্জ, মেজর, আই. এম. এস., রিটায়ার্ড। চিকিৎসা বিদ্যা এখন প্রায় ভুলে গেছি। বহুকাল আগে তোমাদের এই ঠাকুমার ছেলেবেলার সঙ্গী ছিলুম, আলীপুরে আমাদের বাড়ি পাশাপাশি ছিল। ওঁকে খেপাবার জন্যে আমি বলতুম, যশোটা থসথসোটা। উনি আমাকে বলতেন, পুরোটা ঘুরঘুরোট। আমরা যেন ভাই বোন ছিলুম।

ধ্রুব বলল, শুধুই ভাই বোন?

—তার চাইতে বরং বেশী! একদিন দেখা না হলে অস্থির হতুম।

হিহি করে হেসে রাকা বলল, দাদু, শুনেছি আপনি স্পষ্টবক্তা লোক, রেখে ঢেকে কিছু বলতে পারেন না। কেন কষ্ট করে বানিয়ে বানিয়ে মিছে কথা বলবেন? মন খোলসা করে বলে ফেলুন। আমরা সব জানি, আমাদের জেরার চোটে ঠাকুমা সব কবুল করেছেন।

পুরঞ্জয় বললেন, যশো, তুমি দিব্যি একযোড়া শুক-সারী টিয়াপাখি পুষেছ। এরা আমাকে ফ্যাসাদে ফেলবে না তো?

হাত নেড়ে রাকা বলল. না না, আপনার কোনও চিন্তা নেই, নির্ভয়ে সত্যি কথা বলুন। ঠাকুমা আর আমরা সবাই খুব উদার, আমাদের কোনও সেকেলে অন্ধ সংস্কার নেই।

—বেশ বেশ। তা হলে নিশ্চয় শুনেছ যে যশোর সঙ্গে আমার প্রচণ্ড প্রেম হয়েছিল। তার পর ওঁর বিয়ে হয়ে যেতেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হল, মনের দুঃখে আমি বোম্বাইএ গিয়ে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হলুম, তার পর বিলাত গেলুম। কাল পঞ্চান্ন বছর পরে আবার ওঁর সঙ্গে দেখা হল। প্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম, কিন্তু দেখে হঠাৎ মনের মধ্যে একটা তোলপাড় উঠল, যাকে বলে আলোড়ন. বিক্ষোভ, আকুলিবিকুলি।

ধ্রুব বলল, অবাক করলেন দাদু। বুড়ীকে হঠাৎ দেখে বুড়োর ওল্ড ফ্লেম দপ করে জ্বলে উঠল, আগেকার প্রেম উথলে উঠল?

—ঠিক আগেকার প্রেম নয়, অন্য রকম আশ্চর্য অনুভূতি। তোমাদের তা উপলব্ধি করবার বয়স হয় নি। যথাসম্ভব বুঝিয়ে দিচ্ছি শোন। নিশ্চয়ই জান, তোমাদের এই ঠাকুমা অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন।

রাকা বলল, আমার চাইতেও?

—মাই ডিয়ার ইয়ং লেডি. তুমি সুন্দরী বটে, কিন্তু তোমার সেকালের দিদি-শাশুড়ীর তুলনায় তুমি একটি পেঁচী। যদি দৈবক্রমে ওঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হত তা হলে গত পঞ্চান্ন বছরে আমার চোখের সামনেই উনি ক্রমশ বুড়ী হতেন। ধাপে ধাপে নয়, একটানা ক্রমিক পরিবর্তন, কিশোরী থেকে যুবতী, তার পর মধ্যবয়স্কা

প্রৌঢ়া, তার পর বৃদ্ধা। সবই সইয়ে সইয়ে তিল তিল করে ঘটত, আমার আশ্চর্য হবার কোনও কারণ থাকত না। কবে উনি মোটাতে শুরু করলেন, কবে চশমা নিলেন, কবে দাঁত পড়ল, কবে চুলে পাক ধরল, প্রেমালাপ ঘুচে গিয়ে কবে সাংসারিক নীরস বিষয় একমাত্র আলোচ্য হয়ে উঠল, এ সব আমি লক্ষ্যই করতুম না। বৃক্ষ-লতার যৌবন বার বার ফিরে আসে, কিন্তু মানুষের ভাগ্যে তেমন হয় না, বাল্য যৌবন জরা আমাদের অবশ্যম্ভাবী, তার জন্যে আমরা প্রস্তুত থাকি। কিন্তু সেকালের সেই পরমা সুন্দরী কিশোরী যশো, আর পঞ্চান্ন বৎসর পরে যাকে দেখলুম সেই বৃদ্ধা যশো,—এই দুইএর আকাশ-পাতাল প্রভেদ, তাই হঠাৎ একটা প্রবল ধাক্কা খেয়েছিলুম।

রাকা বলল, হায় রে পুরুষের মন, রূপ ছাড়া আর কিছুই বোঝে না! আমি এখনই তো পেঁচী, বুড়ো হলে কি যে গতি হবে জানি না।

—ভয় নেই দিদি। তোমার ক্রমিক রূপান্তর ধ্রুবর চোখের সামনে একটু একটু করে হবে, ও টেরই পাবে না, ডায়ারিতেও নোট করবে না। শেষ বয়সে যদি হাড়গিলে কি শকুনি গৃধিনী হয়ে পড় তাতেও ধ্রুব শক্‌ড হবে না। প্রেমের দুই অঙ্গ, একটা দেহাশ্রিত, আর একটা দেহাতীত। তোমাদের মনে এখন এক সঙ্গে দুটো মিশে আছে। কিন্তু যতই বয়স বাড়বে ততই প্রথমটা লোপ পাবে, শুধু দ্বিতীয়টাই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে।

রাকা বলল, পঞ্চান্ন বছর পরে ঠাকুমাকে হঠাৎ দেখে আপনার মনে একটা ধাক্কা লেগেছিল তা বুঝলুম, কিন্তু তার ফলে আপনার হৃদয়ের অবস্থা অর্থাৎ ঠাকুমার প্রতি আপনার মনোভাব কি রকম দাঁড়াল?

—পর পর দুটো অনুভূতি হল, যশোমতীর দুই রূপ দেখলুম। ওঁকে ভুলেই গিয়েছিলুম, কিন্তু ওঁর হাসি দেখে আর গলার স্বর শুনে পঞ্চান্ন বছর আগেকার সেই তন্বী কিশোরী মূর্তি মনের মধ্যে ফুটে উঠল। তার কিছুমাত্র বিকার হয় নি, একেবারে যথাযথ অক্ষয় হয়ে আছে। তার যে পরিবর্তন পরে ঘটেছে তা তো আমি দেখি নি, সেজন্যে তার কোনও প্রভাবই আমার চিত্তস্থিত মূর্তির ওপর পড়ে নি। তার পরেই যশোর অন্য এক রূপ দেখলুম, দেহের নয়, আত্মার। আমার বুদ্ধিতে মন আর আত্মা একই বস্তু, বয়সের সঙ্গে তার পরিবর্তন হয়, কিন্তু ধারা বজায় থাকে সেজন্য চিনতে পারা যায়। যেমন, নদীর জলপ্রবাহ নিত্য নূতন, কিন্তু প্রবাহিণী একই। যশোমতীর কথায় বুঝলুম, উনি সেই আগের মতন সংস্কারের দাসী গুরুজনের আজ্ঞাপালিকা ভীরু মেয়ে নন, ওঁর স্বাধীন বিচারের শক্তি হয়েছে, মনের কথা বলবার সাহস হয়েছে। উনি যদি সেকালের কিশোরী না হয়ে একুশ-বাইশ বছরের আধুনিকী হতেন তবে সমস্ত বাধা অগ্রাহ্য করে আমাকেই বরণ করতেন।

যশোমতী বললেন, এই, তোরা চুপ কর, কেন ওঁকে অত বকাচ্ছিস, খেতে দিবি না?

রাকা বলল, বা রে, উনি নিজেই তো বকবক করছেন, আমরা শুধু একটু উসকে দিচ্ছি। আসুন দাদু, এইবার খেতে বসুন।

যশোমতী বললেন, টেবিলে খাবার দেব কি, না আসন পেতে দেব?

পুরঞ্জয় বললেন, খাওয়াবে তো ফলার। টেবিলে তা মানায় না, আসনই ভাল। মেজেতেই বসব।

খাদ্যের আয়োজন দেখে পুরঞ্জয় বললেন, বাঃ কি সুন্দর! সাত্ত্বিক ভোজন একেই বলে। সাদা কম্বলের আসন, সাদা পাথরের থালায় ধপধপে সাদা চিঁড়ে, সাদা কলা, সাদা সন্দেশ, সাদা বরফি, সাদা নারকেল কোরা, সাদা পাথর বাটিতে সাদা দই। আবার, সামনে একটি সাদা বেরাল বসে আছে। যশো, তোমার রুচির তুলনা নেই।

রাকা বলল, আসল জিনিসেরই তো বর্ণনা করলেন না। এই পবিত্র শুভ্র খাদ্য-সম্ভার পরিবেশন করেছেন কে? একজন শুভ্রবসনা শুভ্রকেশা শুভ্রকান্তি শুচিস্মিতা সুন্দরী, যাঁর দুটো মূর্তি আপনার চিত্তপটে পার্মানেন্ট হয়ে আছে।

পুরঞ্জয় বললেন, সাধু সাধু, চমৎকার, বহুত আচ্ছা, ওআহ্ খুব, একসেলেণ্ট!

রাকা বলল, দাদু, একটি কথা নিবেদন করি। আমাদের দুজনকে তো আপনি শুক-সারী বলেছেন। আমি বলি কি, আপনিও আমাদের এই নীড়ে ঢুকে পড়ুন, ঠাঁই আছে। যশোমতী দেবীর পাণিগ্রহণ করুন। দুটিতে ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমীর মতন আমাদের কাছে থাকবেন, সবাই মিলে পরমানন্দে দিন যাপন করব।

যশোমতী বললেন, যা যাঃ, বেশী জেঠামি করিস নি।

পুরঞ্জয় বললেন, শোন রাকা দিদি। বুড়ো-বুড়ীর বিয়ে বিলাতে খুব চলে, ভবিষ্যতে হয়তো এদেশেও চলবে, যেমন স্মোক্‌ড হ্যাম আর সার্ডিন চলছে। কিন্তু আপাতত এদেশের রুচিতে তা বিকট। তার দরকারও কিছু নেই। যশোমতীর পূর্বরূপের ছাপ আমার মনে পাকা হয়ে আছে, ও'র আত্মার স্বরূপও আমি উপলব্ধি করেছি, উনিও আমাকে ভাল করেই বুঝেছেন। এর চাইতে বেশী উনিও চান না, আমিও চাই না।

১৮৮১ শক (১৯৫৯)

জয়রাম-জয়ন্তী

জয়রাম নন্দী কোনও অসাধারণ মহাপুরুষ নন, তিনি শুধু অসাধারণ দীর্ঘ-জীবী। আজ তাঁর শততম জন্মদিন, তাই তাঁর আত্মীয়রা একটু জয়ন্তীর আয়োজন করেছেন। পোলাও আর মাংস রান্না হচ্ছে, কিন্তু এ বাড়িতে নয়, একটু দূরে অন্য বাড়িতে, নয়তো বুড়ো গন্ধ পেয়ে খাবার জন্যে আবদার করবে।

সকালে কমলানেবুর রস আর দুধ-সন্দেশ খাইয়ে বাইরের ঘরে একটা তক্তপোশে অনেকগুলো বালিশে ঠেস দিয়ে জয়রামকে বসানো হয়েছে। আজ রবিবার, সকলেরই ফুরসত আছে। স্বজনবর্গ একে একে প্রণাম করছে, উপহার দিচ্ছে, দু-চারটে কথা বলে অনেকে চলে যাচ্ছে, কেউ বা অল্পক্ষণের জন্যে বসছে।

বয়সের তুলনায় জয়রামের শরীর ভালই আছে। ব্লডপ্রেশার বেশী নেই, ডায়াবিটিস নেই, বাত নেই। চোখে ছানি পড়ে নি, তবে দৃষ্টি কমে গেছে। খাবার লোভ খুব আছে, কিন্তু পেটরোগা। কানে কখনও ভাল শোনেন, কখনও খুব কম শোনেন। দোষের মধ্যে মাঝে মাঝে স্মৃতির ওলটপালট হয়, অতীত আর বর্তমান গুলিয়ে ফেলেন, কেউ প্রতিবাদ করলে চটে ওঠেন। মেজাজ সাধারণত ভালই থাকে, গল্প করতে ভালবাসেন, মাঝে মাঝে প্রলাপ বকেন, আবার বুদ্ধিমানের মতন কথাও বলেন। খবর জানবার আগ্রহ খুব আছে, কাগজে কি লিখেছে তা তাঁর নাতির কাছ থেকে প্রত্যহ শোনেন। বেশী তামাক খাওয়া বারণ, কিন্তু জয়রাম হাত থেকে গড়গড়ার নল নামাতে চান না, কলকে নিবে গেলেও টের পান না।

সিমসন স্মিথ অ্যান্ড কম্পানির অফিসে জয়রাম চল্লিশ বছর চাকরি করেছেন, শেষ বিশ বছর বড়বাবুর পদে ছিলেন। মনিবরা উদার, জয়রামকে মোটা পেনশন দেন। তিনি অবসর নিলে তাঁর ছেলে হরেরাম ওই পদ পান। চার বছর হল হরেরামও অবসর নিয়েছেন, এখন তিনি নবদ্বীপে বাস করছেন। তাঁর ছেলে, অর্থাৎ জয়রামের নাতি শিবরাম ওই ফার্মেই কাজ করে, তারও ভবিষ্যতে বড়বাবু হবার আশা আছে।

জয়রাম তিনবার বিবাহ করেছিলেন, এখন তিনি বিপত্নীক। স্নান, কাপড় বদলানো, খাওয়া, মুখ ধোয়া ইত্যাদি নানা কাজে তাঁকে পরের সাহায্য নিতে হয়। রাত্রে অনেক বার তাঁর জন্যে প্রস্রাবের পাত্র এগিয়ে দিতে হয়, সকালে এনিমাও দিতে হয়। একজন দক্ষ চাকর এইসব কাজ করত, কিন্তু জয়রামের গালাগালি সইতে না পেরে সে চলে গেছে। অগত্যা সম্প্রতি একজন নর্স বাহাল করা হয়েছে, লতিকা খাস্তগির। পাস করা নর্স নয়, সেজন্যে তার চার্জ কম। সে সন্ধ্যায় আসে, বেলা আটটায় চলে যায়। তার সেবায় জয়রাম এখন পর্যন্ত তুষ্ট আছেন।

আগন্তুক আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে জয়রাম প্রসন্ন মনে গল্প করেছেন আর মাঝে মাঝে গড়গড়ার নির্ধূম নল টানছেন, এমন সময় তাঁর নাতি শিবরাম এসে বলল, দাদু, মস্ত খবর, আমাদের বড়সায়েব মিস্টার সিমসন তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন।

জয়রাম বললেন, বলিস কি রে, সার চার্লস সিমসন?

—আঃ, তোমার কিছুই মনে থাকে না। সার চার্লস তো তোমার চাইতেও বড় ছিলেন, সেই কবে মান্ধাতার আমলে মারা গেছেন। তাঁর নাতি হ্যারি সিমসন এখন সিনিয়র পার্টনার, তিনিই গুড উইশ জানাতে আসছেন। তোমার সঙ্গে ফার্মের কত কালের সম্পর্ক তা জানেন কিনা।

—জানবেই তো, কত বড় বংশের সায়েব। কিন্তু বসতে দিবি কিসে? বাড়িতে একটাও ভাল চেয়ার নেই।

—ভেবো না, তার ব্যবস্থা আমি করেছি।

জয়রাম চঞ্চল হয়ে বললেন, ওরে শিবু, চট করে আমার সেই জীনের পাতলুন আর মুগার চাপকানটা বের করে আমাকে পরিয়ে দে। তোর বউএর কাছ থেকে একটু খোসবায় এনে ভাল করে মাখিয়ে দিস, যাতে ন্যাফথালিনের গন্ধ চাপা পড়ে। আর, একটা উড়ুনি বেশ করে কুঁচিয়ে পাকিয়ে দে, গলায় দেব। আর, আমার ঘড়ি, ঘড়ির চেন, সার চার্লস সিমসন যা দিয়েছিলেন।

—কেন শুধু শুধু ব্যস্ত হচ্ছ দাদু, তুমি যা পরে আছ সেই সাজেই সায়েবের সঙ্গে দেখা করবে। খাতির জানাবার জন্যে কাগতাড়ুয়া সাজবার কোনও দরকার নেই।

উপস্থিত স্বজনবর্গের দিকে সগর্বে দৃষ্টিপাত করে জয়রাম বললেন, উঃ, মস্ত লোক ছিলেন সার চার্লস সিমসন। আমাকে কি রকম স্নেহ করতেন, হরদম ডাকতেন, ন্যাণ্ডি ব্যাবু, ন্যাণ্ডি ব্যাবু। ওরে শিবু, জন্মদিনের উপহার কি সব এল তা তো দেখালি নি।

—তা ভালই এসেছে। ফুলের মালা, ফুলের তোড়া, গরদের জোড়, নামাবলী, দুধখাবার রুপোর গেলাস, গড়গড়ার রুপোর মুখনল, বাক্স বাক্স সন্দেশ আর চন্দ্রপুলি, ল্যাংড়া আম, মিহি পেশোয়ারী চাল, গাওয়া ঘি, আরও কত কি।

—পাকা রুই মাছ দিয়েছে?

—না, তা তো কেউ দেয় নি।

—তবে কি ছাই দিয়েছে। তোর বউকে শিগ্‌গির ডাক।

নাতবউ শিবানী আধঘোমটা দিয়ে ঘরে এল। জয়রাম বললেন, এই শিবি, আজ পেশোয়ারী চালের চাট্টি পোলাও করবি, শুধু আমার জন্যে, বুঝলি? পাঁচ ভূতকে খাওয়ালে ওইটুকু চাল কদিন টিকবে। নতুন বাজার থেকে ভাল পোনা মাছ আনিয়ে দই আদা লংকা গরম মসলা দিয়ে গরগরে করে কালিয়া রাঁধবি—

ডাক্তার উমেশ গুহ বললেন, পোলাও কালিয়া এখন থাকুক সার। আপনার এ বয়সে লঘু পথ্যই ভাল।

—হুঁ। বয়সটা কত ঠাওর করেছ ডাক্তার?

—সে কি, জানেন না? আজ যে আপনি এক শ বছরে পা দিয়েছেন, তাই তো আমরা জয়ন্তী করছি। এমন দীর্ঘ আয়ু কত লোকের ভাগ্যে হয়!

—এক শ বছর না তোমার মুণ্ডু। মোটে সত্তর, এই তো সবে সেদিন পঁয়ষট্টি বছর বয়সে রিটায়ার করলুম। এই শিবে শালা আর ওর বাপ হরে ব্যাটা মিছিমিছি বয়স বাড়িয়ে আমাকে ভয় দেখায়, না খাইয়ে মেরে ফেলতে চায়, আমার সম্পত্তির ওপর ওদের দারুণ টান। শাস্ত্রে লিখেছে না—পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ। উমেশ ডাক্তারকেও ওরা হাত করেছে।

শিবানী বলল, কারও কথা শুনবেন না দাদু, আপনার জন্যে পোলাও কালিয়াই রাঁধব। তার পর ডাক্তারের দিকে চেয়ে ফিসফিস করে বলল, শিউলি-বোঁটার রঙ দেওয়া গলা ভাত আর শিঙিমাছের ঝোল।

জয়রাম বললেন, শিবি, তোর দেখছি একটু দয়ামায়া আছে। দুটো ল্যাংড়া আম ছাড়িয়ে দে তো দিদি, আর খান দুই চন্দ্রপুলি, দেখি কেমন উপহার দিয়েছে। চট করে দে, বড়সায়েব আসবার আগেই খেয়ে নি।

—সেকি দাদু, একটু আগেই তো দুধ-সন্দেশ খেলেন! বিকেল বেলা একটু আম আর চন্দ্রপুলি খাবেন এখন।

—সব বেটা বেটী শালা শালী সমান, আমাকে উপোস করিয়ে মেরে ফেলতে চায়। দাঁড়া, সবাইকে কলা দেখাচ্ছি। আমি ফের বিয়ে করব, নতুন বউকে সব সম্পত্তি দেব।

শিবরাম বলল, এমন থুত্থুড়ে যুবো বরকে বিয়ে করবে কে?

—লট্‌কী নর্স বিয়ে করবে। এই লট্‌কী, তোকে পঞ্চাশ ভরি গোট দেব, দু-হাতে দশ-দশ গাছা চুড়ি দেব, এই বাড়িখানা তোকে দেব, বিয়ে করতে রাজী আছিস?

নর্স লতিকা বলল আহা আগে বলেন নি কেন কত্তাবাবু, আর একজনকে যে কথা দিয়ে ফেলেছি। আপনি দেখুন না, যদি বুঝিয়ে সুজিয়ে কি ভয় দেখিয়ে লোকটাকে ভাগাতে পারেন।

নর্স চলে গেলে শিবরাম বলল, দাদু, বেশ তো, লতিকা খান্তগিরকে বিয়ে কর, মজা টের পাবে। যেমন তুমি চোখ বুজবে অমনি তোমার পেয়ারের লট্‌কী একটা জোয়ান বর বিয়ে করবে আর মনের সাধে দুজনে তোমার সম্পত্তি ওড়াবে।

শিবরামের বড়সাহেব হ্যারি সিমসন এসে পড়লেন। যাঁরা ঘরে ছিলেন তাঁরা সকলেই উঠে গেলেন। মহা খাতির করে শিবরাম সায়েবকে জয়রামের কাছে নিয়ে এল।

জয়রামের শীর্ণ হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে সিমসন বললেন, হাডুডু, এ গ্রেট ডে নন্দী বাবু। আপনার জন্মদিন আরও বহুবার আসুক এই কামনা করি। ইউ লুক ভেরি ওয়েল।

হাত জোড় করে গদ্‌গদ স্বরে জয়রাম বললেন, অ্যাজ ইউ হ্যাভ কেপ্ট মি সার, যেমন আমাকে রেখেছেন। উইশ ইউ লঙ লাইফ, ইউ, ইওর মিসিস অ্যান্ড চিলড্রেন। লঙ লিভ মেসার্স সিমসন স্মিথ অ্যান্ড কম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, লঙ লিভ কুইন ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড ব্রিটিশ এম্পায়ার—

শিবরাম বলল, কি বলছ দাদু, কুইন ভিক্টোরিয়া তো ষাট বছর হল মরেছেন।

—বেগ ইওর পার্ডন। লঙ লিভ কুইন এলিজাবেথ নম্বর টু, আই অ্যাম হার মোস্ট অম্ব্‌ল সবজেক্ট সার।

সিমসন সহাস্যে বললেন, নন্দী বাবু, আপনাদের দেশ বারো বৎসর হল ইন-ডিপেন্ডেন্ট হয়েছে, তার খবর রাখেন না?

হাত নেড়ে জয়রাম বললেন, নো ইনডিপেন্ডেন্স সার। অ্যাশ, ওনলি অ্যাশ, শুধু ছাই। চাল পঁয়ত্রিশ টাকা, পোনা মাছ পাঁচ টাকা, নো পিওর ঘি।

—যুদ্ধের পর যেমন সব দেশে তেমনি আপনাদের দেশেও দাম চড়ে গেছে। কিন্তু লোকের আয়ও তো বেশ বেড়েছে। দেদার নতুন নতুন বিল্ডিং উঠছে, পথে অসংখ্য মোটর কার চলছে—

—থীভ্‌স সার, অল থীভ্‌স। ব্রিটিশ আমলে আমাদের ছেলে ভাইপো শালা জামাইএর চাকরি জোটানো সহজ ছিল, কারণ আপনাদের আত্মীয়রা কেউ তুচ্ছ কেরানীর কাজ চাইতেন না। কিন্তু এখন একটা সামান্য পোস্টের জন্যে বড় বড় কর্তারা সুপারিশ পাঠান, তাঁদেরও এক পাল বেকার আত্মীয় আছে কিনা।

—তা হলেও তো আপনাদের এই ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের লোকে মোটের ওপর সুখে আছে।

—নো সার, মোস্ট অনহ্যাপি। ইউনিয়ন অভ রিচ রাসকেল্‌স, ফল্‌স লীডার্স, অ্যাণ্ড প্রোটেকটেড গুণ্ডাজ। পুওর নেহরু ইজ হেল্পলেস।

জয়রাম ক্রমশ উত্তেজিত হচ্ছেন দেখে সিমসন বললেন, পলিটিক্স থাকুক, আপনার নিজের কথা বলুন নন্দী বাবু।

স্মিতমুখে জয়রাম বললেন, সার, ইউ উইল বি হ্যাপি টু হিয়ার, আমি আবার বিবাহ করছি। একটি ভাল ইয়ং লেডি, আমার অবর্তমানেও যে ফেথফুল থাকবে।

—রিয়ালি? নন্দী বাবু, তার চাইতে একটি গুড ওল্ড লেডি বিয়ে করাই তো ভাল, আপনার যত্ন নেবে।

জয়রাম ঠোঁট উলটে বললেন, ওল্ড লেডি নো গুড।

—আপনি নিজে কি রকম?

—আই ভেরি গুড। আপনাদের তেরোটা ডিপার্টমেণ্ট আমি একাই ম্যানেজ করতে পারি। সার, আমার কথা থাকুক, হোমের কথা বলুন। বড়ই মন্দ খবর শুনছি।

—কি রকম?

—শুনছি ব্রিটেন নাকি ফার্স্ট পাওয়ার থেকে থার্ড পাওয়ারে নেমে গেছে, চায়না আর একটু উঠলেই ব্রিটেন ফোর্থ হয়ে যাবে।

—চিরকাল সমান যায় না নন্দী বাবু। ইণ্ডিয়া যদি মিলিটারি মাইণ্ডেড হয় তবে ব্রিটেন হয়তো ফিফ্‌থ পাওয়ার হয়ে যাবে।

—গড ফরবিড। আরও সব বিশ্রী কথা শুনছি।

—কি শুনছেন?

ছোট ছেলের মতন হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে জয়রাম বললেন, ওই আমেরিকানরা সার। সিটিং অন দাই ব্রেস্ট অ্যাণ্ড পুলিং আউট দাই বিয়ার্ড বাই দি হ্যাণ্ডফুল, বুকে বসে দাড়ি ওপড়াচ্ছে। বিউটিফুল গার্ল্‌স্ ধরে ধরে নিজের দেশে নিয়ে যাচ্ছে। আর, আমাদের হোলি গীতায় যা আছে—জায়তে বর্ণসংকরঃ। অ্যাটম আর হাইড্রোজেন বোমা চালাচালি করছে। বেশী মদ খেয়ে পাইলট যদি বেসামাল হয় তবে তো আপনাদের দেশের ওপরেই বোমা ফাটবে। তা হলে কি সর্বনাশ হবে সার!

—যত সব ননসেন্স। ডোণ্ট ওআরি নন্দী বাবু, আমরা নিরাপদে আছি।

—নো সার, ভেরি গ্রেভ সিচুয়েশন। আপনারা এখানে চলে আসুন, অল ব্রিটিশ পিপ্‌ল, নেহরুজী আপনাদের আশ্রয় দেবেন, যেমন তিব্বতীদের দিয়েছেন। হিমা-

লয় অঞ্চলে প্রচুর ঠাণ্ডা জায়গা আছে, সেখানে আরামে থাকবেন। আমেরিকা আর রাশিয়া ঝগড়া করে মরুক, লেট ইউরোপ গো টু হেল।

—নন্দী বাবু, এই দেশ কি আমাদের পক্ষে খুব নিরাপদ? শুনেছি আপনাদের এক পাওআরফুল গড আছেন, কল্কি অবতার, মিস্টার নেহরু কোনও রকমে তাঁকে ঠেকিয়ে রেখেছেন। নেহরু যখন থাকবেন না তখন ওই কল্কি অবতার এদেশে অবতীর্ণ হবেন, প্রকাণ্ড তলোয়ার দিয়ে সমস্ত ননহিন্দুকে কেটে ফেলবেন। তার চাইতে প্যাকিস্তানই তো ভাল, ওরা চিরকালই ফেথফুল, আমাদের তাড়াতে চায় নি।

—পাকিস্তানে জায়গা পাবেন না সার, আমেরিকানরা আপনাদের থাকতে দেবে না। গুড ওল্ড ইণ্ডিয়াই আপনাদের পক্ষে ভাল। কোনও ভয় নেই, শুধু একটা ডিক্লারেশন সই করবেন যে আপনারা স্পিরিচুয়াল হিন্দু। আপনাদের পৈতৃক খ্রীষ্ট-ধর্ম, বীফ, পোর্ক, হুইস্কি কিছুই ছাড়বার দরকার নেই, তবে একখানি গীতা সর্বদা সঙ্গে রাখবেন।

সিমসন বললেন, গুড আইডিয়া, ভেবে দেখব। গুড বাই নন্দী বাবু, আপনি বিশ্রাম করুন। এই এক বাক্স চকোলেট আপনার জন্যে এনেছি, খাবেন।

১৮৮১ শক (১৯৫৯)

২৪৬

গুপী সাহেব

এই লোকটির নাম আপনাদের হয়তো জানা নেই। আমিও তাকে ভুলে গিয়েছিলুম, কিন্তু সেদিন হঠাৎ মনে পড়ে গেল। তার যে ইতিহাস নয়নচাঁদ পাইন আর দাশু মল্লিককে বলেছিলুম তাই আজ আপনাদের বলছি। নয়নচাঁদ আর দাশু তা মন দিয়ে শোনেন নি, কারণ তাঁদের তখন অন্য ভাবনা ছিল। আমার বিশ্বাস, গুপী সায়েব অখ্যাত হলেও একজন অসাধারণ গুণী লোক। আশা করি আপনারা যথোচিত শ্রদ্ধাসহকারে তার এই ইতিহাস শুনবেন।

নয়নচাঁদ পাইনের ঘড়ির ব্যবসা আছে। দাশু মল্লিক তাঁর দূর সম্পর্কের শালা, নেশাখোর, কিন্তু খুব সরল লোক। নয়নচাঁদের ছেলের বিয়ের কথাবার্তা চলছে। কনের ঠাকুরদা হৃদয় দাসের সঙ্গে আমার আলাপ আছে, সেজন্যে নয়নচাঁদ আমাকে অনুরোধ করেছেন তাঁর দাবি সম্বন্ধে আমিই যেন হৃদয় দাসের সঙ্গে কথা বলি। দাবির দুটি আইটেমের ওপর আমাকে বেশী জোর দিতে হবে। এক নম্বর—পাত্রের পিতার জন্যে একটি মোটর গাড়ি অগ্রিম চাই, উত্তম সেকেন্ড হ্যান্ড হলেও চলবে। দু নম্বর—যেহেতু এদেশে পাত্রের তেমন লেখাপড়া হল না, সে কারণে দাদাশ্বশুরের খরচে তাকে জেনিভা পাঠাতে হবে, ঘড়ি তৈরি শেখবার জন্যে।

আমার দৌত্যের ফল কি হল তা জানবার জন্যে দাশু মল্লিক আমার কাছে এসেছেন, নয়নচাঁদও একটু পরে আসবেন। আমি বললুম, দাশুবাবু, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, পাইন মশাই এলেই সব খবর বলব। ততক্ষণ একটা বর্মা চুরুট টানুন।

দাশু মল্লিক ধূমপান করতে করতে চুপিচুপি বললেন, দেখ হে, তুমি এই দেনাপাওনার ব্যাপারে বেশী জড়িয়ে প'ড়ো না, পরে হয়তো লজ্জায় পড়বে। আমার ভাগনে, মানে নয়নচাঁদের ছেলে একটি পাঁঠা।

এমন সময় নয়নচাঁদ এলেন, এসেই একটা তাকিয়া টেনে নিয়ে শুয়ে পড়লেন। আমি প্রশ্ন করলুম, কি হল পাইন মশাই, শরীরটা খারাপ নাকি?

নয়নচাঁদ আঙুল নেড়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, আমি তোমাদের এই বলে রাখলুম, দেশ উচ্ছন্নে যেতে বসেছে, সর্বনাশের আর দেরি নেই।

দাশু মল্লিক আর আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইলুম। নয়নচাঁদ বলতে লাগলেন, গেল হপ্তায় মানিকতলা বাজারে পকেট থেকে সাড়ে চোদ্দ টাকা উধাও হল। আবার আজ সকালে কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে উনিশ টাকা তেত্রিশ নয়াপয়সা মেরে নিয়েছে। তোমাদের মিনমিনে গণতন্ত্রী সরকারকে দিয়ে কিছুই হবে না, জবরদস্ত আয়ুবশাহী গভরমেণ্ট দরকার, পকেটমার চোর আর ভেজালওয়ালাদের সরাসরি ফাঁসিতে লটকাতে হবে।

দাশু মল্লিক বললেন, যা বলেছ দাদা। তোমাদের মনে আছে কিনা জানি না, তেরো-চোদ্দ বছর আগে লীগ মন্ত্রীদের আমলে পুরো একটি বছর পিকপকেটিং একেবারে বন্ধ ছিল, নট এ সিংগল কেস। তারপর যেমন স্বাধীনতা এল, আবার যে কে সেই।

আমি বললুম, আপনারা প্রকৃত খবর জানেন না। লীগ মন্ত্রীদের বা পুলিসের কিছুমাত্র কেরামতি ছিল না, পকেটমারদের ঠাণ্ডা করছিল আমাদের গুপী সায়েব।

নয়নচাঁদ বললেন, তিনি আবার কে?

—আমার এখানে দেখে থাকবেন, এখন ভুলে গেছেন। তেরো-চোদ্দ বছর আগে প্রায়ই এখানে আসত, অতি অদ্ভুত লোক।

—ফিরিঙ্গী নাকি?

—না, খাঁটি বাঙালী। গুপী সায়েবের আসল নাম বোধ হয় গোপীবল্লভ ঘোষ, গোপীনাথ গোপেশ্বর কিংবা গোপেন্দ্রও হতে পারে, ঠিক জানি না। একটা বিস্কুটের কারখানায় কাজ করত। এখনকার ছোকরারা যেমন প্যাণ্ট-শার্ট প'রে গলায় লম্বা টাই উড়িয়ে খালি মাথায় রোদে ঘুরে বেড়ায়, স্বাধীনতার আগের যুগে তেমন ফ্যাশন ছিল না। রামানন্দ চাটুজ্যে মশাই একবার লিখেছিলেন, রোদে বেরুতে হলে মাথায় হ্যাট দেওয়া ভাল, দেশী সাজের সঙ্গেও তা চলতে পারে। গুপী এই উপদেশটি শিরোধার্য করেছিল, ধুতি পঞ্জাবি প'রে মাথায় শোলা হ্যাট দিয়ে বাইসিকল চড়ে ঘুরে বেড়াত। একবার অর্ধোদয় যোগের সময় তাকে দেখেছিলুম, একটা গামছা প'রে আর একটা গামছা গায়ে জড়িয়ে মাথায় হ্যাট দিয়ে হাতে কমণ্ডলু ঝুলিয়ে গঙ্গাস্নানে যাচ্ছে। এই হ্যাটের জন্যেই সবাই তাকে গুপী সায়েব বলত।

নয়নচাঁদ বললেন, তোমার ভণিতা রেখে দাও, পকেট-মারা কিসে বন্ধ হল তাই চটপট বলে ফেল। আমাদের এখন অনেক কাজ আছে। একটা বিয়ের যোগাড় কি সোজা কথা!

একটু চটে গিয়ে আমি বললুম, গুপী সায়েব হেঁজিপেঁজি লোক নয়, তার ইতিহাস বলতে সময় লাগে, আর ধীরে-সুস্থে তা শুনতে হয়। আপনাদের যখন ফুরসত নেই তখন থাক।

নয়নচাঁদ বললেন, আরে না না, রাগ কর কেন। কি জান, মনটা একটু খিঁচড়ে আছে, তাই ব্যস্ত হয়েছিলুম। হাঁ, ভাল কথা, শুনলুম হৃদয় দাস নাকি একটা ভাল রোভার গাড়ির জন্যে বায়না করেছে। তা হলে কঞ্জুস বুড়োর সুবুদ্ধি হয়েছে?

—তা হয়েছে।

—বেশ বেশ, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। যাক, এখন তুমি গুপী সায়েবের ইতিহাস বল।

আমি বলতে লাগলুম।—

গুপী সায়েব লেখাপড়া বেশী শেখে নি, কিন্তু ছোকরা খুব পরোপকারী ছিল আর হরেক রকম জানোয়ার সম্বন্ধে তার অগাধ জ্ঞান ছিল। তার মক্কেলও ছিল বিস্তর। পয়সার জন্যে নয়, শখের জন্যেই সে ফরমাশ খাটত, তবে কেউ কিছু দিলে খুশী হয়ে নিত। মনে করুন আপনি একটা ভাল কাবুলী বেরাল চান। গুপী সায়েব ঠিক যোগাড় করে দেবে, এমন বেরাল যার ন্যাজ খ্যাঁকশেয়ালকে হারিয়ে দেয়। আমাদের পাড়ার রাধাশ্যাম গোসাঁইএর নাতির শখ হল একটা বুলডগ পুষবে। কিন্তু বাড়িতে মাংস আনা বারণ। গুপী সায়েব এমন একটা কুত্তা এনে দিল যে ভাত ডাল ডাঁটা-চচ্চড়িতেই তুষ্ট, আর হাড়ের বদলে এক টুকরো কঞ্চি বা একটি পুরনো টুথ-ব্রশ পেলেও তার চলে। কালীচরণ তন্ত্রবাগীশকে মনে আছে? লোকটা গোঁড়া শাক্ত,

রাধাকৃষ্ণ কি সীতারাম শ্ননলে কানে আঙ্নল দিতেন। তাঁর শখ হল একটি ময়না প্নষবেন, কিন্তু বৈষ্ণবী ব্নলি কপচালে চলবে না। গ্নপী সায়েব তারাপীঠ না চন্দ্রনাথ কোথা থেকে একটা পাখি নিয়ে এল, সে গাঁজাখোরের মতন হেঁড়ে গলায় শ্নধ্ন বলত, তারা তারা বল্ শালারা।

সেই সময় হ্যারিসন রোডে বিখ্যাত সিনেমা হাউস ছিল ঝমক মহল। করনুগেট লোহার ছাত, তার নীচে কাঠের সীলিং। বহ্নকালের প্নরনো বাড়ি, সীলিংএ অনেক ফাঁক ছিল, তাই দিয়ে বিস্তর পায়রা ঢ্নকে ভেতরের কার্নিসে রাত্রিযাপন করত। অডিটোরিয়ম এত নোংরা হত যে দর্শকরা হল্লা করতে শ্নর্ন করল। ম্যানেজার হর-ম্নসজী ছিপিওয়ালা পায়রা তাড়াবার অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছ্নই হল না। মেরে ফেলবার উপায় নেই, কারণ হিন্দ্নর চোখে গর্ন যেমন ভগবতী, তেমনি হিন্দ্ন ম্নসলমান আর পারসীর চোখে পায়রা লক্ষ্মীর প্রজা। ছিপিওয়ালা সায়েব লোক-পরাম্পরা শ্ননলেন, পায়রা তাড়াতে পারে একমাত্র গ্নপী সায়েব। তাকে কল দেওয়া হল। সে বলল, খ্নব সোজা কাজ। রাত বারোটার পর যখন শো বন্ধ হবে আর পায়রার দল বেহ্নঁস হয়ে ঘ্নম্নবে তখন দ্ন-তিন জন লোক লাগিয়ে দেবেন। তারা মই দিয়ে উঠবে আর প্রত্যেকটি পায়রার পেট টিপে ছেড়ে দেবে। পায়রার স্মরণশক্তি তীক্ষ্ম নয়, সেজন্যে দিন কতক নিয়মিত ভাবে পেট টেপা দরকার। ক্রমশ তাদের হৃদয়ংগম হবে যে এই ঝমক মহল সিনেমা ভবন পায়রার পক্ষে মোটেই নিরাপদ আশ্রয় নয়। গ্নপী সায়েবের ব্যবস্থা অন্নসারে হরম্নসজী ছিপিওয়ালা প্রাত্যাহিক পেট টেপার অর্ডার দিলেন, দিন কতক পরেই পায়রার দল বিদায় হল। গ্নপী পঁচিশ টাকা দক্ষিণা পেল। তার কয়েক মাস পরে সিনেমা হাউসের ভাড়া নিয়ে ঝগড়া হওয়ায় ছিপিওয়ালা সায়েব নাগপ্নরে চলে গেলেন, ঝমক মহলের মালিক প্নরনো বাড়ি ভেঙে ফেলে নতুন হাউস বানালেন।

একদিন গ্নপী সায়েব আমার এখানে এসেছে, তার ডান হাতে রবারের দস্তানা, বাঁ হাতে একটা দেশলাইএর বাক্স। আমরা প্রশ্ন করল্নম, ব্যাপার কি? গ্নপী সায়েব জবাব দিল না, ফরাসের ওপর দ্নখানা খবরের কাগজ বিছিয়ে দেশলাইএর বাক্স খ্নলে তার ওপর ঢালল। ছোট ছোট জ্নঁই ফ্নলের কুঁড়ির মতন সাদা পদার্থ। গ্নপী বলল, ডেয়ো পিঁপড়ের ডিম, বারো টাকা ভরি, দ্ন আনা দিয়ে এক রতি কিনেছি, খ্নব পোষ্টাই। তারপর দস্তানা পরা ডান হাত পকেটে প্নরে আবার বের করল, কাঁকড়াবিছেতে হাত ছেয়ে গেছে। আমরা ত্রস্ত হয়ে তক্তপোশ থেকে নেমে গেল্নম। কাঁকড়াবিছের দল গ্নপীর হাত থেকে কাগজের ওপর পড়ল আর ট্নপ ট্নপ করে সমস্ত পিপড়ের ডিম খেয়ে ফেলল। তার পর গ্নপী সায়েব তার পোষা জানোয়ারদের আবার পকেটে প্নরল।

আমরা সবাই বলল্নম, তোমার এ কিরকম ভয়ংকর শখ? কোন্ দিন বিছের কামড়ে মারা যাবে দেখছি।

গ্নপী সায়েব বলল, আপনারা জানেন না, কাঁকড়াবিছে অতি উপকারী প্রাণী। বিছানায় ছারপোকা হয়েছে? কীটিংস পাউডারে কিছ্ন হচ্ছে না? (তখন ডিডিটি ইত্যাদি বেরোয় নি)। গ্নটি কতক কাঁকড়াবিছে ছেড়ে দিন। তিন-চার দিন অন্য ঘরে রাত্রিযাপন কর্নন, তার পর দেখবেন ছারপোকা নির্বংশ, আন্ডা বাচ্চা ধাড়ী সমস্ত সাবাড়। আলমারি কি দরজা-জানালা উই লেগেছে? ভাঁড়ার ঘরে পিপড়ে? তারও দাবাই কাঁকড়াবিছে।

জিতেন বোসের নাম শুনে থাকবেন। ভদ্রলোকের পুরনো বই সংগ্রহের বাতিক আছে। একদিন এখানে আড্ডা দিতে এসেছেন। কথায় কথায় বললেন, আর তো পারা যায় না, কলকাতার যত রিসার্চ স্কলার আর পি-এচ. ডি. আছেন সবাই আমার ওপর হামলা করছেন। কেবলই বলেন, এই বইটা দু দিনের জন্যে দাও, ও বইখানা সাত দিনের জন্যে দাও। বই দিলে কিন্তু ফেরত আসে না। ওমর খাইয়ামের স্বহস্তে লেখা একটি মহামূল্য পুঁথি আমার আছে। ডকটর সীতারাম নশকর সেই পুঁথিটি বাগাতে চান, একজন জর্মন প্রোফেসরকে দেখাবেন। নশকর মশাইকে হাঁকিয়ে দিতে পারি না, এককালে তাঁর কাছে পড়েছিলুম। তানানানা করে এতদিন কাটিয়েছি, কিন্তু আসছে রবিবার তিনি আবার আসবেন, কি ছুতো করব তাই ভাবছি।

দৈবক্রমে গুপী সায়েব উপস্থিত ছিল। সে বলল, আপনি ভাববেন না জিতেন-বাবু। আপনার প্রত্যেক আলমারিতে আমি পাঁচটি করে কাঁকড়াবিছে ছেড়ে দেব আর গুটিদশেক ডিম। কেউ বই চাইলে বলবেন, আলমারি বিছেয় ভরতি, বই নিতে পারেন অ্যাট ইওর রিস্ক।

জিতেনবাবু রাজী হলেন, গুপী সায়েব যথোচিত ব্যবস্থা করল। তার পর ডকটর নশকর এসে ওমর খাইয়াম চাইলেন। জিতেনবাবু বললেন, মহা মুশকিল সার, সব আলমারি বিছেয় ভরে গেছে। এই সেদিন আমার ভাগনেকে কামড়েছে, বেচারা হাসপাতালে আছে। আমার তো হাত দেবার সাহস নেই। আপনি যদি নিরাপদ মনে করেন তবে বইটা খুঁজে বের করে নিতে পারেন। ডকটর নশকর সন্দিগ্ধ মনে আলমারিতে উঁকি মেরে দেখলেন, কাঁকড়াবিছে সাঁড়ন খাড়া করে পাহারা দিচ্ছে। তিনি তখনই ওব্বাবা বলে প্রস্থান করলেন।

এইবার গুপী সায়েবের মহত্তম অবদানের কথা শুনুন। কিছুকাল তার দেখা পাই নি, হঠাৎ এক দিন সন্ধ্যাবেলা টেলিফোন বেজে উঠল। কে আপনি? উত্তর এল, আমি গুপী, আপনাদের গুপী সায়েব, মুচীপাড়া থানা থেকে বলছি। আমাকে গ্রেপতার করেছে, শিগ্‌গির আসুন, বেল দিতে হবে।

থানায় গিয়ে দেখলুম, একটা সরু কাঠের বেঞ্চে ব'সে গুপী সায়েব পা দোলাচ্ছে, দারোগা গুলজার হোসেন তাঁর চেয়ারে বসে কটমট করে তার দিকে চেয়ে আছেন। গুপীর পাশেই বেঞ্চে আর একটি লোক বসে আছে, রোগা, বেঁটে, অল্প দাড়ি আছে, পরনে ময়লা ইজার ফরসা জামা, মাথায় টুপি। লোকটি কাতর স্বরে মাঝে মাঝে 'বাপ রে বাপ' বলছে আর একটা গামলায় বরফ দেওয়া জলে হাত ডোবাচ্ছে। আশ্চর্য হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, ব্যাপার কি ইনস্পেকটার সাহেব?

গুলজার হোসেন বললেন, এই গোপী ঘোষ আপনার ফ্রেন্ড? অতি ভয়ানক লোক, এই বেচারা চোট্টু মিঞার জান লিয়েছেন।

ব্যাপার যা শুনলুম তা এই।—গুপী সায়েব বউবাজারে কি কিনতে গিয়েছিল। চোট্টু মিঞা পকেট মারবার জন্যে গুপীর পকেটে হাত পোরে, সঙ্গে সঙ্গে দুটো কাঁকড়াবিছে তাকে কামড়ে দেয়। যন্ত্রণায় চোট্টু অজ্ঞান হয়ে পড়ে, তখন দুজন পাহারাওয়ালা তাকে আর গুপী সাহেবকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে।

আমি নিবেদন করলুম, চোট্টু মিঞা পকেট মারবার চেষ্টা করেছিল, তাকে আপনারা অবশ্যই প্রসিকিউট করবেন। কিন্তু গুপী সায়েবের কসুর কি? ওঁকে তো আট-কাতে পারেন না।

দারোগা সায়েব গর্জন করে বললেন, আমাকে আইন শিখলাবেন না মশয়। এই গোপী একজন খুনী, ডেঞ্জার টু দ পবলিক। গরিব বেচারা চোট্টু মিঞা একটু আধটু প্যাকিট মারে, কিন্তু তার জন্যে আমরা আছি, সোরাবার্দি সাহেব আছেন, লাট সাহেব ভি আছেন। চোট্টুর জান নেবার কোনও ইখতিয়ার আপনার এই ফ্রেন্ডের নেই।

আমার কথায় কোনও ফল হল না। এক শ টাকার বেল দিয়ে গুপীকে খালাস করে নিয়ে এলুম। পাঁচ দিন পরে ব্যাংকশল স্ট্রীটের কোর্টে মকদ্দমা উঠল, শুধু গুপীর কেস। পকেটমার চোট্টুর বিচার পরে হবে, সে তখনও হাসপাতালে।

সরকারী উকিল বললেন, ইওর অনার, এই আসামী গোপী ঘোষকে কড়া সাজা দেওয়া দরকার। পিকপকেটকে বাধা দেবার অধিকার সকলেরই আছে, কিন্তু তাকে খুন বা নিমখুন করা মারাত্মক অপরাধ। হুজুর সেই বহুকালের পুরনো কেস ক্রাউন ভার্সস ভিখন পাসীর নজিরটি দেখুন। ভিখন পাসী তাড়ি তৈরি করত, তালগাছে ঝোলানো তার ভাঁড় থেকে রোজই তাড়ি চুরি যেত। চোরকে জব্দ করার মতলবে ভিখন ধুতরো ফলের রস ভাঁড়ের মধ্যে রাখল। পরদিন একটা তাড়িচোর মারা পড়ল, আর একটা কোনও গতিকে বেঁচে গেল। হাকিম রায় দিলেন, চোরের বিরুদ্ধে এমন মারাত্মক উপায় অবলম্বন করা গুরুতর অপরাধ। ভিখন পাসীর এক বছর জেল আর পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হয়েছিল।

গুপী সায়েবের উকিল বললেন, ইওর অনার, আমার মক্কেলের কেস একেবারে আলাদা। কোনও লোককে জব্দ করবার মতলব বা ম্যালিস প্রিপেন্স এঁর ছিল না, পিকপকেটদের প্রতিও ইনি শত্রুভাবাপন্ন নন। ইনি শখ করে কাঁকড়াবিছে পোষেন, তাদের ট্রেনিং দেন, আদর করেন, ভালবাসেন, তাই সঙ্গে সঙ্গে রাখেন। কি করে ইনি জানবেন যে পুওর ফেলো চোট্টুর মতিচ্ছন্ন হবে? ইনি তার অনিষ্টচেষ্টা করেন নি, এঁর পালিত অবোধ প্রাণীরাই আত্মরক্ষার জন্যে চোট্টুকে কামড়ে দিয়েছিল। চোট্টু মিঞার প্রতি আমার ক্লায়েন্টের খুব সিমপাথি আছে, কিন্তু এঁর দায়িত্ব কিছুই নেই।

হাকিম ব্রজবিহারী অধিকারী ভুক্তভোগী লোক, বার-দুই তাঁরও পকেট মারা গিয়েছিল। হাসি চেপে বললেন, পকেটে কাঁকড়াবিছে নিয়ে বাজারে যাওয়া অন্যায় কাজ। আসামী অপরাধী। ওঁকে সতর্ক করে দিচ্ছি, আর যেন এমন না করেন। আচ্ছা গোপীবাবু, আপনি যেতে পারেন।

গুপী সায়েব নমস্কার করে করজোড়ে বলল, হুজুর, একটা কোশ্চেন করতে পারি কি?

হাকিম বললেন, কি কোশ্চেন?

—আজ্ঞে, পঞ্জাবির পকেটে কাঁকড়াবিছে রাখা আমার ভুল হয়েছিল। কিন্তু যদি কোট পরি, তার পকেটের ওপর যদি বোতাম দেওয়া ফ্ল্যাপ্প থাকে, আর তার গায়ে যদি একটি নোটিস সেঁটে দিই—প্যাকিট মে বিচ্ছু হৈ, হাথ ঘুসানা খতরনাক হৈ—তা হলে কি বেআইনী হবে?

হাকিম ব্রজবিহারী অধিকারী একটু চিন্তা করে বললেন, না, তা হলে বেআইনী হবে না। কিন্তু মাইন্ড ইউ, আমি হাকিম হিসেবে মত প্রকাশ করছি না, একজন সাধারণ লোক হিসেবেই বলছি।

গুপী সায়েব খালাস হল, তার কিছু আক্কেলও হল। কিন্তু ব্যবসাবুদ্ধি তার

কিছুমাত্র ছিল না। আমি বললুম, তোমার শ্বশুরবাড়ি কেষ্টনগরে না? কালই সেখানে যাও, হাজার খানিক মাটির কাঁকড়াবিছে অর্ডার দিয়ে এস, দাড়ার নীচে যেন ফাউন্টেন পেনের মতন ক্লিপ থাকে। বিজ্ঞাপন দেওয়া চলবে না, আমরা পাঁচজন মুখে মুখেই জিনিসটি চালু করে দেব। গুপী সায়েব হাজারটা নকল বিছে আনাল, বিশ দিনের মধ্যেই বিক্রি হয়ে গেল। খুব ডিমান্ড, আরও আনাতে হল। চোট্টু মিঞার দুর্ভোগের খবর পিকপকেট সমাজে রটে গিয়েছিল, পথচারী ভদ্রলোকদের পকেট থেকে দুটি দাড়া উঁকি মারছে দেখে তারা আতঙ্কে কাঁপতে লাগল, তাদের পেশা একদম বন্ধ হয়ে গেল। তার পর ক্রমশ জানাজানি হল যে আসল বিচ্ছু নয়, মাটির তৈরী। পকেটমারদের ভয় ভেঙে গেল, তারা আবার ব্যবসা শুরু করল।

ইতিহাস শুনে নয়নচাঁদ বললেন, হুঁ, দিব্যি আষাঢ়ে গল্প বানিয়েছ। এখন কাজের কথা বল। হৃদয় দাস মোটর কিনছে ভাল কথা। আমার ছেলেকে বিলেত পাঠাতে রাজী আছে তো?

বিষণ্ণ মুখে আমি বললুম, আজ্ঞে না। মোটর কিনছেন নিজের জন্যে। নাত-জামাইকে বিলেত পাঠাতে পারবেন না।

বটে! আমার ছেলেকে জলের দরে পেতে চান?

—আজ্ঞে না, অন্য জায়গায় নাতনীর সম্বন্ধ স্থির করেছেন। কি জানেন পাইন মশাই, আপনি ধনী মানী লোক, কাজেই অনেকের চোখ টাটায়। হিংসুটে লোকে ছেলের নামে ভাংচি দিয়েছে।

—কি বলেছে?

—বলেছে, ষাঁড়ের গোবর।

১৮৮১ শক (১৯৫৯)

গুলবুলিস্তান

(আরব্য উপন্যাসের উপসংহার)

সম্প্রতি আরব্য উপন্যাসের একটি প্রাচীন পুঁথি উজবেকীস্তানে পাওয়া গেছে। তাতে যে আখ্যান আছে তা প্রচলিত গ্রন্থেরই অনুরূপ, কেবল শেষ অংশ একেবারে অন্যরকম। বিচক্ষণ পণ্ডিতরা বলেন, এই নবাবিষ্কৃত পুঁথির কাহিনীই অধিকতর প্রামাণিক ও বিশ্বাসযোগ্য, নীতিসংগতও বটে। আপনাদের কৌতূহলনিবৃত্তির জন্যে সেই উজবেকী উপসংহার বিবৃত করছি। কিন্তু তা পড়বার আগে প্রচলিত আখ্যানের আরম্ভ আর শেষ অংশ জানা দরকার। যদি ভুলে গিয়ে থাকেন তাই সংক্ষেপে মনে করিয়ে দিচ্ছি।

শাহরিয়ার ছিলেন পারস্য দেশের বাদশাহ, আর তাঁর ছোট ভাই শাহজমান তাতার দেশের শাহ। দৈবযোগে তাঁরা প্রায় একই সময়ে আবিষ্কার করলেন, তাঁদের বেগমরা মায় সখী আর বাঁদীর দল সকলেই ভ্রষ্টা। তখন দুই ভাই নিজ নিজ অন্তঃপুরের সমস্ত রমণীর মুণ্ডচ্ছেদ করলেন এবং সংসারে বীতরাগ হয়ে একসঙ্গে পর্যটনে নির্গত হলেন।

স্ত্রীচরিত্রের আর একটি নিদর্শন তাঁরা পথে যেতে যেতেই পেলেন। এক ভীষণ দৈত্য তার সুন্দরী প্রণয়িনীকে সিন্দুকে পুরে সাতটা তালা লাগিয়ে মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াত। মাঝে মাঝে সে সুন্দরীকে হাওয়া খাওয়াবার জন্যে সিন্দুক থেকে বার করত এবং তার কোলে মাথা রেখে ঘুমুত। সেই অবসরে সুন্দরী নব নব প্রেমিক সংগ্রহ করত। দুই ভ্রাতাও তার প্রেম থেকে নিষ্কৃতি পান নি।

শাহরিয়ার তাঁর কনিষ্ঠকে বললেন, ভাই, এই ভীষণ দৈত্য তার প্রণয়িনীকে সিন্দুকে বন্ধ করে সাতটা তালা লাগিয়েও তাকে আটকাতে পারে নি, আমরা তো কোন ছার। বিবাগী দরবেশ হয়ে লাভ নেই, আমরা আবার বিবাহ করব। কিন্তু স্ত্রীজাতিকে আর বিশ্বাস নেই, এক রাত্রি যাপনের পরেই পত্নীর মুণ্ডচ্ছেদ করে পরদিন আবার একটা বিবাহ করব, তা হলে অসতী-সংসর্গের ভয় থাকবে না। দুই ভ্রাতা একমত হয়ে নিজ নিজ রাজ্যে ফিরে গেলেন এবং প্রাত্যহিক বিবাহ আর নিশান্তে মুণ্ডচ্ছেদের ব্যবস্থা করে অনাবিল দাম্পত্য সুখ উপভোগ করতে লাগলেন।

শাহরিয়ারের উজিরের দুই কন্যা, শহরজাদী ও দিনারজাদী। শহরজাদীর সনির্বন্ধ অনুরোধে উজির তাঁকে বাদশাহের হস্তে সমর্পণ করলেন। রাত্রিকালে শহরজাদী স্বামীকে জানালেন, ভগিনীর জন্যে তাঁর মন কেমন করছে। দিনারজাদীকে তখনই রাজপ্রাসাদে আনা হল। শাহরিয়ার আর শহরজাদীর শয়নগৃহেই দিনারজাদী রাত্রিযাপন করলেন। শেষ রাত্রে তিনি বললেন, দিদি, আর তো দেখা হবে না, বাদশাহ যদি অনুমতি দেন তো একটা গল্প বল।

শাহরিয়ার বললেন, বেশ তো, সকাল না হওয়া পর্যন্ত গল্প বলতে পার।

শহরজাদীর গল্প শুনে বাদশাহ মুগ্ধ হলেন, কিন্তু গল্প শেষ হল না। বাদশাহ বললেন, আচ্ছা, কাল রাত্রিতে বাকীটা শুনব, একদিনের জন্য তোমার মুণ্ডচ্ছেদ মুলতুবী থাকুক। পরের রাত্রিতে শহরজাদী গল্প শেষ করলেন এবং আর একটি

আরম্ভ করলেন। তারও শেষ অংশ শোনবার জন্যে বাদশাহের কৌতূহল হল, সুতরাং শহরজাদীর জীবনের মেয়াদ আর একদিন বেড়ে গেল। এইভাবে শহরজাদী এক হাজার একরাত্রি যাবৎ গল্প চালালেন এবং বেঁচেও রইলেন। পরিশেষে শাহরিয়ার খুশী হয়ে বললেন, শহরজাদী, তোমাকে কতল করব না, তুমি আমার মহিষী হয়েই বেঁচে থাক। তোমার ভগিনী দিনারজাদীর সঙ্গে আমার ভাই শাহজমানের বিবাহ দেব। অতঃপর শহরজাদীর সঙ্গে শাহরিয়ার এবং দিনারজাদীর সঙ্গে শাহজমান পরম সুখে নিজ নিজ রাজ্যে কালযাপন করতে লাগলেন।

এখন আরব্যরজনীর উজবেকী উপসংহার শুনুন।

হাজার-এক রাত্রি শেষ হলে শাহরিয়ার প্রসন্নমনে বললেন, শহরজাদী, তুমি যেসব অত্যাশ্চর্য গল্প বলেছ তা শুনে আমি অতিশয় তুষ্ট হয়েছি। তোমাকে মরতে হবে না।

শহরজাদী যথোচিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন।

দিনারজাদী বললেন, জাহাঁপনা, এতদিন আপনি শুধু দিদির গল্পই শুনলেন, পুরস্কার স্বরূপ জীবনদানও করলেন। কিন্তু আমার কথা তো কিছুই শুনলেন না।

শাহরিয়ার বললেন, তুমিও গল্প জান নাকি? বেশ, শোনাও তোমার গল্প।

দিনারজাদী বললেন, আমি যা বলছি তা গল্প নয়, একেবারে খাঁটি সত্য। জাহাঁপনা, আপনি তো বিস্তর স্ত্রীর সংসর্গে এসেছেন, এমন কাকেও জানেন কি যার তুলনা জগতে নেই?

—কেন, তোমার এই দিদি আর তুমি।

—আমাদের চাইতে শতগুণ শ্রেষ্ঠ নারী আছে, তার বৃত্তান্ত আমার প্রিয়সখী গুলবদনের কাছে শুনেছি। তার দেশ বহু দূরে। ছ মাস আগে একদল হূন দস্যু তাকে হরণ করে ইস্পাহানের হাটে নিয়ে এসেছিল, তখন আমার বাবা একশ দিনার দাম দিয়ে তাকে কেনেন। গুলবদনের সঙ্গে একটু আলাপ করেই আমি বুঝলাম, সে সামান্য ক্রীতদাসী নয়, উচ্চ বংশের মেয়ে, গুলবুলিস্তানের শাহজাদীদের আত্মীয়া।

—গুলবুলিস্তান কোন্ মুলুক? তার নাম তো শুনি নি।

—যে দেশে প্রচুর গোলাপ তার নাম গুলিস্তান। আর যে দেশে যত গোলাপ তত বুলবুল, তার নাম গুলবুলিস্তান। এই দেশ হচ্ছে হিন্দুকুশ পর্বতের দক্ষিণে বল্‌খ উপত্যকায়। জানেন বোধ হয়, অনেক কাল আগে মহাবীর সেকেন্দর শাহ এই পারস্য সাম্রাজ্য আর পূর্বদিকের অনেক দেশ জয় করেছিলেন। দিনকতক তিনি সসৈন্যে গুলবুলিস্তানে বিশ্রাম করেছিলেন, সেই সময়ে তিনি নিজে আর তাঁর দশ সেনাপতি ওখানকার অনেক মেয়েকে বিবাহ করেন। বর্তমান গুলবুলিস্তানীরা তাঁদেরই বংশধর। ওদেশের পুরুষরা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, আর মেয়েরা অত্যন্ত রূপবতী। তাদের গায়ের রঙ গোলাপী, গাল যেন পাকা আপেল, চোখের তারা নীল, চিবুকের গড়ন গ্রীক দেবীমূর্তির মতন সুগোল। স্বয়ং সেকেন্দর শাহ ওদেশের রাজার পূর্বপুরুষ। এখন রাজা জীবিত নেই, দুই শাহজাদী রাজ্য চালাচ্ছেন, উৎফুল্লন্নেসা আর লুৎফুল্লন্নেসা।

—ও আবার কিরকম নাম!

—আজ্ঞে, গ্রীক ভাষার প্রভাবে অমন হয়েছে। নিকটেই হিন্দ্ মুলুক, তার জন্যেও কিছু বিগড়েছে। গুলবুলিস্তান অতি দুর্গম স্থান, অনেক পর্বত নদী মরুভূমি পার হয়ে যেতে হয়। পথে একটি গিরিসংকট আছে, বাব-এল-মৈমুন, অর্থাৎ বানর-তোরণ। দুই খাড়া পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে অতি সরু পথ, এক লক্ষ সুশিক্ষিত বানর সেখানে পাহারা দেয়, কেউ এলে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলে। শোনা যায় বহুকাল আগে ওদেশের এক রাজা বংগাল মুলুক থেকে এই সব বানর আমদানি করেছিলেন। জাহাঁপনা, আমি বলি কি, আপনি আর আপনার ভাই শাহজমান সেই গুলবুলিস্তান রাজ্যে অভিযান করুন, শাহজাদী উৎফুল আর লুৎফুলকে বিবাহ করুন। আমার সখী গুলবদন পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, আপনাদের সঙ্গে গেলে সেও নিরাপদে নিজের দেশে ফিরতে পারবে।

শাহরিয়ার বললেন, আমরা যাকে-তাকে বিবাহ করতে পারি না। সেই দুই শাহজাদী দেখতে কেমন? তাদের চরিত্র কেমন?

—জাহাঁপনা, তাঁদের মতন রূপবতী দুনিয়ায় নেই, তেমন ভীষণ সতীও পাবেন না। তাঁদের যেমন রূপ তেমনি ঐশ্বর্য। আপনারা দুই ভাই যদি সেই দুই শাহজাদীকে বিবাহ করেন তবে স্বর্গের হুরীর মতন স্ত্রীর সঙ্গে প্রচুর ধনরত্নও পাবেন।

—তোমার দিদি কি বলেন?

শহরজাদী বললেন, জাহাঁপনা, আমার জন্যে ভাববেন না, আপনাকে সুখী করবার জন্যে আমি জীবন দিতে পারি।

একটু চিন্তা করে শাহরিয়ার বললেন, বেশ আমি আর শাহজমান শীঘ্রই গুলবুলিস্তান যাত্রা করব। সঙ্গে দশ হাজার তীরন্দাজ, দশ হাজার বর্শাধারী ঘোড়সওয়ার আর ত্রিশ হাজার টাঙ্গিধারী পাইক সৈন্য নেব।

দিনারজাদী বললেন, অমন কাজ করবেন না জাহাঁপনা, তা হলে গুলবুলিস্তান পৌঁছুবার আগেই সসৈন্যে মারা যাবেন। বাব-এল-মৈমুন গিরিসংকটে যে একলক্ষ বানর আছে তারা পাথর ছুড়ে সবাইকে সাবাড় করবে। তা ছাড়া শাহজাদীদের পাঁচ হাজার হাতি আছে, আপনার সৈন্যদের তারা ছত্রভঙ্গ করে দেবে। আমি যা বলি শুনুন। সঙ্গে শুধু পঞ্চাশজন দেহরক্ষী নেবেন, আপনার পঁচিশ আর ছোট জাহাঁপনার পঁচিশ। আপনার যে দুজন জোয়ান সেনাপতি আছেন, শমশের জঙ্গ্ আর নওশের জঙ্গ্, তাদেরও নেবেন।

—কিন্তু সেই বাঁদরদের ঠেকাব কি করে?

—শুনুন। এখন রমজান চলছে, কিছুদিন পরেই ঈদ-অল-ফিত্র। এই সময় দেশের আমির ফকির সকলেই জালা জালা শরবত খায়, তার জন্যে হিন্দুস্তান থেকে রাশি রাশি তখ্ত-ই-খণ্ডেসরি অর্থাৎ খাঁড় গুড়ের পাটালি বসরা বন্দরে আমদানি হয়। আপনি সেই পাটালি হাজার বস্তা বাজেয়াপ্ত করুন, সঙ্গে নিয়ে যাবেন। বাব-এল-মৈমুনের কাছে এসে পথের দুই ধারে সেই পাটালি ছড়িয়ে দেবেন। বাঁদরের দল হুমড়ি খেয়ে পড়বে আর কাড়াকাড়ি করবে, তখন আপনারা অনায়াসে পার হয়ে যাবেন।

শাহরিয়ার বললেন, বাঃ, তোমার খুব বুদ্ধি, যদি পুরুষ হতে তো উজির করে দিতাম। যেমন বললে সেই রকমই ব্যবস্থা করব। শাহজমানের কাছে আজই দূত পাঠাচ্ছি। তোমরা দুই বোন আর তোমাদের সখী গুলবদন যাবার জন্য তৈরী হও।

দিনারজাদীর পরামর্শ অনুসারে যাত্রার আয়োজন করা হল। কিছুদিন পরে শাহরিয়ার শাহজমান শহরজাদী দিনারজাদী, দুই সেনাপতি আর পঞ্চাশ জন অনুচর গুলবদনের প্রদর্শিত পথে নিরাপদে গুলবুলিস্তানে পৌঁছুলেন।

চার জন রক্ষীর সঙ্গে গুলবদন এগিয়ে গিয়ে শাহরিয়ার ইত্যাদির আগমন-সংবাদ দুই শাহজাদীকে জানালেন। তাঁরা মহা সমাদরে অতিথিদের সংবর্ধনা করলেন। বিশ্রাম ও আহারাদির পর বড় শাহজাদী উৎফুল্লন্নেসা বললেন, মহামহিম পারস্যরাজ ও তাতাররাজ, কি উদ্দেশ্যে আপনার এখানে এসেছেন তা প্রকাশ করে আমাদের কৃতার্থ করুন।

শাহরিয়ার উত্তর দিলেন, হে গুলবুলিস্তানের শ্রেষ্ঠ গোলাপী বুলবুল দুই শাহজাদী, যা শুনেছিলাম তার চাইতে তোমরা ঢের বেশী সুন্দরী। আমরা একেবারে বিমোহিত হয়ে গেছি, তোমরা দুই ভগিনী আমাদের দুজনের বেগম হও।

শাহজাদী উৎফুল্ল বললেন, তা বেশ তো, আমাদের আপত্তি নেই, বিবাহে আমরা সর্বদা প্রস্তুত। আপনাদের দলে এই যে দুজন সুন্দরী দেখছি এঁরা কে?

শাহরিয়ার বললেন, ইনি হচ্ছেন আমার এখনকার বেগম শহরজাদী, আর উনি আমার শালী দিনারজাদী, আমার ভাইএর বাগ্‌দত্তা। সপত্নীর সঙ্গে থাকতে এঁদের কোনও আপত্তি নেই।

মাথা নেড়ে উৎফুল্ল বললেন, তবে তো আমাদের সঙ্গে বিবাহ হতে পারে না। আমাদের নীতিশাস্ত্র কলীলা-ওঅ-দিম্‌না অনুসারে পুরুষের এককালে একাধিক স্ত্রী আর স্ত্রীর একাধিক স্বামী নিষিদ্ধ।

—তুমি যে ধর্মবিরুদ্ধ খ্রীষ্টানী কথা বলছ শাহজাদী। স্ত্রীর পক্ষেই একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ, পুরুষের পক্ষে নয়।

—আপনাদের রীতি এখানে চলবে না। আমাদের শরিয়ত অন্য রকম, তা যদি না মানেন তবে আপনাদের সঙ্গে আমাদের বিবাহ হবে না।

শাহরিয়ার তাঁর ভাই শাহজমানের সঙ্গে কিছুক্ষণ চুপি চুপি পরামর্শ করলেন। তার পর বললেন, বেশ, তোমাদের রীতিই মেনে নিচ্ছি। শহরজাদী, তোমাকে তালাক দিলাম, তুমি আর আমার বেগম নও। তোমার জন্যে সত্যই আমি দুঃখিত। কি করা যায় বল, সবই আল্লার মর্জি। তোমার জন্যে আমি অন্য একটি ভাল স্বামী যোগাড় করে দেব।

শাহজমান বললেন, দিনারজাদী, আমিও তোমাকে চাই না। তুমি অন্য কাকেও বিবাহ ক'রো।

অনন্তর সানাই ভেঁপু, কাড়া-নাকাড়া আর দামামা বেজে উঠল, সখীর দল নাচতে লাগল, গুলবুলিস্তানের মোল্লারা শাহরিয়ারের সঙ্গে উৎফুল্লের আর শাহজমানের সঙ্গে লুৎফুল্লের বিবাহ যথারীতি সম্পাদন করলেন।

বিকাল বেলা প্রাসাদ-সংলগ্ন মনোরম উদ্যানে ফোয়ারার কাছে বসে শাহরিয়ার বললেন, প্রেয়সী উৎফুল্ল, তোমাদের সখীরা অতি খাসা, অনেকে তোমাদের দুই বোনের চাইতেও খুবসুরত। আমরা দুই ভাই ওদের ভাগাভাগি করে আমাদের হারেমে রাখব।

উৎফুল্ল বললেন, খবরদার প্রাণনাথ, আমাদের সখী বাঁদী ঝাড়ুদারনী বা অন্য কোনও স্ত্রীলোকের দিকে যদি কুদৃষ্টি দাও তো তোমার গরদান যাবে।

অত্যন্ত রেগে গিয়ে শাহরিয়ার বললেন, ইন্‌শাল্লাহ্‌! মুখ সামলে কথা বল প্রিয়ে, গরদান নেওয়া আমারও ভাল রকম অভ্যাস আছে।

উৎফুল বললেন, এস আমার সঙ্গে, বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই বাঁদী, এখনই চার-জন মশালচী আর দশজন রক্ষীকে গরদানি মহলে যেতে বল।

দুই শাহজাদী স্বামীদের নিয়ে সুবিশাল গরদানি মহলে প্রবেশ করলেন। মশালের আলোকে দুই ভ্রাতা সন্ত্রস্ত হয়ে দেখলেন, দেওয়ালের গায়ে বিস্তর গোঁজ পোঁতা আছে, তা থেকে সারি সারি নরমুণ্ড ঝুলছে। তাদের দাড়ি হরেক রকম, কাঁচা, কাঁচা-পাকা, গালপাট্টা, ছাগল দাড়ি, লম্বা দাড়ি, গোঁফহীন দাড়ি ইত্যাদি।

উৎফুল্লুন্নেসা বললেন, শোন বড় জাহাঁপনা আর ছোট জাহাঁপনা, এইসব মুণ্ড হচ্ছে আমাদের ভূতপূর্ব স্বামীদের। উত্তরদিকের দেওয়ালে আমার স্বামীদের, আর দক্ষিণের দেওয়ালে লুৎফুলের। বিবাহের পর এরা প্রত্যেকেই আমাদের সখীদের প্রতি লোলুপ নয়নে চেয়েছিল, সেজন্যে আমাদের নিয়ম অনুসারে এদের কতল করা হয়েছে। তোমরা যেমন কুলটা স্ত্রীকে দণ্ড দাও, আমরা তেমনি লম্পট স্বামীকে দিই। ওহে শাহরিয়ার আর শাহজমান, যদি হুঁশিয়ার না হও তবে তোমাদেরও এই দশা হবে। খবরদার, তলোয়ারে হাত দিও না, তা হলে আমাদের এই রক্ষীরা এখনই তোমাদের গরদান নেবে।

শাহরিয়ার বললেন, পিশাচী রাক্ষসী ঘুলী ইবলিস-নন্দিনী, তোমাদের মনে কি দয়া মায়া নেই?

—তোমাদের চাইতে ঢের বেশী আছে। তোমরা প্রতিদিন নব নব বধূ ঘরে এনেছ, এক রাত্রির পরেই প্রত্যেককে হত্যা করেছ। তাদের চরিত্র ভাল কি মন্দ তা না জেনেই মেরে ফেলেছ। আমরা অত নির্দয় নই, বিনা দোষে পতিহত্যা করি না। যদি দেখি লোকটা অন্য নারীর ওপর নজর দিচ্ছে তবেই তার গরদান নিই।

শাহজমান চুপি চুপি বললেন, দাদা, মুণ্ডুগুলো মাটির কি প্লাস্টিকের তৈরী নয় তো?

শাহরিয়ার বললেন, না, তা হলে মাছি বসত না। অবশ্য একটু গুড় লাগালেও মাছি বসে। যাই হক, এই শয়তানীদের কবল থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। আমাদের সঙ্গে যদি প্রচুর সৈন্য থাকত তবে সখীর দল সমেত এদের গ্রেপতার করে নিয়ে যেতাম।

তার পর শাহরিয়ার গুরুগম্ভীর স্বরে বললেন, শাহজাদী, তোমাদের আমরা তালাক দিলাম, এখনই দেশে ফিরে যাব।

উৎফুল বললেন, তোমাদের তালাক-বাক্য গ্রাহ্য নয়, এখানকার আইন আলাদা। আমরা ছেড়ে না দিলে তোমাদের এখান থেকে মুক্তি নেই।

—তবে এই সখীদের সরিয়ে দাও, ওরা চোখের সামনে থাকলে আমাদের লোভ হবে।

—ওরা এখানেই থাকবে, নইলে তোমাদের চরিত্রের পরীক্ষা হবে কি করে।

মাথা চাপড়ে শাহরিয়ার বললেন, হা, আমাদের পারস্য আর তাতার রাজ্যের কি হবে?

উৎফুল বললেন, তার জন্যে ভেবো না। তোমার সেনাপতি শমশের জঙ্গ্‌ শহর-জাদীকে বেগম করে পারস্যের সিংহাসনে বসবে আর নওশের জঙ্গ্‌ দিনারজাদীকে

বেগম করে তাতার রাজ্যের মালিক হবে। তুমি আর শাহজমান এখনই ফরমান আর রাজীনামায় পাঞ্জার ছাপ লাগাও। দেরি ক'রো না, তা হলে বিপদে পড়বে।

নিরুপায় হয়ে শাহরিয়ার আর শাহজমান দলিলে পাঞ্জার ছাপ দিলেন। তার পর শাহরিয়ার করজোড়ে বললেন, শাহজাদী, দয়া কর। এখানে তোমাদের সখীদের দেখলে আমরা প্রলোভনে পড়ব, প্রাণ হারাব। আমাদের অন্য কোথাও থাকতে দাও।

—তা থাকতে পার। এই গুলবুলিস্তানের উত্তরে পাহাড়ের গায়ে অনেক গুহা আছে, সেখানে তোমরা সুখে থাকতে পারবে। সাত দিন অন্তর এখান থেকে রসদ পাবে। দুজন মোল্লাও মাঝে মাঝে গিয়ে ধর্মোপদেশ দেবেন। ওখানে তোমরা পাপ-মোচনের জন্যে নিরন্তর তসবি জপ করবে এবং হরদম আল্লার নাম নেবে।

পাঁচ বৎসর পরে মোল্লারা জানালেন যে আল্লার কৃপায় দুই ভ্রাতার চরিত্র কিঞ্চিত দুরস্ত হয়েছে। তখন দুই শাহজাদী নিজ নিজ স্বামীকে মুক্তি দিলেন, তালাকও দিলেন।

শাহরিয়ার ও শাহজমান দেশে ফিরে গিয়ে দেখলেন, প্রজা সৈন্য আর রাজ-কোষ সব বেহাত হয়ে গেছে, শমশের আর নওশের সিংহাসনে জেঁকে বসেছেন, রাজ্য ফিরে পাবার কোনও আশা নেই। অগত্যা তাঁরা বাগদাদে গেলেন এবং কাফি-খানার জনতাকে আরব্য রজনীর বিচিত্র কাহিনী শুনিয়ে কোনও রকমে জীবিকা নির্বাহ করতে লাগলেন।

১৮৮১ শক (১৯৫৯)

জামাইষষ্ঠী

অসমাপ্ত

গল্পটির পেনসিলে লেখা খসড়া পাণ্ডুলিপি

রাজশেখরের মৃত্যুর পরে পাওয়া যায়।

লেখা অনেক আগের। শেষ করেন নি।

মহাবীর প্রসাদ চৌধুরী—নাম অবাঙালী হলেও লোকটি বাঙালী। তার ঊর্ধ্বতন তিন পুরুষ গোরক্ষপুরে বাস করতেন তাই ভাষায় আর আচার ব্যবহারে কিছু হিন্দী প্রভাব এসেছে। মহাবীর কলকাতায় এম. এ. ফিফ্‌থ ইয়ার পর্যন্ত পড়েছিল, সেই সময় থার্ড ইয়ারের ফুল্লরার সঙ্গে তার পরিচয় হয়। বাপের মৃত্যুর পর থেকে মহাবীর পড়া ছেড়ে দিয়ে হ্যারিসন রোডের পৈতৃক কাপড়ের দোকানটি চালাচ্ছে। সম্প্রতি ফুল্লরার সঙ্গে তার প্রেমোত্তর বিবাহ হয়েছে।

ফুল্লরার বাবা যদুগোপাল চন্দননগরে থাকেন, তিনি বনেদী বংশের সন্তান, কিন্তু এখন অবস্থা মন্দ হয়েছে। অনেক খরচ করে পাঁচ মেয়ের বিবাহ ভাল ঘরেই দিয়েছেন, দুজন সরকারী কর্মচারী, একজন অ্যাটর্নি, একজন প্রফেসর। শুধু ছোট জামাই মহাবীর দোকান-দার। যদুগোপাল আগেকার চাল বদলাতে পারেন নি, তার ফলে তাঁর দেনা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। তিনি আশা করেন তাঁর দুই ছেলের ওকালতি আর ডাক্তারিতে ভাল পসার হবে এবং তারাই সব দেনা শোধ করবে।

একগুঁয়ে বলে মহাবীরের বদনাম আছে। শ্বশুরবাড়ির লোকেদের কাছে তাকে কিছু উপহাস আর গঞ্জনা সইতে হয়েছে। সে অনেক উপাধি পেয়েছে—খোট্টা, মেড়ো, ছাতুখোর, কাপড়াবালা, রামভকত, হনুমানজী ইত্যাদি। শালীরা বলেছে, তোমার দোকান তুলে দাও, একটা চাকরি যোগাড় করে নাও। ভগিনীপতি কাপড় বিক্রী করে—এই পরিচয় দেওয়া যায় নাকি? স্ত্রী ফুল্লরার শাসনে তার কথাবার্তা অনেকটা দুরস্ত হয়েছে, এখন সে ঘৈলা লোটা গিলাস কটোরা না বলে কলসী ঘটি গেলাস বাটি বলে।

যদুগোপালবাবুর বাড়িতে খুব আড়ম্বর করে জামাইষষ্ঠী হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝা-মাঝি ফুল্লরা মহাবীরকে বলল, জামাইষষ্ঠী এসে পড়ল, আমি ছোড়দার সংগে পরশু চন্দন-নগর যাচ্ছি। দিদিরা ত আগেই পেঁছে গেছে। এবারকার ভোজে একটু বেশী ঘটা হবে এখান থেকে দুজন বাবুর্চি যাবে, একগাড়ি আইসক্রীমও যাবে।

মহাবীর বলল, ঘটা করার কি দরকার। আমরা পাঁচটি জামাই কি পাঁচটি রাক্ষস যে ভুরিভোজন না করলে চলবে না? শ্বশুর মশায়ের তো শুনেছি মোটারকম দেনা আছে, এখন অনর্থক খরচ করাই অন্যায়। তুমি আর তোমার দিদিরা বারণ কর না কেন?

ফুল্লরা বলল, বছরের মধ্যে একটি দিন পাঁচ জামাই আর পাঁচ মেয়ে একত্র হবে, একটু ভাল খাওয়া দাওয়া করবে, জামাইকে তত্ত্ব পাঠানো হবে—এতে অন্যায়টা কি? তোমার দোকানদারি বুদ্ধি, কেবল মুনাফাই বোঝ। বংশের যা দস্তুর আছে তা কি ছাড়া যায়? দেনা তো সব বনেদী বংশেরই থাকে, তার জন্যে ভাববার কিছু নেই, আমার ভাইরা শোধ করবে।

মহাবীর বলল, আমার কিন্তু ঘোর আপত্তি আছে।

—খরচ করবেন আমার বাবা, তোমার মাথাব্যথা কেন? যেরকম একগুঁয়ে তুমি, জামাইষষ্ঠী বয়কট করবে না তো?

—নিমন্ত্রণ পেলে অবশ্যই রক্ষা করব, কিন্তু পোলাও কালিয়া চপ কাটলেট সন্দেশ রাবড়ি চর্ব্য-চুষ্য রাজভোগ খাব না।

—তবে খাবে কি, কচু না ছাতু?

—ছাতুই খাব।

—তোমার যেরকম বেয়াড়া গোঁ, ওখানে না যাওয়াই তোমার পক্ষে ভাল, একটা কেলেঙ্কারি করে বসবে। নিমন্ত্রণের চিঠি এলে একটা ছুতো ক'রো, দোকানে কাজের চাপ, তাই যেতে পারব না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মহাবীর বলল, নিমন্ত্রণ এলে নিশ্চয়ই যাব, না এলেও যাব।

—দক্ষযজ্ঞ পন্ড করবে নাকি?

—দক্ষযজ্ঞে শিব নিজে যান নি, অনুচর বীরভদ্রকে পাঠিয়েছিলেন। সেরকম অনুচর আমার নেই, তাই নিজেই যাব। আমি কোনও উপদ্রব করব না, নিঃশব্দে অসহযোগ জানাবো।

[অসমাপ্ত]

কবিতা

কবিতা

'বাল্যের কবিতা বাদ দিলে চাকরির সময়ে বিজ্ঞাপন লেখাই আমার সাহিত্যের হাতেখড়ি।' এটা রাজশেখর বসুর বহুবার বলা উক্তি। সেই 'বাল্যের কবিতা'ও যে একদিন খুঁজে পাব তা কল্পনাতীত। প্রায় ৯০।৯৫ বছর আগেকার একটা খাতায় রাজশেখরের বোনেদের কপি করা বিস্তর কবিতা। তার কয়েকটির নীচে লেখা 'শ্রীরাজশেখর'। এ থেকে চারটি কবিতা 'জল', 'নাবিক', 'সরস্বতী' ও 'শেলী থেকে' প্রথম প্রকাশিত হল এই সংকলনে। তবে কিছু সংশয় রইলই। কেউ যদি দেখিয়ে দেন এসব উনবিংশ শতাব্দের অন্য কারুর লেখা কবিতা কপি করা ছিল তবে আমার এই বেনিফিট অফ ডাউট ভুল হবে।

অন্যান্য কবিতা আগেই প্রকাশিত হয়েছে, তিন খণ্ডে 'পরশুরাম গ্রন্থাবলী'তেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সে ছাড়াও আরও বেশ কিছু কবিতা পেয়েছি ; সবই এই সংকলনে দেওয়া হল। শুনেছি রবীন্দ্রনাথও রাজশেখরের কিছু কবিতার বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। কোন্ কবিতা তা অবশ্য কিছুই জানি না। কিছু কবিতা সত্যিই অসাধারণ—দেবনির্মাণ, গঙ্গা, কৈলাস শিখরে, কালিপদ ডলিকোসেফালিক ইত্যাদি, এমনকি 'বাল্যে'র 'সরস্বতী'।

'সতী' অবশ্যই সব আলোচনার ঊর্ধ্বে।

'জামাইবাবু ও বউমা' আগেও প্রকাশিত হয়েছে, এটি একটি 'পাঠান্তর'। এ কবিতার এই প্রথম প্রকাশ হল রাজশেখরের নিজের হাতে লেখা একটি খাতা থেকে। তখন তাঁর বয়স ১৯ —সবে ৭।৮ বছর হল বাঙলা শিখেছেন। এটি এবং আরও কয়েকটি প্রথম যুগের কবিতার কিছু 'ভুল বানান' অক্ষুন্ন রাখা হল। পরবর্তীকালের বাংলা বানানের 'কর্ণধার' রাজশেখরের পরিপ্রেক্ষিত পাওয়ার জন্যে।

জল

১

কৌমুদী প্লাবিত কুসুম কাননে,
ধীর বিকম্পিত সুরভি পবনে।
হরিত ভূষিত সরসী আসনে,
অমল বিমল তরল জল ॥

২

উরসে ভাসিত রবিকর জ্বালা,
ফেন পুঞ্জময় বীচিরঙ্গশালা।।
আলোড়িত ঘোর তরঙ্গের মালা,
ধবল উজ্জ্বল চঞ্চল জল ॥

৩

নব পল্লবিত তরুশাখা পরে,
কুসুমের দাম শোভে থরে থরে।
ফুলদল অঙ্গে সমীরণ ভরে,
অধীর নিশির শিশির জল ॥

৪

গভীর গরজে নভ নিনাদিত,
বিজলী আলোকে দিক উদ্ভাসিত।
প্রাবৃট আকাশে মেঘ বিগলিত,
সুখদ সুহৃদ বারিদ জল ॥

৫

তনু বিদাহিত খর রবিকরে,
প্রখর উত্তাপে ঘন শ্বাস সরে।
তৃষিত মানব জীবনের তরে,
বিমল কোমল শীতল জল ॥

৬

গভীর বিষাদে হৃদয় পূরিত,
শোক দুঃখ ভরে মানস দহিত।
তাপিত মানব হৃদি বিগলিত,
পাষাণ গলন নয়ন জল ॥

৭

মোহন মূরতি জগৎ ভূষণ,
তরল ধবল হীরক বরণ।
সুন্দর তোমার রূপ অগণন,
সৃজন ললাম শোভন জল ॥

নাবিক

অনন্তের কোলে রহিগো আমরা, অনন্ত হইতে এসেছি চলে।
অনন্তে আবার ফিরে যাব মোরা, বারেক হেরিয়া সুনীল জলে ॥

সাধ করে দূরে এসেছি চলিয়া, হেরিব কি আছে সাগর নীরে,
দেখা ত ফুরাল, তরণী লইয়া চল এবে পুনঃ যাইগো ফিরে,

চলিয়া যাইতে প্রাণ নাহি চায়, অনন্তের মায়া নাহিক আর
কি ছিল তথায় মনে নাহি হায়, ভুলেছি হেরিয়া নীল পাথার ॥

পদাহত হ'লে কোন কোন নর, আবার যাইয়া চরণ ধরে,
দেখেছ কি কভু ধরণী উপর মান লাজহীন এমন নরে,

তাহাদেরি মত হয়েছি আমরা, নীল জল সার করেছি হায়।
ডাঙ্গিয়া তরণী বহে জলধারা, ডুবে যাক্ তরী কি ক্ষতি তায় ?

সরস্বতী

ফুল্ল কমল দল মানস সরসে
ধীর বিকম্পিত মারুত পরশে
বিম্বিত গিরি শির তুষার নীরে
অমল ধবল জল চঞ্চল ধীরে।

ভাসিত রবিকর দূর দিগন্তে
রঞ্জিত লোহিত তরুশির অন্তে
পবন প্রবাহিত কুসুম সুবাস
পূরিত গিরিবর বিলাস আশ।

প্রণত তপন কর পদযুগ পদ্মে
রাজিত পদতল সরসিজ সদ্মে
অপর চরণতল মরাল অঙ্গে
ধবল ধবল পর শোভিত রঙ্গে।

ভীত পবনকৃত নিশ্চল বাসে
প্রভাত রবিকর বিম্বিত ত্রাসে
বীণা বাদিত করতল কমলে
যন্ত্র বিচর্চিত মলয়জ ধবলে।

সংগীত উত্থিত সুকণ্ঠ সঙ্গে
প্লাবিত অম্বর গীত তরঙ্গে
শত শত দেব অমরগণ তপনে
বর্ষিত কুসুমাঞ্জলি যুগ চরণে।

কাব্য জগৎময় পূজিত জননী
অদ্য তব স্তব নাদিত ধরণী
শত নর যাচিত শতাংশ ভার
বিদ্যা কবিতা সংগীত হার।

কি তব সকাশে চাহিব আর
ফলিত স্বকর্মে যাচন ভার
প্রার্থনা পূরিত আংশিক তপনে
পরাংশ সাধিত নর হৃদি যতনে।

মোহবশে নর সৎপথ ভ্রষ্ট
কম হৃদি বৃত্তি মুকুলে বিনষ্ট
আত্ম ছলন কৃত মন দুখ ভার
মাতঃ সে সব বিপদ নিবার॥

শেলীর The Question হইতে অনুকৃত

ভ্রমিতে ভ্রমিতে হেরিনু স্বপন
    শীত ঋতু কোথা গিয়াছে চলি
মৃদু মৃদু বহে বাসন্তী পবন
    মধুর মধুর সুবাসে মিলি
জল কলনাদ সুবাসে মিলিয়া
    সুদূর হইতে আসিছে ধীরে
ধীরে ধীরে মোর চেতনা হরিয়া
    আনিল আমারে তটিনীতীরে
সে তটিনীতীরে রহিছে হেলিয়া
    একটি ব্রততী মধুর বায়
ধীরে নদি সলিল চুমিয়া
    চকিতে আবার সরিয়া যায়
বিকশিত কত কুসুম রতন
    হরিত তটিনী পুলিন 'পরে
এ কুসুমমালা মুদেনা কখন
    হেলেনা বিটপী কুসুমভারে
হেথা এক ফুল পড়েছে হেলায়
    ঢালিছে শিশির পল্লব তরে
কাঁদে যথা শিশু আদরে ভাসায়
    জননী বদন নয়ন জলে
চম্পক কামিনী মালতী মল্লিকা
    হাসে চারিদিক বিটপী পরে
বিকশিত কত কম শেফালিকা
    দোলে ধীরে ধীরে সমীর ভরে,
কুমুদ কহ্লার শোভে নদী জলে
    তীরে তরুবর সে ছবি হেরে
উল্লাসে তটিনী সাজি ফুল দলে
    প্রবাহিয়া যায় মধুর স্বরে
রচিনু যতনে কুসুমের হার
    বসি নদীতীরে বিটপীতলে
ফুলহার লয়ে ফিরিনু আবার
    পরাতে সে মালা কাহার গলে ॥

জামাইবাবু ও বউমা।

[ন্যাকা ন্যাকা সুরে পড়িতে হইবে।]

(By a Veteran.)

সূত্রপাত

মানস সরসে কোথা স্বরস্বতি !
এস তাড়াতাড়ি করি গো মিনতি ;
আজি হে ভারতি যতেক শকতি
গাহিব জামাইবাবুর গান।
কর অধিষ্ঠান পেনের ডগায় ;
অতি চড়া সুর বাঁধো গো বীণায়।
শুন হে জামাই যে আছ যথায়—
শুনিলে এতান জুড়াবে প্রাণ।
বউ আছ যত ঘরের কোনেতে
জামাই-কাহিনী শুন কান পেতে ;
তোমাদেরো কথা লিখিব শেষেতে,
কেহ নাহি আজি পাইবে পার।
হবে সব কথা রহিয়া রহিয়া,
যত আবরণ দিব গো খুলিয়া,
পেটের কথাটি আনিব টানিয়া ;
যদি রাগ কর তবে নাচার।
সত্যতার ব্রতে হইয়াছি ব্রতী,
নাহি ভেদজ্ঞান সতী কি অসতী ;
আজি এক গাড়ে গাড়িব সবারে—
জামাই বউমা শালাজ শালী।
পৃথিবীতে আছে নানাবিধ সঙ্,
নানাবিধ সাজে করে কত ঢঙ্ ;
তাঁহাদের চাঁই বউমা জামাই,
তাঁদেরি চরণে দিনু এ ডালি।

অথ জামাইবাবুর পরিচয়

মা বাপের ছেলে যাদু বাছাধন,
কত যতনের একটি রতন।
চরিত্র নিখুঁৎ—যেন নীলাকাশ ;
বিদ্যায় কি কম ? ছেলে এলে পাশ।

রঙ বড় কাল কোন্ শালা বলে ?
ন-হাজার টাকা দামের এ ছেলে।
শ্বশুরের খুব কপাল ভাল।
জন্মেছিল সেই পউষের শীতে,
পোয়াতী তখন কাতর জ্বরেতে।
পেঁচী ধাই ছিল,—মাগী বড় কাল,
তারি দুধ খেয়ে ছেলে হ'ল ভাল।
তা হলে কি হয় ? কাল মাই খেয়ে
অমন যে রঙ—গেল মাটি হয়ে।
তা না হলে এরে কে বলে কাল।

মাথার অসুখ বাছার আমার
একজামিন দিতে পারেনি এবার।
কোবরেজ বলে পড়ে কায নাই,
মন ভাল থাকে সেটা দেখা চাই।
শরীরের আগে পড়া ত নয়।
বয়েস কি বেশী ? গেল পউষেতে
পা দিয়েছে বাছা মোটে তেইশেতে।
দুধের ছেলে এ—ষষ্টির দাস,
বেঁচে বত্তে থাক্ নাই দিলে "পাশ"।
এখন বউমা এলেই হয়।

শ্বশুর লিখেচে পুজোর ছুটিতে
তাঁর কাছে যেতে হাওয়া বদ্‌লাতে।
পশ্চিমে এখন জলহাওয়া বেশ,
রেলে চড়ে যাবে নাই কোনো ক্লেশ ;
পথ বেশী নয়, দুই দিনের।
রথ দেখা আর কলা বেচা হবে,
মন ভাল রবে শরীর সারিবে।
ভাল ডাক্তার সেইখানে আছে
কবিরাজ কোথা লাগে তার কাছে ?
পাঁচনে টনিকে তফাৎ ঢের।

লেখাপড়া আর ভাল নাহি লাগে
বইগুনো দেখে হাড় জ্বলে রাগে।
জন্মিয়া অবধি জুটেছে জঞ্জাল।
বহিতে হইবে আর কত কাল ?
আর কায নাই এবারে থাক্।

রোজ রোজ আর বই হাতে করে
কলেজেতে যেতে মন নাহি সরে।
লেকচার নোট হারিয়ে গিয়েছে,
অঙ্কের খাতাটি ইঁদুরে খেয়েচে।
দূর হোক্ ছাই চুলোয় যাক্।

কোথাকার এক বাঁকা প্যারাবোলা
ফোকস্ কোথায় জানে কোন্ শালা?
হাইপার বোলা থাক্ কাঁচকলা
মরুক এলিপ্স্ ঘোড়ার ডিম্।

$BaCl_2 + K_2SO_4$
এ সকল জেনে কিবা লাভ মোর?
ফিজিক্স্ কেমিষ্ট্রী পড়ে গুলি খোর,
ফিজিক্স্ তেঁতুল কেমিষ্ট্রী নিম।

বিদ্যার ব্যাপারে পড়েছে ইস্তফা
ও সকল দফা বহুদিন রফা।
জামা'য়ের কিরে ও সব পোষায়?
দুরকম জ্বালা নাহি সহা যায়।
বউ আর পড়া আদা কাঁচকলা,
বউ কাঁচপোকা পড়া আরসোলা।
পড়া কেলে হাঁড়ি বউ মোটা লাঠি
লেখা পড়া সব বউ করে মাটি।—
আজ যা পড়ি তা কাল্‌কে ভুলি

পড়িতে কখনো মন নাহি লাগে
"কি যেন মুখখানি" হৃদয়েতে জাগে।
প্রাণ জ্বর জ্বর লভের জ্বালায়
বৌএর ভাবনা সর্ব্বদা মাথায়।
কখন "কি যেন কি কথা" বলেচে
"কি যেন কি কথা" চিঠিতে লিখেচে।
ভালবাসে কি না বাসে প্রাণভরে
চিঠি দিতে কেন এত দেরি করে?
চিঠি নাহি এলে দুখ নাহি ঘোচে
চিঠি নাহি পেলে ভাত নাহি রোচে,
বৌএর চিঠি যে হজ্‌মি গুলি।

ভেবে ভেবে আহা মাথার অসুখ,
শরীর কাহিল মনে নাই সুখ।
তাই বলি আর পড়ে কায নাই,
শ্বশুর বাড়িতে চলহে জামাই।
পরশু তরশু দিন ভাল নয়,
বার বেলা পড়ে নটার সময়।
কাল ত্রয়োদশী, দিনটাও ভাল—
সেই বেশ কথা, কাল্‌কেই চল।
মিছে দেরি করে লাভ ত নেই।
কাল যেতে হবে কর তাড়াতাড়ি,
নাও হে গুছিয়ে খাবারের হাঁড়ি
বোঁচ্‌কা বুঁচ্‌কি গেঁঠ্‌রি গেঁঠ্‌রা
চ্যাঙারি চুবড়ি বাক্‌স প্যাটরা।
এক গোছা টাকা শাশুড়ি প্রণামী,
একটা মোহর বৌএর সেলামী।
চাকরের তরে টাকা গোটা ছয়—
না না দশটাকা—যদি নিন্দে হয়!
প্রথম বারেতে বেশী দেওয়া চাই,
পরে না দিলেও কোনো ক্ষতি নাই:
শ্বশুরবাড়িতে ধারাই এই।

অথ যাত্রা

গড় গড় গড় মেল ট্রেন ধায়,
জামা'য়ের মন আগে আগে যায়।
এই যে হুগলী, ওই বর্দ্ধমান,
এই রাণীগঞ্জ,—ওটা কোন স্থান?
দেরী নাহি সহে আর কত দূর?
আসানসোল গেল, ওই মধুপুর।—
আঃ তবু ঘুম আসেনা ছাই।
মোকামা আসিল ঘুমে কায নাই,
পেটে বড় ক্ষিদে কি খাই কি খাই—
হোটেলেতে যেতে সাহস না হয়
দেরি হলে পাছে গাড়ি ছেড়ে যায়।
একটা হাঁড়িতে বাসি লুচি আছে,
সেটা থার্ড ক্লাসে চাকরের কাছে।—
চাকর বেটার দেখাই নাই।

ওই বাঁশী বাজে গাড়ি গেল ছেড়ে,
এই বার বুঝি পেটে পিত্তি পড়ে।
পকেটেতে আছে ভাল বার্ডসাই,
বসে বসে কোসে টানা যাক তাই।
বক্সর আসিলে ব্রেকফাস্ট হবে,
বাসি লুচি আলু পেটে কেন সবে?
নটা বেজে হল একুশ মিনিট,—
তবু কেন দেরী—হাউ ইজ্ ইট্?
না না ওই ফের বাঁশী শোনা গেছে,
ডিস্ট্যান্ট্ সিগ্নাল্ ছাড়িয়ে এসেছে।
আসিল ষ্টেষণ, দাঁড়াল গাড়ি।
নামিলেন বাবু তড় বড় কোরে
হোটেলের দিকে চলিলেন জোরে।
দোর হয়ে গেছে—নাইন্ হাফ্ পাষ্ট্
"খান্সামা, খান্সামা, লাও ব্রেকফাষ্ট্।"
"বহুতাচ্ছা বাবু, কোন্ চিজ্ চাহি—
মটন্ কি বীফ?" "আরে নেহি নেহি!
হিন্দু হ্যায় হম্—বীফ নেহি খাগা,
খানা খাগা কিন্তু জাত নেহি দেগা।
মটন্ লে আও, বীফ নেহি খাতা,
কাহে তুম্ কহা অলক্ষুনে কথা?
যাতা হ্যায় হম্ শ্বশুর বাড়ি!"

পেঁয়াজের সহ মটনের কারি
গরম গরম ভাল লাগে ভারি।
কর তাড়াতাড়ি—টাইম ওভার,
কাঁটা চাম্‌চেতে কায নাই আর।
পুঁটিমাছ খেকো বাঙালির ছেলে,
কাঁটা চাম্‌চেতে খেলে কিরে চলে?
ইঃ হিঃ হিঃহিঃ হিঃহিঃ ওমা একি হ'ল?—
হলুদের দাগ হাতে লেগে গেল!
বাহারে রুমাল গোঁজা আছে বুকে
মাখানো তাহাতে কাশ্মীর বোকে।
কোন্ প্রাণে হাত মুছি গো তাহায়?
শালাশালী দেখে কি ভাবিবে হায়!
কি করি উপায়?—বল জগন্নাথ—
টেবিলের ক্লথে মুছে ফেল হাত।
এ বুদ্ধি কি আর যোটেনা ছাই?

আর দেরি নাই ছাড়ে বুঝি গাড়ি,
সিগারেট মুখে চল তাড়াতাড়ি।
বাবা—বাঁচা গেল, ধড়ে প্রাণ এল,
বোয়ের ভাবনা আবার জুটিল।
ভাবনা আসেনা পেট খালি হ'লে
যতেক ভাবনা পেট্‌টি ভরিলে।
তাই বিধবারা একাদশী করে,
তাই সন্ন্যাসীরা শুখাইয়া মরে।
বে'র দিন লোকে খায় না তাই।

ঘড়্‌ ঘড়্‌ ঘড়্‌ ঝন্‌ ঝন্‌ ঝন্‌
কান ঝালাপালা হাড় জ্বালাতন।
সময় ত হ'ল ; আর দেরি নাই,
টেরিটা এবারে ঠিক করা চাই।
মুখ ধুতে হবে সাবানের জলে,
এসেন্স একটু দিতে হবে চুলে।
কোঁচার ফুলটা হয়ে গেছে মাটি
সেটাকে আবার কর পরিপাটি।
সব কায হল ; বাঁকী কিছু আছে ?
চল একবার আয়নার কাছে।
কেমন দেখায় দেখি একবার—
ব্বা ! এক্সেলেণ্ট্‌ ! অতি চমৎকার !
এই সাজে যাব শ্বশুরবাড়ি।

আর কত দেরি ? আর যে সহেনা
ধড়ে আর প্রাণ থাকিতে চাহেনা।
নানা না না না না ওই এল এল,
আর দেরি নাই হরি হরি বল।
ওই প্ল্যাটফর্ম ওই দেখা যায়,
শ্বশুর শালারা ওই যে বেড়ায় !
এই বারে গাড়ি ঢোকে ইষ্টিশ্যাণ,
ভ্যাকুয়ম্‌ ব্রেকে পড়েছে কি টান—
গুম্‌ গুম্‌ গুম্‌ কড়্‌ কড়্‌ কড়্‌
ঝড়াৎ হড়াৎ হড় হড় হড়
ক্যাঁচ্‌-ক্যাঁচ্‌-কোঁ—থামিল গাড়ি।

অথ পদার্পণ

নামেন জামাই গজেন্দ্র গমনে।
"বাবাজি কোথায় ?—এই যে এখানে।
খবর ত সব ভাল তথাকার ?
পথে কোনো কষ্ট হয়নি তোমার ?"
"আজ্ঞে না। আপনি আছেন ত ভাল ?"
"এক রকম। আর দেরি কেন চল।
কোচমান কোথা ? গাড়ি নিয়ে আয়—
লগেজ আসিবে মুটের মাথায়।
বেলা পড়ে এল গাড়ি হাঁকাও।"

হ্যাট্ ট্যাক্ ট্যাক্ ছপাং ছপাং
ঘোড়া ব্যাটা বড় করে উৎপাৎ।
জামাই কুটুম কিছুই মানেনা,
যখন তখন করে পাজীপনা।
অবশেষে খুব চাবুকের ঘায়,
গাড়ি লয়ে ঘোড়া অতি দ্রুত যায়।
অসার সংসারে এক মাত্র সার,
শ্বশুর বাড়ির গেট হ'ল পার—
সবুর সবুর গাড়ি থামাও।

"কোথায় আছিস্ ওরে ও ছেলেরা
জামাই বাবুকে ভেতরে নিয়েযা।
বাহিরে এখন থেকে কায নাই,
ভেতরে আরাম করুক্ জামাই।
দিতে বল এরে জল খাবার।"
ঠুংরি চালেতে চলেন জামাই,
মরি কি কায়দা বলিহারি যাই !
এইবারে রূপ করিব বর্ণনা,
এখন না হলে সময় হবেনা ;
রাত্তিরে জাগাতে সাহস কার ?

অথ রূপবর্ণনা

বারেক দাঁড়াও হে বাপা-জীবন !
নিরখি' মুরতি জুড়াই নয়ন।

আদরের ধন পতিত পাবন
অগতির গতি তুমি জামাই!
মূরতি তুলিতে ধরেছি ক্যামেরা
কিবা অপরূপ উঠিবে চেহারা!
রূপ-নীর-ধারা ছুটাবে ফোয়ারা
হবে চিত হারা হেরে সবাই।
আরে কেহে তুমি কোথা হতে এলে?
এ সব ফ্যাষাণ কোথায় শিখিলে?
চাদরের ফুল শোভে কিবা বুকে,
শিরে কিবা তেড়ি চশমাটি নাকে
কচি কচি গোঁফ কচি কচি দাড়ি
কামিজেতে মোড়া নেয়াপাতি ভুঁড়ি।
সিল্কের কোট চিক্ মিক্ করে,
(পূজার সময় পান আর বারে।)
ঢাকাই কাপড়ে কোঁচার বাহার,
হাওয়া লাগলেই সব একাকার—
ভিতরে একটা সেমিজ চাই।
কোটের বোতাম প্রায় সব খোলা,
কামিজের প্লেটে বেলফুল তোলা।
গলায় কলার,—আহা মরে যাই
ঘাড়ে বড় লাগে তবু পরা চাই!
একত্রিশ ভরি গলে গার্ড চেন,
সেই একঘেয়ে ষ্টার প্যাটারেন।
রদার হামের ঘড়ি খানি বেশ,
বাবুদের প্রিয় হনটিং কেশ।
রেসমী রুমাল পকেটেতে আছে,
"দৈবের গতিকে" বেরিয়ে পড়েছে,—
জামা'য়ের অত খেয়াল নাই!
কারপেট পম্প শোভে শ্রীচরণে
সিল্কের সকে মণ্ডিত যতনে।
ধীরে ধীরে যান ফিরে ফিরে চান,
কতবিধ আশে হাবুডুবু প্রাণ।
একটা বৌয়েতে আশ নাহি মিটে
বেহায়া নয়ন চারিদিকে ছোটে।
আঁদাড়ে পাঁদাড়ে খড়খড়ি ধরে
কে কোথায় আছ যাও শীঘ্র সরে—
হ্যাদে দেখ ওই জামাই আসে!

অথ শালী

চুম্বক পাথর লোহা টেনে আনে,
শালী চলে আসে জামা'য়ের টানে।
সেজে গুজে ওই আসিছে শালীরা
রঙ্ বিরঙের বিবিধ চেহারা।
কেহ এক হারা কেহবা দোহারা,
কেহ তিনহারা কেহ তাড়ে বাড়া।
কারো হাতে চুড়ি কারো হাতে বালা,
কারো শিরে খোঁপা কারো চুল খোলা।
কেহ কানে কানে ফিশ্ ফিশ্ করে,
জামাই বাবুর প্রাণ ওড়ে ডরে।
কেহবা চালাক, মুখে খই ফোটে,
কেহবা লাজুক কথা নাই মোটে
মাঝে মাঝে সুধু মুচ্‌কে হাঁসে।

শালীরা আসিয়া চারিদিকে ঘিরে,
জামা'য়ের মুখে হাসি নাহি ধরে।
ঢিপ্ ঢিপ্ ঢিপ্ প্রণামের পালা,
নাও যত পার চরণের ধুলা।
এমন খাতির আর কেবা জানে ?
কত ভালবাসা জামা'য়ের প্রাণে।
জামা'য়ের আহা তুলনা নেই !
জামাই কারুকে করেনা বঞ্চিৎ
সকলেই পায় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ—
বউ আট আনা শালী সাত আনা,
শালা আছে যত সব আধআনা,
এক এক পাই শ্বশুর শ্বাশুড়ি,
যত আছে বুড়ি—সব কাণা কড়ি—
জামা'য়ের প্রেমে বিভাগ এই !

অথ সম্ভাষণ

"ভাল আছ ভাই ?—(বোসোনা হেথায়—)
কতদিন আহা দেখি নি তোমায়।
বে'র পরে ভাই আসনাই আর,
কতদিন 'পরে এসেছ আবার।
দূর দেশে থাক দেখা না পাই।

সহজেতে মোরা ছেড়ে নাহি দিব
দুই মাস পাকা ধরিয়া রাখিব।
খাবারের থালা আয় না লো নিয়ে,
ও ঝি—ও ঝি—দেনা আসন বিছিয়ে।—
খাবার দিয়েচে—এসত ভাই!"

"আজ্ঞেনা আজ্ঞেনা, হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ না-না-না
মাপ কোর্‌বেন, খেতে পারবো না।
পেট বড় ভারি; অসুখ কোর্‌বে,
একেবারে সেই রেতে খাওয়া যাবে।
খেয়ে কায নেই এখন আর
"ওমা সেকি কথা! কিছুই খাবেনা?
তা কি হয় ভাই? না না তা হবেনা।
জামাই মানুষ, লোকে কি বোল্‌বে?
কিছু অন্তত খাইতেই হবে:—
তা না হলে খাও মাথা আমার।"

শালীদের কথা কে এড়াতে পারে?
চলেন জামাই সুড় সুড় কোরে।
গালিচার কিবা বিচিত্র আসন,
ঝক্‌ মক্‌ করে রূপার বাসন।
পাথর বাটিতে মিছরি ভিজানো,
রূপার রেকাবে বেদানা ছাড়ানো।
ক্ষীরের ছাঁচেতে কিবা কারিগরি,
মুগ ভিজে চিনি মাখম মিছরি
আরো ছাঁই পাঁশ কত কি আছে।

জামাই বাবাজি বসেন আসনে,
সরবতে লেবু টেপেন যতনে।
(শ্বশুর বাড়িতে লেবু টেপা দায়—
শালীদের গায়ে পাছে ফশ্‌কায়!)
ঢুকু ঢুকু ঢুকু সরবত পার—
ফলমূলে হাত দাও এইবার।
একটি একটি মুখে চলে যায়,
গোগ্রাসেতে নাহি জামাইরা খায়।
জামা'য়ের কভু সব খেতে নাই,
অর্দ্ধেক অন্তত ফেলে রাখা চাই,
লোকে মনে করে পেটুক পাছে।

আদরের ঝুড়ি যতনের খনি
নিকটেতে বসে শালী দিদিমণি,
করেন বাতাস পাখা লয়ে করে।
এমন আদরে কে থাকিতে পারে?
জামা'য়ের প্রাণে অত কি সয়?

"পাখা রেখে দিন"—বলেন জামাই।
"তাতে দোষ নেই, খাও তুমি ভাই।"
"পাখা ধরেছেন কেন কষ্ট করে?
তা হ'লে খাব না—দিন না আমারে"—
"না ভাই, ছি ভাই, তাও কি হয়!"

এ আদর আর কত দিন রবে?
চিরস্থায়ী সুখ নহে কভু ভবে।
নূতন জামাই এলে পরে হায়
পুরানো জামা'য়ে এ'ড়ে লেগে যায়।
রূপার বাসন কোথা যায় চলে,
এনামেল প্লেট তাহার বদলে।
রূপার ডিপার না হয় সন্ধান,
কলাপাতে সুধু এক খিলি পান।
ঘন ঘন আর না হয় পোলাও,
আছে ভাত ডাল যত পার খাও।
পাতে নাহি আর বড় বড় মুড়া,
যত পার চোষো কাঁকড়ার দাড়া।
রোজ রোজ আর নাহি আসে পাঁটা,
পোড়া কপালেতে সজনের ডাঁটা।—
জগতের রীতি এমনি হায়!

চাঁদেতে কলঙ্ক গোলাপেতে কাঁটা,
কচি কচি খোকা তারো নাকে পোঁটা।
বেদানায় বীচি আঙুরেও খোসা
ঘরেতেও ঝুল বিছানায় মশা।
যেখানেতে সুখ সেইখানে দুখ,
সম্পদের মাঝে বিধাতা বিমুখ।
পেটের অসুখ হয় বেশী খেলে,
কুড়ি হলে বুড়ি বিয়ে হ'লে ছেলে।
বাড়া ভাতে কাঠি পাকা ধানে মই,
গুড়ে বালি হায় কেমনেতে সই?
একটানা সুখ নাহি ধরায়।

ও সব এখন ভেবে কায নাই
খাওয়া শেষ হ'ল ওঠ হে জামাই।
জামা'য়ের পাতে যাহা আছে পড়ে
ছেলেগুনো নিয়ে কাড়াকাড়ি করে।
"তোরা কি কাঙাল ?"—দিদিরা গরজে,
ছেলেরা কি আর ও সকল বোঝে ?
জামাই বাবাজি যান বাহিরেতে,
কে কোথায় আছ এসগো ঘরেতে।
ছেড়ে দাও গলা, নাড় খুব হাত,
সমালোচনায় কর মুণ্ডপাত।
জামাই বেচারা নাই গো হেথা।

অথ সমালোচনা

"ওমা কোথা যাব—কি ঠ্যাঁটা জামাই,
এমন ত কোথা দেখি নেই ভা—ই !
হি হি হি হি—টানে হাত ধরে,
বলে কিনা ভাই—'আসুন এ ঘরে!' "
"তাতে দোষ কি লো, তুই যে শালাজ,
ঠাট্টা তামাসা তোরি ত এ কায।"
"যা বল যা কও, চেহারাটি বেশ ;
রঙ কাল বটে, মুখটি সরেস।"
কিন্তু ভাই বড় কপালটা উঁচু,
কান বড় বড় চোক দুটো নিচু।"
"যা বলিস্ ভাই চুপি চুপি বল্,
মা যদি শোনে ত বাধাবে জঞ্জাল।"
"হ্যাঁ ভাই।—আবার দাঁত ফাঁক ফাঁক
ঠোঁট্ মোটা মোটা বড় খ্যাঁদা নাক।
ঠ্যাং বড় গোদা, পেট্টা গোলালো।—
মোটের ওপর নয় তত ভাল।"
"কি করবে ভাই!—কপাল যেমন।
সকলে কি পায় মনের মতন ?
সে রকম হলে ভাবনা কৈাথা!

অথ সাজগোজ

রাত বহে যায়, দশটা বেজেছে,
খাওয়ার ব্যাপার সব চুকে গেছে।
তবু আর ছাই ডাকিতে আসেনা,

জামাইয়ের ব্যাথা কেহ ত বোঝেনা।
চুপ্ করে বসে থাক গো জামাই ;
চলহে পাঠক ভেতরেতে যাই।
এবার বৌয়ের সাজিবার পালা,
এক পাল মেয়ে করিছে জটলা।
কেহ চড়া সুরে হাসে হি হি হি হি,
কেহ মিহি সুরে করে চিঁহি চিঁহি।
দপ্ দপ্ কোরে মোমবাতী জ্বলে,
চারিদিকে ঘিরে আছেন সকলে।
সুগন্ধের শিশি—পফ্—পাউডার—
সাবান—তোয়ালে—কুন্তলীন আর।
আরসী—চিরুনি—ফিতে খোঁপাবাঁধা
ফুলের মালাটি ধপ্ধপে সাদা।
গোলাপী রঙের কাপড় কোঁচানো
এক ঘণ্টা ধরে আল্তা পরানো।
লজ্জায় মেয়ের ঠোঁট যে শুখায়,
দাও রঙ দেওয়া গ্লিসারিণ তায় ;
"আতর দেওয়া এ পানটা খা।"
মল বালা চুড়ি অনন্ত সোনার
ব্রেস্লেট ব্রুচ নেক্লেস্ হার।
(আরো মাথামুণ্ডু কত আছে ছাই—
সকলের নাম মোর মনে নাই।)
যত পার দেহে চড়াও গহনা,
সোনার ওজন ভারিতো লাগেনা।
"চুড়ি কিম্বা বালা—পরাবো কোন্টা ?
কিম্বা ব্রেসলেট ?—কিম্বা সব কটা ?"
"বেশী গহনায় কায নাই বোন্—
জানো না ত ভাই পুরুষের মন।
অধিক গহনা ওরা নাহি চায়,
মল চুড়ি দেখে হাড়ে চটে যায়।
রাত হয়ে গেছে ; আর কায নাই,
যা হয়েছে,—খুব ; চল নিয়ে যাই।
টেনে দাও ওর ঘোম্টা টা।

অথ বউমা

বিছানায় এসে এদিকে জামাই,
আর কত দেরি ভাবছেন তাই !

শুয়েছেন দিয়ে বালিষে ঠেষান্‌,
ডান দিকে আছে ডিপে ভরা পান।
এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়
একে একে সব খিলি শেষ হয়।
তবু এক খিলি ডিপেতে রয়েছে,
বিশেষ কারণে সেটা বাঁকী আছে!
ওই—ওই—ওই কপাট খুলিছে—
বউ নিয়ে আহা শালীরা আসিছে!
"লজ্জা কি লো তোর—আয় না এ ঘরে,
এখনি আমরা সবে যাব সরে।
এই দিকে ফের্‌—ঘোমটাটা খোল্‌,
আঃ কি করিস্‌!—মুখ খানা তোল্‌।
কেমন দেখায় দেখ ত ভাই!"
দেখহে জামাই মেলিয়া নয়ন,
ধরণীতে কোথা দেখেচ এমন?
মুখ চোখ নাক আরক্ত লজ্জায়
ড্যাব্‌ডেবে চোখ মিটি মিটি চায়।
পিটুলির জলে চিত্রিত বদন,
নাকেতে নোলক ভারি তিন মোণ।
বিষম লজ্জায় ঘন শ্বাস সরে.
বুকের ভিতর ধড়ফড় করে।
বউ হওয়া হায় কি বিষম দায়,
যার যাহা খুসী সে তাই সাজায়—
ট্যাঁ-ফোঁ কর্‌বার যোটি নাই।

"তোমার এধন বুঝে নাও ভাই,
যার ধন তারে দিয়ে মোরা যাই।"—
শালীরা পালাল, আঃ বাঁচা গেল,
জামাইবাবুর ধড়ে প্রাণ এল।
চলহে পাঠক আমরাও যাই,
বউ নিয়ে তুমি ঘুমোও জামাই।
অপরের কাছে বউ জুজুবুড়ি
একলা থাকিলে মিছরির ছুরি।
কর স্তবস্তুতি যত পার তত,
শ্রীচরণে তেল দাওহে সতত।
পাঁচশত বার বোঝাও তাহারে—
বড় ভালবাসি বউ গো তোমারে।"

যত পার ঝাড় নভেলের বুলি
প্রতিদানে তার শোনো গালাগালী।—
বোয়ের এমনি লভের চাড়!

কেন কর্ম্মভোগ? আরে ছিছি ছিছি
অত খিচি খিচি কেন মিছি মিছি?
কোথাকার এক পুঁটু পুঁটে মেয়ে
বেড়ায় তোমারে চরকী ঘুরিয়ে।
যত পার কর খোষামোদ তার
হায় হায় তবু মন পাওয়া ভার।
কোথা সরলতা পাবেহে খুঁজিয়ে
ন্যাকামীর ঝুড়ি এক ফোঁটা মেয়ে।
কোথা হে সাবিত্রি! শকুন্তলা কোথা?
কোথা দময়ন্তি? কোথা আছ সীতা?
কোথায় প্রফুল্ল? কোথা তিলোত্তমা?
কোথায় ভ্রমরা? কোথা আছ রমা?
হায়রে ও সব গাঁজার খেয়াল,
ধরণীতে শুধু গরুর গোয়াল;
তাহাদের মাঝে তুমিও ষাঁড়।

এসেন্সের শিশি আরসী চিরুনী
গায়ে ভাল জামা মাথায় বিনুনী।
সাজিলে গুজিলে পুরে মনস্কাম,
বাহার মারিতে বড়ই আরাম।
যা আছে তাহাতে নাহি মিটে আশ,
দ্বিগুনিতে রূপ সতত প্রয়াস।
চাই নানা বিধ লেটার পেপার
খাম নানা জাতি সোনালী বর্ডার।
আইভরি ফিনিশ্ তাসের জোড়াটি
চাই চক্‌মকে গানের খাতাটি।—
এই সবি বেশী; বর বেশী নয়,
গাধা বাঁদরেতে হয় কি প্রণয়?
শুয়ে থাক্ পাশে নাহি আসে যায়,
ছারপোকা মশা কত বিছানায়।—
বর হতভাগা তাদেরি সামিল,
মাঝে মাঝে পিঠে পড়ে চড় কিল;—
লাথিটাও লাগে ঘুমের ঘোরে।

বিয়ের আগেতে বড়ই দুর্দশা,
মিটিতে না পায় হৃদয়ের আশা।
দিদি বউদিদি ঘরে আছে যত
কত ফিশ্‌ফিশ্‌ করে অবিরত।
সে সকল কথা শুনিতে বাসনা।
কিন্তু দিদিমণি শুনিতে দ্যায় না।
কাছে গেলে হায় দূর্‌ দূর্‌ করে,
বলে—"ঝাঁটা খেকি যা না তুই সরে!"
ধেড়ে ধেড়ে যত মেয়ের কথায়,
ছোট ছোট মেয়ে কল্কে না পায়।
বিয়ে হয়ে গেলে ভারিক্কেটা বাড়ে
কেহ নাহি আর দূর্‌ দূর্‌ করে।
দিদিরা তখন টেনে নেয় দলে,
ফিশ্‌ ফিশ্‌নিটা ভাল রূপে চলে।
যতনে শিখায় ধরণ ধারণ
দু-দিনে বউমা সাবালক হন।
ইয়ার্কি না হলে পুরুষ বাঁচেনা
মেয়ে নাহি বাঁচে ফিশ্‌ ফিশ্‌ বিনা!—
টিকে থাকে তারা তাহারি জোরে।

বিয়ের আগেতে না থাকে জঞ্জাল
ছেলে মানুষিতে কেটে যায় কাল।
বিয়ে হয়ে গেলে বাধে যত গোল,
বউমার ন্যাজ ফুলে হয় ঢোল।
কোথা হতে এক আসে ধেড়ে বর
সেই দিন হতে ঘটে যুগান্তর।
কভু হাতে ধরে কভু পায়ে পড়ে
যোড় হাতে কত "হেঁই হেঁই" করে।
নড়িতে চড়িতে করে খোষামোদ,
বাঁদর নাচাতে বড়ই আমোদ!
কভু হাতে দাঁড় কভু হাতে চাঁদ
তবু বোকা বর নাহি সাধে বাদ।
গরজের বাড়া বালাই নাই।

কারু কারু থাকে পরামর্শদাতা
খেয়ে দেন তাঁরা বউমার মাথা।
নানা বিধ ফন্দি তাহারা শিখায়

বর যাতে থাকে হাতের মুঠায়।
"দেখ্ ভাই আজ শুস্ পাশ ফিরে
পায়ে না ধরিলে নাহি যাবি সরে।"
ইত্যাদি ইত্যাদি বিবিধ প্রকার
শেখেন বউমা ঘোর অত্যাচার।
হাঁদা বর গুনো চুপ্ করে সয়
যাতে তাতে রাত কেটে গেলে হয়।
পাজী বরগুণো করে পিট্ পিট্
আগে খুঁৎ খুঁৎ শেষে খিট্ মিট্।
অবশেষে যদি বাধে গোলমাল,
মন্ত্রী মহাশয় ছেড়ে দেন হাল।
চোখ রাঙানিতে নাহি মানে ডর
বড় ভয়ানক একগুঁয়ে বর ;—
"বোঝালেও বোঝে তাই কি ছাই ?"
নেহাৎ বেহায়া হওয়া নাহি যায়,
একবারে হাঁদা তাও ঠিক নয়।
আঁকা বাঁকা পথে বউমারা যায়,
ন্যাকামিতে থাকে দুদিক বজায়।
টন টনে জ্ঞান, মুখে "নাহি জানি,"
ধরি মাছ কিন্তু নাহি ছুঁই পানি।
কোনো কোনো বর বড় লক্ষ্মীছাড়া
বউমা ঘাঁটিয়ে মজা দেখে তারা।
পেটের কথাটি যদি আনে টেনে,
জ্বলেন বউমা তেলেতে বেগুনে।
ঠাট্টা করে যদি আঁতে দাও ঘা—
ওগো সর্ব্বনাশ! তা হলেই "যাঃ!"
তখন বউমা একবারে বাঁকা
বর বেচারার লাগে ভ্যাবাচাকা ;
খোষামোদ ছাড়া উপায় নাই।

"অদৃষ্টের দোষ" কথায় কথায়
মনের মতন বর মেলা দায়।
বউমার আহা বেঁচে সুখ নাই
"অতি পাপীয়সী বেঁচে আছি তাই।"
ঘণ্টায় ঘণ্টায় মরিতে বাসনা,
বর ঝাঁটা খেকো শুনেও শোনেনা।
মরার কথায় ভয় নাহি পায়,

রকম দেখিলে হাড় জ্বলে যায়!
মাটির ঢিপির মত হবে বর,
কথা নাহি কবে কথার উপর।
যে দিকে ফিরাব সে দিকে ফিরিবে,
লাথি মারিলেও চরণে ধরিবে।—
এরকম বর বউমারা চায়,
পোড়া পৃথিবীতে কোথা পাবে হায়?
বিধাতার রাজ্যে ঘোর অবিচার—
বাঁদরের গলে মুকতার হার।—
এদুখ রাখিতে যায়গা নাই!

এই একদিন; আর একদিন
বহুদূরে ওই দেখা যায় ক্ষীণ।—
কোথা অভিমান? কোথা অহঙ্কার?
কালের পেষণে সব চুরমার।
ঘন ঘন ভাব ঘন ঘন আড়ি
ঘন ঘন যাওয়া শ্বশুরের বাড়ি।
কোথা ঘন ঘন চিঠি লেখা লেখি?
কোথা ঘন ঘন অত মাখামাখি!
কোথা সেণ্টিমেণ্ট? প্রণয় কোথায়?
বুড়ো হলে হয় সব চলে যায়।
একপাল মেয়ে একপাল ছেলে,
চারি দিক হতে "বাবা বাবা" বলে।
কারো নাক খ্যাঁদা—পোঁটা বহে তায়;
কেউ বড় কাল,—বর মেলা দায়।
গায়ে হেগে দ্যায়, কোলে মুতে দ্যায়,—
"প্রাণাধিক প্রিয়ে" সব ভেসে যায়।
প্রণয়ের কিরে এই পরিণতি?
বুড়ো বয়সেতে হায় কি দুর্গতি!
সুখের ঘরেতে কেনরে আগুন?
পাকা বাঁশে হায় কেন ধরে ঘুন?
মধুর হাঁড়িতে কেনরে মাছি?

কি কথা লিখিতে কি কথা আসিল,—
ঘুমোও জামাই রাত হয়ে গেল।
আর বেশি রাত জেগে কায নাই,
অসুখ কোর্‌বে না ঘুমুলে ভাই!

জামাই ঘুমুল, পাড়াটা জুড়ুল,
আমার কথাও শেষ হয়ে এল।

জামায়ের কথা অমৃত সমান,
কাশীরাম কহে শুনে পুণ্যবান।
একথা শুনিলে দুখ দূর যায়,
পাপী নরাধম পরিত্রাণ পায়।
কাল রঙ যার সেও হয় সাদা
ছোট হয় বড় ঘোড়া হয় গাধা।
বাঁজা হয় তাজা, তাজা হয় বাঁজা
একথা যে শোনে সেই হয় রাজা।
একথা শুনিয়া যেবা রাগ করে,
তাহার ভিটায় সদা ঘুঘু চরে।
তাই বলি শোনো মন দিয়ে বেশ।—
হরি হরি বল, কথা হ'ল শেষ।
তোমরাও বাঁচ, আমিও বাঁচি।
ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি।

ইতি—

[৬ই এপ্রেল ১৮৯৯।]

প্রার্থনা

ওহে অনন্ত বিশাল বিপুল নিখিলের অধিপতি,
বিশ্বে তোমার না পাই নাগাল মোরা অতি মূঢ়মতি।
মহাজগতের বিরাট ধান্দা ছেড়ে বারেকের তরে
অতি ছোট হয়ে ধরা দাও আজ মোদের ক্ষুদ্র ঘরে।
ভেবেছ এ ঘর বেশ তো সাজানো, কিসের অসদ্ভাব,
হায় হায় প্রভু বুঝিলে না এ যে ভাড়া করা আসবাব।
অন্তর্যামী, ভাঁড়ের খবর কিছুই জানিলে না কি?
কোনো মতে ঠাট বজায় রেখেছি ভিতরে সকলি ফাঁকি।
এই যে দেখিছ রোগা রোগা যত অমৃতের সন্তান,
দারুণ দৈন্য লজ্জার চাপে কণ্ঠে আগত প্রাণ।
কবে কোন্ যুগে খেয়েছিনু মোরা দুই চার ফোঁটা সুধা,
হজম হইয়া গেছে কোন্ কালে পেয়েছে বিষম ক্ষুধা।
হাজার বছর সবুর করিয়া লভিয়াছি এই জ্ঞান—
নিজে হতে তুমি নাহি দিবে কভু ছাপ্পর ফোঁড়া দান।
ওহে হৃদিস্থ হৃষীকেশ, তাই সকলে তোমার কাছে
জবরদস্তি করিব আদায় যা কিছু অভাব আছে।
চল্লিশ কোটি নাছোড়বান্দা মোরা ছাড়িব না কভু,
তুমি যে একলা পড়িয়াছ ধরা, কোথায় পালাবে প্রভু?
ওঠো নারায়ণ, জাগ জাগ ওহে অচেতন শালগ্রাম,
এ নয় তোমার ক্ষীরোদসিন্ধু, এ যে গরিবের ধাম।
ওহে দামোদর, চল্লিশ কোটি টানিছে তোমার রাশি,
ওঠ নারায়ণ আজি যে তোমার উত্থান-একাদশী॥

অল্পে তুষ্ট দস্যু আমরা, বেশী কিছু নাহি চাই,
অর্ধরাজ্য, রাজার কন্যা — এসবেতে রুচি নাই।
ইন্দ্রের পদ, কুবেরের ধন, স্বর্গের ভোগ যত
মুক্তি মোক্ষ নির্বাণ আদি তোলা থাক্ আপাতত।
দেশে দেশে যাহা দিয়েছ দেদার তাই দাও আমাদের—
একটি কেবল ছোটখাটো বর, তাতেই হইবে ঢের॥

খোল হে শীঘ্র খোল হে তোমার শক্তির ভাণ্ডার,
দাও হে মাথায় হৃদয়ে শক্তি বাহুতে শক্তি আর।
কর হে কোমল কুসুমের মত, তাতে আপত্তি নাই,
দরকার হলে বজ্রের মত কঠোরতা যেন পাই।
তৃণের চেয়েও কর হে সুনীচ, তরুর চেয়েও ধীর,
শত্রুর কাছে উঁচু যেন রয় হিমাচলসম শির।
যত খুশি দাও ক্ষমা অহিংসা অন্তরে মোর ভরি,
একটি কেবল মনের বাসনা বলে রাখি হে শ্রীহরি—
দুর্জন অরি এক চড় যদি লাগায় আমারে কভু,
তিন চড় তারে কষাইয়া দিব, মাপ কর মোরে প্রভু।
একটি কানের বদলে তাহার দিব দুই কান কাটি,
একটি দাঁতের বদলে তাহার উপাড়িব দুই পাটি।
ইষ্টানিষ্ট না ভাবিব কভু, শক্ত করিব টিট—
ক্ষম অপরাধ ওহে দয়াময়, আমি নরকের কীট॥

এইটুকু বর লইয়া তোমায় আপাতত দিব ছুটি,
নিজ নিজ ঘর লব গুছাইয়া যত পারি মোটামুটি।
তার পরে যদি আসে হে সুদিন, আর যদি বেঁচে থাকি,
ভাল ভাল বর করিব আদায় যা কিছু রহিল বাকী—
মান সম্ভ্রম, মোটা রোজগার, চারতলা পাকা বাড়ি,
লোক-লশকর, রূপসী বনিতা, আট-সিলিন্ডার গাড়ি॥

(১৯২৬)
ভারতবর্ষ, আশ্বিন, ১৩৩৩.

দেবনির্মাণ

চাই বাঞ্ছাকল্পতরু ভক্তজনদাতা,
নাহি চাই নির্বিকার অবোধ্য বিধাতা—
গুণহীন পরমাত্মা, যাঁরে তর্কপটু দার্শনিক জ্ঞানী
ধরিতে ছুঁইতে নাহি পারে, তবু নিয়ে করে টানাটানি।
চাই দেব হেন শক্তিমান যার সনে চলে কারবার,
বিপদে সম্পদে বার বার যাঁর কাছে চলে আবদার—
মন্দ যা আছে ফিরে নাও,
শুভ যত আছে সব দাও,
তাহার উপরে কিছু ফাও
আরো দাও মোরে আরো দাও॥

ভূলোকে দ্যুলোকে তাই করিনু সন্ধান
কোথায় দেবতা যিনি বহুশক্তিমান।
জলে স্থলে মেঘলোকে নভে বিশ্বদেব তোমারে সম্ভাষি,
হে অনল-সলিল-বিহারী, হে ওষধি-বনস্পতি-বাসী—
বধিয়াছি অজাগত পশু মন্ত্রপূত যজ্ঞবেদী পরে,
ঢালিয়াছি হবির আহুতি, অগ্নিশিখা উঠিল অম্বরে,
দাও পুত্র ধন ধান্য ধেনু, দাও ব্রীহি শস্যের সম্ভার,
দূর কর অমঙ্গলভয়, শত্রু মোর কর হে সংহার।
যজ্ঞ ধূমে দৃষ্টি হয় নাশ,
সোমপানে আসিল তন্দ্রা,
মেদগন্ধে না পড়ে নিঃশ্বাস,
দেখা দাও মন্ত্রের দেবতা!
কোথা ওরে বিশ্বদেবগণ?
হা বধির হা রে অচেতন॥

হে অদৃশ্য দেব, এই মুক্তাকাশতলে
ধরা নাহি দিবে তুমি মোর মন্ত্রবলে।
গড়িয়াছি বিপুল আয়াসে অভ্রভেদী তব নিকেতন,
পত্র পুষ্প ফল জল দিয়া ভরিয়াছি অর্ঘ্য নিবেদন,

রচিয়াছি বিশ্বরচয়িতা দৃশ্যমান তব কলেবর
ধাতু শিলা কর্দমপ্রলেপে সুগঠিত মুরতি সুন্দর,
মণিময় নানা আভরণে সাজায়েছি বিগ্রহ তোমার,—
ওহে স্রষ্টা, হের সৃষ্টি মম, লও পূজা দাও পুরস্কার।
আর যদি ওহে নিরাকার, নাহি চাও মুরতি সুঠাম,
আছে ঐ অবয়বহীন সুডৌল শিলা শালগ্রাম।
যেথা ইচ্ছা কর অধিষ্ঠান,
ধর ধর অর্ঘ্য উপহার,
কথা কও ওহে মূর্তিমান,
মনোবাঞ্ছা পুরাও আমার।
হা রে মূক জড় ভগবান,
হা বিমুখ অচল পাষাণ॥

বুঝিয়াছি যে দ্যুলোকবাসী ভগবান,
মুরতি পূজায় শুধু তব অপমান।
নররূপী তব দূত মুখে পাইয়াছি বার্তা অভিনব,
মানবেরে করেছি দেবতা, দেবতারে করেছি মানব।
সব কথা নারিনু বুঝিতে, এইটুকু বুঝিয়াছি প্রভু—
নিজস্ব মোদের তুমি শুধু, অপরের নহ তুমি কভু।
ত্রাণ কর সন্তানে তোমার, স্বর্গলোকবাসী হে জনক,
প্রতিবেশী বিধর্মীর তরে দাও প্রভু অনন্ত নরক।
বীর যত তোমার সন্ততি
শত্রু নাশি করিছে উল্লাস,
জয় জয় প্রভু গোষ্ঠীপতি—
এ কি দেব এ কি পরিহাস?
ভ্রাতা বধ করিছে ভ্রাতায়,
তব বাক্য রসাতলে যায়॥

শুনিব না কোনো কথা অপরে যা কয়,
বিশ্বাসে তোমারে আমি লভিব নিশ্চয়।
তুমি সর্ব গুণের আধার, হে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান,
তুমি সর্বভয়পরিত্রাতা, হে অপারকরুণানিধান।

পাইয়াছি তোমারি দয়ায় ধরাতলে ভাল কিছু যাহা,
অমঙ্গল যা কিছু দিয়েছ আমারি উন্নতি তরে তাহা —
সে কেবল তব লীলাখেলা, অথবা সে মোর কর্মফল।
হে ঈশ্বর, নাহি কি হে তব আর কোনো উপায় করণ?
সোজাসুজি কর না উদ্ধার যদি তুমি এত শক্তিমান।
ওরে শুষ্ক বাঞ্ছাকল্পতরু, গৃহস্থের পোষা ভগবান,
ভক্তি চায় ধরিতে তোমারে, যুক্তি কাটে তোমার বন্ধন,
হায় প্রভু টিকিলে না তুমি, আবাহনে হইল নিরঞ্জন!
হে অক্ষম ভয়পরিত্রাতা, হে অথর্ব নিয়মের দাস,
হে দুর্বল মহাকারুণিক, হে নিষ্ঠুর শক্তির বিকাশ,
হে কৃত্রিম মানসবিগ্রহ,
হে নরের বাঞ্ছিত বিধান,
এক চক্ষু মুদি অন্তরে
কেমনে করিব তব ধ্যান?

হে বিধাতা, পার নাই গড়িতে ঈশ্বর,
ফেলিয়াছ এই ভার আমার উপর।
অতি দীন আয়োজন মোর, তবু নাহি মানি পরাভব,
যুগে যুগে তিল তিল করি অসম্ভবে করিব সম্ভব।
হে অব্যয়, কর কিছু ব্যয়, দাও মোরে শ্রেষ্ঠ উপাদান —
মন-প্রাণ ধৈর্য নিরবধি, যথাসাধ্য করিব নির্মাণ।
আপনার স্বরূপে স্বভাব দেবতায় চাই মিটাইতে,
সুন্দর যা কিছু আছে যেথা দেবতায় চাই ঢালিতে।
মাঝে তার দিতেছি লেপিয়া শ্রেয় প্রেয় কামনা আমার,
দেবোত্তর রচিবার ছলে নরোত্তমে দিতেছি আকার।
এখনো অনেক ত্রুটি আছে, কেমনে সে দিবে ইষ্টফল?
তবু আশা আছে ক্রমে হবে মনবাঞ্ছা সুন্দর সফল।
খণ্ডিত সে মানসবিগ্রহ, খণ্ড তার হেরেছি নয়নে,
নানা পাত্রে নানা দেশে কালে; নমি সেই খণ্ড-নারায়ণে।
সর্বশক্তি নাহি থাক তার,
তথাপি সে বহুশক্তিমান।
না পারুক করিতে উদ্ধার,
তথাপি সে করুণানিধান।
নাহি হ'ক সর্বফলদাতা,
তবু তারে করিব দেবতা॥

(১২৫)
ভারতবর্ষ, বৈশাখ, ১৩৩৪.

দুলালের গল্প

দুলাল নামে একটি ছেলে পটোলডাঙায় বাস,
গরম গরম পটোলভাজা খায় সে বারো মাস।
পটোলডাঙার চারদিকেতে পটোলগাছের বন,
ডাল ধ'রে তার নাড়লে পড়ে পটোল দু-চার মণ।
পাড়তে পটোল ছিঁড়তে পটোল মোটেই মানা নেই,
বারণ কেবল পটোল তোলা—আইন হচ্ছে এই।
অটল ঘোষের পিসীর ননদ পটোল তুলেছিল,
ইস্কুলে তাই অটল ঘোষের নামটি কেটে দিল।
যাক্ সে কথা। বলচি এখন গল্প দুলালের ;
মন দিয়ে খুব শোনো যদি বুদ্ধি হবে ঢের।

দুলাল ব'লে একটি ছেলে পটোলডাঙায় ধাম,
বাপ হচ্চেন জ্যোতিষচন্দ্র, গৌরী মায়ের নাম।
তিনকড়ি আর সাধনচন্দ্র দুলালের দুই চাচা,
আড়াই হাতী খদ্দরেতে দেয় না তারা কাছা।
দুলালচাঁদের আছে আবার ফুটফুটে পাঁচ বোন,
বীণা, রাণু, বুলু, দুলু—এই নিয়ে চার জন।
আর একটি বেরাল-ছানা নামটা গেছি ভুলে,
দেখতে যেন মোমের পুতুল, গাল দুটো তুলতুলে।
এ সব ছাড়া দুলালচাঁদের আছে অনেক জন
জেঠতুতো আর মাসতুতো আর পিসতুতো ভাই-বোন।
থাক্ সে কথা। মন দিয়ে খুব শোনো এখন ভাই—
বলচেন যা দুলালচাঁদের ন-পিসে মশাই।

দুলালচন্দ্র ছিল যখন সাত বছরে ছেলে,
একদিন সে লুচি দিয়ে পটোলভাজা খেলে।
পাকা পাকা পটোল তাতে ক্যাঁচর ক্যাঁচর বিচি,
বিচি খেয়ে মুখ বেঁকিয়ে দুলাল বলে—"ছি ছি,
রইব না আর কোলকাতাতে পটোলভাজার দেশে,
যাচ্চি আমি পণ্ডিচেরি মাদ্রাজীদের মেসে।"
এই না ব'লে টিকিট কিনে দুলাল তাড়াতাড়ি
কটকেতে চ'লে গেল সেজপিসীর বাড়ি।

ভাবেন তখন দুলালচাঁদের তিন-নম্বর পিসে—
উড়ের দেশে এ ছেলেটির বিদ্যে হবে কিসে।
অনেক খুঁজে মাষ্টার পেলেন, নামটি বাঞ্ছা ঘোষ,
নাকটা একটু থ্যাব্‌ড়া-পানা, এই যা একটু দোষ।
বললে দুলাল—"আপনার সার নাকটা কেন খাঁদা?
আপনি যদি পড়ান আমার বুদ্ধি হবে হাঁদা।"
বাঞ্ছানিধি হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন ঘরে,
নাক-লম্বা গোবর্ধন এলেন দু-দিন পরে।
দুলাল বলে—"আপনার সার খাঁড়ার মতন নাক,
নাকের খোঁচায় শেষে আমার বুদ্ধি ছিঁড়ে যাক!"
গোবর্ধন বরখাস্ত হলেন চাকরি থেকে,
পিসে তখন ব'লে দিলেন চাপরাসীকে ডেকে—
জলদি লে আও এসা মাষ্টার নাক নেই যার মোটে,
কটক পুরী দিল্লি লাহোর যেখান থেকে জোটে।"

চাপরাসীটা পাগড়ি বেঁধে বন্দুক ঘাড়ে ক'রে
অনেক দেশে দেখলে খুঁজে একটি বছর ধ'রে।
তার পরেতে ফিরে এসে বললে—"হুজুর সেলাম,
নাক নেই যার এমন মানুষ কোত্থাও না পেলাম।
কিন্তু অনেক চেষ্টা ক'রে দুলালবাবুর তরে
ধরেচি এই ওস্তাদকে মহানদীর চরে।
নাকের বালাই নেই, কিন্তু আওয়াজটি এঁর খাসা,
শিখিয়ে দিতে পারবেন খুব উর্দু ফার্সী ভাষা।"
চাপরাসী তার লাল বটুয়ার মুখ করলে ফাঁক,
অবাক হয়ে শুনলে সবাই গুরুগম্ভীর ডাক।
আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল লম্বা দুটো ঠ্যাং,
বটুয়া থেকে লাফ দিলে এক মস্ত কোলা ব্যাং।
ব্যাং বললে—"আয় রে দুলাল পড়বি আমার কাছে।"
কোথায় দুলাল? লেপের ভেতর ঐ যে লুকিয়ে আছে।
দুলালচাঁদের রকম দেখে কষ্ট পেয়ে মনে,
ব্যাং বেচারা পালিয়ে গেল খণ্ডগিরির বনে।
দুলাল তখন ইষ্টিশানে গিয়ে একেবারে
কোলকাতাতে রওনা হ'ল পুরী-প্যাসেঞ্জারে।

পটোলডাঙায় দু-তিন বছর হয়ে গেল শেষ,
বিস্তর বই পড়লে দুলাল, বুদ্ধি হ'ল বেশ।
কিন্তু হঠাৎ একদিন তার খেয়াল হ'ল মনে—

"এখানে নয়, পড়ব আমি শান্তিনিকেতনে।"
ভালমানুষ হলেও দুলাল বড়ই জেদী লোক,
যা চাইবে করবেই তা যেমন ক'রেই হোক।
ছোটকাকার সঙ্গে দুলাল জিনিস-পত্র নিয়ে,
শান্তিনিকেতনের ক্লাসে ভর্তি হ'ল গিয়ে।
ইংরিজী আর বাংলা কেতাব পড়লে একটি রাশ,
পাটীগণিত ব্যাকরণ আর ভূগোল ইতিহাস।
দিনুঠাকুর শিখিয়ে দিলেন গানের অনেক সুর,
তাকাগাকি শিখিয়ে দিলেন কায়দা যুযুৎসুর।
নন্দলালের কাছে দুলাল আঁকতে শিখলে ছবি,
আর সমস্ত যা যা আছে শিখিয়ে দিলেন কবি।

অনেক রকম শিখলে দুলাল শান্তিনিকেতনে,
গায়ে হ'ল ভীষণ জোর আর অসীম সাহস মনে।
গোমড়া-মুখো মাষ্টার যাঁর সদাই হাতে বেত,
নাকে কথা বলেন যাঁরা—ভূত পেত্নী প্রেত,
পা-ফাটা সেই কানকাটা যে থাকে খেজুর গাছে,
ছোট ছেলের কান ধ'রে যে যখন-তখন নাচে,
বাঘ ভালুক সাপ ব্যাং আর ভিমরুল আর বিচ্ছু—
এসব দেখে দুলালের আর ভয় করে না কিচ্ছু।
কারণ, দুলাল জানে ওরা সবাই জুয়োচ্চোর,
আর, দুলালের সাহস আছে, গায়ে ভীষণ জোর।

তারপরেতে বোশেখ মাসের তেসরা রবিবারে,
ঠিক দুপ্পুরবেলা যখন ভূতে ঢেলা মারে,
সকল দিক নিঝুম যখন রোদ্দুরে কাঠফাটে,
জুজুর খোঁজে দুলাল গেল তেপান্তরের মাঠে।
জুজু তখন ঘুমুচ্ছিল ভিজে গামছা প'রে ;
সাড়া পেয়ে বেরিয়ে এল ষাঁড়ের মূর্তি ধ'রে—
কাঁধের ওপর মস্ত ঝুঁটি, শিং দুটো খুব লম্বা,
দৌড়ে এসে ঘাড় বেঁকিয়ে ডাক ছাড়লে—হম্বা।

তেড়ে গিয়ে বললে দুলাল—"শোন্ রে জুজু হাঁদা,
চেহারা তোর ষাঁড়ের মতন, বুদ্ধিতে তুই গাধা।
যুযুৎসুতে শিক্ষা আমায় দিলেন তাকাগাকি,
জুজুর বুদ্ধি নিয়ে আমার সঙ্গে লড়বি নাকি?
শিং ধ'রে তোর দুমড়ে দিয়ে লাগাই যদি চাড়,

হুমড়ি খেয়ে পড়বি তখন ওরে গর্দভ ষাঁড়।
আমার সঙ্গে লড়তে এলি মুখখু কে তুই রে ?
জানিস, আমি পটোলডাঙার দুলালচন্দ্র দে!"

ফটাস ক'রে ষাঁড়ের তখন পেটটা গেল ফেটে,
ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন মানুষ একটি বেঁটে।
পরনে তাঁর পেন্টুলুন হ্যাট কোট নেকটাই,
হাতে একটি নিরেট খাতা চামড়ার বাঁধাই।
বুকের ওপর দশটা মেডেল, ফাউণ্টেন পেন ছ-টা,
হাত-ঘড়িতে কেবল দেখেন বাজল এখন ক-টা।

দুলাল জানে ভদ্রলোকের সঙ্গে ব্যবহার ;
দু-হাত তুলে বললে তাঁকে—"মশাই নমস্কার।
মাপ করবেন, আপনাকে সার গাল দিয়েচি যা—
ষাঁড়ের পেটে আপনি ছিলেন তা তো জানতুম না।"

ঘাড়টি নেড়ে জবাব দিলেন জুজু মহাশয়—
"ছেলেদের সব কাণ্ড দেখে বড়ই দুখখু হয়।
এই দুপুরে জিওমেট্রির অঙ্ক-কষা ফেলে
রোদ্দুরেতে টো-টো কর, কেমন তুমি ছেলে ?
পরখ ক'রে দেখচি তোমার বিদ্যে কত দূর,
এই চারটে কোশ্চেনের দাও দেখি উত্তর—
তিরিশ টাকায় ছ-মণ হ'লে আড়াই সেরের কি দাম ?
বল দেখি শাজাহানের চারটি ছেলের কি নাম ?
বল দেখি কোন দেশেতে আছে শহর মক্কা ?
বল দেখি সন্ধি কি হয়—'এতদ্' ছিল 'ঢক্কা' ?"

বললে দুলাল—"আড়াই সেরের পাঁচ আনা হয় দাম।
দারা সুজা আরংজেব আর মুরাদ—এই চার নাম।
সবাই জানে আরব দেশে আছে শহর মক্কা।
'এতদ্' ছিল 'ঢক্কা'— হ'ল সন্ধি এতড্ঢক্কা।"

জুজু বললেন—"ভুল করনি বেশী জবাবেতে ;
শিখতে যদি আমার কাছে ফুল-নম্বর পেতে।
মন দিয়ে খুব পড় খোকা, যাচ্চি আমি আজ ;
সেনেট-হলে আমার এখন আছে একটু কাজ।"

দুলাল বললে—"থামুন মশাই, অনেক সময় পাবেন।
এই গরমে দুপুরবেলা রোদে কোথায় যাবেন?
এই বারেতে আমার পালা, বলুন দেখি সার—
এই চারটে কোশ্চেনের ঠিক ঠিক আনসার—

রাবণ-রাজার দশ মুণ্ডু, নড়বড়ে বিশ হাত,
কেমন ক'রে বিছানাতে হতেন তিনি কাত?
গঙ্গা-নদী মহাদেবের জটায় করেন ঘর,
ভিজে চুলে শিবের কেন হয় না সর্দি জ্বর?
সে কোন্ ঘোড়া ডিম পাড়ে যে বাচ্চার বদলে?
ভূতের যিনি বাবা তাঁকে সক্কলে কি বলে?"

ঘাড় চুলকে জজ্ বলেন—"তাইতো খোকা তাইতো,
জানতে তুমি চাচ্চ যে-সব, আমার মনে নাইতো।
আচ্ছা, তুমি দিন আষ্টেক থাক চক্ষু বুজে
বিস্তর বই আছে আমার, দেখব আমি খুঁজে।"

দুলাল বললে—"দুও মশাই, হেরে গেলেন, দুও!
দরকারী যা সে-সব খবর জানেন না একটুও।
বলচি শুনুন—টুকে নিন সার আপনার খাতাটিতে,
কাজে লাগবে ভবিষ্যতে সভায় স্পীচ দিতে।—

রাবণ-রাজার পাগড়ি ঘিরে ন-টা সোলার মাথা,
আঠারোটা কাঠের হাত জামার সঙ্গে গাঁথা।
শুতেন খুলে পাগড়ি জামা, নকল মুণ্ডু হাত,
অনায়াসে বিছানাতে রাবণ হতেন কাত।
মাথায় মেখে বেলের আঠা আর ঘুঁটের ছাই,
শিবের জটা ওয়াটার-প্রুফ, সর্দির ভয় নাই।
পক্ষীরাজ ঘোটকের পক্ষীরাণী যিনি,
অন্য অন্য পাখীর মতন ডিম পাড়েন তিনি।
সকল ভূতের বাবা যিনি আবাগে তাঁর নাম,
তাঁর শ্রাদ্ধে হয়ে থাকে খুবই ধুমধাম।"

জজ্ মশাই বলেন তখন—"হার মানলুম খোকা,
তুমিই হ'লে পণ্ডিত, আর আমিই হচ্চি বোকা।"

এই-না ব'লে মাটির ওপর ছ-বার লাথি ঠ্‌কে
জ্‌জ্‌মশাই পালিয়ে গেলেন ষাঁড়ের পেটে ঢ্‌কে।

এই সমাচার জানতে পেরে সঙ্গীরা সব মিলে
দ্‌লালচাঁদের পিঠ চাপড়ে খ্‌ব বাহবা দিলে।
জ্‌জ্‌র খবর রাষ্ট্র হ'ল পটোলডাঙা-ময়,
গোলদীঘিতে বললে সবাই দ্‌লালচাঁদের জয়।
দ্‌লালচাঁদের কথা এখন সাঙ্গ হ'ল ভাই,
সকল গল্প সত্যি যেমন, এ গল্পটাও তাই।
ব'লে গেলুম তাড়াতাড়ি যা মনেতে এল,
বিশ্বাস যদি না করে সেউ—বড় বোয়েই গেল।
মিথ্যে যদি বলেই থাকি, দোষটা তাতে কিসে?—
আমি হল্‌ম দ্‌লালচাঁদের চার-নম্বর পিসে।

পুত্তলিকা বিবাহ পদ্ধতিঃ।

শ্বেতদ্বীপনিবাসিভিঃ সাহেবৈর্নির্ম্মিতস্য গৃহীতস্য পুত্রস্য পোর্সিলেন গোত্রস্য শ্রীমতঃ অমুকস্য শ্রীমত্যা অমুকয়া সহ বিবাহকর্ম্মাহং করোমি। ভাস্করে মাসি তস্করে পক্ষে ছুট্যাং তিথৌ খেলালগ্নে সপ্তগোলযোগে ইদং শুভবিবাহকর্ম্ম সম্পাদয়তু। পরিণামফলং কন্যায়াঃ নাসিকাভগ্নং পুত্রস্যতু মুণ্ডপাতং অন্তে পুষ্করিণ্যাং বিসর্জ্জনং। শুভাশুভং যথোচিতং তদস্তু। ইতি।

মন্দাক্রান্তায় রচিল কালিদাস কাব্য মেঘদূত চমৎকার;
বাংলার বর্ণের লঘুগুরুবিভেদ নেই বলেই শক্ত কিঞ্চিৎ;
যুক্তাক্ষর তাই যতপার চালাও আর দোসার দাও হসন্ত,
ঠিক ঠিক জায়গায় বসালে হবে এই ছন্দ একদম মারাত্মক॥

৩০/৮/৪২

ঙ্গ

বেলাবন্ধনে পঙ্গু
সাগর মাগিল সঙ্গ।
বারতা পাইয়া তুঙ্গে
লম্ফে নামিল গঙ্গা।
ভঙ্গী দেখিয়া রঙ্গে
হাসিয়া ডাকিল বঙ্গ—
এই পথে এস গঙ্গা,
মিলিবে তোমার সঙ্গী॥

১৯৩৯

নিশীথ গগন যদি উজ্জ্বল পট হ'ত, চন্দ্র তারকা মসীবিন্দু,
চাহিয়া দেখিত কেবা তুচ্ছ তারার কণা, কেবা বন্দিত কালো ইন্দু॥

...।৯।৪৩

কালিপদ ডলিকোসেফালিক,
বউ তার ব্রাকিসেফালিকা ;
কালো দাঁতে হাসে ফিকফিক
খাঁদা নাক উটকপালিকা।
কালিপদ দীর্ঘকপালিক
মন দুখে হ'ল কাপালিক
বলি দিল হাজার শালিক
মন্দিরের হইল মালিক
বসাইল দেবী কংকালিকা।
তার পর মোটর চালিকা
এল এক নেপালি বালিকা
চটপটে, অতি আধুনিকা
বলিল সে—আমি সাবালিকা
কর মোরে তব কাপালিকা।
কালিপদ দীর্ঘকরোটিক
মাথা তার হইল বেঠিক
বুঝিল না এই নেপালিকা
তারই বউ ব্রাকিসেফালিকা
রং মেখে সেজে আধুনিকা।॥

শেক্‌স্পীয়ারের নাটক পড়িয়া
পাঠক বলিল—ধন্য ধন্য।
পণ্ডিত কহে—সবুর করহ,
শোধন করিব ত্রুটি অগণ্য।
যষ্টি তুলিয়া বলে সুধীজন—
কি আস্পর্ধা ওরে জঘন্য॥

স্টিফেনসনের রেলগাড়ি চ'ড়ে
যাত্রী বলিল—কি আশ্চর্য!
মিস্ত্রী বলিল—আছে ঢের দোষ,
সারিব সে সব, ধরহ ধৈর্য।
ধনী জন কহে—লেগে যাও দাদা,
যত টাকা লাগে দিতেছি কর্জ॥

২৯।৮।৪০

যদি পাই ছ-হাজার সেণ্টিগ্রেড তাপ,
তার সঙ্গে দিতে পারি ছ-শ টন চাপ,
কয়লার গাদা হবে হীরকের কাঁড়ি
রান্নাঘরে কিন্তু আর চড়িবে না হাঁড়ি।
এই পরিণাম শুধু করিয়া বিচার
ছাড়িয়াছি মতলব হীরা করিবার॥

—।৬।৪২

কৈলাসশিখর মধ্যে যত ধাতু ছিল,
তার মধ্যে স্বর্ণ আসি লৌহেরে নিন্দিল।
প্লাটিনম বলে—ওরে সোনা তুই থাম,
তোর চেয়ে আমার যে তিনগুণ দাম।
রেগে বলে রেডিয়ম—ওরে হরিজন,
মোর এক ডেসিগ্রামে তোদের দশ টন।
ভাবে ডিম্ববতী এক ক্ষুদ্র পিপীলিকা—
আঁটকুড়ো বেটাদের কিবা অহমিকা॥

—।৬।৪২

চন্দ্র সূর্য বন্দনা

চাঁদের জয় হোক,
পরোপকারী ভদ্রলোক,
আস্ত খেঁদো ফালি সব অবস্থাতে
যথাসাধ্য লণ্ঠনের কাজ করে রাতে ॥

সুয্যিকে নমস্কার,
এই দেবতাটি মহা ফাঁকিদার,
চোপর রাত দেখা নেই মোটে,
দিনের বেলা রূপ দেখাতে ওঠে,
যখন তার দরকার কিছু নেই—
আরে, আলো তো ভর দিন থাকেই ॥

তবে লোকে সুয্যিকে কেন চায় ?
কবিরা বলেন বটে—জ্যোৎস্নায়
ফুল ফোটে, মলয় বয়, হেন হয় তেন হয়,
কিন্তু কচি ছেলের কাঁথা কি চন্দ্রালোকে শুখয় ?
আমসত্ত্ব ঘুঁটে আর কাঁচা চম্ম,
এসব শুখোনো কি চাঁদের কম্ম ?

আজ্ঞে না। আমার জানা আছে যদ্দুর,
তার জন্য চাই কাঠফাটা কড়া রোদ্দুর।
সূর্যসৃষ্টির কারণই মশাই এই,
বিধাতার রাজ্যে অনর্থক কিছু নেই ॥
অতএব গাও চাঁদের জয় সুয্যির জয়,
দুটোর একটাও ফেলবার নয় ॥

১১।২।৪৫

ঘাস

মাননীয় ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোকগণ
এবং আর সবাই যাঁদের এ পাড়ায় বাস,
মন দিয়ে শুনুন আমার অভিভাষণ,
আজ আমাদের আলোচ্য—Eat more grass

অর্থাৎ আরও বেশী ঘাস খান প্রতিদিন,
কারণ, ঘাসেই পুষ্টি, স্বাস্থ্য বলাধান,
দেদার ক্যালরি, প্রোটিন ও ভাইটামিন,
ঘাসেই হবে অন্নসমস্যার সমাধান।

এই দেখুন না, হরিণ গো মহিষ ছাগ
সেরেফ ঘাস খেয়েই কেমন পরিপুষ্ট,
আবার তাদেরই গোস্ত খেয়ে বাঘ
কেমন তাগড়াই কেঁদো আর সন্তুষ্ট।

যখন ঘাস থেকেই ছাগল ভেড়ার পাল
তথা ব্যাঘ্র শৃগালাদি জানোয়ার পয়দা,
তখন বেফায়দা কেন খান ভাত ডাল
মাছ মাংস ডিম দুধ ঘি আটা ময়দা?

দেখুন জন্তুরা কি হিসেবী, এরা কদাপি
খাটের ওপর মশারী টাঙিয়ে শোয় না
এরা কুইনিন প্যালুড্রিন খায় না, তথাপি
এদের ম্যালেরিয়া কস্মিনকালে ছোঁয় না।

এরা কুসংস্কারহীন খাঁটি নিউডিস্ট,
ধুতি শাড়ি ব্লাউজ অমনি পেলেও নেয় না,

হবুচন্দ্র-গবুচন্দ্র

হবুচন্দ্রকে বললে রাজ্যের যত লোক—
হে মহারাজ ধর্মাবতার,
আমাদের আরজিটা শুনুন একবার,
গবু মন্ত্রীকে শূলে চড়াতে আজ্ঞা হোক।
ব্যাটা অকর্মণ্য ঘুষখোর,
পয়লানম্বর চোর,
ওর জন্যে আমরা খেতে পরতে পাই না।
যদি না পারেন রাজার কাজ
তবে কি করতে আছেন মহারাজ?
চ'লে যান, আপনাকে আমরা চাই না॥

হাই তুলে বললেন হবুচন্দ্র,
এরা বলে কি হে গবুচন্দ্র?
গবু বললেন, আঃ কি জ্বালাতন,
দোষ ধরাই ওদের স্বভাব।
শিখেছেন তো তার জবাব,
আউড়ে দিন তোতাপাখির মতন॥

হেঁকে বললেন হবুচন্দ্র নরপতি,
ওহে প্রজাবৃন্দ শান্ত হও, ধৈর্য ধর,
না বুঝেই কেন চেঁচিয়ে মর,
তোমরা অবোধ ছেলেমানুষ অতি।
তোমাদের নালিশ মিথ্যে আদ্যন্ত,
স্বয়ং গবুচন্দ্র করেছেন তদন্ত।
তোমাদের কিঞ্চিৎ টানাটানি,
কিঞ্চিৎ এটা ওটা সেটা দরকার
আছে তা অবশ্যই মানি।
শীঘ্রই হবে তার প্রতিকার।
স্বর্গ থেকে আসছে মালী এক দল,
সঙ্গে নিয়ে কল্পতরুর বীজ,
ষাট বছরে ফলবে তার ফসল,
পাবে তখন হরেকরকম চীজ।
তদ্দিন বাপু সয়ে থাক চক্ষু মুদে,
বাজে খরচ কমাও,
দেদার টাকা জমাও,
আমার কাছে রাখ আড়াই পারসেণ্ট সুদে।
৮।২।৪৬

অটোগ্রাফ ১

শুধু শুভেচ্ছায় যদি হ'ত কোনো কাজ
তোমাদের তরে আমি চাহিতাম আজ—
বিদ্যা বুদ্ধি টাকাকড়ি সুকীর্তি সুনাম।
অথবা প্রাচীন মতে শুধু চাহিতাম—
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ—এই চতুষ্টয়
পুরুষার্থ যার নাম। দুঃখের বিষয়
এরকম আশীর্বাদ বড় অনিশ্চিত।
অতএত চাহিতেছি সামান্য কিঞ্চিৎ—
হও কুতুহলী, হও উৎসাহী সতত,
তাতেই অনেক লাভ হবে আপাতত।
বাড়িয়া চলুক এই তোমাদের খাতা,
লেখাতে ছবিতে এর ভরে যাক পাতা॥

৮।১০।৪০

অটোগ্রাফ ২

বেশ ঝকঝকে তোমার এ খাতা,
মিছে অটোগ্রাফে ভরিও না পাতা।
বরঞ্চ তুমি এক কাজ কর—
তুলে রাখ এটা বছর পনর।
তার পরে রোজ সকাল সন্ধ্যে
গদ্য অথবা পদ্য ছন্দে
লাল কালি দিয়ে এই নোটবুকে
কেবল কাজের কথা রেখো টুকে—
ধোবার বাড়িতে কি যাবে ময়লা,
দুধ কত এল, কত বা কয়লা,
তেল নুন চিনি মাছ তরকারি ;
এসব হিসেব ভারী দরকারী॥

২৩।১০।৪০

অটোগ্রাফ ৩

এই যে তোমার আছে অটোগ্রাফ বই,
হরেক রকম যাতে লেখা আর সই,
লাগবে না কোনো কাজে, একেবারে ফাঁকি
ছিঁড়ে ফেল পাতাগুলো। থাক শুধু বাকি
সাদা পাতা আছে যত। সেই নোট বুকে
এর পরে বড় হয়ে রেখো তুমি টুকে
ধোবার হিসাব, দুধ, মাছ, তরকারি।
এ সব হিসাব রাখা বড় দরকারী।

অটোগ্রাফ ৪

দাতব্য বলিয়া যাহা বিনা প্রত্যাশায়
দেশ কাল পাত্র বুঝে দান করা যায়,
সাত্ত্বিক নামেতে খ্যাত গীতায় সে দান,
যার কথা বলেছেন কৃষ্ণ ভগবান।
তার চেয়ে আছে দান উচ্চতর অতি,
এদেশে চলন তার হয়েছে সম্প্রতি।
এদানে পকেটে হাত পড়ে না দাতার,
বরঞ্চ খরচ কিছু হয় গ্রহীতার।
কিনতে পয়সা লাগে একখানি খাতা,
তাহার পাতায় দাতা লিখে দেন যা তা
সারগর্ভ বাজে বাণী। নাহি লাগে কাজে.
অটোগ্রাফরূপে শুধু খাতায় বিরাজে॥

অটোগ্রাফ ৫

গাদা গাদা ফোটোগ্রাফ
গুচ্ছের অটোগ্রাফ
কেষ্ট বিষ্টুর সার্টিফিকিট
দেশ বিদেশের ডাক টিকিট
ছিন্ন পাদুকা বস্ত্র ছত্র
পুরাতন টাইমটেবল
তামাদি প্রেমপত্র
শুকনো ফুল মরা প্রজাপতি
এ সব সংগ্রহ কদভ্যাস অতি।

ছবি-মণিকে

(মায়া ও স্নেহ চৌধুরি)

দিল্লি শহরচারিণী—
দুই বিদুষী ফার্স্ট-ইয়ারিনী—
এই বুড়ো দাদাকে কেন টানাটানি?
আমি বচন রচনার কিবা জানি।
এখানে আছেন অনেক আমির ওমরা
পলিটিশিয়ান হোমরা চোমরা
নাচিয়ে গাইয়ে বলিয়ে কইয়ে লিখিয়ে—
তাঁদের ধর না গিয়ে॥
তবে যদি নিতান্ত নতুন কিছু চাও
দিনকতক কলেজী বিদ্যা ভুলে যাও,
পড় টাইমটেবল আর রামায়ণ,
লঙ্কায় কর গমন॥

যেখানে আছেন দশমুণ্ড বিশহস্ত
লঙ্কেশ্বর জবরদস্ত।
তাঁর বিশ হাতের দশটা ডান আর দশটা বাঁ,
কিন্তু বাঁ হাতে তিনি লিখতে পারেন না।
অতএব নিও দশখানা অটোগ্রাফ বই,
আর দশটা ফাউণ্টেন পেন চলনসই,
কারণ, রাবণের সব মোটা মোটা বাঁশের পেন,
তাও ভেঙে ফেলেছেন॥

রাবণকে এত্তেলা পাঠিও লঙ্কায় গিয়ে,
কালনেমি মামাকে একটা টাকা দিয়ে।
তিনি হচ্ছেন রাবণের সেক্রেটারি,
আহম্মক আর ঘুষখোর ভারী।
রাবণ ডেকে বলবেন—'কে তোমরা কন্যে,
এখানে এসেছ কি জন্যে?
তোমরা কি সীতার সখী না রামচন্দ্রের দূতী?
তোমাদের ঐ শাড়ি রেশমী না সুতী?
পায়ে মল নেই কেন, কান কেন ঢাকা?
ভুরু দুটো আসল না কালি দিয়ে আঁকা?'
তোমরা বলবে—'হুজুর আমরা দিল্লি-প্রবাসিনী
তরুণী বাঙালিনী অটোগ্রাফ -প্রত্যাশিনী॥'

রাবণ বলবেন—'আরে দিল্লিওয়ালী,
তোমরা তো ভারি বদ্‌খেয়ালী!
অটোগ্রাফ লেখা কি সহজ কথা?
আমার দশটা মাথায় এখন বড্ড ব্যথা।
দুটো টিপটিপ, তিনটে কনকন, পাঁচটা কটকট—
ওঃ, রাজকার্য কি ভজকট!'

তোমরা বলবে—'মশায় রেখে দিন ওসব চালাকি,
মনে করলে আপনি পারেন না কী?
এক মিনিটে করতে পারেন ইন্দ্রলোক জয়,
খাতায় লেখা তো কিছুই নয়।
যদি নিতান্তই লেখাপড়া না থাকে জানা
তবে দিন শ্রীহনুমানের ঠিকানা।
শুনেছি তিনি যেমন লড়িয়ে তেমনি লিখিয়ে
আপনাকেও অনেক কিছু দিতে পারেন শিখিয়ে।'

রাবণ বলবেন—'সব মিছে কথা,
তার ভারী তো ক্ষমতা।
টিকটিকির মতন ছিনে ছিনে হাত
তাতে হাজারটা মাদুলি আর গাঁটে গাঁটে বাত।
আহা কিবা লড়িয়ে, কিবা লিখেয়ে! রোগা নাদাপেট,
ব্যাটা ইল্লিটারেট!
দাও তোমাদের কলম আর খাতা দশখানি,
এক্ষুনি লিখে দিচ্ছি আমার বাণী।'

এই ব'লে রাবণ লিখবেন এক সঙ্গে দশ হাতে
দশটা খাতার দশ পাতে—
সেকেলে আস্ত আর আধুনিক ভাঙা কবিতা,
আর অত্যাধুনিক গদ্য কবিতা, যাকে বলে গবিতা।
তোমরা মোটেই বুঝবে না সেই প্রচণ্ড বাণী,
কিন্তু না-বোঝার যে আনন্দ তা পাবে অনেকখানি॥

রাবণ বলবেন—'আর নয়, আমার এখন বিস্তর কাজ।'
'ধন্য হলুম মহারাজ।'
ব'লেই তোমরা চ'লে আসবে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ক'রে।
খবরদার, যেন ঢুকো না পাশের ঘরে।
সেখানে কুম্ভকর্ণ ঘুমুচ্ছেন, নাক ঘড়ঘড়,
নিশ্বাস প্রশ্বাসে ঘরে বইছে তুমুল ঝড়।
যদি কাছে গিয়ে পড় তবে নাকের ভেতরে
শুষে নেবেন চোঁৎ ক'রে॥
—।২।৪০

বনফুল

হে ডাক্তার, চিরিয়াছ বহু কলেবর,
যন্ত্রযোগে দেখিয়াছ সূক্ষ্ম দেহকলা,
সূক্ষ্মতর অণুজীব রোগের নিদান।
কুতূহলী মন তব মানে নাই সীমা,
শুষ্ক প্যাথোলজি তাই ছাড়ি' ক্ষণে ক্ষণে
ছুটিয়াছ প্রফেশন-বহির্ভূত পথে।
মানবচরিত্র মাঝে করেছ মৃগয়া,
সুখদুঃখ হাসিকান্না রাগদ্বেষ যেথা
দ্বন্দ্ব করে নিরন্তর। ধরিয়া আনিয়া
মনোনীত নিদর্শন, লিপির কৌশলে
রচিয়াছ বহুবিধ বিচিত্র স্লাইড।
শ্রীমধুসূদন যথা ব্যবহারজীবী,
বঙ্কিম ডেপুটি যথা, রবি জমিদার,
তেমনি ভিষক্ তুমি বিধির বিপাকে'
নেশা তব মানিল না পেশার বাঁধন,
বনফুল দিল চাপা বলাই ডাক্তারে॥

রা. ব.
২২-৬-৪২

‘কবিতা’কে

জন্মাবার পরে
সবাই ট্যাঁ ট্যাঁ করে।
কিন্তু খোট্টা দেশের এক মেয়ে
ভূমিষ্ঠ হয়েই চক্ষু চেয়ে
বললে বাহা বাহা রে
কাঁহা হাম আয়া রে!
ফুল ফল গাছ পালা
খেত খামার নদী নালা
গাই ভঁইস বকাড়ি
ঘুঁটে কয়লা লকাড়ি—
যা দেখছি সবই তা
বিরাট একটি কবিতা।’
গতিক দেখে সেই থেকে তাকে
সবাই ‘কবিতা’ বলেই ডাকে ॥

২০।১০।৪৪ এক দাদাশ্বশুর

পঞ্চাশ বৎসর পরে

(নরেনবাবুকে*)

Be old with me,
The best is yet to be.[১]
বুড়ো হও দুজনে থাকিয়া কাছে কাছে
উত্তম ফল এখনও বাকী আছে ॥
অনেক বছর দুজনে করেছ ঘর,
বহু দোষগুণ সহেছ পরস্পর।
যা কিছু ঘটেছে সব ভাল, সব ভাল,
অর যা ঘটিবে তাও ভাল, তাও ভাল।
বিধাতার যাহা ভাল লাগে ঘটে তাই,
চোখ কান বুজে সহা ছাড়া গতি নাই ॥
সুখং বা যদি বা দুখং, প্রিয়ং যদি বাপ্রিয়ম্।
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনা পরাজিতঃ ॥[২]
সুখ বা দুঃখ প্রিয় অপ্রিয় যাহা পাও,
অপরাজিত হয়ে হৃদয়ে মেনে নাও ॥

১৮.১.৫৫

১ Browning ২ মহাভারত
* বহুকালের বন্ধু, ‘আর্ট প্রেস’-এর সত্বাধিকারী, পরে ‘সচিত্র ভারত’-এর সম্পাদক শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

সূর্যগ্রহণ

সূর্য এবং পৃথিবীর ঠিক মাঝখানে
চন্দ্র এসেছে গ্রহণ লাগাতে আসমানে।
দু তিন হাজার অ্যাস্ট্রনমার দূরবিনে আছে চেয়ে,
ভুসো-মাখা কাঁচ হাতে নিয়ে আছে অসংখ্য ছেলেমেয়ে।
এমন সময় চাঁদে আর মেঘে ঝগড়া লাগিল গগনে,
চাঁদ বলে—মেঘ, থাকিস না তুই এই গ্রহণের লগনে।
মেঘ বলে—চাঁদ, তোর কাজে কিবা বাধা?
তোর আর আমার দুজনের কাজ দুটোই চলুক দাদা।
ন মাস সাগর শুষিয়া সূর্য করেছে আমায় সৃষ্টি
বর্ষার এই তিন মাস আমি করিব প্রচুর বৃষ্টি।
ছেলেমেয়ে আর বিজ্ঞানীগণ
সবুর করিয়া থাকুক এখন
দু শ চোদ্দ বৎসর পরে মিটিবে তাদের আশ
শরৎকালের বিমল আকাশে দেখিবে পূর্ণগ্রাস।

২০।৬।৫৫ (সূর্যগ্রহণ)

সূর্যগ্রহণের দিন, পূর্বোক্ত বন্ধু নরেন মুখোপাধ্যায়ের দৌহিত্র শ্রীমান সুরঞ্জন দত্তকে।

পদ্য ও ছড়া

লোকে পদ্য লেখে, হিসাব লেখে, কিন্তু ছড়া কাটে, সুতো কাটে। পদ্য শৌখিন রচনা, ছন্দের নিয়ম মেনে লিখতে হয়। ছড়া গ্রাম্য রচনা, মুখে মুখে তৈরী হয়, ছন্দের দোষ থাকলেও চলে, যদি মনে রাখবার যোগ্য হয় তা হলেই যথেষ্ট। বছর চার আগে Verse Verse নামে একটি ইংরেজী ছড়া পড়েছিলাম, সম্প্রতি ক্লোরোফিল টুথপেস্টের যে হুজুগ উঠেছে তাকেই ঠাট্টা। নীচে তুলে দিলাম।

Why reeks the goat
On yonder hill,
Who seems to dote
On chlorophyll?

অর্থাৎ

বোকা ছাগলটা চরে বেড়াচ্ছে,
দূর থেকে লোকে গন্ধ পাচ্ছে।
এত ক্লোরোফিল বেচারা খাচ্ছে,
তবুও গন্ধ কেন ছড়াচ্ছে?

১৪·৭·৫৬ (আশুতোষ কলেজের 3rd year ছেলেদের জন্য)

দীপংকর

দীপংকর, তোমার জন্মদিনে
ভেবেছিলুম একটা কবিতা লিখব।
কিন্তু কিছুতেই হাত দিয়ে বেরুচ্ছে না
তাই কবিতার বদলে গবিতা লিখছি॥

ষোলই জুন উনিশ শ একচল্লিশ
রাত দুপুরে ঘোর দুর্যোগ,
সেই সময় তুমি অবতীর্ণ হলে।
(ষোল ইঞ্চি লম্বা, সাড়ে তিন সের ওজন,
ঠিক জানা নেই, আন্দাজে বলছি)।
ভূমিষ্ঠ হবার তিন মিনিট পরে

ডাক্তার লক্ষ্মী হালদারের মত থেকে
তোমার মুখে ফুটল হুলো বেরালের বাণী—
হোয়াঁ ওয়াঁ ওয়াঁও॥

তার পর ষোল বছর কেটে গেছে,
তোমার লম্বাই এখন সাড়ে পাঁচ ফুট,
ওজন ঠিক জানি না, বোধ হয় দেড় মন।
তোতন যদি তালগাছ আর তারাচাঁদ
যদি নারকেলগাছ হয় তবে তুমি খেজুরগাছ।
কিন্তু তোমাদের বাড় এখনও শেষ হয় নি,
পঁচিশ বছর পর্যন্ত চলবে,
এই কথা পণ্ডিতেরা বলেন।

তার পরেও যা থাকে
তা হচ্ছে গোঁফ আর দাড়ি
আর গায়ের চর্বি বা fat ||

তোমার বুদ্ধির দৌড় কত দূর ?
শুনেছি ষোল বছরের পরে
বুদ্ধি আর বাড়ে না।
যা বাড়ে তা হচ্ছে অভিজ্ঞতা, experience,
দেখে শেখা, ঠেকে শেখা, আর শুনে শেখা।
এর মধ্যে শেষেরটাই risky।
কালিদাস বলেছেন —
মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ ;
অর্থাৎ বোকারা পরের বুদ্ধিতে চলে।
কিন্তু নিজের বুদ্ধিতে যখন কুলোয় না
তখন পরের বুদ্ধি নিতেই হয়।
যদি তুমি চালাক হও
তবে মূর্খ humbug-এর মত নেবে না,
জ্ঞানী লোকের পরামর্শ নেবে,
তা হলেই সিদ্ধিলাভ।

আজ এই পর্যন্ত। যদি টিকে থাকি
তবে আসছে বছর আবার লিখব!

রাজশেখর বসু
১৬/৮/৫৭

আরও তিন বছর 'টিকে' ছিলেন,
কিন্তু আর লেখানো হয় নি। — দীপংকর ||

সতী

নিশিশেষে কৃতান্ত কহিল দ্বার ঠেলি'—
'ছাড় পথ হে কল্যাণী, আনিয়াছি রথ,
জীর্ণ দেহ হতে আজি পতিরে তোমার
মুক্তি দিব। ধৈর্য্য ধর, শান্ত কর মন।'
কৌতুকে কহিল সতী—'দেখি দেখি রথ।'
সসম্ভ্রমে বলে যম—'দেখ দেখ দেবী,
রথশয্যা মাতৃঅংকসম সুকোমল
ব্যথাহীন শান্তিময় বিশ্রাম-নিলয়,
কোনো চিন্তা করিও না হে মমতাময়ী।'
চকিতে উঠিয়া রথে বসে সীমন্তিনী
বিদ্যুৎ-প্রতিমা সম। শিরে হানি' কর
বলে যম—'কি করিলে কি করিলে দেবী!
নামো নামো, এ রথ তোমার তরে নয়।'
দৃপ্তস্বরে বলে সতী—'চালাও সারথি,
বিলম্ব না সহে মোর, বেলা বহে যায়।'
বিমূঢ় শমন কহে—'যথা আজ্ঞা সতী।'
উল্কাসম চলে রথ জ্যোতির্ম্ময় পথে,
স্তব্ধ বসুন্ধরা দেখে কোটি চক্ষু মেলি'।
প্রবেশি' অমরলোকে জিজ্ঞাসে শমন—
'হে সাবিত্রীসমা, বল আর কি করিব?'
কহে সতী—'ফিরে যাও আলয়ে আমার,
যার তরে গিয়াছিলে আনো শীঘ্র তারে।'
কৃতান্ত কহিল—'অয়ি মৃত্যু-বিজয়িনী,
নিমেষে যাইব আর আসিব ফিরিয়া।'

১৬।৪।১৯৩৪

১৫ই এপ্রিল ১৯৩৪ একই সংগে মৃত্যু হয় রাজশেখরের একমাত্র সন্তান 'প্রতিমা' ও জামাতা অমরনাথ পালিতের। তার পরদিনই এই নিয়ে রাজশেখরের রচনা 'সতী'।

রবীন্দ্রকাব্যবিচার

'রবীন্দ্র-কাব্যবিচার' রাজশেখর বসুর জীবনের সর্বশেষ রচনা। তাঁর শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি।

১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে, তার প্রায় একবছর আগে শতবর্ষ কমিটির পক্ষে শ্রীঅমল হোমের অনুরোধে ১৭ই এপ্রিল ১৯৬০ রাজশেখর এই লেখা আরম্ভ করেন, তাঁর চিরাচরিত নিয়মে, পেনসিলে লিখে। লেখা শেষ হয় ২৬-৪-৬০। (এও তাঁর চিরকালীন অভ্যাস—সব লেখারই তারিখ লিখে রাখা।) ২৭শে এপ্রিল সকালে এর অর্ধেক অংশ 'ফেআর কপি' করেন। তার কয়েকঘণ্টা পরেই নিঃশব্দ মৃত্যু।

রবীন্দ্রশতবর্ষে এটি বেতারে প্রচারিত হয়।

মৃত্যুর ছাপ এলেখায় আছে। একটি চমৎকার লেখা হতে গিয়েও যেন দিশা হারিয়ে ফেলেছে। সমাপ্তির পরেও অসমাপ্তির আভাস।

না কি সেটাও শেষ রাজশেখরীয় সংক্ষিপ্ততা ?

রবীন্দ্রকাব্যবিচার

যাঁরা সাহিত্যের চর্চা করেন তাঁদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—লেখক পাঠক আর সমালোচক। লেখক সাহিত্য রচনা করেন, পাঠক তা উপভোগ করেন, সমালোচক তার উপভোগ্যতা বিচার করেন। এই তিন শ্রেণীর চেষ্টা বিভিন্ন, পটুতাও বিভিন্ন, কিন্তু এঁদের সংস্কার বা মানসিক পরিবেশ যদি মোটামুটি এক না হয় তবে লেখক পাঠক আর সমালোচকের সংযোগ হতে পারে না। বন্দেমাতরম্ গান সকল জাতির এবং সকল সম্প্রদায়ের উপভোগ্য হতে পারে নি, কারণ তার রূপক অনেকের সংস্কারের অনুকূল নয়। রূল ব্রিটানিয়া, ইয়াংকি ডুড্‌ল প্রভৃতি গান সম্বন্ধেও এই কথা খাটে।

রবীন্দ্রনাথ নিজেকে হিন্দু বলতেন, যদিও তিনি সনাতনী ছিলেন না। ভারতীয় পুরাণ তত্ত্বে তাঁর প্রচুর জ্ঞান ছিল, বাল্মীকি কালিদাস প্রভৃতির তিনি অনুরক্ত পাঠক ছিলেন, উপনিষৎ থেকে আরম্ভ করে রূপকথা আর গ্রাম্য ছড়া পর্যন্ত ভারতীয় সাহিত্য ইতিহাস আর ঐতিহ্যের কোনও অঙ্গই তিনি উপেক্ষা করেন নি। পূর্ববর্তী লেখক ভারতচন্দ্র মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় রবীন্দ্রনাথও ভারতীয় ঐতিহ্যে লালিত হয়েছিলেন। তারই ফলস্বরূপ কর্ণ-কুন্তী, কচ-দেবযানী, ব্রাহ্মণ, অভিসার, মেঘদূত প্রভৃতি অনবদ্য রচনা তাঁর কাছ থেকে আমরা পেয়েছি। এই বিশিষ্ট ভারতীয় সংস্কারের চিহ্ন তাঁর রচনাতেই অল্পাধিক পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়।

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য যেমন গ্রীস-রোমের পুরাণ, বাইবেল আর ইউরোপীয় ইতিহাস থেকে সংস্কার পেয়েছে, আমদের সাহিত্যও তেমনি ভারতীয় দর্শন পুরাণ ইতিহাসাদি থেকে পেয়েছে। পাশ্চাত্ত্য সংস্কার মোটামুটি আয়ত্ত না করলে যেমন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের রসগ্রহণ করা যায় না, তেমনি ভারতীয় সংস্কারে ভাবিত না হলে এদেশের সাহিত্য উপভোগ করা অসম্ভব।

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কবিদের মধ্যে যাঁদের প্রাচীনপন্থী বা রবীন্দ্রানুসারী বলা হয় তাঁদের রচনাও ভারতীয় সংস্কার দ্বারা অনুপ্রাণিত। কিন্তু যাঁরা আধুনিক বলে খ্যাত তাঁরা এই সংস্কার প্রায় বর্জন করে চলেন, তাঁদের রচনায় আধুনিক পাশ্চাত্ত্য কবিদের প্রভাবই প্রকট, গ্রীস-রোমের পুরাণকথার উল্লেখও কিছু কিছু দেখা যায়। এই নব্য রীতি প্রবর্তনের কারণ—গতানুগতিকতায় বিতৃষ্ণা এবং আধুনিক পাশ্চাত্ত্য কাব্য-রীতির প্রতি অনুরাগ। আর একটি কারণ—এদেশের ঐতিহ্যকে এঁরা প্রগতির পথে বাধা স্বরূপ মনে করেন, সেজন্য তার যথোচিত চর্চা করেননি।

পূর্ববর্তী কবিরা যে সংস্কার অর্জন করেছিলেন, তা থেকে এঁরা প্রায় বঞ্চিত। রবীন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মণ', 'মেঘদূত' তুল্য রচনা এঁদের আদর্শের অনুরূপ নয়, সাধ্যও নয়। 'এ নহে কুঞ্জ কুন্দ-কুসুম রঞ্জিত ফেনহিল্লোল কল-কল্লোলে দুলিছে'—এইরকম অনুপ্রাসময় ছন্দ তাঁরা অতি সেকেলে মনে করেন। 'তাঁর লটপট করে বাঘছাল তাঁর

বৃষ রহি রহি গরজে, তাঁর বেষ্টন করে জটাজাল, যত ভুজঙ্গদল তরজে'—এই রকম পৌরাণিক কল্পনাতেও তাঁদের অরুচি ধরে গেছে। রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব তাঁরা অস্বীকার করেন না, কিন্তু আদর্শও মনে করেন না।

বাঙালী সমাজের একটি শাখা ইঙ্গবঙ্গ নামে খ্যাত। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে যে নূতন শাখা উদ্‌গত হয়েছে, তাকে ইওরোবঙ্গ নাম দিলে ভুল হবে না। এই নূতন শাখার প্রসারের ফলে আমাদের সাহিত্যের প্রাচীন শাখার ক্ষতি হবে মনে করি না। সাহিত্যের মার্গ বহু ও বিচিত্র, কালধর্মে নূতন নূতন মার্গ আবিষ্কৃত হবেই। একদল কবি যদি পূর্বধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বনির্বাচিত পথেই চলেন এবং তাঁদের গুণগ্রাহী পাঠক আর সমালোচকের সমর্থন পান তাতে সাহিত্যের বৈচিত্র্য বাড়বে ছাড়া কমবে না।

প্রাচীন আর নবীন দুই শাখায়ই নিষ্ঠাবান লেখক পাঠক আর সমালোচক আছেন। এক শাখার সমালোচক যদি অন্য শাখার রচনা বিচার করেন, তবে পক্ষপাতিত্ব অসম্ভব নয়। তথাপি বাঙালী সমালোচকের পক্ষে সমগ্র বাঙলা কাব্য বিচারের চেষ্টা স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতীয় বা বিদেশী যে কোনও পণ্ডিতের পক্ষে ভারতীয় আর পাশ্চাত্ত্য রচনার তুলনাত্মক সমালোচনা সহজ নয়।

এককালে রবীন্দ্রকাব্যের যেসব দোষদর্শী সমালোচক ছিলেন তাঁরা সকলেই প্রাচীনপন্থী। নব্যতন্ত্রের পক্ষ থেকে প্রতিকূল সমালোচনা বিশেষ কিছু হয়নি। রবীন্দ্রকাব্য আর পাশ্চাত্ত্যকাব্যের তুলনাত্মক নিরপেক্ষ বিচার করতে পারেন এমন বিদগ্ধ প্রতিভাবান সাহিত্যিক কেউ আছেন কিনা জানি না। মধুসূদন দত্ত যদি একালের লোক হতেন, তবে হয়তো পারতেন, প্রমথ চৌধুরীও হয়তো পারতেন। কোনও বিদেশী পণ্ডিতের এইরূপ সমালোচনার যোগ্যতা আছে কিনা সন্দেহ। ভারতীয় আর পাশ্চাত্ত্য উভয়বিধ সাহিত্যে যাঁর গভীর জ্ঞান নেই, উভয়বিধ সংস্কারে যিনি ভাবিত নন, তাঁর পক্ষে তুলনাত্মক বিচারের চেষ্টা না করাই উচিত।

১৮৮৩
(২৬শে এপ্রিল, ১৯৬০)

রবীন্দ্রনাথ-প্রফুল্লচন্দ্রের পরশুরাম ঘটিত কলহ

পরশুরামের প্রথম গল্প-গ্রন্থ 'গড্ডলিকা' প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ-নিতান্তই 'নিয়মভঙ্গ করিয়া' তার অত্যন্ত প্রশংসাসূচক একটি সমালোচনা লেখেন (গ্রন্থটির নামোল্লেখে রবীন্দ্রনাথও সামান্য ভুল করে ফেলেন!)।

পরশুরাম তখন 'বেঙ্গল কেমিক্যাল'-এর ম্যানেজার। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র 'রীতিমত শঙ্কিত' হয়ে রবীন্দ্রনাথকে বিস্তর যুক্তিজাল দিয়ে অনুরোধ করলেন পরশুরামের হাত হতে কুঠার খসিয়ে দিতে—অন্যথায় তাঁর সমূহ ক্ষতি!

প্রত্যুত্তরে রাজশেখর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক উক্তি—ইনি 'খাঁটি খনিজ সোনা'।

এই তিনটি লেখা এখানে ছাপা হ'ল।

বইখানির নাম "গড্ডলিকা প্রবাহ।" ভয়ছিল পাছে নামের সংগে বইয়ের আত্ম-পরিচয়ের মিল থাকে, কেননা সাহিত্যে গড্ডলিকা প্রবাহের অন্ত নাই। কিন্তু সহসা ইহার অসামান্যতা দেখিয়া চমক লাগিল। চমক লাগিবার হেতু এই যে. এমন একখানি বই হাতে আসিলে মনে হয় লেখকের সংগে দীর্ঘকালের পরিচয় থাকা উচিত ছিল। সকালে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া যদি দ্বারের কাছে দেখি একটা উইয়ের ঢিবি আশ্চর্য্য ঠেকে না, কিন্তু যদি দেখি মস্ত একটা বট গাছ তবে সেটাকে কি ঠাহরাইব ভাবিয়া উঠা যায় না। লেখক পরশুরাম ছদ্ম নামের পিছনে গা ঢাকা দিয়াছেন। ভাবিয়া দেখিলাম, চেনা লোক বলিয়া মনে হইল না, কেননা লেখাটার উপর কোনো চেনা হাতের ছাপ পড়ে নাই। নূতন মানুষ বটে সন্দেহ নাই কিন্তু পাকা হাত।

পিতৃদত্ত নামের উপর তর্ক চলে না কিন্তু স্বকৃত নামের যোগ্যতা বিচার করিবার অধিকার সমালোচকের আছে। পরন্তু অস্ত্রটা রূপধ্বংসকারীর, তাহা রূপসৃষ্টি-কারীর নহে। পরশুরাম নামটা শুনিয়া পাঠকের সন্দেহ হইতে পারে যে লেখক বুঝি জখম করিবার কাজে প্রবৃত্ত। কথাটা একেবারেই সত্য নহে। বইখানি চরিত্র চিত্রশালা। মূর্ত্তিকারের ঘরে ঢুকিলে পাথর ভাঙার আওয়াজ শুনিয়া যদি মনে করি ভাঙা চোরাই তাঁর কাজ তবে সে ধারণাটা ছেলেমানুষের মত হয়.—ঠিকভাবে দেখিলে বুঝা যায় গড়িয়া তোলাই তাহার ব্যবসা। মানুষের সুবুদ্ধি বা দুর্ব্বুদ্ধিকে লেখক তাঁহার রচনায় আঘাত করিয়াছেন কিনা সেটা তো তেমন করিয়া আমার নজরে পড়ে নাই। আমি দেখিলাম তিনি মূর্ত্তির পর মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন। এমন করিয়া গড়িয়াছেন যে. মনে হইল ইহাদিগকে চিরকাল জানি। এমন কি. তাঁর ভুষণ্ডীর মাঠের ভূতপ্রেতগুলোর ঠিকানা যেন আমার বরাবরকার জানা ; এমন কি. যে পাঁঠাটা কন্সার্টওয়ালার ঢাকের চামড়া ও তাহার দশটাকার নোটগুলো চিবাইয়া খাইয়াছে সেটাকে আমারই বাগানের বস্‌রাই গোলাপ গাছ কাঁটাসুদ্ধ খাইতে দেখিয়াছি বলিয়া স্পষ্ট মনে পড়িতেছে। লেখক বোধকরি আধুনিক রুদ্র তেজের দিনে নিজেকে বীরপুরুষের দলে চালাইয়া দিবার লোভ সামলাইতে পারেন নাই কিন্তু আমরা তাঁহাকে রসস্রষ্টার দলেই দাবী করি। ইহাতে বর্ত্তমানে যদি তাঁহার কিছু লোকসান হয় সুদীর্ঘ ভাবীকালে তাহা পূর্ণ হইয়াও উদ্বৃত্ত থাকিবে।

লেখার দিক হইতে বইখানি আমার কাছে বিস্ময়কর। ইহাতে আরো বিস্ময়ের বিষয় আছে সে যতীন্দ্রকুমার সেনের চিত্র। লেখনীর সংগে তুলিকার কী চমৎকার জোড় মিলিয়াছে. লেখার ধারা রেখার ধারের সমান তালে চলে. কেহ কাহারো চেয়ে খাটো নহে। চরিত্রগুলো ডাহিনে বামে এমন করিয়া ধরা পড়িয়াছে যে. তাহাদের আর পালাইবার ফাঁক নাই।

গ্রন্থ সমালোচনার দাবী আমার কাছে প্রায় আসে। রক্ষা করিতে পারি না। লেখা আমার পছন্দ হয়না বলিয়া নয়. কর্ম্মবন্ধনের পাক পাছে বাড়িয়া যায় এইভয়ে। আজ ঝোঁকের মাথায় নিয়ম ভংগ করিয়া ভীত হইলাম। ভুষণ্ডীর মাঠে একদা আমার যখন গতি হইবে তখন প্রেতদের সংগে আমার কীভাবের বোঝাপড়া ঘটিবে পরশুরামের উপর তাহার রিপোর্টের ভার রহিল কিন্ত যতীন্দ্রকুমারের কাছে দরবার এই যে আমার প্রেতশরীরের প্রতি পটির প্রতি মসীলেপন সম্বন্ধে করুণ ব্যবহার করিবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রফুল্লচন্দ্রের 'নালিশ'

শ্রদ্ধাস্পদেষু

শেষ বয়সে আপনাকে লইয়া বড়ই মুস্কিলে পড়িলাম। চরকার সপক্ষে বিপক্ষে যাহাই লিখুন না কেন তাহাতে বরং সমাজের উপকারই ; এ বিষয়ে যত বাদানুবাদ হয় ততই ভালো। এই প্রবন্ধের সপক্ষে বিপক্ষে অনেকেই লেখনী ধারণ করিয়াছেন ; ইদানীং মহাত্মা গান্ধীও আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমি অনেক সভায় বলি, যখন "বড়-দাদা" আমাদের দিকে, তখন "ছোট-দাদা"কে ভয় করি না—সে দিন আপনার সামনে হিসাব করিয়া দেখিলাম আপনি আমার অপেক্ষা তিন মাসের বয়োজ্যেষ্ঠ।

সম্প্রতি দেখিতেছি আপনি সত্য সত্যই আমার ক্ষতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। "গড্ডলিকার" প্রথম সংস্করণ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যখন দেখি সাহিত্যসম্রাট্ স্বয়ং তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন অচিরে পর পর বারো হাজার কপি সে বিক্রয় হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেদিন গ্রন্থকার পরশুরামকে আমি বলিলাম, এ-প্রকার সৌভাগ্য কদাচিৎ কোনো লেখকের ঘটিয়া থাকে। এখন তাঁহার মাথা না বিগড়াইয়া যায়। তিনি আমারই হাতের তৈয়ারী একজন রাসায়নিক এবং আমার নির্দিষ্ট কোনো বিশেষ কার্যে অনেকদিন যাবৎ ব্যাপৃত। কিন্তু এখন তিনি বুঝিলেন যে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রেও একজন "কেষ্ট-বিষ্টু"! সুতরাং আমাকে অসহায় রাখিয়া ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইতে পারেন!

আর-একটি কথা!—আপনি তো এগারো-বারো বৎসর বয়স হইতেই কবিতা লিখিতেছেন। শুনিয়াছি ঈশ্বর গুপ্ত তিন বৎসর বয়সেই পদ্য রচনা করিয়াছিলেন এবং পোপ নাকি কিশোর বয়সেই বলিয়াছিলেন—

Father father mercy take
I shall no more verses make!

অনেকে বলিয়া থাকেন যে চল্লিশ বৎসরের পর নূতন ধরণের কিছু কেহ রচনা করিতে পারেন না ; কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাসে দেখিয়াছি নিউটন ৪৩।৪৪ বৎসর বয়সের পূর্বেই অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন ; কিন্তু গ্যালিলও সেই বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর যুগান্তরসংঘটনকারী আবিষ্কার করেন ; আবার (Schumann) শুমান পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পরে জড়-বিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কারের দ্বারা জগৎকে চমৎকৃত করেন। রিচার্ডসন (Father of English novelists) পুস্তকবিক্রেতা ছিলেন এবং আমার যেন স্মরণ হইতেছে, যখন পঞ্চাশ বৎসরের কাছাকাছি তখন তিনি নভেল্ লিখিতে হাত দেন। আমাদের পরশুরামও প্রায় ৪৩।৪৪ বৎসর বয়সে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আসল কথা এই যে আপনাকে কি অনুরোধ করিব যে আর-একটি এমন তীব্র সমালোচনা করুন যে, পরশুরামের হাত হইতে কুঠার খসিয়া পড়ে? এক সময় পড়িয়াছিলাম যে অনেক তত্ত্ব ও শক্তি গুহায় নিহিত থাকে ; কিন্তু ভগবানের লীলা কে বুঝিবে, কাহাকে কখন গুপ্ত অবস্থা হইতে সুপ্রকাশ করিয়া তুলেন।

ভবদীয়
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ

ওঁ

শান্তিনিকেতন

সুহৃদ্বর,

বসে বসে Scientific American পড়ছিলুম এমন সময় চিঠির খামের কোণে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানসরস্বতীর পদাঙ্ক দেখতে পেয়ে সন্দেহ হল আমার হৃৎপদ্ম থেকে কাব্যসরস্বতীকে বিদায় করে তিনি স্বয়ং আসন নেবেন এমন একটা চক্রান্ত চলচে। খুলে দেখি যাকে ইংরেজিতে বলে টেবিল ফেরানো—আমারই পরে অভিযোগ যে, আমি রসায়নের কোঠা থেকে ভুলিয়ে ভদ্রসন্তানকে রসের রাস্তায় দাঁড় করাবার দুষ্কর্মে নিযুক্ত। কিন্তু আমার এই অজ্ঞানকৃত পাপের বিরুদ্ধে নালিশ আপনার মুখে শোভা পায় না ; একদিন চিত্রগুপ্তের দরবারে তার বিচার হবে। হিসাব করে দেখবেন কত ছেলে যারা আজ পেটমোটা মাসিকপত্রে ছোটগল্প আর মিলহারা ভাঙা ছন্দের কবিতায় সাহিত্যলোকে একেবারে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড বাধিয়ে দিতে পারত, এমন কি লেখাদায়গ্রস্ত সম্পাদকমণ্ডলীর আশীর্বাদে যারা দীপ্তশিখা সমালোচনায় লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত বড় বড় লাফে ঘটিয়ে তুলত, তাদের আপনি কাউকে বি. এসসি, কাউকে ডি. এসসি-লোকে পার করে দিয়ে ল্যাবরেটরির নির্জন নিঃশব্দ সাধনায় সন্ন্যাসী করে তুললেন। সাহিত্যের তরফ থেকে আমি যদি তার প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করে থাকি কতটুকুই বা কৃতকার্য হয়েছি। আপনার রাসায়নিক বন্ধুটিকে বলবেন মাসিকপত্রবলে যে সব জীবাত্মা হয়ত বা সাহিত্যবীর হতে পারত ভুষণ্ডীর মাঠে তাদের অঘটিত সম্ভাবনার প্রেতগুলির সঙ্গে আপনার মোকাবিলার পালা যেন তিনি রচনা করেন।

আমার কথা যদি বলেন—আপনার চিঠি পড়ে আমি অনুতপ্ত হইনি ; বরঞ্চ মনের মধ্যে একটু গুমর হয়েচে। এমন কি, ভাবচি স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মতো শুদ্ধির কাজে লাগব, যে সব জন্মসাহিত্যিক গোলেমালে ল্যাবরেটরির মধ্যে ঢুকে পড়ে জাত খুইয়ে বৈজ্ঞানিকের হাটে হারিয়ে গিয়েছেন তাঁদের ফের একবার জাতে তুলব। আমার এক একবার সন্দেহ হয় আপনিও বা সেই দলের একজন হবেন, কিন্তু আপনার আর বোধ হয় উদ্ধার নেই। যাই হোক আমি রস যাচাইয়ের নিকষে আঁচড় দিয়ে দেখলেম আপনার বেঙ্গল কেমিক্যালের এই মানুষটি একেবারেই কেমিক্যাল গোল্ড নন, ইনি খাঁটি খনিজ সোনা।

এ অঞ্চলে যদি আসতে সাহস করেন তাহলে মোকাবিলায় আপনার সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করা যাবে।

ইতি ১৮ অঘ্রান ১৩৩২

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অবতরণিকা

—অনন্তে

পরশুরাম-সাহিত্য 'পরিমাণে' অত্যন্ত কম হলেও (তাঁর একাধিকবারের উক্তি —হাত তুলে দেখিয়ে—'সের দুই'!) প্রায় অনন্ত তার দিশা। অন্তেও তার সম্বন্ধে অনন্ত কথা বাকী থাকে। "আজো তাই/এ পথের শেষ নাহি পাই।/ ফুরালে এ পথ/পূর্ণ হবে সর্ব মনোরথ..."। ১

আমি তার যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করছি। এটা রাজশেখর-জীবনী লেখার জায়গা নয়, কিন্তু তার কিছু খাপছাড়া ঘটনা জানলে এক বিপুল প্রতিভার সৃজনীশক্তির গভীর বহুমুখীতার পটভূমির কিছু আভাস পাওয়া যাবে।

চন্দ্রশেখর বসু ও লক্ষ্মীমণি দেবীর দ্বিতীয় পুত্র রাজশেখরের জন্ম ৪ঠা চৈত্র ১৮৮৬, মঙ্গলবার ১৬ই মার্চ ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে, বর্ধমান জেলার বামুনপাড়া গ্রামে, মাতুলালয়ে। মাতামহী জগন্মোহিনী দত্ত ছিলেন সেখানকার 'দেবী চৌধুরাণী'। শৈশব থেকে কৈশোরের যাবতীয় লেখাপড়া চন্দ্রশেখরের কর্মস্থল বিহারের দ্বারভাঙ্গায়—হিন্দী মিডিঅমে। ১২ বছর বয়স পর্যন্ত বাঙলা বলতে পারতেন না। বাঙলা শেখা তার পর। এর পর পাটনা, তার পর লেখাপড়ার শেষ কলকাতায়, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে কেমিস্ট্রিতে এম. এ., পরে বি. এল.। এরই মধ্যে (১৮৯৭) কলকাতার শ্যামাচরণ দে'র পৌত্রী, যোগেশচন্দ্র দে'র চতুর্থা কন্যা মৃণালিনীর সঙ্গে বিবাহ।

১৯০৩ সালে সার পি. সি. রায় নিয়ে গেলেন ১৯০১-এ তাঁর ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প-রূপে প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গল কেমিক্যাল'-এ। ১৯০৪ থেকে ১৯৩২ সেখানকার 'সর্বাধিনায়ক' হয়ে বেংগল কেমিক্যালকে করে তুললেন ভারতের সর্বোচ্চ দেশীয় রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান। এখানেই প্রকাশ পেল তাঁর প্রথম প্রতিভা—ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'ইনডসট্রিঅল কেমিস্ট'। আর এখান থেকেই তাঁর দ্বিতীয় কীর্তি—সুহৃদ্ যতীন্দ্রকুমার সেনের সঙ্গে 'বাঙলা বিজ্ঞাপনের' সার্থক রূপায়ন। আজকের অসংখ্য বিজ্ঞাপন সংস্থার সেই বীজ। এই প্রবর্তনের মাত্র অপর ব্যক্তিত্ব—সুকুমার রায়। পরবর্তীকালে রাজশেখর বহুবার বলেছেন—'বাল্যের কবিতার পর এই বিজ্ঞাপন লেখাই আমার সাহিত্যের আরম্ভ।'

এরই মাঝে, ১৯২২ সালে, 'মধ্যগগনের প্রখর রবিকরে' প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম গল্প শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'। এতেই দেখা দিল তাঁর ছদ্মনাম—পরশুরাম, যা হাতের কাছে পাওয়া পারিবারিক স্বর্ণকার তারাচাঁদ পরশুরাম-এর নাম থেকে নেওয়া, যার সঙ্গে কুঠার-স্কন্ধ পৌরাণিক জামদগ্ন্য সম্পূর্ণ সম্পর্করহিত। তখন এ এক অদ্ভুত সমাপতন।

১৯২৪-এর মধ্যে আরও চারটে গল্প নিয়ে প্রকাশিত হল পরশুরামের প্রথম গল্প-গ্রন্থ 'গড্ডলিকা'। পাঠকমহলে সাড়া পড়েই ছিল, মধ্যাহ্ন রবিও (গ্রন্থের নামটি কিঞ্চিৎ ভুল উল্লেখ করে) লিখে ফেললেন এক দীর্ঘ প্রশংসাপত্র, যার সুবিখ্যাত উক্তি—"সকালে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া যদি দ্বারের কাছে দেখি মস্ত একটা বট গাছ..."।

সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হল প্রফুল্লচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের এক অপূর্ব 'মসি যুদ্ধ'।

প্রফুল্লচন্দ্রের অভিযোগ—'আপনি আমার হাতে গড়া রাসায়নিকটির মাথা বিগড়াইয়া দিতেছেন। "...আর একটি তীব্র সমালোচনা করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত্র করুন।..."

রবীন্দ্রনাথের উত্তরে পাওয়া গেল আরও একটি ঐতিহাসিক উক্তি—"এই মানুষটি একেবারেই কেমিক্যাল গোল্ড নন, ইনি খাঁটি খনিজ সোনা।..." [২]

কিন্তু সত্যিই এই খনিজ সোনাটিকে বাংলা ভাষার 'বীকন্'/'বেকন্' করছিল। আলোকস্তম্ভের হাতছানি। ১৯৩২-এ বেঙ্গল কেমিক্যালের ম্যানেজারের পদ ছেড়ে রাজশেখর নিজেকে সম্পূর্ণভাবে জড়িয়ে ফেললেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে। বার বছর বয়সে প্রথম-বাংলা শেখা, পরে এক রসায়নবিদ্ ব্যবসায়ী হয়ে গেলেন বাংলা ভাষা সংস্কার ও পরিভাষা-কমিটির অধিনায়ক। তখনও 'ডিরেক্টর' হয়ে বেঙ্গল কেমিক্যাল পরিচালনার সঙ্গে চলল বানান-সংস্কার, অভিধান সংকলন গল্প লেখা ও রামায়ণ মহাভারতের সারানুবাদ।

১৯৩৪-এ হঠাৎ এল তাঁর সবচেয়ে বড় আঘাত—একমাত্র সন্তান 'প্রতিমা' ও জামাতা অমরনাথ পালিতের মৃত্যু। সেদিন শনিবার, ১৫ই এপ্রিল ১৯৩৪ : দীর্ঘ-রোগগ্রস্ত অমরনাথের মৃত্যুর প্রস্তুতি ছিল সকলেরই : কিন্তু অক্লান্ত শুশ্রূষা-কারিণী পত্নী প্রতিমার সম্পূর্ণ আকস্মিক মৃত্যু এল পতির মৃত্যুকে নিশ্চিত 'প্রত্যক্ষ' করার সঙ্গে সঙ্গে। বিজয়িনী। কয়েকঘণ্টা পরে মৃত অমরনাথের দেহ উঠল পত্নীর জ্বলন্ত চিতায়।

দুঃখ সুখে ব্যথিতচিত্তে সম্পূর্ণ বিগতস্পৃহ রাজশেখর নিবাত দীপশিখা। পরের দিনই ভোরে এই নিয়ে লিখলেন 'সতী' কবিতা : সদ্য পিতৃমাতৃহীনা একমাত্র দৌহিত্রী 'আশা'কে (আমরা মা) সেটা দিয়ে বললেন স্বল্পতম কথা—'লেখাপড়া নিয়ে থাক। বিদ্যের চেয়ে বড় আর কিছু নেই।'

'সতী' তখন মা'র কাছে হয়ত 'মৃত্যুর পরে'র চেয়েও। এ কবিতার মূল্যায়নও আমার সাধ্যাতীত। তবু বলতে পারি এ কবিতা সৃষ্টির পটভূমি, এর দর্শন ও তারপরের ওই স্বল্পতম উক্তিই রাজশেখরের সারাজীবনের কর্ম ও প্রতিভা ছাপিয়ে ওঠা মূল মন্ত্র।

এর পর ঠিক ২৬ বছর বেঁচেছিলেন রাজশেখর। নিরন্তর সন্তান শোকাতুরা পত্নীর মৃত্যু হয়েছে ১৯৪২-এ। বিদ্যা ও কর্মের মধ্যে আরও মগ্ন হয়ে গেছেন তিনি। তবে এই প্রথম যেন পেয়েছেন এক সস্নেহ 'রিল্যাকসেশন'—একমাত্র ক্ষুদ্র দৌহিত্রী-পুত্র—এই 'উত্তম' 'আমি'। পরবর্তীকালের বিশ্বস্ত সচিব।

বেঙ্গল কেমিক্যাল পরিচালনা করে চলেছেন। বাংলা বানান সংস্কারের কর্ণধার হয়েছেন। সুরেশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে, যতীন্দ্রকুমার সেন সহ সৃষ্টি করেছেন বাংলা লাইনোটাইপ। সাহিত্য সৃষ্টি তো চলেছেই।

পরশুরামই সম্ভবতঃ একমাত্র লেখক যাঁর লেখনীতে সর্বকালের সর্বোচ্চ ডিটেকটিভ—দ লাস্ট কোর্ট অভ অ্যাপীল—শার্লক হোমস জীবনে একবারই ভারতে এসেছেন ও বাঙলার এক অখ্যাত গ্রাম্য স্কুলটীচার রাখাল মুস্তৌফীর কাছে প্রায় পরাস্ত হয়েছেন (নীলতারা গল্পে)। রাখাল মুস্তৌফী যেন আর এক প্রোফেসর মরিআর্টি। এটা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা নয়। অত্যন্ত রাশভারি রাজ-শেখরের ভাবলেশহীন মুখভঙ্গি ও ততোধিক 'মৃত' চোখের চাহনির আড়ালে যে

চিরন্তন 'হোমসীয়' পর্যবেক্ষণ শক্তি লুকিয়ে ছিল, সেই তাঁর জীবনব্যাপী লোক-চরিত্র প্রকাশের, উন্মোচনের উৎস। একমাত্র তাঁর পত্নী মৃণালিনীই তাঁর এই শক্তি সম্বন্ধে বারবার অতি সরল বাংলায় বলেছেন— '—বড় ধড়িবাজ, কারুর (বিশেষতঃ মেয়েদের!) দিকে চোখ তুলে তাকায় না, কিন্তু তাদের হাড়হদ্দ সব জানে।

আমিও অবশ্য তাঁর এই হোমসীয় শক্তি অনেকবার দেখেছি।

দীর্ঘ জীবৎকালে অতি সাধারণ ব্যক্তি থেকে উচ্চ বুদ্ধিজীবি মহলের সংখ্যাতীত ব্যক্তির অপরিসীম শ্রদ্ধা পেয়েছেন রাজশেখর—সঙ্গে অনিবার্য 'আক্রমণ'ও। এটা তো সভ্যতার আদি থেকে সত্য। বিশাল প্রতিভা দেখা দিলে দুরন্ত বাধাই যেন তার স্বীকৃতি। বিদ্যাসাগর তার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথকেও সহ্য করতে হয়েছে বিস্তর নোংরামি। সেই বিরাট পুরুষদের মতনই নির্বিকার নিজের পথে এগিয়ে গেছেন রাজশেখর। 'মৃত্যু' ছাড়া আর কারুর সঙ্গে আপোষ নয়।

ধীরে ধীরে তাঁর লেখা হয়ে উঠেছে সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাণিত ব্যঙ্গ—satire—সরসতা ও কৌতুকের মধ্যে প্রচ্ছন্ন তীক্ষ্ন ব্যঙ্গ। অতি কঠিন বর্মের মতন দুর্ভেদ্য তাঁর এই রঙ্গের নির্মোকা আর এই কারণেই—যার জন্যে রাজশেখর নিজেই দায়ী—মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী ছাড়া, সর্বসাধারণ তাঁর রঙ্গের শুগার কোটিংটাকেই শুধু উপভোগ করে তাঁকে 'রসসাহিত্যিক' 'হাঁসির গল্প লেখক' ইত্যাদি 'খেতাব' দিয়েছেন।

নিজের সম্বন্ধে এই একটিমাত্র বিষয়ে তাঁকে বারবার বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখেছি— ৩৪।৩৫ বছর হয়ে গেছে, পরিস্কার মনে আছে প্রতিটি শব্দ—"এটা অত্যন্ত অপমানকর, 'রসসাহিত্যিক' আবার কি, আমি কি হাঁড়িতে রস ফুটিয়ে তৈরী করি"।

অবশ্য বেশ কিছু ব্যক্তি সরসতার আড়ালে এই satire-এর তীক্ষ্নতা ঠিকই উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু তাঁরাও বারবার বলেছেন যত তীক্ষ্নই হোক, কখনও তা কাউকে আঘাত দেয় নি।

এইখানে আমার নিতান্তই সুযোগ—'প্রিভিলেজ-'এর গুরুত্বপূর্ণতা দাবী করতে পারি। আমার জ্ঞানোদয় থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত নিরন্তর সান্নিধ্যের বিশেষ সুযোগ। তাছাড়া অসংখ্যবার আমার কাছে বলে ফেলা রাশভারি রাজশেখরের অনেক একান্ত উক্তি, আমার বহু আপাত তুচ্ছ বিষয়ে গভীর স্মরণশক্তি, আমার বয়স ও তাঁর লেখা বারবার পড়া, এই সব মিশিয়ে এত বছর পরে আমার বিশ্বাস 'কখনও তা কাউকে আঘাত দেয় নি'—বুদ্ধিজীবিদের এই উক্তি সর্বাংশে ঠিক নয়; হয়তো তাঁরাও খেয়াল করেন নি, অথবা খুব সম্ভবতঃ করেও ভদ্রতার খাতিরে এই নম্র উক্তি করেছেন। আমার উপলব্ধি—শুধু আঘাতই দেন নি, বহুবার, বিশেষতঃ মানবসভ্যতার সমস্ত কুসংস্কার পাপ ও অন্যায়ের ক্ষেত্রে আঘাতের সীমানা ছাড়িয়ে তাঁর লেখা নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতার রাজত্বে প্রবেশ করেছে। অথচ রাজশেখরের অন্য এক সত্তা, 'যথার্থ' ভদ্রলোক', তাঁর প্রশ্নাতীত শিষ্টাচার বারবার বাধা দিয়েছে এই নিষ্ঠুরতা এই নৃশংসতাকে। তখন তিনি তা প্রচ্ছন্ন করেছেন চরম থেকে চরমতর অস্পষ্টতার মধ্যে। বুঝ যে জন জান সন্ধান। সাধারণ তো বটেই, অসাধারণও যদি সেই গভীরে প্রবেশ করতে না পেরে তাঁর রঙ্গের নির্মোক নিয়ে মাতামাতি করে তবে তার জন্যে দায়ী তিনি নিজে।

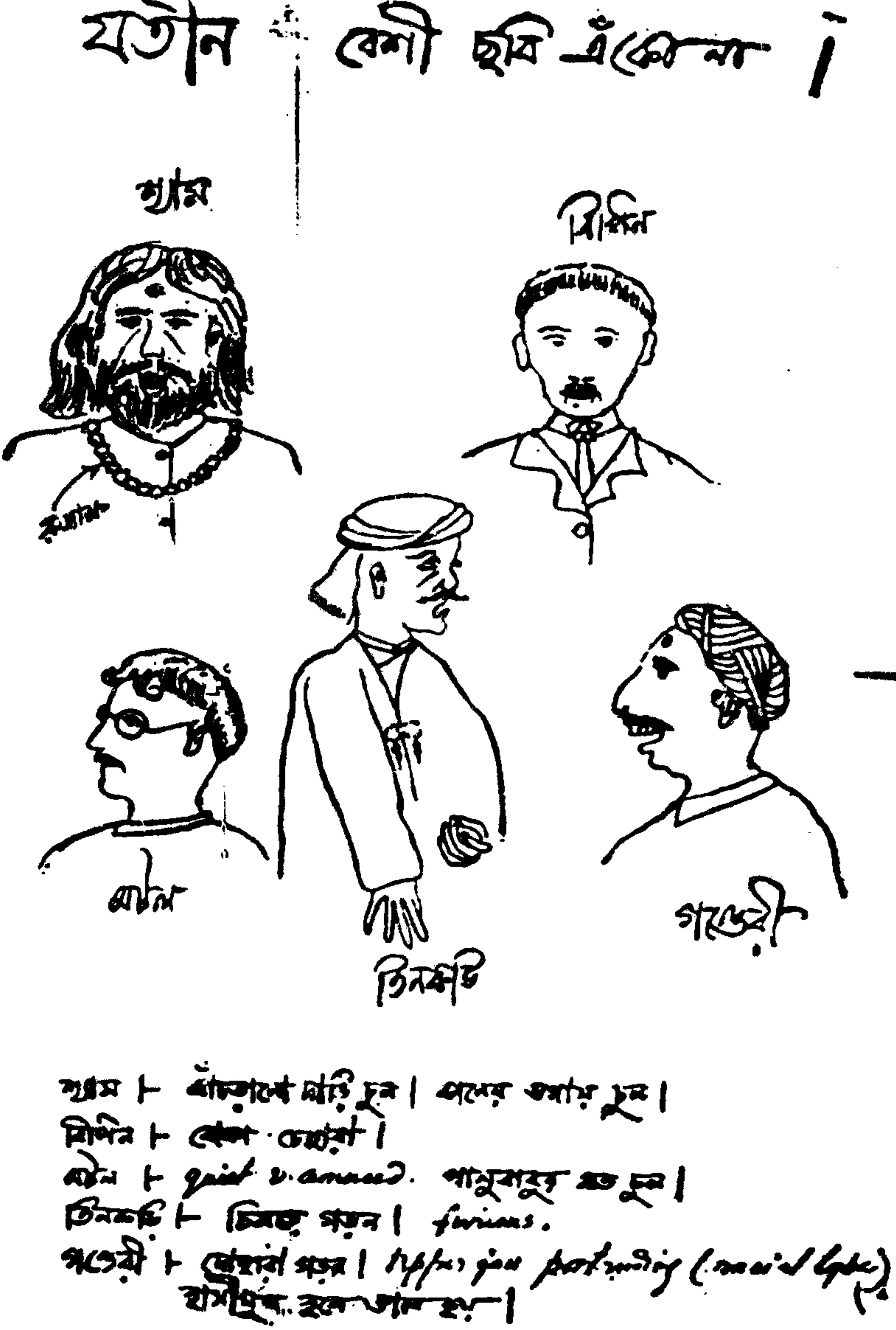
শুধু তাই নয়, আরও আছে। বোধ হয়, বোঝা না বোঝার একটা লুকোচুরি খেলার জন্যে মাঝে মাঝে বেশ স্থূল ব্যঙ্গও সৃষ্টি করে রেখেছেন অনেক লেখায় ; অবশ্যই সেটা অলংকারের একটা অংগ। কিন্তু 'বিভ্রান্তি' ত তাহলে আসবেই।

সবশেষে একবার ফিরে যাওয়া যাক তাঁর সৃষ্টির আদিতে, ১৯২২ সালে হাতের কাছে হঠাৎ পাওয়া স্বর্ণকার তারাচাঁদ পরশুরামের নাম থেকে নেওয়া রাজশেখর বসুর ছদ্মনাম 'পরশুরাম' তখন এক সামান্য ঘটনা : কিন্তু এক বিরাট সমাপতন। পরবর্তীকালে, বয়স অভিজ্ঞতা মানসিকতা পারিপার্শ্বিকতা তাঁর লেখনীকে ক্ষুরধার করে ধীরে ধীরে তাঁকে করে তুলল এক 'চিরঞ্জীব' পৌরাণিক জামদগ্ন, যাঁর স্কন্ধস্থিত শাণিত কুঠার সমাজ ও সভ্যতার সমস্ত দোষ, evil, সামাজিক ও মানসিক কুসংস্কারকে নির্মম সংহারের জন্য সর্বদাই উদ্যত।

পণ্ডিতেরা তর্ক তুলুন, আমাকে মূর্খ বলুন, কিন্তু হয়ত রবীন্দ্রনাথ কৃত সজ্ঞার্থ অনুসারে 'যার সব কিছু পণ্ড হয়ে গেছে' সেই 'পণ্ডিত'—আমি'র পরশুরাম-সাহিত্য সম্বন্ধে এই ধারণা, এই বিশ্লেষণ, এই অবতরণিকা।

দীপংকর বসু

১. বাদল সরকার।
২. তিনটি লেখাই এই গ্রন্থে মুদ্রিত হল।



প্রথম গল্প শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড-এর ছবির জন্যে চিত্রকর যতীন্দ্রকুমারকে পরশুরামের নির্দেশ।

গল্পের নামের বর্ণানুক্রমিক সূচী

গ ঃ গড্ডলিকা — ল ঃ গল্পকল্প — ন ঃ নীলতারা
ক ঃ কজ্জলী — ধ ঃ ধুস্তুরীমায়া — আ ঃ আনন্দীবাঈ
হ ঃ হনুমানের স্বপ্ন — কৃ ঃ কৃষ্ণকলি — চ ঃ চমৎকুমারী

১, ২, ৪ ঃ পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত
৪ ঃ শেষ রচনা (অসমাপ্ত) (১৯৫৯)
৫ ঃ শেষ রচনা (১৯৫৯)
৮ ঃ তিনটি গল্প-সমষ্টি :
বনোয়ারীবাবু, সত্যবতী
ভৈরবী, মধু-কুঞ্জ সংবাদ
৯ ঃ একমাত্র করুণ রসের গল্প
১০ ঃ প্রথম রচনা (১৯২২)
৩ ঃ পূর্বনামঃ উজবেকী উপসংহার
৬ ঃ ঐ ঃ দুই বুড়োর রূপকথা
৭ ঃ ঐ ঃ সাত্ত্বিক আহার



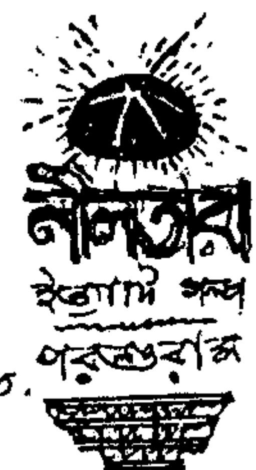
ভুশণ্ডীর মাঠে

পরশুরাম-রচিত :: [illegible]

(১)

শিবু ভট্টাচার্যের নিবাস পেনেটী গ্রামে। একটি স্ত্রী, তিনটি গরু, এককামরা পাকা বাড়ী, ছাব্বিশ ঘর যজমান, কিছু ব্রহ্মোত্তর জমি, কয়েক ঘর প্রজা,— ইহাতে স্বচ্ছন্দে সংসার চলিয়া যায়। শিবুর বয়স বত্রিশ। ছেলেবেলায় স্কুলে যা একটু লেখাপড়া শিখিয়াছিল এবং বাপের কাছে যে টুকু সংস্কৃত পড়িয়াছিল তাহা সম্প্রতি এবং যজমান রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু শিবুর মনে সুখ ছিলনা। তার স্ত্রী নৃত্যকালীর বয়স প্রায় পঁচিশ, আঁটো সাঁটো মজবুত গড়ন, দুর্দান্ত স্বভাব। স্বামীর প্রতি তার যত্নের ত্রুটি ছিলনা, কিন্তু শিবু সে যত্নের মধ্যে রস খুঁজিয়া পাইতনা। সামান্য খুঁটিনাটি লইয়া স্বামী স্ত্রীতে তুমুল ঝগড়া বাধিত। তাছাড়া মিলি





নীলতারা গ্রন্থ প্রকাশের সময় পরশুরাম অঙ্কিত প্রচ্ছদ। উজ্জ্বল নীল কালিতে কলমে আঁকা।

বালকাণ্ড

১। নারদ-বাল্মীকি-সংবাদ



যে দক্ষ তপস্বী পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ নারদকে মুনিবর বাল্মীকি জিজ্ঞাসা করলেন, সম্প্রতি পৃথিবীতে কে আছেন যিনি গুণবান্‌, বীর্যবান্‌, ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী ও দৃঢ়ব্রত; যিনি সচ্চরিত্র, সর্বভূতের হিতকারী, বিদ্বান্‌, কর্তব্যপালনে সমর্থ এবং অদ্বিতীয় প্রিয়দর্শন; যিনি আত্মজয়ী, কান্তিমান্‌, জিতক্রোধ ও অসূয়াশূন্য?



সম্পূর্ণ রচনা তালিকা

পরশুরাম গল্প গ্রন্থ

১) গড্ডলিকা

২) কজ্জলী

৩) হনুমানের স্বপ্ন

৪) গল্প কল্প

৫) ধুস্তুরী মায়া

৬) কৃষ্ণকলি

৭) নীলতারা

৮) আনন্দীবাঈ

৯) চমৎকুমারী

কবিতা

পরশুরামের কবিতা

(মরণোত্তর)

রাজশেখর বসু

অভিধান

চলন্তিকা

সারানুবাদ

১) বাল্মীকী রামায়ণ

২) ব্যাসকৃত মহাভারত

৩) কালিদাসের মেঘদূত

৪) শ্রীমদ্ভগবতগীতা

(মরণোত্তর)

প্রবন্ধ-সংগ্রহ

১) লঘুগুরু

২) বিচিন্তা

চলচ্চিন্তা

অন্যান্য

১) কুটির শিল্প

২) ভারতের খনিজ

ছোটদের ঃ হিতোপদেশের গল্প

চলন্তিকা সম্বন্ধে অভিমত

রবীন্দ্রনাথ—

বাংলা ভাষার সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়
পেতে যে ইচ্ছা করবে
তোমার বই ছাড়া
তার অন্য গতি নেই।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস—

আমি বাংলায় যতগুলি ছোট
অভিধান দেখিয়াছি তন্মধ্যে
চলন্তিকাতেই অভিধান
সংকলনকলার প্রকৃষ্ট পরিচয়।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—

বাংলা ভাষা আলোচনাকারী
ব্যক্তির পক্ষে এই কাজের কথায়
পূর্ণ সংক্ষিপ্ত,
সরল, সহজ ব্যবহার্য
অভিধানখানি যে অপরিহার্য হইবে
তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।
অভিধানের পিছনে যে বৈজ্ঞানিক
ও কৃতকর্মা ব্যক্তির মস্তিষ্ক কাজ
করিতেছে তাহা বুঝিতে দেরী
হয় না।

আনন্দবাজার পত্রিকা—

'চলন্তিকা' যুগান্তকারী গ্রন্থ।

পিতৃদত্ত নামের উপর তর্ক চলে না কিন্তু স্বকৃত নামের যোগ্যতা
বিচার করিবার অধিকার সমালোচকের আছে।
পরন্তু অস্ত্রটা রূপধ্বংসকারীর, তাহা রূপস্রষ্টিকারীর নহে।
পরশুরাম নামটা শুনিয়া পাঠকের সন্দেহ হইতে পারে যে
লেখক বুঝি জখম করিবার কাজে প্রবৃত্ত।
কথাটা একেবারেই সত্য নহে। বইখানি চরিত্র চিত্রশালা।
মূর্ত্তিকারের ঘরে ঢুকিলে পাথর ভাঙার আওয়াজ শুনিয়া
যদি মনে করি ভাঙা চোরাই তাঁর কাজ
তবে সে ধারণাটা ছেলেমানুষের মত হয়,—
ঠিকভাবে দেখিলে বুঝা যায় গড়িয়া তোলাই তাহার ব্যবসা।
মানুষের সুবুদ্ধি বা দুর্ব্বুদ্ধিকে
লেখক তাঁহার রচনায় আঘাত করিয়াছেন কিনা
সেটা তো তেমন করিয়া আমার নজরে পড়ে নাই।
আমি দেখিলাম তিনি মূর্ত্তির পর মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন।
এমন করিয়া গড়িয়াছেন যে, মনে হইল ইহাদিগকে চিরকাল জানি।
এমন কি, তাঁর ভুষণ্ডীর মাঠের ভূতপ্রেতগুলোর ঠিকানা
যেন আমার বরাবরকার জানা; এমন কি, যে পাঁঠাটা
কন্সর্টওয়ালার ঢাকের চামড়া ও তাহার দশটাকার নোটগুলো
চিবাইয়া খাইয়াছে সেটাকে আমারই বাগানের বস্‌রাই গোলাপ গাছ
কাঁটাসুদ্ধ খাইতে দেখিয়াছি বলিয়া স্পষ্ট মনে পড়িতেছে।
লেখক বোধকরি আধুনিক রুদ্র তেজের দিনে নিজেকে
বীরপুরুষের দলে চালাইয়া দিবার লোভ সামলাইতে পারেন নাই
কিন্তু আমরা তাঁহাকে রসস্রষ্টার দলেই দাবী করি।
ইহাতে বর্ত্তমানে যদি তাঁহার কিছু লোকসান হয়
সুদীর্ঘ ভাবীকালে তাহা পূর্ণ হইয়াও উদ্বৃত্ত থাকিবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর